মাধুকরী

প্রফুল্ল রায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

নবকলেবরে প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা—১৩৭০ সাল

প্রচ্ছদ
ধীরেন শাসমল

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩



রেলিং-এ বসে বান্‌জার নদীর যেদিকটা দেখা যাচ্ছে, সেদিকটাতেই কান্‌হা টাইগার প্রিসার্ভ্‌-এর কোর্‌-এরীয়া। ভারী সুন্দর এই নদী বান্‌জার।

আই-টি-ডি-সি'র মধ্যপ্রদেশের মুক্কি-লজ্‌-এর একটু উপরে কতগুলো পাথরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়াতে সবসময়ই প্রপাতের মতো একটানা আওয়াজ হয় ঝরঝরানির। পেছন থেকে সেই আওয়াজ রোদ-পিছলানো জলের উপর নাচতে নাচতে দৌড়ে আসছে।

সামনে, পুরোনো ভেঙে-পড়া কজ্‌ওয়েটা। আগে তার উপর দিয়েই সরু রাস্তা ছিল। কজ্‌ওয়ের নিচ দিয়ে কিছুটা বয়ে গিয়েই বাঁক নিয়েছে। বাঁয়ে। রাতের শিশিরে এখনও গা-মাখা, থোরের রঙের পেলব বালির চর। সোনালি চুলের পরিচ্ছন্ন ও চিন্তাশীল একদল হনুমান সেই চর-এর ছির্‌ ঘাস-এর মধ্যে কোনো জরুরী ব্যাপার নিয়ে পরামর্শে ব্যস্ত। পশ্চিমের জঙ্গল থেকে প্রায়-উড়াল্‌, বড় বড় বাদামী কাঠবিড়ালিদের লাফানো-ঝাঁপানো চিঁক্‌-চিঁক আওয়াজ আর বনে বনে গভীর প্রতিধ্বনি-তোলা, হনুমানদের হুউপ্‌-হুউপ্‌-হুউপ্‌ বান্‌জারের জলকে যেন চম্‌কে দিচ্ছে।

চম্‌কানো, চল্‌কানো নদীতে, বহতা জল যেখানে অগভীর অথবা পাথরের মধ্যে মধ্যে যেখানে সামান্যই জমে আছে ; সেই তির্‌তিরে থির জলে বড় বড় সাদা ফুল ফুটেছে, জল আলো করে। জল-পাথুরে ফুল। মধ্যপ্রদেশের এ অঞ্চলের লোকেরা বলে, গান্ধালা। গাংগারিয়া বলেও একরকমের ফুল ফুটেছে।

এক বৃদ্ধ বাইগা এবং তার শিশু নাতি, নদীর মধ্যের একটি প্রস্তরময় জায়গাতে বসে আছে ছিপ্‌ ফেলে। নদী ও বনের আঙ্গিকের মতো। অবকাশ, দুজনেরই এই নীলাকাশেরই মতো। দু'পাশ থেকে আকাশ-ছোঁয়া সব বোতল-সবুজ, জলপাই-সবুজ, ঘাস-ফড়িং সবুজ গাছ ঝুঁকে পড়ে দেখছে সেই প্রায়-উলঙ্গ বুড়ো আর শিশুকে। কে বেশি শিশু দুজনের মধ্যে তাই-ই দেখছে বোধহয়!

ঠুঠা বাইগা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, বাড়ি কোথায় হে?

বুড়ো মুখই তুলল না।

শিশু একবার তুলল।

কি হে, বুড়ো?

ঠুঠা বলল।

বুড়ো বলল, কুর্‌সীপার্‌। প্রায়, ফিস্‌স্‌ ফিস্‌স্‌ করে।

নানা বিষয়েই প্রৌঢ় ঠুঠা বাইগার বুকের মধ্যে যতখানি উদ্বেল ঔৎসুক্য, ওর গলায় ততখানি জোর নেই। মাঝে মাঝেই, পৃথুর ওকে বলতে ইচ্ছে করে যে, যতখানি ঔৎসুক্য একজন মানুষের বইবার ক্ষমতা থাকে তার চেয়ে বেশি বইতে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ঠুঠা আবার বলল, পেলে কিছু?

হ্যাঁ।

কি?

সাঁওয়ার।

আর কিছু না?

পাড়হেন্‌।

সাঁওয়ার মাছ দেখতে অনেকটা বাম্‌ সাপের মতো হয়। আর পাড়হেন্‌ হয় বলাই-পুঁটির মতো।

বেচবে না কি?

বুড়ো কথা না বলে, ফাৎনা আর স্রোতের দিকে চেয়ে মুখও না-ঘুরিয়েই মাথা নাড়ল। দু দিকে। নেতিবাচক।

ঠুঠা আরও কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কথা-বার্তা চালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কচিৎ হুঁ। হাঁ। পেল উত্তরে।

পৃথুব মনে হল, গভীর বনের গাম্ভীর্য এবং বান্‌জার্-এর শান্ত সম্ভ্রান্ততা আশ্বিন-সকালের কাঁচ-পোকা-ওড়া কুচি-কুচি রোদ্দুরে বাইগা-বুড়োর মনকে এক অজাগতিক নির্লিপ্তিতে ভরে দিয়েছে। বুড়ো যেন নদীরই মতো হয়ে গেছে। নদীকে সকলের দরকার, তাকে সকলেই ডাকে; নদী ডাকে না কাউকেই। সে চলে আত্মমগ্ন হয়ে, আপন খেয়ালে।

বনের লোকের মনে গভীরতা থাকে। বনেরই মনেরমতো। বেশি কথা, ভালবাসে না তারা।

বাচালতা, শহরেরই রোগ।

ঠুঠা বাইগা তার বন-ময়ূরী গ্রামকে ত খুইয়েইছে, হাটচান্দ্রায় কাজ করে তার বনজ চরিত্রটাও খুইয়েছে।

মনে হয়, পৃথুর।

ওদের দুজনকে মুক্কিতে নামিয়ে দিয়ে মোগাঁও হয়ে মালাঞ্জখন্ড-এ চলে গেছে জীপটা শর্মা আর কানিট্‌কার সাহেবকে নিয়ে। কিছু কাজ আছে। ওখানে তাঁদের রিস্তেদাররাও আছেন। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে দিনশেষে পৃথুদের আবার তুলে নিয়ে যাবেন ওঁরা।

হাটচান্দ্রা থেকে মুক্কি অনেকই দূর। প্রায় পাঁচটাকা ভাড়া লাগে, বাসে এলে। একটাই বাস। সকালে হাটচান্দ্রা থেকে ছাড়ে আবার ফিরে যায় রাতে। জঙ্গল পাহাড়ের সান্নাটা এলাকা এসব!

ওদের আসতে হয়েছে কুলী সংগ্রহর উদ্দেশ্যে। হাটচান্দ্রাতে, ওরা যেখানে কাজ করে, সেই ল্যাক-ফ্যাক্টরীর লেবার কনট্র্যাক্টর ভিখু সিং মারকুট্টে লোক। তার ভাই বাগী হয়ে বেহড়ে চলে গেছে। নামী ডাকাত সে। বয়কট করার হুমকি দিয়েছে ভিখু, কম্পানীকে। রেট্ বাড়াতে কোম্পানীর কোনোই আপত্তি নেই। রেসিডেন্ট ডিরেকটর উধাম সিং লোকটিও মারকুট্টে।

ভিখু সিং ইনক্রিমেন্টের পুরোটা নিজেই খেতে চায়। রেট্ কম বাড়াতে বলছে সে; কিন্তু নিজে প্রতিমাসে কাট্ চাইছে। কমিশান্ হিসেবে। লেবারদের কাছে পৃথুরা এ তথ্য ফাঁস করে দেওয়াতে ভিখু তার নিজস্ব দল নিয়ে চলে যাবে বলেছে মোগাঁও, মালাঞ্জখণ্ড-এর কাছে। বদ্‌লাও নেবে বলেছে।

ঠুঠা বলেছে, দেখা যাবে।

ঠুঠার আদি বাস ছিল এখন যেখানে কান্‌হা টাইগার প্রজেক্টের কোর্ এরীয়া, তার একেবারে ভিতরে। তাদের গ্রাম অবশ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। মহামারীতে। গ্রামটা মহামারীতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে বটে, তবে টাইগার-প্রজেক্ট হওয়ার পর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও অনেক গ্রাম সরিয়ে নিয়ে গেছেন অন্যত্র। মানুষজন, গোরু-বাছুর, ছাগল-মুরগী সমেত মূল, পুরোপুরি ছিন্ন করে। একদিন যেখানে শিশুর কান্নাহাসির চকিত স্বরে, যুবতীর কলহাস্যে, কুয়োতলার ছল্‌কানো জল, স্নানরতা মেয়েদের পায়ের মল আর ঘড়ার জলজ ধাতব আওয়াজে দারুণ জীবন্ত শব্দমুখর সব প্রেমময়, শান্তির গ্রাম ছিল, আজ সেখানে শুধুই লাল ঘাসের ধু-ধু মাঠে গম্ভীর বারাশিঙা হরিণ লোমের কম্বল গায়ে জড়িয়ে মন্থর পায়ে ঘুরে বেড়ায়। নয়ত কান্‌হা-কিস্‌লীর ভি-আই-পি বাঘেরা আলস্যে শুয়ে থাকে। অথবা শৃঙ্গার করে। শেষ বিকেলের নিস্তেজ-শীর্ণ আলোতে পাতা-ঝরা গাছের মরা ডালের উপর ঘুঘু-দম্পতি মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুরে ঘুরে বারে বারে অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করে; নামাজ পড়ার মতো করে।

ঠুঠা বাইগার গ্রামের বাসিন্দাদের সব কলেরাতে খেয়েছিল। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে। সময়টা ঠিক জানে না ঠুঠা। সময়ের যে খুবই দাম তা তখন জানত না ওরা। সেই-সময়ের কেউই জানত না। না জেনে, কোনো ক্ষতি বা অসুবিধাও হয় নি কখনও। গ্রাম শেষ হওয়ারও আগে শেষ হয়ে গেছিল গোরু-মোষ সব। "রাইণ্ডারপেস্ট্" মহামারীতে। গোরু-মোষের মহামারী সে। মানুষের আর

গোরু-মোষ-এর এসব অসুখ-বিসুখের ইংরিজী নামগুলো বুড়ো বয়সে এসেই শিখেছে ঠুঠা।

গ্রাম নেই ; শুধু স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। গন্ধ, শব্দ, বোধ সব ঝুমঝুমির মতো বাজে ঠুঠা বাইগার অনুভবে। তাই, ফাঁক-ফোকর্ একটু করতে পারলেই, কোনো ছুতা পেলেই, ঠুঠা দৌড়ে আসে মুক্কিতে। এখান থেকে লুকিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে ; বান্জার নদীর পাড়ে। তার পিতা-প্রপিতামহর গ্রাম খোঁজে ; খোঁজে শিকড়।

আশ্চর্য! দশ বছর হল খুঁজছেই ঠুঠা। খুঁজেই চলেছে। কিন্তু আজ অবধিও খুঁজে পেলো না গ্রামটাকে। নিশ্চিহ্ন হয়েই হারিয়ে গেল কি ? এমন হয় কী করে ! ওর গ্রামের নাম ছিল বান্জারী, বান্জার্ নদীর ধারে ছিল বলে।

জঙ্গলের গভীরের যে-কোনো গ্রাম পরিত্যক্ত হলেই জঙ্গল তার পাইক্-বরকন্দাজদের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়ে, পুরোনো দিনের অত্যাচারী জমিদারদের মতো,গ্রামের জবরদখল নিয়ে মিশিয়ে দেয় তার জঙ্গলের খাস্-মহল-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে। তাই-ই, চেনা পর্যন্ত যায় না আর পরে। প্রকৃতি, তার সবুজ, হলুদ, লাল, কালো নানা-রঙা নিশান উড়িয়ে দেয় আকাশে আকাশে, বহুবর্ণ গালচে বিছিয়ে দেয় জমিতে, উজ্জ্বল, অগণিত স্পন্দিত তারা আর জোনাকির ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেয় আকাশের চাঁদোয়ার নিচে ; অন্ধকার রাতে। জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল, গাছের মধ্যে গাছ, পাতার মধ্যে পাতা, ফুলের মধ্যে ফুল, স্মৃতির মধ্যে স্মৃতি সেঁধিয়ে যায়। চেনবার জো-টি পর্যন্ত থাকে না আর।

ঠুঠা বাইগার মনে আছে, গ্রামের দু প্রান্তে দুটি মস্ত শিমুল ছিল। বয়সের গাছ পাথর ছিল না তাদের। শীতের সকালের রোদে সোনালি বালাপোষ মুড়ে মগডালে বসে বুড়ো বাজ তীক্ষ্ণ স্বরে ডাক পাঠাত দিকে-দিগন্তরে, ধারালো ঠোঁট দিয়ে, ডানা থেকে সোনালি তুলোর মতো রোদ তুলে নিয়ে রোদ ছিটোত কাঁচের টুকরোর মতো,আর জ্যোৎস্নারাতে নাঙ্গা বাইগীনের ঘোর লাগা শাদা লক্ষ্মীপেঁচা ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে বসত এসে ঐ শিমুলেরই সটান ডালে। মনে আছে। পরিষ্কার মনে আছে, ঠুঠা বাইগার।

ঠুঠা বাইগা রোদে পিঠ দিয়ে বানজারেব ব্রিজ-এর রেলিং-এর উপরে উঠে বসেছিল পা ঝুলিয়ে। পৃথুও বসে ছিল পাশেই।

মুক্কির চেকনাকার চৌকিদারকে ঠুঠা বলে এসেছিল জীপ থেকে নেমেই, ভাত, ডাল আর আলুর চোকা রেঁধে দিতে হবে ওদের দুজনের জন্যে। আসলে, রাঁধবে চৌকিদারের বৌ। চৌকিদারের নাম গিদাইয়া। আব তার বউয়ের নাম রুক্মানিয়া। বিহাবের আররা জেলায় বাড়ি ওদের।

ভাবছিল পৃথু, কোথা থেকে কোথায় আসে মানুষ রুজির তাগিদে।

ঠুঠা একটা চুঠ্ঠা এগিয়ে দিল পৃথুর দিকে। আগুন ধরিয়ে দিতে গেল, দু'হাতের পাতায় হাওয়া আড়াল করে শজারু-মার্কা দেশলাই জ্বেলে। নিবে গেল কাঠিটা। অস্ফুটে দিগ্‌বিদিক্ - জ্ঞানশূন্য হাওয়াটাকে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে আবার ঠুঠা দেশলাই জ্বালল। এবার ধরল।

পৃথু ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, ঠিক ত' করে এলে সব, পরে আবার বেগড়বাই করবে না ত' ? কোন্ গ্রামে গেছিলে ? গাওয়ান্‌কে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই ত' পারতে ঠুঠা। গড়বড়-সরবড় হলে ত' গাল খেতে হবে আমাকেই !

ফুঃ।

তোমাকে হাটচান্দ্রাব সকলে ত' ভালভাবেই চেনে। পাঠিয়েছে ত' বেড়াতেই !

তাচ্ছিলাব সঙ্গে স্নেহের হাসি হেসে, বলল ঠুঠা।

কথাটা গায়ে মাখল না পৃথু। কারণ, কথাটা সত্যি।

কোন্ গ্রামে তুমি গেলে তার নামটা অন্তত বলবে ত'।

গ্রাম ত' অনেকই আছে এদিকে। মুণ্ডীটোলি, বাম্‌নি, বান্জার-বাম্‌নি। আর এই মুক্কি ত' আছেই। সব গ্রামের গাওয়ানদেরই বলে এসেছি। তোমার বাবার আশীর্বাদে এখনও শিকারি ঠুঠা বাইগাকে এদিকের সব গোঁদ ও বাইগারা এক নামেই চেনে। ভালও বাসে। গাওয়ান্‌রা না এলেও চিন্তা নেই কোনোই তোমার।

এসব অঞ্চল সত্যিই ঠুঠার নখদর্পণে। কিন্তু পৃথু এ নিয়ে মাত্র দুবার এল মুক্কিতে। আশ্বিনের মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে বান্‌জার নদীর ব্রিজ-এর রেলিং-এর উপরে বসে বেশ ভালই লাগছিল।

বনে, নির্জনে এলেই ভাল লাগে।

ঝুলে-পড়া সাদা গোঁফের একজন লম্বা, সামান্য কুঁজো বুড়োকে মুক্কির দিক থেকে আসতে দেখা গেল। খটাং-খটাং আওয়াজ তুলে শীতের শান্ত দিনের জঙ্গলে মাঝবেলার কাঁচপোকা-ওড়া শান্তিকে ছিদ্রিত করতে করতে আসছিল লোকটা, নাল্‌-লাগানো নাগ্‌রা দিয়ে শক্ত কালো পথের মুখে লাথি মেরে মেরে। আশ্চর্য আঁকা-বাঁকা হাঁটার ভঙ্গী তার।

দিন দুপুরেই কি মহুয়া খেল ?

লোকটি, ঠুঠা বাইগাকে দেখতে পেয়েই আনন্দে, বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বললো, এ হো! ঠুঠা বাইগা!

ঠুঠা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নামল ব্রিজ-এর রেলিং থেকে, উত্তেজনায়, তার নাগরার এক পাটি ছিটকে গেল দূরে। এক পায়ে জুতো নিয়ে নেমেই, বুকে জড়িয়ে ধরল লোকটাকে। অনেকক্ষণ ধরে, ওদের ভাষায় প্রেমময়, উষ্ণ কথাবার্তা বলল দুজনে। তারপর লোকটা আবার তার পথে চলল, ঠুঠার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

ঠুঠাকে খুব খুশী এবং উত্তেজিত দেখালো। ও নিজের মনেই বলল, এবার হয়ত আমার বাপদাদার হারিয়ে-যাওয়া "বান্‌জারী"র হদিস হবে।

কি করে ?

হবে, হবে।

এ কে রে ঠুঠা ? শুফো লোকটা ?

দেবী সিং। এই জঙ্গল পাহাড়ের খুবই নামী শিকারি ছিল একসময়।

আমার সময়।

আত্মপ্রসাদের হাসির ঝিলিক্ লাগল ঠুঠার মুখে।

আর ছিল আমার দুশ্‌মনও। বম্বে, ভোপাল, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, কলকতার সব রহিস্ শিকারিরা এলে বোদে বাঁধার, বোদেকে বাঘ দিয়ে মড়ি করানোর ভার পড়ত আমার অথবা ওরই ওপর। খুবই রেষারেষি ছিল দুজনের মধ্যে।

মোষকে এরা "বোদে" বলে এদের ভাষায়।

কোনোকোনোবার একই শিকারির দলের দুজন শিকারি আমাকে আর ওকে আলাদা করে রাখত সঙ্গে। আরে, এই দেবী সিংই ত' বম্বের ফিলিম্ অ্যাক্‌টেরেস্ নূতনজীর স্বামী বাহাল সাহেবকে শিকার খেলাতে নিয়ে গিয়ে বাঘের হাতে জখম করিয়েছিল। বাহাল্ সাহেব এসেছিলেন সানজানা সাহেবের মেহমান হয়ে। জান্ হি যাতা থা! নতুনজী এসে প্লেনে করে তাঁকে বম্বে নিয়ে যান ভোপাল হয়ে। তাই-ই রক্ষা। দেবী সিং নিজেও মরো-মরোই হয়েছিল আরেকবার। কত্তদিনের কথা সে সব!

ঐ প্রসঙ্গ উঠতেই, ঠুঠা বাইগার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কপালের অজস্র রুখু বলিরেখাতে এক আশ্চর্য তৈলাক্ত চমক্ লাগল।

তুমিও কি কম বাহাদুর! আমার বাবাকে পর্যন্ত মেরে দিলে। নতুনজীর স্বামী ত তাও বেঁচে গেছিলেন।

পৃথু বলল।

ঠুঠা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল পৃথুর দিকে।

কিন্তু কিছু বলল না।

এ কথা, আগে ও অসংখ্যবার শুনেছে।

শহরের শিকারীরা তোমাদের কি হিসেবে রাখত ?

কেন ? বোদে বাঁধা, তাকে দানা-পানি দেওয়া, বোদেকে বাঘ মেরে দিলে, তার উপর মাচা বাঁধা, শিকারের সময় বন্দুক রাইফেল বওয়া, আহত বাঘের পায়ের ভাঁজ দেখে, রক্ত দেখে তাদের হদিস

করা। বস্তু কাজ। খিদ্‌মদ্‌গারিও করতে হত।

ডিস্‌গাস্টিং। শিকারির চাকব হওয়া! তুমি নিজে এত বড় শিকারী হয়ে? লজ্জা। পৃথু বলল।

কি কবব বল? এ দেশে কিছু লোক চাকর হয়েই জন্মায়, মরেও চাকর হয়েই। আর কিছু লোক মনিব। জন্মে এবং মৃত্যুতেও।

শিকার-ফিকার, যাই বল ঠুঠা, আজকাল আর ভাল লাগে না। ভাল নয়, মারামারি ব্যাপাবটা। আদৌ ভাল নয়।

হ্যাঁ, তা ত' বটেই! তুমি হচ্ছ একটি ডরপোক্। কথায় বলে, "বাপ্‌কা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া, কুছ্ নেহীত' থোড়া থোড়া।" এমন জবরদস্ত বাপের কী বেটাই নিক্‌লালো। দস্যু রত্নাকর এতদিনে বাল্মীকি হলো। হাসি পায় তোমাকে দেখে। মাদীন্ শম্বর মারোনি তুমি? পেটে বাচ্চা ছিলো না তার? ভুলে গেছ?

পৃথু বলতে চাইল, সব সত্যি। কিন্তু মানুষের জীবন বড় লম্বা, বৈচিত্র্যময়! একদিন ময়লা মাড়িয়েছে বলে সে কোনোদিনও মন্দিরে ঢুকতে পারবে না জীবনে, এটা কি কথা? ভাবল, কিন্তু ঠুঠাকে কিছু বলল না। মনের মধ্যে যেসব কথা ওঠে, ভাবনা উথাল-পাথাল করে তা বলার মতো লোক এক জীবনে কজন মেলে?

পৃথুর মুখে একটু হাসি ঝিলিক মেরেই মরে গেল।

ঠুঠা বাইগা তাকে ছোট্টবেলা থেকেই কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেছে। পৃথুদের দু'পুরুষের সঙ্গেই ঠুঠার টিকি-বাঁধা। মোতিনালার গভীব জঙ্গলের মধ্যে পৃথুর ঠাকুর্দা ও বাবার কিছু জোত্-জমি ছিল। ঠুঠার বাবার উপবই ভার ছিল দেখাশোনার। পৃথুব বাবাব খুবই শখ ছিল শিকারের। শিকারের শখেই বাবা শেষে সর্বস্বান্ত হলেন। সব কিছুই গেল। শেষে প্রাণটাও। এই মুক্কি গ্রামেবই কাছে একটি পিয়ার গাছের মাচায় বসে, মাঘ মাসের গভীর রাতে বড় বাঘকে গুলি করেন বাবা। পৃথু তখন ইংল্যাণ্ডে। ছাত্র। মাচা থেকে নামতেই, বাঘ তাঁকে ধবে ফেলে। সেখানেই শেষ। সব শিকারীই জানেন যে এমন কবা মূর্খামি। তবুও সব বুদ্ধিমান বিচক্ষণ শিকারীরাও কখনও কখনও মূর্খামি করেন। কুমুদ চৌধুরীবই মতন। মেটাল ফেটিগ্-এর মতোই হিউম্যান ফেটিগ্ বলেও একটা ব্যাপার আছে। মানুষ যেহেতু ভগবান নয়, সেহেতু হিউম্যান এরর বলেও কথা আছে একটা।

পৃথু রেলিং থেকে লাফিয়ে নেমেই ঠুঠাকে বলল, চলো এবার। ক্ষিদে পেয়েছে।

নাকার দিকে এগোতে লাগল ওরা। ক্ষিদে সত্যিই পেয়েছিল।

নাকার পাশের মাটির ঘরের সামনেটাতে, চৌপাইতে বসে, দু হাঁটুর উপর অ্যালুমিনিয়াম্-এর থালা রেখে ঠুঠার পাশে বসে পৃথু খাচ্ছিল। রুষা এইরকম ভাবে, এইরকম জায়গায় পৃথুকে খেতে দেখলে কী যে করত, ভেবেও আতঙ্কিত হয়ে উঠল পৃথু।

পৃথু মানুষটিই একটু আশ্চর্য প্রকৃতির। ও এক আলাদা মানুষ। অন্য কারো মতোই নয়। কারো সঙ্গে মেলেও না ওর স্বভাব। তাই-ই, বড একা। আরাম, আনন্দ, বিলাস, ব্যসন, ভদ্রলোকি সচেতনতা বলতে যা বোঝা যায় সে সব ব্যাপার ওর মধ্যে একেবারেই নেই। বিবাহিত হওয়ার পর, তার সব নিজস্বতাও বোধহয় বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে রুষা। অথবা ও যেহেতু ভারশূন্য থাকতে চায়, নিজেই হয়ত সমর্পণ করে দিয়েছে, অন্য সবকিছুর সঙ্গে, নিজস্বতাও। তাও অনেকইদিন হল। যতটুকু সময় বাড়ির বাইরে থাকে, বা একা থাকে; ততটুকু সময়ই পৃথু তারই মতন করে তাই বাঁচার চেষ্টা করে। সেই সব সময়ে, অনেকদিন পর বাড়ি ফিরে আসা প্রিয় হারানো-কুকুরের মতো নিজের নিজস্বতার গলকম্বলে আদরের মৃদু আঙুল বোলায় ও নীরব কিন্তু উদ্বেল ভালবাসায়।

একটি গাড়ি ঢুকলো মুক্কি লজ্-এ। গড়াই চওকের দিক থেকেই এলো গাড়িটা। সঙ্গে মহিলারাও আছেন। কোথা থেকে আসছে কে জানে? মান্দ্‌লা? জবলপুর? অথবা হয়ত রাইপুরের দিক থেকেই।

মুক্কি গ্রামটির নাম আজকাল সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে গেছে। আই. টি. ডি. সি. ট্যুরিস্ট লজ্ করেছেন এখানে। দারুণ লজ্ বানজার নদীর একেবারে উপরেই। বালাঘাট রোডটি গড়াই চওক্

ছাড়িয়ে বাইহার-এর দিকে যেতে যেতে বান্‌জার-এর উপরের এই ব্রিজটি পেরিয়েছে এ পথে বান্‌জারের উপর একটিই ব্রিজ। ব্রিজটি পেরুলেই চেক-নাকা এবং চেক-নাকার ঠিক আগেই বাঁদিকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে লজ্‌-এ যাবার। পথ থেকে কিছুই বোঝার জো নেই। ছোট্ট চারকোনা সাইন-বোর্ড। একটি বুদ্ধিমান গুঁফো বাঘের ছবি, আর তার নিচে লেখা, "কান্‌হা সাফারি লজ্‌, মুক্কি।" আই, টি, ডি, সি,। এই থ্রী-স্টার আরামদায়ক লজ-এ অনেক গণ্যমান্য লোকই এসে থাকেন কান্‌হাকিস্‌লী-ন্যাশনাল পার্ক দেখার জন্যে। থাকতে, দণ্ডও কম লাগে না।মুক্কিতেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরও অন্য লজ আছে। চমৎকার। পার্ক-এর মধ্যে, একটু হেঁটে গেলেই।কান্‌হা এবং কিসলিতেও আছে।

লজ-এর উল্টোদিকেই বান্‌জার নদীর এপারে কান্‌হা-প্রিসার্ভে-এর কোর্‌-এরীয়া। টাইগার-প্রোজেক্ট। বনে বনে পথ চলে গেছে কিস্‌লি। তারপর হাঁলো নদী পেরিয়ে ইন্দ্রা হয়ে চিরাইডোংরি হয়ে সেই মান্দ্‌লা। টাইগার-প্রোজেক্ট-এর ফিল্ড-ডিরেকটর-এর হেডকোয়ার্টার্স্‌ও মান্দ্‌লাতেই। সেখান থেকে প্রায়ই তত্ত্বতালাশ করতে আসতে হয় তাঁকে এখানে। আসেন অবশ্য গড়াই হয়ে নয়, মান্দ্‌লা থেকে নাইন্‌পুর রোড ধরে চিরাইডোংরি এবং ইন্দ্রা হয়ে, যখন ইন্দ্রার কাছে হাঁলো নদী জীপে পেরুনো যায়। অন্য সময় আসতে হয় মোতিনালা হয়ে। অনেকই ঘুর পড়ে। সীওনী হয়েও আসা যায়। তাও বহু দূর। রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর মোওগলির সীওনী।

এই সুন্দরী "বান্‌জার" আর "হাঁলো" নদী ঘিরে রেখেছে কান্‌হা-কিস্‌লিকে। বড় সুন্দর নদী এ দুটি, মধ্য প্রদেশেই পৃথুর জন্ম। এই-ই ওর দেশ ; পিতৃভূমি। মাতৃভূমিও। এত সুন্দর, পৃথুর চোখে, ভারতের আর কোনো প্রদেশকেই লাগে না। এমন সুন্দর সুন্দর লোহা আর ম্যাঙ্গানিজের সব আকর-বওয়া লাল-নীল নদী। দারুণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর্মদা।   এমন মাথা উঁচু করা সব পাহাড়। এমন গহীন্‌ জঙ্গল। এখানের সহজ, সরল চমৎকার সব আদিবাসীরা। ছত্তিশগড়িয়া, গোন্দ্‌ ; বাইগা। পৃথুর খুবই ভাল লাগে। মধ্যপ্রদেশের শব্দ-গন্ধ, বংশপরম্পরের স্মৃতি। জন্ম এখানে ; মরতেও চায় এখানেই।

মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম্‌ ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশনের কর্তাই বোধহয় হয়ে গেছেন এতদিনে মিঃ বি, কে, বাগ্‌চী। তাঁর সঙ্গেও বহুদিন আগে থেকে আলাপ আছে পৃথুর। চিরিমিরির লাহিড়ীদেরও অনেকেরই সঙ্গে। এসব চেনা-জানা সব পৃথুর বাবার সূত্রেই। ওর বাবা খুবই মিশুকে প্রকৃতির লোক ছিলেন। দিলদরিয়া। সবসময়ই সাঙ্গ-পাঙ্গ থাকত সঙ্গে। পৃথু একেবারেই উল্টো। বড়লোক, উদার সরল বাবার অনেকই মোসাহেব ছিল। মোসাহেবী ভালোও বাসতেন উনি। সেই সব মোসাহেবরাই বাবাকে সর্বস্বান্ত করলেন। পুরোটা দোষ অবশ্য পৃথু তাঁদেরই উপর দিতে রাজী নয়। যাঁরাই সংসারে সর্বস্বান্ত হন, দেখা যায় সর্বস্বান্ত হওয়ার এক স্বাভাবিক প্রবণতা থাকেই তাঁদের মধ্যে।

এখন আর সেই সব 'ফস্‌লি বটের'দের দেখা যায় না। সকলেই গুছিয়ে নিয়েছেন। বাড়ি, জমি, ক্ষেতি, মার্সিডিস্‌ ট্রাক্‌। একজন ত' সিনেমা হল্‌ পর্যন্ত করে নিয়েছেন একটা। বাবার অবস্থা দেখে শুনেই হয়ত পৃথু লোকজন্‌ এড়িয়ে চলে। কথা বলে শুধু নিজের সঙ্গেই।

বাবা যাদের সম্বন্ধে শেষ জীবনেও শ্রদ্ধাশীল শুধু তাঁদেরই কারো কারো সঙ্গে এখনও সামান্য সম্পর্ক আছে শুধু পৃথুর। মিঃ বাগচী, চিরিমিরির লাহিড়ীদের কেউ কেউ তাঁদেরই মধ্যে পড়েন।

মধ্যপ্রদেশে, ট্যুরিজম্‌ ডেভালাপ্‌মেন্ট-এর ব্যাপারে মিঃ বাগচী যেমন পাগলের মতো খাটেন, তা দেখে শুনে পৃথু বুঝতে পারে, কতখানি ভালবাসেন তিনি তাঁর কাজকে এবং এই প্রদেশকে। আসলে, যে-কোনো মানুষই যে কাজ করেন, তা ভালোবেসে না করলে তাতে বোধহয় সিদ্ধি আসে না। যদিও পৃথুর চাকরিটা দায়িত্বর এবং কাজ তাকে করতেই হয় কিন্তু নিছক টাকা রোজগারের জন্যে যে কাজ, তার কিছুমাত্রও করতে ইচ্ছে করে না। টাকা রোজগার না করতে হলে, জীবনটা বেশ আজকের আশ্বিনের মিষ্টি রোদের সকালেরই মতো ঠুঠা বাইগার সঙ্গে বান্‌জার-এর তীরে তীরে অথবা কানহার জঙ্গলের ধানী লাল ঘাসের মাঠে শিশির মাড়িয়ে আল্‌তো সুখেব পা ফেলে ফেলে

হেঁটে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিত। নদী থেকে নদীতে, মাঠ থেকে মাঠে, সকাল থেকে সন্ধ্যে। চারদিকেই বড়ই দৌড়াদৌড়ি ; তাড়াহুড়ো।

এই পৃথিবীতে, পৃথু সম্পূর্ণই বেমানান।



এস ডি ও খাণ্ডেলওয়াল্ সাহেবের সাদা ধবধবে যুবক অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুরটাকে তাঁর কুচকুচে কালো যুবতী আয়া রোজই বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যায়। পৃথু জানলার সামনে ইজীচেয়ারে বসে দেখে। প্রকৃতির মধ্যে গেলে শেকল বাঁধা কুকুরটা সহজ হয় ; প্রকৃতির মধ্যেই বোধ হয় সমস্ত প্রাণীব প্রকৃত মুক্তি নিহিত আছে ; ভাবে পৃথু।

এস ডি ও সাহেবের বাড়িতে অনেকখানি জমি আছে, কিন্তু ন্যাড়া ; রুখু। একটিও সবুজ গাছ নেই তাতে। কোনো ফুলই ফোটে না সেখানে। পাখি ডাকে না। অথচ মধ্যপ্রদেশের এই ছোট্ট অখ্যাত জায়গাটি ঘিরে আছে গভীর ঘনসবুজ জঙ্গল আব মাথা-উঁচু পাহাড। বলয়ের পর বলয়।

পৃথু তার স্ত্রীর দিকে শী... বিকেলেব পড়ন্ত রোদে তাকিযে ভাবল, রুষা খুবই সুন্দরী ছিল এবং এখনও আছে। এমন সুন্দবী, লক্ষে মেলে। রুষাব স্বামী বলে, ওর নতুন কবে গর্ব হলো।

রুষা বারান্দাতে এল একটা কাক বসেছিল পেঁপে গাছে। কোনো এক কাক কাল একটা চামচ নিযে গেছে ঠোঁটে করে। বোকা কাকটা। এই কাক, সেই কাকই কি না, তা জানা নেই। মানুষদেরই মতো, কাকদেরও আলাদা করে চেনার বিশেষ উপায় নেই। এই দুই জীবই বাসি-পচা। নোংরা-আবর্জনা ঠুক্‌রে খায়। কাকেরই মতো মানুষও স্ক্যাভেঞ্জার।

বারান্দার বেলিং-এ পা তুলে বসে পৃথু ভাবছিল।

রুষা রুষ্ট চোখে তাকাল কাকটার দিকে। ডান হাতে ঢেউ তুলে বলল, হুসস্-স্।

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাকটা, রুষাকে গ্রাহ্য না কবে উদাসীনভাবে উড়ে গেল। স্বভাবতই কাকেরা মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি উদাসীন। চামচ, কাকের খাদ্য নয়। খাদক হয়েও খাদ্য চেনে না বলেই নিয়েছিল।

পৃথুর দিকে চোখ পড়তেই বিরক্ত গলায় বলল রুষা, রেলিং-এ পা তুলে বসে আছ কেন অসভ্যর মতো? এক কথা আর কতবার বলব। আর পারি না। স্বভাবটা বদলাও।

স্বভাব বদলায় চিতাতে গিয়েই। স্বভাব বদলাও বললেই কি বদলানো যায় ?

নিরুচ্চারে বলল পৃথু। মুখে কিছু না বলে, পা নামিয়েই নিল। সুখের চেয়ে শান্তি অনেক দামী। এই সুন্দর কনে-দেখা-আলো-ছোঁয়ানো সুগন্ধি বিকেলে অনেক কিছুই করা যেত, যায় ; যা সুন্দর।

ঝগড়া করতে ইচ্ছে করল না পৃথুর।

একি ! চায়ের কাপটাও কি নিজে তুলে রাখতে পারো না ? পা লেগে যে, এখুনি ভাঙত ! তাও কলকাতা থেকে রুবু নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল বলে ! হিট্‌কারির ; এক্সপোর্ট কোয়ালিটির। তুমি এসবের কি বুঝবে ? রুচি থাকতে হয় ; শখ থাকতে হয়। ভদ্রসমাজে বাসের তুমি একেবারেই অযোগ্য !

এস ডি ও সাহেবের বাড়ির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল ও। জবাব দিল না। সব কথার

জবাব হয়ও না। মাঝে মাঝেই, ভদ্রসমাজে ওর জন্ম, ওর বাস বলে নিজের উপর খুব ঘেন্না হয় পৃথুর।

মুখটা নিচু করে পৃথু বলল, আস্তে কথা বলো, এস ডি ও সাহেব বাড়ি আছেন।

যে খুশি থাকুক। আই ডোণ্ট্ কেয়ার। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর ভাল লাগে না। ঘর-কুনো, কুঁড়ে, লেথার্জিক্ পুরুষমানুষ একটা। পুরুষ না ছাই। সীমা বাড়ি করে ফেলল, কুকু, এমনকি নোটনটা পর্যন্ত বাড়ি করে ফেলল ভোপালের মতো জায়গায়। কুর্চির মতো সাধারণ মেয়ে; সেও কী চমৎকার থাকে জবলপুরে। আর আমি? হুঁ! সারাজীবন এই জংলী হাটচান্দ্রাতে, লালধুলো আর চামারটোলির শুয়োরদের মধ্যেই কাটাতে হবে বাকি জীবন। কান্না পায় আমার। বিয়ে করেছিলাম বটে! এরকম বিয়ে যেন শত্রুরও না হয়।

পৃথু সিগারেটটা ছাইদানীতে ঠেসে ধরে, রাগটা আর সিগারেটটাকে একইসঙ্গে জোরে টিপতে টিপতে বলল তুমি আর করলে কোথায়? বিয়ে ত' আমিই করেছিলাম।

থাক্। তোমার ঐ একঘেয়ে মনোলোগ্ শুনতে চাই না আর। ফেড্-আপ হয়ে গেছি। বক্তৃতা না মেরে, যাও, দুধটা নিয়ে এসো এখন। কুক্ নেই, আয়া নেই, মালী নেই, একটু কাজ করো, ফর আ চেঞ্জ! দুধটা চট্ করে এনে দিয়েই বাজারে যাবে একবার। বুঝেছো! কাল টুসুর এক বন্ধুর বার্থডে। পদ্মা স্টোর্স থেকে এক পাউণ্ড কেক কিনে নিয়ে এসো, আর ওখানেই র‍্যাপিং পেপার পাবে, গিফ্‌ট্ প্যাক-এর। চার-পাঁচটা শীট্ এনো। তোমার যা টেস্ট! ক্যাট্‌ক্যাটে রঙ এনো না আবার। হালকা শেড্-এর আনবে। বুঝেছো। গোলমাল কোরো না যেন। পদ্মা স্টোর্স চেনো ত'? লাল সাইনবোর্ডে লাল লাল পদ্মফুল আঁকা আছে। তোমার ইয়ার, সাবির মিঞার জুতোর দোকান ছাড়িয়ে যাবে। ভুল্‌ভুলাইয়া অবধি যেতে হবে না। একটু আগে, বাঁ হাতে। মানে, ভুল্‌ভুলাইয়ার একটু.....

পৃথু অস্ফুটে বলল, চিনি।

চেনো! আর আমাকে এতক্ষণ বকালে! আগে বলতে কি ছিল?

সুযোগ পেলাম কই?

যাচ্ছেতাই। ইন্‌করিজিবল্ লোক।

পৃথুদের বাড়ির কাছেই নিমগাছতলায় ছোট্ট খাটাল। মোষই বেশি। দুটি গরু। দুধটা এনে দুখীর হাতে দিয়েই আবার চাদর গায়ে বেড়িয়ে পড়ল থলে হাতে করে বাজারের দিকে। স্ত্রীর বশংবদ, সংসারী স্বামীর মতো। এই আদর্শ সামনে রেখেই অন্য বহু পুরুষেরই মতো ও এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কোনো একটিও আদর্শর যথার্থ অনুগমন করতেই সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছে ও। আটারলী ওয়ার্থলেস্।

অন্ধকার হয়ে গেছে। পাশ দিয়ে ফুল স্পীডে সাইকেল চালিয়ে বানোয়ারীলাল চলে যেতে যেতে পান-ভরা মুখে বলল, সব্ ঠিক্কেই না হ্যায় খাল্-খরিয়াৎ ঘোষবাবু?

চমকে উঠে, পৃথু বলল, হাঁ! সব ঠিক্কেই...

কিন্তু কথাটা যখন বানোয়ারীলালের কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন সে অনেকটাই দূরে এগিয়ে গেছে। শুনতে যে পেয়েছে, তা বোঝাবার জন্যে হ্যাণ্ডেল ছেড়ে ডান হাতটা তুলল সে উঁচু করে। পান জব্‌জবে মুখে কী একটা বলল, বোঝা গেল না।

আরও একটু এগোতেই বড় রাস্তাতে এসে পড়ল ও। যদিও কম বাড়িতেই ইলেকট্রিসিটি আছে এখানে, তবুও প্রায়ই লোডশেডিং হয়। বড় রাস্তাতে পৌঁছতেই লোডশেডিং হয়ে গেল। দোকানে দোকানে মিট্‌মিট্ করে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। মোড়ের পানের দোকানের দেওয়ালজোড়া আয়নাটা কেরোসিনের আলোতে কেমন লালচে দেখাচ্ছে। তার মধ্যে পথচল্‌তি মানুষের অসংখ্য ভুতুড়ে মুণ্ডু আর মুখের ছায়া নাচানাচি করছে। সাইকেল রিক্‌শার প্যাঁক্ প্যাঁক্। নানারকম মিশ্র আওয়াজ। কার্তিকের ওঠা-বসা ধুলো। চিৎকার। লাফাবোঝাই লরী। ভীড়, ভীড়।

পৃথুর ভালো লাগে না।

ভুলভুলাইয়ার দিকে যেতে যেতে ভাবছিল পৃথু। ভীড়ের মধ্যে, আওয়াজের মধ্যে থেকেও একদম একা হয়ে গিয়ে ভাবতে খুব ভাল লাগে ওব। ভাবতে ভাবতেই হাঁটছিল……

সময়ের কোনোই দাম নেই পৃথুর কাছে। তিন মাস ছুটি পাওনা ছিল, পুরোটাই নিয়ে নিয়েছে। ম্যানেজার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ইত্‌না দিন ছুটি লেকর কিজিয়েগা কেয়া ঘোষবাবু ? চেঞ্জকা লিয়ে কাঁহি বাহার যা রঁহা হ্যায় ক্যা আপ্ ?"

পৃথু হেসেছিল। বলেছিল, নহী।

তব ?

অ্যাইসেহি……।

অ্যাইসেহি ? তিন মাহিনা ভর ? আপ্‌কা দিমাগ জরুর গড়বড়াগিয়া হোগা ঘোষবাবু। অজীব আদ্‌মী।

পৃথু জানে যে ও অজীব্ আদমী। তবু ওঁকে বোঝাবার চেষ্টায় আরও কিছু না বলে শুধু বলেছিল, খ্যয়ের্। লে হি রহা হ্যায়……।

সব কথা সবার বোঝার জন্যে নয়। সংসারে সব কথা সবাইকে বোঝাতে যাওয়াও মূর্খামি। বেড়াতে যাওয়ার জন্যে অথবা হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যেও নয়, নিছকই কাজের জোয়াল থেকে ছাড়া পেয়ে একটু পড়াশুনো, ভাবাভাবি, লেখালেখি করার জন্যেই এই ছুটি নেওয়া।

রুষা এখানের কো-এড্ স্কুলে ইংরিজি পড়ায়, তার স্কুলে ছুটি এবং মিলি-টুসুর ছুটিই কোথাও বেড়াতে বা অন্য কাজে যাওয়ার সময়, যদি কোথাও যাওয়া আদৌ হয়, নির্ধারিত করে। রুষার স্কুলের ছুটি যদি-বা হল, তখন তার মহিলা সমিতির নানারকম কাজ থাকে। ছুটিতেই সে কাজ বেশি। খুবই সামাজিক, পরোপকারী, জনপ্রিয়, উদ্‌যোগী মেয়ে রুষা। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের সম্মিলিত সুবিধা যখন হয়, তখন পৃথুকে প্রায়ই প্রচণ্ড অসুবিধে করেই ওদের সঙ্গে যেতে হয়। অনেকটা কন্‌ডাকটেড ট্যুওরের থ্যাঙ্কলেস্ নন-এনটিটি গাইডেরই মতো।

পৃথু কবিতা লেখে এবং দশ বছর আগে 'অসূয়া' নামে তাব একটি কবিতার বই কলকাতা থেকে প্রকাশিতও হয়েছিল। অবশ্য নিজেই, কলকাতার এক বন্ধু মারফৎ প্রকাশ করেছিল নিজেরই খরচে। কবিতার কারণে তাকে রুষার কাছে প্রতিনিয়তই নিগৃহীত হতে হয়।

মেয়ে মিলি, মনে হয় তাব অপদার্থ কবি-প্রকৃতির বাবার প্রতি ইদানীং সামান্য অনুকম্পা বোধ করে এবং অসম সাহসের সঙ্গে তা প্রকাশও করে। তাতে পৃথু বিব্রতই বোধ করে। অনুকম্পা, সে কারো কাছ থেকেই চায়নি। আজও চায় না।

রুষাকে যেমন ভয় পায় পৃথু, তেমন একধরনের ভক্তিও করে। তার চরিত্রে, পৃথু ওদের পিতৃতান্ত্রিক যৌথ-পরিবারের প্রয়াত জ্যাঠামশাইকে প্রত্যক্ষ করে। আ গ্রেট অটোক্র্যাট। সামান্য হলেও, রুষার বাড়ি-ঘর সবসময়ই ঝক্‌ঝক্-তক্‌তক্ করে। এই ছোট্ট সংসারের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই সুকঠিন নিয়মানুবর্তিতা ও কড়া শাসনের সঙ্গে চালিত হয়। ঘড়ি ধরে। এই ক্রিয়াকাণ্ডে পৃথুর মতো অগোছালো স্বভাবের এলোমেলো অপদার্থ মানুষের কোনোই ভূমিকা নেই। বরং এই সুসংহত স্রোতের পথে ওই একমাত্র বাধা। এটা জেনে, মেনে নিয়ে ; মনে মনে ও সবসময়ই বড লজ্জিত থাকে। নিজের অসূয়া, নিজেরই প্রতি ; লজ্জা করলেও ফেলে দিতে পারে না।

নির্বুদ্ধি প্রথম যৌবনে নিজের খরচে, এবং নিজের প্রাণ-প্রাচুর্যতায় কবিতার প্রথম ও শেষ বই প্রকাশ করতে পেরে ও অনেক অপরিচিত কবিদের সঙ্গে এক গভীর একাত্মতা বোধ করে। ওর মতো অনেকেই ব্যর্থ কবি এদেশের আনাচ-কানাচ ভরে আছে যে, এ সত্যটা তাকে এক অচিহ্নিত, পতাকাহীন দলগত বোধেও উদ্বুদ্ধ করে। "ব্যর্থ কবি" কথাটাতেও ওর ঘোর আপত্তি আছে। কবিতার সাধনা যাঁরা করেন তাঁরা কি কখনই ব্যর্থ হন ? কবিতার সার্থকতা ত' কবিতারই মধ্যে, কবির যশেই কি তা সীমিত ? ব্যর্থ কবিরা মনে মনে যতখানি কবি, তথাকথিত অনেক সফল কবিরাই হয়ত ঠিক ততখানি নন, এমন একটা ভাবনার গায়ে পৃথু ওর পুরুষাঙ্গে হাত বোলানোর মতই অত্যন্ত গোপনে এবং আদরে হাত বোলায়। পৃথুর মনে হয় যে, সাফল্য, বোধহয় মানুষে

সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং তীব্র বোধকে প্রায়শই ভোঁতা করে দেয়।

গত মাসে কলকাতা থেকে অনেক নামী-দামী কবিরা এসেছিলেন হাটচান্দ্রাতে। কবি সম্মেলনে। নবনীতা দেব সেন-এরও আসার কথা ছিল। অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি। প্রবীণদের মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এসেছিলেন। তরুণতমদের মধ্যে জয়িতা মিত্র। সার্কিটহাউস এবং এখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়িতে ভাগ করে করে মানী অতিথিদের রাখা হয়েছিল।

কবি সম্মেলন ছিল দু'দিনের। সারা শহরে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল। এতজন বিখ্যাত কবিকে কাছ থেকে দেখা গেল, মধ্যপ্রদেশেব এই জংলী হাটচান্দ্রার কবিতাপ্রিয় মানুষদের এই-ই অশেষ সৌভাগ্য। পৃথুর মতো নগণ্য মানুষেরও তাই-ই। আলাপিত হতে পেরেছিল শুধু দুজনের সঙ্গে। রুষাও গেছিল সম্মেলনে। সুন্দরী, সপ্রতিভ এবং মার্জিত রুচি, নিখুত ইংরিজী উচ্চারণের মনোহারিনী রুষাকে ছাড়া হাটচান্দ্রার কোনো অনুষ্ঠানই যেন প্রাণ পায় না। ওই-ই হাটচান্দ্রার ট্রাম্প-কার্ড। ডি-এম, এস-পি থেকে শুরু করে এখানের সব কৃতী মানুষরাই রুষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুরুষদের চোখে অবশ্য প্রশংসা ছাড়াও অন্য কিছু থাকে। রুষা সেটা জানে। এবং সেই অহংবোধটা ও ললিপপ্-এর মতো চুষে চুষে তারিয়ে তারিয়ে খায়।

জীবনে যদিও রুষা একটিও বাংলা কবিতা পড়েনি, তবু ওর অটোগ্রাফ খাতায় ও সমস্ত সফল কবির স্বাক্ষরই সংগ্রহ করেছিল। কোনো কবিই রুষার সুন্দর মুখে চেয়ে, জিজ্ঞেস করতে প্যারেননি যে, সে তাঁদের কারো একটি কবিতাও পড়েছে কি না। হেসে, সাগ্রহে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন সকলেই। কবিরা সৌন্দর্যর কদর না করলে, কারাই বা করবেন?

পৃথুর খুবই ইচ্ছা ছিল একদিন বাড়িতে কবিদের সবাইকে এনে চা খাওয়াবে, বিরজুর দোকানেব কালাজামুন আর দহি-কচুরীর সঙ্গে। কিন্তু রুষা বলেছিল, এমন থার্ডক্লাস বাড়িতে সুপার-ক্লাস, ওয়েল-অফ্‌ফ ফেমাস কবিদের ডাকা যায় না। ও মরে গেলেও নিজেকে এতখানি অসম্মানিত করতে পারবে না। ঠোঁট বেঁকিয়ে বিদ্রূপ করে বলেছিল, সাধ্য নেই এককণা, সাধ অনেক।

পৃথু আহত গলায় বলেছিল, আন্তরিকতার কি কোনোই দাম নেই?

নেই। আন্তরিকতা একটা অব্‌সলিট ওয়ার্ড। টাইম-বারড্। কবিতা যাঁরা লেখেন, তাঁরা সকলেই যে ব্যক্তিগত জীবনে তোমাব মতোই ল্যাজে-গোবরে, ওয়ার্থলেস, আন্‌প্র্যাকটিকাল্ হন না, তা সাকসেসফুল কবিদের দেখেও না-বুঝলে, না-শিখলে আমার কিছুই বলার নেই। তোমার মান-সম্মান না থাকতে পারে; কিন্তু আমার আছে। এমন বোকা-বোকা শ্যাবী ব্যাপার আমি ঘটতে দেবো না প্রাণ থাকতে।

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে"!

দেখে, ভাল লেগেছিল পৃথুব।

একী! এ কোথায় চলে এসেছে ও!

প্রায় শহর ছাড়িয়ে, রাত মোহানার পথের দিকে! ভুল্‌ভুলাইয়া ত' ফেলে এসেছে অনেকই পিছনে। কোথায় পড়ে রইল লাল লাল পদ্মফুল আঁকা পদ্মা স্টোর্স-এর সাইনবোর্ড! দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে সাতটাতেই। ঈসস...... বড়ই ভুল হয়ে যায় পৃথুর....।

আজ কপালে আছে.....

পৃথু যদি আরেকটি কবিতার বই নিজের খরচে প্রকাশ করতে পারে, তাহলে সেই সংকলনেব নাম দেবে "ভুল্‌ভুলাইয়া"।

আজ রুষার কাছে.... না.... কপালে আছে....



হাটচান্দ্রার সীমানা ঘিরে ঘুরে ঘুরে বয়ে গেছে সুন্দব বানজার নদী। অন্যদিকে আছে হাঁলো নদী। এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে গড়ে উঠেছে। হিন্দুস্তান কপার করপোরেশানের নতুন তামার খনি ও খনি-সংলগ্ন বিরাট আধুনিক কাবখানা। মালাঞ্জখণ্ড-এ। সাম্প্রতিক অতীতে চালু-হওয়া দূরের মালাঞ্জখণ্ড এবং মোগাঁও গাঁ এই হাটচান্দ্রার শান্ত, নিরুদ্বেগ, গ্রাম-গন্ধী জীবনে হঠাৎ আবর্তব সৃষ্টি

চামারটোলির কাছেই ওদের বাড়ি। সেখান থেকে আধমাইলটাক্ দূবে দুটি ছোট ছোট নদী মিশেছে এসে রাত-মোহানায়। একটিব নাম শাঁওন। অন্যটির নাম ভাঁদো। ভাঁদো নদীটি হঠাৎই বাঁক নিয়ে হাম্‌লে পড়েছে গিয়ে শাঁওনের উপর। কে, কবে এদের নাম বেখেছিল জানে না, তবে ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে। মোহানাটা দারুণ। রাত-মোহানা। বড় বড় শালগাছ আছে কিছু। আর অন্যান্য হবজাই জঙ্গল। একটি পত্রহীন প্রাচীন বাজ-পড়া শিমুল। সাহেবের মতো তার গায়ের রঙ। বর্ষায যে আগাছার ঝাড় জন্মেছিল সমতলে, এখন তা ঘন সবুজ ওড়না জড়িয়ে ঘন-সন্নিবিষ্ট নিবিড় হয়ে উঠেছে। বিরাট বিবাট গোলাকৃতি পাথর আছে অনেক। চাবধাবে ছড়ানো-ছিটোনো, চ্যাটালোও আছে কিছু কিছু।

এখন রাত। পৃথু একটি বড় উঁচু পাথরের উপর বসেছিল। মনটা যখন পাগল-পাগল কবে, তখনই ও পালিয়ে আসে এখানে। মাঝে মাঝেই রুষার ব্যবহারে ও নিজের সম্বন্ধে এমনই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে যে, কী কববে ভেবে পায় না। পাগলের মনও মাঝে-মাঝে পাগল-পাগল করে। সেইসব সময এসে এখানে একা-একা ঘন্টার পব ঘন্টা বসে থাকে। মনের মধ্যে টাইট্ হয়ে গুটিয়ে থাকা স্প্রিংটা ক্রমশঃ ঢিলে হতে আরম্ভ করে ; আস্তে আস্তে। মন শান্ত হয়ে এলে, একসময, ঘরমুখো গোরুব মতো বাড়ির দিকে ফেরে।

কোনো মানুষজনেরই যাতাযাত নেই এদিকে। ক্বচিৎ প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া কেউই আসে না। তারাও জায়গাটা নির্জন বলে দিনমানেই পালায়। শীত যখন জাঁকিয়ে বসে, তখন অবশ্য অনেকেই আসে দলবেঁধে, চড়া রোদে, চড়ুইভাতি করতে। দিনে, দিনে। রাতে, কেউই নয়।

যখনই ও এমন একা থাকে তখনই পৃথু একটি বড় লেখা লিখবে ভাবে। ওর জীবনের প্রথম ও শেষ উপন্যাস, প্রথম ও শেষ কবিতা গ্রন্থেরই মতো। হয়ে কি উঠবে কখনও ? না বোধহয়। কিছুই হবে না। উপন্যাস লেখা বড়ই পবিশ্রমের। অনেকটাই একা-হাতে অট্টালিকা গড়ে তোলার মতো। ও যে শুধু ভাবতেই জানে। পাতার পর পাতাও ত' লেখে রোজই। কিন্তু মনে, মনে। অক্ষব কাটে, শব্দ ছেঁড়ে, পঙক্তি উধাও করে, প্যারা বানায় ; সবই মনে মনে। মনেব মধ্যেই কিশলয়, মনেব মধ্যেই লাল, হলুদ, খয়েরী-ডুরে ঝরা-পাতা, মনের মধ্যেই নিঃশব্দ সব শব্দময়তা, চর-পড়া, পাড়-ভাঙ্গা, বিরহ এবং মিলন সব। ওর এই আত্মস্থ, আত্মজ উপন্যাস কোনোদিনও কালি ও কাগজের সঙ্গে সহাবস্থান করবে না। জানে, পৃথু।

জীবনের হাল ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে অনেকই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শক্তি। অন্যচালিত, অন্যবাহিত, অতি সাধারণ, উদ্দেশ্যহীন সম্পূর্ণ এক বস্তুতান্ত্রিক দিগন্তর দিকেই ভেসে চলেছে

তীরবেগে এবং যান্ত্রিকভাবে জীবনের জল কেটে, একটি কুৎসিত পানকৌড়ির মতো। থামবার কোনো উপায় নেই, দুপাশে এক মুহূর্তের জন্যও তাকাবার অবসর নেই।

কত নবতৃণদল! কত সর্ষে আর সরগুজার হলুদ ফুলে ভরা সবুজ মাঠ দুদিকে! অড়হর্ লেগেছে, কুল্থী লেগেছে, বাজ্রা; নদীপারে সতেজ সবুজ টানটান ধান, শান্তির দূতীর মত সাদা, মসৃণ ডানার বকেদের নিঃশব্দ ওড়া-উড়ি। চিকন নদীর পেলব চরের উপর জলের-সহস্র আকুলি-বিকুলি আঙুলে আঁকা কী অসাধারণ স্পন্দন এবং ফুৎকারে উৎসারিত সব সার সার ছবি। গাঙ্-শালিকের বাসা. প্রমত্ততায় পাড় ভেঙে-যাওয়া নদীর রৈ রৈ রব, অন্যদিকে অবলীলায় স্তিমিত চর ফেলা। খাড়া, উঁচু পাড়ে উদ্‌বেড়ালের উড়াল গর্ত, সোঁদা-সোঁদা মেছো-মেছো গভীর গন্ধ ওড়ে সেইখানে, ঝাঁকি দিয়ে মিশে যায় সে গন্ধ জলবাহী ঘূর্ণি হাওয়ায় চখাচখির কবোষ্ণ আঁশটে গন্ধের সঙ্গে। প্রসন্ন, পরিযায়ী পাখিদের মিশ্র-স্বরের জলজ কাকলি পৃথুর মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় সুদূর, শীতার্ত দূর দিগন্ত থেকে দূরতর দিগন্তে। এই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

বড় কষ্ট পৃথুর বুকের ভিতর। বুক থাকলেই বোধহয় কষ্ট হয়। হৃদয়-আক্রান্ত হলেও কি এইরকমই কষ্ট পায় মানুষ? না বোধ হয়। সে কষ্ট ত' এক চকিত পরিণামের সে ত' তীব্র তাৎক্ষণিক কষ্ট। সে কষ্টর সময় জ্ঞান ভয় পেয়ে চকিতে দৌড়ে পালিয়ে যায় শরীরের বাড়ি ছেড়ে, মুক্তি দেয় মানুষকে সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার নখ থেকে। কিন্তু পৃথুর যে যন্ত্রণা, সেটা ক্যানসারাস। চব্বিশ ঘন্টাই। ব্যথাটা সবসময়ই গুবরে পোকার মতো ফেরে নিজের মধ্যে, অসভ্য শিশুর মতো অনুক্ষণ একঘেয়ে কাঁদে, কুরে কুরে খায় পৃথুকে। এ ভোঁতা ব্যথা। লেপ্টে থাকে সবসময়। সঙ্গ ছাড়ে না।

আশ্বিন চলে গিয়ে কার্ত্তিক এসেছে। শীতটা জাঁকিয়ে পডতে পড়তেও কী মনে করে থম্‌কে আছে যেন। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে। রূপোর জরি লেগেছে নদীর গেরুয়া-দুধি আঁচলে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে এখন চারপাশ। খুবই ভাল্ লাগছে পৃথুর। মাঝে মাঝে ওরও ভাল লাগে। ভাল লাগবে বলেই ত' আসে।

শাঁওন্ আর ভাঁদো নদীতে জল বওয়ার কুল্‌কুলানী শব্দ ভেসে আসছে পৃথুর কানে। কোনো নৌকোর দাঁড় বাইবার ছলাক্ ছলাক্ শব্দ শুনতে পেল ও।এসব নদীতে নৌকো বাইবার মতো শান্ত জল বছরের এই সামান্য সময়টাতেই একমাত্র থাকে। মধ্যপ্রদেশের নদীগুলি বিশেষ নাব্য নয়। সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না,নর্মদা, এখন কানায় কানায় ভরা। প্রতিটি ছিপ্‌ছিপে স্বচ্ছতোয়া শাখা নদীতেই সেই সুপুরুষ নদীর নবম আদর লাগে বছরের এই সময়টিতে।

নৌকোটা যেন এদিকেই আসছে মনে হল। বাঁকটা ঘুবল। তারপরই এগিয়ে আসতে লাগল। ছলাক্ ছলাক; ছুপ্ ছুপ।

একটি পুরুষকণ্ঠ বলল হিন্দীতে: পাথরগুলোর কাছেই নোঙর করা যাক। কি বল তোমরা?

লোকটি হাটচান্দ্রার বাসিন্দা নয় বোধ হয়। তার কথায় অন্য কোথাকার যেন টান আছে।

সে আবারও বলল, এই রাতের বেলায় মেয়েছেলেদের নিয়ে এখানে নোঙর করবে? কি গো মাঝি? তুই কি বলিস রে, নাসিরুদ্দিন ভাই? তার চেয়ে চল্ ভাই চলেই যাই। হাটচান্দ্রাতে ত এসেই গেছি। ভয় লাগে হে! অচেনা জায়গা, সাপ-কোপ! সঙ্গে মেয়েমানুষ।

একটি চিকন নারী কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ধমকের গলায় বলল,ডর্ ক্যা কহুঁ ম্যায়। ডর্ কওন্ চিজ্ কা?

সাঁপ?

জারামে সাঁপ্‌কা ডর থোরী!

গলার স্বর শুনেই পৃথু চম্‌কে উঠল।

নৌকোটা থামল। একজন লম্বা মতো লোক কতগুলো হাঁড়িকুড়ি নিয়ে নামল নৌকো থেকে। ঠোকাঠুকি লেগে ধাতব শব্দ হল। নৈঃশব্দ চমকে গেল। লোকটার-তুলে নেওয়া পায়ের চাপে নৌকোটা ছলাৎ করে দুলে উঠল। ওগুলো নামিয়ে রেখে, লোকটা এদিক-ওদিক কোনো কিছুর খোঁজে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। বোধ হয় উনুন বানাবে, রান্নাবান্না করবে এইখানে। পৃথু ভাবল,

এরাও খুব সম্ভব পাগল।

মাঝির সঙ্গে দুজন নারী নৌকো থেকে নামল। রাত-মোহানার হাওয়া তাদের গায়ের ঈত্বরের গন্ধে হঠাৎই ভারী হয়ে উঠল। নাক উঁচু করে ঈত্বরগন্ধী কার্ত্তিকের শিশিরের ঘ্রাণ নিল পৃথু। বোধহয় ফিরদৌস্।

দুই নারীর পরনেই ঘাগরা। একজনের বয়স তিরিশ হবে। আবছা চাঁদের আলোয় ভাল ঠাহর হল না। অন্যজনের বয়স হবে পঁচিশ-টচিশ। ভরা যৌবন। শাঁওনভাঁদো নদীরই মতো। ছলবল করছে।

মাঝি পৃথুকে পাথরের উপর হঠাৎ দেখে ভূত দেখার মতই চমকে উঠে বলল, ইয়ে সান্নাটা জাগেমে এক্কেলা ব্যৈঠ্‌কে আপ্ কেয়া কর্ রহা হ্যায় শেঠ ?

কুচ্ছো নেহী ! মগর করেঙ্গে কেয়া, এহি ত' শোচ্ রহা থা।

পৃথু বলল।

ওর কথাতে মেয়ে দুটি হেসে উঠল। অল্পবয়সী মেয়েটির হাসিতে অসংখ্য বেলোয়ারি চুড়ি ভেঙ্গে গিয়ে, কলস ভরার শব্দের সঙ্গে যেন ভেসে গেল রাত-মোহানায়। এমন আশ্চর্য কিন্নরকণ্ঠ কখনও শোনেনি আগে।

সুরেলা কণ্ঠস্বর পৃথুকে চিরদিনই অবশ করেছে। সে নারীরই হোক, কী পাখিরই হোক। পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে কতবার, ফাঁদে পড়া শিঙাল হরিণেরই মতো। জবলপুরের বাঈজীর গজল বা টপ্পার টুকরো-টাক্‌রা চওক্-এর চক্‌মিলানো চিক্‌ঝোলানো বারান্দা থেকে উৎসারিত হয়ে তার কানে হঠাৎই বিঁধে গেছে। অচেনা, অদেখা, শালীন গৃহবধূর হাঁসীর মতো শীষ তোলা যৌন-গন্ধী স্বর, দ্রুত দৌড়ে যাওয়া গোলাপ বালার পায়ের পায়জোরের, চকিত সতীচ্ছদ-এর দুঃখী-সুখী স্বর, নর্ম-নর্তকীর নৃত্যবতা পাখির মতো উড়াল পায়ের নূপুরের আরোহণ অবরোহণের নিক্কণিত শিঞ্জিনি স্বর ; সুর আর স্বর পৃথুকে চিরদিনই ঘুরিয়ে মেরেছে। পথ ভুলিয়েছে। কতবার উদাস দুপুরে, চিহরচিরি ঝিলের পাশের ঝাঁটিজঙ্গলে বিরহী কালি-তিতিরের গলার দীর্ঘ, বিষণ্ণ, ছিদ্রিত স্বর শুনে তাকে বুকে তুলে নিয়ে তার কোমল গলায় চুমু খেতে ইচ্ছে করেছে পৃথুর !

পৃথু একসময়ে বাস্তবে ফিরল ; যদিও বাস্তবে ওর বাস নয়। তবু, কখনও সখনও সেই অচিন পরবাসেও সে প্রবেশ করে, দ্রুত নিক্রান্ত হবে বলে। রুষার কাছে থাকলে অবশ্য বাস্তবেই তাকে বাস করতে হয়।

বেশি সময়ই।

পৃথু বলল, তোমরা কারা ?

আমরা ; আমরা।

ইয়ার্কির গলায় কমবয়সী মেয়েটি বলল।

পৃথুর বাস্তব বুদ্ধিতে ভর-করা স্বল্প আয়ু সুস্থ মস্তিষ্ক বলল, তুমি পৃথু ঘোষ, হচ্ছো গিয়ে হাটচান্দ্রার লাক্ষা কোম্পানীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। বিদেশের ডিগ্রীধারী। পথের কোন্ সহজলভ্যা চটুল নারী তোমার সঙ্গে এভাবে কথা কয় ? কোন্ বেয়াদবী এ ?

পরক্ষণেই সেই হাম্‌বড়াই ভাবটা হঠাৎ-আসা অসময়ের কাম-এর মতই হঠাৎই মরে গেল। মেয়েটি আবার বলল, আমরা নাচেওয়ালী ; গানেওয়ালী। লোক মোটেই ভাল নই।

অন্যজন বলল, শেঠকে দেখে মনে হচ্ছে রহিস্ খান্‌দানের লোক !

রহিস্-টহিস নই। শেঠও নই। আমি অতি সাধারণ লোক। ভালত নই-ই।

বুঝেছি, লোক তুমি খুবই খারাপ। বাড়ি কোথায় তোমার শেঠ ?

আমার বাড়ি সবখানে। চমকে উঠল পৃথু। কথাটা, নিজেই বলল তো ?

বড়া মন্‌মৌজী আদ্‌মী লাগ্‌তা কম্‌লা বহীন।

ছলবলিয়ে অল্পবয়সী মেয়েটি বলল।

লম্বামতো লোকটি ততক্ষণে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। সে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি

মনোযোগ দিয়ে, উবু হয়ে বসে, উনুন ধরাবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। উনুনটা ধরে উঠতেই, উনুনের গন্‌গনে আগুনে পাশের কালো বড় পাথরে পিক্‌নিক করতে আসা ছেলেমেয়েদের লিখে-যাওয়া জোড়া-জোড়া নামগুলো ফুটে উঠল।

কখনও বাঈজী বা তওয়ায়েফ্-এর গান শুনেছেন ?

অল্পবয়সী মেয়েটি বলল।

শুনেছি।

আবার বলল পৃথু।

কোথায় শুনেছেন ?

জবলপুরে।

হাঁ ? জবলপুরমে ? বড়ী তাজ্জব্ কী বাত !

একটু চুপ করে থেকেই আবার বলল, হামলোঁগোনেঁ ত' বড়ী ঘুম-ঘাম্‌কে হিঁয়া আয়ী ! কিত্‌না দূর পড়েগী জবলপুর হিঁয়াসে? সিধী রাস্তে সে ? সম্‌ঝে না, ইয়ে নদ্দী সে নেহি। রাস্তেসে !

অন্য মেয়েটিই জবাব দিল, পৃথু জবাব দেবার আগেই; জবলপুরসে ইয়ে রাত যিত্‌নী দূর, ইয়ে রাত সে জবলপুর শ্রিফ্ উত্‌নাহি দূর পড়েগী।

ছোট মেয়েটি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। বাঁ হাতের তর্জনী তার ডান গালে ঠেকিয়ে কুর্নিশের ভঙ্গীতে তারিফ জানাল অন্যজনকে। বলল, বহুত্, খুউব !

ইডিয়ট, পৃথুর শরীর ও বোধ ক্রমশই শক্ত হয়ে আসতে লাগল। সত্যি ! এমন গলা ও জীবনে শোনেনি। এমন গলার স্বরও কারো হয় ? এমন স্বর ত শুধুমাত্র কুর্চিরই আছে বলে জানত ! পৃথুর মাথার মধ্যে কী যেন সব গলে-টলে যেতে লাগল। মেয়েটির চোখ দুটিতে, আর নাক-চিবুকে বুদ্ধি আর রসবোধের দ্যুতিও যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। কে এ ? কুর্চিই নাকি ? কুর্চি ছদ্মবেশে নদী—ভেসে এল কি ?

অন্য মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে সে-ই বলল, অল্পবয়সী মেয়েটি, কমলা বহিন্, দিখো ত' সাহি, হামারা নাম ভি হ্যায় ? বলেই, আঙুল তুলে দেখাল পাথরগুলোর দিকে।

পৃথু দেখল, লেখা আছে বিজ্‌লী+পওন্।

হাসল ও। বলল, তোমার নাম তাহলে বিজ্‌লী। তা, তোমার নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে ও কার নাম ? চেনো নাকি ?

বিজ্‌লী হাসল। বলল, চিনি না। তবে, চিনতে কতক্ষণ ?

কম্‌লা একদৃষ্টিতে পৃথুকে দেখছিল। ওর চাউনিতে সাপের চাউনির মতো একধরনের ঠাণ্ডা সম্মোহন ছিল। কম্‌লাকে তার বয়সের তুলনায় অনেকই বেশি বড় দেখাচ্ছে। মনে হল পৃথুর। কে জানে ? যেমন দেখাচ্ছে, তাই-ই তার বয়সের আসল ছবি কী না ? চোখের নিচে কালি ! এককালে সেও হয়ত সুন্দরীই ছিল বিজ্‌লীরই মতো চোখের কালিতে অনেক অভিজ্ঞতা মাখামাখি হয়ে, লেপ্টে ছিল।

কম্‌লা বলল, শেঠ্-এর নামটা কি ?

আমি শেঠ্ নই।

নামটা কি ? বাপ-মায়ে নাম ত' একটা দিয়েছিল ?

পৃথু !

বিজ্‌লী হেসে উঠল।

বলল, কেয়া বেমত্‌লব্ কা নাম আপ্‌কা ? উস্ নাম্ কি কোই মতলব্‌ই নেহি ! ঝুট্টো

তারপরই বলল, বেমতলব্ কা নাম্ কা আদ্‌মী ভি সব বেকাম্‌কাই হোতা। বোল্, কম্‌লা বহিন কিঁউ, খুচ্চুকা বাত্ ইয়াদ ত' হোগী ! সাচ্‌মুচ্ই বেকাম্‌কা।

বলেই, ঝুমঝুমির মতো হেসে উঠল।

"বেকাম্‌কা আদ্‌মী" বলতে কী বোঝাল সেই বিদ্যুতের মত বিজ্‌লী, তা বিজ্‌লীই জানে

পৃথু প্রতিবাদ করে বলল, না না। বে-মত্‌লবের নয়। আছে। মানে আছে। তার নামেরও মানে আছে।

পৃথু ? ফুঃ। হোনেই নহী শেকতা !

বলেই, আবারও হেসে পড়ল বিজ্‌লী, এবার নিজেরই কোলের উপর।

পৃথুর বেশ লাগছিল।

তুম্‌হারা নাম কিনোনে রাখ্‌খাতা? উনোনে ভি জরুর বেকাম্‌কাই হোগা। আবার বলল বিজ্‌লী।

পৃথুর মনে হল, কী করছে কি সে, এই রাত-দুপুরে, সস্তা আতরের গন্ধ-ভরা বাজে বাঈজীদের সঙ্গে ? রুষা ঠিকই বলে, "তোমার কোনো সেন্স্‌ নেই, ব্যালান্স নেই, তোমাকে কোথাওই একা ছেড়ে দিতে আমার ভরসা হয় না।" কোথায় যে গিয়ে আমার নাম ডুবিয়ে আসবে। তোমাকে কেউই না চিনতে পারে, হাটচান্দ্রায় আমাকে সকলেই চেনে। আমার একটা প্রেস্টিজ আছে, ইমেজ আছে।"

হঠাৎই কম্‌লা বলল, তা শেঠ, তোমার চোখ দুটিতে এত দুঃখ কেন ?

দুঃখ ?

পৃথু চমকে উঠল।

কই ? না ত ! কাল এক বন্ধুর বাড়ি গেছিলাম, সুর্মা লাগিয়ে দিয়েছিল সে। বাড়িতে তেওহার্‌ ছিল। সুর্মাই লেগে আছে হয়ত।

ভালই বলেছো শেঠ। সুর্মা ; শুধু খুবসুরতি ধারই দেয়, তাও অতি অল্প সময়েরই জন্যে। দুঃখী মানুষের চোখের চেহারাটা আমি চিনি। তাদের দুঃখটা চোখের তলায় থাকে না। চোখের একেবারে মণির মধ্যেই বাসা বেঁধে থাকে, ঝিনুকের মধ্যের মুক্তোর মতো।

আবারও চমকে উঠল ও।

বিজ্‌লী বলল, কিন্তু দুঃখ যার নেই কম্‌লা বহিন্‌, সে ত' বিল্‌কুল্‌ জানোয়ারই হচ্ছে। তাই না ? সে কি আদমী ? ইন্‌সান্‌কেই ত' খুদা দুঃখ দিয়ে পাঠান। দুঃখ না থাকলে যে কিছুই হয় না বহিন্‌। নাচ হয় না, গান হয় না, যারা শের লেখে, তাদের শের আসে না। দুঃখ নিয়ে দুঃখ করে ত' একমাত্র বোকারাই। ইনসানোঁকো লিয়ে দর্দ্‌, খুদাহ্‌কি ইক্‌ বুঝদিল্‌ দোয়া।

বিজ্‌লী পৃথুর একেবারে কাছে চলে এসে সামনে বসল। পা দুটি মুড়ে। এমন করে ওর চোখে তাকাল, যেন জন্ম-জন্মান্ত থেকে পৃথুর সঙ্গেই ওর জানাশোনা ভালোবাসা।

কম্‌লা ভাত চাপিয়েছিল আলু আর ডিম সিদ্ধ দিয়ে। পাথর সাজানো কাঠ-কুটোর উনুনে। মাঝি বলল, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখব নাকি নৌকোটা নিয়ে ? মুঠিবাঁকে চেত্‌নী মাছ পাওয়া যেত হয়ত। যাব, আর আসব।

বিজ্‌লী তাকে ধমক্‌ দিয়ে চুপ করালো। বলল, আঃ। চুপ্‌ করো না। আমরা কথা বলছি। খালি খাওয়া, আর খাওয়া ! যেন, খেতেই মানুষ আসে এই দুনিয়াতে !

বিজ্‌লী একটু পরেই আবার শুধোল, তুমি কোথায় থাকো শেঠ, বললে না ত' !

ঐখানে।

বলেই, বাঁ হাত তুলে চন্দ্রালোকিত আবছা অন্ধকারে আঙুল নির্দেশ করে শহরের দিকে দেখালো পৃথু।

ওর মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, ঐখানে নয়, ঐখানে নয় ; আমি সবখানে থাকি। আজ নয়, আমি অনন্তকাল ধরেই আছি। চিরন্তন পুরুষ আমি।

বাড়িতে কে কে আছে তোমার ?

সবাই আছে। মুখ বলল।

মন বলল, সবাই ? সবাই কে ? তোমার কেউই নেই। তুমি একা। জন্ম-জন্মান্তরের একা।

বিজ্‌লী ফিক করে হেসে উঠেই, গম্ভীর হয়ে গেল।

পৃথু বোকার মতো হাসল।

কম্‌লা বলল, লাও নাসিরুদ্দিন ভাইয়া। বাবুকে লিয়ে গোলি লাও।

নাসিরুদ্দিন নৌকোয় গিয়ে ফিরে এসে একটা প্লাস্টিকের কৌটো দিল কম্‌লার হাতে। কম্‌লা তা থেকে চারটি কালো গুলি নিয়ে বিজ্‌লীকে দিল। বিজ্‌লী দু' হাত জড়ো করে, বহত্‌ এক্‌লাখ্‌ আর তমদ্দুনের সঙ্গে শব ঝুঁকিয়ে পৃথুকে পেশ করল সে-গুলি। গোলাপের লাল-পাঁপড়ি, পেস্তা, কিসমিস এবং রাংতা-মোড়া গুলি।

বশীকৃতর মতো চিবিয়ে জল খেলো ও। কে জানে কী আছে এতে? বিষ নয় ত? হলে হবে।

বিজ্‌লী বলল, তোমার মতো মানুষ দেখেছি আমি।

আপনার মতো?

ও নিজেই বলল, না ওর ভেতর থেকে অন্য কেউ বলল, এবারেও বুঝল না। পৃথু বলল, দ্যাখো, অন্য মানুষের মধ্যে, অন্য কোনো মানুষের মধ্যেই কিন্তু আমি নেই। আমি মোটেই টুক্‌রো-টাক্‌রা নই গো মেয়ে। আমি আসলে, আস্ত একটি মানুষ। নিটোল। পরিপূর্ণ একটি মানুষ।

নদীর শব্দ জোর হল। সাহেবের মতো গায়ের রঙের, ন্যাড়া, বাজপড়া, দীর্ঘদেহী শিমুলের ডালের আশ্রয় ছেড়ে হুতোম্‌ পেঁচা ভেসে গেল চাঁদের আলোর স্রোতের বিপরীতে, হর্‌জাই গাছেদের গা-ছম্‌ছম্‌ ছায়ায়। তারও পর রাতের নদীর অস্পষ্ট-ছবি বুকে-ধরা স্নিগ্ধ চাল-গুঁড়ো-রঙা আকাশে।

তোমরা আসছ কোথা থেকে? আসছ না যাচ্ছ?

পৃথু শুধোল।

যাওয়া মানেই ত' আসা, আর আসা মানেই যাওয়া। যেমন ভাবে যে দেখে। এখন অবশ্য বলতে পারো, যাচ্ছিই। হাটচান্দ্রা বলে কাছেই একটা জায়গায়। রাতটা ইচ্ছে করেই নৌকোয় কাটাবো। কাল ভোরে নৌকো ফেলে শহরে যাবো। গাড়ি আসবে আমাদের জন্যে। মুজ্‌রো আছে। গান গাইব, নাচব। তুমি দেখতে আসবে?

রাত, কথায় কথায় বাড়তে লাগল। ওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে একসময় জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে নিয়ে নৌকোর দিকে এগোলো ওরা। নৌকোটা খুলে নিয়ে ভাসিয়েও দিল একসময়। ভাসতই, কারণ, কোনো নৌকোই চিরদিন একই ঘাটে বাঁধা থাকে না; নদীতে, অথবা জীবনে।

পৃথুই শুধু বসে রইল একা পাথরের উপর অবশ হয়ে, সাদা শালে মাথা ঢেকে। ওর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। মাথাটা ক্রমশই হাল্কা হয়ে আসছিল। কে জানে কী খাইয়ে গেল খারাপ মেয়েটা।

চমৎকার অনুভূতি একটা। এমন কখনও হয়নি এর আগে। কী খাইয়ে দিয়ে গেল বিজ্‌লী, কে জানে? মেঝের মাটি?

সামনেই বালির উপর পাথর, কালো পোড়া-কাঠ আর আগুন জ্বালাবার চিহ্ন পৃথুকে শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, যা-কিছু ঘটেছিল কিছুক্ষণ আগে তার সবটুকু না হলেও, কিছু অন্তত সত্যি!



'রাত কত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পৃথু, অকাজে কোনোদিনও এত রাত করে বাড়ি ফেরেনি কাজেও যদি রাত হয়েছে, তখনও রুষার পারমিশান্‌ নিয়েই গেছে। আজকে নির্ঘাৎ ওর

কোর্ট-মার্শাল হবে।

জমিটা এবং বাড়িটাও রুষারই নামে। রুষার ব্যাচেলার বড়মামার সম্পত্তি ছিল। রুষাকে দিয়ে গেছেন উনি। কথায়-কথায়ই রুষা পৃথুকে আজকাল গেট-আউট করে দেয়। বলে, এক্ষুণি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

ও বলে, পৃথু শোনে। কিন্তু আজ অবধি সত্যি সত্যি বের করে দেয়নি। যে স্বামী, বলতে গেলে প্রায় স্ত্রীর আশ্রয়েই থাকে ; তাকে মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে পড়তে যে হয়ই এই সরল সত্যটিকে পৃথু অম্লান বদনে মেনে নিয়েছে। সত্য যা, তাকে মেনে নেওয়াই ভালো। এই রাতেই বোধ হয় সেই গৃহনির্গমনের অশুভ মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসছে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই খুব ভয় করতে লাগল পৃথুর। নিজের জন্যে যতখানি নয়, এস· ডি· ও· সাহেবের জন্যে তার চেয়েও বেশি। রুষার চিৎকার চেঁচামেচিতে এস· ডি· ও· সাহেবের মেমসাহেব হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাঁর উপর হামলা চালাতে পারেন। দুর্বল চিত্ত সব স্বামীদেরই কি প্রকৃতির পরিহাসে অত্যন্ত সবলচিত্ত স্ত্রী জোটে কপালে ? এই বাবদে পৃথু এস· ডি· ও সাহেবের একজন সমব্যথী। কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ? এস· ডি· ও সাহেবের বিপুলা স্ত্রী যখন গুড়ের হাঁড়িতে পড়ে-যাওয়া নেংটি ইঁদুরের মতো চেহারার সাহেবকে 'ডাস্ট্' করেন, 'থ্র্যাশ্' করেন তখন পাথরের চোখেও জল আসে। পৃথুর যা হয় হোক, এস· ডি ও সাহেবের প্রাণটা বাঁচা খুবই দরকার। কারণ প্রাণটা সাম্প্রতিক অতীত থেকে ভদ্রলোকের কাছে হঠাৎই খুব দামী হয়ে উঠেছে। আগামী মাসেই তাঁর প্রি-প্রমোশান সি-সি-আর ফাইন্যাল হবে। তিনি এ-ডি· এম· হলেও হতে পারেন এবারে।ডাইরেক্ট রিক্রুট ত নন। এইরকম 'প্রেগন্যান্ট উইথ পসিবিলিটিজ-এ'র সময়ে নিজের মৃত্যুর দুঃখটা ভদ্রলোককে বড়ই বাজবে!

গেটটা খোলা। আশ্চর্য ! আলোও জ্বলছে না, বাগানে, বা বাগানের শেষে বসবার ঘরে ঢোকার দরজার সামনেও নয়।

ব্যাপার কি বুঝতে পারলো না পৃথু। না বোঝার অন্য কারণও ছিল। ওর অবস্থা এখন তুরীয়। ঠিক এইরকম কোনো অনুভূতির শরিক ও আগে কখনই হয়নি।

রুষা কি বাড়ি নেই ? ডাকাত পড়েছিল কি ? নাকি, বসবার ঘরে ওর জন্যে জেগে বসে বসে সে ঘুমিয়েই পড়ল ঈসসস। নিজেকে নিজে লাথি মারা যায় না, গেলে, মারত পৃথু। রুষা ! বেচারী।

চামারটোলীর দিকের মহল্লার প্রায় সব কুকুর-কুকুরীকেই পৃথু চেনে। এখন কার্তিক মাস। কুকুর আর চোরা-শিকারিদের মরশুম

দরজাটা বন্ধই। দরজায় এসে যখন কড়া নাড়ল, তখন কেউ যে ওর জন্যে সহাস্য অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, তা ও জানত। কখনও সখনও মদ খেয়ে এলে, ওর বুকে তাও একটু সাহস থাকে। ভাবে, আজও খারাপ ব্যবহার করলে একটা ইস্‌পার-উস্‌পার হয়ে যাবে। মদ বোধ হয় শরীরকে উত্তেজিত করে। বোধ হয় নয় ; নিশ্চয়ই করে। তবে কালে-ভদ্রেই খাওয়া হয়। নেমন্তন্ন থাকলেও রুষা কোথাওই প্রায় যায় না, গেলেও এসব খায় না। এবং পৃথু যে খায় , তাও পছন্দ করে না। মদ তো উত্তেজিত করে কিন্তু সিদ্ধি ? সিদ্ধি শরীরকে কি করে ? সিদ্ধি বোধ হয় শরীরকে হাপিস্ না করলেও বিলক্ষণ নিস্তেজ করে দেয়। সিদ্ধি ; সিদ্ধ করে।

গণ্ডার এবং খাণ্ডার রমণীদের সামনে সাহস দেখানো অতীব মূর্খের কাজ। যাঁরাই পৃথুর মতো অসহায় অবস্থায় মাঝে মাঝে পড়েন সেই সমস্ত হতভাগ্য স্বামীদের প্রত্যেককেই একটি অনুরোধ করবে ভাবে, পৃথু। অনুরোধ করবে, সিদ্ধি খেতে। স্বয়ংসিদ্ধ হবার এমন চমৎকার পথ আর নেই।

ব্যোম্‌শংকর।

সারা বাড়িটা অন্ধকার। ভাগ্যিস সামান্য চাঁদের আলো ছিল।

দরজায় ধাক্কা দিল পৃথু। ধাক্কা দিতেই উল্টোদিকের বাড়ির বারান্দা থেকে এস· ডি ও সাহেবের পেডিগ্রী, ধব্‌ধবে শাদা জোয়ান অ্যালসেশিয়ান এবং চামারটোলির লালমাটির রাস্তায় রাতময় ঘুরে-বেড়ানো বিনিমাইনের পাহারাদার বেজম্মা নেড়ী কুত্তার দল একই সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

নেড়ীরা মুদারায় ; অ্যাল্‌সেশিয়ান তারায়।

পৃথু ভাবল, পাথর তুলে মারে। তারপর ভাবল, ব্যাপারটা বড়ই নিষ্ঠুরতা হবে। মাসটা কার্তিক। ও কারো মিলনেই বাধা দেয়নি, দেয় না। খামাকা কুকুরদের মিলনেই বা দেবে কেন ?

দরজাটা নিঃশব্দে ভিতর থেকে খুলে গেল। এবং খুলে যেতেই, পৃথুকে প্রায় গোঁত্তা মেরেই একটা গাঁট্টা-গোঁট্টা নর্‌-পাট্টা পেল্লায় শুয়োর সাঁ করে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। পৃথু তার ছড়িয়ে পড়া বুদ্ধির টুকরো-টাক্‌রাগুলোকে কুড়িয়ে নিতে না নিতে শুয়োরটা ঠিক শুয়োরেরইমতোঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দৌড়তে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে পড় ত পড় সোজা পড়ল গিয়ে একেবারে কার্তিক মাসের দারুণ দুর্দৈবে জোড়া-লেগে-যাওয়া এক জোড়া থম্‌কানো-পুলকের ঘাড়ে। বেচ্চারারা অসহায় অবস্থায় ঘ্যাঁকাৎ ! ঘ্যাঁকাৎ ! ঘ্যাঁকাৎ। বলেই তিনপাক ঘুরে গেল।

শুয়োরটা তীব্রগতিতে ভেজা ধুলো আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে ছুটে গেল মহুয়াটিলার দিকে।

যাক্‌গে।

শুয়োরটাকে চেনার ইচ্ছা পৃথুর আদৌ ছিল না। শুয়োরদের আবার চেনাচিনি কি ? শুয়োরের আমি, শুয়োরের তুমি ত' হয় আর হয় না। ভাবল, পৃথু।

আল্‌তো করে ঠেলা মারতেই ভুতুড়ে শব্দ করে, বন্ধ হয়ে যাওয়া গভীর রাতের দরজাটা আবার খুলে গেল। রুষা দরজার কবজায় ওকে পোড়া-মবিল দিতে বলেছিল বাব বার। মনে পড়ল পৃথুর। ভুলেই গেছে। ইস্‌স্ . . আছে কপালে।

বসবার ঘরে ঢুকে দেওয়াল হাতড়ে সুইচ্‌ টিপতেই আলো জ্বলে উঠল।

তাহলে লোডশেডিং হয়নি !

আশ্চর্য। ঘরের ভিতরেও কেউই নেই। পৃথু দরজাটা বন্ধ কবল। রুষা এবং টুসুর ঘরের কাছে গিয়ে ডাকল, ক

বন্ধ দরজা, অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে গাঢ় ঘুমের ভারী নিশ্বাসের ঘষ্‌টানো শব্দ এল। ওর হঠাৎই মনে পড়ল, মিলি আর টুসু চলে গেছে মণিবাবুদের বাড়ি। ঝুম্‌কিবা এসেছে পরশু কলকাতা থেকে ; তাই। কাল ভোরে ফিরবে ওরা।

রুষা একা ছিল ?

ইয়েস। রুষা একা ছিল। মাথার মধ্যে যেন কে বলল।

থাকুক। পৃথু ভাবল। ও নিজে ত' চিরদিনই একা। রুষাও একটু থাকুক। মাঝে মাঝে একা না থাকলে মানুষের মানুষী বুদ্ধিগুলো সব নষ্ট হয়ে যায়। বুদ্ধি-সুদ্ধি শুয়োরেরমতোহয়ে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়।

সন্ধ্যেবেলা ও যখন রাতমোহানার দিকে যাওয়ার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোয় তখন কি রুষা বাড়ি ছিল ? তাকে কি বলে গেছিল পৃথু যে, ফিরতে রাত হবে ওর ? কে জানে ? কিছুমাত্রও মনে পড়ছে না। কোনো কথাই। মস্তিষ্কর মধ্যে দুর্ভেদ্য ঝাঁটি-জঙ্গল গজিয়ে গেছে যেন। মাত্র দুটি ঘণ্টায়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সকলে সিদ্ধি খেলে অ্যাফরেস্টেশন্‌ দ্রুত হবে। নাঃ, কিছুই মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে শুধু বিজলীর কথা, শুধুই বিজলীর কথা। ওঃ বিজ্‌লি। আঃ বিজলি। বড় পিপাসা পেয়েছে।

শরীর পৃথুর যাইই বলুক না কেন, মন বলছে, সিদ্ধির নেশাটা ভারী ভাল নেশা। মন মেজাজ কেমন ঠাণ্ডা, পৃথিবীশুদ্ধু সকলকেই ক্ষমা করে-দিই ক্ষমা-করে-দিই ভাব। পৃথু নিজেকে তবুও শুধোল, নিরুত্তাপে ; রুষা ! আমার বউ, আমার লোকাল এবং পার্মানেন্ট গার্জেন কি . . কিছু . . . হুজ দ্যাট পিগ ? পৃথুর বৌ-এর সঙ্গে এতরাতে সে কি বৌ-বর খেলতে এসেছিল ? একেই বলে ডল্‌স্‌-হাউস।

কে বউ ‹ কাব বউ ? দুদিনের এই পৃথিবী !

মনে পড়ে গেল। ঠিক সময়ে। কবি-সম্মেলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডঃ চৌধুরীকে নিয়ে এসেছিলেন হাটচান্দ্রার "বেঙ্গলী ক্লাব"। চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন ডঃ চৌধুরী। বক্তৃতা শেষ

করার সময় বলেছিলেন, আনন্দম্। আনন্দম্। আনন্দম্ .

খুব ভাল লেগেছিল পৃথুর। উনি বলেছিলেন, সবসময় আনন্দে থাকতে হয়। আনন্দে থাকবে। আনন্দম্!

ব্যোম্‌শংকর।

"দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া জনম জনম এই চলেছে তোমায় আমায়, মরণ কভু তারে থামায় ?" গানটা ভগবানকে নিয়ে। বিজলীর খোদা। "রভীন্দর্ সংগীত"। রুষা ঠাট্টা করে বলে। ও ভোপালের মেয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে না। তাতে কি হয়েছে ? প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত মতামতকে শ্রদ্ধা করার আরেক নামই ত' শিক্ষা। ফাদার টমকিন বলেছিলেন। পৃথু নিজেকে শিক্ষিত বলে জেনে, অন্ততঃ এই মুহূর্তে খুব শান্তি পায়।

সিদ্ধিটা বড় ভাল ছিল হে! সকলের ভালো হোক। সকলেই আনন্দে থাকো। রুষা, পৃথু নিজে, পৃথুকে অন্ধকারে পেটে গোঁত্তা মেরে চলে যাওয়া হাট্টা-কাট্টা-নরপাট্টা অচেনা আগন্তুক শুয়োরটা। দৈব-দুর্বিপাকে জোড়া লেগে-যাওয়া, অর্গাজমিক্ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া জোড়া জোড়া কুকুব এবং কুকুরীরা। আহাঃ! ওদের বোধ হয় বড্ড লেগেছে গো।

আর বিজ্‌লী ? আহ্ বিজ্‌লী। নাঃ বিজ্‌লী। ঈঃ বিজ্‌লী। জানি, বিজ্‌লী, তুমিও বিজলীই থাকবে। বিদ্যুৎ চমকের পরই ঘোর অন্ধকার। পৃথু ভাবে।

আসলে, কোনো কিছুই বোধহয় মূল অবয়বে থাকে না। থাকে কি ? রুষা নেই। পৃথু, তুমি নিজে নেই। বিজ্‌লীও থাকবে না। এইই নিয়ম। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে লাক্ষা সংগ্রহ করে আনে। তারপর সীড-ল্যাক্। শেলাক্। বাটন্ ল্যাক্, গার্নেট্ ল্যাক, স্টিক্ ল্যাক্ তৈরী হয়ে চলে যায় সব রাশিয়া, আমেরিকা, চায়না, পৃথিবীর কত কত জায়গায়। আদিবাসী ছেলেমেয়েদের বাঁশির ঘুমপাড়ানি সুর আর মেয়েদের বুকের ঘাম-এর ঝাঁঝালো গন্ধ কিছুমাত্রই বেঁচে থাকে না সেই বাণিজ্যিক দ্রব্যের মধ্যে। নাঃ। কিছুই থাকে না মূল অবয়বে। পণ্য, চিন্তা, মানুষ নিজেও। অবিরতই রূপান্তর ঘটে চলেছে। গ্রহনক্ষত্র খচিত অনুভবের ব্রহ্মাণ্ডর মধ্যে, অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের মনের মধ্যে। মন ত' নয়, যেন এক একটি ক্রসিবল্। কেউই কোনো মুহূর্তেই স্থির হয়ে নেই ; থেমে নেই। ভিতরে, বাইরে, দৃশ্যমানে এবং অদৃশ্যে এক প্রচণ্ড সচল অথচ শব্দহীন বিবর্তন ঘটে চলেছে। কখনও কখনও এই নৈঃশব্দ্যর শব্দময়তা পৃথুকে বড় নাড়া দিয়ে যায়।

কখনও কখনও।

জামা-কাপড় ছুঁড়ে ফেলে পৃথু কম্বলের তলায় ঢুকে গেল বাড়িতে পরার পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। রাত কত কে জানে ? কারখানার প্ল্যান্টের ঝিরঝিরে শব্দ এখন শোনা যাচ্ছে। রাত গভীর। বড় রাস্তা দিয়ে জবলপুর আর রায়পুবেব দিকে বিপরীতমুখী ট্রাক ছুটে চলেছে মাঝে মধ্যে শীতল কালো হাইওয়ের শিশির ভেজা অ্যাস্‌ফাল্টে প্যাচ্‌প্যাচ্ শব্দ তুলে। পথের দুপাশেব গভীর জঙ্গলে শব্দটাকে ধুলোর মতো চারিয়ে দিয়ে। রাতের ধুলো বড় অলস। শিশিরে ভিজে থাকে বলে নড়তে চড়তে চায় না, পৃথুরই মতো।

গাঢ় ঘুমে এলিয়ে পড়ল পৃথু। অথচ জেগেও রইল। আশ্চর্য এক অনুভূতি। পৃথুর চোখের সামনে কে যেন চাঁদের আলোর মধ্যে নানা রঙা আলোর সুতো টান টান করে টাঙিয়ে দিয়েছে। রূপোলি সুতো টাঙিয়ে, তাতে সোনার গুঁড়ো দিয়ে ক্রমাগত মাঞ্জা দিচ্ছে। বিশ্বকর্মা পুজো কবে গো ? শিউলি ফুলের হালকা কমলা রঙ, অগ্নিশিখার গাঢ় কমলা, জীরহল্-এর হালকা বেগুনী, সেই টানটান মাঞ্জা লাগানো বহুবর্ণ সব সুতোর উপর এক এক করে চাপিয়ে দিচ্ছে ডিমের কুসুমগুলো তাতে মিশিয়ে। আব সেই সুতোর ওড়ানো শতরঞ্জির উপর নানা রঙা চাঁদিয়াল আর শতরঞ্জ ঘুড়ি সোঁ সোঁ করে গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে পড়ছে এসে।

পৃথুর সব অঙ্গ শিথিল। কোনো সাড়া নেই। ওর হাত ওর হাতে নেই। পুরুষাঙ্গও। হাউ ডেঞ্জারস! উর্দ্ধাঙ্গ, নিম্নাঙ্গ পুরোপুরি অন্যের হেপাজতে চলে গেছে। কে জানে, কার হেপাজতে ?

ওর ইমপোটেন্ট বন্ধু শ্যামাপদ ধার নিয়ে গেল ?

মস্তিষ্ক কিন্তু সজাগ। মস্তিষ্কের বাকুলে আকুলকরা চাঁদের আলোর মধ্যে রূপের হাট মেলে বিজ্‌লী বসে আছে। একা। শুধুই বিজ্‌লী। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আর কেউই নেই। কেন বিজ্‌লী ? বিজলী না কুর্চি ? কেন ? কুর্চি কেন ?

হঠাৎই পৃথুর মনে হল, কে যেন তার বাঁ পেট ফাঁসাবে। পাঁজরের কাছে খোঁচাচ্ছে।

কে ? কি ব্যাপার ? খেয়েছে। শুয়োরটা নাকি ?

দাঁত দিয়ে পেট ফাঁসাবে ? চাঁপাফুলের গন্ধে চাঁদের আলোয় এমন দেবদুর্লভ সুসিদ্ধ পর্বে এই বেরসিকটি কে ? কার এমন আস্পর্ধা যে ঠিক এখনই পৃথুকে খোঁচাখুঁচি করে ?

পৃথু পাশ ফিরতে চেষ্টা করল ; কিন্তু পারল না। পৃথু আর পৃথুতে নেই। তারপরই পরিচিত হাতের ছোঁয়ায় ও বুঝল যে, রুষা। ওমাঃ।

নাইলনের নাইটি। খরগোশের গা-এর মত। "ফর হুম্ দ্যা বেল টোলস্" এর র‍্যাবিট্ মনে হল পৃথুর।

বিয়ের পরও খড়কে-ডুরে শাড়ি পরেই শুতো। রুষার মত কিছু কিছু মেয়ে থাকে, যাদের সব কিছুই বোধ হয় লেট্-এ হয়। লেট-এই আসে, নানা আগন্তুক তাদের জীবনে নাইলনের প্যান্টি ও নাইটিরই মতো। রুষা সেরকমই। আধুনিকতাও খুবই দেরী করে এল ওর জীবনে। বাইরের আধুনিকতা। ভেতরে বোধ হয় কোনোদিনও তা ঢুকতে পাবে না। জায়গা নেই সেখানে। বাজে জিনিসে বোঝাই। ল্যাজারাস কোম্পানির ফার্নিচার। জার্মানীর রোজেন্‌থাল্-এর ফ্লাওয়ার-ভাসস্, জাপানীজ ক্রকারি এট্ সেটরা এটসেটরা।

জেগেছো ? জেগে আছো ?

পৃথু নিরুত্তর। মগজ উত্তর দিচ্ছে, দিতে চাইছে। ডাঙায় তোলা কই মাছেরমতোধড়ফড় করছে কিন্তু মুখে সাড় নেই। ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে সে তার মধ্যের এহেন দুর্বিনীত মানুষটির দুঃসাহসে। চিৎকার করে জবাব দিতে চাইছে। একটিও শব্দ নেই পৃথুর ভাঁড়ারে।

কে ডাকে ? রুষা ? নাকি নিশির ডাক ?

কি হল ? জেগে আছো নাকি ?

বলেই, পৃথুর কম্বলের নিচে আদুরে বেড়ালনীরমতোমসৃণ, পেলব ঢেউ তুলে ঢুকে গেল রুষা।

অনভ্যস্ত পৃথুব বুকেব মধ্যে আরও বেশি কষ্ট হতে লাগল।

কে ডাকে ? জেগে আছি কি ?

কি ? কথা বলছ না কেন ?

হুঁ।

কোথায় গেছিলে ? এত রাত হল ?

উত্তর দিলো না তবুও পৃথুর মুখ। আবার। জিভে একটুও সাড নেই। ডেবিট-ক্রেডিট মারাত্মক গড়বর করে মস্তিষ্ক থেকে হঠাৎই একটি শব্দ ছিটকে বেরুলো : শুয়োর।

শুয়োর ? ওমা ! কোথায় ?

মগজ বলল : আই নিউ অ্যাজ্‌মাচ্। ইয়েস্। ডিফারেন্স ইন ট্রায়াল ব্যালান্স।

আতঙ্কিত গলায় রুষা আবারও বলল, বলো না ? কেমন শুয়োর ? সাদা না কালো ? সুইস্ না অস্ট্রেলীয়ান ? নাকি ? ম্যাগো ! চামারটোলীর?ম্যাগো।তুমি নিশ্চয়ই ড্রিঙ্ক করে এসেছ। গেছিলে কোথায় ? আশ্চর্য।

আশ্চর্য নিশ্চয়ই। কারণ, রুষার গলায় রাগ নেই, বিস্ময় নেই, অভিমান নেই। ভাবল পৃথু।

ইনভেস্টিগেশানের কেস্।

রুষা ঝুঁকে পড়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে মুখ শুঁকলো।

হিঃ হিঃমাই ডার্লিং। সিদ্ধি, স্বয়ং-সিদ্ধ। গন্ধহীন। হুঁ। হুঁ। শোঁকো, শুঁকেই যাও। তবু গন্ধ কিছুতেই বেরুবে না গর্ত থেকে। এপ্রিল ফুল ! ওগো গন্ধ গোকুল !

পৃথু মুখ ফস্‌কে বলল, উঁহু !

কেমন দেখতে! শুয়োরেরই মতো ?

রুষার মুখের রঙ কি বদলে গেল ? অন্ধকার ঘরে দেখা গেল না। একজোড়া লাল আপেলের মতো তার বুক-দুটি জোরে জোরে ওঠানামা করতে লাগল।

কাঁপা কাঁপা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, সত্যি ?

তারপরই বলল, ওমা ! শুয়োর ? অবাক করলে। বাড়ির মধ্যে থেকে বেরুল ! কী যে বল !

পৃথুর মস্তিষ্ক নিরুচ্চারে বলল, ওহে মূর্খা ! শূকরীর কাছে কি বাঘ আসে ?

মুখ, তখনও বিমুখ।

নীরবতা ! দীর্ঘ নীরবতা। দীর্ঘতর নীরবতা !

ক্ষমা। শুকরদেব প্রতি ক্ষমা। বরাহজাতিকে ক্ষমা।

মেরী, মেরী, মেরী বলে নাইটীর ফাঁস আঁটতে আঁটতে ঘরের আলো জ্বেলে রুষা বেবিয়ে গেলো ঘর থেকে নিমেষে। ঘর থেকে ; যে ঘবের জোড়া খাটে প্রেমের কফন্ শোয়ানো আছে কালো কাপড়ে ঢাকা। খালি চোখে দেখা যায় না।

মেবী !

কে এই মেরী ? মেরী মেরী কোয়াইট্ কনট্রারী ?

মেবীব গলাও শোনা গেল। চোখে এখনও দেখা হয়নি। গলা ভাল। সি-শার্প-এ বলে। গভীর বাতেও। এস ডি-ওব ডিম ফুটে, খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের আব এ-ডি-এম- হওয়া হল না। সব ডিম থেকে ডি.এম. হয় না। হওয়া উচিতও নয়। ক্যড নট্ কেয়ারলেস্।

মেরী মেরীকোয়াইট'কনট্রারী খুব সম্ভব কাল সন্ধ্যে থেকেই বহাল হয়েছে। সেরকমই কথা ছিল। ছিল কি ? সিদ্ধি, মনের সব সূতো নিয়ে গুটিয়েছে মনের লাটাইয়ে। টাইট্ করে। হাঁটি, হাঁটি পা পা। টাইট-রোপ্ওয়াকিং। এন্ড দ্যাট ট্যু ইন স্লিপ্। ইন স্লীপ।

বিজ্‌লী। হাই। ওপাশে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে। সী উ্য এগেইন্। কিছুক্ষণ পব রুষা ফিরে এসে লাইট নিবিয়ে দিযে বলল, যা ভেবেছিলাম। তুমি ঠিকই বলেছ।

পৃথুর মুখ বলল, কি, খ্রি ?

মন বলল. ইয়েস্। আমি সবসময় ঠিকই বলি।

শুয়োর।

এটা কী পিগারী ? ঘরের মধ্যে শুয়োর !

ছিঃ ছিঃ। ন্ ন্না। ঘরের মধ্যে কেন, ঘরের মধ্যে নয়।

নয় ?

ঘরে নয় গো। পিছনে।

পেছনে ? শুয়োর ? হাউ ডেঞ্জারাস্।

আঃ ! পিছনের কপিক্ষেতে।

পৃথুর কানে এই 'গো' কথাটা নতুন শোনালো। বিয়ের পর পর কিছুদিন যখন ভালোবাসা বেঁচেছিল, বেঁচেছিল ঢং-ঢাং, পারফ্যুমের গন্ধ, চোখ-চিবুকের চকিতচুমু ফষ্টিনষ্টি, তখন স্বল্পদিন রুষা এমন করে "হ্যাঁ গো", "না গো" বলত। এখন ভাণ করছে। কোনো অন্যায় করলেই করে। রুষাটা দু'নম্বর হয়ে গেছে। ভেরী স্যাড।

পৃথু নিশ্চিত হল, যে শুয়োর এসেছিল। শুয়োরের, নাম হারাম। শুয়োরের মেয়ের নাম হারামজাদী ! কজন জানে ?

রুষা আবার বলল, পিছনের কপিক্ষেতে এসেছিল। জানো গো, একেবারে তচ্‌নচ্ করে গেছে। বোধ হয় মেরীর, মানে··· , হলো

পৃথুর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। মানে, মেরীর কপিক্ষেত। কচ্‌কচ্। তচন

তুমি জেগে ছিলে নাকি আমারই জন্যে ? মানে, ফিরিনি বলে ? তা আমার বদপ্রাছে, লয় আছে,

এলো'? পৃথুর কথা ফুটলো এতক্ষণে। এনাস্থেসীয়ার ঘোর কাটার মতন মনে হল। সিদ্ধি, চৈতন্যর স্টপকক্ খুলে দিল, নিজেরই খেয়ালে।

না। দুটো ক্যাম্পোজ খেয়েছিলাম। বড় টেন্সানে আছি। রুষা বলল।

কেন?

বাঃ! কাল আমাদের 'শো' না? ত্রিপাঠি হলে। কিন্তু শুনছি,তার কাছেই বাঈজী নাচ হবে। জবলপুর থেকে বাঈজী আসছে। আনিয়েছেন মিসেস চক্রবর্তীর লোকেরা, যাতে আমাদের 'শো' ডিস্‌ক্রেডিটেড্ হয়। হাইট অফ্ মীননেস্। যেখানে বাঙালী, সেখানেই দলাদলি। অ্যাভারেজ বাঙালীরা এখন যা আন্‌কালচারড্ হয়ে পড়েছে যে, দেখবে সকলেই হয়ত আমাদের "শো" ছেড়ে বাঈজীদের নাচ-গান শুনতেই চলে যাবে। বাঈজীর খেমটা নাচ দেখতে যাবে। নামেই বাঈজী, গানেওয়ালী। আসলে ত' বাজনাও বাজায়।

বাঙালীর থাকাব মধ্যে ছিল এক কালচার, তাও গেল।

না, না। যেতে দিও না। শক্ত করে ধরে রাখো।

হুঁ! আমার হাতে আর কতটুকু জোব?

তোমাদের "শো"তে কি হবে?

ভদ্রলোকদের "শো"তে যা হয়। যা হওয়া উচিত। মিসেস চ্যাটার্জী পিয়ানোতে মোৎজার্ট বাজাবেন। টুসু এবং ওদের চেয়ে বড় বয়সী যারা, তাদের অর্কেস্ট্রা আছে। পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান, গীটার, বঙ্গো, ড্রাম ইত্যাদি নিয়ে। মিলিদের স্কুলের মেয়েরা একটা ইংলিশ ড্রামা করবে। মিসেস রোহ্‌তাগী ডাইরেক্ট করবেন। লিখেছেনও উনি। ডি সি আসছেন সস্ত্রীক। তাঁর স্ত্রী আর্ট ফিল্মের সমস্যার উপরে কিছু বলবেন। অপর্ণা সেন ওঁর পিসতুতো বোনের কীরকম ডিস্‌ট্যান্ট রিলেশান্ হন যেন! ন্যাচারালী, শী নোজ কোযাইট আ লট বাউট দ্যা ওয়র্লড অফ্ আর্ট-ফিল্মস্— !

পৃথুর চোখের পাতা বুঁজে আসছিল।

শ্রাবণী ওপেনীং সং গাইবে, "ও গঙ্গাআ তুমি-ইই বইচোও কেন ও ও ও ও..."। তোমার কিন্তু যেতেই হবে। আমি আমাদের সমিতির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। আমার আবদার।

পৃথু শুনলো, অর্ডার। আবদারে আদৌ অভ্যস্ত নয় ও।

যাবে ত'! কাল ত' ববিবার।

আমার ত' এখন রোজই ববিবার।

পৃথুর মাথার ঘন কালো চুলে হাত দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে হাত বুলিয়ে রুষা বলল, ঈসস্, চুলগুলো কী বড় হয়ে গেছে গো। হ্যাভ্ আ নাইস্ হেয়ারকাট্।

একটু চুপ করে থেকে বলল, অ্যাই শোনো। সাদা একটা ট্রাউজার বের করে দিয়ে যাব। সঙ্গে ইয়ালো-ইয়কার শার্টটা। ফুলহাতা শার্টটী পরে যাবে কিন্তু, যেটা দেব। বুজেচো? আর তার উপরে সেই ভোপালে বানানো কোটটা। হাফ-হাতা শার্টের সঙ্গে কোট পরবে না, কেরানী কেরানী লাগে। ম্যাচিং টাইও বের কবে দেব। শ্যাবী ড্রেস-এ যাবে না। আমার প্রেস্টিজই থাকবে না তাহলে।

আমাকে কি এই জন্যেই জাগালে?

ঠিক এই জন্যে নয়।

তাহলে?

কী আর বলব। এত বছর বিয়ে হল, এখনও যদি...। তুমি যেন জানো না? শেষ রাতেই...আমি...।

অন্ধকারে গায়েব হয়ে যাওয়া হোঁৎকা শুয়োরটার পশ্চাৎদেশ লক্ষ্য করে ছোটবেলা থেকে শেখা যত অশ্রাব্য গালাগালি ছিল সব নিরুচ্চারে উগরে দিল পৃথু। ঝাঁক ঝাঁক তীরের মতো গালগুলি ছুটতে ...গল শুয়োরটার পিছন পিছন। তার গুহ্যদেশ নির্মমভাবে বিদ্ধ করবে বলে।

হিঃ ...ম্নার মন কখন কি চায় তার...

কিছুতেই ...নের কথা বলছ? পৃথু বলল। মনের কথা রুষা?

তারপরই, নিজের পায়জামার দড়ি ধরে এক টান লাগাল। ব্যোমশংকর।

রিপু অথবা অনুশোচনা-তাড়িত ক্বচিৎ-রুষা পাশ ফিরে উদাস পৃথুর শরীরের উপর তার আধখানা উদোম্ উচ্ছিষ্ট শরীর উপুড় করে দিল। উচ্ছ্বাসে।

কিন্তু শুয়োরটা কার ? যে কপি খেতে এসেছিল ? ভাবছিল পৃথু। কার কপিক্ষেতে ?

মুখ হঠাৎ বলল, আচ্ছা ! কি কপি ? ফুল না বাঁধা ?

রুষার বাম স্তনবৃন্তে তর্জনী দিয়ে তাড়ন করতে করতে পৃথু শুধোল।

ফিল্ম ফেস্টিভালের একটি ফরাসী ছবিতে এইরকম আদর দেখেছিল। অনেকদিন আগে। কোলবালিশের উপর শ্যাডো-প্রাক্টিস্ করে করে আঙুল পাকিয়েছে।

তাবপরই হল এক কাণ্ড ! কাণ্ড বলে কাণ্ড ! ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে দু' হাতের পাতা, পাতায় পাতায় জড়ো করে, পৃথুকে দু পাতার মধ্যে নিয়ে স্বর্ণচাঁপাকে দেখতে দেখতে গ্রান্ড ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা করে তুলল রুষা।

নারীদের আসলে বোধ হয় কোনো শ্রেণীভেদ নেই। পৃথুর মনে হল। এক নারীই বিভিন্ন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়ে বিভিন্ন রাতে পদ্মিনী, হস্তিনী বা শঙ্খিনী হয়ে ওঠে। বহুরূপীর মতো। অঙ্কশায়িনী নারীর অঙ্কর উত্তর কখনও মেলে, কখনও মেলে না।

রুষা, উথাল-পাথাল, ভারী উষ্ণ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিরক্তির গলায় বলল, এত বছরেও···চিনলে না, সত্যি !···চিনলে না তুমি না··ইন্কবিজিবল্···

পৃথু মুখে কিছু না বলে সমস্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করে ভেড়া গুণতে লাগল। এখন কথা বলার সময় নয়, স্বামীদের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও প্রচণ্ড বিপন্নতার কন্সেন্ট্রেশানের সময় এখন। কনসেনট্রেশান যাব নেই , তাব কোনোদিনই সিদ্ধিলাভ হয না। ইয়েস্। সিদ্ধি খেলেও না। পৃথু বিষণ্ণ, বিপন্ন হয়ে ভাবছিল জীবনে কোনো একটা, একটামাত্র ব্যাপারও কী টেন্শান-ফ্রী হতে পারত না ? পবীক্ষা সবসময়ই ?

না, না, কথা নয় অ্যাই চোপ্।

বেড়া ডিঙ্গোচ্ছে এখন ভেড়ারা। দ্রুত বেগে ডিঙ্গোচ্ছে। পাঁচশ, চারশ-নিরানব্বুই, চারশ-আটানব্বুই···

পথ ?

যার পথ , সেই-ই চেনায়।

হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ জানি না।

পৃথু চোখ বন্ধ কবে ফেলল। ভয়ে। ভেড়ার ভীড়। তাদের খুরে খুরে ধুলো উড়ছে। দুসস···লাইন চুজ্ করাই ভুল হয়ে গেছে ওর। মেকানিকাল এঞ্জিনীয়ারিং না পড়ে, অ্যানিম্যাল-হাজব্যান্ড্রী পড়া উচিত।

চোখ বন্ধ । বিজ্লী ওর সামনে বসে আছে। বিজ্লী ? না কুর্চি ? চাঁদের আলোয়, নদীর জলের পাশে, গরম ভাত, গাওয়া ঘি, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধর গন্ধর সঙ্গে বিজ্লীর শরীরের আতরের গন্ধ মিশে গেছে। ফির্দৌস ? না অম্বর ? কোন ঈত্বর ?

হবে, একটা।

বিজ্লী না কুর্চি ?

শারীরিক নেগেটিভ্ পজেটিভ ,ততক্ষণে সংযুক্ত হয়েছে। অনেক মননশীলতার পর আলো জ্বলছে। হৃদয়হীন, অনুতাপহীন, বিবেকহীন, উষ্ণতাহীন, প্রেমহীন, কাঠিন্যময় শিরাসমষ্টি কঠিন মনোরম কর্তব্যে ব্যাপৃত হয়েছে।

কর্তব্য ! সারাজীবনই কর্তব্য করছে পৃথু ! জীবনে কবিতার মতো একটি কবিতাও লেখা হলো না।লেখেনি, এই জোড়া খাটেও। ও প্রকৃতই ব্যর্থ কবি।

পৃথু ভাবছিল, এই গলদঘর্ম করুণ কবিতাতেও অন্য অনেক কবিতারই মতো ছন্দ আছে,লয় আছে,

কিছু কিছু অন্ত্যমিলও আছে ; নেই শুধু প্রাণ। প্রাণহীন, বিচিত, মৃত, প্রেমহীন পথে তবু ক্লান্তিকর কুচকাওয়াজ্। কোম্পানী, আইইজ্ রাইট্ ! কোম্পানী, হল্ট ! স্ট্যান্ড, অ্যাট্ ইজ্ !

হঠাৎই দৈববাণীর মতো, ঊষার আলো ফোটার একটু আগেই নৈর্ব্যক্তিক গলায় রুষা বলল : তোমার হলে বোলো : আমার হয়ে গেছে।

অ্যাব্সল্যুট্, আলটিমেট স্টেটমেন্ট !

কিছুই করার নেই। স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট। প্রেগ্ন্যান্ট নয় ; টোটালী ব্যারেন. ওয়েল, তবু...

পৃথুরও পথ চলা শেষ হলো। সব পথই শেষ হয় একসময়। সুরম্য পথ, অগম্য পথ, ফুল-ফোটা, প্রজাপতি-ওড়া পথ ; এমন কি কুচ্কাওয়াজের পথও। বাইরে আলো ফুটল। কী আশ্চর্য সীন্ক্রোনাইজেশান। কী মিক্সিং ! ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র, সৌমেন্দ্যু রায়রাও লজ্জা পাবেন। একেবারে পারফেক্ট। বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে, ভাঁটি-দেওয়া সাগরের ঢেউ যেমন অবলীলায় [illegible] তটে গিয়ে মেশে, গুটিয়ে-নেওয়া-পা বুকে করে যেমন অনবধানে জল ছেড়ে উড়ে যায় সাইবেরীয়ান্ রাজহাঁস, ঠিক তেমনি করে পৃথিবী ছেড়ে উড়ে গেল রাত ; দিন এল, শীতার্তকে উষ্ণতায় ভবে দিতে।

পৃথিবী অথবা সূর্য এদের কারোই আগে পরের কোনো ব্যাপারই নেই। একজনের সঙ্গে অন্যজন কেমন অণুতে অণুতে পরমাণুতে পরমাণুতে মিশে গেল ! বোঝা পর্যন্ত গেল না। একজনের জন্যে অন্যজন দাঁত-কিড়মিড় বিরক্তিতে অপেক্ষা করল না

সব আরম্ভই বোধ হয় শেষে পৌঁছে আবার আরম্ভেই ফিরে যায়। এবং আরম্ভে পৌঁছে আবারও শেষে !

রুষা বাথরুমে গেল। লাইট জ্বলল। জলেব শব্দ হল। ফ্লাশ টানার শব্দ। পৃথু পাশ ফিরে ঘুমোল, কোলবালিশটা টেনে নিয়ে। আরও একটা ঘটনাবিহীন, ম্লান, উদ্দেশ্যহীন দিন যাপনের জন্যে সকালে জেগে উঠবে বলে।



আনন্দম্। আনন্দম্। আনন্দম্ ....

পৃথুর ঘুম ভেঙে গেল। শীতের সোহাগী রোদ, পেয়ারা গাছের ডাল পাতা পিছলে বিছানাতে এসে কম্বলের উপর হলুদ-রঙা বেড়ালছানার মতো নরম থাবা মেলে গুটিসুটি হয়ে বসেছে। এখনও নেশাটা ওকে পুরোপুরি ছাড়েনি। সিদ্ধির এবং বিজলীর নেশা।

একটি অচেনা মেয়ে এসে চা দিয়ে গেল। সাধারণত খাবার ঘরে ছাড়া কোথাওই খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করে না রুষা। খুব কড়া শাসন। ওর কাছে নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সত্যিই শেখার আছে। কিন্তু সব নিয়মের পেছনেই কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য থাকেই। সেই কথাটাই রুষা কখনও বুঝে দেখার চেষ্টা করেনি। বোঝেনি যে, মানুষের মন ও মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্পর্ক মানুষের বানানো সব নিয়মের চেয়েই বড়। ওর সমস্ত জীবনীশক্তি বেচারী নিয়ম মানতে এবং মানাতেই নিঃশেষ করে ফেলছে। অথচ একটি জীবন নিয়ে একজন মানুষ, রুষার মতো অশেষ গুণসম্পন্ন ও রূপবতী মানুষ কত কীই-ই না করতে পারত।

৺এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই মেরী। আদিবাসী ক্রীস্টান। বাড়িতে পুরুষ চাকর আছে এবং পৃথুর মতো দুশ্চরিত্র মনিব আছে বলে বাড়িতে আয়া রাখার ঘোরতর বিপক্ষে ছিল রুষা। পৃথুর অক্ষমতা, অথবা নির্বিষতা সম্বন্ধে ও নিঃসন্দেহ হয়েছে কি এতদিনে ?

মেরী ঘরে ঢুকেই বলল, গুড মর্নিং স্যার।

চমকে গেল পৃথু। আদব কায়দা জানে। সাহেবেরা যে অনেকদিন আগে এদেশ ছেড়ে চলে গেছে একথাটা রুষারই মতো এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই মানে না! মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকাল ও। বেশ। তার মুখের মধ্যে এক ঢলঢলে সুখ আর জীবন সম্বন্ধে প্রচণ্ড আগ্রহ ঝল্‌মল্‌ করছে। তবে রুষা, খুব সম্ভব ইন্টারভ্যু নিয়েই শহরের সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েটিকেই নিয়োগ করেছে। রুষার চোখে হয়ত ওর বাইরের আপাত সৌন্দর্যহীনতাটাই চোখে পড়েছে, মেরীর ভেতরের গভীর পবিত্র সৌন্দর্যটা নজরেই আসেনি।

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে চা খাচ্ছে পৃথু এমন সময় মেরী আবার ঘরে এসে বলল, গিরিশবাবু বলে একজন সাহেব এসেছেন।

গিরিশদার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো সাহেবেরই বিন্দুমাত্র মিল নেই। তাই-ই কথাটা শুনে পৃথুর হাসি পেল। মেরীকে বলা দরকার যে, সাহেব আর বাবুকে একসঙ্গে মেশালে গুরুচণ্ডালি দোষ হয়।

পৃথু বলল, কি চাইছেন, মানে, বলছেন গিরিশবাবু ?

আপনাকেই।

এত্তো সকালে!

অবশ্য এ পৃথুরই কৃতকর্মের ফল। যৌবনের মূর্খামি যখন তুঙ্গে তখন কবিযশপ্রার্থী গিরিশদার একখানি কবিতার বই ছাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পৃথু। খরচ অবশ্য তিনিই দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তিনি এই হতভাগ্য পৃথুকেই বেছে নিয়েছেন তাঁর কাব্যপ্রতিভার কষ্টিপাথর হিসেবে।

এত সকালে গিরিশদার আসার একটাই মানে হতে পারে। কাল গভীর রাতে অথবা ঊষাকালে তিনি একটি কবিতার জন্ম দিয়েছেন। হাঁস-মুরগীর ডিম সদ্য-গর্ভ-নির্গত অবস্থায় যেমন নরম ও গরম থাকে, গিরিশদার কবিতাও এখন সেরকম। টেপাটেপি করা যেতে পারে। সুবিবেচনা অথবা আত্মসমালোচনার হাওয়া লেগে তা শক্ত হয়ে যাবার আগেই তিনি তা দায়িত্ববান এবং প্রতিভাবান পৃথুর হেফাজতে দিয়ে দিতে চান।

কিন্তু এই অসময়ে বসাবেই বা কোথায় তাঁকে। পৃথুদের এখানে পৃথুর কাছে-আসা লোকজনের বড়ই দুর্দশা। এমনিতে ত' কেউই আসে না। গিরিশদার মতো দু'একজন আত্মসম্মানহীন অবিবেচক মানুষ শান্তিপ্রিয় পৃথুকে সাংঘাতিক বিপদে ফেলার জন্যেই এমন না-বলে কয়ে তবুও মাঝে-মধ্যে এসে পড়েন। কাব্যর কামড়, বড় কামড়। রুষা ত' এক্ষুনি চান করে, শায়া আর ব্রা পরে, শাড়িটিকে বুকের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে বাথরুম থেকে বেরুবে। দিনের এই সময়টাই তার ক্ষিপ্ত মেজাজ ক্ষিপ্ততার চুড়োয় থাকে।

বসবার ঘরেও রুষা এবং ছেলেমেয়েদেরই একচেটে অধিকার। আজ ত' আবার ছুটির দিন। রুষা এবং মিলি টুসুরও ছোট বড় বন্ধু-বান্ধবীরা আসবে। গান-বাজনা, সিনেমার আলোচনা হবে। কাম্পাকোলা, মিল্কশেক খাওয়া হবে। অ্যাটেনবোরোর 'গান্ধী', কুরোসোওয়ার 'কাগেমুশা', ফোর্থ জেনারেশান রায়ের 'ফটিকচাঁদ', এবং সত্যজিৎ রায়-এর 'পিকু' নিয়েও আলোচনা হবে।

পৃথুর মনে হয়, এখনকার ছেলেমেয়েরা পৃথুদের তুলনায় অনেকই বেশি বুদ্ধিমান। তাদের কোনো জেস্টেশান পিরিয়ডও নেই। অনেক অল্প সময়ে, অনেক বেশি কিছু করার ক্ষমতা এবং আইকিউ নিয়েই তারা জন্মায়। পৃথু ওদের সামনে এলেই, কেমন হীনমন্য বোধ করে। ওদের অ্যাডমায়ারও করে। পৃথু ভাবে, হয়ত পৃথুরাও ওদের বয়সে ঠিক এমনিই ভাবত এক ধাপ এগিয়ে। পৃথুর বাবাদের প্রজন্মর তুলনায় ওরা অনেক বেশি সপ্রতিভ ছিল।

মিলি টুসুরা এখন উঠছে ; আর পৃথুরা নামছে। ওরাও একসময়ে নামবে, যখন ওদের পরের

প্রজন্ম উঠবে। এ এক নাগরদোলা।

গিরিশদাকে বসার ঘরে বসানোর মতো দুঃসাহস না দেখিয়ে বাড়ির লাগোয়া ফাঁকা জায়গাটুকুতে নিয়ে গিয়ে চেয়ার পেতে তাঁকে বসাতে বলল পৃথু ; মেরীকে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নিয়েই গেল ও। গাছতলায় মিষ্টি রোদ। হাওয়াটা ছাড়বে বেলা বাড়লেই। মুচুর্ মুচুর্, কুচুর কুচুর আওয়াজ করে শুকনো পাতাদের ডাবল-আপ্ করিয়ে নিয়ে তাদের পেছন পেছন ছুটে যাবে নিজেও।

মেরী চা নিয়ে এল। ভিতর থেকে গজ্‌গজ্ কানে আসছে। রুষা অসময়ে অবাঞ্ছিত অতিথি আসাতে ক্ষিপ্ত। রুষার সুসময় কখন হবে জানা নেই। খুব সম্ভব পৃথুর জীবৎকালে হবে না। মেরীর উপরও সে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল, অর্ডার ছাড়া আগন্তুককে চা খাওয়ানোর বাড়াবাড়িতে। মেয়েটার চাকরীটাই গেল বলে। পৃথুদের এ বাড়িতে কাজের লোকজন চড়ুই পাখিরই মতো যাওয়া-আসা করে। আসে আর যায়, যায় আর আসে। একটা ট্রানজিট সেন্টার। আগ্নেয়গিরির উপর বেশিদিন কেই-ই বা বসে থাকতে চায় ? চাইলেও পারে না। একমাত্র দুখীটাই রয়ে গেছে। অনেক বছর হল। ছেলেটার বোধহয় মায়াও পড়ে গেছে। বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গেছে। অগ্ন্যুৎপাত ভালবাসে। ওর মা-বাবা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলেই ওর নাম রেখেছিলো দুখী।

গিরিশদা রিটায়ার করেছেন ভাল পেনশান এবং গ্র্যাচুইটি নিয়ে। পৈতৃক অবস্থা অত্যন্তই স্বচ্ছল ছিল। ওঁর বাবা জবলপুরের এক বিখ্যাত বাঙালী ছিলেন। আগে নিজেও থাকতেন জবলপুরেই। ওঁর বাবার বাগানবাড়ি ছিল একটা, হাটচান্দ্রাতে। বাড়িটার প্ল্যান খুবই সুন্দর। 'স্কটিশ কটেজ'-এর মতো। গিরিশদাকে প্রায়ই বলতে শোনে কথাটা। 'স্কটিশ কটেজ'টাকেই মেরামত করে, রঙ ফিরিয়ে আস্তানা গেড়েছেন বরাবরের মতো এখানে এসে এখন। নানারকম উদ্ভট উদ্ভট শখ আছে গিরিশদার। স্বচ্ছল ব্যাচেলরদের শখটাই বোধহয় বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়। সেই বাতিকগ্রস্ততা উত্তরোত্তর বাড়ছেই। অনেক বাতিকের মধ্যে একটি কবিতা লেখা। পড়াশোনাও কিন্তু করেন নানা বিষয়ের উপর। ওঁর লাইব্রেরীটিও বেশ ভাল।

গিরিশদা চায়ে এক চুমুক দিয়েই পকেট থেকে ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করলেন।

একটা লিখেছি। কাল মাঝরাতে ব্রেইনওয়েভ্ এল। রাত জেগেই লিখে ফেললাম। এটাকে কি 'সীমান্ত'র দপ্তরে পাঠাবে ? এক্ষুণি কি পাঠানো দরকার ?

শোনো, গিরিশদা। এখন প্রথমেই তোমার যা দরকার, তা হল ঘুম। 'সীমান্ত' শব্দটাই খুব সেনসিটিভ। এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত অত তড়িঘড়ি নিতে নেই।

পৃথু আন্তরিকতার সঙ্গে বলল। কাল রাতের বিজলী অথবা কুর্চি, এবং সিদ্ধি এবং রুষার সঙ্গে শরীরী প্রেম পৃথুকে বেশ হালকা মেজাজে ঠেলে দিয়েছে। এমন মেজাজে সে বহুদিন আবিষ্কার করেনি নিজেকে।

তার মানে ? পাঠাবো না, বলছ ?

ক্ষেপে উঠেছ যখন, তখন পাঠিয়েই দাও। তবে, কপি রেখে পাঠিও। এটা ক'নম্বর হবে ?

একশ সাঁইত্রিশ।

'সীমান্ত'তেই ?

হ্যাঁ।

রবার্ট ব্রুসও তোমার কাছে কিছুই নয়। তোমার হবে। ব্যোপ্‌দেব-এর হয়েছিল যখন তখন তোমারও নিশ্চয়ই হবে। সম্পাদকদের নানারকম ব্যাপার থাকে। ক্লিশে। পেটোয়া—পোষণ। বোঝোই ত'।

বুঝি আর না। হাড়ে হাড়ে বুঝি। কিন্তু তুমি একবারটি শুনবে না ? পৃথু ?

আমি কি সম্পাদক ? তাঁদের পছন্দটাই শেষ কথা। বনেবনে মুক্ত ছড়াতে যাবে কেন ? ভাল কথা। তোমার বাঁদরটা কেমন আছে বল।

ও ! সুখময়ের কথা বলছ ? ওকে এমন করে বাঁদর বাঁদর করে হেনস্থা কোরো না। চেহারাতে বাঁদর হলেই বাঁদর সবসময় বাঁদর হয় না। ওর চেয়ে বাঁদরতর অনেক মানুষ এই হাটচান্দ্রাতেই

আছে। আমাদের দুজনেরই চেনাজানা।

পৃথু মনে মনে বলল, হাটচান্দ্রাতে শুধু বাঁদর নয়, শুয়োরও আছে।

তারপর বলল, সরী, গিরিশদা, বাঁদর বলা ঠিক হয়নি। সুখময়।

হ্যাঁ, সুখময়।

সুখময়কে এক শনিবারের লাড়ুয়ার হাটে আদিবাসীদের কাছ থেকে কিনেছিলেন গিরিশদা। বাচ্চাবস্থায়। সে রীতিমত ষণ্ডাগুণ্ডা হয়ে উঠেছিল ইদানীং। গিরিশদার ভাষায়, 'আ প্রেজেন্ট হীম্যান'।

গিরিশদা বললেন, কদিন আগে বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছি ওকে, আমার সুখময়-এর কোনো সুখই যাতে ব্যাহত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে।

সেকি ? তোমার কাছে কি ও অসুখে ছিল ? এত ভালোবাসার সুখময় তোমার, এত খরচ করে এই ত' সেদিনই শীতের পোশাক বানালে। সিল্কের ওয়ার-দেওয়া লেপ, তোষক, সব ...

তা ঠিক। তবে একটা ঘটনা ঘটেছিল।

কি ?

মাসখানেক হল একটি সুন্দরী বাঁদরী আসছিল আমার বাগানে। সুখময়ের কাছেই এসে বসত। সুখময়ের মাথার উকুন বেছে দিত। নানারকম খেলা খেলত। দুজনে মিলে। অভব্য খেলাও কিছু।টি ছিল। সেই বাঁদরীটিকেও আমি আদর করে খাওয়াতাম, সুখময়েবই সঙ্গে। একদিন, বুঝলে পৃথু ;ঃর হঠাৎই লক্ষ করলাম...এবং লক্ষ কবেই...

গিরিশদা চুপ করে গেলেন।

পৃথু বলল, কি হল ?

না, লক্ষ করেই সুখময়ের তুলনায় দারুণই ছোট মনে হল নিজেকে। দারুণ ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স এল একটা।

লক্ষ্যটা কি করলেন ?

সুখময়ের প্রেমে পড়েছে মেয়েটি।

কি করে জানলেন ? সারাজীবনে একজনও মানুষীর প্রেম চিনে উঠতে পারলেন না আপনি, নিঃশব্দ চরণে কত প্রেম এসে চলে গেল ; আর আপনি চিনলেন বাঁদরীর প্রেম।

ছিঃ। প্রেম কি চাপা থাকে পৃথু ? সে মানুষীর প্রেমই হোক কী বাঁদরীর প্রেমই হোক। যদিও অনেকদিন হল সুখময়ই ছিল আমার বন্ধু, সখা ; তবু তার নিজের পরিপূর্ণতার জন্যে তাকে মুক্তি না দিয়ে পারলাম না। পরিপ্লুত হতে বাঁদরেরও ত' ইচ্ছে করতে পারে। আফটার অল, আমাদেরই পূর্বপুরুষ। তবে, প্রেমটা অবশ্য খাঁটি না মেকি, তা পরখ করে নিয়েছিলাম বিয়ে দেওয়ার আগে। বাঁদরীও ত' মানুষীর মতোই ফোরটুয়েন্টী হতে পারে।

তা ত' পারেই। কিন্তু পরখ করে নিয়েছিলেন মানে ? পরখটা করলেন কি করে ?

শোনোই না। পাঁউরুটি আর কলার মধ্যে ভাই একদিন একেবারে একডজন ব্রুকলাক্স গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

তুমি কখনও খেয়েছ ?

হ্যাঁ। সে ত পারগেটিভ্ নয়, একেবারে মলটভ ককটেল।

হ্যাঁ। সে কী করুণ অবস্থা ভাই ! বেচারী বাঁদর মেয়েটি, থুড়ি, মেয়ে বাঁদরটি, একবার এ-ডালে একবার ও-ডালে। তারপর বিকেলের দিকে দেখি, একেবারেই ঝিমিয়ে পড়ল। ভাবলাম, এবারে হাতকড়াই পড়ল বুঝি নারীহত্যার দায়ে। সত্যিই ভয় হল মরেই যাবে। মরো মরো হলো, কিন্তু মরলো না। মেয়েমানুষের জান, কইমাছেরই মতো। আর আমার সুখময়ের—তার গার্লফ্রেণ্ডের ঐ অবস্থা দেখে সে কী কান্না। গালে হাত দিয়েই বসে রইল সারাটা দিন। খেলে না কিছুই। পরদিন আমি বাঁদরের গড় আয়ুর সঙ্গে মানুষের গড় আয়ুর একটা কমপ্যারেটিভ স্টাডি করে, হিসাব করে দেখলাম যে পঁচিশ বছরের যৌবনের একটি মানুষ আর আমার সুখময়ের বর্তমান বয়স একই।

পাচশ বছরের গিরিশ বোসের কামনা-বাসনা, প্রেমের তীব্রতার কথা ভেবে সুখময়ের কারণে অসহ্য কষ্ট এবং পাপবোধ হল আমার।

জানো পৃথু আমার নাগপুরের পিসী বলতেন, গিরো, বাবা কারো ভালো করতে পারলে করিস, খারাপ করিসনি কারোই। তাই-ই দুকাঁদি মর্তমান কলা মুনেশ্বরকে দিয়ে লাড়ুয়াহাট থেকে আনিয়ে ওদের গত মাসের আঠারো তারিখে বিয়ে দিয়ে দিলাম। পাঁজিও দেখেছিলাম। দিনক্ষণ ভালোই ছিল। মুনেশ্বর উলু দিল। সেটাই একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার হল। সিদ্ধিখোর কুস্তীগীরের গলা দিয়ে কি আর বঙ্গললনার উলু বেরোয়?

পৃথু বলল, মন খারাপ লাগে না? সুখময়কে ছেড়ে?

আমার আবার মন তার আবার খারাপ-ভাল। কতকিছুই ত ছেড়ে আছি। সে সব কিছু নয়। প্রত্যেক দিনই ত জোড়ে একবার করে এসে দেখা দিয়ে যায়। ছেলেমেয়ে থাকলে ভায়া, তারা যা করত, আমার সুখময়ও তাই-ই করছে।

বাঁদর বলেই করছে গিরিশদা। মানুষের ছেলেমেয়ে হলে হয়ত মাসের মধ্যে একবারও আসত না।

তা যা বলেছ ভায়া। মানুষের মত খচ্চর জানোয়ার বিধাতা আর দুটি গড়েননি। আমার অভিজ্ঞতায় লোকেদের যদি চোখ খুলত, তাহলে সকলকেই বলতাম; পুষ্যি নিলে মানুষের ছানা নিও না, বাঁদরের ছানা কুকুরের ছানা নাও।

গিরিশদা চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলেন ঘাসের ওপর। পৃথুর চোখে দুচোখ রেখে বললেন, শুনবে না কবিতাটা? খুবই সময়াভাব?

আমি ত' এখন ছুটিতে? বেকার। সময়ের কোনোই অভাব নেই। কিন্তু···

ঠিক সেই সময়ই মেরী এসে বলল,

মেমসাহেব ডাকছেন আপনাকে। আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

গিরিশদা বললেন, দাঁড়াও মেয়ে। দাঁড়াও। সব গোলমাল করে দিলে। অত হড়বড় করে কথা বলো কেন? ভোপালের বাস কি ছেড়ে যাচ্ছে?

তারপরই পৃথুর দিকে ফিরে বললেন, তোমার বাড়িতে কে এল? কার কথা বলছে এ মেমসাহেবটি কে পৃথু?

মুখ নামিয়ে নিলো পৃথু।

পৃথুকে দেখিয়ে মেরী বলল, সাহেবের মেমসাহেব।

অঃ। গিরিশদাই লজ্জিত হলেন। আবারও বললেন, অঃ।

পৃথু প্রসঙ্গ বদলে, বলল, আমিই না-হয় কাল পরশু আপনার কাছে যাবো। বিকেলের দিকে। কবিতাটিও শুনে আসব। কি নাম দিলেন নতুন কবিতার?

হাত।

হাত!

বাঃ। কোন্ হাত? ডান, না বাঁ?

উল্লেখ করিনি স্পেসিফিক্যালী। তবে, আসলে বাঁ-ই-ই। এখন ত' বাঁ-এরই যুগ। ডান হাতে এখন কবিতা লেখার মত অপকর্ম ছাড়া আর প্রায় কোনো কর্মই হয় না। যদি আসো তুমি, পৃথু, তবে ভায়া, বিকেল বিকেলই এসো। তারপর রাতে আমার সঙ্গে দুপাত্তর রাম চড়িয়ে, মুনেশ্বরের রাঁধা সুজির খিচুড়িও খেয়ে আসবে। সুখময়রাও প্রায় রোজই বিকেল বিকেলই আসে। চারটে নাগাদ। সুখময়ের স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেবো। ভারী ওয়েল বিহেভড় মেয়ে। ওর জন্যেও একটি লাল শাটিনের শাড়ি বানাতে দিয়েছি বসির দর্জিকে। এবং ব্লাউজও। আজই দেবে বলেছে বিকেলে।

সে কি! একি নাচানাচি করার গলায় দড়ি-বাঁধা বাঁদরী নাকি? জেনুইন্ বর্ন-ফ্রী বাঁদরী। দড়াম্ দড়াম্ করে আছাড় খাবে যে!

খাবে না রে বাবা, খাবে না। মানুষের ছেলেমেয়েরা ছ' ইঞ্চি উঁচু হীলওয়ালা জুতো পরে নাচানাচি করতে গিয়েও যখন আছাড় খায় না, তখন ও-ও শাড়ি পরে খাবে না।

কিন্তু ওসব ওকে পরাবে কে ? আপনি ? সে ত' আর সুখময়ের মতো পোষ মানেনি। সে ত' জঙ্গলের বাঁদরী। তাছাড়া, আপনাকে ও ত লজ্জাও…

আহা ! সে সুখময়ই পরাবে ! লজ্জাহরণ করতে পাবল, আর এটুকু করতে পারবে না ? ওসব মাইনর প্রবলেম। মেজর প্রবলেম হচ্ছে ওই কবিতাটা। তুমি যতক্ষণ না আসছ, আমি কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছি না। যাই, গিয়েই কপি করে ফেলি। একটা কপি "সীমান্ত"তে পাঠাব, আর অন্যটা ভাবছি, ভোপালের "অশনি"তে পাঠিয়ে দেব। তুমি কি বল ?

পৃথু উঠে দাঁড়িয়ে নিজের চেয়ার ঠেলে দিলো পিছনে। নইলে গিরিশদা যেতে যেতেও আবও আধঘণ্টা কথা বলবেন। বিয়ে না-কবা পুরুষমানুষের এত উদবৃত্ত জীবনীশক্তি থাকে যে, তাদের ট্যাকল্ করা বড়ই মুশকিল হয়ে ওঠে।

আমি উঠি।

এসো তাহলে ভায়া। কাল তাহলে এ কথাই বইল। সুজির খিচুড়ি।

বেশ। যাব। পৃথু বলল।

গিরিশদা ম্যাজেন্টাবড়া বোগোনভোলিয়ার আর্চটি পেরিয়ে লাল পাতিয়ার ঝাড়ের পাশ দিয়ে গেট খুলে বাইবে বেরোলেন। গেটটা বন্ধ করে দিলেন। একটা অশ্লীল শব্দ করে বন্ধ হল গেটটা ওঁব হাতেব ঠেলাতে।

ভুচুর গ্যারাজ থেকে চেয়ে এনে পোড়া মবিল দিতে হবে দরজার কব্জাতে। রোজই ভুলে যায়। রুষা অনেকবার বলেছিল।

কপালে আছে…

চান করতে করতেই পৃথুর হঠাৎই শুয়োবটার কথা মনে পড়ল। মাথায় গরম জল পড়তেই বোধ হয়, সিদ্ধিতে উধাও বুদ্ধিটা ফিরে এল। নেশা কেটে যেতে লাগল দ্রুত। কুয়াশার মতো এবং ও হঠাৎই বুঝতে পারলো যে শুয়োরটা শুয়োর নয়। বিনোদ ইদুরকার্। ন্যাশনাল হাইওয়ে রিপেয়ার করার ব্যবসাতে বহু পয়সা কামিয়েছে। ঠিকাদারী করে ও। আরও নানারকম ব্যবসা আছে। দুটি নতুন ইণ্ডাস্ট্রী খুলবে ভাবছে। ব্যাঙ্ক থেকে নানা অছিলায় মোটা মোটা লোন নিয়ে সাবড়ে দিয়েছে। ব্যাঙ্কমারা মোচ্ছবে অনেক লোকের মতো ভিনোদও সামিল হয়েছে।

সমিতির সমস্ত অনুষ্ঠানেই অনেক টাকাব অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট জোগাড় করে দেয় সে। প্রায়ই বম্বে থেকে রুষাকে নানারকম 'ফোরেন গুডস্' এনে দেয়। জাগতিক সবকিছুর প্রতিই রুষার যে এক গভীব অদম্য লোভ আছে, তার অনেকটাই পূরণ করে ইদুর্কার।

বিনোদ ইদুর্কার যে শুধু রুষার সুন্দর বাঁধনের শরীরটার প্রতিই অনুরক্ত তাই-ই নয়। রুষার মাধ্যমে ও ডি· সি পি· ডাব্লু· ডি ও সি· পি· ডাব্লু· ডি-র ইঞ্জিনিয়র ইত্যাদির সঙ্গেও পরিচিত হয়ে ও ব্যবসার নানারকম মুনাফা ওঠায়।

এতক্ষণে দুয়ে দুয়ে চার মিলল। অঙ্ক মিলে গেল। জীবনে এই প্রথমবার, কোনো অঙ্ক মি যাওয়াতে দুঃখিত হলো পৃথু।

একথা ও জানে যে, জীবনে প্রত্যেক মানুষকেই কোনো না কোনো পরীক্ষাতে হারতেই হয়, অন্য প্রতিযোগীর কাছে। সব পরীক্ষা শুধু যোগ্যতা দিয়েই পাশ করা যায় না। আজকাল হয়ত খুব কম পরীক্ষাই যায়। যোগ্যতা চেষ্টা, এসবেব বাইরেও একটা ফ্যাক্টর্ থাকে। হয়ত বা একাধিকও। সব পবীক্ষাতেই জিতব বলে যে মানুষ পণ করে আসে এখানে সেই বোকা-জেদীর কপালে অনেকই দুঃখ। জানে পৃথু। তবু হারতে কারই বা না দুঃখ হয় ! পৃথুরমতো সামান্য চাহিদার মানুষেরও বড় লাগে। যে হেরে যায়, তার পক্ষে হারটা স্বীকার না করেও উপায় থাকে না। তবু…

রুষার ন্যায় অন্যায় বোধ তারই। কিন্তু তবু রুষার কি ন্যায় হল এটা ? পৃথুর নিজের কথা না-হয়

ছেড়েই দিল। কিন্তু মিল আর টুসু! ও ত একটা ল্যাজে-গোবরে, ন্যালাখ্যাবা কবিতা লেখা অপদার্থ পুরুষমানুষ। ওকে নিয়ে রুষা যে সুখী হতে পারেনি, এ কথাটা না বোঝারমতোবোকা সে নয়। বিয়ে করেছিল পৃথু, ভোপালের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাহেবীভাবাপন্ন শিক্ষিত, মিষ্টি, সুন্দরী একটি মেয়েকে। সেই রুষা আর নেই। অনেকই বদলে গেছে সে এখন। বদলানোই ত' স্বাভাবিক। মানুষ নিজেকে ক্রমাগত না বদলালে সভ্যতা ত' থেমে থাকত। কোনোদিনও বদলকে ভয় পায়নি পৃথু।

রুষার বাবা সেন্ট্রাল প্রভিন্স সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। প্রকৃত শিক্ষিত চমৎকার মানুষ। বাবা এবং মাকেও হারিয়েছিল রুষা অল্পবয়সে। রুষার এক মাসীর কাছে সে মানুষ। মাসতুতো ছোটভাই দেবাশিস ও শুভাশিসকে বলতে গেলে, পৃথুই মানুষ করে। ওর সীমিত সাধ্যের মধ্যেও। দেবাশিস এখন এঞ্জিনিয়ার। মিলিটারী এঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস-এ আছে। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট। জবলপুরে পোস্টেড। শুভাশিস কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সী এবারেই পাশ করে দিল্লীতে চাকরী করছে এখন। রুষার নিজের জন্যে না হলেও, তার মাসীর পরিবারের জন্যে পৃথু আজ অবধি যা করেছে সে কারণেও কিছুটা কৃতজ্ঞতা আশা করেছিল রুষার কাছ থেকে। কৃতজ্ঞতাবোধ ব্যাপারটাও বোধহয় আজকের পৃথিবীতে অব্‌সলিট হয়ে গেছে। টাইম-বাররড্। রুষার প্রকৃতির মধ্যে যতটুকু খারাপত্ব, তা তার মা-বাবার কাছ থেকে বোধহয় পাওয়া নয়, তার মাসীর কাছ থেকেই পাওয়া। ভোপালের বাঙালীরা তাকে "অ্যাংলো" বলে ডাকতেন। পৃথুর জ্যাঠামশাইও ছিলেন একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ। বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর, বাঘের হাতে, পৃথু বিদেশ থেকে ফেরার পর উনিই এই সম্বন্ধ করে বিয়েটা দেন। মা তখন বেঁচেছিলেন, কিন্তু মার মতামতের দাম ছিল না কোনো। পৃথুর পছন্দ ছিল নিমুকাকার মেয়ে কুর্চিকে। তারা গরীব এবং পরিচয়হীন বলে সে বিয়ের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশায়।

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়ালো পৃথু। চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করতে লাগল। বাথরুমের আয়না আর জন্মদাত্রী মা ছাড়া আপন বলতে সংসারে মানুষের বোধ হয় আর কেউই থাকে না থাকারমতো। এই রকম কোনো কথা একটা বাংলা উপন্যাসে যেন পৃথু পড়েছিল। নাম মনে করতে পারছে না উপন্যাসটার।

পৃথু ভাবছিল, প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যু অবধি, বোধ হয় গাছেরইমতোবাড়ে, মনে মনে। কেউ সটান ঋজু শিমূল হয়ে আকাশ ছুঁতে চায়। তার ঋজুতা দিয়ে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কেউ বিনয় এবং নম্রতাতে লজ্জাবতী লতা হয়েই থাকে। কেউ আশশ্যাওড়া হয়। কেউ নিম; নিজে তেতো থেকেই পরের ভাল করে। কেউ কাঁটা গাছ। কেউ ধুত্‌রো। কেউ বা আফিম হয়ে নেশা জোগায় অন্যদের। কেউ "হেল"-এর ঝাড়। বিষ বয়ে বেড়ায় বুকে করে। বিষাক্ত করে সারা পৃথিবীকে। বিশল্যকরণীও বোধহয় কেউ কেউ। কে জানে? কেউ আবার বা ম্যাংগ্রোভ জঙ্গলের গাছ-গাছালিরমতোশিকড় ছড়াতে থাকে বিস্তারে যে-জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তারই গভীরে। প্রত্যেক মানুষেব এই বিচিত্র বিভিন্নমুখী অগ্রগতি, বা উচ্চতার বিভিন্নতা; তার নিজের মানসিকতা, শিক্ষা, পরিবেশ, সঙ্গী-সাথী-রুচি এই সমস্তকিছুর উপরই নির্ভর করে। য-কোনো কারণেই হোক, পৃথু আর রুষার এই উন্নতির রকমটাতে পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। কিছুটা অবধানে, এবং কিছুটা অনবধানে। তাই-ই বোধহয় এরকম হল। হয়ে গেল। ইসস্ সত্যিই কি? রুষা কি সত্যিই...

পৃথু দাড়ি কামাবে বলে মুখে সাবান লাগাচ্ছিল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, বাথরুমের টুলটার উপরে বসে পড়ে। পায়ে যেন হঠাৎই জোর কমে গেল। জন্মাবধি অনেকই দিন বয়েছে তার শরীরকে এই দুটি পা। ওরা ক্লান্ত। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। টুলটাতে বসেই পড়ল পৃথু। কল দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে বাথটাবে। ভর্তি হতে একটু দেরী। জল পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে এবং জল দেখতে দেখতে পৃথু ভাবছিল। জলের সঙ্গে জীবনের কেমন যেন মিল আছে। দৃশ্যত শূন্য: চোখের আড়ালে মাটির নিচে গিয়ে জমে।

চোখ কান খুলে রাখলেই কত কী শেখে মানুষ। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি প্রত্যেকটি মানুষই

শেখে। প্রতি মুহূর্ত। এই শিক্ষা মানে, কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নয় ; ভেতরের শিক্ষা। বাইরে থেকে আমরা কিছু নিই, আর বেশিটাই বোধ হয় নিই তৈরি করে, নিজেদেরই ভেতর থেকে। তাই প্রতিটি দম্পতি এক ঘরে, এক খাটে শুলেও, দুজনে মিলে অনেক ভালোবাসায় সন্তান আনলেও, বিবাহোত্তর জীবনে মানসিকতায় তারা যে একই ভাবে, একই দিকে, একই গড়নে বেড়ে উঠবে, এটা ভাবাই বোধ হয় বোকামি। এই বাড়ের নিশ্চয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা আছে। তফাৎ থাকে, পৃথু ভাবে ; এই কারণেই যে, ওরা মানুষ। মানুষ হয়ে জন্মেছে বলেই, মন আছে বলেই, মানুষকে এত সইতে হয়। তার যা সয়, তা অন্য কোনো প্রাণীরই সয় না। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সমান্তরালভাবে এগোতে থাকলেও জ্যামিতিক নিয়মেই দুটি সমান্তরাল রেখা কখনই একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় না। দূর দিগন্তে বা বহু বছরের সংসারের ঘোর পেরিয়ে আসার পর হয়ত একসময় মনে হতে থাকে যে রেখা দুটি মিলেছে : কিন্তু তখনও সেটা প্রকৃত মিলন নয় ;অপটিক্যাল্, ইল্যুশান। আসলে প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারীই একা। একা আসা এখানে, একা ফিরে যাওয়া।

দাড়িতে ক্ষুর লাগায় পৃথু। সেফ্‌টি রেজরও পুরোপুরি সেফ্ নয়। অ্যাবসল্যুট সেফ্‌টি বলে কোনো কথা নেই। গালের অনেকগুলো জায়গা কেটে যায়। জীবনেরও যেমন কাটে। রক্তক্ষরণ হয়ই মাঝে মধ্যে। পৃথু বুঝতে পারে যে, ও বোধহয় এখন প্রকৃতিস্থ নেই। কিন্তু খুব আশ্চর্যও হয় এই-ই ভেবে যে, এখনও ওর রাগ হচ্ছে না। ও যদি পুরুষ হত সত্যিকারের, তাহলে কি এতক্ষণে ইঁদুরকারকে খুন করাই উচিত ছিল না ?

গায়ে ভাল করে সাবান ঘষতে লাগল ও। ভাবল এই গ্লানি অথবা লজ্জা বা অপমান সবই সাবানের সুগন্ধি ফেনায় ধুয়ে ফেলবে ; রুষা যেমন করে সহজে ওর ভ্রষ্টতা ধোয়। শরীরে ত' লেগে থাকে না কিছুই। সবই ধুয়ে দেয় সাবান বা শাওয়ার ; যায় না শুধু মনেরই দাগ। জন্মদাগের মতোই তা মন কামড়ে থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। "আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক, আমাদের মিলিত জীবন ঈশ্বরের হোক" বললেই ত আর তা হয়ে যায় না। এই মন্ত্রোচ্চারণ একটা আদর্শকেই অনুধাবন করার অঙ্গীকার মাত্র। এই অঙ্গীকার প্রায়শই পূর্ণ হয় না। পূর্ণতার কাছাকাছি আসতে পারলেও অনেকখানি হত।

কিন্তু মিলি টুসু ? ওরাও ত একা। ছোটবেলায় একা হওয়াই ভাল। একাকিত্বতে অভ্যেস হয়ে যায়। পরনির্ভরতায় অভ্যেস হয়ে গেলে, দীর্ঘদিন পরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে বড় কষ্ট হয়। ওর যেমন হচ্ছে। আসলে, পৃথু ভাবছিল, কাউকেই সম্পূর্ণতায় পেতে চাওয়ার ভাবনাটাই হয়ত ভুল। একান্ত করে আজকের মানুষ কেউই কাউকে নিতে বা দিতে পারে না, নিজেদের টুকরো করে টুক্‌রো-টাকরাই ভেঙ্গে ভেঙ্গে বার্-চকোলেটের মতো তুলে দেয় বোধহয়, আমরা অপরের হাতে, পৃথু রুষার হাতে, টুসু বা মিলির হাতে, অফিসের বস্-এর হাতে, বন্ধুদেরও। সবাই-ই তাই-ই দেয়। টুক্‌রো-টাক্‌রাই। কথাটা, সম্পূর্ণ করে পাওয়ার নয়। তা ও বোঝে। কিন্তু রুষা তুমি দাম্পত্যর মতো একটা মান্‌ডেন্ মোটা-দাগের, জাগতিক, ব্যবসায়িক লেনদেন-এর মধ্যেও অসাধুতা এনে ফেললে। যতটুকু নিলে, তার মূল্যটুকু সমান করলে না বিনিময়ে। এটা কিন্তু মানাল না তোমাকে।

পৃথুর ভাবনার জগৎ হঠাৎই ছিঁড়ে খুড়ে গেল। দরজায় ধাক্কা পড়ল দড়াম্ দড়াম্। এমন যে, মনে হল ভেঙ্গে যাবে।

রুষা চেঁচিয়ে উঠল।

তারপর গলা নামিয়ে বলল, টুসুর বন্ধু মিঃ মজুমদারের বাচ্চারা, জয় আর পিংকি এসেছে ডে-স্পেণ্ড করার জন্যে। বিকেলে এখান থেকেই একসঙ্গে আমাদের "শো"-এ যাবে। বাথরুম নোংরা করবে না। মেঝেতে জল ফেলবে না। বেসিনে যেন দাড়িকাটা সাবানের এক ফোঁটাও না পড়ে থাকে। শুনতে পাচ্ছো ? কি হল ? বেরোবে কী না বলো।

পৃথু বিড়বিড় করে বলল : শুয়োর।

কি ?

শুয়োর !

নিজেও পাগল হবে ; তুমি, আমাকেও পাগল করবে।

শুয়োব ! পৃথু আবার বলল।

ছোটবেলাতেও পৃথুরা বড়লোক ছিল, কিন্তু সাহেব ছিল না। যদিও ওর বাবা কাকাদের মধ্যে দুজন ইংল্যাণ্ডেই পড়াশুনো করেছিলেন হায়ার স্টাডিজ। বাংলা মিডিয়াম স্কুলেও পড়াশুনা শিখেছিল। তখনও সব ভারতীয়ই সাহেব হবার চেষ্টাতে উঠে পড়ে লাগেনি। যৌথ-পরিবারেই মানুষ হয়েছিল। প্রিভি ছিল, ওড়িশা টাইপের। এয়ার-কণ্ডিশনার ছিলো না। গীজার ছিল না। বাথ্‌টাব্ ছিল না। এমনকি বেসিনও ছিল না তাদের বাড়িতে। তখন এসব কিছুকে আবশ্যিক বলে মনে করত না অনেকেই। মেঝেতে জোড়াসনে বসে মহানন্দে খুড়তুতো, জ্যাঠ্‌তুতো এবং পিসতুতো ভাইদেরও সঙ্গেও বসে পঙক্তিভোজন করত পৃথু। কূয়ো বা চৌবাচ্চা থেকে ঝপাং ঝপাং করে জল তুলে, চান করত ওরা। হাপুস্-হুপুস্ শব্দ করে ডাল ভাত মেখে খেত। তাতে লজ্জাবোধের কোনো কারণই দেখেনি। মানুষের প্রকৃত শিক্ষা আর টেবল্ ম্যানার্স, পৃথুর চোখে কখনই সমার্থক ছিল না। পৃথু নিজেও ইংলণ্ডে ছিল দু বছর, কিন্তু তার চোখে তা "বিদেশই" ছিল। হাম্‌লে পড়ে ওদের সবকিছু নকল করার মধ্যে একরকমের হীনমন্যতা আছে বলেই মনে করত ও। আজও তাইই করে।

কিন্তু শুধু রুষা একাই নয়, রুষার ভয়ে এবং শাসনে ছেলেমেয়েরাও প্রোটোটাইপ হয়ে উঠেছে। ওরাও পৃথুকে জংলী, অমানুষ ভাবে। পান খাওয়াকে ওরা "প্রি-হিস্টরিক" "ঘাস্টলী হ্যাবিট" বলে। বলে, কোনো ভদ্রলোক পান খায় না। পান খেয়ে পানের পিক্ ফেললে বলে ঊ্য ডোণ্ট হ্যাভ এনী সিভিক সেন্স, বাবা।

বাথরুম যদিও এ যুগের পুরুষ ও নারীর একমাত্র স্যাংচুয়ারী ; তবু একসময় বাথরুমের দরজাও খুলতে হয়। কিন্তু খোলার আগে, পৃথু হাঁটু গেড়ে বসে, ভাল করে ঝ্যাঁটা দিয়ে বাথরুমটাকে পরিষ্কার করল। বেসিন পরিষ্কার করল ঝক্‌ঝক্ করে।

টুসুর চোখ তার মায়ের চোখের চেয়েও তীক্ষ্ণ। কোনোই সন্দেহ নেই, পৃথুর যে, তার মায়ের শিক্ষায়, হাটচান্দ্রার প্রিন্স্-অফ্-ওয়েলস্ টুসু ঘোষ, বড় হলে আর কিছু হোক আর নাইই হোক, একজন ফার্স্ট-রেট স্যানিটারী ইন্স্‌পেক্টর হবেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই খোলা হাওয়াতে, ওর বাড়ির স্বাভাবিকতাতে, ছেলেমেয়ের, রুষার গলার স্বরে, খাওয়ার ঘরের ছোটো-হাজ্‌রিব টেবল্ লাগানোর পরিচিত শব্দে ওর মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কী সব যা তা ভাবছিল এতক্ষণ ! মিলি-টুসু-রুষাকে নিয়ে তার কান্না-হাসির বিরাগ-অনুরাগের জড়ানো-মড়ানো সংসার। আঃ চমৎকার।

রুষা ? কোন্ দুঃখে ?

ইঁদুরকার ? ছিঃ ছিঃ ! নাঃ।

আর ঊ্য ক্রেইজী মিষ্টার পৃথু ঘোষ ? ফ্রেণ্ডস আর ফ্রেণ্ডস্। হি ইজ আ গুড ফ্রেণ্ড। দ্যাটস্ ওল্। মাথাটাই গেছে পৃথুর। যত্ত সব নেই ভাবনা।

ও প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে আর কখনও সিদ্ধি খাবে না। কাল রাতমোহনা থেকে ফেরার পর কি কি ঘটনা সত্যিই ঘটেছে, আর কি কি ঘটেছে কল্পনায় পৃথু তার কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছে না। যে কোনো ভদ্রলোকেরই, জর্দা-পানেরই মতো; সিদ্ধি খাওয়া একদম উচিত নয়। সিদ্ধির সিদ্ধিতে তার আদৌ প্রয়োজন নেই। ছেঃ।

জামাকাপড় পরে এসে পিছনের কপিক্ষেতে ও গেল একবার। ইন্‌ভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টএর মতো। সত্যিই ত ! শুয়োরে তছনছ করেছে কপিক্ষেত। সত্যিই কচকচ তচনচ। পিছনের বেড়াটাকেই ভেঙে ঢুকেছে। কী বিপদেই পড়া গেল ! সাবির মিঞার কাছে যেতে হবে কাল। নইলে, শামীমকেই বলতে হবে। এসে, মেরে দিয়ে যাবে শুয়োর। ওরা দুজনেই শুয়োর শিকার করে বটে, কিন্তু শুয়োরের মাংস খেলে হারাম হয় বলে খায় না। অনেক ওয়েপনস্-এর মধ্যে এখন পয়েন্ট থ্রী-টু পিস্তলটাকে রেখেছে। কোল্ট-এর। আর আছে পৃথুর মৃত বাবার উপহার দেওয়া একটি

ফোর ফিফটি ফোর হান্ড্রেড ডাবল ব্যারেল রাইফেল। কাস্টম বিলট। নানা কারুকার্য করা। জেফরী, নাম্বার টু। তবে দুটিই রাখা আছে অনন্ত বিশ্বাসের বন্দুকের দোকানে। জবলপুরে।

গৃহস্থবাড়িতে শুয়োরের এমন অবাধ যাতায়াত কোনোক্রমেই বরদাস্ত কবা যায় না। হেস্তনেস্ত করবে পৃথু। প্রয়োজন হলে, অনেক বছর পরে নিজেই রাইফেল ধরবে। মেরী এসে বলল, স্যার, ডিমের কি খাবেন?

স্ক্রাম্বল।

বলল পৃথু। মুখ বিকৃত করে।

কটা টোস্ট? স্যার?

দুটো।

স্যার এই। মনে মনে বলল।

প্রত্যেকদিনই সকালে নতুন করে রাগ হয় পৃথুর। এমন প্রাতঃকালীন রেজিমেণ্টেশন্ বোধহয় কোনো কম্যুনিস্ট দেশেও নেই! রোজই একই প্রশ্ন, যদিও প্রশ্নকর্তা বিভিন্ন।

১। কটা ডিম?

২। ডিমেব কি?

৩। কটা টোস্ট?

এখন আবার একটা করে মাল্‌টি-ভিটামিন ট্যাবলেটও খেতে হচ্ছে। রুষার অর্ডার। নতুন অত্যাচাব। মাল্‌টিভিটামিনস খেলেই, পৃথুর অম্বল হয়। পেট ঢাক হয়ে যায়। অতএব মাল্‌টি-ভিটামিনস-এর পরেই অম্বলের জন্যে দুটি গোলাপি রঙা জেলুসেল্ এম-পি-এস্। তারপর পথে বেরিয়ে দুটি জর্দা-পান মুখে পড়লেই ওর মনে হয়, প্রাণটা এবার খাঁচা-ছাড়া হবে। আবার জেলুসেল গোলাপি-রঙা এম্-পি-এস্। রোজই এই একই নিয়ম ; একই চক্র। দুটো ডিম, স্ক্র্যাম্বল, নয় ফ্রাই, নয় পোচ, নয় ওয়াটার-পোচ্। অথবা ওমলেট। যদিও ওমলেট ত চিকেন-ওমলেট, নয় চিজ ওমলেট, নয়, অ্যাসপারাগাস ওমলেট, অথবা ওমলেট উইথ হ্যাম এণ্ড বেকন্।

দুটো টোস্ট, হয় মাখন। নয়-মাখন নয়। ক্লোরোস্ট্রোল্। হ্যামও নয়, বেকনও নয়। ক্লোরোস্ট্রেল হয় জ্যাম্, নয় জেলী। জ্যাম জেলী নয় ; ব্লাডসুগার। নয় মাগাবীন, নয় মার্মালেড, বাটার নয় চিজ। তারপরই মাল্‌টিভিটামিনস্। তারপর? জেলুসেল। সার্টেনলি ইয়েস। তারপর? জর্দা পান ; ঘাস্টলী ; আন্‌সিভিলাইজড্। ক্যাডনট্ কেয়ারলেস! তারও পর প্রাণ যাবো যাবো ; খাবি খাবো-খাবো ভাব। আবার জেলুসেল। প্রতিদিনই সকালে।

দিন শুরু এইভাবেই। মিল্ক-কেক, ড্রিঙ্কিং চকোলেট, রুটি, ডিম, চা, কফি, পান। বিশ্বাস, সন্দেহ, ঈর্ষা, বৈরাগ্যর সী-স। এইই .... এই করেই পৃথুর বেঁচে থাকা। যার আরেক নাম অভ্যেস। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বললে, “অব্যেস”।

ইয়েস্।

ছেলেমেয়েরা স্কুলে। পৃথু, তার চিরাচরিত ইরেস্‌পন্‌সিবল্ ওয়েতে চরাবরা করতে বেরিয়েছে। যদি খাবার সময়ে ফেরে, তাহলে ভালই। নইলে, খাবে না। দেড়টা অবধি দেখতে বলা আছে সবাইকে।

দুখীটা কাজে আসে সেই কাক-ভোরে। মেরী ত এখানেই থাকে। দুপুরেও যদি কাজেব লোকজনকে একটু রেস্ট না দেওয়া যায় তাহলে তারা কাজ করবেই বা কেন? একটু খেতে পাওয়া, একটু ভাল ব্যবহার, একটু ভালোবাসা এই জন্যেই ত নিজেদের মা-বাবা ছেড়ে, বৌ ছেলেমেয়ে ছেড়ে মাসের পর মাস পড়ে থাকে।

এই অবস্থা, এই সিসটেম্ চলবে না বেশিদিন। মালাঞ্জখণ্ড-এ বিরাট কারখানা হয়েছে। মৌগাওতেও নানারকম ব্যবসা। এজিলারি, ইণ্ডাস্ট্রীজ গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রদেশ নিশ্চয়ই চিরদিনই কিছু বন-পাহাড় আর পৃথুর মতো ব্যর্থ কবিদের রোম্যাণ্টিসিজম-এর সাবজেক্ট হয়ে থাকবে না। নানারকম ইণ্ডাস্ট্রী বসছে চারদিকে, গভর্ণমেণ্ট সিরিয়াসলী চেষ্টা করছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল বিহার এবং,

আসাম থেকে নাকি অনেক ইণ্ডাস্ট্রীজ এখানে চলে আসছে। কলকারখানা গড়ে উঠলেই তখন বাড়িতে কাজ করার জন্যে একজনকেও আর পাওয়া যাবে না। স্বাভাবিক ! কে কাজ করবে, এত অল্প মাইনেতে সারা মাস ? না-ছুটি, না-বোনাস্, না প্রভিডেন্ট-ফাণ্ড, না অন্য-কোনো পার্কস্ ! রুষাদের জেনারেশনই শেষ জেনারেশন্ ; যারা লোকজন রাখার বিলাসিতা করে গেল।

লোকজন কি লাগে ওর নিজের জন্যে ? অদ্ভুত স্বভাব ওর স্বামী পৃথুর। ঘরের মধ্যে লেখার টেবলে বসে ছাই-ভস্ম কিছু হয়ত লিখছে, হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল। কি ব্যাপার ? না, টেবলরই এক কোণায় কালির শিশিটা আছে, নিজের হাতের নাগালের সামান্য বাইরে, সেটাকে কাবো তার হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হবে। অথবা পাখাটাকে, যদি গরমের দিন হয় ; তবে এক পয়েণ্ট বাড়াতে বা কমাতে হবে। যদি এয়ার-কণ্ডিশনার চলে, তবে হয়ত একসস্ট্এর নব্টা ঘোরাতে হবে। চেয়ারে বসলে, সেখান থেকে এক পা, এক চুলও নড়বে না। অদ্ভুত স্বভাব !

এমন জমিদারী মেজাজের মানুষের সঙ্গে ঘর করা চলে না, আর যাইই করা চলুক। রুষা শুনেছে যে, পৃথুর বাবা-জ্যাঠামশাইরা আগেকার দিনেব পা-তোলা ইজীচেয়ারে বসে গড়াগড়া খেতেন। আলবোলার নল আসতো অন্য ঘর থেকে। ভোপাল বা ইন্দোর থেকে আনা অম্বুরী তামাক-এর গন্ধে নাকি পুরো মহল্লা ভুরভুর করত। তামাক খেতে খেতে যদি অসাবধানে বা ঘুমের ঘোরে হাত থেকে আলবোলাটি পড়েও যেত কারো, তখনও চাকরদের পুরা নাম ধরে ডেকে নিজেদের মৌজ্ নষ্ট করতে আদৌ রাজী ছিলেন না তারা একজনও। তারা তখন আস্তে বলতেন রে···

"রে" মানে, ওরে ! বা কে আছিস রে ? এসে আল্বোলার নলটা তুলে দিয়ে যা। "ওরে" বা "কেরে" বলার মতো কষ্টটুকু করতেও তারা নারাজ ছিলেন। শুধু "রে" বলেই খালাস। তাদেরই বংশধর পৃথু। অতএব··

যখন বিয়ে হয়েছিল, অনেক কিছুই স্বপ্ন দেখেছিল। বিলেত-ফেরৎ এঞ্জিনীয়র। মধ্য-প্রদেশের এতবড় নামী, শৌখীন পরিবারের ছেলে। গান-বাজনা,পায়রা-ওড়ানো, সাহিত্য, শিকার বটেরের লড়াই ইত্যাদি নানারকম পরস্পর বিরোধী ব্যাপারের জন্যে এই পরিবারের সুনাম-দুর্নাম দুইই ছিল পুরো মধ্যপ্রদেশের বাঙালি সমাজে। এক নামে চিনত সকলে।

কিন্তু হতাশ হয়েছে রুষা। একেবারেই। কেন যেন মনে হয় ওর এখন, পৃথুর বড় জ্যাঠামশাইএর সঙ্গে রুষার মাসীর কোনো একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ওর বিয়েটা একটা স্যাক্রিফাইসাল ঘটনা !

বিয়ের পর পর সকলেরই একটা ঘোরের মধ্যে কাটে। কী স্ত্রী কী পুরুষ। শরীরের ঘোরটাও কম বড় ঘোর নয়। যদিও বেশিদিনের জন্যে হয়ত থাকে না সেই ঘোর। তবে, রুষার মধ্যে কাম ব্যাপারটা চিরদিনই কম। ও ছোটবেলা থেকে এমনভাবে মানুষ হয়েছিল যে, শরীরী ব্যাপারের মধ্যে এক ধরনের নিষিদ্ধতা ছিল বলে মনে করত রুষা। এখন অবশ্য তাতে যায় আসে না কিছুই। তার স্বামী পৃথুর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তার নেই বললেই চলে। শরীর ত কখনও শরীরের সঙ্গে মিলিত হয় না, মন মনের সঙ্গে সঙ্গমেচ্ছু হলেই শরীর ক্রিয়াপদের ভূমিকা নেয় শুধু। কী করতে যে পৃথু এমন হঠাৎ ছুটি নিল তা সেইই জানে। ভেবেছিল এবারে পাঁচমারী যাবে গরমে। ছুটিই নষ্ট করে দিল।

সকাল থেকে সন্ধ্যে কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়ায়। যেমন জামা কাপড়ের ছিরি ! তেমনই সঙ্গীসাথীর। কেউ জুতোর দোকানদার, কেউ ঘড়ি সারাই করে, কেউ মোটর-মেকানিক। না আছে তাদের কোনো শিক্ষা-দীক্ষা ; না সহবৎ। আন্কালচারড্ ব্রুটস্ সব। আর এক ইডিয়টিক বুড়ো আছে, গিরিশ বোস।

জোটেও বটে।

"আ ম্যান ইজ নোন, বাই দ্যা কম্পানী হী কীপস্।"

হাটচান্দ্রা ছোট্ট জায়গা। পৃথুর জন্যে মুখ দেখাতে পারে না রুষা কোথাওই। এই লাক্ষা কোম্পানীকে ঘিরেই আজ থেকে অনেক বছর আগে গড়ে উঠেছিল এই জনপদ। সেই কোম্পানীর অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারকে কুলি কামিনরা "পাগলা ঘোষা" বলে ডাকে। "পৃথু" নামটা ওদের পক্ষে

খুবই কমপ্লিকেটেড্। উচ্চারণ করলেও, কোলীগ্‌রা প্রায়ই বলেন পিরথু। পারথু ; এই সব। লেবারাররা শর্টকার্ট করে "পাগলা ঘোষা" করে দিয়েছে।

. ওরা পৃথুর আসল স্বভাব জানলে ওর নাম হয়ত দিত "পাগলা গোস্‌সা"। লোকটাকে বাইরে তার কাজের জগতের সকলে বলে, আহা ! মাটির মানুষ ! দেবতুল্য লোক ! কোনো এয়ার নেই, অহং নেই ; কারো সঙ্গে ঝগড়া বা খারাপ ব্যবহার নেই। অমন মানুষই নাকি হয় না। কিন্তু সেই জগতটাই একমাত্র জগৎ নয়। এমন একটা খিট্‌খিটে, ইরিটেবল্, ইন্‌কন্‌সিডারেট ইনকন্‌সিসট্যান্ট্ লোকের সঙ্গে রুষা বলেই ঘর করে গেল। এই যুগে এই কালে, এরকম লোক একেবারেই অচল। এই দাম্পত্যজীবনে রুষার আর বিন্দুমাত্রও ইণ্টারেস্ট নেই। ও নিজেই জানে না কবে কী করে ফেলবে !

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে, রুষা বেডরুমে এল একবার। অসময়ে, নিজেকে দেখল রট-আয়রনের ফ্রেমে ঘেরা বেলজিয়ান কাঁচের আয়নাতে। রুষা জানে যে, সে অত্যন্ত সুন্দরী। যে-কোনো পুরুষকেই বশ করতে চাইলে, তার পাঁচ মিনিট লাগে। যত বড় জিতেন্দ্রিয়ই সে হোক না কেন ! এমন কী, সেদিন কোনো কাগজের সানডে এডিশানে যখন সে পড়ছিল যে, হিন্দী ফিল্ম ওয়ার্লড-এর রেখা বলেছেন যে কোনো পুরুষকেই তিনি যে কোনো সময়ে আধগেলাস জল দিয়ে গিলে খেয়ে নিতে পারেন। তখন রুষা তার নিজের সম্বন্ধেও সেরকম একটা প্রাইড ফ্রীল করেছিল।

বশ করতে পারল না শুধু এই আশ্চর্য মানুষটাকে, তার স্বামী পৃথুকে। ও আসলে হয়ত মানুষ নয়ও। ছোটবেলা থেকে জঙ্গলে ঘুবে ঘুরে, তার জংলী, শিকারী বাবার সঙ্গে একদল আনকালচারড্ ব্রুটদের সঙ্গে মিশে মিশে একেবারে অসভ্য, আনসিভিলাইজড্ হয়ে গেছে। কোনো উল্ফ-বয়এর মতো। কিপলিংএর মোওগ্‌লির মতো।

এমন নেশা নেই যে, সে করে না। মাঝে মাঝে শাঁওন নদীর পারের শ্মশানে গিয়েও বসে থাকে। মড়া পোড়ানো ডোমদের সঙ্গে থুথু-ভেজা লাল শালুতে মোড়া গাঁজার কল্‌কে থেকেই নাকি গাঁজা খায়। মদ খায়। সিদ্ধি খায়। এই ত সেদিন কোথা থেকে মাঝ রাতে সিদ্ধি খেয়ে এসে শুয়োর ! শুয়োর ! করে কী কাণ্ডই না করল।

শুয়োর অবশ্য এসেছিল। কপিক্ষেতে।

কিন্তু পৃথু যাকে শুয়োর ভাবছিল, সে শুয়োর নয়। সে বিনোদ ইদুরকার। খুব বেঁচে গেছে সেদিন ওরা দুজনেই। আহা ! ভারী সুইট্ ছেলেটি। ছেলেটি মানে, বয়সে হয়ত রুষার সমবয়সীই হবে, কিংবা একটু ছোটও হতে পারে। কিন্তু ভারী ম্যাচিওরড্। পৃথুর উপর কোনো ব্যাপারেই ডিপেণ্ড করা যায় না, বিনুর উপরে সব ব্যাপারেই যায়। ও সেদিন রাতে সত্যি সত্যিই এসেছিল। পৃথু ভেবেছিল শুয়োর। হাউ ফানী ! ভাগ্যিস মেরী ঘুমিয়ে পড়েছিল। পৃথু ফিরছে না দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে রুষা সেদিন বসবার ঘরেই বসেছিল। আলো নিবিয়ে। ভয় করছিল, আলো জ্বালিয়ে বসে থাকতে। পাছে, বাইরে থেকে লোকে জানে যে বাড়িতে ও একা। এত রাতে। মালীটাও বাড়ি গেছিল তিনদিন হল ছুটি নিয়ে। কুক্, লছ্‌মার সিং সেই যে দেশে গেছে স্ত্রীর অসুখ বলে, তারও আসার নামটি পর্যন্ত নেই।

রাত বাড়তে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল রুষা। হঠাৎ গেট খোলার শব্দ হল। তারপর টলটলায়মান পায়ে কারো হেঁটে আসাব শব্দ। পৃথু এসেছে ভেবে রুষা মনে মনে বলেছিল, "ন্যাউ, আই উইল গিভ ট্যু আ উঈ বিট্ অফ্ মাই মাইণ্ড।" দরজাটা খুলতেই পৃথু নয় ইদুরকার এসে রুষাকে জড়িয়ে ধরল। ড্রাঙ্ক ছিল ও।

বলল, রুষা, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। চিরদিনের মতো না হও, ত অন্তত একবারটির জন্যে আমার হও। আজ। এখুনি। বলেই, চুমু খেয়েছিল রুষার ঠোঁটে।

রুষা দরজা ভেজিয়ে ওকে সরিয়ে এনে সোফাতে বসিয়েছিল। ওকে ফিস্‌ফিস্ করে বোঝাচ্ছিল, ওকি পাগল হয়ে গেল ? ইদুর, কি করছোটা কি ? ইয়াং, হ্যাণ্ডসাম্, অ্যাফ্লুয়েণ্ট ব্যাচেলর্। ইমপোর্টেড গাড়ি, চমৎকার বাংলো-বাড়ি, পাঁচমারিতে কটেজ, ধনী মা-বাবার একমাত্র সন্তান, সে

রুষার মতো দু ছেলেমেয়ের মায়ের জন্যে তার জীবন তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে তা রুষা চায়নি।

একবারটির জন্যে চায়। যা চায়, তা দেবে এখন, সময় সুযোগ বুঝে, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবে। রুষাও যে ওকে চায় না এমন নয়। রুষা তেমন সংস্কারাবদ্ধ জীব নয় যে, ও বিশ্বাস করবে যে একদিন স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাস করলেই তার চরিত্র বা তার বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে। শুচিবাই থাকলে, বিয়ে আজকালকার দিনে একজনেরও করা উচিতই নয়। দুঃখ পেতে হবে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

চরিত্র কথাটা অনেকই বড় কথা ! কটা লোকই বা তার মানে বোঝে। আর বিয়েও, বিশেষ করে ছেলেমেয়ে আসার পর, অনেকই বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাকে ভাঙা এত সোজা নয়, ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে ভাঙা উচিতও নয় হয়ত। তবে, এক জীবনে, একটিই জীবনে ; কোনো আধুনিকা নারীর কেবলমাত্র তার স্বামীব সঙ্গেই একমাত্র শারীরিক ও মানসিক হারমনি থাকবে, অন্য কারো সঙ্গেই নয়, এমন অদ্ভুত কথায়, রুষা বিশ্বাস করে না।

ইদুর ছেলেটা সত্যিই ভাল। সব দিক দিয়েই ভাল। গোয়ালিয়র পাবলিক স্কুলে পড়াশুনো শেষ করে কলেজ করেছিল ভোপালে। তারপব স্টেটস্‌এ গিয়ে ম্যানেজমেন্ট-এ ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছে। ও এখানে একটি সোয়াবিন অয়েল একসস্ট্রাকশান্ প্ল্যান্ট·বসাচ্ছে। অন্য ফ্যাক্টবী করছে লাক্ষা থেকে, লাক্ষার গয়না তৈরী করার, ফেরো-অ্যালয়ের বা লো-ক্যারেটের সোনার বা লোহার বা তামার বা রূপোর বেস্‌-এ। স্টেটস্ জার্মানী কানাডা এবং জাপানে একসপোর্ট-এর পসিবিলিটি নাকি দারুণ।

ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ইদুর। ও পাগলেরই মতো ভালবাসে রুষাকে। আগে ভাবী বলে ডাকত। এখনও তাইই বলে।

সে রাতে, ইদুরকে শুধু একটুই দিয়েছিল। ওর স্তনসন্ধিতে মুখ রেখেছিল ইদুর, ঠোঁটে চুমু খাওয়ার পরে। সবকিছুই একটু একটু করে দেওয়া ভাল। তাতেই মোহ থাকে, মজা থাকে, বাঁচার ফান্ অটুট, আনস্পয়েল্ট থাকে। উত্তেজিত, ভীত রুষা ওকে বলেছিল, আর নয় ; অ্যাই ! আজ আর নয়।

পরে, পরে কখনও…।

রুষার শরীব বলে যে কোনো একটা ব্যাপাব, এমন সুন্দর একটা ব্যাপার এখনও আছে, এমন জীবন্তভাবে আছে ; তা মধ্য তিরিশের রুষা একেবারে ভুলেই গেছিল। পৃথুর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক ত নেই-ই বলতে গেলে। পৃথুব হাতের আর শরীরের ছোঁওয়া তার কাছে নতুন কোনো কিছুই আর বয়ে আনে না। কী কবে যে আদর করতে হয়, মেয়েরা কি যে চায়, কতটুকু চায় একজন পুরুষের কাছে, কেমনভাবে পেতে চায়, তার কোনো খোঁজই রাখে না পৃথু। একটা জংলী। উল্ফ-চাইল্ড। বড়লোকের স্পয়েল্ট—ওয়ার্ড। হাফ্-উইট লুনাটিক্। কী করে বিলেতে ছিল, কী করে পাশ করল এঞ্জিনীয়ারিং কে জানে !

যখন রুষার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ইদুর ওব বুকে মুখ রেখেছে, যখন বহু বহু বছর পর, সারা শরীর থর্ থর করে শরত-ভোরের শিউলির মতো নরম্ নরম্ ফুল ঝরাচ্ছে, ভালোলাগায় তির্‌তির্ করে কাঁপছে জরি-মোড়া জরায়ু, ঠিক অমনি সময় আবার গেট খোলার আওয়াজ হল।

ইদুর শোনেনি। ও পাগলেরই মতো ঘোরে ছিল। গভীর ঘোর। অভিজ্ঞা এবং সাবধানী রুষাই শুনেছিল শুধু।

শুনেই, এক ধাক্কায় ইদুরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, পালাও শিগগিরী। পৃথু আসছে।

পি-র্-থু দাদা বলেই, ইদুরও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

রুষা কিন্তু আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। কী হয় ; কী হল, কী ঘটছে তা দেখবার জন্যে যে মূর্খরা দাঁড়িয়ে থাকে, জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই তারাই তলপেটে ছুরি খায়, তাদেরই গুলি লাগে বুকে। বোকা পুরুষের প্রাণের চেয়ে, বুদ্ধিমতী নারীদের সতীত্বর সার্টিফিকেটের দাম অনেকই বেশি। চিরদিনই। নারী মাত্রই নির্দয় খুনী ; যখন তাদের সতীত্বর গায়ে ধুলো লাগার প্রশ্ন ওঠে। রুষা দৌড়ে এসে যে ঘরে ও আর টুসু শোয়, সে ঘরে শুয়ে পড়েছিল। তারপর দরজায় ধাক্কা—একটা

ধ্বস্তাধ্বস্তির মতো আওয়াজ। কুকুরের চিৎকার। টলায়মান পায়ে বাগান দিয়ে যেন। ছেড়ে না চলে ছুটে যাওয়ার শব্দ। যে কি করবে, তা

ভগবানের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ লাগছে রুষার। যদি…।

নাঃ। ও ভাবতেই পারে না। হাতে-নাতে ধরা পড়লে পৃথু হয়ত দুজনকেই গুলি ক.আছেই। ফেলত! শয়।

তা অবশ্য পারত না। কারণ, পিস্তল ও রাইফেল সব অনন্ত বিশ্বাসের দোকানে জমা আছে, জবলপুরে। ভাগ্যিস। কিন্তু পৃথু রাগে না সচরাচর। রাগ বলে কোনো রিপু ওর আদৌ আছে বলে মনেই হয় না বেশি সময়। কারণ রুষার প্রতিক্ষণের খোঁচাতেও ও নির্জীবের মতোই পড়ে থাকে। যেন ঢোঁড়া সাপ। ভুসস ভুসস করে সিগারেট খায়। কিন্তু যদি ওর রাগ কোনোদিন হয়, সেদিন কি হবে জানে না রুষা। রাগের আভাষ পেয়েছে। রাগ কখনও দেখেনি। আভাষই যথেষ্ট। তাইই মনে মনে ও ডাকে 'পাগলা গোসসা'।

খুব ভাল লাগছিল ওর। পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে, দিনে ও রাতে অনেকেই গোপন দেওয়া-নেওয়ার খেলা চলে, ঘটে যায় অনেক ছিঁচকে চুরি, দস্যুবৃত্তি অথবা ডাকাতি। তার অতি সামান্যই, আইসবার্গ-এরই মতো চোখে পড়ে। লক্ষভাগের এক ভাগেরই মতো কথায় বলে, "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা : যদি না পড় ধরা"।

কিন্তু রুষার চরিত্রে কিন্তু চৌর্যবৃত্তি আদৌ নেই। ওর মতো সোজা, সৎ স্ট্রেইট, ক্যারাকটারের মানুষ মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায় বলে ওর নিজের মনে হয় না। মাঝে মধ্যে এই স্ট্রেইটনেসটা একটু স্টিম – এঞ্জিনের মতো বিহেভ করে। রুষা সেটাও জানে। ওর মধ্যে ন্যাকামি নেই, ঈর্ষা নেই, মীননেস নেই, যা ও অধিকাংশ মেয়েব মধ্যেই দেখে। হয়ত ওর জীবনে সেক্স নেই বলেই মাঝে মাঝেই ও পাগল পাগল বোধ করে ইদানীং। ওর বয়স আর কি ? দিনে রাতে অসংখ্য পুরুষের ধূর্ত, লুব্ধ চোখকে ও ওর চোখ দিয়ে চাবকায়। তবু, কারো প্রতিই ও বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করে না। এত্ব পুরুষ দেখে। চোখ ত কতই দেখে, দেখল ; এই জীবনে, কিন্তু চোখে যা পড়ে তার সবই কি মনে ধরে ? মনে যে বড়ই কম আঁটে। লক্ষে হয়ত একজনকেই মনে ধরে, কী ধরে না। কিন্তু তবু, ওব যে হাত-পা বাঁধা।

একটা কাক এসে বসল পেঁপে গাছে। বেশ সুন্দব দেখাল ওর চোখে আজ কাকটাকে। দেখার জিনিস একই থাকে হয়ত, চোখই বদলে যায়। কখনও একই জিনিসকে সুন্দর দেখে, অথবা কুৎসিৎ।

আশ্চর্য। ভাবে রুষা। ওর চৌত্রিশ বছর বয়সে ও কি এইই প্রথম একটা কাকের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাল ? কী সুন্দর গ্রীবা কাকটার ! ময়ূরের চেয়েও সুন্দর মনে হল। ব্ল্যাক-এণ্ড-হোয়াইট ফোটোগ্রাফীতে যে গভীরতা আলোছায়ার, কালো-সাদার গ্র্যাঞ্জার তা কী কালার-ফোটোগ্রাফীতে কখনই থাকে ? কাক ত সাদা-কালোর, তাইই ভাল, রিয়্যাল। কাককে বোঝা যায় ; ভালোবাসা যায়। ময়ূর থাকে তার রঙের ঔজ্জ্বল্য আর চোখ ধাঁধানো চমক নিয়ে শুধু কাব্যে-সাহিত্যে, পৃথুর মতো ব্যর্থ কবির আটারলী ইউসলেস কবিতাতেই।

এই কাকটাই কি সেদিন চামচ নিয়ে গেছিল ? ঠোঁটে করে ? যাক্ ! কত কিছুই ত কতলোক ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে যায়। সেদিন গভীর রাতের অষ্টমীর জোছনায় ইঁদুর যেমন রুষার ঠোঁটের সিক্ততা, তার স্তনসন্ধির দুর্লভ সুগন্ধ ঠোঁটে করে একটি ইঁদুরেরই মতো পালিয়ে গেছিল। যাক্। যাক। কতটুকুই বা কে নিতে পারে ? সবার উপরই কি রাগ করা যায় ? না, করতে আছে। যখের ধন-এর মতো আজীবন সব ধন আগলে রাখারও বা মানে কি হয় ? শরীরের ধন ত চিরদিন থাকার নয়, তা'ত পেরিশেবল্।

দরজা খোলাই ছিল। উর্দিপরা ড্রাইভার বলল : মেম্‌সাব।

কি ব্যাপার আজাইব সিং ?

চমকে উঠে, বলল রুষা।

এনোছ মেমসাব।

রুষাব মতো দু ছেলে। তুমি মেরীকে সব বুঝিয়ে দাও। ইটালিয়ান অলিভ অয়েল ে়ায়েছো ?

একবাবটিব জ ।। স্টোর্স ত বলল, আসেনি। এলেই ফোন করবে।

কবে। রুষাও । কী যে কবে এরা।

একদিন রুষা বলল বিড় বিড় করে

যাবে গাড়িটা রুষারই কাছে থাকে। যদিও কম্পানীর গাড়ি। এ সব ব্যাপারে পৃথুকে কিছু বলার নেই। মানুষটাকে সব সময় গালাগালি করে বটে, তার আগোছালোমির জন্যে তার ভুলো মনের জন্যে, তার অদ্ভুত, ইমাজিনারি, হ্যালুসিয়েশনের জগতে বাস করার জন্যে। কিন্তু পৃথুর চরিত্রে কোথাও-এখনও কিছু লেগে আছে ধুলো-ময়লার বা ডায়মণ্ড-ডাস্ট এরই মতো,অ্যাজ্ঞ ওয়ান সীজ ইট, যার জন্যে ওকে এক ধরনের শ্রদ্ধা না করেও পারে না। টাকা পয়সা, ক্ষমতা, দেমাক, বড চাকরী করার অহমিকা, মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগাবের গর্ব, কোনো কিছুই মানুষটাকে ছুঁতে পারে না। জাগতিক কোনো কিছুর প্রতিই মানুষটার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। যতক্ষণ বাড়ি থাকে, সব সময় সে তার বইপত্র, লেখালেখি নিয়ে থাকে। সব সময় বিছানায় বালিস বুকে লেখালেখি করে, দলাই-মলাই করে বিছানা বালিশ। যাচ্ছেতাই। ডাস্টিং করাব জন্যে সময় মত ঘর ছাড়ে না, সময় মত চান করে না, দাড়ি কামায় না, দিনের পর দিন ঘর ছেড়ে বেরোয় না। খাটের উপর বসে বালিশের উপর ব্রিফকেস তুলে মেকশিফ্‌ট টেবল করে ঘাড় ঝুঁকিয়ে লেখে।

কী যে অত লেখে, কী যে ভাবে ভুসস ভুসস করে সিগাবেট খেতে খেতে, তা ওইই জানে। যদি বুঝত রুষা যে, ওর নাম হয়েছে কবি হিসেবে, লেখক হিসেবে তবেও বুঝত। ভবিষ্যতের জন্যে পৃথু ওর বর্তমানটাকে পায়েব নিচে অবহেলায় মাডিয়ে যায় প্রতিমুহূর্ত।

ও বলে, ওর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। বলে কিছুই হল না এ জীবনে ! আর কি হবে ? ওর যা হয়েছে, তাব কিছুমাত্রও হলে, অন্য অনেক পুরুষ গর্বে বেঁকে থাকত। ওকি ভাবে যে, ও মরে গেলে ওর নামে হাটচান্দ্রায় কী ভোপালে ওর স্ট্যাচু হবে ? ও কী ভাবে ও কোনো লিটারারী এওয়ার্ড পাবে মৃত্যুর পর ? ওকে কী কালিদাস এওয়ার্ড দেওয়া হবে ? পশথুমাস ? ইফ হী থিংকস সো, হী মাসট বী আ স্টুপিড চ্যাপ।

মৃত্যুর পর কি হবে তা নিয়ে রুষা কখনও মাথা ঘামায় নি। একটাই জীবন। জীবনকে ও খুব ভালোবাসে। প্রতিটি মুহূর্ত ও এ জীবনে দারুণ ভাবে বাঁচতে চায়। পৃথু কখনই জীবনের প্রতি রুষাব এই তীব্র ভালোবাসাটা বুঝতে পাবল না। অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, কখনও পৃথুস্বামীর মতো বিহেভ করল না, করল না ছেলেমেয়ের বাবার মতো। একদিনের জন্যেও না। এমন লোকের বিয়ে করার, ছেলেমেয়ে হবার কেনোই প্রয়োজন ছিলো না। কোন ঘোরে থাকে ও সব সময় তা পৃথুই জানে। পান চিবোয়, সিগারেট ফোঁকে, জামা কাপড় সব পানের পিক ফেলে নষ্ট করে। কালকে রুষা দেখেছে, ওর লেখার টেবলের উপরে একটি নস্যির কৌটো। নস্যি ! সত্যি ! আনথিঙ্ককেবল। কোনো ভদ্রলোকে নস্যি নেয় ? খইনীও খায় পৃথু মাঝে মধ্যে। চুন দিয়ে খৈনী মারে দু হাতের তেলোতে। ছিঃ ছিঃ।

এই সব কারণেই টুসু ও মিলিও তাদের বাবাকে আজকাল দেখতে পারে না। অন্য ভদ্রলোক, কন্‌সিডাবেট বাবারা ছেলেমেয়েদের কম্পানি দেয়, তাদের নিয়ে বেড়াতে যায়, তাদের জীবনের অনেকখানিই জুড়ে থাকে তাদের বাবা। পৃথুর সময় নেই কারোও জন্যেই। ছেলেমেয়েরাও তাই স্বাভাবিক কারণেই তাকে ভাবে নন-এনটিটি। তাদের কাছে মাইই সব। সবকিছু। পৃথু, এতে দুঃখ পর্যন্ত পায় না। আশ্চর্য ! কারখানায় যায়, ঘড়ির কাঁটা ধরে। লাঞ্চ-এও বাড়ি আসে না। অন্য সকলেই আসেন। কারখানা বন্ধ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ কাজ করে। নিজের জীবিকার কাজের বেলাতে কিন্তু মানুষটা খুবই দায়িত্ববান। সবাই সেই কথাই বলে। কাজের সময়ে কাজ-পাগলা মানুষ। কোম্পানিটা ফেরা অ্যাক্ট-এ যখন ইণ্ডিয়ানাইজড্‌ হয়ে যায়, তখন ফরেন কম্পানির বোর্ড পৃথুকে কোম্পানির টুয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার গিফ্‌ট করে দেন। অন্য টুয়েন্টি পার্সেন্ট রেসিডেন্ট

ডিরেক্টরকে। কম্পানির সবাই বলেন, "পাগলা" ঘোষা পাগলামি করে এই কম্পানি ছেড়ে না চলে গেলে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হওয়াটা কেউই ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু পাগলা যে কি করবে, তা পাগলাই শুধু জানে। এ কথাও বলেন সকলে।

রুষার প্রায়ই ভয় করে। পৃথুর মেজ্-ঠাকুর্দা পাগল ছিলেন। ওর মধ্যে পাগলামির বীজ আছেই। পৃথুকে রুষা সর্বক্ষণই টাইট্ করে রাখে, গালাগালি করে ; যাতে ওর পাগলামিটা বাড়তে না পায়। রুষাই জানে, কতখানি ভালোবাসে সে পৃথুকে। শ্রদ্ধা করে। এখনও। আফটার অল, মানুষ ত দোষেগুণেই হয়। কিন্তু পৃথুটা এমনই বোকা, এমনই আউট-অফ-দ্যা ওয়ার্লড রোমান্টিক যে, ওর ধারণা, ভালোবাসা মানে সবসময় হাতে হাত রেখে বসে কবিতা পড়া। ভাবা যায় না। আটারলি ইন্‌করিজিবল্ ওর ভালোবাসা, পৃথু যে এ-জীবনে বুঝতে পারল না ; এ-কথাটা রুষাকে বড়ই ব্যথা দেয়। যে ছেলেমানুষকে কিছু দিয়েই ভোলানো যায় না, যার কান্না, যার ন্যাগিং কিছুতেই বন্ধ করা যায় না, না ক্যাডবেরী, না কাম্পা-কোলা, না রুষার শরীর দিয়ে, তাকে নিয়ে সবসময়ই বড়ই বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত, চিন্তিত থাকে রুষা।

ছেলেমেয়েদের মানুষ করা বলতে যা বোঝায়, সবই ও একা হাতেই করেছে। তাছাড়া, এত বড় সংসারের এতরকম দায়িত্ব, মাসের বাজার, দৈনিক খাবারের মেনু, বাগানের পরিচর্যা, মালী থাকা সত্ত্বেও, বাড়ি-ঘর সবসময় ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাখা এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই শেকল-ছাড়া পাগলকে চোখে চোখে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। যদিও লোকজন অনেকই আছে। নিজের হাতে খুব কিছু একটা করতে হয় না, এবং ছোটবেলা থেকে করা অভ্যেসও নেই ওর। নিজের জন্যে খুব দুঃখ হয় রুষার। জীবনটা কত সুন্দর, কত মজার, কত সুখের, কত অন্যরকম হতে পারত।

পৃথু সম্বন্ধে আরও একটা ভাল কথা বলবে রুষা। সকলকেই বলে, মেয়েদের সম্বন্ধে ওর কোনো আদেখ্‌লাপনা নেই। অথচ কোনো দুর্বোধ্য কারণে ওর ন্যালাখ্যাবা স্বামীকে ওর জানা-শোনা অনেক মেয়েই বিশেষ পছন্দ করে। তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতা, সফিস্‌টিকেটেড, পার্সোনালিটি সম্পন্ন অনেক মেয়েই আছে। পৃথু তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই মেশে। যদিও পৃথু যখন ইচ্ছে করে, মানে হোয়েনেভার হী চুজেস, তখন সুন্দর কথা বলতে পারে, ইংরিজি বাংলা দুই ভাষাতেই, গানও গায় মোটামুটি। তবে রভিন্দর সঙ্গীত। রুষা দেখতে পারে না এই গান। তবে অনেক স্টুপিড মেয়েরা আছে, দোজ হু ফল ফর হিম। এই অবসলিট্ অফ্‌ফ-হোয়াইট, ওলমোস্ট কালারলেস বাংলা গান শুনেও। রিয়ালী সিলী! রুষার নারী-চোখ বোঝে তাদের মধ্যে কেউ কেউ পৃথু সম্বন্ধে একেবারে 'পজেসড্'। পৃথুর মধ্যে একটা এরাটিক কিন্তু ম্যাজিকাল পার্সোনালিটি আছে। যেটাকে ডুয়াল বলে মনে হয় রুষার। কিন্তু দুটিই রিয়্যাল।

পৃথুর দুর্বলতা কেবল একটিই। তার 'অ্যাকীলীজেজ হীল'। সে হচ্ছে কুর্চি। এবং এই কারণেই খুব অপমানিত, হীনমন্য বোধ করে ও। পৃথু যদি রূপেগুণে রুষার কাছাকাছিও আসতে পারে এমন কোনো মেয়েকেও ভালবাসত তবে ওর এত অপমানিত লাগত না। কুর্চি। অফ্ ওল্ পার্সনস্। কী আছে ওর? যা রুষার নেই? রুষার বাঁদী হবার যোগ্যতাও কুর্চির নেই। আর এই কুর্চিকে নিয়েই ওর সবচেয়ে বড় ভাবনা।

আজ সকালবেলাতে অনেকই সময় নষ্ট হল। তবু, শুধু এই সময়টুকুতেই একটু ভাবার সময় পায় ও। ভাবতে ত শুধু মানুষই পারে। ভাগ্যিস পারে। নিরিবিলি বসে ফাঁকা বাড়িতে এক কাপ চা খায়। দু'একটি ফোন করে। দু'একটি ফোন আসেও।

দেওয়ালের ইলেট্রনিক ঘড়িটা দেখল রুষা। পৌনে এগারোটা। সময় হয়েছে। ইঁদুর রোজ এগারোটার সময় ওকে একটা ফোন করে। নিয়মিত। পৃথু বাড়ি থাকলেও করে। কারণ ও বাড়ি থাকলেও কখনই নিজের ঘর ছেড়ে বাইরেই বেরোয় না। কারো ফোন এলেও ধরে না। মিথ্যে কথা বলতে বলে। বলে ; বলে দাও, বাড়ি নেই। ফোনটা লিভিং রুমে। পৃথু তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে সবসময়।

রুষার জীবনে সত্যিই কোনো আনন্দ নেই। সংসারের কাজ করে ও মেশিনের মতো। মহিলা

সামাতিয় কাজও করে, কারণ গাল গাইডে ও শিখেছিল, সমাজে মানুষ কেবল নিজেরটুকু করার জন্যেই আসে না। সমাজ একটা সমষ্টি। নিজেরটুকু করেও যদি অন্যর জন্যে, লেস্ ফরচুনেটসদের জন্যে নীডীদের জন্যে কিছুই না করে মানুষ, তবে তার মানবজন্ম বৃথা। এই পৃথিবীকে অন্যদের জন্যে সুন্দরতর করে রেখে যাওয়া প্রত্যেক মানুষের মরাল ডিউটি হওয়া উচিত।

ফোনটা আসবে এবার। ইদুরের ফোন এলে, ওর সঙ্গে ফোনেও একটু কথা বললে রুষার অর্গাজমিক আনন্দ হয়। একেই কি ভালবাসা বলে ?

ওর জীবনে ইদুরই একমাত্র আনন্দ। রামু ইদুরকার। ওর সুইটি-পাঈ ! ওর একার ইঁদুর। সুন্দর গিনিপিগ্ রুষার।



পূবে সবে আলো ফুটেছে। পূবেব পাহাড়টার জন্যে আলো পৌঁছতে একটু দেরী হয় উপত্যকাতে। আলো এসে পৌঁছতেই ভোঁর ঘাসেব মাঠের উপব রাতভর জমা শিশিরে লক্ষ লক্ষ হীরে ঝিকমিক করে। লাল সাদা ফুল এসেছে ঘাসগুলোতে। ঘাসের মাঠের আঁচল ঘিবে শুখরা বা চোবকাঁটার বর্ডাব। তাবপবই গহীন জঙ্গল।

চাবদিকে সাজা, শাল, ধাওযা, বহেডা, কাসসী কুহমী, বেল, চাঁর, জামুন, পলাশ ইত্যাদি নানা গাছ-গাছালি। শালই বেশি। সোজা, সবুজের পতাকারমতো উঠে গেছে নীল অকলঙ্ক আকাশে। সাজা গাছেব আর একনাম সাজ। গোঁদ-বায়গাবা পুজো করে ওই গাছ। শালকে, যেমন করে ওঁরাও-সাঁওতালরা। ধাওযা হচ্ছে গঁদ এর গাছ। আঠা হয় এ গাছ থেকে। বহেডা গাছগুলো বিরাট বিরাট। শখ করে খায় হবিণ ওদেব ফল। কাসসী গাছের কদর গরুর গাড়ির চাকা বানাতে। বড় শক্ত কাঠ এ। কুহমি অনেকটা বেলেরমতো। চাঁর গাছও মস্ত মস্ত হয়। চমৎকার ছায়া দেয় এ গাছ। চিরাঞ্জীদানাও বলে, অনেকে এব ফলকে। ফুল ফোটে সাদা সাদা মিষ্টি গন্ধর, ফাল্গুন চৈত্রে। চাঁর-এর ফল ধরে বৈশাখের শেযে বা জ্যৈষ্ঠেতে। মিষ্টি ফল। জামুনও, বড ও ছোট অনেক আছে হাটচান্দ্রার আশে পাশের জঙ্গলে। গরমের শেষে আষাঢ় শ্রাবণে পাকে। পলাশ। পলাশ গাছে গাছে গবমেব শুরুতে ফুল যেমন লালে লাল করে দেয় দিগন্ত, তেমন সে গাছের গুটি পোকা থেকেই লাক্ষা সংগ্রহ করে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা। কারখানায় নিয়ে যায়। মেটিরিয়াল ম্যানেজার শর্মা পা ছড়িয়ে বসে সওদা করতে করতে অনেক কিছু দেখে। কোকিলের মতো কালো এবং মধুরকণ্ঠী মেয়েগুলো জানে যে, শর্মার চোখ দুটি অসভ্য। ওরা এও জানে যে, বেশির ভাগ পুরুষের চোখই অসভ্য।

শর্মাকে কারখানার অফিসের সকলেই ডাকে 'ইম্‌মেটিরিয়াল' ম্যানেজার বলে।

এই জংগলের দূর গভীরে দিগা পাঁড়ে থাকে। তুলসীদাস পড়ে, সূর্য ওঠার আগেই চান করে। বড সৎ, ভগবৎপ্রেমী লোক। কথায় কথায় রামচরিত মানস থেকে ; ভাগবত থেকে উদ্ধৃতি দেয়। ওকে দেখেই মনে হয়, দিগা খুব উঁচু ধরনের সাধক। ভুজুং-ভাজুং দেয় না। কোনোরকম ভোগবিলাসের প্রতি ওর কিছুমাত্রও আকর্ষণ নেই। ওর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসলে, প্রখর গ্রীষ্মে কোনো পাহাডী ঝর্নার পাশের মাথা উঁচু চাঁর গাছের নিচে বসার অনুভূতি হয়। ভালো গলায়,

শান্তিতে, অপনোদিত শ্রান্তিতে ঘুম এসে যায়। পৃথুর মনে হয়, বাকি জীবনটা এইখানেই শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে বেশ হত, হাওয়ায় পাতার চিরুনি বোলানোর ঝরঝরানি শব্দে, বাসরঘরের নববধূর গলার স্বর আর গয়নার মৃদু নিক্কনেরইমতো ঝোপ-ঝাড় লতা পাতার আড়ালে লুকিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্নার ঝরঝরানি ঝালরের ঘেরে।

দিগার স্নান হয়ে গেছিল। ছোট্ট মাটির ঘরের সামনে একটি বড় কালো শিলাসন। সামনে পুঁথি মেলে সে তার উপরে বসে ছিল। পাথরটা প্রায় মানুষ সমান উঁচু। উপরটা সমান এবং চ্যাটালো। দশ পনেরোজন লোক অনায়াসেই বসতে পারে। তার ঠিক পেছনেই একটি মস্ত আকাশমণি গাছ। আফ্রিকান টিউলিপ। কোন শিকারী সাহেব কবে তৎকালীন সেনট্রাল প্রভিন্সে শিকারে এসে লাগিয়ে গেছিলেন হয়ত। পাথরটির দুপাশে দুটি প্রকাণ্ড বহেড়া গাছ। দিগার কুটিরের সামনের ও পেছনের কিছুটা জায়গাই শুধু পরিষ্কার। চারদিকেই ঘিরে আছে গভীর জঙ্গল। হাঁলো নদী বয়ে গেছে ডান পাশ দিয়ে। একটা পথ চলে গেছে, পায়ে চলা। পুনোয়া বস্তীর দিকে। হাটচান্দ্রা থেকে পায়ে চলা পথও আছে এখানে আসার। জঙ্গল, পাহাড়, নালা মাড়িয়ে। আর একটা রাস্তা আছে, সেটা চিল্‌পির পাকা রাস্তা থেকে বেবিয়েছে। তাকে রাস্তা বলে না, জীপ আসে না কোনো মতে।

দিগা পাঁড়ের চেহারাকে ছিপ্‌ছিপে বললে ঠিক বলা হয় না, বলতে হয় ফিন্‌ফিনে। জলফড়িং-এর ডানারমতোই স্বচ্ছ। ওর শিরা উপশিরার নীলচে রঙ কপি-পেপারের রঙেরমতোচামড়া ভেদ করে দেখা যায়। তুলসীদাস পড়ার সময় ওব সাদা গলার চামড়াব নিচে নীল শিরাকে ফুলে ফুলে উঠতেও দেখা যায়। গহবজান বাঈজী পান খেয়ে পানের পিক গিললে নাকি নীল শিরা বেয়ে পানের লাল পিক নামতে দেখা যেত। শুনেছিল, পৃথু, তার বাবার কাছে। অনেকটা সেরকমই দিগা। দিগা প্রথম জীবনে ছিল কুখ্যাত ডাকাত। করে নি, এমন অপকর্ম নেই। বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে, উত্তবপ্রদেশের এটাওয়ার কাছাকাছি বেহড়ে এবং পরে চম্বল এলাকাতেও ওর নাকি যাতায়াত ছিল। হাটচান্দ্রাব এক দল বাসিন্দার; যাঁরা দিগাকে জানেন, অথবা ওর কথা শুনেছেন ; বলেন যে, দিগা পাঁড়ে আদপে পাঁড়েই নয়। বিহাবীই নাকি নয় সে। আসলে ঠাকুব। বাগী-হয়ে-যাওয়া ঠাকুর। এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। এখন নাম ভাঁড়িয়ে এখানে এসে বসেছে পুলিশেব চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্যে।

দিগাকে দেখার পর থেকে কথাটা পৃথুব বিশ্বাস হয় নি। যে, শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছে, দিগা যদি সেই বামচন্দ্রর চোখেই ধরা না পড়ে থাকে অসাধু বলে ; পুলিশ তাকে অসাধু বলে ধরবে কেমন করে ?

সংসারে অতি অল্প সংখ্যক মানুষ থাকেন, যাঁদের কাছে এলেই এক সুন্দর শান্ত ভাব মনে জাগে। কোনো দেনা-পাওনা, লেন-দেনের ব্যাপার নয়, কিছুমাত্র চাওয়া-পাওয়ার জন্যেও নয়, নিছক তাদের সঙ্গই অন্যকে আনন্দে ভরপুর করে তুলতে পারে। একটু কথা, অথবা দীর্ঘ নীরবতা, এক চিলতে মৃদু হাসি, চোখের একটু চাওয়া;চৈত্রর প্রহরশেষের রাঙা আলোর রেশ-এরমতো; এই-ই যথেষ্ট। প্রেমে বোধহয় মানুষ বা মানুষী এমন আত্মার সঙ্গেই পড়ে। প্রথম দর্শনেই। কিন্তু দিগা যে মানসিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, অক্সিজেন সিলিণ্ডার ছাড়াই এভারেস্টে পৌঁছনোরমতো; সেখানে মানব মানবীর প্রেমের কথা উঠলে তার মুখে এক স্মিত প্রেমময়, ক্ষমাময়;লীলাময় হাসিই ফুটে ওঠে শুধু। ভগবানের প্রেমে যে সত্যিই মশগুল তার কাছে মানুষী প্রেমের কোনো আকর্ষণই থাকে না বোধ হয়।

কাল রাতে ঠুঠা বাইগা দিগার কাছে ছিল। এবং পৃথুও।

রাতে, দিগা পাঁড়ে কিছুই খায় না। যদি কেউ কিছু দেয় ; নিয়ে আসে, হাটের দিনে যদি কেউ পাঠায় কিছু, তাইই। না খেলেও বোধ হয় চলে যায় ওর। খেলেও একবেলা ; একচড়া খায়। ঠুঠা বাইগা কিছু খেতে খুবই ভালবাসে। অনেকদিন আগে দিগা পাঁড়ের পর্ণকুটিরে একটা ময়ূর মেরে এনেছিল তার গাদা বন্দুক দিয়ে। বন্দুক এখনও সারেণ্ডার করেনি সে। অবশ্য করার কথাও ওঠে না, কারণ বন্দুকটাই বে-পাশি। আর যে ক'টা দিন বাঁচে, বন্দুক ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতেই পারে না ঠুঠা বাইগা। যুবতীর আস্‌কল পাখিরমতোবুকের খাঁজের শালফুল শালফুল গা-সিরসির গন্ধও তাকে

ফোটা কার্তুজের বারুদের গন্ধরমতোটানেনি কখনও, সে যখন জোয়ানও ছিল। এ কথা ঠুঠা বাইগার কথা শুনেই বোঝা যায়। আজত' ও বুড়োই হয়ে গেছে। বিয়ে করেনি ঠুঠা। ছোট্টবেলায় কাংড়ীতে আগুন পোয়াতে গিয়ে দুটো হাতেরই কয়েকটি আঙুলের ডগা তার জ্বলে খসে গেছিল। ডান হাত টার চারটি আঙুল, তাই-ই থেকে, তার নাম ঠুঠা। বিয়ে করেনি বটে, কিন্তু হন্‌সো নামের একটি গা-ছমছম্ মেয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকে এসেছিল। 'ঘরঘুসি' বিয়ের জন্য। সে কী কেলেঙ্কারী। মেয়েও যাবে না। ঠুঠাও বিয়ে করবে না। ঠুঠার বাবার কী রাগ!

গাওয়ান আর প্যাটেলদেব সভা বসেছিল। ফাইন দিয়েছিল। তবুও বিয়ে করেনি।

হন্‌সো বাঈ-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল গত বছর সীওনীর কাছে একটা গ্রামে। বালাঘাটের কাছাকাছি। এক গাওয়ানের বউ সে। গায়েগতরে হয়ে উঠেছে একেবারে পৌষালী বোদে। নাতি-নাতনীতে ঘর ভবা। কী খিটক্যাল! কী খিটক্যাল। অমন শাওন-ভাঁদোরমতোচলকে যাওয়া যৌবন নিয়ে যদি দেওয়ালের আধ-শুকনো এবড়ো-খেবড়ো গোবর গন্ধের ঘুঁটেই বন্‌বি শেষকালে, তাহলে আর জুলুনি যৌওন নিয়ে জন্মালি কেন? নদীরমতোইচল্‌কে চল্‌কে চলতিস সারা জীবন তবে না বুঝতাম রে ছিঃ ছিঃ। মনে মনে বলেছিল ঠুঠা। এখনও ঠুঠা শিকার পাগল। জঙ্গলে এলেই রক্ত না দেখলে দু হাতে পাখির পালক ফরফর করে বা জানোয়ারের চামড়া চড়চড় পৎ-পৎ শব্দ করে নিজে হাতে না ছিঁড়লে ওর দিলখুশ্ হয় না। মানুষটাব মধ্যে এক ধরনের আদিম, গভীব প্রাগৈতিহাসিকতা আছে। কিন্তু দিগাব হাসিটা যেন তীরেরমতো বিঁধে যায় ঠুঠার পাঁজরের মধ্যে। নড়তে চড়তে পাবে না। দিগা তুলসীদাস আউড়ে বলে:

"জো মধু মরৈ না মারিএ মাহুর দেই সো কাউ।
জগ জিতি হাবে পরসুধর হারি জিতে বঘুবাউ॥"

দিগা আবার মানেও বুঝিয়ে দেয়, এই দোঁহার। "মধুতেই যে মরে, তাকে বিষ দিয়ে মারতে নেই। সমস্ত পৃথিবী জয় করলেন পরশুরাম কিন্তু হার হলো তাঁর শ্রীরামচন্দ্রের কাছে। রঘুরাজ হেরেও কিন্তু আসলে জিতেই গেলেন।"

বলে, অনেকইত মাবামাবি করলে সারাজীবন, এবার বন্ধ করো শিকার-টিকার। বন ছেড়ে ঠুঠা বাইগা এবার নিজের মনের বনে ফিরে এসো। সেখানে মৃগয়া ক'জন করতে পারে?

এসব কথা চৈত্র মাসের দামাল হাওয়ারমতোইঠুঠা বাইগার মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। ঠুঠার কোনোই বৈকল্য ঘটে না। কিন্তু পৃথুর হয়। পৃথু যখনই আসে দিগার কাছে, তখনই সারা বেলা কাটিয়ে যায়। ভারী ভাল লাগে ওর মনটা।

আজ কোথাওই বেরোতে হয়নি দিগার। কাল, পৃথুই চাল ডাল আর আলু নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। রুষা, কাল বাড়িতে ছিলো না। মিলি ও টুসু গেছে মনিবাবুদের ওখানে। উইক-এণ্ড স্পেণ্ড করবে। আর রুষা গেছে কুর্চিদের ওখানে। হাটচান্দ্রা থেকে মোটে দশ মাইল, রায়নাতে নতুন সংসার পেতে বসেছে কুর্চি। ওকেও নেমন্তন্ন করেছিল। পৃথু, ইচ্ছে করেই যায়নি। যেতে চায় না ও। রুষাব সঙ্গে ত নয়ই। রুষা গেছে। শনিবার বলে, রাত কাটিয়েই আসবে।

কুর্চি আর ভাঁটুর এদিকে আসার খবরে পৃথু বিশেষই বিচলিত হয়ে রয়েছে কদিন হল। ভাঁটু একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর মাঝারী অফিসার ছিল। কোনো কারণে তার চাকরী গেছে। এখানে নাকি লাক্ষার ব্যবসা করবে। অন্য ব্যবসাও করবে টুকটাক। ব্যবসা করতে পারলে ওর ভালই হবে। কারণ ভাঁটু এমনিতে খুবই ঘুঘু ছেলে। ভেরী স্মুথ-টকাব। ভাল সেলসম্যান।

ভাঁটুর কারণে পৃথু আদৌ চিন্তিত নয়। ও চিন্তিত, কুর্চির কারণে। বেশ ছিল। চোখের দেখাও ছিলো না গত পাঁচ বছর। মানে, ওর বিয়েব পর থেকে। প্রথম প্রথম পৃথু মাঝে মাঝেই চিঠি লিখেছে। পাগলের চিঠি যেমন হয়। সাবধানী কুর্চি তখন শ্বশুরবাড়ি থেকে সাবধানে উত্তর দিয়েছে। বুদ্ধিমতী মেয়েদের মতন।

ভাঁটুব সঙ্গে ওর মনেব সঙ্গম হয়নি। মনেব সঙ্গম আব ক'জন দম্পতির মধ্যে হয়?

কুর্চি আবার রায়নাতে ফিরে আসাতে পৃথুর সমস্যাসংকুল জীবনে সমস্যা আরও বাড়বে।

কোনোই সন্দেহ নেই। কুর্চি কাছে থাকবে অথচ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, তার কাছে যাবে না, একথা ভাবাও ওর পক্ষে মুশকিল। কুর্চি তার ভালবেসে বিয়ে-করা স্বামীর ঘরে থেকেই, ভিক্ষা চাইতে যাওয়া পৃথুর হাতে, দূর থেকে হাত বাড়িয়ে একটু ভিক্ষা দেবে। নরম চোখে চাইবে, মিষ্টি গলায় কথা বলবে, মিটি-মিটি হাসবে আর না-বলে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেবে যে ; পৃথু তার কেউই নয়।

কুর্চি। তুমি কেন ফিরে এলে ? কেন এলে কুর্চি ? বেশ ত' ছিলাম, প্রায় ঘর-জামাই, স্ত্রী-তাড়িত, রুজি-রোজগার করা অঙ্গপ্রত্যঙ্গওয়ালা একটা মেশিন। তেল, মবিল, ডিপ্রিসিয়েশান, ইনপুট, আউটপুট সব প্রায় ঠিক-ঠাকই ছিল। ব্রেক-ইভিন্ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়ে সার্থক বশংবদ মুখে-জাল পরানো এঁড়ে বাছুরের মতো নিজেকে, অনবরত মেরে মেরে ঘেন্নায়, চোনায়, গোবরে তবুও আহা ! কী চমৎকার বেঁচেছিলো। মানুষেরই মতো। দশজন ভদ্রলোক মানুষ যেমন করে বাঁচে।

পৃথু বলছিল, নিরুচ্চারে, তুমি কেন এলে কুর্চি ?

কেন এলে ?

আহা ! কত্বদিন দেখিনি তোমাকে !

কুর্চি ! তুমি কেন এলে ?

পৃথু বেশ ছিলে তুমি। ভেবেছিলে, অন্য কোনো ঝড়ের মধ্যে আর পড়বে না। কোনোরকম ঝড। ঝড় ঝগড়া না, মারামারি না।

একটি কবিতা মনে পড়ে গেল। কেবলি কবিতা মনে পড়ে যায় ব্যর্থ কবির। ব্যর্থ প্রেমিকের। সফল কবিতা তাকে চেনে না, জানে না, তার পাঠানো কবিতাকে ব্যঙ্গ-ভরা হাসিতে পুড়িয়ে তারপর কুচি কুচি করে ছিঁড়ে, ওঁরাই ছেঁড়া কাগজেব ঝুড়িতে ফেলে দেন। অথচ এঁদের জন্যেই পৃথুর মতো একজন ব্যর্থ কবির বেঁচে থাকা। এদেরই বুকেব গভীরে শিকড় ছড়িয়ে রস টেনে এনে স্বর্ণলতার মতো নিজের উষর জ্বালাধরা অস্তিত্বতে একটু জলসিঞ্চন।

কেন এলে ? কুর্চি ? কেন যে এলে তুমি ?

মনে আছে ? তুমি একটি কবিতা শুনিয়েছিলে আমায় ?

কী যেন নাম কবিতাটির ? "তোমাকে বলেছিলাম" ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব সম্ভব তাই-ই হবে।

> "তোমাকে বলেছিলাম, যত দেরিই হক,
> আবার আমি ফিরে আসব।
> ফিরে আসব তল/আঁধারি অশ্বত্থগাছটাকে বাঁয়ে রেখে,
> ঝালোডাঙ্গাব বিল পেরিয়ে,
> হলুদ ফুলের মাঠের ওপর দিয়ে
> আবার আমি ফিরে আসব
> আমি তোমাকে বলেছিলাম।
> আমি তোমাকে বলেছিলাম, এই যাওয়াটা কিছু নয়,
> আবার আমি ফিরে আসব।
> ডগডগে লালের নেশায় আকাশটাকে মাতিয়ে দিয়ে
> সূর্য যখন ডুবে যাবে,
> নৌকোর গলুইয়ে মাথা রেখে
> নদীর ছলছল জলের শব্দ শুনতে শুনতে
> আবার আমি ফিরে আসব।
> আমি তোমাকে বলেছিলাম।"

কিন্তু এলে কেন ?

কেন ?

কাছে এলেই কি কাছে আসা যায় কুর্চি ? তুমিও ত' আরেকজন রক্তমাংসের সাধারণ মেয়েই। তুমি রুষার চেয়েও সাধারণ। অথচ আমার ভালোবাসা তোমাকে কী ঈশ্বরীর স্বমহিমাতেই না মহিমামণ্ডিত করে রেখেছে ! তুমি তোমার নিজের কাছেও বোধহয় ঈশ্বরী হয়ে গেছ। তোমাকে নিয়েই আমার বোধন, যত আগমনী গান, কুমারী পূজো। দেবীত্ব থেকে নেমে এসে, আমার জন্যে মানবত্বে ফিরতে পারবে ত' কোনোদিন ? কঠিন বড়। বিমল কর-এর 'ভুবনেশ্বরী'র মতোই ঈশ্বরী, তুমি হয়ত ঈশ্বরীই থেকে যেতে চাইবে।

তুমিও আমার কেউ নও। আমি জানি। কেউ হবেও না। কোনোদিন।

কাছে আসো আর দূরেই থাকো ; সবই আসলে দূরই। বড় দূর। বৃত্ত কখনও সম্পূর্ণ হয় না কুর্চি। ঘুরে, ঘুরে, দূরে, দূরে, সুরে, সুরে, আলো-ছায়ায়, মেঘ-রোদ্দুরে হেঁটে যাওয়ারই আর এক নাম জীবন। রিল্‌কের 'সনেটস টু অরফ্যুস' মনে আছে ? তা কেন থাকবে ? বিবাহিত নারীরা কবিতা শুধু পড়ে না তাই-ই না, মনেও রাখে না। কবিতা, শুধুই কুমারীদের জন্যে।

"থিংক অফ দ্যা স্প্যানস টু আ ম্যান ফ্রম আ মেইড, হুজ প্লেজার লিংগারস্ উইথ হিম্ শী ফ্লাইজ।"

ওল ইজ রিমোট—নো হোয়্যার ডাজ দ্যা সার্কল ক্লোজ্…"

কাছেই আসো আর দূরেই যাও। ঘুরে ঘুরে, দূরে, দূরে, সুরে, সুরে, আলো-ছায়ায়, মেঘ-রোদ্দুরে হেঁটে যাওয়ারই আর এক নাম জীবন।

বৃত্ত কখনই সম্পূর্ণ হয় না।

ঘটনা, এটাই।



ঠুঠা বাইগা আর দেবী সিং দুজনেই হাঁপাচ্ছিল।

আগের দিন ত' আর নেই !

একটা সময় ছিল যখন এর চেয়েও উঁচু পাহাড়ে ওরা চোদ্দ পাউন্ড ওজনের ডাবল্-ব্যারেল্ রাইফেল কাঁধে করেও প্রায় দৌড়ে উঠেছে।

চমৎকার মালভূমি। টাইগার প্রোজেক্ট হওয়ার পর থেকে জানোয়ার বেড়ে গেছে অনেক। গাছপালা, ঘাসবন সবই বেড়েছে। বছরের বারোমাস, জঙ্গল নিজেই নিজের মালিক হয়ে রয়েছে এখন। অন্য কারোরই তাঁবেদার নয় সে। অনেকদিন শরিকে শরিকে মামলা চলার পর মহাল্ ফিরে পেলে জমিদারের মনে যেমন এক আত্মপ্রসাদ আসে, কান্‌হার জঙ্গলের মনের এখন সেইরকম অবস্থা। বৃষ্টিও বেড়েছে জঙ্গল বাড়াতে, শুকনো নদী-নালা বেয়ে জল ছুটছে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে, সবুজ শাড়ি পরা মেয়ের মতো সবুজ চুল উড়িয়ে, সবুজ পাড় ছড়িয়ে দৌড়ে যাচ্ছে জঙ্গল। তাতে ঠুঠা বাইগার হারিয়ে যাওয়া গ্রামকে খুঁজে পাওয়া আরওই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে দেবী সিং বলল, চলো, মালভূমির অন্য দিকটাতে যাই। তারপর দ্যাখো ভালো করে, কোনো চিহ্ন দেখতে পাও কী না।

বিন্ধ্য আর সাতপুরা পর্বতমালাকে জুড়ে দিয়েছে মাইকাল পাহাড়শ্রেণী। এই বৃত্তর মধ্যেই বয়ে চলেছে একদিকে বান্‌জার, অন্যদিকে হাঁলো। এই দুই উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলই কান্‌হা। অপরূপ।

ঠুঠা বাইগা একটা চুট্টা বের করে, হাঁটু গেড়ে বসল, কাঁধ থেকে ঝোলা আর বন্দুকটা নামিয়ে রেখে দেবী সিংকে বলল, ধরাও ধরাও। অত তাড়া কিসের। চলো, যাব এখন। দিনের ত' অনেকই বাকি। আর রাত হলেই বা কি? রাতে আর দিনে তফাত কি খুব আছে আমাদের? তাছাড়া, এ যাত্রা তিনদিন তিন রাত থাকব বলে ত' ঠিকই করে এসেছি।

আসলে, মনে মনে ঠুঠা হাল ছেড়ে দিতে আরম্ভ করেছে। এ জীবনে ও আর ওর শিকড়ে ফিরতে পারল না বোধহয়।

দেবী সিং বলল, জানো ত', এখন জঙ্গলে চুট্টা খাওয়াও মানা। কখন আগুন লেগে যাবে। ফোরেস্ট-ফায়ার।

ঠুঠা বাইগা মুখ বিকৃত করে বলল, গুলি মারো! তিনকাল পার করে এককালে ঠেকলাম এসে, জঙ্গলের পোকা আমরা, আমাদের জঙ্গলের নিয়ম শেখাতে এলেন! বাঘ মারা মানা ' বাঘ দেখাও মানা। বাঘ-বাঘিনীর আদর-করা দেখলে মহা সর্বনাশ হবে। যেন তোমার ছোট ভাই আর ভাদ্র বউয়ের কারবারই দেখছ! শালারা! কালে কালে কতই দেখব আর! ' গ্রাম', গ্রামের চিহ্ন পর্যন্ত উড়িয়ে দিল, এখন ফোরেস্ট ফায়ারের ভয়ে গর্তে গিয়ে ঢুকব ছুঁচোর মতো! মনের সুখে একটা বিড়ি পর্যন্ত খেতে পারব না।

দেবী সিং, ঠুঠার চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। অনেক সাহেব-সুবো শিকারির সঙ্গে শিকার খেলেছে সারা জীবন। তাছাড়া, সান্‌জানা সাহেবের কাছে এক সময় থেকেছিল বলে সুশিক্ষাও পেয়েছে। সহবৎ শিখেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে শিখেছে নিজেকে।

ও বলল, রাগ করলে হবে কেন? তা হিসাব করে বলো ত ' দেখি, শুধু তুমি আর আমি মিলেই সারা জীবনে নিজেরাই ক'টা মারলাম এবং শিকারিদের দিয়েই বা ক'টা মারালাম? বাঘ। শুধু বাঘই। বাঘের হিসবেই ধরো শুধু। অন্য জানোয়ারদের কথা ছেড়েই দাও।

দেবীসিং-এর কথাতে দুজনেই আঙুল গুণতে লাগল নিজের নিজের হিসাব করে। ঠুঠা প্রথমে বলল, নিজে দশটা, শিকারিরা বারোটা।

দেবী সিং বলল, আমি ন'টা। শিকারিরা পনেরোটা। তবে? তবেই হিসাব করো। আমরা দুজনেই ছেচল্লিশটা সাবড়ে দিয়েছি। তা এমন চললে, বাঘের বংশ লোপই হয়ে যেতো না কি আর কিছুদিনেই? আমরা এবং আমাদের মতোই অন্যরাও এমন করলে?

ঠুঠা বলল, কিন্তু এর জন্যে দায়িটা কারা বলো দেখি? আমরা? না সরকার নিজে? যেই ইণ্ডিপিণ্ডিরি হয়ে গেল, অমনি···।

ঠুঠা এই ইংরিজীটা শিখেছে।

দেবী সিং শুধোল, মানেটা কি?

ভারত স্বাধীন, মানেই ইন্ডিপিন্ডিরি। ইন্ডিপিন্ডিরি হয়ে যেতেই সব শিকাব কোম্পানী গড়ে উঠল রাতারাতি, বর্ষার দিনে শালের জঙ্গলের নিচে অসংখ্য কুকুরমুত্তার মতো বিদিশি টাকার ভীষণই দরকার ছিল না কী সরকারেব সেই সময়। ফোরিন্ ইক্সচিঞ্জ্। একটা বাঘ মারতে পারলে, বা একটা বাঘকে মাচার নীচে বা জীপ থেকে দেখাতে পারলেই এক এক কম্পানী পাঁচ-পাঁচ হাজার দশ-দশ হাজার ডলার পেত। সে শিকারী ছাই, বাঘ মারতে পারুক আর নাই-ই পারুক। গরমেন্টের 'ফুরেন্ ইক্সচিঞ্জি' হত। তা 'ফুরেন ইক্সচিঞ্জি' করতে গিয়েই ত' সব বাঘ ফুটে গেল। হিসেব করে বলো দেখি, ইংরেজ আমলে ক'টা বাঘ মারা পড়েছে এই মুক্কি, সুফকর, ভাইসেনঘাট, কিস্‌লি কী সীওনী বা মান্দলাতে? ক'টাই বা মারা পড়েছে ইণ্ডিপিণ্ডিরির পর? ইংরিজি আমলে আইন, শৃঙ্খলা, ভয়-ডর ছিল। ইণ্ডিপিণ্ডিরি হয়ে, সবই গেল। যাই-ই বল, আর তাই-ই বল।

দেবী সিং চুট্টায় বড় একটা টান লাগিয়ে বলল, 'সবই গেল' এ কথাটা তোমার বোধহয় ঠিক

নয়। অনেকেই ভাল হয়েছে। সবই খারাপ হয়েছে এ কথা বলাটা অন্যায়। তোমার নজরটা বড়ই একপেশে ঠুঠা।

তা হবে!

অভিমানের গলায় বলল ঠুঠা!

তারপর তাকিয়ে রইল বিস্তীর্ণ ঘাসে ছাওয়া মালভূমিটার দিকে। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। সকালের রোদেও গা-হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মেমসাহেবের চুলের মতো নরম, সোনালি দেখাচ্ছে হাওয়াতে ইলিবিলি-কাটা ঘাসের মাঠকে। ধু ধু করছে ভোঁর ঘাসের মাঠ। মধ্যে একটি মাত্র শিমুল দাঁড়িয়ে আছে, একা। যেন, বস্তির গাওয়ান্। একটি ঝর্ণা মালভূমি ফুঁড়ে বেরিয়ে কোনাকুনি নেমে গেছে পাহাড়ের গায়ের হরজাই জঙ্গল, বাঁশের ঘন ঝাড় বেয়ে নিচের ঘন গভীর কালচে শাল জঙ্গলের দিকে।

পাহাড়ের পায়ের কাছে বাঁশই বেশি। বাইসন, বাঘ, শুযোররা পছন্দ করে, এই বাঁশ জঙ্গল। এইসব জঙ্গলে হাতী নেই। কেন নেই, তা বলতে পারবে না ওরা, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই দেখেছে যে, নেই। হর্‌জাই জঙ্গল, পাহাড়ের গায়ে গায়ে। জঙ্গল খুবই ঘন। নিচে নেমে গেলে শালই বেশি। আর মাঝে-মাঝেই প্রকাণ্ড সব ঘাসীমাঠ, যাদেরই কোনো একটার মধ্যে লুকিয়ে আছে ঠুঠার গ্রাম। গ্রাম, গ্রামেব স্মৃতি।

এই সমস্ত জঙ্গলই পাতা-ঝরা জঙ্গল। কোনোদিনও পাতা ঝরে না, এমন চিব সবুজ জঙ্গল আছে বলেও শুনেছে ঠুঠা ও দেবী সিং, অনেক বিদিশি শিকারির কাছে। কত দেশের শিকারিই দেখল ওরা এ জীবনে! কত সাহেব, মেমসাহেব, কত হাসির, কত দুঃখের, মজার সব কাণ্ড কারখানা। ভাবতে বসলে, সময় উড়ে যায় কাপাস্ তুলোর মতো। তাই-ই ভাবে না। সে সব নিয়ে লিখতে পারলে, যদি তেমন লেখাপড়া জানত ওবা, তবে কত কীই না লিখতে পারত। মোটা-মোটা সব দুঃখ-হাসিব বই।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে, ইংরেজদের আমলে, পশ্চিমে বান্‌জার-এর উপত্যকা এবং পুবে হাঁলোর উপত্যকায় প্রথমে এই কান্‌হা পার্ক-এর পত্তন হয়েছিল। পরিষ্কার মনে আছে দেবী সিং-এর। মধ্যপ্রদেশ বলে কোনো জায়গাই ছিলো না তখন। সি পি, সেন্ট্রাল প্রভিন্স্। সাহেবরা বলত। সি পি টিক্। সি পি টাইগার। সেগুন ও শাল দুই-ই যদিও বিখ্যাত, তবু, সেগুনেরই নাম ছিল বেশি। বার্মার স্যালউইন্ নদীর উপত্যকায় নাকি সবচেয়ে ভাল সেগুন হত। কিন্তু ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভাল সেগুন হত এই সেন্ট্রাল প্রভিন্স্ বা সি পি-তেই। সি পি ছাড়াও বার্মার সীমান্তে, মণিপুরেও ভাল সেগুন পাওয়া যেত।

সান্‌জানা সাহেবের কাছেই এসব শুনেছিল দেবী সিং।

এসব গল্প দেবী সিং-এর ছেলে বা নাতিকে করলে তারা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। সে সব এক অন্য জগতের ; অন্য সময়ের খবর। এরা জানবে কী করে! তাছাড়া, ওসব ব্যাপারে ওদের কোনো আগ্রহও নেই।

ঠুঠা ভাবছিল, উনিশশো পঞ্চান্ন-ছাপান্ন সালে কান্‌হার ন্যাশনাল পার্কের পত্তন করলেন ফরেস্ট ডিপার্ট। ইণ্ডিপিণ্ডিরির পর। কিন্তু সেই পার্কে-র এলাকা ছিল বান্‌জার-এর উপত্যকার এ এলাকাই। তাই না?

চুট্টার ছাই ঝেড়ে ঠুঠা শুধোল দেবী সিংকে।

যতদূর মনে পড়ে, ঠিকই। তবে, ঐ সময় বোধহয় এলাকা বাড়িয়েও ছিল একটু। মনে নেই? সেই যেবার কলকাতার গুহ সাহেব এসেছিলেন। ফারস্ট-ক্লাস একটা বাঘ মারলেন। নর্ বাঘ। সঙ্গে তাঁর বন্ধু এসেছিলেন জন্‌সন্ সাব্। সেই যে মাদীন্ বাঘ মারলেন যিনি। কোন্ জনসন? সেই যে হে, দণ্ডকারণ্যর লেস্‌লি জন্‌সন সাহেব, আই সি এস্-এর ছোট ভাই। কে, ই জনসন। কি হে ঠুঠা। ভুলেই গেলে? সাহেবরা ঘড়ি দিয়ে গেলেন দুটো আমাদের। যাওয়ার সময়। গুহ সাহেবের সেই বাঘটা নিয়ে গণ্ডগোল হল না কত?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার মনে পড়েছে। সেই জন্‌সন্ সাব ত দিল্লীর রেভিন্যু বোর্ড-এর মেম্বার ছিলেন। তাই না ? মনে আছে না ? খুব আছে। আরে গণ্ডগোল বলে গণ্ডগোল। গুলি খেয়ে বাঘ গিয়ে সেঞ্চুরী-এরিয়ার মধ্যে ঢুকল। গুহসাহেব পায়ে হেঁটে বাঘকে ফলো করে মারলেন। তুমি আর আমি দুজনেই ত' ছিলাম সঙ্গে। কি দেবী সিং ? ঠিক বলছি ত' নাকি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। সব মনে আছে। চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঠুঠার। হ্যাঁ ! ফোরেস্ট-ডিপার্ট কেস করবে বলল। বলল, বাঘ মারা হয়েছে সেঞ্চুরীর ভিতরে।

দ্যাখো মজা ! বাইরে গুলী খাওয়া বাঘকে যদি সেঞ্চুরী এরিয়ার মধ্যে ছেড়ে দিতেন গুহসাহেব, তাহলে ল্যাভটা কার হত ?

বাঘেরই হত ! আর কার ? জমিয়ে ফোরেস্ট-ডিপার্টের গার্ডদেরই খেত, মানুষখেকো হয়ে।

ওরা দুজনে হাসল একসঙ্গে।

হ্যাঁ তখন সেঞ্চুরীর এরিয়া বাড়িয়ে করল কত ?

ঠিক কত মনে নেই, বোধ হয় সাড়ে চারশ' মতো হবে।

সাড়ে চারশ' ? কি মাইল ?

আরে ইস্‌কুয়ার। ইস্‌কুয়ার কিঃ মিঃ। তখন ত কিমিটিমি ছিলো না। মাইল। ওরকমই হবে। কাছাকাছি।

ঠুঠা বলল, হবে কিমি কিংবা মাইল তা যতখানি হোক। বাইশটা গ্রাম ত' উচ্ছেদই করে দিল।

ঐ বাইশটা ছাড়া, আগে যেসব গ্রাম মহামারীতে উজোড় হয়েছিল সেগুলোকে খেয়েছিল জঙ্গল। আমার গ্রামটাও খেয়ে দিল। গ্রাম-খাকী ! থুঃ।

আওয়াজ করে থুথু ফেলল ঠুঠা বাইগা।

এখন সেঞ্চুরীর এরিয়া কত ?

এখন ? সবসুদ্ধু দু' হাজার ইস্‌কুয়ার কি মি-র উপরই হবে। কম নয়। বাফার জোন্-টোন নিয়ে। অবশ্য, বন এবং জানোয়ার বাড়াবার জন্যে অনেক কিছুই করছে কিন্তু এখন ফরেস্ট ডিপার্ট।

তা করুক। কিন্তু এই শালা রেঞ্জার মহা টেঁটিয়া আছে। আমরা সব আদিবাসী। আমাদেরও শিকার একেবারে বন্ধ করে দিল। একদিন হয়ে যাবে ইস্‌পার-উস্‌পার।

দেবে একদিন একঠে তীর ঠুকে, কোনো ছেলে-ছোক্‌রা।

হুঁ ! ছেলে-ছোকরারা কী আমাদের মতো ? আমাদের মতো হিম্মৎই নেই তাদের।

তা যা বলেছো। হিম্মৎ নেই। গায়ে জোর নেই।

চলো, এবার যাওয়া যাক।

কোন্‌দিকে ?

চলো, এই ঘাসবনের শেষ কি আছে দেখে আসি। যদি পাহাড়ের ঐ মাথায় গিয়ে কিছু দেখতে পাও।

এ ত' মস্ত মাঠ। দেবী সিং। এর শেষই নেই।

আছে। আছে। শেষ নেই এমন কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে ? সব কিছুরই শেষ আছে।

শেষে পৌঁছেও যদি না দেখি ? না দেখতে পাই ?

তবে আবারও দেখব। মানে, খুঁজব। খুঁজতেই যখন এসেছি।

তারপর ঠুঠাকে প্রবোধ দেওয়ার গলায় বলল, তুমি বড় সহজেই নিরাশ হয়ে পড় ঠুঠা। যত সহজে ভাবছ, তত সহজে নয়।

কি ? করবেটা কি ?

আবার নতুন জায়গায় খুঁজব। তোমার গ্রাম বের করবোই। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামে, মঙ্গলা বলে কোনো মেয়ে ছিল ? ভারী মিষ্টি মেয়ে।

ছিল !

উদাসীন গলায় বলল ঠুঠা।

ছিল ?

বললাম ত হ্যাঁ ! কেন ? তুমি চিনতে ?

হুঁ !

যাঃ শালা !

কেন ?

আমারও ভাল লাগত ওকে। তা বিয়ে করল ইতোয়ার। দেখো দেবী সিং. দোস্তী আমাদের জবরদস্ত হওয়ার আরও একটা কারণ ঘটল বল ?

ঠিক।

তাহলে, গ্রামটা বোধহয় পেয়েই যাব, কি বল ?

বান্‌জারী যাব বলেই ত' আসা। আচ্ছা, তোমাদের বান্‌জারী গ্রামের সেই শিমুল গাছ দুটো ঠিক কেমন ছিল ?

দেবী সিং শুধোল।

ওরে বাবাঃ। মস্ত শিমুল। অত বড় জোড়া শিমুল এ তল্লাটেই ছিলো না। বাবার কাছে গল্প শুনেছি নাঙ্গা বাইগা আব নাঙ্গা বাইগীনের নামে আমার বাবার ঠার্কুদা পুঁতেছিল শিমুল দুটো। বান্‌জারেব পাশের এক বাইগা গ্রাম থেকে চারা তুলে এনে।

নাঙ্গা বাইগা নাঙ্গা বাইগীনের নামেই যদি লাগালো, ত' সাজা গাছ লাগালো না কেন ? শাকুয়াও ত' পারত লাগাতে ?

দেবী সিং শুধোলো।

কেন, তা কি করে জানব।

চলো। এবার ওঠো। অনেকক্ষণ আরাম হয়েছে।

ওরা দুজনে হাঁটতে লাগল, পৌষের রোদে, সোনালি ধু ধু ঘাসের বনে, সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর মাথার উপরের এক অনামা মালভূমিতে। শীতের হাওয়া হু হু করে ঘাসে বিলি কেটে ওদের চুল এলোমেলো করে বয়ে আসছিল পশ্চিম থেকে, পাহাড়শ্রেণীর গায়েব শীতের দিনের রুখু, কিন্তু মিষ্টি গন্ধ বয়ে নিয়ে। সোঁ সোঁ করছে হাওয়াটা। হাওয়ার স্রোতের বিপরীতে, ওদের মাথা সামনে সামান্য ঝুঁকিয়ে, একটি হারিয়ে যাওয়া গ্রামের ইতিহাস পুনরাবিষ্কারের উদ্দেশ্যে জঙ্গল পাহাড়ের দুজন আদিম প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী হেঁটে চলেছে। তাদের একজনের কাঁধে একটি দোনলা বন্দুক। অন্যজনেরও কাঁধে একটি এক নলা। গাদা। একটি করে সস্তা কাপড়ের থলে, তাতে দুটি কম্বল। কিছু চাল-ডাল, আলু, নুন। অনেকই সম্ভার।

প্রকৃতি সব কিছুই দিয়েছিলেন মানুষকে, এবং অন্যান্য প্রাণীদের। অন্যদের সকলেরই কুলিয়েও গেল তাতে। কুলোল না একমাত্র মানুষেরই। বড় লোভী, মূর্খ জানোয়ার এ। সকলের জন্যেই সব ছিলো। জংলী কুকুর ঢোল্‌দের জন্যে বারাশিঙা, খরগোশ-এর জন্যে ঘাস, শেয়ালের জন্যে খরগোশ, হরিণের জন্যে আমলকী, চিতার জন্যে হরিণ, শম্বরের জন্যে বহেড়া, কুল্‌থী, অড়হর, আর বাঘের জন্যে শম্বর।

একটি বন্দুক আর একমুঠো চাল ডাল এবং একটি কম্বলেই স্বচ্ছন্দে হেসে, গেয়ে, নেচে, হয়ত চলে যেত দিন, সাধারণ মানুষের। এত দৌড়তে হতো না, টেনশান থাকত না, লোভ মানুষকে এমন করে গলায় দড়ি বাঁধা কুকুরের মতো টেনে নিয়ে যেত না ক্রমাগত তার অবধারিত মৃত্যুর দিকে। মানুষই সর্বনাশ করেছে মানুষের। মানুষের লোভ আর অতিমাত্রায় ঔৎসুক্য-ভরা মস্তিষ্কই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। অথচ যে শত্রুর বাস তার বুকের ভিতর, তার মস্তিষ্কের ভিতরেই, তাকে সে চিরদিন খুঁজে বেড়িয়েছে বাইরে।

ঠুঠা খুঁজছে ওর হারিয়ে-যাওয়া জঙ্গলের গ্রামকে। ঠুঠার অত সব গভীর ভাবনা ভাবারমতো মানসিকতা নেই। শিক্ষা নেই, বুদ্ধি নেই। যদি থাকত, তবে ও নিশ্চয়ই জানত যে ও একা নয়, জানত যে হাটচাপ্রার সাহেবদের মতো,এ পৃথিবীর অসংখ্য পোকার মতো অগণ্য শিক্ষিত সর্বজ্ঞ

মানুষদেরও একাধিক গ্রাম ছিল, যেখানে ছিল মানুষের আদিবাস ; সেই মস্ত আদিবাস শহরের মালটিস্টোরিড্ বাড়ি, টি-ভির অ্যান্টেনা, কনস্যুমার গুডস্-এর বিজ্ঞাপনের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। যা-কিছু অনাবিল ছিল, সেই সমস্ত কিছু অনাবিলকে মানুষ তার নিজের হাতেই আবিল করেছে, লোভে, ঈর্ষায়, অন্য মানুষের প্রতি জীঘাংসায়। হয়ত, ঠুঠার গ্রামেরই মতো, আদিবাসটিকে এরা কেউই ইচ্ছে করলেও আর খুঁজে বের করতে পারবে না। অপ্রয়োজনের বিলাস, অকারণ প্রতিযোগিতা, অনভিপ্রেত ঈর্ষার ইথারে হারিয়ে গেছে, সেই সব সুন্দর সুখী গ্রামগুলি, দিনগুলি চিরতরে, যে সব গ্রামে, যে সব সুন্দর শান্তির, নূপুর-নিক্কণিত অবকাশে মানুষ নামক একদল জীবের স্থায়ী ভাবে এবং সুখে বাস করবার কথা ছিল।

তফাৎটা এই-ই।

প্রাকৃত, ইংরিজী না-জানা "অশিক্ষিত" ঠুঠা তবু খোঁজ করে, তার আদিবাসের। উজোন বেয়ে যাবার মতো মানসিক জোর এই সামান্য মানুষটার তবুও আছে। সে পরশ পাথরের মতো তবুও খুঁজে ফেরে। খোঁজে না, বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষেরা।

ওরা দুজনে চলেছে। সারা দুপুরই প্রায় চলতে হবে ওদের ঐ ঘাসী মালভূমিটুকু পেরুতে। কাঁধে-ঝোলানো দুটি বন্দুকের কালো নল উঁচু হয়ে আছে ওদের দুজনের মাথার উপরে। ওদের দুজনকে দূর থেকে দুটি আলাদা মানুষ বলে আর চেনা যাচ্ছে না। আসলে, বোধহয় কোনো মানুষই আলাদা নয়।

এখন ওরা আরও দূরে চলে গেছে, হাওয়ায় ঢেউ-খেলা ঘাসবনে। এতই দূরে যে, এখন মানুষ বলেও ওদের চেনা যাচ্ছে না। বন্দুকের নল দুটিকে মনে হচ্ছে, দুটি শিং। মনে হচ্ছে, অদ্ভুত দর্শন, দু'শিং এবং চার-পা-ওয়ালা কোনো এক বিদ্‌ঘুটে জানোয়ার এলোমেলো পা ফেলে হেঁটে চলেছে সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর মাথার উপর দিয়ে, আদিম গন্ধ-ভরা ঘাসে ঘাসে কোনো অজানা গন্তব্যের দিকে। তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, পাখিরই ভাষার মতো, বারাশিঙারই ভাষার মতো, তাদেরও এক ভাষা আছে। যদিও কথা বলছে ওরা, কিন্তু বড়হা দেব-এর ফুঁ-এর হু-হু হাওয়া ওদের সব কথা উড়িয়ে নিচ্ছে, কাপাস তুলোর মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘাস বনে। বনে বনে কানাকানি উঠছে। বড়হা দেব, কিছুটা ক্ষমা, কিছুটা স্নেহ, কিছুটা অনুকম্পার সঙ্গে চেয়ে আছেন তাঁরই সৃষ্টির এই আশ্চর্য, গোলমেলে দুটি দু-পেয়ে প্রাণীর দিকে।

মালভূমির ঘাসী-প্রান্তর পেরোতে ওদের প্রায় দু ঘণ্টা লাগল। এই দু' ঘণ্টার সমস্ত সময়ই এক ঝাঁক লাল আর হলুদ প্রজাপতি ওদের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়তে উড়তে, কাঁপতে কাঁপতে গেল, যেন রাজার মাথায় ছাতা ধরে।

প্রান্তরের শেষে পৌঁছে আবারও ওদের অবাক হবার পালা।

একটা বড় পাথরের উপরে বসে পড়ল দুজন। যারা উলঙ্গাবস্থা থেকে জঙ্গলের মধ্যেই বড় হয়েছে তাদেরও অবাক করার মতো অনেক কিছু এখনও গোপন আছে বনের বুকের কোরকে। কী আশ্চর্য! ভোঁর ঘাসের এক আদিগন্ত মাঠ। লাল-সাদা ফুলে, বুড়ি বিকেলে সেই মাঠকে কোনো স্বপ্নের মাঠ বলে মনে হচ্ছে। বাঁয়ে, মাঠের সীমানা দিয়ে বয়ে গেছে বান্‌জার নদী। সাদা বালি এবং পাথরের রেখায়। এত উপর থেকে দূরের নদীকে মনে হচ্ছে একটি দুধ-রঙা অজগর সাপ, এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে তার স্বপ্নের গুহার দিকে।

দেবী সিং প্রথমে ঘোর কাটিয়ে উঠে কথা বলল।

বলল, এই মাঠের মধ্যে কতগুলো গ্রাম ঘুমিয়ে আছে কে জানে?

ঠুঠা কথা না বলে, চেয়ে ছিল নিচে।

কোথায় গেল? শিমুল দুটো? কোথাও কোনো চিহ্নই নেই। নাঃ। এখানে ছিলো না তাদের গ্রাম। গ্রামের কাছের নদীর চেহারাও ছিল অন্যরকম। নদীতে একটা মস্ত দহ ছিল উঁচু প্রপাতের নিচে। সাঁতার কাটত ওরা ছেলেবেলায়। হন্‌সোকে একদিন আদর করেছিল চ্যাটালো গরম পাথরে শুইয়ে এক শীতের দুপুরে সেইখানে।

কিংবা কে জানে ? হয়ত এত দূর থেকে ওরই ঠিক ঠাহর হচ্ছে না।

দেবী সিং বলল, কি বুঝছো হে, ঠুঠা ?

এত কাটাং আর ছোটা বাঁশ এল কোত্থেকে বলত ? ঘাসী মাঠের ডানদিকে ? পাহাড়ের পায়ের কাছে ?

স্বগতোক্তির মতো বলল ঠুঠা।

আমার "বান্‌জারী" গ্রামের কাছে কোনোরকম বাঁশই ছিলো না। বস্তির বড়দের যেতে হত তিন ক্রোশ পথ কাটাং বাঁশ আর ছোট বাঁশ কেটে আনতে ঘর তৈবী বা মেরামতের সময়।

তবে ?

এ নয়।

কি করবে ?

যাব।

কোথায় ?

ঐ মাঠে নামব।

তারপর ?

মাঠ পেরোব।

তারপর ?

শ্রাবণের ঘন কালো মেঘের মতো শালের বন পেরোব।

তারপর ?

আরো অনেক বন, নদী, সাতপুরা, মাইকাল ; সব পাহাড়, সব মাঠ।

তারও পর যদি না পাও ?

পাব।

মনে মনে নিরুচ্চারে বলল, পাবই !

আমি মানুষের বাচ্চা। প্রকৃতি, এই বন, এই পাহাড় নদী এদের কারো কাছেই আমি হার মানব না দেবী সিং। তুমি শুধু আমাকে একটু সাহায্য কোরো। আমার হারানো গ্রামকে আমি খুঁজে বের করবই। যতদিন প্রকৃতিব মধ্যে, প্রকৃতিরই এক জানোয়ার হয়ে বাস করেছিলাম ততদিন অন্য কথা ছিল। এখন বেরিয়েই যখন এসেছি, অন্য জাতের হয়ে গেছি, অন্য গ্রামে বাস করছে আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা, গা থেকে বনেব গন্ধ মুছেই যখন গেছে, তখন আমি ত' বেজাত সাহেব কোম্পানীর কর্মচারী, এখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। প্রকৃতিকে ভাল করে আমিও শেখাব। শালী ! আমার গ্রাম না দেবে ত' আমিও ওকে দেখে নেব। সাইআম, উইক্কে, কুস্‌রে, ধারয়া, মারাই, বড়াহ্‌দেব সব দেব-দেবীরই আমি মাথা ফাটিযে দেব পাথর মেরে, যদি-না এই কান্‌হার বন আমাকে আমার গ্রাম ফিরিয়ে দেয়।

দেবী সিং ঠুঠা বাইগার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে একটা চুট্টা বের করে মুখে দিতে যাচ্ছিল। ওর দিকে ফিরে ঠুঠা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, পাব। ঠিক পাব। দেখে নিও তুমি, দেবী সিং।



যাবে বলে ঠিক করে বাড়ি থেকে বেরোয়নি পৃথু, কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে শেষে গিরিশদার বাড়ির পথই ধরল।

গিরিশদার বাড়িটা ভুলভুলাইয়ার উল্টো দিকে। হাটচান্দ্রার মূল সীমানা পেরুনোর পরই এদিকটা বেশ নির্জন। কাঁচা রাস্তাটা গিয়ে পুন্নার গভীর জঙ্গলের ফরেস্ট রোডে মিশে গেছে। রাস্তাটা ঢালু হয়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট নালা পেরিয়েছে। তার নাম পিরপিরি। উপরে একটা কজওয়ে। নালাটার পরই সেগুনের প্ল্যান্‌টেশান্‌। চল্লিশ বছরের পুরনো। যখনই এই প্ল্যানটেশানটা পেরোয়, পৃথু ভাবে ; যদিও এই সেগুনেরা এখন পৃথুরই সমবয়সী, ওর জীবনাবসানের অনেক দিন পর অবধিও ওরা সতেজ, প্রাণবন্ত থেকে যাবে। সৃষ্টিতে মানুষ অনেকেরই চেয়ে কম দীর্ঘজীবী। ক্ষিদে জ্বালায় শরীরকে; আর চিন্তা জ্বালায় মনকে। থাকার মতো মন ত' শুধু মানুষেরই থাকে। এই মন জ্বলে গেলে, নির্মন মানুষের আর বাকিটা কি থাকে ? খোলসটার দাম ত' সাপের খোলসের চেয়েও কম। মানুষ কি একটি সেগুনের চেয়েও কম মূল্যবান যে, এই জমকালো রঙ্গমঞ্চে তার অবস্থান এতই স্বল্প সময়ের জন্যে ?

বেলা পড়ে এসেছে। কার্তিকের বিকেলের এক বিশেষ কারুণ্য আছে, এবং তা যেন দিনশেষেই সবচেয়ে বেশি করে প্রতীয়মান হয়। বড়কি ধনেশের একটি ছোট্ট ঝাঁক গ্লাইডিং করে স্থির ডানায় পশ্চিমের আকাশকে এক গভীর স্তব্ধতা ও গাম্ভীর্যে মুড়ে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ডুবন্ত সূর্যের গলে-যাওয়া টেরাকোটা বিধুর বৃত্তর মধ্যে। দিনান্তর মধ্যেও অন্য দিনান্ত থাকে। সূর্যের গলিতার্থর মধ্যেও অন্য গলিতার্থ ; যার রহস্য বিজ্ঞানীদের আজ অবধিও অজানা, কিন্তু সেই রহস্যর খোঁজ যেন ইতিহাসের সমবয়সী ধনেশ পাখিরাই একমাত্র রাখে।

কত রহস্য চারদিকে। রহস্যময়তায় দিগন্তবেলার পেঁয়াজখসী কাতান বেনারসী-জড়ানো প্রকৃতি যেন বিশ্বচরাচরের দূর দূরান্তরের শীতার্ত প্রান্তর থেকে মাধুকরী শেষে তার পর্ণকুটিরে ফেরে। আসন্ন সন্ধ্যার নিবাত নির্লিপ্তিতে হেমন্তের হিমের গন্ধ ভাসে। পৃথুর চারপাশে, কারা যেন যায় আসে, কাঁদে হাসে ; অশরীরী, আশ্চর্য সব বোধ। এমনই কচিৎ স্তব্ধ, শান্ত, নির্লোমি অনুভূতির সীমিত বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও অন্য পৃথিবীর জীবাশ্ম এবং প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। খুব ভাল লাগতে থাকে ওর। তারপরই ; হঠাৎ, ভয় করে।

একদিন যেতে বলেছিলেন গিরিশদা ওকে। রাম আর সুজির খিচুড়ি খাওয়াবেন বলেছিলেন। সেদিনটা কবে, পৃথু ভুলে গেছিল। আজকাল কোনো কিছুই তেমন স্পষ্ট করে মনে থাকে না। একদা-পরিচিত মানুষের মুখ, নেমন্তন্নর দিন, কে বা কারা তাকে একদিন অনেক ভালোবেসেছিল অথবা অপমান করেছিল এ সবই ভুলে যায়।

ভুলে যাওয়াই ভাল। ভুলে না যেতে পারলে কি কোনো মানুষ বাঁচে ? এই অকৃতজ্ঞতার, কৃতঘ্নতার পৃথিবীতে ! সব কিছুই মনে রাখতে গেলে মনের মধ্যে এক বিরাট ক্যান্‌সারাস গ্রোথ হয়ে উঠবে যে কুৎসিত ; তারপর সেই দলা-পাকানো ভীতিজনক স্মৃতি নিঃশব্দে ফেটে যাবে এক সময় মস্তিষ্ক খান খান করে দিয়ে। তাই-ই ও সহজে সবকিছু ভোলে। সুন্দর অতীত এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন ছাড়া তার ক্লিষ্ট মস্তিষ্কে আর কিছুই ধরে রাখতে চায় না পৃথু।

মুনেশ্বর বাগানে ঝারি হাতে জল দিচ্ছিল। ওকে দেখে, মুখ নিচু করেই বলল, পর্‌নাম্‌ পির্‌থুবাবু।

পর্‌নাম। তোর বাবু কোথায় ?

বাবু, হাওয়া ধরছেন।

হাওয়া ধরছেন ?

পৃথু ভাবল, মুনেশ্বরও কি তাকে ইয়ার ঠাওরাল না কি ? যাকে দেখলে মনে হয়, পয়সা নেই ; পদমর্যাদা নেই, যার কাউকেই ভয় দেখাবার, ভয় পাওয়াবার ক্ষমতা নেই, তাকে সকলেই ইয়ার ভাবে। ইয়ার্কি করে তার সঙ্গে।

হাওয়া ধরছেন ? কোথায় ?

ঐ ত' ! পেছনের টাঁড়ে।

গিরিশদার "স্কটিশ কটেজ"-এর পেছনে অনেকখানি টাঁড় মতো জায়গা। সেখানে লাল মাটি, খোয়াই, ঝাঁটি জঙ্গল, তিতির আর খরগোশের বাস। মাঝে-মধ্যে কোটরা হরিণ চলে আসে উদ্‌ভ্রান্তের মতো জঙ্গলের গন্ধ মেখে। শেয়ালরা ধূর্ত চোখে ইতি-উতি চাইতে চাইতে শর্ট-কাট করে যায় পুন্নার জঙ্গলের দিকে আসতে-যেতে। সেই টাঁড়েরই মধ্যে একটা প্লাটফর্ম মতো দাঁড় করানো। শালবল্লী আর লতা দিয়ে বানানো হয়েছে পোক্ত করে। গিরিশদা কোনোরকম অপোক্ত ব্যাপারে বিশ্বাস করেন না। সেই প্লাটফর্ম-এর উপরে বাঘ শিকারের মাচার মতো করে বানানো হয়েছে পেল্লায় এক মাচা, শালের চেরা-তক্তা ফেলে। যজ্ঞিবাড়ির একটা প্রকাণ্ড কেলে-পেছন, কাৎ-করানো হাঁড়িকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে সেই মাচার উপর। সেই হাঁ-হাঁড়িটার কেলে পেছনে একটি ফুটো। দেখা যাচ্ছে না ; কিন্তু আছে। সেই ফুটোর মুখে ক্লিপ, শালগম আর লেটুসের ক্ষেতে জল দেওয়ার স্বচ্ছ পলিথিনের পাইপ। পাইপের অপর প্রান্ত "স্কটিশ কটেজ"-এর ভিতর অবধি চলে গেছে। সাপের মতো ঢুকে গেছে এঁকে বেঁকে সেই ঘরে, যেখানে বসে গিরিশদা কাব্য এবং নানাবিধ গা-শিউরানো সৃষ্টিশীলতার চর্চা করে থাকেন। সেই ঘরে। মাচার নিচে, লাল মাটিতে একটি রঙ-চটা টেবল ফ্যান, কেৎরে পড়ে উপরের হাঁড়ির দিকে সন্দেহজনক চোখে চেয়ে আছে। লাল-নীলে জড়ামড়ি করা তার এসেছে দূরের "স্কটিশ কটেজ"-এরই ভিতর থেকে। গিরিশদা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এবং প্রাণপণ চেষ্টাতে তাঁর একজোড়া ক্রিয়েটিভ দুব্‌লা পাতলা হাতে টেব্‌ল-ফ্যানটাকে একটা ছোট্ট কাঠের পুলির সাহায্যে মাচার উপরে ওঠাবার নিষ্ফল চেষ্টা করছিলেন। পৃথু যে গিয়ে তাঁর একেবারে পেছনেই দাঁড়িয়েছে, তা লক্ষ্য পর্যন্ত করেননি। হঠাৎই মুখ ফিরোতেই পৃথুকে দেখতে পেলেন।

কি গিরিশদা ? এটা আবার কি হচ্ছে ? নতুন কোনো এক্সপেরিমেন্ট ?

অ্যাই ত' !

খুশী হয়ে গিরিশদা বললেন, এসসে গেছো। বাঃ একেবারে গড - সেন্ট। হোলি-মিশানে, এরকমই হওয়ার কথা।

কী হচ্ছে কি এটা ? কিসের হোলি-মিশান ?

এখনও কিছু হয়নি। তবে, হতে পারে। সাকসেসফুল হলে, একটা হওয়ার মতো হওয়া হবে। পুরো কলকাতা শহরের চেহারাটাই পাল্টে যাবে তখন। ঠাট্টা কোরো না। কলকাতার জমি-বাড়ির দাম বম্বে-ব্যাঙ্গালোরের মতো হয়ে যাবে। আর ইন দ্যা প্রসেস আমিও কোটিপতি হয়ে যাবো। অক্সিজেন-হীন ডিজেলের ধোঁয়ায় খাবি-খাওয়া শহরে ছেলে-মেয়েরা সব ফুটফুটে ফুলের মতো হয়ে যাবে। তুমি এজেন্সী নিতে চাও আমার নতুন কোম্পানীর, ত' দিতে পারি। ভেবে দ্যাখো। কিন্তু এদেশে মানুষ কিছু করবে কি ? করতে গেলেই ত' বাধা। নিজের কাজে কেউ বাধা দেয় না। দেশের কাজ করতে গেলেই টিটকিরি ! এসো ত' ভায়া, একটু হাত লাগাও দেখি। এই ফ্যানটাকে তুলে ঠিক ঐ হাঁড়ির মুখ থেকে তিন হাত পেছনে করে মাচাটার উপর দাঁড় করাতে হবে। পুরনো আমলের ফ্যান। বাবা নাগপুরে থাকতে কিনেছিলেন। তাঁর মাথার পেছনে রেখে রাত দুটো অবধি শুয়ে শুয়ে ওয়েস্টার্ন ব্যাং-ব্যাং নভেল পড়তেন। এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কিনেছিলেন এই ফ্যানটা। খাঁটি বিলিতি জিনিস। এ-সবের কোনো প্রোটোটাইপ হয় না। আর দ্যাখো না, ওজনও তখনকার দিনের দশাসই খাঁটি মেমসাহেবদেরই মতো। একা উঠোনোই যায় না। ঐরকম সব

গামা-গোবর-মার্কা মেমসাহেবদের, সাহেবরা কোলে তুলে কী করে আদর করত বল দিকি ?

পৃথু কিছুই বলল না উত্তরে।

ব্যাচেলর মানুষকে কিছু বলে, ও লজ্জা দিতে চায় না। আদর করতে হলেই যে পিস্তুতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশন-খাওয়া-কন্যার মতো নিজের বৌকেও কোলে-কাঁখে করতেই হবে এর কী মানে আছে ?

কথা না বলেই, অকর্মার-ধাড়ি পৃথু হাত লাগাল। দেশের কাজে। ফর আ চেঞ্জ ! যতক্ষণ সম্ভব ফ্যানটার তলায় হাত রেখে নিচ থেকে সেই অচেতন পদার্থর উন্নতিকে সাপোর্ট করা যায়, তাই-ই করতে লাগল। করতে-করতে আড়চোখে একবার দেখেও নিল ; পুলির সঙ্গে লাগানো দড়িটার স্বাস্থ্যটা কী প্রকার।

নাঃ। ভাল মোটেই নয়। ন্যাবা ধরেছে। অথচ, হাটচান্দ্রার জল ত' খারাপ নয় !

ফ্যান উপরে উঠতে লাগল। গিরিশদা এবং পৃথুর যুগ্ম চেষ্টাতে। গিরিশদা দড়ি ধরে ক্ষেপে ক্ষেপে টানছেন ; কুঁয়োতলা থেকে জল তোলার মতো করে। আর পৃথু নিচ থেকে ঠেলছে। যার যেমন কপাল ! চিরদিনই অধঃপতিত বস্তু বা ব্যক্তিকে উত্থিত করার কর্তব্যই ওকে দিয়ে সবাই-ই করিয়ে নিতে চায়। অথচ, ওর স্বাভাবিক প্রবণতা সবরকম অধঃপতনেরই দিকে। ঠেলছে, মানে, হাঁড়িটাকে ধরে আছে মাথার উপরে। অনেকটা, হনুমানের গন্ধমাদন ধরে উড়ে যাবার পোজ-এ। যখন টেবল-ফ্যানটা পৃথুর উত্থিত দু' হাতেরই নাগালের উপরে চলে গেল তখন হাত খালি হওয়ায় ও গিরিশদার সঙ্গে দড়িতেই হাত লাগাল। কিন্তু পৃথুর প্রত্যয় এ বিষয়ে বিশেষই দৃঢ় হল যে, মাধ্যাকর্ষণ, শক্তি হিসেবে, এখনও যথেষ্ট জোরালো শক্তি। ফ্যানটা ইনকনসিডারেটের মতো অল-অন্-আ-সাডন গিরিশদার মাথা এবং পৃথুর ডান পা গুঁড়িয়ে দিতে দিতেও, না-দিয়ে ; মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল গোঁত্তা মেরে। গোব্দা মেমসাহেব মার্কা ফ্যানের মূল শরীর এবং এলিজাবেথীয়ান গাউনের মতো পাখা-ঢাকা গ্রীলটা আলাদা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মুক্তির আনন্দে পাখার বিযুক্ত গ্রীলটা চার পাক ঘুরে নিয়েই থিতু হল।

গিরিশদা দু কোমরে দুই হঠাৎ-খালি হাত রেখে দীর্ঘ সময় ধরে ঘটনাটাকে ঘটতে দেখলেন।

বললেন, দেখলে ! পৃথু ! অধঃপতন !

পতন ত' চিরকাল অধঃলোকেই হয় গিরিশদা, কে আর কবে উর্ধ্বলোকে পড়েছে বলো ?

পৃথু বলল। তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষের' নুটু মোক্তারের লাজোয়াব ডায়ালগ কোট্ করো।

ঠাট্টা নয় হে ! ক্যালামিটি ! রিয়্যাল্, গ্রেট ক্যালামিটি !

বড় কিছু করতে গেলে এরকম ছোট-খাটো ক্যালামিটি হয়ই !

পৃথু বলল।

ক্যালামিটি ইজ আ ক্যালামিটি, ইরেসপেক্টিভ্ অফ ইটস্ স্কেল্।

ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ফ্যানটা পড়লে বড়ই লাগত, কারণ সেখানে সবে একটা লোম-ফোঁড়া গজিয়েছিল পৃথুর। বেঁচে যে গেছে, এই ঢের ! পৃথু সে কথাই ভাবছিল। লেসার ক্যালামিটি সামলাতেই হিমসিম ও সমস্তক্ষণ, গ্রেটার ক্যালামিটি থেকে দূরেই থাকতে চায়।

পৃথু বলল, কি করবেন এখন ?

মুনেশ্বরকে দেখেছো ? কোথায় যে থাকে রাস্কেলটা !

জল দিচ্ছে। বাগানে। দেখে এলাম।

ডেকে আনো ত' ! ও ইচ্ছে করেই নন্-কোপারেট করছে। কোনোরকম সায়েন্টিফিক ব্যাপারেই ব্যাটার এক ফোঁটা ইন্টারেস্ট নেই। টিপিক্যাল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয়।

পৃথু, মুনেশ্বরকে ডাকতে যেতে যেতে আবারও শুধোল, তা সায়েন্টিফিক ব্যাপারটা হচ্ছে কি ? খুড়োর কলটা, কিসের ? বলে ফেললেই ত হয়। খামোখা টেনসানের মধ্যে আমাকে রেখে কি লাভ হচ্ছে কিছু আপনার ?

মুনেশ্বরকে ডেকে আনো। পরে বলব। আর শোন পৃথু, তোমার কি ফ্ল্যাক্ট-ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান

অয়েল-এর কারো সঙ্গে জানাশোনা আছে ? কোনো বড় আফসার ? বোর্ডের কেউ ?

নাঃ।

আদার ব্যাপারী, থাকে ধ্যাতধেড়ে গোবিন্দপুরে ; ও চিনবে কী করে ?

নো ওয়াণ্ডার ! তোমরা যে লেখাপড়া কেন শিখেছিলে তা-ই ভাবি মাঝে মাঝে।

পৃথু উত্তর না-দিয়ে মুনেশ্বরকে ডাকতে চলে গেল। মূর্খর কথার উত্তর মূর্খরাই দেয়।

মুনেশ্বরকে নিয়ে ফিরে আসতেই গিরিশদা ওকে হাঁড়ি, ফ্যান ও পুলি সব স্টোর-রুমে তুলে সেদিনের মতো রেখে দিতে বললেন। তারপর বাড়ির ভেতরে এলেন। বসবার ঘরে এনে বসালেন পৃথুকে।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। টাঁড়ে আর ঝাঁটিজঙ্গলে গিরিশদার সায়েন্টিফিক ক্রিয়াকাণ্ডে তিতির-বটেররা এতক্ষণ সব সন্দেহে এবং ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। এখন প্রাণ খুলে দিনের প্রাত্যহিক ফেয়ারওয়েল্-সঙ্ গাইতে লাগল।

গিরিশদা বললেন, কি খাবে ? বল।

যা হয়।

ন্যাকামি কোরো না। জোয়ান-মদ্দ লোকের ন্যাকামি আমার একেবারেই পছন্দ হয় না। তোমার সব ভাল, কিন্তু তুমি বড় মেয়ে-মেয়ে। কি খাবে তাই-ই বল। মন খুলে।

আপনি যা খাবেন ?

আশ্চর্য ! আমার সঙ্গে তোমার কি ?

বিরক্ত হয়ে গিরিশদা বললেন।

তাহলে, হুইস্কীই খাব।

তাই-ই বল। বেশ ! মনে পড়ে গেল, তোমার জবলপুরের লেফটেনান্ট শালাকে বলে এক বোতল স্কচ্ জোগাড় করে দিতে পারো ? স্বাদই ভুলে গেছি। কত করে দাম এখন। অফিসারস্ ক্যান্টিনে ?

স্কচ আমি খাই না। জানি না। চেষ্টা করব।

পৃথু বলল।

ভাবল, শালাকে বলে কিছুই হবে না। পৃথু যতদিন শালার কাছে দামী ছিল, শালাবাহন ছিল, ততদিনই সে-শালার মুখ-মিষ্টি। এখন প্রয়োজন সবই ফুরিয়ে গেছে। পৃথুকে কেউই পোছে না। দু' একটি অনুরোধ করে দেখেছে, গ্রাহ্যই করে না। বড়ই অপমান লাগে। এরা যখন ছোট, তখন থেকেই পৃথু এদের দেখেছে। এই পৃথিবী বড়ই নির্লজ্জ। চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত নেই। কৃতজ্ঞতাবোধ-টোধ ত' অনেক বড় ব্যাপার সব। তার চেয়ে বরং রুষাকেই বলবে। রুষার মতো রিসোর্সফুল মানুষ হাটচান্দ্রাতে আর একজনও নেই। রুষা, ইদুরকারকে বললেই সে জোগাড় করে দেবে। নো-প্রবলেম। গিরিশদাকে একটা না-হয় প্রেজেন্টই করবে।

মুখে শুধু বলল, আচ্ছা গিরিশদা, বলব। মানে, লিখে দেব জবলপুরে। আপনি নেবেন না ? হুইস্কী ? আমাকে একা কেন ?

না ভায়া। এ ব্যাপারে আমি একেবারে সাহেব। 'স্কটিশ কটেজ'-এর মালিক বলে ব্যাপার। নট বিফোর সানডাউন্। তা সুজির খিচুড়ি খাবে ত' তুমি !

ঘাড় নাড়িয়ে লোভীর মতো পৃথু বলল, হ্যাঁ।

রুষা কিছুই অন্যায় বলে না। সত্যিই, ও একটা এপিকিউরিয়ান্। প্রি-হিস্টরিক পিগ্। গ্লাটন্। খাওয়ার ব্যাপারে। আ বিলিভার্ ইন কোয়ান্টিটি-কাম-কোয়ালিটি। তা হবে। পৃথুর জ্যাঠামশায় সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি চালুও ছিল এক সময়ে। পেট-রোগা, অথবা খেতে-না-পাওয়া মানুষেরা প্রায়ই বলে বেড়াত, "মিঃ জগদানন্দ ঘোষ বিলিভস্ দ্যাট দ্যা ওন্‌লী ওয়ে টু দ্যা হার্ট্ ইজ থ্রু দ্যা স্টম্যাক্।"

আসুক মুনেশ্বর। জোগাড় যন্ত্র করে দিক। আমিই রাঁধব।

গিরিশদা বললেন।

তুমি ? তুমি কিছু রাধতে-টাঁধতে পারো ? পৃথু ?

না। তবে, চা আর ওম্‌লেট্‌ পারি।

হাঃ।হাঃ।

গিরিশদা জোরে হেসে উঠলেন।

হাসিতে মানুষের চরিত্র ফুটে ওঠে। মানুষটা খুবই সরল। মনের মধ্যে কোনো ঘোর-প্যাঁচ নেই।

তবে ত' পারোই ! তুমি যদি শিখতে চাও, তাহলে তোমাকে রান্নাও শেখাতে পারি। কুলিনারি আর্ট হচ্ছে হাইট্‌ অফ্‌ অল্‌ আর্টস। কেভ-পেইন্টিংস-এর আগে এর জন্ম। বুঝে দ্যাখো, আমাদের এই মধ্য প্রদেশের ভীমবৈঠ্‌কা বা স্পেনের আল্‌টামিরারও অনেক আগে মানুষ রন্ধন শিল্পে পারদর্শী হয়েছিল। বাগান করারই মতো আনন্দ পাই আমি রান্না করার মধ্যে। ফুল-ফোটানোব মতো,এও এক ক্রিয়েশান্‌। কিন্তু রেঁধে খাওয়াবটা কাকে ? হোয়াট আ পিটী ? বল ?

কেন ? গিরিশদা ? আমাকে আর সুখময়কে। এবং তার স্ত্রীকেও। যখন আপনি ডাকেন তখনই ত আসি। আপনিও খাবেন। গিবিশদা হাসলেন।

বললেন, ঠাট্টা করছ ; করো ! যে মানুষেব পুরো জীবনটাই একটা মস্ত ঠাট্টা, তার গায়ে এসব ছোটখাট ঠাট্টা বাজে না হে !

উঠে গিয়ে ছোট্ট সেলার খুলে হুইস্কী ঢেলে নিয়ে এসে পৃথুকে দিলেন। তারপর বললেন, শম্বরের আচার খাবে ?

শম্বরের আচার ?

হ্যাঁ ! বানিয়েছিলাম নাইনটিন সেভেন্টিতে। আস্ত একটা শম্বর। সাবির মিঞা আর শামীম্‌ মেরেছিল পুন্নার জঙ্গলে। একদম বডকা নব্‌পাঠ্‌ঠা শম্বর। পুরোটাকেই আচার বানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম ডীপ-ফ্রীজ্‌-এ । খেয়ে দেখো। উমদা জিনিস !

আচার নিয়ে এলেন গিরিশদা।

তারপর বললেন, শোনো পৃথু, আজ সুজির খিচুড়ি নাই-ই বা খেলে। মনটা আজ সাহেবী খানা খেতে চাইছে। চলো তোমার জন্যে ফ্রেঞ্চ অ্যানিয়ন্‌ স্যুপ রাঁধব। আর ডীপ-ফ্রীজ-এ আমার ভাইপো প্রণব-এর মাবা নাক্‌টা হাঁস রাখা আছে ; তার রোস্ট কবব। নাক্‌টা মেরে প্রেজেন্ট করেছিল নাইটনটিন এইট্টিতে। খেয়ে দ্যাখো ; মনে থাকবে চিবদিন।

সন্ধ্যে ত' হয়ে এল। আপনি এবাব একটা নিন্‌ গিরিশদা। কিছুক্ষণ পর পৃথু বলল।

বাইরে তাকিয়ে গিরিশদা বললেন, হাঁ ' ওয়াক্ত্‌ হো গ্যয়া। গিবিশদা উঠে গিয়ে রাম ঢেলে নিয়ে এলেন।

ব্যাপারটা কি করছেন, বললেন না ত !

কোন্‌ ব্যাপারটা ?

ঐ যে ! মুনেশ্বর বলল, আপনি নাকি হাওযা ধরছেন ?

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছে। হাওয়াই ধরছি। এন্‌ভায়রন্‌মেন্টের যে রকম পলুশ্যান হচ্ছে বড বড় শহরে তাতে মানুষের বেঁচে থাকাটাই মুশকিল। আরে, আমাদের ভোপাল. ইন্দোর, জবলপুর, রায়পুরের কথাই ভাবো না। আরো বড় শহরের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম। হাটচান্দ্রার মতো আন্‌পল্যুটেড্‌ জায়গার হাওয়া এব" এন্‌ভায়রন্‌মেন্টের সবরকম নারিশমেন্ট সুদ্ধ যদি কোনো বড শহরে সটান চালান করে দেওয়া যায়, তাহলে কি হয় ? ঐ যে হাঁড়িটা দেখলে , ওটা কিছুই নয়। ওটা জাস্ট একটা এপিটম্‌। ডেকরেটরের কাছ থেকে ভাড়া করে এনেছি। পেছনে ছ্যাঁদা অবশ্য করেছি আমিই। ফেরৎ নেওয়ার সময় ঝামেলা করবে বিলক্ষণ। কিন্তু ওটাব দরকার ছিল। ঐ হাঁড়ির মতো ব্যাপারটি আসলে হবে কয়েক হাজার গুণ বড়। উল্টো দিক থেকে বড় বড় ব্লোয়ার, ব্লো করে সেই হাঁড়ির মুখে ঢুকিয়ে দেবে বিশুদ্ধ হাওয়া। তার পর এয়ার-টাইট, ওয়াটার-টাইট পাইপ-লাইনে করে তা চলে যাবে বড় বড় শহরে। পাইপ লাইনের মাঝে মাঝেও চার্জাব স্টেশন

থাকবে। ব্লোয়ার থাকবে, বিশুদ্ধ হাওয়া চারিয়ে, ভাগিয়ে, ডেস্টিনেশানে নিয়ে যাবার জন্যে অক্সিজেনের ওজোনের ডোজ দিয়ে দিয়ে। বড় বড় পল্যুটেড্ শহরে স্টোরেজ ট্যাঙ্ক থাকবে। ট্যাঙ্ক থেকে পলিথীনেব সীলিন্ডারে করে, যেমনভাবে রান্নার গ্যাস সাপ্লাই হয়, গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি, অফিস-কাচারীতে এই বিশুদ্ধ হাওয়াও সাপ্লাই দেওয়া হবে। বেড-রুমে, স্কুলে, কলেজে, কারখানায়, অফিসে ঐ সীলিন্ডাব রেখে দিলেই হল সামান্য খুলে। ভোপালে কী কলকাতায় বসে হাটচান্দ্রাব পরিবেশ ! চিন্তা কবো, একবার। আমার এক এন্‌ভাযরন্‌মেন্ট এঞ্জিনীয়র বন্ধুর সঙ্গে কথা বলব এ নিয়ে। বম্বেতে তাকে চিঠিও লিখেছি। এখানে আসতে বলেছি। এই ভেঞ্চাব সাকসেস্‌ফুল হলে বিশুদ্ধ জল নিয়েও এমন করা যাবে। একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ফর্ম কবব ভাবছি। নাম দেব, আন্‌পল্যুটেড্ এনভাযবন্‌মেন্ট প্রাঃ লিমিটেড। তুমি কি ডিরেক্টব হতে চাও ? ক্যাপিটাল লাগবে না। তুমি শুধু আমাব কোম্পানীব দারুণ সব চমকে-দেওয়া বিজ্ঞাপনের কপি লিখবে। যাকে বলে, সত্যিকারের ক্রিয়েটিভ্ কপি-রাইটিং। কি হে ? পৃথুবাবু ঝুলে পডবে নাকি ? হাঃ হাঃ। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। পি· সি· রাযেব কথা, বি· সি· বায়েব কথা শুনল না ত বাঙালী !

গিবিশদাব চবিত্র সত্যিই বহুমুখী ! ওঁব বহুমুখী বাতিকগুলোব একটিও প্রতিভাব পাকা রাস্তায় গিযে পৌঁছতে পাবল না, এইটে ভেবেই দুঃখ লাগে। প্রতিভার পথ বোধ হয় বড়ই দুর্গম। খুব কম লোকই বোধ হয় সে পথ বেযে গন্তব্যে পৌঁছতে পাবেন। আব যাঁবা পেরেছেন বলে ভাবেন, তাঁদেব মধ্যে বেশিব ভাগেরই প্রতিভা কাকে যে বলে সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধাবণাই হযত নেই। আজকালকাব মেডিযা-বাহিত যশ, প্রচাব আব নাম-ডাকের সঙ্গে হযত প্রতিভার কোনো সাযুজ্যই নেই। গিরিশদা প্রতিভাবান না হতে পারেন, কিন্তু চমৎকাব মানুষ। চমৎকাব মানুষই বা ক'জন হতে পারেন ? বাতিকগ্রস্ত হতেও এক ধবনেব কুঁড়ি-প্রতিভা লাগে হযত। খুবই জীবন্ত মনেব একজনের ঝক্‌ঝকে বসিক মানুষ তিনি। পৃথুব একঘেয়ে, ক্লান্তিকব মন-খারাপ বিষণ্ণ দিনগুলি আনন্দবফুলফোটা সোনাঝুরি গাছ হয়ে ওঠে যেন গিবিশদাব কাছে এলেই। এখানে এসে, নিজেকে নবীকৃত কবে ও। বাবে বাবে।

যেখানে বাঘেব ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। বাম-এ এক চুমুক দিযেই গিবিশদা বললেন, তাহলে শুরু কবি ভাযা, কি বল ?

কথাটা তবুও না বোঝাব ভান করে পৃথু বলল, কি ?

কবিতাটা শুরু করি ?

সুখময় কোথায় ? আজ এলো না ত ? তার স্ত্রী ? দেখা হলো না।

কথা ঘোরাবাব জন্যে বলল পৃথু।

সুখমযবা সুখেই আছে। যেদিন আসতে বললাম, সেদিন ত' তুমি এলে না ! তাদেব দেখো পবে, অন্যদিন। আজই জানতে পেলাম সুখময়ের স্ত্রী, পরম কল্যাণীয়া, মানে আমার পুত্রবধূ ; ইজ ইন দ্যা ফ্যামিলি ওযে !

কনগ্রাটস।

পৃথুব মুখ ফস্‌কেই বেবিযে গেল কথাটা। ইংবিজি ভাষাটাবও বোধ হয়, কোনো কোনো আগ্নেয়াস্ত্ররই মতো; হেয়ার-ট্রিগার আছে। হাওযা লাগলেও কিছু বোঝার আগেই ; গুলির মতোই চকিতে শব্দ ছুটে যায়। ভারী খারাপ !

তাবপব বলল, কোন কবিতাটি ? যাব নাম দিয়েছিলেন হাত ?

সে কবিতাটি ছিঁডে ফেলেছি।

কেন ?

আর্নেস্ট হেমিংওযে কী বলতেন জানো ?

কি ?

বলতেন যে, যিনি যত নির্মম ভাবে নিজের লেখা কাটতে পারেন, ছিঁডতে পারেন, তিনি তত বড লেখক। নিজেকে বাতিল না করতে পাবলে প্রতি মুহূর্ত, পেরিয়ে না যেতে পারলে ; সে মানুষ

কিছুই সৃষ্টি কবতে পাবে না। যে ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট তাঁব নিজেব সম্বন্ধে বা নিজেব সৃষ্টি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও শ্লাঘা জন্মিয়েছেন, নিজেব মস্তিষ্কে অনবধানে হলেও , সেইটুকু তাঁব কবব খোঁড়াব জন্যে যথেষ্ট।

বাঃ আপনি সুন্দব বললেন কিন্তু। সত্যি। আপনি চমৎকাবই বলেন। হবার্বাভাও।

বাঃ। বাংলা কবিতা লিখলে কি হয় ছাত্র ত' ইংবিজিবই ছিলাম। ইংবিজিতেই ত এম এ কবি। বেশিবভাগ বড বাঙালী কবিই ত ইংবিজিব ছাত্র, ইংবিজিব অধ্যাপক। ভাষা জলেবইমতো। জমিতে বেডা লাগালেও তলে তলে চুইয়ে চলে যায় অন্য মাঠে।

তা ঠিক। ভাষা মাত্রই একে অন্যেব পবিপূবকও। একটি ভাষা ভাল যে জানে , সে অন্য একাধিক ভাষাও বেশ ভাল জানে বলেই দেখা যায় সাধাবণত।

পৃথু হুইস্কীতে চুমুক দিয়ে, জ্ঞানী-গুণীদেবমতোবলল। কিন্তু, ব্যতিক্রমও থাকে। যেমন আমাদেব চাঙ্গু, মানে অতিক্রম সেন। "অশনি' পত্রিকায় তাব কলাম বেকচ্ছে প্রতি সপ্তাহে। অথচ সে বাংলাতে একটি প্যাবাও লিখতে পাবে না। লিখছে ইংবিজিতেই। অশনিব নুচুবাবু অনুবাদ কবে দিচ্ছেন হব-সপ্তাহে। বাঙালী পাঠকবা ভাবছেন, কী অসাধাবণ প্রতিভাবান লোক এই অতিক্রম সেন। ইংবিজী এবং বাংলা দুটোতেই অসাধাবণ দখল।

যেতে দিন।

তা দিলাম। কিন্তু চালাকিব দ্বাবা কোনো মহৎ কম হয় না।

সকলকেই যে মহৎ কর্ম কবতেই হবে এমন মাথাব দিব্যিই বা দিয়েছে কে আমাদেব ?

হুইস্কীতে একটি বড চুমুক দিয়ে পৃথু বলল

তা অবশ্য ঠিক। এবাব তাহলে শুক কবি ?

নতুনটা কি নিয়ে লিখলেন ? নাম দিয়েছেন ?

নাম দিয়েছি। "একটি কবে আয়না ।

'একটি কবে আয-না ?' মানে ? কুস্তী-ফুস্তীব ব্যাপাব নাকি ? জুডো ? ক্যাবাটে ? এক একজন কবে এসে একা একা লডতে বলছেন ?

এমন এমন সময়ে নিজেকে পৃথুব খুবই অপবাধী লাগে। গিবিশদা মানুষটা সতিাই ভাল পৃথুকে যথার্থই ভালওবাসেন, কাছে ডাকেন, আদব কবেন। খাদ্য পানীযব আদবও ওঁব কাছে পৃথু যা পেয়েছে তা এ জীবনে শোধ কবতে পাববে না কোনোদিনও। অথচ, বাডিতে ডেকে তাঁকে একদিন খাওযাবে, সে উপাযও তাব নেই। কিন্তু এত কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও অ কবিতাকে কবিতা বলে মানতে সে অপাবগ। এটা তাব সততা। অভদ্রতা বা অকৃতজ্ঞতা নয়। ও পাবে না , মিথ্যাচাব কবতে। চৈনিক দার্শনিক কনফ্যুসিযাস বলেছিলেন "ইফ ডা পে ইভিল উইথ গুড, হোয়াট ডু উা পে গুড উইথ ? ভালোকে ভালো বলো খাবাপকে খাবাপ। এই অবিবেচনা, এই ট্যাক্টলেসনেস অথবা ভণ্ডামিতে অপাবগতাব কাবণে, পৃথুকে কম কিছু হাবাতে হয়নি আজ পযন্ত এই জীবনে তবুও, বদলাতে পাবল না নিজেকে। স্বভাব কী বদলায় ? স্বভাব বদলায় চিতাতে

জুডো কুস্তীব ব্যাপাব নয। আযনা মানে , আয়না। লুকিং-গ্লাস

একটু ক্ষুব্ধ গলায় বললেন গিবিশদা।

তাবপব বললেন, শুক কবছি কিন্তু

পৃথু, পবাজিত সেনাপতিব মতো চেযাবে গা এলিয়ে দিল। আবও একটা বড চুমুক দিল গ্লাসে তাবপব নিজেব শ্রবণেন্দ্রিয় ও বোধকে ফাঁস-খুলে-ফেলা টাইযেবইমতোআলগা কবে দিয়ে চোখ দুটি বুঁজে ফেলল।

পডছি "আযনা দেব একটি কবে"—

দিনবাত ঢাকেব শব্দে কেঁপে উঠছে পাডা

ভাই সব জানেন কি এই নতুন বাবুবা কাবা ?

ঢাকীরা বাজাত ঢাক খালে আর বিলে
নেশা করে পেশাদার চাঁটি দিত ঢাকে
পুজো ও পার্বণে, ব্রতবন্ধ ও ব্রতখোলার দিনে
বাজাত পাড়ায়, বেপাড়ায় গঞ্জে ও হাটে ;
প্রতিমায় আলো-করা হ্যাজাক জ্বলা মাঠে
ড্রিদিম্ ড্রিদিম্ ড্রি ড্রি ড্রিম্...

কাল্ রাতে ধরা পড়ে গেল হাতে নাতে, বাবুগণ
যশের বাগানে চুপি চুপি ফুলচোর এতদিন
জীবনের চোরাগলি ঘুরে ঘুরে
অহর্নিশ নিশপিশ হাতে নিজেদের ঢাক নিজেরাই
বাজিয়েছে প্রচণ্ড বিক্রমে সাজানো যশের
ঘুষ-খাওয়া কেঁদো বাঘ ওদেরই পায়ের কাছে
শুয়ে শুয়ে লেজ নেড়ে গেছে যেন দীর্ঘদিন
ঘৃণিত কুকুর !
আসুন দাদারা ! চাঁদা তুলে অবহেলা অপমানে একীভূত
নাম গোত্রহীন সব শত্রুমিত্র প্রতিবেশী মিলে
তুলে দিই এদের প্রত্যেকেরই হাতে হাতে
একটি, একটি করে আয়না... আত্মসম্মানের...

কাল, বৈতালিকে আমরাই যাব আগে আগে
শিশির আব শিউলির গন্ধভরা ভোরে
গান গেয়ে যাব সকলের আগে ;
পিছু-পিছু, হেঁট-মাথা, নিচু-মুখ ;
শ্লথপায়ে ওরা হেঁটে যাবে...
গিরিশদা ! পৃথু বলে উঠল ।
আবারও হেয়ার-ট্রিগারের গুলির মতো গুলি বেরিয়ে গেল মুখ থেকে ।

গিরিশদা থেমে গিয়ে বললেন, থামিয়ে দিলে পৃথু ! ভাল লাগল না ? শেষ হয়নি এখনও । আরো অনেকটা আছে ।

দীর্ঘ নীরবতা।

আরেকটা চুমুক দিল পৃথু গ্লাসে ।

কি ? কিছু বলছ না যে ! কবিতার কথা ?

দীর্ঘতর নীরবতা !

কি পৃথু ?

পৃথু ভাবছিল, কবিতাটিতে কি তার প্রতিই খোঁচা ? পৃথু ঘোষ আর মণি চাক্‌লাদার ছাড়া ত' কবিতার বন্ধ্যা চাষ হাটচান্দ্রায় বেশি লোক করে না । মণি, গিরিশদার কবিতা, ছাপা পত্রিকা দূরস্থান, হাতে-লেখা দেওয়াল পত্রিকাতেও ছাপতে রাজি হয়নি । তাই-ই কি ?

কি পৃথু ?

পৃথু বলল, ও· কে· । তবে, বড়ই দীর্ঘ গিরিশদা, অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ । বলছিলেন, আরও আছে ? শেষ হয়নি ?

হ্যাঁ । আরও তিনটি স্ট্যাঞ্জা আছে । তুমি বললে, এখানেই শেষ করে দেব ?

একটু চুপ করে থেকে বলল, না, না । আমি তা বলছি না । আমি কেন তা বলব ? আপনার

কবিতা, আপনি ভাল বুঝবেন!

কি হুইস্কি এটা গিরিশদা? খুব ভাল ত! আমাকে আরেকটা দেবেন।

গিরিশদা গ্লাসটি নিয়ে সেলারের কাছে গেলেন।

পৃথু ঘর ছেড়ে বারান্দায় এল। এক পাশে পুন্নার গভীর জঙ্গল। অন্য পাশে সেগুন বন। পেছনে, তিতির-বটেরের টাঁড়। চাপ চাপ অন্ধকার। রাতে জঙ্গলের গায়ের মিশ্র গন্ধ।

কি হুইস্কী এটা?

গিরিশদা বারান্দায় এলেন। দুটি গ্লাস হাতে করে। ওঁর জন্যে রাম, পৃথুর জন্যে হুইস্কী।

কী হুইস্কী এটা? খুব ভাল ত!

পৃথুর কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, এবার বল। ইম্প্যাকট্টা কেমন হল? থামিয়ে দিলে কেন, মাত্র অর্ধেকটা পড়লাম...

কবিতায় এত রাগ কেন? এত অভিযোগ। ছায়ার লড়াই। কেন?

জীবনে রাগ আছে, তাই...

কথা ঘুরিয়ে গিরিশদাই বললেন, তা হুইস্কিটা ভালই বলছ? নতুন ব্র্যান্ড একটা। চারটে গ্লাস দিল। তাই-ই কিনেছিলাম।

খুবই ভাল গিরিশদা। খুবই ভাল।

পৃথু বলল, গিরিশদার চোখে চেয়ে।

কবিতা খারাপ লেগেছে বলার দুঃখটা হুইস্কী ভাল লেগেছে বলার সুখ দিয়ে পুষিয়ে দিতে চাইল ও।

হুইস্কীর ভালত্বর সঙ্গে কবিতার ভালত্বর সমীকরণ করতে চাইছেন না নিশ্চয়ই গিরিশদা! ভাবল ও। হুইস্কীটা কি ঘুষ? না, না, উনি অমন নীচ নন। তবে, কিছু মানুষ সংসারে নিশ্চয়ই থাকেন, হাইলী ডায়াবেটিকদের মতন, সবসময়ই সাধুবাদের ইনসুলিনের উপর যাঁদের বেঁচে-বর্তে থাকাটা নির্ভরশীল। গিরিশদা সেই ধাঁচের মানুষই নন।

কোনো ভদ্রলোকই গৃহস্বামীর ভাল হুইস্কী খেয়ে তাঁর স্বরচিত কবিতাকে খারাপ বলার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারেন না। কিন্তু পৃথু পারল। এ জন্যেই "ভদ্রলোক" হওয়া হল না ওর। রুষা ঠিকই বলে। ভদ্রসমাজে অচল। একেবারেই!

কি হল? বলছ না যে ভায়া। আরও কিছু বল। একটু বিশদে...

কবিতার আমি কী-ই বা বুঝি গিরিশদা! আমার মতামতের দামই বা কী! যা মনে হল, তা ত' বললামই।

তা না, রাগের কথা বলছিলে কী যেন, একটু আগেই...

হ্যাঁ। তা বলছিলাম। বলছিলাম যে, রাগ ভাল নয়...

কেন? ভাল না হওয়ার কি?

মানে...

মুখে কিছু বলতে পারল না পৃথু।

নিরুচ্চারেই বলল: রাগ না থাকলে হয়ত বিপ্লব হয় না, যুদ্ধও হয়ত জেতা যায় না, জানি না। কিন্তু রাগের সঙ্গে কবিতা... মানে অন্যভাবে বললে...কবিতা রাগের সঙ্গে সচরাচর সহবাস করে না।

কবিতা – প্রসঙ্গ তারপর গিরিশদা আর তুললেন না। অত্যুৎসাহীদেরও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে; কখনও কখনও। নির্লজ্জরও লজ্জা হয়, কখনও কখনও।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর গভীর রাতে টর্চ হাতে যখন পৃথু হুইস্কীর খুশি বুকে নিয়ে গিরিশদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে আসছিল, তখন ফেউ ডাকতে লাগল পিরপিরি নালার কাছে সেগুন

জঙ্গলের মধ্যে থেকে।

জংলী জানোয়ারের ভয় পৃথুর নেই। মনে হল, হঠাৎ একটা বোঁটকা গন্ধও যেন এল নাকে। দুর্বল-ব্যাটারির টর্চের আলোটা বৃত্তাকারে পড়ছিল অন্ধকার জঙ্গলে। সেই আলোর ফিকে বৃত্ত, অন্ধকারকেই গাঢ়তর করে তুলছিল শুধু।

ফেউটা আবারও ডাকল। হঠাৎই পৃথুর বুকের হুইস্কীর খুশিটা মরে গিয়ে এক গভীর অপরাধবোধে ছেয়ে দিল তাকে। কার্তিকের হিমেব রাতের তারা ভরা অন্ধকার আকাশ তাকে নিরুচ্চারে বলল : পৃথু ! তুমি নিজেও একটি ফেউ। এ সংসারে ; ভগবান কেউই নও। বাঘ নও কেউ।

গিরিশদার জন্যে যেমন মনটা হঠাৎ খুবই খারাপ হয়ে গেল, তেমনই হল রুষার জন্যেও। কুর্চির জন্যে। এমনকি নিজের জন্যেও। নিজে একশ ভাগ সৎ হতে পারলেই খুশি হত ও।



পৃথুর জীবনে কুর্চিই একমাত্র আনন্দ।

এমনই হয। ভেবেছিল, যা হারিয়ে গেছে, তা গেছেই।

যা হাবিয়ে যাবাব, তাকে আগলে বসে থাকা সম্ভবও নয় বেশিদিন।

ভেবেছিল, পবিণত বযসে এসে, চল্লিশেব আওতায়, নিজে একটু বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞর মতো ব্যবহাব কববে নিজের ছেলেমানুষ চিরশিশু মনটাব সঙ্গে। তাকে ধমকে দেবে, বকবে, কান মলাও দেবে প্রায়োজন হলে, দবজা বন্ধ করে ফেলে রেখে দেবে না খেতে দিযে ঘরে। এমন চড মারবে তাকে, আচমকা যে, শিশুরই মতো দমবন্ধ নীল নিঃশব্দ হয়ে থাকবে সে দীর্ঘ সময়।

মনে হবে, প্রাণ বেরুবাবই সময় হল বুঝি।

কিন্তু পারল না।

তার প্রতি মুহূর্তর ক্যানসাবাস, ভোঁতা বিষণ্ণতা পৃথুকে তীব্র কোনো দুঃখ অথবা আনন্দেব অনুভূতি থেকে বঞ্চিত কবে রেখেছে বহুকালই।

বাসটা সুকরাতে এসে দাঁড়াল। গাড়ি, পৃথুরও একটা আছে। কম্পানিব গাডি। উর্দিপবা ড্রাইভারও আছে। তবে সে গাডি বিশেষ একটা ব্যবহাব করে না। কারখানায় যখন যায়, তখনও বেশির ভাগ দিন হেঁটেই চলে যায় এবং আসে। কাছেই ত'। যখন ছুটি থাকে, ত' কথাই নেই। গাড়ির প্রয়োজন রুষারই বেশি। মিলি-টুসু বড় হচ্ছে, ওদেরও দবকার থাকে মাঝে-মধ্যে। স্কুলে যাওয়া-আসা ছাড়াও। গাড়ি থাকা সত্ত্বেও হেঁটে বা অন্য কারো মোটর সাইকেল বা স্কুটাবের পেছনে বা বাসে ছোটা-ম্যানেজারকে সবসময় ঘোবাঘুরি করতে দেখে বলে, সকলেই পৃথুকে আড়ালে ডাকে 'পাগলা ঘোষা'।

আসলে ঘোষ সাহেব থেকেই ঘোষা। পৃথু জানে সেটা।

বাসটা দাঁড়াবে মিনিট দশেক। সামনেই চায়েব দোকান। পান বিডি। ভুজিয়া, মাছি-পড়া লাড্ডু,

বালুসাই, চুবমুব। অনেকে নেমে খেল, যাবা দূব থেকে আসছে। পৃথু নামল না। বাঁদিকে, ড্রাইভাবেব পেছনেব সীটেই জাযগা কবে দিযেছে কনডাকটব। তাকে এখানে সকলেই চেনে। এই ব্যাপাবটা ওব একেবাবেই ভাল লাগে না। যাদেব সে চেনে না, তাদেব অনেকেই তাকে চেনে এই ভাবনাটাই ভাবী অস্বস্তিকব। যখন বযস কম ছিল, চেহাবা আজকেবমতোকুৎসিত ছিলো না, তখন বম্বেব এক ফিল্ম-কোম্পানী অফাব দিযেছিল ছবিতে অভিনয কবাব জন্যে। বাবা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলেননি। ডিবেকটব যখন জিজ্ঞেস কবেছিলেন পৃথুকে, তোমাদেব বাড়ি কি খুবই কনসার্ভেটিভ? তখন পৃথু উত্তব দিযেছিল, কনসাভ কবাব যাদেব কিছুমাত্র থাকে, তাবাই কনসার্ভেটিভ হয।

বক্ষা কবাবমতোআদৌ কিছু না থাকলে সত্যিই বক্ষণশীল হওযাব কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তখন বাজাবী অভিনয ও ফিল্ম-এব জগৎ আজকেব মত সম্ভ্রান্তও ছিল না। যাইই হোক, ববিবাবেব সকালে বিস্রস্ত চুলে বাতেব পাযজামা-পাঞ্জাবি পবে হাওযাইন চটি গলিযে যে বাজাব যেতে পাববে না, একবাব 'হীবো' বনে গেলে, শুধু এই ভাবনাটাই তাকে তখন সিনেমাতে নামতে দেযনি। ডিবেকটব, পৃথুব বাবাকে বীতিমত অনুনয বিনযও কবেছিলেন। শিকাব কবতে যাওযা পৃথুব, বাইফেল-কাঁধে ঘোড়ায-চড়া চেহাবা সুফকব-এব জঙ্গলে দেখেই ডিবেকটবেব বোখ চেপে যায। চবিত্রটিও চমৎকাব ছিল। অত্যাচাবী জমিদাবেব সুদর্শন ছেলে, ঘোডাব পিঠে চডে শিকাব কবে, পাহাড-জঙ্গলেব মেযেদেব মধু লুটে খায একদিন তাব জীবনেও প্রেম এসে হাজিব হল লখীন্দবেব লোহাব বাসব ঘবেব সাপেব মতো সূক্ষ্ম শবীবে এবং খলনাযক বাতাবাতি রূপান্তবিত হল দেবশিশুতে।

সিনেমাতে না নামাতেই বোধ হয দেবশিশু আব হওযা হলো না পৃথুব।

প্রেম-এব নিঃশব্দ চবণে যাতাযাতই চিবদিন পছন্দ ওব। তাই-ই এমন ঘোড়ায-চড়ে, অশ্বখুবেব শব্দে মেদিনী কাঁপিযে যে প্রেম আসে তাব প্রতি ওব চিবদিনেব অনীহা। শুধু অনীহাই নয, ও বলবে অসূযাও। পৃথুব প্রথম এবং শেষ কবিতাব বইযেব নামও যে 'অসূযা', তাব কাবণও এই বোধ।

বাসটা বাযনাতে এসে থামল খাতিব কবে নামিযে দিল কনডাকটব। মজা এইই। যাদেব কাছে যাদেব হাতে যত্নখাতিব পাবাব কথা ছিলো না একটুও, তাবাই চিবদিন ওকে খাতিব যত্ন কবে গেল।

কুর্চিদেব বাড়িটা কোথায একটু খুঁজতে হবে। যা শুনেছিল তাব সঙ্গে মিলছে না। একটা মুদীব দোকান, বাস স্ট্যাণ্ডেব পাশে, তাবপব তামাকেব দোকান। তাব পাশে বাসনকোসন ও দেহাতী শাড়ি-ঘাগবাব দোকান, তাবপবই একটা চৌমাথা। সেখানে বাঁক ঘুবে বাঁ দিকেব নির্জন বাস্তাতে মিনিট দশেক হাঁটতে হবে। শালেব জঙ্গলেব মধ্যে দিযে। তাবপবই বাড়িটা। বাড়িটাব ঐ পাশে কিছু দূবে বাযনা বস্তীব একটা হাত এসে পৌঁছেছে, কিন্তু এই মোড থেকে ওদেব বাড়িব শেষ অবধি কোনো বসতি বা দোকান নেই। খুব সম্ভব সবকাবি খাসমহল এটা।

এখন দশটা বাজে। একটাব মধ্যেই হাঁটচান্দ্রাতে ফিবতে হবে। বাড়িতে দেড়টাব মধ্যে ফিবে খাবাব টেবলে গিযে না-বসলে তুলকালাম কাণ্ড হবে। ঠিক পৌনে দুটোব সময টেবল সাফ হযে যাবে। ন্যাপকিন-ছুবি-কাঁটা-চামচ উঠে যাবে। উঠে যাবে সবকিছু। ঝকঝকে বার্নিশকবা টেবলেব উপব হলুদ-কালো চৌখুপী চৌখুপী টেবল ক্লথ পাতা হযে যাবে। টেবলেব ঠিক মধ্যিখানে ভ্যান ঘঘ-এব 'স্টিল-লাইফ' ছবিবই মতো একটি ফ্রুট-বোওল শোভা পাবে। তাব মধ্যে সীজনাল ফ্রুটস থাকবে কিছু। ছবিব মতোই শোভা পাবে। ওদেব বাড়িতে দিন ও বাতেব যে-কোনো প্রহবেই কেউ ঢুকুক না কেন, বলবে বাঃ। মুখ থেকে আপনা থেকেই বেবিযে আসবে বাঃ। পৃথুব নিজেব মুখ থেকেও বেবোয। সৌন্দর্য, সুরুচি, এসব এ্যাপ্রিসিযেট কবাব ক্ষমতা ভগবান তাকেও কিছু কম দেননি, কিন্তু রুযাব বাড়িটা এত বেশি ভাল যে সে বাড়িতে ঢুকে মাঝে-মাঝে পৃথুব মনে হয যে, এটা বাড়ি নয। কোনো পশ-দোকানেব শো-রুম, বা স্টুডিও। অথবা যেন কোনো অ্যান্টিক-ডিলাবেব একজিবিশান চলছে এখানে। যে-বাড়িতে মানুষ মানুষী থাকে, সেখানে প্রাণ

থাকে, সেখানে ভালোবাসা, প্রীতি সর্বই ছড়ানো থাকবার কথা। পরিচ্ছন্নতা পৃথুও ভালবাসে। বাকিগ্রস্ততা নয়। ওটা বাড়ি নয়; রাজা-রাজড়ার ভুতুড়ে, গা-ছমছম প্রাসাদ যেন। ছোট মাপের।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দূর থেকে বাড়িটা দেখা গেল। কুর্চির বাড়ি। বাড়ি নয়, বাংলো। একতলা। টালিব ছাদ, পাঁচ ইঞ্চি দেওয়াল, সামনে একটুখানি খোলা জায়গা। বাগান মতো। চারপাশেই শাল জঙ্গল। পশ্চিমের দিকে জঙ্গলটা গিয়ে মিলে গেছে শাঁওন্ নদীর সঙ্গে। তারপর নদী পেরিয়ে, অনেক দূরের পথ হেঁটে চলে গেছে কানহার দিকে। সবচেয়ে যা ভাল লাগল পৃথুর, তা হচ্ছে দুটি মস্ত কদম গাছ, কুর্চিব বাড়িব ঠিক সামনেই। গেটেব দু'পাশে। একটা কুর্চি গাছ থাকলেও খুব ভাল হত।

কুর্চি কিন্তু কুর্চির আসল নাম নয়। ঐ নাম পৃথুরই দেওয়া। পৃথিবীর সকলেই কুর্চিকে অন্য নামে ডাকে। কুর্চির উপর কোনোরকম মালিকানাই আর নেই পৃথুর। মালিকানা যেতে যেতে থমকে রয়েছে শুধু নামটুকুরই মধ্যে। ও যে নামে ডাকে, সে নামে আর কেউই কুর্চিকে ডাকবে এ কথা ভাবলেই কষ্ট হয়।

আঃ। কদমগাছ দুটি সত্যিই সুন্দর! খুব বড। বর্ষায় কী যে হবে এখানে, কেমন যে দেখাবে; ভাবে পৃথু।

দরজাটা খোলা ছিল। ছোট্ট বাগানের গেটটি যদিও বন্ধ ছিল। হয়ত ছাগল, গরু যাতে না ঢুকতে পারে সে জন্যে।

গেট খুলে দবজার কাছে গিয়ে ও ডাকল, কোঈ হ্যায়?

কোনো উত্তর নেই।

আবারও ডাকল।

এবাবে একটি ছত্তিশগড়িয়া বুড়ি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

কুর্চির নিয়মিত, আইনানুগ নামটি বলল পৃথু। কুর্চির স্বামীব নামও বলল।

বাবু গেছেন হাটচান্দ্রাতে এক রিস্তেদারেব সঙ্গে দেখা করতে। আর দিদি চান করতে গেছেন।

দিদির সঙ্গেই দেখা করব।

বসুন তাহলে।

বলেই, বসবাব ঘবে নিয়ে গিয়ে বসালো।

দিদিকে কি এক্ষুনি খবর দেব? না, চান হলেই?

চান হলেই দিও। তাড়া নেই।

চা-টা কিছু খাবেন? কফি না চা? না কি ঠাণ্ডা দেব?

পৃথু হকচকিয়ে গেল। বলল, না না। কিছু না। দিদি আসুন আগে।

দাঈ চলে গেল নিজের কাজে।

বসে চতুর্দিকে চোখ বোলাল একবার ও। এক-সেট সোফা। ভীষণ দামী কিছু নয়, কিন্তু বসে খুব আরাম। হেলান দিয়ে বসার জন্যে পাতলা বালিশও আছে। স্ট্রাইপড কভার-পরানো, প্যাস্টেল্-রঙা।

সামান্য অগোছালো। দেখে বোঝা যায় যে, এখানে কুর্চি আর ভাঁটু অথবা অন্য কেউ বসেছিল সকালে। একাধিক কাপ চা খেয়েছে। সিগারেট-এর টুক্‌রো এখনো পড়ে আছে অ্যাস্ট্রেতে। চার্মস-এর গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। ঘরের কোণায় একটি কাঁচের আলমারী। নানা জিনিস সাজানো তাতে। উপরের তাকে কুর্চি আর ভাঁটুর বিয়ের পরে তোলা ফোটো। জোড়ে। ভাঁটুর মুখে গদগদ ভাব। নিখুঁতভাবে দাড়ি গোঁফ-কামানো। এতই নিখুঁতভাবে যে, মনে হচ্ছে বুঝি মাকুন্দ ও। পাশে কুর্চি।

বিয়ের পরই ওরা চলে গেছিল। ভাঁটুর সঙ্গে তেমন আলাপিত হবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু ওকে বাঙালী বলে মনেই হয় না। তাছাড়া পড়াশুনাও বেশি করেনি। চেহারাটা লম্বা, চওড়া, ফর্সা, মস্ত একটা মাথা। মাইনাস বুদ্ধি। ভাঁটু কি জানে কুর্চিকে পৃথু ভালবাসে এবং কুর্চি

পৃথুকে ? ভালোই যদি বাসত, তাহলে বিয়ে কবল কেন ভাঁটুকে ? বেচাবা ভাঁটু। ও বোধহয জানে না যে, ভালোবাসাব নানা বকম হয। একই সঙ্গে একাধিক লোককে ভালোবাসা যায। যে বাসতে জানে।

চাবটে বড় বড় জানালা বসাব ঘবে। লাল, ম্যাজেন্টা, হলুদ এবং কমলা বোগেনভোলিযা গাছ। বাগানে পেঁপে, আম, আতা, চেবী এবং কাবিপাতা গাছ।

চমকে চেয়ে, পিছন ফিবল পৃথু।

কুর্চি দাঁড়িযে আছে। অফফ-হোযাইট একটি ব্লাউজ আব হালকা খযেবী আবসাদা ডুবে শাড়ি পবে। দবজাব দু দিকেব খিলানে দু হাত বেখে। কুর্চি। তাব মস্তিষ্কব মধ্যে, বুকেব মধ্যে, দু চোখেব মধ্যে। আবাব হাসল কুর্চি।

অনেকক্ষণ কি বসে আছেন ? আমি চান কবছিলাম। তেল মাখি না অনেকদিন, ভাল কবে। কম ঝঞ্ঝাট। এক জাযগা থেকে আবেক জাযগায সবমালপত্র নিয়ে আসা। আজ অনেকক্ষণ ধবে তেল মেখে খুব ভা-ল্ল কবে চান কবলাম। খুবই ফ্রেশ লাগছে।

কুর্চি যখন চান কবাব কথা বলছিল পৃথুকে পৃথু আচমকাই শবীবে এক অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল ও যেন স্নানবতা কুর্চিব অদেখা নগ্নতাকে ওব চোখেব সামনে, সেই কার্তিকেব উজ্জ্বল উষ্ণ সকালবেলায দেখতে পাচ্ছিল ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল ওব মনেব কোণে বহুদিনেব দোযা সাধ ছিল গা-শিউবানো এক নিভৃত শখ ছিল যে কুর্চিকে নিজে হাতে একদিন বছব-ঘোবা শিশুব মতো চান কবায। মাযেব মতো স্নেহ, নার্সেব মতো দক্ষতায। তাবপব পাউডাব-টাউডাব মাখিয়ে, ন্যাপি পবিয়ে চোখে কাজল দিয়ে, কপালেব এক পাশে থ্যাবড়া কবে কাজল লেপে দেয, যেন আকাশ বাতাস এই পৃথিবীব কোনো দুষ্ট গ্রহ ডাইনী, জিন কিচিং কাঁড়িযা পীবেত বা কুচক্রী কোনো মানুষেবই চোখ না লাগে। না পড়ে তাব কুর্চিব উপব।

কুর্চি বলল, কেমন আছেন আপনি ?

কেমন দেখছো ?

অনেক বোগা হয়ে গেছেন ভাল কবে খাওযা দাওযা কবেন না বুঝি ?

খাই ত ! খুবই খাই। বেশিবকম খাই বলে কত অশান্তি। আব তুমি বলছ খাই না ?

তাহলে, অনিযম কবেন ? নিশ্চযই

উপায নেই। অনিযম কবাব কোনোই উপায নেই।

তবে ? ভাবনা চিন্তা কবেন বুঝি সব সময ?

তা কবি।

কিসেব এত ভাবনা চিন্তা ? এতো টাকা মাইনে পান। আজ বাদে কাল বোর্ডে যাবেন ডিবেকটব-হাটচান্দ্রাব চার্বদিকেব পঞ্চাশ মাইলেব পবিধিব মানুষ, পথে দেখলেই আপনাকে সেলাম কবে। রুষাদিবমতোভার্সেটাইল, গুণী, সুন্দবী, স্ত্রী, হাটচান্দ্রাব ইন্দিবা গান্ধী টুসু ও মিলিবমতোএমন ওযেল-ম্যানার্ড, ইন্টেলিজেন্ট, ব্রিলিযান্ট ছেলেমেয়ে। চিন্তাটা কিসেব এত আপনাব ! কী নিয়ে চিন্তা কবেন ?

কুর্চিটা ভীষণ খাবাপ। পবীক্ষা নিতে চায পৃথুব।

এবপব দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে বইল। পৃথু জানালা দিয়ে বাইবে চেয়ে কুর্চি বাগানে। কোনো কথা না বলে।

কি খাবেন বলুন ? চা, না কফি, না ঠাণ্ডা কিছু ?

কিচ্ছু না। আমি এক্ষুনি উঠব। রুষাকে বলে আসিনি। দেবী হলে, বাড়িতে খাবাব নষ্ট হবে। গালাগালি খেতে হবে।

নষ্ট হবেই না। আপনাব খাওযা ত ভাঁটুই খাবে ওখানে। ভাঁটুব খাওযাব আপনি খাবেন এখানে। রুষাদি কি এই অবেলায ভাঁটুকে না খেয়ে আসতে দেবেন ? তা হতেই পাবে না। ওসব কথা শুনবো না। আমি কফি কবে নিয়ে আসছি। একটু বসুন পৃথুদা ! কী ভাল যে লাগছে না। এখন কফি

খান তারপর আমরা দু'জনে বসে খাব। কত্ত গল্প করব। কত্তদিন পর

তুমি কেন কফি বানাতে যাবে? দাঈকে বরং বলো। আমি কি তোমার কাছে কিছু খেতেই এসেছি বলে তোমার ধারণা? তুমি আমার সামনে বসে থাকো গল্প করো তাহলেই সব চেয়ে খুশী হব।

তা হোক অত বেশী খুশী হওয়ার দরকার নেই। একটু খুশী হলেই হবে। আপনি বসুন। আপনি ত আপনিই। আপনাকে কি দাঈয়ের হাতে তৈরি কফি দিতে পারি? বলুন? এই নিন 'দেশ' তিন সপ্তাহ আগের। বলে ম্যাগাজিন র‍্যাক থেকে তুলে দিল দেশ'টা

যেতে যেতে বলল কত কষ্ট করে যে যোগাড় করি, জংলপুরেই পাওয়া মুশকিল ছিল। আর এইখানে ত' পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আচ্ছা। মিলি-টুস্ কি বাংলা পড়ে? পৃথুদা! বাংলা বই পড়ে ওরা?

নাঃ! **দীর্ঘশ্বাস** ফেলে বলল পৃথু।

তারপর বলল প্রবাসী বাঙালাদের পরের প্রজন্ম আর বাঙালী থাকবে না। কেউ কেউ হয়ত বাংলা ভাষায় বাড়িতে কথা বলবেন তাও অ্যাফেক্টেড বাংলায় বাংলা পড়তে বোধহয় শতকরা পাঁচ ভাগও পারবেন না

সত্যি বড়ই দুঃখ হয় ভাবলে

আমি আসছি কফিটা নিয়ে। সঙ্গে কিছু খাবেন? চানাচুর? ফিংগার চিপস? ওঃ ভুলেই গেছিলাম। নারকোলের নাড়ু খাবেন? কাল বানিয়েছিলাম।

পৃথু ঘাড় নাড়ল। কুর্চি চলে গেল ভিতরে।

পৃথু ভাবছিল, এক একজন মেয়ে, এক একরকম হয়। রুষা জীবনে একদিনও নিজে হাতে কফি বা চা করে তাকে খাওয়াযনি। তবে তার বন্দোবস্তে কোনো ত্রুটি নেই। দুজনের দুরকম গুণ কিন্তু এক একজন পুরুষও যে এক এক রকম হয়। কেউ একটু পার্সোনাল টাচ-এর কাঙাল কেউ অর্গানাইজেশনের অ্যাডমায়রার।

নারকোলের নাড়ু! মায়ের মৃত্যুর পর খায়নি। পৌষ পার্বণে পিঠে খায়নি। তেল-কই খায়নি। ধনেপাতা, কাঁচা লংকা, কালোজিরে দিয়ে। ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি খায়নি। বড় চিতলের তেলওয়ালা পেটি খায়নি, ধনে পাতা, কাঁচা লংকা দিয়ে। ভাপা ইলিশ খায়নি। বড় গলদা চিংড়ির মাথা ভাজা খায়নি যাক কী পাইনি, কী খাইনি তার হিসাব মিলাতে আজ ইচ্ছে করছে না পৃথুর। আজ, ও আর কুর্চি একা বাড়িতে। কত গল্প, কত মজা। শুধু ও আর কুর্চি। পাঁচ বছর পর!

এক ঝাঁক টিয়া সবুজ মেঘের মতো নীল আকাশে তীক্ষ্ণ স্বরের চাবুক মেরে উধাও হয়ে গেল শাঁওন নদী পেরিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে, দ্রুতবিলীন স্মৃতির মতো, কাঁপতে কাঁপতে। বাইরে কাঁচপোকার মতো রোদে কার্তিকের গায়ের তিক্ত কটু গন্ধ ভাসছে। উড়ছে। নামছে, মনমৌজী হাওয়ারই সঙ্গে সঙ্গে, পাখির মতো। কুর্চির বাগানে অনেকই পাখি। সব পাখিই সুন্দর। কেবল একটিই বিচ্ছিরী। সে পাখির নাম পৃথু।

এমন সময় একটা স্কুটারের আওয়াজ পেল নির্জন পথটাতে। তারপরই দেখা গেল। গাঢ় লাল-রঙা স্কুটার। লম্বা চওড়া ভদ্রলোক ব্যাংলনের একটা গোলাপী গেঞ্জী ও নীলরঙা স্ট্রেচলনের ট্রাউজার। নেমে ধাক্কা দিয়ে গেট খুলে আবার স্কুটার চালিয়েই চলে এল ভিতরে। বাগানে যে ছোট চালামত আছে, তার নিচে সেটাকে রেখে, হাঁক দিল দাঈ-ঈ, গেট বন্ধ কর দেনা জী। দাঈ

প্রথমে চিনতেই পারেনি পৃথু পাঁচ বছর আগে দেখেছিল বিয়ে করতে আসা নবাগন্তুককে। ভাঁটু। কুর্চির বর!

বসবার ঘরে ঢুকে পৃথুকে দেখেই বলল, আরবে? পিরথু দা যে! আজীব আদমী ত। আপনার খোঁজেই ত গেছিলাম। দেখুন, ধুলোয় কেইসা ভুত বনে গেছি। সুকবার ঠিক পরেই যে কজওয়েটো মেরামত না হচ্ছে, সেইখানে ডাইভার্সন! বাম কহো! কী ধুলো! হালত সাচমুচ খারাব হো গ্যায়া। উর শুনাইযে খাল খবিয়ৎ সব ঠিক্কে না?

সব ভাল। রুষা বাড়ি ছিল না? কখন গেছিলেন ওখানে?

হ্যাঁ। হ্যাঁ, ছিলো ত। আভভিত আ বহা হ্যায়, হঁইযেসে।

ও, ছিল তাহলে। কটা বেজেছে এখন ভাঁটুবাবু?

লজ্জা করল পৃথুর। ওকে খাইয়ে দিলো না রুষা। ছিঃ।

এখন প্রায় সোয়া একটা হল? কেন? কি হল? এতো তাড়া কিসের? আমি ত সামনে আবার যাবো ভাবীর কাছে। ইদুরকার সাহেব ভি আসছেন। একটা মীটিং ডেকেছেন ভাবী। হাটচান্দ্রাতে কিশোরকুমার নাইট কোরাবার কোথা শোচছি আমরা। মোহিলা সোমিতিকো যো ভি রূপেয়া বাঁচেগা, সবহি দে দেগা। কুর্চি বোলছিল, কোনিকা বনার্জী আর সুবিন রয়কে আনতে।

কি বলল রুষা?

ভাবী বললেন, ছোড়ো, ভাঁটু। রবীন্দ্র সঙ্গীত ফঙ্গীত নেহী চলেগা হিঁয়া। আইদার কিশোরকুমার + অমিতকুমার নাইট, নেহী ত আনন্দশংকরকা পার্টিকা বোলা লেও। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয্যারকা ভি দাওয়াত দিতে পারো

একটু চুপ করে থেকে ভাঁটু বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীত কা জামানা খতম হো গ্যায়। আভভি কুছ ঝিং-চ্যাক জিগলিং-ঝুম-ঝুম মিউজিকোঁকো ওয়াক্ত হ্যায় আপনি কি বোলেন দাদা?

এ সবের আমি আর কী বুঝি বলুন? আপনি খেয়ে এলেন না ওখানে। এত বেলায় এলেন?

খেয়েছি ত। আলবাৎ খেয়েছি। ফ্রেশ লাইম। উইথ ওয়াটার। আপনার আয়া মেরী, নিম্বু চিপে ফ্রিজ-এর পানি দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস সোরবৎ কোরে দিল।

দুপুরের খাওয়াটাই আপনি খেয়ে এলেন না?

সত্যিই খুব অপরাধী লাগছিল পৃথুর।

আরেঃ। আপনি কি পাগল আছেন? উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট বোলা নেই, কোওয়া নেই, হুট করে খাওয়া যায় নাকি? আজকাল সোব ফ্যামিলিতেই গিনতি-করা লোক এ ত' আর আগের জামানা নেই যে, ওনেকেরই খানা বেশি থাকছে রোজই। তাছাড়া রুষা ভাবী আপনার বহুতই ডিসিপ্লিনড হচ্ছেন। আমি বহুতই অ্যাডমায়ার করি বেটা বেটি'ও কী চোমৎকার হোলো দাদা আপনার। বৌদি ডাকলেন, ইনট্রোডিউস কোররার জন্যে এক সেকেণ্ড করে এল, বাও করল, পাক্কা সাহেবের বাচ্চার মতো বলল, হাই। আঙ্কল। তারপর নিজের নিজের ঘোরে চলে গেল। ভাবীর কাছ থেকে শেখার বহুত কুছ আছে।

কুর্চি কফি নিয়ে এল। ভাঁটুকে দেখে বলল, খাবে তুমি?

দুসস। আমি বীয়ার লেব। আছে ত' ফ্রিজ-এ কি হল? এই ওবেলায় কফি? বীয়ার চোলবে ত'? চোলবে। চোলবে। চোলুক।

আবারও পৃথুর মন খারাপ হয়ে গেল লজ্জা ত' হলই এই অবেলায়, রোদ মাথায় করে যখন ভাঁটু হাটচান্দ্রাতে গেল, তখন ওকে খাইয়ে দিলে কি হত রুষার? একদিন যদি একজন লোক বেশিই খায় উইদাউট নোটিস-এ, তাহলে কি ক্ষতি হয়? নিজেরা না হয় সকলে একটু কম কমই খাওয়া যেত।

আর এখানে বসে কী-ই বা লাভ। কুর্চিকে ত আর একা পাবে না ভাঁটু তার ভাঙা ভাঙা বাংলায় ভট ভট করে কন্টিনুয়াসলি কথা বলে যাবে। অনেকেরইমতো, নিজের গলার স্বরকে ভাঁটু খুবই ভালবাসে। পৃথুরা, ওরা নিজেরাও অনেকদিন প্রবাসী। কিন্তু ভাঁটুরমতো ভাঙা বাংলা ওদের পরিবারের কেউই বলে না। আসলে ভাঁটুটা অশিক্ষিতও বটে কী দেখে যে বিয়ে করেছিল কুর্চি সেই-ই জানে।

পৃথু বলল আমি উঠলাম।

সে কি?

আহত ও অবাক গলায় কুর্চি বলল।

আরে বোললাম ত' বীয়ারবিয়ার খেয়ে ডাটকে খনা খেয়ে স্কুটারে দুজনে বসে সামকা

টাইম্‌মে চলে যাব। এখন যাবেনই বা কিসে? এই ধূপ-এ? আসলেন কিসে?
গাড়িতে।
মিথ্যা কথা বলল পৃথু। ভাঁটুর হাত থেকে বাঁচতে।
গাড়িতে? কোথায় গাড়ি?
আছে। বাজারে।
বাজারে? আমি ত' এই-ই আসলাম। বাজাব হয়ে। কোনো গাড়ি ত' দেখলাম না। স্রিফ্ চান্‌চানীদের জীপটাকে দেখলম্।
কাছেই গেছে। কাজে পাঠিয়েছি। এসে যাবে, মানে এসে গেছে এতক্ষণে।
আর্‌রে। কী যে বলেন দাদা। আপনাব দিমাগ্‌ই খরাপ। হাটচান্দ্রাতে গাড়ি ত' আপনার দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম আপনার বাড়িরই পোর্টিকোতে। আপনাবই গাড়ি ত' হচ্ছে? নাকি? নেভি-ব্লু রঙা আম্বেসোডব। ফোবটিন সিক্সটিন নাম্বার। ঠিক কি না?
পৃথু বিরক্ত হল। ছোকরাটা বড় স্টাবর্ন্। আর এঁড়ে তর্ক করে। যাদের কোনো কাজ কম্ম নেই, তাবাই যত রাজ্যেব গাড়ির নাম্বাব মুখস্ত করে বাখে।
বলল, আমাব নিজেব গাড়ি নিয়ে আসিনি। ভুচুব গ্যারাজ থেকে একটা···
ভুচু? কে ভুচু? কুর্চি শুধোল।
আছে। ওব মোটব গারাজ আছে। মান্দলাতে ছিল আগে। তাব আগে জবলপুবে।

তাই-ই। বলল কুর্চি।
পৃথু সোজা উঠে পড়ে, বাগানেব দিকে এগোল। গেট খুলে পথে যাবে বলে।
কুর্চি কথা না বলে পেছন পেছন এল।
গলা নামিয়ে বলল, কি হল? হলটা কি আপনাব? কফিটা অন্তত খেয়ে যান। কি?
নাঃ। আমি যাই কুর্চি।
মাঝে মাঝেই এমন অশান্ত অবুঝ হয়ে ওঠে ও। ও এমন এমন সময় নিজেকেও বোঝে না।
কুর্চি গেট অবধিই এল, খালি পায়েই। পেছন পেছন।
দুদিকে দুটি কদম গাছ। মুখ তুলে ভাল কবে তাকাল কুর্চি পৃথুব দিকে। বলল, আপনি ভাবী অসভ্য হয়েছেন। ছিঃ।
চিবদিনই ছিলাম। চলি।
আবার আসবেন। কি? আসবেন না?
দেখি।
চিঠি লিখবেন? আগে ত' কত লিখতেন?
গলা নামিয়ে কুর্চি বলল
পৃথু ভাবল বলে যে, চিঠি ত অন্য লোকে হাতিয়ে নিত। কে জানে ভাঁটুই নিত কী না? না, ওব পবিবাবেব অন্য কেউ? লিখবে কি কবে? এখানেও তাই-ই হবে। পবেব চিঠি যাবা খোলে তাবা
কিন্তু মুখে কিছু বলল না।
ঠিক আছে।
ঠিক?
ঠিক।
ভাঁটু বসবাব ঘরেব দরজার সামনে দাঁডিযে বলল, আপনি পিরথু দাদা বড্ড জিদ্দি হচ্ছেন। এত জিদ্দি ভাল নয়। আসবেন আবার।
গেট খুলে, পথে পড়ে, শালবনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল পৃথু, বাজারের দিকে। পিপাসা পেয়েছে। বাজাবে গিয়ে দুটো পান খাবে একশ-বিশ জর্দা দিয়ে।
অনেকদূর এসে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ও। কুর্চি তখনও সাদা-রঙা কাঠের গেটেব

উপরে দুটি হাত বেখে দাঁড়িযে আছে। জোড়া কদমের নিচে।

আগেব মতোই আছে। একটুও বদলায নি। ভাঁটু ফুল কি কুর্চি ফুলকে বদলাতে পাবে ? খুবই ভাল লাগল ওব। কুর্চিব জন্যে অনেক অনেক শুভকামনা ও হাত না তুলেই কার্তিকেব বোদেব মধ্যে মিশিযে দিল যাতে কুর্চিব সাবা গাযে তা গিযে ছোঁয। উড়ে উড়ে, আবীবেব মতো, আশ্লেষে।

পৃথু এখন বাড়িতে যাবে না। গেলেই ত' অশান্তি। মিথ্যা বলতে পাববে না। বলতেই হবে যে, গেছি, কুর্চিব কাছে। বিকেলে আবাব মীটিং। বিনোদ ইদুবকাব। জিগলিং-ঝুম। ভাঁটু। হুলো বেড়াল। তখনই জানতে পাববে রুষা। বাতে ত' বাড়ি ওকে ফিবতেই হবে। তখন কপালে আছে

বাজাবে একজোড়া জর্দা পান খেযে, জর্দাটা মাথাব মধ্যে ব্যাঙাচিবমতোলাফালাফি শুরু কবতেই ও ঠিক কবল, হাটচান্দ্রাতে পৌঁছে বাড়ি না গিযে, সাবীব মিঞাব দোকানেই যাবে। বহুদিন যাওযা হয নি। দোকানে বসেই কাবাব-পবোটা আনিযে খেযে নেবে।

পানেব দোকানেব পাশেব অশ্বত্থতলাব ছাযায একটা সাইকেল-সাবাই-এব দোকানেব কাঠেব পাটাতনে বসে বইল পৃথু। বাস আসাব প্রতীক্ষায। পথেব নবম ধুলোও প্রতীক্ষায আছে। কখন কোন দ্রুতগামী যান এসে ওদেব উড়িযে দেবে বলে।



সন্ধ্যেব আগে আগেই পৃথু ঠুঠা আব শামীম এসে পৌঁছেছিল দিগা পাঁড়েব কুঁড়েতে শামীমেব বি এস এ মোটব সাইকেলে তিনজন আগে পিছনে বসে লাফাতে লাফাতে আদাপমস্তক ধুলোব আবিব মেখে।

এই দিকটা গিবিশদাব বাড়ি পিবপিবি নালা এবং পুন্নাব জঙ্গলেব একেবাবেই উল্টোদিকে ঘন গভীব জঙ্গল এদিকে। হাটচান্দ্রা থেকে দূবত্বও প্রায তিবিশ মাইলেবমতো। হাঁলো নদী বযে গেছে দিগাব কুঁড়েব পাশ দিযে। এই জঙ্গলই গড়িযে গিযে মিশে গেছে সুফকব বাঘমাব, ঘাঙ্গাব এবং গোন্দলাব দিকে। অন্যদিকে চলে গেছে কানহা কিসলি-ইন্দ্রা। মোতিনালা চিলপিব দিকে বেবিযে গেছে অন্য আবও একটি হাত। অন্যতব দিকে অন্যতব হাত ছড়িযে গেছে বাইহাব, বালাঘাট সীওনী ইত্যাদি জাযগা হযে। সেই সীওনীব কাছে নতুন ন্যাশনাল পার্ক গড়ে উঠছে একটি। নাম পেঞ্চ। মধ্যপ্রদেশেব এই অঞ্চলে শুধু জঙ্গলই জঙ্গল, পাহাড়ই পাহাড়। দশ পনেবো মাইল বাদে বাদে ... ... নো বস্তী, অথবা সামান্য জনপদ। এখনও শান্তি আছে নিজনতা আছে এখানে।

এই সীওনিতেই রুডইযাড কিপলিং এব 'মোওগুলি'ব বাস ছিল বলে অনেকেবই ধাবণা। কুমার্যুকে যেমন কববেট-কানট্রি বলে সকলেই জানেন সীওনী এবং তাব চাবপাশেব অঞ্চলকেও তেমনই, সকলে বলে 'কিপলিং কানট্রি।"

শামীম মিঞা বহস্যময লোক। হাটচান্দ্রাব ছোট্ট মসজিদটাব পাশে যে ধূলিধুসবিত এবড়ো-খেবড়ো পথটি আছে যে পথেব দুপাশে লাল-কাপড়ে মোড়া, বড় বড় হাণ্ডাব উপবে সাজানো কাবাব, চাপাটি, বাখখবখানি আব বোমালী বোটি, বিবিযানী আব বড়া গোস্ত-এব দিল খুশ

গন্ধে যে-গলিব বাতাস দিনে রাতে ম' ম' করে সেই রাস্তারই মোড়ে শামীমের ঘড়ি, চশমা, আর লাইটার সারাই-এর দোকান। সেটাকে দোকান না বলে, গর্ত বললেই ভাল হয়। দোকানের সাইজ চারফিট বাই তিন ফিট। তারই মধ্যে শামীম হাঁটু মুড়ে কোনোরকমে অষ্টাবক্র মুনিরমতোবসে থাকে। দোকানে নতুন ঘড়ি, চশমা, লাইটাব বলতে একটিও থাকে না। সামান্য কয়েকটি চশমার ফ্রেম এবং ঘড়ির ব্যাণ্ড। লাল-নীল-সোনালী-রূপোলী। উত্তব ভাবতীয় মুসলমানী রুচির। সারাই-এর জন্যে কয়েকটি হাতঘড়ি, টেবল্-ঘড়ি। ব্যসস্। দেওয়ালে বম্বে সিনেমাব রেখাব আধ-বন্ধ আধ-খোলা চোখের গা-গরম করা অ্যাফ্রোডিসিয়াক্ ক্যালেণ্ডাব।

শামীম-এর পকেট সবসময়ই প্রায় শূন্য। ব্যতিক্রমহীন ভাবেই শূন্য। কিন্তু হৃদয়, প্রেম এবং বসজ্ঞানে টইটম্বুর। তাব বযস তিরিশ। বিবিব সংখ্যা দুই। এবং দু'পক্ষ নিয়ে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা দশ। মিঞাব সংসাব ঠিক কী উপাযে চলে, এ বহস্যেব কিনারা পৃথু তাব স্থূল বুদ্ধিতে কখনও কবে উঠতে পাবেনি।

শামীম্ সব সমযই হাসিখুশি, অফুবন্ত উৎসাহ তাব। কথায় কথায় শেব-শায়েব আওড়ায়, এবং শশীকাপুরেব ঢঙ নকল করে হাঁটে। কথাও সেরকমই বলে। নিন্দুকেবা অনেকে আড়ালে মন্তব্য কবে শামীমেব দু বউয়েও শানাযনি, তাই একজন উপবি প্রেমিকাও আছে। তাই-ই ও সব সময এমন চলকে চলকে চলে।

পৃথুর অবশ্য সন্দেহ আছে এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে। শামীম এমনই জন্মপ্রেমিক যে, গা-ঝলসানো, চোখ-জ্বালানো লু, অথবা আঙুল-বাঁকানো শীতরাত্রিব ববফ-ঝবা আকাশ কিংবা পাগলেব কথা অথবা ছাগলেব খাদ্যদ্রব্য থেকেও ও ওব রোম্যাণ্টিসিজম নিংড়ে নিতে জানে। পৃথুব নিজের ধারণা যে, কোনো মানবীব খেযালখুশিব উপর শামীমেব প্রেমিক সত্তা আদৌ নির্ভরশীল নয়। পৃথিবীব তাবৎ শুষ্কতা এবং রুক্ষতা থেকেও ক্যাক্টাস-এব মতোই রস শুষে নেয় মানুষটা।

আজ বাতে শামীমেব ঠুঠা বাইগার সঙ্গে দিগাপাড়েব নদীপারেব সান্নাটা কুটিরে আসাব উদ্দেশ্য একটাই। চুরি করে চিতল হবিণ মাববে ঠুঠা ও শামীম। বহুদিন কাবাব খাযনি বলে তো বটেই, তাছাড়া মহম্মদ সাবীর-এব তেবো নম্বব ছেলেব ছুন্নৎ কাল। শিকাবিব বাড়িব দাওযাত-এ শিকার-করা বুনো জন্তুব একটিও পদ না থাকলে শিকারি এবং তার ইয়ার-দোস্তসকলেরই দারুণ অসম্মানেব কাবণ ঘটে। পৃথু এখন শিকার-টিকাবেব মধ্যে একেবারেই নেই। তবে একসময় ও অনেকই শিকার কবেছে। পাবমিট নিয়ে, পাবমিট না নিয়েও ; এই সব অরণ্য পর্বতে বাবার সঙ্গে, বাবার বন্ধুবান্ধব এবং নিজেব বন্ধুদেব সঙ্গে। কিন্তু আজ প্রায় পনেবো বছব শিকারেব সঙ্গে নফরৎ। ঠিক কেন যে, তা বুঝিয়ে বলতে পারবে না। বাইবেব বিধিনিষেধ তো আছেই, তাছাড়া মন থেকেই সাড়া পায না আজকাল। অল্প বয়সে বোধ হয় একটা বাহাদুরী-প্রবণতা ছিল। তাছাড়া ওর বাবাব নিজের প্রচণ্ড উদ্বেল উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন ওব দশ বছব বয়স তখন থেকেই জঙ্গলে জঙ্গলে বন্দুক হাতে ঘুরেছিল ও। এ অঞ্চলের এমন জঙ্গল নেই যেখানে পৃথু যায়নি বা এমন জাতের জানোয়ারও নেই যে, পৃথু শিকাব করেনি এক সময়। কিন্তু সে সব পিছনে ফেলে-আসা দিনেবই কথা।

শিকার বন্ধ হয়ে গেছে, তবে শিকারী বন্ধুবান্ধবদেব এবং জঙ্গলেব সঙ্গে প্রগাঢ় সখ্যতার শিকড় এখনও গভীরে প্রোথিত বয়ে গেছে। হয়ত থাকবেও বাকি জীবন। জঙ্গল-পাহাড়, নদী, ঘাসী-মাঠ, শিকারী বন্ধুবা শুধু একতরফা দিয়েই গেছে তাকে, বিনিময়ে চাযনি কিছুই।

হৃদয়ের মামলাতে দেনা-পাওনা থাকার কথা নয়, তবুও থাকে। কিন্তু শিকাবের ইয়ার-দোস্তদেব প্রেমের সঙ্গে কোনো নাবীব প্রেম কখনই তুলনীয় নয়। শিকারী মাত্রই জানেন একথা।

আজকে পৃথুকে প্রায় জোব কবেই ধরে নিয়ে এসেছে ওবা। ওব ভূমিকাটা, অনেকটা পুরোনো দিনের যাত্রাদলের বিবেকেবই মতো!

এ এক অদ্ভুত জগৎ। এই শিকাব ও শিকারীদেব জগৎ। তুফান-তোলা। সবচেয়ে বড় জুয়াব নেশার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র এ নেশা। পুরুষালী নেশা। খোলা আকাশেব নিচে, পরের জীবন

এবং নিজেরও জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার নেশা। এ নেশার ঝাঁঝের মধ্যে, গ্যাঁজালো ফেনার মধ্যে, একদিন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে ছিল বলেই পৃথু জানে যে, যারা শিকারকে ছোট চোখে দেখেন তাঁরা অন্যায় করেন। তাঁরাও নিশ্চয়ই অন্যায় করেন, যাঁরা শিকারকে মহান কোনো ব্যাপার বলে প্রচার করেন। সবকিছুরই মতো এই প্রাণবন্ত প্রাণনিধনের রনময় খেলারও বোধহয় ভালো এবং মন্দ দিক দুই-ই আছে।

ছেলেবেলাতে পৃথুর কিপলিং-এর 'জাংগল-বুক'-এর অনেক গল্পই মুখস্থ ছিল। তার মধ্যে "কা আজ হানটিং", "রিক্কি-টিক্কি টাভি" ইত্যাদি এখনও পরিষ্কার মনে আছে। 'লেটিং ইন দ্যা জাংগল' চ্যাপটারটাও চমৎকার লাগত ওর।

বাবার সঙ্গেই প্রথমবার সীওনীতে এসেছিল পৃথু। তখন ও ছোট্ট ছেলে। বাবা যখন বলেছিলেন, এই সীওনীই রুডইয়ার্ড-কিপলিং-এর 'জাংগল-বুক"-এর মোওগলির সীওনী তখন পৃথুর উত্তেজনার শেষ ছিলো না।

টাইগার! টাইগার!

এখনও ও মুখস্থ বলে। টুসুকেও শিখিয়েছিলো পৃথু,

"হোয়াট অফ দ্যা হান্টিং, হান্টার বোল্ড?/ব্রাদার, দ্যা
ওযাচ ওজ লঙ এণ্ড কোল্ড।/হোয়াট অফ দ্যা কোয়ারী
ঈ ওয়েন্ট টু কিল?/ব্রাদার, হি ক্রপস ইন দ্যা জাঙ্গল
স্টিল /হোয়্যার ইজ দ্যা পাওয়ার দ্যাট মেড ইওর প্রাইড?/
ব্রাদার, ইট এববস ফ্রম মাই ফ্ল্যাঙ্ক এণ্ড সাইড।/
হোয়্যার ইজ দ্যা হেস্ট দ্যাট ঈ হার্বী বাই?/ব্রাদার
আই গো টু মাই লেয়ের টু ডাই।'

আহা!

'লেটিং ইন দ্যা জাংগল'-এর সেই গানটিও ভোলবার নয় কোনোদিনও। পরিণত বয়সে পৌঁছেও যখনই জঙ্গলে রাত কাটিয়েছে ও, যখনই পূবের আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে, উষার ঠিক আগের রাত যাই-যাই মুহূর্তে লালিমার জবাযুর মধ্যে থেকে যখনই লাল রঙের তারল্য অতি আস্তে আস্তে আভাসিত হতে থেকেছে, তখনই পৃথুর মনে পড়েছে

'হো! গেট টু লেয়ের! দ্যা সানস অ্যাফ্লেয়ার বিহাইণ্ড দ্যা ব্রীদিং গ্রাস/ এণ্ড ক্রীকিং থ্রু দ্যা ইয়াং ব্যাম্বু দ্যা ওয়ার্নিং হুইসপার্স পাস।/বাই ডে মেড স্ট্রেঞ্জ দ্যা উডস উই রেঞ্জ উইথ ব্লিঙ্কিং আইজ উই স্ক্যান/হোয়াইল ডাউন দ্যা স্কাইজ, দ্যা ওয়াইল্ড ডাক ক্রাইজঃ দ্যা ডে—দ্যা ডে, টু ম্যান।"

মধ্য প্রদেশের এই সব অঞ্চলে 'পানকা' বলে একরকম আদিবাসীরা আছে। এদের সামাজিক রীতিনীতি দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে এরা সবাই-ই কিন্তু কবীর-পন্থী। কবীর দাস-এর মতোও পথের অনুসরণকারী। কিপলিং-এর 'জাংগল-বুক'-এ "আ সং অফ কবীর", বলেও একটি গান আছে। কিপলিং যে এ অঞ্চল নিয়েই লিখেছেন তাঁর 'জাংগল-বুক', সে বিষয়ে বোধ হয় কারোই সন্দেহ থাকার কথা নয়। 'জাংগল-বুক'-এ আরও একটি গান আছে। তার নাম হচ্ছে "হান্টিং সং অফ দ্যা সীওনী প্যাক।" সীওনী নামটা গেঁথে রয়েছে কিপলিং-এর লেখাতে।

কিপলিং-এর কথা হলেই আনন্দ হয় এই ভেবে যে, তাঁর যখন বয়স মাত্র বেয়াল্লিশ তখনই সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। আরেকজন ভারতীয় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিলেন জিম করবেট। সেই প্রচার-বিমুখ, নম্র-স্বভাব, নীরব, প্রায় কবি শঙ্খ ঘোষের মতই লাজুক, অন্তর্মুখী মানুষটিও বড় সাধারণ লেখক ছিলেন না। তাঁর শিকার-কাহিনীগুলির কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, শুধু জাঙ্গল লোর বা "মাই ইণ্ডিয়া"র মতো বইয়ের জন্যেও তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উচিত কর্ম এ পৃথিবীতে ক'টাই বা হয়? সম্মান যোগ্যজনে বর্ষিত হলেই

আজকাল অবাক লাগে পৃথুর।

শামীম্ চায়ের বন্দোবস্ত করতে গেল ভেতরে। চায়ের প্যাকেট আর ঝাল লেড়ে বিস্কুট নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। বেলা পড়ে আসছে তাই বাইরে আগুন জ্বালানোর বন্দোবস্ত করেছিল ঠুঠা। শীতও পড়ে গেছে। আগুনের পাকা-পোক্ত একটা জায়গা ছিলোই দিগার কুঁড়ের সামনেটাতে। মস্ত বড় একটা হলদু গাছের ঝরে-পড়া গুঁড়ি সেখানে টেনে নিয়ে এসে ফেলে রেখেছিল। পাতা, খড়কুটো, ভাঙা শুকনো ডালপালা জড়ো করে এনে আগুন করল ঠুঠা। শামীম্ ততক্ষণে কুঁড়ে থেকে দিগার লোটাটা নিয়ে এসে আগুনের পাশে দু'টুকরো গোলগাল পাথর বসিয়ে চড়িয়ে দিল। পাগলের মতো পুরুষ চিতল হরিণ ডাকতে লাগল হঠাৎ হাঁলোর ওপারের শেষ সূর্যের সিঁদুর-লাগা গভীর জঙ্গলে। দেখতে দেখতে আগুনের ফুট্‌ফাট শব্দের সঙ্গে জল ফোটার শোঁ-শোঁ আওয়াজ গলা মেলাল। চা হয়ে গেলে, একটি ফাটা এবং দুটি ভাল, লাল্‌চে রঙা মোটা কাচের গেলাসে চা খেল ওরা।

চা-টা খায় না দিগা। ওদের খাওয়াও শেষ হল আর পশ্চিমের আকাশ লাল করে অসংখ্য পাখির ব্যস্ত-সমস্ত ডাকাডাকির মধ্যে সূর্য অস্ত গেল।

সূর্যাস্তের অব্যবহিত আগেই বন-পাহাড়ে এক প্রচণ্ড নড়াচড়া, ব্যস্ততা এবং শোরগোল লক্ষিত হয়। বিশেষ করে, পাখিদের মধ্যে। যতক্ষণ পর্যন্ত আলোর রেশ থাকে। তারপরই, যেমন ঝুপ করে গাঁ-গঞ্জের যাত্রা মঞ্চের কালো পর্দা নামে, তেমনই ঝুপ্ করে নামে এক গর্ভবতী স্তব্ধতা। অনেক কিছু হতে পারার, ঘটতে পারার সম্ভাবনাময় গাভীন্ সেই রাত নিঃশব্দে উস্‌খুস্ করে, পাশ ফিরে শোয়; কথা না বলেই কথা কয় নিজের সঙ্গে।

শামীম্ ঘরে গিয়ে ওর ম্যানটন কম্পানীর আটাশ ইঞ্চি ব্যারেলের দোনলা বন্দুকটাতে একবার ক্লীনিং বড্ চালিয়ে, নিজের হিনা-ঈত্বর লাগানো খুশ্‌বু-ভরা রুমাল দিয়ে বন্দুকের মুখ ও গা থেকে ধুলোটুলোও ঝেড়ে এলো। বড় পেয়ারের বন্দুক শামীমের। শামীমের এই বাড়াবাড়ি বন্দুক-ভালোবাসা নিয়ে মাঝে-মাঝেই মজা করে সাবীর মিঞা। ওকে শুনিয়েই বলে: বিবি দো। বাল-বাচ্চা দশ্/ এক আসীক/মাশুক্, মগর·

শামীম তবু হীরোর মতোই হাসে। সমস্ত সময়ই শামীম এমন হীরো-হীরো ভাব করে যে, মাঝে মাঝেই পৃথুর সন্দেহ হয়, এই অ্যামেচার বে-মঞ্চের অভিনয়ই বুঝি শামীমের জীবন।

তারিয়ে তারিয়ে চা-টা খেয়ে নিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে শামীম্ ঠুঠাকে বলল, ক্যা গুরু? অব ক্যা কিয়া যায়? আভভি চলো গে? না, জাবা বাদমে? পাল্‌সা খেলেঙ্গে আজ। বহত রোজ বাদ।

ঠুঠা একটা শুকনো ডাল হল্‌দু গাছের রিকি-ঝিকি আগুনে গুঁজে দিয়ে ধরিয়ে নিল। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে চুঠ্‌ঠাটা গুঁজে দিয়ে মনোযোগ সহকারে চুঠ্‌ঠায় আগুন ধরালো। সেই কমলারঙা আগুনে ওর বাঁ গালের বাঘ-নখের আঁচড়ের গভীর দাগটিকে আরও কুৎসিত করে তুলল। সুফ্‌ফর-এর কাছের হাঁকোয়া শিকারের স্মৃতি, এই দাগ। চুঠ্‌ঠাটা ধরিয়ে ডালটাকে আগুনে ফিরিয়ে দিয়ে মাথা তুলে বলল · তুম যেইসা বোলোগে হীরো-মিঞা।

তারপর বলল, দ্যাখ্ সঙ্গে মৌলভীটাকে নিয়ে এলেই হত। মৌল্‌ভী গিয়াসুদ্দীন। এতক্ষণে শেয়ালের মতো চুপ্‌টি করে গিয়ে কমসে কম্ চার-চারটে বড়কা-মোর্‌গা মেরে আনত। রাতে কী দারুণ জমত তাহলে খাওয়াটা!

শামীম্ ঘেন্নায় থুথু ফেলল। জিভটা টাগরাতে ঠেকিয়ে একটা শব্দ করল। ছুঁচোজাতীয়। বলল, মৌল্‌ভী গিয়াসুদ্দীন বড় দাম্ভিক। তার দম্ভ কেতাবী রংবাজীর, পয়সার আর তার মোর্‌গা-মারার কেরামতির। ও একটা বেজন্মা। মুসলমানদের কুলাঙ্গার।

পৃথু ভাবছিল, মোরগা-মারার ক্ষমতাটা ওর কিন্তু সত্যিই তাজ্জব করার মতো। সে বিষয়ে সন্দেহই নেই কারো। চেক্-চেক লুঙ্গি পরে, ঝুম্‌কো-জবার মতো লেজওয়ালা মেরুন-রঙা ফেজ মাথায় দিয়ে, ঘাড়ে-গর্দানে নাটা-গাঁট্টা মৌল্‌ভী যখন পা-মুড়ে থেব্‌ড়ে বসে, হেলেদুলে মুরগীর দলের দিকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে

এগিয়ে যায়, তখন তাকে দেখলে মনে হয়, সত্যিই সে খুদাহব এক আশ্চর্য সৃষ্টি। শামীম অত্যন্ত ঘেন্নার সঙ্গে বলে পবিত্র কোরআন শরীফ-এব 'সুরা নাহ্‌ল'-এব এক নম্বব 'রুকু'ব পাঁচ নম্বব 'আয়াত্'-এ অন্য জানোয়ারদেরই সঙ্গে এই মৌলভী সাহেবের কথাও উল্লিখিত হওয়া নাকি উচিত ছিল। শালে, এক আজীব্ জানোয়ার।

মুরগীর দলের কাছে গিয়ে ডান হাতে বন্দুক বাগিয়ে ধরে, বাঁ হাতে পাতা, মাটি, কুটো নেড়েচেড়ে, পা দিয়ে ঠিক মুর্গাদেরই মতন শব্দ করে মৌল্‌ভী। আব মুখ দিয়েও মুরগীদের আওয়াজ ছাড়ে ইঁ-ই-এঁ-এঁ-এঁ-এ-এ, এঁ-এঁ-এঁ-এ-ইঁ· ·আব তার সঙ্গে সঙ্গে খচ্ খচ খচব্ খচব্ খচর কবে আঙুল দিয়ে পাতা নাড়াচাড়ার, পোকা-খোঁজার পোক-পোকাবি আওয়াজ। দেখতে দেখতে নতুন হাবেমেব খোঁজ পেয়ে, চিরকালীন বোকাদের প্রতিভূ মদ্দা, দামড়া, ধেড়ে-মোবগা লাল-নীল-বেগনে-সোনালী মাঞ্জা চড়িয়ে, তার মোর্‌গা-পৌরুষের চেকনাই উড়িয়ে কঁক-কঁক-কঁক-কঁক্ করে এগিয়ে আসে। অনেক সময়ই তার পেছনে পেছনে সন্দিগ্ধ, ঈর্ষাকাতর চিবকালীন মুরগীগুলো মানুষীদেবই মতো আসে নতুন সঙ্গ-ধরা অসতী সতীনদের চেহারা-ছবি দেখতে। ঠিক তখনই, গদ্দাম করে দেগে দেয মৌল্‌ভী। মোর্‌গা এবং সঙ্গে দুটো-একটা সহ-মবণে বিশ্বাসী সতী-সাধ্বী মুবগীও পা-হড়কে সড়াৎ করে পিছলে পড়ে মুখ থুবড়ে। স্বর্গের দিকে উড়ে যায, না-উড়েই, পাখায রোদেব বঙ উড়িয়ে।

সাহসী শিকারী শামীম্, মৌলভীর এই সব হরকৎ একেবারে দেখতে পারে না। ও বলল, বাঘ-বাঘিনীকে ডেকে মারতো, তাও তো বুঝতাম। শালে, মোরগা-শিকাবী। ডরপোক। ওব মাথাব ফেজটাও একেবারে মোরগার ঝুঁটির মতো। ওকে আমিই একদিন মুবগী মাবতে নিয়ে এসে ধড়কে দেব ঠিক করেছি। কাছ থেকে একটি পৌনে তিন ইঞ্চি অ্যাল্‌ফাম্যাক্স এল্-জি হুম্মচকে ঠুকে দিলেই, ইয়া আল্লাহ! বলে চক্কর উল্টে পডবে সুরত্‌হাবাম! মজা বুঝবে সেদিন।

ঠুঠা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, হচ্ছিল কখন শিকারে বেরুবে তাব কথা, মধ্যে এতগুলো কথা এসে গেল মৌল্‌ভী গিয়াসুদ্দীনের। বেকাব। বড় ঘোবাধুরি করে যায় তোর কথার পথ শামীম্।

পৃথু, ঠুঠার দেওয়া চুঠ্‌ঠাটা পাথরেব উপর বসে, পা মুডে আরাম কবে খেতে খেতে ওদের মিছিমিছি-ঝগড়া শোনে। ফাক্‌সা—আলাপের মতোই ফাক্‌সা—ঝগডা। সুইট-নার্থিংস্-এরই মতো সুইট্-বিকারিং!

ওরা সব শিকারের, জঙ্গলের বন্ধু। (এমন বন্ধুত্ব বোধ হয় একমাত্র লড়াইয়ের কমরেড্‌দের মধ্যেই হতে পারে। সোস্যালিজম-এরও পরাকাষ্ঠা এই বন্ধুত্বে। বিপদে, আনন্দে, ভযে, স্বস্তিতে এই যে কম্‌রেড্‌শিপ্, তার দাম ধন-দৌলত দিযে কখনই শোধা যায না।)

ঠুঠা বাইগা হাটচান্দ্রা শেলাক্ কম্পানীর নাইট্-ওয়াচ্‌ম্যান। কাজটা, পৃথু যখন এই চাকরীতে ঢোকে, ম্যানচেষ্টার থেকে এঞ্জিনীয়ারিং পাস করে ফিরে এসে, তখনই ঠুঠার জন্যে করে দেয়। শামীমের জন্যে একবার মাত্র একটি উপকারই করতে পেরেছিল। কম্পানীর সিলভার-জুবিলীতে, যেসব কর্মচারী প্রথম দিন থেকে কাজ করছেন, তাঁদের প্রত্যেককেইএকটি করে হাতঘড়ি দেওয়ার ডিসিশান্ নিয়েছিলেন ম্যানেজমেণ্ট। তখন শামীম্‌কেই ঐ ঘড়ি-সাপ্লাই-এব অর্ডারটা পাইয়ে দিয়েছিল পৃথু। এইচ-এম্-টি ঘড়ি। কমিশন বাঁধা। মোটে সাত-আটশরমতো কামিয়েছিল শামীম সেবারে।

মহম্মদ সাবীরও, পৃথুর বাবার আমলের শিকার-জগতের আরেকজন লোক। ওঁকে সাহায্য করতে পেরেও খুশী হয়েছিল পৃথু। কম্পানীব দারোয়ান-বেয়ারাদের য়্যুনিফর্ম ও জুতো সাপ্লাই করার পার্মানেণ্ট অর্ডারটা ওঁকেই পাইয়ে দিয়েছিল ম্যানেজারকে বলে।

বাজারের মধ্যে, ছোট মসজিদেরই কাছে শামীমের দোকানের কিছু দূরেই মহম্মদ সাবীব-এর জুতোর দোকান। ক্যাট্ ক্যাটে লাল-রঙা জমির উপব পাকিস্তানী ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের বঙেব গাঢ়-সবুজে লেখা সাইনবোর্ড—মধ্য প্রদেশ ফ্যান্সী স্টোরস্। শু এণ্ড গান-ডীলাব।

দোকানের নামটা কে ঠিক করেছিল পৃথু জানে না। দোকানে আছে জুতো-চপ্পল্। দিশি-বন্দুক। টোপিওয়ালা এবং টোপিছাড়া। ব্ল্যাক গান-পাউডার। কিছু ইণ্ডিয়ান অর্ডন্যান্স্ কম্পানীর ছররা গুলি,

যে-গুলি, গুলখোব হাসেরা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডানা-ঝেড়ে ফেলে দেয় অবলীলায়। এবং শিকারী'কে দোয়া দিয়ে উড়ে যায় হাসাহাসি করতে করতে। এই সামগ্রী-সম্ভাব সাজিয়েই দোকানকে "ফ্যান্সী" বলতে বোধ হয় একমাত্র সাবীর মিঞাই পাবেন।

পৃথুব জীবনে, বক্‌রী ঈদ, মুহববম্, শাবে-বা-রাত, ইত্যাদি উৎসবে এবং কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়াই যত নেমন্তন্ন খেয়েছে, সাবীব মিঞার বাড়িতে, যত ঈত্তর ইস্তেমাল্ করেছে সাবীর মিঞা তার জন্যে এই দীর্ঘ সময়ে, যত ভালোবেসেছে, পুরুষের ভালবাসা, শিকারী-দাদার ভালবাসা, যত বকেছে, রাগ করেছে, অনুযোগ করেছে ; সে সবের কৃতজ্ঞতাব ঋণ মাত্র এক জীবনের সমস্ত পার্থিব সামর্থ্যের বিনিময়েও শোধ করতে পাববে না পৃথু। শুধতে অনেকই জীবন লাগবে।

আব ঠুঠা বাইগাব কথা? ঠুঠার মধ্যে দিয়ে ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত পৃথু আদিম চিরন্তন ভারতবর্ষকে যেন নিত্যনতুন করে আবিষ্কার করে। ঠুঠারমতোআদিবাসীদের সহজাত জঙ্গল-পাহাড়ের গভীর-শিকড়েব সহবৎ, মূল্যবোধ, ভদ্রতা, আতিথেযতা ওকে ছোট্টবেলা থেকেই মুগ্ধ করে এসেছে। দিগাব কাছ থেকেও কম শেখেনি কিছু।

পাঁড়ে ফিরে এল লাল্লু সিংকে নিয়ে পন্নোয়া বস্তী থেকে।

এই অঞ্চলে শামীমরা আজকাল কালে-ভদ্রে আসে, তাই-ই এদিকেব জানোয়ারদেব রাহান্-সাহান্ খাল্-খবিযাৎ-এব খবব রাখেই না বলতে গেলে।

লাল্লু বলল, হাঁলো নদী পেরিয়েই একটা মস্ত বড় ভোঁর ঘাসেব মাঠ আছে। সেটার পরে যে নীলগিরিযা টিলা, সেই টিলাটাব পাশ কেটে আধ মাইলটাক্ গেলেই টিলাটার পশ্চিমে একটা ছোট্ট 'নুনি'। সেখানে সন্ধ্যের পব বাবাশিঙা, চিতল্ আর নীল গাই নুন চাটতে আসে। শুয়োরও আসে।

মুসলমান দোস্ত-এর ছেলেব ছুন্নৎ অনুষ্ঠানে "হারাম" খাইয়ে "হাবাম" কবতে চায় না ঠুঠা। তাই-ই আজ মৃত্যু থেকে শুয়োরদের ছুটি দেওয়া মনস্থ কবল ও। শামীম্‌কে বলল, নবাবজাদা শামীম্, হারামজাদাদের খেয়াল রাখিস। মারাব দরকার নেই।

শামীম্‌কে বলল ঠুঠা, তুই মান্নান মশালচিকে ববং বলে দিস ফিরে গিয়েই। যেন, চিতলেব কাবাবটা একদম বঁড়িযা হয। লাল্লুকেও নেমন্তন্ন করে দে কাল রাতের খানা-পিনাতে। একেবারে চর্বি-নদনদে চেকনাই-ওযালা চিতল মাবব একটা।

শামীম্, হিন্দী সিনেমাব কমেডিয়ানের মতো মুখ করে বলল, তুম আজীব্ আদমী গুরু! শিকার হবে কি হবে না তারই ঠিক নেই, নেমন্তন্ন করতে শুরু কবে দিলে। হামদর্দ-দাবাখানাকি দো-বটি পাচনলভি দিয়ে দাও না অগ্রিম। খানহা ঠিক সে পচ্‌নেকা লিয়ে।

ওরা সকলেই হেসে উঠল। লাল্লুও।

শামীম্ আবার বলল, কি গো দিগাজী? খাওয়া দাওয়ার কি হবে বাতে? শ্রীরামচন্দ্রর কাছে কিছু চাও না। মেহেমানদের জন্যে? তুমি হচ্ছো গিযে রামভগোয়ান্‌কা হট-ফেভারিট। জিগরী-চেলা ভগবানও আজকাল একচোখো। নইলে, নাম্মী ডাকাইত, ঘর-জ্বালানো, সিন্দুক-ভাঙ্গা, খুনী, ছোক্‌রী-উঠোনেওয়ালা দাগী ভি আজ সাধু বনকে বৈঠা হ্যায়।

শামীম বড় বেশী কথা বলে। এই-ই ওব দোষ। অনেকদিন পর পৃথু এল দিগার কুটিরে। বড় শান্তির জাযগা এটা। এখানে ফিসফিস করে কথা বললেও তা হাঁলোর জলে আলোরই মতো প্রতিসরিত হয়ে গিয়ে নদীপাবের গাছ-পাতায়, জঙ্গলের গভীবের ঘাসে-ফুলে প্রজাপতির পাখার মতোইতির্ তির্ করে কাঁপতে থাকে। শব্দর গতিবেগ পৃথু জানে। আলোর গতিবেগও জানে। যদিও এসব কিছুই জানতে ওর ভাল লাগেনি কোনোদিনও।

ভাবে ত' মানুষ একা একাই। সব মানুষই। পৃথু ভাবছিল। শামীম, কী সাবীর মিঞা বা ঠুঠাকে এসব কথা বললে তারা বুঝবে না। হয়ত দিগা পাঁড়ে বুঝবে। তাও পুরোটা নয়। অথচ,তারা কোনো দিক দিয়েই পৃথুর চেয়ে নিকৃষ্ট, বা অগভীর নয়। আসলে, পৃথুর বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে অনেকগুলো কুঠুরী আছে। ওয়াটার-টাইট, এয়ার-টাইট্, সাউণ্ড-প্রুফ, লাইট-প্রুফ। যখন যে রকম মানসিক সমতার মানুষের সঙ্গে ও মেশে, ওঠে বসে, তখন সেই সমতার ঘরটিই শুধু খুলে দেয়।

আলো-পাখা চালিয়ে দিয়ে, দবজা জানালা খুলে বসে সেই মানুষেব নিজস্ব জগতেব গল্প করে তাবপব এক সময সেই ঘব বন্ধ কবে, আলো-নিবিয়ে অন্য ঘরে চলে যায। প্রায সব ঘরেই আগন্তুক আসে যায। আসে—যায না শুধু একটি মাত্র ঘরে তাব হৃদয়েব প্রেমেব ঘরে যদিও সেখানে কৃষাব সালঙ্কাবা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সাডম্বরে। বিয়েব পবপবই ওবা জ্যার্মখন্দিকাব স্টুডিওতে গিয়ে তোলা, বেনাবসী-পবা ফোটোটি বাঁধানো আছে দামী ফ্রেমে ফ্রেমটা দামী। কিন্তু তাতে বাঁধানো প্রেম এখন ফোটোই হয়ে গেছে। শুধুই ফোটো ধুলো মলিন বিবর্ণ। বে-কামকা। সোনা-বাঁপানো ডেঞ্চাব-এব মতো বোজ আলো জ্বালিয়ে ধূপ ধুনোও দেওয়া হয তাব সামনে কিন্তু সেঘবে কৃষা অথবা পৃথু কেউই বাস কবে না। মৃত ঘব। মৃত সম্পক। অসকাব- ওযাইল্ডএব 'পিকচাব অফ ডবিযান গ্রেব মতো পৃথুও একটি নিষ্প্রাণ ছবি হয়েই থাকে সে ঘবে। তফাৎ এইটুকুই যে, সেই ছবিব চেহাবায ডবিযান গ্রেব ছবিবমতোকোনো পবিবতন ধবা পড়ে না। পৃথু নয, শুধু পৃথুব অপবিবর্তনশীল মূর্তিখানিই সেখানে বাস কবে

আব একজনও বাস কবতে পাবত আসতে পাবত বাস না করুক এসে বসতে পাবত অন্তত ন'মাসে-ছ'মাসে সে ঘবে দু'দণ্ড সে কুর্চি। কিন্তু সে আসে নি আসে না। তাই পৃথুব হৃদযেব এই সুন্দব সাজে সাজানো বড দামী ঘবটি দুর্গম বনেব ভিতবেব নির্জন পোড়ো মন্দিবেবই মতো খাঁ-খাঁ কবে। ভাঙা আলসেতে কামনাব কবুতব কাঁদীন স্ববে ডাকে শেষ-সূযেব সান্ত্বনাব আলো আশ্লেষে এসে কিছুক্ষণেব জন্যে ঘবটিকে, স্বামী হাবা বিধবা নাবীব মুখেব সৌন্দর্যব মতো এক ধবনেব বিধুব সৌন্দর্য হঠাৎ ধাব দিয়েই চলে যায। কখনও ক্বচিৎ বাতে, নবম চাঁদেব আলো চাল-ধোওয়া জলেব মতোসাদা, বন-ডাইনীব গাছে পাতায ভেসে ভেসে এসে কানে কানে অস্ফুট ভাষায ফিসফিস কবে বলে, প্রেমকে ডাকো না কেন? শবীবকে আদব দাও না কেন! আদব কবো না কেন অন্য শবীবকে? বলেই মিলিয়ে যায আলো ছাযাব বুটিকাটা মৃদু ঈত্বব গন্ধী বালাপোশ গাযে আধো অন্ধকাবে।



পৃথুব গভীব মগ্নতা ছিঁড়ে দিয়ে লাল্লু হঠাৎই এসে ভযাবহ দুঃসংবাদটা শোনায।

বলে, আজ মান্দলা থেকে টাইগাব প্রজেক্টেব পাবিহাব সাহেব এসেছেন মুক্কিতে সাবধান! ভাবী ঝঞ্ঝাটিযা লোক হচ্ছে এ। শিকাব যে হচ্ছে তা একবাব জানতে পাবলে হবিণেব চামড়াব মতে আমাদেবই চামড়া খুলে নেবে গা থেকে।

লোঃ!

ঠুঠা বলল, তাচ্ছিল্যেব গলায। মুক্কি কি এখানে? এখান থেকে বিলাইত যত দূব মুক্কিও ততই দূব। আজ অবধি চামড়া আমাদেব কত লোকই খুলে নিল! বেশি সাহেব দেখাস না আমাকে লাল্লু!

না। উনি হযত শিকাবেব খবব পেয়ে যাবেন। ওঁদেব ওয্যাবলেস টাওযাব আছে যে। লাল্লু বলল।

তোব মাথা খাবাপ বে লাল্লু। শামীম বলল। কামান থেকে এখানে গোলা বেবোলেও মুক্কিতে তাব শব্দ পৌঁছবে না। মুক্কি কতদূব জানিস? গেছিস তুই কখনও?

দিগা বলল, মানে হল, চাঁদনী রাত, চোরের কখনও ভাল লাগে না।

সকলেই হেসে উঠল দিগাব কথা শুনে।

লাল্লু তার গ্রামের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

বাইরের আগুনেই চাল-ডাল চড়িয়ে দিয়েছে দিগা। কটা ঝিঙে ছিল ঘরে। আলু লাল্লু এনেছিল। সেগুলোও সিদ্ধ দেওয়া হয়েছে। আগুনে ফুট্‌ফাট্‌ শব্দ হচ্ছে। শামীম্ আর ঠুঠা একটু দূরে বসে গাছতলায় মহুয়া খাচ্ছে, শালের দোনা করে। লাল্লুই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল পলিথীনের জেরিক্যানে করে। সেটা সাপ্লাই করেছিল শামীম্। পৃথু মদ খায়, তবে আজ খাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে মদ ও নিশ্চয়ই খায়, কিন্তু ছেলেবেলায় পড়া, রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী'র রবিবারের অভীক-এর একটি কথা ওর কানে গেঁথে গেছে। "আমি কোনো নেশাকে পেতে পারি, কিন্তু কোনো নেশা আমাকে পাবে, সেটি হচ্ছে না।" এই কথাটাতে বিশ্বাস করে ও।

দিগা কথাটথা বিশেষ বলে না। অনেকে থাকলে ত বলেই না। কখনও পৃথু একা এলে, অন্য কথা। মানুষটার অতীত সম্বন্ধে তার নিজের মুখে কখনও কিছুই শোনা যায়নি। অন্যে যাইই বলে না কেন, ও শুনে হাসে।

বছব তিনেক আগে আচ্ছুরাম কাল্‌কাফ (শেলাক্) ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একজন অফিসার এসেছিলেন হাটচান্দ্রাতে। ওঁদেরও ফ্যাক্টরী আছে রাঁচীর কাছে, মুণ্ডা উলগুলানেব বিখ্যাত নায়ক বীরসা মুণ্ডার জন্মস্থানের কাছেই, মূবহুতে। এবং পুরুলিয়াব ঝালদাতেও। জার্মানি কম্পানি। ফেরা আইনে, এখন ভাবতীয়। ওঁদের বাচী, হাজারীবাগ, পালামৌ অঞ্চলে লাক্ষা সংগ্রহের অনেকই সেন্টার আছে। ঐ ভদ্রলোকই একদিন গেস্ট-হাউসে বসে গল্প করছিলেন পৃথুদেব কাছে। আসলে মধ্যপ্রদেশে কেউ এলেই ডাকাতদেব কথা ওঠেই। মোবেনা, গোওয়ালিযব, বেওয়া, ভিন্দ্ ইত্যাদি জায়গায় যানও অনেকে জায়গাগুলো সম্বন্ধে 'ফীল' করতে। ডাকাতেব গল্পে গল্পেই উনি বলেছিলেন যে, প্রায় বছর তিরিশ আগে হাজাবীবাগে দিগা পাডে বলে একজন কুখ্যাত ডাকাত ধবা পডেছিল। সে নাকি হাজারীবাগ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে রীতিমত তাণ্ডব কবে বেড়াচ্ছিল। সেই গল্প থেকেই হয়ত আমাদের দিগা পাঁড়ের অতীত জীবনেব কাহিনী, "ইমমেটিবিয়াল" ম্যানেজাব শর্মাব মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে এবং অন্যান্যদের মুখে নতুন কিশলয়ে ভবে উঠে পুরো হাটচান্দ্রাতেই ছড়িয়ে গেছিল।

পৃথু শামীম্‌কে বলল, তোমরা কি এখানে মহুযা খেতেই এসেছ না কি? ভুচু ত' জীপ নিয়ে এসে একটু পরই হাজির হবে। এই বেলা বেরিয়ে পড়ে তড়িঘড়ি একটা হরিণ মেবে নিয়ে এসো, নইলে রাতারাতি ফিরবে কি কবে হাটচান্দ্রাতে? সকাল হয়ে যাবে যে! তোমাদেব জন্যে বেইজ্জৎ হতে পারব না আমি। অনেকবাব হয়েছি। আব না। বলে দিলাম।

বেইজ্জৎ না হলে ইজ্জৎ আছে কি নেই তা জানাই যায় না। মাঝে মাঝে বেইজ্জতি ভাল। বলতে বলতে শামীম্ আর ঠুঠা উঠে এল। ঠুঠা বলল, তাইই ভাল। তুমি আব লাল্লু বরং শঙ্খচিলের ডিমের কালিয়া বানাও, আমরা ততক্ষণে এক চক্কর পালসা ঘুরে আসি। চল্ শামীম ভাই।

জঙ্গলে পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে শিকার করাকে পাল্‌সা বলে।

শামীম্ ঘর থেকে বন্দুকটা নিয়ে এলো। তার বন্দুকের সঙ্গে ক্ল্যাম্পে লাগানো একটা তিন-ব্যাটারীর বণ্ড-এর টর্চ। ঠুঠার হাতেও কাচ-ফাটা একটি পাঁচ-ব্যাটারীর। ওর বন্দুকটা লুকোনো আছে দিগার কুঁড়েব পূবদিকে, এক ফার্লংমতো দূবে একটি বড় চাঁব গাছের ফোকরে। সেটা মাটি থেকে অনেকই উঁচু। চেনাজানা কেউ বলে না দিলে, কারো সাধ্যিই নেই যে খুঁজে বার করে সেই গুপ্তধন। আজ ও আর নামায়নি বন্দুক।

চললাম তাহলে আমরা।

ওরা বলল।

এই যে শামীম, কান খুলে শুনে যাও। একটাই মারবে কিন্তু। বেশি নয়। সাবধান। পৃথু বলল। মনে থাকে যেন। আমি কিন্তু রেগে যাব।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। একটাই। আমরা কি কসাই নাকি ?

শামীম্ বলল হাত নেড়ে।

কসাই বলেই ত বলা !

ঠুঠার হাতের কাচ-ফাটা টর্চের আলোর বৃত্ত বনের হালকা অন্ধকারে এক্কা দোক্কা খেলারামতো নিঃশব্দে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি্ করতে করতে যাচ্ছিল ওরা। ঠুঠার টর্চের আলো সবে অদৃশ্য হয়েছে ঠিক এমন সময় একসঙ্গে অনেকগুলো ঢোল্-এর ডাক ভেসে এলো হাঁলো নদীর ওপারের অন্ধকারতর গভীর জঙ্গল থেকে কার্তিকেব সান্ধ্য-নিস্তব্ধতা খান্ খান্ করে। ঢোল্, অর্থাৎ এই জংলী কুকুরগুলো যে কত ক্ষিপ্র এবং সাংঘাতিক তা যাঁরা নিজের চোখে না-দেখেছেন, তাঁরা ধারণা পর্যন্ত করতে পারবেন না। ভাগ্যিস এরা মানুষকে আক্রমণ করে না সচরাচর।

দিগা আর পৃথু চমকে চাইল সেই আলোড়িত অন্ধকারের দিকে, পাথরের উপরেই বসে। ওরা লক্ষ্য করল যে, শামীম আর ঠুঠা টর্চ জ্বেলে কিছুটা এদিকে এসে আবার টর্চ নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারেই দৌড়ে ফিরে গিয়ে নদীর কাছাকাছি যেন দুটো বড় শালগাছের আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জংলী কুকুরগুলো নিশ্চয়ই কোনো জানোয়ারকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে এই দিকে। পৃথু রাতেব বেলা এ-অঞ্চলে কখনই ঢোলদের দ্বারা কোনো জানোয়ারকে আক্রান্ত হতে দেখেনি। দিনেব বেলায় অবশ্য দেখেছে তিনবার।

কী জানোয়ার ওটা ? যেটাকে তাড়া কবেছে ঢোলরা ?

দিগা, ফিসফিস করে পৃথুকে শুধোল।

যতক্ষণে, জানোয়ারটা যে কী হতে পারে তা নিয়ে ওদের ভাবাভাবি শেষ হল, ততক্ষণে ঐ পার থেকে ঝড়েরমতোছুটে এসে একটা প্রকাণ্ড বারাশিঙা ঝাঁপিয়ে পড়ল হাঁলোর কালো জলে। ঝাঁপিয়ে পড়েই, ছুটে আসতে লাগল জল ছিটিয়ে যেন আগুনটা লক্ষ্য করেই। আর তার পেছনে একদল ঢোলও জলে নেমে তাড়া করে আসতে লাগল জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ কবে।

বারাশিঙাটা নদীর অগভীব জল পেরিয়ে জলভেজা শরীবে এপারে উঠে, আগুন দেখেই মানুষ আছে বুঝতে পেরে মানুষের আশ্রয়ে এসে নৃশংস মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে টলোমলো পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। দৌড়বারমতো জোর ওর বোধহয় অবশিষ্ট ছিলো না। আর ঠিক তখনই অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটাল শামীম্।

গুডুম্ করে বন্দুক গর্জে উঠল। বারাশিঙাটা গুলিব শব্দেব সঙ্গে সঙ্গে উছ্‌লে উঠল একবাব ; তার শিং-এর বারো ডালপালা হাত তুলে কী যেন বলতে গেল নীরব প্রতিবাদে তারা-ভরা আকাশকে। মনে হলো, রূপকথার পক্ষিরাজেরমতোওঅন্ধকারে উড়েই যাবে বুঝি। ওব সারা শরীরে একটা ঝড়ের কাঁপন খেলে গেল এবং তারপরই কয়েক পা দৌড়ে এসে, মুখ থুবড়ে পড়ল প্রায় আগুনটার সামনেই।

দিগা হতভম্ব ত বটেই, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। অস্ফুটে বলে উঠল, হা রাম !

পৃথুও কম হক্‌চকিয়ে যায়নি ব্যাপারটার অভাবনীয়তায়। এ ত শিকার নয়, পরের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে উচ্ছিষ্ট খাওয়া। কেন যে মারল শামীম্ এটাকে।

শামীম্‌টা ভীষণই রক্তপিপাসু ; ট্রিগার হ্যাপী আছে। বিনা কারণেই ও কাক চিল থেকে শুরু করে বাঁদর হনুমান পর্যন্ত মারে, যদি গুলির টান না থাকে তেমন। বিচ্ছিরি !

ততক্ষণে কুকুরগুলোও ডাকতে ডাকতে নদী পার হয়ে চলে এসেছে। তাদের শবীর থেকে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে। গুলির শব্দ শোনার পরই থমকে গেছে। এখন ওরা আর ডাকছে না।

শামীম্ আর ঠুঠা আলাদা হয়ে গেছে ততক্ষণে। কুকুরগুলোর দুপাশে চলে গিয়ে ওবা ওদের চোখে আলো ফেলে ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভয় দেখিয়ে নদীর ওপারে ফেরৎ পাঠাবার মতলবে। মাংসাশী কুকুরগুলোর চোখ লালচে, ভুতুড়ে দেখাচ্ছে টর্চের আলো পড়ে। শামীম্‌রা প্রায় কাছে চলে গেছেওদের কিন্তু কুকুরগুলো মুখের শিকার ছেড়ে যেতে আদৌ ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে না। বন্দুক,

শুধুই শামীমের হাতে। ঠুঠার হাতে কাঁচ-ফাটা টর্চ। পৃথুর একবার ভয় করল, কুকুরগুলো ঠুঠাকে আক্রমণ করে বসবে না ত ? ভয় হল শামীমের কারণেও। বিনা প্ররোচনায় সে কুকুরগুলোর উপরও গুলি চালিয়েও বসতে পারে। ঢোল্ এখন খুবই কম দেখা যায় পুরো দেশে। যদিও এ অঞ্চলে আছে। ঢোল্ শিকার করাটা গর্হিত অপরাধ।

পৃথু চেঁচিয়ে বলল, অ্যাই। শামীম্। উপরে একটা গুলি করে কুকুরগুলোকে ভয় দেখাও। যাতে ওরা চলে যায়। খবর্দার ! কুকুর যেন একটাও না মরে।

শামীম্ও চেঁচিয়ে বলল, বেফিক্কর্ রহিয়ে আপ্। বলেই,বন্দুক উপরে তুলে গুলি করল একটা।

এবার কুকুরগুলো একপা একপা করে ঘুরে ঘুরে পিছু হঠতে লাগল। কিন্তু পেছিয়ে গিয়েও অদৃশ্য হলো না। হাঁলো নদীও পেরোলো না মোটেই। নদীর এপারেই বসে রইল গুঁড়িসুঁড়ি মেরে সার বেঁধে, আগুপিছু করে, বারাশিঙাটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে, যেন বড়লোকের বাড়ির অন্নপূর্ণা পুজোর প্রসাদ-প্রত্যাশী কাঙালী সব।

পৃথু পাথরটা থেকে নেমে আসতে আসতেই শামীম্ আর ঠুঠাও এসে পৌঁছল ওর কাছে।

পৃথু বলল, ঈ ক্যা কিয়া শামীম্ ? ইয়ে কৌন্সা বড়া শিকারিকা হরকৎ ?

শামীম্ একটুও অপ্রতিভ না হয়েই বলল, ক্যা করে দাদা ? খুদাহনেই ইসিকো ভেজ দিয়েথেঁ সাবীর মিঞাকা মেহমানলোঁগোকে লিয়ে। শিকার, আহি যব্ পৌঁছা খুদাহ্কি দোয়াসে, খুদহি দৌড়্কে, তব্ তামাম্ জঙ্গল্সে রাতভর পাল্সা খেলনেকে জরুরত ক্যা থা ? ঔর খুদাহকি কসম, মেরী তবিয়ৎ ভী আজ ঠিক নেহী লাগতা। সুবেহসে!

ঠুঠাও শামীমকে বকলো। বলল, ইয়ে কওন্সি তারিকা ? বদ্তমিজ কাঁহাকা।

বারাশিঙাটা তখনও মরেনি। গুলিটা বোধহয় বুকেই লেগেছিল। ব্রডসাইড্ শট্।

শট্ গানে শামীম্ অবশ্য চিরদিনই মারে ভাল। রাইফেলেই বরং ঠিক জুৎ কবে উঠতে পারে না।

মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল বারাশিঙাটার।

পৃথু কিন্তু কাছে যেতে পারল না। গুলি খাওয়া জানোয়ারের খুব কাছে যেতে কখনও পারেনি ও। যখন নিজে শিকার করত, তখনও পারত না। পৃথুর বাবা বিরক্ত হয়ে বলতেন : হিপোক্রিট্। গুলি করে জানোয়ার মারতে পারো, আর কাছে যেতে পারো না ? তুই একটা মেয়েমানুষ।

হয়ত তাই। ও হয়ত সত্যিই মেয়েমানুষ। রুষাও সবসময়ই তাইই বলে। পৃথু আজকাল প্রায়ই ভাবে, এবং ভেবে ক্লিষ্ট বোধ করে যে, ওর বাবাব জিন্ আর ওর জিন্-এর মধ্যে অনেকই তফাৎ ছিল। ক্রোমোসোম-এর তফাৎ। বরং মায়ের জিন্-এর সঙ্গেই হয়ত মিল ছিল বেশি। পৃথুর বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন পৃথুকে কখনও বোঝেননি। এটা নিছকই দুর্ভাগ্য। হিউম্যান জেনেটিকস্ নিয়ে কিছু শখের পড়াশুনা করেছে ও একসময়। এবং করেছে বলেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠছে।

ঠুঠা এগিয়ে গিয়েই আঁৎকে উঠে বলল, ঈসস্। একটা চোখ খুবলে নিয়েছে যে কুকুরগুলো। ঈসসস...

পৃথু ভাবছিল, একটা চোখ সেই তারাই খুবলে নিয়েছিল, প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টির ভারসাম্য বজায় রাখার কারণে যে কুকুরদের স্বাভাবিক খাদ্য করে সৃষ্টি করেছিলেন এই বেচারী বারাশিঙাকে। বারাশিঙার খুবলানো চোখের কারণে দুঃখ হল এত ঠুঠার, আর দোস্ত যখন গুলিকরলতার বুকে, তাতে দুঃখ হলো না। কুকুরগুলো একটা চোখই নিয়েছিল ; শামীম্ প্রাণটাই নিল।

শামী্ ততক্ষণে গাছতলায় ফেলে আসা পলিথিনের জেরিক্যানে রাখা মহুয়ার কাছে আবার পৌঁছে গেছে। গিয়েই সোজা জেরিক্যান থেকেই ঢালতে শুরু করেছে মুখে। সেটাকে মাথার উপরে তুলে ধরে।

ঠুঠা চেঁচিয়ে বলল, এই শামীম ! শামীম মিঞা। কি রে ! হালাল করলি না ? সাবীর মিঞাব মেহমানরা খাবে কি করে ? তুইও বা খাবি কি করে ? আজীব্ আদমী।

শামীম্ তা শুনেই জেরিক্যানটা এক ঝট্কায় নামিয়ে রেখেই দৌড়ে ফিরে এল।

ততক্ষণে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারাশিঙাটা চিরন্তন ভোঁর ঘাসের আদিগন্ত লাল মাঠে পৌঁছে গেছে চিরদিনের মতো। যেখানে জংলী কুকুরের দল নেই, বড বাঘ নেই ; চোরের মত আড়াল থেকে প্রাণ নেওয়া বন্দুক হাতে মানুষেরমতোবদ্‌বু, বেশরম জানোয়ারও নেই। সেখানে শুধুই ঘুম ; শুধুই শান্তি।

শামীম্ এসে পৌঁছতেই ঠুঠা বলল, হুঁ ! শেষ হয়ে গেছে। এখন আর হালাল করবি কাকে ? খাবিই বা কি ? যা ! আরও মহুয়া গেল্ গিয়ে। আসল কাজটাই করলি না, ছুন্নৎ-এর নেমন্তন্ন খাওয়াবি !

শামীম্ ধমকে বলল, শেষ হয়নি, শেষ হয়নি, নির্ঘাৎ বেঁচে আছে।

বলেই, কোমরের চামড়ার খাপ থেকে আমেরিকান ডিসপোজালের রেমিংটনের ছুরিটা বের করে মৃত বারাশিঙাটার শিঙটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতের ছুরি দিয়ে গলায় আড়াই-প্যাঁচ লাগিযে দিল।

সহজে কি কাটে ! শীতের দিনের পুরুষ বারাশিঙা। চর্বি, গলকম্বল, তার উপর পুরু চামডাব আর লোমের কম্বল। গলদঘর্ম চেষ্টার পর একটু রক্ত বের করল শামীম। তারপর দু হাতে বক্ত মেখে প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবেরই মতো উঠে দাঁড়াল। মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে।

ঠুঠা বলল, দেখালি বটে। ভড়ং করলি কার কাছে ? খুদাহ্ বুঝি দেখতে পান না ? খেলে ত এমনিতেই খেতে পারতিস্। আমরা ত আর কাউকে বলে দিতাম না !

তাহলে? আর মরা জন্তুটাকে কাটাছেঁড়া করলি কেন ? ফালতু যত তোর দেখানো হালাল্। বেচারি ! বেহেস্তে পৌঁছে যাবার পরও কাটাকাটি।

এই ঠুঠা ! জবান্ সামল্‌কে বাত কর্‌না !

বলেই শামীম্ রক্তমাখা ছুরি হাতে ঘুরে দাঁডাল ঠুঠার দিকে।

ঠুঠা, ওকে একটা খারাপ গাল দিয়ে বলল, পেঁয়াজী মারবি তোব ছোটা মসজিদের মহল্লাতে গিয়ে, বুঝলি। আমার নাম ঠুঠা বাইগা। আমি নামে বাইগা, আসলে গোন্দ। তোদের মোগল নবাব রাজবাহাদুর কাদের রাণীর কাছে যুদ্ধে গু-হারান্ হেরেছিল জানিস ? গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী ! অত আঁখ্ দেখাচ্ছিস্ কাকে ? যা বলেছি, ঠিক বলেছি। যা, গিয়ে নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে আয়। মাথায় জল দিয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা করে আয়। তোরমতোঅনেক ফিল্‌মী-হীরো দেখেছি। বেশি ফাল্‌তু মেজাজ দেখাবি ত এইখানেই মেরে হাঁলোর কালো জলেব নিচে পুঁতে দেব। বাচ্চা, বাচ্চারমতো থাকবি। বুঝলি।

শামীম্ তখনও ফুঁসে দাঁড়িয়েছিল।

পৃথু বলল, শামীম্। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বড। যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো।

জংলী কুকুরগুলো তখনও চুপ করে ঐভাবেই বসেছিল। ঠুঠা একবার আলো ফেলল নদীর দিকে। ওদের লাল লাল ভুতুড়ে চোখগুলো আবারও সার সার জ্বলে উঠল।

ঠুঠা শামীম্‌কে বলল, দাঁড়া ! দাঁড়া ! খালি হাতে একা যাস্ না হীরো। কখন শয়তানের ভব হয় কার উপর তা কেউ বলতে পারে ? বলেই, শামীম্ যেখানে বন্দুকটাকে গাছে হেলান দিয়ে রেখে এসেছিল মহুয়ার জেরিক্যানের পাশে, সেখান থেকে সেটাকে তুলে নিয়ে, শামীমের গুলির বেল্ট থেকে দুটি গুলি খুলে ব্যারেলে ভরে শামীম্‌কে কভার করে কিছুদূর এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

শামীম্ হাতের রক্ত ধুলো, ছুরি ধুলো, তারপর নিজের খাকি শার্ট-এর আস্তিনে ছুরিটা মুছে আবার কোমরের খাপে পুরে ফেলল।

ও ফিরে আসতেই, টর্চ নিবিয়ে ঠুঠাও ফিরে এল।

দিগা একটিও কথা না বলে পাথর থেকে নেমে, বারাশিঙাটার দিকে একটিবারও না তাকিয়ে হল্‌দু কাঠের আগুনটাকে জোর করল খোঁচাখুঁচি করে। করেই, বারাশিঙার দিকে পিছন ফিরে সোজা নিজের কুঁড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

বেচারী !

শুধুই শামীমের [illegible]।

অনেকক্ষণ কেউই কোনো কথা বলল না।

ঠুঠা বলল, মার্‌লি কোন গুলি?

শামীম্ বলল, স্ফেরিক্যাল বল ছিল। মোক্ষম মার হয়েছে। কি বল ঠুঠা?

পৃথু বিরক্ত গলায় বলল, ভুচু জীপ নিয়ে আসবে কখন?

রাত দশটাতে।

ঠুঠা বলল। ছোট্ট করে।

অনেকই সময় আছে। শঙ্খচিলের ডিমের ঝোল না খেয়ে আমি যাচ্ছি না এখান থেকে। শামীম্ বলল।

ওর গলা শুনে মনে হল, হঠাৎ-ওঠা রাগটা পড়ে গেছে। শামীমের এই-ই এক দোষ। ওর রাগটা খুনে। ঠুঠাটাও তেমনি বদ্‌রাগী। কোন্‌দিন যে কী ঘটিয়ে বসবে।

ঠুঠা বলল, মেরে ত দিলি। বেচারী কুকুরগুলোর কথা ভাবলি না একবারও। তাছাড়া, তিনজন মিলে এই পাহাড়ের মতো জানোয়ারকে জীপে ওঠাবিই বা কী করে? বললাম তখন যে, চল্ মাঝারি দেখে একটা চিতল মারি, 'নুনি'তে গিয়ে! মাংসও ভাল হত। তা না, তর সইল না। এইরকম ঘোড়ার মতো মাংসই সাবীর মিঞার মেহমানদের খাওয়াবি ত বললেই পারতিস্, মুঙ্গালালের বেতো ঘোড়াটাকেই হালাল্ করিয়ে দিতাম তোকে দিয়ে। তাহলে এতদূর এসে বেচারী দিগার শান্তি নষ্ট করতে হত না। যত্ত সব…

পরিবেশটা লঘু করবার জন্যে পৃথু বলল, হ্যাঁ! ঘোড়া খাইয়ে সাবীর মিঞা তাহলে একেবারে হাতেমতাইও হয়ে যেতে পারত! কী বল শামীম্?

শামীম্ বলল, তোমরা সকলেই বড় বেশি কথা বল। আমার মহুয়ার নেশাটাই উৎরে দিলে।

বলেই, চলে গেল আবার স্বস্থানে। পেছন পেছন ঠুঠাও। যেন একটু আগেই ঝগড়া হয়নি, যেন দুজনের মধ্যে কখনো খুনোখুনি হতেই পাবে না এরকমভাবে।

যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে শামীম্ হীরোর মত বলল, মহুয়াটা শেষ করে গায়ে জোর করে এসে এটাকে এখুনি ছাল ছাড়িয়ে বাং-কেটে ফিট্ করে নিচ্ছি। নো-প্রবলেম্। ঘাবড়াও মত্ পির্‌থু দাদা।

নিচে ফুট্‌ফাট করে আগুন একা একা কথা কইছে। স্বগতোক্তি। অন্ধকার আকাশে অনেকই তারা। মৃগশিরা, শতভিষা, স্বাতী, রোহিণী, কৃত্তিকা, কালপুরুষ, সব কালের প্রহরীরা। বসার ঘরের অস্পষ্ট ফিস্‌ফিসানির মতো ভেসে আসছে হাঁলো নদীর রাতের পায়ের শব্দ, রাতের বনের হরজাই শব্দর সঙ্গে মিশে। আর নদীর এই পারে, ঘাসের মধ্যে, সার সার বসে আছে নিঃশব্দে, কান-উঁচু করে জংলী কুকুরগুলো। ওদের স্তব্ধ নৈঃশব্দ্যে এখন বোঝার উপায়ই নেই যে, ওরা যখন দৌড়ে শিকার তাড়া করে তখন মনে হয় যে, "লু" বইছে জঙ্গলে। তখন বাঘেরাও জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ওদের চোখগুলো এখনও হলদু কাঠের আগুনের স্বল্প লাল আভাতেও জ্বলছে। ভুতুড়ে লাল, ওরা এদিকে চাইলেই দপ্ করে কাঠকয়লার আগুনের মতো জ্বলে উঠছে, আবার মুখ ঘুরালেই নিবে যাচ্ছে। আলেয়ার মতো। অন্ধকারে জ্বলছে, নিবছে, নিঃশব্দে। কী ভাবছে, কে জানে জংলী ঢোল্‌গুলো। হয়ত ভাবছে, এই দুপেয়ে জানোয়ারগুলো ওদের চেয়েও অনেক বেশি মাংসলোলুপ। ওদের চেয়েও অনেক বেশি জংলী। এদের লোভের কোনো সীমা নেই। ক্ষিদেরও নেই। এই মানুষগুলো নিজেদের খাদ্য ত খায়ই, পরকে উপবাসী রেখে, পরের মুখের গ্রাসও কেড়ে নেয়। ঢোল্‌গুলো সব সহজ-বুদ্ধি শিকারী-জানোয়ার। মানুষদের এই ধাঁধার উত্তর ওরা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

পৃথু ভাবছিল, মানসিকতার একাধিক এলাকাতেই মানুষ বিংশশতাব্দীর শেষেও কাঁচা মাংসখেকো গুহামানবই রয়ে গেছে। জামা কাপড়ে বদলেছে; বহিরঙ্গেই বদলেছে শুধু।

গাছতলায় থেবড়ে-বসা, মহুয়া-খাওয়া ঠুঠা বাইগা আর শামীমের টুকরো-কথা ভেসে আসছে। একটা হায়না হঠাৎ অট্টহাসি হেসে উঠল নদীর ওপার থেকে। যত দ্রুত মহুয়া যাচ্ছে পেটে, ততই অসংলগ্ন, ঢিলে হয়ে উঠছে শামীমদের কথাবার্তা! এদিকে শঙ্খচিলের ডিমের খোঁজে-যাওয়া

লাল্লুরও পাত্তা নেই । কে জানে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা টাইগার প্রজেক্টের লোকেদেব হাতেই পড়ল কী না ! ওদের বস্তীর পথটা এখান থেকে মাইল খানেক গিয়েই ফরেস্ট রোডে মিশেছে । আবাব ঢুকে গেছে একটা সেগুন প্ল্যান্টেশানের মধ্যে । তারপর গভীর শালজঙ্গল পেরিয়ে পুন্নোয়া বস্তী । কে জানে ? কি করছে লাল্লু এতক্ষণ ? শামীমটাকেও বলিহারি ! পৃথু ভাবছিল ।

শঙ্খচিলেব ডিম খাবে !

কতরকমের চরিত্রই না দেখল এই বনে জঙ্গলে ।

পৃথুর মনে পড়ে গেল, একবার ওরা কুমীরের ডিমের ওম্‌লেট্ খেয়েছিল টিকেরিয়া আর মান্দলাব মাঝামাঝি একটি জায়গায়। নর্মদাব চরে । পাখি মারতে গেছিল ওবা । বাবা এবং সাবীর মিঞাও সঙ্গে ছিলেন । আরও দু'চারজন খিদ্‌মদ্‌গার । সে কী আজকের কথা ! কুমীরের ডিমগুলো যখন আবিষ্কৃত হল তখন হৈ চৈ পড়ে গেল । কে যে প্রথম দেখেছিল ঠিক মনে নেই । পৃথুর মনে আছে, বাবার প্রবল আপত্তি ছিল, কিন্তু কুমীবের বংশ নাশ কবার অসাধু উদ্দেশ্য সাবীর মিঞা কথাবার্তা বেশি এগুনোর আগেই ফটাফট্ ডিমগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিল । তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, শুকনো লঙ্কা, আদা ; এবং পোলাউ রাঁধাব জন্যে নিয়ে-আসা কিস্‌মিস ও বাদাম-পেস্তাও ফেলে দিয়েছিলো । ফ্রাই-প্যান ভর্তি হয়ে গেছিল ওমলেট্এ । খেতে যা হয়েছিল ! সে বলার নয় । এখনও মনে করলে গা গোলায় ।

সেই ওমলেট্ খাওযার পর থেকে কুমীব দেখলেই বমি পায় পৃথুব । কিছুতেই সামলাতে পারে না । চিড়িয়াখানাতে মিলি যখন খুবই ছোট্ট, তখন একবার নিয়ে গেছিল ওকে কুমীর দেখাতে । ওকে নিয়ে কাছে যেতেই একেবারে প্রচণ্ড উল্‌টি । কুমীব দেখে ভয় পায়নি মেয়ে মোটেই কিন্তু পৃথুর অবস্থা দেখে ভয়ে কেঁদে মরে প্রায় ।

কুমীরের ডিমের ওমলেট্-এর কথা মনে পড়াতে আরও অনেক কথা মনে পড়ে গেল পৃথুর । বাবা আজ নেই, বাবারই ভাষায় বলতে গেলে, বলতে হয় যে, "হি হ্যাজ গান্ টু দ্যা হ্যাপী হান্টিং গ্রাউণ্ডস্ ।" বাবার চরিত্রের অনেকগুলো দিকই পৃথুর মধ্যে এসেছে । এবং অনেক জিনিস আবার আসেওনি । পৃথু যে পুরোপুরি তার "বাপ্‌কা বেটা" হয়নি, সেটা ভাল কী মন্দ তা অবাস্তব । সব জাতকের বেলাতেই বোধহয় ওরকমই ঘটে । আধুনিক হিউম্যান জেনেটিকস সত্যিই এক দারুণ সাবজেক্ট । ক্রোমোসোমাল ব্যাকগ্রাউণ্ড । জেনেটিক্ ইনফাবেন্স । কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি প্রবলেমস্ অফ মাল্‌টিপল্ লোসি—কত কত সব বিচিত্র ব্যাপার ! পডতে পড়তে ওব মনে হয়, কোনো রহস্য উপন্যাসই পডছে বুঝি !

ও যতই বড় হয়েছে বয়সে, বিশেষত মনের বয়সে, ততই বাবার প্রোটোটাইপ্ না হয়ে, নিজের ওরিজিনালিটিব দিকে, নিজের অভ্যন্তরের অভ্যন্তরে, নতুন প্রান্তরে, ওর নিজস্ব দিগন্তর দিকে সবে এসেছে । এইরকমই বোধহয় হওয়া উচতি । নইলে, ঠাকুর্দার ছেলের প্রোটোটাইপ হতেন বাবা, বাবার প্রোটোটাইপ্ পৃথু । সব পৃথুরাই তাই-ই । প্রোটোটাইপ্ হতে বাহাদুরী লাগে না কোনো ।

পৃথুর অবশ্য কোনোদিনও অন্যেরমতোহতে ইচ্ছাই করেনি । বাবারমতোহওয়ার কথা ত' ছেড়েই দেওয়া গেল, এমন কি, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী আইন্‌স্টাইনেরমতোও হতে বাসনা যায়নি কখনো । চিরদিনই নিজের মতোই হতে চেয়েছিল ও । হয়েওছে । এই-ই আনন্দ ! যদিও একটা আকাট অপদার্থই হয়েছে । তবুও, একেবারে নিজেরই মতো অপদার্থ । অন্য পদার্থ এবং অপদার্থদের তুলনায় ওর ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র । "প্রোটো" শব্দটা একটা গ্রীক্ শব্দ । প্রোটো মানে ওরিজিনাল । "প্রোটো"ই হতে চেয়েছিল ও ছোট্টবেলা থেকেই ; "প্রোটো-টাইপ্" নয় ।

একটু পরই ফিরে এল ঠুঠা আর শামীম্ । গাছতলা থেকে মহুয়া নিঃশেষ করে । মনে হল, বেশ তুরীয় অবস্থা । পা যেন ঠিকঠাক পড়ছে না । বারাশিঙাটার পিঠের উপর চড়ে বসে দুবার নাচানাচি করে নিল শামীম্ । মনে হল, দুজনের মধ্যে ওই-ই বেশি খেয়েছে । ঠুঠা বাইগা অবশ্য মহাদেব । তার কিছুই হয় না । শামীম্ বলল, আঃ ! ক্যা উম্‌দা চিজ্ গুরু । বডা-কাবাব যো বনেগা, সাবীর

মিঞাকা দিল্ খুশ্ হো যায়গা। বেশক্। বলেই, জিভ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল।

ঠুঠা পাথরটার নিচে রেখে-দেওয়া তার ঝুলি থেকে বড় ছুরিটা বের করল কথা না বলে। কাজের সময় ঠুঠা কথা বলে না। কাজের সময় কাজ : খেলার সময় খেলা।

বারাশিঙার বুকের আর মুখের সামনে কার্তিকের শিশির ভেজা ঘাস, রক্তে লাল হয়ে ছিল। নাক গড়িয়ে এসে বার্নট-সীয়েনা-রঙা থক্থকে কালো রক্ত জমে ছিল। বারাশিঙার গদীতে-আসীন শামীম্ নাক উঁচু করে গন্ধ নিল রাতের, রক্তের ; মৃত্যুরও। ওর মুখ খুশিতে ঝল্‌মল্ করে উঠল। হলদু গাছের গন্‌গনে আগুনে, ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, পৃথুর হঠাৎই মনে হল, শামীম রক্ত খুব ভালবাসে বোধহয়, ভালবাসে খুন খারাপিও। খুনখারাপি করতে পাবে না বলেই বোধহয় শিকার নিয়ে এত মেতে থাকে। শিকার বে-আইনী হবার এত বছর পরও। এর পেছনেও বোধহয় ওর ঐ রক্ত-পিপাসাটাই কাজ করে। কে জানে? শামীমের জিন্-এ কাদের রক্ত আছে? পাঠান? মোগল? শক? হুণ? কোন্ চেঙ্গিস খান্-এব বংশধরের? কেন জানে না, পৃথুর প্রায়ই এ-কথা মনে হয় যে, একদিন এই সুন্দর, প্রাণবন্ত, হিন্দী-সিনেমাব ডায়ালগ-বলা, ছল্‌কে-চলা, চল্‌কানো জীবনের রসিক শামীম্ ওর ভিতরের এই রক্তলোলুপ জিন্-এর হাতেই খুন হয়ে যাবে। বেমালুম। বে-হদিস্। কত মানুষই যে রোজ নিজেরই রক্ত ছেনে নিজেকে অলক্ষ্যে খুন করছে বিনা রক্তপাতে, সেইসব নিঃশব্দ খুনের খবর কেইই বা রাখে!

এইবারে রৌরব হয়ে উঠবে পৃথুর চোখের সামনে শুয়ে-থাকা, মানুষী-গৌরব ; এই সুন্দব, কিন্তু নিথর, মৃত, বারাশিঙাটির জবরদস্তিতে বাজেযাপ্ত শবীরটা। রক্ত ছুটবে ফিনকি দিয়ে, পেটের মধ্যে থেকে নানারকম শব্দ উঠবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। পেটটা ছুবি দিয়ে ফাঁসিয়ে দিলেই বায়বীয়, তরল, ভুতুড়ে সব শব্দ ছুটে যাবে অন্ধকাবে দাঁড়িয়ে-থাকা আতঙ্কিত গাছেদের দিকে, অসহনীয় দুর্গন্ধর সঙ্গে। একটু পরই, রক্তে চান করে, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যাবে সোয়েটার, শার্ট ট্রাউজার খোলা, প্রায় উলঙ্গ ঠুঠা অথবা শামীম বাবাশিঙাটার প্রকাণ্ড পেটের মধ্যে। রক্তক্ষরা লাল-মাংস-গুহার মধ্যে ওদেব রক্তাক্ত হাত বারাশিঙাটার যকৃৎ ছিঁড়ে আনবে। তার পিত্তকে পয়সাওয়ালা দাম্ভিক মানুষের ইজ্জৎ-এরই মতো অতি সাবধানে বিযুক্ত করবে দারুণ দক্ষতায়, যাতে মাংস তেতো না হয়ে যায়। কথা যা গোপন, তা যেন ফাঁস না হয়ে যায়।

আরও পরে, একসময় নিথর হরিণটার হৃদয়টাকেও হঠাৎ এক ঝট্‌কায় কব্জি ডুবিয়ে ছিঁড়ে আনবে শামীম্। মস্ত প্রাণীর মস্ত হৃদয়!

মানুষের হৃদয় কখনও দেখেনি পৃথু। মানুষীর ত' নয়ই! আছে কি আদৌ? থাকলেও বোধহয় খুবই ছোট্ট হয়। পিগ্‌মেন্টেশানটা কেমন হয়, তা কে জানে? পুরুষ বারাশিঙাটার হৃদয় দিয়ে উমদা-কলিজা-ফ্রাই হলেও হতে পাবে। এ বড়ই দুঃখময় সত্য যে, মানুষের হৃদয় মানুষের অন্য কোনো কাজে ত' লাগেই না, খাওয়া পর্যন্ত যায় না তা। কোনো দামই নেই সে হৃদয়েব। নারীর হৃদয়ও খাওয়া যায় না। অথচ পাঁঠার, খরগোশের, শজারুর, হরিণ, শম্বর, বারাশিঙার এমনকি গাধার হৃদয়ও খাওযা যায়, কোনো না কোনো কাজে লাগে। কেবল ইন্টেলিজেন্ট মানুষের হৃদয়ই ফেলে দিতে হয়। কী দুঃখেব ব্যাপার!

বোকা-পুরুষরা, নারীর হৃদয় নিয়ে তবুও কবিতা লেখে। চিরদিনই লিখেছে। এবং ভবিষ্যতেও লিখবে। তারা বলে, শামীমেরই মতো :

> "ইয়ে দিল হাম্‌হারা সাম্‌হালকার হাত্‌মে লেনা,
> নজাকৎ ইস্‌মে ইতনী হ্যায়,
> যব নজরসে গীড়া ; টুটা।"

"আমার এই নাজুক হৃদয়, এই পুরুষ-হৃদয় বড় সাবধানে হাতে নিও গো, বড় সাবধানে নিও ; কারণ এ এতই ভঙ্গুর, এতই নাজুক যে, তোমার চোখের একটু আড়াল হলেই, চোখের আদর থেকে বঞ্চিত হলেই, টুকরো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে যাবে।"

ভেঙ্গে যাবে, গুঁড়িয়ে যাবে জেনেও তবু পৃথিবীর সব পুরুষ, নারীর হাতে তার হৃদয় তুলে দেয়

বারে বারে। বনলতা সেনদের তবুও খুঁজে চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী। পুরুষ মানুষ, বারাশিঙা হরিণদের চেয়ে, শম্বরদের চেয়েও বোধহয় বোকা।

হাঁলো নদীর এপারে, অন্ধকারে, ঘাসের মধ্যে বুনো কুকুরগুলো সারে সারে কান উঁচু করে তখনও বসে থাকে অনন্তকালের প্রহরীর মতো। ঐ কুকুরগুলো সময়ের চাকর নয়, সময়ই ওদের চাকর। চোখের ঠারে ঠারে, চোখের চকমকি দিয়ে অন্যর চোখে আলো জ্বালিয়ে, রাতে রাতে আলোর আলেয়া জ্বেলে বসে থাকে ওরা।

পৃথু এবার উঠে দিগার কাছেই যাবে। এই রক্তারক্তি, মাংস নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি চড়চড় ফবফব করে গা থেকে চামড়া ছিঁড়ে ফেলার-শব্দ, এই কালো থকথকে তরল মেটেরমতোরক্ত পৃথু দেখতে পারে না। বুনো কুকুরগুলো কিন্তু মানুষেরমতো মৃত্যুকে এমনভাবে অপদস্থ, অপমানিত করে না কখনও। যে জানোয়ারই তারা শিকার করুক না কেন, পুরো দল একই সঙ্গে তার ঘাড়ে-মাথায়, গায়ে পায়ে পড়ে, তাকে মাংস, রক্ত, লোম-চামড়া সবসুদ্ধু সাবড়ে, সাপ্টে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে চলে যায়। শুধু শিং আর ক্ষুরগুলো পড়ে থাকে অকুস্থলে। বনের গভীরের একটি স্বাভাবিক মৃত্যুর স্বাভাবিক সাক্ষী হয়ে।

প্রকৃতির নিয়ম, পৃথুর মনে হয়, ঠিক যেন রুষার সংসারেরই নিয়মেরমতো। কোথাওই কোনো অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, নোংরা অগোছালোমি এখানে থাকারই কথা নয়। নেইও। সব কিছুই স্পিক অ্যাণ্ড-স্প্যান। সব কিছুই এখানে এক অদৃশ্য সুশৃঙ্খল হাতে পরিচালিত হচ্ছে। নিখুঁত! খাদ্য ও খাদক, মৃত্যু ও জীবন; মেঘ ও রোদ্দুর, খরা ও বন্যা সমস্তই। তবে, এই প্রকৃতির মধ্যেই রিপুতাড়িত প্রাণীদের সংসারে আর সবই আছে, শুধু প্রেম নেই। "আহার, নিদ্রা, ভয় মৈথুনমকা সামান্যামেতাৎ পশুভিঃ নরানাং ধর্মহি তেষাম্ অধিকো বিশেষোঃ ধর্মেনহীনা পশুভিসমানাঃ"।

হিতোপদেশে পড়েছিল।

আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন পশু আর মানুষ দুইয়েরই। কিন্তু মানুষকে বিশেষ করেছে তার সত্য। তার ধর্ম। তার হিতাহিতজ্ঞান। তার সব অনুভূতি, বন্যপ্রাণীদের জন্যে নয়। না গো! সে প্রাণী যত সুন্দরই দেখতে হোক না কেন! ময়ূর কিংবা চিতা কিংবা চক্রবাক! নাঃ কারো জন্যেই নয়। রুষার ছোট্ট নিখুঁত সংসারের সঙ্গে প্রকৃতির এই বিরাট সংসারের এইখানেই মিল। ক্ষিদে আছে, কাম আছে, ঘুম আছে, সৌন্দর্য আছে, শ্লাঘা আছে। শুধু প্রেম নেই।

না, প্রেম নেই। নেই গো!

কুকুরগুলো একটুও নড়ছে না।

স্থির, অনড় বসে আছে বনের অনুষঙ্গরই মতো, ভেজা ঘাসের মধ্যে, তাবাদের আর হলদু গাছের আগুনের আলোয় কান উঁচু করে এই কটি অদ্ভুত প্রাণীকে লক্ষ্য করছে ওরা, ক্ষিদে পেটে নিয়ে, মুখের গ্রাস হারিয়েও; মানুষের কাছে শেখারমতোওদের কিছু আছে কী নেই তাই-ই জানোয়ারসুলভ সারল্যর সঙ্গে বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওদের ভবিষ্যৎ আছে। মনে হয়! কারণ জীবন সম্বন্ধে ওরা এখনও ঔৎসুক্য হারায়নি।

বুনো কুকুরগুলো বসে থাকবে সারা রাত, যতক্ষণ পৃথুরা থাকবে ওখানে। সার সার, বনের অনুষঙ্গর মতো, বনে।

মনেরও অনুষঙ্গরমতো; পৃথুর মনে।



গিরিশদার বাড়ি ঢুকতেই সেদিন ভিরমি খাবার মতো অবস্থা হল পৃথুর। দুটো গড্‌রেজ-এর আলমারীর সাইজের তাকওয়ালা খাঁচা, কাকে ভর্তি।

ইয়েস্! কাক। এই কাকেদেরই একটা, বোধহয় রুষার চামচ নিয়ে এসেছিল। এলেও, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে; হাটচান্দ্রাতে যত কাক ছিল সমস্ত কাককেই প্রায় রাউণ্ডেড-আপ্ করে ফেলেছেন গিরিশদা। কিন্তু কেন? ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

গিরিশদাও ধারে কাছে নেই। অথচ দরজা খোলা হাঁ করে। বাড়িতে মহিলা না থাকলে, দরজা বন্ধ না-করলেও চলে। চুরি-চামারি এদিকে বড় একটা হয় না। ছিঁচকে চুরি ত' নয়ই। হলে, ডাকাতি হয়। জবরদস্ত,মর্দ্ লোকজন মধ্য প্রদেশের এই হাটচান্দ্রার। একটা হাত ঘড়ি, একটা ফাউন্টেন পেন কী সোনার বোতাম চুরি করে নিজেদের পবের চোখে এবং নিজেদের চোখে ত বটেই; আদৌ ছোট করে না এরা।

তবে, ইয়েস, মাঝে মধ্যে কপিক্ষেতে কপি খেতে আসে শুয়োর-টুয়োর। মাঝে মধ্যে। এই ঘটনা এমন কিছু দূষণীয় নয়। নিশ্চয়ই পৃথিবীর সব জায়গাতেই আসে। শুয়োরেরা নিরামিষাশী হলেও, প্রায় ছাগলদেরই মতো সর্বভুক্ হয়। ছাগলরা মানুষী-নোংরা খায় না; শুয়োররা তাও খায়। ছিঃ ছিঃ! একই মুখ দিয়ে ত' খায়! ফুল-কপি বাঁধা-কপি এবং ঐ সব। চিন্তা করা যায় না।

গা গুলিয়ে ওঠে ভাবলেই।

ভুচু একদিন একটা গল্প বলেছিল। ওব এক বন্ধুর বাবার কাছে শোনা। পার্টিশানেব পর এক সকালে নর্থ ক্যালকাটাব গলিব মধ্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। যাকে বলে, প্রেগন্যান্ট উইথ পসিবিলিটিজ! উঠতি-কবিব কবিতাব টেব্‌লেরই মতো। তারপরই দরজা খুলে, সার সার মানুষেরই বাচ্চা, একদম ছোট, একটু ছোট, ছোট, একটু বড; বড় ফুল-গ্রোন অ্যাডাল্টস। এক জোড়া।

অকৃত্রিম কলকাতাবাসী গৃহস্বামী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, আপনাদের ত' চিনতে পারলুম না। মানে ঠিক···

ততক্ষণে, মিত্র কী না তখনও,অচেনা মিশ্র বাহিনী ফান্স-এব তটে ল্যাণ্ড কবে গেছে। সিচুয়েশান ইন ফুল কন্ট্রোল। ঘরেব ভিতরে দ্রুতগতিতে সেঁধিয়ে গেছে একদম ছোট,একটু ছোট, ছোট, বড়, বেশ বড: একটু বড়। সবশুদ্ধ আট জন। সাবীর মিঞারও কমপিটিটব হয়। এবং হ্যাণ্ডিকাপ নিয়েও। আগন্তুকের এক বৌ। সাবীর মিঞার দুই।

সত্যিই বলছি, আপনাদের কাউকেই একেবারেই প্লেস করতে পারলুম না। অনেক চেষ্টা করেও। ভদ্রলোক আবারও বললেন।

এবার অবাক নয়, রীতিমত উদ্বিগ্ন গলায়।

ততক্ষণে মেল অ্যাডাল্ট, ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি অ্যাপোলজেটিকালি বললেন, দেখুন, এই দুর্দিনে ছিন্নমূল লোক, আত্মীয়র কাছে আসবে না ত' কী কবিরাজেব দোকানে শোভা পাবে?

আত্মীয়? আমি?

গৃহস্বামী তুতলে বললেন।

হ্যাঁ। আত্মীয়, ভেবী মাচ সো। আপনি আমাব ফাবস্ট-কাজিন।

ফারস্ট-কাজিন ? আমাদের দেশ ত' জয়নগর-মজিলপুরে। বাখরগঞ্জ সাবডিভিশানে আমার বাবাও কখনও থাকেননি।

আপনার দেশ যেখানেই থাক। আপনার ঠাকুর্দা চাকরীব্যপদেশে জীবনের আধখানা কোথায় কাটিয়েছিলেন সে খেয়াল কি আছে ?

ও। হ্যাঁ। তিনি ছিলেন বাখরগঞ্জো সাবডিভিশানের.... ফরেস্ট রেঞ্জার। কিন্তু তার জন্যে আমি আপনার ফারস্ট-কাজিন ....

ব্যসস্, ব্যসস্। ঐ টুকুতেই হবে ! বাখরগঞ্জো সাবডিভিশান্ কিসের জন্যে ফেমাস্ ছিল তা কি জানেন ? আই মীন, নোটোরিয়াস ?

আঁজ্ঞে না।

বাঘের জন্যে। রিয়্যাল সোঁদরবন মশায়, সুঁদরীগাছে ভর্তি। আপনাদের চব্বিশপরগণার দোখনো বন নয়। নোটোরিয়াস ছিল বাঘের জন্যে।

আঁজ্ঞে ?

হ্যাঁ। বাঘের জন্যে। ফর. দ্যা গ্রেট রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারস্। ফর, দ্যা ম্যান-ইটিং টাইগারস্। বুঝেছেন ?

হ্যাঁ।

তাহলে এবার খোলসা করেই বলি, মাই গ্রাণ্ড-ফাদার এণ্ড ইওর গ্রাণ্ড-ফাদার ওয়্যার ইটন-আপ্ বাই দ্যা সেম ম্যানইটিং টাইগার ! একই পেট থেকে জন্মালে যদি সহোদর হয় দাদাভাই, একই পেটে ভবলীলা সাঙ্গ করলে কেন হবে না তা ? আর আমাদের গ্রাণ্ড ফাদাররা যদি সহোদর হন, তাহলে ব্রাদার আমরা দুজনে কি হলাম ?

গৃহস্বামী স্তম্ভিত।

বলো, বলো পাঁচু, তাহলে কি ?

পাঁচু ! পাঁচু কে ?

ফারস্ট-কাজিন। তুমি । পাঁচু।

আমি ?

অ্যাইই ত ' মাথা খুলেছে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইই যে, সো-ফার আ শুয়োর ইজ কনসার্নড, ফুল-কপি, বাঁধা-কপি এবং মানুষী নোংরা সবাই-ই ফারস্ট-কাজিন। কারণ, এরা সমানভাবে একই প্রাণীর খাদ্য। শুয়োরের পেটেই তাদের সদগতি।

এতক্ষণে গিরিশদার প্রাইভেট-সেক্রেটারী, কাম-এ-ডি-সি মুনেশ্বরকে দেখা গেল। বাজারের দিক থেকে একটা ঝুড়ি কাঁধে করে সে আসছে। তার মধ্যে মাংসর ছাঁট। যেমন ছাঁট কুকুরে খায়। তবে ছোট্ট ছোট্ট করে কাটা, মিশ্র মাছের মুড়ো, কাটাকুটি করা পাঁঠার ও মুরগীর নাড়িভুঁড়ি, লালচে, গোলাপি, ফ্যাকাসে, নানা-রঙা কানকো। ছোটবড় মাছের।

ঝুড়ি নামিয়ে মুনেশ্বর বলল, ম্যায় তো ভাগেগা সাব । আপ্‌কো ফ্যাকটোরিমে কুছ ভি একঠো কাম দিলাইয়ে সাব মেহেরবাণীকরকে। পাগল্‌কা সাথ্ রহ্‌তে রহ্‌তে ম্যায় ভি পাগল্‌হি বন যাউঙ্গা। ইতনাদিন ঘরমে বান্দর থা, লাড়ুয়া হাট সে কেলা লাতে লাতে সাচ্‌মুচ্ থক্ গায়া.আভ্‌ভি দুনিয়াকা তামাম কাউয়া লেকর্ আঁয়ে উনোনে। লান্ ঈ, লান্ ফালানা....ম্যায় চাল্ দুংগা। সাচ্। হাম্‌সে ঔর নহী হোগা।

পৃথু জানত যে, আসলে সবহি হোগা। মুনেশ্বরের সঙ্গে গিরিশদার সম্পর্কটা অনেকটা স্বামী – স্ত্রীর সম্পর্কেরই মতো। এই মেঘ , এই রোদ্দুর। পথের কুকুরের ঝগড়া মেটানো তবু ভাল ; স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া ? নৈব নৈব চ । পরে দুজনের ভাব হয়ে যাবে দুজনের চোখেই খারাপ হয়ে যাবে তখন আরবিট্রেটর। ঐ ভুলে, পৃথু নেই !

এমন সময় গিরিশদার চটির আওয়াজ পাওয়া গেল।

কী ব্যাপার হে পৃথু ? বহুদিন বাঁচবে। এক্ষুনি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম। ফোনটা ত এখনও লাগলই না। শুনছি ত আগামী সপ্তাহে লাগবে। আসলে কবে লাগবে, কে জানে। হাটচান্দ্রা ত দেখি কলকাতা হয়ে গেল। ছিঃ। পড়ে থাকি, এই এক প্রান্তে, ফোন ছাড়া কি চলে ?

কেন। বহুদিন বাঁচব কেন ?

পৃথু বলল।

তোমাকে মনে করছিলাম। শনিবার রাতে একটু গানা-বাজনার ইন্তেজাম করেছি। আমার মেহমান এসেছে কলকাতা থেকে। আলাপ করিয়ে দেব। সাবীর, শামীম্, ভুচু সকলকেই খবর দেওয়া আছে। সাবীররাই তওয়ায়েফ্-এর গানের বন্দোবস্ত করেছে। আর লাড্ডুপ্রসাদও বহুদিন থেকে গান পেশ করতে চাইছে, সে নাকি জব্বর গাইয়ে, তাই ওকেও বলে দিয়েছি। তোমাকে নিজে গিয়েই বলব ভেবেছিলাম।

সাবীরকে ভার দিয়েছি খনার বন্দোবস্তর। রাঁধবে সাবীরের দুই বউ আর ছ মেয়ে মিলে। গরম গরম উমদা বিরিয়ানী আর চাঁব নিয়ে আসবে ভুচু তার জীপ-এ করে। সঙ্গে হাণ্ডি-নিকাল্নাব লোকও আসবে। চলে এসো, তাড়াতাড়ি। মুনেশ্বব একা। আর আমি। একটু হেল্প-এরও দরকার। তা, বৌমাকেও আনবে না কি ?

ও ত' জানেন, এই সব ভীড়-ভাড়াক্কা, মদ-খাওয়া, এতবকম মিক্সড-কোম্পানীতে ঠিক মানাতে পাবে না নিজেকে।

জানি ভায়া। সবই জানি। তবে, ব্যাপারটা কি জানো ত' ? সব জায়গায়ই একজন বিবাহিত মানুষ যদি একা একা যায়, তাহলে মন্দ লোকে দশটা মন্দ কথা বলে। মন্দ লোকেই ত পৃথিবী ভরা। রটায়, লোকটার মতলব খারাপ। ইচ্ছে করেই বোধহয় স্ত্রীকে সঙ্গে আনে না। পরস্ত্রীদের সঙ্গে ফস্টি-নস্টি করবে বলে।

মানে।…।

পৃথু কী যেন বলতে গেল।

জানি। আমি জানি যে, হাটচান্দ্রা ছোট্ট জায়গা। এখানে সকলেই চেনে সকলকে। এখানে, ইটস্ অলরাইট। বৌমা যে অন্যদের মতো নন, সকলের সঙ্গে তিনি যে মিশতে ভালবাসেন না, বা বলব, যে সকলেরই কম্পানী তিনি এনজয় করেন না তা আমরা সকলেই জানি। এখানে; ইটস অল্‌রাইট। কিন্তু মনে করো, তুমি ভোপাল কিংবা ইন্দোর কিংবা জবলপুরে থাকতে যদি ? কোনোদিন থাকতেও ত' পারো! বিনা কারণে, তখন লোকে তোমার নামে পাঁচকথা বলবে।

পৃথু চুপ করে রইল। রিয়্যালিটির ঠেলাতেই চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে আর ইভেনচুয়ালিটি!

কথা ঘুরিয়ে পৃথু বলল, গিরিশদা, আমাদের অ্যান্টি-পল্যুশান্ প্রোগ্রাম্, সেই আন্‌লিমিটেড হাওয়া-ধরা লিমিটেড কোম্পানী কী রেজেষ্ট্রি হবার আগেই লিকুইডেশানে গেল ?

না না। তা নয়। তবে প্রজেকটা শেলভড্ হয়েছে। হাওয়া-ধরা কম্পানীব ব্যাপারটা।

কিন্তু কাক কি হবে গিরিশদা এত ? লোকে যে বলে, কাক, কাকের মাংস খায় না।

গিরিশদা হেসে উঠলেন। বললেন, এটা ভালই বলেছ। কিন্তু ভায়া, এসব কাক খাওয়ার জন্যে নয়।

তবে ? স্ক্যাভেঞ্জার-কোম্পানী ফর্ম করবেন না কি একটা এবারে ? সিটি ক্লীনারস্ এণ্ড স্ক্যাভেঞ্জারস্ প্রাঃ লিঃ। মন্দ হয় না কিন্তু। লক্ষ লক্ষ কাককে ট্রেইন করে নিয়ে বম্বে, কলকাতা, ভোপাল, ব্যাঙ্গালোরে চালালে এ কোম্পানী কিন্তু দারুণই চলবে। কাকের ব্রিগেড করে, কয়েকশ কাককে এক-একটা কম্পানীতে ভাগ করে নিলেই হবে। একটা করে সাদা, মানে অ্যাল্‌বিনো কাক, এক-একটা কম্পানীর কম্যাণ্ডার হবে। খুব সাহেব সাহেব, প্রেস্টিজাস্ ব্যাপার হবে। সাহেব বা চামড়া সাদা না হলে ত আমরা কাউকেই নেতা বলে মানি না। কথা শুনি না। ত কালো কাকদের সাহেব নেতা হলে ব্যাপারটা দারুণ হবে। দেখাবেও দারুণ। ধবধবে সাদা নেভির অফিসারের মতো, এক সাদা কাক, কাকের কম্পানী কম্যাণ্ড করছে। কাকেদেব খাওয়াতে ত কোন খরচ লাগবে না,

তারা ত' নোংরা আর ময়লা খেয়েই বেঁচে থাকবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি বোনাস, ই-এস আই কিছুই লাগবে না। লিকুইডেশানে দিতে হলে এক সকালে খাঁচা খুলে সব কাক উড়িয়ে দিলেই চুকে গেল। শুধু ওদের রাখাব খরচা আর ট্রেনিং-এর খরচা। গ্রস প্রফিটই হয়ে যাবে নেট প্রফিট।

গুড্ আইডিয়া। ভেরী গুড আইডিয়া। আমি আর তুমি বসব একদিন প্রজেক্ট-রিপোর্ট এবং ফিজিবিলিটি রিপোর্ট নিয়ে। এটা আমার মাথায়ই আসেনি। তবে, কাক আপাতত পুষেছি, অন্য কারণে। কাকশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করছি এখন।

কাক শাস্ত্র ?

পৃথু অবাক হল।

সেটা কি গিরিশদা ? 'কোকশাস্ত্র'র নাম ত' শুনেছি। ছবিওয়ালা বইও দেখেছি বিক্রী হতে চওকের ফুটপাথে। পাছে অন্য কেউ দেখে ফেলে, তাই অবশ্য কখনও লজ্জায় কিনতে পারিনি। কিন্তু 'কাকশাস্ত্র'র নাম ত শুনিনি কখনও।

তা শুনবে কেন ভায়া ? ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে আর কতটুকু খোঁজ তোমরা রাখ। রাখলে কি দেশের এই অবস্থা হয় ? চলো, দেখবে।

কাকেদের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন গিরিশদা, পৃথুকে নিয়ে। মুনেশ্বর খাবার দিচ্ছিল। একেবারে প্যাণ্ডেমনিয়ম্ কাণ্ড। চেঁচামেচি, কামড়াকামড়ি, ঠোকরা-ঠোকরি। সভ্য মানুষদের ক্লাবে-টাবে কোনো স্পেশ্যাল ডিনার-টিনার থাকলে যেমন হয়; তেমনই আর কি !

কাকেদের দিকে চেয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন গিরিশদা।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কী শুনলে ? শুনলে কিছু ?

কি শুনব ? সেকি ? কিছুই শুনলে না ? কানের মাথা কি খেয়েছ ?

ও। হ্যাঁ। অনেক কাক ডাকছে একসঙ্গে।

পৃথু বলল। শুনলামই ত।

ঈসস। পৃথু ! তুমি না একটা ! সে ত' হাফ-উইট লোকেও বলবে। তোমারমতোইন্টেলিজেন্ট মানুষের কাছ থেকে এরকম একটা উত্তর আমি আশা করিনি। কতরকম ডাক আছে লক্ষ্য করেছ কি ? কত ভ্যারিয়েশান ? কত বিভিন্ন জুয়ারীতে বলছে ? কেউ উদারায়, কেউ তারায়। কেউ কোমল-গান্ধারে কেউ রেখাবে ?

পৃথু বলল, হতেই পারে না। কাকেদের গলায় কোনোই কোমল পর্দা দেননি ভগবান।

হ্যাঁ। ভগবান ত একমাত্র তোমাকেই কনসাল্ট্ করেছিলেন, সৃষ্টির সময়ে।

রেগে বললেন গিরিশদা।

তারপরই ঠাণ্ডা হয়ে বললেন, কাকেদের প্রত্যেকরকম ডাকের এফেক্টও আমাদের গলার স্বরের এফেক্টেরইমতোআলাদা আলাদা। কোন দিক থেকে ডাকছে, কখন ডাকছে, কেমন করে ডাকছে এ সব জানলে, দেখবে এ এক গভীর রহস্যময় জগৎ। ফ্যান্টাস্টিক, গা-শিউরে উঠবে। কাকশাস্ত্র জানলে, কোকশাস্ত্র জানারই মতো, তুমি শত্রু জয়, মিত্র লাভ, প্রিয়া-সঙ্গ, দুষ্ট-রমণী-বর্জন সবকিছুই অবহেলায় করতে পারবে।

পৃথু থ' মেরে গেল।

দুষ্ট-রমণী বর্জন ! মানে ? উনি কি রুষাকেই মীন্ করছেন ? ভারী মীন লোক ত' ! এমবারাসড মুখে পৃথু দাঁড়িয়ে রইল। ওর নিজের স্ত্রীকে ও যা খুশি বলতে পারে, অন্যে খারাপ বলবে এ ভাবনাও অসহ্য।

শোনো, শোনো, ঐ দ্যাখো, শুনছ ? শুনতে পাচ্ছ ? সাধে কি কাকশাস্ত্র এই শ্লোক দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। "কাকস্য চরিত্র কর্ম্মো যথোক্তং মুনিভাষিতম্। যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ সর্বতত্ত্বং লভেন্নর ঃ ॥" মানে হচ্ছে, মুনিগণ কাকচরিত্র-কথা যেভাবে বলেছেন, সেই তথ্যই পরিবেশন করছি। এই তথ্য জানলে মানবকুলের বিশেষ উপকার হবে। বুঝলে !

ঐ শোনো ! কাককে যদি কল্-কল্ শব্দ করে ডাকতে শোনো ত' বুঝবে জিনিসপত্রর দাম

ঝপঝপ কবে কমে যাবে। তখন শেয়াব মার্কেটে শেযাব কেনার সময়। ফিনান্স মিনিস্টার, প্রণব মুকুজ্জেও বাজেটেব আগে নির্ঘাৎ কাকেব ডাক শুনেছিলেন, নইলে, পার্লামেন্টে এমন জোর গলায় জিনিসপত্রর দাম কমাব কথা বলতেন না কখনই ! আমি শুনেছি, ওঁর বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাঁকড়োতে। সেখানে নাকি মেলাই কাক। হুঁ হুঁ, একেই বলে, কাকস্য পরিবেদনা।

একটু দম নিয়ে আবার গিরিশদা বললেন, শোনো, হেলা-ফেলা নয় ; মনোযোগ দিয়ে শোনো, যদি ক্রৌ-ক্রৌ শব্দ করে কাক ডাকে, তাহলে লাভ হবে। কাক যদি কেঞ্রা করে ডাকে, তবে কোনো মওত হবে। কাবও মৃত্যু। আমজাদ খান অথবা ইন্দিরা গান্ধীরও কিছু হতে পারে। যদি কিঁ কিঁ শব্দ করে ডাকে, তবে এক্কেবে আটার ক্যালামিটি। কিন্তু যদি ক্রোলন্ ক্রোলন্ করে দুলে দুলে ডাকে, তবে মহাসুখ ' আবাব ধরো, যদি কৌন কৌন্ শব্দে ডাকে, তবে পরিবারের কোনো লোকের মৃত্যু আসন্ন। আমার পরিবাব ত কাকেদেরই নিয়ে। ডাকুক, যত খুশি কৌন কৌন্ করে, শালারা নিজেরাই মরবে। আর যদি ক্লীন ক্লীন্ শব্দ করে ডাকে ? তাহলে ?

ভ্যাবাচাকা পৃথু বলে, তাহলে কি ?

তাহলে বুঝবে নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু।

কাকরা কী ইংবিজী জানে ? গিরিশদা ? সেই নিকটাত্মীয় নিশ্চয়ই পয়সাওয়ালা এবং নিঃসন্তান। নইলে "ক্লীন্ ক্লীন্" করে গ্রীণ্ সিগন্যাল দেবে কেন ?

তাহলে হিন্দীও জানে, কঁওন্ কঁওন্ করে ডাকলে, কে মরবে তা জিগগেস করবেই বা কেন তবে হিন্দীতে ? কিন্তু শোনো, বাজে কথা না বলে শোনো আরও আছে। কাক যদি ক্রোড়ন্ ক্রোড়ন্ শব্দ করে ডাকে, তাহলে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগবেই নির্ঘাৎ ! পাকিস্তান এবার পায়ে পা গলিয়ে দিয়ে লাগাবে। আর কাক যদি কুঁই কুঁই শব্দ করে ? তাহলে তোমাব ধননাশ হবে !

ধন থাকলে ত নাশ হবে ! কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি গিরিশদা, দিন কয় হল আমাদের বাড়ির আশে পাশেই একটা কাক ক্রেন্, ক্রেন্, ক্রেন্ করে ডেকে চলেছে।

সত্যি ?

গিরিশদা উত্তেজিত হয়ে পৃথুব পিঠে জব্বর থাপ্পড় মারলেন একটা।

সত্যি ! আরে ভায়া বলো কি তুমি ?

যদি সত্যিই শুনে থাকো, তাহলে কোনো সুন্দরী নারীর সঙ্গে তোমার অচিরেই মিলন হবে। এ কী কথা ভায়া ! বৌমাকে বলব নাকি ?

পৃথু বলল, বাড়িতে রুষা ছাড়া সুন্দরী নারী বলতে ত' এক মেরী। তাকে ত' আপনি দেখেছেন, তাছাড়া…

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তুমি আমাকে এত ছোট আর খারাপ রুচির ভাবলে ? বৎস ! পৃথিবীতে সুন্দরী নারীর অভাব কি ? কাক যখন ক্রেন ক্রেন্ করে ডাকছে, তখন তোমার জন্যে সুন্দরী নারী যোগাড় হয়ে যাবে। যিনি কাক-ডাকান, তিনিই কাকের ডাক সফল করান।

হঠাৎই পৃথুর কুর্চির কথা মনে পড়ে গেল। ওদের পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে এখনও ছেলে মেয়ে হয়নি। কুর্চি আর ভাঁটু দুজনকে দেখেই মনে হয়, ছেলেমেয়ে না-হওয়ার কারণে ওদের বোধহয় খুবই কষ্ট। একদিন জিগগেস করবে গিরিশদাকে, কাকশাস্ত্রে বন্ধ্যা নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচানোর উপায় আছে কী নেই ! কুর্চি কি বন্ধ্যা ? কে জানে ?

পৃথুর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যে বুঝলেন গিরিশদা, তা উনিই জানেন। আরও কিছুক্ষণ তীব্র চোখে পৃথুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভায়া, তোমাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে কোরো না।

পৃথুর বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগল। কী কথা বলবেন, কে জানে ?

বসল, বলুন।

পত্নীকে বশীকৃত করতে, দাম্পত্য সম্পর্ককে সুখী করতে হলে….

বলেই, পৃথুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে চললেন, এটা ভায়া তোমাকে করতেই হবে। না করলে চলবে না : এ ব্যাপারটা খুবই সিম্পল্। তোমার সুপারস্টিশাস্ দাদার এই একটা কথা

শোনো। আমার কাছেই, একেবারে রেডি, মেয়ে-কাক আছে। তোমাকে একটা দান করেই দিচ্ছি এক্ষুনি, শুভ কাজে। ফরচুনেট্‌লি, এ দেশে কাক-দানেব উপর এখনও গিফট্-ট্যাক্স ন...

মেয়ে-কাক ? নিয়ে কি করব ? পুষব ?

পৃথু বোকার মতো বলল।

শোনো, ফরম্যুলাটা হচ্ছে, একটা মেয়ে-কাক ধরে ঐ কাকের পিঠ থেকে কয়েকটা পালক তুলে নিতে হবে। ঐ পালকগুলো কর্পূর আর গোগ্‌গুল মিশিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করতে হবে। সামনেই যেদিন রবিবার পড়বে, সেইদিন সকালে ভালো করে শুদ্ধভাবে চান করে কপালে ঐ গুঁড়োর তিলক পরতে হবে। কপালের ঐ তিলকে চোখ যেই পড়বে স্ত্রীর, অমনি সে স্বামীব প্রেমে গদগদ হবে। প্রেম-খাবো প্রেম-খাবো করবে। দাম্পত্য জীবন তারপর থেকে পরম সুখময় হবে। দে উইল লিভ্ হ্যাপিলী দেয়ার-আফটার !

পৃথু কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, ভাল কথা। আমার দাম্পত্যজীবনে সুখের বন্যা। আপনি ব্যাচেলব মানুষ, দাম্পত্য সুখের ব্যাপারটা আপনার বোঝার নয়।

গিরিশদা একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, অ।

কথা ঘুরিয়ে বলল, সুখময়ের কি খবব ?

তার আবাব খবর ? নতুন বৌ পেয়ে বাবা-মায়ের খবর রাখে আর কে বল ? ঐ কয়েকদিন সব ঢং-ঢাং দেখিয়ে আরও ভাল ভাল প্রেজেন্ট-ট্রেজেন্ট নিয়ে সেই যে কেটে গেল মিঞা-বিবি ; আর চেহাবাই দেখাল না। মানুষেরই মতো বিবেকহীন হযে গেছে বাঁদরেরা ! শেষ দিনে সুখময়েব স্ত্রীকে একটি ইন্টিমেট সেন্টও প্রেজেন্ট করেছিলাম।

সেন্ট ? ইন্টিমেট ?

হ্যাঁ। পারফ্যূম্।

কি কববে ? বাঁদরে, সরী, বাঁদরী !

ওর, বাহুমূলে বড়ই দুর্গন্ধ। আহা ! ওও ত মানুষ ! দুর্গন্ধ, প্রেমকে ত্বরান্বিত ত করেই না, অনেকসময়ে চিরতরে বিতাড়িতও করে।

তবু, সস্তা, ঈত্বর-টিত্বর দিলেই ত'হত ! বাঁদরীকে অত দামী সেন্ট ! ব্যবহারও জানে না।

সুখময়েব বৌ-ও ত' আমার কাছে দামী !

গিরিশদা বললেন।

গিরিশদাব মেহমানরা ফিরে এল। তাবা হাঁটতে বেরিয়েছিল। গলায় মাফ্‌লার, জুতো-মোজা পাযে। গিরিশদাব দুই বন্ধুর দুই ছেলে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে এসেছে। সঙ্গে তাদের দুজন বন্ধু। সকলেই বিজ্ঞানের ছাত্র। কিন্তু ওরা সকলেই চাটার্ড, কস্ট্ এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সী পড়বে। কী সব পরীক্ষা-টরীক্ষা পাশ-টাশও করে এসেছে। পরীক্ষার ধকল সামলানোর পর শরীর মেরামতি করতে আসা আর কী !

আজকাল এসবের দিকেই বেশি ঝোঁক। তাই প্রচুর ভাল ছেলেরা আসছে এসব লাইনে। কোন্ লাইন কখন বেশী অর্থকরী তা বোঝার উপায় হচ্ছে আনন্দবাজারের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের পাতা। কোন্ ধরনের পাত্রর বাজার দর কমছে এবং কোন ধরনের পাত্রের বাজার দর নামছে, তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। গিরিশদার বন্ধু পুত্র এবং তাদের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে পৃথুর ভালই লাগল। তবে, বেশির ভাগ কলকাতার ছেলেদের যা দোষ ; তা আছেই। একটু এঁচড়ে পাকা !

লাড্ডুর গান কেমন হবে শনিবারে কে জানে ? আসলে, লাড্ডুর নাম কুমার সরজুনারাযণ মিশ্র। গিদ্‌ধারিয়াতে ওদের জমিদারি মতো ছিল নাকি অনেকদিন আগে, উমেরিয়ার কাছে। ওর এবং ওর বাবা, রাজা বীরজুনারায়ণেরও নাকি দারুণ শিকারের শখ ছিল। লাড্ডুর বাবা, অর্থাৎ রাজাসাহেবের সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়নি পৃথুর। লাড্ডু যে-কোনো কথা বললেই, ভুচু সঙ্গে সঙ্গে বলে, পার্সেন্ট কিত্‌না ?

অর্থাৎ কত বাদ দেবে খাদ ?

গিরিশদা বললেন, রাজাসাহেব নাকি জমিদারী থেকে এসে পৌঁছেছেন মাত্র পরশু দিন। শনিবারের ম্যায়ফিলে ছেলের গান শুনতেও আসবেন। গিরিশদা গলায় তোয়ালে দিয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন গিয়ে। সরজুপ্রসাদের নাম লাড্ডুপ্রসাদ হয়ে যাওয়ার কারণ, বাজারে তার একটি প্রসিদ্ধ লাড্ডুর দোকান আছে। রাংতা-মোড়া, মুখরোচক, উমদা, লাড্ডু বেচে সে কার্ডবোর্ডের বাহারী রূপোলী-সোনালী বাক্সে। নিন্দুকেরা বলে, আফিং অথবা সিদ্ধি মেশায়। নইলে, খদ্দেররা ওর লাড্ডু এতবার খেয়েও পস্তায় না কেন?

বহু দূর দূর থেকে লোকে লাড্ডুপ্রসাদের দোকানের লাড্ডু কিনে নিয়ে যায়।

ওব নিজের গরু-মোষও আছে অনেকগুলো। তার মধ্যে প্রেস্টিজ অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড় অছে একটা। সে অস্ট্রেলিয়াব, তার নিজের এবং লাড্ডুরও প্রেস্টিজ নিরন্তর এন্‌হানস্ করে যাচ্ছে। প্রতিদিনই! কান্‌হার চার চারটে বাঘিনী একই সঙ্গে হাম্‌লে পড়েও সেই প্রেস্টিজাস ষাঁড়কে কিছু করতে পাববে বলে মনে হয় না। সেই ষাঁড় থেকেও প্রচুর রোজগার লাড্ডুর। দূর দূর থেকে লোক আসে। ষাঁড়েব দুধ হয় না। এমনকি অস্ট্রেলিয়ান ষাঁড়েবও নয়! ষাঁড়টা নাকি পেডিগ্রীড়। বিভিন্ন জায়গাব সুন্দরী, ফর্সা, কালো, লাল মিষ্টি-গন্ধ গরুরা তাদেব নির্লজ্জ মালিকদের সঙ্গে অনেক পথ ধুলোপায়ে হেঁটে এসে লাজুক-লাজুক চোখে অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের আদর খাওয়ার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সাবাদিন, একটা মস্ত বড় পিপুল গাছের তলায়। এবং সেই অস্ট্রেলিয়ান ষণ্ড সিংহবিক্রমে তাদেব আদর কবে যায়। এত্ব আদর, কি করে যে অকাতরে হেলাফেলায় করে; তা সেই-ই জানে। ভেবেও আতঙ্কিত হয় পৃথু। "অশ্বশক্তি" কথাটা বদলে "ষণ্ডশক্তি" করে দেওয়া উচিত অবিলম্বে।

ভুচু বলে, দাদা, এ ব্যাটা অস্ট্রেলিয়ান নেহাৎই লাথি মেরে বুক ফাটিয়ে দিতে পারে, নইলে, একদিন ষাঁড়টাকে নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে ভক্তিভরে একটা প্রণামই করে আসতাম।

ভুচু প্রায়ই বলে লাড্ডুকে, কুমাবসাহাব, চালিয়ে,, দোনো মিল্‌কে এক দফে অস্ট্রেলিয়া।

কাহে লা?

ঘাড়ে-গর্দানে, লম্বা-চওড়া, নব-পাঠ্‌ঠা, হাঠ্‌ঠা-কাট্টা, কোনো জমিদার তনয় লাড্ডু, কুতকুতে চোখ তুলে বলে। ওর শিশুসুলভ মুখটা, ওব শবীরের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। ব্রহ্মা নির্ঘাৎ কোনো মারাত্মক গোলমাল করে ফেলেছিলেন ওকে গড়বার সময়। ক্ষিতি, মরুৎ, অপ্, ব্যোম্ অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির উপাদানে নির্ঘাৎ টান পড়েছিল সেদিন। বুদ্ধিও মনে হয়, শরীরের আয়তনেব অনুপাতে বেশ কম। ঘিলু দেওয়ার সময়ও কিপেটমি করেছিলেন বেজায়।

ভুচুকে বলে, কাহে লা? ভুচু? আবারও। হাসতে হাসতেই।

ভুচু মিচ্‌কে শয়তানের মতো হাসে।

বলে, লাড্ডু বেচ্‌কে হিঁয়া জিন্দগী ভর যো কামায়গা, হুঁইয়ে যাকে ছে মাহিনে মে উস্‌সে জাদাহি কামা লেগা। জাদা হোগা ত কম নহী।

কৈ সে লা? ভুচু?

আবার শুধোয় লাড্ডুপ্রসাদ। সত্যি বোকারইমতো।

কৈ সে? আববে! কুমারসাহাব! লাড্ডুই বেচ্‌কে।

ইণ্ডিয়ান গরুদেব এই হেনস্থা একজন ইণ্ডিয়ান হয়ে আর সহ্য হয় না ভুচুর। তাই-ই ওখানে গিয়ে সার্ভিস এক্সচেঞ্জ করেআসতে চায় ও। বলে, আমার ত' পেডিগ্রী নেই, তুমি রাজার ছেলে কুমারসাহাব, তোমার হবে। গলায় একটা নীল-সাদা মালা পরে নেবে। শোনপুরেব গরু-মোষের মেলা থেকে আমিই না-হয় কিনে এনে দেব। ভাবতের ইজ্জৎ বলে কথা। জমে যাবে। আমাকে ম্যানেজার করেই নিয়ে চল।

লাড্ডু কুত্‌কুত্ করে হাসে।

ভুচু বলে, দুস্‌স্ শালা। লাইন চুক্ত করনেমে বড়হি গড়্‌বড়ি কর, চুকা ম্যায়। অব্ ক্যা হোগা?

দুপুরের এখনও দেরী। গিরিশদা, হোস্ট হিসাবে দারুণ। বন্ধু-পুত্রদের হাতে হাতেও বীয়ার-মাগ

ধরিয়ে দিয়েছেন। পৃথুকে বললেন, দুটি চেরা-কাচালংকা মিশিয়ে বীয়ার খাবে নাকি এক পাত্তর আমার সঙ্গে ?

পৃথু বলল, না। যাব আমি এখন।

গরমের দিন হলেই গিরিশদার এক স্পেশ্যাল ব্যাপার থাকে। গুচ্ছের তেঁতুল গোলা জলে, লেবুপাতা ফেলে, তাতে একটি করে বীচিছাড়ানো কাঁচা-লংকা চিরে বীয়ার মাগ-এ ফেলে দিয়ে তার মধ্যে দু আঙুল ভড্‌কা এবং এক আঙুল জিন্, যেমন করে গাদা-বন্দুকের নলে বারুদ মেপে ফেলা হয়, তেমনিকরেফেলে দেন। তারপর ভাল করে শেক্ করে নিয়ে বরফের ড্রেসিং দিয়ে হাতেহাতে ধরিয়ে দেন। কতলোক যে খুন হয়েছে এই নিঃশব্দ গাদা-বন্দুকে আজ অবধি এখানে,তার হিসাব রাখলে অনেকই জীবন গিরিশদাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটতে অথবা বহুবার ফাঁসীতে লট্‌কাতে হত। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' গিরিশদার হট্ ফেভারিট বই। তবু উনি বলেন, "যাযাবর আমাকে জানতেন না, তাইই। জানলে লিখতেন, ইফ ইটস্ আ ড্রিঙ্ক, কনসাল্ট গিরিশ ঘোষ। নট, আধারকার।"



ভুচুরা ক্রীশ্চান। ভুচুর বাবা জবলপুরের গান-ক্যারেজ ফ্যাকটরীতে সাধারণ কাজ করতেন। যখন উনি মারা যান তখন ভুচুর বয়স সাত। মা আগেই গেছিলেন ; বাবাই ছিলেন পরিবারের একমাত্র সন্তান। তারপর একাই বড় হয়েছে ও। বড় হয়ত, অনেকে একা একাই হয়, কিন্তু ওর বড় হওয়ার ইতিহাস নিয়ে যদি কোনো শক্তিশালী সাহিত্যিক একটি উপন্যাস লিখতেন তাহলে একটা বইয়েরমতোবই হত। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ কম দেখতে পায় বলেই, বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়া পৃথু প্রায় ছেড়েই দিয়েছে আজকাল। শুধু কবিতা পড়ে। আসলে ও নিজেও যে একজন কবি। কবিতার ডিম ফেটে ও বাইরে বেরুতে পারল না এ জীবনে। নাম হলো না, কেউই জানলো না ওর কবিতার কথা। পৃথু জানে যে, ওরাই দলে ভারী। সফল কবিদের সিংহাসন ওরাই যুগে যুগে কাঁধে করে বয়ে বেরিয়েছে।

বড়লোক বাবা-ঠাকুর্দার পয়সায় বসে বসে খাওয়া মানুষের বয়স, শুধু ক্যালেণ্ডারেই বাড়ে ; মনে বাড়ে না। প্রাপ্তবয়স্ক হয় তারা শুধু বয়সেই, প্রাপ্তমনস্ক হয় না কোনোদিনও। ফুটপাথে যে শিশু, জুতো-পালিস করে পাঁচ বছর বয়স থেকে, বৃষ্টি, রোদ, ক্ষিদে, পুলিশ, গুণ্ডা, মাতাল, মাস্তান, জুতো-পরা বাবুদের হৃদয়হীনতা, সমকামী, বয়স্ক, কুৎসিত, দুর্গন্ধ, ভিখিরী ইত্যাদি ইত্যাদি দেখেশুনে জেনে দশবছর বয়সেই, তার মনের বয়স হয়ে যায় বোধহয় একশ বছরই। আর বড়লোকের বসে খাওয়া ছেলের মনের বয়স পাঁচেই আটকে থাকে।

ভুচুকে অনেকদিন থেকেই চেনে পৃথু। যদিও হাটচান্দ্রাতে পাকাপাকি হিসেবে এসে বসেছে মাত্র একবছর। ভুচুকে দেখে, ভুচুকে চোখের সামনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেখে তিল তিল করে, ওর প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছে।

মান্দলার এক মোটর গ্যারাজে দশ বছর বয়স থেকে সে হেল্পার ছিল। জবলপুর থেকে মান্দলার বাসে চড়ে চলে এসেছিল দশ বছরের ছেলেটি ভাগ্য অন্বেষণে। একা একা। আজ মধ্য-তিরিশে

পৌঁছে ভুচু নিজের কারখানার মালিক। একটি জীপ এবং একটি গাড়িরও মালিক। অনেক লোক কাজ করে তার কারখানায়। লেখাপড়াও শিখেছে এরই মধ্যে নিজে নিজে।

মানুষ অধিকাংশই বোধহয় নীচ। অস্বস্তিকর, পরিচয়হীন অতীতকে ভুলে যাবার এমন গভীর প্রবণতা কোনো জানোয়ারের মধ্যেও দেখেনি পৃথু। নিজের পায়ে অনেকেই দাঁড়ায়, অনেকেই সংগ্রাম করে বড়লোক হয়। সেটা কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। যেটা ভাল লাগে পৃথুর চোখে, তা হল এই-ই যে, ভুচু তার দুঃখের দিনগুলো ভুলে যায় নি। যা নিরানব্বুই ভাগ নিজের-পায়ে দাঁড়ানো বড়লোকই সহজে ভোলে। তার কারখানার লোকদের সে যা মাইনে দেয়, তা হাটচান্দ্রার কোনো মোটর মেরামতির কারখানার মালিকই দেয় না। এ কারণে, ভুচুর একবার জীবন সংশয়ও হয়েছিল। এই লাইনের লোকেরা একটু মারদাঙ্গা-বাজী ভালবাসে। তাই, পৃথুর কোম্পানীর উধাম সিং সাহেবের বুদ্ধিতে, ভুচু এখন বাজারের দরেই সকলকে মাইনে দেয় এখন এক নম্বরে। বাকিটা, দু নম্বরে। পৃথিবীতে একমাত্র দেশ বোধহয় ভারতবর্ষই, যেখানে কর্মচারীকে বেশি মাইনে দিতে মালিককে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য একথাও ঠিক যে, এমন মালিকও গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না এ দেশে।

উধাম্ সিং মানুষটা ভুচুকে খুবই স্নেহ করেন। পৃথু ত' করেই। ওদের কম্পানীর সব ট্রাক ও গাড়ি ভুচুর গ্যারাজেই সারানো হয়। উধাম্ সিং-এর সঙ্গে মিশে পৃথু এইটুকুই বলবে যে, মানুষটা খুব পুরুষ-পুরুষ। উধাম সিং-এরও খুব শিকারের শখ ছিল একসময়। এখনও চুরি করে মেরে দেয় মাঝে মধ্যে। শামীম্রা সেদিনের বারাশিঙা থেকে ওকে এবং উধাম সিংকে মাংস দিয়েছিলো কিলো দুয়েক করে। ভুচুর গ্যারাজের ছেলেরা বেশি খায় বলে, দশ কে· জি· দিয়েছিল ভুচুকে। উধাম সিং-এর চোরা শিকারের এক নম্বর সাকরেদ হচ্ছে ঠুঠা। কালচার-ফালচার নিয়ে যে উধাম সিং খুব একটা মাথা ঘামায় এমন নয়। মিসেস সিং খুবই কালচারড। রুষার সঙ্গে ভাব। কিন্তু ওঁরও আল্গা আঁতেলপনা নেই কোনো। আলগা আঁতেল বাঙালীরাই বেশি হয়। খাটনির সময় খাটে উধাম সিং, খাওয়ার সময় তড়কা-রাজমা- ডাল-রুটি, শর্ষুকা শাক, সঙ্গে বিস্তর কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা-লংকা, তন্দুরী মোরগা-মুরগী এবং দই খেতে ভালবাসে। খাওয়ার আগে, দুপুরবেলা হলে, একটু বীয়র-সিয়র, রাত হলে হুস্কি-উস্কি। সোজা লোক, সোজা কথা।

বাঙালীরা যে পুষ্টিকর খাওয়াটুকুও কেন গ্রহণ করল না উত্তর বা মধ্য ভারতীয়দের কাছ থেকে, তা ভেবে অবাক হয় পৃথু। দক্ষিণ ভারতীয়দের টক এবং দই, উত্তর ভারতীয়দের পেঁয়াজ এবং কাঁচা লংকা গ্রহণ করলেও বাঙালীদের চেহারা ও মানসিকতা বোধহয় বদলে যেত। ভুচু বা রুষা বা কুর্চি বা ভাঁটু কেউই আর নিজেদের বাঙালী বলে মনে করে না। পৃথুর বাঙলার সঙ্গে যোগ আছে শুধু বাঙলা সাহিত্য ও সঙ্গীতেরই মাধ্যমে। বাঙালী আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব তার নেই বললেই চলে। কুর্চিরও তাই। ভুচুর তার নিজের মূল প্রদেশ সম্বন্ধে এক অন্ধ ক্রোধ আছে। গভীর এক অভিমান। বাঙালীকে ও নিজে বাঙালী হয়েও দেখতে পারে না। ভাঁটু ও রুষা তো নিজেদের বাঙালী পরিচয় দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করে। গোটা পশ্চিমবঙ্গ, বাঙালী জাত, তার নিজের ছেলেমেয়েদের মনে রাখেনি, তাদের ভালবাসেনি, তাদের অস্বীকার পর্যন্ত করেছে বলে মনে করেন মধ্যপ্রদেশের অনেকই বাঙালী।

ওদের কি ? ওরা ত' বাঙালী নয়। কলকাতার বা পশ্চিমবাংলার বাঙালীরা যখন কখনও ওদের আপন বলে স্বীকারই করেননি। ওরাই বা তাঁদের স্বীকার করতে যাবেন কেন ?

হাটচান্দ্রাতে এস-ডি-পি-ওর বাড়িতে একজন ডি-সি এসেছিলেন বেড়াতে, সপরিবারে। খুবই সুন্দর দম্পতি। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই অতি সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিত। মুখার্জী। পাঞ্জাব ক্যাডারের। বাঙালী যদিও, বাংলা মুখে বলেনও পরিষ্কার, একটুও অ্যাফেক্টেশান নেই ; কিন্তু বাংলা পড়তে পারেন না স্বামী-স্ত্রীর কেউই। তাও ওঁরা ওদের প্রজন্মে বাংলায় কথা বলে গেলেন। ছেলেমেয়েরা বাংলা আদৌ বলতে পারবে না। বললেও ভাঁটুর মতোই বলবে। অন্য বাঙালীর সঙ্গে রেলস্টেশনে, এয়ারপোর্টে, পার্টিতে দেখা হলে বলবে, "আমিও বাঙালীই হচ্ছি।"

'বাঙালীর' উপর প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা পৃথুর আদৌ নেই। ভুচু ত' লেখালেখির মধ্যেই নেই। কিন্তু পৃথুর সঙ্গে ভুচুর দেখা হলেই এইসব নিয়ে আলোচনা হয়। সবচেয়ে মজার কথা এই-ই যে, ভুচু বাংলা হরফে চিঠি লিখতে পর্যন্ত পারে না। যদি কখনও তার চিঠি লেখার দবকার আদৌ হয়, সে হিন্দী হরফে, কিন্তু বাংলা ভাষায় চিঠি লেখে। অথচ এই লোকেরই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্যে এতখানি দরদ। ওব জীবনে মাতৃভাষা শেখার সুযোগটুকুও বেচারি পায়নি বলেই বোধহয় ও এতখানি ভালবাসে মাতৃভাষাকে। ভুচুব বা ভুচুদেব কথা বোঝেন বা ভাবেন, এমন বাঙালী কি বাঙলার নার্ভ-সেণ্টার কলকাতায় একজনও নেই ? ইংরিজী অবশ্য জানে, মোটামুটি।

ওরা সকলেই মধ্যপ্রদেশকে ভালবাসে। মধ্যপ্রদেশেরই বাসিন্দা হয়ে গেছে। ওরা গর্বিত মধ্যপ্রদেশ নিয়ে। ছেড়ে যাবেও না কখনও। কিন্তু···ওদেব কথা বোধহয় বুঝিয়ে বলতে পারে না ওবা ·কে জানে ?

প্রতি রবিবার চার্চে যায় ভুচু। হাটচান্দ্রাতে ইংরেজ সাহেবরা ছিলেন বলে চার্চ আছে একটা। বহুদিনেব পুবনো। ক্লাবও আছে। তখনকার। স্কোয়াশের কোর্ট, এখন ভাঙা-ইঁটের পাঁজা, সাপেব আখড়া।টেনিসেব ফেটে-যাওয়া হার্ড-কোর্ট-এ এখন গরু ছাগল চরে। কম্পানীর সাহেবী নামটা বয়ে গেছে। ফরেন ডিরেক্টরও আছেন। মীটিং অ্যাটেণ্ড করতে আসেন। কিন্তু সেই ঠাটবাট নেই। আসলে, সেই দিনই নেই। দিনকাল সব বদলে গেছে। কাগজ হয়ে গেছে টাকা।

ভুচুব সঙ্গে মাঝে মাঝে চার্চ-এ আসতে বেশ লাগে পৃথুব। পিউ-এব সামনে দাঁড়িয়ে গান গায় সকলে। ও শোনে। এখানেব চার্চে বেশিই আদিবাসীবা আসে। বেভারেণ্ড পিটাব ভূমিহাব ছিলেন। ওব বাবা ক্রীশ্চান হয়ে গেছিলেন। চার্চটা খুব সুন্দব জায়গায়। বায়পুরের দিকে যাবার পথের উপরে। গভীব জঙ্গলের ধাব ঘেঁষে।

আজ সন্ধেবেলা অফারেটবী হীম গাইছিলো ওবা। "লুজ্ ইওবসেল্ফ্ ইন মী"।

"লুজ ইওবসেল্ফ ইন মী এণ্ড উ্য উইল ফাইণ্ড ইওরসেল্ফ, লুজ ইওরসেল্ফ ইন মী এণ্ড উ্য উইল ফাইণ্ড নিউ লাইফ. আনলেস আ গ্রেইন অফ হুইট ফলস ইনটু দ্যা গ্রাউণ্ড. ইট স্টিল বিমেনস্ আ গ্রেইন অফ হুইট. বাট ইফ ইট ফলস এণ্ড ডাইজ, দেন ইট বেযারস্ মাচ ফ্রুট সো ইট ইজ উইথ দোজ. হু লুজ দেমসেলভস ইন মী।"

গীর্জাব মধ্যেব পবিবেশ. পিয়ানোর গমগমে আওয়াজ, সম্মিলিত কণ্ঠেব এমন গান ! গা শিবশির কবে পৃথুব !

অন্ধকাব হয়ে গেছিল। তবে. এখন শুক্লপক্ষ। ওবা পাকা বাস্তায় পৌঁছে গেছিল অনেকক্ষণ। অনেকদূর গেছিল। চার্চ থেকে বেবিয়ে। এখন ফিরে আসছে। জার্কিনের কলারটা তুলে দিল পৃথু। ভুচুব শীত একেবারেই কম। গায়ে একটা পাতলা জিনের শার্ট. জিনের প্যাণ্ট। তার উপরে একটা নীলচে-বঙা পাতলা সোয়েটার। পামেলা বুনে দিয়েছে। পামেলা এই চার্চেই কাজ করে। ওদেব বাড়ি বিহাবেব বাঁচীব কাছে। খুঁটি বলে একটা জায়গায়। মুণ্ডা ওরা। বাংলা বলতে পারে পামেলা। বাঁচী থেকে নেতাবহাট যাবাব পথে মান্দার-এ যে মিশন হাসপাতাল ও চার্চ আছে সেখানে অনেকদিনই ছিল। সেখান থেকে বদলী হয়ে এসেছে এখানে। ওব সঙ্গে ভুচুর একটা মিষ্টি সম্পর্ক আছে। বুঝতে পাবে পৃথু। মেয়েটিব গানের গলা চমৎকার। চার্চ হীম্ গাইবার সময়. ওব গলাই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে কানে আসে। পৃথুর কানটা ভাল। পৃথু জানে।

চাঁদের আলোয় সাদা-বঙা চার্চটাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। পবিত্রতার প্রতিমূর্তিব মতো। এই বকম জায়গাতে এসেই বোধহয় মন কনফেশান্ করতে চায়। ভাবছিল পৃথু। অন্যায়, দোষ. অপকর্ম সব কথা কবুল করতে হয় অকপটেই। তবেই না শুদ্ধি।

পৃথু ভাবে।

ওরা পাশাপাশি হেঁটে চলে। পথেব উপরে তাদের চামড়ার জুতোর শব্দ হয়। পথেব বাঁ পাশে পেঁচাবা ঝগড়া কবে কিঁচি-কিঁচি-কিঁচি-কিঁচর-কিঁচর-কিঁচর···।

এমন এমন মুহূর্তে পৃথুর হঠাৎ মনে হয়. ও এখানে কি করছে ? কি করতে এসেছে ও ? ওর না

কোথায় যাবার ছিল! কোথায়? কোনখানে? অন্য কোনোখানে, যেখানে যাবার জন্যে, পৌঁছবার জন্যে ও জন্মর পর জন্ম ফিরে ফিরে আসছে এই পৃথিবীতে!

ভুচু বলল, নাও পৃথুদা।

চার্মস এগিয়ে দিল। লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিল।

এই একটা কামিনার কাজ পৃথু করে। সেটা নেহাতই পয়সার অভাবে। রুষা সবই নিয়ে নেয় তার হাতে সিগারেট খাওয়ার পয়সা থাকে না। থাকে না বললে, মিথ্যা বলা হয়, কিন্তু সিগারেট ত' একা খাওয়া যায় না। প্যাকেট বের করলেই অন্যকে দিতে হয়। তাই-ই পান ছাড়া অন্য কিছু নিজে কেনে না। মাঝে মধ্যে নস্যি। ফর আ চেঞ্জ। রুষা ও মিলি-টুসুকে লুকিয়ে। কী-ই- বা দাম। চার আনার কিনলে সাত দিন চলে যায়।

একটা গাড়ি আসছিল উল্টো দিক থেকে। হেডলাইট জ্বালিয়ে। ওদের কাছে এসেই হঠাৎ ব্রেক করে দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা।

ভুচু স্বগতোক্তি করল, ব্রেক-অয়েল কম আছে। বুশ গেছে।

হঠাৎ গাড়িটা থেকে কুর্চি মুখ বাড়িয়ে বলল, পৃথুদা।

আঃ! কুর্চির গলার স্বরে চমকে উঠল পৃথু। ভালো লাগায়, ফুলের গন্ধে, চাঁদের আলো ভরে গেল।

কোথায় এসেছিলে? কার সঙ্গে আসছো?

এই যে! এই, নামনা বিমা! মহেন্দ্র।

গাড়ি থেকে ওরা সকলে নামল।

কুর্চি আলাপ করিয়ে দিল। আমার বন্ধু বিমা। আমরা স্কুলে পড়তাম একসঙ্গে। ওর বর মহেন্দ্র। মহেন্দ্র সিং। মালাঞ্জখণ্ড-এ আছে। উইকএণ্ডে এসেছিল আমাদের কাছে। ভাবলাম, আমার বড়লোক দাদার সঙ্গে এবং রুষাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। বেড়ানোও হল। চিহরচিরি ঝিল-এও নিয়ে গেছিলাম ওদের। ওরা, ভাঁটু আর আমাকে বলছে মুক্কিতে গিয়ে থাকতে একটা উইক-এণ্ড। যাবেন আপনি, আমাদের সঙ্গে? পৃথুদা?

পৃথু বলল, তুমি নিয়ে গেলে, নরকেও যাব।

আহা!

কুর্চি, আসলে লজ্জা পায়। একা থাকলে, পৃথুর যে কথায় ও খুশি হয় ওর চোখমুখ খুশিতে ঝলমল করে, সে-কথা সকলের সামনে শুনতে ভাল লাগে না ওর। বিব্রত বোধ করে। ধরা পড়ে যাবে বলে ভয় করে। পৃথুটা বড় ছেলেমানুষ। গোপনীয়তা বজায় রাখতে শেখেনি একটুও।

মহেন্দ্র সিং বলল, হাই!

পৃথু বলল, হ্যালো!

ভুচুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

ভুচু ইংরিজীটা কাজ চালানোরমতোবলতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, ওর আত্মবিশ্বাস আছে। আত্মবিশ্বাসের কোনোই বিকল্প নেই জীবনে। আত্মবিশ্বাস কোনোদিনও বালি বা দলদলির উপরে গড়ে ওঠে না। ভুচুর ইংরিজি উচ্চারণ ভাল।

বিমা বাঙালী। মহেন্দ্র মধ্যপ্রদেশের ছেলে। বিলাসপুরে বাড়ি বলল।

বিমা বলল, কুর্চির কাছে সব সময়ই আপনার কথা শুনতাম পৃথুদা। আপনার গ্রেট অ্যাডমায়রার কিন্তু ও। পাঁচ বছর শুনে শুনে এত শখ ছিল আপনার সঙ্গে আলাপ করার।

ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলে ত!

নট দ্যা লিস্ট। আমাদের ওখানে আসতে হবে কিন্তু। এনিটাইম আসবেন। আগে বলারও দরকার নেই। চমৎকার জায়গা। তবে, টাউনশিপটা একটু ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। গাছগুলো বড় হয়ে গেলে আর লাগবে না।

এক সময় ওখানে নিশ্চয়ই জঙ্গলছিল। গাছগুলো কার বুদ্ধিতে যে কেটে অমন ন্যাড়া করে দিল

কে জানে? গাছগুলো রেখে টাউনশিপটা গড়ে তুললে কী চমৎকার হত বলত!

পৃথু বলল।

ওঃ। গেছেন আপনি।

গেছি!

গাছ আমারও খুব ভাল লাগে। কুর্চিরও লাগে। কুর্চি বলে, ওর জীবনে যা কিছু সুন্দর তার সবই আপনার কাছ থেকে নেওয়া

পৃথু লজ্জিত হল।

কুর্চিও।

মেয়েটা বেশি কথা বলে। তবে ভাল মেয়ে। সবল, প্রাণবন্ত। তাছাড়া, তিনমাস মোটে বিয়ে হয়েছে। এখন কথা ত বলবেই।

পৃথু ভাবল

বলল, ভাটুবাবুকে দেখছি না।

বাঃ! সে ত' মালাঞ্জখণ্ড-এ। মহেন্দ্র আর রিমার বাড়িতেই গিয়ে গেড়ে বসেছে। এখন থেকে ওখানে যাওয়া আসা করে কনট্রাকট টনট্রাকট ধরতে পারলে, তবে না! মালাঞ্জখণ্ড একদিন ত বিরাট ব্যাপার হবে। তাই না?

তা ঠিক।

পৃথু বলল।

ভাটু ফিরবে, রিমারা ফিরে যাওয়ার তিন চারদিন পর। কুর্চি বলল।

তখন? একা থাকবে?

বাঃ রে। দাঈ নেই বুঝি?

ভয় করবে না?

ভয় করলে আপনাকে ডেকে নেব। পাহারা দেবেন আমাকে।

পৃথু ইঙ্গিতটা বুঝল।

কুর্চি আবার বলল, আপাতত নিশ্চিন্ত। রিমারা বুধবার অবধি আছে।

মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অনেকেই বেশি চালাক হয়। পৃথু ভাবল। কুর্চি ত' পৃথুর চেয়ে চালাকই। অনেক অনেক চালাক।

পৃথু বলল, বাড়িতে রুষা ছিল?

জানা দরকার, ভাঁটুর অনুপস্থিতির খবরটা রুষাও জানে কী না!

না। রুষাদি ছিলেন না। আপনার ছেলে ছিল। টুসু বাবু। গান শুনছিল, একা একা স্টিরীওতে।

কি গান?

ইংরিজী গান?

'দ্যা পোলিস!' রিমা বলল।

মহেন্দ্র হাসল।

খেলে তোমরা কিছু?

বাঃ অসময়ে কি খাব? তবে, টুসুবাবু যত্ন-আত্তির ত্রুটি করেনি।

ভেরী ওয়েলম্যানারড।

রিমা বলল।

ওর মায়ের জন্য। ওল দ্যা ক্রেডিট গো'জ টু হিজ মাদার। আমার স্ত্রী রুষার মতো কেপেবেল স্ত্রী এবং মা খুব কমই হয়। নিজের স্ত্রী বলে, বলছি না। তুমি এসে ট্রেনিং নিয়ে যেও। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, পছন্দও হবে তোমাকে।

কি করে বুঝলেন?

ন্যাকা ন্যাকা করে রিমা বলল।

আসলে নিজেব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং ওয়েলইনফর্মড।

জানি।

বলেই কথা কেটে দিল পৃথু, ঘুড়ি কাটাব মতো। হোয়েন সামওয়ান ইজ ফিশিং ফব কমপ্লিমেন্টস তাব মাথায় বাল্টি-ভর্তি গোবব জল ঢেলে দিতে ইচ্ছে কবে পৃথুব। অনেক দেখেছে এসব। টায়ার্ড লাগে।

ভূচু পাশে দাঁড়িয়ে সিগাবেট খাচ্ছিল লম্বা লম্বা টানে। চাঁদেব আলোতেও ওব চোখ দুটো জ্বলজ্বল কবছিল। ভূচু লোকচবিত্র যতটুকু বোঝে, ততখানি পৃথু বোঝে না।

রুষা কোথায়?

পৃথু শুধোল।

রুষাদি আব মিলি ক্লাব-এ গেছে সিনেমা দেখতে।

কি সিনেমা?

বেতাব না, কী যেন।

ভূচু বলল।

তুমি জানলে কি কবে?

বিল আনতে গেছিলাম কোম্পানীব অফিসে। দেখলাম, ক্লাবেব বাবান্দায় পোস্টাব।

তাহলে চলি আমবা। বলে, ওবা গাড়িতে উঠল।

কুর্চি জানালা দিয়ে মুখ বাব কবে আবাব বলল, চললাম পৃথুদা।

চোখে চোখে কথা হল কুর্চি আব পৃথুব।

ভূচু বুঝল।

গাড়িটা চলে গেল। টেইল লাইটেব জোড়া লাল আলোটা ছোট হতে হতে জঙ্গলেব গভীবেব সোজা বাস্তায় অনেক দবে গিয়ে বাঘেব চোখেব মত জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎই নিভে গেল।

বাঘ মুখ ঘুবিয়ে নিল।

পৃথুদা আব কুর্চিব মধ্যে কেচাইন আছে। স্বাভাবিক। রুষা বৌদিব জন্যেই ঘটেছে এটা। কিছু মেয়ে, নিজেদেব সম্বন্ধে বড বেশি ওভাব-কনফিডেন্ট হয়। বিয়ে ব্যাপাবটাকে পলাশ গাছেব মতো মনে কবে। যেন, কোনো যত্ন ছাড়াই ঠিক বেঁচে থাকবে।

ভূচু ভাবছিল।

মনে মনেই ও বলল, কী কববে বেচাবী পৃথুদা। বৌ নয় ত ভাইসান বেঞ্জেব বাঘ। আমি হলে ত কী যে হত, ভগবানই জানেন।

গাড়িতে বসে বিমা ভাবছিল, কুর্চিব সঙ্গে পৃথুব নিশ্চয়ই কোনো বিলেশান আছে? কি বিলেশান? বেড-বিলেশান কি?

সম্বন্ধ কবে, মাত্র তিন মাস হল বিয়ে-হওয়া মেয়েব পক্ষে অবশ্য বেড-বিলেশান ছাড়া অন্য কোনো বিলেশান যে মানুষে মানুষে হতে পাবে, একজন পুরুষ ও নাবীব মধ্যে একথা ভাবা হয়ত অসম্ভবই! আহা! রুষাদিব ফোটো দেখলাম দেওয়ালে। কী সুন্দবী ডিগ্‌নিফায়েড, পার্সোনালিটিসম্পন্ন মহিলা। অমন স্ত্রী থাকতে কুর্চি! পুরুষগুলো খুব আনডিপেণ্ডেবেল। কী যে দেখে, কোন চোখ দিয়ে, তা তাবাই জানে। খুব চোখে চোখে বাখবে ও মহেন্দ্রকে।

হাঁটতে হাঁটতে ভূচু একটা সিগাবেট পৃথুকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও।

হঠাৎই বলল, মহেন্দ্র সিং-এব শিং আব বেশিদিন থাকবে না।

কেন?

চমকে উঠে, পৃথু বলল।

বিমা ওকে সিংহ থেকে কেঁচো বানিয়ে দেবে। এক বছবেব মধ্যেই। দেখো তুমি।

পৃথুর লজ্জা হল। এই ছেলেটা সব বোঝে। মুখে বলে না কিছু। তাহলে পৃথুকে ও কেঁচোই ভাবে। রুষাকে বাইবেব কেউ খারাপ বলুক, তা পৃথু চায় না। ও যা-কিছু বলতে পারে, বা ভাবতে

পারে। রুষা যে ওর বিবাহিতা স্ত্রী। ওর ছেলেমেয়ের মা। রুষাকে যে ও . . . . .

ভুচু ভাবছিল, কথাটা কী হল চোখে-চোখে দুজনের ?

তারপরই দিগা পাঁড়ের একটি তুলসীদাসী শ্লোক মনে পড়ায়, চাঁদের আলোয় ও হেসে উঠল। নিঃশব্দে।

"সমুঝই খগ খগ হী কে ভাষা"।

পাখিই শুধু বোঝে পাখির ভাষা।

পথটা সামনে বাঁক নিয়েছে। বায়ে। ফ্যাকটরীর মাকরী ভেপার ল্যাম্পগুলো দেখা যাচ্ছে ঝাঁক-বাঁধা, স্বর্গের নীল পাখির মতো। শিশিরের গন্ধ উঠছে চার ধার থেকে। বনেব গন্ধ। শীতের বাতের গন্ধ।

এখানে চার ধাবে অনেক পাথর। শিলাময় জায়গাটা। দিনের বেলায় পাথরে বসে রোদ পোয়াতে বেশ লাগে এখানে।

আরও অনেক দূর হাঁটতে হবে। মাঝে মাঝে চলতে বড় কষ্ট হয় পৃথুর। মনে হয়, থামিয়ে দেয় সব হাঁটাহাঁটি। সব যাওয়া-আসা। আর কতদিন চলবে পথ ? এই পথ ? একই জীবনের ধূলিমলিন পথ ?

থেমে যেতে ইচ্ছে হয়। পথের পাশেব পাথর হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। পথের পাশে পড়ে থেকে পথকে, পথিকদের দেখতে ইচ্ছে হয় বড়।

আবার মাথাব মধ্যে শী-ই-ই-ই। কানের মধ্যে গুলি-খাওয়া তিতিরের ঝটাপটি। হালালকবা মোবগের করুণ ঝাঁপাঝাঁপি। মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে যায়। চোখ অন্ধকার। শূন্যতা।

ও হঠাৎ ভুচুর হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলে।

কি হল পৃথুদা ? হল কি তোমার ?

পৃথু ওকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে একটুক্ষণ। কথা বলে না। ও এখন কথা বলতে পারবে না। তিরিশ সেকেণ্ড : এক মিনিট, ঐ রকমই। কিন্তু যখন কথা বলতে পারবে ও, তখনও ভুচুকে কিছু বলবে না। ভুচু যেমন অনেক কিছু বোঝে : যা পৃথু বোঝে না, পৃথুও আবাব অনেক কিছু বোঝে, যা ভুচু বোঝে না। প্রত্যেকটি মানুষই দ্বীপেব মতো। চারিদিকে বিচ্ছিন্নতা, অতলান্ত জল। মানুষেব ভীড়। এই সমাজ, জঙ্গলেবই মতো। দূর থেকে মনে হয়, জড়াজড়ি করে একে অন্যের পর নির্ভর করে এক জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দারুণ ভালোবাসায় একতাবদ্ধ মানুষেরা সব। আসলে, সবাই-ই আলাদা আলাদা। সব গাছ ; সব মানুষ। বাঁচাব জন্যে, নিজের রস নিজেকেই শুষে নিতে হয় মাটি থেকে, অন্য কেউই সাহায্য করে না ; নিজের সব ফুল ফোটাতে হয় নিজেকেই। একা একা। নিজের সুগন্ধও ছড়াতে হয় একাই। যদি, সুগন্ধ বেঁচে থাকে কিছু।

আমরা সকলেই একা। পৃথু ভাবে। মানুষ, গাছ, আকাশের তারারা। আসলে, সমষ্টি একটা ইল্যুশান্। চোখের ভুল।

কার কবিতা যেন ? মনে থাকে না কবিদের নাম ! শুধু কবিতা মনে থাকে। কার ? মনে পড়েছে : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের . . . . .

"পথে যেতে কষ্ট হয়, পথের একপাশে বসে থাকি।
গভীর গাছের নিচে বসে থাকি যেন শুকনো পাতা—
পাতার মতন থাকি, কষ্ট পাই বাতাসের হাতে,
উড়ে যেতে পারি বলে ভয় পাই, পুড়ে যেতে পারি।

পথে যেতে কষ্ট হয়, তাই একপাশে বসে থাকি
পড়ে থাকি ঢিবি কিংবা পুরাতন পাথরের মতো—
. . . . . ."



পারিহার সাহেব সুফকরের বাংলোর বারান্দায় বসেছিলেন একা। এখন রাত। ভাবছিলেন, অনেক কথাই।

কানহা টাইগার প্রজেক্ট-এর কোর-এরীয়ার মধ্যে অনেকগুলোই ফরেস্ট রেঞ্জ আছে। কান্‌হা, কিস্‌লি, মুক্কি, ভাইসেনঘাট এবং সুফকর। কোর-এরীয়ার পাশে পাশে আছে বাফার-জোন। সাতপুরা আর মাইকাল হিলস এবং তাদের গায়ের এবং উপত্যকার গভীর জঙ্গলে মোড়া এই কোর-এরীয়া।

প্রশাসনিক ভাগে ভাগ করলে, এই পুরো অঞ্চল বালাঘাট আর মান্দলা ডিস্ট্রিক্টএ পড়ে। সীওনী পড়ে, বালাঘাটেই। সীওনীর কাছে পেঞ্চ ন্যাশানাল পার্ক আছে। পারিহার সাহেবের ওখানেই বদলী হয়ে চলে যাবাব কথা হচ্ছে।

এই কোর-এরীয়া স্বভাবতই একদিনের বা একজনের চেষ্টাতে গড়ে ওঠেনি। অনেক মানুষের সম্মিলিত শ্রম, শুভ প্রচেষ্টা আছে এর পেছনে। সাতপুরা আর বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যে মাইকাল পাহাড়শ্রেণী মিলন ঘটিয়েছে। আর এই বৃত্তরই মধ্যে বয়ে চলেছে বান্‌জার একপাশে, অন্য পাশে হাঁলো। এই দুই নদীর মধ্যের উপত্যকাতে কান্‌হা ন্যাশনাল পার্ক। পর্বতময় এই জংগলের উচ্চতা সতেরোশ' ফিট থেকে ঊনত্রিশশ' ফিট। বিভিন্ন জায়গায়, উচ্চতা বিভিন্ন। জংগলের গভীরে অনেকই গ্রাম ছিল একসময়, ভারতের সমস্ত জংগলেই যেমন থাকে। কিছু গ্রাম যুগ-যুগান্ত ধরে নিশ্চিহ্ন -হয়ে এসেছে, ঠুঠার গ্রামেবইমতো, নানারকম মহামারীতে। প্লেগ, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া এবং টাইফয়েড ইত্যাদিতে। মহামারী রাইণ্ডারপেস্টএও উজোড় হয়ে গেছে বহুগ্রামের গবাদি পশু। আবার জলেব অভাবেও অনেক গ্রাম পরিত্যক্ত হয়েছে। সে কারণেই এই বনের গভীরে ঘুরে বেড়াতে বেডাতে মাঝে মাঝেই গা-ছমছম করে তাঁর। কোনো শ্মশান ও কবরখানায় গেলে বা পরিত্যক্ত বক-শেলটাব বা গুহায় গেলে যেমন মনে হয়, তেমনই অনুভূতি হয় অনেকটা। টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরীয়াব পত্তন করা হয়েছিল মাত্র উনিশশ চুয়াত্তর সালে কিন্তু এই কানহা পার্ক-এর পত্তন হয়েছিল উনিশশ তেত্রিশে ; ইংরেজ আমলে। এখন বাফার-জোন শুদ্ধ কানহা-টাইগার প্রজেক্ট-এব আয়তন দাঁড়িয়েছে বারোশ মতো বর্গ কি মি। তার মধ্যে কোর-এরীয়াই হচ্ছে ন'শ মতো কি· মি।

পুব দিক দিয়ে বয়ে গেছে ভারী সুন্দরী কালো মেয়েরমতো নদী, হাঁলো। আর পশ্চিমদিক দিয়ে মেমসাহেবের মতো ফর্সা বানজাব। হাঁলো আর বান্‌জার-এর মধ্যবর্তী ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড়ী এলাকাতেই এই এই টাইগার প্রজেক্ট।

পারিহার সাহেব-এর হেড কোয়ার্টার্স মান্দলাতে। মান্দলা, নর্মদার উপরে। বান্‌জার-এর সঙ্গে নর্মদার মিলনও হয়েছে এখানেই। নদী বা নদ যখম কোনো শহরে ঢোকে, তখন তাদের নিরাবরণ নিরাভরণ রূপটি পারিহার সাহেবকে ব্যথা দেয় বড়। কোনো সুন্দরীকেই কখনও সম্পূর্ণ অনাবৃত নিরাভরণ অবস্থায় সুন্দর দেখায় না। আর্টের গোড়ার কথাও বোধহয় তাই-ই। রহস্য, কিছু না থাকলে, সৌন্দর্য জমি পায় না পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার। মান্দলাতে পারিহাব সাহেবের অফিসের পরই, একটু গিয়েই নদী। কজওয়ের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। ধোপারা কাপড় কাচছে, নারী পুরুষ চান কবছে। মান্দলার নর্মদা বা বানজারকে দেখে টিকেরিয়া আর মান্দলার মধ্যবর্তী নর্মদা অথবা মুক্কির কাছের বা কানহার জংগলের গভীবের বানজার-এর সৌন্দর্যের কোনো ধারণাই করা যায় না।

পারিহার   সাহেব কাল রাতে মান্দলা থেকে এসেছেন সুফকর। সুফকর কথাটার মানে হচ্ছে সুন-সান জায়গা। সান্নাটা। অবশ্য তিনদিন আগে বেরিয়েছিলেন। চিরাইডোংরি, ইন্দ্রা হয়ে; কিসলি। তারপর মুক্কি। তারপর সুফকর-এ এসেছেন আওরাই; সোন্ধর হয়ে।

এদিকের কিছু গ্রামকে এবং কোর-এরীয়ার অনেক গ্রামকেই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোর-এরীয়ার নিভৃতি, নিশ্চিন্ত করতে। কিছু গ্রামকে নিযে যাওয়া হয়েছে লামটা রোড-এর দিকে। আদিবাসীরা খুশি হয়নি। কেই-ই বা আর খুশি হয়! কিন্তু ভারত একটি স্বরাট, বিরাট একীভূত রাষ্ট্র। এখানে দশের স্বার্থর জন্যে একের স্বার্থ মাঝে মাঝে বিসর্জন দিতে হবেই, নইলে দেশের ভাল হওয়া সম্ভব নয়। অন্য অনেক সমস্যাও আছেই। এবং আছে চোরা-শিকার, চোরা-কাঠ চালানের সমস্যা। আদিবাসী এলাকাতে এবং জংগল-পাহাড় ঘেরা জায়গাতে শিকার চিরদিনই ছিল। ছিল কিছু গরীব লোকের পুরুষালি, সাহসিক আনন্দ হয়ে। এদের প্রোটিনের একমাত্র উৎসও ছিল শিকার-করা মাংস। কিছু অবস্থাপন্ন শহুরে মানুষের কাছেও এ ছিল দারুণ এক স্পোর্ট। অনেকদিন পর্যন্ত একইরকম সবই চলে আসছিল। শিকার ত মানুষের আদিমতম সময় থেকেই চলে আসছে আমাদের দেশের ভীমবৈঠকার, মোদীব, গোয়ালিয়বের, রাইসনের, খাড়োওয়াইর, নরসিংগড়ের, কুটলীবাতারারের, স্পেনেব আলটামিরাতে এবং পৃথিবীব আবও বহু জায়গায় মানুষ তার প্রস্তবাশ্রয় এবং গুহাতেই প্রথমে শিকারের ছবি এঁকেই আর্টের গোড়াপত্তন করেছিল। শিকার, আদিবাসী এবং ভাবতীয পাহাড়-জংগলের মানুষদেব জীবন থেকে রাতারাতি ছিনিয়ে নেওযা, খুবই কঠিন কাজ।

সুখেব কথা, শিক্ষিতদের মধ্যে; পশুপাখি কমে যাওয়ায় স্বভাবতই সংবক্ষণের দিকে মন গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আদিবাসীরা ছাড়াও, যাদের ধর্ম অথবা সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে; যাদেব মধ্যে বংশপরম্পরায আইন ভাঙার ও দুঃসাহসী কাজ করার একটা জন্মগত প্রবণতা প্রায়শই দেখা যায; তারাও বয়ে গেছে।

আরও রয়ে গেছে এক ধরনেব মানুষ, যাবা মারতেই ভালবাসে, জানোয়ারেব রক্ত মাংসের উপর যাদের নারী-মাংসেব থেকেও বেশি লোভ; এই তীব্র আদিম প্রবণতার মূল্য হিসাবে নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত যারা দিতে রাজি।

এটা দুঃখজনক, মনে হয়, পারিহার   সাহেবের। যতই এ নিয়ে ভাবেন উনি, ততই বুঝতে পারেন যে শুধুমাত্র বনবিভাগেব সমস্যাই নয় এ। এই সমস্যা, সমাজের, পরিবেশের এবং অর্থনীতিরও গভীর সমস্যা। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সমস্যা সত্যিই আজকের ভারতের মস্ত বড সমস্যা হযে দেখা দিয়েছে। আর্থিকলাভেব জন্যেও কিছু লোক শিকার করে। আফ্রিকাতে ত' বড বড চক্রই গড়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীব্যাপী তাদের জাল ছড়ানো। গণ্ডারের খড়গ, হাতিব দাঁত, জেব্রার চামড়া, কুডুর চামড়া ইত্যাদির চোরাচালানের জন্যে বড বড় বিজনেস টাইকুনরা আড়াল থেকে মদত দিচ্ছে এদের। কোটি কোটি টাকা খাটছে এইসব ব্যবসাতে। শিক্ষাহীনতা, দেশাত্মবোধের অভাব, ধর্মসম্বন্ধীয় এবং সংস্কারগত বিশ্বাস যে সব দেশে যত বেশি; সেই সব দেশে এই সমস্ত সমস্যার গভীরতাও তত বেশি।

পারিহার   সাহেব খবব পেয়েছিলেন যে, কে বা কারা একটি বিরাট বারাশিঙা মেরেছে বন্দুক দিয়ে চাঁলোর পাশে। মাংস কেটে নিয়ে গেছে। ঘটনাটা ঘটেছে একজন সাধুর কুঁড়েব সামনে। সেই সাধুর ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্বন্ধেও নানাবকম কথা কানে এসেছে তাঁর। পাওয়াব সাহেব অনেক কষ্ট কবে ওঁর অ ; বারাশিঙা বাড়িয়ে গেছিলেন। বারাশিঙা কানহার এক বিশেষ আকর্ষণ। শম্বরেব চেয়েও বোকা মনে হয় পারিহার   সাহেবের; এই জানোয়াবদেব। এই পোচিং-এর ব্যাপাবটা তাঁকে খুবই আপসেট করেছে। তিনি নিজে ক'দিন এই অঞ্চলে থেকে এ ব্যাপারেব তদন্ত শেষ কবে যেতে চান। ভোপাল থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ফরেস্ট সেক্রেটারী নিজে খুঁটিনাটি সব জানতে চেয়েছেন। এসেমব্লীতে কোশ্চেনও উঠেছিল। ঘনঘন ফোন আসছে মান্দলাতে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে। ব্যাপারটা খুবই একটা সীরিযাস টার্ন নিয়েছে। ভোপালে বসে, এত বড এলাকার পার্ককে সামলানোর অসুবিধার কথা উপরমহলের খুব কম মানুষই বোঝেন।

মনে হয়, হাটচান্দ্রার কিছু লোক এর পেছনে আছে। বালাঘাট এবং মান্দলার এস· পি-দের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। ওঁরা সব ডি·এস·পি এবং এস· ডি· পিওদের, সার্কল ইনসপেকটরদের খবর দিয়েছেন। হাটচান্দ্রার পোলিস স্টেশান থেকেও একটা রিপোর্ট চাইবেন তিনি, এস· পিকে বলে।

পারিহার সাহেব, সমস্ত সরকারী কর্মচারীদেরই মতো, নিশ্চয়ই রিটায়ার করবেন। একদিন না একদিন সব চাকুরেকেই রিটায়ার করতে হয়। বাগচী সাহেব, পাওয়ার সাহেব, ইত্যাদি সকলেই করবেন। কিন্তু জে· জে· দত্ত সাহেবের মতো পূর্বসূরীরা, যে দৃষ্টান্ত মধ্যপ্রদেশের ফরেস্ট সার্ভিসে রেখে গেছেন, তারই অনুসরণ করতে চান তিনি। যাতে, রিটায়ার করার অনেক অনেক বছর পরে, কানহার কোর-এরীয়াতে আবারও এসে কোনোদিন মনে করতে পারেন যে, তাঁর সরকারী কাজের মধ্যে দিয়ে একটা বড কোনো, সুন্দর কোনো আদর্শকে রূপায়িত করতে বিবেকবান হয়ে সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

মানুষ ত' রেখে যায় না অন্য কিছুই! টাকা পয়সা, সম্পত্তি বাড়ি গাড়ি এ সবের কোনো কিছুই থাকে না। এসব রেখে যাওয়ার পেছনে কোনো গভীর বা মহৎ বোধও কাজ করে না। বড়লোকে টাকা রাখলে তার ছেলেমেয়েরা উড়িয়ে দেয় অচিরে, ঘেয়ো-কুকুরের মতো অর্থ-সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে, যদি তারা মানুষই না হয়। আর তারা যদি মানুষ হয়ই, তাহলে টাকা-পয়সার প্রকৃত তাৎপর্য তারা নিশ্চয়ই বোঝে। সুনামের চেয়ে, যোগ্যতাতে অর্জিত যশ-এর চেয়ে, জীবনের উদ্দেশ্যের চেয়েও টাকা যে বড নয়, প্রায়-অবিশ্বাস্য এই কথাটাতেও কিছু মানুষ আজও বিশ্বাসও করেন।

এই কানহা-কিসলি, এই মুক্কি, সুফকব, ভাইসেনঘাটকে বড়ই ভালোবেসে ফেলেছেন পারিহার সাহেব। ট্রানসফার হয়ে বা প্রোমোশনে অন্যত্র গেলেও এখানে বারে বারেই ফিরে আসবেন।

কানহা রেঞ্জ-এই নানা জানোয়ারের কনসেনট্রেশান হয়েছে। এখন চিতলই হয়ে গেছে প্রায় বারো-তেরো হাজার, শম্বর প্রায় সাতশ-সাড়ে সাতশ। গাউর বা ইণ্ডিয়ান বাইসন দেড়শর মতো। বারাশিঙা চারশ পঁচিশ-টচিশ হবে। জংলী শুয়োর হবে এখন পৌনে দু হাজার। কথায়ই বলে, শুয়োরের মত বংশবৃদ্ধি! এই সব জানোয়ার ছাড়া, কানহা কোর-এরীয়া ও বাফার-জোন্‌এ আছে আরও অনেকই জানোয়ার। কুটরা, কৃষ্ণসার, চৌশিঙা, নীলগাই, ভাল্লুক, বনবেড়াল, বাঁদর, শেয়াল, শজারু, এবং বেজী। বাঘ ও চিতা ত' আছেই।

মাউস-ডিয়ার প্রায় দেখাই যায় না এখানে। কথা হচ্ছে, ওড়িষ্যা থেকে এনে এখানে কীরকম বাড়ে, তা দেখা হবে। ওড়িষ্যাতেও মাউস-ডিয়ার মেরে শেষ করে দিয়েছে প্রায়। ওড়িষ্যাতে মাউস ডিয়ারকে বলে, গুরাণ্টি। সব জায়গাতেই এই একই সমস্যা।

হায়েনা এই অঞ্চলে, কেন জানা নেই, প্রায় দেখাই যায় না। শজারুদের সঙ্গে দেখা হয় শুধু রাতেরই বেলা। পাইথন দেখা যায় না বটে, কিন্তু পথের ধুলোয় তাদের চলার দাগ প্রায়ই দেখা যায়। পাখির মধ্যে ময়ূর, বনমোরগ, ধনেশ ও আরও অসংখ্য পাখি আছে। খরগোশও প্রচুর আছে।

কানহার গর্ব হচ্ছে তার বাঘ আর চিতা। বান্ধবগড়েরই মতো। কোর-এরীয়া এবং বাফার জোন মিলিয়ে এখন বড় বাঘ প্রায় নব্বুই মতো হবে। বেশিও হতে পারে। চিতাও হবে ষাট-টাট।

ট্যুওরিজম-এর বাগচী সাহেবের অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই মান-অভিমান হয় টাইগার প্রজেক্টের পারিহার সাহেবের এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য অফিসারদের। ট্যুওরিজম-এর বড় সাহেব, স্বাভাবিক কারণেই চান, ট্যুওরিস্টরা অনেক বেশি সংখ্যায় এসে, কানহার বাঘ এবং অন্যান্য জানোয়ার দেখুন। তাদের থাকার মতো, খাওয়া-দাওয়ার মতো, তাদের দেখানোর মতো, অনেক বেশি জায়গার ও সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত হোক। এখন যা আছে, তাও কম নয়। তবে, আরোও বেশি থাকলে, অনেকই বেশি লোক আসতে পারতেন।

তাতে টাইগার প্রজেক্ট-এর কোনোই আপত্তি নেই। কিন্তু প্রজেক্টের কাজ ত' এখনও শেষ

হয়নি। বেশি ট্যুওরিস্ট এক্ষুনি এলে, এবং কোর-এরীয়ার মধ্যে অনেকগুলি বড়-বড় ট্যুওরিস্ট লজ হলে বাঘের বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটবে। ফরেস্ট ও প্রজেক্ট টাইগারের লোকেদের তাই-ই ধারণা। কানহার মধ্যে যে মূল লজটি ছিল সেটি এই কারণেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। জানোয়ারদের অসুবিধে হত খুবই। এখন শুধু কিসলি এবং মুক্কিতেই আছে লজ।

বাগচী সাহেবের ট্যুওরিজম ডিপার্টমেন্ট-এর ইন্টারেস্ট বজায় রাখার স্বপক্ষেও কিছু জোরালো যুক্তি, কলকাতার এক ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক, সেদিন এসেছিলেন মুক্কিতে। ভদ্রলোকের নাম মনে নেই। পদবী মনে আছে, খুব সম্ভব সেন। উনি মুক্কি লজ-এই উঠেছিলেন। এককালে শিকার করতেন। ভারতবর্ষের অনেক জংগল ত' বটেই, আফ্রিকার জংগলেও গেছেন। অনেকক্ষণ, নানাবিষয়েই সেদিন কথা হল ওঁর সঙ্গে। মুক্কিতে সেদিন বাগচী সাহেব এবং পারিহার সাহেবও ছিলেন। সেই বাঙালী ভদ্রলোক, মিঃ সেন, অবশ্য কানহার খুবই সুখ্যাতি করলেন। বললেন যে উত্তরপ্রদেশের করবেট পার্ক, এবং রাজস্থানেব র‍্যান্‌থাম্‌বোর ছাড়া মধ্যপ্রদেশেরই কানহা আব বান্ধবগড়েই একমাত্র নিশ্চিত বাঘ দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে বাঘ দেখার সুযোগের কথা বিবেচনা করলে বলতে হয়, বিহারের পালামৌ, পশ্চিমবঙ্গব সুন্দরবন ও ওড়িশার সিমলিপাল আদৌ ভাল নয়। পালামৌ, রোম্যান্টিক ; সুন্দববন ভয়াবহ ; সিমলিপাল-এরমতো ভাল পার্ক পৃথিবীতে কমই আছে , কিন্তু আজকালকার ট্যুওবিস্টরা কম সময়ে এসে যদি বনের বাঘকে বনের পরিবেশে নাই-ই দেখতে পেল, তবে লাভ কি ? উনি বলছিলেন যে, তান্‌জানীয়া এবং কেনীয়াতে গেম-পার্ক-এব মধ্যে মধ্যেই দারুণ দারুণ সব থ্রী-স্টার হোটেল হয়েছে। দু-একটি ফাইভ স্টারও আছে। বেফ্রিজারেটেড ভ্যানে করে পৃথিবীর সেরা সব খাদ্য-পানীয় সববরাহ হচ্ছে, জেনারেটরে আলো, পাম্প, এয়ার কণ্ডিশনার, হিটার, গীজার সব কিছু চলছে। কোটি কোটি টাকা রোজগার। ফরেন এক্সচেঞ্জে।

এখানেও হবে। পারিহার সাহেব বলেছিলেন হেসে, বাগচী সাহেবকে। এখানেও হবে। আমাদের শুধু আরও দশটা বছর সময় দিন বাগচী সাহেব। জন্তু-জানোয়ারের পপুলেশান বাড়ুক। ট্যুওবিজম ডিপার্টমেন্টের দুঃখ আমরা ঘুচিয়ে দেব।

কলকাতার ভদ্রলোক কিন্তু একটা দামী কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, ন্যাশনাল পার্ক-এ এবং কোব-এরীয়াতে সব ট্যুওরিস্টকে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। কিছু ট্যুওরিস্ট সব দেশেই থাকে, যারা পাগলা-গারদে গিয়ে পাগল হওযা মানুষ-মানুষী বা কোব-এরীয়াতে ঢুকে ইনসট্যান্ট-বাঘ দেখতে চান। এই দ্রুতগতি, তরলমতি মানুষদেরও বনে ঢোকার কোনোই অধিকার নেই। তাদের বনে ঢুকতে দেওয়া উচিতও নয়। সময় না দিলে বন, মন খোলে না ; কারো কাছেই।

যাবা বীয়র খেতে, আর তাস খেলতে আব ট্রানজিস্টার শুনতে অথবা ভাড়া-করা মেয়ে নিয়ে ফুর্তি কবতে বেবিযে পড়েন, তাদের জায়গা আর যেখানেই হোক, জংগলে নয়। ডিসক্রিমিনেট করতে হবে। যাঁদের নিজেদের নানাবিধ কথা উচ্চস্বরে বলার প্রবণতার চেয়ে, জংগলের কী বলাব আছে তা শোনার প্রবণতা বেশি, জংগল যাদের সত্যিই টানে, কী করে একটি দিনের জন্ম হয় এবং তার মৃত্যু, তা নীববে দেখার এবং অনুভব করার মতো সময় ও মন যাঁদের আছে, তাঁদেরই শুধু জংগলের গভীরে আসতে দেওয়া উচিত। শুধু তাঁরাই বাঘ দেখতে পাবেন।

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে পাগলামি ছিল কিছুটা ; কিন্তু কথাগুলি একেবারে ফেলেও দেবার নয়।

চৌকিদাব এসে বলল, খনা লগা দিয়া সাব।

পারিহার সাহেব হুইস্কী খাচ্ছিলেন। এই সুফকরের বাংলোটা চমৎকার। খড়ের চালের বাংলো। চওড়া, মস্ত বারান্দা। একেবারে সুন-সান্নাটা। আউট-অফ-দ্যা ওয়ার্লড প্লেস একেবারে ! বাইরে কুটরা ডাকছে একটা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে। ভয় পেয়ে। বাধহয়, বাঘ কী চিতা দেখে থাকবে।

চৌকিদারকে বললেন। পাঁচ মিনট বাদ।

বলে, আর একটা হুইস্কী ঢাললেন। একা বসে, চুপ করে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে বলতে হুইস্কী খাওয়ার আনন্দ একমাত্র জংগলে যাঁরা এসেছেন, থেকেছেন, তাঁরাই জানেন। আনন্দ মাত্রই,

নারীরই মতো! তাকে সময় দিতে হয়, ইম্পর্ট্যান্স দিতে হয় ; তবেই তাকে পুরোপুরি পাওয়া যায়।

বাইরে অঘ্রাণের অন্ধকার রাত। অম্বর ঈত্বরের মতো একটা ভারী গন্ধ ঝুলে আছে স্নিগ্ধ সুফকরের সবুজ সুগন্ধি অন্ধকারে। ভারী ভাল লাগছিল।

জিম করবেটকে ইংরেজ সরকার, "ফ্রীডম অফ দ্যা ফরেস্ট" উপাধি দিয়েছিলেন। শিকারি বলে নয়, জংগল-প্রেমিক বলে। এই উপাধির অর্থ হলো, জংগলের যে-কোনো জায়গায় যেতে তাঁর কারোই অনুমতির দরকার ছিল না। জংগলের যে-কোনো বাংলোতেই তিনি থাকতে চাইলে অন্য সকলের আগে তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত। উইদাউট রিজার্ভেশান। এবং তাঁর কাছ থেকে খুব সম্ভবত থাকার জন্যে কোনো পয়সাও নেওয়া হত না। স্থানীয় বনবিভাগের সমস্ত কর্মচারীরা তাঁকে সবরকম সহযোগিতাও নিশ্চয়ই দিতেন।

পারিহার সাহেবের হাতে ক্ষমতা থাকলে, অন্তত মধ্যপ্রদেশের সমস্ত জংগলের জন্যে "ফ্রীডম অফ দ্যা ফরেস্ট" উপাধি দিতেন কলকাতার সেই পাগলাটে মানুষটির মতো দু একজন মানুষকে।

আরেকটা হুইস্কী ঢাললেন পারিহার সাহেব। এবার আর কিছু ভাববেনও না। হুইস্কীর নেশাটা, এই রাতের গায়ের গন্ধর সঙ্গে মিশে গিয়ে আস্তে, আস্তে, আস্তে, তাঁকে এক গভীরতর নেশার কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বনের নেশা যাকে একবার পেয়েছে, হুইস্কীর নেশা তার কাছে নেশাই নয়!



বিকেল বিকেলই গিয়ে পৌঁছল পৃথু।

রুষাকে বলে, অজাইব সিংকে সঙ্গে নিয়ে গেছিল। ওকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে। ফেরার সময় ভুচুই নামিয়ে দেবে। অথবা নিজেই গিরিশদার ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়িটা চালিয়ে চলে আসতে পারে। শামীমের মোটর সাইকেলেও আসতে পারে। ফেরাটা কোনো প্রবলেম নয়।

পৃথু গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই শামীম এল তার মোটর সাইকেল ফটফটিয়ে। তার আজকের পোশাকই আলাদা! চুড়িদার পাজামা, লক্ষ্ণৌ-এর কাজ-করা কুর্তা, মাথায় বকরী ঈদের নামাজে যেমন সাদা টুপি পরে, তেমন টুপি। গা দিয়ে ভুরভুর করে ফিরদৌস ঈত্বর-এর গন্ধ বেরুচ্ছে। পৃথু ফিরদৌস আর রুহ খসস মাখে গরমের দিনে। ফিরদৌস শীতে কম লোকই মাখে। শামীম অন্যদের চেয়ে আলাদা বলেই মেখেছে। পৃথু শামামা অথবা অম্বর ঈত্বরই মাখে শীতে। শীতে অনেকে হিনা অথবা গুলাবও মাখেন। বড় তীব্র লাগে ঐ দুই আতরের গন্ধ পৃথুর নাকে।

ওরা সকলেই হাত লাগাল। বসার ঘরের সব ফার্নিচার সরিয়ে বিরাট কার্পেট পাতা হয়েছে। তার উপরে সাদা চাদর পেতে ফরাস বিছানো হয়েছে। ফুলও এসেছে বহুত কিসিমের। গোলাপজলের স্প্রে ঠিক করে রেখেছে মুনেশ্বর।

ইতিমধ্যে ভুচুও এসে গেল, বন্দোবস্ত কেমন হল না হল, তা দেখে যাওয়ার জন্যে। ওই গাড়ি নিয়ে যাবে সাবীর মিঞার বাড়ি। সেখান থেকে তওয়ায়েফওয়ালী সারেঙ্গীওয়ালা এবং তবলচিদের তুলে আনবে। কুমার সরজু নারায়ণ মিশ্র ওরফে লাড্ডু, তার বাবা রাজা বীরজু নারায়ণ মিশ্রর সঙ্গে আসবে। রাজার একটি ঢাউস ওল্ডসমবিল গাড়ি আছে। সে গাড়িটি এখানেই থাকে, লাড্ডুর

কাছে। শুধু সেরিমনিয়াল অকেশানেই ব্যবহার করে লাড্ডু। অন্য সময়ে সে তার এক ঘোড়ার এক্কা চালিয়ে যাওয়া-আসা করে। রহিস আদমী বলে খ্যাতি আছে হাটচান্দ্রাতে লাড্ডুর। সেই ওল্ডসমবিল গাড়ির উপর হামলে পড়ে চারজন হাট্টা-কাট্টা লোক ভোরবেলা থেকে ম্যানসন পালিশের বড় বড ডাব্বা নিয়ে পালিশ করছে। রূপোলি রঙের গাড়ি। পাঁচ লিটারে, ইদানীং পাঁচ মাইল যায়। ভুচু বলছিল। বুকের পাঁজরই জ্বলে, পেট্রলেব বদলে। তবু, রাজা-রাজড়ার ব্যাপার ত'। রাজত্ব চলে গেছে, রাজসিক ব্যাপার-স্যাপার, রহিসি, কিছু এখনও রয়ে গেছে। তবে, ওদের এমনি রোজগারও কম নয়। ডেয়ারী এবং মিঠাই-এর দোকান রৈ রৈ করে চলে।

গিরিশদার কাকবাহিনী সমস্বরে এমন ডাকাডাকি শুরু কবেছে যে, পৃথুর খুবই দুশ্চিন্তা হল। গানেব মধ্যে যদি ক্রোলন ক্রোলন বা ক্রেন ক্রেন করে তারা ডাকাডাকি শুরু করে দেয় তাহলেই চিত্তির!

শামীম বলল, শালাদের খাঁচাগুলো বাইরে বের করে দিয়ে আসব নাকি?

গিরিশদা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, পাগল। ওদের ঠাণ্ডা লাগবে। তাছাড়া ওদের নিয়ে তোমাদের কোনোই সমস্যা হবে না। ওবা রাতের বেলা ডাকবে না। সান-ডাউনেব পব কাকের ডাক শেষ; হুইস্কী খাওয়া শুরু হয়। এই-ই নিয়ম!

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। শীতের সন্ধ্যা অমন ঝুপ করেই আসে। সাবীব মিঞা এবং তওয়ায়েফরা আসার আগে গিরিশদা পৃথুদেব সকলকেই এক পাত্তর করে চড়িয়ে দিলেন। খাটা-খাটনিব আগে শরীর মেরামতি আর কী! আজ হুইস্কী নয়। লবঙ্গর সঙ্গে চিনি দিয়ে তাওয়াতে কড়া করে ভেজে, মহুয়ার বোতলের মধ্যে ফেলে তারপর সেই মহুয়া ছেঁকে নিয়েছেন। বস্তুটির চেহাবাটি হয়েছে অনেকটা রাম-এর মতো।খেতে, জ্যামাইকান বিকার্ডি রাম আর অ্যান্টিকুয়ারি হুইস্কী মেশালে যেমন বিচিত্তির স্বাদ হতে পারে, তেমন। এক চুমুকেই মাথা সাফ। আর দিল খুশ।

গিরিশদা বললেন, রাজা সাহেব আফিং খান। তাঁর জন্যে সে বন্দোবস্তও বাখা হয়েছে। এবং দুধ। রাবড়ি। আফিং যে কেন খায় লোকে!

কেন? অনেকেই ত' খায়। শামীম বলল।

তা খায়। কিন্তু তোমরা সেই ইন্দোরেব পরদেশিপুরার আফিংখোর আর মাতালের ঝগড়ার গল্প জানো না? আমি তাদের দুজনকেই চিনতাম ছোটবেলায়।

কি গল্প? জানি না ত'! শামীম শুধোল।

এক আফিংখোর আর মাতাল থাকত পাশাপাশি ঘরে। আফিং সেবন করে সেই আফিংখোর রোজই চেঁচেমেচি কবত আর মাতালকে গালাগালি দিত। মাতাল মানে, মত্ত নয়, মদ সে খেত; কিন্তু বেচাল ছিল না কোনো। জাতে মাতাল, তালে ঠিক। সে বেচারী শেষে একদিন আব সহ্য করতে না পেরে আফিংখোরকে বলল,

দারু পীয়া ত কেয়া বাফা? দুল খুশ ঔর পেট সাফা/ আফিং পীয়া ত কেয়া বাফা? গাঁড় তংক ঔর দিল খাফা। মানে মদ খেলে মন খুশী আর পেট সাফ আর আফিং খেলে কন্‌স্টিপেশান্ এবং দিল খাপ্পা।

ওরা সকলে হেসে লুটোপুটি খেল।

হবেই! পেট পরিষ্কার না হলেই মেজাজ অপরিষ্কার হয়। এ কে না জানে! গিরিশদা বললেন।

ভুচু বলল, সত্যি, গিরিশদা! তোমার স্টকে কিছু গল্পও আছে বটে!

ভুচুও আজ পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছে। ঘাড়ে পাউডারও মেখেছে। যদিও শীতকাল। শীতকাল হলে কি হয়। দৌড়াদৌড়ি এবং পেটের মধ্যে লিকুইড ফায়ারের ধিকিধিকি জ্বলার কারণে শীতকালেও সময় সময় ঘাম হয় বৈ কি!

ভুচু চলে গেল সাবীর মিঞাদের আনতে। ইতিমধ্যে সেই রূপোলি ওল্ডসমবাইল চড়ে রাজা

বীবজু নারায়ণ এবং তাঁর ছেলে কুমার সবজু নারায়ণ এসে হাজির। সঙ্গে জোড়া তানপুরা। রাজা সাহেবের চেহারাটা অনেকটা উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেবের মতো। গোঁফ জোড়া ত' বটেই। উনি গাইবেন না, ছেলেব গান শুনবেন। বাবা ও ছেলের মধ্যে বয়সের খুব একটা তফাৎ আছে বলে মনে হলো না। বেশি হলে, সতেরো-আঠারো বছরের হবে। আজ, লাড্ডুকেও একেবারেই চেনা যাচ্ছ না। তার ভাব-ভঙ্গী, চাল-চলন, ঠাট-বাট সবই পাকা গাইয়ের মতো।

তানপুরা ছাড়ার লোক বেশি নেই। ঠিক হল, পৃথু একটি ছাড়বে এবং ভুচুর কারখানার হেল্পার গুলাম আরেকখানি। গিরিশদাই স্বয়ং হারমনিয়াম নিয়ে বসবেন। বুড়ো হাড়ে ভেলকি খেলাবেন। তবলচি এসেছে ইন্দোর থেকে। রাজা সাহেবেরই পুরোনো তবলচি। ছানা পাণ্ডে তার নাম। চেহারাব সঙ্গে, ছানার মিল আছে।

গিরিশদাব যে সব ইয়াং ক্যালকাটানস গেস্টরা এসেছেন তাদের টিকিটি এ পর্যন্ত দেখা গেল না। তারা নাকি ঘুমোচ্ছেন। বাত্রি জাগরণ হবে বলে গায়ে জোর করছেন। রাজা যে কে, তা ঠিক বোঝা গেলো না ভালমত। ঐ ছেলেকটির হাবভাবই বরং রাজার মতো। এখন ত' রাজা-মহারাজা সব ফওত। বেওসাদার, মিল-মালিক এরাই সব রাজা-মহারাজা এখন। তাদেরই ছেলে এরা। গিরিশদার কথাবার্তায় মনে হল, উনি নিজেও একটু বিরক্ত তাঁর অল্পবয়সী অতিথিদের উপরে। বললেন, ছেলে-ছোকরারা কোথায় একটু হাত লাগিয়ে সাহায্য করবে, তা নয়; বুড়ো-হাবরার মতো ঘুমোচ্ছে পড়ে পড়ে। তোমাদের কলকাতার সব ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা!

পৃথু বলল, কলকাতার আমি কী জানি। আমি ত' মধ্যপ্রদেশেব জংলী বাঙালী। কলকাতার হালচাল আমাব জানা নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুচু ফিরে এল। পামেলাও এল ওদের সঙ্গে। গাড়িতে লোক বেশি হওয়াতে সাবীর মিঞা পরের ট্রিপ-এ আসবেন। পৃথু, তানপুরার তার ঠিক ঠিক আছে কী নেই দেখে নিচ্ছিল। গিরিশদা হারমোনিযমের রীড চেপে সুর দিচ্ছিলেন। একটা পিচ্-পাইপ থাকলে ভাল হত। কিন্তু পিচ্-পাইপ নেই এখানে কারো কাছেই। বি-শার্প-এ বাঁধতে হবে। লাড্ডু বলেছে, বি-শার্প-এ ও গায়। সাবীর সাহেব পাকা গাইয়ে। তবে, বড়ই লাজুক।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো তওয়ায়েফরা।

পৃথু অবাক হয়ে দেখল, বিজ্‌লী। আর কম্‌লা।

বিজ্‌লী আর কমলা পৃথুকে দেখেই আদাব্ করল। পৃথু ফরাস ছেড়ে উঠে আদাব জানাল। খুবই খুশি হল এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল বলে আবার।

গিরিশদা আর ভুচু সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন পৃথুর দিকে। ভাবটা, ব্যাপারখানি কি?

কমলা আর বিজলি জমিয়ে বসে পান জর্দা মুখে দিল। সারেঙ্গীওয়ালা যন্ত্র বেঁধে নিল। সকলের সঙ্গে সকলের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন গিরিশদা। ঠিক হল, বিজ্‌লী আর কম্‌লা আগে গাইবে। রাত গভীর হলে, তারপর লাড্ডু।

শামীম্, পৃথুর কানে কানে বলল, কাজটা কি ঠিক হল? ঐ ষাঁড়ওয়ালা, লাড্ডুর আর মিঠাই-এর দুকান্‌দার কেমন যে গাইবে, তার ঠিক কি? লাড্ডুকে দেখে ত' মনে হয় ওর গলা দিয়ে গাধারই আওয়াজ বেরুবে। রাতটা বিলকুল মাটিই না হয়ে যায়।

এমন সময়ে জিন-এর ট্রাউজার ও গরম ব্লেজার গায়ে দিয়ে টেরিটেরি বাগিয়ে গিরিশদার ইয়াং-গেস্টরা এসে ঢুকলেন ঘরে। এসে, সামনে বসলেন ওঁরা। সামনে যদি বেরসিক বসেন, তবে গায়কের পক্ষে গান গাওয়া ভারী মুশকিল। তবে ওঁদের হাব-ভাব আদব-কায়দা দেখে মনে হলো না যে, তারা আদৌ বেরসিক নন।

মুনেশ্বর ও গিরিশদার ড্রাইভার নানারকম উদ্ভট স্ন্যাকস্ পরিবেশন করছিল। উদ্ভট ড্রিংকস্-এর সঙ্গে। এমন এমন স্ন্যাকস্ কেবলমাত্র গিরিশদার উর্বর মাথা থেকেই বেরুনো সম্ভব। তার মধ্যে দুটি স্ন্যাকস্-এর উপকরণ গিরিশদার কাছে পৃথু আগেই জিজ্ঞেস করেছিল। একটি, কাজু-কিসমিস-লেবু-পেঁয়াজ-লঙ্কা মাখা। অন্যটি, পাঁঠার মাংসর কিমার মধ্যে উরতকা ডাল এবং

ছেঁচা-ঝিঙে দিয়ে পুর বানিয়ে খুব বেশি করে ক্র্যাম দিয়ে ভাজা চপ্। পুরটা আবার ভিনিগারে ভেজানো ছিল চার ঘণ্টা। পলেস্তারার আলুটা মাখার সময় তাতে বস্‌কা ড্রাই ওয়াইন্ এবং শুকনো লঙ্কা এবং গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে জম্পেস মাখা হয়েছে। খেতে যা হয়েছে না! ঐ চাঁট খেয়ে পৃথুর নিজেরই গাইতে ইচ্ছা করছে।

পৃথু যে গান গায় তা ও নিজেই ভুলে গেছে। এখানকার একজনও জানে না, ওর গানের কথা। গোলাম নবী বা শোরি মিঞার অধস্তন পুরুষের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়র কাছে, ভোপালে থাকাকালীন, সে পাঞ্জাবী টপ্পা শিখেছিল। জবলপুরের হৃদয় সেন-এর কাছে বাঙালী টপ্পাও শিখেছিল কিছু। হৃদয়দাদা, রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর শিষ্য কালীপদ পাঠকের কাছে গান শিখেছিলেন অনেকদিন। সেসব গান এখন পৃথুর নিজের গলাতেই কবরস্থ হয়ে আছে। তাদের রেজারেক্‌শান আর হবে না কোনোদিনই। শোনাবার মতো মানুষ, আর গাইবার মতো মেজাজ, এই দুইয়ের যোগাযোগ না ঘটলে গান গাওয়া-না-গাওযা সমান। তা ছাড়া, হাটচান্দ্রাতে পাগলা ঘোষ্‌ষা যে গান জানে এমন অবিশ্বাস্য কথা বললে কেউই বিশ্বাস করবে না। কোনো কোনোদিন আত্মবিস্মৃত হয়ে বাথরুমে হঠাৎ দু'এক কলি গেয়ে উঠলেই দরজায় দুম্‌দাম্ ধাক্কা পড়ে। "স্টপ্ ইওর হাউলিং"। ঐ সব উটওয়ালাদের টপ্পা গাইতে হয়তো আফগানিস্তানে বা দ্যা র‍্যান অফ কাচ্-এ চলে যাও। সেখানে অনেক জংলী গাধাও আছে। ভদ্রলোকের বাড়িতে এ সব অসভ্যতা চলবে না।

রুষা অন্যান্য গানেব সঙ্গে বাখ, বীটোভেন এবং মোৎজার্টও শোনে। চাইকোভ্‌স্কি এবং মেণ্ডেলসনও। ওব ক্লাসিকাল ওয়েস্টার্ন মিউজিক-এর রেকর্ড-এর স্টক দারুণ। টপ্পার মতো এ সব ঘৃণিত দেশজ ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই।

বিজলী বলল, তার তানপুরার দরকাব নেই। সারেঙ্গী হারমোনিয়ম আর তবলা থাকলেই চলবে।

খানা-পিনা, গানের মধ্যে বিলকুল বন্ধ থাকবে। তাই গিরিশদা সকলকে এক পাত্র করে আবার চড়িয়ে নিতে বললেন।

শীতের রাত। পাঁয়তাড়া করতে কবতেই আটটা বেজে গেল। ম্যায়ফিল্ যে কখন শেষ হবে, কে জানে? বাড়ি ফিরে আবারও গালাগালি শুনতে হবে, ভাবছিল পৃথু। রাতে যদিও নয়। কারণ চাবি ও নিয়েই এসেছে ড্রইংরুমের। নিঃশব্দে ঘুমন্তপুরীতে ঢুকে পড়ে, চলে যাবে সোজা বইপত্তর গিস্‌গিস্ নিজের শান্তির গর্তখানিতে। বোমাবাজি শুরু হবে কাল সকালে।

যাক্। হলে, হবে।

বিজ্‌লীর কণ্ঠস্বর শুনে প্রথম দিন যেমন চম্‌কে উঠেছিল, আজও আবার তেমনই চমকে উঠল পৃথু। সুরের মতো ক্ষুরধার অস্ত্র বুঝি আর নেই। এমন নিপুণভাবে, চকিতে হৃদয় বিদীর্ণ করতে আর কোনো অস্ত্রই বুঝি পারে না। বিজ্‌লীর শরীরের যৌবনেরই মতো তার গলার স্বরের যৌবনও চোখ ঝল্‌সানো। চল্‌কে চল্‌কে চলে। উপচে পড়ে অবলীলায়। প্রথমেই, কাজ্‌রী ধরল একটা বিজ্‌লী।

পামেলা, পৃথুর কাছ ঘেঁষে বসেছিল। ভারী মিষ্টি মেয়ে। কালোকে কেন জগতের আলো বলে, তা পামেলাকে দেখলে, ওর সঙ্গে কথা বললে, বোঝা যায়। পামেলার নিজের গলার স্বরও ভাবী মিষ্টি। নানারকম চার্চ-হীমস্ গায় ও। ও গায় বলেই, যেন গীর্জায় গেলে ঐ সব গান অত বেশি ভাল লাগে পৃথুর।

পামেলা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কাজ্‌রী কি?

পৃথু গান বাজনা সম্বন্ধে এমন কিছু জানে না যে, অন্যকে বোঝাতে পারে। তার জ্ঞান অতি সামান্যই। তবু বলল, এই গান কিন্তু সাধারণত বর্ষার গান বলেই জানে লোকে। বর্ষা ঋতুর গান এবং বিরহ বর্ণনারও। উত্তর প্রদেশের গান এ। লোকসংগীত। কাজ্‌রীও বলে, অনেকে আবার বলেন, কজ্‌লী। রাধা-কৃষ্ণর লীলা খেলা নিয়েই বেশি গান।

তারপর পৃথু বলল, শৃঙ্গার মানে বোঝো ত'?

না। কি?

পামেলা বলল। ফোর্‌প্লে।

ইংবিজি ফোরপ্লে কথাটাতে শৃঙ্গার এর অতি সামান্যই ফুটে ওঠে। আমাদের শৃঙ্গাব-এব মানে অনেক গভীর এবং বিস্তৃত। বুঝেছো?

পামেলা লাজুক লাজুক চোখে তাকাল। বুঝেছে, জানিয়ে, মাথা নাড়ল।

শৃঙ্গাব বসেই ভবা এই কাজ্‌রী বা কজ্‌লী গান। উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর আর বানাবস-এলাহাবাদ অঞ্চলেই এই গান বেশি গাওয়া হয়। কাজরী এমন একা গাওয়ার গানও নয়। মোটে দুজন মিলে গাইছেন এঁবা। কিন্তু কাজ্‌রীর আসরে প্রধান গায়কের বা গায়িকার সঙ্গে অনেকে মিলে একই সঙ্গে বসেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার রাতে মেয়েরা নতুন শাড়িতে সেজে সালঙ্কাবা হয়ে সাবাবাত কজলী দেবীর পুজো করে। হিন্দু, মুসলমান সকলে মিলেই কিন্তু এই গান শোনে একসঙ্গে।

পামেলা বলল, আজ হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে খ্রীষ্টানও যোগ হল।

পৃথু হাসল। বলল, গানও হচ্ছে, লালন ফকিরের সেই কথারই মতো। গানের মধ্যে কোনোই জাত বিচার নেই। শ্রোতার মধ্যে তো নেই-ই। একই জাত সবার সেখানে। সে জাতের নাম, রসিক জাত।

লালন ফকিবেব কোন্ কথার কথা বলছেন? কে এই লালন ফকিব?

কথা নয। সেও এক গান। বাঙলাব মুসলমান ফকির লালন গেয়েছিলেন না? "যদি ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান, নারীব তবে কি হয় বিধান?"

লালন ফকিরের বই ইংরিজিতে পাওয়া যায়?

হয়ত যায। এখন চুপ করো। আর কথা নয়। মনোযোগ দিয়ে গান শোনো। কোনো প্রশ্ন থাকলে, গান যখন শেষ হবে তখন জিজ্ঞেস করো।

মিশ্র গারাতে ধরল বিজ্‌লী। মিশ্র-গারা-দাদবা।

নাহি মানে জিয়ারা হামারে
নৈ হারোমে ॥
বাবা হাটে গৈলা, গমনুনা দই হা
বিখ ভইলে বরখা বাহার নেহারুমে ॥

আহা!

চোখের সামনে যেন বর্ষার রূপ ফুটে উঠল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইতে লাগল বিজ্‌লী। তার রূপোলি জরিমোড়া বেণী দুলতে লাগল, তার চোখের মধ্যে কালো চক্‌চকে গহুমন সাপ খেলা করতে লাগল। ফুলের গন্ধ, ধুপের গন্ধ, গোলাপ জলের গন্ধ, বিভিন্ন নারী-পুরুষের গায়ের ঈত্বব ও অন্য সুগন্ধীর গন্ধ এবং গিবিশদার অভিনব কনককশানের নেশা মিলে, পৃথুর মনে হল, যেন সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে কোন্ দেবলোকের দিকে চলেছে। যেখানে মন্দাকিনী বয়ে যায়, দুগ্ধ-ফেননিভ রাজহাঁসী গাঢ় কমলা নীরব ঠোঁট নেড়ে খেলা করে, যেখানে উর্বশী, রম্ভারা রূপের হাট লাগিয়ে গজেন্দ্রগমনে চলেন!

কাজরীতে বিজ্‌লীর কমলা বহীনও গলা মিলিয়েছিল। কিন্তু ঐ কাজ্‌রী, বিজ্‌লী অস্থায়ী ও অন্তরাতে ঘুরে ফিরেই যেমন হঠাৎ শুরু করেছিল, তেমন হঠাৎই শেষ করে দিল।

কজরী গানের মতো শৃঙ্গারও যতিতে মধুর হয়। সকলেই চলতে জানে, গতি ব্যাপারটা সকলেই বোঝে, কিন্তু জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই থামতে-জানা লোকের সংখ্যা, যতির কদর-করা মানুষের সংখ্যা অতি সীমিত। ও নিজেও ব্যতিক্রম নয়।

সুরের ছটার অব্যবহিত পরের যে নিস্তব্ধতা সেই ক্ষণটুকুই বোধ হয় গানের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। সে নৈঃশব্দ্যে গানের রেশ পুরোপুরি স্বরাট থাকে; ঈশ্বরীর মতো।। সমস্ত সৌন্দর্যরই শেষ থাকে। ফুরিয়ে যায়, এক সময়; সব কিছুই। কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়ার আগের এই নিঃশব্দ শব্দময়তাই বোধ হয় শ্রোতাব সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

বিজলী হঠাৎ পৃথুকে কুর্নিশ করে তানপুরা ধরতে বলল। একটু অবাক হয়ে বিজ্‌লীর পিছনে

গিয়ে বিজ্লীর স্কেলে, বেঁধে নিল নতুন করে তানপুরা পৃথু।

এবার ও একটি ঠুম্‌রী ধরল। বাদীর ঋষভকে পিছা করল সম্বাদী পঞ্চম। খাম্বাজ ঠাটের এই রাগটি পৃথুর বড়ই প্রিয়। কত্থদিন পরে শুনল! পৃথুর বাবাও বিশেষ পছন্দ করতেন তিলোক কামদ। আর পরজ বসন্ত। সরগমা, রমপধস পা ; র্সা এই রকম আরোহণ, অবরোহণে র্স পধমগা, সরগা, স্‌না। পকড় হচ্ছে প্‌ন্‌সরগা, সা, রপমগা, স্‌না।

তানপুরা ছাড়তে ছাড়তে বিভোর হয়ে গেল পৃথু। গানের কোনোই বিকল্প নেই। বিজ্লীর আলাপে যেন লক্ষ লক্ষ ফুলকুঁড়ি ফুটে উঠতে লাগল। অথচ, এই রাগে একটিও কোমল স্বর নেই। সুরের পর্দার কাঠামোর উপর আস্তে আস্তে কথা বসাতে লাগল বিজ্লী। যেন, নতুন কোরা-গন্ধ তাঁতের শাড়ি পরে পুজোর আলপনা দিচ্ছে ভিজে চুল পিঠময় ছড়িয়ে দিয়ে বাঙলার কোনো মেয়ে। বড় যত্নে, বড় শ্রদ্ধামিশ্রিত সোহাগে।

বাঙালী!

ঠুম্‌রীটি ধরেছিল বিজ্লী, পাঞ্জাবী তালে।

পিয়া পরদেশ মোরা মনহ
রহে কৌন মোতন কে দ্বার ॥
না মোরি নৈয়া নারে খাবৈয়া
কৌন্ বিধো উত্‌রানো পার ॥
পিয়া পরদেশ মোরা

ঠুম্‌রীর এই ছটফটানিহীন শান্ত, ধীর স্থির ভাবটি বড় ভাল লাগে পৃথুর। যদিও এই শান্ত সৌম্য ভাবটি ধ্রুপদে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন যে চঞ্চল বিজ্লী, সেও যেন ঠুম্‌রীর ভাবে, পুরোপুরি সমাহিত হয়ে থির্-বিজুলি হয়ে গেল। দেদীপ্যমান হয়ে, উদ্ভাসিত ঔজ্জ্বল্যে স্থির হয়ে গেল। এক-একটি খট্‌কা, অথবা মুর্কীর ছোট ছোট কাজ লাগছে ওর চিকন গলায়। শুনে, পৃথুর মনে হচ্ছে তানপুরা ছেড়ে দিয়ে বিজলীর পায়ের উপর মাথা রাখে, দু'হাতে তার মুখ ধরে তার জর্দা-গন্ধী ঠোঁটে আর সুর্মাটানা চোখে চুমু খায়। ভাল গায়িকার মতো তাৎক্ষণিক সম্রাজ্ঞী, এ দুনিয়ার সত্যিকারের কোনো সম্রাজ্ঞীই বোধ হয় কখনই হতে পারেন না। গায়িকার সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ের যে যোগাযোগ, তা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে।বিদ্যুৎচমকেরই মতো হঠাৎই হৃদয় বাঁধা পড়ে।

স্থায়ী থেকে এসে যখন অন্তরার "না মোরি নৈয়া"তে নামল বিজলী, মনে হল শীতের সকালের প্রথম নরম রোদে গাঢ় সবুজ হরিয়ালের ঝাঁক যেন উড়ে এসে বসল অশ্বত্থের ডালে ডালে।

এ গান কোথায় শিখেছিল বিজ্লী কে জানে? মহারাষ্ট্রের কোনো ওস্তাদের কাছে কি? তিলোক কামোদের সঙ্গে দেশ ও সুরট রাগের সাদৃশ্য দেখা যায়, নিষাদ পুরোপুরি বর্জিত হওয়ার কারণেই। কিন্তু খরজ বদলে বিজলী কোমল ও শুদ্ধ নিষাদ দুই-ই লাগিয়ে দিল এক আশ্চর্য মুন্সীয়ানার সঙ্গে। চারিদিকে যেন রঙ ঝলসে উঠল। ফুল আর ঈত্বরের গন্ধর পুকুরে কে যেন রূপোর তাল ছুঁড়ে মারল। ছিটকে উঠল রঙ আর গন্ধ চতুর্দিকে। তিলোক কামোদের আরোহ-অবরোহে স্বরগুলির যে রকম এক বাঁকা গতি আসে, তা শুনতে বড় ভালো। তানপুরার সঙ্গে কানটি চেপে ধরে রসসাগরে যেন ভেসে গেল পৃথু। স্থান, কাল, পরিবেশ সব কিছু সম্বন্ধেই আর কোনোই হুঁশ রইল না।

বিজলীর হঠাৎ সপাট তানে গিরিশদার ড্রইংরুমে যেন শয়ে শয়ে সুরের পায়রা উড়তে লাগল, পাখা ঝাপ্টা-ঝাপটি করতে করতে সেই অদৃশ্য গেরোবাজ পায়রারা সুরের আগুনে যেন সুখের মরণে পুড়ে মরতে লাগল।

প্রত্যেকেই স্তব্ধ। গিরিশদার মুখটি হাঁ হয়ে গেছে। দেখল, পৃথু। যে কোনো মুহূর্তে মাছি ঢুকে যেতে পারত, মাছি থাকলে। বড় ভাল হারমোনিয়ম বাজান গিরিশদা। বিজলীদের দলের সারেঙ্গীওয়ালা পর্যন্ত লাবেদম্ হয়ে যাচ্ছে গিরিশ বুড়োর কাছে। ভেলকি দেখিয়ে দিচ্ছেন একেবারে।

যখন গান থামল, কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! বহত্ খুউব! ক্যা মিঠি আওয়াজ! ইত্যাদি রব উঠতে

লাগল চাবধাব থেকে। এবং সামনে বাখা রূপোব থালায ঝনাৎ ঝনাৎ কবে টাকা পডতে লাগল। কলকাতাব মেহেমান ছোঁডাবা চোখ বড বড কবে বিজলীকে দেখতে লাগল।

পৃথুব বুক-পকেটে একটি লাল বঙা কুডি টাকাব নোট ছিল। বুকেব ভিতব থেকে অদৃশ্য একটি লাল গোলাপ ছিঁডে সেই লাল টাকাব সঙ্গে বাখল রূপোব থালায। রূপোব থালা লাল পদ্মে ভবে গেল। পৃথু ছাডা আব কেউ দেখতে পেল না তা। ঐ ছেলেদেব মধ্যে একজন ফিসফিস্ কবে বাংলায অন্যজনকে শুধোল, অ্যাই বমেন, ট্যাকটফুলি জিজ্ঞেস কববি ত একা পেলে। এ মাল কি শুধুই গায। না বাজাযও ? দারুণ জিনিস।

পৃথু কথাটা শুনল। পাশে বসা ভুচুও শুনেছিল। যে ছেলেটি বলল, তাকে ভুচু ফিসফিস কবে, প্রায কানে মুখ ঠেকিযে বলল, কলকাত্তাইযা বাবু, তোমাব জামাব নিচে জান ক'টা আছে ?

ছেলেটি প্রথমে অপ্রতিভ হযে গেলেও, সপ্রতিভ মুখে হেসে বলল, আমবাও বাঈজীব গান অনেক শুনেছি। কলকাতাব জান-বাজাবে। জান-এব ভয আমাদেব দেখাবেন না।

বিজলী ওদেব চুপি চুপি কথাতে অবাক হযে একবাব চোখ তুলে তাকাল ওদিকে।

বাবু ' এ ডাকাতেব দেশ। গোযালিযব ভিন্দ, মোবেনা এ সব নাম শুনেছ কখনও ? পুতলি বাঈ-এব ? এক সমযে বাঙালী মেযেবাও বুকেব মধ্যে কবে পিস্তল লুকিযে নিযে গিযে গুলি কবেছে অত্যাচাবী সাহেবকে, শুনেছি। কিন্তু তোমবা ত' সেই জাতেব নও বলেই মনে হচ্ছে। এখানে পেযাজি ক'বো না বাবু, খামোখা কেন গিবিশদাকে ডেডবডিব ঝামেলাতে ফাঁসাবে ? একদম চুপচাপ থাক। এখনও দুগ্ধপোষ্য শিশু সব, শুধু গান শুনে মন ভবে না, বাজনা শুনতে চাও, আঁ ? সাহস কত্ত !

ছেলেটি চুপ কবে গেল। ভুচুব চেহাবাব মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যে, স্বযং ডাকু মালখান সিংও হযত ওকে সমীহ কবত যদি চিনত ওকে।

বিজলী সকলেব স্তুতি কুডোতে ব্যস্ত ছিল। ওব কানে ভুচুব কথা যায নি। তা ছাডা, বাংলা তো ও বোঝেও না পৃথুব দিকে ফিবে সে বলল ইযাদ কভভী নেহী পডা থা ক্যা, বহিস অদমী কি ?

পৃথু লজ্জাব সঙ্গে বলল নহী, নহী উও বাত নহী।

আজ সাথহি লে চালুঙ্গি

কাঁহা ? পৃথু শুধোল

কাঁহা ? তাবপব গলা আবও নামিযে বিজলী পৃথুব কানেব সঙ্গে প্রায মুখ ঠেকিযেই বলল, জাহান্নম। নহী, যাইযেগা ? ক্যা ?

চমকে উঠল পৃথু

জাহান্নম।

হাসল একটু। বোকাব মতো। এখানে রুযা থাকলে হযত বলত, ছাগলেব মতো।

পৃথু বলল, শোচেগা।

লাড্ডুব পোশাকটিও আজ দেখবাব মতো। মাথায মস্ত এক পাগডি। পবনে আচকান কামিজ। সোনা রূপোব চুমকি বসানো। বনবেডালেব ল্যাজেব মতো দুটি পুরুষ্ট গোঁফ যেন তীব্রগন্ধী হিনা ঈত্ববেব বিজ্ঞাপন হযে উঠেছে গোঁফেব প্রতিটি চুল থেকে খুশবু উডে সমস্ত মহল্লাকে খুশবুদাব কবে দিযেছে

সে বলল বিজলীব দিকে চেযে, যথাযথ বিনযেব সঙ্গে, আবেকটি হোক। খেযাল হবে না একটি ?

বিজলী পান জর্দা খাচ্ছিল। হাঁসেব মতো দেখতে রূপোব পানেব বাটা বন্ধ কবতে কবতে, হাসতে হাসতে মাথা ঝুঁকিযে আদাব কবল। ঘাড নামিযে বলল, এবাব আপনাব গান শুনবে সকলে। সকলেই ইন্তেজাব কবছে আমবা তো বটেই।

বাত্রমোহানাব অস্পষ্ট অন্ধকাবে, সেদিন বাতে বিজলীব কণ্ঠই শুধু শুনেছিল পৃথু। তাব রূপেব চেকনাই সম্বন্ধে কোনো ধাবণাই কবতে পাবেনি। আজ এই ঝাডলণ্ঠন জ্বালা হালকা নীল-বঙা ঘবে

এত ফুলের আর ঈত্বরের গন্ধের মধ্যে তার মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম হল বিজলীকে কাছ থেকে দেখে। পানের পিক্ গিলছিলো বিজলী। তার ফিন্‌ফিনে ফর্সা পেঁয়াজ-খসীরামতো পাতলা চামড়ার আড়ালের নীল শিরা দিয়ে সেই লাল পিককে যেন নামতে দেখল পৃথু। বাবার কাছে গল্পে শোনা, কলকাতার গহরজান বাঈজীর কথা মনে পড়ে গেল ওর। কত সব নামী নামী বাঈজী ! সম্ভ্রান্ত। সংগীতের প্রকৃত সাধক সব। গহরজান, মালকাজান, চুলবুল্লেওয়ালী, আগ্রাওয়ালী, মালকা, হুসনা। ভোপালের রূপা, ইন্দোরের কিমতি বাঈ।

ইতিমধ্যে আর এক পক্কড় করে পানীয় চলে এল গিরিশদার ফরমাসে। ইন্টারভ্যাল। সেই তরল প্লাস্টিক-বম্ব যারাই গিলেছে তাদের প্রায় সকলেরই হালত বিলক্ষণই খারাপ। কেবল ঠিক আছে ভুচু। পামেলাকে নিয়ে সে এই প্রথম বাইরে এসেছে, পামেলার মায়ের অনুমতি নিয়ে। কোনো রকম বেচাল করবে না, এবার সে উঠবে পামেলাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। ফেরার সময় সঙ্গে করে খাবারদাবার, খিদমদগার সব নিয়ে আসবে।

ভুচু আর পামেলা সকলের কাছেই বিদায় নিয়ে উঠল। পামেলা বিজলীর হাতে হাত দিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক উ্যা ভেরী মাচ।

বিজলী এক মুহূর্ত বোকা হয়ে গেল। মাথা নিচু করে, আদাব করে বলল, মেরী খুশনসীবি।

পৃথু ভাবছিল বিজলীর দিকে চেয়ে, এ মেয়ের কপাল খারাপ। আগের জামানা থাকলে এরও হয়ত ইজ্জৎ হত গহরজান বা মালকাজান-এরই মতো। এমন রূপ, এমন গান এবং এমন সপ্রতিভতার সংমিশ্রণ পৃথু খুব কম গানেওয়ালির মধ্যেই দেখেছে।

গিরিশদা, এবার লাড্ডুর দিকে চেয়ে বললেন, অব কুছ শুনাও ভাই, কুমার বাহাদুর।

লাড্ডুকে রোজই বাজারে তার লাড্ডুর দোকানের গদীতে পা মুড়ে বসে থাকতে দেখা যায়। পরনে মিহি ধুতির উপরে হালকা গোলাপি টেরিকটের পাঞ্জাবি। কী শীত কী গ্রীষ্ম ! শীতে অবশ্য পাঞ্জাবির উপরে একটি ঘোরতর লালরঙা জহরকোট চড়ায় সে। সেটাও তার ভুঁড়ির সবটা ঢাকতে পারে না। নাভির কাছটা অনাবৃতই থাকে। কে জানে, টাকাওয়ালা লোকেদের ভুঁড়িতে গরম বেশি বলে হয়ত ইচ্ছে করেই ঢাকে না সে ভুঁড়ি। মুখে হাসি, পেটে তরমুজ এবং চোখে বানিয়ার চকচকে দুর্বুদ্ধি। তাকে আজ হঠাৎ এমন গায়কের বেশ এবং গান বাজনার পরিবেশে দেখে বড়ই অবাক লাগছিল। একজন মানুষের মধ্যেই অনেক মানুষের বাস। ভুচু, লাড্ডুকে বলে গেছে, শুরু তুম্ করনে শকতা, ইয়ার। মগর খতম মত কর্ না। ম্যায় গ্যয়া, ঔর আয়া।

ভুচুই হচ্ছে লাড্ডুর সবচেয়ে কাছের লোক এখানে। ওদের দুজনের দেখাশোনা হয়। কোথায় হয়, কখন হয় এবং কী ওদের এই গভীর বন্ধুত্বর সূত্র তা যদিও জানা নেই ঠিক পৃথুর।

লাড্ডু তার বাবার দুপায়ের উপর গড় হয়ে প্রণাম করে ইজাজৎ চাইল। তারপর গিরিশদার কাছে, পৃথুর কাছে, সকলেরই কাছে। এমনকি বিজলীর কাছেও।

এইই তারীকা। এইসব ভারতীয় ব্যাপার-স্যাপার এখনও ভারতের এসব দিকে বেঁচে রয়েছে। এই সহবৎ, বিনয়, এই রিচুয়ালস। কলকাতার ছেলেদের দেখে মনে হচ্ছে, বিনয়, নম্রতা, সহবৎ, ভদ্রতা এসব গুণ বোধহয় তামাদি হয়ে গেছে ওদিকে, অনেকদিনই হল। তামাদি হয়ে গেছে বলেই বোধহয় এইসব গুণাবলীকে সভ্যতার খতিয়ানের নাজাই খাতাতে লিখে, মুছে ফেলা হয়েছে বিলকুল।

কলকাতার ছেলেরা লাড্ডুকে বলল, শুরু কিজিয়ে। দেখা যায়।

ভাবটা এমন, যেন ওর গানের পরীক্ষকই ওঁরা।

লাড্ডু তাদেরও দুবার কুর্নিশ করে ঈজাজৎ চাইল। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে কমবয়সী, সেই ছেলেটি, হেইল্ হিটলার বলে জার্মান সৈনারা যেমন করে হিটলারকে স্যালুট করত, তেমনই করে সোজা ডান হাতটি সামনে ছুঁড়ে দিয়ে লাড্ডুকে ঈজাজৎ দিল। ঐ হরকৎ দেখে, লাড্ডু যেন গান শুরু করার আগে রীতিমত ঘাবড়েই গেল।

লাড্ডুর গানের ব্যাপারটা যে একধরনের তামাশা হবেই সে বিষয়ে সাবীর মিঞা, শামীম, পৃথু

এবং হয়ত ভুচুবও কোনো সন্দেহ ছিলো না। এরকম অ্যামেচারদের ম্যায়ফিল জমাতে হলে কিছু তামাশার উপাদানও থাকা চাই। আব সেটা জানতেন বলেই গিরিশদা, লাড্ডু নিজেই যখন উপযাচক হয়ে গান শোনাবাব জন্যে বার বার বলেছিল, তৎক্ষণাৎই রাজী হয়ে গেছিলেন। একটু আগে বড় ভাল গান শোনা গেল। পরেও যাবে। মাঝে একটু তামাশাও হোক। তামাশার মধ্যে দুপাত্তর আরও চড়িয়ে নিতে হবে সকলের। গিরিশদার নির্দেশ। ততক্ষণে নতুন স্ন্যাকস্, গুলহার আর বটি কাবাবও এসে গেছে।

লাড্ডুর পাশে গিয়ে বসল পৃথু। জোড়া তানপুরার একটা নিয়ে : অন্যটা ভুচুর চেলা গুলাম ছাড়ছে। তানপুরা ছাড়তে তেমন কেরামতির দরকার নেই, কিন্তু বাঁধতে হলে কিছু সুরজ্ঞান থাকা চাই। পৃথু লক্ষ্য করল যে, যে তানপুবায় সে বিজলীর সঙ্গে বাজিয়েছিল। ভুচুর চেলা গুলাম ইতিমধ্যেই নিখুঁতভাবে বেঁধে ফেলেছে তা লাড্ডুর স্কেলে। এখানে ভারসেটাইল জিনিয়াসদেরই ভীড় দেখছে পৃথু আজ। মোটব গাড়ির মিস্ত্রীর কান, সুরে টিউন করা, কাকশাস্ত্র বিশারদ গিরিশদা, সঙ্গীতজগতের দিকপাল যন্ত্রজ্ঞ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কায়দায় হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন ; লাড্ডুওয়ালা লাড্ডু খেয়াল গাইতে যাচ্ছে। হাবভাব এমন, যেন শ্রদ্ধাস্পদ সুরেশ চক্রবর্তী মশাই-ই হয়ে গেছে সে। ওয়াহ ! ওয়াহ !

লাড্ডুব চোখে মুখে কিন্তু কোনোই উদ্বেগ উত্তেজনা নেই। দেখে মনে হচ্ছে, ও ওব দোকানেই বসে আছে। এক্ষুনি হালুয়া বা লাড্ডু নিজেই মেপে ওজন করে দেবে। সবসময় দুধ আর ঘিয়ের জিনিস নিয়ে কারবার কবে বলে ওর গায়ে কেমন একটা সব-সব, ছানা-ছানা, ঘি-ঘি গন্ধ হয়ে গেছে। আজ সন্ধেতে লাড্ডু ভোল তো পালটেইছে, মায়, গায়ের গন্ধ পর্যন্ত পালটে ফেলেছে। ভোল পালটানো খুবই সহজ, গায়ের গন্ধ হাপিস করা সোজা কথা নয়, সে জন্তুরই হোক কী মানুষেরই হোক।

এবার সবাই প্রস্তুত। লাড্ডু বিশালাকৃতি এক গ্লাস সিদ্ধির শরবৎ খেয়েছে। সেই অর্ডার ইতিমধ্যে দুবার বিপিট কবে গেছে মুনেশ্বর। এই একটি কাজে মুনেশ্বরের বড়ই উৎসাহ। যতবারই লাড্ডুর জন্যে বাদাম, পেস্তা, গোলমরিচ, গোলাপের পাঁপড়ি এবং থকথকে দুধ মিশিয়ে, তাতে ভোপাল থেকে আনানো দুখানা সবুজ গুলি মেরে, বানিয়ে আনছে ঠাণ্ডাই, ততবার সেও প্রসাদ নিচ্ছে। তবে, কণিকামাত্র নয়। ঠাণ্ডাই খেয়েছে বিজলীরাও। পৃথুকে চোখ দিয়ে ইশারা করল বিজলী। পৃথুর সাহস হলো না। গিরিশদার ঐ বিচিত্রবীর্যকারী পানীয়র সঙ্গে অন্য কোনো বলবর্দ্ধক সে মেশাতে আদৌ রাজী নয়। তার উপব বিজলী আবার বলেছে জাহান্নাম-এ নিয়ে যাবে আজ।

খুবই খুশি খুশি দেখাচ্ছে মুনেশ্বরকে। পাগল মনিবের অত্যাচার ভুলে থাকার এই একমাত্র পথ তার।

হঠাৎই একেবারে আচমকা লাড্ডু "রে" বলে দিল।

চমকে যাওয়ায়, পৃথুর হাত থেকে তানপুরা প্রায় পড়ে যাবার যোগাড়। 'রে'টা এমন করে বলল, যেন মনে হল ফোর সেভেন্টি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলের গুলি গিয়ে বাঘের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল।

একবার বাবার সঙ্গে ইন্দোরের হোলকারদের ম্যায়ফিলে উস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের গান শুনতে গেছিল পৃথু। সকাল বেলা। রাজা মহারাজাদের বাড়িতে ভৈরবীর আসর সাজাতেই সকাল এগারোটা বেজে যেত। পৃথুরা প্রায় একঘণ্টা বসে থাকার পর খাঁ সাহেব এলেন। ভৈরবীতে "বাজু বন্ধ খুলু খুলু যায়" গেয়েছিলেন প্রথমে উনি। এখনও মনে আছে পৃথুর। গান আরম্ভের আগের একটি 'সা'তেই গায়ে শিহরণ জেগেছিল। অনেকক্ষণ অনুরণন ছিল ঘরে। পৃথুর বাবা ছেলেমানুষ পৃথুর পিঠে হাত রেখেছিলেন, ওর উত্তেজনাকে শান্ত করতে, পায়ে হেঁটে বাঘের মুখোমুখি হলে, যেমন পিঠে হাত দিতেন। উস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবে আর বড় বাঘে তফাৎই বা কি ছিল ?

কিন্তু এখানে পৃথুকে শান্ত করাব কেউই নেই। লাড্ডুর এই নতুন সত্তা, ওকে এবং ঘরের অন্য

সকলকেই যেন এক ধাক্কা দিয়ে, তাদের অবিশ্বাসী তামাশা-প্রত্যাশী মনকে সম্পূর্ণই অন্য এক ভাবগম্ভীর সুরের জগতে পৌঁছে দিল। আশ্চর্য! একটি একটি স্বরের নিখুঁত উচ্চারণে কত কীই ঘটে যায়। লাড্ডুর কণ্ঠস্বরে যাদুও কিছু ছিল। আস্তে আস্তে, খুবই আস্তে আস্তে, যেন ওর প্রিয়তমার চুলে আঙুল বুলোচ্ছে লাড্ডু, যেন ওর আরাধ্য দেবতার পায়ে মাথা রাখছে এমনি করেই স্বরগম্ বলল ও। আরোহী। আরোহীতে পৌঁছে, নামল অবরোহীতে। সা ধ নি মগ মরে সা…

আহা! একে বলে পুরুষের গলা! মাধুর্য আর ঔদার্য যেন মাখামাখি হয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করতে লাগল লাড্ডু। শুদ্ধতানে 'উঠাও'কে যেভাবে সে পেশ করল, তার তুলনা নেই।বেহেত্‌রীন্। এতদিন ওরই নিজের মুখে ওর শিশুসুলভ আত্মপ্রশংসার কথা শুনে ভেবেছিল পৃথু যে, লাড্ডু বুঝি একজন "আতাঈ"। কিন্তু আজ ওর গলার স্বর প্রথমবার শুনে কোনো, সন্দেহই রইল না যে, সে আতাঈ তো নয়ই, বরং একজন জবরদস্ত্ "কস্‌বী"। বড় গুণী মাত্রই বোধহয় ছেলেমানুষ এবং সরল। মনে হল ওর।

কী রাগে গান ধরল, প্রথমটা একটু ঠাহর করতে অসুবিধা হয়েছিল পৃথুর। গান তো ভুলেই গেছে।

ওর দোষ নেই। গানবাজনা, তার পরিবেশ কিছুই আর পৃথুর জীবনে অবশিষ্ট নেই। আরোহীটা শুনে ঠিক করতে পারল না। কিন্তু লাড্ডু অবরোহীতে আসতেই ধরে ফেলল পৃথু। গৌড়মল্লার। খাম্বাজ ঠাটের। অনেকের মতে অবশ্য, কাফি। কোমল গান্ধার লাগিয়ে অনেক গায়ক একে কাফি ঠাটে এনে ফেলেন।

দেখা যাক কি করে লাড্ডু।

খাম্বাজ এবং কাফি দুইই পৃথুর সমান প্রিয় রাগ। কিন্তু কোমল নিখাদের উপরই ওর জন্মগত দুর্বলতা। ওর বিয়ের আগে ঠিক করেছিল যে ওর স্ত্রীর নাম রাখবে কোমল নিখাদ। সে নাম রাখা হয়নি। রাখা যায় নি। রুষার বাহ্য চরিত্রে কোমল পর্দাগুলি একেবারেই অনুপস্থিত। কন্ এও নেই। দুঃখের। বড়ই দুঃখের।

বিলম্বিত একতাল-এ শুরু করল। আজ কী হয়েছে কে জানে, বিজ্‌লী এবং লাড্ডু ওরা দুজনেই এই শীতের মধ্যে বর্ষাকে মনে করছে কেন? গৌড়মল্লার তো বর্ষারই রাগ।

বাণীতে এল লাড্ডু, স্বরগম্ সেরে। কথা বসাল স্বরগমের জায়গায়।

আই বাদল
চমকত রহি বিজুরী
বোল্‌ত মূরলা বনমে

স্থায়ী শেষ করে অন্তরাতে গড়িয়ে গেল লাড্ডু, লাড্ডুরই মতো অনায়াস গতিতে;

চঞ্চল সৈঁয়াকে পিয়া
গয়ে পরদেশ কল না পরত
কঁপন লাগে জিয়া ভরমে
আই বাদল…

বিলম্বিত একতালে গেয়ে রাগের চেহারাটা সকলের কাছে স্পষ্ট করে দিল ও।

খেয়াল যদি ঠিকভাবে গাওয়া হয়, তাহলে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। কী করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় তা কারো হুঁশই থাকে না। তার নাভি থেকে ওঠা গভীর সুরের ছোঁয়া যে কী সব বুদ্ধিমত্তার ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্ছিল লাড্ডুর বোকা-বোকা মুখাবয়বে তা বলার নয়। নাদের সঙ্গে তার অন্তরের গভীর থেকে তেজালো সুরেলা গলার মাধ্যমে সুরের নানা মণি-রত্ন তুলে এনে, পেশ করে; মুহূর্তে মুহূর্তে চমকে দিচ্ছিল সে সকলকে। পৃথুর মন নীরবে বলছিল, জীতা রহো, জীতা রহো! জীতা রহো!

একজন মানুষের চেহারা কী বিভ্রান্তিকরই না হতে পারে! শুধু চেহারা দিয়ে বোধহয় কাউকেই বিচার করতে নেই। খুবই ঠকতে হয় তাহলে। রুষার চেহারা দেখে যেমন ও ঠকেছে। লাড্ডু যেমন

এবং হয়ত ভুচুরও কোনো সন্দেহ ছিলো না। ...

ঠকিয়েছে, তাদেব সকলকেই তার চেহারা দিয়ে!

ভুচু ফিবে এসেছিল অনেকক্ষণই। তার মুখ দেখে মনে হল তার দোস্তের এই আন্‌জান্ অজীব রূপ দেখে তার অকল বিলকুলই গুম্ হযে গেছে। সব নেশা উড়ে গেছে তার। চুপ করে লাড্ডুর মুখে তাকিয়ে বসেছিল ভুচু।

গিরিশদা বাব বাব মাথা নাড়ছিলেন। তার চোখের দু কোণা দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তাঁব ফর্সা ডানহাতটি একটি গিনিপিগেব মতো দ্রুত দৌড়ে বেড়াচ্ছিল হারমোনিয়ম-এর উপরে।

এমন আনন্দ পৃথিবীতে আব কি-ই বা আছে! এমন নির্দোষ, স্বার্থহীন, পবিত্র, পুণ্য আনন্দ। ভাল গান শোনা এবং তা তাবিফ কবার মতো আনন্দ? যারা এই আনন্দের কথা জানেন; তাঁরাই জানেন। বড় নির্মল আনন্দ এ।

মীড, জমজমা, গমক, পুকার-এর একেবারে ছড়াছড়ি ফেলে দিল লাড্ডুওয়ালা। শেষে যখন সপাট তানে পৌঁছল, তার দাপটে আর মিষ্টত্বে মনে হতে লাগল ঘর ফুঁড়ে সোনা-রুপোর ফুলের ঝাড় গজাবে এক্ষুনি, ঝাড়লণ্ঠন থেকে চাঁদ সূর্য টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়বে গায়ক আর শ্রোতাদের মাথায় মাথায়!

গান শেষ হলে, পৃথু এবং অন্যান্য সকলে যখন তার রেশটুকুর মধ্যেই পুরোপুরি বুঁদ হয়ে আছে আনতমস্তকে, তাবিফ তখনও জানানোর মতো অবস্থা আসেনি শ্রোতাদেব। সকলেই তখনও সুরের ঘোরে ভবপুব। ঠিক সেইসময় লাড্ডু চমকে দিয়ে খালি গলায়ই টপ্পা ধরে দিল।

হো মিঞা বে জানেবালে
তৈনু আল্লাদি কসম কিরিয়া লেনেবালে ॥

কাফী-সিন্ধু। পাঞ্জাবী টপ্পা ধরল। ও আর বাঙালী টপ্পা জানবে কোত্থেকে!

গলা খুলতেই, পৃথু এবং ভুচুব সাগরেদ তানপুবা ছেড়ে ছেড়ে ওর দু কানে সুরের হাওয়া পুরে দিতে লাগল। গিরিশদা আবার হারমোনিয়মে ঝুঁকে পড়লেন। তবলচীর হাত নেচে উঠল। লাড্ডুর টপ্পাব প্রথম কলিতেই মনে হল বিজলী তীরবিদ্ধ হয়ে গেল। মানুষের হার্ট-অ্যাটাক হলে যেমন মুখচোখের ভাব হয়, বিজলীর অবস্থাও এখন তাই। পৃথু মনেমনে প্রমাদ গুণল! এই মুহূর্তে এই ফুলের ঘবে, সুবের ঘবে, এত সুগন্ধের মধ্যে নিঃশব্দে নিখুঁত খুন-খারাপি ঘাটে যাচ্ছে।

শামীমের মুখচোখেব অবস্থা হাস্যোদ্দীপক। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওর বন্দুকটাই কেড়ে নিয়েছে, গালে এক থাপ্পড় মেরে। হতবাক হয়ে বসে আছে। গানের মার, বড় মার। যার দিল সেই চোট কখনও খেয়েছে, সেই-ই জানে।

সাবীর মিঞার দু চোখ বন্ধ। দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বুড়ো যেন ঘুমিয়েই পড়েছে। লাড্ডু গাইছিল:

"আদা জাঁদা তুসী মান্‌লে জাঁদে
আজও সজ্জন ঘর সরশার লগ্‌দা হো মত্‌বালে
হো মিয়া বে জানেবালে···"

পাতিয়ালা ঘরানার গায়করা টপ্পা গাইতেন। ভোপালে পৃথুর বাবার একজন বন্ধু ছিলেন, গোলাম তন্‌বীর। বড ভাল গাইতেন টপ্পা। মনে আছে, একবার পৃথুদের সঙ্গে শিকারেও গেছিলেন। গভীর জঙ্গলের মধ্যে, সীওনীব কাছের এক বাংলোতে অনেক গান-বাজনাও হয়েছিল। বাঘও মারা হয়েছিল দুটো। একটা তনবীর সাহেব মেরেছিলেন; অন্যটা পৃথু।

পুরনো কথা মনে এলেই আজকাল অনেক কথাই একই সঙ্গে শীতের মুখে দ্রুতপক্ষে ফিরে-আসা পরিযায়ী পাখিদের ঝাঁকের মতো ভীড় করে আসে। ঝাঁকের পর ঝাঁক। স্মৃতির মুখে একটি ছাঁকনি লাগানোর দরকার হয়েছে বড়।

কাফী-সিন্ধুর টপ্পা শেষ করে এবার ভৈরবীতে ঠুংরী ধরল লাড্ডু। রাতের এই প্রহরে দরবারী কানাড়া ধরতে পারত। মালকোষও। কিন্তু ধরল ভৈরবী। গানে, নিজেও অবশ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এমন হয় অনেক সময়। ঈশ্বর, সাধকদের উপর কখনও কখনও যেমন ভর করেন, গানও ভর

করে গায়কের উপর। লাড্ডু কতদিন সাধনা করছে, কে জানে। আজই ও প্রথম এই হাটচান্দ্রাতে গায়ক হিসেবে স্বীকৃতি পেল কি ? মনে হয় না। হাটচান্দ্রাতে না পেলেও অন্য জায়গায় আগে ও গেয়েছে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই, ওর দোস্ত-বিরাদবরা আজ থেকে ওকে অন্য চোখে দেখবে। আনন্দে আর সুরে লাড্ডু ভরপুর ডুবে রয়েছে। সুরের স্রোত বইছে ওর নিমজ্জিত সত্তার উপর দিয়ে। এদিকে, ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে গেছে। ভৈরবী গাওয়ার কথা ত ভোরের সময় বা সকালে। কিন্তু আজকাল রাগরাগিণীর সময় মেনে গান প্রায় কেউই গান না।

আবারও ধরে দিল লাড্ডু। আজ গানে পেয়েছে ওকেও। ও যেন নিজে গাইছে না, কোনো অদৃশ্য গলা গেয়ে উঠছে ওর ভিতর থেকে।

"বাবুল মোরা নৈহর ছুটেহি যায়।"

ক্যা ব্যাৎ ! ক্যা ব্যাৎ ! রব উঠল চারধার থেকে। সাবেঙ্গী কেঁদে কেঁদে কোমল রে আর কোমল নি-র খুশবু ছড়াতে লাগল।

এবং...ঠিক সেই সময়ই কাণ্ডটা ঘটল।

গিরিশদার কাক বাহিনী একই সঙ্গে কা কা খ্বা খবা ক্রাঁ ক্রাঁ ক্রোন ক্রোন ক্রোলন ক্রোলন ক্রঁ ক্রঁ করে ডেকে উঠল। রাজা বাহাদুর, লাড্ডু, সাবীর মিঞা, ভুচু, শামীম, বিজলীর দল সকলেই চমকে উঠে ভীষণ ভয় পেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল গিরিশদার মুখের দিকে। সাবীর মিঞা লাফিয়ে উঠতে গিয়ে গোড়ালি মচকে ফেলল।

গিবিশদা প্রথমটা অপদস্থ হয়ে গেছিলেন। হকচকিয়েও গেছিলেন একটু। কিন্তু পবক্ষণেই, তাঁব মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দে ভরে উঠল। হাবমোনিয়ম ছেড়ে দিয়েই লাড্ডুর কাছে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন লাড্ডুকে বুকের মধ্যে।

বললেন, কামাল কর্ দিয়া ভাইয়া তু ! মিঞা তানসেনকা বাদ অ্যায়সা গানেবালা প্যায়দা নহী হুযা হিন্দুস্তাঁমে।

ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না।

যেই গুবলেট হল, গানে যেই যতি পডল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই দু-এক পাত্তর কবে চড়িয়ে নিল। কনফ্যুশানের ফসল। কাকেদের কোরাস গানের পরে পরিবেশটা আর মানুষের গান-গাওয়া বা গান-শোনার মতো ছিলও না।

শামীম এসে পৃথুকে বলল, ইনসান আল্লা ! ক্যা বাত ! ক্যা ব্যাত !

মিঞা তানসেন দীপক রাগ গেয়ে বাদশাহ্ আকবরের আমলে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, মেঘমল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামিয়েছিলেন। বৈজু বাওয়ারাও অসাধ্য সাধন করেছিলেন ! কিন্তু দরবারী কানাড়া বা মালকোষ গাইবার সময়ে ভৈরবীতে ঠুংরী ধরে দিয়ে পাঁচশ কাককে একই সঙ্গে ভোর হয়েছে ভাবিযে তাদের দিয়ে উষাসঙ্গীত গাওয়ানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয় !

গিরিশদা দাঁড়িয়ে উঠে, দুলে দুলে বললেন।

লাড্ডুর কাঁধে থাপ্পড় মেরে ভুচু বলল, শালে ! কাউয়া-গওয়াইয়া ! ক্যা বাত্।

ভুচুর চোখ লাল, বাক রুদ্ধ গিরিশদার মৃত্যুবাণ তখন সকলের উপরই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কবেছে। সকলেই তখন পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল।

লাড্ডুকে কুর্নিশ করে বিজলী বলল, ক্যা মিঠি আওয়াজ আপ্‌কা !

ঠিক এমনই সময় পৃথুর নিজেরও খুব গান গাইতে ইচ্ছে করল।

মদ বেশি খাওয়া হলেই ওর মধ্যে সুর গুমরোতে থাকে। বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি কবে তাব সুর। এক দুখিনী বন্দিনী নারী যেন ওর বুকের মধ্যে কেঁদে কেঁদে মুক্তি চায়। গান না গাইতে পারলে, তার খুবই কষ্ট হয় তখন। কিন্তু পৃথু যে গান আদৌ গায়, বা কখনও গাইত ; সে খবর এই দলের কেউই রাখে না। একমাত্র ঠুঠা বাইগা জানত। কিন্তু সে ত' এই ভদ্রলোকদের আসরে নিমন্ত্রিত নয় !

মনে মনে ও বলল, ভদ্রলোকমাত্রই খুবই ছোটলোক হয় !

গিরিশদা বললেন, চলো এবার সকলে খেয়ে নেওয়া যাক। নইলে বিরিয়ানী বরবাদ হয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়ার পর আবার লাড্ডুর গান এবং বিজলী বহীনের গান শোনা হবে। আজ সারা রাত ম্যায়ফিল চলবে।

সকলেই বলে উঠল, বহত আচ্ছা। কেবল পৃথু কিছু বলল না। কাক-ডাকার পর রাতে আর গান হয় না। ভোর রাতের মধ্যে তাকে বাড়ি পৌঁছে গুড বয়ের মতো শুয়ে পড়তে হবে। কুকুরগুলোর জন্যে নিঃশব্দে যে গৃহে প্রবেশ করবে তার জো কী আছে! কুকুর জাতটার প্রতিই ওর ঘেন্না ধরে গেছে। শুয়োরদের প্রতি যেমন।

খাবার ঘরে সার সার খাবার সাজানো হয়েছে। বড বড় দস্তরখানের উপর। বাখরখানি রোটি, রোমালি রোটি, বটি কাবাব, শাম্মী কাবাব, পাক্কি বিরিয়ানী, মুর্গ রেজালা, বাগারে বায়গন, মীর্চি কী সাঁলা; হালীম্। একেবারে মোগলাই, ভোপালি, হায়দরাবাদী রান্নার ছয়লাপ। সাবীর মিঞা নিজে বিবিয়ানীর হাঁড়ি থেকে স্তরে স্তরে বিবিয়ানী উঠিয়ে পরিবেশন করার তদারকি করছেন। বিরিয়ানী রাঁধা যেমন ঝক্‌মারি, পরিবেশন করা তার চেয়েও বেশি ঝকমারি। এ গরীবের খাদ্য খিচুড়ি নয়। আমীর ওমবাহ্‌র মন পসন্দ্ এ। এক স্ত্রীর উপর অভিমান করে যাঁরা একটামাত্র জীবন নষ্ট করতেন না কখনও, হারেম রাখতেন।

গিরিশদাও ত অবাক! বললেন, এ কী! বরাত দিলাম মোটে তিন পদের; এসে গেল এত পদ। এ ত ইলাহী ব্যাপার।

ভুচু বলল, আমাকে বকবেন না গিরিশদা। এ সব সাবীব মিঞাব হরকৎ।

বুড়ো বলল, গিরিশবাবু গান শোনাচ্ছেন আর খাওয়ার ভার যখন আমার উপরই পড়েছে তখন আমি সামান্য একটু খানা-পিনার ইন্তেজামও করব না? এই-ই আমার উপহার আজ রাতে। দোকানেব খাবাব এক পদও নেই। সব আমি, আর আমার দুই বিবি মিলে বানিয়েছি।

এই মানুষটি খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি যাই-ই করুক না কেন ভবিষ্যতে এঁর স্থান খুদাহ্ বেহেস্তের বেস্ট জায়গায় নিজে হাতেই নিশ্চয়ই করে রেখেছেন। এত মানুষকে, এতবার এতরকম উমদা খাওয়া খাইয়েছেন ইনি যে, সেই পুণ্যবলেই তার দোজখ্-এ ঢোকার পথ কাঁটা-বিছানো হয়ে গেছে।

খাওয়া দাওযাব পব গিরিশদা তাঁর তুরুপের তাস ছাড়লেন। আফটার-ডিনাব ড্রিংক। হাকিমী কায়দায়। তার আগে সাবীর মিঞা হামদর্দ দাওয়াখানাব এক মস্ত শিশি বের করে প্রত্যেককে এক এক বটি পাচনল খাইয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, খনা, ইতমিনানসে পচ্ যায়েগা। অর্থাৎ, খাবার সহজেই হজম হয়ে যাবে।

গিরিশদা ভাবপবই পেশ করলেন, গিরিশী-লিকুওব। শর্টকাট-এ উনি বলেন গিরি-লিক্।

ছোট ছোট লাল-নীল-হলুদ-সবুজ জার্মান গ্লাসে হানী-বী-ব্রাণ্ডির মধ্যে লবঙ্গ, দারচিনি, বড এলাচ, যষ্ঠিমধু এবং গন্ধরাজ লেবুব পাতা একসঙ্গে ছেঁচে গুলি বানিয়ে তারই এক একটি গুলি তার মধ্যে ফেলে দেওয়া।

শামীমের পেটে ঐ বস্তু পডতেই সে অমিতাভ বচ্চানের কায়দায় দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে আবৃত্তি কবল

"না পীনা হাবাম, না পিলানা হারাম
পীকে হোঁসমে আনা হাবাম হ্যায়।"

মনে হল, শামীম একটু পরেই ধপাস কবে পড়ে যাবে ফরাসে, বেহোঁস হয়ে, শায়েরের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে।

ঐ পরিমাণ খাদ্য-পানীয়র পর এবং কাকেদের ক্রমাগত ডাকের কারণেও গানবাজনা আর হল না। তবে, মজা খুব হল। পান, গড়গড়া, আড্ডা রাতও দেড়টা হল। সভা ভঙ্গ হল সে-রাতের মতো। গিরিশদার গাড়িও বের করতে হল। ড্রাইভারও ছিল। সকলে তিন গাড়িতে ভাগাভাগি করে ফেবা হল। শামীমকেও জোব কবে গাড়িতে আনা হল—ওর মোটর সাইকেল গিরিশদার ওখানেই থাকল। কাল এসে, নিয়ে যাবে।

বিজলী নামবাব সময়, পৃথুকেও নামতে বলল।

না, লোকভয নয, ভীষণই ঘুম পাচ্ছিল পৃথুর। বিজলীদেব বাডিটা ভাল কবে দেখে নিল। সবজী মণ্ডীব একপাশে, গলিব মধ্যে, ফাঁকা জাযগায বাডিটা। আলাদা বাডি। এদিকে কি অন্য কোনো তওযাযেফ থাকে? কে জানে? কতটুকুই বা খোঁজ বাখে পৃথু?

গাডি থেকে নামাব আগে বিজলী পৃথুব হাতে হাত বাখল। পৃথু বলল, আসব একদিন। ঠিক আসব। দেখো।

ধাঙ্গড বস্তিব গলিব মোডে ওবা নামিযে দিল পৃথুকে। ভুচু বলল, জডানো গলায, একটু হেঁটে যাও পৃথুদা। মগজ সাফ হযে যাবে।

ও বিডবিড কবে বলল, মগজ আমাব সব সমযই সাফ। কিন্তু, ধুলোয ভবা পথে নেমেই ঐ ঠাণ্ডাব মধ্যেও বুঝতে পাবল যে, গিবিশদাব নানাবকম মিশ্র-অবিমৃষ্যকাবিতায তাব অবস্থা অত্যন্তই শোচনীয হযেছে।

ধাঙ্গড বস্তিব ভাঁটিখানাব দিক থেকে চাবটি ছেলে ও একটি মেযে হেঁটে আসছিল

এত বাতে।

ওবা নিশ্চযই ভাল ছেলেমেযে নয। পৃথুবই মতো তাবা পৃথুকে চেনে না মনে হল। পবদেশি হবে। নতুন কুলি-কামিন এসেছে কত নানান জাযগা থেকে, ঠিকাদাবেব বেইমানিব 'পব।

ওদেব মধ্যে একটি ছেলে, জডানো গলায পৃথুব উদ্দেশ্যে কী যেন বলল। পৃথু শুনতে পেল না। মনে হল, কোনো খাবাপ কথা। তাব কান ঝাঁ-ঝাঁ কবছিল, নেশাব ঘোবে। সঙ্গেব মেযেটিও খিলখিল কবে হেসে উঠল। আবেকটি ছেলে, পথ থেকে একটি ছোট্ট পাথব কুডিযে নিযে আচমকা পৃথুব দিকে ছুঁডে মাবল।

মেবেই ওবা সকলেই টালমাটাল পাযে বড বাস্তাব দিকে দৌডে গেল।

কী হল, বোঝাব আগেই, পাথবটা এসে পৃথুব কপালে লাগল। বেশ বেশিই লাগল পৃথুব। ও ধাক্কা খেল একটা এমন ত কখনও হযনি আগে। তবু, গ্রাহ্য না কবেই এগোল।

এত শীতেও বেশ ঘাম হচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বেব কবে মাথা, কপাল, ঘাড মুছল পৃথু। পথেব আলোয হঠাৎই লক্ষ্য কবল যে রুমাল বক্তে ভিজে গেছে। চেতনা ও অবচেতনাব মাঝামাঝি একবকম অনুভূতি হল। আশ্চয নিজেব বক্ত দেখে একটুও বিচলিত হল না। যেমন নিজেব শিকাব-কবা নানা জানোযাবেব বক্ত দেখে হত আগে। রুমালটা দেখতে দেখতে বক্তে একেবাবেই ভিজে গেল। সাদা ফ্ল্যানেলেব পাঞ্জাবিব বুক বক্তে লাল হযে গেল লাল গোলাপেব মতো ফুল ফুটে উঠল অনেক, ওব বুকে।

ছেলেগুলো ওব সম্বন্ধে নিশ্চযই খাবাপ কিছু বলেছিল। নইলে, মেযেটি হাসত না

কী বলল ওবা? কী বলতে পাবে? কে জানে? সকলেই ত ওকে খাবাপই বলে ভাল আব বলল কে? ও ত সমাজেব নয। সমাজ তাকে গ্রহণ কবেনি, সেও কবেনি সমাজকে।

দূব থেকে রুষাব বাংলোটা দেখা যাচ্ছিল। পোর্টিকোতে গাডিটা দাঁডিযে আছে। এমন সময কুকুবগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠল। এস ডি ও সাহেবেব ধবধবে সাদা অ্যালসেশিযানও সেই বেজন্মা কুকুবগুলোব গলায গলা মেলাল।

বাডিব কাছে শ্লথ পা দুখানা টেনে টেনে হেটে আসতে আসতে ও ভাবতে চেষ্টা কবল কাল সকালে রুষা কী কী বলবে ওকে। ওব ছেলে আব মেযে কী বলবে? সকলেই খাবাপই বলবে। ও ত খাবাপই। খাবাপ। খুবই খাবাপ। নিজেব সম্বন্ধে কোনো মিথ্যে ধাবণা নেই ওব। ও একটা বিচ্ছিবী, বাজে টাইপ।

"একটা অদ্ভুত বাজে লোক।"

টুসু বলে।

টুসু, তাব গাযেব গন্ধেব ভাগীদাব।

তাব একমাত্র ছেলে।

পৃথুর হঠাৎই মীর্জা গালিব-এর একটি শায়ের মনে পড়ে গেল। এইরকমই পড়ে হঠাৎ হঠাৎ।

একদিন মীর্জা গালিব এরকমই গভীর রাতে সরাইখানা থেকে টালমাটাল পায়ে হেঁটে আসছিলেন। পথের ছেলেরা তাঁকে ঢিল মারে। বড় দুঃখ হয়েছিল গালিবের। এত বড় কবি উনি! তাঁকে পথের অর্বাচীন ছেলেগুলো এমন গালাগালি করল, ঢিল মারল!

গালিব বিড় বিড় করে বলেছিলেন :

"বুঢ়াহ্ না মান গালীব, যো দুনিয়া বুঢ়হা কহে
অ্যাইসা কোঈ হ্যায় দুনিয়ামে, সব্হি ভালা কহে যিসে?"

অর্থাৎ তুমি দুঃখ কোরো না গালীব। এরা তোমার অবমাননা করল, তোমায় খারাপ বলছে এবং তবুও তুমি দুঃখ কোরো না। দুনিয়াতে এমন কি একজন মানুষও আছে, যাকে সকলেই ভাল বলে?

সাবধানে, শব্দ না করে, ড্রইংরুমের চাবি খুলে ঢুকল পৃথু। খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের অ্যালশেসিয়ান কুকুরটা ঘাউ ঘাউ করে ডেকে উঠল অন্ধকার রাতকে মাদলের মতো বাজিয়ে দিয়ে।

সাবধান! বিপদ! বিপদ! কুকুর! হাউণ্ড অফ দ্যা বাস্কারভিলস।

নাঃ। পরক্ষণেই মনে পড়ল। কুকুর নয়। শুয়োর। কুকুর ভাল। কুকুর অনেক ভাল শুয়োরের চেয়ে।

পৃথু পা-টিপে টিপে নিজের ঘরে এল। নিজের ঘরের টেবল লাইটটা জ্বেলে, বাইরে গিয়ে ড্রইংরুমের ফুট-লাইটটা নিবিয়ে দিল। তারপর ঘরে এসে তার বরাদ্দ জলের বোতল থেকে ঢকঢকিয়ে জল খেল অনেকখানি। খুব তেষ্টা। তেষ্টা পায়ই এমন সময়। ডি-হাইড্রেশান হয়ে যায়। এখন একটা পান হলে খুবই ভাল হত। বাড়িতে পান খাওয়া এবং পান রাখা বারণ। ছোটলোকের নেশা।

জল খেয়ে, আলো নিবিয়ে, শুয়ে পড়ল পৃথু।

কে জানে, কেন রাজ্যের শের-শায়ের ঠিক এখনই মাথার মধ্যে ভীড় করে আসতে লাগল ওর। মাঝে মাঝে এরকমই হয়। শামীমই শায়ের বলে, শায়েরের পোকাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ও ভেবেছিল, হয় কুর্চি, নয় বিজলীর অদেখা নগ্নতাকে ভাবতে ভাবতে কোলবালিশ জড়িয়ে আশ্লেষে ঘুমিয়ে পড়বে। রুশ্নাকে ও এমন এমন সময়, একেবারেই মনে করে না। কোনোদিনও না। সেক্স ব্যাপারটা, নিরানব্বুই ভাগই মানসিক, মোটে একভাগ শারীরিক। পৃথুর মনে হয়। মন যাকে না চায়, তার সঙ্গে কল্পনাতেও, স্বপ্নেও, মিলিত হওয়া যায় না। এমনকি আত্মরতির রানী হতেও, কিছু যোগ্যতা লাগে, সব মেয়েরই। কিন্তু কুর্চি বা বিজলী বা তার পরিচিত অন্য একজনও ভাললাগার নারীকে মনে পড়ল না ওর আজ রাতে। একটি মুখ। ক্লিষ্ট। খোঁচা-খোঁচা দাড়ির গভীর চোখের একটি মুখ।

কে যেন, কে যেন সেই কবি?

আঃ। কিছুতেই মনে পড়ছে না।

কপাল আবার ভেসে যাচ্ছে রক্তে। বাথরুম থেকে তোয়ালে এনে চেপে ধরল মাথায়। মানুষের রক্তে কেমন এক অমানুষিক গন্ধ আছে। স্বাদও। নোনতা-নোনতা। ওর মনে হল, জীবন-যৌবন সম্বন্ধীয় বেশির ভাগ জিনিসই বোধহয় লবণাক্ত।

কে জানে, কেন?

সেই মুখ মনে পড়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ফিরাক। ফিরাক গোরখপুরী।

মনে পড়তেই, ওর মাথার মধ্যে গড়ে-ওঠা মনে না-পড়ার সব টেনসান কেটে গেল। ঘুম নেমে এল দু চোখে। তার কপাল থেকে নিঃশব্দে রক্তক্ষরণ হতে থাকল। ও জানলোও না। বড় সাদা তোয়ালেটাতে অন্ধকারে লাল লাল পদ্ম ফুটে উঠতে লাগল। রক্ত-পদ্ম। অনেক পদ্ম।

রক্ত, চিরদিন অমন নিঃশব্দে ক্ষরিত হয়, হয় স্তনা; রক্তবীজ। নিঃশব্দে প্রাণ আসে, প্রাণ ভরে প্রাণ চলে যায়।

তাই-ই পৃথু জানলও না, সেই মুহূর্তে, রাতের তৃতীয় প্রহরে বাইরের অন্ধকারের গর্তে কখন আলোর বীজ নিঃশব্দে রোপিত হয়ে গেল।



আজকের পৃথু অন্য পৃথু। বড়লোক, সাহেব, কেতাদুরস্ত পৃথু। রুষা আজ সঙ্গে থাকলে খুশি হত। তার স্বামীর এই সত্তাকেই সে সবসময় কাছে চেয়েছিল। সপ্রতিভ, নিখুঁত ইংরিজীবলা, ফর্ম্যালি, ভদ্র : হাই-সোসাইটির পৃথু।

ওর বুকের মধ্যের এই বন্ধ ঘরটিকে আজ অনেকদিন পর খুলে দিয়েছে ও। অনেকই ত' ঘর। তাই বদলে বদলে ব্যবহার করে।

মুক্কির আই-টি-ডি-সি লজ-এর ডাইনীং রুমে বসেছিলেন টাইগার প্রজেক্টের পারিহার সাহেব। মিস্টার এ. এস. পারিহার। সঙ্গে ছিলেন ফিল্ড ডিরেক্টর লাওলেকার সাহেব। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। আর মধ্যপ্রদেশ ট্যুওরিজম ডেভালাপমেন্ট করপোরেশানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি. কে. বাগচী। আই-টি-ডি-সি'র মুক্কি লজ-এর ম্যানেজার বারাণসীবাসী সদাই মঘাই পান-চিবুনো ভালমানুষ মিষ্টি-জবানের প্রসাদ সাহেবও ছিলেন। পৃথু সেই সময়ই গিয়ে পড়েছিল ঐদিকে।

মালাঞ্জখণ্ড-এ কাজ ছিল একটু। বেরিয়েছিল হাটচান্দ্রা থেকে সেই কাক ভোরে। মালাঞ্জ খণ্ড-এর কাজ সারা হয়েছে। হাটচান্দ্রাতে ফিরবে এবারে। দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেবার জন্যে থেমেছিল এই লজ-এ।

কোম্পানীরই একটি গাড়ি নিয়ে এসেছিল। তবে, ড্রাইভার ত' ওকে অ্যালট্-করা গাড়িখানাই চালায়। তাই নিজেই এ গাড়িটি চালিয়ে এসেছে। সঙ্গে ভুচুর গ্যারাজ থেকে একটি ছেলেকে নিয়ে নিয়েছিল। ক্লীনার, হেল্পার, সব। গাড়ির চাকা-টাকা পাংচার হলে বদলে দেবে। ওসব পারে না পৃথু। লোকে টিটকারী দেয়, রুষা চীৎকার করে, ছেলেমেয়েরা বলে, "অদ্ভুত বাজে লোক বাবাটা।" কিছুই পারে না। আমাদের সব বন্ধুদের বাবারা কত্ব ভাল। কত্ব কী পারে!

পৃথু মানে।

সবই মেনে নেয়, কিন্তু করেও না কিছুই। কোনোদিনও করেনি বলে, এখন পারেও না। গাড়ির টায়ার বদলাতে, গভীর জঙ্গলের রাস্তায়, যে সময়টুকু নষ্ট হয়, সেই সময়টুকুতে গাড়ির সামনে, অথবা পেছনে বেশ অনেকখানি হেঁটে নেওয়া যায় একা একা সুগন্ধি নির্জনতায়। ফ্যান বেল্ট বা টায়ার বদলানোর মধ্যে নেই পৃথু। ও "অদ্ভুত বাজে লোক"।

বাগচী সাহেব বললেন, কি খবর মশাই? যাচ্ছেন না আসছেন?

যাওয়া মানেই ত' আসা। আসা মানেই যাওয়া। কথাটা ও বলল না। কিন্তু মনে পড়ে গেল। বিজলী বলেছিল। কোথায় গেল বিজলী? চলে গেছে ফিরে। জবলপুরে? কে জানে? কত মানুষের সঙ্গেই দেখা হয় পথে যেতে আসতে, কত্বরকমের মানুষ। ক'জনের সঙ্গে আর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, থাকে?

মুখে বলল, মালাঞ্জখণ্ড থেকে আসছি। ফিরে যাব হাটচান্দ্রাতে।

ব্যাস্, এতটুকুই বাংলায় হল কথা। কারণ পারিহার সাহেব, প্রসাদ সাহেব বা লাওলেকার সাহেব, বাংলা কেউই বোঝেন না।

ইংল্যাণ্ড-এর রাণীর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ্ নাকি ঘুরে গেলেন কানহা ন্যাশনাল পার্ক-এ অল্প ক'দিন আগেই।

প্রসাদ সাহেব বললেন।

তারিখটা শুনে পৃথু, বুঝতে পারল যে যেদিন দিগা পাঁড়ের কুঁড়ের সামনে ঢোল্-এ তাড়া-খাওয়া

বাবাশিঙাকে শামীম্ মাবল, তার দু-তিনদিন পরে বোধহয় প্রিন্স ফিলিপ এসেছিলেন মুক্কিতে। এবং পারিহার সাহেবের মুক্কিতে আসার কথাটা পুন্নোয়া গাঁ-এর লাল্লু যা বলেছিল, তা সত্যিই।

পৃথু দেখল ওঁরা সকলেই পোচিং সম্বন্ধেই আলোচনা করছেন। কে বা কারা নাকি গতকালই ভাইসেন ঘাট ব্লকে একটা বাইসন মেবে দিয়েছে।

পাবিহার সাহেব রেগে বলছিলেন, এবার ফরেস্ট মিনিস্টারের কাছে আমি অটোমেটিক ওয়েপন চাইব—জে জে দত্ত সাহেবকে ফোন করছি কালই ভোপালে। কী অন্যায়।

পৃথু চুপ করেছিল। পৃথুর কি? পৃথু ত' আর সেদিন মারেনি বারাশিঙাটা। মারতে বলেওনি। পৃথু ত' দশ বছরের উপর শিকাব একেবারে ছেড়েই দিয়েছে তবুও, পৃথুর কেমন যেন চোর-চোর লাগছিল নিজেকে।

এমন সময় লজ্ এর বিসেপ্শান্ থেকে একটি ছেলে এসে বলল পারিহার সাহেবকে, স্যার, দেবী সিং, সানজানা সাহেবেব লোক, দেখা কবতে এসেছে।

ও হ্যাঁ। ডেকে পাঠিয়েছিলাম আমি। পারিহার সাহেব বললেন।

সানজানা সাহেব বেস্পেক্টেবল্ লোক। আদিবাসীদেব জন্যে অনেক কিছু করেছেন, হাইলী কানেকটেড্ মানুষ। বযসও হয়েছে অনেক। ওঁব কথাই আসছে না এসবের মধ্যে। কিন্তু কি বলে দেবী সিং? শোনা যাবে।

ভাবল পৃথু।

ডাকো তাকে।

পারিহাব সাহেব বললেন।

দেবী সিং এব নাম শুনেই অবশ্য পৃথুর পিলে চম্‌কে গেছিল। ভেবেছিল, একটু জমিয়ে লাঞ্চটা খাবে বীয়ার সহযোগে। কী বিপত্তি!

রোদ এসে পড়েছে টেবলটাতে, কাঁচের স্বচ্ছ দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে। বাংলোর পা ছুঁযেই বযে-যাওয়া বানজার নদী দেখা যাচ্ছে। ঝরঝরানি শব্দটা কাঁচে বাধা পাওয়াতে, কম শোনাচ্ছে। এরই মধ্যে এই সব ঝামেলা! সুন্দর সময়ে যত অসুন্দর ব্যাপাব। ভাল লাগে না পৃথুব!

ও তাড়াতাড়ি মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল।

অর্ডাব দিল, মাটন-বিরিযানী, চিকেন-দোঁ পেয়াজা, স্যালাড উইথ্ টার্টার সস, রায়তা। এবং তার আগে বীয়াব। গোটা তিনেক খাবে কমসে কম। তারপর পান দো-চার, কম্‌সে কম্। প্রসাদ সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে। তারপর জেলুসেল্ এম্-পি-এস। আট ইয়া দশ। কম সে কম্। ও সত্যিই খেতে ভালবাসে! মনোমত খাওয়ার পেলে ত' কথাই নেই। রুষা বলে, "বিনি পযসাতে পেলে তুমি বোধহয় দাদের মলমও খেতে।" হয়ত। খেত।

দেবী সিং কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার আগেই প্রসাদ সাহেব পৃথুর কাছে উঠে এসে বললেন, "লীজিয়ে, দেওতা!"

বলেই, পৃথুর সামনে হাত জোড করে মঘাই পান নিয়ে পেশ করলেন, বড়ী খশ্- তমিজীর সঙ্গে।

সাদা আর কালো ডোরা-কাটা একটা মারাত্মক শার্ট পরেছেন প্রসাদ সাহেব। পৃথু পান নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে, জামাটার দিকে চেয়ে তারিফ করে বলল, "আর রে প্রসাদ সাহাব! ঈ ক্যা বারিক ঔর রেহ্‌ত্তব চিজ্। মালুম হোতা জৈসে কি সিতারোঁসে রওশনিকি টুক্‌রিয়োঁ কুদ পড় রহি হ্যাঁয়।"

এঃ প্রসাদ সাহেবও কিন্তু সন্ত তুলসীদাসের বড় ভক্ত। রামচরিতমানস এঁরও মুখস্থ। সবসময় দোঁহা আওড়াচ্ছেন। এমন পরিবেশে, এমন ম্যানেজার পাঠানো উচিত হয়নি আই-টি-ডি-সির। যে-কোনো মুহূর্তে প্রসাদ সাহেবও দিগার মতো সন্ত বনে জঙ্গলে চলে যেতে পারেন। তুলসীদাস আওড়াবেন আব খাবেন মাধুকরী করে। মধ্যপ্রদেশের এই সাতপুরা হিলস্ এর জঙ্গল-পাহাড়ও ভারী খতরনাগ। চম্বলে লোকে বাগী হয়ে যায়, এখানে সন্ত হয়ে যায়। দুই-ই সমান। সমাজকে ছেড়ে যাওয়া ত'!

প্রসাদ সাহাব, লাওলেকার সাহাব, বাগচী সাহাব, পারিহার সাহাব সকলেই বহত্ খুব! বহত্ খুব

বলে উঠলেন।

প্রসাদ সাহাব বললেন, ইয়ে বঙ্গালী প্যায়েরভিমে ত' বানারসওয়ালোঁকো ভি বুড়া হালত্ সে...... ..

সেলাম হুজৌর !

দেবী সিং এসে দাঁড়াল।

কেয়া ? তুম্ কুছ্ জানতে হো ইস্ বারেমে ?

পারিহার সাহাব বললেন।

নেহী হুজৌর ! ম্যায় কুচ্ছো নেহী জানতা হ্যায়।

লাল্লু নামের কাউকে জানো, পুন্নোযা বস্তীর ?

নহি হুজৌর !

ঠুঠা বাইগা বলে কাউকে জানো ? দিগা পাঁড়ে ? হাটচান্দ্রার মহম্মদ শামীম ? পাগলা-ঘোষষা ?

দেবী সিং একবার পৃথুর দিকে চাইল। তাবপব চোখ আব গোঁফ একই সঙ্গে নামিয়ে নিল।

বলল, হ্যাঁ। আমি শুধু ঠুঠা বাইগাকে চিনি।

কে সে ? থাকে কোথায় ?

থাকে হাটচান্দ্রায়। সাহেব-ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। খুব ভাল শিকারি ছিল একসময়। আমরা একসঙ্গেই শিকাব কবেছি। কিন্তু আজকাল আমারই মতো শিকার-টিকার ত' ছেড়ে দিয়েছে !

ঠুঠা বাইগা ছাড়া, অন্য যাদের নাম বললাম, তাদের একজনকেও চেনো না ? ঘোষষা কোন জাত ? এমন পদবী ত' শুনিনি কখনও ?

প্রসাদ সাহেব এ অঞ্চলে নতুন। এব আগে একজন সর্দারজী ম্যানেজার ছিলেন। বললেন, পানকা হবে কি ? কবীরপন্থী ?

পারিহার সাহেব বললেন, তাহলে তুমি পাগলা ঘোষ্ষা, শামীম মিঞা, ভুচু বাবু, দিগা পাঁড়ে··· ?

না হুজৌর !

বাগচী সাহেব বললেন, মিঃ ঘোষ, আপনি হয়ত পারিহার সাহেবকে এ ব্যাপারে হেল্প্ কবতে পাবেন। হাটচান্দ্রার লোক আছে বোধহয় কিছু।

আমি ? আমি, মানে···।

পৃথু ঘাবড়ে. গিযে তুত্লে বলল।

বীয়াবটা কি ফ্ল্যাট হয়ে গেছে ? এক ফোঁটাও কিক্ নেই। যাচ্ছেতাই।

কাশল পৃথু একটু। কাশতে কাশতেই বলল, কাম্, লেটস ওল্ হ্যাভ্ সাম্ বীয়র। উ্য লুক টু বী স্ক্রুড্-আপ মিঃ পাবিহাব। বেয়ারা। বীয়ার লাও আউর।

পকেটে ডাইনার্স্ ক্লাবের কার্ড আছে কোম্পানীর। কোনোই চিন্তা নেই।

কি মিস্টার ঘোষ ?

নামগুলো লিখে দিন প্লিজ কাগজে। যদিও আমি এখন ছুটিতে আছি, রেসিডেন্ট ডিরেক্টর উধাম্ সিংকে নিশ্চয়ই বলব। আপনি একটা ওফিসিয়াল্ চিঠিও না হয় লিখে দেবেন আমাকে, এই যে কার্ড, তার বেসিস্ এ আমি আমাদের লোক লাগিয়ে পাত্তা করব। তবে ঘোষ্ষা না কী একটা বললেন যেন নাম ?

পাগলা রোষ্ষা।

লাওলেকর সাহেব বললেন, গ্লাসভর্তি ফ্রথ্-এ চুমুক দিতে দিতে।

পারিহার সাহেব বললেন, রোষ্ষা নয় ঘোষ্ষা।

বাগ্চী সাহেব বললেন, আমি ট্যুওরিজম্ এর লোক, দিস্ বীয়র ইজ অন মী। ইন্ ফ্যাক্ট এসব এন্টারটেইনমেন্ট টু দ্যা রাইট্ টাইপ অফ পিপল্ ত' তোমার, আই মীন, আই-টি-ডি-সিরই করা উচিত, তোমার লজ্ই ফায়দা উঠোচ্ছে, উঠোবে বেশি করে, আমার গভর্নমেন্টের চেয়ে, কি বল প্রসাদ ?

প্রসাদ সাহেবের কিছুতেই 'না' নেই। উনি একটা টীপিক্যাল বানারসী ভঙ্গী করলেন। 'হ্যাঁ'ও হয়,

'না'ও হয়। কথা দিয়ে চিঁড়ে ভিজোতে বেনারাস এলাহাবাদের লোকের মতো আর কেউই পারে না। অবশ্য প্রসাদ সাহেব একসেপশান্। রিয়্যাল বিনয়ীর মতো হাত জোড় করে সবসময় স্মিতমুখে "ইয়েস" করেই আছেন।

লাওলেকার সাহেব পাগলা রোষাকে কারেক্ট করে বললেন, পাগলা-ঘোষ্‌ষা।

ইয়স্।

পৃথু বলল। পাগলা ঘোষ্‌ষা।

আমি নিশ্চয়ই দেখব। আই মীন খুঁজব। কে সে!

তারপর বলল, একদিন আসা হোক।

কোথায়? আপনার বাড়িতে? তা ডিনারের নেমন্তন্ন করলেই যাই। মিসেস ঘোষকে বলবেন। উনি ত ভোপালে আসছেন নেক্সট মার্চ-এ। সেমিনার অ্যাটেণ্ড করতে। রবীন্দ্র ভবনে বিরাট সেমিনার। যাই বলুন, দারুণ মহিলা আপনার স্ত্রী। ভেরী লাকী লোক। কত গুণ! এবার বলুন কবে নেমন্তন্ন? এতদূরের রাস্তা, জীপে করে যাব ঠাণ্ডাতে, সাহেব-কম্পানীর বড়সাহেবের বাড়ি! কি বলেন?

পারিহার সাহেব বললেন, নিশ্চয়ই! ভাল খাদ্য পানীয় না হলে চলবে কি করে?

নো-প্রবলেম। তবে বাড়িতে নানা অসুবিধে লেগেই থাকে। উ্য আর ওলওয়েজ ওয়েলকাম টু দা ক্লাব, টু দ্যা গেস্টহাউস। ইটস্ ইয়োরস্। এনি-টাইম্ ইজ ইওর-টাইম।

লাওলেকার সাহেব বললেন, আমি একটা কথা লক্ষ্য করেছি মিঃ ঘোষ। যাদেরই সুন্দরী স্ত্রী থাকেন, তাঁরাই বাড়িতে কাউকেই নিয়ে যেতে চান না।

পৃথু হাসল।

আর কেউই হাসলেন না।

ওর একার হাসিটা রামছাগলের হাসির মতোই শোনাল ওর নিজের কানে।

মনে মনে বলল, কাউকে আসতে না বলতেই ত' শুয়োর, ইঁদুর, কাক, চিল কত কিছু এমনিতেই আসে। আপনাদের মতো ভদ্রলোকদের খামোখা বাড়িতে ডেকে অপমানিত করা কেন? কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। লাওলেকার সাহেব ত' মারাঠী! মারাঠীই কি? "যাদের নামের শেষে 'কার' তারা মারাঠী আর যাদের নামের শেষে 'আনি-দোয়ানি' তারা সবাই সিন্ধী!" পৃথুকে তার আটবছর বয়সে বম্বে থেকে বেড়াতে-আসা একটি বাঙালী ছেলে বলেছিল। লাওলেকার সাহেবকে জিগ্যেস করলে হয় ইদুকারকে চেনেন কী না। পৃথু ভাবে। তারপর ভাবল, থাক। কোন্ 'কারের' সঙ্গে কোন্ 'কারের' কি সম্পর্ক না জানা থাকলে আকার প্রত্যয়ে ঝামেলা বাধতে পারে। কি দরকার? বাঘেদের ডেরাতে বসে ইঁদুরের মতো একটি সামান্য প্রাণীকে নিয়ে আলোচনার?

বাগ্‌চী সাহেব কথা কম বলেন। রাশভারী। বরেন্দ্রভূমের মানুষ। কোনোদিনও যে ওঁর সঙ্গে ভাল করে জমিয়ে আড্ডা দেবে পৃথু তেমন সুযোগ হয়নি। এখানে-ওখানে যেতে-আসতে দেখা হয় নানা জায়গায়। ভোপাল, ইন্দোর, জবলপুর, এটসেট্রা, এটসেট্রা। পৃথুর বাবার রেফারেন্সেই চেনেন বেশি উনি ওকে, তার নিজের পরিচয়ের চেয়ে। পৃথুর নিজের কিছুই নেই। এমনকি, পরিচয়টুকু পর্যন্ত নয়।

মালাঞ্জখণ্ড-এ কেন গেছিলেন?

আরে উধাম্ সিং এর পাগলামি। একটি ইয়াং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছেলে, জয়েন করেছে কলকাতা থেকে এসে। একেবারেই বাচ্চা, ভাল করে গোঁফও ওঠেনি মনে হল।

তার সঙ্গে উধাম সিং-এর এক বাঙালী বন্ধুর মেয়ের সম্বন্ধ করার জন্যে গেছিলাম। পাগলের কাণ্ড। ছুটিতে রয়েছি। তবু। হাত ধরে বলল, ব্রাদার। এই ব্রাদারলি-কাজটা তুমি ছাড়া আর কাউকেই দিতে পারি না।

কেন, পাগলের হল কেন? আপনার বিয়েও ত' নিশ্চয়ই কোনো পাগলেই দিয়েছে? মশাই, পাগলে বিয়ে না দিলে বিয়ে হয় না। পাগল না-হলে কেউ বিয়েও করে না। হাটচান্দ্রায় গিয়ে খোঁজ

করে দেখুন গিয়ে, দেখবেন ঐ পাগলা-রোষ্‌ষাও নিশ্চয়ই বিবাহিত।

লাওলেকার সাহেব বললেন।

পারিহার সাহেব আবার কারেক্ট্‌ কবলেন। পাগলা-ঘোষষা!

বাগ্‌চী সাহেব বীয়ার মাগ্‌ এ চুমুক দিয়ে বললেন, তা সম্বন্ধের কি হল? হল?

মাথা খারাপ! পৃথু বলল।

গিয়ে দেখি, সে পাত্র বাড়িতেই আছে। বাঙালীর ছেলে। একেবাবে খাস কলকাতাব। মালাঞ্জখণ্ড-এ এসে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। আড্ডা নেই, বন্ধুরা নেই, কী গবম! কী শীত! এখানে ভদ্রলোকে থাকে। চাকরী ছেড়েই দেবে বলছে।

পাত্রর বাঙালীত্বর কোয়ালিটি সম্বন্ধে অন্তত কোনো সন্দেহই রইল না তাহলে। বাগ্‌চী সাহেব বললেন।

তা ঠিক। পৃথু বলল।

বিয়ে? বলুন, বিয়ের কি হল? আপনি মূল ইস্যু থেকে সরে যাচ্ছেন মিঃ ঘোষ।

পারিহার সাহেব বললেন।

ইয়েস। বিয়ে। বিয়ে, সে কাকে কববে, তা নাকি বি,এ, পাশ করার আগেই ঠিক করে বেখেছিল। বি,এ, পাশ করেছে, সি-এ পাশ করেছে সবে, একটু সিনেমা-টিনেমা দেখা, আর্ট-ফিল্ম, বইমেলা, ফার্নিচারের আর ফারনিশিং এর জন্যে পার্ক স্ট্রীট রাসেল স্ট্রীটের অক্‌শান্‌ হাউস ঘুরে ঘুরে দেখা হচ্ছিল, পাখিব নীড়ের, পাখির ডিমের যোগাড়-যন্ত্র। ইতিমধ্যে মালাঞ্জখণ্ড্‌। হোয়াট্‌ আ ট্র্যাজেডি।

ভাবা যায় না। লাওলেকার সাহেব বললেন। ট্র্যাজেডী কি মশায়। আমার নিজের ব্যাপার হলে বলতাম ক্যালামিটি! অফ্‌ দ্যা হায়েস্ট অর্ডার!

পাত্রকে, তাহলে দেখলেনটা কি? বিছানায় উপুড় হয়ে বসে ফিঁয়াসেকে চিঠি লিখছে নীল প্যাডের কাগজে?

দ্যাটস্‌ রাইট্‌। ঠিকই তাই। উ্যা আব অ্যাবসলুটলি রাইট্‌!

প্রসাদ সাহেব বললেন, মগর, গোস্‌সা মত্‌ হইয়ে ঘোষ সাহাব! আজকালকা বাঙালীলোগ ঘরকা বাহারই জানে নেহী মাংতা হ্যায়, ঔর দেখিয়ে ত পুরানা জামানামে উহ্‌নি লোঁগোনে ত' তামাম ইণ্ডিয়া ছেঁক্‌ লিয়ে থেঁ। হ্যায় কী না? ক্যা?

বেয়ারা! ঔর্‌ বীয়ার।

আপনি মূল প্রশ্ন থেকে সরে এলেন ঘোষ সাহেব। ডোন্ট ইন্টারাপ্ট প্রসাদ!

ইয়েস্‌। বলছি।

বীয়ারে একটা বড় চুমুক দিয়ে পৃথু বলল।

ইয়েস্‌। মূল প্রশ্ন। রাইট উ্যা আর!

সারাটা জীবনই মূল প্রশ্ন থেকে বারে বারেই সরে আসছে পৃথু।

ক্রমাগত।

পৃথুর|মতো|অনেকেই আছে। পৃথুর চারপাশে অদৃশ্য ভীড়ের অস্তিত্ব অনুভব করে ও। ও জানে, অনেকেই আছে যারা ওরই মতো সমস্ত মূল প্রশ্নকে ভয় পায়।

একটা সময়, বোধহয় সকলের জীবনেই আসে; শামুকের মতো ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে এলেও আসে; যখন মূল প্রশ্নটাকে তেলাপোকার, মতো গোঁফ ধরে টেনে তুলে, মাটিতে ফেলে, সামান্য একটু দৌড়তে অনুমতি দিয়েই, ইন্‌করিজিবল্‌ ডাকাতদের বা অনভিপ্রেত সাক্ষীদের যেমন করে শেখানো হয়, শোধরানো, তেমন গদ্দাম্‌। গদ্দাম!

না, না গুলি নয়।

চটির চাঁটি। থেঁৎলে দিতে হয়। চটি দিয়ে বারে বারে। রাইফেলের গুলিতে শুধুই মৃত্যু থাকে, চটির আঘাতে ঘৃণামিশ্রিত মৃত্যু।

কিন্তু কোথায় যেন পড়েছিল পৃথু, তেলাপোকা, মানুষের বিবেক এবং কচুরিপানা কখনও নাকি মরে না। শুধু ডরম্যান্ট থাকে ; আবার জেগে উঠবে বলে।

ওয়েল্। ক্যাড বী।

বেয়ারা, বীয়র!



শামীম্ আর ভুচুকে বলতেই হয়েছিল, মুক্কিতে লাঁওলেকর সাহেব এবং পারিহার সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। হাটচান্দ্রাতে ফিরে গিয়ে।

পৃথু বলেছিল, ইন্দ্রিয়সুখ ত' অনেকদিনই হুল। রসনা ছাড়াও ত' অনেকই ইন্দ্রিয় আছে। এবং সেই সব ইন্দ্রিয়র ভজন-পূজনও ত' ভাল মতোই হচ্ছে। এবার রসনাটাকে বাদ দাও। শম্বরের মাংসের আঁচার, শজারুর গা-মাখা গা-মাখা তরকারী, ডুমোডুমো করে কাটা আলু দিয়ে চিংকারার ডানদিকেব বুকের বেজালা. চিতলের পেটের তেল, চিতলমাছের পেটিরই মতো; খরগোশের মাটি-গন্ধ বাটি-চচ্চরি, বড়া-তিতিরের বটি-কাবাব, গুলিস্তাঁর বটেরের গুল্হার কাবাব, ভাল্লুকের কবুরা, ময়ূরের কালিয়া, কৃষ্ণসারের চাঁব। অনেকেই হয়েছে। 'ক্ষেমা দাও' এবারে।

বলেছিল যদিও, তবু মনে মনে জানত যে,শিকারিরা শুধু মাংস খাবার জন্যেই শিকার করে না।'

সেই মিটিং-এ মহম্মদ সাবীরও ছিল। মিটিং বসেছিল রাত মোহানাতে।

সাবীর মিঞা প্রচণ্ড রাম্-বিরোধী। যেমনই, দিগা রাম-ভক্ত। সাবীর মিঞার বদ্ধমূল ধারণা যে, শিকারে বা জঙ্গলে বা যে-কোনো শুভ যাত্রাতেই হৃদয়ের নয়, বোতলের রাম্ আর আণ্ডা এবং রাম-ভক্ত হনুমানের প্রিয় খাদ্য কলা নিয়ে গেলেই ঘোরতর বিপত্তি ঘটবে। ঘটবেই ঘটবে।

এবং আশ্চর্য ঘটেও! পৃথু দেখেছে। বিলক্ষণই ঘটে।

ভুচুও সেই মিটিংএ উপস্থিত ছিল। কারণ, তার নামও নিশ্চয়ই বনবিভাগের নেক্-নজরে আছে।

টাইগার প্রজেক্ট এর অফিসারেরা ন্যায্য কারণে গর্বিত যে, কান্হা-কোর্ এরীয়ার মধ্যে পোচিং একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁরা। জে, জে, দত্ত সাহেবই বলতে গেলে মধ্যপ্রদেশের একাধিক পার্ক-এর জনক। আরও নাম করতে হয় মিস্টার এইচ, এস, পাওয়ার-এর। নামের বানান পানওয়ার। উচ্চারণে 'ন' উহ্য থাকে। পাওয়ার সাহেবও খুবই ডেডিকেটেড অফিসার ছিলেন। কান্হা ন্যাশনাল পার্ক-এর পেছনে বড় ভূমিকা ছিল পাওয়ার সাহেবের। পৃথু আর ক'জনেরই বা নাম জানে? ও থাকে সীড্ল্যাক, স্টিক্-ল্যাক, বাটন্ ল্যাক্, গার্নেট ল্যাক্ এসব নিয়ে। ওর জগৎ অন্য জগৎ। তবে পাওয়ার সাহেবের নাম সে বিভিন্ন ফরেস্ট অফিসারদের কাছে শুনেছে বিভিন্ন জায়গায় "ব্রাণ্ডেরী বারাশিঙা" বাড়াতে তাঁর প্রচণ্ড পরিশ্রমের কথাও। উনিশশ সত্তর সনে নাকি ব্রাণ্ডেরী বারাশিঙার. সংখ্যা কমে ছেষট্টিতে দাঁড়িয়েছিল। আর একাশিতে চারশ একান্ন হয়েছিল বেড়ে তাদের সংখ্যা।

ভুচু, সাবীর মিঞার আপত্তি সত্ত্বেও, রাতমোহানার পাথরের উপরে বসে রাম্ খাচ্ছিল। ভুচু যখন সাহস করে খাচ্ছিলই, তখন ভীতু পৃথুকেও একটু প্রণামী দিয়েছিল।

এই ভুচু ছেলেটার চরিত্রর মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যে, বাধা, যে-কোনো বাধাই ওকে

হাঁকোয়া-করা বাঘের মতোই ক্রুদ্ধ করে তোলে। ও তখন করতে না-পারে, এমন কিছুই নেই। এ কারণে ওর জন্যে চিন্তা হয়, ওকে একরকমের ভয়ও করে পৃথু। শামীম্ আর সাবীরের বোধহয় পারিহার সাহেবের নামেতেই নেশা হয়ে গেছিল। লাওলেকর সাহেবের নামেতে ত' হবেই।

দত্ত সাহেব, পাওয়ার সাহেব এবং বনবিভাগের আরও অনেক বড় সাহেবের কীর্তিকলাপ্ ও শুভ প্রচেষ্টার কথা বলে তার উপর কোনোরকম প্রভাবই বিস্তার করতে পারল না পৃথু। আজকের ভারতবর্ষে, কন্সারভেশানের প্রয়োজন কতটা এবং বন এবং সবরকম বন্য প্রাণীই বাঁচানো যে কতখানি জরুরী সে কথাও অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু এরা সবাই এদের নিজেদের নেশাতেই চলে। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এদের জগৎ শুধু নিজেদেরই নিয়ে। এবং ছোট্ট সে জীবনের গণ্ডী। দেশের বা দশ-এর হিতার্থে এত সব কথা শোনা এবং বোঝার মতো সময় ও ধৈর্য ওদের নেই। হয়ত, অনেকেরই মতো; মানসিকতাও নেই।

বরং, ব্রাণ্ডেরী-বারাশিঙার বংশবৃদ্ধির হিসেব শুনে ভুচু বলল, ঐকিক নিয়ম মনে আছে ত'? উনিশশ সত্তরে যদি ছেষট্টিটি থেকে থাকে এবং উনিশশ একাশিতে যদি চারশ একান্নটি হয়ে থাকে তাহলে অ্যাভারেজে পার ইয়ারে ক'টা করে বেড়েছে?

বলেই, ভুচু বালির উপরে নদীতে ভেসে-আসা শুকনো ডাল ভেঙে অঙ্কটা করে ফেলল। বলল, হ্যাঁ। থার্টি-ফাইভ্। বছরে, গড়ে, পঁয়ত্রিশটা। এই রেটে এইট্টি ফোরে হবে পাঁচশ ছাপ্পান্নটা। মাইনাস, ওয়ান্, ক্রুয়েলী শট্ বাই শামীম মিঞা দ্যাট নাইট। হাতে রইল, তাহলে, পাঁচশ পঞ্চান্নটা। অনেকই ত'।

তারপর রাম্এ চুমুক দিয়ে বলল, পামেলার বাবার অফিসের বস্ আফ্রিকাতে গেছিলেন। তিনি বলছিলেন, ইস্ট-আফ্রিকার গোরোংগোরো ক্রাটারের উপরে ফরেস্ট লজ্এব ডাইনিং রুমে, তাঁকে নাকি ওয়াইল্ড বীস্ট্ এর স্টেক্ খাইয়েছিল। বীফ্-স্টেক্এর মতো। শিকার করেছিলেন গেম-ওয়ার্ডেন্। নিজে। এই-ই ত' সেভেনটি-নাইনের কথা। আর এখানে?

পৃথু বলল, ওখানে ওয়াইল্ড-বীস্ট এর স্টেক্ খেয়ে এসেছিলেন উনি বোনা-ফিডে ট্যুওরিস্ট্ হিসেবে। আর এখানে তোমার স্টেক্টা হচ্ছে দশ বছর জেল অথবা..........

ভুচু বলল, ওয়াইল্ড-বীস্ট্ এর স্টেক না খেয়ে আমি গেম-ওয়ার্ডেনের স্টেক খাবো।

এত সব ইংরিজী-টিংরীজি শামীম আর সাবীর মিঞার বোধহয় ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। সাবীর মিঞা কোনো ব্যাপারেই কখনও উত্তেজিত হয়নি জীবনে। পারিহার সাহেবের ব্যাপারটি একটি চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, কারণ বারাশিঙাটাকে শামীম আদৌ মারত না; যদি-না সাবীর মিঞার তেরো-নম্বর ছেলের ছুন্নৎ-এর খাওয়া-দাওয়াটা না থাকত সেদিন। এবং ছুন্নৎটা আদৌ হতো না, যদি-না তাঁর তেরো-নম্বর ছেলেটা হত। "ব্রাণ্ডেরী বারাশিঙা" বছরে মাত্র পঁয়ত্রিশটা করে বেড়েছে কান্হাতে, সে তুলনায় হাজী মহম্মদ সাবীর মিঞার পরিবার কতটুকুই বা বেড়েছে? বিয়ে হয়েছিল আঠারো বছরে! যদি বয়স আটান্ন হয়, বিবির সংখ্যা দুই, ছেলেমেয়ের সংখ্যা তেরো। মেইন স্প্রিং এখনও ফারস্ট্-ক্লাস কাজ করছে। অ্যাভারেজ-আউট করলে অঙ্কটা এই রকম দাঁড়াবে। একর্ডিং টু ভুচু—(বয়স) ৫৮-(বিয়ের বয়স) ১৮=৪০÷২ (বিবির সংখ্যা)=২০÷১৩=১·৫৩৮৪৬! ফুঃ।

ভুচু খুব সিরিয়াস মুখ করে বলল, ডিমোক্রিসী ঝুগ্ ঝুগ্ জিও। ফ্যামিলি প্ল্যানিং করবার বেলায়, সাবীর মিঞা সাহেব কেবলই আমরা; আর পপুলেশান এক্সপ্লোশান করার বেলায় তোমরা। ডিমোক্র্যাটিক রাইট! কেস কিচাইন্। তা এতই ডিমোক্রিসীতে বিশ্বাস ত' জিয়াসাহেবকে একটু জিয়া-ভরলি উপদেশ দিয়ে, ভাইবিরাদরদের বলে সেখানেও ডিমোক্র্যাসীটা লাগু করে দাও না হাজী সাহেব, ইমার্জেন্সীটাকে লুঙির মতো লিফ্ট করে?

সাবীর মিঞা হাসে। ভুচুও হাসে। ঠুঠা কিছু না বুঝেই হাসে। পৃথু ত সবসময়েই হাসে। বোকারা চিরদিনই বেশি হাসে। হাসে না শুধু শামীম।

ভুচু যখন এসব কথা বলে, প্রায়ই বলে, ভুচুর ধারণা, একই দেশে, একই আইন, একইভাবে

প্রযোজ্য হওয়া উচিত সকলের প্রতি। সকলেরই নিজের থেকে তা মেনে নেওয়া উচিত। নইলে সেকুলার স্টেট একটা ফাল্তু বুলি। কিছু ব্যাপারে কম্যুনাল, আর কিছু ব্যাপারে সেকুলার তা ত' চলতে পারে না! ভুচু যখন এসব বলে, তখন শামীম চুপ করে, অদ্ভুত একটা মুখ করে ভুচুর দিকে চেয়ে বসে থাকে। ঐ বুনো কুকুরে চোখ-খুব্লানো বারাশিঙাটাকে সেদিন যখন মেরেছিল তখন ওর মুখে যেমন এক নিষ্ঠুর হিমেল ভাব ফুটে উঠেছিল, এখনকার মুখের ভাবটাও অনেকটা তেমনই।

ব্যাপারটা পৃথুর ভাল লাগে না। সাবীর মিঞা বলে, আরে, দোস্তীতে সবরকম আলোচনাই হয়। দোস্ত্, দোস্ত্-এর সঙ্গে মজাক্ উড়াহ্বে না ত' দুশ্মন উড়াহ্বে?

কিন্তু শামীম একেবারেই চুপ করে থাকে।

ভুচুটাও অদ্ভুত ছেলে। অদ্ভুত জেদী। ও যা বিশ্বাস করে, তা ও বলবেই। সে ভালই হোক কী মন্দই হোক, প্রিয়ই হোক কী অপ্রিয়ই হোক। ও ওর এই নির্বুদ্ধি স্বভাবের জন্যে খুবই বিপদে পড়বে একদিন। প্রায়ই পড়েও। কিন্তু কিছুকেই গ্রাহ্য করা ওর স্বভাবে নেই। জীবনে শিশুকাল থেকে ও আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছে, পৃথুর মতো নয়ও। বিপদ, .কোনোরকম বিপদের ভয়ই ও করে না।

ঠুঠাকেও একটু রাম্ দিয়েছিল ভুচু। ঠুঠা চুপচাপ কথা শুনছিল। চুট্টা খেতে খেতে।

ও হঠাৎ বলল, আমাদের ত' যা হবার হবেই। কিন্তু পারিহার সাহেব বা তাঁর কোনো ডেপুটি হাটচান্দ্রাতে এন্‌কোয়ারিতে এলে পাগলা ঘোষধার কি হবে? পিরথু বাবার?

সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠল ওব কথা শুনে। .পৃথুও।

শামীম্ তবুও হাসলো না।

শামীম বলল, লাল্লুকে কি শেখানো দরকাব?

ডেকে ধম্কাতে হবে। ঠুঠা বলল।

স্রিফ ধমকাতে? বেইমান্। নিমহারাম। আমি ওর জিভ কেটে নেব।

সাবীর মিঞা বলল, ও নিজের মুনাফাব জন্যেই নিশ্চযই বলেছে, কিন্তু বেইমানি কবার জন্যে বলেছে, না মাবেব চোটেই বলে ফেলেছে সে সব সম্বন্ধে খববাখবর করো আগে। কিছু না জেনেই, ".শিখ্লাতে হবে" বলে লুঙি তুলে দৌড়োবার দরকারটাই বা কি?

দিগার কি খবর? দিগাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করেনি ত' ফরেস্ট গার্ডরা? ওর কাছ থেকেই হয়ত খবর পেয়েছে।

ভুচু বলল।

হতে পারে। ঠুঠা বলল। ও যা সত্যবাদী। মানে, আমাদের দিগা। আমাদের জন্যে মিথ্যে বলে নরকবাসের বন্দোবস্ত করবে কোন সাধু। এই শামীমটাই যত নষ্টের গোড়া। বললাম, চল নুনীতে যাই। তা না!

পৃথু বলল, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। শামীম ভাই। তুমি তাহলে কালই সকালে একবার চলে যাও তোমার মোটর সাইকেলটা নিয়ে, দিগার খোঁজ করে এসো। সত্যিই ত'। আমাদের অনেক আগেই ও বেচারার খোঁজ করা উচিত ছিল।

শামীম একটা পাতলা লম্বা ভোঁর ঘাস কাটছিল দাঁতে। ওর এই-ই এক বদভ্যাস। যখনই চুপ করে থাকে, তখনই ঘাস কাটে দাঁতে। কথা বলার সময়ও ডান হাতে ধরে থাকে ঘাসটা। কথা শেষ করেই আবার মুখে পুরে দেয়।

ভুচু বলে, গত জন্মে ও বকরী ছিল। গত জন্মে কেবলই ঘাস খেয়েই গেছে পেট ভর্তি করে। এজন্মে তাই-ই জাবর কেটে তা হজম করার ধান্দা। অজীব্ আদমী।

কে যে বেশি অজীব আর কে যে কম সেইটাই প্রশ্ন। অজীব এখানে সকলেই।

পৃথু বলল, আমি এবার উঠব। আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে. মিলির আজ জন্মদিন।

রাত ত' অনেক হল। এতক্ষণে ওর বন্ধুরা চলে যাবে না? ভুচু বলল।

ওরা চলে যাওয়া অবধিই ত' অপেক্ষা করছিলাম।

সে কি ?

ভুচু অবাক হয়ে বলল।

আমি থাকলেই বরং ওরা বিব্রত হয়। মিলিও হয়। ওর বন্ধুরাও হয়। ওর বন্ধুরা ছোটবেলা থেকেই আমাকে ত' না-দেখেই অভ্যস্ত। আমার ছেলেমেয়ের কাছে রুষাই ত' সব। পড়াশুনা বলো, ওদের খেলাধুলো, জামাকাপড় বানানো,.ওদের গুড ম্যানার্স্, ওদের ব্রিলিয়ান্স্, ওদের ডায়েট, ওদের একসারসাইজ সবই ওদের মা। রুষা, ওদের মা এবং বাবাও। ওয়ান, ওন্‌লী এণ্ড টোটাল প্যারেন্ট।

বেশ বলেছ ত' কথাটা !

পৃথু বলল, তাই-ই। ওয়ান, বাট টোটাল পেরেন্ট !

তুমি তাহলে কি ? নন্-এগজিস্‌টেন্ট পেরেন্ট। তুমি কি হাপিস্ হয়ে গেছো ?

পৃথু হাসল। বলল, আমার কথা আর বোলো না। আমি একটা লজ্জা। আমি একটা কিছুই নই। আ গ্রেট শেম অন দ্যা ফ্যামিলি ! আ কন্‌সেপ্ট্ অফ নন্-এনটিটি ! তাড়াতাড়ি করছি, মিলিটা ঘুমিয়ে পড়ার আগে একটু চুমু দিয়ে দেব।

প্রেজেন্ট দেবে না ?

ভুচু শুধোল।

আমি ? আমি আবার কি দেব ? আমি কী-ই বা বুঝি ? তাছাড়া, আমার টেস্টও অতি বাজে। কী কিনতে, কী কিনব। পয়সার শ্রাদ্ধ। মা ও মেয়ে দুজনেই মুখ বিকৃত করবে। তাছাড়া টাকা পয়সা সব ত' দিয়ে দিই আগেই। আমার হাতে আলাদা কিছু থাকলেই-না কিনতে পারতাম !

তারপর বলল, ছাড়ো, আমার কথা ছাড়ো !

তুমি ও' বেশ লোক পৃথুদা। মিলির জন্মদিনে আমাকে নেমন্তন্ন করলে না !

পৃথু অভিনয় করল। বলল, ঈস্‌স্ একদম ভুলে গেছি।

সাবীর মিঞা, ঠুঠা শামীম্ ওদের কাউকে বলোনি ? কোনোবারই বলো না বুঝি ? আমি ত অবশ্য জানিই না। এ দলে আমিই ত নয়া-চিড়িয়া।

হ্যাঁ। বলি, আবার বলিও না.........মানে,....

কথাটা এড়িয়ে গেল পৃথু। নিজে অন্যায় করলে, দায়িত্বহীনতা ঘটলে, অনেকসময় অনেককেই মিথ্যে কথা বলতে হয়। এ-কাজটা অনেকে খুব ভালই পারে। একটুও চোখের পাতা কাঁপে না তাদের। মিথ্যাটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করে তারা। অনেকে আবার একটুও পারে না। চোখের পাতা কেঁপে যায়, ঠোঁট কাঁপে, গলা শুকিয়ে আসে। কিন্তু কথার সঙ্গে যখন নিজের কোনো অ্যাক্ট্ বা অমিশান জড়ানো থাকে না, অন্য কারো অ্যাক্ট্ বা অমিশানের জন্যেই যখন মিথ্যেটা বলতে হয়, পাছে খারাপ না-ভাবে সেই মানুষকে লোকে, তখন সত্যিই বড় অসহায় লাগে। অথচ নিজেব অপরাধের জন্যে নয়, অন্যের অপবাধ চাপা দেওয়ার জন্যে নিজেকে মিথ্যাচারিতার অপরাধে অপরাধী কবতে হয়।

ভুচুর গাড়িতে উঠল ঠুঠা আর পৃথু। সাবীর মিঞা গেল শামীম্-এর মোটর সাইকেলে। ভুচু গাড়িটা স্টার্ট করার আগেই পৃথু বলল, আমরা সবাই সাবীর মিঞার দোকানে যাচ্ছি কাল বিকেলে। শামীম, তুমি সকালে গিয়ে কিন্তু লাল্লুর খবরটা নিয়ে আসছ।

বিকেলে, ক'টায় ?

সাবীর মিঞা বলল।

এই চারটে-সাড়ে চারটেতে।

না, না। একটু দেরী করেই এসো। রাতের খাওয়াটা ওখানেই। কাল আমি নিজে বিরিয়ানি রাঁধব। অনেকদিন নিজে বাঁধি না।

বিরিয়ানি ! বাঃ উমদা ! উমদা !

না খেয়েই উমদা ?

বাঃ। বিরিয়ানি যে ! গন্ধ পাচ্ছি নাকে। পৃথু বলল।

পৃথুকে বাড়িতে নামিয়ে দেওয়ার সময় ভুচু হঠাৎ হিপ্-পকেটে হাত দিয়ে পার্সটা বের করে বলল, পৃথুদা এই টাকাটা মিলিকে দিও। আমার নাম করে।

না, না। এ কী! টাকা কেন? এত টাকা! তাছাড়া রুষা রাগ করবে।

বৌদিকে বলবার কি দরকার?

না, না। আরে, বৌদিই ত' ওদের সব। ছেলেমেয়েদের ভাল ত' কিছুই আমার দ্বারা হলো না, আমার জন্যে ওদের কিছুমাত্র ক্ষতি হোক, স্বভাব খারাপ হয়ে যাক আমারই প্রশ্রয়ে, তা আমি চাই না। ওরা খুব ভাল হয়েছে, পড়াশুনায়, খেলাধুলোয়, ব্যবহারে, সকলে ওদের খুব ভাল বলছে তা শুনেই খুব আনন্দ হয় রে আমার। তোর বৌদি, রুষা না, বুঝলি, দারুণই এফিসিয়েন্ট্ মেয়ে। খুব কম ছেলেমেয়েই এমন মা পায়। ওর কোনো তুলনা নেই।

যাই-ই হোক, টাকাটা তুমি নাও। লুকিয়ে দিতে হবে না। বৌদিকেই দিও।

ঠিক আছে!

চলি, পৃথুদা। ভুচু বলল।

আচ্ছা, পিবথু বাবু। বলল, ঠুঠা।

গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।



কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওদিকে পৃথু। ভুচু উপহার দিল, কিন্তু ভুচু ও ঠুঠাকে জোর করে নামিয়ে জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে কিছু খাইয়ে দেবে ওদের, এক টুকরো কেক ; একটু দই বড়া, তার উপায় বা সাহসও নেই ওর। ওর কোনো অধিকার, ওর কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছাই নেই আর অবশিষ্ট। এখানে একবকম পেয়িং-গেস্ট হিসেবেই ওর থাকা।

কী ভাবল ভুচু কে জানে? ঠুঠা ত ওকে জানেই। ঠুঠা সবই বোঝে। ভুচু হয়ত ভাবল, ছোটলোক! ভাবল, পৃথুকেই! খাওয়াতে ভয় পায় ঘোষ-পরিবারের পৃথু ঘোষ! ভাবল? ঈ'সস···।

রুষার গাড়িটা পোর্টিকোতে নেই। হয়ত কাউকে ছাড়তে গেছে। বাগান পেরিয়ে ঘরে ঢুকল পৃথু। নানারঙা বেলুন সাজানো হয়েছে। কেক কাটা হয়েছে। অনেকে যে এসেছিল, তার চিহ্নও বর্তমান। অর্ধভুক্ত খাবার-দাবার, কাগজের প্লেট, গ্লাস, এদিকে ওদিকে। সব কটি আলো জ্বলছে বাড়ির। ঝলমল্ করছে।

রুষা দেখতে পেয়েই বলল, এলেন এতক্ষণে মেয়ের বাবা! বার্থডে-চাইল্ডের বাবা। গ্রেট ফাদার। ইনডিড্।

পৃথু ভয়ে, কুঁকড়ে গেল। খুবই ক্লান্ত আর টেন্স্ এখন রুষা। "টাইগ্রেস ইন হিট'-এরই মতো হাইলি ডেঞ্জারাস্।

এই একশ টাকা দিয়েছে ভুচু। মিলিকে।

দাও দাও। আমার খরচ, বাজেট অনেক বেশি একসীড্ করে গেছে। বা বা! ক্রীম আর পীচ্-এর যা দাম আজকাল! কত লাগল জানো?

হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল রুষা।

পৃথু জানে না। জানতে চায়ও না। পৃথু শুধু একটু শান্তি চায়, একটু কম আলো, একটু নম্রতা ; একটু ভালবাসা একটু দরদ, আরও একটু কম শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, ব্যসস্। আর কিছুই ও চায় না।

তাঁরাও এসেছিলেন। তোমার পীরিতের লোকেরা ?

শ্লেষের গলায় বলল, রুষা

কারা ?

কুর্চি আর ভাঁটু।

ওদেরও বলেছিলে বুঝি !

আহা! ন্যাকা! যেন জানো না ?

তারপরই সুন্দর মুখটা বিকৃত করে বলল, অফিসের দীর্ঘ ছুটিটা বুঝি এই জন্যেই নেওয়া হল ? টু রিনিউ দ্যা ডিসজয়েন্টেড রিলেশান্। তাইই বল। আমি ভাবি, হঠাৎ এবকম ছুটি। জীবনে কোনোদিনও...আমার জন্যে, ছেলেমেয়েদের জন্যে...

পৃথু চুপ করেই থাকল।

তাদের পাঠাতেও হল গাড়ি দিয়ে। শীতের রাতে, অতদূর যাবে কি করে ? আশ্চর্য ! সকলে যেন ধবেই নেয় যে, যাদেরই বাড়ি-গাড়ি আছে, তাদের বাড়ি নেমন্তন্ন কবলে প্রত্যেককেই বাড়িতে পৌঁছে দেবার দায়িত্বটাও হোস্ট-এরই ! কী ইনকনসিডারেট হতে পারে মানুষ ! আবে, এই করে করেই ত আমার বাবা পথে বসলেন। লোকগুলোব একটু চক্ষুলজ্জা অবধি কি নেই ? আশ্চর্য ! যখন অবস্থা থাকে, চারধারে তখন ফস্‌লি-বটেরের ভীড় আর যখন থাকে না, তখন খাঁ-খাঁ। কেউ ডাকেও না আসেও না। চেনেই না যেন কেউ।

পৃথু ভাবল, একথাটা সত্যি। সত্যি যে, তা ও নিজে যতটা জানে, তা খুব কম লোকই জানে, কিন্তু কুর্চি, পৃথুর কাছে ; "ঐ লোকগুলোর" মধ্যে পড়ে না। কুর্চিকে যদি নেমন্তন্ন করে থাকে রুষা, পৃথুকে না-জানিয়েই, তাহলে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার দাযিত্বও নিশ্চয়ই রুষারই নেওয়া উচিত ছিল। ঘন জঙ্গলের পথে ; রাতের বেলা, মোটর সাইকেলে। ঈসস। ভাগ্যিস হাতী নেই এদিকের জঙ্গলে। হাতীবা মোটব সাইকেলের শব্দ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। অনেকসময় তেড়ে যায়।

পৃথুর যদি টাকা থাকত, উপায় থাকত, তবে কুর্চিকে একটি সাদা এয়ার-কণ্ডিশানড মার্সিডিস্ গাড়ি কিনে দিত। লটারীর টিকিট ত প্রতিমাসেই কেনে। কিন্তু ও কি পাবে ? পৃথু পাবে না। বিনা-মেহনতে কিছুই পাওয়ার কপাল করে আসেনি এ জন্মে। শুধু দেবারই জন্যে এসেছিল। শনিবারে যাদের জন্ম, তাদের কপাল নাকি এরকমই হয়। মা বলতেন। স্যাটারডেজ্ চাইল্ড হ্যাজ টু ওয়ার্ক হার্ড ফর আ লিভিং। সেটা যেমনই হোক না কেন। কিন্তু পড়ে-পাওয়ার কপাল তাদের নয়।

অনেক খাবার আছে। দয়া করে খাওয়া হোক্। মেরী! মেরী!

মিলি কোথায় ?

ওর ভিনোদ-আংকল্ আসতে পারেনি। কী নাকি জরুরী মীটিং ছিল। সেইই ডেকে পাঠিয়েছে মিলিকে। দারুণ একটা পার্টি-ফ্রক পাঠিয়েছে ইদুরকার সকালে। উইথ্ রেড্-রোজেজ্। ফুলের যে একটা দোকান হয়েছে, নতুন, দেখেছো বাজারে ?

পৃথু চুপ করেই রইল।

ফুল ? কাকে ফুল দেবে ? ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধে অ্যালার্জি রুষার। পৃথু নিজে মরে গেলে কোথা থেকে সাদা ফুল যোগাড় হবে, সেটা ওর নিজের না জানলেও চলবে ! অতদূর অবধি ভাবে না ও।

আগের কথার খেই ধরেই রুষা বলল, তাই অজাইব্ সিংকে বললাম যে, কুর্চিদের ছাড়তে যাবার

আগে মিলিকে ভিনোদ-এর বাড়ি নামিয়ে দিয়ে যাবে। আবার ফেরার সময় তুলে নিয়ে আসবে। কুচিদেব ওখানে যেতে-আসতে ত' অনেকক্ষণ। গেছেও অনেকক্ষণ। মিলির জন্যে একটা ছোট্ট পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছে ভিনোদ। আমাকেও যেতে বলেছে। খুবই ক্লোজ্-সার্কল। ড্রিঙ্কস্ এণ্ড ডিনার। তোমাকেও। যাব আর আসব। তুমি যাবে না?

কখন বলেছে? মুখ না-তুলেই বলল পৃথু!

বলেছে ত' আগেই। কিন্তু তোমাকে বলব কখন? তোমার সঙ্গে দেখা কি হয়? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই ত' বটে! তুমি ত এখনও তোমার কলেজের হস্টেলের ঘরেই থাকো। ঘণ্টা দিলেই, ঘড়ি-ঘড়ি খাওযাব এসে যাচ্ছে; কোনই দায়-দায়িত্ব নেই। মনের সুখে নভেল পড়া, কাব্য করা! জীবনটা কাটিয়ে দিলে বেশ!

মেরী এসে বলল, ডাকছিলেন?

হ্যাঁ। মেরী, মিলির ভিনোদ-আংকল-এর জন্যে একটু কেক, আইসক্রীম সব ভাল করে টিফিন ক্যারীযার আর থার্মোস-এ প্যাক করে দাও। আমি এবার চান করতে যাব। শুনলাম, যাঁদের, বলেছে ভিনোদ, তাঁরা সব হাইলী রেসপেকটেবল্ লোক। টাইগার প্রজেক্টের একজন অফিসার আসবেন।

পৃথু চমকে উঠে বলল, কে? মিঃ পারিহাব না কি? মিঃ লাওলেকাব নয়ত?

রুষা বলল, মুন্সীয়ানার সঙ্গে। যেন ও নিজেও একজন ভারী অফিসর, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের।

টুসু কোথায়? পৃথু শুধোল।

ও ও ত' গেছে মিলির সঙ্গে। এত খাবার বেশি হল না এবারে! তোমার সব ঘড়ি-সারাইওয়ালা, জুতোওয়ালা, গাড়ির মিস্ত্রীদের ঠুঠা-বোবা-কালাদের বলে দিলেই হত। এত্ত জিনিস ওয়েস্ট হল।

পৃথু আবার তাকাল রুষার দিকে। ভাবল বলে, কেন? ওরা কি ভিখিরী!



এই পৃথিবীতে ও কি শুধু দুঃখই পেতে এসেছিল?

দুঃখ কি ওর একারই? দুঃখী নয় কে? সকলেরই দুঃখ আছে কম বেশি।

জাগতিক দুঃখ না মিটলে অন্য দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রশ্নই ওঠে না। এইরকম একটা কথা অনেকেই বলেন। সে কথা বিশ্বাস করে না ও। কিছু কিছু দুঃখ থাকে, দুঃখবোধ থাকে তা কেবল মানুষেরই জন্যে। মনুষ্যপদবাচ্য মানুষ! শুধুই মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন জীবদের জন্যে নয়। তবু এই দুঃখময়তার মধ্যেও পৃথু নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। নিজের দুঃখটাকেই একমাত্র দুঃখ বলে কখনই মনে করে না। সক্রেটিস বলেছিলেন খুব সম্ভব প্লুটার্ক-এর "অ্যাড অ্যাপোলোনিয়াম দ্য কন্‌সোলেশান"-এ "ইফ্ ওল্ মিস্ ফরচুনস্ ওয়্যার লেইড ইন ওয়ান কমোন হীপ্, হোয়েন্স এভ্‌রী ওয়ান মাস্ট টেক্ অ্যান্ ইকুয়াল পোর্শানি, মোস্ট পীপ্‌ল উড বী কনটেণ্ট্ টু টেক্ দেয়ার ওওন্ এণ্ড ডিপার্ট।"…. ওর মনে হয় আর দশজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাগমেটিক্ মানুষের মতোও ও সর্বার্থে সুখী হবে, রুষার বাধ্য স্বামী হবে।

কিন্তু পারল কই?

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের লেখায় পড়েছিল, "যেসব মানুষ সামান্য সময়ের জন্যে অস্থায়ী নিরাপত্তা কিনতে গিয়ে মূল ও অত্যাবশ্যক স্বাধীনতা দিয়ে দিতে রাজী থাকেন, তাঁরা না স্বাধীনতার

যোগ্য ; না-নিরাপত্তার।"

কথাটা রাষ্ট্রনীতিতে যতখানি সত্যি, ব্যক্তিনীতিতেও ঠিক ততখানি সত্যি বলে মনে হয় ওর। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি নিশ্চয়ই যুদ্ধের বা বৈরিতার নয়; তবু "এসেন্‌সীয়াল, লিবার্টি" অন্যের হাতে তুলে দিতে রাজি নয় সে আদৌ। এমনকি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাতেও নয়। "এসেন্‌সীয়াল লিবার্টি" দেবে না ও কাউকেই। হ্যাঁ বলতে বলতে, বলতে একটা প্রান্তিক সীমানাতে পৌঁছেও "না" বলতে যাঁরা তবুও অপারগ, জীবনের কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতাই তাঁদের জন্যে নয়।

বেরিয়ে পড়ল ও। সকলে এখনও ঘুমাচ্ছে। অনেকদিন জঙ্গলে হাঁটে না একা একা।

পথে বেরিয়েই, কোম্পানীর একটা ট্রাক পেয়ে গেল।

ড্রাইভার ওকে দেখে, গাড়ি থামিয়েই বলল, সেলাম সাহাব।

পৃথু সংক্ষেপে শুধোল, কিধার?

ড্রাইভারও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বাইহার।

আমাকে একটু এগিয়ে দাও ত।

কাঁহা যাইয়েগা সাহাব?

কোথাও যাবো না। এই জঙ্গলেই। একটু হাঁটবো। ভাঁদো নদীটা পেরিয়েই আমাকে নামিয়ে দাও। নদীব পাবে পারে জঙ্গলের দিকে হেঁটে যাব।

ড্রাইভাব ইফতিকাব বলল, জিন্দ্‌গীভর্‌ জঙ্গলমে রহকেভি আপকি জঙ্গল্‌সে ইতনা পেযার? হামলোগোঁনেত জঙ্গলসে বিলকুলই থকা হুয়া হ্যায়। হিঁয়া কোঈ আদ্‌মী রহ্‌তা হ্যায়? আদ্‌মীকা লায়েক জাযগা হি নেহী ঈ!

পৃথু জবাব দিলো না। পৃথুকে সযত্নে পাশে বসিয়ে নিয়ে মিনিট দশেক ট্রাক চালিযে, ভাঁদোর কজ্‌ওযের উপর নাবিয়ে দিল ইফতিকার।

ট্রাকটা যখন চলে গেল, তখন পৃথু দিব্যচোখে দেখতে পেল ইফ্‌তিকার আব ক্লিনার হাসাহাসি কবছে ওকে নিয়ে। বলছে, এইসীই ক্যা সবহি উন্‌কো পাগ্‌লা কহ্‌তে হ্যায?

ট্রাকেব ডিজেলের গন্ধে ভ্রষ্ট হযে রইল কিছুক্ষণ, শীতের সকালের তিরতির করে কাঁপা শিশিরের তাজা গন্ধ। হঠাৎ একটা হলুদ বসন্ত পাখি ডেকে উঠেই উড়ে গেল একটা মরা হল্‌দু গাছের ডাল ছেড়ে, ভাঁদো নদীর রেখা ধরে, গভীর জঙ্গলের দিকে। উঠতে-নামতে, নামতে-উঠতে। সকালের অকলঙ্ক নীল-আকাশে হলুদ লেগে গেল। পৃথু চেয়ে রইল সেদিকে। পাখিটাকে অনুসরণ করল চোখ দিয়ে, যতক্ষণ তাকে দেখা যায়। তারপর পাখি যে দিকে গেছে, সেই দিকেই পা বাড়াল।

কী ভাল যে লাগে! কত গন্ধ, শব্দ দৃশ্য। অনাঘ্রাত, অশ্রুত, অদেখা। এই অনাবিল শীতের সকাল। জঙ্গল রোজই দেখে, এতবার করে, এতরকম করে, বছরের বিভিন্ন ঋতুতে দেখে, তবুও আশ মেটে না চোখের কানের অথবা মনের। নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটে। সব ভুলে যায় তখন। ওর কী নাম, কী জীবিকা, ওর স্ত্রী ছেলেমেয়ের নাম, সমস্ত পরিচিতদের নাম, এমনকি কুর্চিরও। এ জঙ্গলে এলে কাউকেই ওর মনে থাকে না, কোনো দুঃখই দুঃখিত করে না, কোনো আনন্দে আনন্দিতও নয়। এক আশ্চর্য নির্লিপ্তিতে ছেয়ে থাকে ওর সমস্ত সত্তা তখন।

জঙ্গলের গভীরে এলেই হেলেন কেলারের ক'টি কথা বারে বারেই মনে পড়ে পৃথুর। যে মহিলা অন্ধ হয়ে গেলেন, তাঁর মতো দেখার চোখ নিয়ে বোধহয় কম মানুষই জন্মেছিল এ পৃথিবীতে। ওর "থ্রী ডেজ টু সী" বইতে আছে "আমি নিজে ত' অন্ধ, কিন্তু যাঁরা, দেখতে পান, তাঁদের আমি একটি সূত্র দিতে পারি—একটি উপদেশও। তাঁরা যেন চক্ষুষ্মানতাব দানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তাঁরা প্রত্যেকে যেন ভাবেন যে, কাল তাঁরা চিরদিনের মতোই অন্ধ হয়ে যাবেন। এই ভেবে, আজ চোখ দুটিকে ব্যবহার করুন।

"একথা অন্যান্য অনুভূতির বেলাতেও প্রযোজ্য। আগামীকাল চিরদিনের মতো বদ্ধ কালা হয়ে যাবেন এই মনে করে মানুষের গলার স্বর শুনুন, পাখির গানে কান পাতুন, অর্কেস্ট্রাব ঝরনার মতো মত্ততায় সম্পৃক্ত হোন। প্রতিটি জিনিসই, আপনার আঙুল দিয়ে পরশ করুন এই ভেবে যে, আগামীকাল আপনার স্পর্শানুভূতি চিরদিনের মতোই নষ্ট হয়ে যাবে। ফুলের সুগন্ধ নাক ভরে নিন,

প্রতিটি গরাস পূর্ণ আনন্দে খান, এইই ভেবে যে ; আগামীকাল আপনার নাক আর রসনা চিরদিনের মতোই স্তব্ধ হয়ে যাবে।"

তাই-ই করে পৃথু। তাই-ই করে বলেই ত' ওকে সকলেই পাগল বলে। তাই-ই ত' ও কুর্চিকে মনে মনে বলে, "অ্যায় হুসন্, জী খোল্‌কর্ আজ সাতাঁলে মুঝ্‌কো। কাল, মেরা ঈস্ক্‌কা আন্দাজ বদল যায়ে গা।"

মানে, "ওহে সুন্দরী ! আজ প্রাণ খুলে আমাকে দুঃখ দিয়ে নাও, আমায় নিয়ে খেলা করো, আমার সঙ্গে আজ তোমার "প্রাণের খেলার" সময়। আহা ! তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা। কারণ কাল, আগামীকাল, আমার প্রেমের পাত্রী অন্য কেউও হয়ে যেতেও পারে।"

আগামীকাল ত' অনেক কিছুই হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে ত' পারেই ! সেই পুরাতনী গান আছে না, একটা, "প্রণয় পরম রত্ন, যত্ন করে রেখো তারে, বিচ্ছেদ তস্করে আসি, যেন কোনোরূপে নাহি হরে। অনেক প্রতিবাদী তার, হারালে আর পাওয়া ভার, কখন যে সে হয় কার, কে বা তা বলিতে পারে ?"

কাল, আগামীকালকে, মনে হয় রাত পোহালেই হাতের কাছে। কিন্তু আগামী কাল, আসলে থাকে অনেকই দূরে। কত কী ঘটে যেতে পারে, সম্ভবকে অসম্ভব করে, অসম্ভবকে সম্ভব ; কত পাঁচিল ওঠে রাতারাতি, শরীর মনের ন্যায়, অন্যায়ের লাঠালাঠি, জবরদখল একটি রাতের মধ্যে। ক'জন বোঝে এই গভীর সত্য ?

আজ আর কালে যে অনেকই তফাত !

পৃথুর কর্ডুরয়ের প্যান্টটা ভিজে গেছিল শিশিরে। নদীর পাশের বালি ও ঘাসে ভরা মাটি এখনও ভিজে। সোজা হেঁটে গেল নদীর পারে পারে জঙ্গলের গভীরে। একদল শম্বর নদী পার হল ওর সামনে দিয়ে। দুটি শিঙাল, পাঁচটি মাদীন। তখনও তাদের ঘন খয়েরী গায়ে শিশির আর ঘাসের গন্ধ লেগে ছিল। সকালের রোদ তাদের গা থেকে ইরেজার-এর মতো সেই গন্ধকে বাষ্প করে তুলে দিচ্ছিল।

একটা খুব বড় দাঁতাল শুয়োর রাতভর দাঁত দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে মূল খুঁড়ে ক্লান্ত হয়ে জঙ্গলের গভীরে তার দলের নালায় ফিরছিল। পৃথুকে আচমকা নদীর বাঁকে দেখে নাক দিয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ করে পায়েব খুরে খুরে মাটি ছিট্‌কিয়ে উধাও হয়ে গেল নদী পেরিয়ে, জল ছিটিয়ে। ছিটকে-ওঠা জলকণা রোদ লেগে, লক্ষ লক্ষ হীরে হয়েই ঝরে গেল বালির উপর। মিলিয়ে গেল।

এবার পৃথু ফিরল। আজকে ও ওব নতুন লেখাটাতে হাত দেবে। ওর জীবনের প্রথম উপন্যাস। এবং হয়ত শেষও। অনেকদিন থেকেই বুকের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট। কী নিয়ে লিখবে ? কেমন করে লিখবে ? কাল সারা রাত ঘুমোতে পাবে নি। লেখা-টেখা এত কষ্টের, তাহলে মানুষে লেখালেখি করে কেন ? লাভ কি ? এমনিতেই ত' সব মানুষেরই অনেক কষ্ট ! কে জানে ? লেখাও বোধহয় শিকারেরই মতো একরকম অসুখ। হান্টিং-বাগ্ এ কামড়ানোর মতোই 'রাইটিং-বাগ্' এ কামডালেও বোধহয় না-লিখে উপায থাকে না। আজ বাড়ি ফিরে, চান করে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে, লিখতে বসবে পৃথু।

বাড়ি ফিরে, চান করে, নিজের ঘরে বসেছিল ও।

জানালা দিয়ে দেখল পৃথু, এস. ডি. ও খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের কালো কুচকুচে যুবতী আয়া সাদা ধবধবে জোয়ান অ্যাল্‌সেসিয়ান্ কুকুরটিকে প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে গেল। রোজই যায়। সকালে এবং বিকেলে। প্রথমে আদেশ ছিল, এখন অভ্যেস।

ইয়েস্। অভ্যেস।

ডিমের কি ? স্যার ? কটা ডিম স্যার ? টোস্ট কটা স্যার ?

মেরীর প্রাত্যহিক প্রশ্ন, প্রায়ই পৃথুকে মার্ক টোয়াইনের সেই প্রসিদ্ধ উক্তির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। নিজের জন্যে দুঃখ যেমন হয়, তেমন হাসিও পায়। নিজেকে নিয়ে এখনও হাসতে পারে দেখে মনে মনে নিজের উপর অত্যন্ত প্রসন্নও হয়। যে মানুষের চোখে, সে নিজেও কখনও কখনও হাস্যোদ্দীপক নয়, তার কপালে, মনে হয়, অশেষই দুঃখ। যদি নিজেকে নিয়ে নিজে হাসতে না পারে

তাহলে জানতে হবে যে, তার মনের গড়ন এখনও সম্পূর্ণতা পায়নি, অথবা সে মেগালোম্যানিয়াক্ হয়ে গেছে। অনেক, অনেকই বছর আগে মার্ক টোয়াইন বলেছিলেন মার্ক টোয়াইনেরই মতো করে: "হ্যাবিট্ ইজ হ্যাবিট্। এণ্ড নট্ টু বী ফ্লাঙ্গ আউট্ অফ্ দ্যা উইণ্ডো বাই এনি ম্যান, বাট্ কোক্সড্ ডাউনস্টেয়ারস্ আ স্টেন অ্যাট আ টাইম্।"

নো। ডিমের কিছুই না ম্যাডাম। একটাও টোস্ট নয়।

পৃথিবীতে টোস্ট ডিম ছাড়াও অনেক সুখাদ্য ছিল, যা ব্রেকফাস্টে খাওয়া যেতে পারত। যেমন, ফুলকো লুচি, একটু হলুদ কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা দিয়ে প্রায় সেদ্ধ করে রাঁধা গা-মাখা গা-মাখা আলুর তরকারীর সঙ্গে। অথবা, টাটকা কড়াইশুঁটির কচুরী। অথবা কড়াইশুঁটির চপ্। পুরটা বানাবার সময় একটু কড়া করে ভেজে নিতে হবে আর আলুটা মাখবার সময় সামান্য গোলমরিচ ছিটিয়ে নিতে হবে তাতে। আঃ কী স্বাদ! অথবা চিঁড়ের পোলাউ। কড়াইশুঁটি, ধনেপাতা, গাজর-কুচি, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। অথবা, মুড়ি ভাজা। তেল-ছাড়া। সঙ্গে নারকোল-কুচি, কিস্‌মিস্, কড়াইশুঁটি, আদার-কুচি। বসন্তের শেষে এঁচড়ের চপ্। আরও কত কত কী!



সকাল সাড়ে সাতটা এখন। খবরের কাগজ উল্টেপাল্টে দেখেছিল। এখানে এমনিতে কলকাতার কোনো কাগজ আসে না। তবে ও আনন্দবাজার রাখে। যদিও পৌঁছতে খুবই দেরি হয়ে যায়। বাড়িতে বাংলা কাগজের পড়ুয়া অবশ্য ও একাই।

আজ ভোরে কি আছে, কে জানে? নিশ্চয়ই কোথাও আছে কিছু। মিলি-টুসুকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে চলে গেছে রুষা সাত সকালে। কি ব্যাপার? প্রভাত-ফেরী? পতাকা তোলা? কারো জন্মদিন? কোনো কবিতা, গান, বাজনার আসর?

স্যার।

কে? চমকে উঠে, বলল, পৃথু।

মেরী।

কি বলছ মেরী?

ক'টা ডিম? স্যার?

পৃথু নিরুত্তর।

ক'টা টোস্ট? স্যার?

পৃথু নিরুত্তর।

কফি? না চা? না মিল্ক শেক্? না ড্রিঙ্কিং চকোলেট?

নিউজপেপার। স্যার।

নিউজপেপার। এই অপ্রয়োজনীয় খবরের রাশই মানুষের পরম শত্রু। পৃথিবীর সব খবরের কাগজ। কামাস্‌কাটকায় খুন। সেসেলস্ আইল্যাণ্ডস্ এ ক্যু। নদীয়া জেলার অভ্যন্তরের অভ্যন্তরতম গ্রামের কাঁচা পাটক্ষেতে কচি নাবালিকার নিভৃততম অভয়ারণ্যে নীললুঙিধারী একজন

বলশালীর বলপূর্বক গমন। সাইপ্রাসে লেটারবম্ব!

এই সব খবরে, এই সব জ্ঞানে, মানুষের, কীই-ই বা এসে যায়! শুধুই বিরক্তি বাড়ে, শুধুই রক্তচাপ, ডায়াবেটিস্, হতাশা। এসবে শুধু সৎ-ইসাব্‌গোল্-এরই বিক্রী বাড়ে। এ সবই, অসৎ, গভীর চক্রান্ত।

ক'টা ডিম? স্যার?

ক'টা টোস্ট?

স্যার, কফি, না চা, না

কোনোই বৈচিত্র্য নেই জীবনে।

এমন কি; ব্রেকফাস্টেও।

মেরীকে বিদায় দিয়ে, খবরের কাগজগুলো পাশে সরিয়ে দিয়ে চেয়ারটাকে পেছনে ঠেলে টেবলের উপর পা দুটো তুলে দিল পৃথু। কিছুদিন হল মাঝে মাঝেই, ওর মাথার মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মতো হঠাৎ হঠাৎ যন্ত্রণা বোধ করছে একটা। পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। রোদের সোনালি উষ্ণতা ঝুপ্ করে হঠাৎই ঠাণ্ডা মেরে যায়। মাথার মধ্যে আইল্যাণ্ডস্ অফ সার্সির সাইরেনের মত বাঁশি বাজে। শী-শী- শী-ই ই ই ই

সে বাঁশী সে শোনেনি। হয়ত উ্যলীসীস্ শুনেছিলেন। কে জানে? রুষা ভাল বলতে পারবে। ইংরিজীর ছাত্রী ছিল ও। পড়ায়ও ইংরিজী। কিন্তু সেই সময়, যখন এই আক্রমণটা হয়, ও মৃত্যুর গন্ধ পায় নাকে, অনেকটা হেমন্তর শেষ বিকেলের ভোঁর ঘাসের বনের শামুকের গায়ের গন্ধর মতো বসন্ত-শেষেব হলুদ-বসন্ত পাখির তলপেটেব অস্বস্তিকর গন্ধর মতো। গা-শির্‌শির্ করা, ভালোলাগাময়, কিন্তু ভীষণ ভয়ের এক অনুভূতি হয় ওর সেই সময়। বিজ্‌লীর দেওয়া সিদ্ধি খেয়ে যেমন দেখেছিল, তেমনই চোখের সামনে লাল-নীল হলুদ-সবুজ সোনালী-রুপোলি সুতোর দল নাচানাচি লাফালাফি করে।

আঃ! উঃ! ভীষণ যন্ত্রণা! কী ভীষণ যন্ত্রণা!

অজ্ঞান হয়ে যায় পৃথু।

কে যেন তাকে ডাকে। অনেক দূর থেকে।

তাই-ই ত! পৃথুকেই ত ডাকে!

—ভইষান্‌ঘাট রেঞ্জের জঙ্গলের গভীর থেকেই কি?

কে যেন ডাকে তাকে। কোনো পুরুষ। বলে, পৃথু উ উ

মনে হয়, যে ডাকে, তার ভীষণই বিপদ? বাঘে তাকে ধরেই ফেলেছে। পেড়ে ফেলেছে একেবারে। অথবা বাইসনে ফেলে দিয়ে তাকে পেটের নিচে শুইয়ে রেখে সাদা-মোজা-পরা চার পায়ের ঘেরে তাকে ঘিরে তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তারই রাইফেলের গুলিতে মারাত্মক আহত বাইসনের ভেলভেট-এর মতো কালো উজ্জ্বল গা বেয়ে, গুলির রক্ত ঝরনা-ধারার মতো বয়ে যায় সেই মানুষের গা-গড়িয়ে। উষ্ণ, কালোজামের রঙের রক্ত, তার চোখে মুখে। ঝর্‌ঝর্। তার চিৎকারে যেন বাইসনের রক্তেরই গান ফুৎকারিত, উৎসারিত হয়। তার মুখে, মৃত্যুর নোনা স্বাদ লেগে থাকে। তার নিজেরই মৃত্যুর গন্ধ।

কে সে?

পৃথু নিজেই কি?

আঃ।

আবার কে ডাকে?

এবারে?

মা!

কি, মা?

খোকন, আয়। পায়েস খেয়ে যা। তোর জন্যে পায়েস রেঁধেছি। আজ যে তোর জন্মদিন! সাদা

পাথরের বাটিতে কালো গাইয়ের ঘন দুধের লাল সর-ফেলা পায়েস। আয় খোকন, খেয়ে যা!

আমার জন্মদিন। পৃথু ভাবে। পৃথুরও জন্মদিন! জন্মদিন ত হয় বিখ্যাত লোকেদের! ভাগ্যবানদের। যাদের অনেকে ভালোবাসে; শুধু তাদেরই। হাসি পায়! পৃথুর জন্মদিন!

আজ আমার জন্মদিন। অ্যাই যে! কে আছো? রুষা, মিলি, টুসু, অ্যাই যে কুর্চি! আজ আমার জন্মদিন, জানো? পৃথু বলে, নিজেকে। আসলে, মৃত্যুদিনই ত' মানুষের আসল জন্মদিন।

স্যার! স্যার! স্যার

কে, কে, কে.

চমকে উঠল ও।

কে? কে তুমি? আজ আমার জন্মদিন। কে এসোছো? রুষা? কুর্চি? কুর্চি বুঝি?

আমি মেরী। আপনার কাছে একজন সাহেব এসেছেন।

মেরী! মেরী? ও মেরী। কোয়াইট্‌ কনট্রারী! কে সাহেব?

দেখতে সাহেবের মতো নন।

নন? নাম কি? নাম কি সেই অসাহেব সাহেবের?

মিস্টার দিগা পাঁড়ে!



মিস্টার দিগা পাঁড়ে?

এ যন্ত্রণার মধ্যেও পৃথুর হাসি পায়।

ডাকো। মেরী, ঘরেই ডাকো।

বলেই, ওর মনে পড়ে যায় যে হাইলী-রেসপেক্টেবল্‌ ভদ্রলোকের বাড়ি এটা। সরী, সাহেব-মেম-এর বাড়ি। দিগা পাঁড়ের মতো অসভ্য জংলী লোককে কোনোক্রমেই এ বাড়ির ভিতরে আসতে দেওয়া যায় না।

পৃথু, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না, না, ডেকো না, ভিতরে ডেকো না। বাইরেই চেয়ার পেতে দাও, আমিই যাচ্ছি।

দিগা পাঁড়ে স্যুট পরে না, জুতো পরে না, ইংরিজী বলে না, পাইপ খায় না। না, না।

মনে মনে বলে পৃথু।

তারপর বলে, শোনো মেরী, প্লিজ! খাওয়ার আছে কি কিছু?

নাঃ। কিছুই নেই।

জানত পৃথু। সাহেব-মেমরা না-বলে কয়ে কেউ কারো বাড়ি আসে না, অসময়ে খায় না, এসব ঘাস্ট্‌লী ইণ্ডিয়ান হ্যাবিটস্‌। যেই আসবে, তাকেই খেতে দিতে হবে এ আবার কী কথা?

মেরী বলল চিজ্‌ আছে স্যার। ডিমও আছে। ওমলেট্‌ বা চিজ্‌ টোস্ট করে দেব কি?

ওহো! তাইত! দিগা ত মাত্র একবেলা, একচড়াই খায়, তাও স্বপাক, যদিও জাত বিচার নেই ওর। ও ত এসব কিছুই খাবে না। মনে পড়ে গেল পৃথুর। বাঁচা গেল, লজ্জা থেকে।

নাঃ। ওসবের দরকার নেই। শোনো মেরী! ভাল করে এক গ্লাস ফ্রেশ-লাইম বানিয়ে দাও।

শীতকালটাকে অনেকেই কারণে পৃথু ভালবাসে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ এই-ই যে দিনেব বেলা তার কাছে, বাড়িতে কোনো মূর্খ ইল্-ম্যানারড্ লোক না-বুঝে, না-জেনে চলে এলে বাইবের বাগানে বা লন্-এ স্বচ্ছন্দে বসাতে পারে। পৃথুরও ইজ্জৎ থাকে আগন্তুকদের কাছে। বসতে পারে। রুষা এবং আগন্তুকেরও কাছে বে-ইজ্জৎ হতে হয় না।

ফ্রেশ-লাইম! সাহেবের জন্যে? এই সাহেবের জন্যে আনব স্যার?

হ্যাঁ। সাহেবের জন্যে।

উইথ ওয়াটাব? অর সোডা স্যার?

ওয়াটার।

সুইট? অব সল্ট স্যার?

সুইট? সুইট। উইথ্ প্লেন্টী অফ সুইট্স। বেশি করে চিনে দিয়ে।

আপনার ব্রেকফাস্ট তাহলে কি হবে স্যার? কুক্ ত রেডি করে ফেলেছে। আপনি কি ডাইনিং টেবলে আসবেন না স্যার?

বাইবেই দাও।

বাইরে যে কাক স্যার। মেমসাহেব বলেছেন, বাইবে কোনো খাবার ব্যাপারই নয়! কাক চামচ নিয়ে গেছিল।

তবে? কি হবে?

যাবার আগেই খেয়ে নিন। আমি বরং এখানেই নিয়ে আসছি।

আমি খাবো না।

সে কি?

হ্যাঁ। আমি খাবো না।

খাবার নষ্ট হলে মেমসাহেব যে বকবেন!

দমবন্ধ লাগে পৃথুর। গলায়-বকলেস বাঁধা কুকুবের মতো পরাধীন বলে মনে হয়। বুকের মধ্যে গভীর কষ্ট বোধ করে একরকম!

নষ্ট কোরো না।

কি করে স্যার?

উঃ।

মেরীর এই অদ্ভুত ন্যাগিং-সেবা অসহ্য লাগে মাঝে মাঝে।

কি করে স্যাব? ব্রেকফাস্ট নষ্ট, না-করব স্যার?

আঃ! তোমরাই খেয়ে নাও। তুমিই খেয়ে নাও। দুখী আর তুমি!

সে ত' নষ্টই হবে।

যা বলছি করো। আব কথায় কথায় স্যার স্যার কোরো না আমাকে। অনেকদিন বলেছি।

পৃথু ভাবছিল মেরীকে বলে কিই বা লাভ? ভাবছিল, নষ্ট কিছুই হয় না আসলে আমার পেটে গেলে কাজে লাগত আর তোমাদের পেটে গেলে নষ্ট হবে?

থ্যাঙ্ক উ্য!

বলে, কিণ্ডারগার্টেনেব মেয়েব মতো ভঙ্গী করল মেরী।

পৃথু বাইরে বেরোতে গেল।

মেরী বলল, মালটিভিটামিনস ট্যাবলেট?

দাও।

জেলুসেল? খালি পেটে খাবেন?

দাও। পান খেলেই দরকার হবে।

নিয়ে আসছি স্যার। বাইরে। এক্ষুণি।

আমার জন্যে শুধু এক কাপ চা দেবে। আর কিছুই না।

ইয়েস্ স্যার।

দিগা চেয়ারে না-বসে, ঘাসেরই উপর উবু হয়ে বসেছিল। কাছে যেতেই, পৃথু দেখল, তার চোখমুখ ফোলা। মনে হল, শরীরে প্রচণ্ড জ্বরও। ঠোঁটের কোণায় রক্ত শুকিয়ে আছে, মনে হল, ঘুমোয়ওনি অনেকদিন। মুখে এবং ডান হাতে কাটা দাগ। রক্ত শুকোয়নি সেখানেও।

সংসারে কিছু লোকের মুখে এক আশ্চর্য সমর্পণ-তন্ময়তা থাকে। দিগার মুখটিও তেমন. কারো প্রতিই ওর কোনো অনুযোগ অভিযোগ নেই। একেবারেই নয়। নিজের প্রতিও নয়। কে বা কারা তাকে ধরে এমন করে মারল?

পৃথু ডাকল, দিগা!

কী।

ব্যাপার কি?

দিগা হাসল।

তার শুকোনো-রক্ত ঠোঁটের সেই আশ্চর্য হাসিতে কৌতুক, এবং অশেষ ক্ষমা মাখানো ছিল।

তোমাকে মারল কে? বনবিভাগের লোকেরা?

না, পুলিশ। বালাঘাট থেকে এসেছিল। পুলিশ ছেড়ে দেবার পর আমাকে ধরে নিয়ে গেছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেবা। জীপে করে এসেছিল। নিয়ে গিয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ করল সুফ্‌কর এর বনবাংলাতে। অনেকই ত' দূর। অফসব. সব জানল। আমাকে জিগগেস করে।

কি জানল?

কে শিকার করল বারাশিঙা? কেমন করে করল? ইত্যাদি।

তুমি কি বললে?

বললাম, আপনি, শামীম্ ভাই, ঠুঠা আমার কাছে এসেছিলেন পিক্‌নিক্ করতে। এমন সময় ঢোলরা বারাশিঙাটাকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাঁলো নদী পেরিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে এল আমারই ডেরার সামনে। বলতে গেলে. ঢোলদের হাতেব নৃশংস মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই এবং ওদের ভয়-পাইয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাতেই গুলিব আওযাজ করার জন্যেই বন্দুক ছুঁড়েছিলেন শামীম ভাই।

কি বললেন ফরেস্টাব?

প্রথমে বিশ্বাস করলেন না। গার্ডরাও নিয়ে গিয়ে মারল আমাকে। তারপর আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল ওঁর কাছে।

উনি মুখে বললেন, খুবই ভাল কথা। কিন্তু, মৃত্যু মৃত্যুই। মৃত্যুর মধ্যে নৃশংস বা মধুর বলে কোনো ভাগাভাগি নেই। ঢোলদেরও সৃষ্টি করেছেন শ্রীরাম ভাগোয়ান, বারাশিঙাদেরও তিনিই কবেছেন। ঢোলদের কাজই হচ্ছে দাপাদাপি করে বেরিয়ে, জঙ্গলের হরিণ, শম্বর, বারাশিঙা এবং অন্যসব জানোয়ারকে সারা জঙ্গলে সমানভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া। জগতে, জঙ্গলে, যা-কিছুই ঘটে সবই আগেই ঠিক করা ; সবকিছুরই মানে থাকে। এক অদৃশ্য হাতই সবকিছু পরিচালনা করেন।

খুব ভাল লাগল অফ্‌সর-এর কথা শুনে। মনে হল, মানুষটা ভগবানকে আমার জানার চেয়েও অনেক গভীরভাবে জেনেছে। অথচ লোকটা খাকি-পোশাক পরা। বাইরের পোশাকটা কিছু নয়। আমার চেয়ে অনেকই বড় সাধক উনি। উনি যা করছেন, সেটা তাঁর পেটের অন্ন যোগাবারই জন্যে। সেটা কর্ম ওঁর কর্ম, ওঁর ধর্মকে নোংরা করতে পারেনি।

এই অবধি বলে, দিগা একটু চুপ করে রইল। ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, চমৎকার মানুষ অফ্‌সর সাব্।

চমৎকার! তা ত বুঝলাম, তাহলে তোমার এ দশা হল কি করে?

এ দশা ত' করেছে পুলিশ আর ফরেস্ট গার্ডরা।

কেন?

ওদের দারুণ গালাগালি খেতে হয়েছে অফ্‌সরদের কাছে এই বারাশিঙাটার ব্যাপার নিয়ে। তাই-ই ওদের রাগ আমার উপরে চাপাল। অন্যায় ত' হয়েইছে। আমি অবশ্য রাম গোয়ানের কাছেই বেশি অপরাধী মনে করি নিজেকে। মানুষের আদালতে কে অপরাধী আর কে নয় তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। শামীম্‌ভাই না মারলেই পারত।

পৃথু বলল, তুমি মিথ্যা বললে, আমাদের বাঁচাতে? আশ্চর্য!

দিগা হাসল। বলল, অন্যকে বাঁচাতে মিথ্যা বললে দোষ হয় না।

ডাক্তার দেখিয়েছো?

না। এই-ই ত' এলাম সকালের বাস ধরে। কাল রাতে ওরা আমাকে বড় রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে গেছিল। আসলে আমার অসুবিধে হয়েছিল, আপনারা চলে আসার পর। দিনে রাতে শকুন আর শেয়ালদের চিৎকার, মাছির ভনভনানি আব দুর্গন্ধে রীতিমত পাগল হবার অবস্থা। এখন শুধু কংকালটাই পড়ে আছে। রোদে শুকনো পরিষ্কার। শিংটা আর চামড়াটা ত' শামীম্‌ভাই নিয়েই এসেছিল। যেটুকু মাংস ছিল ছোট ছোট পাখিতে খেয়ে গেছে। এখনও রাতে কটাং কটাং করে হাড়-কামড়ে বেড়ায় কঙ্কালেব। নানা নিশাচর জানোয়ারে।

মেরী ফ্রেশ-লাইম্‌ এনে, দিগাকে দেখেই আঁতকে উঠল।

গ্লাসটা নামিয়ে, ওকে দিয়ে, চা-টা পৃথুকে দিয়েই ইংরিজীতে বলল, স্যার! হুজ্‌ হি? মিঃ পাঁড়ে?

দিগা পাঁড়ে। আমার বন্ধু।

আপনার বন্ধু? স্যার? একস্‌কিউজ মী স্যার? হি লুক্‌স লাইক্‌ আ টেরীবল্‌ ড্যাকয়েট্‌।

"একস্‌কিউজ মী" কথাটা মেরী এমন মিষ্টি করে বলে যে, শুনে মনে হয় কোনো তিনবছরের শিশুই বুঝি মিস্‌-এর কাছে 'ছোট-বাইরে' করতে যাওয়ার জন্যে ছুটি চাইছে।

পৃথু চা ও মাল্‌টিভিটামিন্‌স এবং দিগা ফ্রেশ-লাইম খাওয়ার পর ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়লো। মোড় থেকে পৃথু দুটো পান খেল। একশ-বিশ জর্দা। খায়, রিলিজস্‌লি। তারপর রিলিজস্‌লি এদেশীয় তাবৎ বাদামী সাহেবদের কল্পিত মুখগুলির উপর পিচিক্‌ করে পিক্‌ ফেলল। তারপর সাইকেল রিকশা নিল একটা। নিয়ে, ডাক্তারের কাছে গেল। কম্পানীর ডাক্তার নয়। ঝিংকুর কাছে। ঝিংকুর বড় ভাই টিংকুও ডাক্তার। সীওনীতে। ওদের বাবাও প্রাক্‌টিস্‌ করেন মান্দ্‌লাতে।

ঝিংকু ব্যাণ্ডেজ করে দিল হাতে, ওষুধপত্র দিয়ে। ইঞ্জেক্‌শান নিলো না কিছুতেই দিগা। বলল, সুঁই নেয় না ও। নেবেও না কোনোদিন।

ঝিংকু হেসে বলল, আরে ভাই, যদি মরা-বাঁচার প্রশ্ন ওঠে? যদি তোমার ধনুষ্টংকার হওয়ার ঝুঁকি থাকে? তাহলেও নেবে না?

দিগা ছেলেমানুষ, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী ঝিংকুর চোখে সোজা তাকিয়ে ওর বিশ্বাস দিয়ে ঝিংকুর চোখ দুটি বিদ্ধ করে বলল, আপনি কি চিরদিন বাঁচবেন ডাগ্‌দার সাব্‌? মওত যখন আসবে, তখন কি সুঁই আটকে দেবে মওত্‌? প্যায়দা যে হয়েছে, সে তার সঙ্গে করেই কপালে লিখে এনেছে মওত্‌-এর জনম্‌পত্‌রী। তোমাদের দাওয়াই-এর প্যাকেটের উপর যেমন লেখা থাকে—মেনুফ্যাক্‌চারিং ডেট্‌, ইক্‌স্‌পায়ারিং ডেট্‌—। ঠিক্কে না?

ঝিংকু এইরকম জ্ঞানের কথা শুনে অভ্যস্ত নয়। চুপ মেরে গেল।

ওর ফীস্‌ দিয়ে পৃথু বাইরে এসে দিগাকে নিয়ে একটা রিকশা করল। এখন যাবে সাবীর মিঞার বাড়ি। একটা মীটিং-এর দরকার। মিঞার বাড়ি আর দোকান একই সঙ্গে। সামনে দোকান। পিছনে বাড়ি। ক্যাশ বাক্সের সামনে সাবীরের বড় ছেলে ওয়াজ্জু -বসে ছিল। চেহারা প্রায় বাবারই মতো, ছিপছিপে। পৃথুকে দেখেই সেলাম করে বলল, সেলাম সাহাব।

আব্বা কাঁহা?

আব্বা ত' ভোপালমে।

কব্‌ গ্যয়া?

ইতোয়ারকা রোজ।

লওটেঙ্গে কব্ ?

কাল ইয়া পড়শু। বলেই, বলল, আইয়ে, অন্দর আইয়ে, উতারিয়ে না রিকশাসে ! চায়ে মাঙ্গাউ, পান মাঙ্গাউ ? আপ্‌কা লায়েক উর কোঙ্গ সেওয়া।

পৃথু বলল, না, না। আমি যাচ্ছি। আব্বাকে বোলো, যেন, এসেই যোগাযোগ করেন। রিকশা ঘুরিয়ে ভুচুর গ্যারাজের দিকে যেতে বলল রিকশাওয়ালাকে।

যখনই সাবীর মিঞার কাছে আসে, সাবীর আর তার ছেলেদেব ব্যবহার পৃথুকে মুগ্ধ করে। এদের এই তমদ্দুন আর এতলাখ্ শেখার মতো। পৃথুর বাবা বলতেন, বাঙালী ব্যবসা করবে কি ? সুন্দর করে হাত-জোড় করে নমস্কার পর্যন্ত করতে শেখেনি !

কথাটা বোধহয় আংশিক সত্য। ব্যবসা, ভাল ব্যবহার এবং সততা দিয়েই গড়ে ওঠে।

ভুচু গ্যারাজেই ছিল। দিগাকে দেখে তাড়াতাড়ি একটা ঢাউস ডজ্ কিংসওয়ে গাড়ির পাশে চেয়ার পেতে বসতে দিল ওদের। তীক্ষ্ণ চোখে একবার দিগার শারীরিক অবস্থাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, দু মিনিটে আসছি। এক ঝঞ্ঝাটিয়া খদ্দেরকে বিদায় করেই।

শীতের রোদে ভুচুর গ্যারাজের টিনেব চাল গবম হয়ে ছিল। তাব নিচে বসে বেশ লাগছিল পৃথুর। নানারকম আওয়াজ আসছিল কানে। মিশ্র শব্দ সব অর্কেস্ট্রাব মতো। মার্ডগার্ড পেটানোর একটানা ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ, লেদ মেসিনের আওয়াজ, বঙ চাঁচবার চ্যাঁ-চোঁ আওয়াজ। একপাশে একটা ফিয়াট গাড়ির এঞ্জিন টিউন্ করছে ভুচুর অ্যাসিস্ট্যান্ট নাগ্‌বেকার। অন্যপাশে একটা মাহীন্দ্র জীপে জাওয়ালা হর্ন ফিট হচ্ছে। তীক্ষ্ণ এবং ভোঁতা, উদারা মুদারা তারার মিশ্র আওয়াজ। কিন্তু ভাল করে কান পাতলে বোঝা যাবে এই বিভিন্নতার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। বিভিন্ন স্কেল মিলে মিশে গেছে যেন। আসলে, মিলে ঠিক যায়নি, সি শার্পএ বাঁধা আছে গরিষ্ঠ আওয়াজগুলি। তানপুরার আওয়াজের মতো এই আওয়াজেও গলা মিলিয়ে নিয়ে রেওয়াজ করা যায়।

আহা ! গান বাজনার কথা মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যায় পৃথুর।

দিগা বসেছিল প্রসন্ন মুখে। ওর শরীরের বৈকল্য ওর মুখে বা মনে এসে পৌঁছয়নি। সাধক হলে, বোধহয় এরকমই হয়।

ভুচু ফিরে এল একটু পরেই। দিগাকে শুধোল, খবর কওন্ দিয়া ? লাল্লু ?

দিগা বলল, জানি না। লাল্লুর কাছ থেকেও জানতে পারে। কিন্তু ওর দোষ কি ? মিথ্যে ত' বলেনি। মিথ্যে বলবেই বা কেন ?

মিথ্যে বলবে নাই-বা কেন ? পাঁচ কে জি মতো মাংস আর এক কে জি কলিজা নিয়ে ভাগল সেদিন সুরতহারাম ! প্রয়োজনে একটা মিথ্যে না বলতে পারলে, সে মাংস হজমই বা হবে কেন ? দেখাচ্ছি শালাকে। শামীম্‌কে বলব ওকে ফিট্ করে দেবে।

দিগা হাত তুলে বলল, নাঃ, নাঃ, ছিঃ ছিঃ এ কী কথা ! এমন কোরো না। বেচারী। দোষ কি ওর ?

তোমারও ত' কোনোই দোষ নেই পাঁড়েজী। না শিকারে ছিলে ; না মাংস খেলে। তবে ? মারটা তোমাকে খেতে হল কেন ? ইয়ে জামানাতে দোষ যার নেই সেই-ই মার খায়। ওই-ই নিয়ম এখন।

সেটা কপালের লিখন। দ্যাখো ভুচুবাবু, "জগ্ ভল ভলেহি, পোচ্ কহুঁ পোচু"

মানে ?

মানে হচ্ছে, এই সংসার ভালর কাছে ভাল ; মন্দের কাছে মন্দ। তাছাড়া, "পরপীড়া সম নহি অধমাঈ" পরকে কষ্ট দেওয়ার মতো নীচতা আর কিছুই নেই। যা হয়েছে, তা হয়েছে। লাল্লু দোষ করেনি কোনো। তোমাদের চোখে যদি তা দোষ হয়ও, তাহলেও ওকে কষ্ট দিও না।

ভুচু পৃথুকে সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল, সেকথা আমরা বুঝব পাঁড়েজী। তোমার জ্ঞান তোমার থাকুক। আমাকে জ্ঞান দিও না।

পৃথু বলল, দিগাকে পৌঁছে দেওয়ার বন্দেবস্ত করতে হয় ভুচু।

নিশ্চয়ই। জীপটা নিয়ে তুমিই পৌঁছে দিয়ে এস পৃথুদা। আমি ত' ফেঁসে আছি। আর কেউই

নেই এখন যাকে জীপ দিয়ে পাঠাতে পারি। তুমি জানো, "যিসকি বাঁদরী ওহি নাচায়" এই প্রবচনে বিশ্বাস করি আমি। তোমার কথা আলাদা। আমার গাড়ির স্টীয়ারিং-এ তুমি ছাড়া আর কাউকেই হাত ছোঁয়াতে দিই না আমি। আমাকে একটু বিল-টিল নিয়ে বসতে হবে। অর্জুন দাস সোলাঙ্কিদের অনেকগুলো টাকা বাকি। শালারা ইন্টারেস্ট বাঁচিয়েই তা থেকে বিল দেয়। আসলে হাতই পড়ে না। এতদিন বাদে পেমেন্ট দেয়। এমন হারামী পার্টি আর দুটি নেই আমার। টাকাওয়ালারা ভাবে সারা জীবন মাল না ছেড়ে কেবল বাণ্ডিল দেখিয়েই কাজ হাসিল করবে।

পৃথু বলল, চলি, তাহলে। দাও, জীপের চাবি দাও।

আরে দাঁড়াও। তোমার জন্যে পান আনতে দিয়েছি। পান না খেয়ে কোথায় যাবে ? শামীমের ভাষায় দো পান কম্‌সে কম্। থোরা সা জর্দা কম্ সে কম্। এই হুদা,পান কে আনতে গেল ? সব শালা সুরত্‌হারাম। জীপটা বের কর্। ঝেড়ে পুছে দে। দ্যাখ্, তেল আছে কী নেই। না থাকলে, আগরওয়ালের পাম্প থেকে বিশ লিটার তেল ভরে নিয়ে আয় জল্‌দি। এই নে, স্লিপ্ নিয়ে যা।

গাড়িটা কাল পাঠিয়েছিল ভুচু ? রুষা ? অজাইব সিংকে দিয়ে ? বলছিল, কী একটা আওয়াজ হচ্ছে গাড়িতে ?

পৃথু বলল।

হ্যাঁ : হ্যাঁ ! নিয়ে এসেছিল। দেখেও দিয়েছি।

জীপে তেল ছিল। আগরওয়ালের পাম্পে যেতে হল না আর হুদার। পানও এসে গেল। দিগাকে নিয়ে জীপে উঠল পৃথু। স্টীয়ারিং-এ বসল। স্টার্ট করল জীপটা পানের পিক্ ফেলে।

পৃথুর মা বলতেন, খোকন, জর্দা খেলে কখনও প্রথম পিক্ গিলবি না, ফেলে দিবি। পৃথু মায়ের এই কথাটি মেনে চলে। তাতে, বুকের মধ্যে ধ্বক্‌ধ্বকানি একটু কম লাগে।

ভুচু হঠাৎই দিগার পাশে উঠে পড়ে বলল, চলো ত একটু পৃথুদা। আমিও যাই।

কোথায় ?। বাঁ দিকে চল।

সে কি ? যাবার ছিল ত' ডানদিকে। বাজারে গিয়ে কি হবে ?

আর ! চলোই না।

বিরক্ত গলায় বলল ভুচু।

জীপটাকে ফারস্ট গীয়ারে গড়িয়েই সেকেণ্ডএ ফেলে দিল পৃথু। টপ্এ ফেলতেও সময় লাগল না।

বাজারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ভুচু বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাঁয়ে লাগিয়ে দাও। ব্রেক্ করে দাঁড় করাল পৃথু জীপটাকে।

থামতেই, ভুচু নেমে সামনের দোকানে ঢুকে গেল। বড় একটা মুদীর দোকান। ভেড়ুয়ার দোকান। ভেড়ুয়া মাঝি।

পৃথু আবার পানের পিক্ ফেলল পথেব ধুলোয়

বানোয়ারীলাল এসে দাঁড়াল পাশে। সাইকেল থেকে নেমে বলল, খাল্-খরিয়াৎ সব ঠিক্কে না হ্যায় ?

সব ঠিক্কে।

পান-ভরা মুখে বলল পৃথু।

আপ্‌কি কোঈ রিস্তেদার আয়ে হুয়ে হ্যায় ক্যা রায়নামে ?

জী হাঁ।

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বলল পৃথু। ভাঁটুবাবু কা বারেমে?

জী হাঁ।

আপ্‌কি আপ্‌না সাড়ুভাই ?

একটু বিস্ময় ও সন্দেহের সঙ্গে জিগগেস করল বানোয়ারীলাল।

পৃথু পান-ভরা মুখে দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, সম্‌ঝে না, বানোয়ারীলালজী! ভায়রাভাই,

ভগ্নীপতি, যা কিছুই বলতে পারেন। রক্তর আত্মীয়তা নেই।

হেসে বলল, এহি না বাত্! আভ্‌ভি সমঝা!

কি সম্‌ঝালেন বানোয়ারীলালজী তা অবশ্য বোঝা গেল না।

ভুচু ফিরে এল। সঙ্গে একটি ছেলে। তার হাতে পোঁটলা-পুঁটলি।

কি এসব?

পৃথু শুধোল।

আরে, দিগার জন্যে।

দিগা বলল, এত্ব! এ ত' আমার সারা বছর লাগবে শেষ্ করতে।

ওর গলাটা একটু নাকি-নাকি শোনাল। নাকের চোট্‌টা বেশ বেশিই হয়েছে বোধহয়।

বে-ফিক্কর্ রহো পাঁড়েজী। এ ত' পৃথুদা আর আমরা মিলে খিচুড়ি খেয়েই উড়িয়ে দেব। এখন এই-ই রইল। কাল লাড়ুয়ার হাট থেকে সবজিও কিনে পাঠিয়ে দেব তোমাকে। আলু, চালেব সঙ্গেই আছে। আলাদা করে নিও।

না। আর কিছুই পাঠাবে না কাল। কোনো সবজিরই দরকার নেই।

ভুচুকে ফিরে গিয়ে গ্যারাজে নামিয়ে দিয়ে জীপ ছোটাল পৃথু। পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাটচান্দ্রা ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসে পড়ল। জঙ্গলে।

জীপেব স্টিয়ারিংএ বসলেই পৃথু যেন তার প্রথম যৌবনে ফিরে যায়। জীপ্ এর এঞ্জিন ওর সঙ্গে কথা বলে। জঙ্গলের মধ্যে, বহুদূর থেকে আওয়াজ শুনেই ও বলে দিতে পারে, কী জীপ সেটা ; পেট্রল না ডিজেল, মিলিটারী ডিস্‌পোজালের অ্যামেরিকান জীপ, না মাহিন্দ্রর না দোঙ্গা! এবং কোন্ গীয়ারে সেটা চলছে। জীপের এঞ্জিনের আওয়াজকে জঙ্গলেবই অনুষঙ্গ বলে মনে হয়। সভ্য মানুষের ইতিহাসে আগুন আবিষ্কার যেমন এক ঘটনার মত ঘটনা, পৃথুর মতো জঙ্গলের মানুষদের ইতিহাসেও জীপ আবিষ্কারও তেমনই এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বনে জঙ্গলে যাদেরই যাতায়াত আছে, তারা সকলেই এ-কথা মেনে নেবেন বোধহয়।

পিচ্ রাস্তা ছেড়ে দিল ও। ডাইনে ঢুকল হাঁলো নদীর পাশে পাশের পায়ে চলা পথের মতো পথে। শেষ সকালের বনের গন্ধে নাক ভরে গেল পৃথুর। নদীর পাশে পাশে শুখ্‌রা আর ছররা ঘাসের বন। হলুদ পাতায় কাঁটা। লালচে ফুল ফুটেছে তাতে। ঘাসের মাঠের পরই অনেকগুলো বড় বড় জামুন গাছ আছে। এদিকের জঙ্গলে বেশিই ধাওয়া (গঁদ), হাব্‌রা, বহেড়া, কস্‌সী আর কুহমি গাছের হরজাই জঙ্গল। নদীর মধ্যে জায়গায় জায়গায় গাংগারিয়া ফুলের ঝাড়। প্রজাপতি উড়ছে। কাঁচপোকা উড়ছে। শীতের মিষ্টি রোদদুবে তির্‌তির করে কাঁপছে তাদের পাখা। রোদ ঠিকরে যাচ্ছে।

এবার সেকেণ্ড গীয়ারে যেতে হচ্ছে। রাস্তা বলতে ত' কিছু নেই। জীপ বা মোটর সাইকেলের পক্ষেই যাওয়া সম্ভব। মোটব সাইকেলে গেলে, তাও নেমে পড়তে হয় বিশেষ বিশেষ জায়গা পেরোতে। জীপের চারটি চাকার মাধ্যমে পৃথু যেন বনপথকে তার নিজের শরীর দিয়েই ছুঁয়ে যাচ্ছে। টায়ারের নিচে ঝবা ফুল বা খড়কুটো দলে গেলেই ওর মনে হচ্ছে নিজেব পায়েই যেন মাড়িয়ে গেল তা।

জীপটাকে দাঁড় করালো। পান খাবে বলে। ড্যাশবোর্ড থেকে ভুচুর দেওয়া শালপাতার দোনার মোড়ক থেকে পান বের করে মুখে দিল। জর্দা ফেলল মুখে। সামনেই মস্ত একটা হররা গাছ। এত উঁচু যে, ঘাড় পেছনে হেঁটে হেঁট করে তাকাতে হয়। এই হর্‌রার ফল বাঁদররা খুব শখ কবে খায়। মানুষও খায়। হজ্‌মী হিসেবে। কাশির ওষুধ হিসেবেও খায়। কালো কালো দেখতে থাকে ফলগুলো প্রথমে। পরে সবুজ হয়ে ওঠে। এ দিয়ে আদিবাসীরা তাদের বাড়ি-ঘর রঙ কবার জন্যে একরকম রঙও তৈরী করে। হাল্‌কা হলুদ রঙ হয়।

হঠাৎ দিগা বলল, তুমি যেগুলো দিলে, সেই সব-দাঁবাইয়াই কি খেতে হবে?

নিশ্চয়ই।

দিগা হাসল। বলল, জঙ্গলে অনেকইরকম ওষুধ আছে। আমি জড়ি-বুটি করে দু-তিনদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাব পিরথুবাবু। চিন্তা কোরো না।

পৃথু রেগে বলল, খাবেই না যখন, ওষুধ তখন অত হাঙ্গামা করালে কেন ?

হাঙ্গামা করে, তুমি আনন্দ পেলে, তাই আপত্তি করিনি।

হাসি-হাসি মুখে দিগা বলল।

তারপর বলল, কারো আনন্দেই বাধা দিতে নেই। তোমার বিবেক আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে বলল। তোমরা আমাকে ভালবাসো যে, তা ও' আমি বুঝি। ওষুধ চাই না, ওষুধ খাবো না বলে ওখানেই তোমাদের সঙ্গে মারামারির দরকার মনে করিনি। তোমাদের মনের খুশির দাম, নিশ্চয়ই এই কটি ওষুধের দাম এর চেয়ে বেশি ? তাই না ?

কিছুই না বলে,পৃথু স্টীয়ারিং-এ হাত ছুঁইয়ে অ্যাকসিলারেটরে ডান পায়ের পাতা রাখল আলতো করে।

দিগা আবার বলল, এবার দেখছি, একদিন তোমাদের সঙ্গে ঝগড়াই করতে হবে। তোমরা যে রোজ আমাকে এত এত ভিক্ষা দাও, থলে ভর্তি চাল ডাল আলু ; এ সব আমার পছন্দ হচ্ছে না। জানো, পিরথুবাবু, মাধুকরী করে খাওয়া আর ভিক্ষা করে খাওয়ার মধ্যে অনেকই তফাৎ আছে।

পৃথু চকিতে একবার দিগার মুখে চেয়েই, চুপ করে জীপ চালাতে লাগল।

তফাৎটা যদি তোমরা নিজেরা না বোঝ, তাহলে আমি তোমাদের বোঝাতে পাবি এমন সাধ্য কি আমার আছে ? ভিক্ষা আর মাধুকরী এক জিনিস নয়। আমাকে ভিখিরী ভেবো না।



মেয়েত আর কম দেখলাম না। ও সব মেয়েকে আমার বুঝতে বাকি নেই।

রুষা বলল।

কার কথা বলছ ?

পৃথু কলম থামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল।

কার কথা আবার ! তোমার প্রেমিকার কথা। এই নাও চিঠি। ডাক-বাক্সের মধ্যে একটা বিচ্ছিরী টিকটিকির সঙ্গে জড়াজড়ি করে ছিল।

চিঠিটি ছুঁড়ে দিল রুষা। পৃথুর প্রায় মুখেরই উপর।

পৃথু ব্যথিত চোখে চেয়ে বলল, একী ! খুলল কে ?

আমি।

সার্জেন্ট মেজরের মতো বলল রুষা।

পরের চিঠি খোলা অভদ্রতা !

তুমি আমার পর নও। দ্বিতীয়ত...

কি ? দ্বিতীয়ত কি ?

তা আমি বলব না। প্রেম না ছাই ! বিয়ে করেছে একটা অপোগণ্ড গুড ফর-নাথিং-কে। এখন

তোমার টাকা পয়সার উপর লোভ। তুমি কি মনে কর,কুর্চি তোমাকে ভালবাসে ? ও সব দেখানো ভালোবাসা। কিছু শাড়ি গয়না বাগিয়ে নেওয়ার মতলব ! কোন্‌দিন কম্পানীর শেয়ার-টেয়ারও লিখিয়ে নেবে তোমাকে দিয়ে। মেয়েদের তুমি কতটুকু চেনো ? খবর্দার বলে দিলাম। আমার একটা সম্মান আছে। এই ধরনের ক্যারাক্টারলেস মেয়ের সঙ্গে, স্পেশ্যাল স্ট্যাটাসহীনের সঙ্গে হরদম যদি হবনব্‌ করো ত আমি ডিভোর্স চাইব। তোমার কোন্ গুণটা আছে বলতে পারো ? কোথায় কেরীয়ারিস্ট হবে, তাড়াতাড়ি ডিরেক্টর হবার চেষ্টা করবে, তা না নিজের কাজ নষ্ট করে কবিতা লেখা নিয়ে পড়ে থাকো। কবি সাহিত্যিকরাও আজকাল কেরীয়ারিস্ট, তাঁরাও নিজেদের বৈষয়িক ভালটা কিছু কম বোঝেন না। তুমিই যেন একমাত্র কবি এসেছ, আর্টিস্ট এসেছ ভ্যান গো ! হাসি পায়। তোমাকে পরিষ্কার বলে রাখছি কবি-সাহিত্যিক হওয়ার ধান্দা তোমার ছাড়তে হবে। আমি একজন ফরেন কোয়ালিফায়েড এঞ্জিনীয়রকে বিয়ে করেছিলাম, ভোলে-ভালা কবিকে নয়। এনাফ্ ইজ এনাফ। তাছাড়া, সংসারের কোন কাজে তুমি লাগো ! আমি, এই একা মানুষটা, ছেলেমেয়ে, নিজের সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিয়ে হিমসিম্ খেয়ে যাই চব্বিশ ঘণ্টা আর তুমি ? বসে বসে প্রেম করো। আনথিংকেবল্। ফাইডালিটি ছাড়া, আর কোনো গুণই ছিলো না অবশিষ্ট। এখন দেখছি, সেটাও গেছে! সেখানেই ত' সব টাকা ঢেলে আসছ। আমাকে আর দেবে কি ? এই কটা টাকাতে আমি সংসার চালাতে পারব না বলে দিচ্ছি। এভাবে মানুষ বাঁচতে পারে ? কোনো মানুষ এভাবে বাঁচে না। বিয়ে করেছিলে কেন তুমি ? কী রাইট্ ছিল তোমার, আমার জীবনটা এমন ভাবে নষ্ট করবার ? আমার বাবা, সারেঙ্গী বাজিয়ে আর বড়লোকের মোসাহেবী করে ফ্যামিলী মেইনটেইন করতেন না, কুর্চির বাবার মতো। কুর্চি ! রিয়্যালী ! কী টেস্ট হতে পারে এক একজন মানুষের। ভাবনারই বাইরে।

রুষা !

থম্‌থম্ করে উঠল পৃথুর গলা।

মনে হল, বাঘ ডেকে উঠল জঙ্গলের মধ্যে, সন্ধের মুখে।

থমকে গেল রুষা।

পৃথুর এমন গলা বেশি শোনেনি রুষা।

পৃথু বলল, কুর্চির বাবা নিমুকাকা সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না। স্যুট না পরলে, ইংরিজীতে পণ্ডিত না হলে কী সিভিল সার্ভিসের অফিসার না হলেই মানুষ কিছু অমানুষ হয়ে যান না। তোমার কথাবার্তা তোমার বংশ পরিচয়ের আদৌ যোগ্য নয় রুষা। ভবিষ্যতে কখনও এমনভাবে কথা বলো না কারো সম্বন্ধেই। অন্যকে সম্মান দিও ; তবে নিজেও সম্মান পাবে।

সম্মান কী করে পেতে হয়, তা তোমার কাছে শিখব না আমি !

শুধু আমার কাছে কেন ? সকলের কাছেই সকলের শেখার আছে। শেখার কি শেষ আছে রুষা ? মৃত্যুর দিন অবধি মানুষ শেখে,অবশ্য শিখতে যে চায়। অন্য প্রত্যেক মানুষের কাছেই তার কিছু না কিছু শেখার আছে। বড় ছোট, গরীব বড়লোক, শিক্ষিত অশিক্ষিত।

তোমার বক্তৃতা শোনার সময় আমার নেই। আমি চললাম।

দাঁড়াও। আমার চিঠি, কোনো চিঠিই ভবিষ্যতে তুমি খুলো না। শিক্ষিত মানুষমাত্রই কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকেই। সেই ব্যক্তিসত্তা তার নিজের। নিজেরই একার। সেখানে তার স্ত্রী, স্বামী, ছেলে মেয়ে, অফিসের বস কারোই প্রবেশাধিকার নেই। এটা গোপনীয়তার ব্যাপার নয় রুষা,এটা আধুনিক মানুষের বেঁচে থাকার একটি অত্যন্ত জরুরী শর্ত। তোমার ব্যক্তিসত্তা তোমার, আমারটা আমার। আমার ব্যক্তিগত জগতে তোমার প্রবেশাধিকার নেই কোনো।

বড় বড় বাংলা বোলো না। আমি বাংলা ভাল বুঝি না। তবে যা বললে,তা পুরোপুরিই রেসিপ্রোকাল সবসময়ই কথাটা মনে রেখো। উ কান্ট হ্যাভ দ্যা কেক এণ্ড ঈট্ ইট্ টু। আরও একটা কথা। উ্য মাস্টজেটিসান্ কুর্চি। শী ডাজনট্ বিলঙ্ টু আওয়ার ক্রীড্ আওয়ার কাল্‌চার, আওয়ার ক্লাস। শী ইজ আ নন-এনটিটি। আর তার বর ! মাই গুডনেস্। কোনো দিক দিয়েই কুর্চি

তোমার যোগ্য নয়। তুমি মিসেস চ্যাটার্জীর সঙ্গে কী আমার স্কুলের চুমকির সঙ্গে অথবা মহিলা সমিতির রাণী বা শান্তার সঙ্গে প্রেম করলেও আমার কিছুই বলার ছিলো না। অফ ওল পার্সনস্ ; কুর্চি !

পৃথু, এক টিপ নাস্য নিল মাথা পরিষ্কার করতে। হয়ত রুষাকে রাগাতেও।

সেদিন নীলিমাদি জিগগেস করছিলেন ক্লাবে, বাই এনী চান্স্ রায়নাতে যে ভাঁটু এবং কুর্চি বলে একটি কাপল এসেছে তারা কি মিঃ ঘোষের রিলেশান্ ? আমিই এড়িয়ে গেছিলাম। বলেছিলাম, সকলেই ওয়েলপ্লেসড বা ফেমাস লোকের রিলেশানস্ বলে নিজেকে দাবী করেন। ঊ্য নো। বুঝতেই পারেন !

নীলিমাদি হেসেছিলেন।

বলেছিলেন তা যা বলেছ ভাই ! তোমার সামুদা এতবড় কোম্পানীর নাম্বাব টু বলেই হেঁদিপেঁচি সকলেই তার কাজিন্ বলে ক্লেইম করে। বরিশালে বাড়ি হলেই হয়ে গেল। ওল বরিশালিয়াজ্ ক্লেইম টু বী হিজ কাজিনস্।

পৃথু বলল, আমি সামান্য লোক। সামুদাব মতো বড় চাকরী কবি না, অত বড় কম্পানীতে ত' নয়ই। ওঁর সঙ্গে আমার কোনোদিক দিয়েই তুলনা হয়না।

কথা ঘুরিও না। একটা উদাহরণ দিলাম। প্লীজ পৃথু। প্লীজ ! লেন্ড মী ইওর ইয়ারস। এ ব্যাপারে আমি স্টাবর্ন। এবং স্টাবর্ন থাকব। এসব ইণ্ডিয়াটিক সিলী ব্যাপার আমি স্ট্যাণ্ড করব না। তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। আমার কথা যদি না শোনো, তাহলে ঊ্য হ্যাভ টু রিপেণ্ট ফব দ্যা কনসীকোয়েন্সেস।

ওকে। থ্যাঙ্ক ঊ্য।

পৃথুর মুখ দিয়েও হঠাৎ ইংরিজী বেবিয়ে গেল। সঙ্গগুণে কত কীই-ই ঘটে, কত অবিশ্বাস্য উন্নতি।

রুষা চলে গেলে অনেকক্ষণ পৃথু চেয়াবে গা এলিয়ে বসে রইল। পৃথু ভাবছিল, এই জন্যেই এদেশের কিছু হলো না। হবে না। সব ব্যাপারে জাত পাত। স্ট্যাটাস্। ক্লাস – কনশাস্‌নেস্। এমনকি ভালোবাসার ব্যাপারেও। ভাবা যায় না !

বেচারী কুর্চি ! কন্‌ভেন্ট-এ পড়াশুনো করেনি। বাবা বড়লোক ছিলেন না। অতএব সে একটি মানুষই নয়। রুষার অ্যাপ্রুভড্ স্ট্যাটাসের অন্য যে-কোনো মহিলার সঙ্গে পৃথুর কোনো মিষ্টি সম্পর্ক থাকলে, সেটা রুষা সহ্য করত। কিন্তু কুর্চির সঙ্গে সম্পর্ক। নো। নেভার। ভাবাই যায় না।

কান দুটি গরমে ঝাঁ ঝাঁ করছিল পৃথুর। কুর্চির পাঠানো খামটি খুলেই নিরস্ত হয়নি রুষা। চিঠিটি পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলাব চেষ্টা করেছিল। কিছুটা ছিঁড়েওছিল। পরে হয়ত কী মনে হওয়াতে, এনে দিয়েছিল।

পৃথুদা,

আজ ভাঁটু জবলপুর গেছে সকালে। এখানে বুধবার একাই আছি। দাঈ যদিও আছে, কিন্তু আমার ভয় করে। আপনি এলে, বেশ আমাকে পাহারা দিতে পারতেন।

এইটুকু পড়েই পৃথুর মনে হল, বাঃ। কুর্চি ত বেশ লিখেছে !

কুর্চিকে পাহারা সে নিশ্চয়ই দিত কিন্তু পৃথুকে পাহারা দিত কে ? ভয় কি শুধু চোর-ডাকাত-আর জংলী জানোয়ারকেই ? মানুষের নিজের মনের মধ্যে শরীরের মধ্যে যেসব ভয়াবহ জন্তু-জানোয়ার চোর-ডাকাত বাস করে তাদের হাত থেকে নিজেকে পাহারা দেওয়া যে কত কঠিন কাজ তা কি কুর্চি জানে ?

আবার মনোনিবেশ করল চিঠিতে।

"সাড়ে সাতটাতেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। আজ বায়গনভাত্তা করেছিলাম, পেঁয়াজকুঁচি কাঁচালঙ্কা টম্যাটো ধনেপাতা দিয়ে। ঠিক আপনি যেরকম পছন্দ করেন। খেতে বসে আপনার কথা খুবই মনে পড়ছিল।

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার কারণও ছিল। কান্‌হা ন্যাশানাল পার্কএ জন্তু জানোয়াব অনেক বেড়ে যাওয়ায় এদিকে সন্ধ্যের পর নানা জানোয়ারই চলে আসে। বুনোশুয়োর, ভালুক, খরগোশ, হরিণ এসব ত' অনেকই ; মাঝে মাঝে ফেউ-এর ডাকও শুনি।

গত সপ্তাহে ত এক কাণ্ডই ঘটে গেল ! বিকেলে চা খেয়ে বাড়ির পেছনের সবজি বাগানে গেছি সালগম আর লেটুস্ গাছেদের তদারকি করতে। হঠাৎই অদ্ভুত ডাক শুনে চমকে চেয়ে দেখি একদল ঢোল্ জঙ্গল থেকে একটি হরিণকে ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে মুখে, চাপা, সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উত্তেজিত সম্মেলক ডাক ডাকতে ডাকতে। আমাদের বাড়ির পেছনের টাঁড়ে ঝাঁটিজঙ্গল এবং অনেকই নালা আছে।খোয়াই। আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন। হরিণটা একটি নালার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল হঠাৎই হোঁচট খেয়ে। অথবা কী জানি, এক লাফে পেরোতে পারল না বোধহয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢোলগুলো এসে পড়ল তার উপরে।

কী বলব পৃথুদা পনেরো মিনিটের মধ্যে হরিণটাকে নিশ্চিহ্ন করে খেযে চলে গেল ওরা আবারও জঙ্গলে। টাঁড়, খোয়াই এবং ঝাঁটিজঙ্গল পেরিয়ে, পড়ে থাকল শুধু হরিণের শিংটা। ওদেব চোখে শুধু ক্ষিদেই ছিলো না এক বীভৎসতাও ছিল ; প্রতিহিংসার আগুন, বেহড়ের ডাকাতদের চোখে যেসব থাকে।

দেখে, গা গোলাতে লাগল আমাব। তাও ত' হরিণটা পুরুষ, তাই-ই তার কিছু স্মৃতি রয়ে গেল। পড়ে-থাকা শিং-এর মধ্যে। মেয়ে হরিণ হলে তার কিছুমাত্রই অবশিষ্ট থাকত না। এদেশে মেয়ে জাতীয়বা খাদ্য হলে, উচ্ছিষ্ট হযে থাকাব গ্লানি থেকে তারা মুক্ত হয়। তাদের মৃত্যুতে কোনো ফাঁক-ফোকর থাকে না। এইটুকুই আনন্দ।

এ ত জঙ্গলের কথা। জঙ্গলের ঘটনা। মানুষের জঙ্গলেও এমন কত ঘটছে রোজই। তা দেখার চোখ কজনেরই বা আছে বলুন ?

আজ বোধহয় অমাবস্যা। বাইরের ঘন অন্ধকার এবং দাঈয়েব কোমরেব বাতের ব্যথা বাড়ার কারণে আজ যে অবশ্যই সে বিষয়ে নিশ্চিতই হচ্ছি একরকম। শোওয়ার ঘরে খাটে শুয়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। খাওয়ার পর বাতি নিবিয়ে দিয়ে বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। আকাশ ভরা তাবা। জ্বল জ্বল করছে। হেমন্তের আকাশে।

কতদিন আপনার সঙ্গে জঙ্গলে যাই না, না ? বারে বারেই মনে হয়, সেই বহু-উচ্চারিত তবু না-পুরোনো রবীন্দ্রনাথের গানটি।

আমাদের গেছে যে দিন একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি ?

তারপরই মনে হয়, বাতেব সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

বানিয়ে বলিনি কিন্তু। আছেই যে, তা আমাব মতো সত্যি করে আর কেউই জানেনা।

পৃথুদা, মনে পড়ে, একদিন আপনিই বলেছিলেন যে, আপনি অগ্নিদেবের মতো একা। তাঁর পরিবার পরিজন কেউই নেই।

ত' শুনে আমি বলেছিলাম মোটেই নয়। আপনি চন্দ্র। যার সাতাশ জন পরমাসুন্দরী স্ত্রী। আপনি হেসেছিলেন শুনে। বলেছিলেন, চন্দ্রদেব খুবই রূপবান। শুধুমাত্র এই কারণেই আমি চন্দ্রত্বর পরীক্ষাতে ডিস্‌কোয়ালিফায়েড্।

অগ্নিদেবের কথা আপনি বলেছিলেন। অগ্নিদেব একা একা আকাশে ঘুরে বেড়াতেন। নিজের মনে। এমনিই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই একদিন সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। রূপের ছটায় জ্বলজ্বল করছিলেন তাঁরা। তিনি তাঁদের পেতে ইচ্ছা করলেন। এবং সেইমতোপ্রস্তাবও পাঠালেন তাঁদের কাছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হলেন। এই অপমানে অগ্নিদেব গভীর জঙ্গলে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। লজ্জায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করতে চাইলেন। তখন দক্ষ কন্যা স্বাহা অগ্নিদেবের মতো দেবতার এমন কাণ্ড দেখে বড় দুঃখ পেয়ে নিজের রূপ পরিবর্তন করে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অগ্নিদেব স্বাহাকে গ্রহণ করলেন এবং স্বাহাই হয়ে গেলেন অগ্নিদেবের স্ত্রী।

কিন্তু আকাশের স্বর্গের অগ্নিদেবও ত' পুরুষ এই ধরাধামের পুরুষদেরই মতো! একই নারীতে চিরজীবন আসক্ত থাকা বোধহয় পুরুষের ধর্ম নয় । মানুষ, পিশাচ, দেবতা, যাইই সে হোক না কেন পুরুষ হলেই বোধহয় এ নিয়ম খাটে !

স্বাহা থাকতেও সপ্তর্ষির সপ্ত স্ত্রীদের পাবার ইচ্ছা অগ্নিদেবের গেল না । স্বাহা বেচারী পড়লেন অন্তর্দ্বন্দ্বে । একবার অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ গ্রহণ করে শিবাকে, অগ্নিদেবকেও এবং নিজেকেও মিথ্যাচারের শিকার করেছেন তাইই আবারও ঋষিদের স্ত্রীদের রূপ ধরতে তাঁর আর ইচ্ছে গেল না । স্বাহা, অন্য অনেক মানুষীরই মতো' ভাবলেন, পাখি হয়ে এই অনল-বনের বাইরে উড়ে গিয়ে শান্ত হবেন । শুধু ভাবাই নয় । যেহেতু তিনি মানুষী নন, সেইহেতু তা করতেও পারলেন । পাখি হয়ে উড়ে এক পাহাড়ের চূড়োতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ।

কিন্তু হলে কী হয় । তাতে ত' নারীই ! অগ্নিদেব নিজের একমাত্র স্ত্রী, যাঁকে ইচ্ছেমত কাছে পাওয়া যেত, যার উপর সবরকম দাবীদাওয়া আদর-অত্যাচার চলত, তাঁকে কাছে না পেয়ে দিশাহারা হয়ে উঠলেন । বৌ-পালানো যে-কোনো পুরুষ মানুষেরই মতো। পাহাড়চূড়ো ছেড়ে উড়ে এলেন স্বাহা । আগে ত তিনি শিবার রূপ ধরেইছিলেন এখন সপ্তর্ষির ছয় ঋষির স্ত্রীদের রূপ ধরে অগ্নিদেবকে নিত্যনতুন নারী হয়ে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন । কিন্তু পারলেন না শুধু তেজবান বশিষ্ঠর তেজবতী স্ত্রী অরুন্ধতীর রূপ ধরতে । সাহসে কুলোল না। আমার যেমন কখনও সাহসে কুলোবে না রুষা বৌদির রূপ ধরতে, আপনি যদি কোনোদিন অগ্নিদেব হয়ে এই স্বাহার কাছে আসেনও । থুরি এই স্বাহা যদি কখনও...............

এদিকে স্বাহা গর্ভবতী হলেন । একটি পুত্রর জন্ম দিলেন । অদ্ভুতদর্শন হল ছেলেটি । ছেলেটিকে কিন্তু তিনি অগ্নিদেবের কাছে রাখলেন না । যে সন্তান, ছলনার মধ্যে দিয়ে আসে তাকে হয়ত কোনো নারীর পক্ষেই তার সহবাসের পুরুষের কাছে রাখতে ভয় হয় । পুরুষমাত্রই বাঘের মতো। নিজ ঔরসজাত শিশুকে ছিন্নভিন্ন করতে তাদের বিন্দুমাত্রও বাজে না ।

দেখুন কী লিখতে বসে কত কীই লিখে ফেললাম । অপ্রাসঙ্গিক। বাচালতা। হচ্ছিল, তারা দেখার কথা ! যেখান থেকে কত কথায়ই এসে গেলাম ।

হেমন্তের নির্মেঘ উজ্জ্বল কালো আকাশে চেয়ে সেই গানটির কথা মনে পড়ে গেল পৃথুদা । আমার গলায় যে গানটি শুনতে খুব ভাল বাসতেন আপনি ।"হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে ।.........

দেবতারা আজ আছে চেয়ে, জাগো ধরার ছেলে মেয়ে, আলোয় জাগাও যামিনীরে । এল আঁধার দিন ফুরালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো, জ্বালাও আলো আপন আলো জয় করো তামসীর" ।

পৃথুদা, অল্পবয়সের অনেক বিশ্বাস, আশা এবং কল্পনায় ভরপুর হয়ে যখন এই গান গাইতাম তখন মনে হত খুব সহজ বুঝি । আলো জ্বালিয়ে তামসীকে দূর করা খুবই সহজ । এখন বুঝি, কত কঠিন । কী সীমিত আমার ক্ষমতা, কী ক্ষুদ্র আমার এই মুঠি ; মুঠির জোর । আমার হাতে যে জোনাকির আলোটুকুও নেই ।

ভাবলেও খারাপ লাগে বড় ।

ঘুম এলোনা বলেই চিঠি লিখতে বসেছিলাম । কিছুতেই ঘুম আসছিলো না । কত কথাই যে মনে আসে এলোমেলো । জানি না, ভগবানের কী ইচ্ছা ! বেশ ত ছিলাম দূরে গিয়ে । কেন যে আবার আপনার এত কাছে ফিরে এলাম । কী যে হবে আমার ! ভাবলেও, ভয় করে ।

অনেক বড় হয়ে গেল চিঠি । তার দোষ আপনার । চিঠি লেখা আপনার কাছ থেকেই শেখা ॥ তখন বুঝতাম না, এখন বুঝি, আপনার কথা । আপনি বলতেন, চিঠির মধ্যে দিয়ে আমরা একে অন্যকে এত আগল-হীন, স্পস্ট, এবং কাছাকাছি করে পেতে পারি যে, তেমন করে মুখের কথাতে কখনই পাই না ।

যার পাওয়া, শুধু মুখের কথা অথবা চিঠিতেই সীমাবদ্ধ থাকে সারাজীবন তার কাছে অবশ্য চিঠিই ভাল । স্বাহারা চিরদিন স্বাহাই থাকে পৃথুদা । অন্য নারীর রূপ ধরে ছলনা করে অন্য নারীর সঙ্গে

সঙ্গমেচ্ছু পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে। এবং তার সন্তানকে নির্বাসিন দেয় পাহাড়ে জঙ্গলে। স্বাহার আনন্দ বলতে মাঝে মাঝে পাখি হয়ে বনে বা পাহাড়চূড়োয় উড়ে যাওয়া। তাও, তা আকাশপথের স্বাহারাই পারে একমাত্র। মর্তর স্বাহাদের ওড়াউড়ি, পাখি হয়ে পালিয়ে যাওয়া শুধু মনে মনেই।

বাইরে টি-টি পাখি ডাকছে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে। খুব জোরে জোরে। ঘুরে ঘুরে। কোনো জানোয়ার দেখেছে কি ? খোলা জানালা দিয়ে হেমন্তর বনের আর আকাশের আর তারাদের আর পাখিদের গন্ধ ভেসে আসছে। বড় শান্ত মন-খারাপ করা গন্ধ এ। হেমন্তর হিমের রাতের অন্ধকারের অ্যানোডাইজ-করা জড়ি-মোড়া জরায়ুর গন্ধ এ।

এখন কী করছেন পৃথুদা ? এখন রাত দশটা। আমি যখনই একা থাকি তখনই আপনার কথা ভাবি। আপনি কি কখনও আমার কথা ভাবেন ? একবারও ? খুব জানতে ইচ্ছে করে।

টেলীপ্যাথী বলে কি সত্যিই কিছু আছে? আছে কি নেই এরপর যেদিন দেখা হবে তখনই বুঝতে পারব। সুখে থাকবেন সবসময়।

—ইতি আপনার কুর্চি।

—চিঠিটা পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকল পৃথু। পৃথু ভাবছিল, স্বাহা তাহলে আসলে শিবা নয়। অঙ্গিরার স্ত্রী শিবা আসলে জানেই না যে, স্বাহা তাকে ....।

আশ্চর্য ! এই সব কথা একদিন ও নিজেই নাকি বলেছিল কুর্চিকে ! ওইই ভুলে গেছে। কিন্তু কুর্চি মনে করে রেখেছে।

বড বেশি মনে রাখে মেয়েটা। মনে রাখার মতো পাপ, মূর্খামি ও সংসারে আর দুটি নেই। যে ভুলতে না পারে, তার মৃত্যু অবধারিত !

দুখী এসে বলল, খনা লগা দিযা সাহাব !

হঠাৎ দুখী ! মেরী কোথায় ?

ভাবল পৃথু।

বলেও ফেলল দুখীকে।

দুখী বলল, ঘর চলা গ্যয়া।

ঘর ? কাহে ?

কাল সুব্বে রায়না যায়েগী মেরী বহিন্।

রায়না ? কাহে ?

মেমসাব এক খাত ভেজিন মেরী বহিন সে। মেমসাবকা কোঈ রিস্তেদার হ্যায় না উঁয়া ? উও মোটে বাবু, ভাঁটুবাবু। আযা থা না উস্‌দিন ? উন্‌হিকা পাস।

শংকিত হল পৃথু মনে মনে। কোন্ নিউক্লিয়ার বোমা পাঠাল রুষা কে জানে ? বেচারী কুর্চি।

আইয়ে সাব।

দুখী আবার বলল।

ক্যা খনা বনায়া লছমার সিংনে আজ ?

অ্যাস্‌পারাগাস্ স্যুপ। ফ্রায়েড চিকেন। স্যালাড ঔর সুফ্‌লে।

ধুস্‌সস...“ স্......।

স্বগতোক্তি করল পৃথু।

ক্যা সাব ? আপ নারাজ হ্যায় ?

আমি খাব না রে। মেমসাহেবকে বলে দিস।

কাহে সাব ?

কী জ্বালা ! এও দেখি, মেরীরই ভাই।

পালা। পালা। যা ! বলছি, পালা।

দুখী চলে গেলে, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল পৃথু।

আজ বাতে হাতে-গড়া গরম গরম পাতলা মুচমুচে রুটি, তার সঙ্গে কুর্চি যেমন করে বানায় তেমন করে বানানো বায়গনভাত্তা। সঙ্গে আঁওলার আচার আর ক্ষীরার রাইতা। বেশ হতো তা হলে।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল ও। রাতের দ্বিতীয় প্রহরেই।

জানালা দিয়ে আকাশে চেয়ে ছিল পৃথু। খানা-কামরা থেকে স্যুপ-প্লেটে স্যুপ-স্পুনের ঠোকাঠুকির আওয়াজ আসছে তখন। একটি শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত, নিয়মবদ্ধ, সুধন্য সাহেবী পরিবাব ডাইনীং-টেবলে বসে। ন্যাপকিন সাজানো, যেখানে যেটি থাকার কথা। মাছ এবং মাংস খাওয়ার আলাদা আলাদা ফর্ক। কোথাওই কোনো অমিল নেই। নেই ছন্দপতন।

তার ছেলে এবং মেয়ে নিখুঁত টেবলম্যানার্স-এর পরাকাষ্ঠার সঙ্গে মায়ের সঙ্গে ডিনারে বসেছে।

জানালা দিযে হেমন্তর উজ্জ্বল তারাভরা স্নিগ্ধ কালো আকাশ দেখা যায়। পেঁচারা ঝগড়া করে পিছনের টাঁড়ের উপরে উড়ে উড়ে। ঘুরে ঘুরে। কিম্ভুতকিমাকার বেসুরে। কিঁচি-কিঁচি কিচর্ কিঁচি-কিঁচর্ ব্....

কোথাও প্রেম নেই, কারোই নেই। বড়ই ঝগড়া চারদিকে। ভাল লাগে না পৃথুর। পৃথু বড়ই কাঙাল একটু ভালবাসার, আদর যত্নর; তাইই বোধহয় ওর জীবনে এমনটি হল।

ওর খুবই ইচ্ছে হয় এমন অন্ধকারে উদ্বেল আকাশে পাখি হয়ে উড়ে যায়। তারপর আঁষটে-গন্ধ ডানায় তারাকুচি মেখে, শিশিরে এবং ভিজে ধুলোর গন্ধ মেখে পৌঁছে যায় সেই পাহাড়চুড়োয়, যেখানে অন্য এক নরম সাধের পাখি, সুখের পাখি দুখের পাখি হয়ে স্বাহা উড়ে আসবে। অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধকারতর একটি কালো বিন্দুর মতো।

ঘর অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার। আকাশে অন্ধকার। সব অন্ধকার। মানুষ-মানুষীর যা-কিছু সুন্দব অনুভূতি, পাওয়া, যা কিছু আশ্লেষে চাওযা সব ত অন্ধকারেই! ভালো খুবই ভালো তুমি! কালো, নরম, তারাকুচি আব শিশির-ধোওয়া হেমন্তর এই হিমেল অন্ধকার! তুমি আলোর চেয়েও ভাল গো! হতভাগা, এই সংসারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পৃথুর না-বওয়া চোখের জল তারাদের গায়ে বিন্দু বিন্দু আলো হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে। হতে থাকবে সারা বাত। দেবতারা সব আছে চেয়ে। গাছেরা, পাহাড়েরা, নদীরাও সব চেয়ে থাকে। পৃথু ত ওদের মধ্যেই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে, একটা অসভ্য অশিক্ষিত জঙ্গুলে মানুষ।



শীতটা এবার বেশ জাঁকিয়ে পড়বে মনে হচ্ছে।

কার্তিকের শেষ। আজ লীট্টি খেয়েছিল ঠুঠা রাতে। বেগুনভাত্তা দিয়ে। পালামৌ থেকে দারোয়ান মুনাব্বর সিং-এর রিস্তেদার এসেছে। সে জাতে ছত্তিশগড়িয়া হলে কী হয়, পালামৌতে এক বাঁশের ঠিকাদারের কাছে কাজ করেছে বহুদিন হল। তাই ছাতুর লীট্টি, মাখনী ইত্যাদি নানারকম বিহারী খাবার রাঁধতে শিখে এসেছে। ছাতুর লীট্টির মধ্যে আবার গরম গাওয়া ঘি ঢেলে দিতে হয়। জবজব করে।

খেয়েছে ত' জমিয়েই, কিন্তু ছোক্‌রাদের পেট আর ঠুঠার পেট! পেট একেবারে পাথরের মতো ভারী হয়ে রয়েছে।

আজ ওর অফডে, রাতে ডিউটি নেই। থাকলে, তাও হাঁটাহাঁটি করে হজম করার সুবিধে হত।

খাওয়াদাওয়ার পর একটা চুট্টা টেনে কোয়ার্টারে এসে শুয়েছিল। ওর কোয়ার্টারে ও একাই থাকে। ঘরটা বেশ বড়ই। কুয়োতলাও কাছেই। মস্ত আমগাছ আছে একটা প্রায় মাথার উপরে, ছাতা ধরে। ঝাঁক্‌ড়া গাছ, যদিও আমের স্বাদটা একেবারেই ভাল নয়। গরমের সময় দুঃসাহসী ভাল্লুক কম্পাউণ্ডের পেছনদিকের কাঁটাতারের বেড়া টপ্‌কে আম খেতে চলেও আসে কখনও কখনও। কর্তৃপক্ষ, ভালুকের চেয়ে মানুষকে বেশি ভয় পান বলেই মানুষ যেদিক দিয়ে ঢুকতে পারে সেদিকটাতে উঁচু দেওয়াল দেওয়া আছে। জঙ্গলের দিকে শুধুই কাঁটাতারের বেড়া। গরমের রাতে খুব সাবধানে ডিউটি করতে হয়। ভাল্লুকের সঙ্গে কুস্তী লড়তে কোনো লোকই চায় না। ভাল্লুক, জঙ্গলের লোকের সবচেয়ে বড় অমঙ্গল। বিনা কারণে, খামোখা যার তার সঙ্গে কুস্তী-লড়তে-চাওয়া এমন জানোয়ার জঙ্গল-পাহাড়ে নেই-ই বলা চলে। গরমের দিনে, আরও থাকে সাপ।

ঠুঠা বাইগা, পৃথুর পেযারের লোক বলে প্রত্যেক দারোয়ান, ঝাড়ুদার, নাইট ওয়াচম্যান ড্রাইভার সবাই-ই ওকে একটু সমীহ করে চলে। ঠুঠাকে সমীহ করা, পৃথুকে ভয় পাওয়ার কারণে নয়। পৃথুকে কেউই ভয় পায় না। সংসারে যে মানুষের অন্যের ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই তাকে কেউই ভয় করে না আজকাল। ক্ষতি করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ ক্ষতি করে না কারো, তাকে "মানুষ" বলেই পাত্তা দেয় না কেউ। পৃথু, বা "পাগলা ঘোষাকে" কেউই ভারী অফসর্ বলে মনেই করে না। ও বরং ওদেরই একজন কেউ। ভয়-ভক্তি করে না, কিন্তু একরকমের ভালোবাসা বাসে, সে ভালোবাসার রকমটা ঠিক কী, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। আপন এবং পরকে ভালোবাসার মাঝামাঝি এক রকম অনুভূতি সেটা। প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা খাবাপবাসার মাঝামাঝি কোনো বাসা।

গেটের কম্পাউণ্ডের চারদিকের মার্কারী ভেপার ল্যাম্পগুলো জ্বলছিল নীল স্বপ্নের মতো, শীতের রাতে ঘন সবুজ জঙ্গল আর নীল কুয়াশার কাঁথা জড়িয়ে নিয়ে গায়ে। আলো এসে পড়েছিল ঠুঠার আলো-নেবানো ঘরের একটিমাত্র কপাট-খোলা জানালা দিয়ে। হাঁপানীর মতো এক উপসর্গ দেখা দেয় ওর শীতকালে। প্রতি বছরই। এসব ছিলো না যতদিন খামারে-জঙ্গলে থাকত। কিন্তু এই কারখানায় থাকতে থাকতেই আরম্ভ হয়েছে এ সব। পৌষ এবং মাঘেই শুধু সব জানালা বন্ধ করে ঘুমোয় ঠুঠা। অঘ্রান মাস অবধি এই একটি জানালা খোলাই থাকে, সারা রাত। না-থাকলে, দম-বন্ধ লাগে। বুকে হাঁপ ধরে।

অফ্-ডিউটির রাত ছাড়া অবশ্য ঘুমোবার সুযোগই পায় না ও বিশেষ। রাতে জেগে থাকে, দিনে ঘুমোয়। পুবে আলো ফুটলেই ওর কাজ শেষ। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে লাটাখাম্বা নামিয়ে দিয়ে বড় বাল্টি করে জল তুলে ঝপাং-ঝপাং করে চান করে। নিজে হাতে দুটি রুটি আর তরকারী বানিয়ে খায়। চা কোনোদিন খায়, কোনোদিন বা খায় না। তারপর শীতকাল হলে আমগাছের ছায়ার বৃত্তের বাইরের রোদে চৌপাই টেনে এনে শোয়।

রোদের দিকে বন্ধ চোখে তাকালে রামধনু দেখে, ছোটবেলায় নর্মদার উপরে যেমন দেখত বর্ষার দিনে। টিকেরিয়া আর মান্দলার মধ্যের নর্মদাতে। গরমকালে, পুরোনো আমের ছায়ার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে চৌপাইটি লাগিয়ে, শুয়ে পড়ে ভোরের মিষ্টি হাওয়ায়। গরমের ভোরের হাওয়াকে খুব ভালবাসে ঠুঠা। তখন বানজার-এর তীরের গভীর জঙ্গলের মধ্যে "বান্‌জারী"র কথা মনে পড়ে যায় ওর।

জীবনটা একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেল। ভাল লাগে না। আবারও কয়েকদিনের জন্যে হঠাৎ ভেগে পড়ার সময় হয়েছে। কেটে পড়ার। মুক্কিতে দেখা হওয়ার পর দেবী সিং বলেছিল, আসবে হাটচান্দ্রাতে। কিন্তু আসেনি। আসবে কি করে ? ও সান্‌জানা সাহেবের ডেরায় থাকে এখন। আর, মুনজীটোলি বস্তীতে ওর পরিবার থাকে। ছেলের এবং মেয়ের ঘরের নাতি-পুতিসমেত মস্ত সংসার তার। জলকাদাতে লেপ্টে, থেবড়েবসা রোদের মতোই অবস্থা ওর। ঠুঠার মতো স্বাধীন, ওর জানাশোনা মানুষদের মধ্যে একজনও আর নেই। ওর নানারকম কষ্টের মধ্যেও ও যে স্বাধীন এ কথাটা মনে করে ওর খুব আনন্দ হয়। দুঃখের মধ্যে একমাত্র দুঃখ "বান্‌জারী" হারাবার দুঃখ।

গ্রামটাকেই যদি খুঁজে বের করতে না পারে, যদি আবার না গিয়ে দাঁড়াতে পারে ওর জন্মভূমিতে, ওর ছেলেবেলার খেলার দিনের ছায়া-রোদ্দুরে, তবে বেঁচে থেকে লাভ কি ? মরার আগে তার শিকড়কেই শুধু খুঁজে বের করবে না ঠুঠা, শিকড় উপড়ে ফেলবে বুনো শুয়োরের মতো দাঁত দিয়ে, নরম সুগন্ধি মাটি ফালা-ফালা করবে, তার জন্মস্থানের গন্ধ নেবে নাক ভরে। জন্ম দেবে নিজেকে নিজেই ; নতুন করে। রামখিলাওন্ দুবের মতো ও-ও দ্বিজ হবে।

তারপর মরলেও সুখ !

যার শেকড় নেই ; তার কিছুই নেই। শীতে-ফোটা গন্ধালা ফুলেরও শেকড় থাকে। যদিও তারা বহতা বান্‌জার নদীর পাথর-ভরা চিল-ছিপা জায়গাগুলোর মধ্যে মধ্যে মৃদুস্রোতা অথবা প্রায়-থির জলেই ফুটে থাকে। গন্ধালারদেরও শেকড় আছে, এমনই হল যে তারই শুধু নেই। তা হবে না। খুঁজে সে বের করবেই।

পেট, প্রচণ্ডই গরম হয়েছে। ছাতুর লীট্টি খেয়ে আঁই-ঢাঁই করছে শরীর। লীট্টি খাওয়ার আগে ভাঙ্গও খেয়েছিল। ভাঙ্গ-এর সরবৎ। হাটচান্দ্রার ওরা ত খায়ই, বিহার উত্তরপ্রদেশের মানুষরাও খুবই খায়। এই কারখানাতে এসেই, এসব দোষ হয়েছে ওর। নিজে নিজের মতো না থাকতে পারলে থাকার কোনো মানেই নেই। সে থাকা না থাকা সমান। পাঁচরকম মানুষের সঙ্গে মিশতে নেই ; ঠুঠার ঠুঠাত্ব একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল জঙ্গল ছেড়ে এসে। জঙ্গল, জঙ্গলই ; জংলী মাত্রই জানে। তার কোনো বিকল্প নেই। জংলীর আসল জায়গা জঙ্গলেই।

ঘুম আসছে না কিছুতেই।

নানা কথা, ছোটবেলার কথা, নানা গন্ধ, বাঘের গায়ের গন্ধ, নানা শব্দ, অমাবস্যার রাতের হুতোম পেঁচার ডাকের শব্দ ঘন বনের গভীর রাতের দূরের শট্‌গানের চকিত গম্ভীর শব্দরই মতো তার চেতনাতে ফিরে ফিরে আসছে। অবচেতনও, বর্ষাকালের কান্‌হার জঙ্গলের গভীর শালবনের নিচে নিচে ফোটা অজস্র কুকুরমুত্তা ব্যাঙের ছাতার মতোই ভরে যাচ্ছে, মাথার এক এক কুঠুরীতে দশটি দশটি করে, শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে। সাদা, কালো, লালচে, ক্ষয়েরী। কত রঙ তাদের। আকাশে কালো, শালবনে কালচে সবুজ আর শালবনের পায়ের কাছে রঙ-রঙিনা নরম আলোর কুকুরমুত্তা।

পুরোনো সাজা গাছের নিচে দেব-দেবীরা কথা কন ঠুঠার স্বপ্নে, কখনও মেঘগর্জনের মতো গুড়-গুড় স্বরে ; কখনও বা বাঁশপাতি পাখির গলার স্বরেরই মতো, মিষ্টি মিহি দূরের সুরে।

ঠুঠা বাইগা আসলে, নামেই বাইগা। তার ছোট্টবেলায় 'বান্‌জারী' হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে গোঁন্দদের বস্তীরই পাশে পৃথুর বাবার জংগল-খামারে মানুষ হয়েছে। তার শেষ কৈশোরের পর থেকেই আজ অবধি গোঁন্দদের সঙ্গেই তার মেলা-মেশা, ওঠা বসা। আসলে ও গোঁন্দই হয়ে গেছে। 'বান্‌জারী'র অন্য আর একটিও মানুষকে সে খুঁজে পায়নি। কোনো পরিবারের কোনো একজনকেও না।

কি হল ? কে জানে ? সবাই-ই কি একই সঙ্গে মরে গেল ? সবাইইকে একই সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটে গেছে বিস্মৃতির ধুলোর মধ্যে ? নিজের সমাজ ও পরিবারের মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে যে থাকল ; সে থাকল। যদি না সেইভাবে থাকল, এবং বিয়েও যদি না করল তাহলে সব মানুষই ভেসে যায় কচুরিপানার মতো। ঠুঠা ভাবে, চৌপাইয়ে এ পাশ ও পাশ করতে করতে। আশ্চর্য ! এমনকি গান্ধালা ফুলদেরও শেকড় থাকে। অমন মানুষেরা তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়। এতসব ভাবে বোঝে, তবু ইদানীং মাঝে মাঝেই ঠুঠার বড় কষ্ট হয় নিজের জন্যে। বিশেষ করে, যখন শরীর টরীর খারাপ হয়। বিয়ে করলে ও একটা ঝুপড়ি আমগাছেরই মতো ডালপালা ছড়িয়ে, পাতার ছায়ার আর চামরের নিচে ছেলেমেয়ে, নাতি-নাত্‌নী নিয়ে বাঁচতে পারত। পা-ছড়িয়ে, ঘরের দাওয়ায় বসে চুট্টা খেতে পারত, মহুয়া খেত ; দিল খুশ্ করে। একটা নাতি পা টিপত, অন্য নাতির নাত বৌ মাথা চুলকে দিত। বিয়ে না-করাটা, সময় মতো, ভুলই বোধ হয় হয়ে গেল ?

ঠুঠার বয়স এখন পঞ্চাশ হয়েছে, কিন্তু শরীরের বাঁধন তিরিশের মতো।বোঝার উপায়ই নেই । ও বুঝতে পারে যে, কোনো মানুষের জীবনেরই টাঁড়ে, বুদ্ধি বা জ্ঞান অর্জুন গাছের মতো যুগযুগ ধরে একপায়ে একই জায়গায় সটান দাঁড়িয়ে থাকে না। জংলী পলাশেরই মতো তারা চারা ছড়াতে ছড়াতে প্রতি বছরই সরে যেতে থাকে । নিজের পুরোনো নিজস্বতাকে রোদের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে ঠায় একা-একা দাঁড় করিয়ে রেখে চারিদিকে চারিয়ে-যাওয়া সবুজ সতেজ চারাদের মধ্যে নিজেকে চোরা-চালান করে করে, নড়ে নড়ে, সরে সরে আসতে থাকে ক্রমান্বয়ে । নিজে সরাও যা, নিজের সত্তাকে সরিয়ে নেওয়াও তাই-ই ।

এত্বসব বুঝতো না ঠুঠা, যখন বয়স কম ছিল । তখন বোঝেনি বলে, দুঃখ কিন্তু নেই তেমন । আজ অবশ্য বোঝে যে, এই-ই ত ঢের ! যা হয়েছে, যা বুঝেছে ; তাই-ই অনেক । বোঝাবুঝি যার শেষ হয়ে গেছে, যে স্থবির, অনড় বয়স শুনতে-ভোলা মেহগনি গাছ হয়ে অনন্তকাল ধরে একই জায়গায় দাঁড়িযে থেকে শুধু বড় থেকে বড়, তার থেকে আরও বড় হতে, হতে, হতে এত বেশি জীবন্ত স্পষ্ট ও চোখ-ধাঁধানো এক সময়-প্রহরী হয়ে যায় যে,সময় তাকে দীমক-পোকার মতো কাটতে শুরু করে তার অজানিতেই । কিন্তু সময় দিযে সময়কে গুণ করলে. অথবা যোগ করলে, অথবা বিয়োগ করলে যে হাতে অনড অচল সময়ই শুধু থাকে ; একথা মানী মেহগিনীকে বোঝাবে কে ? তাই-ই মান চায় না ঠুঠা, দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না একই জায়গায় । নড়ে-চড়ে, সরে-সরে, নতুন সবুজ চারাদেরই মতো।চারিদিকে চারিয়ে যেতে চায় সবুজ-সেনাব মতো। জীবনে । এ জীবন থেকে অন্য জীবনে । অন্য জীবন থেকে, অনন্ত জীবনে ।

অনেকই দেখেছে ঠুঠা । মৃতা হরিণীর উষ্ণ যোনিব গোপন গন্ধ নিয়েছে নাকে। অতর্কিতে গুলি-খাওয়া মৃত্যু পথযাত্রী বাঘের ভয়হীন বুকেব, বুক-ফাটা চকিত কান্নাও শুনেছে । মৃত্যুকে, মৃতকে ও বারেবার নানাভাবে শীতলতব, মৃততর করেছে । সদা-মৃত পুরুষ শিঙাল শম্বরের শুক্রকীটের ডাক শুনেছে । তার হাত ধরে তারা ডাইনীর মতো ডেকেছে, বলেছে, আয় ! আয় ! আয় ! সে ডাক শুধু নিজেই শোনা যায়, অন্যকে শোনানো যায় না ; জীবনের অনেক গভীর গা-শিউরানো ডাকেরই মতো। ও জেনেছে যে, সৃষ্টি বক্ষা করতে পাহাড-প্রমাণ শৌর্যর প্রয়োজন নেই, যা প্রয়োজন, তা সামান্য একটু দৃশ্যমান নৈকট্যর । সৃষ্টির শিকডেব কাজটা একেবাবে বড় নিঃশব্দেই ঘটে ! শিকড়মাত্রই নিঃশব্দ পদসঞ্চারী । যখন প্রোথিত হয় তখন এবং যখন উৎপাটিত হয় ; তখনও ।

এত্ব সব কথা, ঠুঠা এইরকম ভাষায় স্বভাবতই ভাবে না । ওর ভাষাটা কাঠ-খোট্টা। মানুষটারই মতো। ভাষা, শিক্ষিত, শহুরে মানুষের ! শিক্ষিত মানুষ মাত্রই যে অনেক ঘোরা-পথে চলে, ঘোবা-পথে ভাবে । ঠুঠার মুখের ভাষা অন্য, আর এ ভাষা শুধুই স্বপ্ন দেখার জন্য ।

ঠুঠা অনেকক্ষণ তার তপ্ত জঠবের মধ্যেব লীট্টি আব বায়গনভাত্তার সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি করে এক সময় ঘুমিয়ে পডেছিল । জানালা দিযে সবজে-নীল মার্কবী ভেপাব ল্যাম্প-এর আলো তার কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়িময় রুক্ষ কিন্তু কুটিলতাহীন পবিত্র মুখে এসে পড়েছিল ।

ঘুমের মধ্যে ঠুঠা বাইগা, দেবতা নাঙ্গা বাইগার সঙ্গে দেয়ালী করল একবার । নাঙ্গা বাইগীন্ দেখা দিল না ।

তারপরই সে বিড় বিড় করে উঠল, ঘুমের মধ্যে । পুরোনো দিনের মত গোপন মন্ত্র পড়ছিল ও ।

"নাঙ্গা বাইগীন, নাঙ্গা বাযগা ধরতি ঠাকুব দেও. ঘামসান বাওয়া সওয়া লাখ বনস্পতি যো ম্যায কাম করুত ত ওকর ডাহার মত যাবে ।

র্ত তবফ না, ওকব, সে ঝেঁচ যাবে, মাযলে হুচ্ছো ঝেঁচ যাবে যো যো দাওযাবিন বৃচেলে কান পাকাড়ই হিচ্ছো লানবে, মোর সে আনবে, ওক্করসে ঝেঁচ্ যাবে ।

মাইলে হুচ্ছো মোর ছোযাবে ত' তয ম্যায খানা দেঁহু, সিন্দুব, কাজর, একঠেনাবিহাব তোব চডহাবো আর মোরে সে গাডা করাই দেবে. আর শের মাররাই দেবে, তায় একঠে লাল কুক্বা, এক ক্ষয়রা কুকরা, এক ক্ষয়েবী পিলে তোয় দেঁহু ।

সতকবপাঠ হোবে ত' সাহী গাড়া কববে।"

হঠাৎই ধড়মড় কবে ঘুম ভেঙে উঠে বসল ঠুঠা তাব চৌপাইতে।

ঈসস সর্বনাশ হয়ে গেছে!

শোনেনি ত' কেউ? শুনে ফেলেনি ত' একজনও? এ যে বোদেকে গাড়া কবাবাব, মানে, মোষকে বাঘকে দিয়ে মড়ি কবাবাব মন্ত্র! কুমাবীব গোপনাঙ্গব মতোই অসূর্যম্পশ্যা, পবিত্র যে এ। জংলী শিকাবীব অন্তবেব অন্তবতম স্থানে থাকা গোপনতা। এ মন্ত্র, সে কি কবে বলে ফেলল? জোবেই বলেছে কি? শোনেনি ত' আব কেউই? হে বড়াদেব! হো নাঙ্গা বাযগা।

একটা চুট্টা ধবালো ঠুঠা, চৌপাইতে বসেই, শজাক-মাকা দেশলাই ঠুকে, ফসফস কবে। চুট্টাটা ধবানোব পবই ওব বাগ হল খুবই ছাতুব লীট্টিব উপব। গাল পাড়ল একটা। তাবপব নিঃশব্দে অনেক গাল পাড়ল নিজেকেও। গালাগালেব পাহাড় জমে গেল দেখতে দেখতে।

এসব গালাগাল কাবখানাব গালাগাল। ভাবী অসভ্য, অশ্লীল, ভিনদেশী! দিগা শুনলে, তাব বন্ধু পানকা ইতোযাব শুনলে, লজ্জায় ঘেন্নায় মবে যায়! এই দেশে কল-কাবখানা না-হওযাই বোধহয় ভাল ছিল বাযগা, গোন্দ কুই, মাবিযা, ভূমিহাব, ছত্তিশগাড়িযাবা বনপাহাড়েব দেবশিশু সব।

ছিল অন্তত।

শহবেব মানুষেব যত্ত লোভ-দেখানো ব্যাপাব আছে, জিগলিং-ঝিং-চ্যাক শাড়ি পড়াব লোভ, ক্যাটক্যাটে বঙেব নাইলনেব বুক-বাঁধুনি আব জাঙ্গি পবাব লোভ ট্রানজিস্টাবেব গোঙানিব জন্য এই নির্লজ্জ কাঙালপনা ঠুঠাদেব নিজস্ব সবকিছুকেই নষ্ট কবে দিল।

সবই।

মববে সব মববে শালাবা। সাবা পৃথিবী মববে। "বড়াদেব" সব দেখছেন, "মাবাই" দেখছেন, ধাবযা সাইআম হযাম উইকে, কুসুবে সব দেব দেবীই দেখছেন। কানা নন তাঁবা কেউই। নিস্তাব নেই কাবো। জঙ্গলেব ছেলেমেয়ে সব নষ্ট হয়ে গেল হো!

চুট্টাটা ফেলে দিয়েই হাসি এল ঠুঠাব মুখে। ওব মনে হল, হাসি দিয়ে পাকানো একটা নতুন চুট্টাই ধবিয়েছে ও হাসিব আগুন হাসিব ধুঁযো চাবিদিকে হাসিব গন্ধ। কত পুবোনো সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল ওব স্বপ্নটা! ওব স্মৃতিব ঝুঁটি বড় জোবেব সঙ্গে নেড়ে দিয়ে গেল। কত সব জঙ্গলেব বন্ধু-বান্ধব। পুবষ পুরুষ গন্ধ ভবা সময় ছিল, শব্দ ছিল। পুবনো। জান দিয়ে দেবে, কিন্তু দোস্তী দেবে না এমন সব জিগবী দোস্ত। হীবা সিং বাযগা, লিমরু বাযগা। হাবামজাদা, কিন্তু জববদস্ত শিকাবী দেবী সিং হ্যাঁ দুশমন হো ত', অ্যাযসা!

ভাল লাগল খুবই ঠুঠাব সকলেব কথা এমন হঠাৎ মনে পড়ে।

এমন সময় দবজায় টোকা পড়ল।

বিবক্ত মুখে ও বন্ধ দবজাটাব দিকে তাকাল

কে তা জানে ঠুঠা!

উধাম সিং সাহেবেব বুড়ো ড্রাইভাবেব ছুকবী বউ পুনিযা-বাঈ। বাতে ঠুঠা ঘবে থাকলেই আসবে একবাব। একই প্রশ্ন কববে। একই উত্তব শুনবে ঠুঠা বাইগাব কাছ থেকে। শুনে, চলে যাবে তবুও আবাব যেদিন ঠুঠাব অফফ ডে থাকবে কিংবা একা থাকবে ও বাতে ঘবে, সেদিন আসবেই মেযেটাব জন্য কষ্টও হয ব্রাহ্মণেব বউ। বামখিলাওন দুবে ড্রাইভাব, কবে না, হাণ্টচান্দ্রাতে এমন নেশা নেই। ওব মধ্যেব পুরুষ মানুষটা নিশ্চযই কুচো পাড়ছেন মাছেব মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে সব সময় শুয়েই থাকে। বড়ই শীত-কাতুবে, গবম-কাতবে, জল-কাতুবে সে মাছ। পাখি ডাকলেও ওঠে না বাঘিনী ডাকলেও না।

বাত আটটাব পব দুবে মবেই যায বলতে গেলে, নেশাব ঝোঁকে। ওব আগেব দু বউ ভেগে গেছে মাইহাব থেকেই মাইহাবে বাড়ি দুবেব। ছেলেমেয়ে নেই একটাও। এইবাবে, এই তৃতীয পক্ষ পুনিযা-বাঈ-এবও ভাগবাব সময় হয়েছে বোধহয।

ঠুঠা দবজা খুলল

পুনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। শীতের মধ্যে। একটা শেয়াল-রঙা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে। ঠুঠা জানে যে, পুনিয়ার ঘোর লাল-রঙা শাড়ির নিচে আর কিছুই নেই। অনেকদিন ভেবেছে যে, দরজাটি বন্ধ করে, ওকে টেনে এনে খাটিয়াতে ফেলে পুনিয়া যা চায় তা ওকে কোঁচড় ভরে একদিন দিয়েই দেবে। কিন্তু, ধর্মে বাধে। রামখিলাওন-এব সঙ্গে তার যে বড় ভাব। যখন নেশা না করে থাকে, তখন লোকটার মতো লোকই হয় না। অধর্ম, ঠুঠা করেনি কোনোদিনও। জেনে শুনে। ও নিজে যেটাকে ধর্ম বলে জানে, সেটাই ত' ধর্ম তাব কাছে। এতগুলো পাহাড়-উপত্যকার রোদ-চাঁদ-জল-ঝড়ের বছর নিজেকে এমন এমন অনেক পরীক্ষাতেই পাস কবিয়ে এনেছে।

পুনিয়া বলল, থোরিসী দুধ হোগী ? বড়হি জরুরৎ থী !

নহীলা! ম্যায দুধকি কারবারী নহী··। ম্যায় আহীর থোরী হুঁ !

পুনিয়া এখুনি চলে যাবে। প্রতি রাতেবই মতো। মেয়েটাব ধৈর্য অসীম। কিন্তু ঠুঠার ধৈর্যও কম নয়।

ঠুঠাকে দিগা পাঁড়ে শিখিয়ে দিয়েছে, "কো জগ কাম নাচার ন জেহী ?" পরন্তু, "করত মনোরথ জস জিঅা জাকে।" মানে জগতে কাম যাকে নাচায়নি এমন কে আছে ? কিন্তু যার হৃদয় যেমন, তাব ইচ্ছাও সেইরকমই হয়। লোকে লোকে তফাৎ থাকে।

পুনিয়া তখনও দাঁড়িয়েছিল। আবারও বলল, থোরীসি হোগী ? দুধ···

ঠুঠা আবার বলল, এ ! দেখ পুনিয়া ভাবী! হিঁয়া শেরকা দুধ মিল্‌ব। গাইযা-বোদেকে নহী ! চল। হঠ্‌ ! বড়ী রাত্‌অ ভইল।

পুনিয়া চলে গেল। বোজ একই রকম মুখ করে আসে, একই রকম মুখ করে যায়।

দিগা পাঁড়ে বলে, "জানি না জাই নারী গতি ভাই।" নারীর গতিপ্রকৃতি কিছুই জানা যায় না ভাই।

সত্যিই জানা যায় না। কোনোই সন্দেহ নেই।

পুনিয়া চলে যেতেই, ঘুম-ঘুম পেতে লাগল ঠুঠার। এতক্ষণে ছাতুর লীট্টির ভূত তাকে ছেড়েছে। বহুত দিন আগে বাস্তবের অবুঝমার পাহাড়ের মারিয়াদের কাছ থেকে কম্বলটা কিনেছিল। দরজা বন্ধ করে, জড়িয়ে শুয়ে পড়ে পাশ ফিরল। কম্বলের সঙ্গেও এক বকমের প্রেম হয়। সব শীতের রাতের পাখিরা [illegible] জানে।

ঠুঠা ভাবল।

মনে মনে বলল, সত্যি! অনেকই দিন হয়ে গেল, বাঘের দুধ খায়নি। খেয়েছিল, অবশ্য মাত্র একবারই। কানহাতে। বানজারের তীরে। কিন্তু এখন থাক্ সে গল্প। গল্প শোনাবাব আছেটাই বা কে ?

সেইসব বাঘেব দুধের মত খাঁটি দিনগুলোই সব চলে গেছে। ভেসে গেছে গন্ধালা ফুলের গন্ধেরই মতো, প্রস্তরময় বান্‌জারের ঝরঝরানি স্রোতে।



পড়ন্ত বেলার ঝাঁটি জঙ্গলের তিতিরেরমতোতিত্বর্-কিতর-কিত্বর্-তিতর্ করে ফোনটা বাজছিল।

বাড়িতে এখন রুষা আর কাজেব লোকজনেবা ছাড়া অন্য কেউই নেই। পৃথু ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে, আদৌ ফিববে কী না, তাও সেইই জানে। সকলকেই রুষাব বলা আছে, একটার মধ্যে না ফিবলে ধরে নিতে হবে যে, পৃথু খাবে না। তা সে কোথাও খেয়েই আসুক আর না-খেয়েই আসুক। কোনো একজন অবুঝ ইনকনসিডাবেট্ মানুষেব জন্যে ওব সংসাবে বিশৃঙ্খলা আনতে বাজী নয় ও আদৌ।

পৃথুর কথা ভাবলেও বিরক্ত বোধ করে রুষা আজকাল। না ভাবাই ভাল। বড়ই ক্লান্ত, একঘেযে হয়ে গেছে এই জীবন। দায়িত্বজ্ঞানহীন, প্রায় বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামীর এবং নাবালক অবুঝ ছেলেমেয়েদের বোঝা কাঁধে ন্যুব্জ হয়ে গেছে রুষা। টাকা দিলেই কি সব হয়ে যায় ? পৃথুবমতো মানুষ যে কেন বিয়ে করে, কেন তার ছেলেমেয়ে হয, তা ভাবনাবও বাইবে।

ঘড়ির দিকে তাকাল একবার ও। তাবপব বাজতে থাকা ফোনটার দিকে।

ভিনোদ !

নিশ্চয়ই ভিনোদের ফোন।

লঘু পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলল।

কী ভালো যে লাগে ! বাগানে একজোড়া বুলবুলি রঙ্গনের ডালে রঙ্গভরে ঝাপ্টা-ঝাপ্টি কবছিল শিষ দিতে দিতে। হেমন্তর হিম-হিম শিশু-দুপুর চমকে উঠছিল তাদেব বঙে-ঢঙে।

কী ভালোই যে লাগে !

ভিনোদের একটু গলার স্বর কানে এলেও যেন খুশিতে ভরে যায় মন। কে জানে ? কী থাকে, কী আছে ; এক-একজনেব গলার স্বরে ! কেন যে এমন বিপজ্জনকভাবে ভালো লেগে যায় এক একজন পুরুষকে এ জীবনে ! আর তেমন করে ভালো লেগে গেলে, কোনো নিয়ম, কোনো বাঁধন, কোনো শাসনই আর মানতে চায় না মন।

কী করছ ?

ভিনোদের সুন্দর, পুরুষালি গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে। ইংরিজিতেই বলছিল ও। ভিনোদেব সঙ্গে সাধারণত রুষাও ইংরিজিতেই কথা বলে। হিন্দী ; ভিনোদ ইদুরকার-এর কাছে প্রাকৃত ভাষা বাংলা যেমন রুষার কাছে।

আবারও বলল ভিনোদ, কী হল ? কি করছ তুমি ? কথা বলছ না যে !

বিশেষ কী আর করব ! কাজ করছিলাম।

এত কী কাজ কর ? সব সময় ?

এই ! একটু ধরো না, প্লিজ !

আবার কি হল ?

এক সেকেণ্ড আসছি।

চা-টা, ড্রয়িংরুমেই এনে দিতে বলে এল কিচেনে গিয়ে। মেরীকে। তাব পর চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ফোনের সামনে রুষা, আরাম করে। পেছনে একটি কুশান দিয়ে।

বলো।

তুমি বলো ! কত্তদিন তোমার গলা শুনি না।

আহা !

কত্তদিন পরে ফিরলাম হাটচান্দ্রাতে কিন্তু তোমাব গলায় ত' তেমন খুশি দেখছি না। কি হল ? যত প্‌রোনো হচ্ছি ততই কি সস্তা হয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে ? কী ভাল যে লাগে না, তোমার সঙ্গে এই একটু সময় কথা বলতে। কী বলব ! আজ আসবে আমাব বাড়িতে রুষা ? চলে এসো। পাঠাব গাড়ি ? তোমাব জন্যে বাযপুবের হোসসা সিল্কের শাড়ি এনেছি একটা। তুমি এসে নিয়ে যাবে নিজে ? এসো, এসো ; প্লীজ।

পাগল নাকি ? নাঃ। যত্বই বলো না কেন, আমি যাবো না। পাগলামি তোমাকে মানায় ; আমাকে মানায় না। ব্যাচেলবেব একা বাড়িতে বার বার যাওয়া··

কেন, না ? না কেন ? শাড়িটা নিতেও আসতে পারো না ?

এমন করে বলছ, যেন আমাব নিজের দামের চেয়ে একটা সিল্কের শাড়ির দামই বেশি হল ? সত্যি ! তুমি না !

আসলে, এমনিই। আমার ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে না ?

তোমার কাছে যেতে।

মিথ্যে কথা।

সত্যি ! তোমাব সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে, দেখা হলে ভাল লাগে। অন্য কিছু ভাল লাগে না। ভাল নয়, ওসব। তোমবা পুরুষবা বড জংলী। শুধু ঐ সবই বোঝো। তোমরা যখন ভিখিরী হও তখন তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান একেবারেই লোপ পেয়ে যায়।

ভিনোদ হাসল।

বলল, আত্মসম্মানজ্ঞান আর ভিক্ষা চাওয়া এই ব্যাপার দুটো একসঙ্গে যায় না। তাছাড়া, শরীরের মধ্যে কী আনন্দ নেই ? শবীর কি নোংবা ?

আছে হয়ত। কিন্তু তার চেযে মনেব আনন্দ অনেক বেশি গভীর।

বাজে কথা। মনটা ত' শরীবের মধ্যেই থাকে। শরীর না থাকলে মন থাকত কোথায় ?

জানি না। শরীর, বড নোংরাই লাগে আমার কাছে। শরীব কি চিরদিন থাকে ভিনোদ ? মনই চিবদিনের।

ছাড়ো ত। ফিল্‌সফাইজিং। চিবদিন যেন আমরা নিজেরাই থাকব ! অত্ত সব জানি না। যাকে ভালবাসি, তাকে শারীরিকভাবে কোনোদিনও না পেলে মনে হয় যে, সে বুঝি ভালই বাসে না আমাকে। এটাও একরকমের স্বীকৃতি। তোমার যে অদেয় কিছুই নেই আমাকে, এ কথাটাই শরীরের ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে নতুন কবে কখনও জানতে পেলে আমার পুরুষের ইগো স্যাটিস্‌ফাইড হবে। অন্য পুরুষদের কথা জানি না। আমি এরকমই।

তুমি বোকা, তাই-ই, জিনিসের দাম বোঝো না।

জানি ত'। আমি ত' বোকাই। তবু···

শরীর ত' যাকে তাকে হেলাফেলায়ই দেওয়া যায়। মানে, যাকে মনই দিতে পারলাম, তাকে আর শরীরটা দিতে বাধা কোথায় ?

অনেকই বাধা। সবসময়ই বাধা। তোমাকে দেখে ত' তাই-ই মনে হয়। তুমি একটি চাইনীজ ওয়াল।

ভিনোদ অভিমানের গলায় বলল।

আমাকে তুমি একটুও বোঝো না তাই-ই। আসলে, যা দামী, তোমরা, পুরুষরা, তাকে দাম না দিয়ে, যা সস্তা তাকেই মহামূল্য মনে করো। মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে তোমাদের এই বোকা-বোকা দুর্বলতার কোনোই মানে নেই। তোমার মত বুদ্ধিমান পুরুষও যে কী করে···

কী জানি। আমাদের যা দুর্বলতা ; সেটাই হয়ত তোমাদের বল। ভগবান পুরুষদের যে কেন এত দুর্বল করে গড়লেন তা তিনিই জানেন। শুধুই মানুষদের। জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে বোধহয়

এমন দুর্বলতা দেখা যায় না।

হেসে বলল ভিনোদ।

হাসল রুষাও।

ভারী সুন্দর কথা বলে ইদুরকার। ও আসলে জানে না, হয়ত জানবেও না কোনদিনই যে রুষা ভিনোদেব সুন্দর চেহারা, সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব, ওর অঢেল টাকা কোন কিছু দেখেই ভালবাসেনি ওকে। ভালবেসেছে, শুধু ওব কথারই জন্যে। "শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না" এমন একটি প্রবাদ ওর জানা আছে। কিন্তু প্রবাদটি বোধহয় সত্যি নয়। রুষার মধ্যে যে এক রোম্যাণ্টিক সত্তা আছে সেই সত্তা ভিনোদের কথাতে পুঁটিলেখা ফুলেরই মতো ফুটে উঠতে থাকে জড়াজড়ি-করা-সবুজ-পাতা ছড়াতে থাকে চতুর্দিকে, ফুল-কুঁড়িতে পরিবেশ ভরে দিয়ে। ভীরু বৃষ্টিব মতো ফিস্‌ফিস্ করে তার নারীসত্তার সার্সিতে সেই কথা চুমু খেতে থাকে অবিরত। তখন আগল খুলতে কোনো বাধাই দেখে না আর। রুষা অন্তত দেখে না। যদিও শরীর দেয়নি ভিনোদকে সে কখনও। যা উপ্‌চে চল্‌কে পড়ে, সেটুকুই দিয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কখনও সখনও। তার বেশি নয়।

কি হল? কথা বলছ না যে!

ভাবছি।

কি এত ভাবো?

ভিনোদ হালকা গলায় বলল।

তাবপর বলল, বেশি ভাবলে, মানুষ স্থবির হযে যায়। পাগল হয়ে যায়। পিবথু-দাদার মতো যাব মধ্যে যতখানি ভাবনা আঁটে, তার বেশি আঁটাতে গেলেই মরণ। কার মনে যে কতটুকু আঁটে, সেটা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত প্রত্যেকেরই। না থাকলেই বিপদ।

তোমার সঙ্গে কথায় পারব না।

জানোই যদি, তাহলে আমার কথা কাটো কেন?

কাটব না? কথা? মানুযেব এই-ই ত' এক বিশেষ আনন্দ। কথার কাটাকাটি খেলা, মানুষ ছাড়া; আর কোন্ প্রাণী খেলতে জানে, বলো?

তা ঠিক। তুমি কখনও পতঙ্গ্ উড়িয়েছো? ছেলেবেলায়? রুষা?

পতঙ্গ্! না। মেয়েরা কি পতঙ্গ্ ওড়ায় নাকি? সত্যি পতঙ্গ্ ওড়াইনি কখনও, তবে মনে মনে উডিয়েছি কথার পতঙ্গ্, স্বপ্নের পতঙ্গ্। সবসময়ই ওড়াই। আমি নিজেই ত' একটি কাটি-পতঙ্গ্। জীবনের আকাশে।

পির্‌থু দাদার কি খবর?

কথা ঘুরিয়ে ভিনোদ বলল।

ভিনোদ জানে, রুষার মতো মেয়ের সেণ্টিমেণ্টে সুড়সুড়ি দিলেই এরা বেশি সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে ওঠে।

রুষা বলল, কে জানে? তার কথা সেই-ই জানে। কোন্ ঘোরে যে থাকে! এতদিন ছিল কবিতা নিয়ে, এখন শখ হয়েছে প্রোজ্ লিখবে। মণি চাকলাদারের মতো! উপন্যাস! নভেল লিখছে। খুব নামের মোহ হয়েছে আসলে। ফেমাস্ লোক হতে চায়। আসলে, ও একটি কনফিউজড্ লোক। যোগ্যতা ছাড়াই যারা ফেমাস হতে চায় এবং অনেকসময় হয়ও; তাদের পদদলিত হতেও বেশি সময় লাগে না। অথচ এটা ও বুঝতেই চায় না। আসলে, কী যে ও চায়, আজ অবধি সেটাই স্পষ্ট করে বুঝে উঠল না।

ফেমাস্ আর নোটোরিয়াসে তফাৎ আছে। জানে ত' তা, পির্‌থুদাদা?

চাপা হাসি হেসে বলল ভিনোদ।

জানা ত উচিত। আই ডোন্নো।

রুষাও হেসে বলল।

পির্‌থুদাদা গেছে কোথায়? কতদূরে।

কে জানে ? সে ত' কাছে থেকেও সবসময়ই দূরে। আজ হয়ত অনেক দূরের কোনো পাহাড়ে-জঙ্গলে গেছে। কিংবা কে জানে, হয়ত এই মুহূর্তে সাবীর মিঞার জুতোর দোকানে গিয়েই বসে আছে, কী ভুচু মিস্ত্রীর গ্যারাজে। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁটে শ্বেতীর মতো দাগ হয়ে গেছে, জানো? কোনোদিন ক্যান্সার হলেও আশ্চর্য হবো না। ও যখন পানের পিক্ ফেলে, কেন যেন আমার মনে হয় ; প্রতিবারই আমার সমস্ত সৌন্দর্যবোধ, সমস্ত শখ, সুরুচি সবকিছুকেই বিদ্রূপ করে আমার প্রতি ওর জমে-ওঠা ঘৃণাটাই যেন উগ্‌রে দেয়। ওর মধ্যে একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে, এক অন্ধ পাশবিক নীরব ক্রোধ। আর জেদও। সেটা আমার ক্ষতি যত না করে ; তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করে ওর নিজেরই। মানুষটা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে পুরোপুবি জংলীই হয়ে গেছে। শহরে সমাজে ও একেবারেই বেমানান্। এমনিতেই ওর মধ্যে অনেকই জংলামো আছে। অনেকরকম। রক্তেই বয়ে এনেছে সঙ্গে করে, মনে হয়। ইট রানস্ ইন্ হিজ ব্লাড।

যাই-ই বলো, তুমি কিন্তু পির্‌থুদাকে ভালোবাসো এখনও। ওকেও বাসো : আমাকেও বাসো। কি করে পারো বলো ত' ? দুজনকে কি একসঙ্গে ভালবাসা যায় ?

তুমি কি বুঝবে ? বললে ? আমার ভালোবাসা কি এতই সীমিত যে, একজনকে দিয়েই আমি নিঃস্ব হয়ে যাব ? মনে হয়, আমি তেমন মেয়ে নই। না গো, আমি তেমন নই। একই সঙ্গে একাধিক মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা আমার আছে। হয়ত অনেকেরই আছে। আমরা কি নিজেদেরই জানি ? সম্পূর্ণ কবে ?

কী জানি ? এ কেমন ভালোবাসা তোমাদেব। আসলে আমাব মধ্যের মালিকানা বোধ এসব ভাগাভাগিতে বিশ্বাস কবতে চায় না। জরু আব গরু ভাগাভাগির নয়।

ভিনোদ বলল। তুমিই বলো যে, পিব্‌থু-দার সঙ্গে তোমাব মনেব কোনো মিলই নেই, শারীবিক সম্পর্কও নেই কোনো ; অথচ তবু বলো যে, এখনও তাকে ভালোবাসো। আশ্চর্য তুমি। সত্যি !

হাসল রুষা।

চাপা হাসি।

বলল কী জানি। নিজেই বুঝতে পাবি না নিজেকে।

মেবী চা এনে রাখল গোলাপী মার্বল পাথরের টেবল্‌টাব উপব। যার উপরে ফোনটা থাকে।

হাসছ যে !

ভিনোদ অবাক-হওয়া গলায় শুধোল।

হাসছি, তোমার কথা শুনে। তুমি ত' বিয়ে করোনি, তোমাব ত' ছেলেমেয়ে হয়নি, তুমি এই ভালবাসার স্বরূপটা ঠিক বুঝবে না। বেশির ভাগ স্বামী-স্ত্রীব ভালবাসাটা এমনই। একটা অভ্যেস। ছেলেমেয়েরা এসে যাওয়ার পবে স্বামী-স্ত্রীব সম্পর্কটা একটা অন্য ডাইমেনশান পায়। অন্যভাবে বললে বলতে হয়, আল্‌গা হয়ে যায় হযত। আবার গভীবও হয়, ছেলেমেয়েদেব জন্যেই। মনে করো, কী বলব ; ধরো, ছিঁড়ে-যাওয়া পুবোনো বাথরুম স্লিপাবেরই মতো। ছিঁড়ে গেলেও ছেড়ে যাওয়া ; ফেলে দেওয়া বড়ই কঠিন।

একটু চুপ করে থেকে রুষা বলল, উপমাটা কি খুবই খারাপ হল ?

উত্তর না দিয়েই ভিনোদ বলল, আমাকে বিয়ে কবলেও কি সেই নতুন সম্পর্কটাও বাথরুম-স্লিপারের মতোই হয়ে যাবে? হলে, হোক ! তবুও বিয়ে আমি করতেই চাই। তুমিই ত' কথা শোনো না আমার। কী না করতে পারি আমি তোমার জন্যে ! বিয়েটা আমাব পক্ষে একটা মিনিমাল করা। আমার সব কিছুই ত' তোমার। তুমি ত' জানো রুষা।

ভিনোদ আবেগ-ভরা গলায় বলল।

অন্তত তাই-ই মনে হল, রুষার।

আবারও বিয়ের কথা ভাবি না। একবারই যথেষ্ট, ভিনোদ। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলেই তোমার আর আমার এমন সুন্দর সম্পর্কটাও হযত একটা মেনে-নেওয়া অভ্যেস হয়ে যাবে। ছেলে-মেয়ের ভালো-মন্দ, তাদের ভবিষ্যৎ, দৈনন্দিনতার একঘেয়েমি, আমাদের দুজনের সব

নিজস্বতা, সব আনন্দ ছাপিয়ে সে সব অনেকই বড় হয়ে উঠবে। আমরা মানে, আমি আর পৃথু ত' এখন আর নিজেদের জন্যে বাঁচি না। ছেলেমেয়েদের জন্যেই বাঁচি এখন। এত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অজানা ভবিষ্যৎ-এর এত জল্পনা-কল্পনার থক্‌থকে দুর্গন্ধ-কাদার মধ্যে বিবাহিত ভালবাসা একসময় হারিয়েই যায়। তার সব বীজ শিকড়, ফুল, পাতা সংসারের ভারে চাপা পড়ে যায়। কাদায় ত পদ্মও ফোটে। কিন্তু এই মান্‌ডেন্, প্রোথিত ভালবাসা খুব কমই ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। বিয়ে ; আর নয়। একবারেই অনেক হয়েছে। এনাফ্, ইজ এনাফ্। ও ভুল আর নয়।

তোমার বাড়িতে এখন কে কে আছে, রুষা ?

হঠাৎই শুধোল ভিনোদ।

মানে ?

মানে, এখন তুমি কি একাই আছ বাড়িতে ?

না। কিন্তু কেন ?

বলোই না।

মেরী আছে। কুক্ লছ্মাব সিং, দুখী, মালি, ড্রাইভার অজাইব্ সিং সবাই-ই আছে। কিন্তু কেন ? হঠাৎ এই প্রশ্ন ?

ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমার কাছে যেতে।

কেন ? হঠাৎ ? এই ভর দুপুরে ?

তোমাকে আদর করব। ইচ্ছা করছে ভীষণ।

কী ! বল কি ? না, না। পাগল না কি ? উ্য হ্যাভ গান্ ক্রেইজী !

আতঙ্কিত গলায় রুষা বলল।

না, এসো না। একদ্দম্ না। বাড়ি ভর্তি লোক ! ছিঃ। তারা কী ভাববে ? তাছাড়া, পৃথু জানতে পেলে ? এমনিতে ও উদার। বলব, যথেষ্টই উদার। সেদিন রাতের ব্যাপারটা ও বুঝতে পেরেছে মনে হয়। তবু, কিছু বলেনি আমাকে। তাতেই বুঝেছি যে, ও অন্তত অন্য দশজন পুরুষের মতো মীন নয়।

একে তুমি ঔদার্য বলছ ?

বিদ্রূপের গলায় ভিনোদ বলল। যদি আমার স্ত্রী অন্য কারো প্রতি আসক্ত হত, তবে আমি ত' নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই দেখতাম। সেল্‌ফ-ক্রিটিসিজম্ করতাম ; নিজেকে চাবকাতাম। বুঝতে চাইতাম, কোথায় আমার অপূর্ণতা, ঘাটতি, কেন সে আমাকে নিয়েই খুশি না থেকে অন্যর দিকে হাত বাড়াল।

তুমি মহৎ।

বিদ্রূপের গলায় রুষা বলল।

তারপর বলল, অত সোজা নয় ভিনোদ। অত সোজা নয়। একজন ব্যাচেলর-এর পক্ষে এ ব্যাপারটা বোঝা ত' সোজা নয়ই।

কি, সোজা নয় ? এত কঠিনই বা কিসে ?

কোথায় যে লাগে, তা বিবাহিত মানুষের পক্ষেই একমাত্র বোঝা সম্ভব। আমার সঙ্গে পৃথুর সম্পর্কটা প্রায় মরে যাবারই মতো হয়েছে। নেই-ই বলতে গেলে। তবুও ও যদি অন্য কোনো মেয়ের জন্যে কাঙালপনা করে, এবং তা আমি জানতে পাই, আমার ভীষণই লাগবে। নিজেকে ছোট লাগবে ভীষণ, বঞ্চিত লাগবে। নিজের সম্মানে প্রচণ্ড লাগবে। তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না ভিনোদ কিছু কিছু কথা থাকে, যা নিজে বোঝা যায়, কিন্তু অন্যকে বোঝানো যায় না ঠিকভাবে। এ কথাটাও বোধহয় সেই রকমই।

আমি তোমার অত বড় বড় সব কথা বুঝি না।

তোমাকে বোঝাবার কোনো গরজও নেই আমার। বললামই ত। সব কথা সবার বোঝার নয়।

তুমি চান করেছ ?

এই-ই প্রথমবার রুষার মনে হল, ভিনোদের কথা যেন কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন ত' কচি-দুপুর। এখনই! ছিঃ! পৃথুও দিনের বেলায় কখনও এমন নেশাগ্রস্ত হয় না। নেশা করেছে! তাই-ই…এলোমেলো কথা বলছে…

রুষা অন্যমনস্ক গলায় বলল, হ্যাঁ। চান ত' সকালেই করেছি। কিন্তু কেন ? হঠাৎ চান করার কথা!

কী পরে আছ ? তুমি ?

মানে ?

কী শাড়ি ? খুব সেজেছ কি ?

রুষা হাসল।

মুখে বলল, হঠাৎ সাজব কোন্ সুখে ? বুড়ি হতে চললাম, এত সাজাসাজির কি ? দিন দুপুরে ?

তবু। বলো না। তোমাকে তাহলে আমার কল্পনার চোখে ঠিক্‌ঠাক্ দেখতে পাব।

সত্যিই পাগল তুমি। থাক্। আর ঠিক্‌ঠাক্ দেখে কাজ নেই। বেঠিকই ভাল।

না। প্লীজ বলো।

তবুও রুষার উত্তর না পেয়ে বলল, কি ? পরেছো কী শাড়ি ?

মাহেশ্বরী!

সে আবার কি ?

শাড়ির তুমি কি বোঝো! ইন্দোরের কাছের মাহেশ্বরের। মাহেশ্বরী। ভোপালের লঘু নিগম্-এর "মৃগনয়নী" থেকে কিনেছিলাম, যখন গেছিলাম গতবছর। কালো, সাদা ছোট্ট ছোট্ট চেক্। সস্তা; তাঁতের। কিন্তু দারুণ সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন শাড়ি।

আশ্চর্য! জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই দামের সঙ্গে মূল্যর পরম্পরা প্রায়ই থাকে না। কেন অমন হয় বলো ত' ?

জানি না। ভাবিনি কখনও এ নিয়ে।

"মৃগনয়নী" ? ভোপালের কোন্ পাড়ায় ? এতবার ভোপালে যাই, কই ? চোখে পড়েনি ত'!

আরে! টি টি নগরের নিউ মার্কেটের একেবারে লাগোয়াই বলতে গেলে।

ও কে। এবার গেলে যাব। তোমার জন্যে চান্দেরী বা সিল্ক আনব, "মৃগনয়নী" থেকে ?

একদম্ না। কিচ্ছু চাই না আমি। যা পাই, তাই-ই ত' অনেক। জিনিস চাই না কোনো।

ব্লাউজ ? কি ব্লাউজ পরে আছ ?

তুমি দেখছি জ্বালালে আমাকে। বড় মেয়েলি তুমি। এমন পুরুষ অসহ্য লাগে আমার।

ওকে। ফাইন্। মেনে নিলাম আমি অসহ্য। কিন্তু বলো। প্লীজ।

সাদা ব্লাউজ।

ঈসস। দারুণ দেখাচ্ছে তাহলে বলো।

টিপ পরেছো ? পরোনি ?

উঃ! বোকা বোকা কোরো না।

আহাঃ, বলোই না।

না। আমি কি প্যারাম্বুলেটরে বসে বেড়াতে যাব এখন ? হঠাৎ টিপ পরতে যাব কোন দুঃখে ? সিলী!

তাহলে চোখে ? কাজল ? কি ? কি দিয়েছ চোখে ? সুর্মা ?

হ্যাঁ। দিয়েছি। চোখে কাজল। হল। সো হোয়াট ?

গলায় কি পরেছো ?

উঃ! কালো পুঁতির মালা। অ্যানোডাইজড্ তারে বাঁধা।

আর পারফ্যুম ?

তোমারই দেওয়া; টোপাজ।

চুল বেঁধেছো ?

সত্যি । তুম্মি না ! না বাঁধিনি । রোদে চুল ছড়িয়ে বই পড়ছিলাম বারান্দায় বসে । শুকিয়ে গেছে অনেকক্ষণই ।

কি বই ?

মাই ! মাই ! এড্ওয়ার্ড লীয়র্ । আমার বড় প্রিয় । ছোটবেলার বই । কখনও তবু পুরোনো হয় না ।

আমিও হবো না পুরোনো । দেখো তুমি ।

সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, কি তেল মেখেছ ? চুলে ?

তেল ত আমি মাখি না ।

হ্যাঁ ।

ঈসস্ ! কী সুন্দর গন্ধ তোমার নরম চুলে । আমি এখান থেকেও পাচ্ছি । শোনো রু-রু...রুষা । আমি কিছু জানি না । আমি এক্ষুনি যাচ্ছি । তুমি তোমার বাড়ি-ভর্তি খিদ্‌মদ্‌গারদের কাকে কোথায় পাঠাবে কোন্ ছুতোয়, কাকে মেরে ফেলে পুঁতে দেবে বাগানে ; সেসব তোমারই ব্যাপার । আমার এক্ষুনি একবার ভীষণ আদব করতে ইচ্ছে করছে তোমাকে । আই মাস্ট হ্যাভ উ্য । রাইট্ ন্যাউ ।

তুমি পাগল ! ভয়ার্ত গলায় রুষা বলল, না না । মাথা খারাপ । যে-কোনো মুহূর্তে পৃথু চলে আসবে । আমি রাখলাম ফোন ।

আমি, না গিয়ে পারছি না । তোমাকে ভালো না-বেসে যে পারি না রুষা ! আমাকে ক্ষমা করো, প্লীজ । দশ মিনিটে পৌঁছচ্ছি ।

ও প্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রাখার কটাক্ আওয়াজটা শুনল, আতঙ্কিত রুষা । ভয়ে ওব হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ।

শুধু কি ভয়েই ?

এক ধবনের অপ্রকাশ্য নিষিদ্ধ আতঙ্ক-মেশা আনন্দও সেই ভয়ের সঙ্গে মিশে ছিল । সেসব অনুভূতির নাম জানে না রুষা । নতুন অনুভূতি ।

কাঁপা-হাতে ফোনটা নামিয়ে রেখেই, তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা ট্রে-সুদ্ধ তুলে নিয়ে গেল নিজেই প্যান্ট্রিতে ।

গলা তুলে ডাকল, মেরী, মেরী ! নিজের কানেই গলাটা কাঁপা কাঁপা শোনাল ।

ওর বুক উথাল-পাথাল করছিল । কানের লতি গরম হয়ে উঠেছিল : প্রায় কাছে এসে-যাওয়া এক নিষিদ্ধ অথচ তীব্র আনন্দর ভয়ার্ত আভাসে ওর জ্বর জ্বর লাগছিল । আশ্চর্য ! এখনও এমন হয় ? কী করে হয় ? পৃথুর ছোঁয়াতে যে-শরীর শব-এব মতো শীতল, নিথর থাকে ; সেই শরীরই ভিনোদের আসার কথাতেই আইসক্রীমের মতো গলে যাচ্ছে । উপমাটা বোধহয় ঠিক হলো না । আইসক্রীম নয় ; হিমবাহ আইস্‌বার্গ । ভয় হয়, ওর সমস্ত শরীরটাই হিমবাহর মতো গলে গিয়ে নিঃশব্দে ভিনোদের সমুদ্রে একদিন হারিয়েই না যায় ! এই মরচে-ধরা, বাতিল-করা, ফিউজ-হওয়া শরীরে এত হ্যালোজেন, মার্কারি ভেপার, এত লাল-নীল-হলুদ-সবুজ টুনি বাল্ব্ কী করে যে জ্বলে ওঠে ! এ এক বিস্ময় !

—মেরী !

আবারও ডাকল রুষা ।

এবার গলায় বিরক্তি ঝরিয়ে । এখন সময় নেই একটুও সময় নষ্ট করবার । বিরক্তিটা ঠিক কার প্রতি তা নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না । মেরীরই প্রতি ? ওর নিজেরই প্রতি কি ? ভিনোদ-এর প্রতি ?

দুখী এসে বলল, মেরী কাপড়চোপড় কাচতে নিয়ে গেছে কুয়োতলায় । আজ ত' মশারী বেডকভার কাচার দিন । একেবারে চান করেই আসবে ।

কতক্ষণ গেছে ?

এই ত গেল।

খুব তাড়াতাড়ি মনে মনে সময়ের একটা হিসাব করল রুষা। ক্যালকুলেটরের চেয়েও তাড়াতাড়ি। সময়ের অকুলান না হলে, বোধহয় সময় কখনও দামী হয় না। মেরী এখন কমপক্ষে আধঘণ্টা ওখানে আটকে থাকবে।

মালিটা কোথায়?

রুষা শুধোল, দুখীকে।

ডালিয়ার বাগানে গোবর সার দিচ্ছে।

দুখী বলল, তার ঘড়ি-ধরা মেমসাহেবের এই অসময়ের তৎপরতাতে আশ্চর্য হয়ে।

ওকে বলবি, যেন একদম ফাঁকি না দেয়। যত্ন সময় লাগে, লাগুক। এবারে জবলপুরের ক্যান্টনমেন্টের ফ্লাওয়ার-শোতে প্রাইজ পাওয়া চাই-ই চাই। বলে দিবি। নইলে, ওকে ছাড়িয়ে, অন্য মালী রাখব।

কুক্ কোথায়? লছ্‌মার সিং?

বাঃ। আপনাকে বলেই ত' গেল। রান্না-বান্না সেরেই গেছে। ওর কে রিস্তেদার এসেছে চিলপি থেকে। তার সঙ্গেই দেখা করতে গেছে না কারখানায়! লাঞ্চ-এর আগেই ফিরে এসে টেবল লাগিয়ে খাবার দেবে তাই-ই ত' বলে গেল।

ওঃ।

রুষা বলল।

মনে মনে হিসেব করল দ্রুত। লাঞ্চ-এর দেরী আছে। দেড়টা-দুটো হবে খেতে।

তুই কি করছিস? তুই? ফাঁকি মেরে বেড়াচ্ছিস?

বাঃরে! আপনার ঘর ডাস্টিং করছিলাম।

আমার ঘর?

চমকে উঠল রুষা।

সর্বনাশ! রুষারই বেডরুম? ভিনোদ যদি অবুঝপনা করে। যদি ফেরাতে না পারে তাকে? না পারলে যে কি হবে, তা ভাববার মতো যথেষ্ট জোরও যেন নেই রুষার বুকে।

এতক্ষণে আমার ঘর ডাস্টিং করছিস্। আশ্চর্য! না, না এখন ছাড়!

শিগগীর একবার বাজারে যা ত'। অজাইব্ সিং বাইরেই আছে। ওকেই বল্, গাড়ি করে নিয়ে যাবে।

দুখী অবাক হল। খুবই। কোনোদিনও বাজারে যায় না ও। ভাল করে চেনে না পর্যন্ত কোথায় সেটা। মেমসাহেবের ঘড়ির ভুলও হয় না কখনই। আজ সবই যেন গোলমাল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

কি আনব? এখন? ফ্রিজ ত ভর্তিই আছে। কালই ত' মেমসাব আপনি নিজে বাজারে গেলেন। তাহলে·

চুপ কর্। মাছ আনবি।

আমি মাছ চিনি না। আমার দেশে শুধু পাহাড় আর টাঁড় আছে, তালাও—টালাও নেই। নদী আছে, তাও একটাই···মাছ-টাছ কোনোদিনও···। আমি ত' জীবনে কখনও···

জীবনে অনেক কিছুই মানুষ আগে করে না, একদিন না একদিন তা শুরু করে। "জীবনে করিনি" "জীবনে করিনি" করবি না। যাঃ। টাকা এনে দিচ্ছি।

রুষা বেডরুম থেকে টাকা এনে দুখীর হাতে দিতেই দুখী আবার বলল, মাছ ত' অজাইব্ সিংই আনে···আমি···চিনি না যে···

কথা কম। মাছ আনবি। তুই-ই আনবি, বড় কাৎলা। না, কাৎলার মাথা। মুগের ডাল হবে। মাথা দিয়ে।

কাৎলা কি মেমসাব?

উঃ ! কাৎলাও চিনিস না ? খাস ত' খুব ! কালো, মুখ-ভ্যাটকানো ইডিযট্-এব মতো দেখতে মাছ। একরকম।

দুখী বেশি কথা না বলাই ভাল ভেবে বলল, ক্যাটলা না পেলে ?

না পেলে, যা পাবি , তাই-ই আনবি। পাডহেন. সাঁওযাব, ঘেঁওডা বা মুঙ্গবী। বললাম না, যাই ই পাবি। বাজাবে না পেলে নদীব ঘাটে যাবি। সব কটা ঘাট দেখতে বলবি অজাইব সিংকে। সময যত লাগে লাগুক। কাৎলাব মাথা চাই-ই।

দুখীব মুখ দেখে মনে হল, রুষা কাৎলাব মাথা না চেয়ে দুখীব নিজের মাথা চাইলেও যেন বেঁচে যেত ও।

আর শোন্। মাছ কিনে একবাব পদ্মা স্টোর্স-এযেতে বলবি। কাস্টার্ড আনবি। জানে, দোকানী। তাবপর মুদীর দোকানে। গবম মশলা আনবি একশ। সোনামুগেব ডাল দু কে জি' রাজ্‌মা , কাশ্মীরী , এক কে জি। যাঃ দেবী কবিস না।

দুখী বেজাব মুখে চলে গেল ভাবল. মেমসাহেবেব মাথাটা নির্ঘাত খাবাপ হযেছে। এতদিন সাহেব এক' পাগল ছিল। এবার মেমসাহেবও হল। চাকবী ছেড়ে দিযে প্রাণ নিয়ে পালাবাব সময হয়েছে এখন।

অত্যন্ত উত্তেজিত মস্তিষ্কে রুষা সময়েব হিসেব কবতে লাগল। অতি-দ্রুত। ক্যালকুলেটরের মতো ওবা একবাব বেরোলে কম কবে পঁযতাল্লিশ মিনিটেব আগে ফিবতে পারবে না। যথেষ্টই সময। যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভিনোদকে ফেবৎ পাঠাতে পাবে তাহলেও যথেষ্ট সময। না পারলেও। পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়, বাঁচা অথবা মবা , দুইযেব পক্ষেই যথেষ্ট সময।

দুখী অনেকই দেবী কবে ফিরল ভিতব থেকে থলি হাতে কবে। রুষাব ভয হচ্ছিল, ওরা বেবোবার আগেই ভিনোদ না এসে পড়ে। সময় অতি দ্রুত ফুবিয়ে যাচ্ছে।

ধমক দিযে দুখীকে বলল, কী বে' এতক্ষণ কি কবছিলি ? এত দেবী করলি ?

আমার পেট গড়বড় হয়েছে মেমসাব

রাগ হল ভীষণই। পেট গডবড কবাব আব সময পেলে না বাছা ?

মনে মনে বলল। মানুষের পেট থাকলেই মাঝে মাঝে গডবড সড়বড হয়। সামান্য পেট নিয়ে যাবা ভাবে, তাবা · । নাঃ। যাঃ, তোকে দুটাকা বকশিস দিলাম। মাছ কিনে যা ফিরবে, তা থেকে নিয়ে নিস। জিলিপি খাস।

পেট গড়বড় হওযার সঙ্গে বকশিস পাওযা বা জিলিপি খাওয়ার সম্পর্কটা কি তা বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল দুখী রুষার মুখের দিকে।

বলল, কেন মেমসাব ?

আঃ। এমনিই দিলাম। যাঃ। আর দেরী করিস না।

একটু পব, রুযা ড্রয়িংরুমের জানালা দিয়ে দেখল, অজাইব্ সিং দুখীকে সামনের সীটে তার পাশে বসিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিযে গেটের দিকে যাচ্ছে। এবং ঠিক সেই সমযই, অ্যাজ ব্যাড লাক উড হ্যাভ ইট, যে ভয়টা কবছিল ; ঠিক তাই-ই হল। লাল ধুলো উড়িয়ে ভিনোদের গাড়ি এসে জোবে ব্রেক কষে গেটে ঢুকল। অজাইব সিং গাড়ি একেবারে বাঁয়ে কাটিয়ে ভিনোদকে ঢোকার জায়গা করে দিল।

ভীষণই রাগ হল দুখীর উপর, রুষার। ফাজিল ছোঁড়া। খালি বকোয়াস্। দু মিনিট আগে বেরোলেও এমন হতো না। বাজারের রাস্তা আব ভিনোদের আসার রাস্তা আলাদাই ছিল। পাঁচ সেকেণ্ড আগে বেরোলেও···দুখী এবং অজাইব্ সিং দুজনেই দেখে গেল ভিনোদকে। এই অজাইব্ সিংটা মহা ধূর্ত লোক। পৃথুকে কিছু বলে না দেয় ! দিন-দুপুরে। কোনো মানে হয় ? ভিনোদের এত ডেসপারেট হবার ? ওর আর কি ? ঝুঁকি যা, তা ত' সব রুষারই।

দুখীর কাছে বিস্তারিত সব শুনল অজাইব্ সিং। অসময়ের বাজারের ফিরিস্তি। শুনতে শুনতে তার গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ফুটে উঠল। বড় রাস্তাতে পড়েই, গাড়ির ক্যাসেট-প্লেয়ারে

ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিল দু আঙুল দিয়ে আলতো করে ঠেলে। বাঁ হাতে।

গান বেজে উঠল .— "ব্যাবিলিকি বাজাবমে ঝুমকা গীডা রে। ওঃ ঝুমকা গীডা বে।"

ক্যাসেটটা অজাইব সিং-এব নিজেবই। ডিউটি সেবে বাড়ি যাবাব সময প্রতি বাতে গাড়ির ড্যাশবোর্ডে বেখে যায। মেমসাহেব ও বাবাদেবও অনেক ক্যাসেট আছে, গাড়িতেই বাখা। বেশিই ইংরিজী গানেব। সেগুলোতে হাত দেয না ও। যা কিছু ওর নিজের নয়, তাতে হাত দেওযা ও নিজেই পছন্দ কবে না। তাই-ই ইদ্‌বকাব সাহেবেব তাদেব মেমসাহেবের সঙ্গে এই বহস্যজনক আচরণ তার চোখে মোটেই ভাল ঠেকে না।

কিছুক্ষণ বাঁ হাতে স্টীযাবিং ধবে গানেব সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের আঙুল দিয়ে গাড়ির ছাদে তাল দিল অজাইব সিং। তাবপব হঠাৎই প্লেযার বন্ধ কবে দিয়ে দুখীর দিকে ফিরে বলল : আববে, এ দুখীযা. অব জিলাইবী খাইবি ? ঔব মালাই ভি পীবী ? চল্।

দুখী অন্যমনস্ক ছিল।

চমকে উঠে বলল. জিলাইবী ? মালাই ? কাহে ? নহী, নহী । হামাবা পেট গড়বডাগিযা। চলো. তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কবে আমবা বাড়ি ফিরে যাব. সত্যিই আমার শরীব ভাল নেই। ঘরমে বহুতই কাম হ্যায।

—টেন্স গলায বলল দুখী।

কাম ? ছেঃ ! কাম ক্যা বে ছওড-পুত্র ? কাম-ফাম কুচ্ছো নহী। গান্ধা কাহাঁকা ! চল্ চল্ গবমাগবম জিলাইবী ঔব মালাই খানেসে গডবড়-সব্বড় ঠিক হো জায়গা বিলকুল।

অবাক গলায দুখী বলল. এখন জিলাইবী খাবে কী তুমি ? আগে মাছ।—মাছের খোঁজে চলো সিং সাহাব। কাটিলা মাছ।

ছাড় তোর কাটিলা মাছ।

তাচ্ছিল্যেব গলায বলল অজাইব সিং।

সে কি ? গরম মশলা. মাছ. কাস্টার্ড. এসব কিনতে হবে না ?

গুল্লি মাব বে ছঁওডাপুত্তান। আইসেহি কাফি গরম হ্যায। গরম মশলাকা কওন্ জরুরৎ ?

গাড়িব ক্যাসেটে আবার গান বেজে উঠল ·

"ব্যারিলিকি বাজারমে ঝুমকা গীডা বে ·

অজাইব সিং ভাবছিল যে. তাদেব সাহেব মানুষটা একটা বে-আক্কল, গাণ্ডু। পাগলা-ঘোষষা। সংসারে জরু আর গরু যে শক্ত হাতে সামলে রাখতে হয়, এ কথাটাই সে জানে না। দিন-দুপুরে নিজের ঘরে মুরগী-মাবা চলছে, আর সেই ভোলে-ভালা মানুষটাব কোনো খেয়ালই নেই। সাদীর মিঞাব জুতোর দোকানে বসে হযত বে-কাম্‌কা বাত্ করে চলেছে এখন। পান থুক্‌ছে। মজাক ওড়াচ্ছে। অজীব আদ্‌মী। সাচ্‌মুচই অজীব আদমী। খ্যায়েব। বড়া আদমীদেব বাতই আলাদা ! উনলোগোঁকো বেকুবীভি অজীবই হোতা হ্যায।

ঝড়ের মুখের ইউক্যালিপটাসেব মতো শবীরে মনে আন্দোলিত হতে লাগল রুষা। সত্যিই ঝড়েরই মতো ঢুকেছিল ভিনোদ গাড়িটা পোর্টিকোতে রেখে। ওর চোখ মুখ উদভ্রান্ত। ড্রয়িংরুমের দরজা খোলা রেখে রুষা দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ঢুকেই.ভিনোদ ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তার রুক্ষ, উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে লাগল রুষার নবম ঠোঁটের সমস্ত স্নিগ্ধ সিক্ততা। রুষার মনে হল যেন দীর্ঘ তপ্ত গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টি নামল। ভালো লাগায়, ভরন্ত কলসের মতো ভরে উঠতে লাগল ও। দ্রুত।

কিন্তু মুখে বলল, আঃ কী করছ কী ! লাগে··লাগে···ভাল্লাগে না··অসভ্য।

তখন অজাইব্ সিং-এর গাড়ির ক্যাসেটে গান বাজছিল উঁচুগ্রামে · ব্যারিলিকি বাজার মে ঝুম্‌কা গীড়া রে,····

"ঝুম্‌কা গীডা রে।

ওঃ।

ঝুমকা গীড়া রে। ঝুম্‌কা। ঝুম্‌কা গীড়া রে।
ব্যারিলিকা বাজার মে ঝুম্‌কা গীড়া রে······
সাঁইয়া আযে নয়ন্ ঝুঁকায়ে ঘর্‌মে চোবি চোরি/বোলে, ঝুম্‌কা ম্যায় পৈহনাদু, আযা বাঁকি ছোরি
ম্যায় বোলি না : ন্ ন্না না বাবা! না কর্ জোরাজোরি···
ওঃ ঝুম্‌কা গীড়া রে··
ব্যাবিলিকি বাজার মে ঝুম্‌কা গীড়া রে···· ।"

দুখী অবাক হয়ে গান শুনতে লাগল। পরের জন্মে ও সিং সাহ'বের মতো ড্রাইভার হবে। এতক্ষণ ওর পেট গড়গড ছিল। এখন মনে হচ্ছে মাথাও গডবড় সড়বর হয়ে যাবে।

অজাইব সিং বলল, ঘাটে যেতে হবে না। কোথাওই যেতে হবে না। চল্ বাজাব থেকে জিলাইবী আর মালাই খেযে বাড়ি ফিরে যাই। তুই কি দুধ পীবী? বাড়ি ফিরলে তুই বলবি যে, পথে টায়াব-পাংচাব হযে গেছিল, স্টেপনীতেও হাওযা ছিল না। দেরী হয়ে গেল বলে ফিরে এলাম। দেখিস্, মেমসাহেব কিছুই বলবেন না।

ছেলেমানুষ দুখী বেগে বলল, ওযাহ্। অজীব বাঁতে কর্ রঁহে হে আপ্। রাতে মেহেমান আসবে যে! খাওয়া-দাওয়া হবে বললেন না মেমসাব। মাছ না আনলে···

তুই চুপ কর্ ত' ছঁওড়াপুত্তা। ভদ্রলোকেরা দু' ঠ্যাঙের চিকনি-লোম-এব নরম মুরগী খেতেই ভালবাসে। পাড়হেন, ঘেঁওড়া, মুঙ্গরী এসব মাছ ছোটলোকেরাই খায।

গান বাজতে লাগল আবার ·
"হাম্ দোনোকা ঘাব্‌ড়ার মে ঝুমকা গীড়া রে······"

রুষার সমস্ত শরীর, ওব দু হাঁটু, থরথর করে কাঁপতে লাগল। কান দুটি ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ওর শরীরের ঝাঁটি-জঙ্গলে এত তাপ জমে ছিল যে, তা জানা ছিলো না ওর নিজেরও। হিমবাহ গলে যেতে লাগল দ্রুত তীব্র-জ্বালার উষ্ণ লু-তে।

ওকে জড়িয়ে ধরেই বেডরুমে এল ভিনোদ, পা দিয়ে ড্রয়িংরুমের দরজা লাথি মেরে বন্ধ করে।

অনেকই কথা বলাব ছিল তাকে রুষার। বুঝিয়ে-সুজিয়ে, দাম্পত্য সম্পর্কর পবিত্রতা, সৌন্দর্য, অনাবিলতা, এসব বিষয়ে স্নিগ্ধ জ্ঞান দেবার ছিল। ও ভেবেছিল বলবে যে, বিনু, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ, এই একঘেযেমিব, ক্লান্তির বিষণ্ণতার দমবন্ধ ঘরের লাগোয়া একফালি আলো-হাওয়ার বারান্দা তুমি। শরীরকে এর মধ্যে টেনে এনে এমন সুন্দর সম্পর্কটিকে নষ্ট করে দিও না। ভেবেছিল, বলবে, শরীরের মধ্যে কিছু নেই ভিনোদ। সত্যিই কিছু নেই।

কিন্তু·····

অসুন্দর শরীর কিন্তু কখনও কখনও বড় চকিতে কাজ করে। সুন্দর মন সময় সময় তার নাগালও পায় না হাত বাড়িয়েও। সেই ছুটন্ত ফেরারী শরীরই হয়ত পরক্ষণে অনুতাপে ক্লিষ্ট হয়ে মনের পায়ে উপুড হয়ে পড়ে কাঁদে ফুলে ফুলে। এমনই ঘটে। এই সবই ঘটনা। আমরা কেউই ভগবান নই। মানুষ। বড় সাধারণ, ভঙ্গুর, বড় অসহায়, মানুষ-মানুষী আমরা এই দ্রুতগতি জীবনের সঙ্গে বাঁধা-থাকা ইচ্ছাহীন, মনহীন, শরীরহীন সব গাধা-বোটগুলি।

রুষা ভাবছিল নীরবে।

এতসব, আসলে, তখন ভাবার সময় পায়নি রুষা। শরীর যখন শরীরের উপর দখল নেয় তখন ভয়-পাওয়া কাঠবিড়ালীর মতো মন তার মনের পাতার গভীরে লুকিয়ে পড়ে একটু পরেই, স্বমহিমায় প্রকাশিত হবে বলে।

বেডরুম-এর দরজার গড়রেজের লক্‌টাকে কট্ শব্দ করে বন্ধ করল ভিনোদ। রুষার বুকের মধ্যে ভয়-মিশ্রিত—উত্তেজনা-জনিত এক ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। ওর জীবনের একটি কুঠরী, বড় সুন্দর, বড় স্বপ্নের কুঠরীটি থেকে কে যেন তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কট্ শব্দ করে সেই নিভৃত কুঠরীরই দরজা বন্ধ করে দিল।

কে?

নিয়তি ?

না মেনে উপায় নেই। রুষা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ কত বছরের কত কষ্ট দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। হেরে গেল আজ। রুষা হেরে গেল।

পৃথুর ঘরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বই আছে একটি। কবিতা-টবিতা পড়ে না রুষা। বইটির নামটিই শুধু চোখে পড়েছে বারবার। 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই'।

নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রুষা।

নষ্ট। রুষা কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? রুষা শুধোলো। নিরুচ্চারে। রুষাকে।

বাগানে জল তুলছিল মেরী, লাটাখাম্বার ক্যাঁচোব-কোঁচোর বিষণ্ণ নিচু, মন্থর একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছিল। এস ডি ও সাহেবের সাদা অ্যালসেশিয়ানটা হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঁচুগ্রামে ডাকছিল। চামারটোলিতে মাদল বাজছিল ধ্রাম্। ধ্রামাধা! ধ্রাধাম্। ধ্রাধাম। ধ্রাধাম। ধিড়কু ধরাক্। ধুনক্ ধুনক্।

কেউ মরেছে বোধহয় চামারটোলিতে। কে মারা গেল? কোনো নারী কি?।কোনো।নারী কি নষ্ট হয়ে গেল?

মাদল বাজছিল ধ্রাধাম্ ধ্রাধাম্। ধ্রাম্।

মৃতদেহ নিয়ে আসছে ওরা শোভাযাত্রা করে। দূর থেকে তার শব্দ ভেসে আসছে। মরে যাচ্ছে রুষাও। কতরকম মরণই আছে এ সংসারে। রুষার স্বপ্নের সুগন্ধি বীজগুলিকে নিয়ে তুলো পিঁজছে ভিনোদ। শরীরের গোপন স্নিগ্ধ সুগন্ধি প্রান্তরের নিভৃত কুঁড়িগুলিকে ছিঁড়ছে কুচি কুচি করে। মাদল বাজছে, মাথার মধ্যে। ধিড়ক ধড়াক্। ধুনুক। ধুনুক্। ধিড়কু ধড়াক। ধ্রাম্। ধ্রামাধাম। ধ্রাধ্রাম্।

হঠাৎই রুষা তার বুক থেকে ভিনোদের হাত সরিয়ে দিল। ধাক্কা দিয়ে।

অস্ফুটে বললো, এই। হাত দিও না। প্লীজ!

কেন? রুষা! তুমি ত আমারই। তুমি কি আমার নও? তোমার সমস্ত তুমি?

কথা বোলো না। দিও না হাত।

মনে মনে বলল, আমার সমস্ত আমিকে কেউই পাবে না। আমরা টুকরো টুকরো। প্রত্যেক মানুষই ভেঙে গেছে ভিনোদ। এক টুকরো দিয়েই এক টুকরো পাই। যে-আমি পৃথুর, যে-আমি আমার ছেলে-মেয়ে মিলি টুসুর, তাকে তুমি কোনোদিনও পাবে না। তা আমার দেওয়ার ক্ষমতারও বাইরে। এছাড়াও আরও অনেক 'আমি'র টুকরো আছে আমার মধ্যে। সেসবও পাবে না। যতটুকু দিতে পারি ততটুকুই নাও। আর কিছু চেও না।

ভিনোদের কথাটা কেমন জড়ানো জড়ানো মনে হল রুষার। এ কি আনন্দেরই ঘোর? মনে হল, খুবই নেশাগ্রস্ত ও। আবিল হয়ে রয়েছে ভিনোদ। পুরুষরা অনাবিলভাবে, সুস্থতার সঙ্গে কোনো সুন্দর কিছুই কি পেতে শেখেনি জীবনে?

ভিনোদের নেশা হয়েছিল। আধঘণ্টার মধ্যে টকাটক চারটে পিংক্-জিন্ খেয়ে এসেছিল সে। সোয়াবিন এক্সট্রাকশান্ প্ল্যান্টটার প্রজেক্ট রিপোর্ট অ্যাকসেপটেড হয়েছে। ব্যাঙ্কের বড় সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভিনোদ সেলিব্রেট করতে চেয়েছিল এই অকেশান। পুরুষের সেলিব্রেশানে নারী-শরীর এক অপরিহার্য অঙ্গ। চম্বলের অনেক ডাকাতই নিপুণ সফল ডাকাতির পরই নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়ে জোটে ভারতের সর্বত্র। চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, অত্যাচারী, ঘুষখোর, দালাল সব পুরুষই নারী-শরীরে অবৈধভাবে গিয়ে তার পৌরুষের আদিমতম, কদর্য, ঔদ্ধত্যকে নতুন করে অনুভব করতে চায় শিরায় শিরায়। তাদের নিজের নিজের গোপন পাপবোধ থেকেও বোধহয় মুক্ত হতে চায়।

ভিনোদও কি তাই-ই চাইছে?

রুষার ভীরু, সাদা পায়রার মতো বুকের দিকে চেয়ে ভিনোদ বিড়বিড় করে শায়ের আওড়াল। পিংক-জিন্-এর এবং রুষারও নেশার দারুণ ঘোরে।

"নীগাহ্ যায়ে কাঁহা সীনেসে উঠ্‌কর?

হুঁয়া ত' হুসন্‌কি দওলত্‌ গড়ী হ্যায়।"

শাপগ্রস্তা, প্রস্তরীভূতা দেবীর মতো দেখাচ্ছিল তখন, আনন্দে এবং পাপবোধে নিথর রুষাকে। তবুও ওর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু আধ ফোটা হাসিকে ফুটতে না-দিয়ে ও বলল : অসভ্য!

ভিনোদ রুষার স্তনসন্ধিতে মুখ রেখে ভাবছিল, মেয়েদের মুখের 'অসভ্য' কথাটার মতো এত বড় কমপ্লিমেন্ট আর হয় না।

রুষা ভাবছিল, খুব সুন্দর শায়েরটি কিন্তু। চোখ, নারীর বুক ছেড়ে আর কোথায়ই বা যাবে? সুন্দরীদের সব সৌন্দর্য ত' বিধাতা ঐখানেই গড়ে রেখেছেন।

আজ আর কী সৌন্দর্য বাকি আছে! মেঘে মেঘে বেলা যে অনেকই হল। রুষারও একটি শায়ের মনে এল। "খণ্ডহার বাতাতি হ্যায় ইমারৎ বুলন্দ্‌ থা।" প্রাসাদ যে একদিন অনুপমই ছিল, আজকের এই ধ্বংসাবশেষই তাব প্রমাণ।

মনে এল। কিন্তু বলল না। সবকিছুই ব্যক্ত করতে। ওর রুচিতে বাধে।

সীলিং-এর নিশ্চল ফ্যানের দিকে চেয়েছিল ও। এ-ঘরে এয়ার-কণ্ডিশানারও আছে। তবে এসব কোনো কিছুই সেপ্টেম্বরের পর থেকে আর দরকার হয় না। বাঁ দিকের দেওয়ালের মাথার দিকে হালকা ঝুল পড়েছে। ঝাড়তে বলবে দুখীকে। একটা সাদা, সুন্দরী কৌতূহলী টিকটিকি চেয়ে আছে ওদের দিকে। কী ভাবছে, কে জানে?

হাই তুলল রুষা একটা। যত অসময়েই কেন যে ওর হাই ওঠে! বোঝে না।

বাগানের পেঁপে গাছে কাক ডাকছে। অসভ্য, কুৎসিৎ-দর্শন দাঁড়কাক একটা। রুষার এই মুহূর্তের খুশিতে দাঁড়কাককেই মনে হচ্ছে স্বর্গের পাখি। হেমন্তর কচি-দুপুরের রোদের গন্ধ, ধুলোর শালীন গন্ধ, রোদ ঝলমল গাছপাতার ক্লোরোফিলেব গন্ধ, স্বচ্ছ উষ্ণতার ভাপ-এর সঙ্গে ভেসে আসছে ওর নাকে। সবুজের এই শান্ত স্নিগ্ধ সমারোহের মধ্যে, এই বিচিত্র হবজাই শব্দমঞ্জরীর ও গন্ধপুঞ্জর ঝুমঝুমির মধ্যেই রুষার দু চোখের মণি আস্তে আস্তে তরমুজ-এর বুকের রক্তের মতো লাল হয়ে এল। শরীরের সব রক্তই যেন হঠাৎ দৌড়ে এল দু চোখে চোখকে রাঙাজবা করে তুলবে বলে। দৌড়ে এসে, আনন্দই যেন বলল; পৌঁছে গেছি! এই যে, পৌঁছে গেছি!

ভিনোদ জামাকাপড় পরে বেডরুম থেকে বেরিয়ে যেতেই রুষা ঘর লক্‌ করে বালিশের উপর এলিয়ে দিল নিজেকে। ইনোসেন্টলি। ওর মধ্যে এক তীব্র আনন্দ এবং হঠাৎ আসা তীব্রতর অপরাধবোধ মিলেমিশে গিয়ে ওর লাল-হওয়া চোখ ফেটে নীল জল গড়িয়ে গেল গাল বেয়ে। একেবারে হঠাৎই। বালিশ ভিজে যেতে লাগল। বড় ঘুম পেল ওর।

কিছু কিছু শ্রান্তি আছে, কুসুমগন্ধী ক্লান্তি আছে; যা পরম প্রার্থনার। এমন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হতে ইচ্ছে করে রোজই...। কিন্তু...।

রুষা ভাবল, আজ তার স্বামী, তাব ছেলেমেয়ে, তার প্রেমিক, তার সংসার সকলের, সবকিছুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ভীষণ ভীষণ ভীষণই ঘুমোবে। ওর তিরিশটি বছরের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে ও বিযুক্তির ঘুম ঘুমোবে। জাগবে, যখন ওর নিজের খুশি।

ঘুমিয়ে পড়েওছিল।

অনেকক্ষণ পর ঘুমঘোরের মধ্যেই শুনতে পেল, চামারটোলির শবযাত্রীরা ওদের বাংলোর প্রায় সামনেই এসে পৌঁছে গেছে। এখন মাদলেব শব্দে কান ফাটার উপক্রম। বাইরে অপরিচিতা এক নারীর শব চলেছে জীবন্ত হয়ে কাঁধে-তোলা চৌপাইয়ের উপর আলতো হয়ে নাচতে নাচতে আর ঘরের ভিতরে অন্য এক শবেরই মতো নিথর হয়ে পড়ে আছে রুষা। আরেক নারী। জীবন্ত, অথচ মৃতব চেয়েও মৃততর।

জানালার পর্দার উপরের ফাঁক দিয়ে শীত-দুপুরের রোদ এসে পড়েছিল এক চিল্‌তে। হঠাৎই রুষাব চোখ পড়ল দেওয়ালে, যেখানে পৃথুর ফোটোখানি বাঁধানো অবস্থায় ঝুলছিল। বিয়ের পবে পরেই তোলা। পরমা সুন্দবী রুষাব সুন্দর ছবি, তার অসুন্দর স্বামীর সঙ্গে। পৃথুর চোখের দিকে

চোখ পড়তেই, কী যেন হয়ে গেল। ও বালিশে মুখ দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হঠাৎ। শব্দ করে। বালিশের মধ্যে কান্নাটাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করল প্রাণপণে। একটু পরই বাইরে গাড়ির হর্ণ বাজল। অজাইব সিংরা ফিরল বোধহয়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বেডরুমের দরজা খুলে দিল। বাথরুমে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করল। নতুন করে লিপস্টিক লাগাল। শাড়ি জামা ঠিকঠাক কবে নিল।

ভিনোদ ফোনে তার সঙ্গে কত কাব্যিই না করল। তার শাড়ি, জামা, কাজল পারফ্যুম্ নিয়ে। কিন্তু কাছে যখন এল, ঝড়ের মতো;তখন তাকেও একটা জন্তু বলেই মনে হল। সব পুরুষের কাব্যিই বোধহয় ছল ; ছুতো। এমনই। এসব নিতান্তই সস্তা শৃঙ্গার। পুরুষের আদিম অসভ্য বন্যতা, তার ক্ষুধার্ত বুনো-কুকুরের সত্তাকে আশ-মিটিয়ে পেট-পুরে খাওয়ানোরই উপক্রমণিকা মাত্র। ছিঃ ছিঃ। চলে যাওয়ার সময় একটা চুমু পর্যন্ত খেয়ে গেলো না ভালবেসে! শার্ট-এর বোতাম আঁটতে আঁটতে দৌড়ে পালিয়ে গেল ভীত কুকুরের মতো। আশ্চর্য!

সমারসেট মম ঠিকই লিখেছিলেন। "ওল্ মেন আর পিগস্।"

রুষা ভাবল।

রিয়্যালী, ওল মেন আর পিগস্।



ঠুঠা বাইগা আর দেবী সিং মস্ত একটি ঝাঁকড়া কদম গাছের নিচে বসেছিল। গাছটি পাহাড়ের একেবারে পায়ের কাছে। পাহাড়ে কিছুটা উঠলেই একটি গুহা। ভেবেছিল, রাতটা সেই গুহাতেই কাটাবে। কিন্তু সূর্য ডোবার কিছু আগে সেখানে পৌঁছে আবিষ্কার করেছিল যে, এক ভালুক পরিবারের আস্তানা সেটা। খামোখা ঝামেলা বাড়াবে না ঠিক করেই নেমে এসে ওই গাছের নিচেই আগুন করেছিল দুজনে মিলে। বন্দুকদুটো সঙ্গে আছে বটে কিন্তু শিকারে ত আসেনি। তাই নেহাত দরকার অথবা দায়ে না ঠেকলে ব্যবহার করবে না। বিকেলে ঠুঠার গাদা বন্দুক দেগে একটি বড় ময়ূর মেরেছিল। পালক-টালক ছাড়িয়ে নিয়েছে। আগুনে ঝলসে নিয়ে খাবে পাথুরে নুন আর সঙ্গে নিয়ে আসা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। এইই ওদের রাতের খাবার আজ।

জায়গাটা যে ঠিক-কোথায় তা ঠিক। বুঝে উঠতে পারেনি ওরা। এমন বড় একটা হয় না। জঙ্গলের পোকা যারা, তাদের পথভুল হয় না সচরাচর জঙ্গলে। কিন্তু আজ দুপুর থেকেই মেঘ করে এসেছিল। তারপর ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে বৃষ্টি। থেমেছে সামান্য আগেই। গাছের পাতা থেকে এখনও জল চুঁইয়ে পড়ছে। বিকেল থেকে জলে ভিজে, দুজনেরই ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থা।

দেবী সিং বলল, আজ একটু মহুয়া থাকলে খুব ভাল হত। জ্বর-জারি না হয়ে যায়! শরীরের জওয়্যানী ত আর নেই। আগের মতো সয় না আর অত!

জওয়ানীর কমই বা কি আছে? বুড়ো ভাবলেই বুড়ো। আমার ত মনে হয় সেই আগের মতোই আছি।

মনে করছ তাই। আসলে কি আর আছো! বিয়ে-শাদী ত করোনি। জওয়ানীর পরীক্ষাও দিতে

হয় না তোমাকে।

কথাটা, হাঃ করে এক পক্কড় হেসে, উড়িয়ে দিল ঠুঠা। কথা ঘুরিয়ে বলল, একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম কাল রাতে। বুঝলে, দেবী সিং।

কি স্বপ্ন ?

অদ্ভুত স্বপ্ন একটা।

কি ?

নাঙ্গা বাইগীন্ একেবারে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বললেন, পাবিরে ঠুঠা বাইগা, পাবি ফিরে তোর গ্রামকে। যে এমন করে চায় তাকে আমি সবই দিই। সব।

কবে ?

বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম আমি নাঙ্গা বাইগীন্‌কে।

সময় হলেই পাবি। তোকে পেতেই হবে। যখন পাবি ; তখন তোকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে আমার জন্যে।

কি কাজ ?

বলব। সময় হলেই বলব। আবারও আসব আমি।

কবে ?

সময় যখন হবে। যখন আসব, তখন ফেরাবি না ত আমাকে। যদি ফেরাস, তাহলে··।

তাহলে ?

দেবী সিং চুট্টায় টান দেওয়া থামিয়ে চোখ চোখ বড় বড় করে শুধোল।

"তাহলে", বলেই, চোখেমুখে ভয়াবহ এক ভঙ্গী করেই মিলিয়ে গেলেন বাইগীন্।

সে কি ?

হ্যাঁ। আমার নিস্তার নেই দেবী সিং।

মুখ নিচু করে বসে আগুনের দিকে চেয়ে ঠুঠা ভাবছিল মনে মনে, যখন প্রথম হারিয়ে-যাওয়া গ্রামের খোঁজ করতে শুরু করি তখন তাগিদটা ছিল আমার। আমারই একাব। ইদানীং লক্ষ্য করি, কে যেন ভিতর থেকে তাড়া লাগায় সবসময়। কে যেন বলে, কি করছিস তুই ঠুঠা, এই কারখানায় বসে ? জঙ্গলে যা। ফিরে যা। যেখানে তোর জন্ম, যে ধুলোয় তোর ছেলেবেলা, যে নদীতে তোর ঝাঁপাঝাঁপি, যে ফুলের মালা গেঁথে তোর জীবনের প্রথম নারী তোকে নরম ঘাসের বিছানাতে ববণ করেছিল, ফিরে যা সেই ফুলেব বনে। সেই শিশিব ভেজা ভোরে, তিতির-ডাকা বিকেলে, সেই আলো-ছায়ার মেঘ-মেদুরের বনে। যা। যারে ঠুঠা, যা।

দেবী সিং আগুনটাকে নাড়া-চাড়া দিয়ে জোর করল একটু। উবু হয়ে ফুঁ দিল দুবাব। নিভে-যাওয়া চুট্টাটাকে ধরিয়ে নিল একটি ঘাস আগুনে ধরিয়ে নিয়ে। তারপর গাছে হেলান দিয়ে পা দুটি লম্বা করে মেলে দিল আগুনের দিকে। জমি ভিজে ছিল তখনও। ত্রিপলের টুকরোটুকু বিছিয়ে পাশাপাশিই বসেছে দুজনে। রাতেও পাশাপাশিই শোবে।

কাল রাতেও ওরা ছিল একটি গুহাতে। সেই গুহার গায়ে ফিকে লাল আর হলুদ রঙে আঁকা ছবি ছিল অনেক। খুব বড় বড় মৌচাক ছিল গুহাটার চারপাশে। দাঁতাল মস্ত বড় বুনো শুয়োরটাকে শিকাব করেছে একদল মানুষ তীব-ধনুক আর বল্লম দিয়ে, এইই আঁকা ছিল সে ছবিতে। কে জানে ? কত হাজার বছর আগে তাদেরই পূর্ব পুরুষরা এইসব গুহাতে বাস করত ! কেমন দেখতে ছিল তাদের তাই-ই বা কে জানে ? কি তারা খেত ? কি পরত ? কেমন ছিল তাদের জীবনযাত্রা ? তাও জানে না ওরা। কি রঙ দিয়ে এঁকেছিল এই সব ছবি পাহাড়ের গায়ে তাও জানা নেই। কত গ্রীষ্মের ঝিম-ধরা মরীচিকা-ওড়ানো তাপ, কত বর্ষার উথাল-পাথাল ঝোড়ো তাণ্ডব, কত শীতের শান্ত মন-খারাপ-করা আর্তি বুকে মুখে চোখে, শরীরের অণুতে অণুতে ধরে রেখেছে সেইসব গুহা-ছবি, তাইই বা কে জানে ? গুহা তবু একটুও ম্লান হয়নি, মোছেনি ছবিগুলি। বাতে সেই গুহাতে শুয়ে মনে হচ্ছিল দেবী সিং-এর, যেন ও কয়েক হাজার বছর পেছনে হেঁটে গেছে।

কাল বেশ ভাল কেটেছিল রাতটা। কি বল ?

হঠাৎই দেবী সিং-এর ভাবনার রেশ কেটে দিয়ে ঠুঠা বলল।

হুঁ। নিশ্চয়ই !

অনেকদিন পর নাচগানও হল একটু। গুহা থেকে নেমে, নদীপারে বানজার-বামনী বস্তীতে না গেলে মজাই হত না কিন্তু। তবে, গাওয়ান বুড়োকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল বড়। এখনও কী সুন্দর চেহারা তার। দু কানে পেতলের মাকড়ি। আগুনের আভায়, সোনার মতো চক্চক্ করছিল। সত্যি সোনা বোধহয় ঐ রকমই দেখতে হয়। গায়ে, গুহার গায়ের ছবিরই মতো নানারঙা সুতোয় নক্শা-তোলা লেপের জামা। টানটান হয়ে জোড়াসনে বসে থাকার ভঙ্গীটি। গাওয়ান্ও ত রাজাই হল। রাজাদের কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়। রাজত্ব থাক আর নাইই থাক। রাজার ভাবভঙ্গী কিছু থাকেই।

তা বটে। তবে হলে কি হয়। গাওয়ান-এর ছেলেটা একটা অমানুষ হয়েছে। বুড়ো হয়েও, বেঁচে থাকার এই এক মস্ত কষ্ট। ছেলেমেয়ে যদি মানুষ না হয়, তাহলে একজন মানুষ জীবনভর যাইই গড়ে তুলুক না কেন তার দু হাতের মেহনতে, তা বালির প্রাসাদের মতোই ভেঙ্গে পড়ে।

যা বলেছো ! ঠুঠা বাইগা বলল। এই জন্যেই ত বিয়ে করিনি। নিজের কৃতকর্মের জন্যে নিজে দায়ী থাকতে রাজী আছি। রাজী, নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেও। কিন্তু যে পাপ-পুণ্যের উপরে আমার নিজের বিন্দুমাত্র হাত নেই সেই পাপের বোঝা আর পুণ্যের আনন্দে আমার মোট্টে দরকার নেই। অবশ্য মানুষ হওয়া বলতে তুমি বা গাওয়ান কি বোঝো জানি না। গাওয়ানের ছেলেটা টাকা রোজগার করে না বটে কিন্তু ভারী সুন্দর বাঁশি বাজায়। শুনলে না কাল ? যাইই হোক, বিয়ে-টিয়ে না করাই ভাল।

তুমি বলছ বটে। কিন্তু বিয়ে করে না কটা লোক ?

না দেবী সিং। তুমি যাইই বল, আমি বলব, মানুষও কেন ভেড়ার দলেরই মতো হবে ? সবাইই যা করে আমার তা করতে কখনই ইচ্ছে করেনি। অন্যের হাতের শালের দোনা থেকে জীবনের মহুয়া আমি খেতে চাইনি দেবী সিং। বাঘের মড়ি দেখে যেমন কোথায় মাচা বাঁধব, বাঘের শরীরের কোথায় গুলি করব, ঠিক সাদা আর কালো ডোরার কাটাকুটির জায়গায়, তাও যেমন ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক ক[illegible] তেমনই জীবনের বেলাতেও না ভেবেচিন্তে কোনো কিছুই করিনি আমি।

দেবী সিং-এর দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেই নিবে গেল। ওর চোখে একটু বিব্রত ভাবও খেলে গেল। তারপরই ওর দরাজ হাসি হেসে প্রসঙ্গান্তরে গেল দেবী সিং। বলল, যা হবার তা ত হয়েই গেছে ঠুঠা এ জন্মের মতো। তোমার জীবন তোমার, আমার জীবন আমার। একটু হালকা কথা বল। মজার কথা বল। মহুয়া খাও, গান গাও। দুদিনের জীবন। কালকের গানগুলোই বরং আরেকবার গেয়ে শোনাও। যে গানগুলো বানজার-বামনির ছেলেমেয়েরা নেচে নেচে গাইছিল। ঠুঠা, তোমার গলা কিন্তু এখনও খুব ভাল আছে। বান্জার-বামনির জওয়ান মেয়েগুলো তোমার দিকে এমন চোখে চাইছিলো যে, আমার হিংসেই হচ্ছিল। সত্যি !

হাঃ।

হাসল ঠুঠা। চুট্টা ধরালো একটা।

বলল, তাকাচ্ছিল না আরও কিছু। আসলে তুমি কাল বেশি মহুয়া খেয়েছিলে।

তাইই ? হবে হয়ত। মহুয়াই যেদিন খাব, সেদিন কম খাব কেন ? কিন্তু যা আমি বললাম, তাইই ঠিক। কুকুরীদের মতো যুবতীরাও যৌবনের গন্ধ পায়। এ সবই ভগবানের বন্দোবস্ত। আমরা আর বুঝি কতটুকু !

হাসতে হাসতে বলল দেবী সিং।

তারপর বলল, গানগুলো শোনাও না ! মনে নেই নাকি ?

বা-রে ! ও সব ত কার্মা নাচের গান। মনে না থাকার কি ? এখন তুমি গান শুনবে ? ময়ূরটাকে

ঝলসাবে না ?

আবে হবেখন। বাত ত পড়েই আছে। বৃষ্টির জন্যে অনেক আগেই অন্ধকার হয়ে গেছে না আজ !

তা ঠিক।

গলাটা, দুবাব খাঁকবে পবিষ্কাব কবে নিল ঠুঠা। তাবপব শুরু করল :

ছেলে বলছে মেয়েকে : চলো. সাজ্যা তেঁতুল ঢাবাঁধ ছিছেলা যাব।
পব্‌শা ভাদারি মাবে হুদারি লাগোদাবি
চলো টুবী কর্মা নাচালে খারানা যাবওও।

চল মেয়ে, সাজা গাছেব নিচেব ঝর্ণায মাছ ধবতে যাব। তোকে নিযে। তাডাতাড়ি চলরে মেয়ে পা চালিযে জঙ্গল পেবিযেই নাচের জাযগা খাবানাতে গিয়ে পৌঁছব।

মেয়ে বলছে : বাত ভবা কর্মা নাচাইলে
দিনাকে উগত্‌মোলা ছট্টি দেই দেরি
হাম যাব. ঘবা ভাগি যাবওওওও…

ছেলে : বাতভবা করামা নাচাযোঁ
দিনাকে উগত্‌ টুরী ঘব লায়ি যাওওও…।

মেয়ে : দাদা মোরা গালি দেহি, দাই মোলা মার্‌হি
নেহী যাউ টুবা তেরা সঙ্গা, ঘব নেহী যাউ টুরা
বড়া ভারী কোমিটি ঘর বৈধ্‌ যাহিইই।

ছেলে : আরে দাদালা দারু পিয়ারে, দাইলা দারু পিযাবে
যাবা সঙ্গত কর্‌কে খুশিয়ালিসে শাদী বানাবওওও…

বাঃ ! বাঃ !

বলে উঠল দেবী সিং। সত্যি ! তারপব বলল এসব গান শুনলে নিজেদেব ছেলেবেলাতেই চলে যাই। তবে, আমাদের সময়কার নাচগানে 'কোমিটি'রমতোইংরিজি কথা-টথা থাকত না, এইই যা।

ঠুঠা বিজ্ঞরমতোবলল, ইণ্ডিপিণ্ডিরির পর দেশের লোক সবাই ইংরিশ বলাবলি শুরু করল। বলো দেবী সিং ! শিকারের মওকায় সত্যিকারের কত্ত সাহেব-মেম আমরা গুলে খেলাম। এই দিশি ইংরিশ সাহেব-মেমদের হ্যাঁদাহেঁদি দেখে ওদের মুখে হিসি করে দিতে ইচ্ছে করে।

দেবী সিং বলল, এই ত কেমন মজার মজার কথা বলছ এখন ঠুঠা। তোমারমতোকথা। মাঝে মাঝে তোমার যে কী হয়। এতক্ষণ যে কী সব মাথা-ধরানো কথাবার্তা বলছিলে। ভাল লাগছিল না একেবারেই আমার। কী যে সব চিন্তা করো তুমি !

ঠুঠা হাসল একটু, আগুনের আলো দেবী সিং-এর চক্‌চক্-করা চোখে চেয়ে। তারপর দিগা পাঁড়ের মুখে শোনা তুলসীদাসের শ্লোক আউড়ে দিল কড়াক্ করে। বলল. মানুষমাত্রই চিন্তা থাকে দেবী সিং। "চিন্তা সাপিন্ কো নহি খায়া ?"

মানে কি হল ?

চমকে উঠে, দেবী সিং বলল, আবারও জ্ঞান দিচ্ছে ঠুঠা। জীবনের শেষে এসে এত জ্ঞানট্যান ভাল লাগে না আর।

চিন্তার সঙ্গে সাপের উপমা দিয়েছেন তুলসীদাস। চিন্তারূপী সাপ, কামড়ায়নি কোন্ মানুষকে ? মানুষ হয়ে জন্মালেই এই সাপের কামড় খেতে হয়।

তা হয়ত হয়। কিন্তু, থাক থাক। রাত-বিরেতে আর সাপ সাপ করে কাজ নেই। একমাত্র ঐ জিনিসকেই ভয় আমার জঙ্গলে। শঙ্খচূড়ের জবরদস্ত আড্ডা এ সব জায়গায়। তার উপর আবার বৃষ্টিও হল। শুতেও ত হবে মাটিতেই। এই গাছেব নিচে।

আনো এবার ময়ূরটা। হঠাৎই বলল ঠুঠা। শালাকে বানাই। কত শঙ্খচূড় খেয়েছে এ ব্যাটা তা

কে জানে !

দেবী সিং একটা বাঁশ কেটে টাঙ্গী দিয়ে চেঁচে সরু শিকের মতো করেই রেখেছিল। সেটা পালকছাড়ানো ময়ূরের সামনে থেকে পেছন অবধি সেঁধিয়ে দিল শক্ত হাতে। তারপর সেই ছুঁচোলো বাঁশের দুদিক দুজনে ধরে আগুনের উপর আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ময়ূরটাকে সেঁকতে লাগল।

একটু ঘি থাকলে জমে যেত।

ঠুঠা বলল।

থাক। অনেক হয়েছে। খিদের সময় মাংস জুটছে জঙ্গলে এইই ঢের, তার আবার ঘি ! যেন কতই রোজ ঘি খাওয়ার অভ্যেস দুজনের !

দুজনেই হেসে উঠল। দেবী সিং-এর কথায়।

ময়ূরের সাদাটে মাংস, অনেকটা মুরগীর মাংসের মতোআগুনে পুড়ে প্রথমে লাল তারপর কালো হয়ে উঠতে লাগল। মাংস-পোড়া গন্ধও বেরুতে লাগল। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঠুঠার মনে হল ওকেও একদিন এমনি করে পুড়ে যেতে হবে। তার নিজের গায়ের পোড়া মাংসর গন্ধ বেরুবে একদিন কোনো গভীর বনের ধারের নির্জন নদীপারের শ্মশানে ! গা ছমছম করে উঠল ঠুঠার। ইদানীং এরকম হচ্ছে ওর প্রায়ই। কারা যেন ওর সঙ্গে কথা বলে জঙ্গলে এলেই, দিনে বা রাতে। একা নদীতে যেতে, বা জঙ্গলে হাঁটতেও অন্ধকারে ভয় করে আজকাল। ঠুঠা বাইগারও ! যে একদিন দিনের এবং রাতের যে-কোনো প্রহরেই মাটিতে দাঁড়িয়ে বড় বাঘের মোকাবিলা করেছে আকছার ! কেন যেন ঠুঠার মনে হচ্ছে, আজও রাতে নাঙ্গা-বাইগীন্ স্বপ্ন দেবে তাকে। নাঙ্গা-বাইগীন ! আবারও গা ছমছম করে উঠল ওর।

ভাবছটা কি অত ?

হঠাৎই বলল, দেবী সিং।

ঠুঠা চম্‌কে চোখ তুলে চাইল। ওর হাতে-ধরা ছুঁচোলো বাঁশ-বেঁধা ময়ূরটা দুলে উঠল হঠাৎ হাত কেঁপে যাওয়ায়।

বলল, নাঃ। কী ভাবব, তাইই ভাবছি !

এমন সময় ওদের পেছনের পাহাড়ের উপর থেকে বাঘ ডাকল দুবার। বড় বাঘ। তার ডাক বৃষ্টি ভেজা জঙ্গলের দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে গেল। প্রস্তরময় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে প্রতিধ্বনিত হল কিছুক্ষণ।

দেবী সিং বলল, যাঃ শালা। ইণ্ডিপিণ্ডিরির পর যত ফেমিলি-প্লেনিং সব আমাদেরই বেলায়। আর তোদের বংশবৃদ্ধি করতে সরকার বাহাদুরের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। যাঃ ! বেঁচে গেলি। আমি আর ঠুঠা বাইগা এখন রিটিয়ার করেছি। সব রকম মারামারির সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি এখন আমাদের।

ল্যাক ফ্যাক্টরীর ক্যান্টিনে একজন মাঝবয়সী ওড়িয়া আছে। কালাহাণ্ডীর ভবানী-পাটনা থেকে এক ওড়িয়া শিকারির ক্যাম্পের রাঁধুনি হয়ে এসেছিল বছর কুড়ি আগে। ছত্তিশগড়িয়া একটি মেয়েকে বিয়ে করে থেকে গেছে সে হাটচান্দ্রাতেই। এই মস্ত কদম গাছটির তলাতে বৃষ্টি ভেজা রাতে বসে তার কথা এবং তার গাওয়া একটি গানের কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল ঠুঠার। লোকটির নাম হল দুগ্‌গা মহান্তি। দুগ্‌গা মাঝে মাঝেই রাতের বেলা সুর করে ওড়িয়া রামায়ণ পড়ে আর গান গায়। ভারী ভক্ত মানুষ সে। এই গানটি তার বড়ই প্রিয়। গত কয়েক বছরে এতবারই শুনেছে যে, শুনে শুনে মুখস্তই হয়ে গেছে ঠুঠার।

> "কদম্বমূলে কী এ পশিছি গো
> নন্দনন্দনপরি কী এ দিশুথিব
> সে যেরে রামহন্তা সঙ্গে সীতয়াথান্থা
> লক্ষ্মণপরি মুখ দিশন্তা গো ও-ও-ও-ও-ও…
> সে যে বেহরবন্তা সঙ্গে পার্বতীথান্তা
> ডিবিডিবি ডম্বরু বাজন্তা

সে যে রে মেঘহন্তা গরজি বরষন্তা
চিকিচিকি বিজলী মারন্তা গো ও-ও-ও-ও...

দেবী সিং বলল, আবার কি ভাবতে বসলে ঠুঠা ?

নাঃ। কিছু না। কী ভাবব, তাইই ভাবছি।

ঠুঠা ভাবছিল, নিজের সব ভাবনার কথা অন্যকে বলতেই নেই। লাভ হয় না কোনো। প্রত্যেক মানুষে মানুষেই নাঙ্গা বাইগা বড়ই তফাৎ করে রেখেছেন। এক একজন মানুষের ভাবনা এককে স্তরে চলে, একই আকাশে নানান জাতের পাখি যেমন নানা উচ্চতাতে ওড়ে। তেমনই।

খাওয়া দাওয়ার পর ওরা দু'জনে চুট্টা টেনে শুয়ে পড়েছিল। চারধার থেকে ঝরনার শব্দর মতো ঝি ঝি ডাকছে। একটানা।

দেবী সিং অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাৎ হয়ে। সুখী লোকদের ঘুমোতে দেরী হয় না। দু' হাতের পাতা জোড়া করে ঘুমের মধ্যে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করছে সে বড়হা দেবের কাছে। ক্ষেতি-জমিন, বৌ, গাই-বয়েল, বোদে, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীতে ঘর ভরা দেবী সিং-এর। একটা মস্ত প্রাচীন, ঝাঁকড়া ঝুরি-নামানো অশত্থগাছেরমতোমনে হয় ঠুঠার, দেবী সিংকে। সে না থাকলেও তার শিকড় সব থেকে যাবেই। সে যখন মারা যাবে, কাঁদবে তার আত্মীয় পরিজনরা। মুখে আগুন দেবে তার ছেলেরা।

আর ঠুঠার ? না আছে তার শিকড়। না, থাকবে। যে-শিকড় ছিল একদিন তারই খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। পাবে কি ? কে জানে ? ঠুঠা ওর হারিয়ে-যাওয়া গ্রামের একলা শিমুলেরই মতোইএকা। চলেও যাবে একা একাই।

রাত আস্তে আস্তে গভীর হচ্ছে। শেষ কার্তিকের বিকেলের অসময়ের বৃষ্টির পর আকাশ থম্ মেরে আছে। পেছনের কাছিম-পেঠা পাহাড়টা কিচুল রাজারমতোঅন্ধকারের বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন অঘোরে। ঝিঝি ডাকছে একটানা। সেই ডাক মাঝে মাঝে ছিদ্রিত হচ্ছে বারবার একটি কুট্‌রা হরিণের ভয়-পাওয়া, ঝাঁকি-দেওয়া, সংক্ষিপ্ত ডাকে। সেই গম্‌গমে ডাকে বৃষ্টিশেষের নিথর মৌনী জঙ্গল চমকে চমকে উঠছে।

এখন জঙ্গলের অন্য রূপ। আরও কিছুদিন পর শীতের বেলা এলে হঠাৎ সদ্য বিধবার রুখু, বিষণ্ণ, উদাস রূপ নেবে এই জঙ্গল। গুড়িসুড়ি-মারা বুড়ি পাতারা একে একে ঝরে যাবে হাওয়ার সওয়ার হয়ে। বিবাগী হাওয়ায় লাল হলুদ খয়েরী কালো পাতারা এক দমকে দলবেঁধে দৌড়ে যাবে আগাছাশূন্য শুকনো মরা-খুস্‌কিরমতোমাটিতে। দৌড়ে যাবে কালো-সাদা পাথরে, শুকিয়ে যাওয়া পাহাড়ি নালাতে, বিছিয়ে থাকা সাদা প্রান্তরে। এক একবার থম্‌কে থামবে, যেন কোনো অদৃশ্য দেবতার আঙুলেরই নির্দেশে। পরমুহূর্তেই আবার দৌড়ে যাবে। বনের বুকের মধ্যে থেকে ফিস্‌ফিস্ করে চাপা গলায় অদৃশ্য কারা যেন কথা বলবে। মৌটুস্‌কি পাখি ডাকবে কিস্‌কিস্ করে। কুঁচফুলের থোকা ফেটে লাল-কালো কুঁচফল ঝরে পড়বে মাটিতে। কোনো অদৃশ্য, হলুদ-বরণ সোনার বেণে সেই কুঁচফলগুলো তুলে নিয়ে শীতের শেষ বিকেলের পেতল-রঙা দাঁড়িপাল্লায় পশ্চিমাকাশের সোনা, ওর কৃপণ হাতে ওজন করবে।

ভর দুপুরের আলো-ছায়ার সাদা-কালো ডোরা-কাটা সতরঞ্চীতে এক্কা-দোক্কা খেলবে লাফিয়ে লাফিয়ে চিংকারা, কৃষ্ণসার আর চিতল হরিণীরা আমলকি বনের নিচে ঝরে-পড়া আমলকি খেতে খেতে। উদোম নীল আকাশে, উদ্‌লা বাতাসে ভেসে দিগন্তে উধাও হবে টিয়ার ঝাঁক চকিত-চাবুকের মতোডাক ডাকতে ডাকতে। দিনান্তবেলায় একটি অতিকায় নরম লাল গোল বলেরমতোসূর্যর রহস্য উন্মোচনের দুরন্ত দুর্মর আশায় তার লম্বা নড়বড়ে দুটি উড়ন্ত পা দোলাতে দোলাতে, কোনো অভিযাত্রী উৎসুক যুবক টি-টি পাখি সেই দিকে উড়ে যাবে হুট্টিটি হুট্টিটি-টি-টি হুট্-টি-টি -টি-টি-হুট করে ডাকতে ডাকতে। তারপর একসময় সেই গলন্ত বিলীয়মান সূর্য কপ্ করে গিলে নেবে তাকে।

চাকরীতে ইস্তফাই দেবে ঠিক করেছে ও। কোম্পানীর ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, পিরথ্‌বাবুর বৌ রুম্বা মেমসাব, ঠিকাদার ইদুরকার সাহেব এদের জীবনযাত্রা, রাহান-সাহান্ ভাল লাগে না ঠুঠার।

পিরথুবাবু অবশ্য একটা অন্য জাতের মানুষ। সে যেন ওদেরই একজন। জঙ্গলে যখন থাকে তখন তাই-ই মনে হয়। ইংরিজী লেখা-পড়া, বিলেতের ডিগ্রী, বড় চাকরী, বাড়ি-গাড়ি টাকা-পয়সা এসবের কিছুই মানুষটাকে ছুঁতে পারেনি।

ঘুম আসে না ঠুঠার। এ পাশ ও পাশ করে। পাশ ফেরে। তারপর উঠে বসে রাতের বনের শব্দ শোনে। গন্ধ নেয় নাকে। নাভি থেকে টেনে। এই গন্ধ, তাকে চিরদিন যুবতীর গায়ের গন্ধর চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করেছে।

উপবের গুহা থেকে ভালুক পবিবার নামল। এই শালাদেরই বিশ্বাস নেই। বনে জঙ্গলে মাত্র এই শালারা আর শুয়োরেরা বিনা কারণে হাম্‌লা কবে দেয় মানুষের উপর। বন্দুকটা টেনে নেয় ঠুঠা হাতের কাছে।

চারদিকে নানারকম গাছ। নীরব প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে ওদের ঘিরে। সার সার। এদিকে শাল নেইই বলতে গেলে। বাঁশের ঝাড়, ধাওয়া (গঁদ), হাররা, বহেড়া, কাস্‌সী, কুহমি, চাঁব বা চিবাহ্যিদানার মস্ত মস্ত সব গাছ। শিমুল, কদম, আর জামুনও আছে। শীতের বৃষ্টির পর মাঝ রাতে সুগন্ধ ছড়িয়েছে বন-বনানী। রাতচরা পেঁচা আব নাইটদারের ডাকের সঙ্গে হায়নার হাসি মিশে যাচ্ছে। চিতল হবিণের ঝাঁক থেকে শিঙলগুলো ডাকছে টাঁউ! টাঁউ! টাঁউ! করে। রাত জেগে উঠেছে। মধ্যবাতেব ছাই-বঙা অন্ধকারে, সপ্তমীর চাঁদের আলোর সঙ্গে বনেব মধ্যের শিশির আর কুয়াশা মিশে এক স্বপ্ন-রাজ্য তৈরী হযেছে যেন। দেব-দেবীরা বোধহয় এই সময়েই জেগে ওঠেন। হাবাই, ধারওয়া, সাইআম ইয়াম্‌, উইক্কে, কুস্‌রে। ঠাকুর দেও। ঘামসেন, মাস্‌ওয়াসি, সাইযাম দেও, ঠাকুর দেওব সব ছেলেবা। আবও কত দেব-দেবী! বড়াহদেব ত আছেই।

একটা চুট্টা ধবালো ঠুঠা। ভাবনায় পেয়েছে এখন ওকে। জঙ্গলে একা থাকলেই ওকে ভাবনাতে পায়। এই পৃথিবী কতদিনের পুরোনো কে জানে? ওর ঠাকুদাব কাছে গল্প শুনেছিল এই পৃথিবীর জন্মব কথা। নাঙ্গা বাইগা আব নাঙ্গা বাইগীনেব জন্মবৃত্তান্তও :

হুঁকো খেতে খেতে ঠাকুর্দা, বান্‌জাব-বাম্‌নির সেই বুড়ো গাওয়ানেবই মতো. কানে পেতলের মাকড়ি পরে, লেপেব জামা গায়ে দিয়ে শীতের রাতে আগুনের পাশে বসে লাউয়েব খোল থেকে মহুয়া ঢেলে খেতে খেতে নাতি-নাতনীদের গল্প শোনাত। অনেক সময় ছিল তখন মানুষেব হাতে, শান্তি ছিল অনেক। এত ব্যস্ত ত্রস্ত ছিলো না প্রত্যেকে। আজকের সব ব্যস্ততাই টাকার জন্যে অথচ টাকা দিযে কেনা যায় না যা ওবা ফেলে এসেছে পিছনে। সেই সব দিন অনেক সুখের ছিল। শহবের মানুষরা..কল-কারখানার মানুষবা আরামেব সঙ্গে সুখকে গুলিয়ে ফেলেছে।

ঠাকুর্দা বলেছিলেন, ভগযান নাঙ্গা বাইগাকে সৃষ্টি কবাব আগে বারো বছর ধবে উপোস কবেছিলেন। শুধু উপোসই নয়। সেই বাবো বছর তবল কিছুও খাননি। জলও না চানও করেননি। বারো বছব চান না করায ভগয়ান ভাবী নোংবা হযে গেছিলেন। গাময় মযলা। বারো বছব পেরুনোব পব তেরো বছরের মাথায ভগয়ান তাঁব বুক এবং বগলতলা থেকে ঘষে ঘষে অনেকই মযলা বের করলেন। দু হাতেব পাতাতে ওই মযলার কিছুটা নিয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে রগড়ে বগড়ে দুটি মানুষেব মতো দেখতে মূর্তি বানালেন তিনি। সেই মূর্তি দুটিকে বাড়িতে নিযে রেখে দিযে বললেন : কোনোও একদিন কাজে আসবে এ দুটি।

তারপর একদিন ভগয়ান তাব হাতের কড়ে আঙুল কেটে সেই মূর্তিদুটিব উপর রক্ত ঢেলে দিয়ে তাদেব প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন।

নাঙ্গা বাইগা আর নাঙ্গা বাইগীন দুজনেই উলঙ্গ ছিলেন। তাই প্রাণ পেয়েই তাঁদেব বড লজ্জা হল। তাঁরা সিঙ্গার দ্বীপে গিয়ে সমুদ্রে গা-ডুবিযে বসে থাকলেন লজ্জা থেকে বাঁচতে। সিঙ্গাব দ্বীপ আমাদেব পৃথিবীর আদি, তখন শুধুই পাথব-ভরা ছিল। আর সমুদ্র ঘেবা।

বুড়্হা নাঙ্গকে দেখতে ছিল মানুষেরই মতো। কিন্তু তাঁব সাপেব মতো একটি লেজ ছিল। মুখটাও ছিল সাপেরই মতো। সাপেব মতো লম্বা মুখ এবং নাক। দাঁতগুলো কিন্তু মানুষেবই মতো ছিল।

উচাইতে তিনি সাধারণ মানুষেরই সমান ছিলেন কিন্তু লেজটা ছিল মস্ত লম্বা। হাত পা সবই মানুষেরইমতোছিল। অথচ সাপেরমতোইল্যাংটা থাকতেন তিনি। জামা-কাপড় পরতেন না কিছু। উত্তরাখণ্ডে ফিকে বাদামী-রঙা বুড়হা নাঙ্গ তাঁর ফর্সা বউরাণী দুধ-নাঙ্গ-এর সঙ্গে থাকতেন। আর থাকত বুড়হা নাঙ্গ-এর ঝি এবং উপপত্নী মালহিন্। মালহিন্ অন্য সব কাজ ত করতই তাছাড়া বুড়হা নাঙ্গ-এর গা মালিশ করত এবং বুড়হা নাঙ্গ-এর সঙ্গে দুধ নাঙ্গ-এর ঝগড়া বাধলে সেই ঝগড়া মিটিয়ে দিত। বুড়হা নাঙ্গ-এর খাদ্য ছিল শজারু। রোজ একটি করে শজারু খেতেন তিনি। শজারুই ছিল বুড়হা নাঙ্গ-এর শুয়োর।

সিঙ্গার দ্বীপ থেকে উত্তরাখণ্ডে যাওয়ার কোনো পথই ছিল না। কিচুল রাজা ছিলেন এক পেল্লায় কচ্ছপ। তিনি থাকতেন সিঙ্গার দ্বীপের এক পাহাড়ের মস্ত গুহায়। গায়ে ভীষণ জোর ছিল কিচুল রাজার। পাণ্ডবরা তাঁকে গিয়েই ধরলেন। বললেন যে, উত্তরাখণ্ডে গিয়ে তাঁদের জন্যে ধরিত্রী মাকে নিয়ে আসতে হবে। ধরতি-মাকে। কিচুল রাজা পাণ্ডবদের অনুরোধে সেই পাহাড়ের মধ্যের গুহাতে এক ফাটল ধরিয়ে সেই ফাটল বেয়ে উত্তরাখণ্ডে নেমে গিয়ে কী করে উত্তরাখণ্ডের মাটি গিলে ফেলে পেটের মধ্যে করে তা শেষমেশ সিঙ্গার দ্বীপে নিয়ে এলেন এবং ধরতি-মাতা থেকেই কী করে পৃথিবীতে মাটি এল এবং কী করে পৃথিবী ধান, জওয়ার, বাজরা, কাড়ুয়া সরগুজা, তামাকু এবং বন-বনানী আর ফুলে, ফলে ভরে উঠল সে অনেক লম্বা গল্প।

ধরতি-মাতা পৃথিবীতে আসার পর সিঙ্গার দ্বীপের সমুদ্রে গা-ডুবিয়ে বসে-থাকা নাঙ্গা বাইগার তলব পড়ল। নাঙ্গা বাইগার স্ত্রী নাঙ্গা বাইগীন থাকা সত্ত্বেও নাঙ্গা-বাইগার প্রকাণ্ড পুরুষালী চেহারাতে মুগ্ধ হয়ে ধরতি-মাতাও তাঁর স্ত্রী হবার বাসনা দেখালেন। তারপর থেকে সিঙ্গার দ্বীপে থেকেই গেলেন ধরতি-মাতা নাঙ্গা বাইগারই সঙ্গে, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে। নাঙ্গা বাইগীনও থাকলেন আগেরই মতো। দুধবরণ নাঙ্গ-রাণী।

এসব গল্প ঠুঠা বাইগা প্রায় ভুলতেই বসেছে। হাটচান্দ্রার পরিবেশে ও ভুলেই যায় যে ওরও একটা আলাদা জগৎ কখনও ছিল।

রাত এখন কত কে জানে?

নদীর কাছের কোনো বড় গাছের ডালপালা ঝাঁকিয়ে হনুমানেরা রাতের ঝিঁঝির ডাকের একঘেয়েমি ছিঁড়ে দিয়ে হঠাৎ হুটোপাটি করে ডেকে উঠল। বাঘটা এখন নিশ্চয়ই ওদিক দিয়ে চলেছে। হয়ত নদী পেরোবে। কখন যে ঠুঠা আর দেবী সিংকে অলক্ষ্যে দেখে সে চলে গেছে তার পথে, বুঝতেই পারেনি ঠুঠা। যদিও জেগে বসে, গাছে হেলান দিয়ে চুট্টা খাচ্ছে।



গতকাল রাতে ভিনোদের বাড়ি ওদের নিমন্ত্রণ ছিল। মানে, কক্‌টেইলস্ এণ্ড ডিনার। মান্দলা, মুক্কী, মালাঞ্জখণ্ড থেকে হোমরা-চোমরা অনেকেই এসেছিলেন। সফিস্টিকেটেড ককটেল পার্টি অপছন্দ নয় রুষার। ও সহ্য করতে পারে না শুধু আজে-বাজে মানুষের সঙ্গে মদ খাওয়া। মেলা-মেশা। ওর মধ্যে একটা 'ক্লাস'-এর ব্যাপার আছে, বরাবরই। আর পৃথু হচ্ছে 'ক্লাসলেস্'।

। মানুষে মানুষে প্রভেদ করার শিক্ষাটা পৃথু বাবার কাছ থেকে পায়নি। সেই ঔদার্যর দাম ওকে দিতে হয় প্রতি মুহূর্তে এই তথাকথিত শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, উচ্চবিত্ত শহুরে সমাজে।

পৃথু গেছিল। রুষার পীড়াপীড়িতে। ভিনোদ যে অবিশ্বাস্যরকম বড়লোক তাই-ই নয়, ছেলেটা কিন্তু ভালোও।

একদিন হঠাৎই দেখে ফেলেছিল পৃথু। বর্ষার এক বিকেলে তাদের ড্রয়িংরুমের সোফাতে বসে ভিনোদের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল রুষা। পৃথুকে আসতে দেখে লজ্জা পেয়ে এক লাফে সরে গেছিল দু পাশে ওরা। প্রথমে রেগে গেছিল কিন্তু পরমুহূর্তে খুব ভালও লেগেছিল ওর। পরস্ত্রীদের ভালোবাসাটা শীতের শেষ বিকেলের রোদের মতো। পরপুরুষকে উষ্ণতাতে একটুক্ষণ ভরে দিয়েই মরে যায়। তবু, তার দামও হয়ত অনেক। ওদের দুজনের মধ্যে যে এক মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—এ কথা বুঝতে পেরে পৃথুর খুবই ভাল লেগেছিল। এই নিষ্ঠুর, নির্মম, প্রেমহীন পৃথিবীতে কারও বুকে যদি অন্য কারো প্রতি একটুও প্রেম থাকে ত' তা জেনেই পৃথুর হৃদয় এক মহৎ বোধে ভরে ওঠে। ও জানে যে, ওর নিজের মধ্যে এমন রূপ বা গুণ নেই যে, রুষার শরীর-মনের সব চাওয়াকে সে পূর্ণ করতে পারে। শুধু ওরই কেন, পৃথিবীর কোনো স্বামীরই হয়ত নেই! তা কেউ স্বীকার করুন আর নাই-ই করুন।

ওদের দুজনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক আছে একথা বিশ্বাস হয় না পৃথুর। শরীরকে এনে ফেলে সুন্দর প্রেমকে আবিল করে ফেলার মতো বোকা, রুষার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে কখনই হবে না বলেই ওর মনে হয়। আগে আগে এসব ভেবে উত্তেজিত বোধ করত একটু। এখন খুশিই হয়। আহা! বেচারী রুষা! তুমি খুশি থাকো। তুমি খুশি থাকলেই আমি খুশি। কী ভাবে এবং কোন্ পথে তুমি খুশি হচ্ছো, তা আমার জানার দরকার পর্যন্ত নেই। খুশি থাকো গো। সবাই খুশি থাকুক। খুশিতে ভরে উঠুক এই খুশিহীন পৃথিবী। আনন্দম। আনন্দম। আনন্দম্। দুদিনের এই জীবন। এসেই ত' চলে যাওয়া। নিয়ে-দিয়ে, দিয়ে-নিয়ে ভরপুর করে রেখে সুধন্য করো সকলে, একে অন্যকে। প্রত্যেক তপতীরা আর সুধন্যরা। এবং বেড়ালরাও। শুধু বেড়ালরাই বা কেন? ইঁদুররাও। এমন কি শুয়োররাও। আনন্দম। আনন্দম্। আনন্দম্। এই-ই পৃথুর মনের কথা। অন্তরের কথা।

মেরী চা দিয়ে গেছিল।

লেখার টেবলেই বসে ছিল পৃথু। বৃষ্টির পরে বাড়ির পেছনের ঝাঁটি-জঙ্গল থেকে একা তিতির ডাকছে শীর্ণা গায়িকার মতো গলার শির ফুলিয়ে। দুটো ফ্লাই-ক্যাচার পাখি উড়ে উড়ে ফড়িং ধরছে। মনে হচ্ছে, চিতল হরিণের ঝাঁকে চিতা পড়েছে চকিতে। বৃষ্টির পরের উজ্জ্বল আলোয় শয়ে শয়ে ফড়িং উড়ছে আকাশ হলুদ করে। চামারটোলির দিক থেকে একটা মোষ ডেকে উঠল।

আজ সকাল থেকেই কুর্চিকে বড় মনে পড়ছে পৃথুর। ন'মাসে ছ'মাসে এরকম হয়। যখন হয়, তখন মন বড়ই উচাটন লাগে। ভেজা স্মৃতির ঝোড়ো হাওয়ায় উথাল-পাথাল গাছের মতোই উথাল-পাথাল করে ওর উদলা মন।

কুর্চি যে-ক'দিন একা ছিল এবং নিমন্ত্রণও জানিয়েছিল যাওয়ার জন্যে; তখন যায়নি পৃথু। যায়নি, কারণ ও নিজেকে জানে। কতখানি সংযম অথবা মহত্ত্ব ওর মধ্যে অকুলান্ হবে না সে সম্বন্ধে ওর স্পষ্ট ধারণা নেই। একা-বাড়িতে কুর্চিকে পেলে ও নিজেকে হয়ত হারিয়ে ফেলবে।

একটু পরই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ফিরে আসছে ওরা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। এস ডি ও খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের কালো কুচকুচে যুবতী আয়া, সাদা ধবধবে জোয়ান অ্যালসেশিয়ান কুকুরটিকে শীতের বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতির মধ্যে নিয়ে গেছিল মুক্তির স্বাদ দিতে। তারা এখন ফিরে আসছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ভিজে-যাওয়া, পাতা-ঝরা শাল-সেগুনের শাখা-প্রশাখায় বৃষ্টি-শেষের শীতার্ত রোদের ছোঁয়া লেগেছে। লাল মাটির পথ থেকে হেমন্তর গায়ের সোঁদা সোঁদা গন্ধ উড়ছে। ঝাঁটি-জঙ্গলে তিতিররা পাগলের মতো ডাকাডাকি করে চলেছে। আর এই পটভূমির মধ্যে অনন্ত যৌবনের দুটি প্রতীকেরই মতো সাদা কুকুর আর কালো মেয়েটি যেন দিনান্তবেলার দিগন্তলীন কুয়াশার মেঘের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধসবুজ দীপজ্বালানো লালের

ছোঁয়া-লাগা পশ্চিমাকাশের আঙিনা থেকে নেমে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, ওরা যেন মর্ত্যলোকের কেউ নয়।

কখনও কখনও কোনো কোনো দৃশ্য মনের চোখে, অথবা চোখের মনে এমনি করেই গেঁথে যায়। গেঁথে থাকে। জীবনের শত আবিলতাতেও তা ম্লান হয় না। আজ বৃষ্টিশেষের শেষ বিকেলের এই দৃশ্যটি অনেকটা সেই রকমই। গেঁথে থাকবারই মতো।

লেখার প্যাডটি বের করে কলমের বাক্স খুলল পৃথু।

এই কলমগুলোই ওর প্রাণ। কুর্চির অদেখা, কিন্তু কল্পিত নগ্নতারই মতো এরা প্রত্যেকে খুব দামী ওর কাছে।

ওর প্রিয়তম কলমটি খুলে চিঠি লিখতে বসল পৃথু কুর্চিকে।

হাটচান্দ্রা, রবিবার
বাইশে

কুর্চি,

মালাঞ্জখণ্ড-এ যাওয়ার আগে তুমি আমাকে এবারে জানিয়ে যাওনি। তাই-ই, কালকে রায়নাতে গিয়েও ফিরে এলাম। বাসে করেই গেছিলাম। রুষারা মহিলা সমিতির তরফ থেকে জবলপুরে গেছিল গাড়িটি নিয়ে। ও এবং অন্য কয়েকজন। ওঁদের মধ্যে মিসেস সেনকে তুমিও চিনবে। অন্যদের নাও চিনতে পাবো।

রায়না থেকে ফিরে এসে খুবই খারাপ লাগছিল। ভেবেছিলাম, সারাটা দিন তোমার কাছেই কাটাব। অনেক গল্প শুনব। গান শুনব। গান গাইব দুজনে মিলে। পুরোনো দিনের মতো।

তোমার জন্যে লাড্ডুর দোকানের লাড্ডুও নিয়ে গেছিলাম। দাঈ দিয়েছিল নিশ্চয়ই তোমাকে।

খুবই ইচ্ছে করে এক সন্ধ্যেতে তোমার ওখানেও লাড্ডুর গানের মজলিস বসাই। তোমার পরিচিতদের মধ্যে মালাঞ্জখণ্ড, জবলপুর, মান্দলা, এবং সীওনীতেও ক্লাসিকাল গান যাঁরা ভালবাসেন, এমন অল্প কয়েকজনকে ডেকো। খুবই অল্প কয়েকজনকে। ভীড় হয়ে গেলে রাজনৈতিক সভা হয়, গানের ম্যায়ফিল হয় না। অন্য কেউ বুঝুক না বুঝুক, তুমি অন্তত বোঝো যে গানের সঙ্গে প্রাণের যোগ কতখানি। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে অনেক মানুষকেই গান নিয়ে মাতামাতি করতে দেখি, বিজ্ঞর মতো 'কেয়াবাৎ' 'কেয়াবাৎ' বলে মাথাও নাড়তে দেখি কিন্তু অতি স্বল্পজনেরই মধ্যে গানকে হৃদয় দিয়ে ছোঁবার মতো গভীরতা আছে। অথচ এই কেয়াবাৎওয়ালারাই দলে ভারী। দুঃখ এটাই।

আমাদের লাড্ডু, ওরফে, কুমার সরজুনারায়ণ কিন্তু ক্ষণজন্মা মানুষ। ওর গলার এবং গায়কীর সঙ্গে বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের ছেলে মুনাব্বর খাঁ সাহেবের গলার এবং গায়কীর সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে। অথচ হতভাগা নাকি তালিম নেয়নি কারো কাছেই। বিশ্বাস করো। এযুগেও কি আরেকজন মৌজুদ্দিন এসে হাজির হল?

তুমি লাড্ডুর গান না শুনলে সত্যিই হারাবে কিছু জীবনে। আগামী মাসে গিরিশদার বাড়িতে নাকি আরেকদিন হবে ম্যায়ফিল। তুমি ও ভাঁটু যদি আসতে চাও তাহলে আগেই জানিও। রুষা অবশ্য যাবে না। এই সরজুনারায়ণই যদি ভোপালের রবীন্দ্রভবনে গাইত তবে রুষা প্রথম সারিতে বসে শুনত তার গান। গিরিশদার বাড়িতে লাড্ডুর গানের ত' সামাজিক মূল্য নেই। যে-কোনো আলো-ঝলমল রঙ্গমঞ্চে প্রথম কয়েকটি সারিতে গান, বাজনা, নাটক দেখতে যাঁরা সেজেগুজে বসে থাকেন তাদের মধ্যে বেশিই রুষারই মতো। নামকরা মঞ্চর নামকরা শিল্পীর অনুষ্ঠানে সবচেয়ে দামী টিকিট কেটে দেখতে বা শুনতে না গেলে তাঁদের স্ট্যাটাস থাকে না!

বললে, হয়ত ভাববে, বানিয়ে বলছি; পরশু রাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম বলেই কাল মিষ্টি নিয়ে গেছিলাম তোমার কাছে।

আমার মা বলতেন, কাউকে স্বপ্ন দেখলেই মিষ্টি খাওয়াতে হয় তাকে। রুষা বলে, শুধু মরার স্বপ্ন দেখলেই খাওয়াতে হয়। জানি না। তবে তোমার মরার কথা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবি না কখনও। তুমি না থাকলে, আমার যে কী হবে, তাই-ই শুধু ভাবি মাঝে মাঝে। মনের মধ্যে যখন ঝড় ওঠে,

আমার পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রা,সবকিছু সম্বন্ধেই যখন বড়ই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি ; তখন একমাত্র তোমার কাছে গিয়ে একটু বসলেই শান্তি পাই। তুমি নূতন প্রাণ দাও আমাকে। ফুরিয়ে-যাওয়া আমাকে নবীকৃত করো।

ক'দিন ধরেই খুব ইচ্ছে করে, অনেকদিন পব তোমার গলায় আমাব প্রিয় দুটি গান শুনি। খালি গলায়। "তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, তখন ছিলেম বহুদূরে কিসের অন্বেষণে", আর "কে বলেছে তোমায় বঁধূ এত দুঃখ সইতে/আপনি কেন এলে বঁধূ আমাব বোঝা বইতে"।

আরও অনেক গানই শুনতে ইচ্ছে কবে। তোমাব বিয়েব পব তেমন কবে আর গান শোনা হয়নি। জানি না, কবে হবে আবার। ভাঁটু কি গান ভালবাসে? ববীন্দ্রসঙ্গীত ত' বাসে না বুঝলাম। অন্য গান ?

চিঠি লিখতে বসাব একটু আগেই মণিবাবু এসেছিলেন। তুমি কি মণি চাকলাদারকেব ভুলে গেছ ? বিলাসপুবেব ? সেই যে ! ব্রাহ্ম ভদ্রলোক, সামান্য ট্যারা, খদ্দবেব পায়জামা, পাঞ্জাবী পবতেন, বেসুবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন এবং নাক কুঁচকে কথা বলতেন।

গিরিশদাব কাছেই শুনেছিলাম যে, শান্তিনিকেতনের একটি মেয়ে মণি চাকলাদারকে অনেকদিন আশা দিয়ে শেষে ডুবিয়ে দেওয়াতেই শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে মণি চাকলাদার প্রচণ্ড নস্টালজিক।

ববীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দব প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া আমাদের প্রজন্মর মানুষদের পক্ষে হয়ত মুশকিলই ! তবে, কোনো যথার্থ কবি বা লেখকেবই উচিত নয়, কারো দ্বারাই প্রভাবিত হওয়া। সে ব্যক্তি যত বড় প্রতিভাবানই হন না কেন ! কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত না হলেও অনবধানে, অবচেতনে এক ধরনেব প্রভাব নিশ্চয়ই কাজ করে। এই প্রভাবের কথাও যাঁরা অস্বীকার করেন, আমি তাঁদেব দলে নই। তোমার কী মত এ ব্যাপারে ?

কিন্তু মণিবাবুব ব্যাপাবটা উল্টো। উনি রবীন্দ্রনাথেব প্রভাব অস্বীকার ত' করেনই না বরং উগ্র-রবীন্দ্রভক্ত। যেসব উগ্র-ভক্ত ববীন্দ্রনাথেব প্রতি অশেষ অন্যায় করেছেন অন্ধতায়, মণিবাবু তাঁদেব মধ্যে অন্যতম। যতি যে কোথায় টানতে হয়, তা তিনি জানেনই না। এর পর যেদিন যাব, সেদিন এ নিয়ে আলোচনা করব।

এই দ্যাখো, কোন কথা থেকে কোন্ কথায় এসে গেলাম। কী স্বপ্ন যে দেখলাম, তাই-ই বলা হলো না।

তোমাব মনে আছে কী না জানি না, বাবা মা নিমুকাকা এবং কাকীমার সঙ্গে আমি আর তুমি একবাব মাণ্ডুতে গেছিলাম। তুমি তখন বেশ ছোটো ছিলে। বারো-তেরো বছরের হবে। ইন্দোর থেকে ধার্-এর বাংলোয় গেছিলাম আমরা দুটি গাড়ি করে। তারপর ধার-এর বাংলোতে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে মাণ্ডু পৌঁছলাম। বাবা সঙ্গে থাকলে খাওয়া-দাওয়াটা কী রকম চেহারা নিত ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই !

বর্ষাকাল ছিল। বাবা বলতেন, মাণ্ডুতে বর্ষাকালেই যেতে হয়। মাণ্ডুর রূপ উপভোগ করতে হলে। সেদিন আবার ছিল পূর্ণিমা। খুব সম্ভব আষাঢের পূর্ণিমা। রূপমতী মেহাল্-এ যখন আমরা পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কিউরেটর ছিলেন বাবার বন্ধু। বললেন, ওঁর ওখানে রাতের খাওয়া সেরেই ফিরতে হবে আমাদের। নইলে যেতেই দেবেন না।

রূপমতী মেহালের ছাদে দাঁড়িয়ে আমি আর তুমি হাত ধরাধরি করে দিগন্ত অবধি ছড়ানো নিমার-এর সমতলভূমির দিকে চেয়ে রইলাম। নর্মদার উপত্যকা। যে নর্মদার নাম ছিল বহু শো বছর আগে রেওয়া। দূরে, প্রায় দিগন্তরেখাব কাছে শেষ সূর্যর আলো পড়ে নর্মদাকে লুকিয়ে-থাকা এক ধূসর শঙ্খিনীর মতো দেখাচ্ছিল।

নিমুকাকা দিলরুবা বের করে ভূপালীতে সুর দিলেন, বাবা গাইলেন। সেই গানটি ! মনে আছে কি তোমার ?

"সব গুণী গায়ে অব্ প্রভুকা নাম।

প্রভুকে নাম ান কুছ নাহি কাম ॥
চঞ্চল সৈযা বৈঠে মন্দিব দ্বাবে,
বোবত বোবত আবজ কবে
মাঙ্গত বৈকুণ্ঠ ধাম ॥
সব গুণী গাযে অব প্রভুকা নাম ॥'

'সব গুণী গাযে অব প্রভুকা নাম" ।

আহা ' তবলা ছিল না ত্রিতালে গেযেছিলেন । তাল যেন সমাশ্রিত ছিল তাঁব ভিতবে । হাঁটা চলা কথা বলা, কোনো কিছুব মধ্যেই বাবাব বেতাল ছিলো না কোনো । বাবাব গলাব স্বব এখনও আমাব কানে ভাসে । কী জুযাবি ' মাও ভাল গাইতেন, কিন্তু বাবাব মতো নয়। আমাব বাবাব মধ্যে সত্যিই অনেকগুলো মানুষ বাস কবত । পবস্পববিবোধী, উজ্জ্বল, মেধাবী সব মানুষ , একই আধাবে । বাবা যখন শিকাবেব পোষাক পবে শিকাবে যেতেন হাতে বাইফেল নিযে, তখন তাঁব এক চেহাবা ছিল যখন ব্যাবিস্টাবেব পোষাক পবে ভোপালেব হাইকোর্টে সওযাল কবতেন, তখন তাঁব আবেক রূপ, আবেক ব্যক্তিত্ব । আবাব সেই মানুষই যখন কলিদাব সাদা পাযজামাব উপব চিকনেব কাজ কবা পাঞ্জাবী পবে খসস ঈত্ববেব খুশবু উডিযে মুশাযবা বা কভি-দববাবে বা গান-বাজনাব ম্যাযফিলে উপস্থিত হতেন, তখন আবাব তাঁব রূপ ছিল একেবাবেই অন্য । এই বিভিন্ন সত্তাব মানুষটি যে একই ব্যক্তি তা বোঝাব উপায পর্যন্ত ছিলো না ।

বিভিন্ন পবিবেশে সমাজেব বিভিন্ন স্তবেব মানুষেব সঙ্গে বিনা আযাসে এমন মিলে যেতে, মিলিযে নিতে আমি খুব বেশি মানুষকে দেখিনি । সত্যিই বলছি, কুর্চি, আমাব বাবা বলে নয , এমন মানুষেব সংস্পর্শে আসা যে কোনো লোকেব পক্ষেই সৌভাগ্যব ব্যাপাব ছিল । যেসব মানুষ বাবাকে এক মুহূর্তেব জন্যেও দেখেছেন, তাঁবাও তাঁকে আজীবন মনে কবে বেখেছেন । এমনই ছিল তাঁব চৌম্বকী ব্যক্তিত্ব । আব বাবাব হাসি ' কী দবাজ হাসি যে হাসতেন ' বসিকও ছিলেন তেমন । কোনো অবস্থাতে, কোনো পবিবেশেই তাঁকে নিষ্প্রভ মনে হতো না । এতই বেশি সাবল্য ও দযা ছিল বাবাব যে, মা তাঁকে বোকা বলতেন । বাবাব চবিত্রেব বেহিসেবী, বেসামাল দিকটা আমিও পেযেছি পুবোমাত্রাতে । তাই-ই, কৃষা , আমাব মাযেবই মতো আমাকে নিযে সর্বদাই চিন্তা কবে । কিন্তু আমি বাবাব কোনো গুণই পাইনি । এক কণাও নয । পেযেছি, শুধু দোষগুলোই । মদ্যপান, সংসাববিমুখতা , উডনচণ্ডী স্বভাব, অমিতব্যযিতা, অকাবণ বিষণ্ণতা, আত্মহত্যাব দুর্মব প্রবণতা ।

যা আজ অবধি কাউকেই বলিনি, তা শুধু তোমাকেই বলছি ।আমাব বিশ্বাস হয না বাবাবামতো শিকাবিকে খেতে পাবে এমন বাঘ মধ্যপ্রদেশেব জঙ্গলে পযদা হযেছিল । অবহেলায ছেলেবেলা থেকেই বাঘ মেবেছেন বাবা । দুচোখ খুলে ডাবল-ব্যাবেল বাইফেল দিযে মাবতেন । যাঁবা ভাল শিকাবি তাঁবা একচোখ বুঁজে নিশানা নেন না । দুটি চোখেব মধ্যে সকলেবই একটি মাস্টাব আই থাকে । চোখেব সামনে একটি আঙুল তুলে ধবে দেখলেই বুঝতে পাববে এ কথা । তাঁবা দু চোখ খুলে ঐ মাস্টাব আই দিযেই নিশানা নেন । অব্যর্থ নিশানা ছিল । দিনে কী বাতে । মাটিতে দাঁডিযেও কম মাবেননি । তাই-ই, আমাব দৃঢ বিশ্বাস, আত্মহত্যা কবাব জন্যেই বাবা ইচ্ছে কবে বাঘকে আহত কবে নিচে নেমেছিলেন মাচা থেকে । তুমি বলতে পাবো, তাহলে ত নিজেব বাইফেল দিয়েই মাবতে পারতেন নিজেকে । হযত পাবতেন ' কিন্তু কাব মাথায আত্মহত্যাব ভূত যে কখন চাপে তা ত যাঁবা তা কবেছেন তাঁবা নিজেবাই একমাত্র বলতে পাবতেন । বেঁচে থাকলে ।

আমিও দশ বছব বযস থেকে শিকাবে যাচ্ছি বাবার সঙ্গে । প্রথম দিনেই শিখিয়েছিলেন বাবা আমাকে, অন্ধকাব হযে যাবাব পর বাঘ আহত হলে মাচা থেকে কখনই নামবে না । কখনও না । আব বাবা নিজেই ' বিশ্বাস হয না আমাব সে জন্যেই । উনি হঠকারী ছিলেন না ।

মনে আছে, তোমাব মা গান ধবলেই বাবা তাঁব পেছনে লাগতেন । কাকীমার গলায় পুবাতনী ও ব্রহ্মসঙ্গীত খুব ভাল লাগত আমাব । তুমিও কিন্তু কাকীমার ব্রহ্মসঙ্গীতেব ঝাঁপি থেকে তেমন কিছুই নিলে না । আহা ' কী সব গান ' কী সুব ।

কাকীমা গান ধরলেই বাবা ঠাট্টা করে বলতেন, ও রাণী, কোন্ স্কেলে ধরলে বোন ? এ ত' শ্রুতি। তুমি যেখানে 'পা' বলছ সেখানে ত কোনো স্কেলই নেই। লজ্জায় কাকীমা লাল হয়ে যেতেন। বলতেন, আবারও !

কাকীমার ঐ একটিই দোষ ছিল। ছোটবেলা থেকে খালি গলায় বাজনা-ছাড়া গান গেয়ে গেয়েই গান ধরবার সময় বোধহয় অনেক সময় শ্রুতিতেই ধরে দিতেন। সামান্য সময় পরে কিন্তু নিজেই বদলে নিতেন এবং নিকটতম স্বীকৃত স্কেলে ফিরে আসতেন অতি দ্রুত। এরকম অবশ্য ক্বচিৎ কদাচিৎই হত।

অবশ্য খালি গলার গানই ত' গান ! আজকাল অনেক শিল্পীকে দেখি, যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বা অতুলপ্রসাদের গান বা অন্যান্য হালকা গানও গাইতে বসে, পাঁচরকম যন্ত্র নিয়ে গাইছেন। তাঁদের গলাটা যে কী ধরনের তা বোঝারই উপায় থাকে না। প্রত্যেক যন্ত্রর সামনে মাইক, নিজের সামনে দুটি মাইক। গান ত' না যেন গলা ঢেকে রাখাব বোরখা। শুধু তানপুরা বা অন্য একটি তারের বাজনা নিয়ে গাইলে, কাব গলা যে কেমন তার পরীক্ষা হয়ে যায়।

কাকীমার গলায় একটি ব্রহ্মসঙ্গীত শুনেছিলাম আমি। প্রথমবার শুনেই গানটি তুলে ফেলেছিলাম। মন খারাপ লাগলে এখনও গাই। তুমি কী জানো গানটি ?

"চলো গাই সেই ব্রহ্মনাম/যে নাম স্মরণে প্রাণারাম, মরণ ঘুচেরে/হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে মধুর রাগিণী তুলিযে..." ইত্যাদি।

কাকীমা, আরেকবাব আমাদের জবলপুবেব বাগান বাড়িতে আমাব মায়ের জন্মদিনে গেয়েছিলেন। বাড়িব ছাদে বসে। একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। মনে আছে কি তোমার ? মায়ের জন্মদিন ছিল। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে। সামনে নর্মদা বয়ে যাচ্ছে। গরমের দিন। ফুল, ধূপ আব ঈত্বরের গন্ধে মস্ত কবা সেই চাঁদের রাতে কাকীমা গেয়েছিলেন গানটি। বুকেব মধ্যে গেঁথে আছে সে গান। মনে আছে, পিচ্-পাইপ দিয়ে সুর বাঁধা হল। নিমুকাকা এস্রাজ বেঁধে নিলেন। আমি তানপুরা ছেড়েছিলাম !

"হৃদযবাসনা পূর্ণ হল আজি মম পূর্ণ হল, শুন সবে জগতজনে ৷৷
কী হেবিনু শোভা, নিখিল ভুবননাথ
চিত্ত-মাঝে বসি স্থিব আসনে ৷৷"

এক-একটি গান এমনভাবে কানে, হৃদযে বসে যায় যে, সেইসব গান আমাদের জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। কিছু মুহূর্ত, কিছু অনুভূতি, কিছু স্মৃতি, সেই সব গানেরই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গেঁথে যায় বিনিসুতোর মালায়। আমার মৃত্যুতেই সেই সব গানের রেশ বুঝি ছাই হয়ে যাবে এই অপদার্থ মানুষটার শরীরেরই সঙ্গে।

কুর্চি ! কিছুই ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে এত ইচ্ছে করে, তোমার সামনে গিয়ে বসার জন্যে এমন আকুলি-বিকুলি করে আমার সমস্ত মন যে পাগল-পাগল লাগে। রায়নাতে ফিরেই খবর পাঠিও কিন্তু। বা চিঠি লিখো। চিঠি লিখলে, কারখানার ঠিকানাতেই লিখো। জীবনে ন্যূনতম শান্তির কারণে কখনও কখনও বক্রগতির বা মিথ্যাচারের আশ্রয় নেওয়া যে অন্যায় নয়, এ কথা আমি আজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি জীবনের ধুলোর পথে অনেক অনেকদিন হেঁটে এসে।

চলো, কুর্চি ! আর একবার মাণ্ডু যাই। শুধু তুমি আর আমি। এখন মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজম্ ডিপার্টমেন্ট থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করেছেন সুন্দর। মাণ্ডুতেই থাকব। ইন্দোর থেকে চলে যাব গাড়ি ভাড়া করে। জাহাজ ম্যেহাল, বাজবাহাদুর ম্যেহাল, রূপমতী ম্যেহাল, আসরফি মেহ্যাল। আরও কত সব মোহাল, মসজিদ, তাবেলা। মাণ্ডুতে অতীত কথা কয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের কথা মনে হয়, সেখানে গেলেই। ঘুরে ঘুরে সব দেখাব তোমাকে নতুন করে। যখন আমরা গেছিলাম, তখন তুমি ত ছোটই ছিলে। তোমার সব মনে থাকার কথা নয়।

মা, বাবা, নিমু কাকা, কাকীমা সকলেব স্মৃতির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে রূপমতী ম্যেহাল। তুমিও আমাকে গান শোনাবে আসন্ন সন্ধ্যায় অথবা রাতের প্রথম প্রহরে রূপমতী ম্যেহালের ছাদে

বসে। বাবার গানের কথা মনে পড়ে যাবে : "সব গুণী গায়ে অব্ প্রভুকা নাম…"।

ভাবলে, ভারী খারাপ লাগে, না ?

মানুষের নিজের হাতে-গড়া প্রতিটি জিনিসই থাকে, শুধু মানুষই থাকে না। এই বিপুল রঙ্গমঞ্চে তার ভূমিকাটিই সংক্ষিপ্ততম। যদি যাও আমার সঙ্গে, আমরা দুজনে দেখতে পাব, রূপমতী ম্যেহাল ঠিক তেমনই আছে, আছে নিমার্-এর বিস্তীর্ণ সমতলভূমির শেষের দিগন্তরেখায় নর্মদার শান্ত বিবাগী চাল : রোজ উষাকালে যে নদীদর্শন না করে রূপমতী জলস্পর্শ করতেন না। আর আছে আকাশভরা তারাদের স্নিগ্ধতা। আছে যুগ যুগান্ত ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই আফ্রিকান বাওবাব্ গাছগুলি। "আপ-সাইড-ডাউন" ট্রীজ। নেই শুধু বাবা, মা। আমার এবং তোমার। নিমুকাকা কোথায় বসে দিলরুবায় সুর দিচ্ছিলেন, মা এবং বাবা কোথায় বসেছিলেন—সে জায়গাটুকুও আমি আর তুমি হাত দিয়ে ছুঁতে পারব। পারব না শুধু তাঁদেরই ছুঁতে।

কিন্তু মাণ্ডুতে তোমার সঙ্গে একা যাওয়া হবে কি কুর্চি ? এ জীবনে ? আমি যে পরপুরুষ। আর তুমি যে পরস্ত্রী যার যার খোঁটায় বাঁধা আছি যে আমরা। যার যার মুখের সামনে রাখা জাব্‌নাতে অবোধ পশুর মতো মুখ ডুবিয়ে জীবনের জাব্‌না খাচ্ছি। মাপা খড়, মাপা গুড়, মাপা খোল। প্রয়োজনের সংসারে, দুধ বেশি করে দেব বলে। মাপা দুধ। মাপা নিয়মে। সকাল-সন্ধ্যে। মৃতবৎসা গাভীদেরই মতো আমাদেরই পাশে, ব্যাঙের গায়ের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া আমাদের সব মানবিক বোধ, সূক্ষ্ম আশা-আকাঙ্ক্ষা, মৃত বাছুরের কাঠে-মোড়া চামড়া, দাঁড় করানো আছে। এই সংসারের গোয়ালে। হ্যাঁ। কুর্চি। ঐ চামড়া-মোড়া কাঠটুকুই আমাদের জীবনের প্রতিভূ। আমাদেরই জীবন ? হ্যাঁ। আমাদেরই। যে জীবন আমরা চেয়েছিলাম। হয়ত ভুল করে। তবু। আমরা প্রত্যেকটি মানুষ। আমি। তুমি। রুষাও। আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ বড় কাতর হৃদয়ে চেয়েছিলাম, অনেক বাসনায় কৈশোরের হালকা বেগুনী রঙা জীরহুল ফুলের মতো স্বপ্নে যে জীবনের ছবি এঁকেছিলাম, সেই জীবন ! এই-ই আমাদের মনোমত জীবন কুর্চি।

একটাই জীবন। শুধুমাত্র একটা। অথচ, এই-ই আমাদের নিয়তি। এই কালে, এ সমাজে আমরা কেউই বেঁচে থাকি না, আমরা বাঁচতে জানি না। সংস্কার, লোকভয় আর অভ্যাসের দাসত্বই করি শুধু আমরা। প্রেমকে খুন করে তার রক্ত ছেনে অপত্যস্নেহের পুতুলদের নিয়ে পুতুলের ঘর করি। শুধুই প্রশ্বাস নিই আর নিঃশ্বাস ফেলি। ছিঃ। ছিঃ।

চলো কুর্চি। পালাই। বাঁধন ছিঁড়ে হাত ধরাধরি করে চলো, পালিয়ে যাই। বাইরে থেকে ভেতরের দিকে পালাই, বহিরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গে, আপাত থেকে সত্যের দিকে। চলো, চলো, রাত হয়ে আসছে, দিন ফুরিয়ে আসছে : পালাই চলো। পারবে ? সাহস হবে কি পালাবার ?

ভালো থেকো। নিজের জন্যে না হলেও, আমার জন্যে না হলেও অন্তত ভাঁটুর জন্যেও ভালো থেকো। তোমার অনাগত সন্তানের জন্যে ভালো থেকো। ভালো থেকো, সবসময়। আমরা যে কয়েদী। কয়েদীরা ভালো না থাকলে কয়েদখানার বাগানে আনাজ ফলাবে কারা গো ?

—ইতি তোমার পৃথুদা, এই কয়েদখানার একজন কয়েদী।



ছুটি ফুরিয়ে গেল।

অনেকদিন পর ফ্যাক্টরীতে এসেছে পৃথু। শেলাক্ প্ল্যান্ট-এর হাইড্রলিক প্রেস-এর এবং ওয়াশারের একটানা আওয়াজ অনেকদিন পর কানে বড় মিষ্টি লাগছে।

প্রত্যেক পুরুষের আসল জায়গা বোধহয় তার কাজের জায়গাই। তার জায়গা সংসারে নয়। পুরুষ পেনেলোপে নয়, সে ড্যালসাস। তবে পৃথুর কথা আলাদা। ওর আসল জায়গা ওর লেখার টেব্ল, ওর পড়াশুনোর ঘর, যেখানে সে থাকলে সবচেয়েই আনন্দে থাকে। কিন্তু সে যে অগোছালো ব্যর্থ কবি, ব্যর্থ লেখক : তাই-ই নিছক রুজির তাগিদেই যেখানে তাকে একেবারেই মানায় না, সেই কারখানাতেই মানিয়ে নিয়ে থাকতে হয়।

কথাটা কি পরস্পরবিরোধী হল না?

হল।

পৃথুর সমস্ত জীবনটাই ত' পরস্পরবিরোধিতার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। তার চরিত্রের চাবি-স্বরই হচ্ছে স্ব-বিরোধ। অন্য যে-কোনো মানুষ হলে এই টানাপোড়েনে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন, তুলোপেঁজা হয়ে যেত এতদিনে।

কারখানা কুস্‌মি লাক্ষাতে ভরে আছে। এখন খুব জোর কাজের সময়। কুসুম গাছে যে লাক্ষা হয় তাকে বলে কুসমি। ভারী সুন্দর এই গাছগুলো। মস্ত বড় বড়। ফিনফিনে পাতা, একটু গোলচে ধরনের। দোলের সময় পাতাগুলো সব লাল হয়ে যায়। বনে পাহাড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এরা সারা শরীর দুলিয়ে বসন্তশেষের বনে হোরিখেলার আমন্ত্রণ জানায়।

বিকেল শেষ হয়ে এলো। দূর দূর পাহাড় জঙ্গলের বস্তী থেকে কুলীরা দিন থাকতে থাকতেই হেঁটে চলে আসে। সন্ধ্যে থেকে পড়ে পড়ে ঘুমোয় স্টিক ল্যাকের বস্তার উপর। রাত দশটার ভোঁ বাজলে নাইট-ডিউটিতে সামিল হবে বলে। পাঁচ থেকে সাতমাইল হেঁটে আসে ; হেঁটে যায়। কোম্পানী খুব দয়ালু, ওদের ঘুম ছাড়াবার জন্যে রাত দশটার ভোঁ বাজলে এক গ্লাস করে চা দেওয়া হয় প্রত্যেককে। বিকেলেও দেওয়া হয় একবার। দিনে আট টাকা করে পায় ওরা। এই বন-বাদাড়ে যা পায়, তাই ই যথেষ্ট। ভিখিরীর আবার পর্যাপ্ত অপর্যাপ্ত কি ? এই-ই না পেলে ত না খেয়েই থাকত।

দু নম্বর বয়লারটা গোলমাল করছে। কতদিনই বা এই দাসত্ব করবে বেচারীরা। ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার। একটা হরাইজেন্টাল, অন্যটা ভার্টিকাল। একশ ষাট পি সি আই-এর। পি সি আই মানে হচ্ছে, প্রেসার পার পাউণ্ড পার স্কোয়ার ইঞ্চ। বয়লার-এর ক্যাপাসিটি এই ভাবেই মাপা হয়। বয়লার ইনসপেক্শানের দিনও এগিয়ে এল। দু নম্বর বয়লারটার একটা হিল্লে করতে হবে। দুটি মেকানিক্যাল সিডও এবাটিক বিহেভিয়ার করছে। যন্ত্রদের মধ্যেও বোধহয় মনুষ্যত্বর উন্মেষ হচ্ছে। করে না আবার বোনাস-টোনাসও চেয়ে বসে। দিনকাল খুবই খারাপ। বলা যায় না কিছু। কোম্পানীর পার্সোনেল ম্যানেজার বলছিলেন।

দু নম্বর বয়লারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল পৃথু, এমন সময় বড় সায়েবের খাস বেয়ারা এসে সেলাম করল ওকে। বলল যে, উধাম সিং সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

ভগুয়াকে স্টপ ককগুলো ভাল করে চেক করতে বলে, পৃথু উধাম সিং-এর ঘরে গেল অফিস বিল্ডিং এ। দেখল, ঘর একেবারে ভর্তি। তার মধ্যে, একজনকেই শুধু চিনল। সেনট্রাল

এক্সাইজ-এর ইনস্‌পেক্টর। প্রতি মাসে অ্যাকাউন্টস অফিসে এবং কারখানাতে এসে খাতা-টাতা চেক্ করে সই করে দিয়ে যান। সঙ্গের লোকজনদের দেখে মনে হল, সকলে ওঁর সঙ্গেই এসেছেন। একজন মহিলাও আছেন। সঙ্গে দুজন হৃষ্টপুষ্ট চেহারার হোমরা-চোমরা লোক।

উধাম সিং আলাপ করিয়ে দিলেন, এই-ই যে, যাঁর কথা বলছিলাম, পি ঘোষ মানে পিরথু ঘোষ! আর ইনি হলেন দুঙ্গার সিং। সেনট্রাল এক্সাইজের বড় সাহেব। আর মিসেস সিং। ইনি, মিঃ নাগ্‌বেকার। ঘোষ, ভাই তুমি মিস্টার এণ্ড মিসেস সিংকে নিয়ে ফ্যাক্টরীটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দাও। মিসেস সিং একজন লেখিকা। ইনি শেল্যাক্ ফ্যাক্টরীর ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটি নভেল লিখছেন। যদিও ওঁর নভেলের ব্যাকগ্রাউণ্ড মহারাষ্ট্র, তবু যে-কোনো ফ্যাক্টরী দেখলেই কিছু ধারণা হবে।

ভাগ্যিস লিখছেন! পৃথু বলল। নইলে কী আর পায়ের ধুলো পড়ত এই গরীবখানায়। কী বলেন মিসেস সিং?

মাঝে মাঝে পৃথুও রুষার মতো ভাল কথা বলে। বিশেষ করে, সৌন্দর্য-মোহিত হলে।

যদিও মিসেস সিং সত্যিই সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তেমন নন। বয়সে, রুষাদেরই মতো হবেন। তবে, বুদ্ধি ও রুচিজনিত একরকম আল্‌গা শ্রী তাঁর মুখমণ্ডলে লেগে আছে; প্রসাধনেরই মতো।

লজ্জার হাসি হেসে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বল্‌লেন, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি; মিস্টার ঘোষ।

নট্ অ্যাট্ ওল্।

বলল, পৃথু।

মনে মনে বলল, ভারী সরকারী অফ্‌সর-এর স্ত্রীর মধ্যে এমন স্বাভাবিক সৌজন্য দেখা যায় না আজকাল। এখনও এদেশে অনেক কিছুই ভাল আছে। নইলে দেশ বোধহয় চলত না; থেমে যেত। যারা বলে এদেশ থেমে যাবে, থেমে গেছে; তারা ভুল বলে।

সিং সাহেব স্ত্রীকে বললেন, তুমিই যাও। আমি তোমার বই পড়েই সব জেনে নেব, যা জানি না; যখন লিখবে। ল্যাক্-এর গন্ধটা আমার সহ্য হয় না। বমি আসে, বিশেষ করে লিকুইড এবং সেমি-লিকুইড ফর্ম-এ যখন থাকে। তোমার জন্যে ইতিমধ্যে চা-টা'র ইন্তেজাম করছেন উধাম সিং সাহাব। বেশি দেরী কোরো না। তুমি না এলে, আমরা কিন্তু শুরু করতে পারব না।

মিসেস সিং খুবই সপ্রতিভ মহিলা। ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে কারখানার ভিতরে যেতে যেতে পৃথু ওঁকে জিগগেস করল:

কোন্ ভাষায় লেখেন আপনি?

হিন্দীতে। ইংরিজীতেও লিখি। তবে, ক্রিয়েটিভ লেখাটেখা নয়। প্রবন্ধ-টবন্ধ। মিস্টার উধাম সিং ত' আমাকেও বলছিলেন আপনিও নাকি লেখালেখি করেন।

পৃথু লজ্জা পেয়ে বলল, সে বলার মতো কিছুই নয়। আমার কথা থাক। বলুন মিসেস সিং, আপনি কী কী জানতে চান।

সবই বলুন। সব শুনে, যতটুকু জানতে চাই না; সেটুকু বাদ দিয়ে নেব।

সব বলব?

বলেই, হেসে ফেলল পৃথু।

তার চেয়ে আপনি প্রশ্ন করুন।

তা করছি। কিন্তু প্রশ্নর বাইরে কিছু থাকলে তা কিন্তু আপনি নিজেই বলে দেবেন।

আচ্ছা! ঐ দেখুন! ঐ যে দেখছেন স্তূপ করে রাখা আছে, ঐগুলোকে বলে স্টিক্-ল্যাক। চার রকমের ল্যাক্ আসে কারখানাতে। বৈশাখী, জেঠুয়া, কাত্‌কি আর কুস্‌মি। পলাশ, জংলী ফুল, কুসুম এবং নানা হরজাই গাছে হয় ল্যাক। যেমন করে আম বা লিচুর কলম বাঁধে গাছে, তেমন করে ল্যাকসুদ্ধ গাছের ডাল সুতো দিয়ে বা দড়ি দিয়ে এইসব গাছে বেঁধে দেয় আদিবাসীরা। মানে, বীজেরই মতো। তারপর বলল, আরও একটু পরিষ্কার করে বলি, আম বা লিচু গাছে কলম বাঁধা দেখেছেন তো!

হ্যাঁ।

মনে করুন ঐ রকমই। ফিরে যাবার সময় ভারী জঙ্গলে গিয়ে পড়ার আগে লক্ষ্য করবেন পথের দু'পাশে, দেখতে পাবেন ; গাছে গাছে এমন কলম বা বীজ। সেই বেঁধে-দেওয়া ডাল থেকে লাক্ষার পোকা সারা গাছে ছেয়ে যায়। মেয়ে পোকাগুলো গাছের ডাল আঁকড়ে অনড় থাকে আর পুরুষ পোকারা অনবরত ডালে ডালে, উপরে নিচে ঘোরাঘুরি করে মেয়েদের গর্ভবতী করে। তখন মেয়ে পোকাগুলো তাদের শরীরের অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে ল্যাক রেজিন্ বের করতে থাকে। এই সময়ে তারা অনড় অবস্থাতে থাকে বলেই ঐ সময়টা গাছের ডাল থেকে রস শুষে খেয়ে বাঁচে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ ল্যাকের পোকা গাছময় ছেয়ে থেকে তাদের রসের পরতের পর পরতে ঢেকে দেয় গাছের প্রশাখাগুলোকে। যখন এই ক্ষরণ সম্পূর্ণ হয় তখন শাখা-প্রশাখার উপর প্রায় পৌনে এক ইঞ্চিমতো প্রলেপ পড়ে যায়। আদিবাসীরা সেই প্রলেপ দেওয়া ডাল কেটে নেয়, জীবন্ত ও মৃত পোকাসুদ্ধ। সেই ডালপালাকে টুকরো টুকরো করে কেটে তারা বিক্রি করে। এইগুলোকেই বলে স্টিক-ল্যাক্। কেউ কেউ বা গাছের ডাল থেকে ল্যাক্ চেঁচে নিয়ে আলাদা করেও বিক্রি করে। ন্যাচারালী, তার দাম বেশি পায় তারা স্টিক্-ল্যাক্ থেকে।

এই যে চার রকম নাম বললেন, এর মানে কি ? বৈশাখ মাসেই কি বৈশাখী ক্রপ্ ওঠে ?

মিসেস সিং শুধোলেন।

না, না। বৈশাখ মাসে আদিবাসীরা যে বীজ লাগায় গাছে, সেই গাছের ল্যাক্ যখন তৈরী হয়ে গিয়ে বিক্রির জন্যে পাহাড় জঙ্গলের বস্তীর হাটে আসে, তাকেই 'বৈশাখী' বলে। তেমনই আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ লাগানো হলে বলে 'জেঠুয়া', কার্তিক মাসে হলে বলে 'কাত্‌কি'। আর কুসুম গাছে যে বীজ লাগানো হয়, তাকেই বলে কুস্‌মি।

বাঃ। বুঝলাম।

মিসেস সিং বললেন।

এবার আপনারা কি করে শেল্যাক্ বানান ল্যাক্ থেকে তা বলুন !

বলছি। বলে, পৃথু ওঁকে নিয়ে ক্রাশার প্ল্যান্টের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, ঐ দেখুন, স্টিক্ ল্যাকগুলোকে ওখানে ক্রাশ্ করা হচ্ছে। ক্রাশার মেশিনে। মেকানিকাল সীভস অর্থাৎ যান্ত্রিক ছাঁকনি স্টিক-ল্যাক্ থেকে কাঠ এবং অন্যান্য ইমপিউরিটিস্ আলাদা করছে কী করে, তা দেখুন। আলাদা করা হয়ে গেলে, ঐ দেখুন ওয়াশার ব্যারেলস-এ ল্যাক্-এর গ্রেইনস্‌গুলোকে কীভাবে ধোওয়া হচ্ছে।

শুধুই জল দিয়ে ধোওয়া হয় বুঝি ? এত জল পান কোথায় এমন রুখু জায়গায় ?

জল পাই, নদী থেকে। পুনপুনিয়ার নালা থেকে পাম্প করে পাইপলাইনে করে জল আনা। সেখানে পাম্প বসানো আছে। কারখানাতেও পাম্প আছে, ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল তোলে সেই পাম্প।

জঙ্গলের মধ্যের নালাতে পাম্প ! চুরি হয়ে যায় না ? আমার বাড়ির পাম্পই ত' দুবার চুরি হয়ে গেল।

পাহারা থাকে। নইলে, চুরি নিশ্চয়ই হত। এদিকের জঙ্গলের আদিবাসীরা সব সৎ। চুরি করলে এই টাউনের লোকরাই করবে। চলুন, আরও একটু আগে চলুন। ওঃ, বলা হল না আপনাকে, শুধু জল দিয়েই নয়, জলের সঙ্গে সাজিমাটি দিয়েও ল্যাক্ পরিষ্কার করা হয়।

সাজি মাটি ! কোথা থেকে পান ? নর্মদা ? সাজি মাটি ত' পলিই, তাই না ?

পলিই। তবে আমরা নর্মদা থেকে আনি না। আনতে হয় কানপুর থেকে। গঙ্গার পলি। ট্রাক কবে আসে এখানে।

তারপর ?

স্টিক্-ল্যাক্ ধুয়ে পরিষ্কার করার পর যে পদার্থটি বেরোয় তাকে বলা হয় সীড্-ল্যাক্। এই সীড্-ল্যাক্ পরিষ্কার এবং শুকনো করা হয় ম্যানুয়ালী। তৈরী হয়ে গেলে, সীড-ল্যাক্ হয় ঐ ভাবেই

রেখে দেওয়া হয় এক্সপোর্ট করার জন্যে ; নয়ত ঐ থেকেই আবার শেল্যাক্ তৈরী করা হয় কারখানায়।

শেল্যাক্ কি করে তৈরী করেন ?

শেল্যাক্ প্ল্যান্টেই তৈরী করি। হাইড্রলিক প্রেস্ আছে। তাতে স্টীমের সাহায্যে স্টিক ল্যাক্‌কে গলিয়ে ফেলে শেল্যাক্ তৈরী হয়। চলুন, দেখাব আপনাকে। একশ কেজি স্টিকল্যাক্ থেকে পঞ্চাশ কেজি মতন সীডল্যাক বেরোয়। আবার একশ কেজি সীডল্যাক থেকে আশি-পঁচাশি কেজিমতে শেল্যাক্ হয়। বাকিটা ওয়েস্ট প্রডাক্ট হিসেবে থেকে যায়। তাকে বলে, কিরি।

কিরি ?

হ্যাঁ।

অদ্ভুত নাম ত'। মজারও বটে !

হ্যাঁ। খুব সম্ভব আর্মেনীয়ানদের দেওয়া নাম। আর্মেনীয়ান ভাষায় হয়ত এর কোনো মানেও আছে। কিরি থেকে আবারও শেল্যাক্ বের করা হয়, সলভেন্ট প্রসেসে। স্পিরিট এক্সট্রাকশান্ করে যে শেল্যাক্ বের করা হয় তাকে বলা হয় গার্নেট্।

গার্নেট ? বাঃ। এও ত' চমৎকার নাম ত'!

হ্যাঁ। আর জল এবং সোডা-সল্যুশান্ দিয়ে সেপারেট্ করে যে শেল্যাক বেরোয়, তাকে বলা হয় সোয়ান্‌সন্।

কি বললেন ? সোয়ান্‌সন্ ? সোয়ানসন কি কারো নাম ?

হ্যাঁ। আমাদের কোম্পানীর পুরনো বড় সাহেবের নাম।

বাঃ। ভদ্রলোককে ত' অমর করে দিলেন আপনারা।

সেই রকমই। আমাদের সবচেয়ে বড় কমপিটিটর হচ্ছে আচ্ছুরাম কাল্‌কাফ্।

জার্মান কোম্পানি একটি। এখন ফেরা অ্যাক্ট-এর আওতাতে এসে আমাদের কোম্পানিরইমতো ভারতীয় হয়ে গেছে। তবে, আমাদেরও যেমন ইংলিশ ডিরেক্টর আছেন, ওঁদের আছেন জার্মান ডিরেক্টর। বিহারের মুরহুতে, রাঁচীর কাছে, এবং ওয়েস্টবেঙ্গলের পুরুলিয়ার ঝাল্‌দাতে তাঁদের কারখানা আছে। ঐ ফেরা কোম্পানির বর্তমান মালিক সোহনলাল ব্যাহল্ খুবই ধার্মিক লোক। তিনি আবার তাঁদের কম্পানির এই প্রডাক্ট-এর নাম দিয়েছেন "গোপাল"। ইণ্ডিয়ান লীডিং এক্সপোর্টারও তাঁরা শেল্যাক-এর। ঐ "গোপাল" নামই সারা পৃথিবীতে এখন চালু হয়ে গেছে।

হ্যাঁ। আমাদের কারখানাতে আমি চেষ্টা করছি ব্লীচড্ ল্যাক করবার, ক্লোরিন এবং সোডা প্রসেসে। ডি-ওয়াক্সড শেল্যাকও ইন্ট্রড্যুস করাব ইচ্ছে আছে শীগগিরই।

মিসেস সিং বললেন, বাঃ।

পৃথুর খুব ভালো লাগছিল ভদ্রমহিলার ঔৎসুক্য দেখে। তার নিজের স্ত্রীর কথা না হয় বাদই দিল, এই শেল্যাক ফ্যাক্টরীতে যাঁরাই কাজ করেন, তাঁরা সকলেই নেহাৎ পেটের দায়েই ল্যাক্-শেল্যাক তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত আছেন। সকলের স্ত্রীরা হাটচান্দ্রাতেই এতদিন থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কারো মধ্যেই এমন ঔৎসুক্য লক্ষ্য করেনি ও। জানার ইচ্ছা আর ঔৎসুক্যই ত' মানুষকে তার ইতিহাস এত দূরের এত দুর্গম সব অজানা পথ অতিক্রম করিয়ে নিয়ে এসেছে ! ইতিহাস অন্তত তাই-ই বলে। ভাবছিল পৃথু। নিরুৎসুক মানুষ ত' মৃত মানুষই। যদিও উধাম সিং-এর অনুরোধে এই কর্তব্য করছে পৃথু, তবু ব্যাপারটাতে কোনোই গন্ধ পাচ্ছে না কর্তব্যর ; প্রশ্নকর্ত্রীর সহজ, আন্তরিক এবং সপ্রতিভ উৎসাহরই কারণে।

আমাদের দেশে ত' লাক্ষা অনেকদিন থেকেই তৈরী হচ্ছে, তাই না ?

নিশ্চয়ই।

কি কি কাজে লাগত এ, প্রাচীন ভারতবর্ষে ?

গয়না তৈরী হত, খেলনা তৈরী হত, আলতা তৈরী করতে লাগত লাক্ষা, রঙ তৈরী করতেও লাগত। এখনও লাগে। উনিশশ উনপঞ্চাশ সন অবধি এদেশের সব গ্রামোফোনের রেকড্‌ও তৈরী

হত এ দিয়ে।

তাই-ই বুঝি? আর এখন? এখন হয় না?

এখন ত' সীন্থেটিক ম্যেটেরিয়ালেই হয়। পলী-ভিনীল্-ক্লোরাইড্। এবং অ্যাসিটেট্।

এক্সপোর্ট হয় অনেক, না? লাক্ষা?

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সতেরশ ছাপ্পান্ন থেকে লাক্ষা রপ্তানী করছে ইংল্যাণ্ডে। আঠারশ পঞ্চান্নতে ইংরেজ-ইটালিয়ান কোম্পানি কলকাতার অ্যাঞ্জেলো ব্রাদার্স শেল্যাক্ তৈরী করা বোধহয় প্রথম আরম্ভ করে। উনিশশ' বিরাশিতে শ্রমিক বিরোধের কারণে সেই কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়।

ওয়েস্ট বেঙ্গলের ত' এখন এই-ই ট্র্যাডিশান্ শুনতে পাই।

তাই ই ত' শুনি এদিকে বসে। নিজে সেখানে থাকলে ঘটনাটা সত্যিই যে কী তা বোঝা যেত।

কোন কোন দেশ আমাদের এখান থেকে ইমপোর্ট করে শেল্যাক্?

ইউ এস এ ইউ এস এস আর, পশ্চিম জার্মানী, ইউ কে, ইজিপ্ট, পিপলস রিপাবলিক্ অফ চায়না, ইন্দোনেশিয়া এবং আরও অনেক দেশ।

বাঃ বাঃ! এই সব দেশ করে কি শেল্যাক দিয়ে?

অনেক কিছুই করে। ভার্নিশ, পেইন্ট, ইলেকট্রিক্ ইনসুলেশ্যান্, মাইকা বোর্ডিং, প্রিন্টিং-ইঙ্ক এবং ফার্মাসিউটিকাল কোটিংস্। আপনারা যে ওষুধের ক্যাপসুল-এর উপর কোটিং দেখেন, তাও এই শেল্যাক্ এরই।

সে কি? খাওয়ার জিনিসে?

হ্যাঁ। শেল্যাক একেবারেই অখাদ্য তা ভাবছেন কেন? এইবার ডানদিকে চলুন। হাইড্রলিক প্রেসের দিকে। ইউ এস এ-তে এবং ওয়েস্ট-ইউরোপীয়ান দেশগুলিতে ত' ফল এবং নানারকম খাবারের উপরেও কোটিং হিসেবে ব্যবহার করছেন ওঁরা এখন শেল্যাক্। নিয়মিত।

কি খাবার?

চকোলেটের উপরটা যে চকচকে করে, আপেলের যে জেল্লা, ওঁরা এখন তা, এই শেল্যাক্ দিয়েই দিচ্ছেন। ফল এবং খাবারের প্রিসার্ভেটিভ হিসেবেও এর গুণ স্বীকৃত হয়েছে। বইয়ের মলাটেও ঢালাওভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে শেল্যাক্। আমাদের দেশেও হচ্ছে।

সত্যি!

অবাক হয়ে বললেন মিসেস সিং।

এমন সময় উধাম সিং-এর খাস বেয়ারা আবার দৌড়ে এল। পৃথুকে বললে, সামোসা আর চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, মেমসাহেবকে নিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে বললেন বড় সাহেব।

চলুন তাহলে মিসেস সিং। এতেই আপনার কাজ হবে আশা করি। তাছাড়া আপনারা যারা লেখেন-টেখেন তাঁদের ইমাজিনেশান্ বলেও ত' একটা ব্যাপার থাকে।

তা জানি না, তবে জ্ঞান ত' একটু হল না, অনেকই হল! একসঙ্গে এত জ্ঞান হলে একই সঙ্গে সবটুকু জ্ঞান দিয়ে দেবার প্রবণতাও আসতে পারে নেশাতে। ফিক্‌শান্ ত' আর প্রবন্ধ নয়। তাই, সব জ্ঞান একসঙ্গে দিতে নেই; একটু একটু করে গল্পের মধ্যে মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়।

বাঃ। ভাল বলেছেন। জানা রইল। তবে, লিখতে বসে যদি আটকে যান তখন আরও কিছু জানার থাকলে নিঃসঙ্কোচে চিঠি লিখবেন আমাকে। জানিয়ে দেব। চলুন, এবারে নামতে হবে। দেখবেন, উঁৎরাই আছে এ জায়গাটাতে। পা মচ্‌কে যায় অনেকের।

ঠিক আছে।

বলে, শাড়িটা সামান্য তুলে নিয়ে নামলেন মিসেস সিং। পায়ের পাতা এবং গোড়ালিটি ভারী সুন্দর। লক্ষ্য করল পৃথু।

অদ্ভুত মানুষ ও একটা। পৃথু ভাবল মেয়েদের শরীরে ছড়ানো-ছিটোনো এত কিছু সৌন্দর্য থাকে তবু ও চিরদিনই মুখ ছেড়ে; পা, দেখে হাতের আঙুল, আর পায়ের গড়ন, চিবুক আর দাঁত দেখেই প্রেমে পড়ল। গত জন্মে বা অনেক জন্ম আগে ও নিশ্চয়ই চীনদেশে বাস করত। অথবা হাজার

কিংবা ওয়ালরাস্ ছিল।

মিসেস সিং বললেন, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব। যা এক্সপোর্ট হয় তার সবই কি শেল্যাক্ ?

না, না। সব নয়। তবে বেশিটাই। গত বছরে, পাঁচ হাজার মেট্রিক টন শেল্যাক্, এক হাজার মেট্রিক টন সীডল্যাক্ এবং দুশ টন কিরি এক্সপোর্ট হয়েছিল।

ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও হয় না ল্যাক ?

হাসল, পৃথু।

বলল, হয় বৈ কী ! তবে, শতকরা ষাট ভাগই ভারতবর্ষে হয়। পঁয়ত্রিশ ভাগ হয়, থাইল্যাণ্ডে। আর পাঁচ ভাগ পীপলস্ রিপাবলিক অফ্ চায়নাতে।

ভারতবর্ষের বেশি শেল্যাক কি মধ্যপ্রদেশেই হয় ?

না, না। ভারতের মধ্যে ষাট ভাগই হয বিহারের পালামৌ, রাঁচী আর সিংভূম জেলাতে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুরুলিয়াতেও হয়। এছাড়া বাকিটা ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের কিছু জায়গা এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্যান্য রাজ্যে। যেখানে জঙ্গল আছে।

একটু থেমে বলল, ল্যাক্ ছাড়াও এখানে খুব ভাল সামোসা আর কালা-জামুনও হয়। আশা করি উধাম সিং সাহেব আপনাদের কাছে নমুনা পেশ করবেন।

মিসেস সিং হেসে উঠলেন।

বললেন, যা হাঁটালেন এতক্ষণ, চড়াইয়ে উৎরাইয়ে। ক্ষিদে যে একটু পায়নি, তা বলব না। তারপর এতটা পথ গাড়িতেও এসেছি। সামোসা এবং কালা-জামুন্ 'বৈশাখী' না 'জেঠুয়া', না 'কাত্‌কি' না 'কুস্‌মি' তাও কি এখন পরীক্ষা করে দেখতে হবে ?

মিসেস সিংকে নিয়ে পৃথু উধাম সিং-এর অফিসে ঢুকল।

অনুমানে একটু ভুল হয়েছিল ওর। সামোসা ছিল। কিন্তু কালা-জামুনের বদলে বড় বড় ডব্‌কা লাড্ডু ; লাড্ডুর দোকানের।

ইয়ে ভি হিঁয়াকা কিম্‌তি চিজ।পৃথু কালাজামুনের অভাব মেটাতে মিসেস সিংকে বলল।

লাড্ডুর অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভার কথা হাটচান্দ্রাতে রাষ্ট্র হয়ে যাবার পর ওর দোকানের লাড্ডুর কদর আরও বেড়ে গেছে। ভয় হচ্ছে, হৃদয় নিঙরানো গানের চেয়েও দোকানের লাড্ডুরই ইজ্জৎ বেশি না হয়ে যায় শেষে !

মিসেস সিংকে পৌঁছে দিয়েই ওঁদের সকলের অনুরোধের উত্তরে আসছি বলে কারখানায় চলে গেল পৃথু। এই সময়ে কাজের খুবই চাপ থাকে। শেল্যাক্ ইণ্ডাস্ট্রিটাই সীজনাল। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে প্রডাকশান বন্ধ থাকে। যদিও কারখানা বন্ধ থাকলেও কাজ বন্ধ থাকে না। মাল চালান যায়। তখন পৃথুর কাজ আরও বাড়ে। প্লান্ট, থরোলী রিপেয়ার করতে হয়, মেইনটেনান্স, ডেভেলাপমেন্ট, কন্সট্রাকশন সব কিছুই সেই সময়ই। মেকানিকাল এঞ্জিনীয়ার হলেও জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করে ও। এই কারখানাকে, ওর রুজির স্থানকে, ঘেন্না যেমন করে, তেমনই তীব্রভাবে এক ধরনের ভালবাসাও আসে। কারণ, ওর নাম পৃথু ঘোষ ; দ্যা লাউজিয়েস্ট পাজল্ ; সিন্স্ দ্যা ডিস্‌কভারী অফ পাজলস্ । যাই-ই যখন করে, তখন তা খারাপ করে করতে পারে না ও। কোনো কিছুই। বয়লার মেরামতি থেকে রুষাকে আদর করা পর্যন্ত। পৃথু ঘোষ-এর চরিত্রর এইই একটা দিক। দোষের অথবা গুণের।

কী সুন্দর সুন্দর নাম সব। দুর্গন্ধ কারখানার মধ্যে ঐ নামগুলোই এক ধরনের রোমাণ্টিকতা বয়ে আনে। গার্নেট অরেঞ্জ ; লেমন এবং বাটন ল্যাক্। 'কাত্‌কি', 'জেঠুয়া', 'বৈশাখী', 'কুসমি'।

যে যাই-ই বলুক, ওর এই দেশটা ভারী সুন্দর। আর সুন্দর এই দেশের সাধারণ সব গরীব, সরল অশিক্ষিত মানুষগুলো। এদেশের শিক্ষিত আর বড়লোকগুলোই দেশটাকে ডুবিয়ে দিল। শহুরের মানুষগুলো, বাদামী, লোভী এই নব্য ভারতের সাহেবরা।

ব্যতিক্রম আছে। অবশ্যই আছে। ব্যতিক্রমই ত' প্রমাণ করে যে. সাধারণ্য সত্যি।



বিকেলে, একা ঘরে পৃথু বসেছিল। হঠাৎ মেরী এসে বলল, চাকলাদার সাহেব এসেছেন। রুষার এই বাড়িতে, ভিনোদ ইদুরকার ছাড়া একমাত্র মণি চাকলাদারেরই অবাধ যাতায়াত আছে। ভিনোদের পদবীই ইদুরকার। আর মণিবাবুর চেহারাটাই ইঁদুরের মতো। কে জানে? রুষা হয়ত শুয়োরেরই মত ইঁদুর ভালবাসে।

পৃথু কিন্তু ইঁদুর ভালবাসে না। যদিও ইঁদুরেব মাংস ওর খুবই প্রিয। অবশ্য, জঙ্গলের ক্বচিৎ-খাদ্য হিসেবেই। জংলী অথবা মেঠো ইঁদুর আগুনে ঝল্‌সে, পাথুরে নুন এবং কাঁচা-পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খেতে খুবই ভাল লাগে ওর। শুয়োরের ত কথাই নেই। স্বযং রামচন্দ্রই খেতেন। বন্য-বরাহ বলে ব্যাপার! তবে, বস্তীর শুয়োর খেতে ঘেন্না লাগে। শুয়োরের নলা-পোড়া, কাবাব; অথবা ভিণ্ডালু। ডিলিসস।

অনেকদিন হয়ে গেল বুনোশুয়োর অথবা ইঁদুর খায়নি পৃথু। একদিন খেতে হবে।

মেরী দাঁড়িয়েছিল।

পৃথু বলল, বসতে বল, মানে, বসাও সাহেবকে; বসার ঘরে।

নিজের লেখা-পড়ার ঘরে শুয়োর, তেলাপোকা, ইঁদুব ইত্যাদি মনুষ্যেতরদের ঢোকাতে ইচ্ছা করে না ওর একেবারেই। অথচ, মণি চাকলাদারই হাটচান্দ্রার আঁতেল-শ্রেষ্ঠ।

বসার ঘরে গিয়ে পৃথু কর্তব্য-পরায়ণ গলায় বলল, কী খবর? মণিবাবু।

বালো। আমি বালোই। আপনি ক্যামোন্?

হঠাৎ? কোনো খবর না দিয়ে? কোথাও কি এসেছিলেন এদিকে?

না। বইটি ফেরৎ দিতেই এলাম।

অন্যমনস্ক গলায় পৃথু বলল, বই? কী বই? তার বই কেউ যে পড়তে নিয়ে গিয়ে ফেরৎ দিয়েছে এমন অভিজ্ঞতা বেশি হয়নি। অবাকই হল। বই এবং বউ একবার হাতছাড়া হলে ফিরে আসে না।

এলিমেণ্টস্ অফ রাইটিং। ক্রুস্-এর একটি বই। রুষারই বই।

তাইই বলুন!

আশ্বস্ত হয়ে পৃথু বলল। তারপর ভদ্রতার গলায় বললো: কি খাবেন? মণিবাবু? কফি, না চা? না ঠাণ্ডা কিছু?

রুষা বাড়িতে নেই বুজি?

নাঃ। ওরা সব ক্লাবে গেছে। আজ যে রবিবার।

ওঃ। দ্যাটস্ রাইট্।

কী খাবেন?

কাবো? নাাা। কিছু কাবো না। রুষাই নেই।

পৃথুর মনে হলো কথার ধরণ দেখে যে, রুষাকেই যেন খেতে এসেছিলেন মণিবাবু। ওঁর ভাষায়, শব্দপ্রয়োগের গোলমাল আছে।

ফীল্ লাইক্ হ্যাভিং আ ড্রিঙ্ক। বাড়িতে . ?

বাড়িতে ত কিছু থাকে না।

লজ্জিত গলায় বলল, পৃথু।

স্ট্রেন্‌জ্। রুষা ত' আমাকে অনেক কিচুই কাইয়েচেন।

সে আপনার জন্যেই আনিয়েছিলেন হয়ত। পৃথু বলল।

মনে মনে বলল, কে কাকে কি কাওয়াচ্চে তা আমি কি করে

কফি খাবেন না ?

কফি ? নো। থ্যাঙ্ক উ্যা। নট্ আফটার সান্‌ডাউন্।

গিরিশদার সঙ্গে এই মানুষটির অনেকই অমিল। মিল শুধু এই একটি ব্যাপারে।

আমাদের পত্রিকার পরের সংখ্যা কবে বের করছেন ? দু মাস দেরী ত' ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। পৃথু শুধোল।

বিজ্ঞাপন। পৃতুবাবু ; বিজ্ঞাপনই এখন সাহিত্য পত্রিকা এবং বিশেষ করে বাঙলা- সাহিত্যের জনক। চুলের তেল এবং সাবানের বিজ্ঞাপনই ত এখন বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দিনকুড়ি বাদে একবার শান্তিনিকেতনে যাব, সেখান থেকে ফিরে এসেই কাজ আরম্ভ

অন্যমনস্কর মতো বললেন মণিবাবু, চলি তাহলে। রুষাকে বলবেন। আপনি কিন্তু সত্যিই সৌভাগ্যসমৃদ্ধ। এমন স্ত্রী আপনার !

পৃথু নমস্কার করে হাসল।

মুখে কিছু না বলে, ভাবল, যাদেরই সুন্দরী স্ত্রী আছে তাঁরা সকলেই সৌভাগ্য-সমৃদ্ধ। পরস্ত্রী মাত্রই ভাল। পর মাত্রই ঈর্ষাযোগ্য।

মণিবাবু চলে যাবার জন্যে উঠলেন।

পৃথু বলল, আপনার উপন্যাসটি আর আর কতদূর এগাল মণিবাবু ? "সুধন্য এবং তপতীর বেড়াল ?"

জানেনই ত ! কী সীরিন্ পটভূমিতে শুরু করেছিলাম। আপনাকে ত' শুনিয়েওছিলাম কিছুটা, তাই না ?

হ্যাঁ। সামান্যই তারপর কতখানি এগোল ?

ব্যসস্ ওটুকুই । আর একটুও এগোয়নি । কোনো মহৎ লেখাই অবশ্য তাড়াতাড়ি লেখা যায় না। আমি ত' 'আর অর্ডারী-সাহিত্য করি না পৃতুবাবু। কখনও করবও না।

পৃথুর মনে হল, পৃথুকে বা মণি চাকলাদারকে অর্ডার দিচ্ছেটাই বা কে ? যাঁদের লেখার জন্যে অর্ডার কেউই দেয় না তাঁদের প্রত্যেকেরই অডরী-সাহিত্যের ওপর প্রচণ্ড রাগ দেখা যায়। জন্ম-অনিয়ন্ত্রিত-ঈর্ষা আর বন্ধ্যা-রাজনীতিই বাঙালীদের খেল ! মণি চাকলাদারের ভাষায় "কেল"। কেলোও বলা চলে।

মুখে বলল, লিখে যান মণিবাবু। যতটা সময় লাগে লাগুক। তেমন কিছু লিখতে হলে ফাঁকিবাজী দিয়ে ত' হয় না। অ্যানা কারেনিনা, জাঁ ক্রিস্তফ্, ম্যাজিক মাউন্‌টেইন .

মণিবাবুর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, দেকবেন, দেকবেন আপনি পৃতুবাবু। শেষ হোক। মধ্যপ্রদেশের উমেরিয়ার আকাশ বাতাস, জল, আলো, সেগুনবন, ইউক্যালিপ্‌টা, মাটির সুগন্ধ। এবং একজন নারী ; একজন পরম নমনীয় এবং রমণীয় নারীকে কী করে প্রতিভাত করি এই উপন্যাসে ! আমার সফলতার জন্যে প্রার্থনা করবেন কিন্তু পৃতুবাবু, পরমব্রহ্মর কাছে।

গলার দ্রবীভূত স্বর কেমন যেন পাতিহাঁসের মতো ফ্যাস্‌ফ্যাসে হয়ে এল হঠাৎ, মণি চাকলাদারের। গেটে হাত রেখে বললেন, চলি, ক্যামোন্ ?

পৃথু ভাবছিল, প্রেম বড়ই খারাপ অসুখ। প্রাণঘাতী অসুখ। ইঁদুর এবং মানুষ, মৃগী এবং নিষাদ একই সঙ্গে হত হয় এই অসুখে। হাউ বাউট্ শুয়োর ? শুয়োরদের হয় না এই অসুখ ?

মুখে বলল, আচ্ছা। আবার .আসবেন। বলব, রুষাকে।

সী, উ্য। বলেই চলে গেলেন তিনি।

গেটের কাছে পৌঁছেই আবার দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোকের চরিত্রর সঙ্গে চড়ুই পাখিদের চরিত্রর মিল আছে। কোনো গন্তব্যেই বেশিক্ষণ

একসঙ্গে যেতে পারেন না।

মুখ ঘুরিয়ে বললেন, সাম্প্রতিক ভবিষ্যতের এক দূর-সকালে আসুন না স্ত্রীর সঙ্গে আমার পর্ণকুটিরে। পায়ের ধুলো দিন্না। বেকন্ এণ্ড এগ্স খাওয়াব। ফর, লাঞ্চ। সঙ্গে বীয়র। আসুন।

যাব একদিন।

মণিবাবু চলে গেলে পৃথু নিজের ঘরের লেখার টেব্লে এসে আবার বসল। নস্যির ডিবে খুলে, চারধারে কেউ যে নেই তা দেখে নিয়ে, একটিপ্ নস্যি নিল। আঃ। মগজ একেবারে সাফ্।

যে উপন্যাসটি মণিবাবু লিখছেন সেটি লিখে ফেলতে পারলে তা যে কালজয়ী হতই সে সম্বন্ধে মণিবাবুর নিজের কোনোই সন্দেহ ছিল না। উপন্যাসটির প্রথমটুকু একদিন পৃথুকে শুনিয়েছিলেন মণিবাবু। সাহিত্য-টাহিত্যও,দাঁত ওঠারই মতো বড় কষ্টকর ব্যাপার। ভদ্রলোক এখনও টীথিং-ট্রাবল্ থেকেই উদ্ধার করতে পারছেন না নিজেকে। কথাটা, অবশ্য উদ্ধার হবে না ; হবে উত্তীর্ণ। "উত্তীর্ণ" হতে পারাই হচ্ছে আসল কথা। মণি চাকলাদারের ভাষায় "কতা"। উত্তরণ ! উত্তরণ যখন কোনো লেখকের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায় শুধুমাত্র তখনই তাঁর যশ, গাড়ি বাড়ি হতে পারে। সফল লেখক হতে পারা কি অত সহজ কথা ? "নাথিং সাক্সীডস লাইক সাক্সেস্ "। তখন লেখার দরকারই হয় না ; পাতা ভরালেই চলে যায়।

মণি চাকলাদার "সুধন্য এবং তপতীর বেড়াল"-এর যতটুকু লিখেছিলেন তা এইরকম : "আকাশমনি গাছের বুকে আজ বড়ই ব্যথা।বাইগাপল্লীর দিক থেকে উদাস ঘুঘু ডাকছে। কথা হয়েছে সুধন্যর, তপতীর সঙ্গে ; তাদের দেখা হবে গতকাল। তপতী এবার ধন্য করবেই সুধন্যকে। গাভীর নিঃশ্বাসেরই মতো উত্তেজনাময় গভীর নিঃশ্বাস বয় সুধন্যর।সেগুনবনে ধুলোর ঝড়, খোয়াইয়ে বাঁশি বাজায় ডাইনী হাওয়া, ঝরাপাতারা হাওয়ায় ঝুর-ঝার্ দৌড়োয় নক্শাল্ ছেলেদের মতো।

কিন্তু সুধন্যর প্রেম ?

সুধন্যর প্রেম কি ধন্য হবে না ?

সমস্যা অতএব, তপতীর কালো কাবুলী বেড়াল। তপতীর অশেষ সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যা মন কাড়ে সুধন্যর তা তার গর্বিত, শান্ত চিবুকের অনুলোম , যে অনুলোম দিয়েছিল তাকে আশ্চর্য যৌনতা। কিন্তু কালো কাবুলি বেড়াল তাকে ভালোবেসেছিল সুধন্যর চেয়ে বেশি অনেকই ; তাইই অন্ততঃ তপতী মনে করত, ভাবত সুধন্য

অতএব বেড়াল, সুতপা এবং সুধন্য, ধন্য একে অন্যকে করবে ; কথা ছিল এমনই অথচ কিন্তু "

মণি চাকলাদার উপন্যাসের এইটুকু পড়িয়ে পৃথুকে বলেছিলেন, দেকবেন। ভোরের প্রকৃতির স্নিগ্ধ নম্রতা এবং এক আপাত-দুর্বোধ্য কিন্তু সুউচ্চ ভাষার দাঢ্য গুঁড়িয়ে নিংড়ে, চিপে, ছেঁকে কী ক্লাসিক সাহিত্যই না গড়ে তুলি ! যদিও বড়ই দুঃখের হবে শেষটুকু।

পৃথু হঠাৎ শুধিয়েছিল, কেন ? কাবুলি বেড়াল কি কামড়ে দেবে সুধন্যকে ? অথবা, তপতীর কি ডিপ্থীরিয়া হবে ?

আপনি বড়ই স্থূল পৃতুবাবু, বড় মান্ডেন্ আপনার ভাবনা। আপনার সঙ্গে আমার উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করাটাই ভুল হয়েছে। অবশ্য এও বুঝতে পারছি যে, প্রকৃত শিক্ষিতজনের পক্ষে উপন্যাস লেখা সম্ভবই নয়। সম্ভব নয় তার প্রকৃত মূল্যায়ন করাও। উপন্যাস সাধারণের জন্যে, তাদের সঙ্গে আমার কম্যুনিকেশান্ নেই। ঔপন্যাসিক হতে হলে ইনিয়ে-বিনিয়ে গল্প বলতে হয়। কথক হতে হয়। লেখক আর কথকের মধ্যে যে তফাৎ আছে ! তাছাড়া, গল্প যে আমার নেই। ব্যথা, বড় ব্যথা, হৃদয় জুড়ে বিদগ্ধ ব্যথা !

পৃথু ভেবেছিল যে, বলে ওকে, উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন মেম্বারকে একদিন বলেছিলেন "দি অনারেবল্ মেম্বার শুডনট ইনডালজ ইন মোর ইনডিগ্নেশান্ দ্যান্ হি ক্যান্ কন্টেইন্"। একজন মানুষের পক্ষে কতখানি পণ্ডিতমন্যতা বা উচ্চমন্যতা বিনাক্লেশে ধারণ করা সম্ভব সে সম্বন্ধেও প্রত্যেক পণ্ডিতমন্য ও উচ্চমন্য মানুষেরই একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

তাদের নিজেদেরই হিতার্থে।

জানেন পৃতুবাবু, মণিবাবু বলেছিলেন : একন বুঝি, উপন্যাস বোধহয় একমাত্র মূর্খজনদেরই চিন্তার বাহক। আসল হচ্ছে কবিতা। আমি আসলে কবিই। শরতের আকাশের নরম স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না দিয়ে টাইচুং চালের গোল গোল ভাত মেখে খেতে চাই আমি গরাস গরাস ; গদ্যের মতো ইতর ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া উচিত হয়নি আমার আদৌ। তবুও চেষ্টা করব একটি মাল্‌টি-স্টোরিড অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসেরই মতো গেঁথে তোলার, "সুধন্য এবং তপতীর বেড়াল"কে।

মণি চাকলাদারের কথা মনে এলেই অনেক কথাই মনে এসে যায়। ভীড় করে। ভাবনার কোনো খেই থাকে না।

বুদ্ধিমতী রুষা হয়ত পৃথুর চেয়ে ভাল বুঝেছে মণিবাবুকে। খাবার টেব্‌লে বসে ও একদিন বলেছিল মণিবাবু সম্বন্ধে, আই ফীল পীটি ফর হিম্‌। হি ইজ আ স্ট্রেঞ্জ সাইকলজীক্যাল কেস ; আ ভিক্টিম অফ হিজ ওওন্‌ ইডিঅসী এণ্ড ইডিয়সীন্‌ক্রেসীস্‌। পুওর, পুওর, চ্যাপ্‌।

হতে পাবে। পৃথু বলেছিল।

বাট হু'জ নট্‌ ?

মণি চাকলাদারের সঙ্গে গিরিশদার ইকুয়েশান্‌টা বিশেষই গোলমেলে। বিরোধী, দুই ভারতীয় রাজনৈতিক দলেরই মতো। সেই জন্যেই আশা হয় যে, কোনোদিন হঠাৎ-আঁতাত হয়েও বা যাবে হয়ত।



শরীর ভাল না থাকায় পৃথু কারখানা থেকে সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরে আসছিল। বড় রাস্তা থেকে ওদের বাড়ির রাস্তায় ঢোকার মুখে একটি শালবন আছে। বসন্তের শেষে শালফুলের গন্ধে ম' ম'করে রাস্তাটি। তখন ঝরা পাতারা ঝরনা বইয়েছে। হাওয়ার তোড়ে পাথুরে জমিতে চাপান-উতোর দিতে দিতে হাডুডু খেলছে। ধুলো উড়ছে। লাল ধুলো। মিষ্টি, শীত-শীত গন্ধ তাদের গায়ে।

শালবনের ভিতরে একটি গভীর কুয়ো আছে। কবে, কারা, এই জায়গায় কুঁয়ো খুঁড়েছিল কে জানে ? বাঁধানো কুঁয়ো। সেই কুঁয়ো থেকে পায়ে চলা পথ চলে গেছে পুন্‌পুনিয়ার জঙ্গলের গভীরে। বাসিয়া বস্তী পড়ে, কাছেই। গোন্দদের পুরোনো বস্তী। বস্তীর পেছনে শালবন। তারও পেছনে একটা কাছিমপেঠা নামগোত্রহীন পাহাড় পিঠ উঁচিয়ে শীতের দুপুরে বিনিপয়সার রোদ পোয়াচ্ছে। গরীব বড়লোক, নামী অনামী : রোদ সকলেরই। বাসিয়া বস্তী থেকে সকাল—বিকেলে মেয়েরা এই কুঁয়োতে আসে। রোদ চড়া হলে অনেকে চান করে। কুয়োপাড়ে কাপড় কাচে। অনেক জল পড়ে এবং বয়ে যায় বলে কুয়োর চারপাশে লিট্‌পিটিয়া আর পুটুসের ঝাড় গজিয়েছে। গরমের দিনে বিকেলবেলায় সাপ আর তৃষ্ণার্ত মোরগা-মুরগী, তিতির, ছাতারে সব চল্‌কে-পড়া জলের কাছে চোরের মতো এসে জল খেয়ে যায়।

ঐ শালবনের পাশে পাশেই পথটা এসেছে প্রায় দু-তিন-ফার্লং। শালবনের মাঝামাঝি আসতে কে যেন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল শালবনের গভীর থেকে। বোধহয়, কুঁয়োর দেওয়ালের ভিতর মুখ

ডুবিয়েই ডাকল সে। গম্‌গম্‌ করে উঠল সমস্ত জঙ্গল সেই অনুরণিত ডাকে। প্রতিধ্বনি ফিরে গেল সাড়া-দেওয়া পাহারাদারের হাঁকের মতো।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল পৃথু। চিৎকারটা কিসের? কে করল এবং কেন করল তা বোঝার চেষ্টা করল। স্বরটি খুবই চেনা মনে হল।

আবারও চিৎকার হল বা—বা। আবারও গম্‌গম্‌ করে উঠল প্রাচীন শালবন। ভয় পেয়ে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে গেল বনের মাঝখান থেকে ডানা শন্‌শন্‌ করে।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে পৃথু। ভাল করে নজর করে দেখল টুসু! তারই ছেলে।

কিছু বুঝতে না পেরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল পৃথু সেদিকে।

এই হঠাৎ "বাবা" ডাকটা তার বুকের মধ্যে কী সব জমে থাকা জিনিস হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। সেই সব গভীর অজানা, অনাস্বাদিত বোধ তারও বুকে যে বিশ্বাসঘাতকেব মতো লুকিয়ে ছিল তা ও কখনও জানেনি। হঠাৎ করে সহস্র হাতে ছুরি মারল তারা পৃথুর বুকে। রক্ত নয়, ঐ একটি ডাকে, আচমকা ডাকে অপত্য-স্নেহ হঠাৎ উৎসারে ফোয়ারার মতো ফিন্‌কি দিয়ে ছুটল দিকে দিকে।

ও যে কারও বাবা, "বাবা" বলে ডাকার যে কেউ আছে তাকে, এ সংসারে এ কথা সে ভুলেই গেছিল। পৃথু ঘোষ। "অদ্ভুত বাজে লোক" একটা।

টুসু একটি সাদা শর্টস্‌ পবেছে। গায়ে সাদা-কালো স্ট্রাইপের একটি ফুল-হাতা জামা। তার উপর কালো স্লিপ-ওভার। শালবনের মধ্যে আলো ছায়ার সতরঞ্চীতে দাঁড়িয়ে আছে তার আট বছরের ছেলে, সাদা পাথবে বাঁধানো কুঁয়োর পাশে। ধবধবে ফর্সা তার গায়ের রঙ। রুষার মতো কাটাকাটা নাক মুখ ঠোঁট চিবুক। উজ্জ্বল কালো দুটি চোখ। মাথাভর্তি কুচকুচে কালো চুল। আজকালকার ফ্যাশানানুযায়ী কপালেব মাঝখান অবধি নামিযে গোল কবে চুল কেটে দিয়েছে তার মা।

ওদিকে এগোতে এগোতে এক দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকে উঠল পৃথু। টুসু। তাব ছেলে! তাবই ছেলে? কী সুন্দর হয়েছে দেখতে টুসুটাকে! মিলিও সুন্দরী। কিন্তু শিশুকাল থেকেই মেয়েরা অন্যরকম সুন্দব। ছেলেরাও যে এত সুন্দব হয, নিজের ছেলেকে দেখেই যেন আজ প্রথম জানল পৃথু।

আবার ডাকল টুসু, কুঁয়োর ভিতর মুখ নামিয়ে। এইবারে পৃথু বুঝল যে, ডাকটা, তার বাবাব নাম ধরে ডাকটা নিছক ডাক নয়, কান্না। বাবা—আ—আ—আ—আ—বলে কাঁদছে টুসু।

টুসু কাঁদছে!

কেন?

অসুস্থ শরীর নিয়েই দৌড়ে যেতে লাগল পৃথু ওদিকে।

মুখে বলল, টু—সু—উ!

ডাকটা, শীতের বিবাগী রুখু শালবনের মধ্যে পৃথুর পিতৃত্বই যেন নতুন করে জারি করতে লাগল। খুব ভয় হলো। ভয় হলো, ছেলেটা কুয়োর মধ্যে পড়ে না যায়! ভয় হলো, এই হাওয়াকে। এই ঝরা-পাতার দৌড়োদৌড়িকে। ভয় হল, শীতের দুপুরের এই আশ্চর্য হিমেল স্তব্ধতাকে।

দ্রুতপায়ে দৌড়ে যেতে লাগল পৃথু কুঁয়োর দিকে।

কুয়োর কাছে পৌঁছে পৃথু দেখল, টুসুর দু চোখে জল।

পৃথুকে কাছে আসতে দেখেই টুসু দৌড়ে এসে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে দু'পায়ের মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কী! কী। কী হল টুসু? কি হয়েছে তোমার?

টুসু উত্তর না দিয়ে কাঁদতে লাগল।

পৃথু ছেলেকে কোলে টেনে এনে কুয়োর বাঁধানো পাড়ে বসল ওকে নিয়ে। থর্‌থর্‌ করে হাঁটু কেঁপে উঠল তার। কোনোদিন কুর্চি এমন করে দৌড়ে ওর বুকে এলে ওর কেমন লাগত ও জানে না। অনেকদিনই স্বপ্নে কল্পনা করেছে, একদিন কুর্চি দৌড়ে আসবেই তার বুকে। পশ্চিমী দেশের মেয়েদেরই মতো। ভালোবাসা, যাদের কাছে গোপন রোগের মতো গোপনীয় কোনো ব্যাপার নয়

ভালোবাসা যেখানে জীবন এবং যৌবনের সুস্থ, স্বাভাবিক প্রকাশ।

কিন্তু এই মুহূর্তে পৃথুর মতো আর কেউই জানে না যে, কুর্চি তার বুকে দৌড়ে এলে হয়ত অন্যরকম লাগত। তা যে রকম ভালোই লাগুক না কেন; এমন ভাল লাগত না কখনই।

কুর্চি ত' পৃথুর ভালোবাসারই জন! আব টুসু ত পৃথু নিজেই। পৃথুই ত টুসু। তার কৈশোরের স্বপ্ন, প্রথম যৌবনের সব অবুঝ অনাবিল পবিত্র ভালোলাগা দিয়ে টুসুকে ত' ওই-ই তৈরী করেছিল রুষার সাহচর্যে। মিলিকেও। টুসু যে ওরই এক টুকরো। মানুষ নিজের চেয়েও ভাল কাউকে কি বাসতে পারে? টুসুর চেয়ে ভাল পৃথু কী করে বাসবে কুর্চিকে?

টুসুর কান্না থামলে, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে পৃথু বলল, কি হয়েছে টুসু? কাঁদছিলি কেন রে? এখানে কি করছিলি তুই?

আমি কুয়োতে লাফিয়ে পড়তাম! তোমাকে দেখে........

আতঙ্কে ও ভয়ে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল মাটিতে-দাঁড়িয়ে বাঘ-মারা সাহসী পৃথু ঘোষের!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কেন? কুয়োয় লাফিয়ে পড়ে কি করতিস? মাছ ধরতিস্?

না। মরে যেতাম!

স্তব্ধ হয়ে গেল পৃথু।

কেন?

আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

কেন? সে কিরে? কি......কি বলছিস তুই.. .?

পৃথু লক্ষ্য করল ওর গলার স্বর চড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারল যে, ও নিজেই নিজের উপর ভীষণ রেগে যাচ্ছে। সামলাতেও পারছে না নিজেকে।

কেন?

আমি লাইফ-সায়েন্স্-এ খারাপ মার্কস পেয়েছি।

তাতে কি হয়েছে? আন্টি কি বকেছেন তোমাকে?

হ্যাঁ।

কি বলেছেন?

বলেছেন, ট্যু আর নট ফিট্ টু বী ইওর ফাদারস্ সান্। ইওর মাদারস্ সান, আইদার!

একটা প্রচণ্ড হাসি পৃথুর ভিতর থেকে ঠেলে উঠে আসতে লাগল ঐ দুঃখের ভিতরেও। হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল পৃথু—টুসুকে দু'হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে।

টুসু অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার বাবার মুখে।

হাসি থামলে, পৃথু বলল: তুই আমার যোগ্য নোস? এই কথা বলেছেন আন্টি? আমি কে রে বেটা? মেরা বেটা। আমি না একটা "অদ্ভুত বাজে লোক।" বিচ্ছিরী বাজে টাইপ। তুই ত নিজেই সবসময় বলিস্। তোর মাও ত বলেন। তবে, তুই কেন আন্টিকে এ কথা বলে দিলি না।

আন্টিকে ও সব বলা ব্যাড ম্যানার্স। তাছাড়া......তুমি ত আর আসলে বাজে নও। তুমি ত ভালই। সকলে বলে। মাও ত সব সময় বলে। তুমি জানো না তা?

কী যে বলবে ভেবে পেলো না পৃথু। ছেলের চোখের আয়নাতে নিজের হারিয়ে যাওয়া মুখ খুঁজে পেল। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওদের সময়কার মতো বোকা নয়। ওদের প্রত্যেকের আই-কিউই অন্যরকম। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল পৃথু নিজের ছেলের দিকে। এমন গুছিয়ে যে কথা বলতে পারে তার ছোট্ট ছেলে সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না পৃথুর।

তা খারাপ নম্বর পেলি কেন? ভাল করে পড়িসনি বুঝি?

না।

কেন?. না কেন?

আমার লাইফ-সায়েন্স্ পড়তে ভালই লাগে না।

কি করতে ভাল লাগে তাহলে?

তোমার মতো,জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে। কাঠবিড়ালীদের পেছনে দৌড়তে, বসন্তবৌরি পাখির বাসা খুঁজতে, শামুকের চলা দেখতে ; এই-ই সব।

মাথায় হাত দিল, পৃথু। হাত না দিয়ে।

লাইফ-সায়াল্স কাকে বলে জানে না পৃথু। ওদের ছেলেবেলায় এসব ভারী-ভারী নামের বিষয়ই ছিলো না। কিন্তু টুসুর যা ভালোলাগা তা ত জীবন-সম্বন্ধীয় ব্যাপারই। অথচ···· ! সবই, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তাদের ছেলেমেয়েগুলো বোধহয় তাদের চোখের সামনেই সব নষ্টই হয়ে যাচ্ছে। টাটকা প্রাণগুলো। শৈশব নষ্ট করে শিশুকে পণ্ডিত করতে চাইছে এই শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষার বাইরের ভারে চাপা পড়ে মরছে শৈশব ; মরছে কৈশোর। বড় অভাগা-অভাগী এই শিশুরা।

ভাল্লাগে না আমার। কবিতা পড়তে ভাল লাগে শুধু। ছবি আঁকতেও।

সর্বনাশ !

নিরুচ্চারে বলল, পৃথু।

পৃথু নিজেই এই সরল নিষ্পাপ শিশুর চরম সর্বনাশ বয়ে এনেছে তার নিজের রক্তে। সেই অভিশপ্ত রক্তবীজই সঞ্জীবিত হয়ে গেছে টুসুর মধ্যে। কবিতা ; আত্মহত্যার প্রবণতা। ছিঃ। ছিঃ ! শুধু বিয়ে কবাই নয়, ছেলেমেয়ের বাবা হওয়াও সত্যিই উচিত হয়নি ওর। ঠিকই বলে রুষা।

রুষা ঠিকই বলে। পৃথু একটা..

বাড়ি যাওনি স্কুল থেকে ? বই-পত্র কোথায় ? অজাইব সিং নিয়ে আসেনি তোমাকে ?

হ্যাঁ। বাড়ি গেছিলাম। কিন্তু অজাইব সিং নিয়ে আসেনি।

মা-র সঙ্গে দেখা করেছিলে স্কুলে আসার সময় ? মা ছিলেন না স্কুলে ?

মা আজ স্কুলে যায়ইনি। আমার জ্বর-জ্বব লাগছিল বলে মালহোত্রা আণ্টিকে বলে আমি আগেই চলে এসেছি। অজাইব সিং যাওয়ার আগেই।

কেন ? শরীর খারাপ হয়েছে না কি মায়ের ? মা স্কুলে যায়নি কেন ?

না ত ! শরীর ত খারাপ হয়নি। কেন যায়নি, তা জানি না।

তবে ?

জানি না। বাড়ি ফিরতেই, মা খুব বকল আমাকে। মা, আমাকে মারল বাবা। বলল,—বলতেই, দুচোখ জলে ভরে এল টুসুর।

কি বলল ?

বলল, বকা ছেলে। চালচুলোর ঠিক নেই। ঠিক বাবার মতো হচ্ছে। এখন তোমাকে স্কুল থেকে একা একা চলে আসতে কে বলেছে ? বলেই, আমাকে বের করে দিল।

তোকে মা এই দুপুরে বাড়ি থেকে বের করে দিল ? এমন ত কোনোদিনও করে না। মাও ত তোকে ভালবাসে। খুবই। তোর মা, তোদের আমি যতটুকু ভালবাসি তার চেয়ে অনেকই বেশি ভালবাসে। তবে ? তা, মেবীর কাছে থাকলি না কেন তুই ? দুখীও কি ছিলো না ? লছমার সিং ? নিজের ঘরে শুয়ে থাকলি না কেন ? জ্বর হয়েছে, সে কথা মাকে বলিসইনি বুঝি ?

মা ত বলতে দিলো না। মা-ই এসে বাইরের দরজা খুলল। আমাকে দেখেই ভীষণ রেগে ঐসব বলল আর মারল। আণ্টি নিশ্চয়ই মাকে ফোন করে আমার রেজাল্টের কথা বলে দিয়েছে। না হলে......

তুই বাড়িতে ঢুকলিই না ?

না। মা বই-খাতা সব কেড়ে নিয়ে বলল বিকানিয়া থেকে একপাউণ্ড সবুজ উল কিনে আনতে। যে উল দিয়ে মা আমার সোয়েটার বুনছে। বলেই, দরজা বন্ধ করে দিল। বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে আমার মনে হল পয়সাও দেয়নি মা আমাকে। ভীষণ কান্না পেল আমার। ফেরার সময় ঐ জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। মা খারাপ হয়ে গেছে, বাবা। মা আমাকে এমন বকেনি, মারেনি কখনও।

আবার কেঁদে ফেলল টুসু।

তারপরই বলল, একটা শেয়াল ছিল, জানো বাবা ; কুয়োটার কাছে। আমাকে দেখেই পালাল।

কুয়োটার কাছে এসে আমার ভীষণই কান্না পেতে লাগল। আমি লাফিয়েই পড়তাম। এমন সময় দেখি, তুমি আসছ। তোমার নেভী-ব্লু ব্লেজারটার বোতামগুলোতে রোদ পড়ে ঝক্‌মক্ করছিল। সেই ঝক্‌মকি দেখে তাকিয়ে দেখি, তুমি! তুমিও কেন এলে আজকে এখন? এখন ত তুমি আসো না, কাবখানা থেকে কোনোদিনও।

আমারও জ্বর-জ্বর হয়েছে রে টুসু। ভাগ্যিস! চল্ আজ আমি আর তুই আমার ঘরে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকব। কম্বলের নিচে। তুই যখন ছোট্ট ছিলি তখন যেমন শুতিস। মনে আছে?

হুঁ। টুসু বলল, বাবা! বিকেলে চিঁড়েভাজা খাব?

কি দিয়ে?

বাদাম, ধনেপাতা, ফুলকপি, পেঁয়াজ, এইই সব......

একশবাব খাবি। এখন চল্ ত।

বেটা আমার খাদ্যবসিক হযেছে। কপালে দুঃখ আছে। এও রক্তরই ব্যাপার। জিন্। ভাবল, পৃথু।

বাবা আর ছেলে রাস্তাব কাছে আসতেই দেখল গাড়ির চাকায় ধুলো উড়িয়ে অজাইব সিং আসছে।

ওদের অসময়ে এবং একসঙ্গে দেখে অবাক হয়েই ব্রেক কষে দাঁড় করাল গাড়িকে অজাইব সিং। দরজা খুলে দিল পেছনের। গাড়ি থেকে নেমে, সেলাম করে।

কাঁহা গ্যায়া থা?

পৃথু শুধোল।

মান্দলা হুজৌর?

কাহে?

মছলী লানেকা লিয়ে।

ক্যা মছলী লাযা?

কুছো নেহী মিলা হ্যায় হুজৌব। বড়ী দের করকে নিক্‌লা থা হিয়াঁসে।

কাহে?

মেমসাব দের্‌হি কর্‌কে ভেজিন্।

হুঁ!

ওদের বাংলো এখনও বেশ কিছুটা দূর। পৃথু হঠাৎ দেখল, ভিনোদ ইদুরকারের কালো রঙা অ্যাম্বাসাডরটা গেট থেকে বেরিয়ে ধুলো উড়িয়ে জোরে চলে গেল।

টুসু বলল, ভিনোদ আংকল্। তাইই ত। ঐ গাড়িটাকেই ত দেখেছিলাম স্কুল থেকে ফিরে। আমাদের গাড়ির মতই রঙ। বুঝতেই পারিনি। এতগুলো গাড়ি না ভিনোদ আংকল্-এর! মনেই থাকে না!

বাবা আর ছেলে নেমে গেলে, মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করে এসে, অজাইব্ সিং গাড়িটা গেটের বাইরে এনে বড় গাছতলায় লাগালো। তারপর ক্যাসেট প্লেয়ারটা চালিয়ে দিল।

"ঝুমকা গীড়ারে, ব্যারিলিকি বাজারমে ঝুম্‌কা গীড়োরে।
হাম্ দোনোকা ঘাবড়ার মে ঝুমকা গীড়া রে।"

পৃথু আর টুসু পৃথুর ঘরে গেল। রুষা বাথরুম থেকে এল মুখে চোখে জল দিয়ে। পৃথুর ঘরে টুসুকে দেখে অবাক হল খুবই।

উল? উল কোথায়?

পয়সাই ত দাওনি ওকে। আনবে কি করে?

আমার নাম বললেই দিত। রুষা ঘোষকে কে না চেনে হাটচান্দ্রাতে? যে-কোনো দোকানী তাকে হাজার দুহাজার ধার দেবে অমনিতেই!

ওর জ্বর হয়েছে। জ্বর নিয়ে স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এল আর মার্কস্ খারাপ হয়েছে বলে

ওকে তুমি মেরে বের করে দিলে।

মার্ক্স ! কিসের মার্ক্স ?

তোমাকে সুস্মি ফোন করেনি ?

সুস্মি ! না ত' কী ব্যাপার ?

না কিচ্ছু না।

ইদুরকার এসেছিল কেন ?

রুষার চোখ দুটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, এমনিই এসেছিল। জাস্ট ড্রপড্ ইন। কেন ? জবাবদিহি করতে হবে নাকি ?

না। আমি ভাবলাম ওর ব্যবসাতে কোনো ঝামেলা-টামেলা হল বুঝি।

তারপর বলল, শোনো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। একটু তোমার ঘরে চলো। টুসু, তুই আমাব ঘরে শুয়ে থাক।

কি শুয়ে থাকবে ? অসময়ে। যাও আগে জামাকাপড় ছাড়ো, জুতো-মোজা জায়গায় রাখো, চান করো। বাড়ির পোষাক পরো, তারপব ওসব ন্যাকামি কোরো। জ্বরে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলেন ছেলে !

টুসু একবার তাকাল তাব বাবার দিকে। তারপর চলে গেল জুতো ছাড়ার জায়গাতে।

রুষার ঘরে ঢুকেই একটা বিজাতীয় গন্ধ পেল নাকে। পাইপের টোব্যাকোর।

নাক কুঁচকে বলল, ভিনোদ ?

হ্যাঁ। ওরও ত জ্বর। কী যে হয়েছে ? সকলেরই জ্বর-জারি। আমারও ত সকাল থেকেই জ্বব-জ্বব। এদিকে কোথাও এসেছিল ভিনোদ। বলল, আজ সকালেই জবলপুব থেকে রওয়ানা হয়ে আসছে। অনেক মাইল গাড়ি চালিয়ে এসেছে। বাস্তার অবস্থাও নাকি খারাপ। আমি থাকব না জানত। এসেছিল, লছমার সিংকে বা মেরীকে বলে একটা ওমলেট খেয়ে যাবে ! সঙ্গে ভড্কা ছিল ওর গাড়িতে। আইস-বক্স ও আইসও। আমাকে দেখে ত অবাক। আমিই বললাম, বিছানাতে রিল্যাক্স করো। ওমলেট্ বানিয়ে আনছি। এখানেই শুযে ভড্কা খেল দুটো।

ওমলেট তুমি নিজেই বানালে ? বাঃ ভিনোদ খুব লাকি ত ! তা জ্বর বেশি হয়নি ত ?

পৃথু শুধোল, রুষার চোখে তাকিয়ে।

থতমত খেয়ে গেল রুষা। বলল, না, বেশি না, মানে, খুব বেশি না। তবে, কিছুতেই থার্মামিটার নিলো না। কপালে হাত দিয়ে দেখলাম, এই একশ-ট্যাকশ হবে। কি জ্বর কে জানে ?

পৃথু বলল, সত্যি ! কতরকম জ্বর-জারিই না হচ্ছে আজকাল ! আর তোমার জ্বর ? কাম জ্বর-টর নয় ত ?

ফ্যাকাশে হয়ে গেল রুষার মুখ।

বলল, সবসময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

শোনো। পৃথু বলল।

ওর গলায় এমন কিছু ছিল যে, রুষা ভীষণ ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে চোখ রাখল পৃথুর চোখে।

তুমি বকে-মেরে টুসুকে বের করে দেওয়ার পর বাসিয়াতে যাবার সেগুনবনেব কুঁয়োতে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল টুসু। আমি জ্বর নিয়ে আজ তাড়াতাড়ি না ফিবলে ঐ পথ দিয়ে......

কি কি..কি বলছ তুমি ?

যে ভয়টা চোখ তোলার সময় রুষার মুখে মাখামাখি হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বড় একটা ভয় তার সমস্ত মুখ ফ্যাকাসে করে দিল। চাপা আর্তনাদ করে রুষা বলে উঠল, টুসু ! উঃ.....

হ্যাঁ। এরকম আর কোবো না ভবিষ্যতে। ও আমার কাছেই থাকবে বলেছে দুপুরটা। এই ভিক্ষাটা মঞ্জুর করো আমার। বহু বছর তোমার কাছে চাইনি কিছুই।

রুষা উত্তর না দিয়ে বাথরুমের দিকে দৌড়ে গেল। টুসু চান করছিল সেখানে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা

সব ঋতুতেই বিকেলে গরম জলে চান করে ছেলে আর মেয়ে, স্কুল থেকে ফিরেই। রুষার এই-ই অর্ডার।

কে জানে, ছেলেটার জ্বর বাড়বে কী না জ্বরের মধ্যে চান করে! পৃথুর কিছুই বলার নেই। এই সংসারে তার ভূমিকা নীরব দর্শকের।

কী দয়া হল কে জানে? পৃথুর ঘরে আজকে টুসুর শোওয়ার অনুমতি মিলল। পৃথুর চেয়েও বেশি অবাক হল টুসু।

বাইরে রোদের তেজ পড়ে আসছিল। বুলবুলি ডাকছিল পেয়ারার ডালে। লাটখাম্বাতে জল তুলছিল খাণ্ডেল্‌ওয়াল সাহেবের বাড়ির চাকর। ধাঙ্গড় বস্তির দিক থেকে উঁচুগলায় দুজন মেয়ের ঝগড়া কানে আসছিল। চিলেব মতই তীক্ষ্ণ তাদের স্বর। মেয়েরা যখন ঝগড়া করে তাদের ভীষণ খারাপ দেখায়, তাদের গলার স্বর শকুনের মতো হয়ে যায়। তখন বুকের মধ্যে কষ্ট হয় পৃথুর।

বুকের মধ্যে টুসুকে নিয়ে শুয়েছিল পৃথু টুসুর মুখে একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। বোধহয় বেবী-জনসন ক্রিমের। এখনও বাচ্চা। ছেলেটা দূরে থাকে, কাছে আসে না বলে এই শিশুর উপরই কত রাগ আর অভিমান করে থাকে পৃথু। দুজনের মধ্যে কে যে বেশি বাচ্চা ও নিজেই বোঝে না। রুষা ঠিকই বলে। দোষ নেই কোনো রুষার। পৃথুটা একটা অদ্ভুত বাজে লোক। বিচ্ছিরী বাজে টাইপ।

আকাশে ঘুড়ি উড়ছিল। সতরঞ্জ একটা। আর একটা চাঁদিয়াল। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

টুসু বলল, আমাকে একটা ঘুড়ি আর লাটাই কিনে দেবে বাবা?

দেব।

মা বকবে।

কেন?

মা বলে, ছোটলোকের ছেলেরা ঘুড়ি ওড়ায়।

আর ভদ্রলোকের ছেলেরা?

বিলিয়ার্ড খেলে, ভিডিও গেমস, টেনিস, এইই সব।

পৃথু ভাবল, তোর বাবাটা একটা ছোটলোক, তুই বেটা ভদ্রলোক হবি কি করে? তোর মা যতই চেষ্টা করুক। জিন্-এর কাছে হেরে যাবে। ক্রোমোসোম। হিঃ হিঃ। বুকের আরও কাছে টেনে আনল ও টুসুকে। একেবারে বুকের কাছে। মনে মনে বলল, বাপ্‌কা বেটা সিপাহিকা ঘোড়া, কুছ নেই ত থোড়া থোড়া।

তোর ঘুড়ি ওড়াতে ভাল লাগে টুসু?

হ্যাঁ। খুব ভাল লাগে।

কীরকম ভাল লাগে? ভাল লাগে কেন রে?

সাচমুচ, দিল খুশ হো যাতা হ্যায়।

টুসু বলল, সাদা-সবুজ চেক চেক কম্বলের তলা থেকে উজ্জ্বল চোখ দুটি বের করে।

ভীষণই কষ্ট হল পৃথুর। টুসুর কথা শুনে। টুসুর জন্যে নয়। ওর নিজেরই জন্যে। যদি ও টুসুর জগতে ফিরে যেতে পারত আর একবার। যদি পড়ন্ত রোদে-রাঙা আকাশে একটি আট-আনা দামের সতরঞ্জ ঘুড়ি উড়িয়েই সাচমুচ দিল্ খুশ করতে পারত। একেবারে অনাবিল, অকলুষ খুশি। যে-খুশির দাবীদার থাকত না আকাশের পাখিও। কী মজাই না হত তাহলে।

আর কোনোদিন এমন কোরো না কিন্তু টুসু। বুঝেছো। খুব অন্যায় করেছ তুমি।

কি বাবা?

আজ সেগুনবনের কুয়োর কাছে গিয়ে কী সব বোকা-বোকা ভাবনা ভাবছিলে না? বোকারা ওরকম করে। যারা ইডিয়ট। তুমি কি ইডিয়ট?

না।

তবে ? আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও যে কখ্খনো, কখ্খনো, কখ্খোনো ওরকম করবে না ?

না।

না, কি ?

না, মানে হ্যাঁ। আজকে চিঁড়ে ভাজা খাবো ত বাবা ? মা যদি বকে ?

আমি এক্ষুনি গিয়ে মাকে বলে আসছি। বকলেই হল ?

এখন না, একটু পরে যেও। বাবা। ঘুম থেকে উঠে রুমাল দিয়ে বল-পাকিয়ে লোফালুফি খেলবে ? ছেলেবেলার মতো ?

ছেলেবেলার মতো। তুই কি মস্ত বড় হয়ে গেছিস না কি ?

বাঃ হইনি ? এখনও না হলে আব কবে বড হব ? এবার ত উঠব ক্লাস ফোর-এ। আমি কবে তোমার মতো বড় হব বাবা ?

মনে মনে বলল পৃথু, বড হোস নারে টুস। কোনোদিনও বড় হোস না। এই দেবলোকের শৈশব ছেড়ে নারকীয় যৌবনে কখনও প্রবেশ কারস না তুই। তুই পাখি, কী কাচপোকা, কী প্রজাপতির মতো চিরদিন নবীন থাক, চিকন থাক। বড় হোস না বাছা আমার। বড় হোস না কখনই।

মুখে বলল, আমিও ত ছোট এখনও। কোনোদিনও বড় হোস না টুসু। চিরদিনই ছোট থাকিস। বড়দের কোনো মজা নেই। তারাতোর মতোকাঠবিড়ালীর পেছনে দৌড়ায় না, শামুক কী করে চলে তা দাঁড়িয়েদেখার মতো নষ্ট করার সময তাদেব থাকে না, বসন্ত-বৌরি পাখির বাসাতেও তারা যায় না কখনও, ঘুড়িও ওডায না। তুই ছোটই থাকিস। আমার মতো ছোট। চিরদিন।

মিছিমিছি বলছ তুমি। তুমি বড়ো না হলে অফিস যাও কেন ? তোমাকে সবাই ঘোষ সাহেব বলে ডাকে কেন ? তুমি ত অনেক বড। টাকা রোজগার করো, বেয়ারারা, মেরী, লছমার সিং, অজাইব সিং এসব কি ছোটদের থাকে ? মিছিমিছি বলছ তুমি।

ওরে পাগলা, টাকা রোজগার করলে বুঝি আর ছোট থাকা যায় না ?

না। বড় হলে ছোট হবে কি কবে ? তুমিই ত পাগলা ! না হলে, তোমাকে সকলেই পাগলা-ঘোষষা বলবে কেন ?

ঠিক আছে। আরেকদিন এই সব নিয়ে আলোচনা করব তোমার সঙ্গে। আজকে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। মাথা-ব্যথা নেই ত এখন ?

না। শুধু জ্বর। গায়ে, হাতে পাযে ভীষণ ব্যথা বাবা। আমার না ভীষণ টায়ার্ড লাগে আজকাল।

টায়ার্ড লাগে ? মাকে বলেছিলি কি কখনও ?

না।

কেন ?

মা বলে, পড়া ফাঁকি দেওযাব জন্যে বলছি। আমি কিন্তু তবুও ফারস্ট আসব ক্লাসে তুমি দেখো। মা বলে, আমাকে ফাবস্ট আসতেই হবে, যে করেই হোক। নইলে মায়ের প্রেসটিজ থাকবে না। তুমি নাকি কোনোদিনও সেকেণ্ড হওনি বাবা ?

আমি ? কে বলেছে ?

মা।

মিথ্যে কথা। আমি একেবারে বাজে ছেলে ছিলাম পডাশুনোয়। তোকে আশীর্বাদ করছে তোর খারাপ বাবা, বাজে বাবা, পাগলা বাবা, তুই যেন মানুষ হোস। ফাবস্ট নাই বা হলি !

হব ফাবস্ট।

কি কবে ? লাইফ-সাযান্সে ত না তুমি খারাপ করেছো ?

পৃথু ছেলেকে মুখে বলল, তাব মাথায় নিরুক্ত আশীর্বাদের হাত রেখে।

করলে কী হয়। অন্য সব সাবজেক্টে আমি সকলেব চেয়ে অনেক বেশি পাই যে।

কোন সাবজেক্টে তুমি সবচেয়ে ভাল ?

ইংরিজীতে।

বড় হয়ে তুমি কি হবে ? কি হতে চাও ?

তোমার মতো কবি হব। লিখব । হ্যাঁ বাবা ?তোমাব মতো অনেক কলম কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকব সবসময় ।

হার্ট-ফেইল করার উপক্রম হল পৃথুব । ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বলল, না, ন্-না, আমি কবি, তা তোমাকে কে বলল ? আমি ত এঞ্জিনীয়র ।

মা বলেছে ।

মা ? মা কি বলেছে ? আমি কী এঞ্জিনীয়র নই ? খাটের উপর উঠে বসল ও উত্তেজিত হয়ে ।

মা প্রায়ই বলে আমাকে আর দিদিকে ।

কি বলে রে ? আর ? দিদিকেও বলে ?

হ্যাঁ । দুজনকেই । বলে, এঞ্জিনীয়র, ডাক্তার, উকিল, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ত হওয়া সোজা, তোমরা বাবার মতো কবি হবে, লেখক হবে, ভাল মানুষ হবে ।

ভাল মানুষ । আমি ? তোর মা বলে ? রুষা ? কি বলছিস তুই ?

হ্যাঁ বাবা । মা ত সবসময়ই বলে আমাকে আর দিদিকে ।

পৃথু নিজেকে ত চেনে নাইই অন্যদেরও কাউকেও চেনে না কি ? তার স্ত্রী, তার ছেলে মেয়ে ?

পুরোপুরি হতাশ হয়ে আবার ও ছেলের পাশে শুয়ে পড়ে । এবার সেইই যাবে বাসিয়ার দিকের সেগুনবনের কুয়োতলায় । তার মাথার গোলমালটা এবারে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না । পিস্তলটা এবারে আনিয়ে নিতে হবে জবলপুরের অনন্ত বিশ্বাসের দোকান থেকে । রুষা । মাই গুডনেস । এক বাড়িতে, এক ঘরে, এক খাটে থেকেও একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে কতই কম চেনে । ঠিকই বলে দিগা পাঁড়ে । "বিধিহু ন নারি গতি জানী ।" বিধাতারও নারীর গতিপ্রকৃতি জানা নেই ।

বেচারী রুষা । বেচ্চারী । পৃথু ভাবে । পৃথুকে এত ভাল ভাবে সে ? ছিঃ ছিঃ । আসলে যে পৃথু লেখে, যে কবি, সে যে অন্য লোক । সত্যিই যে লেখে, সে ত অন্য লোকই । সে ত পৃথু নয় ! ওই পৃথু, রুষার স্বামী, অথবা মিলি-টুসুর বাবা ত সে নয় । সে যে....

কার কবিতা যেন ? কেবলই যে কবিতাই মনে পড়ে ! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের।মনে পড়েছে । কবিতা যখন হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় তখন পঙ্‌ক্তিগুলি দূরদেশের পরিযায়ী পাখিদেরই মতো দ্রুতবেগে ফিরে আসতে থাকে মস্তিষ্কের ভিতরে শীতল বিস্মৃতির সাইবেরিয়া থেকে স্মৃতির চিলকার উষ্ণতায়, জৈব, জীবন্ত, কোষে কোষে বসন্তে—ফেটে-যাওয়া শিমুল বীজের আলতো-হাওয়ায় ভাসতে-থাকা পেঁজা তুলোরই মতো !

"যে লেখে, সে আমি নয়
　　কেন যে আমায় দোষী কর !
যে লেখে সে আমি নয়
যে লেখে সে আমি নয়,
　　সে এখন নীরার সংশ্রবে আছে পাহাড়-শিখরে
চৌকোশ বাক্যের সঙ্গে হাওয়াকেও
　　হারিয়ে দেয় দুরন্তপনায়
কাঙাল হতেও তার লজ্জা নেই
　　এবং ধ্বংসের জন্য তার এত উন্মত্ততা
　　দূতাবাস কর্মীকেও খুন করতে ভয় পায় না
সে কখনো আমাব মতন বসে থাকে
　　টেবিলে মুখ গুঁজে ?"

রুষা ! ও রুষা ! তুমি কি ক্ষমা করবে আমায় ? আমি আমার আমিময় জীবনে কেবল আমাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলাম সারাক্ষণ । তুমি যে আছ, এমন করে ভরে আছো আমার সমস্ত আমিত্ব ; এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি তা আমার । ছিঃ । আমি কী খারাপ । কী খারাপ আমি !

মনে পড়েছে। এ-কবিতাই বা কার ? সফল কবিরা মিলে এই ব্যর্থ, মস্তিষ্কবিকৃত কবিকে একেবারে পাগলই করে দেবে।

"পাহাড়, সমুদ্র, নারী এই সব জ্যামিতিক ছকের পিছনে
সর্বস্বান্ত হওয়া যায় ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
জল বা দুধের মত জানা যায় নাকো"।

....

পূর্ণেন্দু পত্রীর।

ও গো আমার কবিরা। তোমরা যে সব অমৃতর পুত্র।

জানে না, পৃথু সত্যিই জানে না, রুষা তার ছেলেমেয়ের কাছে তাকে কবি বা লেখক বলে পরিচিত করায় কেন ? তাহলে কি রুষা ওকে বুঝেছে ? কন্‌ফ্যুসিয়াসের কটি কথায় পৃথুর যে গভীর বিশ্বাস, তা কি রুষাকেও স্পর্শ করেছে ? বিশ্বাস যদি গভীর হয়, তাহলে তা ছোঁয়াচে হতে যে বাধ্য। তাই-ই হয়ত......

কন্‌ফ্যুসিয়াস লিখেছিলেন, যে মানুষ উত্তম সে বোঝে কোনটা ভাল : আর অধম যে, সে বোঝে কোনটা বিক্রী হবে। যে উত্তম, সে নিজের আত্মাকে ; তার সত্তাকে ভালবাসে। আর অধম ভালবাসে তার সম্পত্তিকে। যে উত্তম, সে তাব ভুলের জন্যে কী কী মাশুল গুনেছে তাই-ই মনে করে রাখে সবসময়, আর যে অধম সে মনে করে রাখে কী কী উপহার আর পুরস্কার কার কার কাছ থেকে সে পেয়েছিল।

রুষা বসেছিল বারান্দায়। আজ তার মন বড়ই খারাপ। সে সত্যিই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভিনোদ তাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। শবীরের মধ্যে যে এত গভীর সব আনন্দ লুকোনো ছিল তা পৃথুব সঙ্গে এতবছর ঘর করেও সে জানেনি কখনও। আনন্দে প্রায় পাগলই হয়ে উঠেছিল আজকে। নিজেকে এমন করে হারিয়ে ফেলেনি ও কখনও এর আগে। ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ টুসু এসে বেল টিপেছিল। অনেক প্ল্যান করে, বাড়ি সুদ্ধ সবাইকে বাইবে পাঠিয়ে নিজে স্কুলে না গিয়ে, উত্তেজনা আর ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়ে ভিনোদকে আসতে বলেছিল। সেই সময়েই হঠাৎ টুসু। এবং পৃথুও। পৃথুও ত আগে আসতে পারত টুসুব চেয়ে। তাহলে কি হত ? ভাবতে পারে না রুষা। ভয়ে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর আজ টুসু যা করতে যাচ্ছিল।

নাঃ আর ভাবতে পারে না রুষা। বড কষ্ট। বড়ই কষ্ট রুষার।

পৃথু মানুষটা বড় ভাল। ভারী সোজা সরল। শিশুর মতো। আজকাল ওরকম মানুষ হয় না। এরকম মানুষ অচল এ সমাজে। কোনো কথা লুকোতে পারে না, যা মনে হয বলে ফেলে। এমনকি লুকোতে পারে না কুর্চি সম্বন্ধে ওর দুর্বলতাটুকুও। সহজেই ধরা পড়ে যায় রুষার কাছে। যদিও ব্যাপারটা সম্ভবত পুরোই মানসিক। তাই-ই ওকে ঠকাতে বিবেকে লাগে বড়। কিন্তু এটা ঠকানো ? রুষার জীবন মানে কি পৃথু-মিলি-টুসু, স্কুল, ক্লাব, মহিলা সমিতি—বাড়ি। ব্যসস্। এটুকুই ? ওর নিজস্ব জীবন বলে কি থাকতে নেই কিছু ? সব জায়গাতেই ও ত একাই যায়, অথবা ছেলেমেয়ে নিয়ে। পৃথু কোথাওই যায় না তার সঙ্গে। এতদিনও যে ভিনোদের মতো বহু মানুষ তার জীবনে আসেনি সেও ত একটা বড় কথা। সেটাই দুর্ঘটনা একটা। ওর নিজস্ব চাওয়া, নিজস্ব বন্ধু, নিজস্ব জগৎ বলতে কি কিছুই থাকতে নেই ? বিয়ে, মানে কি একটা কয়েদখানা ? একবার এ জীবনে ঢুকলে সব কিছু নিঃশেষে দিয়ে ফেলে উদবৃত্ত বলতে কি কিছুমাত্রই থাকে না আর কারো হাতেই ? যা অন্য কাউকে, নিজের পছন্দসই, কোনো মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যায় ? টুকরো-টাকরা, কোনো একজন পুরুষ কি কোনো একজন নারীর শরীর মনের সব চাহিদা মেটাতে পারে ? রুষা কি একাই ভ্রষ্টা ? নষ্টা ? ওর খুব ইচ্ছে করে জানতে, ও যা ভাবে তা ওর শিক্ষার, ওর সমাজের লক্ষ লক্ষ অন্য বিবাহিতা মেয়েরাও ভাবে কী না ? শরীরে হয়ত সকলে চায় না, বা চাইলেও পায় না ; মনে মনেও কি স্বামী ছাড়া আর কাউকেই চাইতে ইচ্ছা করে না ? দিতে ইচ্ছে করে না নিজেকে ? আর মনই যদি দিতে পারে কাউকে, শরীরটা দিতে বাধা কোথায় ? তার শরীরে এমন বিশেষ কি

আছে যা অন্য একজন নারীর শরীরে নেই ? তফাৎ যা, তা ত মনেরই, ব্যক্তিত্বর, রুচির। মনই যদি মিলল মনের সঙ্গে, ব্যক্তিত্ব মিলল ব্যক্তিত্বর সঙ্গে, রুচিও হয়ত মিলল রুচির সঙ্গে, সেখানে শরীরের দামটা কতটুকু ? তবে পুরুষরাই সবাই-ই বোধহয় ভিনোদেরই মতো। যা দামী তার দাম না বুঝে, যা সস্তা সেই শরীরটাকেই দামী বলে মনে করে, দামীকে তাচ্ছিল্য করে।

আজ টুসুর ব্যাপারটা এবং ফাঁকা বাড়িতে ভরদুপুরে ভিনোদ আসার খবর জানার পরও পৃথুর এই নিরুত্তাপ ব্যবহার তাকে বড়ই ধাক্কা দিয়েছে। মানুষটা কি বোঝে সবই ? মুখে কিছুই বলে না কি ইচ্ছে করেই ? ছিঃ ছিঃ। এমন উপেক্ষার চেয়ে ও বরং ঝগড়া করতে পারত, হঠাৎ রেগে গিয়ে চড়ও মারতে পারত একটা। তাহলেও জানত রুষা যে, পৃথুর কাছে তার এখনও কিছু দাম আছে। কিন্তু পৃথুর অদ্ভুত ঠাণ্ডা এই দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন ব্যবহার ওকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা। দুর্বল করে দেয় ওকে। বাধা না থাকলে তাকে প্রতিহত করার প্রশ্নই ওঠে না। কী যে করবে ও ভেবেই পায় না।

যে আগুন ভিনোদ জ্বালিয়েছে ওর শরীরে, সে আগুন ক্রমশই জোর হতে থাকবে। পৃথু-মিলি-টুসু একদিকে। একদিকে তার এতদিনের জীবন—অভ্যেস। আর অন্যদিকে ভিনোদ।

কী যে করে রুষা। বেচ্চারী রুষা।

নিজেই বলল, নিজেকে।

টুসুর গাটা বেশ গরম হয়েছে।

ওকে বুকের কাছে টেনে নিল পৃথু। ভাবল, অজাইব সিংকে পাঠাবে ঝিংকু ডাক্তারকে আনতে। কিন্তু রুষার ভাল লাগে না ঝিংকুকে। ও বলে, 'বড় বেশি গসিপিং টাইপ'। কখনও "গসিপিং টাইপ" উকিল বা ডাক্তারের কাছে যেতে নেই। যারা গোপনীয়তা রাখতে না জানে তাদের....'

হয়ত ঠিকই বলে রুষা। ও কোম্পানীর ডাক্তারকেই আনাবে। ডঃ পোপটলাল। পোপটলাল শরীর বোঝে, শাস্ত্র বোঝে, ডিগ্রীর বোঝায় তাঁর লেটারহেড ন্যুব্জ। কিন্তু মন বোঝে না। যে-ডাক্তার মন বোঝে না, তার ডাক্তারী করা বৃথা। শিকারির মতো ডাক্তারেরও একটা সিক্সথ্ সেন্স-এর ব্যাপার আছে। থাকা উচিত।

টুসু ওর ডান হাতটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। আকাশের ঘুড়ি-ওড়া দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে ও জ্বরের মধ্যে।

চাঁদিয়াল ঘুড়িটা কেটে গেছে অনেকক্ষণ, ভেসে গেছে। শীতের দুপুরের নীল আকাশে তা দেখে, দুঃখ পেয়েছিল ও।

বেচারী টুসু এখনও জানে না, মানুষ হয়ে যখন জন্ম নিয়েছে এই সংসারে, তখন সারা জীবনে কত অসংখ্য ঘুড়িই যে কেটে যাবে ওর চোখের সামনে। কত সুন্দর স্বপ্নের সব ঘুড়ি, সাধের ঘুড়ি, প্রেমের ঘুড়ি, হয়ত সততা এবং বিশ্বস্ততার ঘুড়িও। কোনো ঘুড়ির সুতো থাকবে তার নিজের হাতে, কোনোটায় নিজে মাঞ্জা দেবে কিন্তু প্রায়ই সবসময়ই অপরপক্ষের ক্ষুরধার মাঞ্জার ভার এবং ধারে কচ্ করে কেটে যাবে তার সব ঘুড়ি। বেচারী ত শুধু লাইফ-সায়ান্সেই খারাপ নম্বর পেয়েছে। তবুও, প্রথম হবে স্কুলের পরীক্ষাতে। স্কুল-কলেজের পরীক্ষা ত ছেলেখেলা ! পৃথু মনে মনে বলল, ওরে আমার ছোট্ট, বোকা ছেলে, তোমাকে এসব ছেলেখেলাতে যে পাশ করতেই হবে। এসব ত চৌকাঠ। এখনও ত আসল পরীক্ষাই বাকি। জীবনের পরীক্ষা। প্রত্যেকটি দিন, প্রত্যেকটি সম্পর্কই ত এক একটি পরীক্ষা। "দ্যা ব্যাটল অফ লাইফ"। দ্যাট ব্যাটল ইজ ইয়েট টু বীগিন। আজ তোর লাইফ-সায়ান্সই ভাল লাগছে না শুধু। জীবনে পৌঁছে দেখতে পাবি বাবা যে, তোর কিছুই ভাল লাগছে না। জীবিকার জন্যে শতকরা নিরানব্বুই জন মানুষ যা করে,তা করতে ভাল লাগে না তাদের কারোই। তবুও করতে হবে। সকাল থেকে রাত, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর ; যৌবন থেকে মৃত্যুদিন অবধি। কী করবি বাবা। নিঃশ্বাস ফেলবি, প্রশ্বাস নিবি ; কিন্তু বাঁচা কাকে বলে তা জানতে পারার আগেই মরে যাবি।

কখনও বা হয়ত ভাববি, ভাল চাকরি করা আর ভালভাবে বেঁচে থাকা বুঝি সমার্থক। কখনও বা ভাববি, গাড়ি চড়া, কম্পানীর ডিরেক্টর হওয়া, সমাজে পরিচিত হওয়াই বুঝি বাঁচারই সমার্থক। আবার কখনও বা ভাববি নাম, যশ, খ্যাতি, কীর্তি, স্ট্যাচু, নিজের নামে রাস্তা এসবও প্রচণ্ডভাবে বাঁচার সমার্থক।

না রে টুসু, আমার সোনা ছেলে ; সে সবও নয়। বেঁচে থাকার মানে এক একজন মানুষের ব্যক্তিগত অভিধানে এক একরকম। তাই-ই ত মানুষ আমরা। বিধাতার হাতে-গড়া শ্রেষ্ঠ জীব!

তোর মাকে একদিন আদর করেছিলাম। কোনো দেবদুর্লভ সুগন্ধিক্ষণে তোর আরম্ভ হওয়া শুরু হয়েছিল। তখন তুই ছিলি তোর মায়ের চোখের তারায়, তার স্বপ্নে, আমার কাজের অবকাশের ফাঁকটুকু ভবে।অথবা বনপথে, একলা-চলাব ভাবনায়। তৈরী হওয়ার প্রক্রিয়াটা আরম্ভ করাটুকুই শুধু তোব বাবা-মায়ের হাতে ছিল রে। শুধু ঐটুকুই। এত বড় পৃথিবীতে কোটি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তুই কেমন মানুষ হবি না হবি, তা শুধুমাত্র তোরই ব্যাপার। একমাত্রই তোরই ব্যাপার। আজকের দুটি নরম হাত, যে দুটি হাতে তুই আমার ডান হাত আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে আছিস ভাবছিস ; তোর বাঘ-মাবা বাবা তোকে চিরদিন এই পৃথিবীব সব ঝড-ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচাতে পাববে. আজকের তোব সেই দুটি নরম হাত দিয়েই, তোব মস্তিষ্ক দিয়ে, তোর বিবেক, তোর স্বাতন্ত্র্য দিয়ে তৈরী করতে হবে তিল তিল করে নিজেকে। সব শিক্ষারই দুটি দিক থাকেরে টুসু-বাবা। কোনো স্কুল, কোনো কলেজ, কোনো বিশ্ববিদ্যালযই তোকে "শিক্ষিত" কবতে পারবে না, যদি না তোর মধ্যে যে অদৃশ্য কিন্তু প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, তাকে তুই কাজে না-লাগাস। পৃথিবীতে, সত্যিকাবেব বড যাঁবা হন,তোর বাবাবামতো ইউসলেস নন-এনটিটি মানুষ নন, যাঁরা যথার্থই বড় ; তাঁবা সবাই-ই এই ভিতরের শিক্ষার জোরেই এতখানি পথ পেরিয়ে এসেছেন অন্যদের পিছনে ফেলে৷ পেরিয়ে আসেন। একা একা। যে-কোনো দৌড়েই যে প্রথম হয ; সে একাই আগে থাকে। তার সামনে বা পাশে কেউই নয়।

ঘুমিয়ে নে বাবা। আরামে ঘুমিয়ে নে। সারাটা জীবন জাগতে হবে তোকে। মানুষের মতোমানুষ হতে হলে, ঘুমেব সঙ্গে, আবামের সঙ্গে, সাধারণ্যব সঙ্গে তোকে আড়ি করতেই হবে। দলে-বলে কেউ কখনও বড় হযনি রে। পৃথিবীর মানুষেব ইতিহাস অন্তত তাই-ই বলে। অনেক রাতজাগা আর অনেক হাঁটাব জন্যে তৈরী হ বাবা। তোব বাবা যা পারেনি, পারল না এ জীবনে, তুই যেন তা পারিস। এই-ই আশীর্বাদ করি তোকে, আমি ; তোব অপদার্থ বাবা!



গিরিশদার বাড়ি অনেকদিনই যায় না পৃথু। কিন্তু সাবীর মিঞার বাড়ি যায় না আরোও বেশি দিন। ডিসেম্বর মাস পড়ে গেল। টুসু মিলির দুজনেরই পরীক্ষা হয়ে গেছে কিন্তু স্কুল বন্ধ হয়নি এখনও। বাতাসে বরফের ছুঁচ উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছেরা মৌনী নির্বাক। বেশিদেরই পাতা ঝরে যাবে শীতের শেষে। তারপর বসন্ত অপগত হলে নাগা সন্ন্যাসীদের মতোনগ্ন হয়ে সার সার দলে দলে তারা একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেই মাথার উপর পত্রশূন্য, হাত তুলে কোনো অদৃশ্য অনামা দেবতার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে কোন্ কোন্ দূরের তীর্থযাত্রায় যাবে।

জোরে ছুটে গেলেও অনেকসময় একপাও এগোনো যায় না। আবার এক জায়গায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও ইচ্ছে করলে অনেক দূরে চলে যাওয়া যায় হয়ত।

জিম্ ক্যালান্ বলে এক স্কটিশ সাহেবকে জানত পৃথু। জনসন্ সাহেবের বন্ধু ছিলেন। একবার ওড়িশার কালাহাণ্ডির জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘ মারতে গেছিলেন ওঁরা। পৃথুর বাবাই নিয়ে গেছিলেন। রাতে মাচায় বসেছিল পৃথু ক্যালান সাহেবকে নিয়ে। হৃষ্ট-পুষ্ট মানুষটি। কলকাতার ব্রিটিশ কনস্যুলেট-এ কী যেন কাজ করতেন। স্কচ হুইস্কি খেতেন। নীট্। আমুদে লোক ছিলেন খুব। জীবনে এর আগে কখনও শিকার করেছিলেন যে কিছু, তা মনে হয়নি পৃথুর তাঁকে দেখে। মানুষ-খেকো দিয়েই অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন ভেবেছিলেন। যা, অনেক ভাগ্যবান আনাড়িই করেছেন বলে জানা আছে। বাঘের অপেক্ষায় শীতের কৃষ্ণপক্ষের তারাভরা রাতে মাচা মটমটিয়ে নড়ে-চড়ে বসে জিম্ বলেছিলেন : "হে, পৃটু, দিস্ প্লেস, আ গুডওয়ান্ ফর কন্‌টেমপ্লেশান্।"

শুধুমাত্র গাছেরাই জানে 'কন্‌টেম্‌প্লেশান্' কাকে বলে। মালোঁয়ার রাজধানী মাণ্ডুর বাওবাব গাছগুলি, কান্‌হার সুপ্রাচীন শালেরা, ঠুঠা বাইগার হারিয়ে যাওয়া গ্রামের একলা শিমুল এরা সকলেই হাজার হাজার শ-শ বছর ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেই যাচ্ছে। মৌনতার ভাষা বড়ই বাঙময়।

আজ মুসলমানদের কী যেন একটা তেওহার ছিল। মসজিদ, মসজিদের গম্বুজ থেকে জবাকুসুম-রঙা আকাশে ভোরের আজান ছুটে গেছে সূর্যের বুকের অস্ফুট লালিমার দিকে। পায়রারা ডানা-ঝটপটিয়ে এই প্রাণবন্ত, ভোগবিলাসী, অনেক যুদ্ধ-জেতা এবং যুদ্ধ-হারার স্মৃতিতে সমানভাবে গর্বিত ধর্মাবলম্বীদের ধার্মিক উচ্ছ্বাস মুখে করে উড়ে গেছে স্বাধীন আকাশে। কারখানা বন্ধ নেই, কিন্তু অফিস বন্ধ আজ।

মুসলমানদের তেওহার উপলক্ষ্যে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল ক্রিংক্রিং করে সাবীর মিঞার বড় ছেলে নতুন পায়জামা কুর্তা এবং কাজকরা সাদা টুপী মাথায় দিয়ে এসে দাওয়াত্ দিয়ে গেছে পৃথুকে। কত ঋণই যে জমে গেছে, জমে যাচ্ছে সাবীর মিঞার কাছে পৃথুর! এ জন্ম কেন, দশ জন্ম এই ঋণের বোঝা বইতে হবে তাকে। নিঃস্বার্থ প্রীতির ঋণ। সাধক মহম্মদের সার্থক ভক্ত এই খাঁটি মুসলমান ভদ্রলোকের প্রেমের ঋণ। সাবীর মিঞা ইংরিজী শেখেনি বলেই বোধহয়, ঠুঠা বাইগা বা দিগা পাঁড়ের মতো খাঁটি ভারতীয় রয়ে গেছে এখনও ভদ্রতায়, স্বভাবে, অতিথিপরায়ণতায়। ফার্সী, উর্দু, সংস্কৃত, ভোজপুরী এইসব ভাষার পুরাতনী ঐতিহ্যবাহী, প্রকৃত ভারতীয় মানুষ যে এখনও অনেকেই বেঁচে আছেন, রয়ে গেছেন এই বিরাট, বৈচিত্র্যময়, স্বরাট দেশে তা পৃথুদের মতো মানুষদের পরম সৌভাগ্য!

যাবে পৃথু।

সাবীর মিঞার বাড়ির দাওয়াত্-এর রকমসকমই আলাদা। সকাল দশটাতে খাওয়া শুরু হবে, শেষ হবে বিকেল চারটেয়। সঙ্গে গল্প হবে নানা রকম, শিকারের, গানবাজনার। পুরুষালি, নারীবিবর্জিত সঙ্গর নেশা আস্তে আস্তে চারিয়ে যাবে মোগলাই খানা আর সুরার সঙ্গে ধমনীতে। ভাবলেই, একধরনের চাপা উত্তেজনা বোধ করে পৃথু।

ওয়াজ্জু মহম্মদ বলেছিল, আসবেন অনেকেই। গিরিশদা, ভুচু, লাড্ডু, শামীম, ঠুঠা বাইগা এমন কি দিগা পাঁড়েও। আধুনিক, ইংরিজী-শিক্ষিত তথাকথিত ভারতীয় আঁতেলদের কাছে অথবা কম্যুনিজম-এর প্রকৃত তাৎপর্য না-বোঝা কম্যুনিস্টদের কাছেও ; ধর্ম ব্যাপারটা একটা ন্যক্কারজনক প্রাচীনতা। কিন্তু যে প্রকৃত শিক্ষিত, এক ধর্ম নয়, অনেক ধর্মর সীমা পেরিয়ে গেছে যার উপলব্ধির গভীরতা ; হয়ত সাবীর মিঞারই মতো ; তিনিই জানেন যে, ধর্ম আর কুসংস্কার এক নয়।

অফিস যেদিন বন্ধ থাকে সেদিনকার ছুটিটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে পৃথু। যে কোনো নিয়মের মধ্যেই একধরনের ক্লান্তি জন্মায়। নিশ্চিন্ত স্থির জলের মধ্যের শ্যাওলার মতো। সে নিয়ম কাজেরই হোক, কী ছুটিরই হোক। এই কারণেই রবিবারের ছুটিটাকে আর ছুটি বলে মনে হয় না। খাণ্ডেলওয়াল সাহেবরা প্রতি রবিবারে পিক্‌নিকে যান। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ অবধি নিয়ম। উধাম্ সিং চুরি করে তিতির মারতে যান। রুষা, প্রতি রবিবারে স্টীমবাথ্ নেয়, ওজন ঠিক রাখার জন্যে।

ভুচু, পামেলার কাছে চার্চ্-এ যায়। রথও দেখে, কলাও বেচে। শামীম মিঞাও মৌলভী গিয়াসুদ্দিনকে দু' ঘণ্টা গালাগালি করে। নাস্তা খেতে খেতে। প্রতি রবিবার সকালে। রবিবারের নাস্তাটা একটু ভারী হয় বলে, মৌলভীকে গালাগালি না করলে নাকি নাস্তা হজমই হয় না ওর। তাই-ই বে-ইতোয়ারের যে-কোনো ছুটিই বেশক্ খুশি বয়ে আনে পৃথুর কাছে।

পৌঁছতে পৌঁছতে একটু দেরীই হয়ে গেল পৃথুর। হেঁটেই গেল। টি-বি হস্পিটালের রুগীদের লাল গোলাপ আর চিজ্ দিতে যাবেন রুষাদের মহিলা-সমিতির মহিলারা। রুষারও অবশ্যই যেতে হবে। দারুণ দারুণ সিল্কের শাড়ি পরে মহার্ঘ সব "ফোরেন্" সুগন্ধি মেখে, আইব্রো-প্লাক্ করা, ফেস্-প্যাক্-নেওয়া মহিলারা এক সকালে হঠাৎ-দেখা দিয়ে টি-বি রুগীদের ধন্য করতে গিয়ে তাদের বুকের অবস্থা আরও খারাপ করে দিয়ে চলে আসবেন।

বছর তিনেক আগে রুষাকে দেখে, দিগা পাঁড়ে একদিন অবাক হয়ে চেয়েছিল। রুষা হাউস্কোট পরে কাজ করছিল। তখনও চান করেনি ; ভুঁরু আঁকেনি ; লনে এসেছিল পৃথুকে কিছু জরুরী কথা বলতে। ও চলে যেতেই দিগা আতঙ্কিত গলায় ফিস্ফিস্ করে পৃথুকে শুধিয়েছিল, "কাউয়ানে খা লিয়া ক্যা ?"

পৃথু তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, দিগার চিন্তার কোনোই কারণ নেই। কাকেরা সবরকম আবর্জনা যদিও খায়, তবু, সুন্দরী মেয়েদের ভ্রূ তাদের সুখাদ্যর তালিকাতে পড়ে না।

চান করে উঠে, শীতের রোদে হেঁটে যেতে ভালই লাগছিল। জর্দা দেওয়া পান খেতে খেতে। ইচ্ছে করেই সাইকেল রিক্সা নেয়নি। রুষা চলে যাবার পর টুসুর সঙ্গে একটু ব্যাডমিণ্টন খেলেছিল কিচেন গার্ডেনে। অতি সাবধানে। পৃথুর হাতের একটি মোক্ষম "চাপ"-এ এগ্জিবিশানের জন্যে সযত্নে- ফলানো একটি টোম্যাটোর গাল তুবড়ে যাওয়ায় গত রবিবারে প্রায় প্রলয় ঘটেছিল। রুষা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেছিল, কিচেন্-গার্ডেন্টা ব্যাড্মিণ্টন্ খেলাব জায়গা নয়। গায়ে জোর থাকে, স্ম্যাশিং স্ম্যাশ্ করার ক্ষমতা থাকে ত ক্লাবের টুর্নামেণ্টে নাম এন্ট্রী করে যারা খেলতে জানে তাদের সঙ্গে খেললেই পারো ! ছোট ছেলের কাছে হীরো সাজার দরকার কি ?

পৃথু মনে মনে বলেছিল, টোম্যাটো স্ম্যাশ্ করতে যাবেই বা কেন সে ? 'মেশড়' পোটেট্যোরা টোম্যাটোর কাছাকাছি থাকতে ভাল বাসলেও ; পৃথু মোটেই ভালবাসে না।

ধূলি-ধূসরিত গলির মধ্যে সাবীর মিঞার অতি-সাধারণ বাড়ির সামনে ভুচুর জীপ, শামীমের মোটরসাইকেল, গিরিশদার গাড়ি, লাড্ডুর ঢাউস বড় গাড়িটা লাগানো আছে। অতিথিপরায়ণ লোকেরা সচরাচর নিজেরা বড়লোক হয় না। বড়লোক হবার উপায় থাকে না তাদের।

"আইয়ে, আইয়ে" করে সাবীর মিঞা বুকে জড়িয়ে ধরলেন পৃথুকে। লাড্ডুকে প্রত্যাশা করেনি পৃথু। দেখে খুশি হল। তবে দিগা আসেনি। লাড্ডু বলল, পাধারীয়ে, পাধারীয়ে দাদা।

লাড্ডুর গান শুনে সাবীর মিঞা তার বড় ভক্ত হয়ে উঠেছেন বোঝা গেল। সাবীর মিঞার মতো কিছু মানুষ দেখেছে এ জীবনে পৃথু, যাঁদের দেখে মন বলে ওঠে, গুণী হওয়া খুবই সোজা ; গুণগ্রাহী যে হতে পারে সেই-ই হওয়ার মতো কিছু হল। সত্যিকারের গুণগ্রাহী। স্বার্থ, বা ধান্দাবাজীর বা চাম্চাগিরির গুণগ্রাহিতা নয়।

গিরিশদা বললেন, কী হে ? লং টাইম, নো সী ?

ওরা সবাই বটি কাবাব খাচ্ছিল। একটি মস্ত খাসী কাটা হয়েছে। লাড়ুয়ার হাট থেকে তাকে মাস ছয়েক আগে কেনা হয়েছিল। ধব্ধবে সাদারঙা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বড়-বড় কানের, এবং বুদ্ধিমান চোখের এই খাসীটিকে অনেকদিনই দেখেছে পৃথু। এই খাসীটির সঙ্গে লান্ডান্ স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর একজন অধ্যাপকের চেহারার দারুণ মিল খুঁজে পেত পৃথু ; যতবারই দেখা হত গলায় দড়ি-বাঁধা খাসীটির সঙ্গে। পাঁঠা বা খাসী হলেই যে বোকা হয়, আর অনেক ডিগ্রীধারী অধ্যাপক হলেই যে চালাক হতে হবেই এমন কোনোই কথা নেই।

খাসীটার শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিভিন্ন পদ রান্না হচ্ছে আজ। মহল্লার অপেশাদারী নাটকে যেমন অভিনেতার চেয়ে প্রম্টারের ভূমিকাই অনেক বেশি ইম্পরট্যাণ্ট্ হয়, আজ সাবীর মিঞার

চেয়েও নেপথ্যবাসিনী তাঁর দুই বিবি এবং অগুনতি মেয়েদের ভূমিকাও সেরকমই অনেক বেশি ইম্‌পরট্যান্ট। সাবীর মিঞার পরনে চেক্-চেক্ লুঙ্গি এবং জালি-গেঞ্জী, এবং তার উপরে ফিনফিনে আদ্দির কাজকরা পাঞ্জাবি। ভোপালের টাঙ্গাওয়ালারা গরমের দিনে যেমন পরেন, তেমন। শীত-টিত নেই মানুষটার। মাঝে মাঝে আণ্ডেকা রোসান্ হালুয়া খান।

সাবীর মিঞার ফিগারটাও অদ্ভুত। লম্বায় ছ' ফিট। বুকের ছাতি আগে ছিল চুয়াল্লিশ এখন কমে চৌত্রিশ। পশ্চাদ্দেশের ঘেরও চৌত্রিশ। কোমর চব্বিশ। মিঞা না হয়ে বিবি হলে, যেকোনো মিস্ ইউনিভার্সের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারতেন স্যুইমিং কসট্যুম্ পরে। তবে, প্রাইজ হয়ত পাওয়া হয়ে উঠত না। কারণ সাবীর মিঞাকে যদি স্যুইমিং কসট্যুম পরা-অবস্থায় কেউ দেখত, তবে নিছক 'শক্'-এই তার মৃত্যু হত।

সাবীর মিঞার চোখ দুটি সম্বন্ধেও কিছু না বললে সব বলা হবে না। চোখই ত মানুষের মনের আয়না! রাতের জিপ গাড়ির হেডলাইটের মতোই তাঁর চোখ দুটি। স্বাভাবিক অবস্থাতে "ডিমারে" থাকত। উত্তেজিত, খুশি, রাগী, বা বিস্মিত হলেই চোখ দুখানি "ডিপারে" উজ্জ্বল হয়ে জ্বল্‌জ্বল্ করত। ডিমার্-ডিপার্ ডিপার্-ডিমার্। যাঁরা এই দুচোখের খেলা না দেখেছেন তাঁদের এর লীলা বোঝানো আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু এমন মানুষটার গলার স্বরটা ছিল টি-এইট্-মডেল ফোর্ড গাড়ির পেট্রল-এঞ্জিনের আওয়াজের মতোই মিষ্টি। গানও গাইতেন চমৎকার। আর শের-শায়রীর নবাব ছিলেন তিনি। মীর্জা গালীব্, জীগর্ মোরাদাবাদী, ফৈয়াজ এবং সাম্প্রতিক অতীতে এলাহাবাদের ফিরাক্ গোরখপুরীর শায়েরও ঘুরত তাঁর মুখে মুখে। ফিরাক্ যে আসলে হিন্দু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এবং নামটাও যে তার ছদ্মনাম এ কথাও পৃথু প্রথম শোনে সাবীর মিঞার কাছ থেকেই।

ফিরাক্ও এখন আর নেই।

শামীম হঠাৎ বলে উঠল, পৃথু ঢুকতেই, শালে লাল্লুকো নীল্লা বনাকে ছোড় দিয়া দাদা। ইক্‌সো পাঁচ বুখার। আঁখ বন্ধ। পোর্‌সার্‌ভি বন্ধ। মর্‌ভি যানে শক্‌তা। শালে বেইমান।

সকলে হাঁ-হাঁ করে উঠল।

ব্যাপারখানা কি? কেন এমন করলে শামীম? তুমি কি ঠিক জানো যে, ওই-ই বলে দিয়েছিল ফরেস্টার এবং পুলিশদের?

বিলকুল্!

শামীম বলল, ধর্মেন্দ্র-স্টাইলে।

তা, মারলে কেন? অন্য ভাবে কি শিক্ষা দেওয়া যেত না?

পৃথু বলল। দুঃখিত গলায়।

নেহি দাদা। মগর্, ইক্ নয়া স্টাইলসে শিখ্‌লায়া শালেকো।

নয়া স্টাইল?

সকলে সমস্বরে শুধোল।

ভুচু চোখ টিপল একবার শামীমের দিকে। এখানে লাড্ডু আছে। যে, বারাশিঙা মারার কিছুমাত্রই জানে না। ওর কাছে গোপন-কথা ফাঁস করার দরকারটা কি?

শামীম্ ভুচুর সিগন্যাল্ রেকগ্‌নাইজ করল। করেই, হঠাৎ লাড্ডুকে বলল, দেখ লাড্ডুওয়ালে, হিয়াকাকোঈ বাঁতে ছুঁয়া হোনেসে বাহারমে তেরী লাড্ডুকা দুকান্‌মে ম্যায় আগ্ লাগা দুঙ্গা। হুঁশিয়ার!

লাড্ডু বেচারী জম্পেস্ করে মুখ ভর্তি বটি-কাবাব নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ ওর দোকানে আগুন লাগবে শুনে ও একই সঙ্গে কোঁৎ করে কাবাব গিলতে গিলতে হতভম্ব হয়ে বলতে গেল "লেহ্ লট্‌কা।" ব্যস্‌স, যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে গলায় কাবাব আটকে গেল। তখন তাকে নিয়ে আর এক বিপত্তি! এ মাথায় চাঁটি মারে, ত ও গুলাব-জল মেশানো জল ঢালে তরমুজের মতো মুখ হাঁ-করিয়ে, বদনা থেকে। হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার!

অবস্থা; খবরের কাগজের ভাষায়, যখন "আয়ত্তাধীন", তখন ব্যাপারটা জানা গেল শামীমের মুখে।

ও বলল, চটে যাবার ওর বিলক্ষণ "হক্" ছিল। ও ত আসলে মারেনি লাল্লুকে। কোনোরকম হিংসা করেনি। গান্ধী মহাত্মার অহিংসার পথেই গেছে।

অহিংসার পথের হিংসার কথা শুনে, লাড্ডু আবারও বলল, লেহ্ লট্‌কা।

পৃথু ধমক লাগাল শামীম্‌কে। বলল, খুলেই বলো না। কী হেঁয়ালি করছ?

শামীম তখন যা বলল, তা শুনে সকলেরই চোখ কপালে।

লাল্লুদের গ্রাম আর দিগার কুঁড়ের মাঝের জঙ্গলে পাহাড়ে ভোপালের কাছের ভীম্‌বৈঠ্‌কার গুহা আর রক্-শেলটারের মতোই অনেক গুহা আর রক্-শেলটার আছে। সেখানে মস্ত মস্ত ভীমরুলের চাক। মৌমাছির চাক। ভীমবৈঠ্‌কাতেও যেমন আছে। শামীম, লাল্লুকে হাটচান্দ্রায় ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে পরোটা আর মোর্‌গা-টোর্‌গা খাইয়েছিল ভরপেট। তারপর তাকে খাতির করে হিন্না ঈত্বর্ মাখিয়েছিলো আদর করে।

রহিস্ মুসলমানেরা বাড়িতে দাওয়াত্ দিলে আগেই ঈত্বরদান এনে মেহমানদের গোঁফে, জুলফিতে; কারো বা বুকের চুলেও ঈত্বব ইস্তেমাল্ করে দেন। কষে হিন্না ঈত্বর লাগিয়ে লাল্লুকে মোটর-সাইকেলের পেছনে বসিয়ে শামীম দিগাব কুঁড়ের মাইলখানেক দূরে এমনই জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এসেছিল যে ঠিক সেখান থেকেই জঙ্গলের সেই পাকদণ্ডী বাস্তাটা ওদের বস্তীর দিকে গেছে। ঐ পাকদণ্ডীটিই গেছিল একেবারে গুহা এবং রক-শেল্‌টার-এর গা ঘেঁষে। শামীম জানত যে, আতরের তীব্র গন্ধ গায়ে মেখে ঐখানে পৌঁছলে আর দেখতে হবে না। হাজার হাজার মৌমাছি টাইফুনের মতো আছড়ে পড়বে লাল্লুব গায়ে। মৌমাছিব কামড যে একবার খেয়েছে সে জীবনে আর কখনও মৌমাছি নিয়ে কাব্য করবে না।

কবে ঘটেছে এ ঘটনা?

সাবীর মিঞা শুধোলেন।

পরশু। শামীম বলল।

কেমন আছে? খোঁজ নিয়েছ?

আররে! সেই খোঁজ নিয়েই ত এলাম! সোজা সেখান থেকেই আসছি।

ভেবেছিলাম, এতক্ষণে টেঁসেই গেছে। গিয়ে দেখি, বেঁচে গেল এ যাত্রা। মরেইনি যখন, তখন ইলাজ করাবার জন্যে দশটা টাকাও দিয়ে এলাম। পকেট এদিকে পুন্নোয়া-টাঁড় এর মতো ধু-ধু। এই টাকাটা তোমরা আমাকে দিয়ে দেবে। সাবীর মিঞারই দেওয়া উচিত। তাঁর নাতির ছুন্নৎ-এর শিকার করতে গিয়েই ত এত বিপত্তি।

পৃথু বলল, খুবই অন্যায় করেছ।

শামীম বলল, তুম্ কাবাব খাও দাদা। ঠিক-বেঠিক্‌কে মাম্‌লেমে আপনে মত ফাঁসো। শালার বউটা বড় কাঁদতে লাগল।

লাল্লুব বউ-এর কান্না দেখেই গলে গেলি বল্।

গিরিশদা বললেন।

মেয়েছেলের কান্না দেখে যে গলে যায় সে শালা পুরুষ নয়।

আমার এক শালী এসেছিল লাহোর থেকে। তাকে গতবছর নিয়ে গেছিলাম মাণ্ডু, পাঁচমারী, ভীমবৈঠ্‌কা সব দেখাতে। সেও ইত্বর মেখেছিল। গরমের দিন ছিল। ফিরদৌস্ মেখেছিল সে। শেষ বিকেলে গিয়ে পৌঁছেছি ট্যুওরিসট্ বাসে করে। ইয়া আল্লা! সে যাত্রায় শালীকে এনে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি যে এইই ঢের। সাতদিন অসুস্থ ছিল। ভোপালে তাকে হামিদিয়া হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি করতে হয়েছিল। তার কাছে থাকাতে আমাকেও কম কামড়ায়নি। সত্যিই। মৌচাক আর ভীমরুলের চাকের কাছে কখনও গন্ধ মেখে, বা ধুপকাটি জ্বালিয়ে যেতে নেই।

শামীম বলল, ন্যাকামী করবেন না সাবীর সাহেব, যে শালারা শালীর কামড় খেয়েছে, তারাই জানে যে মৌমাছির কামড় তার তুলনায় কিছুই নয়।

ভুচু বলল, যে জায়গায় লাল্লু কামড় খেয়েছে, সে জায়গাটাতে বিস্তর ভাল্লুক আছে। বড় বাঘও

আছে। ঐ কামড় খেয়ে বাড়ি ফিরে গেল কী করে লাল্লু ?

বাড়ি ফিরবে কী করে ? অজ্ঞান অবস্থায় ঐখানেই পড়েছিল। পরদিন সকালে ফরেস্ট-গার্ড যাচ্ছিল সাগুয়ান প্ল্যান্টেশন্-এ বাইসন্ আসছে কী না তার ভান্জ দেখতে। সেই লাল্লুকে অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করে। তারপর লাল্লুদের বস্তী থেকে লোকজন ডেকে এনে ওকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে।

লাড্ডু বলল, শামীম্‌কে। বহত্‌ই খতরনাগ্ আদ্‌মী হ্যায় ভাই তুঁ।

নিরুত্তাপ শামীম বলল, তোমার মতো অতটা নই। এক-এক তান মেরে কত মেয়েকে যে খুন করেছ সুরের ছুরিতে তা তুমিই জানো ! তোমার মতো খতরনাগ আমিও নই !

গিরিশদা বললেন, প্রেমে আর যুদ্ধে অবশ্য কিছুই অন্যায় নয়।

তাছাড়া, অহিংসার পথেই ত হিংসা করেছে শামীম্।

ভুচু বলল।

সকলেই হেসে উঠল। অহিংসার পথে হিংসা কথাটা বোধহয় এবার থেকে চালু হয়ে গেল।

সাবীর মিঞা বললেন, দ্যাখ্ শামীম, কাজটা তবু তুই ভাল করিসনি। ও যদি কখনও জানতে পায় ?

খুদাহ নিজে পর্যন্ত জানতে পাববেন না আর লাল্লু বাইগা ! ছাড়ো ত তুমি ! এসব দিমাগের ব্যাপাব অকল-এর বলেই, ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নিজের বাঁ দিকের জুলপীর উপর টোকা মারল দুটো।

তবুও অন্যায় কবেছিস। কারণ, লাল্লু আমাদেরই একজন ছিল। নিজেদেব মধ্যে কারো সঙ্গে সম্পর্ক যদি খারাপই হযে যায়, তবে তা সুন্দর ভাবে শেষ কবা উচিত, তিক্ততার সঙ্গে নয়।

অজীব আদমী আপ্। লাল্লুর বউ আমাকে বালুসাই খাওয়াল, মোগাঁও-এর হাট থেকে কিনে এনেছে বলল দু দিন আগে। কত্ত ভালবাসল আমাকে। সম্পর্ক শেষই বা কেন হবে আর তিক্ততাটাই বা দেখলেন কোথায় ? উসব কেতাবী কথা শেব-শায়েবী আমিও কম জানি না সাবীর সাহাব বলেই : উঠে দাঁড়িয়ে চমৎকাব সুললিত গলায় আবৃত্তি করল শামীম। মনে হলো, ইতিমধ্যেই ভদকার ভূত চড়ে গেছে ওর মাথায়।

ত—আর-রুখ বোগ বন যায়ে
উসকো ভুল না হী বেহতব
ত-আল-লুক বোঝ বন যায়ে
—তো উসকো তোড়না হী আচ্ছা।

অফসানা আনজাম তক
লানা না হো মুসকিন
উসকো এক খবসুবৎ মোড
দেকব ছোড়না হী আচ্ছা

কেযাবাৎ। কেযাবাৎ বহত খুউব, বহত খুউব্। রব উঠল চারধার থেকে।

হারামজাদা, সুরতহহারাম শামীম, ব্রীড়ানম্র কিশোরীর মত মুখ করে মাথা হেঁট করে আদাব জানাল সকলকে। তাবপবই বলল, আজকের মেনু কি সাবীর সাহাব ?

সাবীর মিঞা বললেন, আমাব ক্ষেতির চাল, ক্ষেতির চানাকা ডাল, গোবি, বায়গন, টোম্যাটো, পিঁয়াজ, হরা-মিরচা আর……

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

এই ক্ষেতির রহস্য, সাবীর মিঞা আর তার বন্ধুরাই শুধু জানে।

মেন উইদাউট উইমেন-এর এই দোস্তীর গোপন রহস্য এ। ক্ষেতি-ফেতি কোনো জন্মে ছিল না

সাবীর মিঞার। তাঁর সুউর্বর কল্পনা দিয়ে বনক্ষেতি বলে এক খামার বানিয়েছিলেন তিনি। বিবিরা শিকারে যেতে দিতে চাইতেন না একেবারেই। বয়সও হয়েছে এবং শরীর ভাল যাচ্ছিল না মাস ছয়েক থেকে। একটা মাইল্ড অ্যাটাক্ও হয়ে গেছিল। রাত জাগতেও দিতেন না। তাই বনক্ষেতির উদ্ভব হয়েছিল। যখনই শিকারে যেতে হত তাঁকে, তখনই অন্দরমেহাল্-এ বলতে হত বনক্ষেতিতে যাচ্ছি। জমি জমা তদারকি করতে, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ। বনক্ষেতি বলে একটা জঙ্গলে গ্রাম ছিল ঠিকই বাইহার-এর পথে। সেখানে তিনদিক খোলা একটি মাটির ঘরও ছিল। পাশে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ। একটু দূরে তালাও, তাতে নীল জল। বড় পদ্ম, ছোট ছোট কুমুদিনী আর শাপলার ভীড় সেখানে। নানারকম বুনো-হাঁস এসে জমা হত শীতকালে। বনক্ষেতিতে শিকার করা কিন্তু একেবারেই বারণ ছিল। নিজেদেব বারণ। এ মাটির কুঁড়েতে সাবীব মিঞা নিজে হাতে পাথর-সাজানো উনুনে, খিচুড়ি, আলুকা-ভাত্তা এবং অন্যত্র—শিকার করা জানোয়ারের ও পাখির মাংস বান্না করতেন। তেঁতুলতলার খাটিয়াতে বসে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার অনেক দিন ও বাত কেটেছে পৃথুদের। নারী-সঙ্গ-বর্জিত, ফোটা- কার্তুজের গন্ধ-মাখা সেই সব পুরুষালী দিনেব স্মৃতি মস্তিষ্কর কোষে কোষে জড়িয়ে থাকবে, যতদিন প্রাণ থাকে।

বনক্ষেতিব মাশুল গুণতে হত সাবীব মিঞাকে। আর তার ফ্যায়দা ওঠাত ভেড়ুয়া মাঝি। মুদীর দোকানী। তাবৎ ভাল ভাল চাল, পুলাউ-এর জন্যে, বাজাবের শ্রেষ্ঠ ডাল ঘি এবং অন্যান্য জিনিস পৌঁছে যেত সাবীব মিঞাব বাড়ি সেই দোকান থেকে। কুলির মাথায়। বস্তা করে। লাল্লু শেখ-এর দোকান থেকে আসত সবরকমেব সেবা আনাজ। দুই বিবি মহা খুশি। 'বনক্ষেতির' জিনিসের স্বাদই আলাদা!

বলতেন তাঁরা।

খাসীর কি কি পদ হয়েছে তাইই বলুন সাবীব সাহাব?

এবাব ভুচু বলল।

বটি-কাবাব দেওয়া, দবাজ হাতে জাফবান-ঢালা মন-পসন্দ্ বিরিয়ানি পুলাউ তোমার জন্যে। গুলহাব কাবাব ত খাচ্ছোই। চাঁব। পায়া। সঙ্গে তক্কর থাকবে। লাব্বা, রেজালা, কলিজা-ভাজা, ভডকাব সঙ্গে। এবং কবুরাও।

কবুবা অর্থাৎ অণ্ডকোষ মুসলমান রান্নার এক বিশিষ্ট পদ।

মগজও তাইই। জঙ্গলেব লোকেরা বলে, ভাল্লুকের "কবুবা" খেলে বৃদ্ধবও হারেম রাখার ক্ষমতা আসে। খাসীব কবুরা খেলে কী হয়! তা কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়নি আজ পর্যন্ত।

খানা চালু হয়ে যাবাব পরই মাঝে মাঝে সাবীব মিঞা সকলকে হামদর্দ দাবাখানাব এক এক বাটি "পাচনল" খাইয়ে দেবেন জোর করেই। খানা "পচবাব" জন্যে অর্থাৎ, হজম করার জন্যে। সঙ্গে শিকারের গল্প চলবে।

বাহাদুরীর গল্প নয়। হেরে-যাওয়ার গল্প সব। গুলি-ফস্কানোর।

ধোঁকা-খাওয়ার, বোকা-বনার, থকে-যাওয়ার সব গল্প। নিজেদের কৃতিত্বর গল্প নিজেরা, নিজেদের মধ্যে সচরাচর ওরা করে না। জঙ্গলের নানাবিদ্যায় কৃতী না হলে এই বিশেষ সঙ্গে এসে মেশবার ছাড়পত্রই ত তাদের কারোই পাওয়াব কথা ছিলো না। তাইই কৃতিত্বর গল্প বড় একটা হয় না এই মজলিসে। এখানে গান বাজনাও হয় না। তবে, গান বাজনার কথা হয়। লাড্ডুর মতোগুণীরা নিমন্ত্রিত হয়।

পৃথু এখানে, এই সঙ্গে থেকেও; যে সবসময়ই একাত্ম থাকে, তা ঠিক নয়। তার প্রধান কারণ, শিকাব সে আজকাল করেই না। বহুদিন হলই করে না। তাইই এদেব অনেক ঘটনা, গল্প, যে সব নিয়ে ওরা আলোচনা করে তার বেশিই ওর অজানা। তবু, জঙ্গলের বন্ধুদের সঙ্গও ত অনেকখানি। পরনিন্দা নয়, পরচর্চা নয়, ষড়যন্ত্র নয়, কাউকে টেনে নামানো বা ঠেলে ওঠানোর বদমতলবও নয়, নীচ বা ইতর কোনো আলোচনাই নয়, পৃথিবীতে যে হাসি ছাড়া, পুরুষালী বল-বীর্য ছাড়া, জীপের এঞ্জিনের আওয়াজ, জঙ্গলের নিস্তব্ধ শব্দময়তা অথবা বন্দুক বা রাইফেলের গুলির শব্দ ছাড়া আর

অন্য কোনো শব্দ আদৌ আছে এ কথা একবারও মনে হয় না এখানে এলে। টাকা পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, সুন্দরী-নারী, যশ, এ সব কোনো-কিছুরই ধার ধারে না এরা। এই রুক্ষ, আত্মিক সৌন্দর্যে সুন্দব, সদাহাস্যময় বিভিন্নবয়সী পুরুষদের প্রেমে পড়ে আছে ও। জঙ্গলের প্রেমে, জঙ্গলের এই জীবনের প্রেমে।

এখনও চুরি করে যে দু একটা পশু-পাখি এরা মারে, তা অন্যায় হলেও ; দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অহর্নিশ যে পরিমাণ অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে তার তুলনায় এ কিছুই নয়। আজ এদের চুরি করে শিকার কেন যে করতে হয়, তাও জানে না পৃথু। বনের আইন ইংরেজ আমলেও যা ছিল এবং যেমন করে তা পালিত হত, তেমন থাকলে আর পালিত হলে, আজও পারমিট্ নিয়েই ওরা শিকার করতে পারত। বুক ফুলিয়ে।

শুধু চোরা-শিকারিদেরই জেল হয় এই ভারতবর্ষে, ভোট-চোবাবা বুক ফুলিয়ে রাজা-মহারাজা হয়ে সহজে ঘুরে বেড়ায় বীরদর্পে। মিথ্যাচাবে, মিথ্যা-প্রচারে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে কোটি কোটি সরল সহজ, নিরুপায় দেশবাসীকে ধোঁকা দিয়ে পাঁচ বছর পর পর ভোট-চুরি করাটা অন্য সব কিছু চুরির আগেই বন্ধ করা উচিত ছিল।

আইন যাঁরা বানান, যাঁরা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ; তাঁদের প্রত্যেকেরই আগে সততা, আন্তবিকতা ও আইনানুগতার পরীক্ষায় আগে নিজেদের উত্তীর্ণ করে তারপরই দেশবাসীর বিভিন্ন অপরাধের বিচার করতে বসলে ভাল করতেন।

'ভড়কা এনেছিলেন গিরিশদা। "ইফ ইটস্ আ ড্রিঙ্ক, কনসাল্ট গিরিশ ঘোষ" এই বেদবাক্য সকলেই মেনে চলে। গিবিশদা গন্ধরাজ লেবু যোগাড় করেছেন বড়, বড়। হয়ত তাঁর বাড়িব কামধেনু সেই ডীপ-ফ্রিজ-এর মধ্যেই বাখা ছিল তা। সঙ্গে ধানী-লঙ্কা। লেবু কেটে ও লঙ্কা চিরে গেলাসের মধ্যে ফেলে তাতে পাতিয়ালা সাইজের ভড়কা ঢেলে দিচ্ছিলেন তিনি। ফল যা হচ্ছিল, তা বলার নয়। লিভার-এর মধ্যে কেউ যেন আলপিন ফুটিয়ে দিচ্ছিল। সাবীর সাহাবের শরীর ভাল নয়। বিবি আর ছেলেরা সাবীর সাহেবের মদ খাওযা বা শরীরের উপর অত্যাচার কবা একেবারেই পছন্দ করতেন না। ওঁর বাড়িতে ওসব থাকতও না। এমনিতে তিনি এসব অখাদ্য-কুখাদ্য খান না আজকাল। তার সারেঙ্গীওয়ালাদের সঙ্গে পড়লে অবশ্য না করতেন না। বলতেন, হাসতে হাসতে, এদের কী করে বোঝাই যে জন্মেছি যখন, তখন মরতে ত হবেই।

ভেতর থেকে বিবিদের পরোয়ানা এল ছোট ছেলের মারফৎ।

সাবীর মিঞা গিরিশদার দিকে চেয়ে বললেন, কি করি?

গিরিশদা লোকাল গার্জেন বনে গিয়ে বললেন, খান্। একশবার। আপনি সাহাব আমার চেয়ে বয়সে আর কতই বা বড় হবেন। যা ইচ্ছে করে, করবেন। বিবি-বাচ্চাদের প্রতি সব দায়িত্ব ত পালন করেছেন, আর কি?

সাবীর সাহেবের হেডলাইটের মতো চোখ দুটো ডিপারে জ্বলজ্বল করে উঠল। বললেন, সাহী বাত্। আমি ত তাইই বুঝি। পঞ্চাশ বছর অবধি মানুষ যা কিছু করে তার সবই উচিত-কর্তব্য। পরের প্রতি কর্তব্য। আব্বা, আম্মা, বিবি, আওলাদ, সবকিছু এদেরই জন্যে। পঞ্চাশের পর সবকিছুই করা উচিত নিজেরই জন্যে। শুধুই নিজের জন্যে। যা কামাব, নিজের জন্যে খরচ করব ; দোস্ত-বিরাদরদের দাওয়াত্ দেব। শরীরের উপর শাসন রাখব না। আমি মরে গেলে ত এই নমকহারাম দুনিয়া আমাকে বারো ঘন্টাও মনে রাখবে না। আমি ত গাইয়ে নই, শায়ের লিখনেওয়ালা নই ; অন্য লক্ষ লক্ষ মানুষেরইমতোএকজন অতি সাধারণ মানুষ। অত পুতুপুতু করে বাঁচার সময় আমারও আর নেই ইয়ার। ওয়াক্ত ফুরিয়ে আসছে। ঝাড়লণ্ঠনের সবকটি বাতিই এখন জ্বালাবার সময় হয়েছে। পলতে উস্কে দিয়ে, তেল ভরে নিয়ে ; নতুন করে জ্বলব এবার। যাওয়ার আগের জ্বলা।

গিরিশদা বললেন, ভাই হে, নিশ্চয়ই মরবেন, আপনি মরবেন আমিও মরব। প্রত্যেক আওলাদ্ যখন প্যাদা হয় তখন সে তার নিজের মওত্ ত মুখে করেই নিয়ে আসে।

সাবীব মিঞা হাসলেন। ভডকাব গ্লাসে চুমুক দিলেন একটা। খোলা দবজা দিয়ে চবুতবাব উপব দিয়ে ধূলিধূসবিত খোযাব বাস্তা পেবিয়ে তাঁব চোখ দুখানিব দৃষ্টি মসজিদেব গম্বুজ আব খিলানেব গাযে লেগে থাকা শীতেব ম্লান বিধুব বোদেব সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেল।

হঠাৎই বুড়ো স্বগতোক্তিব মতো বলে উঠলেন,

"গুস্তাকি, ম্যায ভ্রিফ কবেঙ্গে ইকবাব
যব সব পাযদল চলেঙ্গে,
ম্যায কান্ধেপব সওযাব।'

অর্থাৎ জীবনে অপবাধ একবাবই কবব। সবাই যখন হেঁটে যাবে আমাব দোস্তবা আমি তখন তাদেব কাঁধে চড়ে যাব।

হঠাৎ ঘবেব মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। এত খুশিব মধ্যে এত খুশবুব মধ্যে এত উমদা খানাব মধ্যে দোস্তদেব মধ্যে বসে এহ তেওহাবেব দিনে এমন কথা কেন?

শামীম বলল আপনাব গুস্তাকি কখনই হযনি বাবো কাছে। হবেও না। আমবা সকলেই আপনাব জানাজা বয়ে নিয়ে যাব, যদি আগে মবেন আপাতত ঝুঠঠো ফজুল বাঁতে না কবে আমাকে একটা ভডকা দিন। ডাবল কবে।

বলেই বলল,

'না পীনা হাবাম হ্যায,
না পিলানা হাবাম,
পীকে হোঁসমে আনা হাবাম হ্যায'

সকলেই বহত খুউব। বহত খুউব কবে উঠল।

আজ কেন যেন এখানে আসাব কিছুক্ষণ পব থেকেই মনটা কেমন উচাটন হযেছিল পৃথুব। দুটো ভডকা খেযেছিল। গুলহাব কাবাব, কলিজা-ভাজা, তবু ওদেব সঙ্গে আজ যেন আনন্দে সামিল হতে পাবছিল না। ওব এই স্বভাবকে কেউই বোঝে না। ও নিজেও যে পুবো বোঝে এমনও নয়। সকলেই ওকে ভুল বোঝে। এমনকি দোস্তবাও।

কুর্চিব কথা মনে পড়ছে বাব বাব। কোনোদিন রুষাব কথাও মনে পড়ে। কোনোদিন বা শেষ যে বাঘটাকে মেবেছিল হাঁস্‌সাব জঙ্গলে বহুবছব আগে তাব শান্ত ক্ষমাময মুখটাকে। তখন অন্য কিছুতেই আব মনোনিবেশ কবতে পাবেনা ও।

খাওযা শেষ হতে হতে বিকেল চাবটে বাজবে। আসল খানা তখনই জমবে।

ভুচুব কাছে ভুচুব জীপেব চাবিটা চাইল।

বলল, আমি একটু ঘুবে আসছি ভুচু।

কোথায যাবেন?

সকলেই হাঁ হাঁ কবে উঠল।

এই, একটু ঘুবে আসছি।

গিবিশদা বললেন, আমাব গাড়িও নিযে যেতে পাবো ভাযা।

নাঃ। শীতের মধ্যে হুডখোলা জীপ চালাতেই ভাল লাগে। বোদ লাগে।

তবে আব একটা খেযে যাও। ওযান ফব দ্যা বোড।

গিরিশদা বললেন।

পৃথু কিছু বলার আগেই ভুচু বলল, এতদূব জীপ চালিযে যাবে আসবে সঙ্গে নিযে যাওযাব জন্যেও আমি ফিট্ কবে দিচ্ছি।

এতদূব মানে? পৃথু শুধোল।

আমি জানি, কোথায যাবে তুমি।

কোথায় ?

পরে বলব।

সকলেই পৃথু আর ভুচুব মুখে তাকাল। এমন এমন সময়ে ভুচুকে পৃথুর টেনে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করে। মারামারি ও কবে না ; করেইনি বলতে গেলে। কিন্তু ওর রাগ যখন চাপে তখন মানুষ খুন করে ফেলাও আশ্চর্য নয় ওর পক্ষে। জিন্। বাবার রক্ত। সবই মোছা যায়, রক্ত মোছা যায় না। কালো রক্ত, নীল রক্ত, লাল বক্ত কোনো রক্তই মোছা যায় না। অনেককেই প্রাণপণ চেষ্টা করতে দেখে চারদিকে ; নিজের বক্তকে প্রাণপণে অস্বীকার করার। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা শুধু বিফলই নয় ; হাস্যকরও বটে।

জীপটা চালিয়ে পৃথু চলে গেলে, সাবীর মিঞা চিন্তান্বিত মুখে ভুচুর দিকে চেয়ে বললেন, গ্যয়ে কাঁহা পিরথুবাবু ?

ভুচু বলল, আমি জানি না।

শামীম বলল, বিজ্‌লীর কাছে কি ? সেদিন জলের ট্যাঙ্কির নিচে মাছ কিনতে গিয়ে দেখা হয়েছিল। পিবথুবাবুব কথা জিজ্ঞেস করছিল বিজলী বাইজী।

বল কী ?

অবাক হয়ে বললেন, গিরিশদা। পঞ্চাশের পবই মানুষের বনে এবং বাইজীর কছে যাওয়ার হক্ক হয়। পৃথুব হঠাৎ···· অসময়ে······অবশ্য······

টিকিয়া-উড়ান চালিয়ে হাটচান্দ্রার শহর এলাকা পেরিয়ে এল পৃথু। রুষা বলেছিল, বাড়িতে থাকতে। মিলি-টুসুর সঙ্গে লাঞ্চ করতে, কারণ মহিলা সমিতির কমিটি মেম্বাররা সকলেই এস-ডি-ওর বাড়িতেই লাঞ্চ খেয়ে আসবেন। পৃথু জানে, যে ও কর্তব্য করল না। জীবনে, খুব কম কর্তব্যই ও কবেছে। অস্বীকাব করে না ও ওর অপারগতার কথা। তবু, মনের কোণে কাঁটা কাঁটা লাগে। ও বোঝে যে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ ছাড়া মিলি-টুসুরও কোনো প্রয়োজন হয় না ওকে। বরং ও থাকলে, ওবা অস্বস্তিই বোধ করে। জোরে টেপ-ডেক বাজাতে পারে না। বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রী হতে পারে না।

পবপব তিনটে ভডকা তাডাতাডি খেয়েছে। মাথায় চড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে ও। জীপের স্টীয়াবিং শক্ত হাতে ধরে স্পীড্ বাড়াল। রাস্তাটা এখানে খারাপ। সামনেই নালার উপর একটা কজ্‌ওয়ে। পৃথুর চোখের কোণদুটো জ্বালা জ্বালা করতে লাগল। অনেকদিন কাঁদে না পৃথু। অনেক অনেক বছর। কাঁদতে পারলে হালকা হত অনেক। চোখের জল কোথায় যে পালিয়ে গেছে। কান্নার বদলে বালি। দুঃখ হলে চোখ জ্বালা করে শুধু। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁট। পান খেয়ে ফেটে গেছে ঠোঁটদুটো।

কজ্‌ওয়েটা পেবিয়ে অ্যাকসিলারেটরে পুরো চাপ দিয়ে চড়াইটা উঠতে উঠতে ও জোরে চেঁচিয়ে উঠল ; কুর্চি ! কু-র্চি !

পথের দুধারের ঘন বন জীপের এঞ্জিনের শব্দ ওর গলার স্বরকে শুষে নিল। তারপর কুর্চি নামটাকে পাথুরে লাল-ধুলোয ধূসরিত পথে জীপের টায়ারের নিচে গুঁড়িয়ে দিল। গুঁড়ো গুঁড়ো করে। শুকনো পাতার মতো।

রায়নার বাজারে পৌঁছেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠল ও। কত জোরে গাড়ি চালিয়েছে ও তা কে জানে ? এত অল্প সময়ে কী করে এসে পৌঁছল এতটা পথ। বাজার পেরিয়ে কুর্চিদের বাড়ির নির্জন রাস্তাতে জীপটা ঢোকাল। তারপর কী মনে করে আবার ব্যাক্ করে গিয়ে পান কিনল। জর্দা ! কাঁচা লঙ্কা আর গন্ধরাজ লেবু মেশা ভডকার সঙ্গে জর্দা মিশে যেতেই দুবার হেঁচকি উঠল ওর। তারপর আস্তে এঞ্জিন স্টার্ট করে কুর্চিদের বাড়ির দিকে এগোল।

মোড় ঘুরতেই দেখা গেল বাড়িটা। কদমগাছ দুটো। মস্ত।

একটা মহুয়াগাছের পাশে জীপটাকে দাঁড় করাল ও পথের একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল। ঘড়িতে তখন প্রায় একটা বাজে।

কী লাভ ? কেন যাবে ? যাবে, কার কাছে ? সে তার কে ? ছুটির দিনে মিঞা-বিবি শীতের দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে আতর মাখানো রজাই-এর নিচে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে নিশ্চযই এখন। সে কেন এই সময় ওদের সুখকে বিঘ্নিত করতে যাবে ? জীবনে কাউকেই ও ঠকাযনি আজ পর্যন্ত, জ্ঞাতসারে, কেনই বা ভাঁটুকে ঠকাতে যাবে ?

একটা মন্থর হাওয়া ছেড়েছিল। পাথরে, টাঁড়ে, শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে নিযে যাচ্ছিল সেই হাওয়া। কালি তিতির ডাকছিল টাঁড় থেকে বিষণ্ণতার প্রতীকেব মতো। পথের ডানদিকে থোকা-থোকা কুঁচফল ফুটেছে। কুর্চি কি জানে যে, এখানে লাল-কালো উজ্জ্বল কুঁচফলেব গাছ আছে অনেক ? ওর বাড়ির এত কাছে ? ভাঁটু ত এই পথ দিয়েই বোজ মোটর সাইকেল চালিযে যায়। ভাঁটু কি দেখে না ?

সবাই সব দেখে না। সবাই, সব ভাগ্যিস দেখে না। কুঁচগাছ দেখতে পেলে ত ভাঁটু কুর্চিকেও দেখতে পেত।

কে যেন ওর মাথাব মধ্যে বলে উঠল, কুর্চি, তোমাকে ভালবাসে পৃথু। যাও না তুমি। তুমি গেলে, খুশি হবে ও।

পৃথু হাসল। ভাগ্যিস সেই নির্জন দুপুবেব বনপথে কেউ ছিলো না। একা একা হাসতে দেখলে পাগল ভাবত ওকে। পাগল যে, সেও লোকেব সামনে পাগলামি করতে চায় না। ভাবল, পরস্ত্রীদের ভালবাসা ! ও গেলে, কুর্চি খুবই খুশি হবে হযত। বলবে, আসুন আসুন। কী সৌভাগ্য আমার। বলবে, আজ দই-মাছ রেঁধেছিলাম, রুইযেব কালিয়া। মুগেব ডাল, রুইএর মাথা দিয়ে। বাঁধাকপি, কড়াইশুটি আব আলু দিয়ে লাল কবে। বসুন বসুন। আমি এক্ষুনি গবম কবে দিচ্ছি, ফ্রিজ থেকে বেব করে। পাঁচ মিনিট।

যে ভালোবাসা ফ্রিজে ঢুকে যায়, তা আর গরম হয না কখনও।

খেতে পৃথু ভালই বাসে। তার উপর নিজে হাতে যদি রেঁধে খাওযায কেউ। কিন্তু একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালো যদি বাসে তেমন করে, তবে তাব ভালোবাসার জনেব কাছ থেকে কখনও সখনও দই-মাছ বা তেল-কই ছাডাও আবও কিছু খেতে ইচ্ছে করে। ভগবানেব কাছে প্রার্থনা করে পৃথু, পুরুষের শরীর যেন শত্রুতেও না পায়। পুরুষের শরীরেব মধ্যে যে কত জানোয়ারই ঘুমিয়ে থাকে। কুম্ভকর্ণের মতো শক্তিমান একটি সত্তা যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে ওঠে তখন বড়ই ক্ষিদে থাকে তাব।

কুর্চিকে যেন দেখতে পেল পৃথু। বাবান্দায় এসে একবার ঘুরে গেল। কে জানে ? হয়ত ভুলই দেখল। গিয়ে কি লাভ ? গিয়ে যদি বলতেই হয় কুর্চিকে যে, আমাব ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও ; সে ত ভিক্ষে চাওয়াই হল। নিজের ছেলেবেলায় নিজের বাড়ির কাজের লোক, রান্নাব লোকদের কাছ থেকেও কিছু চায়নি কোনদিন ও। চেয়ে খায়নি কখনও, একটি মাছ, বা একটুকরো মাংসও। মা যেদিন না থেকেছেন খাওয়ার কাছে, সেদিন যা দিয়েছে তাবা তাইই খেয়ে উঠে গেছে। ক্ষিদে পেয়েছে কী পায়নি তাইই যে মানুষ অন্যের মুখ দেখে বুঝতে না পারে, তার কাছে কি কিছু চেয়ে খাওয়া যায় ?

ঘুম ঘুম পাচ্ছে পৃথুর। ঝরনার মতো ঝরাপাতা বয়ে যাচ্ছে দুপাশ দিয়ে। জীপটা যেন নৌকো একটা।

হঠাৎই মনে পড়ে যে, জীপে ওঠার সময় কী একটা দিয়েছিল ভুচু জীপের কাঁচমোছা হলুদ বঙা কাপড়ে মুড়ে, ড্যাশবোর্ডের পকেটে। ডান হাত দিয়ে খুলল প্যাকেটটা। একটা পাইন্টের বোতলে জল দিয়ে লেবু দিয়ে তৈরী করে দিয়েছে ভড্‌কা।

খাবে ? যখন আর খাওয়া উচিত নয় বোঝে ; ঠিক তখনই আরো খেতে ইচ্ছে করে।

খাবে না ত কী করবে ? আর কী করার আছে ওর ? বোধ যখন বড তীব্র হয়, ছুরির ফলার মতো, কুরে কুরে খায় ভিতরটা তখন তাকে ভোঁতা করার এই-ই ত সহজ পথ।

কুর্চির শোবার ঘরের বিছানায় লেপের মধ্যে ওম্। আতরের গন্ধ। কুর্চির মাথার গন্ধ তেলের

গন্ধে সব মাখামাখি হয়ে গেছে। মাথার কাছের খোলা জানালা দিয়ে একটু রোদ আর টাঁড়ের গায়ের দুপুরের গন্ধ এসে ঢুকছে বিরহী কালি-তিতিরের ডাকের সঙ্গে, কুর্চির ঘরে।

ভাঁটুর গায়ের গন্ধটা কেমন ? নিশ্চয়ই বিচ্ছিরি ! হবেই। হতে বাধ্য। ভাল্লুকের গায়ের গন্ধর মতো কি ? নাকি, হায়নার গায়ের গন্ধর মতো ?

কে জানে ? এসব ভেবে লাভই বা কি ? কুর্চি তার কে ? কুর্চি ত ভাঁটুরই বিবাহিত স্ত্রী। বিবাহ ! উদ্দালকের ছেলে শ্বেতকেতু প্রথম বিবাহপ্রথা চালু করেছিলেন না ? থাক্ সে সব কথা এখন নয়। পাইন্টের বোতলটা থেকে সোজা গলায় ঢালল পৃথু। দাঁত দুটো টকে আসছে। টক টক লাগছে গলা। সাড়, অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

বেলা পড়ে আসছে। মেয়েদের ভালবাসারই মতো শীতের বেলা ঝুপ করে সরে যায় ; মরে যায়। জানান না দিয়েই। হাওয়ায় হিম। কিন্তু ভড়কা খাওয়ার জন্যে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ আবার স্টার্ট করল এঞ্জিন। ফারস্ট গীয়ারে দিয়ে. কুর্চির বাড়ির সামনে গেল। বাড়িটা পেরিয়ে গেল। হর্ন দিল একবার। ভাঁটু বেরিয়ে বারান্দায় এল। চুল উস্কোখুস্কো। মুখ ফোলা। ভুঁড়িটা তরমুজের মতো বেরিয়ে আছে। জীপটা ফেরালো পৃথু। ও বুঝল ওর হাত থেকে স্টীয়ারিং ফসকে যাচ্ছে। প্রচণ্ড নেশা হয়ে গেছে ওর। "না পীনা হারাম হ্যায়, না পীলানা হারাম, পীকে হোঁসমে আনা হারাম হ্যায়।" জীপটা ঘুরিয়ে যখন আবারও গেটের কাছে এল ও, তখন দেখল ভাঁটু নেই। ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ফাঁকা। সব ফাঁকা। পৃথুর মধ্যেটাও ফাঁকা।

বোকার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল খোলা চোখে। এমন সময় বাগানের দিক থেকে দাঈকে আসতে দেখা গেল। তেলমাখা ভিজে চুল মাথার উপরে চুড়ো করে বেঁধেছে। মনে হচ্ছে, যেন কোনো বাঙালী বোষ্টমী। একী। দাঈ যে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে। অথচ. যে চিনলে খুশি হত, সে জানতেও পেল না ওর আসার কথা।

সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিন স্টার্ট করল পৃথু। দুগ্ধপোষ্য শিশু নয় ও যে, দাঈয়ের দরকার আছে কোনো। না দাঈ। বাঈ ! বাঈ !

এবার আবার ফিরে চলল হাটচান্দ্রার দিকেই। মসজিদের পাশের সেই বাড়িটির একটি ঘরের দিকে, যেখানে একদল পুরুষ বসে আছে ঘন হয়ে। যারা বনের বাঘেরই মতো পুরুষ। নারী সঙ্গ করেছে, নারীকে সন্তান দিয়েছে ; কিন্তু নিজেদের নিজস্বতা, স্বাধীনতা কিছুই বাঁধা দেয়নি পৃথিবীর নারী জাতির কাছে। নারীকে ছাড়াই যে খুব সহজে বাঁচা যায়, তা সেই পুরুষরা নিজেরা নিজেদের জীবনে বেঁচে দেখিয়েছে। প্রমাণ করেছে।

কিন্তু বাঁচা কি সত্যিই যায় ? বনের বাঘও কি পারে ? শালা আদম। একবার তার চেহারাটা জানা থাকলে ফোর-সেভেনটি-ফাইভ ডাবল-ব্যারেল, রাইফেলের সফ্ট-নোজেড বুলেট পুরে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিত। পৃথিবীতে এত খাবার থাকতে কেউ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে যায় ?

আবারও জঙ্গলে এসে পড়ল জীপটা। ঠাণ্ডা লাগছে। একদল চিতল হরিণ লাফিয়ে রাস্তা পেরোল। লাফিয়ে নয় ; উড়েই। সেদিকে তাকিয়ে ছিল পৃথু। হঠাৎই দেখল বাঁকের মুখে একটা কয়লা-বোঝাই ট্রাক। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেল ও। ট্রাকের পেছনে দাঁড়ানো কুলিরা অকথ্য গালাগালি করে উঠল পৃথুকে। জীপটা আস্তে করে পথের বাঁদিকে একটি বুড়ো পলাশের নিচে রাখল। স্টার্ট বন্ধ না করে পাইন্টের বোতলটা শেষ করল।

কে যেন বলল, মাথার মধ্যে থেকে, পৃথু তুমি মরে গেছিলে। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলে এই মাত্র।

আবার অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল ও। নিজে নিজেকে বলল, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে তফাৎ চিরদিনই ত এক চুলেরই। আমি ত মরতেই চাই। যে বেঁচে নেই, সে নতুন করে মরবে কী করে ?

এবার জীপটা এরোপ্লেনেরমতো চলছে। আঃ। কী হাওয়া। ঠাণ্ডা হাওয়া। মা যেন হাত রাখলেন কপালে। বললেন, খোকন, একী তোর গাটা গরম গরম লাগছে ? মা চলে যাওয়ার পর আজ অবধি কেউ কপালে হাত রাখেনি ওর। জ্বরের মধ্যেও না।

হিঃ। হিঃ। ইডিপাস কমপ্লেক্স ? স্বাভাবিক ব্যাপাবেব যত্তসব অস্বাভাবিক ব্যাখ্যা। মা ছেলেকে ভালবাসবে না ত কী রুষা ইদুবকাবকে ভালবাসবে ? কুর্চি, পৃথুকে ? ফানী!

বাসে না। ভাল সে বাসে না। কুর্চি, একটুও ভালবাসে না পৃথুকে। ও শুধু কথাব ভালবাসা, চোখেব ভালবাসা, দই-মাছ আব তেল-কই-এব ভালবাসা, সুন্দব চিঠিব ভালবাসা। শুধু ওইটুকু ভালোবাসা নিয়ে একজন অভাবী পুরুষ বাঁচতে পাবে না। দিগা পাঁড়ে যেন কী একটা দোঁহা বলে। দোঁহা ? না মানসমুক্তাবলী ?

জিয বিনু দেহ, নদী বিনু বাবী
তৈসি অ নাথ পুরুষ বিনু নাবী ॥

প্রাণ বিনা দেহ, জল বিনা নদী যেমন, নাবী বিনা পুরুষও তেমনই।

নাবী ত আছে সব পুরুষেবই। সব নাবীবই আছে পুরুষ। তবুও, এত কষ্ট কেন ? কষ্ট কি পৃথুব আব রুষাবই ? না কি কষ্ট সকলেবই ? বাঘবন্দীব ঘবে সকলেই কি সুখে আছে বেশ ? বব-বব, বৌ-বৌ খেলা, ছেলে-মেযে, ছেলে-বৌ, মেযে-জামাই, নাতি-নাতনী, নাতবৌ-নাতজামাই। অবশে পুতিও। আবাব পুতি-বউ, পুতনি-জামাই চলেছে এইই আবহমান কাল ধবে। অভ্যেস। অভ্যেস। অন্ধ পুতুল খেলাব অর্থহীন অভ্যেস।

গাঁ-আ আ-আ-কবে ধেযে এল একটা বাস। নীল-বঙা- মালঞ্জখণ্ড যাচ্ছে হাটচান্দ্রা থেকে। পথ ছেড়ে বাঁদিকেব পাথুবে জমিতে নামিযে দিল কোনোক্রমে জীপেব চাকা দুটো পৃথু। খাদে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল, সামান্যব জন্যে।

কে যেন মাথাব মধ্য থেকে আবাব বলে উঠল পৃথু, তুমি এক্ষুনি মবে যাচ্ছিলে।

পৃথু হাসল, না বলে বলল, যে মবতে চায, মৃত্যু তাকে ছোঁয না। যে বাঁচতে চায মৃত্যু বাঘেব মতো তাবই ঘাড়ে এসে পড়ে। আজও ত মবল না ও। মবলে একদিন এমনি কবেই মববে। নিজে নিজে। নিজেব গাড়ি নিযে। অন্যেব গাড়ি ভাঙবে না, অন্যেব গাযে আঁচড় লাগাবে না। গাড়িব স্টীযাবিং এ বসে নিজে নিজে মবাব অনেকই পথ আছে। গিবিশদাব ভাষায, মবলে গদ্দাম আওযাজ কবেই মববে, ধুঁযোব মতো উড়ে যাবে এক লহমায কুকুবেব মতো কেঁই কেঁই কেঁই কবে কাঁদবে না মবাব সময। কাবো কাছেই না। রুষা, মিলি, টুসু, এমন কী কুর্চিব কাছেও না। একটা মানুষ ভিতবে ভিতবে যে কাঁদছে, তা যদি মাযেবই মতো কেউ সত্যি সত্যি কাঁদাব আগে নাইই বুঝতে পাবল তাহলে সেই মানুষদেব কাছে নিজেকে ছোট কবতে যাবেই বা কোন দুঃখে ? বাইবেব কান্না ত চোখই কাঁদে। পৃথুব এ কান্না যে সে কান্না নয এ যে বুকেব মধ্যে বক্তক্ষবণ। এই বোবা কান্না বুকে কবে যাবা কাজ কবে, কর্তব্য কবে হাসে নেমন্তন্ন খায তাদেব বড়ই কষ্ট। সত্যিই বড় কষ্ট। কজন আব সত্যি সত্যিই কেঁদে ভাবী দমবন্ধ এই বোবা পাথবেব ভাব থেকে মুক্ত কবতে পাবে নিজেকে।

সাবীব মিঞাব বাড়িব সামনে যখন এসে পৌঁছল তখন বেলা প্রায তিনটে। খানা জমে উঠেছে পৃথুকে দেখে গিবিশদা বুঝতে পাবছিলেন বললেন বোসো বোসো, ঐ আবামকেদাবাতে বোসো তোমাব এই অবস্থায নিজে জীপ চালানো উচিত হযনি।

বহত বুড়হা কাম আ্যাযসা কভভী নেহী কবনা চাইযে পৃথুবাবু।

সাবীব মিঞাও বকলেন

পৃথু আবাম কেদাবায পুবো এলিযে দিতে চাইল না শবীব। এলিযে দিলে আব উঠতে পাববে না

সাবীব মিঞা নিজে হাতে বড় দস্তবখান থেকে বেব কবে লাল নীল ফুল আঁকা এনামেলেব বেকাবীতে কবে বিবিযানী, তরুব, একটু বাখবখানি বোটি, ভোপাল থেকে আনিযেছেন এবং বেজালা তুলে দিলেন বললেন খান। এব পব ফিবণী দেব।

একটা জিনিস লক্ষ্য কবেছে পৃথু ওব মুসলমান দোস্তদেব খানাপিনাতে টক-এব কোনো পদ থাকে না। সাবীব মিঞা একদিন বলেছিলেন যদি মস্ত হযে বাঁচতে চান জিন্দা দিল হযে হবওযাক্ত মস্তীতে থাকতে চান তবে পেযাজ বসুন, লঙ্কা এইই খাবেন পুরুষ মানুষদেব টক খাওযা মানা।

হিন্দুদের যদিও মোটে একটি করেই বিবি। তবুও বেশি টক খেলে সে বিবিও পালিয়ে যাবে। বলতেন, বিবিকে টক খাওয়াবেন বেশি করে। নিজে একদম খাবেন না।

যত্ত সব। মনে মনে রাগ হচ্ছিল পৃথুর। কেন জানে না, ওর শরীরের মধ্যে হঠাৎ শয়ে শয়ে কাঁকড়া নড়াচড়া করতে আরম্ভ করেছে। সকাল থেকে। বেশি পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা ভড়কা এসব খেয়েই কি হল ? সে ত খাচ্ছে ছোট্টবেলা থেকেই। তাব বাবাও খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি মুসলমান ছিলেন। জীবনযাত্রার রইসীতেও অনেকখানি। পানের পিক ফেলার পিক্‌দান থেকে শুরু করে, পার্সিয়ান গালচে। সুর্মা থেকে শুরু করে জড়িমোড়া আলবোলা, বাদ ছিলো না কিছুই। পৃথুরও হারেম থাকা উচিত ছিল। এই চখা-চখির মতো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর মতো নির্জন চরের মধ্যের ঘরে দিগন্তের নদীব নীলাঞ্জনে চোখ ভরে খঞ্জনী বাজিয়ে দিন কাটানোর রক্ত নিয়ে সে জন্মায়নি।

হায় রক্ত ! মানুষ নিজের রক্তকে ছাপিয়ে উঠতে কেন পারে না। কিসেব শিক্ষা তাহলে তার ? কিসের পারিপার্শ্বিকতার গর্ব ? তার মায়েব রক্তের সমস্ত সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি, দয়া, গান, কবিতা, গভীবতা, ভালবাসা, অভিমান, সব মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যায় তাব বাবার রক্তের স্থুল দুর্মর ব্যাপারগুলোতে। মুখে বলল, নাঃ।

নাঃ। ফিরে এসে, অমন খানা মুখে দিয়েও শান্ত লাগছে না নিজেকে একটুও। আগুন নিভছে না। কী যে করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

কী হল ? পৃথু ভাযা ? তোমাব আজ হয়েছেটা কি ?

বাঘ জেগেছে আজকে ; বাঘিনী চাই।

মনে মনে বলল ও।

যে-সব কথা জীবনের শিকড় অবধি গিয়ে পৌঁছয় অথবা জীবনের শিকড় থেকেই যেসব কথা উঠে আসে, তা খুব অল্প লোককেই বলা যায়।

তাড়াতাড়ি খেযে নিতে চেষ্টা কবল। কিন্তু পারল না। বমি বমি লাগতে লাগল ওব। উঠে বলল, আমি বাড়ি যাব। শবীর খাবাপ লাগছে আমার।

সকলেই উদ্বিগ্ন হলো। গিরিশদা বললেন, আমার গাড়ি নিয়ে যাও। ড্রাইভার আছে। যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয বা ডাক্তাব ডাকতে হয়, তাহলে গাডি রেখে দিও তোমাব যতক্ষণ খুশি। আমাকে ভুচু পৌঁছে দেবে।

কথা বলাবমতো অবস্থা ছিলো না তখন। হাত তুলে দেখাল ও, আচ্ছা। তারপর গিয়ে ড্রাইভারেব পাশে বসল।

বাড়ির সামনে গাড়িটা নেই। রুষা কি ফেরেনি এখনও ? আজ সে তার বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে বিবাহেব প্রধানতম শর্ত পালন কবাব কথা বলবে। "ইজ ম্যারেজ লিগালাইজড প্রস্টিট্যুশান ?" রিয্যালী ? কোথায় যেন পড়েছিল কথাটা।

বেল টিপতেই রুষাই এসে খুলল।

কি হয়েছে তোমাব ? উদ্বিগ্ন গলায় বলল, রুষা।

মিলি, টুসু, গাড়ি কোথায় ?

ওরা স্কুলেব ফেট এ গেছে।

মেবী, দুখী ওরা ?

ন্যাকামি কোরো না। জানো না, এখন ওদের রেস্ট করাব সময়। কেন ? কি দরকাব তোমার ? কি চাই ? খেয়ে এসেছো ?

হুঁ।

কি চাই ?

চাই চলো, তোমাব বেডরুমে চলো।

ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল রুষার মুখে। আমাব বেডরুম ? হঠাৎ। কেন ? আমার বেডরুমে তোমার কি চাই ? তুমি ত বাঘ। বাঘেদেব ত বেডরুম দরকার হয় না।

অত কথা বলার এবং শোনার সময় নেই এখন পৃথুর। রুষার আগে আগেই ও রুষার বেডরুমে গিয়ে পৌঁছল। খাটে শুয়ে পড়ল। বেডশীট দিয়ে ঢাকা বিছানার উপর। জুতো খুলে রাখল গোল হালকা নীল কার্পেটে। রুষা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল তীক্ষ্ণ চোখে।

বলল, কি হয়েছে তোমার ? কি চাই ?

তোমাকে। রুষা। তোমাকে একটু চাই। এসো।

রুষা না এসে, জানালা দিয়ে বাগানে চেয়ে রইল। পেয়ারা বনে টিয়ারা মারামারি করছে। পেয়ারা ঠুকরে ফেলে দিচ্ছে নিচে। জোড়া বুলবুলি ডাকছে রঙ্গনের ঝাড়ে বসে। ভালোবাসায় ঝাপটা ঝাপটি করছে। ঘুঘু দম্পতি ডাকছে সপ্রেম, গভীর স্বরে।

রুষা কাছে এলো না দেখে পৃথু খাট থেকে কষ্ট করে উঠে রুষার কাছে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রীর মতো ভয়ে ভয়ে জড়িয়ে ধরল।

এক ধাক্কা দিয়ে রুষা ওকে খাটে ফেলে দিল।

খাটের বাজুতে মাথা ঠুকে গেল পৃথুর। বলল, উঃ।

কী ভেবেছো তুমি আমাকে ? স্বামীর পবিচযটুকু ছাড়া, আমার কাছে তোমার আব কোনো দাম নেই। আমি কি তোমার ঝি ? না রক্ষিতা ? ন মাসে ছ মাসে তোমার যখন হঠাৎ ইচ্ছা হবে তখন ...। না, আমি তেমন নই। ব্যাপাবটা মনেব ব্যাপার। শরীরের নয়।

ভাবল বলে, তাইই ত। আমি ত তাইই বলি। মন থেকে যে তোমাকে চাইতেই ইচ্ছে কবে না আমার। তাইই ত চাই না। কিন্তু তবু...

মুখে কিছুই বলতে পাবল না, বলল, উঃ।

লেগেছিল খুবই মাথায়।

আবারও ও হাত বাড়িয়ে বলল, এসো, এসো, একটু এসো, প্লীজ...

রুষা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, কেন ? আমার কাছে কেন ? কুর্চির কাছে যাও। বাজারের প্রস্টিট্যুটের কাছে যাও। যেখানে খুশি যাও। আমি কি চাই, কখন চাই তা নিয়ে তোমার কোনোদিনই কোনো মাথাব্যথা ছিল ? তোমাব যখন নেই, আমাবই বা থাকবে কেন ? বেবিয়ে যাও তুমি এখান থেকে। গেট আউট।

তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

হ্যাঁ। তুমি গেলে আমি বাঁচি। আমার ছেলেমেয়ে বাঁচে। তোমাব এই অদ্ভুত অসামাজিক অসুস্থ জীবনযাত্রা কোনো রেসপেকটেবল লোকের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। এখান থেকে যাও, তবে প্রতি মাসে টাকাটা ঠিক ঠিক দিতে হবে। মাইনের সব টাকা।

উঠে বসে পৃথু বলল, কেন ? চলে যাব, তাহলেও·

কেন আবার কি ? আমার বাড়ি এটা। আমার রাইট আছে তোমাকে তাড়িয়ে দেবার। তুমি কোম্পানীর গেস্ট হাউসে গিয়ে থাকো। টাকা দেবে, কারণ ছেলে মেয়ে আছে। ছেলেমেয়ে হবার সময় মনে ছিলো না ? বিয়ে করেছিলাম আমি একজন রেসপেকটেবল ফরেন-ট্রেইনড এঞ্জিনীয়ারকে। একজন ব্যালান্সড মানুষকে। ব্যর্থ কবি, বনের বাঘকে আমি বিয়ে করিনি। তোমার আসল—তুমি কে জানলে, কোনোদিনও বিয়েই করতাম না তোমাকে। আর কথা নয়। চলে যাও।

পৃথু বিড় বিড় কবে উঠল। তারপর মাথা নিচু করে জুতোটা পরল বহু কষ্টে। নিজেব স্ত্রীকে অনেকেই রেপ্ করে বলে শুনেছে পৃথু। তারা হয়ত অন্য মেয়েদেরও রেপ্ করতে পারে। পৃথু সে কথা ভাবতে পারে না। জোর করে ? জোব করে জীবনে লজ্জা পাওয়া যায়, গ্লানি পাওযা যায়, কোনো আনন্দই জোর করে কি পাওয়া যায় ?

গিরিশদার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার ওকে দেখেই এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। পৃথু বসে বলল, চলো।

কাঁহা, সাহাব ?

কাঁহা ? বলেই, চুপ করে গেল পৃথু।

কোথায় যাবে ? যাওয়ার যায়গা ত ওর কোথাওই নেই। বন্ধু বলতে যা বোঝায়, যাকে জীবনের সব কথা অকপটে বলা যায় ; তেমন বন্ধুও তার একজনও নেই। দু একজন ছিল। ইঁদুরকারেরই মতো,তারাও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রিয়তম বন্ধুদের মুখোস খুলে গেলে, তাদের গভীর ঈর্ষাপরায়ণ শত্রু বলেই চিনেছে। তার জঙ্গলের বন্ধুরা রাইফেল-বন্দুক বোঝে, বাঘ মারার সাহসের কথা বোঝে, একজন মহিলার কাছে এমন করে হেরে যাবার মতো ভীরুতার কথা তাদের কাছে বলা যায় না। তাছাড়া, তাদের জঙ্গুলে বুদ্ধিতে তারা বুঝতেও চাইবে না যে দোষটা রুষার নয়, দোষটা পুরোপুরিই ওর। একজন মানুষ জীবনে যা-কিছুই পায় অথবা পায় না, তার কৃতিত্ব বা দায়িত্ব তার নিজেরই। অনুকম্পা চায় না, সমবেদনা চায় না সে কারো কাছেই ; তাইই ত তার মুখ-ভরা হাসি সব সময়। নিজেকে তবু ছোট করলেও করতে পারে, তা বলে রুষাকে ছোট করবে কি করে ? রুষা যে তব থেকে সবদিক দিয়েই ভাল। দোষ ত সব পৃথুরই। মস্ত দোষ। ও সাধারণ হতে পারল না, অন্য দশজনের মতো হতে পারল না।

কাঁহা যাইয়েগা সাহাব ?

চলো, সিধা চলো।

রুষা বলেছিল, "তোমার আসল-তুমিকে জানলে তোমাকে কখনও বিয়ে করতাম না।"

ভালোই বলেছে। আসল-তুমি ! আসল-আমি, আসল-তুমিকে কেইই বা চেনে জানে? এই আমি-তুমি ত প্রতিমুহূর্তেই বদলে যাচ্ছি। জন্তু জানোয়ার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুধু আয়তনে বাড়ে, গায়ের জোরেই বাড়ে। কিন্তু মানুষ ? এই বিচিত্র প্রাণীর মন বলে যে বস্তুটি আছে সেই মনের ঊর্ধ্বগতি অধোগতি, তার বিবর্তন, পরিবর্তন এমনভাবে ঘটে যে ; তার মালিকের পর্যন্ত তা জানবার উপায় থাকে না।

কোথায় যাবে ? শ্বশুরবাড়ি ?

সব বিবাহিত মানুষেরই একটি করে শ্বশুরবাড়ি থাকে। সেখানে জামাই বা ভগ্নীপতি গেলে আদর-যত্ন, ভালোবাসা ফ্রিজ খুলে সহজে বের করে দেওয়া হয়। ইনস্ট্যান্ট ভালোলাগা ; কফির মতো। পৃথুর তাও নেই। রুষার যে দুজন কাজিন আছে তারা এখন কেউ-কেটা হয়ে অতীতকে ভুলে গেছে। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিন্তু অতীতের স্মৃতি বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে কৃতজ্ঞতা বোধ। শুধু মানুষের মধ্যেই এসব তামাদি।

আভভি কাঁহা ?

আবাব শুধোল গিরিশদার ড্রাইভার। বাজারের মোড়ে এসে। অন্ধকার হয়ে এসেছে। পৃথুর মাথাব মধ্যের অন্ধকারেরই মতন।

তোমার নামটা কী যেন ভাই ?

শ্রীকৃষ্ণ। ড্রাইভাব বলল।

মুখে বলল, বাঃ। বাঃ।

শ্রীকৃষ্ণকেই ত দরকাব ছিল এই মুহূর্তে। সারথী ! তুমি যেখানে হয় নিয়ে চলো। অর্জুন আর যুদ্ধ করবে না। তার পরমাত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না সে। তারা তাকে যতই মারুক, বকুক, ব্যথা দিক ; তীর ছুঁড়ুক বুকে।

মনে মনে বলল।

কাঁহা সাহাব ? গাড়িটা মোড়ের মাথায় দাঁড় করিয়ে রেখে শ্রীকৃষ্ণ আবারও বলল।

শরাবকা দুকান্। রঘু শাহকা দুকান। পানিকা ট্যাঙ্কিকি পাস্।

আপ ঔরভি পীজিয়েগা সাহাব ? আপকি তবিয়ত গড়বড়াগিয়া। এর নহী পীনে চাহিয়ে সাহাব।

বাত্ মত করো। রঘু শাহকা দুকান।

জলের ট্যাঙ্কির নিচের মাছওয়ালারা তখনও দু একজন বসে আছে। ছড়ানো-ছিটোনো বরফ-চাপা দেওয়া শাল সেগুনের পাতা। আঁশটে গন্ধ। গাড়িটা দাঁড়ালো।

রুপাইয়া হ্যায় তুমহাবা পাস ?

পৃথু শুধোল।

কাহে সাহাব ?

ভড়কা লাও। বড়া বুত্তল্ এক। রূপাইয়া নেহি হোনেসে, হামারা নাম বোলো ; অ্যাইসাহি দে দেগা।

ভুড়কা ?

আর্‌রে ভুড়কা নেহী, ভড়কা।

সফেদ্, বড়কা ? পানিকো মাফিক।

হাঁ। হাঁ। তুম ত সবহি জানতা।

নেহী সাহাব। উ ত গাড়িমেই পড়া হ্যায়। দো বুত্‌ল্। বাবু লেতে আয়েথে ইকসট্রা। কম্মী হোনেসে...।

ওয়াহ্। ওয়াহ্। তব্ ত মজা আ গ্যয়া। লাও। এক বুত্তল লাও।

গিলাস ত নেহি হ্যায় সাহাবসাথমে।

গিলাস সে কেয়্যা হোগা। জেহর কোঈ গিলাস্‌মে পীতে হেঁ থোরী ! বিষ কে আর গেলাসে করে খায় হে ! আভ্‌ভী যাও। পান লাও হামারা লিয়ে। ইকশ-বিশ। জর্দা ভি। চার পান।

জী সাহাব।

বলেই নেমে গেল শ্রীকৃষ্ণ।

বোতলটা খুলে ঢক্‌ঢক্ করে ঢেলে দিল মুখে। জ্বালা জ্বালা ! কণ্ঠনালী, লিভার, কেউ যেন সুতীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে কেটে দিল। খুবই কষ্ট। কিন্তু এ কষ্ট, এ খবাবী, কুর্চি আর রুষা দুজনেরই দেওয়া দুঃখেব কাছে কিছুই নয়। হায় ! তোমবা যদি কখনও জানতে, পৃথু তোমাদের কতখানি ভালবাসে। প্রত্যেকের ভালবাসার বকমই আলাদা হয়। আলাদা আলাদা পুরুষ তাদের আলাদা আলাদা ভালোবাসা ! তোমাদেব কত বুদ্ধি। কিন্তু দুহাতে তোমাদের সব বুদ্ধি জড়ো করেও পৃথুকে তোমবা দুজনে কেউই বুঝতে পাবলে না। পাবলে না

এবার কোথায় যা‸ে ? রাত মোহানাতে গিয়ে বসে থাকবে একা যতক্ষণ না বেহুঁস হয়ে যায় ? "পীকে হোঁসমে আনা হারাম হ্যায় !"

এমন সময় গাড়ির পাশে কে যেন এসে দাঁড়াল।

বলল, সাহাব !

কওন ?

জলের ট্যাঙ্কির ছায়া পড়েছে এখানে। আধো-অন্ধকার । প্রথমে চিনতে পারলো না লোকটি‸কে পৃথু। ম্যায় সারেঙ্গীওয়ালা। বিজলী বাঈজীকো ইযাদ ত হ্যায় না ?

বিজলী। হ্যাঁ হ্যাঁ বিজলী। জরুর। জরুর ইয়াদ হ্যায়।

চালিয়ে না হুজৌর। আজ তেওহাবকা ওজেসে মেহমান কোঈ আনেওয়ালা ভি নেহী। আপ চালিয়ে। বড়ী খুশি হোগী বিজ্‌লী।

খুশি হবে ? পৃথুকে দেখে খুশি হবার মতোএখনও আছে তাহলে কেউ ? ঈ ক্যা খশ্‌নসীবী বাত্।

পৃথু মনে বলল, গাড়িমে বৈঠো। চালুঙ্গা।

ড্রাইভার শ্রীকৃষ্ণ এসে পান দিল। জর্দার সঙ্গে নীট্ ভড়কা মিশে গিয়ে প্রাণটা তক্ষুনি বেরিয়ে যাবে মনে হল পৃথুর।

সারেঙ্গীওয়ালাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণর পছন্দ হল না।

পৃথু বলল, বাইজীর সঙ্গে সারেঙ্গী বাজায় এ। দ্যাখোনি, সেই রাতে গিরিশদার বাড়িতে ?

আপ্ কিদার যাইয়েগা সাহাব ?

জাহান্নাম্ !

আপ্‌কি লায়েক আদমীকো ছুঁয়া যানা নেহী চাহিয়ে।

হেসে উঠল পৃথু। হামারা লায়েক ? হাম কওনসী বড় আদমী হ্যায় ?

আপ বহত মানী আদমী হ্যায় সাহাব। সোসাইটিমে আপকি কিত্না ঈজ্জৎ।

সোসাইটি ! আবারও হেসে ফেলল পৃথু। সোসাইটির কাছ থেকে তার কিছুই চাইবার নেই। এই সোসাইটি ? সোসাইটি, রুষাদেব আর ইদুরকারদের জন্যে। ও চিরদিনই আনসোশ্যাল ছিল। এখন অ্যান্টি সোশ্যাল হয়ে যাচ্ছে। বাঈজীব কাছে গিয়ে তার গান শুনে, শরীর ছেনে নিজেদের ভিতরের গভীবে নিহিত পাপবোধকে ক্ষালন কবতে ত যায় গুণ্ডা, বদমাস, আর বেহড়ের ডাকাতরাই। সমাজ যাদেব জায়গা দেয়নি। যারা বাগী হয়ে গেছে ; সমাজেব উপর তীব্র অভিমানে যারা সমাজের উপর প্রতিশোধ নিতে যায় এসব জাযগায়। কেউ খুন করে বাগী হয় গোয়ালিয়রে, ভিন্দ্-এ ; মোরেনায়, চম্বলের বেহড়ে, আবার পৃথুর মতো বাগী হয় কেউ কেউ, বিনা রক্তপাতে খুন হয়ে গিয়ে।

চলো শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন কী কববে জানে না। শ্রীকৃষ্ণ, তুমি জাহান্নমে নিয়ে গিয়ে মুক্ত করো তাকে।

বিজ্লী বোধহয় সাজগোজ করেনি আজকে। আজকে ওর রেস্ট-ডে। সারেঙ্গীওয়ালা মিনিট দশেক বসিয়ে রাখল ওকে ফরাসের উপব। তাকিয়া আছে, ছড়ানো ছেটানো। দেওয়াল-জোড়া আয়না। বাসি লাল গোলাপ। আতর আর ধূপের গন্ধ ঘরে। দেওয়ালে, বুক-খোলা একজন ফিল্মেব নায়িকার ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার।

বড় ঘুম পাচ্ছিল পৃথুর। তাকিয়াতে হেলান দিলেই ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ঘুমোবে ঠিকই, তবে এখন নয়। ওব শরীরের মধ্যেব কাঁকড়াগুলোকে ছেড়ে দেবে বিজ্লীর শরীরে। তখন শান্তি। গভীর শান্তি। বড আরামের ঘুম ঘুমোবে তখন। ওর কোনো দোষ নেই। রুষা ত বলেইছে যেখানে খুশি যেতে ওকে। যা-খুশি করতে। নষ্ট হয়ে যেতে বলেছে ওকে। নষ্টই হয়ে যাবে ও।

বিজ্লী এসে আদাব্ করল। বলল, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ !

পৃথু বলল, ভড্কা খাবে ?

না।

আপনি এসেছেন। আপনিই ত আমার জওয়ানীর সবচেয়ে কিম্তি শরাব। গান শুনবেন ত ?

শোনাও।

তাড়াতাড়ি সারেঙ্গী বাঁধা হল। তবল্চি ঘুমিয়ে ছিল তেওহারের দিনের ভারী খানা খেয়ে। তাকে ঘুম থেকে তুলে আনা হল। বিজ্লী গান ধরল। একটি ঠুঙরী। এই ঠুংরীটি অনেকদিন আগে হীরাবাঈ বরোদাকারের গলায় শুনেছিল, ভোপালে, এক রইস্ আদমীর ঘয়োয়া ম্যায়ফিলে। আজ ম্যায়ফিল নয়। শুধু পৃথুরই জন্যে বিজলী গাইছে। গান দিয়ে রূপ দিয়ে পৃথুকে বিদ্ধ করবে বলে। কিন্তু পৃথু আজ বিদ্ধ হতে আসেনি। বনের বাঘের জমিয়ে রাখা পাহাড়-প্রমাণ তীব্র কাম দিয়ে বিজলীকেই বিদ্ধ করবে বলে এসেছে। নিজেকে ভারশূন্য করতে। নিঃশেষ হতে। অশেষের লীলায় মেতে উঠবে ও আজ ওর জংলী উদ্দামতায়। ফুরিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে ভরে নেবে নিজেকে এই লীলাতে।

গাইছিল বিজ্লী। "মেবা সাঁইয়া বুলাঁওয়ে আঁধি রাতি, নদীয়া বৈরী বঁহি..."

শুনরে মালা হো তেরী ছেরী নইয়া লাগা দে পারে..."

আহা ! কী গান। ভডকার শিশিটা প্রায় শেষ করে আনল পৃথু। ওর মাথার মধ্যে এখন বাস্তারের বাইসন হর্ন মারিয়াদের নাচের মাদল বাজছে। শিরায় শিরায় জঙলী কুকুরের মতো রক্ত-পিপাসু রক্ত ছুটোছুটি করছে। বিজলীকে আজ নরম নধর কোনো বনহরিণীরই মতো নিঃশেষে খাবে ওরা। চেটে-পুটে, খুঁটে খুঁটে, কিছুমাত্র বাকি না রেখে।

গান থামলে, বিজ্লী আরেকটি গান ধরবার জন্যে তৈরী হল। পৃথু হাত তুলে বারণ করল। বিজ্লী, সারেঙ্গীওয়ালা এবং তবলচি সবাইই অবাক হয়ে তাকাল পৃথুর দিকে।

পৃথু আঙুল তুলে ভিতরের দরজার দিকে দেখাল।

অবিশ্বাসে চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল বিজ্লীর। মাথা নিচু করে ফেলল। চোখের ইঙ্গিতে

ওদেব যেতে বলল। তারপর হাত ধরে টাল-মাটাল পৃথুকে নিয়ে গেল ভিতরের ঘরে। খাটে, ওকে শুইয়ে মাথার কাছে বসে কপালে হাত দিল। চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল। নাকের রোমকূপে-কূপে কালো কালো বিন্দুর মতো ময়লা জমেছিল। নাক টিপে সেই ময়লা তুলে দিল। তারপর আতর মাখানো রুমাল এনে নাক পরিষ্কার করে মুছে দিল।

পৃথু হঠাৎ উঠে বসে বাঘ যেমন করে হরিণের মাংস ছেঁড়ে তেমন করে কামড়ে চুমু খেল বিজ্‌লীকে।

যন্ত্রণায় বিজলী বলল, উঁ-উ-উ…জংলীপন্।

হাঁ। ম্যায় জংলীই হুঁ বিজলী। বিল্‌কুল্ জংলী।

পৃথু ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমার আমার মধ্যে কোনো আড়াল চাই না আমি। ওঃ বিজ্‌লী। আমাব কিন্তু পয়সা নেই। তুমি …

ওর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে বিজ্‌লী বলল, এত্তদিনে এইই বুঝলে আমাকে ! সব ব্যবসাদারই টাকা কামায়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই এমন এমন সম্পর্ক থাকে যেখানে তাবা না নিয়ে কিছু দিতে পেবেই ধন্য হয়। তুমি আমার সেইই। পয়সা দিয়ে সকলেই আমার শরীরটাকে কিনতে পারে। মনটা কেনা-বেচার বাইরে। তুমি আমার মনেব মানুষ।

কেন ? কেন ? কী করে ? আমিই কেন ?

কী জানি ! ভালবাসা ত ব্যবসা নয়। দেনা-পাওনার ব্যাপাব নয়। একজনের সঙ্গে অন্যজনের হঠাৎই হয়ে যায়। এর রহস্য খুদাহ্‌ই জানেন। আমি কী করে জানব বলো। আনপড় জেনানা।

এই ঘরের খাটের দু পাশেও দেওয়াল-জোড়া আয়না। এ সব মেয়েরা বোধহয় খুব সৎ হয় ভিতরে ভিতরে। লুকোবার কিছুমাত্র থাকলে, নিজেকে বার বার এমন করে দেওয়াল-জোড়া আয়নাব সামনে অনাবৃত করে দেখা যায় না। দেখানো ত নয়ই।

সব আড়াল খুলে ফেলল বিজ্‌লী একে একে। পরতের পর পরত। মেয়েদের যত পরিধান, যত সাজ, সব বুঝি অবশেষে খুলে ফেলাবই জন্যে। তাদের আবরণ পরিপ্লুতি পায় নিরাবরণ হলেই।

আঃ। দু চোখ ভরে দেখল পৃথু। বেণীটিকে বাঁ কাঁধ দিয়ে নামিয়ে এনে বুকের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে। বেণীর রুপোলী জরির বাঁধন আশ্চর্য এক সৌন্দর্য এনে দিল। শ্রাবণের আকাশে রুপোলি বেখাব মতো।

আঃ। যেন ঝাঁ-ঝাঁ করা বসন্ত দুপুরের গভীর জঙ্গলের মাঝে একটি রক্তলাল ফুলাভারাবনত ঝাঁঝালো ছিপ্‌ছিপে একলা পলাশ। পৃথু ওকে টেনে নিল বিছানাতে। মনে মনে বলল, পলাশ, তোমার ঝাঁঝ সব শুষে নেব আজ।

পৃথুর ডান বাহুতে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল বিজ্‌লী। কাৎ হয়ে। ঘরের বাতি নিবোনো। ছোট্ট নীল আলোটা জ্বলছে। ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথু। নিঃশেষিত বাঘ। হঠাৎ বিজলী অনুভব করল তাব খোলা পিঠ পৃথুর চোখের জলে ভিজে গেছে। অদ্ভুত মানুষ একটা।

বিজ্‌লী উঠে পড়ে রজাইটা পৃথুর গায়ে দিয়ে দিল। ঠাণ্ডা আছে। সব পুরুষই এক এক সময় শিশুর মতোই হয়ে যায় তাদের ভাব ভঙ্গীতে। ঘুমের মধ্যে দেয়ালা করে তারা।

জানালার কাছে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল বিজলী। মহল্লায় কারো ঘরে গান হচ্ছে। ভূপ্ রাগে গাইছে কেউ। বিলম্বিত তিনতালে : "সহেলারে, সহেলালারে আ মিল্ গ্যয়ে…জনম জনমকো… সহেলারে…

শীত করছিল পৃথুর। কে যেন নরম হাতে গলার আর কাঁধের কাছে লেপটা গুঁজে দিল ভাল করে। আবার আরামে ঘুমিয়ে পড়ল ও। পাশ ফিরে।

ঘুম যখন ভাঙল, দেখল, রোদ এসে পড়েছে ঘরের রঙীন টালি-মোড়া মেঝেতে। পায়রা ডাকছে বক্‌বকম্ ছোট মসজিদের মিনারের তলায় বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে। ওদের ঝাপ্‌টানো-ডানায় ছিট্‌কে উঠে পায়রা-পায়রা গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে সকালের ওম্-ধরা রোদে। কাছেই কোথাও গলায় ঘণ্টা-বাঁধা একটা রামছাগল মাথা ঝাঁকাচ্ছে। টুঙ-টাঙ্ আওয়াজ আসছে তার। দুধ দুইছে বোধহয়

কেউ। একটি রামছাগল কত দুধ দেয় কে জানে?

নানা অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা মাথার মধ্যে ভীড় করে আসছে। হরজাই শব্দ ভেসে আসছে কানে, এলোমেলো। পথ দিয়ে মেয়ে-পুরুষ যাচ্ছে আসছে। তাদের জুতো ও চটি পরা পায়ের আওয়াজ পথ থেকে উঠে আসছে ঘরে। শিশির-ভেজা, ধুলো-মাখা, এখনও চুপচাপ পাড়া থেকে। সাইকেল রিক্শা গেল একটা। ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে। বোধহয় দুধের বাল্‌টি বসানো আছে রিক্শাতে। ক্রিং ক্রিং এর সঙ্গে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ মিশে যাচ্ছে। পাশের বাড়ি থেকে কোনো বাতিকগ্রস্ত বুড়ো খুব জোরে গলা খাঁকারি দিয়ে মুখ ধুচ্ছে। খবরের কাগজওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে উর্দু কাগজ নিয়ে। আখ্‌বাব! আখ্‌বার! পায়ে পায়ে ঝুম ঝুম করে মল-বাজিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে পাথুরে পথে কোনো মুসলমান কিশোরী। ওড়না-উড়িয়ে; বেণী-দুলিয়ে।

সাবীর মিঞা অনেকদিন আগে কিশোবীর অথবা কৈশোরের বর্ণনা দিয়ে একটি শায়ের বলেছিলেন। এই অচেনা গন্ধপুঞ্জ ও শব্দমঞ্জরীর মধ্যে অদেখা কিশোরীর দৌড়ে যাওয়ার শব্দেই হঠাৎ করে মনে উড়ে এল সেই শায়েরটি।

"আভ্‌ভি লড়প্পন্‌ভি হ্যায়, শাবার ভি হ্যায়
হায়া কি পব্‌দেমে ও সৌখ্‌বে নকাব ভি হ্যায়।"

কৈশোর যেন দুটি ঘরের মাঝেব পর্দাখানি। একটি ঘর শৈশবের, অন্য ঘর যৌবনের। হাওয়া লেগে পর্দাটি যেন একবাব এ ঘব আর একবার ও ঘর করছে। এইই কৈশোর।

নানা শব্দ ও গন্ধর ছিটে, চেতনার চাবদিকে তাবাবাজীর থেকে উৎক্ষিপ্ত কণার মত ছিট্‌কে যাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে দেখতে পাচ্ছে পৃথু ছোট্ট ঘরখানির উপরের ফলস্‌-সীলিং। সীলিং-এর নিচে ভোপালী চাঁদোয়া নিপুণ হাতে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। রোদ এসে রঙীন মেঝেতে পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে রঙীন চাঁদোয়াতে। আবারও প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত ঘরখানিকে এক বহুবর্ণ প্রজাপতির ডানার মতো তিব্‌তিরে, কাঁপা আলোতে আভাসিত করে দিয়েছে। কে জানে? কোথায় শুয়ে আছে পৃথু? কার ঘব এটা? মস্তিষ্কর শ্লথ কোষগুলিও জড়াজড়ি করে সকালের কবোষ্ণ শীতের আশ্লেষে ঘুমিয়ে আছে এখনও আরামে। এমন সকালে কারই বা ইচ্ছে করে ঘোর ভেঙে, লেপ ছেড়ে উঠতে? কোথায় যে সে আছে, জায়গাটা বেহেস্ত্‌ না দোজখ্‌ তা জানার ইচ্ছেটুকুও যেন নেই ওর। মরে যাবার পূর্বমুহূর্তে, মানুষ তার অনেক গর্বের চেতনা চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে যাবার আগে যেমন এক অবচেতনের জগতে ভাসমান থাকে, তেমনই ভাসমান আছে এখন পৃথু।

আচম্‌কা চোখ পড়ল ডানদিকের দেওয়ালের বড় আয়নাতে। আয়নার উল্টোদিকে পাশের ঘরে যাবার দরজা। সেই দরজায় দাঁড়ানো বিজ্‌লীর ছায়া পড়েছে আয়নায়। বিজ্‌লী!

বিজ্‌লীকে ও এমন সাজে দেখেনি আগে। নকল হীরে-পরা সুর্মাটানা, জর্জেট, বা চুমকী-বসানো বাঁধ্‌নী শাড়ি অথবা সালোয়ার কামিজ অথবা ঘাঘরা-মোড়া বিজ্‌লী নয় এ। সবে চান করেছে। পিঠময় ভিজে চুল ছড়ানো। কোনো হাকিমী তেল মেখেছে মাথায়। আমলার তেলও হতে পারে। আমলকি-আমলকি গন্ধ বেরোচ্ছে। ছড়িয়ে গেছে গন্ধ; সারা ঘরে। ইত্বর এবং হাকিমী তেলের গন্ধ বড় তীব্র। মুসলমানরা তীব্র গন্ধ ভালবাসে। তীব্র ভাবে বাঁচতে জানে তারা। জীবনে এবং জীবনযাত্রায় হিন্দুদের সঙ্গে অনেকই তফাৎ মুসলমানদের। ওরা জীবনকে এবং হয়ত মরণকেও বড়ই ভালবাসে। পৃথু বোধহয় গতজন্মে মুসলমান ছিল। অথবা, পরের জন্মে মুসলমান হয়ে জন্মাবে। নইলে, তাদের অনেককিছুই তার এত ভাল লাগে কেন?

সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরেছে বিজ্‌লী একটি। সাদা-কালো, চেক-চেক্‌; ছোট-ছোট। মাহেশ্বরী মিলের শাড়ি। কালো টিপ পরেছে কপালে। সুর্মা অবশ্য লাগিয়েছে। মামুলী। ছোট হাতার কালো ব্লাউজ একটি। তার অনাবৃত পেটটির একফালি দেখা যাচ্ছে। হলুদ-বসন্ত পাখির মতো রঙ তার পেটের। মসৃণ রেশমী-কোমল, উজ্জ্বল হলুদ। দরজার চৌকাঠে ডান পা-টি রেখে বাঁ হাতটি দরজার পাল্লায় উঁচু করে ছুঁইয়ে উঁকি মেরে দেখছে, পৃথুর ঘুম ভাঙল কী না!

পৃথু মুখ ঘোরাল।

চায়ে লাঁউ ? ঔর্ কুছ নাস্তা ? মু-আঁ ধো নেহী লিজীয়েগা ?

নেহী !

আঁ-মু নেহী ধোকেই নাস্তা ? সাচ্‌মুচ্ অজীব আদ্‌মী হেঁ আপ্ !

সব্‌হি অ্যায়্‌সেহি কহতে হ্যায় । ম্যায় অজীব্‌ই হুঁ । সাচ্‌মুচ্ । বিজ্‌লী প্রশ্রয়-ভরা তিরস্কারে দুটি উজ্জ্বল চোখ ভরে অনিমেষে তাকিয়েছিল পৃথুর দিকে ।

পৃথু ভাবছিল । ও ত মানুষ নয় ; জানোয়ার । জানোয়ারেরা কি দাঁত মেজে, মুখ-চোখ ধুয়ে খাবার খায় ? দাড়িওয়ালা জোয়ান বাঘ কি কস্মিনকালেও দাড়ি কামায় ? ওসব অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা শুধুমাত্র মানুষেরই !

একটু পরই নীলরঙা এনামেলের বড় রেকাবীতে বসিয়ে সিঁদুরে-রঙা এনামেলের কাপে ধুঁয়ো-ওঠা গরম চা আর আধখানা বাখরখানি রোটির সঙ্গে কলিজা-ভাজা নিয়ে এল বিজ্‌লী । খাটেরই একপাশে রেখে বলল, হালিম আমার, দারুন বাওর্চি । খেয়ে দেখুন ! উঠুন এবারে । উঠে বসে, খাটের বাজুতে বালিশ রেখে আরাম করে খান ।

এক ঝট্‌কাতে উঠেই গা থেকে লেপ সরিয়ে দিল পৃথু । কোনো কিছুই ধীরে-সুস্থে করা মানুষটির চরিত্রানুগ নয় । লেপটা সরিয়ে দিতেই শীত করল ।

বিজ্‌লী সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল । লেপটাকে, পৃথু আবার টেনে নিল গায়ে । স্যারা ঘর বিজ্‌লীর পিঠময় ছড়ানো চুলের হামদর্দ্ দাওয়াখানার আমলা তেলের গন্ধে ম'ম করছিল ।

আস্তে আবাব পৃথুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বিজ্‌লী বলল, খান । ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে কলিজা-ভাজা । ভোপাল থেকে আনিযেছিলাম বাথরখানি বোটি । খেয়ে দেখুন ।

পৃথু কিছু বলার আগেই জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আপনমনে বলল, আমার মনের সব শীত পালিয়েছে কাল রাতে । আর দেখুন ! কী জাঁকিয়ে শীত এল আজ সকালে, হাটচান্দ্রাতে ।

চাযে চুমুক দিল পৃথু । আঃ ! "দিল্ খুশ্" হয়ে গেল । টুসুর ভাষায় । টুসু ! তার ছেলে । আওলাদ্ । কী করছে এখন ও কে জানে ? কেন যে ওর কথা হঠাৎ মনে হল । কী করছে টুসু এখন ?

চা-টা ভাল ?

বিজ্‌লী বলল ।

দারুণ !

তুমি খিচুড়ি রাঁধতে পারো ? বিজ্‌লী ?

বিজ্‌লী হেসে উঠল ।

সেই হাসির শব্দে পৃথুর মনে হল, কোনো রাঙা-জবা গাছের ডালে বসে একজোড়া র‍্যাকেট্-টেইলড্ ড্রঙ্গো প্রেম করতে করতে যেন প্রেমেরই ভার সইতে না পেরে গাছ থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে গেল প্রেমোল্লাসে ।

খিচ্‌ড়ি, কওন্ না আওরৎ বনানে শক্‌তি ? দুনিয়াকি হর্-আওরৎহি জান্‌তি হোগী ।

নিরুচ্চারে পৃথু বলল, তুমি কজন 'আওরৎকে. জানো ?

কী কী খিচুড়ি রাঁধতে জানো তুমি ?

সব খিচুড়ি ।

না না । ভুনি খিচুড়ি রাঁধতে জানো ? মুগের ডাল, কড়া করে ভেজে, মধ্যে ফুল-কপি বলে ফেলেই মনে মনে বলল, সরী ! নো ফুলকপি । কপি অফ্‌নো টাইপ । কড়াইশুঁটি, চিনেবাদাম, কিস্‌মিস...বেশি করে গাওয়া-ঘি, সঙ্গে শুকনো লঙ্কা ভাজা । কড়কড়ে করে ।

বাঃ বাঃ । আপনি দেখছি বাওর্চির কাজও জানেন ।

বলেই, বিজ্‌লী হাসতে লাগল ।

পৃথুও হাসল । বলল,হাঁ সব্‌হি কাম । বে-কাম্‌কা আদমীনে ভি আপ্‌না কাম ছোড়কে সব্‌হি কাম জানতে হেঁ থোরা-বহত্ ।

বিজলী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, আজ সারা দিন থাকবেন ত আমার কাছে ?

নিরুচ্চারে বলল, সারাজীবন ? থাকবেন ?

মুখে বলল, কী ভাল যে লাগছে আমার ! বলেই, বিজ্‌লী কাছে চলে এল । কাছে আসতেই ওর চুলের গন্ধে কী যে হয়ে গেল পৃথুর ! মাথার মধ্যে হঠাৎ কী সব জ্বলে গেল । অচানক্ ।

চা-টা সবে খাওয়া শেষ হয়েছিল । এক ঝট্‌কায় হাত বাড়িয়ে ও টেনে আনল বিজ্‌লীকে ওর বুকের মধ্যে । আচমকা । একটু দেখা, একটু ছোঁয়া, কত কীই যে ঘটে যায় ! মানুষ পুরুষেরমতো ভঙ্গুব কবে খুদাহ্ আর কোনো পুরুষ জীবকেই গড়েননি বোধহয় !

হঠাৎ-আকর্ষিত বিজ্‌লীর পায়ের ঠেলায় নাস্তা-ভরা রেকাবীটা পড়ে গেল মেঝেতে । আওয়াজ করে ।

লেপের নিচ থেকে বিজ্‌লীর লজ্জামাখা অস্ফুটস্বর ভেসে এল একটু পর ।

জংলী ! আপনি হতে পারেন রহিস, কিন্তু আপনি জংলী ! অজীব ; জংলী !

জঙ্গল কি খারাপ ?

ফিসফিস করে বলল পৃথু ।

কিছু কিছু সময়, মুহূর্ত আসে সকলেরই জীবনে যখন কথা বলতে একেবারেই ইচ্ছে করে না । শবীব যখন অন্য শরীবের সঙ্গে উন্মাদনাব সঙ্গে কথা বলে তখন মুখের ছুটি । হরজাই আলোয় রঙীন ঘবে, রজাই এব তলার সুগন্ধি নিভৃতিতে একজন স্বল্প পরিচিত নারীব অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হযে গিয়ে পরির্চিতিব শেষ ধাপে পৌঁছে গেল ও । এক নিমেষে । সাবাজীবনের অনেক তেল-কই আর দই-মাছেব পরিচয়কে পিছনে ফেলে এই পরিচয় মুহূর্তের মধ্যে পৃথুর অনেকই কাছাকাছি এনে দিল এই বিজাতীয় নারীকে । হয়ত, এই নারীর কাছে পৃথুকেও ।

যুবতী বিজ্‌লী, পৃথুব বুকেব ঘন কালো বোমে মুখ ডুবিযে যৌবনেব গন্ধ নিচ্ছিল । চিকন হরিণী যেমন বর্ষাদিনেব মেঘলা সকালে নদীপারের চাপ চাপ সবুজ কোমল কচি ঘাসে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ নেয় , যেমন চিতল মাছও, বর্ষাব চলকে-চলা নতুন জলে ঘাই মেরে মেরে ।

মহল্লার একজন বাইজী রেওয়াজ করছিল । ভৈরবীতে, দূরের ঘরে বসে, শীতের শান্ত সকালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুর ভবে দিয়ে, যেন সুরের আলপনা দিচ্ছিল সে ।

বাগ রাগিণীর তাৎপর্য সবসময় বোঝে না পৃথু । কানে যাইই যায় তাইই যে সবসময় মনে পৌঁছয়ই এমনও নয় । কিন্তু আজ সকালেব দূবেব অচেনা গায়িকার গলার সুরে ভরে যাচ্ছে ওর সমস্ত মস্তিষ্ক । সুরারই মতো সুরের তরলিমা চুঁইয়ে যাচ্ছে, ভিতরে আস্তে আস্তে । বিজ্‌লীর কোমরে হাত রেখে শুযে-থাকা পৃথুর মনে হল যে, দিন-মাড়িয়ে যায় ও রোজই সকাল থেকে রাত্, কিন্তু বাঁচে না । বছরের পব বছব-মাড়ানো আর বেঁচে থাকায় অনেকই তফাৎ । ওর এই সামান্য শরীরটার মধ্যেও যে এতসব অসামান্য আনন্দেব উৎস লুকোনো ছিল তা বিজলীর সান্নিধ্যে না গেলে বোধহয় জানতেও পেত না । জীবনের কতগুলো বছর কত অমূল্য বছর সবই নষ্ট হয়ে গেছে । এখন আর ফেরানো যাবে না তাদেব । এক পক্ষর দয়ায় নয়, অন্য পক্ষর ঘৃণায় নয়, দু পক্ষরই উদভ্রান্ত উদ্বাসীনতাতেও নয়, দু পক্ষেবই তীব্র আসক্তি আর আবেশে ভর করে আসঙ্গর আনন্দঘন আশ্লেষে একে অন্যকে সম্পূর্ণকরে না পেলে যুগল শরীরের মন্দিরে ঘন্টা বাজানো আর ধূপ জ্বালানোই হয় শুধু : পুজো হয় না । মানব মানবীব এই আশ্চর্য শরীরে, দহন আর প্রলেপ বোধহয় নিঃশর্তভাবেই নিহিত আছে । বিয়েব পর এতবার রুষার সঙ্গে সংসর্গ করেছে পৃথু কিন্তু বোধহয় কখনই সম্পৃক্ত হয়নি । সমস্ত বিবাহিত নারী ও পুরুষও কি রুষা আর পৃথুরইমতো? সহবাসকেও তারা এক স্থূল দৈনন্দিন অভ্যেসে পর্যবসিত করেছে ।

রুষার পেশা অধ্যাপনা । পৃথুর প্রযুক্তি । আর বিজলীর ? শরীর আর গলা ? আশ্চর্য ! কতকিছুই শেখার আছে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে ।

গলির ঠিক বিপরীত দিকেব বাড়ি থেকে একজন মধ্যবয়সী বাঈজী এবার ভাঙা-ভাঙা, যৌনতামাখা বাঈজীসুলভ গলায় হারমনিয়ম বাজিয়ে একটি ঠুংরী ধরল । রেওয়াজে ত রাগ-রাগিণীর

সময়কাল মানা হয় না ! তবলাতে যে ঠেকা দিচ্ছে তার হাতটি বড় মিষ্টি। অনেকটা কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের মতো। তবলা, সেই হাতের আদরে শৃঙ্গারমোহিত নারীর মতোই শিউরে শিউরে উঠছে যেন! আনন্দে। অস্ফুট সব গভীর সুখের শব্দ উঠছে।

বাঈজী গাইছে :

“কঙ্কর মোঁয়ে লাগ্ যাঁইহে না রে
কঙ্কর লাগ্‌লে কি, কচ্ছ ডর নাহি
গগ্গর মোরা ফুট্ যাঁইহে না রে
গগ্গর ফুট্‌লে কি কচ্ছ ডর নাহি
চুন্দর মোরা ভিজ যাঁইহে না রে
চুন্দর ভিজলে কি কচ্ছ ডব নাহি
বালম্ মোরা হত্ যাঁইবো নারে··
কঙ্কর মোঁয়ে লাগি যাইহেঁ না বে ·

খুবই চেনা চেনা লাগছিল ঠুংরীটি। খুবই চেনা, কিন্তু মনে করতে পারছে না কিছুতেই··· । এখন অবশ্য কিছু মনে কবতে ইচ্ছেও কবছে না। পায়রা ডাকছে বকম বকম্। কার বাড়ির কাকাতুয়া বলছে আও সাহাব, গানেসে নাফবৎ নেহী না হ্যায় ? বাব বারই বলছে শেখানো বুলি। মনে পড়ে গেছে পৃথুর। রসুলনবাঈ-এর ঠুংরী ওটি। কঙ্কব মোঁয়ে লাগি যাঁইহে না রে··· । কথা আর সুরের বৈচিত্র্যব জন্যে মনে গেঁথে ছিল। কোথায় এবং ঠিক কবে শুনেছিল গানটি তা এখনই মনে করতে পাবছে না।

ম্যায় যাঁউ ?

ফিস্‌ফিস্ কবে বলল বিজলী।

নহী। গানা শুনাও।

ধেৎ। আভ্‌ভী ? না তানপুরা, না সারেঙ্গী, না তাবালিয়া···

কওন্‌সী গানা হোগী নাঙ্গা গল্লেমে ?

এই তো সঠিক সময় ! এখনই ত নাঙ্গা গলায় গাইবাব সময়।

নাঙ্গা গল্লেমেই শুনাও।

গুন গুন্ করে, পৃথুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গাইল, বিজলী, নাঙ্গা গলায়, পৃথুর জন্যে। আলসের পায়রারাও শুনতে পেলো না সেই গান।

“বস্‌কে ভরে তোরে নয়না, এবি সাঁবারিয়া
আয়েযা সাঁবারিয়া···তোঁহে দরোমাঁ লাগালুঁ···বসকে ভরে তোরে নয়না···
মোরা জিয়া তড়পে তড়পে মোরা সাবারিয়া···”

যতদিন হল বিজলীর সঙ্গে পৃথুর আলাপ হয়েছে, বিজলী, চোখের ভাষায়, মুখে বলে এবং না-বলেও অনেকবারই বোঝাবার চেষ্টা করেছে পৃথুকে যে, সে ভালবাসে তাকে। বাঈজীর কথা, বাঈজীর চোখের চমক্ অনেক কিছুই ব্যক্ত করে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলেও বিশ্বাস করেনি। পসারিণীর প্রেম ত বিশ্বাসের নয় ! কিন্তু এই সকালের নিরাভরণ নিরাবরণ বিজলী এই গানটির মধ্যে দিয়ে নিজেকে এমনভাবে নিংড়ে দিল পৃথুর কাছে যে, বিদ্যুৎচমকের মতোই ও বুঝল এ মিথ্যা নয় ; ভান নয় এ। এই ভালবাসা ! বিজলী সত্যিই ভালবাসে ওকে। তার ভালবাসাটা মিথ্যা হলে গানটা এমন সত্যি হতে পারত না। বিজলী এই গানের মধ্যে দ্রবতমা হয়ে পৃথুকেও দ্রব করে দিল। হৃদয় চিপে দিল পৃথুর কানে কানে।

ঠিক আছে। ঠিক আছে গো মেয়ে। “দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে।” পুজোর গান ! প্রেমও ত পুজোই। পুজারী যারা ; তারাই জানে।

কী জানি কেন, মন খারাপ হলে, মনের মন কী করবে তা না জানলে, মনে ঝড় উঠলে অথবা মন গভীরতায় প্রশান্ত হলেও সেই সাদা চুল সাদা-দাড়ি আলখাল্লা-পরা ঋষিতুল্য মানুষটির কথা মনে

পড়ে যায় পৃথুর। আর কেবলই তাঁর গানই মনে পড়ে।

গান শেষ করে বিজ্‌লী বলল, চালিয়ে, উঠিয়ে, হাত মু ধো লিজিয়ে, বহুত দের্ তক্ শোয়া আপনে। ম্যায় আভ্‌ভি আয়ি, নাস্তা গরম। ঔর চায়ে লেকর।

মেঝে থেকে রেকাবী ও ছড়িয়ে-পড়া খাবারগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল বিজ্‌লী।

পৃথু উঠে পড়ে জামা কাপড় পড়ল। বাথরুমে যাবে একবার। খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ও। মিষ্টি, উষ্ণ রোদ এসে পড়েছে সবুজ আর লাল কাজকরা টাইলের মেঝেতে। নিচের পথ দিয়ে এই মহল্লার জীবন বয়ে চলেছে। পথে এলে, বা পথের দিকে চাইলেই ওর রক্তে উন্মাদনা জাগে। চলমানেব সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও চলতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবে এবং আদৌ কোথাওই যাবে কী না ; সেটা জানাব ইচ্ছা পর্যন্ত থাকে না। শুধুই চলার মধ্যেও বোধহয় একধরনের আনন্দ আছে। যারা থেমে থাকে, স্থবিরতার শিকার হয়েছে যারা জীবনে, তারা হয়ত জানে না সে কথা।

কাল সন্ধ্যেবেলাতে এখানে এসেছিল। কেন যে কুর্চি একবার দেখা দিল না, কেন যে, রুষা···। এইই বোধহয় হওয়ার ছিল। ভবিতব্য একেই বলে। মিলি ও টুসুর কথা খুবই মনে পড়ছে পৃথুর। পৃথু কি নষ্ট হয়ে গেল?

বিজ্‌লী এসে ঘবের এক কোণায় তেপায়ার উপর খাবারের রেকাবী রাখল।

বাথরুমে যাননি এখনও?

যাচ্ছি।

শিগগীরী যান্। চা নিয়ে আসছি।

বাথরুম থেকে ফিবে এসে খাটের উপরই বসল পৃথু রেকাবী হাতে। বিজ্‌লী, নীল আর সাদা ফুল ফুল কাজ করা পোর্সিলীনের একটা গ্লাসে, ধুঁয়ো-ওঠা গরম চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

বলল, খান। আমি দেখি।

তুমি? খাবে না? কি খাবে?

খাব। সময় হয়নি।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল। আজ রাতে তুমি নিশ্চয়ই অন্য লোকের আদর খাবে?

জানি না। খুব বিষণ্ণ দেখালো বিজ্‌লীকে। খারাপ মেয়ে আমি। তবু আমি ত গানই শোনাই বেশি। বাজাই না। খুবই কম। ক্বচিৎ-কদাচিৎ।

তবু। যদি···

কী করব? আমার এইই ত পেশা। ছেলেবেলা থেকেই গান আর শরীর। এছাড়া আমার যে কিছুই নেই। রোজগার করে খাওয়াবে কেউ, সুখে রাখবে তুলোর মধ্যে করে, এমন কপাল ত করে আসিনি। আমার ত আর স্বামী নেই।

স্বামী চাওনি তুমি, তাইই নেই।

স্বামী নাইই বা থাকল। স্বাধীনতা ত আছে। সেটা কি কম?

খাওয়া থামিয়ে বিজ্‌লীর মুখের দিকে তাকাল পৃথু।

বলল, স্বামী চাও?

অন্য কথা বলুন।

আমাকে কি চাও? স্বামী হিসেবে?

আপনি একটি পাগল!

কেন?

এমনিই বললাম। পাগলকে আর কী বলব?

আমি এবার যাব বিজ্‌লী।

জানি। থাকতে যে আসেননি তা জানি।

তুমি আর কিছু বলবে না? তোমার টাকা আমি নিয়ে আসব পরে। ঠিক আসব দেখো।

আপনি···আপনাকে······খুব খারাপ আপনি, বাজে···।

জানি। অদ্ভুত বাজে লোক আমি একটা। ঠিক আছে?

আঃ! আবার কবে আসবেন?

দেখি।

যেদিন আসতে খুব ইচ্ছে করবে, সে দিনই আসবেন। আমি বলছি বলেই আসতে হবে না। খুব দুঃখ টুঃখ হলে আসবেন। খারাপ মেয়েদের কাছে ভদ্রলোক বড় মানুষরা ত শুধু তখনই আসেন।

কেন? খুশি হলে কি আসতে মানা করছ?

ঠিক তা নয়। খুশি বইবার মানুষ ত নিশ্চয়ই অনেকই আছে আপনার। আমি না হয় দুঃখই বইব। খুশি হয়েই। আসবেন।

একটু চুপ করে থেকে মুখ নিচু করে বলল, তবু ত আসবেন।

পৃথুর গলার কাছে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠল। সেই জিনিসটা বাখরখানি রোটি অথবা কলিজা-ভাজা নয়। অন্য কিছু। তার স্বাদ বড় তেতো।

পৃথু বলল, চলি বিজ্‌লী।

বিজ্‌লী জানলার পাশ থেকে তাড়াতাড়ি সরে এসে পৃথুর কাছে দাঁড়াল।

মেয়েটার গলার স্বরই শুধু নয়, সমস্ত ব্যক্তিত্বই যেন কাঁচ দিয়ে তৈরী। অথচ, সে ভাঙ্গে শুধু নিজের ইচ্ছেতেই। ঝকঝকে দুটি চোখে বুদ্ধি ঠিকরোচ্ছে, হীরের গায়ের দ্যুতির মতো। এই সহজাত বুদ্ধি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই কাউকে কোনোদিন দিতে পারে না। কেউ কেউ তা নিয়েই জন্মায়। শরীর ছাড়াও, একজন পুরুষকে দেওয়ার মতো অনেক কিছুই আছে ওর। শুধু নিতে জানা চাই।

পৃথু মাথা ঝুঁকিয়ে ওর কপালে একটা চুমু খেল। বিজলী, পৃথুর বুকে ওর মুখ রেখে পৃথুকে জোরে জড়িয়ে ধরল একবার। মনে হল, কোনোদিনও ছাড়বে না আর।

একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল পৃথু। তারপর আলতো করে জড়ানো লতানো হাতদুটি দু হাত দিয়ে খুলে দিল।

আবার বলল, চলি বিজ্‌লী। ওর চোখে চেয়ে দেখল, চোখ দুটি জলে ভরে গেছে।

পৃথুর গলার কাছে সেই অজানা জিনিসটা আবারও দলা পাকিয়ে উঠল। চলে যেতে গিয়েও, দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বলল, শোনো; একটা কথা শোনো। আমার সামনে তুমি কখনও কাঁদবে না। আমি যাদের ভালবাসি, তারা আমার সামনে কাঁদুক তা আমি পছন্দ করি না। আমার খুব কষ্ট হয়।

বলেই, ও নেমে গেল সরু, দিনের বেলাতেও প্রায়-অন্ধকার, সিঁড়ি দিয়ে। পথে নামতেই কোথা থেকে সেই কাকাতুয়াটা বলে উঠল "আও সাহাব্। গানেসে নফ্‌রৎ নেহী না হ্যায়?" নেড়ী কুকুরের একটি কাদা-মাখা বাচ্চা কঁকিয়ে কেঁদে উঠল, কাঁচা নর্দমা থেকে কেৎরে কেৎরে উঠে।

গলি থেকে বাইরে বেরিয়েই পৃথু অবাক হয়ে দেখল, শ্রীকৃষ্ণ বসে আছে, গিরিশদার গাড়িতে।

এ কী!

লজ্জা পেয়ে বলল, পৃথু।

তুমি কি সেই কাল থেকে এখানেই রয়েছ নাকি?

না। কা'ল রাত এগারোটায় বাড়ি গিয়ে বাবুকে রিপোর্ট দিয়ে আবার আজ সকাল ছটাতে এসেছি।

রিপোর্ট দিয়ে? কিসের রিপোর্ট?

আপনার রিপোর্ট। আপনাকে আমার বাবু আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছেন।

পেছনের দরজা খুলে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িতে উঠেই পৃথু বলল, কারখানা।

ঘর নেহী যাইয়েগা সাহাব? আপ্‌না ঘর্ ভি নহী?

আমার কোনো ঘর নেই। ভাবল, শ্রীকৃষ্ণকে বলে। তারপর ভাবল, কী লাভ! বাড়িতে বাড়ি নেই।

"বাড়ি ফিরে দেখি বাড়িতে বাড়ি নেই
একটা বড় দরজা

কয়েকটা বখাটে জানালা।
নড়ে চড়ে জিগগেস্ করল।
কাকে চাই ?
ভেবে দেখতে হবে কাকে চাই।
বাড়ি ফাঁকা. বাড়িতে বাড়ি নেই।
কাঠের চেয়ারে ভাড়াটের মত
অনাহুত অতিথির মত
বুঝে ফেলি।
চোখে দ্বিধা, পায়ে ভর কম।
একা।
আমার বাড়িতে বাড়ি নেই।
বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা।
শ্রীকৃষ্ণ কি বুঝবে ?
পৃথু দৃঢ় গলায় বলল, কারখানায় চলো শ্রীকৃষ্ণ। এক কথা আমি দুবার বলা পছন্দ করি না।
জী সাব্।

বলল, শ্রীকৃষ্ণ। তারপর বিলাইতি টোলির মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সব্‌জি মণ্ডির ভীড় এড়িয়ে এগোল কারখানার দিকে।

ঠাণ্ডা জলে চান করে, নাস্তা করে বেশ ভাল লাগছিল পৃথুর। কাল রাতের শরীরের কাঁকড়াগুলো সব শীতের চন্দ্রমল্লিকার মতো নানা নরম-রঙা সত্তায় ফুটে উঠেছে। এখন মন আলো করে। হাল্‌কা, ঝরঝরে লাগছে শরীর। দিগা পাঁড়ের মানস মুক্তাবলী ঠিকই বলে। নারী ছাড়া পুরুষের চলে না। গতি নেই কোনো।

কারখানার মধ্যে ঢুকে অফিস বিল্ডিং-এর সামনে ও নেমে গেল গাড়ি থেকে। শ্রীকৃষ্ণকে বলল, গিরিশদাকে বোলো যে, আমি যাব দেখা করতে ওঁর সঙ্গে। আজ না পারলে, কাল যাব।

জী সাব্।

তোমার সঙ্গেও করব দেখা ; পরে।

জী সাব্।

হাসল শ্রীকৃষ্ণ।

গিরিশদার গাড়িটা চলে যেতেই অজাইব্ সিংকে আসতে দেখা গেল পৃথুর গাড়ি নিয়ে। অজাইব্ সিং গাড়ি থেকে নেমেই সেলাম করল। বলল, মেমসাব খাত্ ভেজিন্।

ভুঁরু কুচ্‌কে খামটা নিয়ে ছিঁড়ল। চিঠিটা বের করল। রুষা লিখেছে, ইংরিজীতে। আই জাস্ট ক্যাডন্‌ট কেয়ার লেস্। তুমি জাহান্নামে যেতে পারো। তবে, আজ অফিসের পর বাড়িতে এসো। টুসুর বেশ জ্বর হয়েছে। তোমার কথা বলছে। মিলি ও টুসুকে বলেছি যে, তুমি অফিসের কাজে হঠাৎ বাইরে গেছ। দু একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। কালকের ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত। চিরদিনই মনে মনে তোমাকে যা বলতে চেয়েছি, বলব বলে ঠিক করে রেখেছি, মুখে বলেছি ঠিক তারই উল্টো কথা। কী করব ! আমি এরকমই। আমি তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু আমারই মতো করে। প্রত্যেকের ভালোবাসারই রকম আলাদা। তুমি বোঝনি কখনও এ কথাটা।

রাতে কোথায় ছিলে ?

লছমার সিংকে দিয়ে চীজ্-বেক্ করিয়ে রাতে অজাইব সিংকে পাঠিয়ে ছিলাম কুর্চির বাড়ি। ঐ ছুতো করে, তোমার খোঁজ করতে। সেখানেও যে তুমি যাওনি সে খবরও পেয়েছি। দাঈ নাকি কুর্চিকে বলেছে যে, দুপুরে জীপে করে ঠিক তোমারই মতো দেখতে কোনো একজন লোক ওদের বাড়ি গেছিল। কিন্তু নামেনি।

কিছুই বুঝলাম না। তোমার হেঁয়ালী তুমিই জানো।

রাতে তাহলে ছিলে কোথায় আপাতত এটুকুই জানিও।

ট্রুলী ইয়োর্স, রুষা।

এই "ট্রুলী ইয়োর্স" কথাটা তামাদি হয়ে গেছে। পৃথিবীতে ট্রুলী পৃথুজ একজন মানুষও নেই। শুধু পৃথুরই কেন ? কারোই্ নেই।

রুষার চিঠিরই উল্টোদিকে, ওব শেষ প্রশ্ন "রাতে কোথায় ছিলে ?" র উত্তরে লিখে দিল পৃথু, এক কথায়। "জাহান্নামেই !"

অজাইব্ সিং চিঠি নিয়ে সেলাম করে চলে গেল।

ইম্‌ম্যাটেরীয়াল ম্যানেজার শর্মা বলল, আজ দাড়ি নেহী বানায়া তুমনে ঘোষ ?

সত্যিই ত ! খেয়াল হয়নি আগে।

পৃথু বলল, অশৌচ চলছে আমার।

অশৌচ ?

হ্যাঁ। আমার জ্যাঠশ্বশুর মারা গেছেন।

কোথায় থাকতেন ?

বিলাসপুর। জ্যাঠশ্বশুর এবং বিলাসপুর দুটোই বানিয়ে বলল, পৃথু।

ভেরী স্যাড। শুনকর, মন্‌মে বহুৎই দুখ পৌঁছা !

রাজনৈতিক নেতাদের মতো থিয়েটার করে বলল শর্মা।

থ্যাঙ্ক উ্য।

পৃথু বলল।

টুসুর জ্বর ! মিলি ? মিলিটা কেমন আছে ? কতদিন যে মেয়েটার সঙ্গে গল্প করেনি ! চেহারাই দেখেনি কতদিন হয়ে গেল। খাওয়ার সময় দেখা হত আগে। ইদানীং তাও হয় না। সময়মত ত খায় না ও ! হবে কী করে ? অনেক পাপ। পাপ জমে যাচ্ছে অনেক। পরতের পর পরত। খারাপ, খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি অফিসের ফাইলপত্র দেখে কারখানার ভিতরে যাবে ও। তার পর আজ বিকেল তিনটে-চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়বে। এখন কাজের চাপও কম। জানুয়ারী থেকে আরও কমবে।

অফিসের ফাইলে ডুবে গেল ও। যখন যা করে ও তখন তাইই করে। কাল রাতে ও ছিল বিজলীর পৃথু। আজ সকালে অফিসের পৃথু। বিকেলের কথা বিকেলই জানে।

ঠুঠা বাইগা একবার এল ইতি-উতি চেয়ে, সাবধানে ঘরে কেউ নেই, তা দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, কাজটা তোমার ঠিক হচ্ছে না। এমন করে কেউ মদ খায় ? মদকে তুমি খাবে। মদ তোমাকে খাবে কেন ? ছিঃ ! ছিঃ !

ব্যস্ত আছি ঠুঠা। নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে। আমি শিশু নই।

শক্ত গলায় বলল, পৃথু।

আমার কাছে শিশুই। আমার কোলে-কাঁধে-চড়েই মানুষ হয়েছ। ভুলে যেও না। যাতে তোমার ভাল হয়, তাইই করতে বলেছি। বলব, চিরদিন। তাতে তুমি রাগই করো, আর যাইই করো তোমার ওসব চোখ-রাঙানী অন্যদের জন্যে রেখো।

পৃথু জবাব দিলো না।

বলল, সত্যিই ব্যস্ত আছি ঠুঠা। পরে এ নিয়ে কথা বলব।

ঠুঠার উপর রাগ হচ্ছিল খুবই। কিন্তু আজ সকালের অনেক দাম দিয়ে কেনা খুশিটাকে নষ্ট করতে রাজী ছিলো না ও একেবারেই।

গলা নামিয়ে বলল, পরে। পরে কথা হবে। যাও এখন।

জানালা দিয়ে কারখানার ভেতরের গেটটা দেখা যাচ্ছিল। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। এখন ফুল নেই। তবে পাতা আছে অজস্র। কামিনরা যাচ্ছে আসছে। কোণার দিকে ফ্যাক্টরীর এক্সটেন্‌শনের কাজ হচ্ছে। হঠাৎই পৃথুর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কামিনরা যাচ্ছে, আসছে। আঁটসাঁট

তাদের শরীর। মাথায় করে ইঁট বইছে, চুন, বালি, পাথরকুচি। ঐ শীতেও তাদের সস্তা ছিটের লাল হলুদ সবুজ ব্লাউজের নিচের বাহুমূল ঘামে ভিজে উঠেছে। আশ্চর্য! কী দারুণ। এই সব জীবন্ত ঘামঝরানো, আঁট-সাঁট সব নারীশরীরগুলি। অসভ্যর মতো চোখে তাকাচ্ছে পৃথু তাদের দিকে। বিজলী তাকে আশ মিটিয়ে খাইয়ে হঠাৎই ক্ষিদে বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মধ্যের অলক্ষ্যে-ঘুমোনো কোনো কামুক কুম্ভকর্ণর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। খুবই বিপদ এখন পৃথুর। পৃথু সত্যিই নষ্ট হয়ে যাবে। রুচি ? যে রুচি নিয়ে তার এত গর্ব ছিল ? কোথায় গেল তা ? ছিঃ ছিঃ। পৃথু ঘোষ। ছিঃ ছিঃ।

কী করে জানল রুষা তা কে জানে, অজাইব্ সিং আবারও এসে হাজির হল গাড়ি নিয়ে তিনটের সময়। যাওয়ার সময় দুপুরের খাবার আনবে কী না জিগগেস করে গেছিল। পৃথু বলেছিল, ক্যান্‌টিনে যা হয় খেয়ে নেবে।

বাড়ি যখন ফিরল : দেখল, রুষা পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য একেবারে নতুন বলে মনে হল। কবে যে শেষ তার জন্যে অপেক্ষা করতে দেখেছে ওকে তা আজ মনে পড়ে না পৃথুর।

অজাইব্ সিং ব্যাপারটাকে দেখেও যেন দেখেনি এমন ভাব করে রইল। নেমে, দরজা খুলে দিল পৃথুর জন্যে।

টুসু কোথায় ?

পৃথু বলল।

ঘরে।

রুষা জবাব দিল। পৃথুর সঙ্গে ভিতরে যেতে যেতে।

চা খাবে ত' ! সঙ্গে খাবে না কিছু ? দুপুরে কি খেলে ?

অবাক লাগছে পৃথুর। দুপুরে কি খেয়েছে এবং আদৌ কিছু খেয়েছে কী না তা নিয়ে রুষার কোনোদিনও মাথাব্যথা ছিলো না।

অবাক লাগলেও একরকমের ভাললাগাও লাগছিল ওর। আদর্শ !

তুমি টুসুর কাছে যাও। আমি মেরীকে বলে তোমার খাওয়ার ঠিক করছি। ফ্রেঞ্চ-টোস্ট খাবে ?

কিছু খাবো না আমি। এক কাপ চা খাবো শুধু।

ওঃ।

টুসু খাটে বসে মবি-ডিক পড়ছিল।

কেমন আছিস রে বেটা ? কত জ্বর ?

বেশি না। তুমি কোথায় গেছিলে বাবা ? জবলপুরে ? আমার জন্যে একটা ক্রিকেটের ব্যাট আনতে বলেছিলাম না ? আজ থেকে ত স্কুল বন্ধ। তিনদিনের জন্যে।

কেন ?

মাদারস্ ডে। টিচারস ডে। তারপর পরীক্ষার পর ত শীতের ছুটি আরম্ভ।

মিলি ঘরে এল। গোলাপীর উপর সাদা ফুলফুল প্রিন্টের একটি ফ্রক পরেছে। গোলাপী রঙ সোয়েটার ফুল-হাতা। কাঁধের উপর চুল ছড়িয়ে আছে। বব্ করে দিয়েছে রুষা। হাতে একটি ইংরিজী বই। পড়ছিল।

বলল, হাই বাবা।

হাই !

পৃথু বুঝল যে, রুষারই নির্দেশে মিলি এসেছে পৃথুর কাছে কর্তব্য করতে। শুধু কর্তব্যই।

যাচ্ছি বাবা।

বলে মিলি চলে গেল।

টুসু !

টুসু বই থেকে চোখ না তুলে বলল, কি বলছ ?

তুই তাহলে ভালই আছিস ?

হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা।

কোনো কষ্ট নেই ত?

কিসের কষ্ট? আঃ যাওনা বাবা, দারুন ইন্টারেস্টিং জায়গায় আছি এখন। ব্লু-হোয়েলটাকে, মানে মবি-ডিককে দেখা গেছে।

আচ্ছা। পড়ো তুমি। বলে, পৃথু ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে এল। তারপর বাথরুমে গেল। জামাকাপড় ছেড়ে পায়জামা পাঞ্জাবী পরল।

রুষা ঘরে এল। পৃথু তার চেয়ারে বসে, টেবলের উপর পা তুলে দিয়ে শেয়াল-রঙা আলোয়ান গায়ে দিয়ে নস্যি নিচ্ছিল। অন্যদিন, অন্য সময় হলে অনেক কিছুই বলত রুষা। ঝগড়া করত। আজ চায়ের কাপটা, নিজে হাতে প্লাস্টিকের ট্রান্সপারেন্ট ট্রে সুদ্ধ নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর পৃথুর খাটের এক কোণায় বসল।

পৃথু চায়ের কাপটা তুলে নিল হাতে। চুমুক দিল। ও বুঝতে পারছিল যে, রুষা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। আজকে ঝগড়া করবে না ও। স্বামী-স্ত্রী যতদিন একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করে ততদিন পর্যন্ত সম্পর্কটা থাকে। অথচ, আশ্চর্য! তখন ঝগড়াটাকেই সম্পর্কহীনতা বলে ভ্রম হয়। যেদিন ঝগড়া করার মতো সম্পর্ক থাকে না, সেদিন সম্পর্ক বলতেও বোধহয় বাকি থাকে না কিছুই। এ কথাটা পৃথু আগে কখনও ভেবে দেখেনি। বোধহয় রুষাও ভাবেনি।

কিছু বলবে?

পৃথু বলল।

নাঃ। কী আর বলব। কাল জাহান্নামে গেছিলে তুমি? সেটা কোথায়?

কাল আমি একজন বাইজীর কাছে গেছিলাম।

খাট থেকে হঠাৎ উঠে পড়ে দরজা ভেজিয়ে দিল রুষা। বলল, আস্তে, আস্তে, মিলি টুসু বাড়ি আছে।

আমি যে খারাপ এটা ওদের কাছে আমি লুকোতে চাই না।

পৃথু বলল, চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে।

খারাপ ভালোর ওরা কি বোঝে? তুমি ওদের বাবা। তোমার পরিচয়েই ওদের পরিচয়। তুমি ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করো এইটেই ওদের কাছে সব। ওদের মা তোমাকে সম্মান করে এটা ওরা জানে, তুমি না জানলেও। এর বেশি ওদের না জানাই ভাল।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে। শীতের বেলা পড়ে আসছে। ছায়ারা দ্রুত দীর্ঘতর হচ্ছে। খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের কালো কুচকুচে যুবতী আয়া সাদা ধবধবে জোয়ান অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে চলে গেল কনে-দেখা আলো মেখে।

রুষা হঠাৎ বলল, তুমি খুশি হয়েছ?

কিসে?

যার কাছে গেছিলে তার কাছে গিয়ে?

পৃথু তার দুটি চোখ রুষার চোখে রাখল। এমন থিয়েটার কোথায় শিখল রুষা তা কে জানে? কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল রুষার চোখে অভিনয় নেই। থতমত খেয়ে গেল পৃথু। জবাবে কি যে বলবে, বলা উচিত, ভেবে পেলো না।

রুষা আবার বলল, যদি খুশি হয়ে থাকো, তাহলে যেও মাঝে মাঝে।

পৃথু আবার তাকাল রুষার দিকে।

রুষা মুখ নামিয়ে নিল একবার। তারপর মুখ তুলে স্থির গলায় বলল, শুধু দেখো, যেন কেউ না জানে। ছেলেমেয়েরা না জানে। কুর্চির কাছে না গিয়ে তার কাছেই যেও। কুর্চি তোমাকে দেবে না

কিছুই। শুধু সর্বনাশ করবে তোমার। আমার এবং ছেলেমেয়েদেরও। তুমি অনেক বোঝো, সব বোঝো না। শরীরের ভালোবাসায় ভয় নেই ; ভয় মনের ভালোবাসায়।

অন্য কথা বল।

দুজনে আবারও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তিতির ডাকছে পেছনের ঝাঁটি জঙ্গল থেকে। চামারটোলিতে রাতের প্রস্তুতি হিসেবে কে যেন চাঁটি মারছে মাদলে। মাথার মধ্যে ঘা পড়ছে। ক্লান্তি লাগছে বড়।

ওরা অনেক কিছু জানে, না ?

হঠাৎ রুষা বলল।

মানে ?

না। পড়েছি, শুনেছি···। এই প্রফেশনালাইজেশানের দিনে সবকিছুই পারফেক্‌শনে পৌঁছেছে ত। অ্যামেচারদের দিন আর নেই। জীবনেব কোনো ক্ষেত্রেই ! বাইজী-টাইজীরা শরীরের ব্যাপারটা আমাদের চেয়ে ভাল বোঝে ? না ?

হেসে ফেলল পৃথু। অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে রুষাও হেসে ফেলল !

হাসলে, এখনও তোমাব গালে টোল পড়ে। পৃথু বলল। অনেকদিন পর তোমার হাসি দেখলাম।

তোমারও।

তুমি, রুষা, কিন্তু সত্যিই শিক্ষিত। অন্য কোনো স্ত্রীই বোধহয ব্যাপাবটাকে এমন ফিলসফিকালী নিতে পারত না !

এটা শিক্ষা-অশিক্ষার ব্যাপার নয়। পারসপেকটিভের ব্যাপার। রিলেটিভ ব্যাপার। তোমাকে বোঝাতে পারব না।

একটু চুপ করে থেকে রুষা হেসে বলল, আসলে আমি ঠিক করেছি, তোমার কাছে কখনও হেরে যাব না। আমি জিতবই, দেখো। দেখি, তুমি কি করে হাবাও আমাকে।

বলেই রুষা মুখ নিচু করে ফেলল। সেই প্রায়ান্ধকার শীতার্ত ঘবে পৃথু দেখল যে, জলে ভরে এল রুষার দু চোখ।

ও উঠে গিয়ে রুষাকে তুলল দু হাত ধরে। নিজেব কাছে টানল। বলল, পাগ্‌লী। কী যে সব ঘটছে ঘটনা, একের পর এক মাথামুণ্ড নেই কোনো কিছুরই। মাথার ঠিক থাকছে না।

পৃথু রুষার গালে গাল ছুঁইয়ে বলল, আমরা বেশ নতুন বব-বৌ ! হ্যাঁ। বেশ। আমাদের যেন ভীষণ প্রেম, হ্যাঁ ?

ছাই।

বলেই, রুষা কান্না আর হাসিব মাঝামাঝি একরকমের অনুভূতিতে ভেসে গিয়ে মাথা রাখল পৃথুর বুকে। এবং ঠিক তখনই একটা জীপের হর্ন কর্কশ আওয়াজ করে বেজে উঠল বাংলোর সামনে। কে যেন পৃথুর নাম ধরে ডাকল, পৃথুদা, পৃথুদা।

রুষা জানলার কাছে গিয়ে বলল, তোমার ভুচু।

তাবপর বলল, একদিন আমি এদের সকলকে একসঙ্গে নেমন্তন্ন করে বিষ খাইয়ে মেরে দেব।

ভুচু, মনে হল জীপ থেকে নেমে দৌড়ে আসছে বাইরের দরজার দিকে।

পৃথু স্বগতোক্তিব মতো বলল, খারাপ কিছু ঘটেছে। বলেই ড্রয়িংরুমের দিকে এগোল।

অজাইব্‌ সিং নিয়ে এল ভুচুকে।

পৃথুর পেছনেই রুষাকে দেখেই ভুচু বলল, নমস্কার বৌদি। পৃথুদার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। গোপনেই বলতে চাই।

রুষা অজাইব সিংকে ইশারায় বাইরে যেতে বলল। বলে, নিজেও ভিতরে চলে এল। রুষার বুক দুরদুব করছিল। কাল রাতের ঘটনাব সঙ্গে জড়ানো কিছু নয়ত !

কি হল ? পৃথু বলল।

গলা নামিয়ে ভুচু বলল, শামীমের বড় মেয়েটাকে ঘণ্টাখানেক আগে কারা যেন কিডন্যাপ্ করে নিয়ে গেছে। বাড়ির সামনের টিউবওয়েলে দাঁড়িয়ে ছিল, খাওয়ার জল ভরাব জন্যে।

বল কি ? ওদের গলিটাতে ত' সবসময় লোক গিস্গিস করে। অতলোকের সামনে থেকে ?

হ্যাঁ। একটা জীপে করে এসেছিল। চারজন গুণ্ডামত লোক। ভোপালের নাম্বার প্লেট লাগানো।

নাম্বার প্লেট বদলে এসেছিল নিশ্চয়ই।

অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। নাম, নুরজাহান। শামীম ভাই একেবারে জবাই-করা মুরগীর মতো ছটফট করছে আর ডাক ছেড়ে কাঁদছে। কে বলবে ওকে দেখে যে, কথায় কথায় ও অন্য লোককে গুলির তোড়ে উড়িয়ে দেয়।

থানায় খবর দিয়েছো।

তা দিয়েছি। তবে বোঝোই ত' কোন্ দেশে বাস আমাদের ! কলকাতার পুলিশের মতো ভদ্রলোক ত' সবাই নয়।

আমাকে কি করতে বল ?

খোঁজ লাগাব। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে : সাবীব মিঞা আব গিবিশদাকে দিয়ে একাজ হবে না। খতরা হতে পারে। তুমিও সংসারী লোক। তোমাকেও টানা উচিত নয়। কিন্তু মাথা কাজ করছে না আমার। আমার বন্দুকটা আর গুলির বেল্টটা নিয়ে নিয়েছি। তোমার

মনে পড়ে গেল পৃথুর যে, গতসপ্তাহেই উধাম সিং যখন জবলপুরে গেছিলেন তখন অনন্ত বিশ্বাসের দোকান থেকে ওর পিস্তলটাকে আনিয়ে নিয়েছিল।

ভুচুকে বলল, এক সেকেণ্ড দাঁড়াও।

ভিতরে গিয়ে পিস্তলটা আর দুটো ম্যাগাজিন নিয়ে নিল পৃথু। গুলির প্যাকেট নিল একটা পঞ্চাশটার। আই সি আই-এর গুলি নিল। ইটালিয়ান গুলি আর অর্ডন্যান্স্ কোম্পানীর গুলি আটকে যায় এই পিস্তলে।

রুষাকে নিজের ঘরে ডাকল। ডেকে সংক্ষেপে বলল। পিস্তলের কথা ওকে বলল না কিছুই। বণ্ড-এর পাঁচব্যাটারীর টর্চটা বের করে তাড়াতাড়ি ব্যাটারী ভরে নিল।

কোথায় যাচ্ছো ? ফিরবে কখন ?

কি করে বলব ?

আজ লছমার সিংকে বলেছি ভাল করে ভুনি-খিচুড়ি রাঁধবে। তোমার পছন্দমত।

তুমি নিজে রাঁধবে না ?

আমি পারি না। সকলে কি সব পারে ? যা আমি পারি না তাইই চিরদিন বড় করে দেখলে তুমি, আর যা যা পারি সেগুলো দেখলেই না চোখ চেয়ে।

হবে। হবে। সময় যায়নি।

বলতে বলতে, দৌড়ে বেরিয়ে গেল পৃথু। দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে বলল, দেরী হলে খাবার হট-কেস্-এ রেখে শুয়ে পড়ো। কেউই যেন বসে না থাকে।

এগারোটা অবধি দেখব তবুও। তাড়াতাড়ি ফিরো। উদ্বিগ্ন গলায় রুষা বলল।

চেষ্টা করব।

ও জীপে গিয়ে বসতেই জীপ স্টার্ট করল ভুচু। কচুবন থেকে হঠাৎ বেরুনো দাঁতাল শুয়োরের মতো গোঁ-ভরে জীপটা ছুটিয়ে দিল ও। হেডলাইটের আলোয় রাস্তা পেরুনো একটা বন-বেড়ালের লালচে ভুতুড়ে চোখ জুল্জুল্ করে জ্বলে উঠল।

কোনদিকে যাবে ? আন্দাজে ?

প্রথমে শামীমের বাড়ির দিকেই যাব। ওখানে কোনো খোঁজ পেল কী না জেনে নিয়ে তারপর পাগলের মতোই ঘুরতে হবে চারদিকে। কিছু না করেও যে বসে থাকা যায় না।

কিছু করার না থাকলে মিছিমিছি পাগলের মতো ঘুরেই বা কি হবে? তার চেয়ে শামীমের বাড়িতে বসে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবা দরকার।

চলো. দেখি কী করা যায়।

পৃথুর কপালটাই এরকম। বহুবছর পরে রুষা ওর খুব কাছে এসেছিল। ওর জীবন একটা প্রচণ্ড সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল থমকে গিয়ে। ঠিক সেই সময়েই এই ঘটনা। আশ্চর্য! ও রুষাকেই হারাতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, নিজে না হেরে গিয়েও রুষাকে হারানো সহজ হবে। ও নিজে কখনই হারতে চায়নি। অথচ, রুষাও হারতে চায় না বলল।

বড়া মসজিদের কাছাকাছি আসতেই হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল শামীমের নিত্য-নৈমিত্তিক বিদ্বেষ ও রসিকতার পাত্র গিয়াসুদ্দিন মৌল্‌ভী হন্তদন্ত হয়ে তার সাইকেল জোর ছুটিয়ে এদিকেই আসছে।

ভুচু বলল, এ শালা এই ঘটনাব পেছনে নেই ত! বলেই, জোরে ব্রেক করল জীপটাকে, প্রায় মৌল্‌ভীর মুখোমুখিই। গিয়াসুদ্দিন প্রায় পড়ে যাচ্ছিল সাইকেল উল্টে। চেঁচিয়ে বলল, বেয়াকুফ্! সব্‌হারাম্।

ভুচু মুখ বের করল পাশ থেকে।

বলল, খাল্-খরিয়াত্ সব ঠিক্কে না মোল্‌ভী সাহাব?

আর্‌রে! পিরথুবাবু ভি হ্যায়! আপ্‌লোগোঁকো তাল্লাসমেই যা রহা থা। শুনা ত আপ্‌লোঁগোনে?

শুনেই ত আসছি।

জল্‌দি জীপ ঘুমাকে হামারা ঘরকা পিছাওয়ালা রাস্তেমে বড়কা ইম্‌লিকা পেঁড় কা নিচে যা কর্ রোক্কিয়ে। ম্যায় আভভি আয়া। তাল্লাস মিলা।

বলেই, মৌল্‌ভী সাইকেলে উঠল। জোবে প্যাডল করেই বলল, ছিপ্‌কর রহিযেগা। কিসিকোভি মালুম নেহি হোনা হ্যায।

ঠিক হ্যায়। আপ্ আইয়ে।

জীপ ঘুবোতে ঘুরোতে ভুচু বলল, হদিস মিলেছে মনে হচ্ছে। আমরা ঠিক সময় মতোই এসেছি। মেয়েটা কেমন আছে কে জানে? রুবাইয়াৎ শোনানোর জন্যে ত' কোনো মেয়েকে কেউ কিডন্যাপ করে না।

পান খাবো ভুচু। কাল দুপুরের পর থেকে পান খাইনি।

পৃথু বলল।

তোমাকে নিয়ে পাবি না আব। এই নাও।

বলেই ড্যাশবোর্ডে হাত চালিয়ে শালপাতার দোনাতে মোডা পান আর সিগারেটেব প্যাকেটেব রাংতাতে মোড়া জর্দা বের করে দিল ও।

পৃথু বলল, একেই ত' বলে চেলা।

জীপটাকে মৌলভীর বাড়িব পিছনের জঙ্গলে জায়গায় নিয়ে গিয়ে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের নিচে লাগিয়ে হেড-লাইট সাইড-লাইট সব নিবিয়ে দিল পৃথু। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মৌল্‌ভী তার বন্দুকটা নিয়ে এসে জীপেব পেছন দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে ঝপাং করে বসে পড়ল। বন্দুকের নলের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল জীপের মাথার লোহার রডের। মৌল্‌ভী একটা মস্ত কাজলদানি বের করে বলল, মুখে, নাকে, কপালে লাগিয়ে নিন। কেউ যেন চিনতে না পারে।

ভুচু বলল, দাঁড়ান। দাঁড়ান!

বলেই, তাডাতাডি নেমে গিয়ে জীপেব নাম্বার প্লেটটা খুলে ফেলে পাদানীর কাছ থেকে গোয়ালিযরেব নাম্বার লেখা একটি নাম্বাব প্লেট বের করে ওরিজিনাল নাম্বার প্লেটটা চেঞ্জ করে দিল।

সকলে মিলে কাজল মেখে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে নেবার পর ভুচু এঞ্জিন স্টার্ট করে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে শুধোল, কোনদিকে? চিলপিব দিকের রাস্তায় ফরেস্ট ডিপার্ট-এর একটা অ্যাবানডানড্ ভাঙা বাংলো আছে। জানেন ত! যে-বাংলোর পিছনের জঙ্গলে সেভেনটি-ওয়ান্-এ সাবীর মিঞা বড় বাঘ

মেরেছিল হাঁকোয়াতে ?

হ্যাঁ।

সেখানে নিয়ে গেছে ? নুরজাহানকে ?

হ্যাঁ।

কে, মানে কারা ?

ভগয়ান শেঠ-এর ব্যাটা লালটু আব তার ইয়াররা।

জীপে করে ?

হ্যাঁ।

আপনার জীপের এঞ্জিন এবং আলো কিন্তু ভাঙা বাংলোর কিছুটা আগেই যে চড়াই আছে, সেখানেই বন্ধ করে দিয়ে জীপ অন্ধকারে গড়িয়ে নামাতে হবে। তারপব এক-ফার্লং মতো দূরে জীপটাকে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে যেতে হবে আমাদের। খাত্‌রা আছে। কিন্তু নুরজাহানের ইজ্জৎ ! শামীম ভাইয়ের ঈজ্জত। কোনোই উপায় নেই। আমবা কুরবানী হলে, হবো। পুরুষের জান্ ত ভালকাজে কুরবানী হবার জন্যেই।

থানায় খবব দিলেন না কেন ? ফোর্স নিয়ে আসত। আইন কি নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া ভাল ?

পৃথু বলল।

ফুঃ। থানা ! থানা ত বড়লোকদের পকেটে। যেমন এখানে, তেমনই পাকিস্তানেও। যার উপায় আছে এবং সাহস আছে তাব পক্ষে নিজের হাতে আইন তুলে না নিলে কোনো অন্যায়েরই মোকাবিলা হওয়া সম্ভব নয়। এদেশে, এখনও অন্তত নয়। মেয়ের ঈজ্জৎ চলে যাবার পব শামীম কি দশ বছব ধরে আদালত আর উকীল করবে ? সেখানেও ত যার পয়সার জোব সেই-ই জিতবে।

জোরে ছুটে-চলা জীপ থেকে মুখ বার কবে পানের পিক ফেলে পৃথু বলল মনে মনে, তা ঠিক ! বঙ্কিমবাবু সেই কবে লিখে গেছিলেন, "আইন ! সে ত তামাশামাত্র ! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ কবিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।"

বেশ লাগছে পৃথুর। কত্তদিন ব্যক্তিগত বিপদেব মুখোমুখি হয়নি ও। শিকার ছেড়ে দিয়েছে বহু বছরই। ব্যক্তিগত বিপদের সামনাসামনি হলে বেশ চনমন করে ওঠে রক্ত। জানা যায় যে, এখনও মরে যায়নি পুরোপুরি, সংসার, রুজি-রোজগার আর একঘেয়েমির চাপে ! ভাল লাগছে। খুবই ভাল লাগছে পৃথুর। জোরে ছুটে-চলা জীপে বসে রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ও বলল, থ্যাঙ্ক উ্য ভুচু !

মিনিট পনেরো প্রচণ্ড জোরে জীপ চালিয়ে সেই চড়াইটার কাছে গিয়ে জীপ পৌঁছল। বাংলোটার দিক থেকে চড়াই। এদিক থেকে গেলে উৎরাই। জীপের সব আলো আর এঞ্জিন বন্ধ করে চোখকে অন্ধকারে সইয়ে নিল ভুচু। অন্যরাও। এই উৎরাই নেমেই একটি কজ্‌ওয়ে আছে। সেখানে স্টীয়ারীং একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই জীপটা নালাতে পড়ে যাবে। ওরা তিনজনেই সামান্য সময় চুপ করে বসে থাকল চোখ বন্ধ করে। তারপর চোখ খুলতেই ঝাপসা ঝাপসা দেখা যেতে লাগল রাস্তা : গাছ-পালা। এখানে ঝাঁকড়া সব শালগাছ। এই জায়গাটা পেরুলেই আরও পরিষ্কার দেখা যাবে চারধার। চাঁদও উঠেছে একটু। আজ অষ্টমী-নবমী হবে।

জীপটা গড়িয়ে নামছে। সেকেণ্ড গীয়ারে দিয়ে রেখেছে ভুচু। জীপের লোহার বডির শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু গুটুর-গুটুর। আর ক্যানভাসের পর্দার পৎ-পৎ। ওরা সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে। কজওয়েটাও পেরিয়ে গেল জীপটা আস্তে আস্তে। ওটা পেরিয়েই পথের পাশে একটা সমান জায়গা দেখে ভুচু ঝোপ-ঝাড় ভেঙে ঢুকিয়ে দিল বাঁদিকে জীপটাকে। তারপর নেমে পড়ল।

ফিসফিস করে বলল, পাস-ওয়ার্ড মাইকাল্।

মাইকাল্।

মাইকাল্।

অন্ধকারে ফিসফিস করে বলল ওবা দুজন। পৃথু আর মৌলভী।

তারপর তিনজনে আলাদা হয়ে ছড়িয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে বনবাংলোর দিকে। কিছুটা যেতেই দেখা গেল বাংলোটাকে। শীতের অল্প চাঁদের কুয়াশাভরা রাতে পোড়ো বাংলোটাকে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। একটা দিক ভাঙ্গা। বারান্দা, এবং চারটি থামের মধ্যে তিনটিই ভেঙে গেছে। মধ্যে থেকে টর্চ-এর আলো ফুটে বেরোচ্ছে। এই পথে কোনো যানবাহন যায় না। চোরা-শিকারি আর ডাকাতরাই ব্যবহার করে রাতের বেলা। দিনের বেলা পাহাড়-জঙ্গলের ভিতরের গ্রামের মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে হেঁটে যায়।

হঠাৎই চোখে পড়ল একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে।

পৃথু দেখতে পেল, ভুচু বাঁ হাতে বন্দুকটাকে ধরে ডান হাত দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে জীপটার দিকে এগোতে লাগল। পেছনে পেছনে গিয়াসুদ্দিন তার ধবধবে সাদা পোষাকে। এই পোষাকের কারণেই মোরগা-মারা মৌলভী আজ ফৎত হয়ে যাবে দুশমনদের হাতে। জীপের ডানদিকের পেছনের চাকার হাওয়া খুলে দিল ভুচু। ফুসসস্—স্-স্ শব্দ করে হাওয়া বেরুতেই কে একজন জীপ থেকে লাফিয়ে নামল। তাব হাতে মস্ত একটা ছোরা। ঐ স্বল্প আলোতেও চকচক করে উঠল সেটা। ভুচু লোকটার বুকের সঙ্গে বন্দুকটা এগিয়ে দিয়ে লোকটার একেবারে বুকে নলটা ঠেকিয়ে দিল। ঠিক সেই সময়ই মৌলভী কাণ্ডটা ঘটাল। হঠাৎ লোকটার পেছন পৌঁছে অতর্কিতে তার মোটা শক্ত বাঁ হাত দিয়ে লোকটার গলাটা জড়িয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে তার গলার কাছে কী যেন কী করল। আঁক—আঁ—আঁ—আর-র-র-র করে শব্দ হল একটু। তারপরই লোকটা কাটা-পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগল মাটিতে পড়ে গিয়ে। মৌলভীর সাদা কুর্তার বুকের কাছটা লাল রক্তর ফিনকিতে ভরে গিয়ে কালো দেখাল অস্পষ্ট আলোতে।

যেন এক্ষুনি একটি মোরগাই জবাই করেছে সে, এমন ভাবেই মৌলভী জবাই-করা লোকটাকে ফেলে রেখে বাংলোর দিকে এগোল।

পৃথুর গা গুলিয়ে উঠল। রুষা ঠিকই বলে। ও একটা জংলীই। জংলী। খুনী। নইলে সে এসব লোকের সঙ্গে মেশে কেন? মৌলভী এক্ষুনি একটা লোককে ঠাণ্ডা-রক্তে খুন করল। এ লোকটা হয়ত ওদের মাইনে করা ড্রাইভারই। কে জানে? লোকটা হয়ত নুরজেহান সম্বন্ধে কিছুই জানে না। হয়ত ওরা নুরজাহানকে নিয়ে আসার পরেই ও জীপ চালিয়ে নিয়ে এসেছে ভগয়ান শেঠের ছেলেকে। কিন্তু মস্ত বড় ছোরাটা? ছোরা বের করল কেন সে?

বমি-বমি পাচ্ছিল পৃথুর। এই সব মানুষগুলোর সঙ্গে এই ঘোলা রাতে তার মতো মানুষ কি করছে? সমাজ ত তাকে অন্য এক নিরাপদ সম্মানের জায়গায় বসিয়ে রেখেছিলই ... তবু ...

পৃথু বাংলোটার ডানদিকে চলে গেল। জীপ থেকে নেমেই দুটি ম্যাগাজিনই গুলিতে লোড করে নিয়েছিল। একটি জার্কিনের ডান পকেটে রেখে অন্য ম্যাগাজিনটি পিস্তলে লোড করে নিল। এবার কোমরের হোলস্টার থেকে টেনে বের করল পিস্তলটাকে। ডান হাতে ধরে এগোল। আশা করল, নিজেকে বাঁচাবার কারণ ছাড়া তাকে গুলি চালাতে হবে না।

রঘবীর! রঘবীর! বলে, ডাকতে ডাকতে একটা লোক বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ঐ স্বল্প আলোতেও দেখা যাচ্ছিল লোকটার চেহারাটা ছিপছিপে। সরু কোমর। লম্বা। গোঁফ আছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। এরা পালোয়ান নয়। কিন্তু ডাকাতদের চেহারা এরকমই হয়। শরীরে প্রচণ্ড শক্তি ধরে লোকটা।

লোকটা আবার ডাকল, রঘবীর! রামকা বটল লাও। শো গ্যয়া ক্যা হারামজাদা?

রঘবীর নিশ্চয়ই ড্রাইভারটির নাম।

তার কাছ থেকে কোনোই উত্তর না পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে লোকটা ভিতরে চলে গেল। ফিরে এল রাইফেল হাতে। তারপর নেমে এল বাংলো থেকে।

ভুচু ঝোপের মধ্যে পৃথুর শেয়ালে-রঙা আলোয়ান গায়ে মিশে গেছিল। লোকটা ওকে পেরিয়ে যেতেই বন্দুকের নল ঠেকিয়ে দিল ও আবারও তার পিঠে।

বলল, হ্যাণ্ডস আপ। জারা সে হিলনেসেই গোলিসে ভুঞ্জ দেগা।

লোকটি রাইফেল-ধরা হাতটা ওঠাতে ওঠাতেই পেছনে ঘাড় ঘোড়াচ্ছিল। হুঁশিযার, ধূর্ত, সাহসী লোকটা। কিন্তু মোটা, চলচ্ছক্তিহীন মৌলভী আবারও চিতাবাঘের মতোই ক্ষিপ্রতায় এক লাফে তার ঘাড়ে চড়ে এক মুহূর্তের মধ্যে তাকেও জবাই করল। আচমকা গলায় ছুরি খেয়েই রাইফেলের ট্রিগারটা টেনে দিল লোকটা। নিজেরই অজান্তে আকাশের দিকে গুলি গেল। গম্ গম্ গম্ করে উঠল নিস্তব্ধ-রাতের গহন জঙ্গল।

সঙ্গে সঙ্গে ভুচু আর মৌলভী ছিটকে গেল দুদিকে। পৃথু একা এগিয়ে যেতে লাগল দ্রুত বাংলোর পেছন দিকে। ওদের আসল কাজ নুরজাহানকে উদ্ধার করা। প্রথমেই খুনোখুনি শুরু করে দিল ওরা। মেয়েটাকে যদি প্রাণেই মেরে দেয় ? ইমম্যাচিওরড, ট্রিগার-হ্যাপী লোক এই মৌলভী!

গুলির শব্দ হতেই ভিতর থেকে দুজন বন্দুকধারী লোক ছুটে এল। এবং বারান্দা থেকে নেমে লোকটি যেখানে পড়েছিল সেদিকে বন্দুক তাক করে সাবধানে এগিয়ে আসতে লাগল।

পৃথু শুনল, ছটফট করা লোকটা রক্ত কুলকুচি করা ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকল, সিরকাস্ত, সিরকান্ত।

জিন্দা হ্যায় আভ্‌ভিতক। খতম কর দো উসকো। পাকাড় যানেসে····

দ্বিতীয় লোকটি বলল।

প্রথম লোকটি তার বন্দুকের নল তারই সঙ্গীর কপালে ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। আহত ডাকাত অন্য ডাকাতের কাছে সাংঘাতিক বিপদের। তাকে ফেলে রাখা যায় না আহত অবস্থায়।

গুলি হতেই গুলি-খাওয়া লোকটি পা দুটি টানটান করে ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যে লোকটি গুলি করল, সে নিচু হয়ে ওর পড়ে যাওয়া রাইফেলটা তুলে নিতে যাবে যখন, ঠিক তখনই ভুচু চকিতে পর পর দুটি ব্যারেলই ফায়ার করল। হঠাৎ ওড়া তিতির কী বটের ফ্লাইং মারার মতো করে। টাঙ্গীর কোপ-খাওয়া পলাশগাছেরই মতো তারা ধপাস্ ধপাস্ করে পড়ে গেল।

পৃথু এবার দৌড়ে গিয়ে পেছনের জানলা দিয়ে উঁকি মারল। দেখল, একটি ধবধবে ফর্সা, ছিপছিপে মাথা ভর্তি কালোচুলের মেয়ে শুয়ে আছে। পৃথুর দিকে মাথা। তার মুখের মধ্যে রুমাল গোঁজা। হাত দুটিকে দু দিকে টান করে বাঁধা জানালার শিকের সঙ্গে। সম্পূর্ণ অনাবৃতা। একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে মেয়েটির পাশে বসে উদ্বেগে বাইরে চেয়ে আছে। ঘরে আর অন্য কেউই নেই।

পৃথু ঘুরে গিয়ে একদৌড়ে ঢুকল ঘরে। ঢুকতেই ছেলেটি ধড়মড় করে উঠে বসে পৃথুকে দেখেই বলল, আমাকে মেরো না। আমি কিছু ক্ষতি করিনি মেয়েটার। এই ডাকুরা আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার করে টাকা নিল, এক একজন। নিয়ে মেয়েটাকেও ওরাই····

এমন সময় মৌলভী আর ভুচু ঘরে ঢুকল এসে দৌড়ে।

ভুচু, তোমার আলোয়ানটা দাও ওকে।

পৃথু বলল।

ভুচু লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে চোখ করে আলোয়ানটা নুরজেহানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ওর হাতের বাঁধন খুলতে লাগল। মুখ থেকে রুমাল টেনে বের করল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেল নুরজেহান, গোঁ গোঁ আওযাজ করতে করতে। অজ্ঞান হবার আগে ওর চোখ দুটিতে আতঙ্ক, বিস্ময় এবং এক নিমেষের স্বস্তি জ্বল জ্বল করে উঠল। তার পরই নিভে গেল।

ভুচু বলল, ক্যা রে, ভগয়ান শেঠকা বেটা!

হামারা কুছ কসুর নেহী। ম্যায় মজা ভি নেহি লুটা, মেরী পয়সা ভি লোগ খা লিয়া।

কাঁহাকা ডাকু থা উ লোগ ?

মোরেনাকা।

জীপকা নাম্বার প্লেট ভ হিয়াঁকাই হ্যায়।

উ লোগ বদল লিয়া থা।

কিত্‌না রূপাইয়া দিয়াথা তুমনে ?

এক এক কো পাঁচ পাঁচ হাজার!

পৃথু বলল। তাড়াতাড়ি চল, মেয়েটাকে নিয়ে। এখানে সময় নষ্ট করার সময় নেই।

হঠাৎ লালটু সিং অপলকে তাকাল পিরথুর দিকে। ওর গলার স্বরে চমকে গিয়ে। হঠাৎ হাত-জোড় করে পৃথুর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে বলল, ম্যানিজার বাবু! ঘোষ সাহাব। আপকো ম্যায় পহচান্ লিয়া। মেরী জান্ আপ বাঁচা দিজিয়ে ম্যানিজার সাহাব। মেরী পিতাজী আপকো আমীর বনা দেগা। জিন্দগী ভর আপকো নোকর বনকে রহেগা ম্যায়। ম্যায় কুছ্ কিয়া নেহী। ছোঁনে ভি নেহি দিয়া ছোকরী কো উ ডাকু লোগ।

ওরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

পৃথু বলল, ওকে বাইরে নিয়ে চলো ত ভুচু। আর মৌলভী, আপনি মেয়েটাকে কাঁধে করে নিয়ে আসুন।

হঠাৎ মৌলভী তার বন্দুকের ঠাণ্ডা, কালো, স্টিলের মৃত্যুবাহী নলটা লালটু সিং-এর বাঁদিকের জুলপির একটু উপরে কানের পাশে ঠেকিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিল।

ছেলেটা হাত জোড় করেই ঢলে পড়ল ভাঙা বারান্দায়। পেচা আর চামচিকেরা একসঙ্গে হল্লাগুল্লা করে উঠল খুব জোর চাবধার থেকে।

পৃথু বলল, হতভম্ব হয়ে গিয়ে ওকে মারাব কি দরকার ছিল মৌলভী সাব? খুন করে কি আনন্দ পান আপনি?

বিরক্তি ফুটে উঠল ওর গলায়।

মৌলভী গিয়াসুদ্দিন ঠাণ্ডা চোখে তাকাল পৃথুর মুখে। বলল, ও যে আপনাকে চিনে ফেলেছিল। নিজেদের বাঁচতে হলে অন্যকে মারতেই হয়। এত ছেলেখেলা নয়। আপনি কি সবই বোঝেন ঘোষ সাহেব?

উত্তব দিলো না পৃথু।

ভুচু তার জীপের ফলস নাম্বার প্লেটটা খুলে এনে ডাকাতদের জীপের পেছনে লাগিয়ে নিজের নাম্বার প্লেট আবার লাগিয়ে নিল। তারপর দৌড়ে সকলে মিলে ওদের জীপে ফিরে ফিরে যেতেই ভুচু জোরে জীপ চালাল।

ভুচু! মৌলবী বলল, আমার বাড়ির কাছের তেঁতুলতলায়ই দাঁড়িও। আমি আমার দুই বিবিকে একটা বোরখা নিয়ে আসতে বলব। তারপর নুরজেহানকে বোরখা ঢেকে নিয়ে যাবো আমার বাড়িতে। শামীম আর তার বৌকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন ভুচুবাবু।

ড্যাশবোর্ড খুলে ভুচু বলল, পান খাও পৃথুদা।

মৌলভীর বাড়ি থেকে তার বিবিরা এসে নুরজেহানকে কোনোক্রমে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল বোরখা-ঢাকা দিয়ে।

ভুচু বলল, তুমি জীপটা নিয়ে তোমার বাড়ি চলে যাও পৃথুদা। আমি সাইকেল রিক্সা করে শামীমকে খবর দিয়ে আবার সাইকেল-রিক্সা করেই তোমার বাড়ি আসছি। সেখান থেকে জীপ নিয়ে যাব। গারাজে গিয়ে দেখতে হবে রক্ত-টক্ত লাগল কী না কোথাও।

ঠিক আছে।

নিজের বাংলোর দিকে আস্তে আস্তে জীপ চালিয়ে যেতে যেতে পৃথু ভাবছিল মৌলভীর পাঞ্জাবীতে রক্ত ভরে আছে। ওকে কি দেখল কেউ? ওর হাতেও রক্ত। কত মানুষের হাতই রক্তমাখা। কোনো রক্ত দেখা যায়, কোনো রক্ত দেখা যায় না। ভগয়ান শেঠ আর লালটু সিংদের নিজেদের হাত কখনও রক্তাক্ত হয় না। যা কিছু করে তারা অন্যদের দিয়ে করায়। পৃথু একদিন লক্ষ্য করেছিল যে, ভগয়ান শেঠ নিজে হাতে টাকা খরচ পর্যন্ত করে না। খরচ করার জন্যেও কর্মচারী আছে। যারা বড় বড় শেঠ তারা নিজেরা রক্তেরই মত, টাকা দিয়েও নিজেদের হাত দূষিত করে না।

জীপটা পোর্টিকোতে ঢুকিয়ে জীপ থেকে নামতেই দেখল রুষা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। চান

করেছে। হলুদ আর কালো ডোরা কাটা ধনেখালি শাড়ি পরেছে একটা। হলুদ ব্লাউজ। চুলে হলুদ ক্রীসানথিমাম ফুল গুঁজেছে। দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে তার বউকে, বেনে-বৌ পাখির মতো। বিজলীর চেয়ে অনেকই বেশি সুন্দরী রুষা। বিজলীর শরীরই আছে। রুষার সৌন্দর্যে মনের সৌন্দর্য,বুদ্ধিমত্তা, পরিশীলনের ছাপ পরিস্ফুট। সৌন্দর্য ত শুধু মুখ চোখ বুকে হয় না, মনের আলোয় আভাসিত না হলে সৌন্দর্য বীজের মতোই সুপ্ত থাকে, ফুল হয়ে ফুটে ওঠে না।

কি হল? পেলে খোঁজ?

বলতে গিয়েও পৃথু চুপ করে গেল। ভুচুই এসে বলুক যা বলার। মিথ্যে কথা ভাল করে বলতে পারে না পৃথু। চোখের পাতা কেঁপে যায়, মুখের ভাব পাল্টে যায়।

বলল, ভুচু সব জানে। মেয়েটিকে ওরা উদ্ধার করেছে।

কিছু করেনি ত মেয়েটিকে?

এতক্ষণ সময় বয়ে গেল। করে, কী আর নি?

কি করেছে?

মেয়েদের নিয়ে পুরুষরা যা করে এসেছে চিরদিন। তফাৎ এই-ই যে অনিচ্ছায় করেছে, জোর করে, যা সুন্দর তাকে কদর্যতা দিয়েছে। করার জন্যেই ত ধরে নিয়ে গেছিল।

কী জংলী! কী খারাপ!

সব পুরুষই জংলী। তাদের জংলামো সুপ্ত থাকে। এই সুপ্ততা অক্ষত রেখে যারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, ভালত্বর তক্‌মা তাদের জন্য। যারা পাবে না তাদের গায়ে খারাপত্বর টিকিট লাগে।

উঃ। ঘাস্ট্‌লী ব্যাপার স্যাপার। হাটচান্দ্রা জায়গাটা খুবই আনসেফ হয়ে উঠছে দিনকে দিন।

সব জায়গাই সমান। বড় বড় শহর এর চেয়েও খারাপ। সে সব জায়গায় প্রতিদিনই এরকম কত ঘটনা ঘটছে। আমরা জানতে পারি না, তাই।

ভুচু আসছে?

হ্যাঁ।

ওকি খাবে এখানে?

খাবে?

অবাক হল পৃথু।

বলল, খেতে পারে, যদি তুমি খেতে বলো। ও ত নিজেই রান্না করে খায়।

তবে খাবে। খিচুড়ি ত বেশি করেই করেছে।

তুমি চান কববে না?

চান? রাতে ত করি না, তবে আজ....

গরম জল আছে গীজাবে। চালিয়ে রেখেছি। চান করে নাও। নোংরা হয়ে থাকলে আমার....

রুষার মুখে তাকাল পৃথু। বেনে-বৌ পাখিটি আজ বেড়ালের হাতে স্বেচ্ছায় ছিন্নভিন্ন হতে চায়। হোক। দিগা ঠিকই বলে। "বিধিহু ন নারী গতি জানী।"

ও যখন বাথরুমে তখন ভুচু এল। পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে বেরিয়ে দেখল রুষার সঙ্গে ভুচু বসে আছে। রাম নিয়ে এসেছে ভুচু একটা। রুষাও নিয়েছে একটু।

ভুচু বলল, এসো দাদা।

রুষা বলল, ড্রিংকস-এর সঙ্গে তোমাদের টিট্‌-বিটস কি দেব কিছু., না, একবারেই খাবে?

ভুচু বলল, না না। খেয়ে নেব একেবারে। নাও পৃথুদা বড় করে একটা ঢেলে দিচ্ছি।

রুষা বলল, তারপব?

তারপর আর কি? দু দল ডাকাতে বোধহয় রেষারেষি ছিল। অন্য দল এদের মেরে দিয়ে গেল। নুরজাহানকে যে নিয়ে যায়নি সঙ্গে এই-ই ভাল।

ঐ ডাকাতগুলো তাও ভাল বলতে হবে। নইলে কি আর মেয়েটাকে ছেড়ে দিত?

ভুচু একটা চুমুক দিয়ে বলল, ডাকাতদের মধ্যেও ভালমন্দ থাকে বইকী, ভাল মানুষদেরও যেমন

থাকে। থাকগে মরুকগে ডাকাতরা, এই ঘটনার জন্যে আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল এইটেই আমার লাভ। পৃথুদা ত সবসময়....

রুষা গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, কি ? সবসময় আমার নিন্দা করে ?

নিন্দা ? কখখনো না। আপনার এত বেশি প্রশংসা করে সকলের কাছেই যে আমার সন্দেহ হত যে আপনি সত্যি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য কী না আদৌ।

প্রশংসা করে ? আমার ? স্ট্রেঞ্জ !

কেন ? স্ট্রেঞ্জ কেন ? আপনার সঙ্গে মিশে এখন বুঝতে পারছি যে হাটচান্দ্রার সকলেই কেন আপনি বলতে পাগল। আমি গাড়ির মিস্ত্রী, আমার কথা ছাড়ুন। তবে ভাল লাগাতে যোগ্যতা লাগে নিশ্চয়ই, ভাল লাগতে লাগে না।

বাঃ। চমৎকার বলেছেন।

পৃথুর ভীষণ ভাল লাগছিল। এই রকম ঘর, এই রকম স্ত্রী, তার অশিক্ষিত, জংলী, বুনো বন্ধুবান্ধবদেব তার বাড়িতে এইবকম অবারিত দ্বারই তার স্বপ্ন ছিল। আজ তার স্বপ্ন সত্যি হল। কে করল, সত্যি ? বিজ্‌লী। আশ্চর্য। বেচারী বিজ্‌লী।

খাওয়া দাওয়ার পর ভুচু চলে গেল জীপ নিয়ে। পৃথু বলল, এসো আমার ঘরে। রুষা খাটে এসে বসলে, দরজা বন্ধ করে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল।

পাখি যখন নিজেই ছিন্নভিন্ন হতে ইচ্ছা করে তখন বেড়ালে আর পাখিতে খুব ভাব হয়ে যায়।

ভাব ভাব কদমের ফুল।



নূরজাহানকে যেদিন উদ্ধার কবা হল তার পরের পরেব দিন সকালে, কাগজ খুলে পৃথু একেবারে থ'। প্রথম পাতায় বাঁদিকে বিবাট হেডলাইন। "নটোরিয়াস ড্যাকয়েট গ্যাংগস্ কনফ্রন্ট ইচ্ আদার। ফোর কিলড। রিচ বিজনেস ম্যানস কিডন্যাপড সান, ওলসো মারডারড"। তার নিচেই মৃত ডাকাত এবং লালটু সিং-এর শবের ফোটো। কুখ্যাত ডাকাত মগনলালের দলের চারজন ডাকাতকে খুন কবে গেছে ডাকু শেব সিং-এর দল চিলপিব পথের এক পরিত্যক্ত বনবাংলোয়। তবে, ডাকু মগনলাল নিজে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। সেও ছিল দলে। মনে হয় মগনলালের দলই হাটচান্দ্রার বড় বানিয়া ভগয়ান শেঠ-এব ছেলে লালটু সিংকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছিল। পরে র‍্যানসম আদায় করার জন্যে। শেব সিং ডাকু, তার দুজন সাকবেদ মোটেলাল এবং সাঁওয়া এই তিনজনেই মগনলালেব দলের চারজনকে খতম কবে গেছে। দলের দুজনকে মারা হয়েছে নৃশংসভাবে জবাই করে। ছুরি দিয়ে। অনুমান করা যাচ্ছে যে, এ নিশ্চয়ই মোটেলালের কাজ। কারণ, মোটেলাল এ কাজে সিদ্ধহস্ত। ইচ্ছে কবলে ছুরি দিয়ে নাকি সে জ্যান্ত বাঘও জবাই করতে পারে। এখন যা দেখা যাচ্ছে তাতে আশা হয যে, এই দুদল নিজেদেব মধ্যে খেয়োখেয়ি করে নিজেরাই শেষ হয়ে যাবে। হাটচান্দ্রা এবং তার লাগোয়া চারদিকেব এলাকাতেই এতদিন ডাকাতের উৎপাত একেবারেই ছিল না। এই শান্তিপূর্ণ এলাকাতেও এই সব ঝামেলা আরম্ভ হল যে, এটা বড়ই দুঃখের।

খবরের কাগজওয়ালাবা এই খবব পেয়েছেন ভোপালের পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মুখপাত্র

মারফত।

পৃথু বিছানাতে তড়াক্ করে উঠে বসল। ভাল করে দু চোখ কচ্‌লাল। তারপর দুখীকে ডেকে কাগজটা পাঠিয়ে দিল রুষার কাছে, খাওয়ার টেবলে রোজ যেমন দেয়। রুষা, কুক্ লছমার সিংকে সারাদিনের রান্নার ইনস্ট্রাকশন দিতে দিতে খাওয়ার টেবলে বসেই চা খায়।

কিছুক্ষণ পর রুষাও দৌড়ে ঘবে এল। বলল, দেখেছো। কী কাণ্ড। হাটচান্দ্রাতেও এই সব শুরু হল। এই ব্যাপারের সঙ্গে তোমাদের শামীম মিঞাব মেয়েকে ধবে নিযে যাওযাব কোনো সম্পর্ক নেই তো?

পৃথু বলল, কার সঙ্গে কার সম্পর্ক? তবে, নুবজাহানকে ত আমবা পথেব পাশে গাছতলায় পেযেছি, জঙ্গলের মধ্যে। দু দলের কোনো একদল ডাকাতরাই যদি তাকে ফেলে গিয়ে থাকে তবে অন্য কথা। তা মেয়েটাই ত বোবা হয়ে গেছে। এসব কথা জানা আব যাবে কি করে?

কী সর্বনাশ! তোমরাও ত পড়তে পারতে ডাকাতদের মুখোমুখি। কী হত তাহলে?

কী আবার হত? আমরাও ত ডাকাতই। পড়লে, তাদের দুদলকেই শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

তোমার শেষ এমনি করেই হবে কোনোদিন। যেমন তোমার চেলা-চামুণ্ডা বন্ধু-বান্ধব! আ ম্যান ইজ নোন বাই দ্যা কম্পানী হী কীপস।

তা ঠিক। পৃথু বলল। অ্যাবসলুটলী বাইট।

কাবখানায় যাওয়াব আগেই ফোন এল একটা। পৃথুব টেলিফোন বড একটা আসে না বাড়িতে। এলেও, ও নিজের লেখাপড়া নিযেই নিজের ঘবে বুঁদ থাকে বলেও এত দূব হেঁটে এসে ড্রইংরুমে ফোন ধরতে ইচ্ছাও করে না। চিন্তার জালও ছিঁড়ে যায়। তবু, আজকের কাগজের খবর এবং ভুচুর হঠাৎ ফোন! তাই-ই অগত্যা উঠে গিযে ধবতেই হল।

পৃথুদা!

ও পাশ থেকে ভুচুর উত্তেজিত গলা ভেসে এল।

দেখেছো?

হুঁ।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিল পৃথু। ক্যাজুয়ালি।

রুষা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিযেছিল পৃথুর মুখেব দিকে।

কি হুঁ?

বিরক্ত গলায় বলল ওপাশ থেকে ভুচু।

আরে, বললামই ত গাড়িতে কোনোই ডিফেক্ট নেই।

পৃথু বলল।

বলছটা কি তুমি? খবরের কাগজ পড়োনি?

উত্তেজিত হয়ে ভুচু আবাব বলল।

তা আর বলতে, তোমার গাবাজের মতো ভাল কাজ হাটচান্দ্রাতে আর কোনো গারাজেই হয় না। তোমার মিস্ত্রীরা সব এক-একটি জিনিয়াস! আমরা কি আর জানি না সে কথা।

তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি? কী সব যা-তা বলছ।

মাথা খারাপ! ওটা একটা ফ্যাকটরই নয। তোমার বিল ত খুবই রীজনেবল্। আমার অফিসে চলে এসো এগারোটা নাগাদ, বিল পাস করে দেব।

কি হচ্ছেটা কি, পৃথুদা?

হবে হবে। নিশ্চয়ই হবে। ঠিক এগারোটায় এসো। আমি আমার ঘরেই থাকব।

বলেই, খটাং করে ফোন রেখে দিল পৃথু।

রুষা ভুরু কুঁচকে বলল, আমি জানতাম। এত পৃথুদা পৃথুদা করে কি এরা এমনি এমনি? সবই স্বার্থ। একশ টাকার কাজ ক'রে পাঁচশ টাকা বিল করে নিচ্ছে। কম্পানীর অ্যাকাউন্ট। তোমারই বা কি আর তোমার ব্লু-আইড বয় ভুচুরই বা কি?

পৃথু, হঠাৎ রুষার দিকে ফিরে বলল, তা ঠিক। কম্পানীর হয়ত কিছুই নয়, আমাদের দুজনেরও

কিছু নয়। বাট ইটস্ নান্ অফ্ ইওর বিজনেস্ আইদার।

মনটা বড়ই উচাটন হয়েছে। খবরের কাগজ পড়ে। এখানের পুলিশই শুধু নয়, ভোপালের পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সেও এই খবব পৌঁছেচে। পুলিশ কি তাদের চিনে ফেলেছে ? না কি অপদার্থ পুলিশ সত্যকে খুঁজে বের করতে না পেরে এই সহজ মিথ্যা চাল চালল ? কাগজে যাই-ই ছাপা হয়, তাই-ই ত আর সত্যি নয়। হয়ত কমটুকুই সত্যি।

একটু তাড়াতাড়িই সেদিন বেরুলো পৃথু। কারখানায় পৌঁছে একটা চক্কর লাগিয়ে এসে অফিসে বসল।

অফিসের বারান্দাতে ইতোয়ারিন্ বসেছিল। গুগ্নার বউ। গুগ্ন. প্রেস-মেশিনে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল। হাসপাতালে ছিল মাসখানেক। ছাড়া পেয়ে বাড়িতে গেছে। তাও এক মাস হতে চলল।

ওর বউকে দেখে ডাকল পৃথু।

কি হল রে ? ইতোয়ারিন্ ?

ওর শরীরটা ভাল নেই সাহাব।

ঘা সারেনি এখনও ?

ঘা সেবেছে। কিন্তু বুকে একটা ব্যথা ব্যথা হচ্ছে।

ডাগদার দেখালি না কেন ?

ডাগদারবাবু ত বাড়ি যাবেন না। কম্পাউণ্ডারবাবুকে নিয়ে গেছিলাম। ওষুধ দিয়েছেন একটা। মিক্‌চার। তাতেও ভাল হলো না। আপনাকে একবার দেখতে চেয়েছে সাহাব। আজ-কালের মধ্যেই একবার যেতে বলেছে আপনাকে। জঙ্গলে জঙ্গলে মোটে দু মাইলের ত পথ। হেঁটেই যেতে হবে। গাড়িটাড়ি যায় না আমাদের বস্তীতে। পথ নেই। যখনই বলবেন, আমি এসে নিয়ে যাব।

তোমার নিয়ে যেতে হবে না। বস্তীর নামটা কি যেন, ভুলে গেছি।

সাজাতারি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। সাজাতারি। আমার চিনতে অসুবিধে হবে না। দুএকদিনের মধ্যেই যাব আমি।

হাঁ। সাহাব।

ঠিক আছে। পৃথু বলল।

আরেকটা কথা।

কি ?

ক'টা টাকা লাগবে সাহাব। দু মাস হল ত মাইনে পায় না গুগ্না। আমিও ওকে দেখাশুনা কবতে বাড়িতেই থেকেছি এতদিন। নিজেও কিছু কামাতে পারিনি। বাড়িতে একদানা গমও নেই। জিনৌর বা মকাই পর্যন্ত নেই।

পৃথু কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল ইতোয়ারিন-এর দিকে। তারপর উঠে গিয়ে ক্যাশিয়ারকে বলে, নিজের নামেই দুশটা টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে এসে ইতোয়ারিনকে দিল। কম্পানী থেকে গুগ্নাকে কিছু দেওয়া যাবে না।

টাকাটা পেয়ে ইতোয়ারিনের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, যাচ্ছি সাহাব। আসবেন কিন্তু।

ঠিক এগারোটায় ঝড়ের বেগে ধুলো উড়িয়ে জিপ চালিয়ে এসে ঢুকল ভুচু কম্পাউণ্ডে। জিপটাকে পার্কিং লট-এ পার্ক করিয়ে প্রায় দৌড়েই এল। খাকি, ন্যাবো ট্রাউজার পরেছে একটা। উপরে জিনের ফুলশার্ট। তার উপরে হালকা নীল-রঙা একটি ফুল-হাতা সোয়েটার। পামেলা বুনে দিয়েছে। গায়ে যোধপুরী। ভারী সুন্দর দেখে পৃথু, এই সেল্ফ-মেড ছেলেটাকে। পামেলার বোনা সোয়েটার ত নয়, যেন তার দুটি নরম ভালোবাসার হাতই জড়িয়ে রয়েছে ভুচুকে এই সুন্দর শীতের সকালে। ওর দিকে তাকিয়ে পৃথু ভাবছিল, দূরের আধো-পরিচয়ের ভালোবাসা,

কোর্টশিপ-পিরিয়ডের ভালবাসা ভারী সুন্দর। কাছে এলেই ভালোবাসার রকমটা বদলে যায়। এমন হালকা-নীল থাকে না বোধ হয় আর তার রঙ।

ভুচু ঘরে ঢুকেই পৃথুর উল্টোদিকের চেয়ার টেনে বসল। বসেই একটা সিগারেট ধবালো। তারপর পকেট থেকে শালপাতার দোনায়-মোড়া পান বের করে দিল পৃথুব জন্যে।

পৃথু উঠে ঘরের জানালার পর্দাগুলোকে পুরো সরিয়ে দিল পেলমেট-এর দুই প্রান্তে। বলল, চা, না কফি?

কিছুই না।

কেন? রাগ কেন এত? ভুচুবাবু?

সবসময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না। তার আগে বল সকালে ফোনে তুমি অমন হেঁয়ালি করলে কেন?

শখ করে করিনি। তোমার ইন্টেলিজেন্ট বৌদি হাঁ করে এই ইডিযটের মুখের দিকে চেয়েছিল, সোয়াবিন-একসট্রাকশান প্লাণ্টএর মতো আমার সবটুকু তেল শুষে নেবে বলে। ডাকাত-ফাকাত-এর কথা কি সবার সামনে আলোচনা করা উচিত?

কী ব্যাপাব বলত পৃথুদা? এতো আচ্ছা বিপদেই পড়লাম দেখছি, পরেব ভাল করতে গিয়ে।

পরের ভাল এই জন্যেই করা উচিত নয় কখনও। করলেই বিপদ! তবে, পরের মন্দও কিছু কিছু করেছি আমরা। নির্ভেজাল ভাল আব করা গেল কোথায়?

ছাড়ো ত! একশবার করেছি। একটা বড় ভালোর জন্যে অনেক ছোট মন্দ কাজ করা চলে। তাছাড়া মন্দই বা কেন? পুলিস যা কবত, আর্মি যা করত, আমরাও তাইই করেছি। আমি আর মৌলভী।

এমন সময় ইমম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার শর্মা এসে ঘরে ঢুকল।

পৃথু দাঁড়িয়ে উঠে গুডমর্নিং করল।

পৃথু বলল, ওর বিল-টিল নিয়ে তাগাদা করতে এসেছে ভুচু।

ইমম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার কথা না বলে ইশারায় ভুচুর কাছ থেকে একটা সিগারেট চাইল। ভুচু, সিগারেট দিয়ে, তাতে আগুনও ধরিয়ে দিল। একটান ধোঁয়া গিলে শর্মা বলল, ইয়ে জাগা বড়া খতরনাগ হোতে চলতা হ্যায়।

পৃথু বলল, ছিলোই ত! যেখানে তোমার মত খতরনাগ্ মানুষ বাস করে সে জায়গা ত প্রথম থেকেই খতরনাগ্।

দেখো, ঘোষ সাহাব। মজাক্ মত উড়াও। সাচমুচ্ ইয়ে জায়গাভি ডাকু-এরিয়া বন্ চুকে হ্যায়। যার কাছে পয়সা, ধনদৌলত তারা খুব সাবধান।

পৃথু বলল, শর্মাকে চোখ মিটকে।

লাও। ফিন্ মজাক্ উড়া রহে হেঁ।

একটু চুপ করে থেকে শর্মা বলল, মগনলালের নাম ত শুনে আসছি বহুদিন। তার মাথার উপর ত প্রাইজও আছে। কিন্তু এই মগনলালেরও পায়জামা উতার দিল, এই নয়া ডাকুটি কে? শেব সিং? কঁহা কঁহা সে ঈলোগ্ আতা হিঁয়া, হামারা প্রশান্তি নষ্ট করনে কা লিয়ে, কওন জানে!

তুমি শর্মা সাহেব। একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরই বটে। প্রশান্ত্! ভালই বলেছ কথাটা।

নেহি ত ক্যা? দিল্ হামারা বিলকুল প্রশান্ত্। ডাল-রোটি খাও, অনেস্ট-লাইফ লিড্ করো; প্রশান্তিকা কন্মি কেয়া?

একটু পর শর্মা চলে গেল। শর্মার ভণ্ডামিতে পৃথু পুলকিত বোধ করল, উদ্বিগ্নতার মধ্যেও।

ভুচু সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে উঠে পড়ে বলল, নাঃ এখানে হবে না। যত সব কাবাবমে হাড্ডি। তুমি সন্ধ্যেবেলা গারাজে এসো। নিরিবিলি কথা বলা যাবে।

আজ যে গিরিশদার বাড়ি যাব ভাবছি। একটা ভিজিট ওভারডিউ হয়ে গেছে। আগেই যাওয়া উচিত ছিল। ডেকেছিলেন উনি।

তাহলে, কাল।
হ্যাঁ কাল।
মৌলভীকেও ডাকব না কি?
না। একদম না। বেশ কিছুদিন আমাদের সকলকে ত' বটেই দুজনকেও যেন কেউ না দেখে একসঙ্গে। কী ব্যাপাব হল তা ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।
নুরজেহানকে যে আমরা ওদেব কাছ থেকে উদ্ধার করে এনেছি এমন কথা কেউ বলে দেয়নি ত।
না না। যে বলবে, সে আমাদের সকলেরই মওত্ ডেকে আনবে। আমরা ত ঠিকই করে নিয়েছিলাম যে, সবাইকেই বলা হবে পথের পাশেই আমরা নুরজেহানকে ঐ অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছি। আমাদের অন্য কোরো সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।
মৌলভীর কুর্তাব বক্ত কেউ দেখে ফেলেনি ত?
সে ত নুরজেহানের পা থেকে লেগেছে। সে কথাও ত ঠিক করা ছিল।
দ্যাখো এখন! কেউ বেঁফাস কিছু বলে না ফেলে।
তেমন ত হওয়াব কথা নয়। এমনকি শামীমকে পর্যন্ত বলা হয়নি কোনো কথা। আমরা তিনজন ছাড়া দ্বিতীয় আর কারোরই কিছু জানার কথা নয়।
কী জানি! দেওয়ালেরও কান আছে। জঙ্গলের ত আছেই।
চলি পৃথুদা।
ভুচু দবজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, তাহলে পড়শু?
পরশু।
সন্ধের মুখে গিরিশদার বাড়ি গিয়ে পৌঁছল পৃথু! অনেকদিন আসেনি এদিকে। গিরিশদার ড্রাইভার শ্রীকৃষ্ণকে কথা দিয়েছিল পরশু দিন যাবে বলে।
গিরিশদা বাড়ি ছিলেন না। মুনেশ্বর বলল, বাজারে গেছেন, এই এসে পড়লেন বলে। আপনি এসে ফিরে গেছেন শুনলে খুব রাগ করবেন আমার উপর। বসুন। বাবুর লেখা-পড়ার ঘরেই বসুন। বসবার ঘর এখনও আমার ডাস্টিং করা হয়নি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
আসলে, মুনেশ্বর কথা বলার লোক পায় না। গিরিশদা নিজে ব্যাচেলর হলে কী হয়, মুনেশ্বরের বৌ ছেলেমেয়ে সবই আছে। বলছিল তাদের সঙ্গে দেখা হয় বছরে দেড় বছরে একবার। বাবুকে ছেড়ে যেতে পারে না। গত তিরিশ বছর হল মুনেশ্বর গিরিশদার সঙ্গে-সঙ্গেই আছে। যে-কোনো কারণেই হোক মুনেশ্বর পৃথুকে খুবই পছন্দ করে। হয়ত বাবু আর সাহেবদের মধ্যে ওকে মানুষ বলে সমানে সমানে দেখে এমন লোক কমই জানে মুনেশ্বর। তাইই।
তোমার কাকেরা কেমন আছে? পৃথু শুধোল, গিরিশদার স্টাডিতে বসে।
নেই।
নেই মানে?
বাবু দিন পনেরো আগে সকালে খাঁচা খুলে সবগুলোকে একসঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছেন। কাকেরা গেছে। বদলে, শেয়াল এসেছে।
শেয়াল? অনেকগুলো না কি? সে আবার কি?
না। একটা। একটাই যথেষ্ট। জ্বালিয়ে খেল!
খায় কি?
মাংস। মাঝে মাঝে শামীম সাহেব খরগোস শিকার করে এনে দেয় বাবুর বন্দুক নিয়ে। ইঁদুর ধরে দিই আমি। বাবুকে নিয়ে আর পারি না। বাপের জন্মে শুনিনি কোন ভদ্রলোকে শেয়াল পোষে। বাবু বলেন, একে নাকি উনি অ্যালসেসিয়ান কুকুরের মত ট্রেনিং দেবেন। সস্তায় কাজ সারবেন। বাবুর চিরদিনই এমন। বগলের তলা দিয়ে হাতী চলে যায় যে তা তাঁর চোখে পড়ে না।
কোনো উন্নতি হল? শেয়ালের?
কিসের উন্নতি? হ্যাঁ। একটা উন্নতি হয়েছে। প্রথম প্রথম সন্ধ্যের সময় ও তারস্বরে ঘড়ি-ঘড়ি

আকাশের দিকে মুখ করে হুক্কা-হুয়া করত। জঙ্গল-টাঁড়ের শেয়ালরা ডাকলে ত আর কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলাত। আর সে কী গলা! দিল-ধড়কান্ ডাক। জঙ্গলে টাঁড়ে লেজ তুলে ডাকে, সে একরকম হয়। ভদ্রলোকের বাড়ির মধ্যে থেকে শেয়াল ডাকলে পিলে তো চমকে ওঠেই : উন্নতির মধ্যে এইই যে, হুক্কা-হুয়া ডাকটা দিনকয় হল বন্ধ করেছে। এখন বাইরের শেয়ালের ডাক শুনলে গলা দিয়ে হু হু হু করে একটা চাপা আওয়াজ করে শুধু।

এটা একটা বজ্জাত শেয়াল। পৃথু বলল। যে নিজের জাতেব দোষ গুণ এত সহজে ভুলে যায়, সে বজ্জাতই শুধু নয় বেজাত ; বেজম্মাই।

মুনেশ্বর পৃথুর কথা শুনে হেসে উঠল ফোকলা দাঁতে। সুইট।

বলল, ভালই বলেছেন। শেযালেব আবার জাত, তার আবার জম্ম বেজন্ম!

পরপরই বলল, আপনি বসুন। আমি ততক্ষণে বসবার ঘরটা ডাস্টিং কবে ফেলি।

গিবিশদাব এই ঘরটি সত্যিই দেখবার মতো। কত আর কতরকমের যে বই ঘবটিতে! যে কোনো মানুষের স্টাডিতে ঢুকলেই মানুষটি সম্বন্ধে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও একটি ধাবণা করা যায়। গিরিশদা হচ্ছেন, যাকে বলে একজন মেনি-স্পে্লনডার্ডপার্সন। দোষেব মধ্যে একটিমাত্র। কবিতা লেখা। কবিতা যদি কবিতা না হয়ে ওঠে, গান যদি গান না হয়ে ওঠে তবে যাদের তা শুনতে হয় চাঁদমুখ করে, তাদের বড়ই কষ্ট। কিন্তু নিজে ভাল কবি বা ভাল গায়ক না হলেই যে তিনি কবিতা বা গান বুঝবেন না, এমন কথা নেই। গুণের সঙ্গে গুণগ্রাহিতার কোনোই সম্পর্ক নেই। বরং বেশি সময়ই দেখা যায় যে, গুণীরা নিজেরা নন, শুধু গুণগ্রাহীরাই কোনো বিশেষ গুণকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

টেবলে একটি প্যাড। প্যাডেব উপর বন্ধ করা কলম। একটি শায়ের লেখা আছে। সেটি পডে চমকে গেল পৃথুর।

কুছ খাফাজ্ কি তিলীয়োঁসে ছান্ রাহা
হ্যায় নুর্‌সা
কুছ্ ফিজা কুছ হাস্‌বাতে পবওয়াজ্ কি
বাঁতে করো।

দ্যাখো জ্যোতিরই মত, জেলখানাব গরাদ থেকে কী যেন আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে। এসো, কিছু পারিপার্শ্বিকতা আর কিছু পালাবাব ইচ্ছার কথা বলাবলি করি আমরা।

এ কোন গরাদের কথা এই কবি বলছেন কে জানে? তবে এই গরাদ বা গরাদ চুঁইয়ে আসা এই জ্যোতি অথবা এই অজানা কয়েদ থেকে পালাবার ইচ্ছার মধ্যে কোনো বিশেষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে এক প্রচ্ছন্ন সংগ্রামই যেন স্ফুরিত হয়েছে। চেঁচিয়ে কিছু বলা হয়নি, রাগ করেও নয় ; তবু বলা হয়েছে অনেকখানিই। কবিতা বোধহয় একেই বলে।

এমন সময় গাড়ির শব্দ কানে এলো। গাড়ির দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দও হল। তারপরই মুনেশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গিরিশদা ঘরে এসে ঢুকলেন।

কতক্ষণ এলে ভায়া?

এই ত। বেশিক্ষণ নয়।

বোসো বোসো। জামাকাপড় ছেড়েই আসছি। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর এই সব চোগা-চাপকান পরলেই দম একেবারে বন্ধ হয়ে আসে। শুধু চাকরি থেকেই নয়, চাকরির গন্ধ আছে এমন সমস্ত কিছু থেকেই রিটায়ার করেছি আমি। একজন মানুষেব সত্যিকারের জীবন বোধ হয় রিটায়ার করার পরই শুরু হয়। কি বল? তুমি হয়ত শুনলে অবাক হবে, আমার ভাইপো দিব্যেন মনট্রিয়াল থেকে লিখেছে যে, কানাডাতে প্রফেশানাল মানুষেরা যেমন ডাক্তার আর্কিটেক্ট উকীল অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি সবাই পঁয়তাল্লিশ বছরে রিটায়ার করেন। স্বেচ্ছায়। তার পর যার কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয় তিনি কবিতা লেখেন, যাঁর গান গাইবার ইচ্ছে তিনি গান গান, কেউ ছবি আঁকেন, কেউ শিকার করেন, কেউ প্রেম করেন আবার কেউ বা শুধুই কুঁড়েমি করেন।

কানাডা বলেই পারেন গিরিশদা। পৃথু বলল। এ দেশে যা অবস্থা হয়ে এসেছে, টাকার দাম এবং মানুষের সঞ্চয়ের আসল মূল্য যেভাবে কমে আসছে তাতে চাকুরীজীবীই বলুন আর প্রফেশনাল লোকই বলুন সকলকেই মৃত্যুদিন অবধি, তাঁরা যা করছিলেন, তাইই করে যেতে হবে। হয়ত স্বর্গে গিয়েও ধান ভানতে হবে। নইলে, সংসার চলবে না। আপনার মত সংসারে যাঁরা ফেঁসে যাননি তেমন ভাগ্যবান আর কজন ?

সেটা অবশ্য একটা কথা। সঞ্চয় থেকে যা রোজগার তার উপর ট্যাক্স দেওয়ার পর নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতোই অবস্থা সকলের। বাবার কিছু না থাকলে ব্যাচেলর হয়েও আমার অবস্থাও শোচনীয় হত। ইনকাম ট্যাক্স ওয়েল্‌থ্ ট্যাক্স। গিফ্‌ট ট্যাক্স। মরে গেলেও নিস্তার নেই এস্টেট ডিউটি। এবাব শুনছি এক্সপেণ্ডিচার ট্যাক্সও বসবে।

আপনার টেব্‌লে একটি কবিতা দেখলাম। কার ওটি ?

গিরিশদা টেবলের কছে গেলেন । দেখলেন সেদিকে। তারপর বললেন, তোমার প্রিয় কবিব। ফিবাখ্ গোবখ্‌পুরি।

ওমা ' তাই ই ?

হ্যাঁ। বলেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্বগতোক্তির মতো আবৃত্তি করলেন :

"জারা ভিসাল কে বাদ আইনা এ দেখ্ এ দোস্ত্
তেরে জামাল কে বাদ দোশীজ্‌গী নিখার আয়ি।"

অর্থাৎ এই পরশের পর আয়নাতে ত দ্যাখো একবার বন্ধু, দ্যাখো : তোমার কৈশোরের কুঁড়ি কেমন পরিপূর্ণতার ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

কৈশোর কেন ? উনি কি ?....

হ্যাঁ। উনি ত সমকামী ছিলেন। অনেকেই বলে।

"খর্জ কে খাত্ দিয়ে জিন্দাগী কী দিন অ্যা দোস্ত্
উও তেরী ইয়াদ্‌মে হো ইয়া তুঝে ভুলানে মে।"

বন্ধু বলতে গেলে, আমার সমস্ত জীবনটাই হয় তোমাকে চেয়ে অথবা তোমাকে ভুলতে চেয়েই কাটিয়ে দিলাম।

কেমন ? ভাল না ? এক মিনিট। পায়জামা পাঞ্জাবী পরে এলাম বলে।

দারুণ !

উনি ফিরে এলে পৃথু বলল, আপনি মনে হচ্ছে ফিরাখ্ সম্বন্ধে অনেকই জানেন।

অনেক জানি না। কোনো কবি সম্বন্ধেই কেউ অনেক জানে না। কারণ নিজেকে পুরোপুরি জানতে দেওয়াটা কবি-ধর্মের মধ্যে পড়ে না। তবে ফিরাখ্ আমার প্রিয় কবি, তাইই একটু খোঁজখবর রাখি। এই-ই বলতে পারো। এলাহাবাদের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারে রঘুপতি সহায় ফিরাখ্-এর জন্ম। উর্দু সাহিত্য সম্বন্ধে এক তীব্র উৎসাহ, তাঁর পারিবারিক আবহাওয়াতেই ছিল। ফিরাখ্-এর বাবা ছিলেন মুন্‌শী গোরাখ্ প্রসাদ। তখনকাব এলাহাবাদের একজন নামী উকীলও ছিলেন তিনি। আরবী এবং ফারসীতেও অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তা ছাড়াও ইব্রাত ছদ্মনামে তিনি উর্দু কবিতাও লিখতেন।

ওঁর কবিতায় কি অন্য কোনো কবির প্রভাব ছিল ? জানেন ?

যাঁরা জানেন, তাঁরা বলেন যে, মোমিন, মুশ্‌তাফি, আমিয়ের, মীনাই ইত্যাদি বিখ্যাত উর্দু কবিদের প্রভাব ছিল ফিরাখ্ এর উপর। বিশেষত তাঁর প্রথম জীবনে। ফিরাখ্ আই-সি-এস'এব পরীক্ষা পাশ করার পর ডেপুটি-কালেক্টর হয়ে চাকরীতে যোগ দেন। কিন্তু সেই সুখের চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন কংগ্রেসের সভ্যও ছিলেন। জেলও খাটেন। কিন্তু রাগের কবিতা লেখেননি কখনই। তাঁর সমস্ত কবিতাতেই প্রচ্ছন্নতা ভাস্বর ছিল। উনিশশ সাতাশ সনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরিজীতে প্রথম হন এম-এ পরীক্ষাতে। তারপর এখানেই অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সবচেয়ে

মেধাবী এবং সবচেয়ে মিশুকে অধ্যাপক হিসেবে পরিচিতি ছিল তাঁর। গর্বিতও ছিলেন তিনি তাঁর কবিতার গুণ সম্বন্ধে। ওঁর একটি শায়েরী আছে, তাতে বলছেন :

"কেহ্‌তে হ্যাঁয় মেরি মওত্‌ পর
উস্‌কো ভি ছিন্‌ হি লিয়া
ঈশক্‌ কো মুদাতোঁ কি বাদ
এক মিলা থা তরজুমাঁ।"

আমার মৃত্যুর পর লোকে বলবে, অনেক অনেকদিন পর প্রেম যদি বা একজন তর্জমাকারীকে পেয়েছিল : তাকেও মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিল। হায়!

নিজের উপর বিশ্বাসও ছিল খুব গভীর। আরেকটি কবিতায় তিনি সগর্বে বলছেন :

"আনেওয়ালি নাসলেঁ, তুম পর রাশ্‌খ
করেঙ্গি হাম্‌ আসরোঁ
যব, ইয়ে ধিয়ান্‌ আয়েগা, উন্‌ কো, তুম্‌নে
ফিরাখ্‌ কো দেখা হ্যায়।"

ভবিষ্যতের প্রজন্মর সকলেই আজকের তোমাদের ঈর্ষা করবে, যখন তারা জানতে পারবে যে, তোমরা ফিরাখ্‌কে দেখেছিলে ; জেনেছিলে।

পৃথু বলল, ওঁর নিশ্চয়ই কবিতা সংকলন আছে দু একটি?

দু একটি কেন? অনেকই আছে। কয়েকটি বিখ্যাত সংকলনের নাম মনে আছে আমার। যেমন 'রাঙ্গা নূর', 'গুলে নাজ্‌মা', 'রুহে ক্যায়নাৎ', 'মশ্‌-আল্‌', 'শাবনামিস্থান', 'শোলা-ওসাজ্‌'—এসব তাঁর বিখ্যাত কবিতা সংকলন। উর্দুটা শিখে নাও পৃথু। উর্দুর মত শক্তিশালী, সম্পদময় ভাষা ভারতীয় ভাষার মধ্যে কমই আছে।

কবিতা ছাড়া অন্য কিছু লেখেননি ফিরাখ্‌?

হ্যাঁ। তাও লিখেছেন। সমালোচনা-সাহিত্যে বিখ্যাত তাঁর বই "আন্দাজে", "উর্দুকি ঈশ্‌কিয়া", "শ্যয়রী" এবং "হাশীয়ে"। রুবাই হচ্ছে উর্দু সাহিত্যর শেষ কথা। ফিরাখ্‌ তাঁর রুবাই সংকলন 'রূপ'-এও তাঁর সেই উৎকর্ষর প্রমাণ রেখেছেন। ফিরাখ্‌ গোরখপুরীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বোধহয় এই-ই যে তাঁর অধিকাংশ পাঠকেব কাছেই, ফিরাখ্‌-এর কবিতা, শুধু আনন্দ পাবার জন্যেই নয়, তা এক প্রচণ্ড টোটাল ইনভল্‌ভমেন্টের ব্যাপাব! মানে কবিতা নিয়েই বেঁচে থাকা। এইখানেই তো একজন কবির সার্থকতা। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে আশ্চর্য এক সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর কবিতাতে।

পৃথুর খুব ভাল লাগছিল শুনতে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে গিরিশদাকে শুধোন, আপনি ত দেখছি ফিরাখ্‌কে গুলে খেয়েছেন। সত্যি! আপনাব মতো যদি উর্দুটা জানতাম!

কোনো কবিকেই গুলে খাওয়া যায় না পৃথু। খেলেও তা হজম হয় না। কবিতা, মানুষের নাভিরই মত। আগুনেও পোড়ে না। এমন বদহজমের জিনিসই আর নেই।

হেসে বললেন গিরিশদা।

ফিরাখ্‌-এর কোন্‌ কবিতাটি সবচেয়ে প্রিয় আপনার?

আমার? বলেই, ভাবলেন একটু গিবিশদা। তারপর বললেন, একটি নয়, দুটি কবিতা সমান প্রিয়। অবশ্য আমার প্রিয় হলেই যে সকলের কাছে প্রিয় হবে এমন কথা নেই। এটা নিজেব নিজের ভালোলাগাব ব্যাপার।

কবিতা দুটি শোনান না গিরিশদা।

তা শোনাচ্ছি। কিন্তু কবিতা শুনে গায়ে জোব এবং মনে আনন্দ করে নাও। এবপব তোমার সঙ্গে আমার কিছু নিরানন্দর কথাও আছে। যে কথা, তোমাব পছন্দ হবে না। এবং যা বলব তা কবিতাও নয়। শোনো এখন :

"থী মুন্‌তাজার সি দুনিয়া খামোশ থী

ফিজায়েঁ

আঙ্গ যো ইয়াদ উন্‌কি চালনে লাগে হাভায়েঁ।"

বুঝলে ত ? মানে, পৃথিবী একেবারেই নিশ্চুপ ছিল। যেই মনে পড়ল তোমার কথা, অমনি হাওয়া দিল ঝুরুঝুরু।

বাঃ। বাঃ। বহত্‌ খুউব।

পৃথু বলল। এবার শেষেরটা।

কবিতা কখনও আশ-মিটিয়ে শুনতে নেই। কারো কবিতাই নয়। আশ মিটে গেলে যেমন প্রেমে আর প্রেম থাকে না, কবিতার আশও মিটে গেলে কবিতা কবিতা-রহিত হয়ে যায়। শেষেরটা অন্যদিন শোনাবো। প্রথম করে দেব সেদিন শেষকে।

ঠিক আছে।

বলল, পৃথু। তারপরই কথা ঘুরিয়ে বলল, শেয়াল পুষলেন এবার ? কাকগুলোকে আকাশে নির্বাসন দিলেন ? এমন টাইমমত কান্‌কো আর কুকুরের ছাঁট কোথায় পাবে আর বেচারারা। না-খেয়ে মারা যাবে যে ! এমন স্পয়েল করে ছেড়ে দেওয়াটা অন্যায়।

সে তাদেরই ব্যাপার। কাক-শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে যাবার পর আর কাক পোষার ঝামেলা করিনি। শেয়ালটাব নাম দিয়েছি পণ্ডিত। মানুষেরা সকলেই আজকাল শেয়াল হয়ে উঠেছে,শেয়ালেরই মতো ধূর্ত, সাবধানী : চোর-চোর। সত্যি শেয়ালরা হয়ত কোনোদিন মানুষদের উপর ঘেন্না আর অভিমানে মাস-সুইসাইড্‌ করে বসবে। কে জানে ? থাকুক আমার কাছে একটি স্পেসিমেন। শেয়ালমাত্রই ত পণ্ডিত হয়। কুমীরের বাচ্চা-খেকো সব। তাই-ই এ-ব্যাটারও নাম রেখেছি পণ্ডিত।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ দুজনেই।

গিরিশদা বললেন, হুইস্কী ত খাবে একটা, না কি ?

নাঃ ! থাক আজকে। ভাল লাগছে না।

শ্যুওর ?

শ্যুওর।

এবার তাহলে বলো, সেদিন তোমার কি হয়েছিল ? শেষে, ঐ মহল্লাতে গেলে ? তাও, শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষী রেখে ? ছিঃ ছিঃ। তোমার বড়ই অধঃপতন হয়েছে পৃথু।

পৃথুর মনে হল তাবাশংকরের 'দুই পুরুষ'-এর সুশোভনের ডায়ালগ্‌। কোট করে বলে : পতন ত চিরকাল অধোলোকেই হয় গিরিশদা, কে আর কবে উর্ধ্বলোকে পড়েছে বল ?

কিন্তু কিছুই না বলে চুপ করে রইল।

হল কি ? কথা বলছ না যে ?

কি বলব, তাই-ই ভাবছি।

আসলে বলার কিছুই নেই। তুমি একবারও ভাবলে না যে, তোমার স্ত্রী, বা ছেলেমেয়েরা কি ভাববে ? তুমি এতবড় কম্পানীর এতবড় অফিসার, তোমার অফিসের লোকেরা জানতে পেলে কি ভাববে তোমাকে ?

অন্যরা আমাকে কি ভাবল না ভাবল তা নিয়ে ভাবি না আমি গিরিশদা।

তুমি আমার প্রশ্নটাই এড়িয়ে গেলে পৃথু।

এড়িয়ে যাইনি।

গেছ। সমাজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তোমার স্ত্রী রুষা জানলে কি ভাববে বা কি করবে, ভেবেছো একবারও তুমি ? যদি কোনোভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে কথাটা ?

ভাবার কোনো অবকাশই রাখিনি। রুষাকে সবই বলে দিয়েছি।

বলে দিয়েছ ? তুমি ? নিজেই ?

হ্যাঁ।

সত্যিই তুমি পাগল। কি ! কি বললেন তিনি ?

বললেন, ইচ্ছে করলে যেও। শরীরের প্রেমে কোনো দোষ নেই। দোষ, মনের প্রেমের। সেই প্রেমকেই ভয় !

আশ্চর্য ! রাগ করলেন না তোমার উপর ?

না।

দ্যাখো পৃথু, যতদিন আমরা তোমাকে দেখছি হাটচান্দ্রাতে, তাতে তুমি তোমার ভিজে-বেড়ালেব মতো ব্যবহারে নিজের সম্বন্ধে এমন একটা ইমেজ গড়ে তুলেছ আমাদের সকলের কাছেই যে, আমরা সকলেই ভেবে নিয়েছিলাম, তোমার স্ত্রীই খারাপ আর তুমিই একটি অত্যাচারিত গোবেচারা-মানুষ। সেই মহিলাকেই সকলে আমরা খারাপ বলে ভেবেছি। তোমাব প্রতি দুর্ব্যবহার করেন ভেবে নিজেদের মধ্যে আলোচনাও কবেছি। আজ দেখছি, তিনিই মহীয়সী।

অথচ ! এমন মহিলাব কথা ত শুধু নাটক-নভেলেই পড়েছি। জীবনেও কাবো কি এমন স্ত্রী থাকে ?

নাটক-নভেল ত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি গিবিশদা ! যে নাটক-নভেল জীবন-সম্পৃক্ত নয়, তা কি থাকে ? না তা পড়ে মানুষে ?

জানি না। তবে, তুমি দেখছি অবাকই কবলে। তা, হঠাৎ মহল্লায় গেছিলেই বা কেন ? গেছিলে কার কাছে ?

বিজ্‌লীর কাছে গেছিলাম। কেন যে গেছিলাম, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি নিজেও জানি না।

জানি, জানি গান শুনতে গেছিলে। তা গান শুনতে ইচ্ছে কবলে ত আমাকেই বলতে পারতে। বাড়িতে ম্যায়ফিল বসাতাম। যাকগে। এ প্রসঙ্গ থাক। থাক। থাক। তোমার নিজেরই যখন অনুশোচনা হচ্ছে তখন আমার আর বলার কিছু নেই।

অনুশোচনা কেন হবে ? খুবই ভাল লেগেছিল। তাছাড়া শুধু গানই শুনিনি। আমি... ভবিষ্যতে আবাবও হয়ত যাব। মানে যেতে পাবি।

কি-কি-কি ? বলছ কি তুমি ? আবার যাবে ? বাণ্ডী-বাজ হবে তুমি ? ছ্যাঃ ছ্যাঃ। মেয়েটা যাদু করেছে তোমাকে।

আমাকে যাদু কবা মুশকিল্। নিজে থেকে যাদু হতে রাজী না থাকলে কেউই যে যাদু করবে আমাকে এমনটি হবার জো নেই।

কি সব বলছ তুমি, এসব আমাব বুদ্ধিবও বাইরে।

আপনি নিজে কখনও, যাকে বলে "কাম-তাড়িত", তা হয়েছেন কি গিরিশদা ? কখনও !

গিরিশদা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, হবো না কেন ? আমি ত ভগবান নই।

যাই-ই বলো। বিবাহিত মানুষের এমন উদ্ভট কাম থাকাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ আদৌ নয়।

পৃথু বলল, ঠিক উল্টো। যে বিবাহিত পুরুষরা ভিটামিন বা প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সীতে ভোগে তাদের কথা জানি না। তাছাড়া বিবাহিত পুরুষরা কি পুরুষজাতের কলঙ্ক ? সে বেচারীদের এমন করে চিহ্নিত করাটাও ঠিক নয়। কাম এমন কিছু খারাপ রিপুও নয়। আপনি যাইই বলুন। অবদমিত কামই বরং সর্বনাশা। পুরিতা-কাম ভাল করে। সকলেরই। যাকে-তাকে না কামড়ালেই হল।

তুমি কামকে ভাল বলছ এত, সেদিন শামীমের মেয়ে নুরজেহানকে যারা ধরে নিয়ে গেছিল তাদেরও হয়ত ভাল বলবে তুমি !

মেয়েটা বোবা হয়ে গেছে। জানো ত ?

পৃথু হঠাৎই বলল, আমি এবার উঠি গিরিশদা।

গিরিশদা ও ভাবনাতে ডুবে ছিলেন। চমকে উঠে বললেন, উঠবে ? এত তাড়াতাড়ি ?

হ্যাঁ। উঠি আজকে। রাত হল। খুব কম সময়ও কাটালাম না !

শ্রীকৃষ্ণই পৌঁছে দিয়ে আসুক তোমাকে। ও ত' আছেই। এতখানি পথ হেঁটে যাবে কেন ? এই

ঠাণ্ডার মধ্যে রাতের বেলা ?

অনেকদিন একা হাঁটিনি গিরিশদা। রাতের জঙ্গলে হাঁটলে মাথা পরিষ্কার হয়। স্নায়ুগুলো সব সজীব হয়ে ওঠে। ভাবতে ভাবতে, একা একা জঙ্গলে হাঁটতে বড় ভাল লাগে।

যা ভাল মনে করো। তোমার রকমসকমই আলাদা। আর একটা কথা। আর কাউকে বোলো না রুষা তোমাকে কি বলেছে না বলেছে। বুঝেছো। সকলেই আমি নই।

তা জানি। আপনি বলেই বললাম।

তারপর বলল, শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? ওর সঙ্গে দরকার আছে আমার একটু।

মুনেশ্বরকে ডেকে গিরিশদা শ্রীকৃষ্ণকে খবর দিতে বললেন। পৃথু উঠে পড়ল।

শ্রীকৃষ্ণ বাইরের দরজার কাছে এসে গলা খাঁকরে জানান দিল সে এসেছে।

পৃথু গিরিশদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোল। গেট থেকে বেরিয়েই টর্চটা জ্বালল। শ্রীকৃষ্ণব মুখে পডল আলোটা। মাথাব পেছনে জ্যোতি ফুটে উঠেছে বলে মনে হল পৃথুব। শ্রীকৃষ্ণরইমতোই। দুটো দশ টাকার নোট ওর পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, চা খেও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ কথা না-বাড়িয়ে সেলাম করে চলে গেল আউট হাউসে, তার কোয়ার্টারের দিকে।

গিরিশদার বাড়ির সামনেটুকু পেরিয়েই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল পৃথু। শিশিরে ভিজে পুটুস-এর গায়ের উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছে। হরজাই গাছেদের গায়ের গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, বুনোফুলের গন্ধ সব মিলেমিশে এক আশ্চর্য গন্ধর মেঘ চাঁদের আলোব সঙ্গে মিশে নীলচে-হলুদ নাইলনের মশারীরইমতো ঝুলে আছে যেন জঙ্গলের সবুজে-কালো চাঁদোয়া থেকে। পথের বাঁ পাশ থেকে পেঁচা ডাকছে। সামনে, দূরে, ডানদিকের জঙ্গল থেকে চেঁচিয়ে পেঁচানী সাড়া দিচ্ছে সে ডাকের। বনপথের স্তব্ধতায় বাদুরের গায়ের গন্ধ। হাওয়ায়-ঝরা শুকনো পাতার মুচমুচে গন্ধ এখন শিশিরে নেতিয়ে ওডিকোলোনের গন্ধের মতো মৃদু হয়ে গেছে।

শামীম নাকি বলেছে গিরিশদাকে যে মৃত ডাকাতদের সনাক্তকবণও করেনি কেউ। তাদের সকলের মৃতদেহই পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠানো হয়েছিল ট্রাকে করে মান্দলাতে। লালটু সিং-এব মৃতদেহ ফিরিযে এনেছে ওরা। ডাকাতদের মৃতদেহ মর্গেই রয়ে গেছে। ঠাণ্ডা ঘরে।

কে জানে, লোকগুলোর বাড়ি কোথায় ছিল ? বাড়িতে কে কে আছে তাদের ? জানোয়ারেরা যেখানে মরে, অসুখে হোক, গুলি খেয়ে হোক, সেই জায়গাটাই তাদের বাড়ির ঠিকানা হয়ে যায়। শুধু মানুষেবই নিস্তার নেই ঠিকানার হাত থেকে। মরে গিয়ে তার শেষ-ঠিকানায় তাকে পৌঁছতেই হয়। পৃথু তাই বেঁচে থাকাকালীনই তার মৃত্যুতে যাতে এই নিয়ম না মানা হয় সে সম্বন্ধে ফতোয়া জারী করে যেতে চায়।

কাল রাতে বারবার লালটু সিং-এর মুখটা মনে পড়ছিল। বার বার। ঘুম হচ্ছে না ভাল পৃথুব একদিনও। বাচ্চা ছেলে নাদুস-নুদুস চেহারা। পান-বাহার আর জর্দা-দেওয়া পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট ফেটে লাল হয়ে ছিল। গলায সোনাব হার। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হীরের বোতাম লাগানো। মিহি ধুতি। বাঁ হাতে সোনার রোলেক্স ঘড়ি। ছেলেটার কোঁকড়া চুল ভরা মাথার উষ্ণতাটা এখনও পৃথুর দু হাঁটুর মধ্যে মাখামাখি হয়ে আছে। রাতে ঘুমোতে গেলেই পৃথুব মাথার মধ্যে পেঁচারা কেবলই ঝগড়া করছে। কিঁচি কিঁচিকিঁচির—কিঁচি-কিচর।

মাথাটা কেমন ফুটো হয়ে গেল গুলিটাতে! নারকেলের এর চেয়েও অনেক কম শক্ত। মানুষের মাথার খুলি হাত দিয়ে জোরে টিপেও বোধহয় ভেঙে দেওয়া যায়। অথচ এই মাথাই মানুষকে যা কিছু দেওয়ারমতোতো দিয়েছে। একটা মানুষকে মেরে ফেলল উত্তেজনা নেই; অনুশোচনা নেই! আশ্চর্য!

এই লালটু সিং বাচ্চা ছোকরা পৃথুকে ঘুষ অফার করেছিল গত বছর। ওর অফিসে। পৃথু তারপর থেকেই ভগয়ান শেঠদের সঙ্গে কারখানার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল, ইম্‌ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজাব শর্মার অনেক অনুরোধের পরও। ক্ষতি হয়েছিল বছরে হাজার পঞ্চাশেক টাকা ভগয়ান

শেঠ-এর। আর হয়ত হাজার পাঁচেক টাকা ইমম্যাটেরিয়াল ম্যানেজারের।

মাঝে মাঝেই টর্চ জ্বালতে জ্বালতে, হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল পৃথু। নুরজেহানের নগ্ন, শায়ীন অসহায় হাত বাঁধা চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে মনে চোখ সরিয়ে নিল তক্ষুনি। পৃথু ঘোষ নিজেই মারতে চেয়েছিলো লালটু সিংকে। না, পৃথুকে সে চিনে ফেলেছিলো বলে নয়। নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে জীবনেব সব ক্ষেত্রেই ওর এক আশ্চর্য উদাসীনতা ছিলো চিরদিনই। মারতে চেয়েছিলো এই কারণে যে, কোনো মানুষের মধ্যেই ও নীচতা সহ্য করতে পারে না। মানুষ যদি অমানুষই হয় তাকে জানোয়ারের মতো নিজে হাতে গুলি করে মারতে ওর কোনো দ্বিধা নেই, ছিলোও না কোনোদিন। কিন্তু মারতে দিলো না মৌলভীই। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেই··· । পৃথু পারতো কি সত্যিই?

একটা হায়না ওর সামনে দিয়ে শিশির-ভেজা লাল-ধুলোর রাস্তাটা পার হল। রাতের অস্পষ্ট আলোয় বড় হায়নাটাকে, গায়ের ডোবাগুলোর জন্যে প্রথম দেখায় বাঘ বলে ভুল হয়েছিল। এক দৌড়ে পথ পার হয়েই বুক-কাঁপানো ডাক ডেকে উঠল সে।

দূরে, দোকানের আলো দেখা যাচ্ছিল। সাইকেল-রিকশার প্যাঁক-প্যাঁক, ক্রিং ক্রিং, আকাশটা আলোর আভায় ভরে গেছে।

পানের দোকান থেকে সবে এসে ভাবছিল, সাইকেল-রিক্‌শা নেবে একটা ঠিক সেই সময়ই একটা জীপ তাকে প্রায় চাপা দিতে দিতেও না-দিয়ে গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। গিয়ে, রাস্তাটা যেখানে অপেক্ষাকৃত নির্জন, ছায়াচ্ছন্ন, সেইখানে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পানের দোকানী অদৃশ্য ড্রাইভারের উদ্দেশে গালাগালি করল অশ্লীল। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল ড্রাইভার।

পৃথুর খুবই রাগ হল ড্রাইভারের উপর। এসব ছোটখাটো ব্যাপার সে উপেক্ষা করে। আজ মনে হল, ড্রাইভার ইচ্ছা করে তাকে অপমান করার জন্যেই এমন করল। কিন্তু দাঁড়িয়েছে অন্ধকারে। পৃথুকেও যেতে হবে ঐখান দিয়েই। ঠাণ্ডাও পড়েছে জোর। দুধিয়ালির মোড়ে না গেলে সাইকেল-রিক্‌শা পাওয়াও মুশকিল। ফাঁকা রিকশা নেই পথে। হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকার জায়গাটাতে গিয়ে পৌঁছতেই জীপের ভিতর থেকে কেউ নড়ে চড়ে উঠল।

অভ্যাস বশে কোমরে হাত দিল পৃথু। নেই। আনেনি।

ফিসফিস করে কে যেন বলল, পৃথুদা। আমি! জীপ আরও আগে নিয়ে যাচ্ছি। একেবারে সান্নাটা জায়গাতে। তুমি এসে উঠে পড়। কেউ যেন দেখে না। কথা আছে, জরুরী।

পৃথুকে ফেলে, জীপটা আবার এগিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক লাগল পৃথুর পৌঁছতে। জীপের পৌঁছতে লেগেছিল এক মিনিট।

পৃথু উঠে বসতেই ভুচু জীপ স্টার্ট করে দিল।

কী ব্যাপার হল?

ভুচু ফিসফিস করেই বলল, মৌলভীকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে।

মানে?

মানে কিডন্যাপড আমরাও হতে পারি যে-কোনো সময়। সঙ্গে রাখবে সবসময়। বাড়িতেও। শোওয়ার সময় বালিশের নিচে নিয়ে শোবে।

মানে? কিসের কথা বলছ?

আঃ! পিস্তলটা। লোডেড পিস্তল আজ থেকে সবসময়ই কোমরে রাখবে। একস্ট্রা ম্যাগাজিনও রাখবে।

পৃথু হেসে উঠল খিক্ খিক্ করে।

ভুচু চমকে উঠল।

কী হল? হল কী তোমার? হাসার কি আছে? পাগল-টাগল হলে নাকি?

ড্যাশবোর্ডের আলোতে ভুচুর চোয়াল নিষ্ঠুর দেখাল।

পৃথু বলল, যাত্রা তাহলে জমে গেছে বলো?

বেশ আছো তুমি। অজীব আদমী!

সত্যিই বেশআছি।বুঝেছো ভুচু। কাল ত কারখানা ছুটি, তেওহারের জন্যে। তোমার জীপটা একটু ধার দেবে?

কোথায় যাবে?

যাব এক জায়গায়। দেবে কী না বল?

দেব।

তাহলে সকালে এসে নিয়ে যাব।

এসো। তোমাকে বুঝতে পাবি না আমি। তোমার প্রাণে কি ভয় ডর বলে......

আমার প্রাণে অনেকই ভালোবাসা আছে। ভালবাসায় প্রাণ আমার ভরপুর। ভয়ডর সব মুদিদের জন্যে। হিসেবীদের জন্যে।

আমার ওখানে যাবে নাকি? হুইস্কী ছিল।

কবে?

কবে আবার? এখন।

না।

কোথায় নামবে পৃথুদা?

সামনের মোড়ে নামাও।

জীপটা থামিয়ে ভুচু বলল, সত্যিই! এখন কিছুদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল।

পৃথু জীপ থেকে নেমে হেসে বলল, যাঃ। তা কি হয়? মন খারাপ করবে যে বড়!

ইয়ার্কি কোরো না পৃথুদা। সীরিয়াসলী বলছি। তোমার সত্যিই ভয় ডর কিছু নেই!

ভয়? কেন? না ভুচু। ভয়-টয় আমার সত্যিই নেই।

একটু থেমে বলল, পামেলার কাছে যাও।

জীপটা চলে গেল।

পৃথু মনে মনে বলল, যাও ভুচু। যাও। এখন না গেলে কাল ভোরে যাও। তুমি শান্তঃ হয়ে যাবে।

বাড়ি এখনও অনেক দূরে। পা টেনে টেনে হেঁটে চলেছে পৃথু।

"কুছ খাফাজ কি তিলীয়োঁসে ছান রাহা হ্যায় নুরমা/কুছ ফিজা কুছ হাসরাতে পরওয়াজ কি বাঁতে করো।"

জেলখানার গরাদ থেকে জ্যোতি চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে। এসো, কিছু পারিপার্শ্বিকতা আর কিছু পালাবার ইচ্ছার কথা বলাবলি করি আমরা।

ফিরাখই জানেন এ কোন গরাদ? কোন্ জেলখানা? আর কেমন পালানো এ?

বাংলোর কাছে প্রায় পৌঁছেই গেছিল পৃথু। বাসিয়ার জঙ্গলের শালবনের শিশিরভেজা গায়ে চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। সেদিকে একবার চেয়ে আবার সামনে চাইল ও। এমন সময় দেখল, একটি জীপ হেডলাইট জ্বেলে আসছে তার বাংলোরই দিক থেকে। জীপটা তার পাশে এসেই থেমে গেল। দুজন লোক লাফিয়ে নেমেই তাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে সামনের সীটে তাদের মধ্যে বসাল। এবং একজন লোক পেছন থেকে আলোয়ানের আড়াল করে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে রাখল তার পিঠে।

পৃথু বলল, কি ব্যাপার? আপনারা কারা?

বলব। সময়মত। জায়গামত।

জীপটা চিলপির দিকে চলতে লাগল। মনে হল যেন সেই ভাঙা বন-বাংলোর দিকেই যাবে। মনেই হল। আরও এগোলে বোঝা যাবে। ডাইভার্সনটা পেরিয়ে যদি বাঁদিকে না গিয়ে ডাইনে যায় তবেই জানা যাবে।

ওদিকে কি?

পৃথু আবার শুধোল।

পাশের লোকটি বলল, জানবেন স্যার। সময়মত।

স্যার?

অবাক হল পৃথু।

মৌলভী গিয়াসুদ্দিনকেও নিয়ে এসেছেন আপনারাই?

হ্যাঁ।

আপনারা কোন ডাকাতের দল? সর্দার কে আপনাদের?

যে ছিপছিপে লোকটি গাড়ি চালাচ্ছিল সে হেসে উঠল। বলল, ডাকু ইন্দারজিৎ লাল।

সে আবার কে?

জানবেন স্যার!

তারপর দীর্ঘ পথ চুপচাপ। শীতের হাওয়ার থাপ্পড় চোখে মুখে।

পৃথুর মনে হচ্ছিল, এরা যারাই হোক, পৃথু বা মৌলভীর কোনো ক্ষতি করবে না। তাহলে এতক্ষণে ব্যবহারেই বোঝা যেত। তবু...

জীপটা থামল এসে একেবারে বন-বাংলোটার সামনেই। পৃথু জীপ থেকে নামতেই একজন সুদর্শন, অল্পবয়সী আই-পি-এস অফিসার বেরিয়ে এসে পৃথুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করলেন। বললেন, আই অ্যাম লাল। ডি আই জি। ড্যাকয়টি সেল। আই মাস্ট কংগ্রাচুলেট ঊ্য অল ফর হোয়াট ঊ্য হ্যাভ ডান মিঃ ঘোষ।

পৃথু বলল, কি করেছি?

কি করেছেন তা না বোঝার মতো বোকা আমরা নই মিঃ ঘোষ। যা করেছেন তার জন্যে আপনাদের প্রত্যেককে আমরা ডেকবেট করতাম। অবশ্য অন্যভাবে দেখতে গেলে বলতে হয় আপনারা যা করেছেন তা আইনের চোখে গর্হিত অপরাধও। ফাঁসীতে লট্‌কানোই উচিত ছিল আপনাদের। কিন্তু না জেনে আপনারা এমন কিছু করে ফেলেছেন যে, আইনের রক্ষক হয়েও আমরা ইচ্ছে করেই চোখ বন্ধ করে রয়েছি। এবং ঊ্য হ্যাভ মাই ওয়ার্ডস, যে ভবিষ্যতেও থাকব। আমরা আপনাদের সাহায্য চাই।

ব্যাপারটা খুলে ত বলবেন।

ভিতরে চলুন।

কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক? এটাও আইন-বহির্ভূত। কিন্তু আমার যে কাজ করতে হয় তাতে সবসময় আইন মানলে চলেও না। আজ ঠাণ্ডাটাও জোর পড়েছে।

পৃথু ঘরে ঢুকে দেখল যে ভিতরে দুটি ফোল্ডিং খাট। একটি ফোল্ডিং টেবল। বাংলোর চারপাশে আর্মড-গার্ডস। হঠাৎ আবিষ্কার করল যে চেক-চেক লুঙি আর কুর্তার উপরে বেগুনী-রঙা র‍্যাপার চাপিয়ে মৌলভী বসে আছে। 'পা-তুলে' একটি চৌপাইতে। পৃথুর দিকে চেয়ে বলল, সেলাম ওয়ালেকুম।

লালসাহেব পিটার-স্কট-এর বোতল থেকে একটা হুইস্কী গ্লাসে ঢেলে ওয়াটাব-বটল থেকে জল মিশিয়ে দিলেন। উনি নিজেও একটা নিলেন। মৌলভীর বিড়ি ছাড়া আর কোনো নেশা নেই। বিড়ি আর প্রত্যহ মোরগা-নিধন।

হুইস্কীতে একটি চুমুক দিয়ে পৃথু বলল, এবার বলুন মিঃ লাল।

হ্যাঁ। মন দিয়ে শুনুন। আপনারা না জেনে ডাকু মগনলালের দলের উপর চড়াও হয়ে তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। মগনলালও দলে ছিল। কিন্তু দারুন ধূর্ত সে। সময় বুঝে গা-ঢাকা দিয়েছিল। খুব সম্ভব ও আপনাদের দেখেছে আড়াল থেকে। নাও দেখে থাকতে পারে। তবে, লালটু সিং একমাত্র আপনাকেই চিনেছিল এবং আপনার নামও বলেছিল। ঘোষ সাহেব, ম্যানেজার! যদি এই কথাকটিও মগনলাল শুনে থাকে তাহলে আপনার খুবই বিপদ।

সে কথা বুঝলাম। এখন আপনি কেন এখানে নিয়ে এলেন আমাকে এমন পাকড়াও করে তা ভাল করে বুঝিয়ে বলুন।

আমরা, মানে ভোপালের পুলিস হেডকোয়ার্টার্স মগনলালের এই এলাকাতে আসাটাতে খুবই কনসার্নড হয়ে পড়েছি। গোয়ালিয়র, ভিন্দ, মোরেনা এবং বেহড়ের মানুষরা সবসময়ই সবকিছুর জন্যে তৈরী থাকে। কিন্তু এই সব অঞ্চল এখন পর্যন্ত পুরোপুরি শান্তিপূর্ণই ছিল। কাছেই মালাঞ্জখণ্ড এবং মোগাঁও। এই সব জায়গায় মগনলালের দল একবার দৌরাত্ম্য শুরু করলে তা বড়ই মুশকিলের হবে। যুদ্ধে যেমন শত্রু একসঙ্গে একাধিক ফ্রন্ট ওপেন করলে তাকে যুৎ করতে বড়ই অসুবিধা হয়, এই ব্যাপারেও তাইই। বড়কর্তারা জরুরী বৈঠকে বসেছিলেন। তাঁদের নির্দেশেই আমার এখানে আসা। এই দেখুন আপনার নামে আই জি সাহেবের নিজের হাতে লেখা অনুরোধপত্র। এ চিঠি টাইপ পর্যন্ত করা হয়নি, সিকিওরিটির কারণে।

পৃথু চিঠিটা খুলে পড়ল। তারপর ফেরৎ দিল লালসাহেবকে।

বল পয়েন্ট পেন বের করে লাল সাহেব বললেন এক লাইন লিখে দিন যে, চিঠিটি আপনি দেখেছেন।

পৃথু লিখল। সীন। থ্যাঙ্কস।

এইবারে শুনুন, আমরা মগনলালকে এবং তার দলকে যদি এলিমিনেট করতে নাও পারি, তবু এ অঞ্চল থেকে হটিয়ে বা তাড়িয়ে যেখানে আমাদের ফোর্স আছে সেইদিকে নিয়ে যেতে চাই। ডাকাত এমন একটা প্রোপাগাণ্ডা আমবা দিতে চাই। আসলে এ কারণেই কাগজগুলোতে বেরিয়েছিলো যে মগনলালকেও সাহস এবং নিষ্ঠুরতায় ম্লান করে দিয়ে অন্য এক ডাকাতের দল তাব দলের লোকের উপব বদলা নিয়েছে গোপনে। ব্রিফিং করে দিয়েছিলাম প্রেসকে এইভাবেই। মৃত ডাকাতদের ছবিও ছাপা হয়েছিল রিপোর্টের সঙ্গে, আমাদেব ব্রিফিং মতো, মগনলাল পুলিসেব হাত থেকে যদি বা বাঁচে ত বাঁচতেও পারে, কিন্তু এই দলেব হাতে তার নিস্তার নেই।

বাঃ। পৃথু বলল। আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে এক ঢোঁকে হুইস্কীটা শেষ করে।

কি হল ?

না। লোকে বাগী হয়ে বেহড়ে চলে গিয়ে ডাকাত হয়, আর আপনারা আমাদের জোর করেই ডাকাত বানাচ্ছেন।

লালসাহেব আরেকটা হুইস্কী ঢেলে দিলেন পৃথুকে। বললেন, উই হ্যাভ নো চয়েস। অ্যাণ্ড মে বী, উ্য হ্যাভ নান, আইদার ! বিলিভ মী, মিঃ ঘোষ। উই বিয়্যালী হ্যাভ নান। মিঃ ঘোষ, মৌলভীই যে লালটু সিংকে ওঁর বন্দুক দিয়ে মেরেছেন, তা থার্মাল নাইট্রেট টেস্ট করে এক্ষুনি প্রমাণ করতে পারি আমবা। কিন্তু তা আমরা করব না। দেশের মানুষ যদি সাহসী না হয়, যারা অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে যদি রেজিস্ট্যান্স না আসে তবে মধ্যপ্রদেশের ডাকাতির সমস্যার সমাধান কোনোদিনও হবে না। আপনাদের সাহায্য আমাদের খুবই দরকার। ইটস আ ম্যাটার অফ ন্যাশানাল ইন্টারেস্ট।

পৃথু হতবাক হয়ে আরেকটি চুমুক দিল গ্লাসে। মৌলভী গিয়াসুদ্দিন ইয়াআল্লা! বলে শুয়ে পড়ল চৌপাইয়ে।

লাল সাহেব বললেন, মিস্টার ঘোষ, আপনার নাম দেওয়া হয়েছে ডাকু শের সিং। ডাকাত দলের সর্দার।

পৃথু হেসে ফেলল। বলল, নো ডাউট, ইটস দা জোক অফ দা ইয়ার।

মৌলভীর নাম মোটেলাল। ভুচু, মোটর মেকানিকের নাম সাঁওয়া। আপনার দলে আর যারা আছে তাদের নাম আপনি ইচ্ছেমতো দিয়ে দেবেন। সেদিনের কাগজে শের সিং, মোটেলাল এবং সাঁওয়ার নাম বেরিয়েছিলো। স্থানীয় লোকজন আঁতকে উঠেছিলো। মগনলাল এবং তার দলবলও তাই। বেচারা মাথার চুল ছিঁড়ছে এখন কে এই ডাকু শের সিং ? এই গবেষণায়। শের সিং-এর যা প্রোপাগাণ্ডা হয়েছে তাতে মগনলাল ভয়েই না পালায় ! বুঝতেই পারছেন ঘোষ সাহেব, অনেকখানি ঝুঁকিই নিয়ে ফেলেছি, জানি না কি হবে ?

এমন সময় তাঁবুর দরজার সামনে থেকে একজন কে যেন ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন।

কাম-ইন পাণ্ডে। লালসাহেব বললেন।

ভুচু এসে ঢুকল। পাণ্ডে নামের এ-এস-আই ভুচুকে সঙ্গে করে নিয়ে ঢুকলেন তাঁবুতে।

পৃথু বলল, এসো, ডাকু সাওঁয়া সিং।

ভুচু বিরক্ত গলায় বলল, মানে?

লালসাহেব হেসে উঠলেন। পৃথুও।

পৃথু বলল, পরে সব বলব। তার আগে একটা হুইস্কী খাও। ভীষণ শীত আজকে। যা বলব, সব শুনলে আরো শীত করবে। মানেন ত আপনি যে, আজকাল মেডিয়া সব কিছুই কবতে পারে? পঙ্গুকে দিয়ে গিরিলঙ্ঘন অথবা গুণীকে নির্গুণ? মেডিয়ার মাধ্যমে শের সিং-এর মীথকে আমরা রিয়ালিটি করে তুলব।

আপনাদের সবাইকে আমার জীপই পৌঁছে দিয়ে আসবে। সাবধানে থাকবেন সবাইই। কোনো বিপদ বা বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই আমাকে ফোন করবেন। ডায়রেকটলি। হাটচান্দ্রাব থানার থ্রুতে নয়। আমাব বাড়ি এবং অফিসের নাম্বাব দিলাম, এই যে! সকলের কাছেই বাখবেন। কোনো দ্বিধা না করে দিনে বাতের যে কোনো সময়ই ফোন কববেন দরকার মনে করলেই। সঙ্গে সঙ্গে সববকম সাহায্য আমি কবব। আপনাদেব সঙ্গে একটা ওয়্যাবলেস সেটও দিয়ে দেব।

আচ্ছা, এবার এগোন আপনারা। গুড লাক্। গুড হান্টিং।

এই খামটা রাখুন। আর একটা বাক্স বাখা আছে জীপে। অ্যামুনিশন্ আছে তাতে। আপনাদের পিস্তলের এবং শট-গানের। এটুকু অন্ততঃ আমাদের করতে দিন, প্লীজ।

পৃথু বলল, ওগুলো তুমি তোমার গাবাজে নামিয়ে রেখো ভুচু।

জীপ স্টার্ট করাব আগে মিঃ লাল হুইস্কীব বোতলটা দিয়ে দিলেন ভুচুকে। আর জলের বোতল এবং গ্লাসও। হেসে বললেন, দেরী কবে বাড়ি ফেবার সবচেয়ে ন্যাচারাল একসপ্লানেশান হচ্ছে, কোথাও জমে গেছিলেন, তাই না? বাড়িতেও যেন কেউ সন্দেহ না করেন। ভুচুর দিকে ফিরে বললেন, নট ইভিন মিস্ পামেলা।

বলেই, মুখ গাড়ির ভিতরে করে ফিসফিসে গলায় বললেন, চারটে খামে মগনলাল এবং তার দলের দশ জনের ফোটো আছে। মুখগুলো ভাল করে চিনে রাখবেন। পোশাক নয়। ওরা যখন তখন ভেক বদল করে।

পৃথুকে যখন নামিয়ে দিয়ে গেল জীপ তখন অনেক রাত। রুষাও ঘুমিয়ে পড়েছে। দুখী ছিল। হটকেস থেকে খাবাব বেড়ে দিল।



কুর্চির বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিল সকালে। দাঈ বাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, থলে হাতে পৃথুকে এনে বসিয়ে দিয়ে খবব দিতে যাচ্ছিল। কুর্চিকে।

পৃথুই বারণ করল। বলল, খবর দিতে হবে না। তুমি তোমার কাজে যাও। আমি বসে আছি।

দিদি রাগ করবে যে!

কবলে, আমার উপর করবেন। তোমার বাবু কোথায়?

উনি বেবিয়েছেন। এসে পড়বেন খাওয়াব সময়েব আগেই। আপনি সেদিন এসেছিলেন না, জীপগাড়ি চালিয়ে? চলে গেলেন কেন অমন করে?

আমি? কী জানি। আমিই কি এসেছিলাম?

আমার তাইই ত মনে হল।

ভুলও ত হতে পারে। তা পারে। বয়সও ত হল। বাতের বেলা চোখে আজকাল দেখিও না ভাল। তবে, বাত ত নয়, তখন ত ভব দুপুর ছিল। আচ্ছা! বসুন তাহলে। যাই আমি। বলে চলে গেল দাঈ।

পৃথু বসার ঘরেব জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। শীত এবার মবে যাবে। কতদূর দূর থেকে পরিযায়ী পাখিরা সব এসেছিল সাইবেবিয়ার তুন্দ্রা, রাশিযা থেকে। কত পিন-টেইলস্, গাড়ওয়াল, টীলস, পোচার্ড ম্যালার্ড, ধূসব আব সাদা বঙা রাজহাঁসের দলগুলি, রঙের দাঙ্গা লাগানো ফ্লেমিংগোবা, সোনা-বঙা চখা-চখি। তাদেব যাবার সময় হল। তিন চাব হাজার মাইল দূব থেকে তারা কত সহজে পথ চিনে আসে আব চলে যায়। স্বাতী, বিদিশা, শর্তভিষা, এবং আবও কত সব তাবাবা তাদেব পথ দেখায়। পানা পুকুবে আজীবন পড়ে থাকা বেলে হাঁসের জীবন নয় তাদেব। তারা বাঁচতে জানে। শীত-জীবনেব ববফ ঢাকা দেশেব গায়েব সাদা গন্ধ বুকের পালকে ঢেকে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দেয় উষ্ণতাব মধ্যে উষ্ণ ট্রপিকাল সবুজ দেশে। আবারও এদেশীয় সবুজাভ উষ্ণতা বয়ে নিয়ে ফিবে যায় শীতার্তকে উষ্ণতায় মুড়ে দেবে বলে। কত চাঁদ আব বোদ আর ইলসে-গুঁড়ি বৃষ্টি আব বসন্তেব ফুল-ওড়ানো ঝড়েব মধ্যে দিয়ে গতিপথ তাদেব।

নাঃ। কিছুই হল না। কিছুই না। এমনকি একটি সামান্য পাখি পর্যন্ত হতে পারল না পৃথু। কলুব বলদ, মিস্টাব পিরথু ঘোষ, অমুক ঘোষের নাতি, তমুক ঘোষেব ছেলে, অমুক নাবীব স্বামী, তমুক ছেলেব বাবা, অমুক ঠিকানায় বাস, তমুক শ্মশানেব ছাই…

ছিঃ। ছিঃ।

একী? আপনি! কখন এলেন?

এই শীতেও আঁচল দিয়ে কপালেব ঘাম মুছতে মুছতে এসে ঢুকল কুর্চি। মুখটা লাল টুকটুকে হয়ে রয়েছে।

কী করছিলে তুমি?

অবাক হয়ে পৃথু বলল

বান্না কবছিলাম।

বান্না কবতে এত কষ্ট?

কেরোসিন ফুবিয়ে গেছে এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। তাইই ভাট্টি গেছে, মোগাঁও-এর দিকে খোঁজ করতে। কাঠেব উনুনে বান্না করে ত অভ্যেস নেই, আঁচ লাগে ভীষণ।

কাঠের উনুন ? কাঠের উনুনে কোনো ভদ্রলোকে রাঁধে নাকি এখন ? এক বিরিয়ানী বা কাবাব বানানোর সময় ছাড়া ! তাও ত কাঠ-কয়লার আগুনে রাঁধে। চলো ত দেখি তোমার রান্নাঘর !

না, না। কেন ? রান্নাঘরে কী করতে যাবেন আপনি ?

চলোই না।

দেখেছো ! কোনো মানে হয় !

হয়। বলে কুর্চির আগে আগেই গেল পৃথু। চিতার মতো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রান্নাঘরটি ভালই। কিন্তু সেখানে রান্না হচ্ছে না। বাড়ির বাইরেই একটি চালামত। তাতে মাটিতে গর্ত করা। তার মধ্যে কাঠ দেওয়া। পাশে অনেক হরজাই কাঠ চিরে রাখা হয়েছে। গনগন্ করছে আগুন। মস্ত একটা হাঁড়ি বসানো তাতে। জল গরম হচ্ছে। বোধ হয়, চানের বা কাপড় কাচার জল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পৃথু। তারপর কুর্চির মুখের দিকে তাকাল।

কুর্চি যে শুধু ক্লান্ত ও লালই হয়ে গেছে তাইই নয়, পৃথুর এই বাড়াবাড়ি ঔৎসুক্যে লজ্জিতও হয়েছে অনেকখানি।

আপনি বসার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি মুখটা ধুয়েই আসছি।

পৃথু কথা না বলে, গিয়ে বসল। চারধারে চেয়ে দেখল। হঠাৎই মনে হল, কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ছে যেন। আগের চাকচিক্য যেন নেই। অথচ অল্পকদিন আগেই যখন এসেছিল, তখন ছিল। খাবার ঘরে ফ্রিজটা যেখানে ছিল, সেখানে ফ্রিজটাও নেই। হঠাৎ কি অবস্থার কোনো হেরফের ? চিন্তিত হল পৃথু।

কুর্চি এল, হালকা প্রসাধন করে। এসে সোফায় বসল উল্টোদিকে। বলল, বাব্বা ! এদিকে কি পথ ভুলে ? সেদিন অমন হেঁয়ালি করলেন কেন ? দাঈ বিকেলে বলল যখন, তখন ভাবলাম ভুল দেখেছে। আপনি এসেও আসবেন নাইই বা কেন ? তারপর রাতে যখন রুষাবৌদি অজাইব সিংকে দিয়ে চীজ-কেক করে পাঠালেন হঠাৎ এবং অজাইব সিং আপনার কথা জিজ্ঞেস করল, তখনই সন্দেহ হল আমার। আপনাকে নিয়ে সত্যিই আমি পারি না। কী লজ্জা বলুন ত!

লজ্জা ? লজ্জা কিসের ? তোমার লজ্জা ?

না ত কী ! একজন মেয়ে হলে বুঝতেন ! অন্য একজনের স্বামীকে খুঁজে পাওয়া না-গেলেই যদি আরেকজন মেয়ের বাড়ি খোঁজ করতে হয়, তবে সেই দ্বিতীয়জনের লজ্জা হয়, কী হয় না ?

পৃথু চুপ করে কুর্চির দুচোখে চেয়ে রইল। কথা বলল না। এটা ওদের অনেক পুরনো খেলা। কুর্চির চোখের মধ্যে চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলে পৃথু, যেন একটুও চোখ উপচে বাইরে পড়ে নষ্ট না হয় ! কুর্চি এই চাউনি চেনে।

কিছুক্ষণ ও অপলকে চেয়ে থেকে বলল, হয়েছে ? এবার ফেরান চোখ।

পৃথু উঠে গিয়ে কুর্চির পাশে বসল। বসে ওর হাতটি হাতে তুলে নিল। কুর্চির ডান হাতের পাতাটি নিজের ডান হাতের পাতায়। কুর্চি মেলে দিল পাতাটি। খুলে দিল। দুপুর বেলার স্থলপদ্মের মতো। আঙুলে আঙুল পাতায় পাতায় উষ্ণতায় উষ্ণতায় মিলন হল। পৃথুর সারা শরীরে সিরসিরানি উঠল।

হয়েছে ?

পুরোনো দিনের মতো কুর্চি বলল।

না। আরও একটু ধরতে দাও। কতদিন আমার হাত আদর করেনি তোমার হাতকে।

থাক। অনেক হয়েছে। আর না।

এমন হয় কেন বল তো ?

পৃথু বলল।

কী এমন হয় ?

তোমার হাতে হাত রাখলে এমন ভাল লাগে কেন ?

কী জানি ? আমিও সেদিন মানসীকে বলছিলাম।

কে মানসী ?

শান্তিমাসীমার সেলাই স্কুলে ও-ও ত শেখে। আমি সেলাই শিখছি যে, পৃথুদা। প্রফেশনাল দর্জিদের মতো পারব পরে। কিছু একটা করতে হবে। সারাদিন বাড়ি বসে সময় কাটে না।

তাই ?

অবাক হয়ে বলল, পৃথু।

হ্যাঁ। মানসীরও বিয়ে হয়েছে আমার বিয়েরই বছর। ওর স্বামী এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টে কী যেন কাজ করেন। মানসীকে বলছিলাম যে, কেন এমন হয় বল্ ত? স্বামীদের অনেক কিছুতেই স্ত্রীদের শরীর ঘুমিয়ে থাকে আর কোনো কোনো মানুষের গলার স্বর, চোখের চাউনি বা হাতের উপর তার হাতের পরশেই সমস্ত শরীর গলে যেতে চায়!

পৃথুর ঠোঁটের কোণায় হাসি ফুটে উঠল।

বলল, কি বললেন মানসী ?

বললেন কি ? বাচ্চা মেয়ে! আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে।

অনেকই ছোট আমার চেয়ে।

বললে কি ?

বলল, যা বলেছ কুর্চিদিদি! ভয় করে গো।

ওকে শুধিয়েছিলাম, কিসের ভয় ?

প্রেমে পড়ার ভয়। ভালোবাসা বড়ই ভয়ের কুর্চিদিদি। যে একবার পড়েছে, সেইই জানে। ভালোলাগা ভালোলাগা খেলা বেশ। ভালোবাসা বড় সাংঘাতিক। আমার শত্রুও যেন কাউকে ভালো না বাসে।

ওর কি অ্যাফেয়ার আছে কোনো ?

অ্যাফেয়ার যাকে বলে, নেই। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, বিয়ে করে যাদের ঝি হিসেবে, রাঁধুনি হিসেবে, সংসারের কাজ করার জন্যে আর বংশরক্ষার উপায় হিসেবেই নিয়ে আসা হয়, তাদের জীবনে অ্যাফেয়ার থাকে না কোনোই। অ্যাফেয়ার করতে সময় লাগে পৃথুদা। দিনের খাওয়াপরার ভাবনা ভেবে যাদের নিঃশ্বাস ফেলারই সময় থাকে না তাদের অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার থাকে না। এসব ব্যাপার ওয়েল-অফ্‌দের জন্যে।

তবে ?

কি তবে ?

তবে, মানসী ভালোবাসার ভয়ের কথা কি জানে ? সময়ই নেই তাহলে ভালোবাসবে কখন ?

ওঃ, সে বিয়ের আগে ভালোবাসত একজনকে। ওদের বাড়ি বিলাসপুরে। মানে, মানসীদের। ছেলেটি পড়াশুনোতে খুব ভাল ছিল। এখন নাকি আই-এ-এস হয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে। মানসীকে অপেক্ষা করতে বলেছিল ও। মানসীর কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা এক দোজবরের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। ভদ্রলোককে দেখলে তুমি ভিরমী খাবে। মানসীর বাবার অবশ্য দোষ ছিলো না কোনোই। ছয় বোন ওরা। বাবা ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টমাস্টার। তাও মধ্য প্রদেশের এমনই এক পোস্টাপিসের যেখানে, লাউটা-কুমড়োটা পর্যন্তও কেউ ভালবেসে দেয় না।

যা শুনছি, তাতে শরৎবাবুর আমলের পর ব্যাপার-স্যাপার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলেই মনে হচ্ছে। এও কি বিশ্বাস করতে হবে ? এই মধ্য প্রদেশে বসেও ?

বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীর অবস্থা বোধ হয় ঠিক সেই রকমই আছে। অবস্থা ফিরেছে শুধু উচ্চবিত্তদের। বিজ্ঞান, সমাজ, প্রযুক্তিবিদ্যা সবকিছুরই সুযোগ শুধু তারাই পেয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত বলে আর কিছু নেইও পৃথুদা। তারা এখন বস্তীতে নেমে গেছে। যারাই বাংলা গান, বাজনা, সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে চিরদিন তারা সত্যিই বস্তীতে নেমে এসেছে। নয়ত নামবে শিগগীরই। অথচ, তারাই বাঙালীর প্রাণ। যারা ভাল আছে, তারা সবাইই সাহেব-মেম

হয়ে গেছে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের আর কোনো যোগাযোগই নেই।

রুষা, মিলি, টুসুদেরই মতো বলছ ?

পৃথু বলল।

সরী। আমি কিছু ভেবে বলিনি পৃথুদা। আমাকে ভুল বুঝবেন না।

তোমাকে আমি কিছুই বলছি না. বলছি তোমাদেব ক্লাসকে। যাবা বাঙালীর, ভাবতের সবচেয়ে ভাল করতে পারত তারাই খারাপ করছে সবচেয়ে বেশি।

পৃথু একটুক্ষণ চুপ কবে থেকে বলল, তাহলে আজ কি এইসব ভালো ভালো আলোচনা করেই আমাকে বিদায় দেবে ?

সরী ! সরী ! কি খাবেন বলুন ? এখন চা খান। আজ কিন্তু খেয়ে যাবেন। মাছ নেই, ছানা কেটেছিলাম। ছানার ডালনা বাঁধব। আমি চা নিয়ে আসছি এক্ষুনি।

তুমি কোথাওই যাবে না আমাব সামনে থেকে। বোসো ত চুপটি কবে। তোমাব কি মনে হয় এত দূবেব জঙ্গল-পাহাড়ের পথ পেবিয়ে আমি তোমার কাছে খেতেই আসি ? পেটুক আমি নিশ্চয়ই কিন্তু তা বলে সত্যি এমন স্থূল পেটুক ?

সত্যি। আমিও প্রায়ই ভাবি। কেন যে আসেন এত কষ্ট কবে। কী যে আপনি দেখেছিলেন আমাব মতো একজন সাধাবণ মেয়েব মধ্যে ! আপনিই জানেন। আপনাব জন্যে কিছু করতে পারি না, কিছু না। তবু, কেন যে ·

এতক্ষণ হাসি হাসি মুখ ছিল কুর্চিব। কালো হয়ে উঠল মুখটি। মুখ নামিয়ে নিল ও।

মেঘ জমছে বাইরে।

পৃথু বলল।

চোখ তুলে বাইরে তাকাল কুর্চিও। নিজের মনে বলল, শীত সবে যাবার আগে বৃষ্টি হবে। তবে তাব দেরী আছে। মুখে বলল, প্রত্যেকটি ঋতু বদল হবাব সময়ই ঝড়বৃষ্টি হয়, লক্ষ্য করেছেন ?

হুঁ ?

বদল মানেই কষ্ট। অন্যকে জাযগা ছেড়ে দেওযা, নিজেকে নতুন জায়গায়, পবিবেশে খাপ খাওযানো। ঋতুদের বুঝি কষ্ট নেই কোনো !

নিশ্চয়ই আছে।

আচ্ছা। একটা সত্যি কথা বলবে আমাকে কুর্চি ?

পৃথু বলল।

কি ? সেই চিরপুরোনো প্রশ্ন ? মিথ্যে ত কখনও বলিনি আজ অবধি। আপনাকে বলিনি অন্তত।

হেসে বলল, কুর্চি।

ফ্রিজটা কি হল ? দেখছি না যে।

হঠাৎ মুখ একেবারে কালো হয়ে গেল কুর্চির। এক ঝাঁকিতে মুখ নামিয়ে নিল।

সারাতে গেছে ? নতুনই ত, অ্যালউইনের ফ্রিজ ত চমৎকার। এরই মধ্যে খারাপ হয়ে গেল ?

কুর্চি মুখ তুলে কিছু একটা বলতে গেল।

পৃথু বলল, তোমার ইলেকট্রিক আভেন নেই ? কেরোসিনের স্টোভে কেউ রান্না করে নাকি ? গ্যাসের স্টোভও ত আনতে পারো। হাটচান্দ্রাতে এবং মান্দলাতেও সিলিণ্ডার পাওয়া যায়। তোমার সিলিণ্ডার আমি কারখানার কোটা থেকেই পাঠিয়ে দেব। বলোনি কেন আমাকে ?

কুর্চি মুখ নিচু করেই রইল। কিছু বলল না।

তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, আপনি বসুন। আপনার জন্যে চা করেই আসছি।

এবারে ওকে মানা করলে কুর্চি আহত হবে তাই কিছু বলল না পৃথু।

কুর্চি চলে গেলে, বসবার ঘরের অন্যদিকের জানালাতে গিয়ে ও দাঁড়াল। আকাশে মেঘ জমেছে। ঘুঘু আর কালিতিতির ডাকছে এই মেঘাতুর বিষণ্ণতাকে বাড়িয়ে দিয়ে। বেশ ঠাণ্ডা আছে। ঝিরঝির করে উত্তুরে হাওয়া দিয়েছে একটা। রাধাচূড়ার স্তবক, রঙ্গনের ঝাড়, কৃষ্ণচূড়ার ফিনফিনে

পাতারা কেঁপে উঠছে। ঘন সটান কদম গাছে শীতের হাওয়া সেঁদিয়ে যেতেই দমবন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে কদম গাছ ত বাধা-কৃষ্ণরই গাছ। "শ্রাবণ ঘন গহন মোহে নীরব দিঠি এড়ায়ে এলে" গাছ ! উত্তুরে হাওয়ার সাধ্য কি তাদের উত্যক্ত করে ? শুধু পূবেরই হাওয়ায় তারা চনমন করে ওঠে। "পূব হাওযাতে দেয় দোলা, মবি মরি··· ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না, পরাণ আমার ঘুম জানে না ; জাগা জানে না···"

হঠাৎই পৃথুর চোখ পড়ল ঐ জানালা দিয়ে একটি কেটলি হাতে করে কুর্চি চলেছে বাইরের সেই চালাঘরের কাঠের গনগনে আগুনেরই কাছে। আগুনে ত মস্ত বড় জলের হাণ্ডি বসানো আছে। সেই হাণ্ডি কি করে নামাবে কুর্চি একা তার নরম হাতে ? ঐ কি বসিয়ে ছিল একা ? তাইই ! অনেকদিন পর কুর্চির হাতে হাত রেখে ও বুঝেছিল ওর হাতের পাতা খসখসে হয়ে গেছে। সেই সুন্দর নরম তুলতুলে হাতদুটি নেই আর। অনেক কাজ করতে হয় নিশ্চয়ই ওর। নিজের হাতে। হয়ত বাসনও মাজে ; কাপড় কাচে। ঈস্‌স্‌ ! কুর্চি !

পৃথু তাড়াতাড়ি ঐদিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে কুর্চি প্রায় পৌঁছেই গেছে উনুনটার কাছে। নিচু হয়েছে, হাঁড়িটা নামাবে বলে, ঠিক সেই সময় পৃথু বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও। পারবে না তুমি। বলেই, পকেট থেকে রুমাল বের করল। রুমালে বেড় পেলো না। তখন নিজের কোট দিয়ে হাঁড়ির বাঁদিক এবং রুমাল দিয়ে ডানদিক ধরে নামাতে গেল হাঁড়িটাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটির উনুনের ডানপাশে কাৎ হয়ে উল্টে পড়ল হাঁড়িটা।

কুর্চি আর্তনাদ করে বাঁ পাশে লাফিয়ে সরে গেল। পৃথুর ডান পায়ের উপর পড়ে হাঁড়িটা আধ-গড়ানে স্থির হয়ে গেল। কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, মোজা, জুতো পরে থাকা সত্ত্বেও ডান হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি ঝল্‌সে গেল পৃথুর।

হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল কুর্চি। পরপরই পৃথুকে জড়িয়ে ধরে বসবার ঘরের দিকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। পৃথু নিজে হাঁটে, এমন অবস্থা ছিলো না তখন ওর। বসবার ঘরের সোফাতে বসিয়ে জুতো-মোজা খুলে দিল কুর্চি এবং একটা কম্বল এনে পাটা ঢেকে দিয়েই বলল, আপনি সোফাতে পা তুলে দিন। বাড়িতে কোনোই ওষুধ নেই। আমি এক্ষুনি বার্নল নিয়ে আসছি বাজার থেকে।

তুমি !

বলেই, পৃথু উঠতে গেল সোফা ছেড়ে। কিন্তু তক্ষুনি পড়ে গেল, সোফাতেই।

কুর্চি আঁচল-উড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঐ শাড়ি জামাতেই।

একা, যন্ত্রণাকাতর পৃথু কম্বলমোড়া ডান পাটা সোফার হাতলের উপর তুলে দিল। বড় জ্বালা ! পুড়ে গেলে এত যে লাগে, জানা ছিল না ওর। রোজই খবরের কাগজে পড়ে ভারতের কোথাও না কোথাও শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী, দেবরের অত্যাচারে কত অল্পবয়সী মেয়ে আগুনে পুড়ে মরছে। ঈসস। কতই না লাগে তাদের। জ্বলে যায় সব। হু-হু করে।

এই অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা, তবু তার সহনীয় বলে মনে হল। যা সহ্য করতে পারছিল না, তা কুর্চির এই অবস্থা ! মনের কষ্টের কাছে শরীরের কষ্ট কিছুই নয়। আজ যেন প্রথম বুঝল ও। কী হয়েছে কে জানে ? ফ্রিজ বিক্রি করে দিতে হল, কেরোসিনেও রান্না করা যাচ্ছে না ? আশ্চর্য !

কুর্চি ফিরে এল বার্নল নিয়ে। তারও একটু পরে এল দাঈ, ডাক্তার নিয়ে। ডাক্তার ভাল করে ড্রেস করে দিলেন। বেশি পুড়েছে গোড়ালি আর পায়ের পাতা। যোধপুরী বুটের মধ্যে দিয়ে জল ঢুকে গেছিল। দু'একদিন এখন শয্যাশায়ী থাকতে হবে। পা'টাকে যত রেস্ট দেবেন ততই ভাল।

ডাক্তার বললেন।

মাথা খারাপ স্যার। আমার চাকরি চলে যাবে।

পৃথু বলল।

ও ভাবছিল যে, রাইনার অবাচীন ডাক্তার কি করে জানবে পৃথুর বিপদের কথা ? রুষাকে কী করে বলবে যে, কুর্চির অবস্থা দেখে তাকে রান্নায় সাহায্য করতে গিয়েই ওই অবস্থা। কী করে কথাটা বলবে ও তা ভেবেই পেল না। আর যদি সাহস করে বলেই ফেলে তাহলে বলবার পর কি হবে ?

এর চেয়ে সেদিন ডাকু মগনলালেব গুলি খেয়ে মবে যাওযাই অনেক ভাল ছিল। পৃথু জঙ্গুলে মানুষ। জঙ্গলের জানোয়ারের মোকাবিলা সে করতে পারে। নিদেনপক্ষে, পুরুষ-মানুষেরও। কিন্তু ঈর্ষাজর্জর মহিলা ?

নেভার। নেভার ! টোটালি ইনকেপেবল্।

পৃথুর ইচ্ছে হল, অনেক অনেকদিন পব ছেলেবেলাব মতো 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে দেয ও। সশব্দে কাঁদলে দুঃখ যে শীৎকারের সঙ্গে তড়িৎবেগে বেরিয়ে যায এই মহাসত্য এই মুহূর্তেব আগে ও জানত না। সশব্দে কাঁদতে ইচ্ছে হল খুবই, কিন্তু পাবল না কিছুতেই। যতই ইচ্ছে হোক না কেন ছেলেবেলায় ফেরা যায় না। মানুষেব সৃষ্ট সমস্ত জল এবং স্থল যানে একটি কবে ব্যাক-গীযার আছেই। নেই শুধু তার নিজের জীবনেই। শত প্রয়োজনেও, শত চেষ্টাতেও ; জীবন-যানে ব্যাক-গীযারে যাওয়া যায় না।

ওয়াট-আ-ট্রাজেডী !

ডাক্তার চলে গেলেন। কিছু ওষুধও লিখে দিলেন। মলমও লাগাতে হবে। ড্রেস করতে হবে প্রত্যেক দিন। পবিবেশ একটু শান্ত হয়ে এলে দাঈও আবাব সেই হাঁড়িতে নতুন জল বসাতে গেল।

কুর্চি বলল, একটু একাই বসুন পৃথুদা। আমি চা নিয়ে আসছি।

আবারও চা ?

দ্বিধার গলায় বলল, পৃথু।

মানা করবেন না আমাকে। কুর্চি বলল।

কুর্চিব চুল বিধ্বস্ত। শাড়ি এলোমেলো। মুখ উদ্বিগ্ন।

যেও না কুর্চি ! আমার কাছে একটু বোসো। লক্ষ্মীটি ! কথা আছে তোমাব সঙ্গে।

পৃথু হাত তুলে বলল।

না। কি কথা ? না !

পৃথু কুর্চির চোখে চাইল। দেখল, কুর্চিব দুচোখ জল-ছলছল।

কুর্চি আবারও বলল, না।

এবারে ওর গলাটা ধবা শোনাল।

পৃথুর বুকের মধ্যেটাতে হঠাৎ এক মোচড় দিয়ে উঠল। এমন ভাবে মোচড দিয়েই বুঝি হার্ট-অ্যাটাক হয় মানুষের। কে জানে ? নিজের না হলে বোঝা যায় না।

কুর্চি চলে গেল।

একা বসে জানালা দিয়ে বাইরের টাঁড়ের দিকে চেয়ে অনেকই কথা ভাবছিল পৃথু। কুর্চিকে পৃথু বিয়ে করলে এত কষ্টে থাকতে হত না কুর্চিকে। কিন্তু কুর্চির কষ্ট দেখে ওর নিজের যে এতখানি কষ্ট হবে তাও ভাবতে পারেনি। চা নিয়ে যখন এসে পৌঁছল কুর্চি তখন শরীরের যন্ত্রণার উপশম হয়েছে, কিন্তু মনের যন্ত্রণাতে বুঁদ হয়ে গেছে পৃথু।

উঠে বসার চেষ্টা করল একটু।

একদম না। চুপ করে বসুন যেমন আছেন।

চায়ের কাপটা সোফার পাশের তেপায়ার উপর রেখে উল্টোদিকে বসল কুর্চি।

পৃথু ইশারায় আবারও পাশে এসে বসতে বলল।

জোর করে হাসার চেষ্টা করে কুর্চি বলল, না। একদম না। এবার চা পড়ুক গায়ে, সেটুকুই বাকি !

চা-টা খেয়ে পৃথু বলল, এবার ?

কুর্চি পাশে এসে বসলে, পৃথু আবার ওর হাতটি হাতে তুলে নিল। আশ্চর্য ! শরীরে আগুনে-পোড়া যত জ্বালা ছিল সব নিবে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য ! যখন সময় এমন অসময় হয়ে ওঠেনি ; তখন ও কতবারই রুষার হাতে হাত রেখেছে। অল্পকদিন আগে হাত রেখেছে বিজলীরও হাতে। এমন ভালো ত লাগেনি কখনও ! রুষা, তার স্ত্রী। তার ছেলেমেয়ের মা। এক ধরনের

বিশেষ ভালবাসা নিশ্চয়ই তার জন্যে এখনও আছে পৃথুর। সে ভালবাসা কানুনী ভালবাসা ত বটেই! বিজলীর জন্যেও এক ধরনের বে-কানুনী, বে-এক্তিয়ারের তীব্র ভালবাসা বোধ করেছে ও সেদিন। কিন্তু কুর্চির ভালবাসাটা একেবারেই অন্যরকম ভালবাসা। অনেকটা বন, নদী, পাহাড় আকাশের তারারা, প্রাচীন মহীরূহ যেমন করে পৃথুকে ভালবেসেছে শিশুকাল থেকে, অনেকটা সেরকম ভালবাসা। এই ভালবাসায় দাহ নেই কোনো ; শুধুই প্রলেপ।বোধহয় একমাত্র কুর্চির মতো মেয়েরাই এ যুগেও এমন শান্ত স্নিগ্ধ ভালবাসা বাসতে জানে। গ্রেট-ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড-এর মতোই এরাও বড়ই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে এই দেশে।

কুর্চি বলল, ছাড়ুন। দাঈ এসে পড়বে যে-কোনে সময়ে। ভাঁটুও এসে পড়তে পারে যে-কোনো মুহূর্তে।

আসুক। আসলেই বা কি ? ছেলেবেলা থেকেই আমরা দুজনে দুজনকে জানি, একটু হাতে হাত রাখলে দোষ কি ? মহাভারত কী অশুদ্ধ হবে তাতে ?

সমাজ ? সমাজ নেই ? আপনি রুষাবৌদির স্বামী নন ? আমিও ত ভাঁটুর বৌ ? অমন পাগলামি করবেন না। সব বিষয়ে পাগলামি চলে না।

আলবাৎ চলে। চালালেই চলে। তাছাড়া, এ পাগলামি কেন হবে। এইই ত সুস্থতা।

নাঃ। বললেই ত আর হয় না। বেঁচে থাকতে হলে একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে করতে হয় সবকিছুই। নইলে···। সমাজকে আপনি মানুন আর নাইই মানুন সে ত আছেই। শকুনের মতো নজর তার। কোথায় ফুল ফুটেছে তা দেখে না তারা, মরা গাছের মগ ডালে বসে থাকে সব সময়। পচা-গলা মৃতদেহের দিকেই চোখ তাদের। আপনি ত আর মেয়ে নন, আপনার কি ?

পৃথু হেসে উঠল। আসলে কাঁদতে চেয়েছিল। গভীর কান্নাটা হালকা হাসি হয়ে ছিটকে উঠল। বলল. ছিঃ! ছিঃ! এমন সব কথা আস্তে বলো। অন্য মানুষে কেউ শুনতে পেলেই লজ্জা পাবে। সারা দেশে এত লিবারেশন মুভমেণ্ট। মেয়েরা ত সবাই পুরুষের সমানই। কোন্ দিক দিয়ে তোমরা কম!

যারা লিবারেটেড হতে চায় তারা হোক। আমি চাই না।

তার মানে ?

আসল কথাটা হচ্ছে ইকনমিক্-ফ্রীডম্'। আমার কথা আলাদা। । আমি চাই আমাকে কেউ জোর করুক, আমাকে চালাক, আমাকে পরাধীন করে রাখুক।

কী বলছ কি তুমি ?

ঠিকই বলছি।আমার মতো অনেক মেয়েই আছে। এই পরাধীনতাটার ইচ্ছেটাও ইচ্ছে করেই। এর মানে, পশ্চিমের মেয়েরা কোনোদিনও বুঝবে না। এদেশের স্বামীরা স্ত্রীদের যতখানি এবং যেমন করে ভালবাসে ততখানি কি ওদেব দেশে পারে ? আমাদের জিতটা যে কোথায় তা ওরা বুঝবে কি করে ? অনেক স্বাধীন মেয়েকে আমি জানি, তাদের পরাধীনতাটা গ্লানির।.স্বাধীনতা তাদের নামেরই স্বাধীনতা শুধু!

যাকগে বাবা। যা বললে বললে, আর বোলো না। হাটচান্দ্রার উইমেনস লিব্ এর প্রবক্তারা তার মধ্যে তোমার রুষা বৌদিই প্রমিনেণ্ট, জানতে পেলে বলবেন যে, তোমাকে আমি ঘুষ খাইয়ে উইটনেস ফর দ্যা প্রসিক্যুশান বানিয়েছি।

হেসে উঠল কুর্চি। বলল, আমাকে যে ঘুষ দিয়ে কেনা যায় না তা সকলেই জানে।

ঘুষ খেও না। খেলে বদহজম হবেই। ঘুষ আর ঘুষঘুষে জ্বর একই রকম অসুখ। আছে বলে মনে হয় না, সারেও না। আমাদের শর্মাকে চোখের সামনেই দেখি। রাতে ঘুম হয় না, ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না, বুড়ো বয়সে কষ্ট পেতে হবে। ঘুষ খাবার দরকার নেই তার চেয়ে একটা চুমুই খাও আমাকে।

ছিটকে চলে গেল কুর্চি উল্টোদিকের সোফায়। লজ্জায়, উত্তেজনায় মুখ লাল হয়ে উঠল ওর।

বলল, কী অসভ্য! ইয়ার্কি হচ্ছে, না ? আপনাকে আমি যে এক বিশেষ চোখে দেখি পৃথুদা।

নিজেকে অন্যদের মতো করেফেলবেন না আমার চোখে। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্লিজ না।

ভালই বলেছ। হেসে ফেলল পৃথু।

বলল, কুলুঙ্গীর দেবতা হয়ে থেকে তোমার হিমেল ফুল-বেলপাতার শ্রদ্ধা কক্ষনো চাইনি। প্রেম যে শ্রদ্ধার চেয়েও সিনিয়র দেবতা, এমন ত জানা ছিল না।

কুর্চিও হাসল। বলল, আপনার সঙ্গে কথায় পারব না।

তবে, এসব জিনিস আলোচনা পর্যন্ত করতে নেই। সব বিষয়ই কি আলোচনার ?

তারপর মুখ নিচু করে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল কুর্চি। তারপর মুখ নিচু করেই গাঢ় স্বরে বলল যে, যে-অসামান্য পুরুষ সময়মত মুখ ফুটে একজন সামান্য নারীর কাছে মাত্র তিনটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারল না তাঁরই মুখে এত কথার ফুলঝুরি কী বেমানান নয় ? মক্কেলের যাবজ্জীবনের কারাবাসের দণ্ড হয়ে যাবার পর মেধাবী দামী উকিলের সওয়ালের দাম আর কীইই বা থাকে ? আপনি একটি অদ্ভুত বাজে লোক।

তিনটি শব্দ ? কোন্ তিনটি শব্দ ? সেই সামান্য নারীটিই বা কে ?

অবাক, ছটফটে গলায় পৃথু শুধোল।

জানেন না আপনি ?

কুর্চির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল, তা বুঝলে ত…

নারীটি যে কে তা অনুমান করতে পারি, তবে শব্দ তিনটি কি ? আর "সময়মত" কথাটির মানেই বা কি ?

তিনটিই শব্দ। আমি কুর্চিকে ভালবাসি। আর "সময়টুকু" হচ্ছে, যখন আপনার জ্যাঠামশায় আপনার বিয়ের কথা প্রথম পাড়লেন আমার তখনও বিয়ে হয়নি।

লাফিয়ে উঠতে গেল সোফা থেকে পৃথু। পরক্ষণেই, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। বসে পড়ল।

ও কিছু বলার আগেই কুর্চি বলল, আপনি বাঘ মারতে পারেন হয়ত, কিন্তু আপনি কাপুরুষ। একটু আগে যা বললেন, ঐ চুমুটুমুর কথা আর কখনও আমাকে বলবেন না। আমি ভাঁটুর স্ত্রী। সে আমার স্বামী। ভাল হোক, মন্দ হোক ; ইনডিফারেন্ট হোক। আমি ওকে ডুবিয়ে দিতে পারি না। বিয়েটা একটা চুক্তি, পৃথুদা। চুক্তির এলাকার বাইরে যা কিছু আছে সবই আমি দেব আপনাকে, দিইও। যা দিই তাব বেশি কখনই চাইবেন না।

বলেই, চুপ করে গেল কুর্চি।

এমন সময় ধুলো ভরা রাস্তা থেকে মোটব সাইকেলের আওয়াজ ভেসে এল। শীতের জমাট-বাঁধা ধুলোর গায়ে আর ধূলিধূসরিত বনের পথপাশের গাছেদের গায়ে অনুরণিত হয়ে শব্দটা অনেকগুণ বেড়ে গিয়ে ধেয়েই আসছে যেন। শব্দ নয়, ও যেন শকুনের দল। পৃথুর একটুখানি সুখে ধারালো ঠোঁট বসাবে যেন।

পৃথু কোটের পকেট থেকে কুঁচফলের থোকাগুলো বের করে কুর্চিকে দিল। বলল, রাখো। তোমার স্বামী আসছেন। ফুল-টুল খুব খারাপ। বড়ই সংক্রামক।

কী, এগুলো ?

ফুল নয়। কুঁচফল। ছোটবেলায় তুমি খুব ভালবাসতে !

কুর্চি উঠে এসে থোকাটি হাতে নিল।

তারপব এক মুহূর্ত স্থির চোখে পৃথুর চোখে চেয়ে রইল। মুখটা ভাঁটুর আসার প্রতীক্ষায় দরজার দিকে ঘুরিয়ে রেখে অস্ফুটে বলল, কথা কিছু মনেও রাখেন আপনি !

সত্যি ! মিছিমিছি !



বিজলীর কাছে যাওয়া হয়নি আর। যাওয়া উচিত ছিল। পৃথু বড় কামিনা হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। এমন ছিলো না ও আগে।

বেচারী বিজলী। কত কষ্ট ওর। সত্যিই বেচারী ভারী কষ্ট করে। সকালে নাকি এক বয়স্কা বাঈ-এর কাছে নাচের তালিম নেয়। দুপুরে রান্না বান্না সেরে জিরিয়ে নেয় একটু। সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই সাজ গোজ করতে হয়। গোলাপের আর ঈত্বরের গন্ধে আর ঝাড় লণ্ঠনের আলোতে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তার মনটা খুশিতে ভরে ওঠে!

রাত নামলেই মুজ্‌রো। তবে আসরে ত আর আজকাল নাচ-গানের পরীক্ষা বেশি হয় না। মুজ্‌রো ঐ নাম-কা-ওয়াস্তেই। যতক্ষণ না ফরাসে বা কামরার কাঁচের-দেয়াল-ঘেরা পালঙ্কে অথবা জাজিমেই স্পর্শদোষ না ঘটে ততক্ষণ কি আর ছুটি হয়? তারপরও হয়ত রেহাই পায় না। কত রকমের পুরুষই না আসে!

পৃথুর হঠাৎ হাসি পেল খুউব। সব পুরুষই বোধহয় এমনই ভাবে। নিজে ভাল এবং অন্য সকলেই খারাপ! পৃথু ত নিজেই গেছিল। মত্ত অবস্থায়। খুনী বা ডাকাতেরই মতো। তার সঙ্গে যেমন ভাল ব্যবহার করেছিল বিজলী, সকলের সঙ্গেই হয়ত তেমন ব্যবহারই করে।

বিজলীর কথা মনে হলেই তাকে খুব দুঃখ দিতে ইচ্ছে করে পৃথুর। মেয়েটার ইমানদারি বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ওকে কাঁদাতে ইচ্ছে করে খুব। কুর্চিকে বা রুষাকে সামনে কাঁদতে দেখলে যে পৃথুর বুকের মধ্যে কষ্ট হয় সেই পৃথুই বিজলীকে কাঁদাতে চায়। এ তার বুকের গভীরের নিষ্ঠুরতা। যা সাধারণত ছাই-চাপা থাকে। পৃথুর মধ্যে অনেকগুলো মানুষ বাস করে যে!

বিজলীর কপালে খুবই দুঃখ আছে। পৃথু ঘোষের মধ্যের স্যাডিস্ট-সত্তা বিজলীকে খুব কষ্ট দিতে চায়। ও ত বাজারের মেয়েছেলেই। ওর ত গুমোর নেই, স্বামীর গরম বা গর্ব নেই। ওর শরীর এবং মনও হয়ত ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরীর মাংস হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে ত খুশি মতন ছিনিমিনি খেলাই যায়! কাউকেই কৈফিয়ৎ দেবার নেই। তালাক্। তালাক্। তালাক্। তিনটি শব্দ সময় মত না বলতে পারার জন্যে জীবনভর গঞ্জনা সওয়া নেই, সাত-পাকে বাঁধা স্ত্রীর ভর্ৎসনা নেই। বিজলী ত বিজলীই। রাণ্ডী বিজলী।

ম্যানেজারবাবুর বাড়িতেই প্রথম আলাপ হয়েছিল কুর্চির সঙ্গে। সেদিন কুর্চি সাদার উপর হলুদ পোলকা ডট-এর ছিটের একটি ফ্রক পরেছিল। মাথায় সাদা রিবন। সাদা জুতো। ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী করুণা-কাকিমা আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন পৃথু এই যে, এর নাম কুর্চি। এও ভাল গান গায়। নিমুবাবুর মেয়ে ও।

কুর্চি ত ফুলের নাম!

কিশোর পৃথু বলেছিল।

কিশোর পৃথু অবাক বিস্ময়ে বালিকা কুর্চির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে বলেছিল।

তাইই ত! মানুষ বুঝি ফুল হতে পারে না?

সপ্রতিভ কুর্চি উত্তরে বলেছিল।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে পৃথুর। কী করে কেটে গেল বছরগুলো। অথচ আয়নার সামনে যখনই দাঁড়ায়, বাথরুমে বা বেসিনে তখন নিজের সেই ছোটবেলার মুখটাকেই দেখতে পায়। চার বছর বয়স থেকে রোজই দেখছে ত। সেই মুখটার বয়স বাড়েনি। তবে ছেলেবেলার কোনো বন্ধুর সঙ্গে

হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে আঁতকে ওঠে ও। বন্ধুকে যদি এমন দেখতে হয়ে গিয়ে থাকে, তার যুবক-মুখকে খুঁজে না পায় যদি, তবে সেও নিজেও নিশ্চয়ই অনেকই বদলে গেছে। ভেবেই মন খারাপ হয়ে যায়।

অফিসের চেয়ারে বসে এই সবই ভাবছিল পৃথু। ভাবনাগুলোর কোনো খেই থাকে না আজকাল। ওর মনোসংযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। আবোল-তাবোল উল্টোপাল্টা ভাবে। পাগলামির আগের স্টেজ। বুঝতে পারে।

ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ইতোয়ারিন আসবে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। ওর বরের জ্বর ছাড়েনি এখনও। বুকের ব্যথাটাও যায়নি। পৃথুকে ডেকে পাঠিয়েছে। আজ যাবে। বিজলীর কাছে যাওয়া হলো না। অথচ যাওয়া উচিত। বিজলীর প্রায়রিটি সবচেয়ে পরে। গুগগা-ইতোয়ারিনের স্বামীর স্থানও বিজলীর অনেক উপরে।

সেদিন সকালে বিজলীকে বলেছিল পৃথু, এত কষ্ট করাব দরকার কি ? বাজাবেই যদি ত গান গাওয়া কেন ? নাচটা রাখো, ফিগার ঠিক রাখার জন্যে। আর মাঝে সাঝে বাজাও। না-বাজালে যখন চলেই না।

বিজলী বড় আহত হয়েছিল। বলেছিল আপনিওএ কথা বলবেন তা ভাবিনি! গান ছেড়ে দিলে যে চলে সে ত আমিও জানি। কিন্তু আমি যে গান গাই তা ত কোনোদিনও ময়লা-কুচলা হবে না পিবথুবাবু ! আমি নিজে ত একদিন তবাহ হয়ে যাবো। ফান্দাবাজী করেই ত নিজের পেট চালাতে হবে। এই আমাদেব নসীবী। "কিমতি চীজ", "কিম্‌তি চীজ" শুনতে শুনতেই একদিন জওয়ানী শেষ হয়ে যাবে। সব কিছুরই ত শেষ থাকে পিরথুবাবু। যেদিন জওযানী শেষ হয়ে যাবে ; পুরুষরা আব মচ্ছিরমতো আমার উপব পডবে না এসে, সেদিন ? সেদিন কী নিয়ে বাঁচব আমি বলুন ? গানই তখন বইবে আমাব সাথী হয়ে। একমাত্র সাথী।

ওয়াহ। ওয়াহ ! মনে মনে বলেছিল পৃথু। "আমাব শেষ পারানীর কড়ি কণ্ঠে নিলেম গান, কণ্ঠে নিলেম"। আবাব সেই সাদা-দাড়ির বৃদ্ধ। নিস্তাব নেই। তাকে বাদ দিয়ে বাঁচার উপায় নেই ; মরার উপায় নেই।

পৃথু বলেছিল, পৃথু ঘোষ আর কজন আছে ? শুধু তোমাব গানের জন্যেই তোমার কাছে আসবে সেদিন এমন মানুষ কি খুব বেশি পাবে ? গান শোনাব মতো জিন্দা-দিল্ আর সজাগ-কান কজন মানুষকেই বা পাঠান খুদাহ ?

বিজলী হেসেছিল।

বলেছিল, পাব পাব। আপনাকে খুঁজে পেলাম কি করে ? আপ যৈসী ইনসান যে-দুনিয়ায় থাকে সে-দুনিয়াতে গান থাকবেই। গানই যেদিন শুনবে না মানুষ, গানকে ভাল বাসবে না ; সেদিন এই দুনিয়াই বরবাদ হয়ে যাবে।

সত্যিই। বিজলী কোনো রকম ঈজৎতারিফ-এব মোহে পড়ে গান শেখেনি। তার শিল্প-সাধনাতে ফাঁক ছিলো না এককণাও। তার জওয়ানী গুজর যাওয়ার পরও তাব এই সুন্দর পবিত্র শিল্পকে আশ্রয় করেই সে বাঁচবে। শুধু শরীরেই নয় ; মনেও। একজন শিল্পীর বাঁচা ত কখনই শরীর-সর্বস্ব হতে পারে না। বাঃ। বাঃ। ভাবলেও ভাল লাগে পৃথুর। একেকজন মানুষের প্রতি একেকবকম শ্রদ্ধায় মন নুয়ে আসে। ভাগ্যিস, শ্রদ্ধা এখনও করতে পারে অনেককে। সেইটুকুই আশার কথা।

আয়ী সাহাব।

চমকে উঠল পৃথু।

ভাবনার রাজ্যে কোথায় যে চলে গেছিল !

এত দেরী করে এলি তুই ইতোয়ারিন ? ফিরতে আমার রাত হয়ে যাবে যে অনেক।

তুমি ত জঙ্গলেরই মানুষ সাহাব। আমাদেরই মতো। জঙ্গলে তোমার ভয় কি ? এখনও ত পুরো শীত। সাপের ভয়ও নেই ত এখন। চলো সাহাব। তোমার কথা বার বার বলছে ও।

ডাক্তার গেল না শেষ পর্যন্ত ?

না।

তোকে যে বললাম ঝিংকু ডাক্তারকে নিয়ে যা ভিজিট দিয়ে।

সে ত অনেকই খরচের ব্যাপার। আমাদের বস্তীতে বাপ-দাদার জম্মে কেউ কখনও হ্যালোপ্যাথী ডাক্তারকে ভিজিট দিয়ে নিয়ে যায়নি।

হ্যালোপ্যাথী নয়, অ্যালোপ্যাথী।

ঐ হল। আমাদের চিকিৎসাই করাব আর দু একদিন দেখে নিয়ে৷ গাওয়ানকে বলে রেখেছি। ওঝাকেও ডাকব।

তাহলে আর আমাকে কষ্ট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস কেন এতদূর? আমি ত ডাক্তার নই, পাহান বা ওঝাও নই।

তোমার সঙ্গে ওর অন্য ব্যাপার। তোমাকে খুবই ভালবাসে। কেন, জানি না.। কিন্তু বাসে; ভাল।

চল।

চল্।

বলে, ইতোয়ারিনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পৃথু।

কারখানার হ্যালোজেন ভেপার ল্যাম্পের গাঢ়কমলা রঙা আলোটা পেছনে ফেলে জঙ্গলের পথে ঢুকতেই জঙ্গলকে অন্ধকারতর বলে মনে হল। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে চড়াই-উৎরাই এ রাস্তা। শীতের রাতের বনের গায়ের গন্ধ মনে হয় থম মেরে আছে। কিন্তু আসলে ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছে অন্ধকার আকাশের তারাদের দিকে।

চলতে চলতে নিচু গলায় স্বগতোক্তির মতো বিড় বিড় করে কথা বলছে ইতোয়ারিন। গেঁহু বাজরার হিসেব। হাট থেকে মোরগা-মুরগী কিনেছিল চারটে ডিমের ব্যবসা করবে বলে, খাটাশে খেয়ে গেছে তাদের। একবার ছাগলের ব্যবসাও করতে চেয়েছিল। শোনচিতোয়াতে নিয়ে গেছে ছাগল। কানহা-কিস্‌লির জানোয়ারেরাও আসে। পুরো পার্কের সীমানাতে ত আর পরিখা কাটা নেই। তাছাড়া জানোয়ারেরা ত আর রাস্তা ধরে চলে না! তবে সুখের কথা এইই যে, ওরা ওদের একমাত্র মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে। গাব্দাগোব্দা নাতি হয়েছে একটা। মালঞ্জখণ্ডে কাজ পেয়ে চলে গেছে দামাদ। ভালই আছে। ভাল খাচ্ছে। মেয়ের মাথায় তেল, গায়ে সাবান জোটে; সিনেমা পর্যন্ত দেখতে পায় মাঝে মধ্যে। অনেক দুঃখের মধ্যে এইটেই ইতোয়ারিনের সবচেয়ে সুখের খবর। নাতিটাকে দেখতে ভারী ইচ্ছে হয় কিন্তু মাসে একবারের বেশি দেখতে পায় না। যাওয়া-আসার খরচ অনেক। মেয়েই আসে। কখনও একা। কখনও বা জামাইর সঙ্গে।

পঁচিশ মিনিট কী আধ ঘণ্টাটাক হেঁটে যখন ওদের গ্রামে পৌঁছল তখন মাদলে চাঁটি পড়েছে, কার্মা নাচের জায়গায়। টোবা-টুরীরা এসে জমায়েত হচ্ছে একে একে। আগুনের পাশে বসে বয়স্করা মহুয়া খাচ্ছে। অন্য পাশটা ফাঁকা রাখা হয়েছে নাচের জন্যে।

হঠাৎ অসময়ে নাচ?

পৃথু শুধোল।

টিনডার মাইনে বেড়েছে পাঁচ টাকা।

পাঁচ টাকা?

হ্যাঁ।

কোথায় কাজ করে?

বাজারের গুড়ের দোকানে।

কাজটা কি?

বস্তা সেলাই করে।

বাঃ। বলল পৃথু।

বলেই ভাবল, কাকে যে বলল! টিনডাকে, না টিনডার গুড়ের দোকানী মালিককে; না এই

স্বাধীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থাকে তা নিজেই বুঝতে পারল না। লজ্জাটা নিজের থুথুর সঙ্গে গিলে ফেলল। এই লজ্জার পেছনে তারও পরোক্ষ অবদান আছে কিছুটা।

এই অল্প-সুখে-সুখী—টিনডাদের এই নাচের জন্যে বাহবা দিতেই হয়। মাতাল যেমন প্রতি সন্ধ্যাতে নতুন নতুন অজুহাত খুঁজে নিয়ে বোতল খুলে বসে তেমনই নাচ যাদের রক্তে আছে তারাও ছুতো বানিয়ে নেয় নতুন নতুন। পাঁচ টাকা মাইনে বাড়াটা ত একটা যথার্থ কারণই। ছুতো নয় আদৌ।

ইতোয়ারিন বলল, এবার ডানদিকে সাহাব।

ডানদিকে ঘুরতেই কার্মা নাচের জায়গার আলোটা মুছে গেল। গভীর অন্ধকার এখন। হঠাৎ আলোর মধ্যে এসে পড়ায় চোখ ধেঁধে গেছিল। টর্চটা জ্বালল পৃথু। ইতোয়ারিন লাউগাছে ছাওয়া কাঠের বেড়ার ফাঁকের দরজা দিয়ে আগে ভিতরে ঢুকে আপ্যায়ন করে বলল, আইয়ে।

দুটি ছোট ছোট ঘর—একই চালার নিচে। জংলীবস্তীর ঘর যেমন হয় আর কী! মাটির, সামান্য চওড়া বারান্দা। একটি ঘরে ছাগল-মুরগী জিনিসপত্র থাকে। অন্য ঘরে খাওয়া-শোওয়া। সবকিছু। ঘরের মধ্যে কেরোসিনের টেমি জ্বলছিল একটা। পৃথু ঢুকতেই, গুগ্‌গা মাটির মেঝের ওপরে পাতা কাঁথার ওপর উঠে বসার চেষ্টা করল। তারপর না পেবে, শুয়ে পড়ল আবার। হাসল একটু। পৃথুও হাসল, সহকর্মী, সহকর্মীকে দেখে যেমন হাসি হাসে; সহমর্মিতার হাসি, কমরেডশিপ্-এর হাসি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করার সুখ-দুঃখের হাসি।

কি হল? যাবে না কাজে? হলোটা কি তোমার? বুড়ো হয়ে গেলে নাকি সত্যি সত্যিই?

উত্তরে ও বুকের ওপর হাত রেখে দেখালো, বুকে ব্যথা।

কাল আমি ঝিংকু ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেব। যা বলবে, করতে হবে কিন্তু ট্যাঁ-ফোঁ করবে না কোনরকম।

ও হ্যাঁ-ও করল না, না-ও করল না পৃথুর কথায়। ওর মুখ দেখে পৃথুর মনে হল না যে, শরীরের কারণে ও খুব বেশি চিন্তিত।

অবাকই হল একটু পৃথু।

তারপর ও ইসারাতে ইতোয়ারিনকে ঘরের বাইরে যেতে বলল। তাতে ইতোয়ারিনও অবাক হল না কম। পৃথু ত হলোই।

ইতোয়ারিন চলে গেলে, গুগ্‌গা চাপা গলায় বলল, আমার অসুখের জন্যে তোমাকে ডাকিনি পাগলা সাহাব। বুড়ো হলে অসুখ করেই। একদিনও না কামাই করেই ত গত পঁচিশ বছর কাজ করলাম কারখানায়। তুমি আসার পাঁচবছর আগে থেকেই। তার আগে বিড়িপাতার ঠিকাদারের কাছেও তিরিশবছর কাজ করেছি। মাইনে সুদ্ধ যদি মাস দুয়েক ছুটি দাও তাহলে এই শুয়ে-বসেই আমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে।

তুমি ত জানো যে ......

পৃথু বলল।

গুগ্‌গা বলল, জানি আমি। আমি কিন্তু সে জন্যেও তোমাকে ডাকিনি।

এবার আরো অবাক হলো পৃথু।

শুধোল, তবে?

আমি আর কাজ করব না।

নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে? তা এর জন্যে আমাকে ডাকার কি ছিল? এমনিতেই ত ছাড়তে পারতে। কিন্তু কাজ ছাড়লে খাবে কি?

খাব, যা হোক কিছু করে। বুড়ো মানুষের খেতে বেশি কি লাগে?

তোমার কথা বুঝছি না আমি। খুলে বল যা বলবে। যা বলছ, ভাল করে ভেবে বলছ কি?

ভাবাভাবি শেষ। আমার আর ইতোয়ারিনের বদলে আমার মেয়ে-জামাইকে চাকরী দাও সাহাব।

সে কি?

তোমার জামাই না এত ভাল চাকরী করে ? ভাল থাকে, ভাল খায়, সরকারী কারখানাতে তবু ?

ভাল চাকরীই ত বিপদ ডেকে আনল সাহাব। দামাদটা আমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটাও। যার যতটুকু টাকার যোগ্যতা, যার যেরকম জীবনে অভ্যেস, প্রয়োজন, তার চেয়ে হঠাৎ বেশি টাকা হাতে এলে মানুষ নষ্ট হয়ে যায় সাহাব। বরবাদ হযে যায় বিলকুলই।

কেন তুমি এরকম ভাবছ ? এত লোক মালাঞ্জখণ্ড্-এ কাজ করছে, সকলেই কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ? পাগলের মতো কথা বলছ তুমি।

সকলের সেই বুদ্ধিই নেই। যখন তারা নষ্ট হয়ে যায়, তখন মনে ভাবে তাদের ভীষণই ভাল হচ্ছে বুঝি। না, না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দিতে পারি না। তুমি আমাকে চেনো, জানো ; ভালবাসো। তোমার ক্ষমতা আছে আমাদের বদলে আমার মেয়ে আর দামাদকে নিয়ে নেবার। নতুন লোক ত আর নিচ্ছ না!

শেষের দিকে গুগ্গার গলাটা জোর হল। এবং ওর কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে থেকে ইতোয়ারন ঢুকল ঘরে। উত্তেজিত হয়ে বলল, এই জন্যেই পাগলা সাহেবকে ডাকা ? পাগল হয়েছিস তুই। গাধা কোথাকার! দামাদ, মেয়েকে যে ভাল রেখেছে, ভাল পরাচ্ছে, দুজনে মিলে ফুর্তি করছে তা বুঝি তোর সহ্য হচ্ছে না ? তুই আমাকে কি করে রেখেছিস সারাজীবন ? তাও ত নিজে বসে খাইনি। দুজনে কামিয়েও দুটি সুখা-রোটি ছাড়া জোটেনি বলতে গেলে কিছুই, সামনেই বলছি, এইই ত ছাতার কোম্পানি তোদের!

আঃ। ইতোয়ারিন্। তোরা কি সবই বুঝিস ? তোরা সব বুঝিস না। তোরা দূর অবধি দেখতে পাস না তাইই এমন বলিস। এমন ভুল করিস না। ভাল থাকা আর ভাল খাওয়ার চেয়েও আরও অনেক বড় ভাল আছে। আমাদের এই বস্তীতে শান্তি আছে, সুখ আছে, বিশ্বস্ততা আছে। ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়নি আজও। অন্যলোকের বউকে ধরে কেউ টানাটানি করে না, টাকা দিয়ে কেউ কাউকে লোভ দেখায় না, আর যদি তা করেও বা লোভও দেখায় ত তাহলেও গাওয়ান-এর সামনে তার ফয়সালা হয়। তাকে বিয়ে করে, ঘর করতে হয়।

কোন্ আমলের লোক রে তুই ? অজীব আদমী সচ্‌মুচ্। যে শুনবে, সেই হাসবে, দিমাগ খরাপ হো গ্যয়া তেরা। বে-অকল্ অদমী।

গুগ্গা এক ঝটকায় উঠে বসল, গায়ের ছেঁড়া কম্বল মাটিতে ফেলে দিয়ে। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

নাকের পাটা ফুলিয়ে বলল, আমি ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে থেকে এসেছি। ওখানে লোভ আছে। নানারকম লোভ। চক্‌চকে ময়ালসাপের মতো সেই লোভ সবসময় টানছে সবাইকে। ওবা নষ্ট হয়ে যাবে ইতোয়ারিন। টাকাটাই সব নয়, ওরা নষ্ট হয়ে যাবে, ফিরে না এলে।

বলেই, গুগ্গা আবার শুয়ে পড়ল। তার কপালময় বলিরেখা, বড় ক্লান্ত তার মনের ভাবটি ; অনেকদিন না-কামানো গালময় সাদা-কালো দাড়ি, কিন্তু মুখটির মধ্যে এক গভীর প্রশান্তি, যেমন প্রশান্তি দিগা পাঁড়ের মুখে পৃথু দেখে।

গুগ্গা ডান হাতটা উপরের দিকে তুলে, হাতের পাতাটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, সব নষ্ট হয়ে যাবে দেখিস তুই, দেখিস ইতোয়ারিন, এই টাকা, এই টানজিস্টার, মো-গাঁওয়ের ঐ চোখ-ঝলসানো হাট, এই সিনেমা মিলেমিশে সবকিছুই নষ্ট করে দেবে, যা কিছু ভাল ছিল আমাদের, যা কিছুই আমাদের বাপ-দাদারা যুগযুগ ধরে এই জঙ্গল-পাহাড়ের বুকের মধ্যে সাবধানে গড়ে তুলেছিল! গুগ্গার মেলে-দেওয়া হাতের পাতার ছায়াটা পড়েছিল কেরোসিন-টেমির আলোর বিপরীতে, মাটির দেওয়ালে। হাতটা দোলাচ্ছিল গুগ্গা। মস্ত একটা কাল-কেউটের কালো ফনার মতো ভয়ের ছায়া দুলিয়ে দিল সেই ছায়াটা মুহূর্তের মধ্যে।

হঠাৎই গা-ছম্‌ছম্ করে উঠল পৃথুর।

ইতোয়ারিন গাল দিল আবার। বাইগা ভাষায়। গুগ্গাকে।

পৃথু, গুগ্গার হাতটা মুঠোয় নিল। কালো সাপের ফনাটার দোলা বন্ধ হল। আশ্বস্ত হল পৃথু।

বলল, আমি এখন চললাম। তোমরা ঝগড়া করো। তুমি যা বললে গুগ্‌গা, আমার পক্ষে সেটা করা মুশকিল হবে না। কিন্তু কি করবে না করবে, তা তোমরা দুজনেই ঠিক করে তারপর আমাকে জানাবে।

পৃথু উঠে, নিচু দরজা দিয়ে মাথা হেঁট করে বেরোতে বেরোতে বলল, কাল ঝিংকু ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেব আমি।

গুগ্‌গা গোঙানির মতো বলল, না। না। আমার সময় শেষ হয়েছে। মরলেই আমি খুশি হব।

সে কথার উত্তর না দিয়ে দুজনকেই চলি বলে বেরিয়ে পড়ল পৃথু।

কার্মা নাচের জায়গায় তখন নাচ-গান জমে উঠেছে। ভীড় জমেছে এখন। ভীড়ের মধ্যে তাকে চিনলও কয়েকজন। অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে, আদর করে বসতে বলল ওকে যদিও হাটচান্দ্রার কারখানায় এই বস্তীর খুব কম লোকই কাজ করে। মহুয়া খেতেও অনুরোধ করল হাতজোড় করে। নাচতে নাচতে সরু-কোমর, ভারী-বুকের করৌঞ্জ আর নিমের তেলে চকচকে যুবতীরা কুর্নিস জানাল;

নাঃ। না, নাঃ। বড় বিষণ্ণ হয়ে গেল পৃথু। ঠিক এইরকমই খোলা-মেলা, সহজ-সুখের উদোম রোদ-চাঁদের বুনো-গন্ধের জীবন চেয়েছিল পৃথু। হলো না। এ জন্মে কিছুই হলো না ....

ওরা আবার ডাকল। মেয়েগুলো কলকলিয়ে উঠল স্বগতোক্তিতে এক ঝাঁক পরিযায়ী হাঁসের মতো,তাদের মরালী-গ্রীবা বেঁকিয়ে।

পৃথুর বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। না। ন্ না। পরে আসব। অন্য কোনো দিন। বলল পৃথু। আসলে বলতে চেয়েছিল অন্য কোনো জন্মে ... আসব .... ঠিক....

অনেকই কষ্টে ওদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এগোল। বস্তীর কাঠের গুঁড়ির আগুনের আলোকে পিছনে ফেলে, দূরের বিজলী-আলো আর বিজ্‌লীদের দূরের হাটচান্দ্রার দিকে পা বাড়াল। জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়তেই ভাল লাগতে লাগল খুব। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পথের বাঁদিকে একটি ঝোরা মতো আছে। অন্ধকারে তার সাদা বালিরেখা দেখা যাচ্ছে। ঝোরার এক পাশের খাত দিয়ে পাথরে পাথরে জেদী শিশুর একঘেয়ে নিচু-স্বরের কান্নার মতো জল বয়ে চলেছে ভেজা, একটানা আওয়াজে। একটা কোট্‌রা হরিণ হয়ত পৃথুর পায়ের আওয়াজ পেয়েই বা ওকে দেখেই, হঠাৎ ব্বাক্ ব্বাক্ ব্বাক্ করে ডেকে উঠল। অন্ধকার আকাশের তারারাও যেন চমকে উঠল সেই ডাকে পথের সামনের ঘনসন্নিবিষ্ট বয়ের গাছের সারির সঙ্গে।

একমুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়াল পৃথু। আগে, একেবারেই নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারত। আজকাল সেই সুঅভ্যেস ছেড়ে যাচ্ছে, আরো অনেক সু-স্বভাবেরই মতো। টর্চটা একবার ওদিকে ফেলে, ঘোরাল এদিক ওদিক, পাহাড়ের পায়ের কাছেও , ঝোরার সাদা গায়ে। বাঘ ত' আছে এদিকের বনে পাহাড়ে অনেকেই, পৃথু ঘোষ ছাড়া অনেকই বাঘ আছে। অতি-সাহস ভাল নয়। জঙ্গল-পাহাড় বাহাদুরি-প্রবণতা সহ্য করে না। গতমাসেই বম্বে থেকে আসা এক বার্ড-ওয়াচার নাক তুলে উঁচু ডালে পাখির খোঁজ করতে করতে হেঁটে গিয়ে এক ঘুমন্ত বাঘের ঘাড়ে পড়ে তার ঘাড়টি খুইয়ে গেল। জঙ্গলে কেউ প্রজাপতিই ধরুক, পাখিই দেখুক, ফোটোই তুলুক অথবা প্রেমই করুক তাকে সবসময় জঙ্গলের অলিখিত আইন-কানুন মেনে চলতেই হবে। না-মানলেই বিপদ। সেই সব নিয়ম পৃথু ঘোষ ভুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, চর্চার অভাবে।

দুপেয়ে পৃথুকেই দেখল কোটরাটা না কোনো চারপেয়ে বাঘকে তা জানা নেই। টর্চটা ঘুরিয়ে নিল একশ আশী ডিগ্রী। বিভিন্ন উচ্চতাতে। বার তিনেক। নিজের পেছনেও দেখল। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে একটুখন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল চোখে অন্ধকার সইয়ে নিতে। তারপর আবার এগোল।

চড়াইটা নেমেই উৎরাই। পায়ে চলা পাকদণ্ডী পথ। সম্বর, বারাশিঙা, কোটরা, শুয়োর; চিতল, চিতা, কখনসখনও বড় বাঘও ব্যবহার করে এই পথ রাত গভীর হলে। আরো দুটো চড়াই আর উতরাই উঠে নেমে, বাঁদিকে একটা ছড়ানো সেগুন প্ল্যানটেশান পড়বে। সেইখানে মাঝে মাঝে বাইসনেরা চলে আসে। ইতোয়ারিন বলছিল। ঐ জায়গাটার আগে পৌঁছে একবার টর্চ ফেলে দেখে নেবে। খালি-হাতে অন্ধকারে বাইসনের ভুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ইচ্ছে নেই কোনো। হাঁটতে

হাঁটতে, অন্ধকার রাতের শিশিরভেজা বনের মিশ্রগন্ধে বুঁদ হয়ে ইতোয়ারিন আর তার স্বামীর কথা ভাবছিল পৃথু। ভাবছিল তাদের অদেখা মেয়ে-দামাদের কথা। এই প্রজন্ম, এই প্রজাতি শেষ হয়ে আসছে, সুদূর উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান প্রজাতি মোহিকান্‌সন্না ? গুগ্‌গাও আরেকজন শেষ লোক ; লাস্ট অফ দ্যা মোহিকানস্‌-এরই মতো। এক ক্রম-বিলীয়মান কৃষ্টি, সংস্কার, বিশ্বাস এবং বোধকে আঁকড়ে ধরে আছে ও এখনও। কে জানে ? গুগ্‌গাই ভুল না ইতোয়ারিন ? ভবিষ্যতই বলতে পারে একমাত্র। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থকরী-বিদ্যা, বাড়ি-গাড়ি, বিদ্যুৎ, অ্যাটম যা-কিছুই আপাতসুখ, আপাত-বৈভব, আপাত-দম্ভ আমাদের দিয়েছে তার কতটুকু আমাদের পক্ষে ভাল তা আমাদের নিজেদেরই চোখের জলে আবিষ্কার করতে হবে পরে। পৃথু একটা ব্যাপারে গুগ্‌গার সঙ্গে একমত। এই বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞানের দম্ভে মানুষ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে তা আসলে বোধহয় কিছুই উদ্ভাবন করেনি, যা কিছুই করেছে সবই নিছক আবিষ্কার। সবই ছিল। যা ছিল তাইই আবিষ্কার করে আত্মশ্লাঘায় মানুষ বেঁচে রয়েছে। আধুনিকতম বিজ্ঞানের যা অবদান তা লিভিংস্টোনের অবদানেরই মতো। তারচেয়ে বেশি কিছু নয়। পৃথু জানে, যে সকলে তাকে মহামূর্খ, ইমবেসাইল, স্টুপিড, ইল্‌লিটারেট বলে এই মনোভাবের জন্যে। রুষা ও ছেলেমেয়েরাও বলে। পৃথু কিছুই বলে না উত্তরে তাদের। বলে, ভাবো। নিজের মতো করে ভাবো একটু। একটু চুপ করে থাকো। একা থাকো। ভাবার ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কারোরই নেই। ভাবো। সবসময় পরিবৃত থেকো না, "টাইম-কিল" করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ো না গো তোমরা, সময়কে হাতে নিয়ে সুন্দর কোনো হলুদ-বসন্ত পাখির মতো|তাকে ভালোবাসো, তার ডানার রঙে নিজেদের রাঙিয়ে নাও। মানুষ যে তোমরা ! মানুষের মতোই হাবভাব হোক তোমাদের একটু ! এবারে সেগুন প্ল্যানটেশানের কাছাকাছি এল। পৃথু ভাবছিল, কে জানে, হয়ত গুগ্‌গার ভয়টা একেবারে অমূলক নয়। ওদের বস্তী নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে ও যেমন ভীত, তেমনই পৃথুও জানে যে হাটচান্দ্রাও নষ্ট হয়ে গেছে। যেখানে প্রযুক্তি, কল-কারখানা, মুনাফার লোভ সেখানেই স্বাভাবিকতা, সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে অনেক উজ্জ্বল মার্কারি ভেপার হ্যালোজেন-ভেপারের আলো, চকচকে গাড়ি, চোখ-চমকানো বাড়ি, যেখানে টাকা, অঢেল টাকা, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনের অনেকই বেশি অপ্রয়োজনীয় টাকা, সেই হাটচান্দ্রার পরিবেশও নষ্ট হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোনো তালেবর ইকোলজিস্টও আর পরিশোধন করতে পারবেন না এর দূষণ। এখানে, ইদুরকার, রুষা, পৃথু, বিজলী, ইমম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার শর্মা, ভগয়ান শেঠ, ডাকু মগনলাল এরা সকলেই থাকে।

আর কুর্চি ? কুর্চিও ত থাকে কাছাকাছিই।

না, না, কুর্চি নষ্ট হয়নি। কুর্চি নষ্ট হলে কি নিয়ে বাঁচবে পৃথু। তার শেষ অবলম্বন যে কুর্চি। তার বাতিঘর। কুর্চি ত ফুল। ফুল যে কখনই নষ্ট হয় না, অন্যকে নষ্ট করে না। জন্ম, বিবাহ জরা মৃত্যু সবকিছুকেই ফুল সম্ভ্রান্ত করে দেয়। মৃত্যুকেও। সাধারণকে অসাধারণ করে।

না, না, কুর্চি, কুর্চিই। কুর্চি আর কারো মতো না। একবারে আলাদা মানুষ সে।

হাটচান্দ্রার পৃথুর, গুগ্‌গার কথা শুনে, ভেবে, নিজের জন্যে, হাটচান্দ্রার সকলের জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছিল। ভাগ্যিস এই অন্ধকার রাত ছিল। বড় বড় গাছ ছিল জঙ্গলে, পাহাড়ের আড়াল ছিল, তার কোলে গাঢ় অন্ধকার ছিল, ভাগ্যিস এই সচেতন অথচ লজ্জিত, অনুতপ্ত, মুখটাকে লুকোবার জায়গা ছিল অনেকই চারদিকে। আঃ। জঙ্গল সকলকে, সব বোধকেই আব্রু দেয়। রাতের জঙ্গল ত বটেই ! এখানে কেউই বে-আব্রু হয় না। এই পরম নিশ্চিন্তি।



পৃথুদা, রাইনা/১৯-১২

ডিসেম্বরেব শেষে আমরা ভোপাল, ভীমবৈঠকা, আর ইন্দোর যাচ্ছি।

ওর কী সব কাজ পড়েছে ওদিকে। বলছিল। ভোপালের হেভী ইলেকট্রিকালস্-এ আর ইউনিযন কার্বাইড-এর কারখানার পাবচেজ ম্যানেজারদের সঙ্গে দেখা করবে।

আমি বলেছি, সঙ্গে যাব। আপনি কি যেতে পারবেন? তাহলে মাণ্ডুতেও যেতাম। ছোটবেলার পব আর যাইনি। আপনার সঙ্গে যেতে পারলে খুবই ভাল লাগত।

আমার বেরসিক স্বামীর সঙ্গে বেড়িয়ে সুখ নেই। হোটেলের ঘরে বসে শুধুই মদ খাবে আর গুচ্ছের খাবাব। ঘরের বাইরে প্রতিমুহূর্ত যে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে, ভাঙছে গড়ছে অনুক্ষণ, সে সব ওব জানার জগতের একেবারেই বাইরে। ও খুব বেশি করলে, হোটেলেই গুটিকয় যাচ্ছেতাই ধরনের লোক জুটিয়ে নিয়ে তাস খেলতে বসবে।

করুক গে ও ওর যা-খুশি, আপনি যদি যান, তাহলে আমরা দুজনে বেড়িয়ে বেড়াতাম পুরোনো দিনের মতো। সত্যি! পুবোনো দিনের মতো।

আমার ত মনে হয় পুবোনো দিনের কিছুমাত্রই হারায়নি। অবশ্য একথাও সত্যি যে, মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছুই হারিয়ে গেছে নিঃশেষে। তবু, মনে মনে এই ভেবেই খুশি থাকি যে, 'রাতের সব তারাই আছে দিনেব আলোর গভীরে'।

যাবেন?

আমার খুউব, খুউব, খুউব ভাল লাগবে তাহলে। আজকাল কেন জানি না, কিছুতেই আব ভাল লাগে না। আগে কত সহজে সুখী হতে পারতাম। শরতের শিউলিতলায়, বসন্তের ভোরের হাওযায়, শ্রাবণের ঘন সবুজ গহন কদম গাছের নিচের, চাপ চাপ গাঢ়-গন্ধ বৃষ্টি-ভেজা ঘাসের মাঠে দাঁড়িয়ে ফড়িং ওড়া দেখলে তখন মনে হত জীবনের সবটুকুই বুঝি সুখ। শুধুই সুখ। মনে মনে দুশ্চিন্তা হত যে, এত সুখ রাখব কোথায়?

বাবা একদিন বলেছিলেন, "তোকে একটা গডরেজের আলমারী কিনে দেব কুর্চি! তোর মা বলছিলেন সুখ বাখার নাকি জায়গার অকুলান তোর!"

কী করব! আজকাল সত্যিই কিছুতেই আর ভাল লাগে না। শুধু আপনি যখন আসেন, আপনাকে যখন একটু কাছে পাই তখন ছাড়া। তখন মনে হয় আমার সব শরতেব শিউলি আর বৈশাখের ভোরের হাওয়া একই সঙ্গে এসে আমার ঘর ভরিয়ে দিল। আপনি চলে যাবার পবও আপনার গায়ের আতরের গন্ধ, পান-জর্দার গন্ধ আর ব্যক্তিত্বের গন্ধে আমার বসার ঘব, মনেব ঘব, সব ভরে থাকে। ব্যক্তিত্বর সত্যিই গন্ধ থাকে আলাদা আলাদা। কোনো বদ্‌বু মানুষ এসে চলে গেলে ঘরে হায়নার গায়ের গন্ধর মতো গন্ধ লেগে থাকে আর আপনার মতো খুশবুদার কেউ এলে…। আমার নাক গন্ধ চেনে। মানুষও।

খুব মজা লাগে ভাবলে যে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং নিজেই তার ব্যক্তিত্বর গন্ধ চেনে না। যে তাকে ভালবাসে, শুধু সেই-ই তা চেনে। কী যে চুরি হয়ে যায় আপনার, যতবারই আসেন আমার কাছে ; তা আপনি নিজেই জানেন না। আপনি চলে গিয়েও রেখে যান আপনাকে আমার কাছে। অনেকক্ষণ !

একজন না-পসন্দ্ মানুষের সঙ্গে আমার সব ভাললাগা না-লাগা যে এমন করে জড়িয়ে যাবে কখনও ভাবিনি তা। আপনি ভীষণই খারাপ। নিজের জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি ত খেললেনই, আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিলেন।

ভালই খাই ; মোটামুটি ভালই পরি। আমার মতো সাধারণ মেয়ের এর চেয়ে বেশি আশা করা অনুচিত। আমার মোটা, সাদাসিধে বর আমাকে তার মতন করে ভালও বাসে। প্রত্যেক মানুষের ভালোবাসার রকমই ত আলাদা আলাদা। ছেলেমেয়ে নেই বলে আমার কোনো কষ্টও নেই। ভালই ত আছি একদিক দিয়ে। ঝাড়া হাত-পা। ইটার্নাল হানিমুনও করা যেত, কিন্তু ···

চাঁদ ত থাকেই। প্রতি মাসেই ঘুরে আসে পূর্ণিমা। কিন্তু আমার জীবনের চাঁদ থেকে চাঁদ কবে যেন চুরি হয়ে গেছে। আমাদের ছেলেবেলার চাঁদ ত নেইও আর। স্পেসস্যুট পরে, স্পেস শ্যু পরে চাঁদে হেঁটে বেড়ায় মানুষ। ভাবলেও খারাপ লাগে। মানুষের এই বাড়াবাড়ির কি সত্যিই খুব দরকার ছিল ?

এখন শুধুই টক চাঁদ, নোনা চাঁদ, ঝাল চাঁদ, অ্যামেরিকার চাঁদ, রাশীয়ার চাঁদ ! চরকা-বুড়ির সেই রহস্যময়ী চাঁদই ভাল ছিল আমাদের।

দেখুন ! আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন কি না এই কথা জানতে কলম ধরে কত কী আবোল-তাবোল লিখে ফেললাম। আসলে, আমার কথা একবার শুরু করলে আর ফুরোয় না।

মনে আছে ? আপনি একবার বলেছিলেন যে, কোনো একটি চিঠিতেও যদি 'পুনশ্চ' না লিখি তাহলে আমাকে একটি বালুচরী শাড়ি আনিয়ে দেবেন ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিষ্ণুপুর থেকে। আমি প্রায় পেয়েই গেছিলাম শাড়িটা যদি না সেই নিখুঁত চিঠিটিব শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখতাম যে, "দেখলেন ত একটাও পুনশ্চ নেই এইবাবে" !

আসলে বালুচরী শাড়িব কপাল আমার নয়। আমাব কপালের সঙ্গে বালুচরের মিল থাকায়ই এই বিপত্তি !

আবারও বলছি, আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন কী না তা অবশ্যই জানাবেন। তখন ওকে বলে ওর কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাব আপনার কাছে। ফর্ম্যালী।

কী বিপদ ! কীবকম স্বাধীন দেখুন ত আমরা ! যেহেতু বিয়ে হয়ে গেছে, যেহেতু স্বামীর পয়সায় খাই-পরি, সেইহেতু সতীত্বেব পবীক্ষাতে সবসময় ফারস্ট ক্লাস হতে ত হবেই, উপরন্তু সতী থেকেও নিজের যাকে সবচেয়ে ভাল লাগে, তাকেও সঙ্গে করে কোথাও যেতে, স্বামী স্বয়ং সঙ্গে থাকলেও তাব পাবমিশান নিতে হবে।

আমাকে একটা চাকরী দেবেন ? পৃথুদা। না। চাকরী থাক। স্বাধীন ব্যবসা করব। সেলাইটা ভাল করে শিখি তারপর রাইনার বাজারে একটা দর্জির দোকান দেব। শুধু মেয়েরাই কাজ করবে। শুধু একজন পুরুষ। বুড়ো, নিবাপদ, মুসলমান দর্জি রাখব। মাস্টার। বুড়ো অশক্ত, খুক্‌খুকে কাশির মানুষ খুঁজে না পেলে বাখা যাবে না। ভাঁটু ভাববে, সে বিপজ্জনক। আপনাদের বলিহারী। খোজা প্রহরী থেকে কত কীই যে আপনাদের মাথা থেকে বেরুল আজ অবধি আমাদের দখলে রাখতে !

সত্যি! বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও, এই দেশের পুরুষরা আমাদের খাইয়ে-পরিয়ে রেখে যে প্রচণ্ড প্রগতি দিয়েছেন তা বাড়ির কুকুর অথবা কাকাতুয়াদেরও হাসির ব্যাপার। ধন্য আপনাদের উদারতার! জয় আপনাদের মহত্ত্বর ! দীর্ঘজীবী হোক আপনাদের এই অশেষ ঔদার্য।

যেতে পাববেন কিনা তাড়াতাড়ি জানাবেন। নইলে আড়ি।—আপনার কুর্চি।

চিঠিটা পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ বসে থাকল পৃথু। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে।

খাণ্ডেলওয়াল সাহেবেব সাদা ধবধবে যুবক অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে নিয়ে তাঁর কালো কুচকুচে

যুবতী আয়া জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

প্রকৃতির মধ্যেই মানব এবং মানবীর প্রকৃত মুক্তি নিহিত আছে।

একমাত্র প্রকৃতিরই মধ্যে।

পৃথু এক টিপ নস্যি নিল। একসময়ের সাহেব পৃথু শেষ। তারপর কাগজ কলম নিয়ে বসল।

কুর্চি যা লিখেছে তা ঠিকই। তবে এমন অনেক স্ত্রীকেও পৃথু জানে যে, তাঁরা এই পরাধীনতাকে, খেতে পরতে পেয়েই, সন্তান পালনেই যে সুখ, সেই সুখটাকেই বড় মনে করেন। কেউ কেউ তা মনে না করলেও এই পরাধীনতার গ্লানিটা স্বীকার করতে পুরোপুরিই লজ্জিত হন। এবং হন-বলেই প্রচণ্ড শব্দর সঙ্গে এর প্রতিবাদ করেন। বলেন, এই-ই হচ্ছে ভারতীয় স্ত্রীদের সনাতন ধর্ম। মহান ভারতীয় নারীর ফর্টে। আবার কুর্চির মতো অনেকে আছে। ইচ্ছে আছে, সাহস নেই। প্রচণ্ড দুরন্তভায় বাঁচতে ইচ্ছা যায় যাদের অথচ রূপোর চেনে বাঁধা ঘুমপাড়ানো কুকুরীরই মতো তাঁরাই বিত্তবান স্বামীর স্থুল দম্ভর মোজাইকটাইলস্ বা মার্বেলের বারান্দায় নেতিয়ে পড়ে থাকেন। যুগের পর যুগ। ঘটনা এটাই।

পৃথুর চিঠি লেখার বহর দেখে ভুচু প্রায়ই বলে, তুমি দাদা একটা এক নম্বরের পাগল হচ্ছ। চিঠি লিখে এই ভাবে সময় নষ্ট কেউ করে! চিঠিব যুগ তামাদি হয়ে গেছে। আজকাল কার্ড, টেলিফোন, এবং টেলেক্স-এরই দিন। এত লম্বা লম্বা চিঠি পড়াব সময়ই বা কার আছে? তুমি লেখো বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, যারা তোমার চিঠি পায় তারা সোজা ওয়েস্ট-পেপার বাক্সেটে তা ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

কী জানি! পৃথু ভাবে। হয়ত ভুচু ঠিকই বলে। যে-প্রজন্মর মানুষ ও হয়ত সেই প্রজন্মটাই তামাদি হয়ে গেছে। সে কারণেই পৃথুদের মানসিকতাও তামাদি হয়ে গেছে। পুরোপুরি।

চিঠিব মধ্যে দিয়ে আমরা যতখানি স্পষ্ট করে নিজেদের প্রতিবিম্বিত করতে পারি, নামাতে পারি আমাদেব ভাবকে তা আব অন্য কিছু দিয়ে পাবা যায়? ঘরে আগল তুলে দিয়ে মনের আগল খুলে ফেলে চিঠির মধ্যে নিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দিতে খুব ভাল লাগে পৃথুর। পৃথুদের প্রজন্মে, ভাল চিঠি লিখতে পারাব ক্ষমতাব সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষারও একটা সাযুজ্য ছিল বলে মনে করা হত।

আর এখন ...?

কে জানে? চিঠিই যদি না-লেখে মানুষ-মানুষী তবে কি গিরিশদার বাঁদর সুখময় আর তার বউ লিখবে?

কুর্চি,

তোমাব চিঠি হঠাৎ এই শীত-সকালে একরাশ উষ্ণতা বয়ে আনল।

পাতা ঝরে যাচ্ছে সামনের শালবনে। বিবাগী হচ্ছে ভোগী। রিক্ততার দিন আসছে সামনে। এরই মধ্যে তোমার চিঠি যৌবনের দূতীব মতো এল এক ঝাঁক টিয়ার উল্লাসী সমবেত সবুজ চিৎকারের মতো। দুর্বোধ্য আপাত কর্কশ শব্দমঞ্জরীও কী দারুণ মুগ্ধতা বয়ে আনে কখনও কখনও, কী দারুণ ভাবে সঞ্জীবিত করতে পারে অন্যকে।

তাই নয়?

তার মানে এই নয় যে, তোমার চিঠি দুর্বোধ্য। উপমার খুঁত ক্ষমা করে দিও।

কেমন আছো তুমি? জানতে চাইলেও জানতে পাই কই?

সকাল থেকেই তোমাকে আজ খুব সুন্দর একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছিল। ঘুম ভাঙার পর থেকেই তোমার কথা মনে পড়ছিল খুবই। আজকে ঘুমও ভাঙল বড় সুন্দর এক চমকে। একজোড়া পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। যে পাখিদের ডাক বড় একটা শুনিনি এদিকে। কম্বল ছেড়ে দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখি একজোড়া স্কার্লেট মিনিভেট এসে বসেছে আমগাছের মাথায়। তাদের গলানো-মোরগঝুঁটি লাল-এর পিচকিরি ছুঁড়ে দিল তারা উৎসাহে নীল আকাশে, দিয়েই, হারিয়ে গেল নীলের মধ্যে। আমার ঘুম ভাঙানীয়া পাখিরা। আহা! রোজই যদি আসত।

কেন এল কে জানে। সালিম আলির বইয়ে পড়েছিলাম ওদের দেখা দেওয়ার কথা এদিকে

বর্ষাতে। তবু, এসে ত ছিল। কী সুন্দরভাবে রাত পোয়াল আজ বলত!

আর তারপরই তোমার এই চিঠি। দিন আজকে ভাল যাবে আমার।

বলছিলাম যে, সকাল থেকেই তোমাকে সুন্দর একটি চিঠি লিখব ভাবছিলাম। কিন্তু সুন্দর সুখের যা-কিছু ইচ্ছা,তা দমন করার মধ্যেও বোধহয় এক ধরনের গভীরতর সুখ নিহিত থাকে। থাকে না?

আজ চিঠি লিখব না তোমাকে। তার বদলে একটি স্বপ্নহার পাঠাচ্ছি। লেখক, কবি না। তবুও, তাঁর নাম গোপনই থাক।

কল্পনা করেই খুব ভাল লাগছে যে, তুমি আমার চিঠি কোলে নিয়ে বসে আছ, জানালার পাশে। যে-মানুষটি তোমার মিষ্টি-গন্ধ কোলের পরশ পায়নি কখনও, পাবেও না কোনোদিন, তার চিঠি সেই পরশে গর্বিত হয়েউঠেছে যে, এই ভেবেই কত সুখ!

আমার চিঠি পড়তে পড়তে তোমার সুন্দর মুখে এক আশ্চর্য প্রসন্নতামাখা প্রেম-ছবি ফুটে উঠছে. অস্ফুট চাপা, গোপন কাম-ভাব? মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি আমি।

কী যে দেখেছিলাম তোমার ঐ মুখটিতে কুর্চি! এত যুগ ধরে কত মুখই ত দেখল এই পোড়া চোখ দুটি। কিন্তু এমন করে আর কোনোও মুখই ত আমার সর্বস্বকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেনি। ভালো না-বাসলেই ছিল ভাল। বড় কষ্ট গো ভালবাসায়। ভালো ত কাউকে পরিকল্পনা করে বাসা যায় না, ভালোবাসা হয়ে যায়; ঘটে যায়। এই ঘটনা ঘটার অনেক আগে থেকেই মনের মধ্যে প্রেমপোকা কুরতে থাকে তারপর হঠাৎই এক সকালে এই দুঃখ-সুখের ব্যাধি দুরারোগ্য ক্যানসারেরই মতো ধরা পড়ে। তখন আর কিছুই করার থাকে না। আমোঘ পরিণতির জন্যে অশেষ যন্ত্রণার সঙ্গে শুধু নীরব অপেক্ষা তখন।

কেউই যেন কাউকে ভাল না বাসে। জীবনের সব প্রাপ্তিকে এ যে অপ্রাপ্তিতেই গড়িয়ে দেয়। যা-কিছুই সে মানুষটি দীর্ঘদিনের চেষ্টা, পরিশ্রম, মননশীলতা দিয়ে গড়ে তুলেছিল, যা-কিছু ছিল তার গর্বর, পরিচয়ের, শ্লাঘার, তার সবকিছুই হঠাৎ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যাকে ভালোবাসে তাকে নইলে তার আমিত্বই অনস্তিত্বে পৌঁছোয়। হুঁশ থাকলে এমন মূর্খামি কেউ কি করে? বল?

সেই জন্যেই বোধহয় হুঁশিয়ার মানুষদের কপালে ভালবাসা জোটে না। যারা হারাবার ভয় করে না কিছুতেই, একমাত্র তারাই ভালোবেসে সব হারাতে পারে। অথবা, অন্য দিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, যা-কিছুই সে পেয়েছিল বা তার ছিল; সেই সমস্ত কিছুকেই অর্থবাহী করে তোলে ভালবাসা। যে ভালোবাসেনি, তার জীবনও বৃথা!

তবুও ...বড় কষ্ট ভালেবাসায়।

এমন মহাবোধ আর কি আছে? আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ তোমাকে ভালোবেসে আমার নিজের সত্তা-আমার কাছে কত যে দামী, কত মহার্ঘই যে হয়ে উঠি তা আমিই জানি। এইটেই কি কম পাওয়া? বল?

জানো কুর্চি, এই মুহূর্তে নিধুবাবুর একটি গানের কথা মনে পড়ে গেল। গৌড়-মল্লারে বাঁধা গানখানি। তোমাকে শোনাব একদিন। কত গানই ত শোনাতে ইচ্ছে করে। সময় কোথায় তোমার? যখনই তোমার কাছে যাই, হয় রান্না করছ, নয় সেলাই করছ, নয় ঘর গুছোচ্ছ, সময় কোথায় তোমার আমাকে দিয়ে সময় নষ্ট করবার?

"কী হল আমার সই বল কি করি?
নয়ন লাগিল যাহে কেমনে পাশরি?
হেরিলে হরিষচিত না-হেরিলে মরি
তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি
ঘন মুখ হেরি সুখী, দুখী, বিনে বারি।"

কী সুন্দর কথা। তাই না?

তুমি জানো না গো। এক মুহূর্তও তোমাকে ভুলতে পারি না আজকাল। সত্যিই কী যে হল আমার, প্রায়-চল্লিশে এসে। এখন ত থিতু হবার সময়। কী যে করি। কেন যে তুমি ফিরে এলে

রায়নায় !

স্বপ্নহার, তোমায় পাঠাই··· নীল নদীটির নিবিড পারে, ঘুম-পাওয়া রোদ চমকে চেয়ে অলস পায়ে, যখন হাঁটে মাঘী মাঠের ন্যাবা-ধরা শূন্যতাতে ঠিক তখনই আমার বুকের গভীর থেকে স্বপ্নগুলো ঝাপটে-ডানা অস্ফুটে কী কইতে কইতে নড়ে চড়ে !

স্বপ্ন ওড়ে।

স্বপ্নে দেখি, নীড়ের পাখি আসছে নীড়ে। অনেক পাহাড মাঠ পেরিয়ে ভালোবাসা ঠোঁটে করে আসছে ফিরে। পাখি আমার নীড়ের পাখি।

স্বপ্নগুলো খুব ভীতু হয়, আমার স্বপ্ন : স্বপ্ন সবার।

তবুও আমি স্বপ্ন দেখি। রূপের রাজা, গুণের গুনীন, মুঠির মাঝে মুক্তো-মলিন, সব পাখিদের মুগ্ধ-করা মন্ত্র নিয়ে আসব ফিরে বারে বারে। আসব ফিরেই, অবহেলার হেলাফেলার শোধ নেবো ঠিক হিসেব করে।

কোনো পাখিই বশ মানেনি আমাব দাঁড়ে। এই জনমে। একটিও নয়। বুনো পাখির সঙ্গে তারা কেউ ওড়েনি।

গায়নিকো গান মিষ্টি গলায শিউলি-ভোবে। গায়নিকো গান সাঁঝবেলাতে হাসনুহানার। সকাল ও সাঁঝ হারিয়ে গেছে নিরুপায়ে, পাখির গায়ের ওম্-এর গন্ধ এবং চোখের চিকনতার বস্‌রা গোলাপ হারিয়ে গেছে, পাখি আমার, নীড়েব পাখি। চিরচেনা অচিন্ পাখি এলেবেলে খেলায় মাতে আলস ভরে। চোখ দিয়ে সে মারত চাবুক আমায় একা। কল্‌জে নিয়ে বাটত সে যে গাবুক-গুবুক। পানা-পড়া দিনগুলোকে চমকে দিয়ে লাফিয়ে যেত ত্রস্ত পায়ে ; মেঘ-দুপুরের ডাহুক যেন !

আমার কিছু স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন দিয়ে মালা গাঁথি। স্বপ্নমালা।

তোমায় নিয়ে ধুরে বেড়াই বনে বনে। মনে মনে। কাল রাতেতে স্বপ্নবেয়ে গিয়েছিলাম কানহার মাঠে। শিশির-ভেজা লাল ঘাসেতে দেখে এলাম আমবা দুজন ; চুপিসাড়ে পা-পা করে হাঁটছে হরিণ ; যেমন করে শিশু হাঁটে। রোদের সঙ্গে ছায়ার বিয়ে, আলোর সঙ্গে দেয়ালা করে কালো। হাতে হাতে হাত মিলিয়ে, শব্দ আর গন্ধরা সব যুগলবন্দী খেলে। থাবার চড়ে রোদের ঝালর ঝাপ্‌টে ছিঁড়ে লাফিয়ে ওঠে চিতা। শিহর তুলে হরিণ ওড়ে শিশির-ভেজা হীরে-মানিক ভোরে। চমকে বেড়ায চিকণ চিতা, চিকুর-তোলা চিল। আলো-ছায়া সাপের খেলা, অনন্য ; কিল্‌বিল্।

ছিপ্‌ছিপে সেই মেয়ে। ছিপছিপে সে, শামলাবরণ, পেঁয়াজখসী শাড়ি ; তার স্বপনপুরে বাড়ি। আমার সঙ্গে আড়ি।

পায়েতে তার চুমু দিতেই কামেতে জরজর, চুমোয় হল পায়া-ভারী, গুমোর-ভরা জোর। দেমাক ভরে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বপ্নে-দেখা নারী, পেঁয়াজখসী শাড়ির আঁচল, ঠোঁটের কোণের তিল, স্বপ্নমালায় গেঁথে গেল হরিণ, চিতা ; চিল।

স্বপ্নে আমি ভেবেছিলাম, অনেক কিছুই। ভেবেছিলাম, এটা করব, সেটা করব, বাড়ি করব পাহাড়চুড়োয় স্বপ্ন এবং সুখের কুটো দিয়ে। পায়ের কাছে বইবে নদী, নারীর মত, সাধের নারী, বাধ্যতা আর নাবাতাতে নীল। ভেবেছিলাম, লিখব আমি গানের মতো; গান গাইব যেমন করে লিখি। আঁকব ছবি খুন করে রঙ, রঙের রক্ত ছেনে। মধ্যবুকের সব ব্যথাকে আনব টেনে টেনে।

বিকেল হলো, বিকেল হলো, স্বপ্ন মরে আছে পড়ে পায়ের কাছে শীত বিকেলের ঝড়ের ফুলের মত। নরম, কিন্তু স্থির। মৃতর চেয়ে মৃত। বিকেল হলো, বিকেল হলো। হয়নি কিছুই, পায়নি কিছুই স্বপ্ন ঘোরে দল ছেড়ে সেই দল ছেড়ে সেই মূঢ় মানুষ একলা তবু হাঁটে। পায়ে পায়ে, ধুলোয় ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে, উচ্চগ্রামের স্বর ফুলিয়ে, হাত উঁচিয়ে, ভয়-দেখিয়ে, যূথবদ্ধ পথিকেরা উল্লাসেতে মাতে। দূরে দূরে একলা হাঁটে স্বপ্ন-পাগল, শাপ্‌লা বিলের আলে আলে একলা-ওড়া টিটি পাখির সাথে। গান গেয়ে যায় খালি গলায়, পাহাড়তলির আলেয়াকে সুরের ঘরে ডাকে।

সন্ধ্যে হলে জোনাক জ্বলে বাঁশ পাহাড়ে। হুক্কা-হুয়ায় শেয়াল দোলে নক্‌শী-কাঁথার মাঠ পেরিয়ে নগ্ন-নিজন- নীল-কুয়াশায় উথালচুলের উড়াল-গন্ধ কনকচাঁপার রাতে, আগল-খোলা বোকা-পাগল

কাঁপা-গলায় গান গেয়ে যায় স্বপ্নমালা হাতে।

নীল নদীটির নিবিড় পারে ঘুম-পাওয়া রোদ চমকে চেয়ে অলস পায়ে যখন হাঁটে মাঘী মাঠের ন্যাবাধরা-শূন্যতাতে, ঠিক তখনই আমার বুকের গভীব থেকে স্বপ্নগুলো ঝাপ্‌টে-জানা অস্ফুটে কী কইতে কইতে নড়ে চড়ে।

স্বপ্ন ওড়ে।

স্বপ্ন ওড়ে। বারে বারে।

কুর্চি দেখি কি করতে পারি, তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার। ইচ্ছে ত কত কিছুই করে। এ জীবনে ক'টি ইচ্ছে আর পূর্ণ হল বলো ?

কারই বা হয় ? এমনিতেই আমার অনেকই কষ্ট। এমন করে ডাক পাঠিয়ে কষ্ট আর বাড়িও না।

রুষা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেকদিনই যাইনি বাইরে। ওদের ফেলে একা একা মজা করতেও বিবেকে লাগে। যার বিবেক বেঁচে থাকে ; তার সুখ মরে যায়। সুখী হবার সহজ উপায় বিবেকহীন হওয়া। বিবেক, বিবশ হলেই বাঁচি !

ভালো থেকো। তোমার পৃথুদা—



সকাল বেলা গিবিশদার ড্রাইভার শ্রীকৃষ্ণ একটি চিঠি নিয়ে এসে হাজির। গিরিশদা লিখেছেন, আমি সাবীর মিঞাব বাড়িতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি চলে এসো। দিগা পাঁড়ে খুব অসুস্থ। কালকে লাড়ুয়ার হাটে এক বাঙালী তান্ত্রিকের কাছে খবর পেলাম। সে নাকি দিগার কাছেই এসে আছে দিনকয় হল। বাজার করতে এসেছিল লাড়ুয়ার হাটে। সাবীর মিঞাও যাবেন। ভুচু জীপ নিয়ে আসছে সাবীর সাহেবের বাড়ি।

গিরিশদার গাড়িটা পেয়ে ভালই হল। অফিসে একচক্কর ঘুরে সাবীর সাহেবের দোকানে পৌঁছল পৃথু। বাজারটাজার সবই উনি করিয়ে রেখেছেন দিগার জন্যে। চাল, ডাল, নানারকম আনাজ। হেসে বললেন, বনক্ষেতির ফসল সাধু দরবেশদের সেবাতে লাগবে এইই ত ভাগ্যর কথা। নইলে বনক্ষেতির জমিদারী আমার আছে কি করতে ?

ঝিংকু ডাক্তারকে সঙ্গে নেবে নাকি ?

গিরিশদা শুধোলেন।

লাভ কি ? দিগা ত অ্যালোপ্যাথী ওষুধও খাবে না, ছুঁচও নেবে না।

সাবীর সাহেব বললেন, তবে কি নাসিরুল্লা হাকিমকেই সঙ্গে নেবো ? জড়ি-বুটি, তেল-মলম সব ইস্তেমাল করে মারীজের ইলাজ করা তাঁর কাছে বাচ্চোঁ ক্যা খেল্।

দিগা, রামভগোয়ানের চেলা ; সে কি আর মহম্মদের খিদ্‌মদ্‌গারের পেশ করা হাকিমী দাবাঁইয়ে নেবে ?

সেও এক কথা বটে। যে রাম। সেইই রহিম এ কথা রাম আর রহিমের খিদ্‌মদ্‌গাররাই যে মানতেই চান না।

সাবীর সাহেব বললেন। খেদোক্তির মতো।

তা যা বলেছেন। এই চেলারাই নিজেদের মধ্যের ভেদ দিয়ে গুরুদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে দিল। ওল রোডস্ লীড টু রোম, এ কথা বুঝলে ত হয়েই যেত।

গিরিশদা বললেন।

সব ভগয়ানই যে এক এ কথা বুঝতে পারে ক'জন? বেশির ভাগ ধর্মই ত মন্ত্র, নৈবেদ্য, নেমাজ আর তর্কিতে এসেই ঠেকে গেল, উপচার ছাপিয়ে উঠে উপাসিতর পায়ে গিয়ে পুজো ত পৌঁছল না।

সাবীর সাহেব বললেন, পথেব দিকে চেয়ে।

কথাবার্তা হচ্ছিল সব সাবীর সাহেবের দোকানে বসেই। ওয়াজ্জু মহম্মদ, বড় ছেলে, ছিল না। সে গেছে পোস্টাফিসে, ভোপাল থেকে আসা বন্দুক ছাড়াতে। সে এলেই সকলে রওয়ানা হতে পারেন।

পৃথুরা গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই একপ্রস্থ চা এবং পান হয়ে গেছে। মসজিদের পাশের দোকানেব মোষের রক্তের মতো লাল খয়ের দেওয়া ছোট ছোট করে সাজা ত্রিকোণ পান। চায়ের দোকানের চায়ের রঙও মোষের রক্তবমতো লাল। কী যে মেশায় চায়ে, কে জানে। এবং মিষ্টিও ভীষণ বেশি। সঙ্গে ভোপাল থেকে আনানো জর্দা। কথায় বলে, উজ্জয়িন-এর বাঈজী, মালোয়াঁর রাত, আব ভোপালের খানা। জর্দাও বেহেতরীন্। যেমন খুশবুদার; তেমনই নাশার।

এমন সময় এক খদ্দের এসে ঢুকলো। একটি বাইগা যুবক। কোনো দূর জঙ্গলের গাঁ থেকে হেঁটে এসেছে ধুলো পায়ে। সে রাবারেব হাওয়াইয়ান চপ্পল নেড়েচেড়ে পছন্দ করল একজোড়া ঘোর সবুজ রঙা চপ্পল।

কর্মচাবী দুতিনজন থাকা সত্ত্বেও সাবীর সাহেব ক্যাশবাক্সর সামনে বসেই তার সঙ্গে কথা চালাচালি করতে লাগলেন। পৃথু আর গিরিশদা নিজেদেব মধ্যে কথা বলছিল, ওঁকে জুতো-বিক্রির সুযোগ দিয়ে। প্রায় মিনিট দশেক রম্‌দা-রম্‌দির পর যুবকটি লোহার নাল-লাগানো মোষের চামড়ার তাগড়া একজোড়া নাগরাতে রফা করল, চপ্পল ছেড়ে দিয়ে। তারপর নতুন জুতো-জোড়া তার ধুতির কোণায় বেঁধে নিয়ে, কাঁধে ফেঁলে হাঁটা দিল বাজারেব দিকে। নতুন জুতো-জোড়া সে পথের ধুলোয় নষ্ট কবতে রাজী নয়।

যুবকটি চলে গেলে গিরিশদা সাবীব সাহেবকে শুধোলেন, এই নইলে দোকানী! গাহক এসে চাইল চপ্পল, বেচলেন নাগরা। অথচ নাগরাতে মুনাফা নিশ্চয়ই অনেকই বেশি।

সাবীর সাহেব হাসলেন। বললেন, বিলকুল গলদ্ বাত্। নাগ্‌রাতে মুনাফা তিন টাকা, চপ্পলে পাঁচ টাকা। ইস্পিসাল্ চপ্পল যে এ।

তবে? নাগরা বেচলেন কেন?

সাবীর মিঞা হেসে বললেন, খদ্দের কী জানে, তার কিসে প্রয়োজন?

মানে?

গিরিশদা অবাক হয়ে শুধোলেন।

কোনো খদ্দেরই তার আসলে কী যে চাই, তা জানে না। দোকানীরই দায় তা জানার। যে-দোকানী খদ্দেরের পক্ষে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা নয়, তা না জানে, তার দোকান করাই বৃথা। গাহক্ আকব্ মাঙ্গেকা আঁম ত' উস্‌কো বেচেগা ইম্‌লি। নেহী ত দুকান্‌দারী ক্যা?

মৎলব?

গিরিশদা আরও অবাক হয়ে শুধোলেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে, দোকানী যদি সৎ না হয়, ইমানদার না হয়; তবে তার দোকানে খদ্দেব আর ফিরে আসবে না। এই ছেলেটা, থাকে গুঙ্গর বস্তীতে। বাস থেকে নেমেও তাকে ছ' কিলোমিটার পথ, জঙ্গলে পাহাড়ে হেঁটে তবে বস্তীতে পৌঁছতে হবে। যদি হাওয়াইয়ান চপ্পল দিতাম, তবে শীতের দিনের শুকনো নালা টপ্‌কাতে গিয়ে, নয়ত' বর্ষার দিনের কাদার মধ্যে, তার চপ্পল হয় ছিঁড়ে পড়ে থাকত, নয় গেঁথে থাকত। নাঙ্গা পায়েরমে ঘর পৌঁছকে উ গালি দেতাথা সাবীর মিঞাকো। কিন্তু

যে-জুতো তাকে দিলাম, সেই জুতো পরে দু বছর পাথরে-জঙ্গলে লাথি মেরে মেরে লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে বেড়াবে ও। তারপর ছিড়ে গেলে আবার আমারই দোকানে আসবে জুতো কিনতে। গাহক্ কতটুকু জানে তার পক্ষে কী ভাল, আর কী ভাল নয়?

বিলকুল্ সাহী বাত্।

বললেন, গিরিশদা।

পৃথু ভাবছিল, একেই বলে সেল্সম্যানশিপ। ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটগুলোতে এই সব মানুষদের ডাক পড়বে না কোনোদিনও বক্তৃতা করার জন্যে। কিন্তু "মাঙ্গেকা আম ঔর্ বেচেগা ইম্‌লি" যে-কোনো কোম্পানীর সেল্সম্যানেজারদের মূলমন্ত্র হতে পারত ; হওয়া উচিত ছিল হয়ত। নিজের প্রডাক্ট এবং নিজের ডিসক্রেশান্-এর উপর কতখানি বিশ্বাস থাকলে যে একজন "সেল্সম্যান" এমন দম্ভভরে কথা বলতে পারেন তা ভেবেও ও পুলকিত হল। খেলার ছলে একটা মস্ত বড় কিছু শিখে ফেলল পৃথু, সাবীর সাহেবের কাছ থেকে। এই দোকানে বসে।

সাবীর সাহেবের ছেলে ওয়াজ্জু এলো পোস্টাফিস থেকে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভুচুও তার জীপ নিয়ে। সাবীর সাহেব বললেন, অব, চলা যায়। রাত কা খনা আজ হিঁয়াপরই। বড়া উম্‌দা বটের মিলাথা আজ। সুবে সুবে। ইমবান, লেতে আয়া থা। মাসস্ত নেহি, মালুম হোতা কী মছ্‌লিই হ্যায়। বিবিয়ানী ভি বনে গা। ঔর ফির্‌নী। দিন্‌ভর্ দিগাকো দেখ্‌ভাল্ করকে লওট্‌কে হিঁয়া আয়েগা সব্ মিল্‌কর। মজা আ যায়েগা। সাচ্‌মুচ্।

কীসে যে মজা না আসে সাবীর মিঞার তা উনিই জানেন। সব সময়ই ওপেন-হাউস। বর্ষার রাতে ভুনা-খিচ্‌রি ঔর্ বটি-কাবাব, শীতের দিনে বিরিয়ানী আর মুর্গ-মুসল্লম, সঙ্গে আন্ডেকা রোশান্, হালোঁয়া, গরমের দিনে রুহ্-আফ্‌জা শরবৎ ; খস্‌স্-গন্ধী। নিদেন পক্ষে আলুকা ভাত্তা বা বায়গন ভাত্তা থাকলেও সাবীর মিঞার 'মজা আ যায়েগা'তে কোনো রকম কমতি পড়ে না। ভাল ল্যাংড়া আম, লিচু, তরমুজ, ফুটি, পেঁপে ; ফলেরই বা কতরকম কায়দা। ফল পেশ করবার কায়দা। জীবনকে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সাবীর মিঞার মতো ভালবাসতে খুব কম লোককেই দেখেছে পৃথু। সমস্ত জীবনটাকেই, তাঁর জীবনের যা-কিছু সম্পদ তার সবটুকু নিঃশর্তে নিরন্তর দোস্ত-বিরাদরদের কাছে ঈশ্বর আর গুলাব-ভরা রেকাবিতে করে পেশ করে যাচ্ছেন উনি। ক্লান্তি নেই কোনো। দিনের পর দিন। এই-ই নমকহারাম আর বদতমিজদের দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে যদি আদৌ হয়, তবে সাবীর মিঞার মতোই বাঁচতে হয়। সুবাসাম্ হাঁটুমুড়ে বসে নেমাজ পড়া থেকে, তার বিবি-বাচ্চাদের এবং দোস্ত-বিরাদর্দের খিদ্‌মদ্‌গারী পর্যন্ত সব কিছুতেই এক বিশেষ স্টাইল আছে মানুষটার। এমন ওরিজিনাল মানুষ বেশি দেখাই যায় না। পৃথিবী এখন প্রোটোটাইপেই গিজ্‌গিজ্ করে। প্রোটোরা, এক-খড়্গ-গণ্ডারের মতো দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে সমাজের সব তলাতেই।

ভুচু, জীপটাতে, গিরিশদার গাড়ি থেকে দিগা পাঁড়ের শামান সব তুলে নিচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে হাত লাগিয়ে। ডাকু মগনলালের সঙ্গে টক্করের পর থেকে কোথাওই যেতে হলে সঙ্গে যন্ত্র নিয়ে যেতে হয় পৃথুর এবং ভুচুর। থুড়ি ডাকু শের সিং এবং সাঁওয়ার। কখন যে কী হয়, কে বলতে পারে? সব সময়ই কোনো কিছু ঘটার আশঙ্কায় মন দুরদুর করে। খুব ভাল লাগে পৃথুর। মনের মধ্যে পাকা ফোঁড়ার মতো এক সুখের দপদপানি অনুভব করে। বুকের মধ্যে সুখের মতো ব্যথা বাজে এক ধরনের। আবার সেই আলখাল্লা-পরা বুড়ো। তার হাত থেকে নিস্তার নেই। জীবনটা বড়ই একঘেয়ে, মান্‌ডেন্ হয়ে গেছিল। বাল্মীকির চেয়ে রত্নাকর অনেকই ইন্টারেস্টিং মানুষ। তাই-ই কবি পৃথু, ডাকু শের সিং-এ রেজারেক্টেড্ হয়ে আনন্দে ঘন হয়ে থাকে।

সামনের মোটরের ব্যাটারীর দোকানের আজ দশ বছর পুরল। খনাপিনা চলছে। দোকানটা বেদানন্দর ছিল। সে শিকারে গিয়ে জীপ উল্টে মারা গেছে বছর পাঁচেক আগে। এখন ভাইয়েরা চালায়। বেদানন্দর সঙ্গে ভাব ছিল ওদের সকলেরই। মাঝে মাঝে শামীম এবং ভুচুদের সঙ্গে শিকারেও যেত সে।

মাইকে গান বাজছে। একই রেকর্ড। সেভেনটি-এইট রেকর্ড বার বার তুলে তুলে দিচ্ছে। "লাউরী

বিনা চাট্‌নী / ক্যায়সে বনী, / ক্যায়সে বনীইইই / ক্যায়সে বনীইই / লউরী বিনা চট্‌নী / ক্যায়সে বনীইই।"

কথাটা সিলাউরী অর্থাৎ শিলনোড়া অথবা লউরী বা ধনেপাতা কোনটা যে, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে, গানের সুরটা ভারী ভাল। কোনো সিনেমার গান হবে। কতদিন সিনেমা দেখে না ! সিনেমার গান যদি হয়, তাহলে ভুচুর গারাজের মেকানিকরা বা কুক্ লছ্‌মার সিং অথবা ড্রাইভার অজাইব সিংরাই নির্ভুল বলতে পারবে, কোন সিনেমার গান।

ভুচু বলল, অব্ চলা যায় সাবীর সাহাব।

হাঁ। চলিয়ে না। ম্যায় ত বিলকুল্ তৈয়ার।

চালিয়ে।

বলে, গিরিশদাও উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণকে বাড়ি গিয়ে খেয়ে নিয়ে আবার এখানেই ফিরে আসতে বললেন সন্ধ্যের পর। জীপটা স্টার্ট করেই ভুচু ড্যাশবোর্ড খুলে বলল, পৃথুদা, পান।

সাবীর সাহেব বললেন, আররে ভুচু। ঈ ক্যা ? গুরু গুড় ; চেলা চিনি !

গিরিশদা হেসে উঠলেন সাবীর মিঞার কথাতে। অন্যরাও।

পান খাওয়ার ব্যাপারে চেলা, গুরুকেও ছাড়িয়ে গেল সত্যিই। গুরু এখনও গুড়ের পর্যায়েই রয়ে গেল, চেলা একধাপ এগিয়ে গিয়ে চিনি হয়ে গেল।

সাবীর সাহেব বললেন, এ ভুচু। ম্যায় বুড্‌হা পুরানা আদমী। তোরা গাড্ডী, টিকিয়া-উডান্ মৎ চালানা। ইয়াদ রাখ্‌না।

ঠিক হ্যায়। ঠিক হ্যায়। বলে, আশ্বস্ত করল সাবীর সাহেবকে ভুচু। ভুচুব এই-ই দোষ। মিঞাবেচারী সাবধানী মানুষ। ভয় পান। তা ছাড়া, পুরোনো জীপ, মেটাল ফেটিগ্ বলেও ত কথা আছে একটা। কিন্তু কে কার কথা শোনে ! সাবীর মিঞাকে কোনোমতে জীপে বসাতে পারলেই একেবারে টিকিয়া-উড়ান্ সে চালাবেই চালাবে। এই-ই একটা খেলা ভুচুর। মানে, এতই জোরে চালাবে যে, তার টিকি থাকলে টিকিটা মাথার উপর খাড়া হয়ে হাওয়ার তোড়ে হাওয়ার সওয়ার হয়ে উঠতে-নামতে থাকত। এমন গাড়ি চালানোকেই বলে "টিকিয়া-উড়ান্" চালানো।

গিরিশদা বললেন, যাচ্ছি রোগীকে দেখতে, অথচ কোনো ওষুধপত্রই নিয়ে যাচ্ছি না। তবে যাচ্ছি কি করতে আমরা ? না ডাক্তার, না ওষুধ ! স্রিফ সকল্ দিখানেকে লিয়ে ?

ভুচু বলল, মুনেশ্বরের কাছে রিপোর্ট যা পেলাম বাঙালী তান্ত্রিকের, তাতে দিগার অসুখ ত বটেই, আমাদেরও কারো কোনো গোপন অসুখটসুখ থাকলে তাও সেরে যাবে তার সংস্পর্শে এসে।

মানে ?

সাবীর সাহেব বললেন।

মানে, খুবই খতরনাগ্।

মানে ?

এবার পৃথু শুধোল।

মুনেশ্বর বলেছে ইয়ে বাঙালী সাধ্বু, সাধ্বু নেহি হ্যায়, হর্ বাঙ্গালিকা মওত্ হ্যায়। পুরা জাত্‌কো বে-ঈজ্জৎ করকে ছোড় দেগা। ইনোনে। দিগা মহারাজকোভি সত্যনাশ কর্‌কে ছোড়েগা। হায় ভগোয়ান!

সে কি ? এত কথা ত মুনেশ্বর আমাকে বলল না। যত কথা কি তাব তোমারই সঙ্গে ? মাইনে দেব আমি, আর মনিব হলে তুমি।

সব কথা সবার জন্যে নয় যে গিবিশদা। আপনি হচ্ছেন মুনেশ্বরের মনিব। আর আমি হচ্ছি বেগর, পড়ে-লিখে সামান্য একজন মোটর মিস্ত্রী। আমার আর মুনেশ্বরের লেভেলটা এক কিনা, তাই-ই আমাদের দোস্তীর সম্পর্ক। তান্ত্রিকের সঙ্গে একজন ভৈরবী ছিল। ভেবে দ্যাখো, কী কেলো। দিগার এবার চরিত্র বলে আর কিছুই থাকবে না।

তা ঠিক। পৃথু ভাবছিল। একেই ত চরিত্র ব্যাপারটাই হাওয়াব মতো। থাকলেও প্রমাণ করা যায়

না, দেখা যায় না যে আছে , আর না-থাকলেও তাই-ই । চরিত্র হচ্ছে মোস্ট ইনট্যান্‌জিবল অফ ওল্‌ ইন্‌ট্যান্‌জিবল্‌ অ্যাসেটস্‌ ।

ভুচু বলল, বুঝলেন গিরিশদা, আপনার ছেড়ে-দেওয়া, গান-বাজনার জবরদস্ত সমঝদার মিষ্টি দেখতে কাকগুলো এবারে দিগা পাঁড়ের চরিত্র নিয়ে মরা কাতলামাছের জিরিজিরি কান্‌কোর মতো ছিনিমিনি খেলবে । ছিঃ ! ছিঃ ! এমন একজন সাধকের শেষে এই-ই পরিণতি হলো ! লেহ লট্‌কা ।

গিরিশদা বললেন, তাই-ই বলো । তাই-ই তুমি দিগার অসুখ । দিগার অসুখ । বলে পাগল হলে । ভুচুর হঠাৎ দিগার উপর এত প্রেম উথ্‌লালো যে কেন এখন তা বুঝতে পারছি । প্রেম কি দিগারই প্রতি, না ভৈরবীর প্রতি ? পামেলা কি জানে ?

ভুচু বলল, এই জন্যেই গিরিশদা, আপনাকে কোনো মেয়ে ভরসা করে বিয়ে করতে পারল না । না-করে অবশ্য আমাদের ভালোই করেছে । বউদি থাকলে ত বউদির জায়গা আর আমরা নিতে পারতাম না ! সব সময় এমন অবারিত দ্বার ।

তা ত' বুঝলাম । কিন্তু তোমার ভৈরবী সন্দর্শনে যাওয়ার সঙ্গে আমার বিয়ে না-হওয়ার সম্পর্কটা যে কি তা বুঝলাম না বাছা !

'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, মিলিলে মিলিতে পারে সোনা ।

বলেই, ভুচু, গীয়ার চেঞ্জ করে, জীপকে টপ-গীয়ারে ফেলেই টিকিয়া-উড়ান চালিয়ে দিল, অ্যাক্‌সিলারেটরকে শেষ প্রান্ত অবধি পা দিয়ে ঠেসে চেপে ধরে ।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল ।

ক্রমশ জোর হতে-থাকা এঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দের মধ্যে সাবীর মিঞার করুণ কণ্ঠস্বর ডুবে গেল, এ !এঃ! ভুচু—এ ভুচু—এ বাব্বা ভুচু, জারা আইস্তা, তোবা গোড় লাগি বাবা । জারা আইস্তা । ইতনা বদ্‌তমিজ হোতে চল্‌তা ঈয়ে ছঁওড়াপুতান্‌ !

পানেব পিকে দুই কষ ভরে ভুচু ফিচিক্‌ করে হেসে, ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক চেয়ে সাবীর মিঞার ভয়ার্ত দু চোখের ডিমার-ডিপারের খেলা দেখে পুলকিত হয়ে পিচিক করে পানের পিক ছুঁড়ল হাওয়ায় । তবল, পলাশ-রঙা আবীরেব মতো সেই পিক উড়ে গিয়ে পথপাশেব শালচারাদের রাঙিয়ে দিল ।

লাম্‌-সাম্‌ । লাম্‌-সাম । লাম-সাম ।

চেঁচিয়ে উঠলেন সাবীর মিঞা । প্রায় আর্তনাদেরই মতো শোনাল তা ।

সকলে আবারও হেসে উঠল ।

এই লাম-সাম কথাটার সঙ্গে ইংরিজী লাম্প-সাম-এর কোনোই সম্পর্ক নেই । কথাটিব মানে ঠিক যে কি, তা সাবীর মিঞা ছাড়া আর কেউই জানেন না । সাবীর মিঞার কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, অনেকদিন আগে উইলী হৌস বলে একজন প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া মোটাসোটা জার্মান শিকাবি নাকি এখানে শিকারে এসে সাবীর মিঞাকে দোস্ত করেন । জঙ্গলের পথে কেউ জোরে জীপ চালালেই হৌস সাহেব নাকি ড্রাইভারেব পিঠে বিবাশী সিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে বলতেন : লাম-সাম লাম-সাম । আফ্রিকান সোয়াহিলি ভাষায় যেমন বলে, "পোলে-পোলে" । লাম্‌-সাম্‌ কথাটার মানেও নাকি আস্তে আস্তে । তবে কথাটা আদৌ জার্মান কী না, তা ওবিজিনাল সাবীর মিঞা অথবা কোনো ওরিজিনাল জার্মানের পক্ষেই বলা সম্ভব ।

ধূলিধূসরিত হয়ে ওবা সকলে যখন দিগার কুঁড়েতে পৌঁছল তখন সকাল দশটা । দূর থেকে দেখা গেল দিগা সেই বড় কালো পাথরটার উপরে আধশোয়া হয়ে বসে একজন লাল লুঙিপরা বড় বড় চুল-দাড়িওয়ালা লোকেব মুখের দিকে চেয়ে তার বাণী শুনছে ।

ভুচু স্বগতোক্তি করল, পৃথুদা । কেস্‌ খুবই খারাপ ।

গিরিশদা বললেন, এইই নাকি দিগার ভয়ানক অসুখ ? এ সবই ভুচু এবং মুনেশ্বরের গভীর চক্রান্ত ! দিগার কিছুই হয়নি আদৌ ! দেখেছো পৃথু ! আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আজ সকালে । ছিঃ । ছিঃ-ছিঃ !

কার সঙ্গে ?

পৃথু শুধোল।

মণি চাকলাদারের সঙ্গে।

সেকি দাদা ? আদায় আর কাঁচকলায় ভাব ?

জীপটা পার্ক করতে করতে ঠাট্টার গলায় বলল, ভুচু।

সবটাতে ইয়ার্কি মেরো না। যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বোলো না।

হঠাৎ চটে উঠে গিরিশদা বললেন ভুচুকে।

কিসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গিরিশদা ?

পৃথু শুধোল। এবার।

সুধন্য ও সুতপার বেড়াল শোনবার নেমন্তন্ন ছিল আমাব।

একটা যুগান্তকারী উপন্যাস লিখছেন মণিবাবু। বুদ্ধদেব বসু, কমল মজুমদার সকলকে নাকি ফ্ল্যাট করে দেবেন।

তা, আপনি হঠাৎ··· ?

আগামী সংখ্যায় আমার একটি দীর্ঘ কবিতা ছাপাচ্ছেন মণিবাবু। সঙ্গে নেপাল গাঙ্গুলির স্কেচও থাকবে। মণিবাবু বলেছেন, রাজযোটক ব্যাপার।

সত্যি ?

পৃথু বলল।

কবিতাটির কি নাম দিয়েছেন ? মানে, এই দীর্ঘ কবিতাটির ?

"লাডুয়া হাটের লক্ড়া"। ভাল হয়নি ? কী বল পৃথু ?

দারুণ ! পৃথু বলল। খুউব ওরিজিনাল।

ভুচু জীপ থেকে নামতে নামতে বলল, গিরিশদা ! শেষে আপনার কবিতাব জিনিয়াস্ লক্ড়াতেই এসে থেমে গেল ? লক্ড়া ত' নেকড়ে বাঘ, তাই না ? আমি কিন্তু যদি কোনোদিনও কবিতা লিখি ত' বাঘকে নিয়েই লিখব। লক্ড়া-ফক্ড়াব মতো অ্যানিম্যাল নিয়ে একেবারেই নয়। লিখব :

"বনক্ষেতিকা বাঘোয়া চলে টাঁড়োয়া টাঁড়োয়া।কভী না দেখিন্থী বাঘিনীয়া।দিখ্‌কে বিলকুল ফাঁসোয়া তিবছি নজরসে ধডকায়া বডা দোস্তী ভইল্ হাটচান্দোয়ামে চাকলাদাব ঔর বোসোয়া····"

আঃ। কী ফাজলামি হচ্ছে ভুচু। সত্যিই বাড়াবাড়ি করছ তুমি !

পৃথু বিরক্ত হয়ে বলল।

গিরিশদা আহত হয়ে চাইলেন ভুচুর দিকে।

জীপ থেকে নামতে নামতে পৃথু ভাবছিল, গিরিশদার মতো বুদ্ধিমান, বিদ্বান, বিচক্ষণ প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্ক এবং চমৎকার ভারসাম্যসম্পন্ন মানুষেরও কিছু কিছু দুর্বোধ্য দুর্বলতা থাকেই, যা তাকে মানুষ হিসেবে হাস্যাস্পদ করলেও, সেই সঙ্গে মানুষ হিসেবে হয়ত পূর্ণতরও করে তোলে। হাস্যাস্পদ কে নয় ? কেউ যদি ভাবে যে, সে নয় ; সে মুর্খ। তার বেঁচে থাকার মজাও বোধহয় ফুরিয়ে গেছে। পৃথু ত' নিজেকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি হাসে। এবং মজাও পায়। যে মানুষকে নিয়ে হাসির কিছুমাত্রও আর থাকে না, তিনি আদৌ মানুষ কী না সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহই জাগে। মানুষ যেহেতু দেবতা নয় ; কোনো মানুষই নয় ; কোনো কোনো ক্ষেত্রের অপূর্ণতাই প্রত্যেক মানুষকে তাই পূর্ণতা দেয়।

বোধহয়।

দিগা, জীপের শব্দ শুনেই উঠে বসেছিল। এবার আস্তে আস্তে পাথর থেকে নীচে নেমে এল। কালো একটি নেপালী কাঠবিড়ালীর মতো। হাতজোড় করে মাথা নিচু করে নমস্কার করে সকলকে বলল, আইয়ে ! আইয়ে ! পাধারীয়ে !

ওঁব হাঁটা দেখে বোঝা গেল যে, অসুস্থ সে সত্যিই হয়েছিল। এখনও দুর্বল আছে।

জীপ থেকে ভুচু শামানগুলো নামাচ্ছিল। পৃথু গিয়ে হাত লাগাল।

ভুচু বলল, যাও ত' আরাম করে রোদে বোসো গিয়ে। আজ ফেনাভাত খাবো। গিরিশদাকে বলো, রাঁধবে। ভালো করে ঘি ঢেলে, ফারসট্‌ক্লাস করে।

গিরিশদা কেন? সাবীর সাহেব থাকতে....সাবীর সাহেব খনা-মাস্টার আর গিরিশদা পীনা-মাস্টার।

আরে! দিগা কি খাবে নাকি সাবীর সাহেবের হাতে?

অ্যাই! অ্যাই ত! এই জন্যেই তোমাদের রামভগয়ান্ শেষে পবননন্দনের সঙ্গে হাত মিলোলেন। তোমাদের হিন্দুধর্মের সব ভালো, মানুষকে তোমরা মানুষের মর্যাদা যে দিলে না এতেই সব গড়বড় হয়ে গেল। এক গামলা দুধে এক ফোঁটা চোনার মতো। দ্যাখো ত আমি খ্রীশ্চান, সাবীর মিঞা মুসলমান, দিগা রামপন্থী, তোমাদের এই নতুন বাঙালী তান্ত্রিক, সে হয়ত অন্য কোনো পন্থী। কিন্তু ভেদাভেদ জাতবিচার তোমাদের হিন্দুদের মতো আর কারোই নেই। এই করেই ডুবে গেলে তোমরা।

হয়ত তাই-ই....

পৃথু বলল।

ভুচু গলা চড়িয়ে জিগগেস করল গিরিশদাকে, এই যে গিরিশদা! ফারস্ট-ক্লাস ফেনাভাত রাঁধতে পারবেন ত!

নতুন চাল এনেছে কি সাবীর ভাই?

গিরিশদা শুধোলেন।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। একদম্ বেফিক্কর, থাকুন। নতুন চাল, নতুন আলু, নতুন কাঁচা লঙ্কা, নতুন কাঁচা পেঁয়াজ, নতুন মুসরীর আর মুগের ডাল, ডব্‌কা নতুন গোন্দ ছুঁড়ির গায়ের রঙের মতো চেকনাই-লাগা কালো নতুন বায়গন্। আর কী নতুন চাই আপনার?

কিসের ভাত্তা খাবে? আলুর না বায়গনের?

ভাত্তা?

ভুচু হঠাৎই চুপ করে গেল।

কী হল তোমার?

একটা কথা বলি? গুস্তাকি মাফ্ করেন ত বলি।

ন্যাকামি না করে বলেই ফেলো।

ভাত্তাই যদি বানাবেন নিজে হাতে গিরিশদা ত' আপনার মণি চাকলাদারের ভাত্তাই বানান। ফেনাভাতের সঙ্গে জমে যাবে। তবে কাঁচা লঙ্কা ভেঙে দেবেন বেশি করে। বড্ড মেয়ে মেয়ে মিষ্টি স্বাদ ভদ্রলোকের।

হঠাৎ মণি চাকলাদারের সম্বন্ধে তোমার এমন বিরূপতা ভুচু, কী ব্যাপার?

গিরিশদা, ঠাণ্ডা মেজাজেই বললেন। কবিতা-টবিতা নিয়ে তুমিও পড়েছো নাকি?

বিরূপতার কোনোই কারণ নেই। কবিতা-ফবিতার মতো মেয়েলী ব্যাপারের মধ্যেও আমি নেই। অমন দুর্মতি আমার যেন কখনও না হয়! তবে, বিশ্বাস করুন! কিছু কিছু লোক ত পৃথিবীতে আছে, তাদের প্রথম দিন দেখামাত্রই তাদের ওপর একটা জাতক্রোধ জন্মে যায়? মনে হয়, এই লোকগুলোকে এক্ষুনি অপদস্থ করি, সকলের সামনে অপমান করি, নিছক চেহারা দেখেই। কেন যে এমন হয় তা বলতে পারব না। কিন্তু হয়। আপনার হয়? আপনার মণি চাকলাদার সেই লোকদের মধ্যে একজন।

তুমি সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাও।

গিরিশদা গম্ভীর মুখে বললেন।

আমারও কিন্তু এমন হয় গিরিশদা! আমি লক্ষ করেছি। যাকে চিনি না পর্যন্ত, যার সঙ্গে আমার কোনো স্বার্থের সংঘাত নেই, যে লোক বরং অনেক উপকারই করতে পারে আমার তেমন তেমন লোককেও দেখা মাত্রই মনে হয় অপদস্থ করি; অসম্মান করি। সত্যিই হয় এমন।

পৃথু বলল।

তুমিও সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাও।

ভুচু দিগার কুঁড়ের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে যেতে পৃথুকে বলল, আমার দলে তাও একজন পেলাম, পৃথুদা।

ইতিমধ্যে সেই তান্ত্রিকের সঙ্গে দিগা সকলকে পরিচয় করিয়ে দিল। তান্ত্রিকের দিকে ভাল করে চেয়েই একেও পৃথুর সেই প্রথম-দর্শনেই অপছন্দর লোক বলে মনে হল। লোকটা ভাল হিন্দী বলে। নামেই বাঙালী ; পৃথুদেরই মতো। বাঙালী হচ্ছেন আর কী ! আসলে, বাঙালী নয়। এদেশী হয়ে গেছেন। মনে হল বহুদিন এদিকেই আছেন।

গিরিশদা শুধোলেন, মশায়ের নিবাস ?

দক্ষিণ-বাংলা। ওয়েস্ট বেঙ্গলের জয়নগর-মজিলপুর। নাম শোনেন নি ? কত মহাপুরুষের আদি নিবাস সে জায়গা।

তা হবে। আমরা ত দাদা বহু পুরুষ এদিকেই।

বুঝতেই পারছি। চেহারা, ভাব-ভঙ্গী দেখেই। নইলে কী আর এত আকাট হন। রিয়্যাল বাঙালী হলে অনেকেই কাল্‌চারড্‌, রিফাইনড হতেন। রিয়্যাল বাঙালীরা বরাকরের আর মেদিনীপুরের এ পাশে থাকেন না।

গিরিশদা জবাবে কিছু বললেন না। মুখ দেখে বোঝা গেল যে, রেগেছেন।

পৃথু বলল, আপনিই বা এতদূরে এসে পড়লেন কি করে ? রিয়েল বেঙ্গল ছেড়ে ? কলকাতা থেকে ত' এ জায়গা বহুতই দূর।

দূর ভাবলেই দূর ! না ভাবলেই নয়। তাছাড়া, এসে পড়তে দোষ কোথায়। রিয়েল বেঙ্গলের রয়্যাল-বেঙ্গল বাঘও কত দূরে দূরে চলে এয়েছে। মন ত' আলোর চেয়েও অনেক বেগে দৌড়য় কী না ! আলো দৌড়য় সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, আর মন পৌঁছে যায় অনন্ত দূরত্বে। সেই এক সেকেণ্ডেরও অনেকই কম সময়ে।

এমন সময় ভুচু ফিরে এল।

ভুচুকে তীক্ষ্ণচোখে দেখলেন তান্ত্রিক। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ বললেন, মনে পড়ে ?

ভুচু থতমত খেয়ে বলল, লেহ লট্‌কা আঃ আঃ...আমাকে... ?

হ্যাঁ। সে কি ? মনে পড়ে না আমাকে ?

কই ? না ত !

সেই যে দেখা হয়েচেল।

কবে ? কোথায় ?

কবে ? সেকি আজকের কতা ! কতযুগ আগে। দেখা হয়েচেল, বেন্দাবনে।

বেন্দাবনে ?

হ্যাঁ গো। তা না হলে আর বলচি কি ?

না। না ত।

ভুচুর মত ছেলেও হক্‌চকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর সামলে নিয়ে দিগাকে শুধোল, কি হয়েছিল দিগা তোমার ?

ওঃ কিছু না, একটু বুখার।

একটু বুখার ?

তান্ত্রিক বললেন। মরে ভূত হয়ে যেত মহ্যায় আমি না থাকলে। সাক্ষাৎ মাইই আমাকে পাটিয়ে দিয়েছিলেন সময়মতো। ডাকাতদের হাত থেকেও বাঁচাত কে ওকে ?

ডাকাত ? কোন্ ডাকাত ?

পৃথু শুধোল। ভুচুও চম্‌কে উঠে তাকাল।

কোন্ ডাকাত কি করে জানব ? ডাকাত নিয়ে ত সাধনা করিনি আমি। ভূত প্রেত, যোনি-সাধনা

এই সবই বিষয় আমার। সেই জগতেই আমার বাস। এই জগতের খোঁজে প্রয়োজনই বা কি ? তবে যারা এসেছিল, তারা ডাকাতদের কুলোপুরোহিত একেবারে সব পেডিগ্রীড্ ডাকাত মহ্যায় ! চকচকে জীপ গাড়ি, চকচকে সব আগ্নেয়াস্ত্র ; ইয়া-ইয়া গোঁফ। আপনাদের দিগা পাঁড়েকে গুলিতে একেবারে ভেজে দিয়ে চলে যেত।

তারপর ?

গিরিশদা শুধোলেন।

তারপর আর কি ! ভাগ্যিস আমার সঙ্গে কারণবারি আর ভৈরবী ছেল। এই দুই দিয়েই তাদের বশ করলাম। ভৈরবীকে ফেরৎ দিয়ে গেল সকালে ; একেবারে প্রেতিনী করে। তাও ঠিক ছিল। আমি তাকে "শুদ্ধ" করে নিতাম। কিন্তু কাল তাদেরই সঙ্গে লাড়ুয়ার হাটে গেছিলাম। হারামীর বাচ্চারা হাটে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভৈরবীকে নিয়ে ইচ্ছে করে হারিয়ে গেল। হাওয়া হয়ে গেল মহ্যায়। ভৈরবী আমার বাগনান-এর মেয়ে। মোটে কুড়ি বছর বয়স। তাকে কি আর পাব ? সেও হয়ত পুত্‌লী বাঈ-এর মতো কোনো ডাকু-রানী হয়ে যাবে। কী কুক্ষনে যে মহ্যায় আপনাদের মধ্যপ্রদেশে এয়েছিলাম। আমার ভৈরবীর মধ্যপ্রদেশই এরা হাপিস্ করে ছেড়ে দেবে। সাধনপীঠই গায়েব হয়ে গেল ত' সাধনা করব কী নিয়ে। কী চিত্তির ! কী চিত্তির !

লোকটার চেহারা, কথাবার্তা, লাল চোখের দৃষ্টি, পা ফেলার ভঙ্গী সবকিছুর মধ্যেই এক ধরনের অশালীনতা ছিল। পৃথু ওর দিকে চুপ করে চেয়ে রইল। পৃথুর মুখে বিরক্তি ফুটে উঠতে লাগল্। চোখাচোখি হল ভুচুর সঙ্গে পৃথুর। ভুচুর চোখ বলল, তান্ত্রিক সম্বন্ধে : "খচ্‌রা নাম্বার ওয়ান্। হুঁশিয়ার ! ডেঞ্জারাস্ স্পেসি।" ভুচু বলল, ডাকাতরা ক'জন ছিল ? তাদের সম্বন্ধে একটু বলুন ত শুনি !

কেন ? আমি কি পুলিসের ইনফর্মার মহ্যায় ? আপনারাও কি পুলিসেরই লোক ? আমার কোন্ দায় ? পারবেন ভৈরবীকে উদ্ধার করে দিতে ? তবে আর এত পিটির পিটির প্রশ্ন কেন ?

কিছু মনে করবেন না সাধুবাবা।

মেয়েটার, মানে, আপনার ভৈরবীর কি হল তা নিয়ে আপনার কোনো মাথা ব্যথাই নেই মনে হচ্ছে। নইলে, আপনি এমন জমিয়ে···

অবাক হওয়া গলায় বললেন গিরিশদা। এদেশে মেয়েছেলের অভাব কি মহ্যায় ? নতুন ভৈরবী জুটোতে আবার কতক্ষণ ? মন্ত্রতন্ত্র সবই জানা আছে। যখন খুশি উঠিয়ে আনব। তবে হ্যাঁ, রিয়েল-বেঙ্গলের ভৈরবী এখানে পাবো না। তাই-ই বলচি, মাথার ব্যথার কোনো উপশমের উপায় যখন নেই তখন কোনো বুদ্ধিমান লোকই মাথার-ব্যথায় কষ্ট পান না। কিছুমাত্র করার না থাকলেও কিছু করতে যাওয়াটা পরম মূর্খামি।

হায় রাম !

দিগা বলল, জোরে শ্বাস ফেলে।

ঘোর কলি এখন। কলির লক্ষণ চারদিকেই পরিষ্কার। এবার আমার যাওয়ার সময় হল। এখানের ডেরা তুলে চলে যাব অন্য জায়গায়।

যাবে কোথায় বাছা আমার ? কলি কি পাথর যে, এক জায়গায় পড়ে থাকবে ? ভাইরাস্ ইনফেক্সানের মতো তা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে মূর্খ !

তান্ত্রিক বলল।

ভুচু বলল, এই যে কলি-কলি করছ তুমি দিগা, এর লক্ষণ কি ?

পৃথু বলল, তোমাদের খ্রীস্টানদের সেই গল্প আছে না, ডিল্যুজ এল, বন্যা, বন্যা ; বন্যায় চারদিক ভেসে গেল, ন্যুহা নৌকো বানিয়ে সব প্রাণীর এক-এক জোড়া করে তাতে নিয়ে ভেসে পড়লেন। এই পোড়া, পাপী পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে নতুন পৃথিবীতে যাতে প্রাণ থাকে তাইই··,·

দিগা বলল, রাম্‌রাজ্য আর কলিযুগের লক্ষণ একেবারেই উল্টো। রাম্‌রাজ্যর বর্ণনা আছে রাম্‌চরিতমানসে :

সব উদার সব পর উপকারী। বিপ্র চরণ সেবক নরনারী। এক নারী ব্রত রত সব ঝারী। তে মন বচ ক্রম পতি হিতকারী।

আরে মানেটা বলবে ত!

অধৈর্য গলায় ভুচু বলল।

মানে হল, যেখানে সবাই উদার, সবাই পরোপকারী, নর-নারী সকলেই ব্রাহ্মণচরণের সেবা করে, সমস্ত পুরুষই এক নারীতে, মানে যাব যার পত্নীতে আসক্ত। নারীরাও প্রত্যেকে মনে, কর্মে ও বচনে পতির হিতকারী! সেইই হল রামরাজ্য!

গিরিশদা বললেন, আহা! মরি মরি। এমন রাজ্য দিগা পাঁড়ে তোমার স্বপ্নেই আছে; স্বপ্নেই থাকবে। আর কলিযুগের ব্যাপারটা কেমন শুনি? ব্রাহ্মণ হলেই তার পায়ে পূজো করতে হবে এ একটা কথা হল? এখানে তোমার এই তান্ত্রিক জয়নগর-মজিলপুরী রিয়েল-বেঙ্গলী বন্ধু আর তুমি ছাড়া আমরা সবাইই ত অব্রাহ্মণ। দুজন কায়স্থ, আমি আর পৃথু। সাবীর সাহেব মুসলমান। আর ভুচু ক্রীস্টান। আমরা কি সবাইই অমানুষ? যত অব ইমাজিনারী স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স, "উইশফুল থিংকিং"-এর জগত তোমাদের।

ইংরিজী শব্দগুলোর মানে না বুঝতে পেরে দিগা বোকার মতো চেয়ে রইল গিরিশদার মুখে।

গিরিশদা বললো, থাকগে, কলি যুগের বর্ণনাটা শোনাও ত এবার।

বলেই, ভুচুকে বললেন, ও ভুচু বাইরে গাছতলায় একটা কাঠের উনুন করো। আমাদের হাতের রান্না এই ব্রাহ্মণ কি খাবেন?

মোটেই না। মোচ্‌লা কেরেস্তানের ছোঁয়া খাবই বা কেন?

লেহ্‌ লট্‌কা। ভুচু বলল।

তারপর চোখ দুটো ছোট করে তান্ত্রিককে বলল, আপনার কি স্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশি আছে কিছু আমাদের চেয়ে? দু' পেয়ে মানুষই ত আপনি আরেকজন, না কি? না হয় হলেনই রিয়েল-বেঙ্গলী!

দু'পেয়ে আমি নিশ্চয়ই। তবে মানুষ আলাদা হয় পায়ের নাম্বারে নয়; মগজের ঘিলুতে। যা বোঝেন না, তা নিয়ে কতা বলবেন না মহ্যায়।

দিগা কলিযুগের বর্ণনা দিল:

"বাদহিঁ শূদ্র দ্বিজন্থ সন, হম তুম্ব সে খাটি।
জানহি ব্রহ্ম সো বিপ্রবর, আঁখি দেখারহিঁ ডাটি।"

মানেটা! মানেটা!

অধৈর্য গলায় ভুচু বলল।

শূদ্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করে, এই আপনারা যেমন করছেন, ভাবখানা; আমি তোমার চেয়ে কম কিসে? হাম কিসীসে কম্ নেহি। সকলেরই ধারণা কলিকালে এইরকমই হয়, তখন মানুষ মনে করে যে, যে ব্রহ্মকে জানে, সেই-ই ব্রাহ্মণ। এ কথা বলে, সগর্বে চোখে রাঙায়।

ভুচু এবার তান্ত্রিককে নিয়ে পড়ল।

বলল, এবার আপনি কিছু বাণী-টানি দিন স্যার। আমরা সব স্পয়েল্ট-বেঙ্গলী, এমন রিয়েল. রয়্যাল বেঙ্গলীর দেখা ত রোজ রোজ পাই না। তবে, আপনার লাইনটা ভাল। কারণবারি, মেয়েছেলে; ভোগের লাইন। ভোগের মধ্যে দিয়েই ভগবানকে ভাগ করে খান আপনারা।

ধর্ম বা ধর্মর আলোচনার এক্তিয়ার সকলের জন্যে নয় বৎস! এ বালখিল্যদের ক্রীড়াভূমি নয়। এতে প্রবেশ করার আগে শুদ্ধ হতে হয়।

কি? সেদ্ধ?

আঃ। কেরেস্তান! সেদ্ধ নয়, শুদ্ধ। চুপ্ করো তুমি!

আরে বাবা! ও পৃথুদা! এ যে চোখও রাঙায় দেখি।

গিরিশদা বললেন, তান্ত্রিককে শান্ত করে; এবার আপনি আমাদের কিছু বলুন জয়নগর স্যার। একটু আগেই বললেন যে আপনার সাধনাতে কারণবারি আর যোনির জয়জয়কার। কিছু শুনিয়ে

আমাদের মতো অর্বাচীন বালখিল্যদের ধন্য করুন। আপনাদের রকম সকম...
কী বলব! কাদের বলব! উলুবনে মুক্তো ছড়ানো।
যাই-ই হোক, রোজ ত আর দেখা হবে না। বলুন কিছু।
শুনুন তাহলে, সামান্যই বলি। পান করার ব্যাপারে আমাদের শাস্ত্র বলেন :
"পীত্বা পীত্বা পুন : পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে ॥
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"
মানে কি হল?
দিগার ভাষা ল্যাটিন আর আপনারটা ত জার্মান।
ভুচু বলল।
তান্ত্রিক চোখ লাল করে একবার তাকালেন ভুচুর দিকে তারপর বললেন, একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু। পান-পাত্রর পর পান-পাত্র, চোঁ চোঁ করে খেয়ে যাবে কারণবারি।
আহা!
সাবীর মিঞা বললেন, এই মামলাতে আমারও কিছু পেশ করার ছিল :
"দস্ত এ সাকী সে (অগর্) শরাব মিলে
শ ইজ্জোকা মুঝে শাবাব্ মিলে
খুম্ পেখুম্ ভরকে ম্যাঁ পিউ জাহিদ্
আচ্ছি হো, ইয়া খরাব মিলে।
দস্তএ সাকী সে (অগ্র্) শরাব মিলে...
কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! করে উঠল পৃথু আর ভুচু।
এবার তান্ত্রিক বললেন, এটা আবার কি ভাষা? মানে কি?
গিরিশদা বললেন, আমি এর তর্জমা করে ফেলেছি বাংলাতে। শোনাই?
জরুর। জরুর। বললেন, সাবীর সাহেব।
"প্রিয়া যদি গোলাপ-কুঁড়ি হাতে/
দেয় আমাকে রঙীন সুরা ঢেলে/
শতবারের হজযাত্রার পুঁজি আমার ঠিকই এক লহমায় মেলে।/
ভালমন্দর বিচার করে কেবা?
দেয় যদি সে নিজের হাতেই ঢেলে।" প্রিয়া যদি গোলাপ-কুঁড়ি হাতে/ দেয় আমাকে রঙীন সুরা ঢেলে
ওয়াহ! ওয়াহ!
ভুচু বললো, এবার স্যার, আপনারটার মানে বলুন। মিস্টার তাঁন্তি।
মিস্টার তাঁন্তি নয়। আমি তান্ত্রিক। আমার পুরো নাম রূপক চক্রবর্তী!
ঐ হলো। বলুন মানেটা। মিস্টার চক্রবর্তী।
পানের পর পান করে যাবে। সুরাপান করতে করতে ভূতলে পতিত না-হওয়া পর্যন্ত বারংবার পান করতেই থাকবে। পান করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলেও সেখান থেকে উঠে পড়ে পুনরায় পান করতে থাকবে। এইরকম করলে তবেই, বৎস; তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না। তোমার আত্মা চিরমুক্ত হবে।
ভুচু বলল, আরও কিছু শোনান ফাদার।
ফাদার নই আমি। বলেছি আপনাকে, আমি তান্ত্রিক। আমার ক্রোধের কারণ ঘটাবেন না। বিপদ হবে।
না। না। আর কিছু বলব না। কিন্তু বলুন।
শুনুন : তবে হজম করতে পাববেন ত?
"মাতৃযোনিং পরিত্যাজ্যং সর্বযোনিশ্চ তাড়য়েৎ।

দ্বাদশাব্দাধিকা-যোনিং যাবৎ ষষ্ঠাং সমাপয়েৎ।
প্রত্যহং পূজয়েদ যোনিং পঞ্চতত্ত্বে বিশেষতঃ।
যোনিদর্শনমাত্রেন তীর্থকোটিফলং লভেৎ ॥"

এই বম্-শেল শুনে পৃথুর মুখ লাল হয়ে উঠল। গিরিশদা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সাবীর মিঞা উৎসুক। ভুচুও বোকা-বোকা।

মানে কি ?

ভুচু বলল।

ভুচু আর সাবীর মিঞা কিছুমাত্র বুঝতে পারেনি।

মানে হচ্ছে, হিন্দীতেই বললেন তান্ত্রিক : কেবলমাত্র মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত কুলযুবতীর যোনিতেই তাড়না প্রশস্ত। বারো বছরের বেশি বয়সী হলেই চলবে, সেই সব কুলযুবতীদের যোনিপীঠে সাধক নিজের ষাট বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যহ পঞ্চতন্ত্র দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে।

যোনিপীঠ দর্শনমাত্রই কোটিতীর্থ দর্শনের লাভ হয়।

এই মহামারণ স্তোত্র শুনিবামাত্র বৃক্ষতলে, প্রস্তরাসীন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মনুষ্যগণের বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

প্রথমে ভাঙা গলায় কথা বললেন, সাবীব মিঞা। বললেন, পইলে কিসীসে বাঁতায়া নেহী থা মুঝে। ধরম হো ত অ্যায়সা। ম্যায় ত হিন্দুই বন্ যায়ে গা।

তওবা ! তওবা ! ঈ ক্যা গুনাহ্ কি বাত কর রহে হেঁ আপ্ ?

বলেই, ভুচু বকে দিল সাবীর মিঞাকে।

তারপর গিরিশদাকে বলল, কত বছরে রিটায়ার কবলেন আপনি দাদা চাকরী থেকে ?

আটান্ন।

এখন কত বয়স হল ?

আটান্ন।

মাত্র দু' বছর আছে দাদা। টাইম ইজ রানিং আউট। যা যা করার দু' বছরের মধ্যে করে ফেলুন। কোটিতীর্থলাভের সুযোগ আপনার আর বেশি বাকি নেই।

তুমি এক থাপ্পড় খাবে আমার কাছে ছোক্‌রা।

ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন গিরিশদা। পৃথুরও রাগ হচ্ছিল। কিন্তু কার উপরে যে রাগটা করবে তা বুঝতে পারছিল না। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে, কিংকর্তব্যবিমূঢ ; তাই-ই হয়েছিল ও। এমন শ্লোক যে সত্যিই কোনো শাস্ত্রে আছে হিন্দুদের তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। মিনমিন করে ও বলল, এ কোন্ শাস্ত্র আওড়ালেন চক্রবর্তী মশায় ?

কেন ? যোনিতন্ত্রম। যোনিতন্ত্রম্-এর দ্বিতীয় পটল থেকে।



ঐ তান্ত্রিকের জন্যেই দিনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষটার চেহারা, কথাবার্তা, হাঁটা-চলা, মেয়েদের সম্বন্ধে নানারকম উক্তি এই সব কিছু মিলেমিশে মানুষটা যে জাল, আসলে তান্ত্রিকই নয় এমন একটা সন্দেহও হচ্ছিল সকলের।'

ভুচু ত একবার দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ইনডায়রেক্টলী বলেও দিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে এ জায়গা ছেড়ে। তাতে দিগা আহত হল। দিগা সত্যিই উঁচুদরের সাধক। ওর কাছে সকলেই সমান। কিন্তু এই মানুষটা ধূর্ত, ডাকাতদের ইন্‌ফরমার হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। হয়ত মগনলালই পাঠিয়েছে।

বেলাবেলি খাওয়া হলো না। সেই দেরীই হয়ে গেল। ছাড়া-ছাড়া কথা হল। তবে, দিগা যে ভাল হয়ে গেছে তা জেনে সকলেই খুশি হল।

একসময় জীপে উঠে বসল সকলে। খাওয়ার পর গাছতলাতেই গড়িয়ে নিয়েছিল একটু।

শীতের বেলা পড়ে আসছে। ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছে। ঝোপে ঝোপে তিতির, বটের আর আসকল্‌রা নড়ে চড়ে বসে দীর্ঘ রাতের জন্যে তৈরী হচ্ছে।

জীপের মধ্যে নানা কথা বলছে ওরা। পৃথু ওদের মধ্যে থেকে একা হয়ে গেছে। ও ত একাই। বাইরের প্রকৃতিতে চেয়ে আনন্দ বাগচীর কবিতাব কটি পঙক্তি ভেসে এলো ওর মনে।

কবিতা এমন হঠাৎ হঠাৎই মনে আসে।

"সোনা গুঁড়ো-রোদ চেলাই কাঠেব করাতেব নিচে।
ঝরে জরিদাব চিকের মতন। মেয়েলি আলোয
ডালে ডালে সেই কাঠবিড়ালকে খুঁজে মরা মিছে
সময় এখন আকাশের নীল গম্বুজ ছোঁয়"

জোরে জীপ চালিয়েছে ভুচু। তবে টিকিয়া-উড়ান নয়। শীতের শেষ বিকেলেব গন্ধ মাখা ধুলো উড়ছে চাকায় চাকায়। মাথা-গা্য ভরে যাচ্ছে ওদের। পথ-পাশের পিটিসের আর কেলাউন্দার ঝোপে ঝোপে এবং শাল-চারায় থিতু হয়ে বসছে সেই মিহি মিষ্টি-গন্ধ ধুলো।

বড় বাস্তায় উঠে এল ওবা। একটা জংলী নাম-না-জানা গাছ ফিকে বেগুনী-রঙা ফুলে ছেযে গেছে। তার নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটি গোঁন্দ মেয়ে। ফুলের বেগুনী ছাযা পড়েছে তার চিকন কালো গায়ে। বিকেলের মরা হলুদ মাখামাখি হয়ে গেছে কালো অঙ্গে রঙ্গ-ভুরা বেগুনী ছায়ার সঙ্গে। ঝরাপাতারা উড়ে যাচ্ছে গাছ থেকে হাওয়ার সওয়ার হয়ে। ঘুরে ঘুরে নৃত্যরতা ব্যালেরিনার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে পাথরে, টাঁড়ে।

রাত নেমে আসবে একটু পরেই।

কে জানে, এ মেয়ে কোথায় যাবে ? কোনো মেয়েই আসলে যায় না কোথাওই। ওরা কিছুটা গিয়ে মিশে যায় কিছু না কিছুর সঙ্গে। কোনো নদীতে ; বা সমুদ্রে অথবা কোনো পুরুষে।

রাত নেমে আসছে।

"ফুলন্ত বৃক্ষের পাশে দাঁড়িও না কাকবন্ধ্যা নারী
বৃক্ষপতনের শব্দ সারারাত স্বপ্নের ভিতরে

সারারাত স্বস্তিহীন আর্তনাদ, রক্তাক্ত আত্মার মতো স্থির
'কার প্রতিচ্ছবি হয়ে কেঁপে ওঠে বৃক্ষের শরীর।
স্মৃতির কুঠার ক্রমে আত্মঘাতী তীক্ষ্ণ তরবারি।"

কার ?

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের।

আজকে কবিতাতে পেয়েছে পৃথুকে। নিজে কবি হতে না পারলে কী হয়, সর্ব কবিদেরই সে আত্মজ করেছে। কবি না হতে পারার সব দুঃখ ঢাকা পড়ে গেছে এই আশ্চর্য আনন্দে।

দূরে বিলিনীয়ার চৌমাথা দেখা যাচ্ছে। শালপাতার দোনা ধুলোর সঙ্গে উড়ছে হাওয়ায়। লাল-রঙা একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে সামোসা, কালাজামুন আব চায়ের দোকানের সামনে। এই মোড় থেকে অন্য একটা লাল মাটির রাস্তা বেরিয়ে গেছে রাইনাব দিকে। কুর্চির বাড়ির দিকে। একথা ভাবতে ভাবতেই, জীপটা মোড়ে এসে পৌঁছল।

হঠাৎ পৃথু বলল, একটু দাঁড়াবে ভুচু ?

কেন ? পান খাবে ? অনেক পান আছে পৃথুদা।

না। আমি নেমেই যাই।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, কোথায় যাবে ? নামবে কেন ? হলটা কি ?

কেনর জবাব পৃথুর নিজের কাছেও নেই। কিন্তু এক্ষুণি যেতে ইচ্ছে করছে ভীষণ। কুর্চিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে খুউব।

পৃথু বলল, আমাকে বাসটা ধবিয়ে দাও। বায়নাতে যাব ভুচু।

রায়না ? সেখানে কি ? এ আবাব কি নতুন বায়না তোমার ! বোজ রোজ ?

গিরিশদা বললেন।

এমনিই, যাব একটু।

যেতে চাচ্ছে, যেতে দিন না বাবা। অত কৈফিয়ৎ চাওয়া কিসের ? কিন্তু পৃথুদা ফিরবে কি করে তুমি ?

ভুচু শুধোল।

গিবিশদা বললেন, শ্রীকৃষ্ণ এসে যাবে একটু পরেই সাবীর সাহেবের বাড়ি। ওকেই পাঠিয়ে দেব।

বাঃ ! তাহলেত ভালই হয়। ভুচু বলল। কিন্তু এসো কিন্তু। আমরা না খেয়ে তোমার জন্যে বসে থাকব পৃথুদা।

গিরিশদা বললেন, ভাযা, আবাব সেদিনেব মতো যেন ....

ঠিক আছে।

বলেই অপরাধীর মতো মুখ করে পৃথু নেমে গেল।

বড় অপবাধী লাগে নিজেকে। ভালবাসা বড়ই অপরাধের। যে বেসেছে ; সেই-ই জানে।

বাসের জানালায় হাত বেখে বসে দেখল যে, জীপটা চলে গেল। ও জানে যে, ওকে নিয়ে ; ওর জটিল ভবিষ্যৎ নিয়ে, ওর হিতার্থীরা এখন উৎকণ্ঠিত আলোচনা করছেন জীপের ভিতরে। কেউ বলছেন এ ভারী অন্যায়। এ কী ! বিয়ে-শাদী করা লোকের এ কী পাগলামি ! কেউ বলছে, যাক্ যাক্। বেচারী ভালবেসে ফেলেছে। ভালোবাসার মত অসুখ কি আর আছে ? ওকে বোকো না। ও বোকা। করুণা কোবো ওকে। বেচারী !

রাযনার বাজারে এসে যখন নামল, তখন রাত হয়ে গেছে। কুর্চিদের বাড়িব দিকে হেঁটে চলল ও। রাত বটে, কিন্তু অন্ধকার নেই। ফুট্‌ফুট্ করছে জ্যোৎস্না। বনফুলের গন্ধর সঙ্গে রাতের গন্ধ জ্যোৎস্নার গন্ধে কুঁচফুলের গন্ধ মিশে গেছে। বাড়িটার কাছাকাছি এসেই প্রথম খেয়াল হল ওর যে, বাড়িটা অন্ধকার। পৃথিবীময় নরম চাঁদের আলো শুধু কুর্চির বাড়িই অন্ধকার। কেন ? তবে কি ওরা চলে গেল ভোপাল, পাঁচমারী, মাণ্ডু, ভীমবৈঠকা ? পৃথুকে না বলেই কুর্চি চলে গেল ? এই-ই

ভালবাসা ?

গেটে পৌঁছে মনে হল কেরোসিনের আলো জ্বলছে যেন ভিতরে। কী হল ? বাজারে ত ইলেকট্রিকের আলো ছিল। লোডশেডিং হল কি ?

গেটটা খুলে ঢুকল ও ভিতরে। কোনোই সাড়া শব্দ নেই। ভুতুড়ে লাগছে পুরো বাড়িটাকে। দরজাও বন্ধ। গা-ছম্‌ছম্‌ পরিবেশ। পেছনের টাঁড় থেকে শেয়াল ডেকে উঠল হুক্কা-হুয়া করে। কড়াও নেই দরজার। যে দরজাতে কড়া নাড়ার খুবই দরকার, সেই দরজাতেই কড়া থাকে না। হাত দিয়ে ঘুষি মারল। কয়েকবার আস্তে করে। কোনো সাড়া নেই। আরও কয়েকবার করল আওয়াজ। জোরে। এবার যেন ভিতর থেকে কুর্চির গলা পেল। নাকি মনের ভুল ?

কওন ?

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কুর্চি বলল।

আমি। কুর্চি, আমি।

মুখে বলল, পৃথু।

ওর মন নিরুচ্চারে বলল, আমি এসেছি কুর্চি। আমার সমস্ত আমি। দরজা খোলো। দরজা খোলো।

কওন ?

আমি, কুর্চি। আমি পৃথুদা।

বিশ্বাস হলো না যেন কুর্চির। নির্জনে বাস। রাতের পথিককে দরজা খোলার আগে অনেকবারই ভাবতে হয়। কেন জানে না, কুর্চি বলল, কোন্‌ পৃথুদা।

আমি। আমি তোমার পৃথুদা।

মনে মনে বলল, কজন পৃথুদা আছে ? পৃথু ত একজনই। কোনো প্রোটোটাইপ নেই পৃথুর।

আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, বহিরঙ্গে না হলেও অন্তরঙ্গে যে অনেকগুলো পৃথু ! সেও ত অনেকগুলো। টুকরো টুকরো পৃথু। তার সমস্তটা ত সে নিজে ইচ্ছে করলেও দিতে পারে না কাউকে। সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তার সমস্তকেই তুলে দেয় কারো হাতে এমন সাধ্য কি তার ?

দরজা খুলল এসে কুর্চি। রাতের সব শীত, আর জ্যোৎস্না আর সব ভালোবাসা নিয়ে ঢুকে পড়ল ও কুর্চির ঘরে।

আসুন। আসুন। কী করে এলেন ? এই রাতে ? গাড়ি কোথায় ?

বাসে এসেছি।

বসুন। বসুন। হঠাৎ ?' এমন অসময়ে কেন ? কী ব্যাপার।

কেন ?

আবারও কেন ? কুর্চিও শুধোচ্ছে, কেন ?

কেন। তা কি পৃথুই জানে ?

মুখে বলল, বড় অসময়ে এলাম, না ?

কুর্চি বলল, আপনি যখনই আসেন তখনই আমার সুসময়।

বলছিলাম, হঠাৎ এই রাতে ?

পৃথু লণ্ঠনের আলোয় কুর্চির চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। বলল, তোমাকে খুউব দেখতে ইচ্ছে করছিল, তাই-ই......

যেন অপরাধ আর রাখার জায়গা নেই। কুর্চি একটুক্ষণ ওর চোখে চেয়ে, হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো ওকে সোফায়। পৃথুর মন বলল, কোনো দুর্বোধ্য কারণে কুর্চির খুবই খারাপ সময় যাচ্ছে। এর আগের বার যখন এসেছিল, তখনও লক্ষ্য করেছিল। চাঁদের আলোর মতো দারিদ্র্যও নিঃশব্দে চারিয়ে গেছে বাড়িটার ফাঁক-ফোকরে। ছুঁচোর গায়ের গন্ধর মতো দারিদ্র্যের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে নাকে পৃথু। কিন্তু কেন ?

সোফায় বসিয়ে, পাশের সোফায় বসল কুর্চি।

পৃথু বলল সামনে এসে বোসো। তোমাকে দেখতে পাই না ভাল কবে, পাশে বসলে।

আমি কি দেখার মতো?

তা জানি না। তবু, একটুখানি দেখতে পাব বলেই ত আসি। ভালোবাসি যে!

খেয়ে যাবেন ত?

না। তেল-কই আব দই-মাছ অনেকই খাইয়েছ তুমি। মনে মনে বলল।

মুখে বলল, খেতে আসিনি। তোমাকে একটু দেখতে এসেছি। ভাঁটু কোথায়?

দাঈ? বাড়িটা এত নিস্তব্ধ কেন?

দাঈ গেছে দুদিনের ছুটি নিয়ে।

আর ভাঁটু?...

ভাঁটু...

কোথায় ভাঁটু?

পরে বলব।

আজকে ফিরবে না?

না।

ফিরবে কবে?

জানি না।

তার মানে?

জানি না। পরে বলব।

তুমি একা আছ? ছিঃ। খবর পাঠাওনি কেন একটা আমাকে? কেউ এসে তোমার সঙ্গে থাকত।

কেউ?

কে কেউ?

যে-কেউ?

বন্দোবস্ত করতাম আমি।

আমার যে, কেউই নেই পৃথুদা! কে-কেউ?

তারপর কুর্চি মুখ নামিয়ে, নিচের দাঁতে উপরের ঠোঁট কামড়ে বলল, আপনি ছাড়া আমার সত্যিই কেউই নেই! অথচ, আপনিও আমার কেউই নন।

আলো জ্বালাওনি কেন? বাজারের সব আলো ত জ্বলছে। ফিউজ হয়ে গেছে? কোথায় আছে ফিউজ? চলো, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

ভাঙতে চেয়েছিলাম অন্ধকারকেই, ভুলবশে ভেঙে ফেললাম আলো। ভালই! আসলে লাইন কেটে দিয়েছে।

সেকি? কেন?

যে কারণে কাটে।

কী বলছ তুমি! কি হয়েছে আমাকে বলবে না? কি হয়েছে তোমাদের? হঠাৎ এই.....

বলব। আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব? তবে এখন নয়, আজ নয়। জানেন পৃথদা আমি জানালায় বসে পিছনের টাঁড়ের জ্যোস্না দেখছিলাম। মাথা উঁচু পাহাড়, গভীর জঙ্গল, আর তার আঁচলেরই মত ওই টাঁড়। কত সব রাত চরা পাখি, কত জন্তু জানোয়ার! গভীর রাতে হয়ত জিন্‌পরীরা খেলা করে এমন জায়গাতেই। পৃথিবীটা কী সুন্দর! না? ভাবছিলাম, বসে বসে যে, কোনো কোনো মেয়ে অভাগী হয়েই এখানে আসে। সৌন্দর্যর একেবারে বুকের মধ্যে বাস করেও সেই সৌন্দর্যে কোনো দাবীই থাকে না তাদের।

আমি বুঝি না তোমাকে।

কেইই বা কাকে বোঝে বলুন ? নিজেরাই কি বুঝি নিজেদের ?

তাই· ।

আমাকে বলবে না ?

চা খাবেন ত ?

আবারও কি পা পোড়াতে চাও আমার ? কিন্তু তুমি রান্না করছ কি করে ? ঐ ভাবেই ? ঐ ভাবে উদোম জায়গায় কেউ রান্না করতে পারে ? স্টোভ কিনে নিয়ে আসব কালকেই আমি। ভেবেছিলাম।

ভেবেছিলাম, "এটা করব ওটা করব, বাড়ি করব পাহাড়চূড়োয়"·আমার কথা ছাড়ুন।

ছাড়ব কি করে ? তাছাড়া, একজন মেয়ের পক্ষে এইরকম নির্জন জায়গাতে অন্ধকারের মধ্যে থাকা কি সম্ভব নাকি ? একা একা ?

সব মেয়েরাই একা, এই বীর পুরুষদের দেশে। সব জায়গায়।

না, না। তুমি জানো না। এই সব জায়গাতে এখন ডাকাতদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। মেয়েদের যে অনেকই বিপদ : অনেকরকমের।

মেয়েরা তা জানে। সব মেয়েরাই।

তুমি আমার কাছে শুধু একটি মেয়েমাত্র নও কুর্চি। তুমি এভাবে তুমি..

আমি আপনার কাছে কি ?

কুর্চির চোখের কোণে নীরব হাসি ঝিলিক মেরে গেল।

ও আবারও বলল, বলুন। জবাব দিন। আমি আপনার কে ?

পৃথু সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে কুর্চির দু গালে দুটি হাতের পাতা ছুঁইয়ে বলল, তুমি আমার সব কুর্চি।

মনে মনে বলল, তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আমার সুখ, তুমি আমার দুখ, তুমি আমার জীবন, মরণ, আমার অস্তিত্ব ; অনস্তিত্ব। কুর্চির চোখ দুটি জলে ভরে এল। দু হাত দিয়ে ছাড়িয়ে দিল পৃথুর দু হাত দু গাল থেকে।

বলল, মিথ্যেবাদী ! মিথ্যেবাদী ! মিথ্যেবাদী ! ভীষণ খারাপ লোক আপনি।

সবাই-ই তাই বলে।

পৃথুর বুকটা ভেঙে যেতে লাগল। গলার কাছে কী যেন সব দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল।

জানালার কাছে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল কুর্চি। শীত আর চাঁদ ঘরে ঢুকল হাত ধরাধরি করে। ধূ ধূ করছে চাঁদের আলোয় বাইরের টাঁড়। টি-টি পাখিরা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে চমকে চমকে ডাকছে হট্রি-টি-টি-হুট্ টি-টি-টি-হুট্। এই পাখিদের ডাক মানুষের বুকের মধ্যের নরম সব কিছুকে কাপাস তুলোর মত পিঁজে দিয়ে টংকারে আর উৎসারে উড়িয়ে দেয় আকাশময়। মন খারাপ লাগে বড়। গা ছমছম্ করে। শম্বরের দল রায়নার বস্তীর দিকে চলেছে কুলথী আর অড়হর ক্ষেতের ফসলের লোভে। শিঙাল সর্দার শম্বরের সংক্ষিপ্ত চাপা অতর্কিত ঢাংক, ঢাংক ডাক ভেসে এল। একবার। তারপরই শীতরাতের স্তব্ধতা। টি টি পাখির ডাকে মাঝে মাঝে তা শুধু ছিদ্রিত হচ্ছে। টাঁড়ের ঠিক মধ্যিখানে একটা বুড়ো মহুয়া গাছ আছে। তার শাখা প্রশাখায় চাঁদের আলো স্বপ্ন বুনেছে যেন, ব্যঙ্গমা-বেঙ্গমী, কুঁচবরণ রাজকন্যা, যার মেঘবরণ চুল তারা যেন সব এই চাঁদের আলোয় সেই বুড়ো গাছের পাতায় পাতায় এসে বাসা বেঁধেছে। সত্যিই ! পৃথিবী কী সুন্দর। এত সৌন্দর্যর বুকের মধ্যিখানে বাস করেও সেই সৌন্দর্যর দাবীদার না হতে পারার মতো দুঃখ বোধহয় বেশি নেই। কুর্চি কি একথা জানে যে, কুর্চিরই মতো তার নিজের আঁজলা গলেও সব সৌন্দর্য চুঁইয়ে গেছে। ধরে রাখতে পারেনি আরেকজনও, একাংশকেও।

পৃথু সম্মোহিতের মতো উঠে গিয়ে কুর্চির কোমর জড়িয়ে ধরল। তারপর সেই ডানহাতেই বুকের কাছে টেনে নিল তাকে। এই-ই প্রথম ; এ জীবনে। মুখ নামিয়ে আনল কুর্চির ঠোঁটের কাছে। তারপর তার নিজের ঠোঁট হঠাৎ রাখল কুর্চির ঠোঁটে। চুমু খাওয়ার জন্যে নয়। কুর্চির সব ব্যথাকে

নিঃশেষে শুষে নেবার জন্যে।

কুর্চি আপত্তি করল না। কিন্তু ওর আনন্দযজ্ঞে যোগও দিল না। এই মুহূর্তে অন্য দশজন মেয়ে যা করে, তাদের দুটি হাত দিয়ে পুরুষকে জড়িয়ে ধরে প্রকাশ করে তাদের গাঢ় নিরুচ্চাব ভালোবাসা. সমর্পণের নীরব স্বীকৃতিতে; কুর্চি তাও করল না।

কুর্চি যে দশজনের মতো নয়! হলে কি আর পৃথু ভালবাসত তাকে!

পৃথুর ভিতরে বাঘটা জেগে উঠেছিল। সেই অসভ্য জংলী বুনো-গন্ধ বাঘটা। ঘুমিয়ে-থাকা কাঁকড়াগুলোও হঠাৎ ঘুম ভেঙে কামড়াকামড়ি শুরু করেছিল। ও বুঝতে পারছিল যে, কুর্চির জন্যে তার জমিয়ে রাখা দীর্ঘ প্রতীক্ষার বছরগুলির অবদমিত কামের খড়ের ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। আর সামলাতে পারবে না ও নিজেকে। এ নিছক কাম নয়; গভীর ভালোবাসায় সিঞ্চিত এক জ্বালাধরা অনুভূতি। বিজলী আব কুর্চি ত এক নয়। কুর্চির হাতে হাত বাখামাত্রই তার শরীরের পুরুষের কেন্দ্রবিন্দু হঠাৎ সেই তীব্র আনন্দের যন্ত্রণায় দৃঢ় হয়ে ওঠে। চিরদিনই। পৃথুর হাঁটু কাঁপছে থরথব, করে। রেডি, গেট সেট্ . দাকণ দৌড় শুরু করবে ও আবার। প্রথম কৈশোর থেকে এই দৌড়েরই স্বপ্ন দেখে এসেছে, কল্পনা করেছে এক বিশেষ সুগন্ধি বনবীথি দিয়ে দৌড়ে যাবে। আজ ....

ঠিক সেই সময়েই কুর্চি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বেশ জোরেই ঠেলল।

নাঃ। না-আ-আ-আ...অস্ফুটে বলল, কুর্চি।

কেন কুর্চি? না কেন? কেন না?

পৃথু আশাভঙ্গতায় ছাই হয়ে গিয়ে বসল। বসল বটে, তবুও ওকে নিয়ে বড় সোফাটার দিকে যেতে লাগল। পৃথুর চোখে উপবাসী ভিখিরীব তীব্র ক্ষিদে জ্বলজ্বল করছে। পুরুষ মাত্রই জন্মভিখিরী। উপবাসী। অন্তত এই দেশে।

কুর্চি হেসে উঠল হঠাৎ। হিঃ হিঃ হিঃ করে।

মনে হল, ডাইনী হাসল চাঁদের রাতে। এ কুর্চির হাসি নয়। অবাক হয়ে হাত আলগা করে দিয়ে ছেড়ে দিল পৃথু, কুর্চিকে।

কী পৃথুদা! একটু আগেই না ডাকাতের ভয়ের কথা বলছিলেন আমাকে আপনি? ডাকাতরা আমাকে এমন একা অরক্ষিত পেলে কি করত? আপনি যা করতে যাচ্ছেন তাই নয় কি? আপনি...

লজ্জিত পৃথু অর্থহীন শব্দ করল একটা মুখ দিয়ে। কী যে বলল, তা বোঝা গেল না।

একজন জংলী অশিক্ষিত ডাকাত যা করত আমাকে নিয়ে আপনিও কি আমাকে নিয়ে তাই-ই করবেন? আমার অনুমতি ছাড়াই ....

কুর্চি ফিরে গিয়ে সোফায় বসে বলল. শান্ত হোন পৃথুদা। শান্ত হয়ে বসুন।

একটু পর স্বগোতোক্তির মতো বলল, জীবনে সব কিছুরই, মানে সব ঘটনারই একটা নির্ধারিত সময় থাকে পৃথুদা। কুঁড়ি ধরার, ফুল ফোটার, ফল হয়ে ওঠার, তারপর ঝরে পড়ারও। পাতা ঝরার দিনে কুসুম ফোটাতে চাইলেও কি তা ফোটে?

আমি এত নাটক বুঝি না কুর্চি। আমি তোমাকে ভালবাসি।

আমাকে ক্ষমা করে দাও কুর্চি!

ধরা পড়ে যাওয়া চোরের মতো বলল পৃথু।

ক্ষমা করব আমি? হাসালেন আমায়! বলে, সত্যিই হাসল কুর্চি।

আপনিই বরং ক্ষমা করে দিন আমাকে।

বলেই, উঠে এসে পৃথুর চুল দুহাতে দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বলল, পাগল। আপনি পাগল একটা। সাধে কি সকলে বলে, পাগলা ঘোষ্‌ষা।

বলতে বলতেই, কুর্চির গলা বুঁজে এল।

এখন কোনো কথা নেই ঘরে। চোখে আলো লাগছে বলে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখেছিল কুর্চি সেণ্টার টেবিলের নিচে। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল দুজনেরই কী বলবে, তা ভেবে না পেয়ে।

কুর্চি জানালার কাছে গিয়ে শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোর মুখে থাকায় ওর ছায়া পড়েছে মেঝেতে। দ্বিধাগ্রস্ত, ছায়াও।

কুর্চি বলল, পৃথুদা! জানেন, সব মানুষেরই না ধারণা যে, তারা সকলেই ভালবাসার মানে বোঝে। ভালোবাসার মানে কিন্তু খুব কম মানুষই বোঝে আসলে।

সায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে রাত চারিয়ে যেতে লাগল, জলের নিচে দিনের আলো যেমন করে কাঁপে তেমনি করে। বাইরেও চাঁদের আলো বনের এবং পাহাড়ের গভীরে গভীরে চুঁইয়ে যেতে লাগল আনাচে কানাচে বন্যার জলের মতন। দুজনের আর কোনো কথাও হলো না। নিজের নিজের ভাবনাতে নিজেরা বুঁদ হয়ে রইল।

পৃথুর মনে হচ্ছিল, পুরুষ ও নারী যখন নীরবে থাকে তখনই তাদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। মনের গন্ধ, ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা ফুলের গন্ধর মতো, ওড়ে শুধু তখনই।

কুর্চি এসে বসল মুখোমুখি। মুখে কথা নেই। দুজনেরই বুকের মধ্যে এত বছর যেসব কথা, উষ্ণ, তরল, প্রমত্ত হয়েছিল লাভাস্রোতের মতো, কার অভিশাপে তা যেন মুহূর্তে শীতল, প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। একদিন হয়ত ফসিলও হয়ে যাবে। কে জানে!

বাইরে গিরিশদার গাড়ির হর্ন বাজল।

চমকে উঠে কুর্চি বলল, ওকি! গাড়ির হর্ন! কে?

পৃথু অবাক হল ওর ফ্যাকাশে মুখ দেখে।

কি যে হয়েছে কুর্চির কে জানে? বলল না এখনও কিছুই।

কার গাড়ি? একটু দেখুন না পৃথুদা।

ডাকাত! তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে!

পৃথু বলল।

দরজা খুলতেই শ্রীকৃষ্ণ গাড়ি থেকে নেমে বলল, পরণাম সাহাব।

তুমি গাড়িতেই বোসো। আমি আসছি এক্ষুনি।

জী সাহাব।

ঘরে ঢুকতেই কুর্চি বলল, আপনার ড্রাইভার আমাকে নিয়ে একটু বাজারে যেতে পারবে?

কেন? বাজারে, তুমি কেন যাবে এই রাতে? কি আনতে হবে বল, আমি এনে দিচ্ছি।

তেমন কিছু নয়। সালিমের দোকান আছে না, বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে: সেখান থেকে আমার জন্যে দুটি হাতরুটি আর একটু তরকারী এনে দিত। আজ রাতে আর রাঁধতে ইচ্ছে করছে না। একার জন্যে...

যাচ্ছি আমি...

না, না, আপনি যাবেন না। ড্রাইভারকেই পাঠান। আপনি থাকুন আমার কাছে। কতদিন পরে এলেন। আবার কবে...। আপনি কাছে থাকলে আমার ভয় করে না একটুও।

তাইই? থাকব তবে। ড্রাইভারকে বলে আসি।

দাঁড়ান। পাত্র দিয়ে দিই একটা। রুটি, শালের দোনায় মুড়ে দেবে। আজকে কিন্তু আপনিই খাওয়াচ্ছেন। ডিনার অন উ্য! বলে, হাসল। করুণ হাসি।

পাত্রটা নিয়ে পৃথু শ্রীকৃষ্ণকে যা যা ভাল জিনিস পায় দোকানে সবই আনতে বলল, তবে একজনেরই মতো। বলল, দোকানের পাত্রও নিয়ে এসো, আমরা যাবার সময় ফেরত দিয়ে যাব!

গাড়িটা চলে গেল। টেইল-লাইটের আলোটা জঙ্গলের পথের ভিজে চাঁদের আলোয় লেপ্টে গিয়েই জ্যাবড়া হয়ে গেল ওয়াশের কাজের মতো। একটু পরে কুর্চিদের বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে পৃথু ভাবছিল যে, অনেকদিন আগে ওরা যখন দুজনেই ছোট্ট, তখন মাণ্ডুর ছায়াচ্ছন্ন জেহাজ-মহলের

ভিতরে এমনিই এক চাঁদের রাতে কুর্চি বলেছিল, কিশোরীর গাঢ় ভাঙা ভাঙা স্বরে, পৃথুদা ! আপনি আমাকে একা রেখে কোথাও যাবেন না, আমার ভীষণ ভয় করবে। বলেই, খুব জোরে পৃথুর হাত জড়িয়ে ধরেছিল। ওদের দুজনের পথই বেঁকে গেছে। আবার মিলেছিল রায়নাতে। অনেক আনন্দর আশ্বাস বয়ে এনেছিল সেই মিলন, কিন্তু সব যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। হয়ে যাবে। মন বলছে পৃথুর।

কুর্চি বড়ই চাপা মেয়ে। এই চাপা মেয়েদের নিয়েই বিপদ। কখন যে কী করে এরা ! এবং যখনই যা করে না কেন, কারো কাছেই জবাবদিহি করতে রাজী থাকে না এমনই জেদী ও এঁকগুয়ে।

কুর্চিকে এইভাবে ফেলে রেখে যেতে তাব মনও সরছিল না। ওকে জোর করেই নিয়ে যেতে চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু নিয়ে তুলবে কোথায় ? রুষার কাছে ? রুষা হয়ত বিষ খাইয়ে মেবেই ফেলবে। নইলে মেরীর ঘরে শোওয়াবে ওকে। ঈর্ষা মেয়েদের যত নিচ করে তোলে ততখানি নীচ বোধহয় পিশাচীরাও ইচ্ছে করলেও হতে পাবে না। সাবীর মিঞার বাড়ি নিয়ে যাবে ? সে বাড়ির অন্দরমহলের পরিবেশে থাকতে পাববে না কুর্চি। অভ্যেস নেই ঐভাবে থেকে। গিরিশদা আর ভুচু ত ব্যাচেলর। অসুবিধে আছে। দু পক্ষেবই। পামেলার কাছে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু অনেক কথা বোঝাতে হবে। দীর্ঘ কৈফিয়ৎ। হয় না। তবে কি বিজলীর কাছেই নিয়ে যাবে ? বিজলীও কি বিষ খাইয়ে মেবে ফেলবে কুর্চিকে। কে জানে ? মেয়েরা সব পাবে। ভালবেসে আর ঘৃণা করে ওরা সবই পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার নিয়ে ফিরল শ্রীকৃষ্ণ।

কুর্চি বলল, ওমাঃ। এত্ব। এত্ব কী হবে ? কে খাবে ?

কেন, তুমি।

আমি জানতাম। চিরদিনই আপনি নষ্ট করার ওস্তাদ। পয়সার যেন মা-বাবা নেই। যা খেলেন সারা জীবনে ; নষ্ট করলেন তার চেয়ে অনেকই বেশি, ফেলে, ছড়িয়ে, ছিটিয়ে।

দ্ব্যর্থক কথাটার মানে যে বুঝল না পৃথু, এমন নয়।

বলল, খাবে, কথা ঘুরিয়ে বলল, যতটুকু ভাল লাগবে খাবে, না পারলে ফেলে দেবে। আসলে, নষ্ট কিছুই হয় না কুর্চি। যে যেমন করে দেখে।

তুমি খাওয়া শুরু করো। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব।

কুর্চি উঠে প্লেট, সাইড প্লেট, কাঁটা ছুরি চামচ সব নিয়ে এল। ন্যাপকিন একটা হলদে রঙের। এক গ্লাস জল। সস্তা একটি কাচের গ্লাস। দেখল ও। রুষার ব্যড়িতে ও ফাইভ স্টার হোটেলের ক্রকাবি-কাটলারীতে ফাইভ-স্টার হোটেলের খনা খায়।

আপনি থাকবেন না আর একটু।

তুমি খাওয়া শুরু কর। তারপর যাব।

বাঃ বাঃ কী সৌভাগ্য আমার। না। শেষ করলে যাবেন। বসুন।

তারপব, বিরিয়ানী প্লেটে বাড়তে বাড়তে বলল, বুঝলেন, মনের অবস্থাটা এমন নয় যে, এমন মোগলাই খানা রসিয়ে রসিয়ে খাই ; তবু, আপনি আনালেন.. খেতেই হয় একটু।

কেন যে ভাল নয়, তা আমি জানতেও পারি না কি ?

এখনও নয়। সময়ে নিশ্চয়ই জানবেন পৃথুদা। আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা জানাব ?

কী হল ? খাও। আমি তুলে দেব ? কাবাব নাও একটা। আগে জানলে, সাবীর সাহেবের বাড়ি থেকে উমদা খনা নিয়ে আসতাম !

এই ত খাচ্ছি।

হাসতে গিয়ে মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল কুর্চির।

বলল, এইই কত্ব ভাল। জানেন, মা মারা যাবার পর এই প্রথম কেউ আমাকে আদর করে খাওয়াল। সামনে বসে সব মেয়েরাই শুধু অন্যদেরই খাওয়ায়, তারা কি খেল অথবা আদৌ খেল কী না কেউই তা দেখে না। মডার্ন পরিবারেও। আপনি কি কখনও রুষাবউদি কি খান, তা দেখেছেন ?

খাইয়েছেন তাঁকে এমন করে একদিনও ?

পৃথু সত্যি কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। রুষা ত রোজই আগে খেয়ে নেয়। পৃথুর খাবার হট্-কেসে থাকে। অথবা দেরী হলে, থাকেই না। কিন্তু বলে কি লাভ ? রুষা ছোট হয়ে যাবে কুর্চির চোখে। তার বউ ত ! কাউকেই ছোট করতে নেই। যে যার কপাল নিয়ে আসে এ পৃথিবীতে। অভিযোগ অনুযোগ এসব চলে একমাত্র নিজের মা আর সৃষ্টিকর্তারই কাছে। অন্যর কাছে তা জানাতে গেলে নিজেকেই ছোট করা হয়। কী দরকার !

মুখে বলল, না। তুমি ঠিকই বলেছ। খাওয়াইনি রুষাকে কখনও।

খুবই খারাপ আপনি।

জানি আমি।

আরও একটু বিরিয়ানী নাও। পৃথু বলল, মুখ দেখে মনে হল কুর্চির যেন খুবই খিদে পেয়েছে। দুপুরে বোধহয় খায়নি কিছুই।

এই ত নিচ্ছি।

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল পৃথুর। কী হয়েছে কুর্চির কে জানে ?

বলল, একদিন তোমাকে নিজে রান্না করে খাওয়াব আমি। নিজে হাতে তোমাকে চান করাবো, সাজিয়ে দেব আমার পছন্দমত, তারপর খাওয়াব। কেমন ? দেবে ত একদিন ?

মুখ তুলে কুর্চি বলল, ঠিক দেব। দেখবেন একদিন ? কেন ? সবদিনই দেব। সময় হলেই···

তোমার জন্যে আমি কি কিছুই করতে পারি না ? কুর্চি ?

ওমাঃ। কী করবেন আর ?

তোমাকে এমন একা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না। পারি না আমি।

একটু জল খেয়ে কুর্চি বলল, আহা ! পারেন আবার না ! সবই পারেন। আপনারা সব পারেন !

জল খেয়েই বলল, অ্যাই পৃথুদা ! শুনুন ! একটু আমার কাছে আসুন।

আমি খাবো না।

আহা ! আসুনই না কাছে একটু।

পৃথু কাছে গেল কুর্চির। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে।

মুখটা নামান একটু। আরো নামান। আমার মুখের কাছে। কি হল ? না নামালে খাব না কিছুই কিন্তু। বলেই, মুখ নামাল পৃথু কুর্চির মুখের কাছে। এঁটো মুখেই পৃথুর গালে একটি চকিত চুমু দিল কুর্চি। 'চুঃ' করে শব্দ হল :

দিয়েই বলল, এ মাঃ। কী করলাম ! এঁটো । আমি এঁটো করে দিলাম যে আপনাকে।

এঁটো কে নয় ? মুখে বলল পৃথু।

মনে বলল, সবাই এঁটো কুর্চি। পঁচিশ বছরের বেশি সব নারী ও পুরুষই এঁটো। অনেকে তার আগেই।

পকেট থেকে রুমাল বের করে গাল মুছল পৃথু। ঐ একটু চুমুতেই ওর মস্তিষ্কে রক্ত ছুটোছুটি করতে লাগল। হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল কাঁকড়াগুলো। এই শরীর এক আশ্চর্য ল্যাবরেটরী। কত কীইই যে ঘটে যায় এক লহমায় ! কী জীবন্ত এই শরীর। অথচ তাকে অনাদরে অবহেলায় পঙ্গু করে রাখে দিনের পর দিন, বছরের পব বছর। শরীরও ত চায় কিছু ! বেচারী। বেচারী। বেচারী। আনন্দভাণ্ডার তালাবন্ধই থাকে সবসময়। পুজো পার্বণে তালা খোলা তার। মরচে পড়ে গেল।

তুমি বললে না কিন্তু আমাকে, কিছু করতে পারি কী না তোমার জন্যে।

খেতে খেতে দুদিকে মাথা নাড়িয়ে কুর্চি বলল, কিছু না। বলেছিই ত।

এবারে তাহলে যাব। খাওয়া হলেই তোমার।

পৃথু বলল।

খাওয়া হয়ে গেছে। এক সেকেণ্ড দাঁড়ান। মুখ ধুয়ে আসি দৌড়ে।

কুর্চি চলে যেতেই পৃথু ওর পার্সটা খুলে দেখল। দুশো দশ টাকা আছে সবসুদ্ধ। খাওয়ার দাম

দেওয়ার পর। একশ টাকার নোট দুটো কুর্চির খাওযাব প্লেটের নিচে রেখে দিল এমন করে যাতে প্লেটটি তুললেই চোখে পড়ে। কুর্চির হাতে একেবারেই টাকা নেই। খাওয়ার টাকাও নেই। পৃথুর মন বলছে।

কুর্চি ফিরে এল। তারপর বাইরে দবজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুবে দাঁড়িয়ে দরজাতে পিঠ দিয়ে বলল, যদি না যেতে দিই ?

ভালই ত ! থাকব তাহলে।

না ! এমন বিচ্ছিরি করে বাখব না আপনাকে ! যেদিন সত্যিই আটকে রাখতে পাবব, সেদিন হয়ত সময হবে না আপনাব আসবাব। আমি খুব অপ্টিমিস্ট পৃথুদা। দেখবেন একদিন ·· কী কবি আমি আপনাকে··· কী দিই·· কেমন বাঁদীব মতো খিদমদ্‌গাবী কবি আমাব শাহেনশাহকে। দেখবেন।

দরজা খোলো।

বাঃ খুব ত চলে যাচ্ছেন। যাবাব সময় আমাকে একটু আদব কবে দেবেন না ? আমি যে আদব কবলাম আপনাকে। ভীষণই খাবাপ ত আপনি। কোনো ম্যানার্স নেই ! রুষাদি বকে না আপনাকে ?

পৃথু মাথা নামিয়ে এনে মুখ রাখল। স্বপ্ন খুব সহজ, বাস্তব বড কঠিন। আজও দেখা হল না। পরশের আভাস পেল শুধু। মুখ নামাতেই যুবনাশ্বব কবিতা চিড়িক চিডিক কবে চমকাতে লাগল মাথায়।

সুগন্ধে নিঃশ্বাস বুঁজে এল পৃথুব। যেন পথ ভুলেছে কনকচাঁপাব বনে। প্রায, ঠিক সেই সময, কুর্চিব যোগ্য হয়ে, কুর্চিরই মতো উচ্চতায় নিজেকে তুলে এনে. মাথা উঁচু বুক টানটান কবে দাঁডিযে পড়ে পৃথু বলল, যাচ্ছি এবাবে। ওব মনে হল শবীবের দাপাদাপিতে যে আনন্দ তাব চেয়ে এই ঋজু, বিমুখ হয়ে দাঁডিয়ে থাকাব আনন্দটা বেশি গভীব।

যাওয়া নেই, আসুন।

কিছুই যখন চাইবাব নেই আমাব কাছে, তখন চলি··

আছে। আছে। আমাকে··আপনি··

তোমাকে, কি কুর্চি ?

উৎসুক, উদ্বিগ্ন হয়ে শুধোল পৃথু।

আমাকে খুউব ভালবাসবেন পৃথুদা। কি ? বাসবেন ত ? সবসময ? প্রমিস্‌ ?

বলেই, মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে

বাসব।

সবসময় ?

সবসময়।

প্রমিস ?

প্রমিস।

বলেই, পৃথু দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

যাওয়াটা সোজা, চলে আসাটা বড় কঠিন।

দরজায় দাঁড়িয়ে রইল কুর্চি। একটু পব বাইরেব চাঁদেব আলোব মধ্যে এসে ওকে আর স্পষ্ট দেখা গেল না। ঝাপসা হয়ে গেল কুর্চি। ঝাপসা হয়ে গেল পৃথুর চোখ।

গাড়িতে গিয়ে বসতেই শ্রীকৃষ্ণ একটি বোতল দিল এগিয়ে। বলল, ভুচুবাবুনে ভেজিন।

হাতে নিয়ে দেখল পিটাব-স্কটের বোতল একটা। জল মিশিয়ে মাপ মতো পাঠিয়েছে ভুচু। শীতেব রাতে পাহাড় জঙ্গলে এতখানি পথ আসতে হবে।

ছেলেটা বড় ভাল।

কিন্তু বোতলটা ফেরত দিল পৃথু। শ্রীকৃষ্ণকে বলল, ভুচুবাবুকো ওয়াপস্ দে দেনা।

আসলে, ওর ঠোঁটে কুর্চিব স্তনসন্ধির উষ্ণতা আর সুগন্ধ মাখামাখি হয়ে ছিল। এখন মুখে অমৃত

দিয়েও তা নষ্ট করতে রাজী নয়। যতক্ষণ থাকে গন্ধটুকু। গন্ধটুকু ভরে দিয়েছে ওকে এক গভীর বোধে। এ সুখ নয়, দুঃখও নয়, এ কামনা নয়, হতাশা নয়, এমনকি তৃপ্তিও নয়। কে জানে ? একেই কি ভালবাসা বলে ?

কাঁচটা নামিয়ে দিয়েছিল। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে চোখে মুখে। লাগুক। আজকেও সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তুমি তোমাকে পেতে দিলে না আমাকে। ভালোবাসো আমাকে ? ছাই !

ঝাপ্‌সা চোখে বলল পৃথু নিরুচ্চারে। বড় রাগ হতে থাকল কুর্চির উপর। রাগটা যখন অসহ্য হল তখন বলল, শ্রীকৃষ্ণ, বুতল্‌ঠো লাও।

বড় একটা ঢোঁক গিলল পৃথু। মুখ বিকৃত হয়ে গেল। বড্ড কড়া করে মিলোয় ভুচু। পৃথুর বয়স হচ্ছে না বুঝি ? সে কথা ভুচু বুঝতে চায় না।

"অ্যায় হুসন !

জী খোল্‌কর আজ সঁতালে মুঝকো,

কাল মেরা ইশ্‌ককা আন্দাজ বদল যায়ে গা।"

মানেটা যেন কি ? হ্যাঁ হ্যাঁ মানেটা ?

আরও এক ঢোক খেল পৃথু। বুক জ্বলতে লাগল এবারে।

মানেটা হল,"ওহে সুন্দরী, তোমার হৃদয়ের সব সাধ মিটিয়ে আজ কষ্ট দিয়ে নাও আমাকে, তোমার যা খুশি তাইই কর আমাকে নিয়ে। আজই করো। হ্যাঁ। আজ। আজ। আজই। কেন না, আগামীকাল আমার প্রেমের পাত্রী অন্য কেউও হয়ে যেতে পারে।"

ওয়াহ ! ওয়াহ ! নিজেই বলল না-বলে।

কুর্চি। হুসন্। সুন্দরী কুর্চি তুমি সবই জানো। জানো না শুধু এই কথাটাই। আমার শরীরে যে নমকহারাম, সুরতহারাম, বদ্ পুরুষের রক্ত বইছে। কালকের কথা নারীদের পক্ষেই বলা সম্ভব। পুরুষ আজকের জীব। কোনো পুরুষের কাছেই আগামীকালের ভরসা বা প্রত্যাশা রেখো না।

আজ বিজলীর কাছে যাবে কী ? যাঃ। কার সঙ্গে কার তুলনা ! রুষার কাছে ? দূস্‌স্, ডীপ-ফ্রিজে রাখা নিখুঁত নির্লোম নিরাবরণ স্বাদহীন ব্রয়লার চিকেন। রক্তমাংসের হৃদয়ের নারী চাই। কী আবদার ! নারী রক্তমাংসের হয়। হৃদয়েরও হয়। দুইয়েরই হয় না। কুর্চি হবে ভেবেছিল। ভে—বে—ছি—ল।

নাঃ নাঃ। স্বপ্নই দেখবে। স্বপ্ন দেখতে বিছানা লাগে না, দরজা বন্ধ করতে হয় না, ভাঁটুর কাছে ধরা পড়ার ভয় নেই, এমনকি কুর্চিকেও প্রয়োজন নেই। মেঘের বিছানায়, চাঁদের আলোয়, রাত ভর কুর্চিকে আদর করবে আজ পৃথু। তারারা বাসর জাগবে।

কুর্চি। শুনে রাখো।

জী খোলকর, আজ সাঁতালে মুঝকো। অ্যায় হুসন্ !

কিঁউ ? কেন জিগগেস করছ তুমি ?

কাল মেরা ইস্ককা আন্দাজ বদল যায়েগা।

কাল যে আমার প্রেমের প্রকৃতি, আমার ভালোবাসার জনই বদলে যাবে। আমি যে চিরদিনের অস্থিরমতি পুরুষ। বেদুইনের রক্ত আমার শরীরে।



কিছু লোককে আগামী শুক্রবার রাতে খেতে বলব ভাবছি। বুঝেছো ?

রুষা বলল।

গেস্ট-লিস্টটাও ফাইন্যাল করছি। সব সুদ্ধ তিবিশজন মতো হবে। চোদ্দটি কাপল্‌স। একজন ব্যাচেলব, একজন স্পিনস্টাব।

পৃথুব মনটা ভাল ছিল না। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, শুক্রবার ? শুক্রবার কি ? আমাদের বিয়ের তারিখ নাকি ?

পৃথু প্রশ্ন কবল।

পৃথুর ঘবে লেখাব টেবিলে, সামনে প্যাড বেখে বসেছিল রুষা। ভুরু তুলে, পেনসিলটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে, তির্যক চোখে পৃথুর দিকে চেয়ে বলল, না। আমাদেব ইমপসিবল্ বিয়েটা, পসিব্‌লি হয়েছিল মার্চ মাসেব চার তাবিখে।

মার্চ মাসে ? ত' গতবছর কবলে না অ্যানিভার্সাবী ?

অ্যাকসিডেন্টেব অ্যানিভাসারী করে না কেউই।

তা ঠিক। পৃথু বলল।

আমাদেব ত বিয়ে হয়নি।

বল কি ?

বিয়ে যাকে বলে তা হয়নি। বিয়ে ব্যাপারটা একটা টোটাল ইনভলভমেন্ট্-এব ব্যাপার। গভীব ব্যাপাব। তোমাব বোঝাবুঝির বাইবে।

পৃথু বলল, বুঝব না কেন ? বিয়ে মানে একটা টাই-আপ্। ইডিয়টিক বন্ধন, ঝুড়ি বোঝাই মিথ্যে কথা। তোমাব জীবন আমাব হোক আমার জীবন তোমার হোক, আমাদের মিলিত জীবন ঈশ্বরেব হোক। অর্থাৎ, বুলশীট্। বিয়ে মানে, কতগুলো মস্তিষ্কহীন, মেকানিকাল, মান্‌ডেন্, বেজ, নেইভ, অন্ধ মানুষেব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আমেবিকা-রাশিযার ডিস্-আর্মামেন্ট্ সামিট্-এবই মতো ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা।

পবাকাষ্ঠা মানে কি ? এত কঠিন কঠিন বাংলা আমি বুঝি না।

যে-বাঙালী নিজের মাতৃভাষা জানে না ভাল করে, তাকে ধিক্।

কী করব ? খেতে বলব ত ? বলো ?

হঠাৎ ? আমাকে এ প্রশ্ন ? আমি কে ? কখনও ত আগে.....

তোমার কোন বন্ধুবান্ধবকে বলবে না ?

আমার যারা বন্ধু তারা কি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য ?

তা ঠিক, তবে সবাইকে বোলো না। জুতোর দোকানী-ফোকানীকে ত আর বলা যায় না, মোটব মেকানিককেও বলা যায় না, ক্রীম অফ দ্যা টাউনকে বলছি আমি ; তার চেয়ে শুধু গিরিশদাকেই বলে দাও। মার্জিনালী প্রেজেন্টেবল্। যদিও ভীষণ বোকা বোকা।

না। বললে সকলকেই বলব, নইলে কাউকেই না। কবে আর বলেছি কাকে ? ওদেব বাদই দাও।

কাকে কাকে বলতে চাও তুমি ?

রুষা বলল । বললে, লাড্ডু, ভুচু, [illegible] বাইগা, সাবীর মিঞা, শামীম মিঞা, দিগা পাঁড়ে । দিগার সঙ্গে আবার এক তান্ত্রিক জুটেছে এসে । বাঙালী । [illegible]যনগর মজিলপুরের । সকলকেই বলতে হয় ।

তান্ত্রিক ? ম্যাগো । ওরা ত আসলে সম্মোহন-টম্মোহন জানে ।

জানেই ত । তা ছাড়া সেদিন যোনিতন্ত্রম-এর দ্বিতীয় পটল থেকে একখানি যা শ্লোক ঝেড়েছিল তা শুনে ত আমারই পটল তোলার জোগাড় ।

যোনিতন্ত্রম ? সেটা কি ? না না ওসব নোংরা, ভালগার লোককে কোনো রেসপেকটেবল লোকের বাড়িতে ডাকা যায় ? তান্ত্রিকদের দেখলেই আমার গা গোলায় ।

খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ কিন্তু । মনের দরজাটা সব সময় বন্ধ করে রাখলে তাতে আলো-হাওয়া ঢুকবে কি করে ? মিশতে হয় সকলের সঙ্গেই ।

তোমার মত নিয়ে তুমি থাকো । নাও আমার লিস্ট্ হয়ে গেছে ।

আমি কী করব নিয়ে ? কাউকেই বলব না আমি ।

সেদিন বাড়িতে থাকবে ত অন্তত ?

এত আগে তাও বলতে পারি না । যা ভাল না-লাগে, তা আমি করি না । সেদিন ভাল লাগবে বা না লাগবে এত আগে থেকে কি করে বলব ? সম্ভব নয় বলা । কিন্তু তোমার পার্টির অকেশনটা কি ?

ইদুরের বার্থডে ।

ইঁদুরদেরও বার্থডে হয় বুঝি ? ভাবল, পৃথু ।

সকলকেই বলতে পারো তুমি, এক কুর্চি ছাড়া । আই হেইট্ দ্যাট কমোনার অ্যাম্বিশাস্ স্টুপিড গার্ল ।

রুষা বলল ।

অ্যাম্বিশান সব মানুষেরই থাকতে পারে । সেটা দোষের নয় । থাকেও ।

কেন ? তোমার ত নেই ? তোমার জীবনে কি আছে ? বড় হবার ইচ্ছা ? ফুঃ । না একটা বাড়ি করলে, না করলে পার্সোনাল গাড়ি, কী করলে কি তুমি জীবনে ? না বানিয়ে দিলে আমাকে ভাল কোনো গয়না । মেয়েটার বিয়ের সময় যে কী করব । তুমি ত টোটালী অ্যাম্বিশানলেস্ । বড় হবার কোন ইচ্ছেই নেই তোমার ।

নাঃ । তা না । আমারও আছে অ্যাম্বিশান্ । তবে সেটা টাকা, বাড়ি, গাড়ি নয়; গয়না নয়, বৌ-মেয়ের । তাছাড়া তোমরা যাকে বড় হওয়া বল, সেই বড় হওয়া আর আমার বড় হওয়াতে তফাৎ আছে ।

বাজে কথা রাখো । সংসারে অচল, অপদার্থ তুমি । তুমি একটি ভূতনাথ । বাউণ্ডুলে ।

বলেই রুষা উঠল ।

বলল, আসছি এখুনি ঘুরে । অনেক ন্যাকামি হয়েছে । কুর্চিরা ছাড়া আর কাদের বলতে চাও তার লিস্ট করে ফেলো । ইঁদুরের বার্থডের কথা ত আর বলছি না কাউকে । ডাকছি, এই-ই···· । মণি চাকলাদারকেও বলছি । স্পার্কলিং কনভার্সেসানালিস্ট ।

রুষা চলে গেল ঘর থেকে ।

কী বলে গেল রুষা ? ভূতনাথ ? বাঃ । ও না জেনে ঠিকই বলেছে । একেবারে পারফেক্ট অ্যানালিসিস ।

"তুমি কী করছ ভূতনাথ ? লিখছ টিখছ ?

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই শুভাশিস, আমি গাড়ি কিনতে পারিনি, না করেছি বাড়ি

জননেতা কোন্ দূর, জনতার দৈত্যের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছি

কলকাতা থেকে কিছু দূরে আধা পাড়াগাঁয়ে, রাত ভোর হলে কলাগাছের পাতায় শিশির ঝরা দেখি, ওতেই শিহরণ খেলে যায় ।

সেই কবে এক রুগণ কবিতার নারীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে অবধি খরচের আর শেষ নেই, রাত্রে গিয়ে ঠায় বসে থাকি তাবার বাগানে ।

গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠলে বুকের মধ্যে হই হই করে শুনি ভাস্কোদাগামার পালতোলা জাহাজের কামানগর্জন। বিদ্যুৎ চমকালে দেখি শেক্সপীয়রের নাটকের বীভৎস বুড়ি ডাইনিদের চুল ছেঁড়াছিঁড়ি। লম্বা লম্বা নখের বাহার। ঘরে বসে জানি না ... কেন দেখি ... একদিন মাঘী পূর্ণিমায় দেখি সাদা ফেনায়িত প্রকাণ্ড আকাশ ছাপা রাজহাঁস। ... টলটলে সোনার ডিম।

শুভাশিস, গাড়ি কিনতে পারনি, করতে পারিনি বাড়ি, জননেতা হওয়া অসম্ভব। শুধু ছোট ছোট কল্পনার লাল ইঁট গাঁথি।

আর চুরমার কবি, কিছুই হওয়া হয়নি। ট্রেনে করে আসি আর যাই।

রুগণ কবিতার-নারীর চিকিৎসায় আমি ফতুর হয়ে গেলাম। হয়তো জীবনই চলে যাবে

তোমরা বেশ আছ। শুভাশিস, সুনন্দ, আশুতোষ আমি এই।"

আমি এই। সুনীল বসুর কবিতা। এই কবিকে কখনও দেখেনি পৃথু। এদিকেও আসেননি কখনও। ছবিও দেখেনি কোথাওই। পৃথুর মনে হয়, ইনি একজন বড় মাপের কবি। জাত-কবি।

ডিসেম্বরের শেষ এসে গেল। কুর্চির সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হলো না। কখন বসন্ত গেল এবার হলো না গান। পরশু বড়দিন। ভুটু নেমন্তন্ন করেছে কাল সকলকে তার বাড়িতে বড়দিনের খানায়। রাতে।

কুর্চির বাড়িতে ওকে ঐ রহস্যজনক একাকিত্বর মধ্যে ফেলে রেখে আসার পর নিজে যেতে পারেনি নানা ঝামেলায়। কিন্তু ঠুঠাকে পাঠিয়েছিল। ঠুঠা এসে যা বলেছে তাতে মন ভেঙে গেছে পৃথুর। রায়নার বাজারের সকলেই নাকি জানে যে গাঁজা ও আফিং-এর চোরাচালানের ব্যবসাতে জড়িয়ে পড়েছিল ভুটু কয়েক মাস হল। নিজের একটি দলও গড়ে তুলেছিল

যেদিন পৃথু গিয়ে হাজির হয় কুর্চির বাড়িতে না জেনে শুনে, তার দুদিন আগে ... অ্যারেস্ট করে পুলিস রায়পুরে নিয়ে গেছিল জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে। কেউ বলছে, রায়পুরে, কেউ বলছে জবলপুরে, কেউ বা বলছে ভোপালে। দাঈ চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছিল তার পরদিন কোনো ব্যক্তিগত কারণে।

কুর্চি সেদিন মিথ্যা কথা বলেছিল পৃথুকে।

কুর্চি নিজেও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে ঠুঠা যেদিন গেছিল তার আগের দিনই। লোকে বলছে, শুধু ছোট্ট একটি স্যুটকেস এবং কম্বল দিয়ে জড়ানো একটি বালিশ সঙ্গে নিয়ে তাকে বাসে উঠতে দেখেছে অনেকেই। মালাঞ্জখণ্ড-এর বাসে। পৃথু যেদিন রায়নাতে গেছিল সেদিনের আগের দিন কুর্চি নাকি নিজে হেঁটে বাজারে এসে খাবারের দোকান থেকে খাবার কিনে দোকানে বসেই খেয়েছে। হাতরুটি আর আলুর তরকারি। ছোট্ট জায়গা। বাঙালিবাবুর বউরা এরকম বে-আব্রু হয়ে বাজারের দোকানে রুটি তরকারি খেতে আসে না কখনও। এ নিয়ে কথা চালাচালি এবং হাসাহাসিও হয়েছে মুনাব্বর বলে একটি পানের দোকানদার নাকি কুর্চিকে কী সব খারাপ কথাও বলেছে। ঠুঠা বাইগা নিজেও নিজের কানে মুনাব্বরের দোকানে-বসা ইয়ারদের কাছ থেকে শুনে এসেছে তা। মুনাব্বর নাকি কুর্চিকে বলেছিল রোজ রুটি তরকারি খাওয়াবে, বদলে কুর্চি যদি কুর্চিকে খেতে দেয়। মুনাব্বরকে।

ঠুঠা বলেছিল, তক্ষুনি আমি ওর দাঁত উপড়ে নিয়ে আসতাম জানো, কিন্তু মেয়েছেলের ইজ্জৎ হচ্ছে খুব ভাল জাতের আমেরই মতো নাজুক। বড় সাবধানে নাড়তে চাড়তে হয়। জোর করে তা বাঁচাতে গেলে তাতে দাগই ধরে যায়। কলঙ্ক তাতে বাড়েই। আঙুলের সামান্য বেকায়দার ছোঁওয়াতেই কালশিরা পড়ে যায় ইজ্জতে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে ঠুঠা ওখানেই হামলা না করে ফিরে এসেছে। পৃথুকে বলেছে কি শেখাতে হবে বল? শিখিয়ে আসছি

মালাঞ্জখণ্ড-এ গেলে, কোথায় যেতে পারে কুর্চি? ভাবছিলো পৃথু। তার অবস্থাপন্ন, সুখী বিবাহিত বন্ধুর বাড়ি নিশ্চয়ই গিয়ে উঠবে না। তাকে বলবেও না যে, তার স্বামী স্মাগলার অথবা সে এখন পুলিসের হেপাজতে। কুর্চিকে যতটুকু জানে পৃথু, তাতে মনে হয় যে ও কিছুতেই সেখানে

যাবে না।

কিন্তু যাবেই বা কোথায় তাহলে ? কী করে খুঁজে পাবে পৃথু তার কুর্চিকে ? কুর্চি কি হারিয়েই গেল জীবনেরই মতো? তাহলে, কি নিয়ে আর বাঁচবে পৃথু ? জীবনে আনন্দ, সত্যিকারের গভীর আনন্দ বলতে ত কুর্চি ছাড়া আর কেউই নেই·; কিছুই নেই।

অনেক ভেবেটেবে শেষে বুদ্ধি খাটিয়ে কুর্চির বন্ধু রিমার স্বামী মহেন্দ্রর কাছে একজন লোকও পাঠিয়েছিল মালাঞ্জখণ্ড-এ পৃথু। কারখানার তার এক শিফট ইনচার্জকে একদিনের ছুটি দিয়ে এই ব্যক্তিগত কাজের জন্যে পাঠিয়েছিল। জানত কাজটা অন্যায়। কিন্তু নিরুপায় হয়েই পাঠিয়েছিল। ন্যায় করতে ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু কমই করা হয়ে ওঠে। মহেন্দ্রর নামে একটি চিঠি দিয়েছিল শুধু এই কথা জানতে চেয়ে যে, ভাঁটু আর কুর্চি জবলপুর। ভোপাল ভীমবৈঠকা ইত্যাদি জায়গায় ইতিমধ্যেই চলে গেছে কী না ! মিথ্যে কথা লিখেছিল, লিখেছিল যে, পৃথু ভোপালে এসেছে কাজে তাই-ই খবরটা জানতে পারলে, ভোপালেই দু একদিন বেশি থেকে যাবে। কুর্চিরা কোথায় উঠবে তা ওরা পৃথুকে আগেই জানিয়েছিল।

উত্তরে মহেন্দ্র সংক্ষিপ্ত চিঠি দিয়েছিল। শিফট-ইনচার্জ-এর হাতে। ডিয়ার পিরথুদাদা,

উই হ্যাভ নো ইনফরমেশান অ্যাবাউট দেম। হ্যাভনট সীন দেম সিন্স এইজেস। তারপব লিখেছিল,

ইটস স্ট্রিক্টলী ফব ইওর কনফিডেন্স :আ স্ট্রং রিউমার ইজ আফ্‌ট হিয়ার দ্যাট ভাঁটু অ্যান্ড হিজ অ্যাকমপ্লিসেস হ্যাভ বীন অ্যারেস্টেড ফর স্মাগলিং। সাম ওয়্যার অ্যারেস্টেড ফ্রম হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। ইটস আ শেম্। অ্যাণ্ড সো ফার রিমা অ্যাণ্ড মাইসেলফ আর কনসার্নড, উই নো-লঙ্গার কনসিডার দ্যা-কাপল অ্যাজ ফ্রেণ্ডস। আফটার ওল, উই আব রেসপেকটেবল পীপল। রিমা ইজ ভেরী স্যাড ফর কুর্চি, নো ডাউট, বাট সার্টেন ডিসিসানস্ হ্যাভ টু বী টেকন ইন লাইফ, হুইচ আর আন্-অ্যাভয়েডেবল হাওয়েভার সরী ওয়ান মে ফীল টু টেক দ্যাট। উই কুডনট কেয়ার লেস।

রিগার্ডস।

সী য়ু সামটাইম। ডোণ্ট ফরগেট টু লুক আস আপ ইফ য়ু আর ইন দিস পার্ট অফ দ্যা ওয়ার্লড।

ট্রুলী ইয়োরস, মহেন্দ্র সিং।

"আফটার ওল উই আর রেসপেক্টেবেল পীপল"। কথাটা বার বারই কানে বাজছে পৃথুর সেই থেকে।

আর উই রিয়্যালী ? বার বার এই প্রশ্নটা করেছে পৃথু নিজেকে।

রেসপেকটেবলিটি একটা মীথ। ফাঁকা আওয়াজ। ভাঁটুও ত রেসপেকটেবলই ছিল, যতদিন ধরা পড়েনি। ধরা না পড়লে, তার অবস্থা দিনে দিনে রমরমে হয়ে উঠলে এই সমাজই তাকে সম্ভ্রান্ততার কনফার্মড শিরোপা দিত। ইদুরকারের মতো ইম্‌ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার শর্মার মতো; পৃথুরও মতো। পৃথু যে বাজারের বাইজীর কাছে গেছিল, রাত কাটিয়েছিল ; এ কথা জানলে এই সমাজ তাকে একঘরে করে বলবে ছিঃ ছিঃ ক্যার‍্যাকটারলেস। বলবে হী ইজ নট রেসপেকটেবল। "ক্যারেকটার" কথাটার মানে জানে কজন মানুষ ?

পৃথু ভাবে, বরং রেসপেকটেবল হচ্ছে ভুচু, দিগা পাড়ে, ঠুঠা বাইগা, রেসপেকটেবল তার কারখানাব শ্রমিক গুগ্‌গা আর তার বউ ইতোয়ারিন। রেসপেকটেবল তাদের কারখানার সামনে গত কুড়ি বছর ধরে দিনে রাতে বারো ঘণ্টা পিঠ নুইয়ে বসে কাজ করে কোনোরকমে বেঁচে থাকা অতি-সজ্জন মুচি মহেন্দর। দারিদ্র্য তার অসীম, কিন্তু সে আত্মসম্মানজ্ঞানী লোক। প্রকৃতই সম্মানের যোগ্য। সম্মানের রঙচঙে জামা চাদর চড়া হারে ভাড়া করে নিয়ে নিজেকে সাজিয়ে সম্মানিত হয়নি এসব মানুষ। রেসপেকটিবিলিটি মিথ্যে অহং। এ জাতের, এ দেশের আত্মসম্মানজ্ঞানই যদি থাকত তবে তার এমন অবস্থা হয় ?

কুর্চিকে খুঁজে বাব করতেই হবে। এবাব থেকে ঠুঠা বাইগাব সঙ্গে আর কোনো তফাৎ বোধহয় থাকবে না পৃথুর। যা হাবিয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে, সেই মূলকে, সেই গভীরকে সত্তার সেই গাঢ়

অস্তিত্বকে বুনো শুয়োরের মতোই পৃথিবীর সব মাটি উপড়ে ছিটকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুঁজে বেড়াতে হবে বাকি জীবন। ঠুঠা খুঁজছে তার অতীতকে, পৃথু খুঁজবে তার ভবিষ্যৎকে। এইটুকুই তফাৎ।

কী যে করবে পৃথু। হতভাগা কি যে করবে।

যখন ওর মনের অবস্থা এমন ঠিক সেই সময়েই অন্য আরেক বিপত্তি। কাল লালসাহেব ফোনে খবর দিয়েছেন যে, মগনলাল তার দল নিয়ে হাটচান্দ্রার কাছাকাছিই ফিরে এসেছে। রেড এলার্ট, মীর্জা গালীব। এলার্ট। চেষ্টা করতে হবে. মগনলালের দলকে এইবারে একেবারে ওয়াইপ্ আউট করে দিতে। প্রেসিডেন্টস্ মেডাল্স অপেক্ষা করবে আপনাদের জন্যে। প্রথম সিভিলিয়ানস হবেন আপনারা যারা মধ্যপ্রদেশের ডাকাতির ইতিহাসে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবেন।

ভুচু সকালে এসেছিল। সব খবর দিয়ে গেল। ও বলছিল যে, মৌলভী গিয়াসুদ্দিন ক্রীসমাস ইভ-এর জন্যে চারটে·বড় মোরগা কাল মেরে দেবেন ভুচুকে। অগ্রিম বলে গেছেন, এখানে ত টার্কি পাওয়া যায় না। সাহেবরা থাকতে ক্রীসমাসের আগে জবলপুর থেকে একজন মুসলমান পাখি-ওয়ালা নিয়ে আসত। আজকাল বড়দিনে টার্কি খাওয়ার লোকও কমে গেছে। মৌলভী বিকেল চারটে নাগাদ বেরিয়ে মোরগা মেরে মোরগা মুসল্লম বানিয়ে নিয়ে আসবেন রাত নটার মধ্যে। বুনো মোরগ মারার পর হয় বানিয়ে রাখতে হয় নয় সেদ্ধ করে নিতে হয় রান্নার আগে। ঝকমারি আছে।

ভুচুর মেকানিক এবং প্রয়োজনে তবলা-বাদক হুদা সাতসকালে গিয়ে নর্মদা থেকে ছাই-রঙা রাজহাঁস মেরে নিয়ে এসেছিল একটা। আজই। কাল তার বার-বী-কিউ-হবে। লোক কম বলেনি ভুচু। পৃথু ছাড়াও, সাবীর সাহেব, গিরিশদা, মৌলভী গিয়াসুদ্দিন, লাড্ডু আর ঠুঠা বাইগা। পামেলা এবং পামেলার মাও আসবেন। তবে ওঁরা তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। গীর্জেতে মাস্ আছে। পৃথু বলেছে, পৌঁছে দিয়ে আসবে ওঁদের জীপে করে। ভুচু আজ আসলে রুষাকে নেমন্তন্ন করতেই এসেছিল। রুষা বলেছিল তোমার দাদাই যাবে। আমার বাড়িতে ছেলে মেয়েদের বন্ধুদের বলেছি। ওরা সব আসবে মজা করবে। আমাকে বাদ দিয়ে দিন। ক্রীসমাস ট্রী সাজাতে হবে। ফাদার ক্রিসমাস। প্রেজেন্টস সব প্যাক করাতে হবে। বাড়িতে মেরী আছে। ওরও ত ক্রীসমাস।

ভুচু আর কিছু বলেনি।

রুষা ফিরে এল। বসল, পৃথুর লেখার চেয়ার টেনে। পৃথু খাটে বসেছিল, বালিশে হেলান দিয়ে।

পামেলা আর তার মাকে যখন নিয়ে যাবো ওদের চার্চে তখন মেরীকেও নিয়ে যাবো।

পৃথু বলল। মেরী খুব খুশি হবে। রুষা বলল, নিয়ে যাবে ত যেও কিন্তু ফেরার সময় ত অতখানি পথ একা আসবে মেরীকে নিয়ে। দেখো. ওর সঙ্গে ইল্-বিহেভ কোরো না আবার যেন। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তোমাকে নিয়ে কী যে চিন্তা আমার!

পৃথু কিছু না বলে তাকিয়ে ছিল রুষার দিকে। ভাবছিল, কী ভাবে রুষা ওকে? রুষার রুচি এত খারাপ হয়ে গেছে! অবশ্য, দোষও দেয় না রুষাকে, পৃথুর পক্ষে নিজেকে পাহারা দেওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

তোমার উপর যে ভরসা নেই একটুও।

তা ঠিক। পৃথু বলল, আমার নিজেরই নেই নিজের উপর ভরসা। আমার মধ্যে কতগুলো যে মানুষ বাস করে রুষা তা আমি নিজেই জানি না। কোন মানুষটা যে কোন্ সময় দখল নেবে আমার উপরে, সে সম্বন্ধেও কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই আমার। আমার কোনো টোটাল সত্তা নেই। এই-ই আমার জীবনের অনেক অভিশাপের এক অভিশাপ। আমাকে গুড, ফেয়ার বা ব্যাড কিছুই বলা যায় না কারণ আমি ব্যাডও বটে, ফেয়ারও বটে, গুডও বটে। শুধু কোন্ সময়ে যে কি সেটাই জানা নেই। অনেকগুলো আলাদা আলাদা ঘরে আমার বাস। নতুন ঘরের আলো জ্বলে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে আগের পুরোনো ঘরের আলো নিবে যায়। ওয়াটার-টাইট এয়ার-টাইট সব কম্পার্টমেণ্টস। এক ঘরের আমি অন্য ঘরের আমিকে চিনি না পর্যন্ত। আমি এক নই গো রুষা, আমি যে অনেক। আমার উপর ভরসা, ভুলেও কোরো না। আমি নিজেই করি না, আর তুমি। সব সময় চোখে চোখে রেখো

আমায়, কখন যে কী করে ধ্বংস।

কোনোদিনই করিনি। তোমার উপর ভরসা করে মরি আর কী। এ আর নতুন কথা কি! তোমার মত স্বামী নিয়ে এই আমি রুষাই ঘর করে গেলাম। নেহাৎ সেন্স অফ রেসপেক্ট আছে বলে, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতকে রেসপেকটেবিলিটি দেবার জেদ আছে বলে, কত যে দাম দিলাম, নিজের জীবনটাকে কীভাবে যে নষ্ট করলাম তা···

এটা কিন্তু ভুল। পৃথু বলল। আমার জন্যে নিজেকে নষ্ট কোরো না। করা উচিত নয়; ছেলেমেয়ের জন্যেও নষ্ট কোরো না। "রেসপেকটিবিলিটি" কোনো বাবা-মাই তাদের ছেলেমেয়েকে দিয়ে যেতে পারে না। রেসপেকটেবিলিটি পারিবারিক দোকানের সাইনবোর্ড নয়, সম্পত্তি নয়; ব্যাঙ্ক-বালান্স নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার নয় এ। ভিক্ষার ধনও নয়। প্রত্যেককেই নিজেকে নিজের যোগ্যতায়, ব্যবহারে একে অর্জন করতে হয়। যাতে তা পারে তোমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে এই ধন অর্জন করতে, এমন শিক্ষাই দিও ওদের। বাবা মা ছেলেমেয়েদের এর চেয়ে দামী সম্পত্তি আর কীই-ই বা দিতে পারেন?

আমি? আমি কেন? সবকিছুই আমি করব? ওরা কি খাবে, কি পরবে, ছুটির দিনে কি হবে ওদের রিক্রিয়েশন, ওদের ভবিষ্যৎ কি হবে সবই যদি আমি একাই করব তাহলে তুমি ওদের জন্ম দিলে কেন? হোয়াট ইজ ইওর কনট্রিব্যুশান?

আমি একটা অপদার্থ। আমি একটা বাজে লোক। আমার কথা ছাড়ো। আমাকে ছেড়ে দাও।

এখন বলছ ছেড়ে দাও। এত বছর পরে। তাহলে ছেলেমেয়েদের জন্ম দিলে কেন?

আমি? আমি ছিলাম কোথায়? তাও ত তুমিই দিলে। আমি ত উপলক্ষমাত্র। স্বপ্ন নিয়ে খেলতে চেয়েছিলাম শুধু। স্বপ্নর সুন্দর বীজ থেকে যে ওঁয়া-ওঁয়া-করা ইদুরের বাচ্চার মতো দেখতে আনরোম্যানটিক, মিনিটে মিনিটে শুশু-করা কোনো বিচ্ছিরী গন্ধ প্রাণী এসে হাজির হবে আমি কি তা ভেবেছিলাম।

ইদুরের বাচ্চা মানে? হোয়াট ডু উ্য মীন?

তুমি কানে কম শুনছ আজকাল। ইঁদুরের বাচ্চা বলেছি, ইদুরের নয়।

নাস্টি। গ্রস। তুমি একটি··

রক্ত, মাংস, প্রাণ, মৈথুন এসব ব্যাপারগুলোই আটারলী গ্রস। আমার এসব ভাল লাগে না। মেয়েরা হল বিধাতার সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি! মেয়েদের ভালবাসতে ভাল লাগে, আদর করতে, অনাবৃত করে দেখতে, পায়ের নখ থেকে কপালের সিঁথি অবধি চুমু খেতে, তাদের চোখের অতল গভীরে চেয়ে সাঁতার না জানা ডুবুরীর মতো ডুবে যেতে। তার সঙ্গে এসবের কি? বাচ্চা কাচ্চা, কান্না, কাঁথা। হাইলী আনরোম্যানটিক বিচ্ছিরি সব ব্যাপার। আমার এসব আসে না।

কত যে পাপ করেছিলাম গত জন্মে! তাই-ই ভাবি।

রুষা বলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এ জন্মেও কম করছ না।

মানে?

এমন বাজে স্বামীর সঙ্গে ঘর করছি। পাপ না এটা?

এমন স্বামী যেন শত্রুরও না হয়।

কুর্চি কি তোমার শত্রুদের মধ্যে পড়ে? আমি যদি কুর্চির স্বামী হতাম, সুখী হতে তুমি?

কুর্চি? মাই! মাই! শত্রু হতে গেলেও অন্য পক্ষের কাছাকাছি আসতে হয়। কুর্চি, ঐ ইমবেসাইল, আন-এডুকেটেড, লোয়ার মিডল-ক্লাস, সিম্পলটন্ রাস্টিক কুর্চির সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না, প্লীজ।

ঠিক আছে।

পৃথু বলল।

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট করছই বা কেন রুষা?

কিসের তোমার পিছুটান, বন্ধন ? আমি ত তোমাকে বেঁধে রাখিনি। আমার সমস্ত খারাপত্ব আমি স্বীকার করি কিন্তু এ কথা বলতে পারো না যে, আমি স্বার্থপর। সব সময় জেনো, তুমি সম্পূর্ণই মুক্ত। একটাই জীবন রুষা। কে কি বলল, কে কি মনে করল, ক্লাবের লাল-নীল হাওয়াইন-শার্ট পরা, কূপমণ্ডুক, বউ আর চাকরিসর্বস্ব বুড়ো বালখিল্যরা কি বলবে অথবা তাদের পিয়ানো-বাজানো, নেকু-পুষু-মুনু ইনসিপিড স্ত্রীরাই বা কি বলবে সেই ভয়ে তুমি তোমার জীবন নষ্ট করবে ? ওরা কারা এই ফাঁকা মানুষগুলো ? তোমার জীবনটা কি তোমার কাছে দামী নয় ? নিজেকে এমন করে ঠকিও না।

কি বলতে চাইছ তুমি ?

বলতে চাইছি যে, ভিনোদকে বিয়ে করো তুমি। ও ত খুশি হবেই, তুমিও সত্যিই খুশি হবে। জীবনের যা কিছু গেছে তা গেছেই ; বাকিটুকুকে এখনও সাল্‌ভেজ করো। নাথিং ইজ টু-উ-উ লেট। ইট্‌স্ বেটার লেট দ্যান নেভার। ইদুর তোমারই টাইপ। তোমরা সত্যিই মেড ফর ইচ আদার।

রুষা দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

বলল, আস্তে। য়্যু হ্যাভ গান আউট অফ ইওর মাইণ্ড।

পৃথু বলল, বাট হাউ বাউট য়্যু ? য়্যু আর গোয়িং আউট অফ ইওর লাইফ। জীবনটা বাঁচবার জন্যে, প্রতি মুহূর্ত পস্তাবার জন্যে নয়। তোমার জন্যে জীবনে করার মতো কিছুই ত করলাম না। একটা ভাল কাজ করতে দাও আমাকে। আমার বিয়ের এই তেতো বাঁধন থেকে তোমাকে মুক্তি দিয়ে চিরদিনের মিষ্টি প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়তে দাও তোমার সঙ্গে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার সঙ্গে ভিনোদের বিয়ে দেব। দেখো তুমি।

পৃথু আমার মন ভালো নেই, ভালো থাকে না, এমন করে আমার সঙ্গে কথা বোলো না। একদিন কারখানা থেকে বাড়ি ফিরে দেখবে যে, আমি নেই। টুসু মিলিও নেই। শূন্য বাড়ি পড়ে আছে। তোমার চাকর বাকর, আয়া ড্রাইভার, গাড়ি।

জানো রুষা তোমাকে যা বললাম, তা কিন্তু আমি বানিয়ে বলিনি। এ সবই আমার মনের কথা। আমার তোমাকে দেওয়া যে কষ্ট, সে কষ্ট আমি চোখে দেখতে পারি না। অথচ এই অদ্ভুত বাজে লোকটার এমন স্বভাব যে নিজেকে বদলাতেও পারলাম না। অথচ, সত্যি, করো না গো ভিনোদকে বিয়ে। ছেলেটা তোমাকে খুবই ভালবাসে।

রুষা চোখ তুলে, চোখ দুটি স্থির করে রাখল পৃথুর দু চোখে। অনেকক্ষণ চোখের ল্যাসার বীম দিয়ে, পৃথু কতটুকু জানে, না জানে, তা বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল। বলল, তুমি কী মীন করছ ? তুমি কি বলতে চাইছ পৃথু... ?

আমি কিছুই বলতে চাইছি না। তোমাদের মধ্যে ফীজিক্যাল কিছু ঘটেছে কী না জানি না আমি। যদি ঘটে থাকে, বলেই, হাতটা রুষার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, কনগ্রাচুলেশানস।

রুষা রেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল, হাউ ডেয়ার য়্যু ! য়্যু ডার্টি, ডার্টি...। তুমি এমন বলতে পারলে আমাকে ? ছিঃ ছিঃ। সকলেই তোমার মতো নয়, তোমার মতো গ্রস শরীর-সর্বস্ব নই আমি। ওরকম শরীর আমার নয় যে....

শরীর নিয়ে ঠাট্টা কোরো না রুষা। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। শরীরও সাপেরই মতো। অন্ধকার হয়ে গেলে যেমন জঙ্গল পাহাড়ের গ্রামের লোকে সাপের নাম মুখে উচ্চারণ করে না তেমন শরীরের নামও অন্ধকার নেমে এলে উচ্চারণ কোরো না। সাপের লেখা যেমন ; শরীরেরও তাই। কখন যে কামড়ায় কাকে তা বলা পর্যন্ত যায় না। দংশনকারী আর দংশিত দুজনেই সমান অসহায়। "একই অস্ত্রে হত হল মৃগী ও নিষাদ।" যুবনাশ্ব। মণীশ ঘটক।

তোমার কথাই বুঝি না। তুমি বড় কমপ্লিকেটেড।

রুষা বলল।

একদিন তুমি ভিনোদের চুল আচড়ে দিচ্ছিলে শেষ বিকেলে, বসার ঘরে বসে। মনে আছে ? শরতের মেঘে মেঘে রঙের খেলা চলছিল, বাইরে শিউলির গন্ধ, আমলকি গাছের পাতারা হাওয়ার

সওয়ার হয়ে ছুটে চলেছে দিগ্বিজয়ে, তার মধ্যে একজন চিরন্তন প্রেমিক আর চিরন্তন প্রেমিকা। সত্যি ! ছবিটা আমার চোখে লেগে আছে গো। লাভ অফ দ্যা পিওরেস্ট, আন্‌-অ্যাডালটারেটেড ফর্ম। প্রায় কৈশোরের নির্মল প্রেমেরই মতো! শরীরটা ইনসিডেন্টাল, প্রেমের অনেক দাবীর মধ্যে একটা ছোট্ট দাবী মাত্র। আসল ভালোবাসা ত একেই বলে। তোমার আর ভিনোদের ভালবাসা যেরকম। আহা ! আমাকে যদি কেউ অমন করে কাছে বসিয়ে আদরে চুল আঁচড়ে দিত ত সাবাজীবন তার বাঁদী হয়েই থাকতাম।

বুঝেছি, যা বোঝার। কাঁপা গলায় বলল, হতবাক হয়ে পৃথুর চোখে চেয়ে বলল।

কি ?

আসলে, তুমি আমাকে ডিভোর্স করে কুর্চিকে বিয়ে করতে চাও। তোমাকে আমি চিনিনি ? তুমি ঘোরো ডালে ডালে, আমি ঘুরি পাতায় পাতায়। যা ভাবছ, তা হচ্ছে না। আমি মরে গেলেও ফিরে এসে কুর্চির ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়ে যাব। ভ্যাম্‌পায়ারের মতো।

ঈসস-স-স···। বোলো না, বোলো না। পৃথু দু হাতেব পাতায় চোখ ঢেকে বলল।

ওব চোখে কুর্চির নরম মবালীগ্রীবাটি ভেসে উঠল। শিরদাঁড়াব হাড়টি উঠে আছে একটু। একটুও বাড়তি মেদ নেই কোথাওই। ছিঃ ছিঃ। ঐ সুন্দব ঘাড় ভেঙে কেউ রক্ত খাওয়ার কথা ভাবতে পাবে ?

তুমি আমাকে চেনোনি রুষা। কেই-ই বা কাকে চেনে বল ? এই ছোট্ট জীবনে ! চিনি চিনি বলে মনে হয়, সত্যিই চেনা কি যায় ? আমরা নিজেরাই কি চিনি নিজেদের ?

তুমি ত একটি মেগালোম্যানিয়াক্‌। সবসময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছ। আমি-ময় জগৎ তোমার। সব সময়, আমি। আমি। আর আমি।

রুষা বলল ঘৃণা এবং হতাশার গলায়।

পৃথু হাসল। বলল, সকলেই তাই। আমিত্বর প্রকাশটা একেকজনের ক্ষেত্রে একেকবকম। কিছুই ত হল না জীবনে। করবার মতো কিছুই করতে পারলাম না। যদি কবি বা লেখক হতে পারতাম, তাহলে আমাব এই দামী আমিময়তা আমার কলমে তৈরী সব চবিত্রের মধ্যে দুর্মূল্য জাফরানএব মতো একটু একটু কবে মিশিয়ে দিতাম। তারা সব অমর হয়ে থাকত আমার লেখার মধ্যে। লেখক ত থাকেন না। থাকেন না কবিও; তবে তাঁবা যদি লেখার মতো কিছু লিখে যেতে পারেন, তাহলে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন তাঁদের ধূলিমলিন প্রাত্যহিক গ্লানির জীবনের নোংরা হাতের কলম দিয়ে গড়া বিভিন্ন সব চরিত্রে। লেখক চলে যান। তাঁর চরিত্ররা থেকে যায়। আমি ত কিছুই হতে পারলাম না। আমিময়তার কথা বলছ, তুমি কি জানো না মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যব রাবণেব চরিত্রব মধ্যে মাইকেল নিজে রয়ে গেছেন।

কে মাইকেল ? আমাদের ক্লাবের চাইনীজ রুম-এর স্টুয়ার্ড ?

ছিঃ !! কী বলছ তুমি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্যা গ্রেট বেঙ্গলী···

আই অ্যাম নট দ্যা লীস্ট ইন্টারেস্টেড ইন প্রি-হিস্টরিক, ইনসিপিড বেঙ্গলী লিটারেচার।

তাহলে বলি, মাদাম বোভারীব মধ্যে ফ্লবেয়ারের, লেডি চ্যাটার্লীজ লাভারের মধ্যে লরেন্সের, রাসকলনিকভ-এর মধ্যে ডস্টভয়স্কির, ডন-জুয়ানের মধ্যে বায়রনের নিজের ছায়া কি নেই ? শেক্সপীয়রও কি উপস্থিত নন হ্যামলেট-এ ? আবার উল্টোটাও হতে পারে। কবি, সাহিত্যিক শিল্পী হলে আমিও তেমন করতে পারতাম, যেমন ভ্যান ঘঘ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনের সব অন্ধকার বিষাদকে তাঁর তুলির মাধ্যমে উজ্জ্বলতম রঙের ঋজু, দীপ্ত রেখায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যাঁরা শিল্পী, তাঁরা লেখার মধ্যে দিয়ে, ছবির মধ্যে দিয়ে নিরুচ্চারে প্রচণ্ড চিৎকৃত বিপ্লব বিদ্রোহের কথা সহজেই বলতে পারেন। নিজের নিজের ব্যক্তি জীবনকে সমাজের অসংখ্য মানুষের ব্যক্তি জীবনের উপর সুপারইমপোজ করে নিপুণতম ফোটোগ্রাফার এবং এডিটরেরই মতো দারুণ দারুণ সব কম্পোজিশান তৈরী কবতে পারেন। তাই নয় ? বলো তুমি ? জীবন, আমার জীবন, তোমার জীবন, আমাদের সকলের জীবনই ত একটি ফ্রেমের মধ্যের একটি মাত্র কম্পোজিশান। কারো ফোটো

সুন্দর; কারো অসুন্দর, কারোটা বা আউট-অফ-ফোকাস হয়ে গেছে, কারো ফোটোর ফ্রেমিংটা ভাল নয়………

আমরা সকলেই ত……………কিন্তু তুমি ? পারলে তুমি ? তোমার ফ্রেমের মধ্যে থাকতে ? একটাই যদি ফ্রেমড-জীবন হত ; তাহলে তোমাকে নিয়ে আমার এত অশান্তি হত না।

রুষা বলল, উষ্মার সঙ্গে।

পৃথু হেসে ফেলল। বলল, আমি, এই পৃথু ঘোষ যে মেনী-ডাইমেনশনাল ! স্টীল-ফোটো হয়ে যারা বাঁচে বাঁচুক। আমি ত একটামাত্র মানুষ নই ; আমি যে অনেকগুলো মানুষ। পুরো আমাকে কেউ ধরতে পারলে ত ? পারবেই না।

কুর্চি ? কুর্চিও পারবে না ?

রুষা বলল, তীক্ষ্ণ চোখে পৃথুব দিকে চেয়ে।



চিঠিটি হাতে পেয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পৃথু।

লিখেছে কুর্চি কারখানারই ঠিকানাতে। ভালই করেছে। বোয়ালমাছের যেমন কচিপোনা দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে, রুষারও কুর্চিব চিঠি দেখলেই কপাৎ করে গিলে খেতে ইচ্ছে করে ! এই চিঠিটিও খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে যদি হত, তাহলে হাবিয়ে-যাওয়া কুর্চিব খবরও তাব পেটে চলে যেত মাছেবই মতো। ছটফট করে মরত পৃথু।

উধাম সিং ডাকলেন ইনটারকম্-এ।

চিঠিটি হিপ-পকেটে গুঁজে ওঁর ঘরে গেল পৃথু। বেশ অনেকটা হাঁটতে হয় কারখানাব চত্বর থেকে অফিসে এম ডি-র ঘবে পৌঁছতে।

সিং সাহেব গম্ভীর মুখে বসেছিলেন।

গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং পৃথু। কাম্। বী সীটেড।

হোয়াট উ্যড য়্যু লাইক টু হ্যাভ ? টি আর কাফি ? দুধ মাঙ্গাউ।

পাঞ্জাবী উচ্চারণে বললেন, সজ্জন উধাম সিং।

ওরা কাবখানাতে চারটে আকাট অষ্ট্রেলিয়ান গরু ইমপোর্ট্ করেছে মাস ছয়েক হল। লাড্ডুর প্রেস্টিজ ষাঁড় তাদের চারজনকেই ইতিমধ্যেই প্রেস্টিজ দান করেছে। তাঁরা সকলেই মা হবেন, সামান্য সময়ের ব্যবধানে। তখন, দুধের বন্যা বইবে ভুবনে। এখন ক্যান্টিনের দিশি দুধ।

নো। থ্যাংকস্। বলল, পৃথু।

কি করা যায় বলো ত ? পরামর্শ করার মতো কেউই নেই আমার। এই দেখো, কেযারিনক্রস থেকে জুনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট কি লিখেছেন ?

বলেই, একটি টেলেক্স্ মেসেজ এগিয়ে দিলেন পৃথুর দিকে।

পাঠিয়েছে কে ?

হ্যারী রব্সন ! আবার কে ?

টেলেক্সটা হাতে তুলে নিল পৃথু।

ফ্রম এইচ/এইচ টু ইউ/এস্।

প্লীজ রেফার টু মাই টেলেক্স ডেটেড নাইনথ্/নো বিপ্লাই বিসিভড ফ্রম পি. জি./সীনিয়র

ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইজ হাইলী অ্যানয়েড/ ইমীডিয়েট্লী কল্ ফর অ্যান এক্সপ্লানেশান ফ্রম হিম/ উই হ্যাভ টু এণ্টার ইনটু আ ডায়ালগ্ উইথ হিম্/ নো-ওয়ান্ ইজ ইনডিস্পেনসিব্ল ইন্ ব্রাডলী গ্রুপ / আনলেস্ হী ইমপ্রুভস্ হিমসেল্ফ, হী উইল গেট দ্যা স্যাক্/সরী/ উই ক্যুডনট্ কেয়ারলেস্ / হাউ ইজ প্রীতম/প্লীজ কন্ভে মাই রিগার্ডস্ টু হার।

—রিগার্ডস্/হ্যারী/

কিসের এক্সপ্লানেশান সিং সাহাব ?

সে কি ?

আমি ত কিছু জানি না।

বল কি তুমি ! সর্দারজী চেয়ারে উঠে বসলেন সোজা হয়ে। দাড়ির যেটুকু দুদিকে বেরিয়ে ছিল তা বাঁধনীর মধ্যে গুঁজতে গুঁজতে উদ্বেগের গলায় বললেন, শর্মা দেয়নি তোমাকে ?· তুমি সেদিন আসোনি অফিসে তাই/···

শর্মা ! কোন্ শর্মা ? ইমম্যাটেরিয়াল সরী মেটেরিয়াল ম্যানেজার ?

উধাম সিং হেসে উঠলেন। তোমরা ওকে ইম্মেটেরিয়াল বল না কি ?

পৃথুও হাসল, বলল, হ্যাঁ। সকলেই।

সেকি ! সে ত মেটেরিয়ালিজম্ই এর কন্সেপ্ট্ হচ্ছে !

আমি ত এই টেলেক্সের কোনো মাথা-মুণ্ডুই বুঝতে পারলাম না।

অলবাইট্। শর্মাকে ডেকে আমি ফিগার-আউট করছি কেন সে তোমাকে এমন ইম্পর্ট্যাণ্ট টেলেক্সটি দেয়নি।

কিন্তু ছিল কি তাতে ?

সীরিয়াস সব আলেগেসানস। তুমি মনমৌজী ভাবে অফিস করো। ইচ্ছে হলে আসো, ইচ্ছে হলে আসোনা, আজে বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করো, কোম্পানীর লাঞ্চরুমে লাঞ্চ খাও না, জুতোর দোকানী, মোটর মেকানিক এদের সঙ্গেই তোমার হবনবিং, ক্লাবে যাও না একদিনও, হোল্ডিং কোম্পানীর লোকেরা এলে তাঁদের ইম্পর্ট্যান্স দাও না, খাতির করো না, সঙ্গ দাও না, তোমার সঙ্গে তোমার স্ত্রীর রিলেশান ভাল নয়, আবও নানা ব্যাপার। ইন ফ্যাক্ট এগুলো সবই চিঠিতে লিখেছিলেন। চিঠিটা আমার কাছেই আছে। বলেই, ড্রয়ার খুলে ছুঁড়ে দিলেন, এই নাও। স্ট্রিক্টলি কনফিডেনশিযাল।

তারপর বললেন, আগের টেলেক্সটা শর্ট এবং ক্রীপ্টিক ছিল। তুমি ছিলে না বলেই এবং তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়া দরকার বলেই শর্মাকে দিয়েছিলাম একটি কপি, তোমাকে দিয়ে দিতে। আশ্চর্য।

পৃথু, টেবল থেকে পেপাব-কাটারটা তুলে নিয়ে কল্পনায় ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো ডান হাত দিয়ে কাটছিলো। এটা অভদ্রতা। কারো ঘরে ঢুকে তার টেবলের কোনো জিনিষেই না বলে হাত দেওযা অভদ্রতা। কিন্তু উধাম সিং-এব সঙ্গে পৃথুব সম্পর্কটা ভদ্রতার নয়। সৌহার্দ্যের।

দুজনেই চুপচাপ। সুইস গ্রাণ্ডফাদার ক্লকটার শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। সাইরেন বাজল, লাঞ্চ ব্রেকের। হাউ বাউট হ্যাভিং লাঞ্চ হিয়ার ?

নোপ। অন্যমনস্ক হয়ে বলল, পৃথু।

কেয়ার ফব আ ড্রিঙ্ক পৃথু ? লেটস গো ট্যু দা ক্লাব। ওর উই ক্যান হ্যাভ ইট ইন্ দা লাঞ্চ রুম্।

নোঃ। থ্যাঙ্কউ্য। ডোণ্ট ফীল্ লাইক।

পৃথু বলল।

তাবপব বলল, হোয়াট আর দে আপ্ টু ?

সর্দার উধাম সিং রিভলভিং চেয়াবে এক পাক ঘুরেই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আবার বসে পড়ে বললেন, ইএ মামলা আচ্ছি তাবা নাআল সমঝ লে পীরথু। তেবে তো কোই ইত্বার নাহিন রাহ্ গিযা।

একটু থেমে গম্ভীব হযে বললেন, উ্য সী পীবথু, হ্যারী আলসো স্পোক টু মী অন দা ফোন লাস্ট

নাইট। হোয়াট টু ডু ? ম্যায় উহ্‌দে নাআল্ দো ঘণ্টে গাঁলা করদে রিহা। বা.ত হোয়াট ফর ? দ্যাট ম্যান ইজ আ রোগ্!

আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, শালারা ভাবে কি বলত ? ফিফ্‌টিওয়ান পার্সেন্ট শেয়ার আমাদের কজন কর্মচারীকে গিফ্‌ট্ করে দিয়ে/দিয়ে শেয়াব স্ক্রিপ্ট্‌গুলো তাদেরই নমিনী ছাড়া আর কাউকেই বিক্রী করব না এই স্টেটমেণ্টেও সই-করিয়ে নিয়ে আমাদের মালিক বানিয়ে দিয়ে বাঁদব নাচাচ্ছে।

শেয়ার স্ক্রিপ্ট্ ত নেই আমার কাছে।পৃথু বলল।

আমার কাছেও নেই।

দেয়ইনি আমাদের। অডিটরও বিলিতি ছাপমারা অডিটার। লালমুখোরা এখনও গায়ের গন্ধ রেখে গেছে সেখানে। যা বলছে, সাহেবরা তাইই সই। শেয়ার স্ক্রিপ্ট্ দেখার দরকার পর্যন্ত নেই। এখনও আমাদের, আমাদের লেবারারদের 'নেটিভ' ভাবে তাঁরা। তেমন হয়েছে গভর্নমেণ্ট! বগলের তলা দিয়ে হাতী চলে যায় তবু দেখে না।

পৃথু বলল, দোষ ত আমাদেরই। আমরা ফালতু কজন ইণ্ডিয়ানস্‌রাই ত আমাদের নিজেদেব সুখের জন্যে, ফাল্‌তু স্ট্যাট্‌াস-এর জন্যে এই চক্র ছিঁড়ছি না। আমবা কি কাজ জানি না ? একটা ফ্যাক্টরী ভাল করে চালাতে আমরা পারি না কি ?

পারি। কিন্তু মার্কেটিং। মার্কেটিংয়ে যে ওরা গত একশ বছর ধরে লাণ্ডানে বসেই কনট্রোল কবে আসছে। আসল বাজার ত এক্সপোর্ট।

করব না আমরা এক্সপোর্ট। ইন্‌ল্যাণ্ড মার্কেটেই সাপ্লাই দেব শুধু। ইণ্ডিয়া এখন মস্ত মার্কেট। বাজী আছেন আপনি ? ত বলুন ছেড়ে দেব এই অসম্মানের চাকরী। ভোপাল এয়ারপোর্টে গিয়ে শালাদের জন্যে মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে না আব। সাপের পাঁচ পা দেখেছে। পৃথু বলল।

এই ফোরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশান্ অ্যাক্ট হবার আগে তবু ব্যাটাদের নিজে হাতে কিছু কাজ কবতে হত, এখন ত তাও হয় না। আমাদের ওপবই ছড়ি ঘোরাচ্ছে।আণ্ডার ইনভয়েসিং করে বিস্তব টাকা চালান দিচ্ছে ইংল্যাণ্ডে। এণ্ড উই আর আ পার্টি টু ইট। আ সীক্, ডাম্ব, পার্টি। জেলে যাবার সময় জেলে যেতে হবে আমাকে পৃরথু, মাখম খাবার সময় ওরা। চলো, ছেড়ে দিই। করিই একটা কোম্পানী। ব্যাঙ্ক টাকা দেবে।

ওদের যা টাকার জোর। দেখবেন, ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে বিলেতে ঘুরিয়ে এনে, কালার টিভি ভি সি আর প্রেজেণ্ট করে আমাদের লোনটা আটকে দেবে। দেশটা ত হাভাতেতে ভর্তি। ফোরেনে বেড়াতে পেলে আর ফোরেন গুডস্ পেলে নিজের মেয়েকেও তুলে দেবে হাতে। এই কথা ভাবলেই মন ভেঙ্গে যায় যে, এতবছর হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হল, এতদিনেও আমাদের একটা ন্যাশানাল প্রাইড, ন্যাশানাল এন্‌টিটি হলো না। দেশেব সঙ্গে এখনও আমরা নিজেদের আইডেনটিফাই করতে পারি না। ভাল বুদ্ধি নেই ত' খারাপ বুদ্ধি ত অনেকই আছে।

তা বটে।

তাছাড়া, আপনারা করলে, আমি সঙ্গে থাকব। ব্যসস্ এটুকুই। আমার আর কাজ কবতে ভালই লাগে না। সত্যিই আমি মনমৌজী লোক।

এটা ভাল নয়। তুমি ত কিছু করলেও না জীবনে। তোমার ক্রিয়েটিভ ফীল্ডেও ত তুমি একজন ওয়েস্টার। যদি এসে বলতে আমাকে কোনোদিন : 'আঁসী ইয়ে কিতাঁব লিখি হাই' কত না খুশি হতাম আমি। কিছুই করলে না। ব্রিলিয়াণ্ট এঞ্জিনীয়র, কাজে মন দিলে এই ইণ্ডাসট্রীতে তুমি রেভলুশান আনতে পারতে। বিয়ে করেছ, এমন সুন্দরী অ্যাকমপ্লিশড্ বউ তোমার, ফুটফুটে দুটি ছেলেমেয়ে। তোমার দায়িত্ব—কর্তব্যও কি কিছু নেই ? তুমি এমন কেন হয়ে গেলে বলো ত পৃথু ! তোমাকে দেখলে আমার সত্যিই কষ্ট হয়।

আমারও হয়।

বলে, পৃথু উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

ভাবল, উধাম সিংকে বলে লাভ নেই যে,টাকা রোজগার বা শেল্যাকের কারখানা ছাড়াও আরও করার অনেকই কিছু থাকতে পারে একজন মানুষের জীবনে। নিজেব কোনো কাজই হলো না। কিছুই হলো না. জীবনের বেলা পড়ে এল অথচ।

মুখে বলল, আপনি ক্লাবে যান সিংসাব। আর হ্যারীকে বলে দিন যে, আই ক্যাড্ নট কেয়াবলেস্। চাকরী,ওরা চাইলে;আমি ছেড়ে দেব। ফরেস্ট-ফামিং করব না হয়। খাটনী নেই। ডাকালিপটাস লাগাব, পেপাব মিলে সাপ্লাই দেব। কিন্তু এই কোম্পানী ছাড়বার আগে আই ওয়াণ্ট টু টক টু হিম। এখনও অনেক ইনইকুয়ালিটিজ বয়েছে বিভিন্ন স্তরে। সেগুলো ঠিক করে দিয়ে তবে আমি যাব। নইলে তাদের সিংহাসন নিয়েই নামব নিচে। আই উইল গিভ হিম্ আ বিট অফ মাই মাইণ্ড। হি উইল নো! ফেবা কোম্পানীর কায়দা আমি সব চট্‌কে দিয়ে যাব। এমনই চটকাব যে, দেশের অন্য সব ফেরা কোম্পানী নিয়েই গভর্নমেণ্টকে নতুন করে ভাবতে হবে।

তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড় সহজে। এতে প্রেসার বাড়ে, হার্ট অ্যাটাক হতে পাবে।

সহজে হই না। এই উত্তেজনা, হ্যারী, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ম্যাকাইভর এবং আপনার ইমমেটেবিযাল ম্যানেজাব গত পাঁচ বছর ধবেই গড়ে তুলেছে আমার মধ্যে। একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়া দরকাব এবাব। দে কাণ্ট ব্রাও-বীট মী। কল্ দেম হিয়ার। আপনি ওদের বলুন যে, আমি সাইকোলজিকাল কেস হয়ে গেছি। আপনি আমাকে ট্যাকল্ কবতে পারছেন না। ওদেব কারো অবিলম্বে আসা দরকাব।

সত্যিই তুমি তাইই হয়ে গেছ পৃথু। এমন ভাল ছেলে ছিলে তুমি। সত্যিই কেমন ক্ষ্যাপাটে হয়ে গেছ আজকাল। তোমাকে সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে নিয়ে যাব আমি।

চলি। আমি এবাবে। টেলেক্সটা পাঠিয়ে দেবেন।

বলে, উধাম সিং এর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল পৃথু। বাইরে তখন দারুণ বোদ। বোদে হেঁটে ও কাবখানার গেট অবধি এসে একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে ভুচুব গারাজের দিকে চলল।

মনে মনে বলল, সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে যেতে হলে তার চেনা – জানা সকলকেই সঙ্গে কবে নিয়ে যেতে হয়। এক অদ্ভুত অসুস্থ সময়ে বাস করছি আমরা। ভুগছি দূষিত, বক্র, এমনকি বিকৃত মানসিকতাতে। শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা সত্যি।

ভুচুর গারাজে এখন খুবই কাজেব ভীড়। ভুচু ক্রীসমাস্ প্রেজেন্ট দেয় কাবখানাব সব ছেলেদের। বিল আদায় করতেও দৌড়োদোড়ি করছে সকলে। ভুচু ছিলো না পকেট থেকে টাকা বের করে হুদাকে বলল, একটা ব্ল্যাকলেবেল বীয়ার আর দুটো মাটন বোল নিয়ে আসতে।

হুদা টাকা নিলো না কিছুতেই। বলল, ভুচুদা জানতে পেলে মারবে আমাকে।

যাবার সময় বলল, পানও আনব ত? আপনার পান? পৃথুদা?

মাথা নুইয়ে হাসল পৃথু। নিজের শাশুড়ী নেই পৃথুর। থাকলেও ঠিক এতখানি আদব করতেন কী না সন্দেহ। আদব যত্ন, ভালোবাসার ব্যাপারটাই বড় গোলমেলে। কোথায় যে কার জন্যে আদবের ভাত বাড়া থাকে, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, তা অলক্ষ্যে থেকে সব যিনি দেখেন, তিনিই একমাত্র জানেন। যেখান থেকে পাওয়ার ছিল, সেখান থেকে শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হয় আর যেখানে প্রত্যাশার কিছুমাত্রও ছিলো না সেখান থেকেই পূর্ণ হয়ে ফেরে।

চিঠিটা না পড়তে পারলে অস্বস্তি কাটছে না। এখনও নয়। হুদা বীয়ারটা নিয়ে আসুক।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল একটা নীলরঙা অ্যামবাসডার গাড়ির কাজ শেষ। বোধহয় ডেলিভারীর জন্যে পড়ে আছে। তারই পিছনের সীটে আরাম করে বসল পৃথু। একটা দরজা খুলে দিল। রোদ আসছে গায়ে। ডিসেম্বরের দুপুরের গায়ে ফ্লানেলের ব্লেজার-ব্লেজার গন্ধ আছে একটা। ধুলোর গন্ধর সঙ্গে মিশে-সেই গন্ধটা গাড়ির স্প্রে-মেসিনের থেকে উৎসারিত বাষ্পীয় রঙের গন্ধের সঙ্গে চারদিকে চারিয়ে যাচ্ছে। পেছনের বড় সেগুনগাছটা থেকে দাঁড়কাক ডাকছে একটা কা-খা। কে জানে, এই ডাকের মানে, ভাল না খারাপ। গিরিশদা থাকলে জানা যেত। খারাপই হবে। সবই

যখন খারাপ হচ্ছে পর পর কিছুদিন থেকে।

হুদা এলে, বীয়ারটা খুলিয়ে নিয়ে রোলটাকে পাশে রেখে ও হিপ পকেট থেকে চিঠিটা বের করল। খামটা ছিঁড়ে ফেলতেই ভাঁজকরা দুটি একশ টাকার নোট বেরিয়ে পড়ল তা থেকে।

পৃথুদা,

আমি জানি আপনি খুব রাগ করবেন আমার উপরে এ চিঠি পেয়ে। কিন্তু আমি নিরুপায়।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন এমন দুর্দৈবের মুহূর্ত আসে কখনও যখন তার অনেক থেকেও, কিছুমাত্রই থাকে না, অনেকে থেকেও, কেউই নয়। সেই সব মুহূর্তে তাকে তার আসল-আমি, একা-আমির সর্বস্ব সম্বল করেই দাঁড়াতে হয়। জীবনের কিছু মূল প্রশ্নর উত্তর তাকে একা একাই দিতে হয়, নিজেকে। সেই সব মুহূর্ত বড় কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত। কারোই জীবনে এমন পরীক্ষা না এলেই ভাল!

জানি না, আপনি আমার বক্তব্য বুঝবেন কী না। আমি নিজেও পুরো বুঝে উঠতে পারিনি এখনও। একটা ঘোরের মধ্যেই আছি।

আমি কোথায় আছি, কেমন আছি কার সঙ্গে আছি এসব প্রশ্নর জবাব এক্ষুণি আমি দিতে পারছি না। সময় যখন হবে তখন নিজেই সব জানাব। আর জানাবার সময় যদি নাইই পাই এ জীবনে, তবে আর জানানো হয়েই উঠবে না।

পোস্ট-অফিসের ছাপ দেখে আমার খোঁজ করতে বেরুবেন না। যেখানে আমি আছি, সেখান থেকে অনেকই দূরে যাতে এ চিঠি পোস্ট হয় তার বন্দোবস্ত করেছি। তবুও ভেবে মনে মনে খুশি হচ্ছি যে, আপনি আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন ঘর-সংসার চাকরী-বাকরী সব ভাসিয়ে দিয়ে। গল্পে উপন্যাসে, অথবা ইচ্ছেময়-ভাবনায় যা সহজেই ঘটে, জীবনে তা ঘটে না। ঘটা সম্ভব নয়। আপনার সে কারণে লজ্জিত বা অনুতপ্ত হওয়ারও কোনো কারণ নেই। আমি জানি যে, আমি কাছে থাকলে আপনার পক্ষে যত সহজে কাছে আসা, আমাকে ভালোবাসা সম্ভব ছিল, দূরে এবং নিরুদ্দেশে ভেসে যাওয়ায় তা আর সম্ভব রইল না।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। কনভিনিয়েন্সের ভালবাসা সব পাবে না। তার দায়-দায়িত্ব অতি সীমিত। সে কারণে হয়ত প্রাপ্তিও।

এবার আপনার যা যা প্রশ্ন থাকতে পারে, অনুমান করে নিয়ে, এক এক করে তার জবাব দিই।

প্রথম প্রশ্ন : ভাঁটু কোথায়?

উত্তরে জানাই যে, আমার বিবাহিত স্বামী ভাঁটুবাবু এখন মান্দলার জেলে। এতদিন পুলিস হাজতে ছিল। হাতে-নাতে ধরা পড়ায় জেল হতে বেশি ঝামেলা হয়নি। সত্যকে দামী মিথ্যার বেসাতি দিয়ে ঢাকবার জন্যে কোনো নামী উকিলও সে দিতে পারেনি। মাত্র পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

মেদ ঝরে যাবে। শরীর ও মনের।

যখন বেরুবে, তখন তাকে স্বামী বলে স্বীকার করব কী না, তা এখনই বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সময়, সব কিছুকেই বদলে দেয়। পনেরো বছর পরের আমি কেমন থাকব অথবা আদৌ থাকব কী না তা এত আগে থেকে বলা সত্যিই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন. আমি কি ভাবে চালাচ্ছি?

চিন্তা [illegible]েন না। নষ্ট হয়ে যাই নি। হবো না। যে যাইই বলুক, নষ্ট হয়ে যেতে কিছুটা নিজস্ব প্রবণতাও লাগে। যে-প্রবণতা আপনার মধ্যে আছে ; আমার মধ্যে নেই। শুধু নষ্টই নয়, আপনার মধ্যে নিজেকে ধ্বংস করার প্রবণতাও লক্ষ করেছি, অনেকই সময় ; ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে। জানিনা, যিনি আপনার অনেক কাছের লোক, আপনার অর্ধাঙ্গিনী রুষাবৌদি, তিনি এই সাংঘাতিক প্রবণতার কথা কখনও লক্ষ করেছেন কী না। আপনাকে নিয়ে আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হয়।

আমার জন্যে কিন্তু আপনি একটুও ভাববেন না। না-খেয়ে নেই। যদিও আহামরিও কিছু নেই। দুঃখেরও কিছু দেখি না এতে। কারণ এদেশে আমার চেয়ে অনেক রূপসী ও বিদুষী মেয়েও, যাদের

স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বোধ আছে, এর চেয়ে অনেকেই খারাপ থাকে।

তৃতীয় প্রশ্ন : আমি কি ভাঁটুকে এখনও ভালবাসি?

সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেই ঠিক জানি না। এক সঙ্গে পাশাপাশি বাড়িতে থাকলেও এক ধবনেব মাযা ত জন্মাযই, ট্রেনেব কামবায সহযাত্রীর সঙ্গে একটি দিন কাটালেও তাকে আপন লোক বলে মনে হয অনেকসময। বাড়িতে কুকুব বেড়াল থাকলেও তাদের প্রতিও এক ধবনের গভীর মমত্ববোধ জন্মায আব ভাঁটু ত আমাব বিবাহিত স্বামী' বক্ত-মাংসর;সুখ-দুঃখর ভাগীদার। আমাব শবীবেব শরিকও ছিল সে। আড়াল, কিছুমাত্রই ছিলো না দুজনের মধ্যে। শিম্পাঞ্জীরা যে ধরনেব মূক অথচ গভীব ভালোবাসা একে অন্যকে বাসে ভাঁটুর ভালোবাসাও আমার প্রতি তেমনই ছিল। সূক্ষ্ম ছিলো না, রুচিসম্পন্ন ছিলো না, কাবণ সে সবেব বালাই ওর মধ্যে ছিলো না, কিন্তু আমার প্রতি ওব গভীব একতবফা অন্ধ ভালোবাসায কোনো খাদ ছিলো না। যদিও ভালোবাসা কাকে যে বলে, সে সম্বন্ধে ওব কোনো ধাবণাই ছিলো না। হযত, কম পুরুষেবই আছে। আমাকে নিয়েই ও ভবে ছিল। আমি ওকে ভালবাসতাম কিনা কখনও, ত যাচাই কবে দেখার অবকাশও হয় নি। মানে, আমাব দিক থেকে। যখন হল, এই দুঃসময়ে তখন মহা দুশ্চিন্তাতেই পড়লাম। এখনও বুঝে উঠতে পাবছি না অভ্যেসটাকেই ভালবাসা বলে ভুল করেছি কি এতদিন?

পৃথুদা, আজ আমাব স্বামী জেলে। স্বদেশেব জন্যে আন্দোলন করে নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিযে আইনেব চোখে কোনো আইন-ভাঙ্গাব অপরাধেও নয়, কাউকে বলা যায় না, নিজেও শুনতে ইচ্ছে কবে না এমনই এক কাবণে। জেলে গেছে সে গাঁজাব চোবাচালান করে।

আজকে আমাব মনে গভীব এক সন্দেহ জাগছে, ভাঁটু আমাকে ভালোবাসে সে কথা জেনেও, ভালবাসা কি শুধুই একটি অভ্যেস মাত্র? সমস্ত বিবাহিত ভালবাসাই? অভ্যেসই বোধহয ভালবাসা বলে চলে যায এ সংসাবে, আসলে ভালবাসা যে কি, তা বোঝাব অবকাশ বোধহয খুব কম মেয়েব জীবনেই আসে। আর ভাগ্যিস আসে না। এলেই, বড় কষ্ট। তবু বুঝলে সে সব মেয়েরাই শুধু বোঝে. আপনাবা কিছুই বোঝেন না। ভাবেন, যে বোঝেন! মিথ্যা শ্লাঘাতে বেঁকে থাকেন আপনাবা! আসলে সত্যিই কিছুই বোঝেন না।

দীর্ঘ চিঠি লেখার অবকাশ এখন নেই। অনেক অসুবিধার মধ্যে এই চিঠি লিখছি। দেবীও হযে গেল অনেক। কাবণ আমি জানি যে, আপনি চিন্তা কবছেন। কবছেন? সত্যিই চিন্তা কবছেন আমাব জন্যে? ভাবতে, কী ভালোই যে লাগে! আসলে, ভালোবাসা বোধহয় একধরনের চবম স্বার্থপবতাও।

ভাঁটু আমাব স্বামী। যে-মেয়ের নিজেব আর্থিক স্বাধীনতা নেই কোনো, স্বামীর পরিচযই ত তার একমাত্র পবিচয়। এও একধবনের বন্দীজীবন। জেলখানাবই মতো। গাঁজার চোরা চালান না কবেও আমাবও পনেবো বছবেব সশ্রম কাবাদণ্ড হল, বিনা বিচাবে, বিনা আদেশে, কারণ আমি আমাব স্বামীর স্ত্রী বলে। স্বাবলম্বী নই বলে। এদেশে এখনও এইরকম হয়।

এই জেলখানা থেকে আমি বাইবে আসতে চাই। একবাব বেবিয়ে এলে, আসতে পাবলে তাবপব অন্য কথা ভাবব। ভাঁটুদেব যে জমিদাবী ছিল উমেরীয়ায়, তা আমাদের বিয়ের পবই ভাঁটুর দাদা এবং ভাইযেরা বেহাত কবে নিয়েছে। লোকটাকে, বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে হলেও আসলে ওব এসব বুদ্ধি বিশেষ ছিলো না। ওকে আমি কখনও তেমন করে ভালোও বাসিনি; যেমন ভালোবাসা ও চায়। আপনার পটভূমিতে ওকে বড়ই নির্গুণ, নিস্প্রভ,আন-ইন্টাবেস্টিং, গ্রস্ বলে মনে হত, বিশেষ কবে আমবা রায়নাতে ফিরে আসার পর। আপনি কবে আসবেন, কবে আপনাব চিঠি পাব তার আশায় মুখ চেয়ে থাকতাম। আপনার সঙ্গে একটু দেখা হওয়া, আপনাব একটি ছোট্ট চিঠি পাওয়াও আমার কাছে ওব সঙ্গে শাবীরিক মিলনের চেয়েও অনেক বেশি আনন্দের কারণ হত। বুঝতে পারতাম যে, ওর সঙ্গে চিরজীবন থাকলে আমার নিজের প্রতি ত বটেই ওব প্রতিও অন্যায় করব আমি। অথচ দেখুন। আইন বলছে, জীবন বলছে, আমাব অকারণের কারাদণ্ডও প্রমাণ কবছে যে, ওইই আমার সব। আপনি কেউই নন। এটাই এখন ঘটনা। গাঁজা-চোরাই চালানকারীর স্ত্রী

আমি। কী সম্মান বলুন ত ! এর চেয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতবাও অনেক সম্মানিত। যেখানে আছি সেখানে একজন ছাড়া অন্যরা অবশ্য জানে না এই গর্বের খবর। এই অপরাধের মধ্যেও যেন একটা উগ্র কটুগন্ধ পাই, যদিও গাঁজার গন্ধ কেমন তা আমি জানি না। তবে, কতদিন আর লুকিয়ে বাখব ? তাছাড়া, লুকিয়ে রাখাটা বোধহয় ঠিকও নয়। তাব চেয়ে এই মিথ্যা সম্পর্ক ভাবছি ভেঙ্গেই দেব।

সামনের ববিবাব ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব মান্দ্‌লাতে। শুনছি শিগগীরই ওকে অন্য জেলে চালান করে দেবে। গুণ্ডা, বদমাইস, খুনী, রেপিস্ট, স্মাগলারদের সঙ্গে ওঠা-বসা করবে ও। যতটুকু ভালত্ব বা ছিল, তাও থাকবে না। আমি কেন ওর জন্যে পনেরো বছর অপেক্ষা করব ? কেন কবব ? আপনি কোনো যুক্তি দেখাতে পারেন ? ভেবে ভেবে কোনোই কূল পাচ্ছি না। আপনি ত এ জীবনে আমার অনেক ভালোই কবলেন, এটুকু ক‍রবেন না আমাব জন্যে ? কী আমার করা উচিত তা আমাকে বলে দেবেন না ?

কোনোরকম সাহায্যই চাই না এ ছাড়া, আপনার কাছ থেকে। যাকে মানুষ ভালবাসে, তার কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিলে সে ভালোবাসা নোংরা হয়ে যায়। বিচ্ছিরি দেনা-পাওনার বিষয় হয়, সুন্দব আর থাকে না। সেদিন রাতে ইচ্ছে কবে প্লেটের তলায বেখে যাওয়া দুটি একশ টাকাব নোট আমি যত্ন কবে তুলে রেখেছিলাম। এই চিঠির সঙ্গেই পাঠালাম। অর্থ খুবই দামী, বিশেষ করে অর্থহীনেব কাছে ; কিন্তু ভালোবাসাব চেযেও নয। দারিদ্র্য যখন আসে, তখন তাকে জড়িয়ে ধবার মধ্যেও একধবনেব শিক্ষা লাগে, সুশিক্ষা। যে-মানুষ দারিদ্র্যে ভেঙ্গে যায় টুকবো হয়ে, তার শিক্ষাটা মনে হয এখনও পুবো হয়নি। আমি আমাব মাকে চোখের সামনে দেখে এ কথা শিখেছি। দাবিদ্র্যব চেযেও অনেক অনেক বড় কষ্ট একজন মানুষের জীবনে থাকতে পারে। থাকে। বড়লোকেব ছেলে আপনি, যদিও বডলোকী মনোবৃত্তিব নন ; তবু বড়লোকের ছেলে ত ! আপনাব পক্ষে এই কথার তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। এই পবীক্ষায ইচ্ছে কবে কেউই বসে না। আপনাব যেন কখনও বসতে না হয ; এইই প্রার্থনা কবি।

যদি চিঠি দেন, তাহলে খুব খুশি হব। কিন্তু আসবেন না। দিদি-ঠাকুমার মতো সেকেলে দিব্যি কেটেই বলছি যে, এলে, মবা মুখ দেখবেন আমার। আপনি এখানে এলে আমাব মবা ছাডা উপায থাকবে না কোনো। সবদিক দিযেই। আসেনই যদি, তাহলে আমাকে সঙ্গে করে নিযে যেতে হবে। পাববেন ? আমাব ভালবাসার ধন ! যিনি, আমাকে একটু দেখতে না পেলে পাগল হয়ে উঠতেন ?

পাববেন না। আমি জানি যে, পাববেন না।

আপনি বিবাহিত। আপনার সুন্দবী, বিদুষী, সমাজে প্রশংসিত স্ত্রী আছেন ; আছে সুন্দব ভাল ছেলে আর মেযে। পাল্লাতে তাদের দিকে ভার বেশিই হবে। আপনাদের মতো সাহসী, বাঘেব মতো সচ্ছল পুরুষ মানুষের পক্ষে ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা, প্রেমের বেদনা-বিলাসই বোধহয বেশি মানায। কবিতা-টবিতা ভাল লেখা যায় তাতে। কবিতার সঙ্গে কল্পনা এখনও সহবাস কবে। প্রকৃত ভালোবাসা যে বড়ই নগ্ন, বড ঝড় – ঝাপ্‌টার, তা অনেকই বেশি প্রত্যাশা করে অন্যজনের কাছ থেকে ! সে দাবী, আপনার ওপর কবব না। ভালবাসি বলেই আপনাকে সর্বনাশেব ডাক দেবো না। নিশ্চিন্ত থাকুন। কবিতা লিখুন। প্রকৃতি নিয়ে, নাবী নিয়ে কাব্যি করুন, নিজের একতবফা আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকুন সারা জীবন। এই সবই কবিদের প্রেরোগেটিভ, স্পেশ্যাল প্রিভিলেজ। ভটু যখন জেলে মধ্যপ্রদেশের দুঃসহ গবমেব দুপুবে বসে ঘানি-ফেরাবে অথবা বাজরার জন্যে জেলেব প্রান্তরে কোদাল চালাবে, আমি যখন টিনেব চালাব জেলখানায় বসে পা-মেসিন চালিয়ে ছিটেব ব্লাউজ তৈবী কবব শুক্রবারেব হাটিয়াতে ছত্তিশ গড়িয়া, গোন্দ আর বাইগা মেয়েদের কাছে বিক্রী কবাব জন্যে, তখন আপনি কবিতা লিখবেন। আমাকে নিয়ে। এবং কে বলতে পারে, সেই কবিতাই হয়ত আপনাকে অমরত্ব এনে দেবে কোনোদিন।

আমাদের মতো মন্দভাগ্য মেয়েরাই চিরদিন আপনাদের কল্পনাব খাদ্য হয়েছি, ষাঁডদেব যেমন টাটকা নেপিয়ার ঘাস ; আমাদের খেযে ছিঁডে ছেনে ধুনে ছড়িয়ে ছিটিযে বেড়ালে-খাওযা সাদা কবুতরের মতো ছিন্ন ভিন্ন কবে রেখে আপনারা পুরুষ কবিরা মহান হয়েছেন। আপনাবা শতাযু হোন।

এবার শেষ কবব চিঠি। কম্বল আর বালিশ উঠোনের বেড়ায় রোদে দিয়েছি। একটা অসভ্য ষাঁড় কাল আমার বালিশের একটা পাশ খেয়ে গেছে। মেয়েলী তেলের গন্ধ পেয়েছিল বোধহয়। গরু হলে নিশ্চয়ই খেত না! শুনেছিলাম ছাগলে কী না খায়, পাগলে কী না বলে! ষাঁড়ও যে সব খায় জানতাম না! রাতে বড় শীত লাগে টিনের চালের মাটির ঘরের বেড়ার ঘরে। তাইই কম্বল বালিশ গবম করতে দিয়েছি। কবিরা বেশ প্রেমিকাদের কল্পনা করেই উষ্ণ হয়ে ওঠেন বলে শুনেছি, আমরা পাবি না কেন বলুন ত! আমরা কি কিছুই পারতে পারি না?

আমাব চিঠিব বকম দেখেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে একজন সতী সাধ্বী অবলা স্ত্রী হিসেবে যতখানি ভেঙ্গে পড়াব কথা ছিল এই আর্থিক দুর্দৈবে তা পারি নি। ভরসা রাখবেন যে, পড়বও না।

বেঁচে থাকার মতো আমার অনেকই কিছু আছে। সজনে পাতায় হাওয়া লাগলে এখনও আমার ভাল লাগে, ভালো লাগে ভোরের পাখির ডাকাডাকি, শেষ বিকেলের মন-খারাপ করা আলো। এই সব ছোটখাটো ভালোলাগা নিয়েই আরো পনেরোটা বছর কেটে যাবে। বুড়ো, কুঁজো ভাঁটুবাবু আমার চেয়ে বয়সে ও সাত বছবের বড় এক সন্ধ্যেয় গরুর ডাক আর বড়হা দেবের পূজোর ঘণ্টার শব্দব মধ্যে আমাব ভাঙ্গা বেড়াব কাছে এসে দাঁড়াবে। বলবে, চিনতে পারো? কুর্চি?

ওকে চিনতে নিশ্চযই পারব। তবে কষ্ট করে। ও-ও আমাকে চিনতে পারবে না প্রথমে। বস্তীব কোনো ছেলেমেয়ে চিনিয়ে দেবে। চোখে চালসে চশমা, সাদা চুল, আমার দিকে চেয়ে ও বলবে, চিনলে না? আমি সেই ভাঁটু। উমেরীয়ার ভাঁটু।

ঐ বক্তমাংসব মানুষটাকে চিনতে পাবব। ও-ও পারবে আমাকে। আমি বসতে বলব, তোলা উনুনে চা করে দেব, বাজরা মাখব রুটি করার জন্যে রাতের। ও মেঝের আসনে বসে, মাটির ঘরে বসে আমাকে চিনতে চেষ্টা করবে। পুরোনো গন্ধ খুঁজবে নাক উঁচু করে, পুরোনো স্পর্শকে কল্পনা কবে খুশি হবে। আর আমি দু হাঁটুব মধ্যে থুত্‌নী রেখে আগুনের দিকে চেয়ে থাকব। চোখ আমাব জলে ভবে যাবে। আমি জানব যে, যে এসেছে আমার ঘরে, সে আমার কেউ না; কেউই ছিলো না কোনোদিন, এদেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ের স্বামীদেরই মতো।

নিরুচ্চাবে আমি আবৃত্তি করব আমাব প্রিয় কবি রাজলক্ষ্মী দেবীর একটি কবিতা:

জানি আমি একদিন বুড়ো হব। চশমার ফাঁকে।
উলের কাঁটাব ঘব গুণে গুণে কাটবে সময়।
যদিও অনেক লোক আসে, যায়—দুটো কথা কয়—
মনে মনে জানা ববে, কেউ তারা খোঁজে না আমাকে।
এমনি মেহগ্নি আলো বিকেলের জানালাকে ছোঁবে!
নরম চাঁদের বল ফের উঠে আসবে আকাশে।
বাতাস সাঁতার দেবে সবুজ ঢেউয়েবই মত ঘাসে।
আকাশের বুক ভরে তারারা বিছানা পেতে শোবে।
শাদা চুল নেড়া দাঁত, আযনায ভ্যাংচানো ছায়াকে
তখনো বলবো আমি রাজ্যচ্যুত রাজ্ঞীদের ভাষা।
'জানিস্, আমাব ছিলো সে এক আশ্চর্য ভালবাসা।
তোর কি ক্ষমতা আছে মিথ্যে করে দিবি সে পাওয়াকে?

ভাঁটু কিছুমাত্র বুঝবে না আমার মনের ভাব। হয়ত বলবে, চায়ে বেশি করে চিনি দিও। কতদিন ভাল করে চিনি খাই না। জেলে বড় চুরি হয়।

আমার দু চোখ দিয়ে জল বইবে। আমি না-বলে বলব, চুরি কোথায় হয় না?

আপনি তখন কোথায় থাকবেন পৃথুদা? ইজীচেয়ারে শুয়ে থাকবেন হয় ত নাতি কোলে করে। ছিঃ। ছিঃ একজন বাঘের কী লজ্জাকর পরিণতি!

ভাল থাকবেন। সবসময় ভালবাসবেন আমাকে।

—ইতি কুর্চি



সকালবেলা পৃথু ও রুষা বসবার ঘরে বসে ছিল। রোদ এসে পড়েছিল গায়ে।

ক্রীসমাস ঈভ্-এ ভুচু সবাইকে ডিনারে ডেকেছে। যাবে নাকি, তুমি?

পৃথু শুধোল রুষাকে।

খবরেব কাগজটা সেণ্টার টেবলে নামিয়ে বেখে তাকাল রুষা পৃথুর দিকে। ভারী সুন্দব দেখাচ্ছিল তার সুন্দরী বউকে। সৌন্দর্যরও এক বিশেষ আবেদন আছে। সে সৌন্দর্য বুদ্ধি বা গুণমণ্ডিত না হলেও। তবে রুষার কথা আলাদা। যা কিছু উপাদান দিয়ে সৌন্দর্য গড়ে ওঠে, রুষাব মধ্যে তার সব কিছুই ভবে গিয়ে উপছে গেছে।

ভুচু ডিনারে ডেকেছে মানে? কোথায়?

ভুরু কুঁচকে বলল ও।

কোথায়? ওব গারাজে।

মোটর মেকানিকের গাবাজে ক্রীসমাস ঈভ। সত্যি। দিনে দিনে তুমি যে কোথায়, সোসাইটিব কোন্ স্তরে নেমে যাচ্ছ তার খোঁজ রাখার মতো মেণ্টাল অবস্থাও বোধহয় আজ তোমার নেই।

দোষ কি হল? ভুচুরা ত ক্রীশ্চান্।

বোকার মতো বলল পৃথু।

না। দোষের কি? ক্লাবে ক্রীসমাস্ ঈভ-এর পার্টি হচ্ছে! কাল চিলড্রেনস পার্টি আছে। মিলি টুসুরা যাবে, বুক ক'রে দিয়েছি। ভিনোদেব বাড়ি গ্রাণ্ড পার্টি আছে। মিস্টার সেন-এর বাড়িব লন-এও দারুণ পার্টি। সকলেই বলছে 'বার ক্রলিং' করে অল্প সমযেব জন্যে সব পার্টিতেই ড্রপ-ইন্ করবে তারপর যাব যেখানে এণ্ড-আপ্ কবতে ইচ্ছে কবে সেখানেই মাঝ রাত অবধি থেকে যাবে। তাই আমার পক্ষে ভুচুব পার্টিতে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

ওঃ।

তুমি কি কখনও ভেবেছো, আমি যে একা একা সব জাযগাতে যাই, আমাকে দশজনে নাচতে বলে, কখনও কখনও নাচিও, দশজন পুরুষ, তোমারই জাতেব ত তারা, গণ্যমান্য হলেও এমন দৃষ্টিকটু ব্যবহার কবে আমার সঙ্গে, এসব কি আমার ভাল লাগে? না সম্মানের, আমাব পক্ষে? তুমি যে আমার স্বামী এ নিয়ে কোনোদিন গর্ব করার মতো কিছুমাত্রও ত দিলে না এ জীবনে, শুধুমাত্র স্বামী হিসেবেও আমার পাশে কোনো কোনো সময়ে থেকে আমি যে সিঙ্গল নই, স্পিনস্টাব নই, খাবাপ মেয়ে নই, এ কথাটা দশজনেব সামনে প্রমাণ কবতে ত পারো। তোমাকে বিয়ে কবে আমাব যে কী অবমাননা এ জন্মে হল তা আমিই জানি।

তুমি বাড়াবাড়ি কবে বলছ। পার্টিতে সকলেই বুঝে নেয়। কেউই কিছু মনে কবে না।

কি মনে করে না?

সবাই-ই জানে যে, তোমার স্বামী একটি অপদার্থ, বাজে লোক, আজে বাজে লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা, তাকে ত তোমার সমাজ খবচেব খাতাতে লিখেই দিয়েছে। ব্যাড-ডেট বাইট-অফ্‌ফ করাব মতো। এই দেনা যে কোনোদিনও আর রিকভার্ড হবে এমন মনে করাব মতো বোকা তাঁবা কেউই নন। আমি ত হারিয়েই গেছি তোমাদের সো-কল্‌ড সমাজ থেকে। আমাকে আব ডাকো কেন?

কিছু বলার নেই আমাব। তোমার ভাল লাগে না শিক্ষিত, ওয়েল-অফফ হাইলী প্লেসড

লোকদের সঙ্গে মিশতে ?

না। ভাল লাগে না। পথের দিকে চেয়ে বলল পৃথু বিরসমুখে।

কেন ?

ওদের বেশির ভাগই একরকম। এক পোশাক, এক কথা, এক আলোচনা, এক উচ্চাশা, প্রোমোশান, বাড়ি, গাড়ি, টাকা। মেয়েরাও তাই। শাড়ি, গয়না ; আমার দম বন্ধ লাগে ঐ পরিবেশে কিছুক্ষণ থাকলে। বড়ই চর্বিত-চর্বণ। কি করে পারে মানুষ, শিক্ষিত সব মানুষ ? তা জানি না। ভাল লোক, গভীর লোক যে নেই তোমাদের সমাজে তা নয়, তবে তারাও দলের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে বোবা হয়ে থাকে। তারা কেউ স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী হয়ে আসে, কেউ বা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী। তাদের নিজেদের সেক্স-এ থাকে না তারা।

রুষার দু চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করল।। বলল, তাদের যার যার স্পাউস্-এর জন্যে তারা তবু ত ঘণ্টা দু-তিন নিজেদের নিজস্বতা বিসর্জন দেয়। সেইটেই ত স্বাভাবিক ! তুমি কি তাও পারো না ? একদিনও ? আমাকে একটু সুখী করতে ? নিজস্বতা কি শুধুমাত্র তোমারই একার আছে বলে মনে করো ? সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত উন্নত সব মানুষের কারোই নিজস্বতা নেই ? তুমি কী মনে করো নিজেকে ? মেগালোম্যানিয়াক্ হয়ে গেছ তুমি !

আমাকে ক্ষমা করে দাও রুষা। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি কারো চেয়েই বড় নই, ভাল নই ; আমি শুধু অন্যরকম। আমার মতন আমি। তোমার কাছে আমার অনেকই অপরাধ। নিজগুণে অনেক মার্জনা করেছো, আবো করবে জানি।

যদি কোনোদিন আর না করতে পারি। যদি....

তোমার যা ভাল মনে হয় করবে। তুমি সুখী হয়ো। আমার দ্বারা সুখী হওয়া হলো না যখন তখন অন্য কারো দ্বারা হয়ো। আমি ত বলেইছি....

জীবনটা নাটক নয়। নভেলও নয়। মাঝ-তিরিশে এসে বড় বড় ছেলেমেয়ের মা হবার পর এখন স্বামী আমাকে মুক্তির পথ বাৎলাচ্ছেন ! সত্যি ! তুমি না ! তোমাকে কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

কেই বা কাকে বোঝে বল ? বোঝা কি অত সোজা ? দিগা পাঁড়ের মতো লোক, সেই বাঙালী তান্ত্রিক বনে পাহাড়ে বাস করেও বোঝার মতো কিছু এখনও বুঝে উঠতে পারল না। বোঝাটা হয়ত বড় কথা নয়, বোঝবার চেষ্টাটা চালিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে জরুরী। বুঝতে চাইলে একদিন নিশ্চয়ই বুঝবে।

রুষা কী একটা কথা বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়ে খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের কালো কুচকুচে যুবতী আয়া আর সাদা ধবধবে যুবক অ্যালসেসিয়ানের ফিরে আসা দেখতে লাগল। শালের ছায়ায় ছায়ায় কমলা রঙা রোদে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ফিরে আসছিল ওরা।

কি দেখছ ?

পৃথু বলল।

ভাবছিলাম, রোজই সকাল বিকেল ওদের এই আসা-যাওয়া দেখি অথচ পুরোনো হয় না কখনও।

এইটেই হচ্ছে আসল কথা। তোমাদের পার্টি পুরোনো হয় কিন্তু ওদের এই আসা-যাওয়া পুরোনো হয় না। কেন, জানো ?

কেন ?

একটি সজীব কালো মেয়ে আর চঞ্চল প্রাণবন্ত সাদা কুকুরের মধ্যে প্রাণ আছে, কোনো মেকী ব্যাপার নেই, ভণ্ডামি নেই। ওরা মিথ্যা নয়। প্রাণের, জীবনের প্রতীক। ওদের রোজ দেখে আমার কি মনে হয় জানো ? প্রকৃতির মধ্যেই প্রত্যেক প্রাণীর প্রকৃত মুক্তি নিহিত আছে।

রুষা হাসল।

বলল, এক্‌সেন্ট্রিসিটির একটা লিমিট থাকা উচিত।

তা নয়। তুমি আজকে হাসছ, পাগল বলছ, বলো, কিন্তু আজ থেকে বেশিদিন নয়, মাত্র পঞ্চাশ

বছর পরে পৃথু ঘোষের এই কথা দেখবে ঘরে ঘরে টাঙানো আছে।একবিংশ শতাব্দীর মানুষ পৃথু ঘোষকে উপেক্ষা করবে না, অপমান করবে না। তোমবা যা করলে তা করলে!

ইয়া। ইয়া। সক্রেটিস! স্পিনোজা! গ্যালিলিও! হাসি পায়। তোমাকে নিয়ে সামনের সপ্তাহেই জব্বলপুরে যাব ডাক্তার গুপ্তাপ্পার কাছে। সাইকিয়াট্রিস্ট। মাথাটি একেবারে গেছে।

আমি পাগল হলে কি তোমার ডিভোর্স পেতে সুবিধে হয়? কিন্তু এমনিতেই বা অসুবিধের কি? যাকে খুশি বিয়ে করো না তুমি আমি দাঁড়িয়ে থেকে পিঁড়ি ঘুরিয়ে বিয়ে দেব। তোমার ফুলশয্যার খাট সাজাব। জমে যাবে পুরো ব্যাপারটা। নিজের স্ত্রীর বিয়ে,আনন্দে মেতে ক'জন স্বামী দিতে পারে বলো?

তা পারো তুমি! লোকে বাহাদুরী দেবে। বলবে, আহা! কী উদার মানুষ পৃথু ঘোষ! এমনটি আব কেউ কখনও দেখেনি।

তাই-ই..

না ত কি?

আসলে আমি ত জানি। তোমার মধ্যে একটি পাঁচ বছরের খোকন বাস করে। তোমার মায়ের খোকন। ইডিপাস্ কমপ্লেক্স-এর একটি ওয়ারসট্ কেস তুমি। এমন বাহাদুরী প্রবণতা কোনো অ্যাডাল্ট লোককে মানায় না। তোমাব বাঘ মারা, শামীমের মেয়েকে উদ্ধার করা এসবই ঐ মনোবৃত্তিবই জন্যে। অ্যাডাল্ট লোক নিজের আখের দেখে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায় না এমন করে।

পৃথু চুপ করে ছিল।

হঠাৎ বলল, মনে পড়ে গেছে। এক্ষুনি মনে পড়ল। তোমার সেই পার্টির কথা ওঠার পর থেকেই মনে করার চেষ্টা কবছিলাম টি· এস· এলিয়ট-এর সেই কবিতাটি।

কোন্ কবিতা?

সে কি? তুমি ত ইংরিজীতে পণ্ডিত। তুমি পড়েছ নিশ্চয়ই!

না বললে, বুঝব কি করে?

'হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেনড হ্যাজ মেড মী অ্যালোন
দ্যাট আই হ্যাভ ওলওয়েজ বীন্ অ্যালোন,
দ্যাট ওলওওয়েজ ইজ অ্যালোন,
....ইট ইজন্‌ট দ্যাট আই ওয়াণ্ট টু বী অ্যালোন
বাট দ্যাট এভরীওয়ান্ ইজ অ্যালোন—অর সো ইট সীমস্ টু মী,
দে মেক নয়েজেস অ্যাণ্ড থিংক্ক দে আর টকিং টু ইচ আদার
দে মেক ফেসেস, অ্যাণ্ড থিংক দে আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইচ্ আদার
অ্যাণ্ড আই অ্যাম শ্যুওর দ্যাট দে ডু নট..."

রুষা উৎসুক চোখে চাইল পৃথুর দিকে। বলল, নাম কি কবিতাটির?

"দ্য পার্টি।" তোমাদের পার্টি সম্বন্ধে এই-ই বোধহয় শেষ কথা।

চুপ করে রইল। দুজনেই চুপচাপ অনেকক্ষণ।

বেশ দিনটা আজকে, না?

রুষা বলল হঠাৎ।

পিক্‌নিকে যাবে নাকি? পৃথু বলল।

চমকে উঠে, রুষা চাইল ওর মুখে। বলল, ফ্যামিলী পিকনিক? বউ, বাচ্চা থার্মোফ্লাস্ক, স্যাণ্ডউইচ কমলা লেবু এইসব নিয়ে? মাই! মাই! অফ ওল পার্সনস, পৃথু ঘোষ! কী হল তোমার আজকে? শরীর ঠিক আছে ত?

পৃথু হাসল। বলল, এই-ই ত তোমার দোষ। নির্লজ্জরও ত লজ্জা হতে পারে মাঝে মাঝে।

তা যা বলেছ। ভেরী ওয়েল-সেইড। কথা তুমি ভালই বল। দুঃখের বিষয় এই-ই যে, কথা সব

মাঠে মারা যায় ভুচু আর লাড্ডুদের আর শামীমদের কম্পানীতে। নইলে, তোমার মতো স্পারক্লিং কন্‌ভার্সেশান্ যে কোনো পার্টিকেই লাইভ্‌লি করে তুলত।

আমি দেবতা নই। যা মরা, ডেড অ্যাজ হ্যাম ; তাকে বাঁচাবার সাধ্য অথবা ইচ্ছা, দুটোর কোনোটাই আমার নেই।

সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে বলল পৃথু, মিলি টুসু কোথায় ?

ভিনোদের বাড়িতে। ডে স্পেণ্ড করতে গেছে। হাটচান্দ্রাতে এখন বড়দিনের হাওয়া লেগেছে। সিমসন সাহেব কি আসছেন লান্‌ডান থেকে ?

ওরা আসত শিকারের জন্যে ক্রীসমাস-এ,ন্যু-ইয়ার্স-এ। এখন শিকার ত বন্ধ। তবু, উধাম সিং ত বলছিলেন যে আসবে বলে টেলেক্স্ পাঠিয়েছে। ক্রীসমাস-এর আগের দিন জবলপুরে গিয়ে রীসিভ করতে হবে এয়ারপোর্টে। আমি বলে দিয়েছি পারব না। উধাম সিং সাহেবেরও অসুবিধে। ভাবীজীর শরীরটা খারাপ। ইমম্যাটেরীয়াল ম্যানেজার শর্মা যাবে।

কাজটা ভাল করলে ? রুষা বলল।

কেন ?

ও যেরকম লোক, যেমন স্মুথ-টকার আর ফিক্সার ওই-ই দেখবে তোমাকে সুপারসীড্ করে ডিরেক্টর হয়ে যাবে একদিন।

হোক না। আমি ত ডিরেক্টর হতে চাই না।

বাঃ ! চমৎকার। তা ত চাইবেই না। অ্যামবিশান্ তোমার কি কিছুই নেই জীবনে ? তোমার জন্যে আমার। এত লজ্জা হয় কি বলব। শেষে ঐ শর্মার কনুই-অবধি সোনার গয়না-পরা অশিক্ষিত বউ ক্লাবে আমার উপর ছড়ি ঘুরোবে ? তোমাব বস্‌স্-এর বউ হবে ?

পৃথু উত্তর দিলো না। বলল, চল ভিনোদের বাড়িই যাই। ওখান থেকে ভিনোদ মিলি ও টুসু সকলকে নিয়ে কোথাও যাওয়া যাবে।

কোথায় যাবে ? রাতমোহানায় ?

হ্যাঁ। অথবা সুফকর-এর বনবাংলোয়।

বাঃ। বাঃ ! বাঁচলে হয় আমি আজকে ! এত সুখ কি সইবে কপালে ?

বলে রুষা উঠে চলে গেল গোছগাছ করতে। অজাইব সিংকে খবর পাঠাতে বলল দুখীকে। মেরীকে ঘর-গেরস্থালির কাজ বোঝাতে গেল। চলে যাওয়া রুষার হঠাৎ খুশিতে ঝলমল মুখের দিকে চেয়ে পৃথুর মনে হচ্ছিল এত সামান্য দিয়েই যদি সুখ-শান্তি পাওয়া যায়, রুষার এমন অনাবিল আন্তরিক হাসি, তবে তা পায়ই বা না কেন ?

পোকা। তার মাথার পোকা ! তার রক্তর পাগলামি। তার প্রাগৈতিহাসিক মেল শভিনিজম্ বোকা-বোকা, অর্থহীন, তার অ্যাডভেঞ্চারপিপাসু সমাজ-বিরুদ্ধ ভাব-ভাবনা তাকে এই সহজ সুখের স্বচ্ছ জলের বেলাভূমি থেকে ভয়াবহ গভীর জলে টেনে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় পাহাড়ে-কন্দরে যেখানে মুহুর্মুহু বিপদ ; যেখানে বেঁচে থাকা মানে সাংঘাতিক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অথবা গভীরতম আনন্দব স্বাদ।

কে জানে ? কেন, কখন, কোথায় কি ও করে তা ও নিজেই জানে না। ওর মাথার ভেতরে একটা ঘড়ি আছে, একটা কম্পাস, এলার্ম বাজে, কাঁটা স্থির হয়ে পথ দেখায়, এ সবই হয় ভিতরে ভিতরে, আর ও রোবোটের মতো বাঁচে, পাছে সত্যিকারের রোবোট না হয়ে যায় এই ভয়ে।

দূর থেকে ভিনোদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। ফুলে ফুলে লনটা ভরা। লনে দোলনা। পাখি, কাকাতুয়া, খরগোশ। গেটে বন্দুক হাতে দ্বারোয়ান। স্যালুট করে গেট খুলল। গাড়িটা ভিতরে ঢুকতেই চমকে গেল পৃথু। দোলনার একপাশে ভিনোদ বসে আছে। তখনও স্লিপিংস্যুট ছাড়েনি তবে তার উপরে হালকা সবুজ ড্রেসিং গাউন পরেছে একটা। টুসু ওর মাথায় বসে আছে দুদিকে দু পা দিয়ে। দোলনার অন্য পাশে মিলি বসে আছে হাতে একটি ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে। রোলিং-স্টোন গ্রুপ-এর গান শুনছে তন্ময় হয়ে। দোলনা দুলছে। হি হি করে হাসছে টুসু—হাসছে

ভিনোদ—গান শুনতে শুনতে হাসছে মিলি। দোলনা দুলছে—পৃথুর চেতনার কাছে আসছে একবার পরক্ষণেই চলে যাচ্ছে দূরে তার ছেলে তার মেয়ে ভিনোদ ইন্দুরকারের সঙ্গে খুশিতে ভালবাসায় আনন্দে মাখামাখি হয়ে গেছে। তার স্ত্রী রুষা খুশিতে ডগমগ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভিনোদের দিকে। খুশির অনেক রকম হয়। ভিনোদকে দেখে রুষার যে ধরনের খুশি তাতে খুশিব গভীরতা বুঝতে কোনো ভুল হয়নি পৃথুর।

তার স্ত্রী, তার মেয়ে, তাব ছেলে, একদিন যাবা তারই একার ছিল, সে এবং রুষা মিলে যা কিছু তৈরী করেছিল শরীরের রক্তবীজ, বুকের ভালবাসা দিয়ে তা আজ সবই অন্যর হয়ে গেছে।

লনের মধ্যে, ফ্ল্যানেলেব ট্রাউজাবের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল পৃথু।

ভিনোদ জোরে ডাকছে "কাম অন ইন পৃথুদা"। প্লিজ কাম হিয়াব। উর্দি পরা বেযারাবা লনে ব্রেকফাস্ট টেবল লাগাচ্ছে। সুন্দব কালো আব হলুদ চৌখুপী-চৌখুপী টেবল-ক্লথ পেতে দিচ্ছে তাব উপব। নানারকম ফলেব পাহাড় এনে সাজিয়ে বাখছে রূপোব ফ্রুট-বোল-এ। পরিজ আব কর্নফ্লেকস্ খাবার প্লেট, কাঁটা চামচ, সাজাচ্ছে থবে থরে।

পৃথু শীত সকালের উষ্ণ বোদদুবের মধ্যে, ভিনোদের মুহুর্মুহু ডাকের মধ্যেও অনড় দাঁড়িয়ে ভাবছিল, সৌন্দর্যর যেমন এক বিশেষ মূল্য আছে ; স্বচ্ছলতাবও এক বিশেষ মূল্য আছেই। সেই স্বচ্ছলতা কি ভাবে আসছে সে কথা বিচাব করার কথা অনেকই পরে আসে। সৌন্দর্যবই মতো: স্বচ্ছলতাও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মোহ জাগায়, প্রেমে পডায মানুষকে। এদেব আকর্ষণ বডই দুর্বার।

রুষা ডাকল, হল কি তোমাব? এসো।

এবাব ভিনোদ এগিয়ে এসে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে চন্দ্রমল্লিকা আর ক্যানাব সারিব পাশে বসালো পৃথুকে সাদা-বঙা বেতের চেয়ারে। বলল, দারুণ আইডিয়া। চলুন সকলে মিলে পিক্‌নিক্-এ যাই।

পৃথু লক্ষ করেছিল যে, তাব ছেলে ও মেয়ে কেউই খুশি হয়নি তাকে দেখে। তারা কেউই ডাকেনি তাকে। ববং তাদেব মুখ দেখে মনে হয়েছে যেন বলতে চাইছে এত খুশি এত মজাব মধ্যে বাবা আবার কেন?

পৃথু মুখে একটা হাসি বাঁচিযে রেখেছিল। ইলেক্‌শানে হেরে যাওয়া নেতারা যেমন রাখেন ফোটোগ্রাফার এবং টি-ভি ক্যামেরাব সামনে। তবু ও জানত হাসিটা শিগগিবই মবে যাবে।

কোথায় যাওয়া হবে?

সুফকর?

রুষা বলল।

ফাইন্।

তাহলে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়া যাক। আমাদের পিছনে অন্য গাড়িতে কুক বাওয়ার্চি খানাপিনার শামান, আইস-বক্স, বীয়ার, কাম্পাকোলা, ভড্‌কা জিন ইত্যাদি নিয়ে আসবে। মজা আ যায়েগা। কেয়া দাদা?

পৃথু বলল, এসেই যখন পড়েছি আমি ব্রেকফাস্ট করেই চলে যাব। তোমবা সকলে যাও পিক্‌নিকে। আমার একেবারেই মনে ছিলো না একবার ভুচুর কাছে যেতে হবে। দিগা পাঁড়ে আসবে সেখানে। কী নাকি জরুরী দরকার। শামীমও আসবে বলেছে। মেয়েটা ত বোবাই হয়ে রইল। শামীমটা পাগলের মতো হয়ে রয়েছে তার পর থেকে। আমাকে ছেড়েই যাও তোমরা।

সে কী!

অবাক গলায় বলল রুষা। তুমিই ত বললে। আর এখন হঠাৎ।

মনে ছিলো না। বিশ্বাস করো, আমার কিছু মনে থাকে না আজকাল। তোমরা সকলে আনন্দ করলেই আমার খুব আনন্দ হয়। ভিনোদ আছে। ও ত আমাদেরই একজন। হ্যাভ আ নাইস ডে। আ প্লেজেণ্ট টাইম। রাতে দেখা হবে খাবাব সময়। ভিনোদকেও ধবে নিয়ে এসো।

আমি রাতে আসতে পারব না পিরথুদাদা। ক্লাবে এনটারটেইনমেন্ট সাব-কমিটির মীটিং আছে আজকে। জানো ত চাড্ডা সাহেব আর মিস্টার গাঙ্গুলী প্রেসিডেন্টশিপ্-এর জন্যে দাঁড়াচ্ছেন এবার? গোলন মুখার্জী গুচ্ছের কাগজ ছেপে মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি পাঠাচ্ছেন। ক্লাবের ঈজ্জৎ একেবারে গেল। ক্লাব থেকে কিছু কিছু মেম্বারদের কুইট-নোটিশ সার্ভ করা উচিত, যদি ক্লাবকে বাঁচাতে হয়।

বাঁচবে না ভিনোদ। দেশই বাঁচলো না আর একটা সামান্য ক্লাব কি করে বাঁচবে? দেয়ার উইল বী আ কমিটী অফ দ্যা কোয়ানটিটি, নট অফ কোয়ালিটী। ভোটের দিকে চোখ থাকলে কিছুই বাঁচানো যায় না। এই অশিক্ষিতদের দেশে এইটেই ডেমোক্র্যাসীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ভোটের মুখ চেয়ে জনসংখ্যা কমাতে বলা গেলো না বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে, কালোকে কালো, সাদাকে সাদা, খারাপকে খারাপ ভালোকে ভালো বলা গেলো না, ভোট রঙ্গতেই এসে ঠেকে রইল স্বদেশসেবা। বেচারী গোলন মুখার্জী কি দোষ করল? গোলন মুখার্জীকে বাছতে গিয়ে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে।

এতগুলো কথা বলেই মনে হল, উঠতি বড়লোক, সবরকম ধান্দায় ওস্তাদ লক্ষ লক্ষ টাকা এই অধুনা ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক আর লোন আর বাণিজ্যের মোচ্ছবে মেরে দিয়ে ইয়োরোপের বনেদী বড়লোকের মতো জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী ভিনোদকে এত কথা বলার মানেই বা কি? নাথিং সাকসীডস্ লাইক সাকসেস। একটা এইরকম বাড়ি, লন, চাকর-বাকর, চারখানা গাড়ি, তার মধ্যে দুটি বিলিতি, সুন্দর পোশাকআশাক, খুশি আনন্দ, মজা এই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণকে অস্বীকার করতে চরিত্রর জোর লাগে। রুষার সে জোর নেই। টুসু মিলিরও নেই। কারণ তাদের হতভাগ্য বাবার কোনোরকম প্রভাবই পড়েনি তাদের চরিত্রে। পড়লে, হয়ত অন্যরকম হত।

যা হবার তা হয়ে গেছে এ জন্মের মতো।

বিনোদ বলল, আমি চানটা সেরেই আসছি। কামিং ইন্ আ জিফ্‌ফী!

এখন রুষা আর পৃথু মুখোমুখী। ছেলেমেয়েরা দূরের দোলনায়।

রুষা বলল, তোমাকে বুঝি না।

আমিও। পৃথু বলল। আমিও বুঝি না আমাকে।

তুমি কি জেলাস? ভিনোদকে কি তুমি...?

আমিও ঈর্ষা করতে পারি এমন পুরুষমানুষ ত এ জীবনে দেখলাম না। ঈর্ষার কথা নয়..

তবে..?

সে প্রসঙ্গ যাক। তোমরা সকলেই তুমি ও আমার ছেলেমেয়েরা যে ভিনোদের কাছে এত অ্যাট-হোম্ ফীল করো এইটে দেখেই ভাল লাগে। সত্যি! তোমরা যা কিছুই চাইলে তার কিছুই দিতে পারলাম না তোমাদের আমি। ভিনোদের মধ্যেই তোমাদের সব অভাব পূরণ হল।

বোকার মতো কথা বলো না। সব অভাব কেউই পূরণ করতে পারে না কারো। কিছু হয়ত পারে, যেখানে ঘাটতি থাকে।

তুমি ভিনোদকে বিয়ে করবে? করো না।

মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

নিয়ে ত যাচ্ছোই সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে জবলপুরে তুমি। কি জিগগেস করবেন ডাক্তার? আমি কি করে বলব তা? তারপর বলল, কী আর বলবেন? বলবেন হয়ত হাউ ডু উ্য ডু? ভাল। আমি উত্তরে বলব, আই ডোণ্ট ডু এনীথিং, মাই ওয়াইফ ডাজ এভরিথিং।

সবটাতে ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

হঠাৎ পৃথু বলল, তুমি ভিনোদের জীবনের মতো জীবনই চেয়েছিলে না? অঢেল টাকা, ঐশ্বর্য, গাড়ির লাইন, পার্টি, দেশ-বেড়ানো, ভাল ভাল শাড়ি, বম্বের জাভেরী ব্রাদার্স-এর ডায়ামণ্ড সেটস্......তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল আমার সঙ্গে থেকে। মিলি টুসুরও! আহা! কত কী শখ ওদের। আমি কীই-ই বা দিতে পারি? কতটুকু!

সেটা কথা নয়। কথা হচ্ছে তুমি ত একটু সময়ও দাও না, দাওনি কোনোদিন তোমার স্ত্রী ও

ছেলেমেয়েদের। আমি যখন কনসিভ করি, দ্বিতীয়বাব, মনে আছে তোমার গাইনীর সঙ্গে প্রথম অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট রাখতে তোমাদের অফিসের মঙ্গল পাঁডেব সঙ্গে পাঠিয়েছিলে তুমি আমাকে ? সে লোকটাকে কোনোদিনও চোখেও দেখিনি আমি তার আগে। আর না-দেখেছি গাইনী ডাঃ চতুর্বেদীকে। এই সব কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। তোমাকে বোঝাতে পাবব না কোথায় আমাদের ক্ষোভ। গাড়ি ড্রাইভাব বেয়ারা বাবুর্চি সব থেকেও আমার স্বামী নেই, মিলি টুসুর বাবা নেই। থেকেও নেই।

ঠিক। টুসু কীরকম ভিনোদের কাঁধে চড়ে দোলনায় দুলছিল। ভারী ভাল লাগছিল দেখে। বাচ্চারা যেখানে আদর, যেখানে আনন্দ সেখানে ত যাবেই। স্বাভাবিক। এমন অদ্ভুত বাবাকে কে চায়।

চলো না পিকনিকে ?

অতক্ষণ তোমাদের দুজনের সঙ্গে কি কথা বলব। ভিনোদ ওব ব্যবসার কথা বলবে, ক্লাব পলিটিকস। রনধীর সিং বাড়িতে বিবাট ককটেইলস পার্টি দিয়েছে সব মেম্বারদেব মাল খাইয়ে বশ কবাব জন্যে। এই-ই সব। বড দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে আমাব। এই কথোপকথন, এই জগৎ, এই ছোট্ট ছোট্ট অ্যামবিশান, অদূবদৃষ্টি, এই-ই সব চেনা জানা কাছের মানুষদেব; হাঁফিয়ে উঠি আমি। বিশ্বাস কবো। ভাল লাগে না। বড বক্র, সর্পিল, বড় অর্থহীন, শুধুই অর্থকরী আর অর্থ ভাবনায় মোড়া এই জীবন। আমি সত্যিই বেমানান্। আমাকে ছেড়ে যাও। তোমরাও এনজয় কববে। আমিও কাজে যাই।

কেন ? আমরা হাউজি-খেলতাম।

হাউজি !

বিস্ময়ের সঙ্গে বলল পৃথু। তাবপর বলল, কোনো পরিণতবয়স্ক, শিক্ষিত মানুষ কী কবে হাউজী খেলে সময় নষ্ট করতে পাবে তা আমার মাথাতেই আসে না। ক্রিমিনাল ওয়েস্ট অফ টাইম। বাচ্চাবা খেললে বুঝি। বডবা কি করে ....কি জানি ?

মনে মনে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। বাগ নয়, অভিমান নয়, দুঃখ নয়, নিছক এক গভীব অপরাধবোধ থেকে এই কথাটা নিরুচ্চাবে বলল পৃথু। রুষা আব তাব ছেলেমেযেব জীবন নষ্ট কবাব কোনো অধিকার নেই তাব।

ছেড়ে দাও আমাকে তোমরা। সমস্ত অন্তব থেকে বলল পৃথু।

কিছু একটা কবতে হবে। এই বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে। কিছু একটা। আত্মহত্যা কববে কি ? প্রায়ই ত মনে হয়...আবার মনে হয় কত কীই করার বাকি, কত সুন্দর কিছু করা হলো না, লেখা হলো না, গাওয়া হলো না গান, প্রতিবাদ কবা হলো না কত অন্যায়, আর অবিচারের, এরই মধ্যে হেরে যাওয়া...না, না, এখনও নয়।

যখন সময় হবে......

ব্রেকফাস্ট খেযে পৃথু যখন অজাইব সিংকে নিয়ে চলে গেল তখন অনেকক্ষণ চলে-যাওয়া পৃথুব পথেব দিকে চেয়ে থাকল রুষা।

অজাইব সিংকে আজ সারাদিনের মতো রাখতে পারে পৃথু। ক্রীসমাসের আগের এই রবিবারে। দারুণ উপহার ! বেচারা ! গাড়ি ড্রাইভার ত পায়ই না। পৃথুও দারুণ এক উপহার দিয়ে গেল রুষাকে। শীতের বেলার এক দারুণ ফুলফলন্ত দিন ! অনুমতির দিন।

চলো, আমরাও বেরোই। হোয়াটস্ দ্যা ডিলে ফর ?

ভিনোদ বলল। অসহিষ্ণু গলায়।

হেভী ব্রেকফাস্ট খেয়ে আলসেমি লাগছিল রুষার। বেশি সে কখনই খায় না, সবসময়ই তার ফিগার নিয়ে সচেতন সে। তবুও সমস্ত নিয়ম মানার মধ্যেই কখনও সখনও সেই নিয়মকে ভাঙার সুখও প্রচ্ছন্ন থাকে। মাঝে মাঝে না ভাঙলে, নিয়মটা একটা বেড়ি হয়ে ওঠে যে, এ কথা রুষা জানে। কিন্তু পৃথু জানে না। তাই-ই ও ওর জেদী একাকীত্বর কচুবনে শুযোরের মতো একগুঁয়ে দাঁত

দিয়ে মাটি উপড়ে বেড়ায়। ছড়ায়, ছিটোয় ; পায় কম। কী জানি কি ও পায়, তা ওই-ই জানে। রুষার জীবনটা কচুবন নয়। কচুবন করে তুলতে দেয়নি রুষা। দেবে না।

ভিনোদের বাবুর্চির মাইনে আটশ টাকা। বুড়ো মানুষ। গাড়োয়ালী। দিল্লীর ওবেরয় ইণ্টারকণ্টিনেণ্টালেও চাকরী করেছে নাকি একসময়। রিটায়ার করেছে অনেকদিন হল। ছেলেমেয়ে সকলেই দাঁড়িয়ে গেছে ভালভাবে উত্তর ভারতের চতুর্দিকে। হাটচান্দ্রার অফিসারস মেস্-এ তার জামাই কাজ করে তাই-ই নাতনীকে দেখতে পাওয়ার লোভে বুড়ো-বুড়ি এখন এখানেই আছে। স্ক্র্যাম্বলড্ এগস্ যা বানিয়েছিল সে, একটু বেকন্, হ্যামের পাতলা পাতলা ফালি দিয়ে ! আহা ! মাস্টার্ড দিয়ে খেয়েছিল রুষা, রেলিশ করে, ব্রেড রোলস্ দিয়ে। সাম'ন্য লেটুস, টোম্যাটো, গাছ পেঁয়াজ, উপরে হালকা স্প্রিঙ্কলিং অফ টাবাস্কো সস্। ফাইন ! তারপব দু কাপ কফি। খেয়ে উঠে এখন গর্ভিনী হরিণীব মতো লাগছে। নডতে চডতে ইচ্ছে করছে না।

তার লছ্মার সিংও বাবুর্চি ভাল। কিন্তু প্রত্যেক বাবুর্চি মাত্রর রান্নাতেই প্রত্যেক পদেরই বিভিন্নতা থাকে। তাই-ই হয়ত ভাল লাগল এত, নতুন হাতের রান্না খেয়ে।

ভিনোদ আবার বলল, শুড উই মেক আ মুভ ?

আল্‌সেমি করেই রুষা বলল, বসে বসেই : অ্যাজ উ লাইক ইট্।

গাডি বেরুল। ডিজেল মার্সিডিজ ওদের জন্যে। পবে অন্য আম্বাসাডরে করে বেয়ারারা আসবে খাবাব এবং অন্য সাজ সবঞ্জাম নিযে। মার্সিডিজ-এর ড্রাইভারকে ছেড়ে দিল ভিনোদ। বলল, দরকাব নেই। অন্য গাডি ত আসছেই পিছনে।

টুসু ও মিলি সামনের সীটে বসল। ভিনোদ ড্রাইভিং হুইলে। রিয়ার গ্লাস-এ চোখ ফেলে রুষাকে দেখল একবার ও। হালকা নীল ইমপোর্টেড টিন্‌টেড গ্লাসে-মোড়া এয়ার-কণ্ডিশনড গাড়িতে হলুদ আর লাল স্ট্রাইপের সিল্কের শাড়ি আব ম্যাচিং ব্লাউজে রুষাকে একটি লাল হলুদ প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছিল। চোখে ফোটোসান্ সান-গ্লাস, আলোর সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলায়। ঠোঁটে লিপস্টিক, শাডিব লালেব সঙ্গে মেলানো। ভিনোদেব ইচ্ছে করছিল সীট টপ্‌কিযে গিয়ে আদর করে দেয রুষাকে। চমকে দেয় হামলে পড়ে। কী যেন ভাবছে রুষা জানালাব পাশে বসে বাঁদিকে চেযে।

টুসু ড্যাসবোর্ডে এটা ওটা ধরে টানাটানি করছিল। সিগারেট লাইটারটাতে ছ্যাঁকা খেল একবার।

রুষা চাপা ধমক দিয়ে বলল, বিহেভ ইওরসেল্ফ টুসু। টুসু একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, এটা কি আঙ্কল ? এই গ্রাফেব মতো মেশিনটা ? ড্যাশবোর্ড-এব সঙ্গে লাগানো ?

কোন্‌টা ?

চোখ ড্যাশবোর্ড-এ নামিয়ে ভিনোদ বলল, ওটা টিউনিং ইণ্ডিকেটব। টিউনিং পারফেকট আছে কী নেই ওটা দেখলেই বোঝা যায়।

আব ঐটা ?

বাঃ ওটা ত থার্মোমিটার ! গাডির মধ্যের ঠাণ্ডা মাপার যন্ত্র।

এখন কি হিটার চালিযে দিযেছ আঙ্কল ? না এয়ার-কণ্ডিশানার ?

এখন কিছুই চলছে না। শুধু ফ্যান আর একজস্ট। শীতের দিন। তার উপর দিনেরবেলা ত। গবমও নেই। এতেই আরাম। কী নয় ?

হুঁ। টুসু বলল।

রুষা বাঁ পায়ের ওপব ডান পাটা তুলে বসল। হ্যাণ্ড-রেস্ট-এর উপর আরাম করে রাখল হাতটা। দুপাশে গভীর জঙ্গল। সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘন সবুজ পাতায় ছেয়ে আছে গাছপালা সব। চিল্‌পির কাছে গিয়েই পথটা দুভাগ হয়ে যাবে। ডানদিকে গেলে মুক্কি, মোগাঁও, মালাঞ্জখণ্ড, বালাঘাট যাবার পথ, আর বাঁদিকে সুফকর-এর রাস্তা। বিয়ের পব পর পৃথু একবার ওকে নিয়ে এক রাতে এসে থেকেছিল এখানে। গরমের দিনে। চাঁদের বাতে। মানুষটার মধ্যে তখনও প্রচণ্ড পাগলামি ছিল, একটা ডাই-হার্ড রোম্যাণ্টিক পৃথু, অথচ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। কতরকমের যে পাগলামি করেছিল সে রাতে রুষাকে নিয়ে, তা মনে করতেও লজ্জা করে। সেসব অনুভূতি স্বামী

স্ত্রীরই একান্ত সব স্মৃতি, প্রকাশ করার নয়। ভাববারই শুধু, কোনো হঠাৎ-আসা অবসরের মুহূর্তে।

পাগলামি ভাল। পাগলামি, প্রাণেরই পূর্ণ এবং সুস্থ প্রকাশ ; প্রকাশ, উদ্বেল জীবনীশক্তির। কিন্তু পৃথু সেই হেল্‌দী কাণ্ডিশান থেকে এগিয়ে গিয়ে সত্যিই পাগল হয়ে গেল। ওর বন্ধু-বান্ধব, জীবনযাত্রা, পোশাক-আশাক সবকিছুতেই রুষা এবং রুষাদের এই সুস্থ, স্বাভাবিক, জীবনযাত্রার প্রতি এক গভীর ডিসঅ্যাপ্রুভাল ফুটে উঠছে অনেকদিন ধরেই। ওর এখনকার পাগলামির রকমটা ডেসট্রাক্‌টিভ। ক্রমশই একেবারে ইনকরিজিবল্ উন্মাদ হয়ে উঠছে।

রুষা নিজে নিয়ে যেতে ভয় পায় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। লোকে বলবে, হয়ত পৃথু নিজেও বলবে ; ভিনোদের জন্যেই পাগল বানাচ্ছে ও পৃথুকে। ওদের ফ্যামিলীতেই ত' ছিল। পাগল আর কে কাকে ইচ্ছে করে বানাতে পারে, ভদ্রলোক ; সৎলোক হলে ?

পাটা আবার বদলে বসল ও। আরাম লাগছে। কোমরের কাছে একটু সির্‌সিরনি লাগছে। ভিনোদ "শ্যানেল নাম্বার ফাইভ" এনে দিয়েছিল একটা কিছুদিন আগেই। শরীরের সমস্ত নিভৃত কোমল প্রান্তরে স্প্রে কবেছে অনেক যতনে তা আজ সকালে চান করে উঠে। সিল্কেব শাড়িও পরেছে ঐ জন্যেই। হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় আদর-টাদব খেতে গেলে সিল্কেব শাড়িই ভাল। ক্রাশড্ হয় না। বোঝা যায় না।

আজকে কিছু একটা ঘটাবে ভিনোদ। সকাল থেকেই ওব চোখ দেখেই বুঝতে পারছে রুষা। বৃষ্টি নামাবে আজ মেঘ। আজ, কেন জানে না, রুষারও অনিচ্ছে নেই। ওর শরীরও ত শরীর ! ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোবা পাহাড়ী এলাকাব ফুল হলেও বেঁচে থাকতে হলে তারও জলসিঞ্চনের দবকার হয়। পৃথুও ত যায় বিজলীব কাছে। যায় না কি ? গেছিল অন্তত কম করে একবার। কে জানে ! পরেও গেছিল হয়ত। তবে ?

শবীরের ভালবাসায় পাপ নেই কোনো। দই চিঁড়ে, ভেলপুরি, দই-বড়া, বিরিয়ানীরই মতো। শুধুই মুখের স্বাদেব জন্যে খাওয়া এসব। পুরুষেব শবীরও সেবকমই। স্বাদ বদলানোর জন্যেই খাওয়া। পাপ কিসের ? পাপ হয় মনে। পাপ ভাবলেই পাপ। শবীবে কোনো পাপ লাগে না। লাগলেও তা ঝরে যায় ধুলোকণারই মতো, ধুয়ে যায় জলেব মতো। শবীরকে খুশি না রাখলে বরং মনেরই বিকৃতি ঘটে যায়। পৃথুর যেমন গেছে। শবীর একটা অনস্বীকার্য রিয়্যালিটী। কাকাতুয়া, কাক, শুয়োব, হাঁড়িচাচা এবং বাঘ সকলেব জীবনেই। ওয়েল ! রুষা ভাবল, আই জাস্ট ক্যুডন্‌ট কেয়াবলেস : ক্যুডনট্ কেযাবলেস।

সুফকরের বাংলোটা খুবই ভাল লাগে রুষার। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এবারে খড়ের ছাদ। নিচু হয়ে এসেছে। একেবারে সুন-সান্নাটা পরিবেশ। সুফকর কথাটাব মানেই হচ্ছে নির্জন। আগে গ্রাম ছিল, তাও টাইগার প্রজেক্ট তুলে নিয়ে অন্যত্র বসিয়ে দিয়েছেন। এখন শুধু বাংলোর সামনের ধীবে ধীরে উঠে যাওয়া পাহাড়টার মধ্যে থেকে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস আর পাখিদের কলকাকলী ভেসে আসে। ফিস্‌ফিস্ ; কিস্‌কিস্...

গাড়ি থেকে নেমেই এনার্জেটিক, ভিনোদ উইকেট পুঁতে মিলি ও টুসুর সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে লেগে গেছে। বোদে চেয়ার পেতে বসে রুষা ওদের খেলা দেখছে। ভিনোদ ব্যাট করছে। মিলি উইকেটকীপার। আর টুসু বোলার। ভিনোদ কি ইচ্ছে করেই বার বাব টুসুর একেবারে হাতের মধ্যেই ক্যাচ তুলে দিয়ে আউট হযে টুসুকে বলছে "ওযাট আ বোওলার" তা লক্ষ কবছে রুষা। মিলিকে ব্যাট করতে দিয়ে অতি সোজা আলতো শর্ট্-পিচ্‌ড বল ফেলে মিলিকেও ইচ্ছা করেই তাড়াতাড়ি রান তুলতে দিচ্ছে।

রুষা বারান্দার ইজীচেয়ারে বসে এসব দেখছিল আর ভাবছিল, ভিনোদ বাচ্চাদের মন পেতে জানে। তাদের কাছে কী করে যে হেরে গিয়ে জিততে হয় সে বিদ্যা ভিনোদ পুরোপুরি বপ্ত করেছে। টুসু মিলি যদি ওর নিজের বাচ্চা হত তাহলে ওরা কত খুশিই না হত। কিন্তু ভিনোদের নিজের যদি কখনও ইস্যু হয় তার পবও কি টুসু মিলিকে ও এমনিই চোখে দেখবে ?

যদি....

জানে না। এক্ষুনি অতদূর অবধি ভাবতে চায়ও না রুষা।

ভিনোদ খেলা শেষ করে মাঠের মধ্যে মহামূল্য জামাকাপড় পরে থেব্‌ড়ে বসে পড়ে বলল, আজকে তোমাদের একটা দারুণ সারপ্রাইজ দেব আমার বাড়িতে রাতে, যখন ফিরে গিয়ে ডিনার খাব আমরা।

হোয়াট আঙ্কল ? হোয়াট আঙ্কল ?

বলে, ছেলে ও মেয়ে দুজনেই লাফাতে লাগল।

মিলিটা বড় হচ্ছে। ইন-ফ্যাক্ট, মধ্যবিত্ত বাঙালীর বাড়ির মেয়ে হলে শাড়ি পরত দুবছর আগে থেকেই। কিন্তু দিনকাল পালটে গেছে। তাছাড়া মধ্যবিত্তদের দলে আদৌ পড়ে না রুষা। পড়তে চায়ও না। তবু, ওর শিশুবেলা থেকে অভ্যস্ত চোখে হঠাৎ হঠাৎ অনভ্যস্ত এই সবই একটু দৃষ্টিকটু লাগে। তাছাড়া, ভিনোদ। মিলিকে সাবধান করে দিতে হবে। সময়মত পৃথু সম্বন্ধেও সাবধান করে দিয়েছিল। হ্যাঁ তার নিজের স্বামী সম্বন্ধেও। পুরুষ বাঘ আর পুরুষ মানুষ বিশ্বাসের নয়। রাত-বিরেতে বাড়ি ফেরে মত্ত অবস্থায়। পুরুষকে ত ভগবান মানুষ করেননি, জানোয়ারই করেছেন। পুরুষ জাতটাব মধ্যে মানুষ কমই,শুধুমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই বেশি। পৃথু সম্বন্ধে মিলিকে সাবধান করে দেওযার পর থেকেই মেয়েটা একটু কুঁকড়ে থাকে, আড়ষ্ট হয়ে। পৃথু ডাকলেও কাছে যায় না। সরল পৃথু কি ভাবে,কে জানে ? মেয়েকে ডেকেও সাড়া না পাওয়ায় পৃথুর ঘর থেকে স্বগতোক্তি কানে আসে । জানলে, খুবই দুঃখ পাবে। কিন্তু রুষা নিরুপায়। সে যে, মা!

একা একা শুয়ে শুয়ে কত কি আবৃত্তি করে পৃথু বেশীই ট্র্যাশ বাঙলা কবিতা। সামান্যই ইংরিজী। ইংরিজীর ছাত্র যদিও রুষাই, তবু মাঝে মাঝে পৃথুর ইংরিজীর জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা দেখে চমকে যায় ও। ভালোবাসার কোনো বেড়া নেই। ভাষার ভালোবাসার ত নয়ই।

বললে না ভিনোদ আংক্‌ল, কি ? কি হবে রাতে ?

আমি, আমি না একটা ভি সি আর কিনেছি, অনেকদিন হল। তোমরা ত এলেই না একদিনও। কত ফিল্ম নিয়ে এসেছি জানো না ? একটা ক্যামেরাও। আজ তোমরা কি ছবি দেখবে বলো ? "আ স্টার ইজ বর্ন", "ব্রিজ অন দ্যা রিভার কাওয়াই" ? "বেন্‌-হুর্‌", না "লরেন্স অফ অ্যারেবিয়া" ? নাকি "দ্যা ফিডলাব অন দ্যা রুফ" ? নয়ত "উইদারিং হাইট্‌স"-এমিলি ব্রন্টির ?

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অন্য গাড়িটিও এসে গেল। দুজন বেয়ারা টপাটপ নেমে পড়ে বাংলোর লনের এক কোণাতে বার সেট-আপ করে ফেলল। আইস-বাকেট্‌। শেরী, জিন্‌, ভড্‌কা,বীয়ার, ফ্রুট জ্যুস্‌ নানারকম। সাদা টেবল ক্লথ পাতলো চাকালাগানো সাদা ট্রলির উপর।

তোমরা কি খাবে ?

ফ্রেশ লাইম জুস্‌ উইথ সোডা। মিলি বলল।

টুসু বলল, আমি একটা গোল্ড কয়েন অ্যাপল্‌ জ্যুস্‌ খাব।

ফাইন্‌।

বলল, ভিনোদ।

তারপর বেয়ারারা দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও নিজে হাতে গ্লাস ঝাড়ন দিয়ে মুছে ওদের ড্রিঙ্কস্‌ সার্ভ করল।

তারপর বলল, নাউ, ইয়াং লেডি, ইয়্যাং ম্যান হোয়াট ডু উ্যা প্রোপোজ টু ডু ? আরও কিছুক্ষণ কি আমরা ক্রিকেট খেলব বিফোর লাঞ্চ ? না তোমরা দুজনে মোগাঁওর হাটে গিয়ে দেখবে মাছ-টাছ পাওয়া যায় কি না ? মাছ খেতে কে বেশি ভালবাসো ?

টুসু।

মিলি বলল।

এমন সময় একটা হলুদ পাখি এসে সামনের গাছের ডালে বসল।

মিলি বলল, কী পাখি এটা আংক্‌ল ? কী সুন্দর !

ভিনোদ একটুক্ষণ চেয়ে বলল, হুম্‌ম্‌ ! আই সী। আ বার্ড। চিড়িয়া অফ সাম কাইণ্ড ? কোয়াইট

বিউটিফুল, ইজন্‌ট ইট ?

টুসু হেসে ফেলল, বলল, এ ত ওরিওল্‌।

যে গাছে পাখিটা বসে আছে গাছটার নাম কি আংকল্‌ ?

আবার শুধোল মিলি।

পেঁড়ই হ্যায় ব্যস্‌স্‌। জঙ্গলকা পেঁড়। নাম ধাম কওন্‌ জানতা ? হু নোজ ? অ্যাণ্ড হোয়াটস দ্যা ইউজ ? আই আম নাইদাব আ বটানিস্ট নর এন অর্নিথোলজিস্ট !

টুসু দুহাতে গোল্ড কয়েন অ্যাপলজ্যুস-এর গ্লাসটা ধরে বলল, এমা ! ইভিন দিস ট্রী, আঙ্কল ডাজ নট নো ! এটা চিল্‌বিল্‌ গাছ।

মাই গুডনেস্‌ ! হোয়াট আ নেম। চিল্‌বিল !

রুষা গলা তুলে গর্বমাখা গলায় বলল, টুসু। তুই এতসব জানলি কি করে ?

এতসব কি ? বাবার কাছ থেকে কবে এসব চিনেছি। বচ্‌পনমে।

রুষা হেসে উঠল ওর কথার ধরনে। বচপন্‌মে ! যেন শেষই হয়ে গেছে ওর বচপন্‌।

রুষা চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসল। বলল, বাবার সঙ্গে তোর দেখাই বা হয় কতটুকু ? কখন আবাব উনি তোকে গাছ পাখি এসব চেনালেন ?

টুসু ভুরু নাচিয়ে হাসল। দুষ্টুমিব হাসি। তাবপর বলল, চুপকে চুপ্‌কে।

মিলি ডাকল, যাবে ত চলো টুসু। আমি কাঁচেব চুড়ি কিনব মোগাঁও-এর হাটে। মাছ কিনলে তুই কিনিস। মা-আ-আ গিভ মী সাম মানি…প্লীজ।

আমার পকেট মানি সব ফুরিয়ে গেছে।

ভিনোদ তাড়াতাড়ি পার্স খুলে দুজনকেই একটি করে একশ টাকাব নোট দিল।

ছেলেমেয়েরা হতভম্বমুখে তাকাল একবার মায়ের মুখে। আরেকবার ভিনোদের মুখে।

রুষা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ খুলল নিজের। দুটি দশ টাকার নোট দুজনকে দিয়ে বলল আংকল-এর টাকা আংকলকে ফেবত দিয়ে দাও।

ভিনোদ বলল, আই ফীল ইন্‌সালটেড রুষা। জেনুইনলি।

রুষা বলল, আমার ছেলেমেয়েদের আব সব অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মসম্মানজ্ঞানটাও শেখাতে চাই। এ নিয়ে কোনো তর্ক কোরো না প্লীজ, ডোণ্ট স্পয়েল দ্যা কিডস্‌।

বেয়ারাদের ও ড্রাইভারদের ভিনোদ টাকা দিয়ে কী সব বুঝিতে দিতেই ওরা সকলে মিলে গাড়িতে চলে গেল।

এখন ওরা একা। রুষা আর ভিনোদ। সাজানো বার-এর সামনে লনের মধ্যের গাছতলায়।

ভিনোদ বলল, ওয়েল, আই অ্যাম হার্ট।

উ্য শুডনট বী, ভিনোদ। মানি ক্যান বাই ওল্‌মোসট এভরীথীং আণ্ডার দ্যা সান। বাট, নট ওল্‌। ডোণ্ট ট্রাই টু বাই-আপ্‌ মাই চিলড্রেন্স সেল্ফ-রেসপেকট। তুমি ভুলে যেও না ভিনোদ। ওরা শুধু আমারই নয়, পৃথুরও ছেলেমেয়ে। ওদের শরীরে পৃথুর রক্তও বইছে। এবং কী বলব তোমাকে, যখনই ও কথা ভাবি তখন যদিও জানি যে, ওদের আমিই সব, সবকিছু ; তবু একটা জায়গাতে, ওদের পার্সোনালিটির কোনো কোনো এরীয়াতে ওদের বাবার রক্ত আমার রক্তর চেয়ে অনেক বেশি ডমিন্যাণ্ট। বিশ্বাস করো, যখন বুঝতে পাই যে, আমি সবসময় জিতে থেকেও আসলে হেরে যাচ্ছি পৃথুর কাছে, ছোট হয়ে যাচ্ছি তখন….

ট্রাউজারের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ভিনোদ রুষার মুখে চেয়ে বলল, তখন কি ? তখন খুব কষ্ট হয়, তোমার না ?

না, না। তা নয়, কষ্ট নয় ; কী বলব ! জানো, খুব আনন্দ হয়।

আনন্দ ? স্ট্রেঞ্জ !

বলল ভিনোদ, বিমর্ষ মুখে।

কিছুক্ষণ ও টুসুর চিনিয়ে দেওয়া চিল্‌বিল্‌ গাছ আর একটু আগে উড়ে-যাওয়া ওরিওল পাখিটার

চলার পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল শীতের সকালে ট্রাউজারের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে রুষার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওর দু কাঁধে হাত রাখল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, শুড আই ফিক্স্‌ ট্যু আ ড্রিঙ্ক ডার্লিং ?

রুষা উত্তর দিলো না। মুখ নিচু করে রইল। অন্যমনস্ক হয়ে।

ট্যু ওয়ান্ট আ শ্যাণ্ডী অব আ জন-কলিনস্‌ ? অব, মেরী সামথিং এলস ?

না। গিভ মী আ ব্লাডি-মেরী প্লীজ। অ্যাণ্ড মেক ইট স্টিফ। রিয়ালী স্টিফ।

হেসে উঠল ভিনোদ।

বলল, হোয়াট আ ডে। ডার্লিং রুষা ইজ আসকিং ফর আ স্টিফ ড্রিঙ্ক। ওয়েল ! দ্যা প্লেজার অ্যাণ্ড দ্যা বেনিফিটস উইল ওল্‌ বী মাইন··।

ভিনোদ যখন খুব বড় করে একটা ভড্‌কা ঢেলে তার মধ্যে টম্যাটো জ্যুস মিশিয়ে, ফ্লাস্ক থেকে আইস কিউব বের করে মিশিয়ে ব্লাডি-মেরীটা নিয়ে এল রুষার কাছে তখন দেখল রুষার দু চোখের কোণ ভিজে। নিচের দাঁত দিয়ে উপরের ঠোঁট কামড়ে আছে। শীতের অলস হাওয়ায় অলকচূর্ণ উড়ে উড়ে পড়েছে কপালে।

ভিনোদ বলল, কাম, হানি ! টেক ইওর ড্রিঙ্ক।

গ্লাসটা রুষার হাতে তুলে দিয়ে ওর পাশে চেয়ার টেনে নিজের পিংক জিনের গ্লাস নিয়ে বসতে বসতে নিজের মনেই বলল ভিনোদ, দীজ উইমেন ! রিয়্যালী, আ স্ট্রেঞ্জ লট ! আই অ্যাম নট গোয়িং টু টাচ আ ম্যারেজ ইভিন্‌ উইথ আ পোল।

বিয়ে-টিয়ে চলত হয়ত এক সময়ে এক যুগে, যখন বয়েল-গাড়ি করে লোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত। এই যুগে, এই জেট-এজ-এ বিয়ে ব্যাপারটাই অবসলিট হয়ে গেছে। কার সময় আছে এসব ফালতু সেন্টিমেন্ট, কান্না, এসব মান-ভাঙানোর ?এখন গিভ অ্যান্ডটেক-এর দিন। ইট, ড্রিঙ্ক, বী মেরী, বাই এনী মীনস। চুরি করো, ডাকাতি করো, কিন্তু ভাল থাকো, লাইফ এনজয় করো। সেন্টিমেন্ট, বিবেক এসবের দিন চলে গেছে বহুদিন আগে।

রুষা পথের ওপাশের পাহাড়ে চেয়েছিল উদাস চোখে। জানোয়ারদের পায়ে চলা শুঁড়ি পথ নেমে এসেছে একটা, পাহাড়টা থেকে, অন্য আরেকটা শুঁড়ি পথ তাকে পনেরো ডিগ্রীতে কেটে গেছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বোধ হয় নুন দিয়েছেন ধারে কাছে কোথাও জমিতে। অথবা ন্যাচারাল সল্টলিকও থাকতে পারে। এসব পৃথুর মুখস্ত। রুষা জানে না।

রুষা বলল, এই পথটা কোথায় গেছে, জানো ভিনোদ ?

কোন পথটা ?

ভিনোদ গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। চম্‌কে উঠে বলল, কোন্‌ পথটা ?

ঐ যে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে। দেখতে পাচ্ছো না ?

কে জানে ? জঙ্গলের পথ জঙ্গলেই গেছে। কে তার খোঁজ রাখে ? জংলীরা রাখে হয়ত। পিচের রাস্তার কথা বল, হাইওয়ের কথা বল ত বলতে পারি। সেই সব পথের ডিস্টিংক্ট ডেস্টিনেশান আছে। এই সব অস্পষ্ট, আনইমপর্ট্যান্ট জানোয়ার-চলা পথের খোঁজ রেখে লাভই বা কি ? এ সব হল পৃথুদার ডোমেইন্‌। যার কোনো কাজ নেই সেই এইসব জেনে শুনে রাখে।

রুষা জবাব দিলো না। ভিনোদ ভেবেছিল, খুশি হবে রুষা। কারণ ভিনোদ জানে যে, রুষা ঘেন্না করে পৃথুকে। এক গভীর ঘেন্না। সত্যিই হয়ত করেও, কিন্তু তবুও রুষা খুশি হল না ভিনোদের এই কথায়।

রুষা, ব্লাডি মেরীর আশ্লেষে নানা কথা ভাবছিল, এলোমেলো। ভাবছিল, একজন শিক্ষিত মানুষের জীবনে অবিমিশ্র কোনো অনুভূতি বোধহয় থাকে না। ঘৃণার মধ্যে প্রেম মিশে থাকে, প্রেমের সঙ্গে ঘৃণা, মালটি লেয়ারড আইসক্রীমের মতো। মূল স্বাদটা যা, তাইই বোধহয় জিভে লেগে থাকে, অন্য স্বাদগুলো ক্বচিৎ জাগে, অবচেতনের ঘুমিয়ে-থাকা সাধের মতো। পৃথুকে অনেক কারণে ভালও বাসে, শ্রদ্ধাও করে রুষা। পুরোপুরি ঘৃণাও করে না।আবার পুরোপুরি ভালোও বাসে না।

ভিনোদ দেখতে দেখতে ওর গ্লাস শেষ করে ফেলল খুব কম সময়েই। করেই, রুষার গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল। বলল, হ্যাভ আ সেকেণ্ড ফীল্। কুইক। আমাদের সময় কিন্তু বেশি নেই। ঘরে চলো। ওদের যেতে-আসতে-ঘুরতে বেশি ত ঘণ্টাদুয়েক লাগবে।

কেন জানে না, রুষার আজকে নেশা করতে ইচ্ছে করছিল। না, ভিনোদের আদর খাবে বলে নয়, নিজেকে একটু ভুলবে বলে ; নিজের মধ্যে থেকে নিজে বেরিয়ে এসে একটি ওরিওলপাখির মতো চিলবিল্ গাছের উঁচু ডালে বসে নিজের ছেড়ে-রাখা খোলসটাকে শীতের চকচকে রোদদুরে দেখবে বলে। পৃথু ওকে অনেক কিছু দেয়নি এই জীবনে, আবার দিয়েওছে অনেক কিছুই। এই সব ভাবনার ক্ষমতা দিয়েছে, দিয়েছে এই অনাবিল চোখ, খোলা হাওয়ায়, প্রকৃতির মধ্যে নাক ডুবিয়ে জীবনকে ভালোবাসার এই তীব্র তাগিদ। স্বীকার করুক আর নাই সে করুক তা মুখে। পৃথু পৃথুই।

ভিনোদের এই ব্যাপারটা ভাল লাগে না। আদর করা বা আদর খাওয়া ব্যাপারটার মতো রোম্যান্টিকতম একটা ব্যাপারকেও বড় স্থূল, মান্‌ডেন্ করে ফেলে। পৃথু হলে, ওকে নিয়ে একচক্কর হেঁটে আসত জঙ্গলে, ফুল চেনাত, পাখি, প্রজাপতি, নদীর শুকনো বুকে বসত, চিকন পাখির ডাক শুনে মনে মনে হারিয়ে যেত কতক্ষণ, তারপর কাঁচপোকার শব্দে ঘোর কাটত। অনেকক্ষণ পর বলত, চলো, এবার আমার কাঠবিড়ালীকে একটু আদর করি, কতদিন হাতে নিই না আমার সুন্দর পায়রা দুটিকে! কেমন আছে গো তারা?

রুষা হেসে, মুখে বলত অসভ্য।

মনে মনে বলত একেই বলে সভ্যতার কনসেপ্ট। এই মানডেন জীবনটাকে ঘোলা, একঘেয়ে দৈনন্দিনতা থেকে জীবনকে হঠাৎই অনেক উঁচুতে গ্রীষ্মের চাঁদের রাতের সাদা ধবধবে গাছেদের বনের পত্রশূন্য ডালেদের মসৃণ পেলব চাঁদোয়াতে তুলে দিতে কী করে যে হয়, তা পৃথুই জানত।

কিন্তু সেই পৃথু আর নেই। বদলে গেছে। আর রুষা? সেই রুষাও কি আছে? বদলায়নি একটুও?

ভিনোদ রুষার জন্যে ব্লাডি-মেরী বানাতে বানাতেই আর একটা পিংক-জিন নিজে খেয়ে ফেলল। তারপর আরও একটা নিজের জন্যে নিয়ে রুষারটা হাতে করে এনে বলল, কুড উই গো ইন দ্যা রুম নাউ।

নট ইয়েট।

রুষা বলল। কেটে কেটে।

মনে মনে বলল, এখনও নয়, এখনও নয় ভিনোদ। পৃথুর চোখের চাউনি, মিলি ও টুসুর গলার স্বরে এখনও কান ভরে আছে আমার। বিবেক এখনও ঘুমোয়নি। আরও একটা ব্লাডি মেরী খাই। অ্যানাদার স্টিফ ওয়ান খাই। তারপর। ঘুমন্ত বিবেকের মনহীন শরীরের রুষাকে নিয়ে তুমি একটা জন্তুর মত যা-খুশি কোরো। তুমি এত খাওয়াও, আমার ছেলেমেয়েদের এত ভালবাসো, এত প্রেজেন্ট দাও, আমাকে সবসময় এত মনোযোগ দাও, আর তোমাকে কিছু না দিয়ে কি পারি? আমি কি এতই ইতর? জীবনের অনেক ঋণ, কৃতজ্ঞতার ভার, অনেক মেয়েদের ত শরীর দিয়েই মেটাতে হয়। মেয়েমাত্রই এ কথা জানে। ফিরিয়ে দেবার অন্য সাধ্য থাকলে হয়ত অন্যরকম হত। তা যে হয় না।

ওক্কে!

বলল ভিনোদ। অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল ও। ওর চোখ মুখ উত্তেজিত। গাল লাল, গা দিয়ে গরমের হলকা উঠছে। মনে হচ্ছে, যেন জ্বর হয়েছে। ভালুকদেরও, শুনেছে রুষা, দিনের মধ্যে এরকম হঠাৎ হঠাৎ জ্বর আসে। আর পুরুষদের কাম-জ্বর।

একটু পর ভিনোদ হঠাৎই বলল, চলো, যাওয়া যাক। ওরা এসে পড়লে এমবারাসিং অবস্থা হবে।

ততক্ষণে রুষার মস্তিষ্কে ব্লাডি মেরীর মাকড়শা জাল বিছিয়ে দিয়েছে। পায়ে ভর নেই।

বাংলোর চৌকিদারকে ডেকে বাইরে লাগানো বার দেখতে বলল ভিনোদ। পাখি-টাখি যেন গেলাস টেলাস উল্টে না দেয়। চৌকিদারকে ডেকে একটা বীয়ারের বোতলও দিল। বলল,

হামলোগ চলা যানেকা বাদ পীনা। সমঝা।

ঘুষ ! অন্যায় কিছু ঘটলেই সেখানে ঘুষ জন্মায়, বৃষ্টির পর ব্যাঙের ছাতার মতো। চৌকিদার বুঝল, যা বোঝাব। আড়চোখে রুষাব দিকে চেয়ে বলল, হাম হিঁয়া চৌকিমে হ্যায় হুজোর। আপলোগ বে-ফিক্কব রহিয়ে।

ভিনোদের মুখ ক্ষণিক লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। রুষার পেছন পেছন বাংলোর ঘরে ঢুকল।

রুষা গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল। ছায়াছন্ন ঘরটা। চড়ুই ডাকছে খড়ের চালে। একটা ঝাঁকড়া বাঙাজবাব গাছ। অজস্র ফুল এসেছে তাতে। বুলবুলি শীষ দিচ্ছে। অমলতাস গাছেব নরম পাতাবা মন্থব বাতাসে ধীরে ধীবে আন্দোলিত হচ্ছে। জানালা দিয়ে সামনের পাহাড়, কাটাকুটি-পথ, ঘননীল আকাশ চোখে পড়ছে। একলা পাহাড়ী বাজ উড়ছে একটা ঘুরে ঘুরে।

উঠে বসল আবাব রুষা। তার স্বামীব কথা, পৃথুব কথা মনে হল তাব। গ্লাসটা একচুমুকে শেষ কবে দিল। বটমস আপ। আর মনে পড়বে না পৃথুকে এখন।

ভিনোদ ততক্ষণে সম্পূর্ণ অনাবৃত কবে ফেলেছে নিজেকে। এগিয়ে আসছে রুষাব দিকে। গুহামানবের মতো। মার্সিডিজ গাড়ি, লনওয়ালা বাড়ি, বাগান, উর্দীপরা বেয়ারা—বাবুর্চি, ভি সি আব, মর্যাদা, যশ, মান সম্মান, টাকাব গবিমা সব গাছের বাকলেব মতো খসে পড়েছে তাব গা থেকে। এইই চিবন্তন পুরুষ। ভাবছিল রুষা। ভালুকের মতো। বুকময় চুল, হাতে পায়ে তলপেটে ; জন্তু একটা।

রুষা চোখ বুঁজে ফেলল।



ভিনোদেব বাংলো থেকে বেবিয়েই মজাইব সিং বলল, কাঁহা সাহাব ?

কাঁহা ?

এই প্রশ্নটা পৃথুকে চিবদিনই বিব্রত কবে। যাওয়াব জায়গা তো তাব কোথাওই নেই

ক্লাবে যাবে ?

ছুটিব দিন। তাব উপরে সামনেই ক্লাবেব ইলেকশান। একদল ওয়েল-অফফ মানুষ রঙচঙে জামা পবে কী দারুণ মনোযোগেব সঙ্গে কী দারুণতব অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি ছোট ছোট চড়াই-সুখেব আলোচনায় এখন প্রচণ্ড ব্যস্ত সেখানে।

ফিস-ফিস-, ফুস-ফুস।

মিঃ সেনের বাড়ি যাবে কি ? তাসের আড্ডা বসেছে সেখানে এখন জোব।

নাঃ

মিঃ গাঙ্গুলী ?

মোসাহেবেরা ভিড় করে আছে আর উনি কিং ক্যানিউটেব মতো লনের গোলাপবাগানেব সামনে চেয়াবে বসে সামনের টেবলে দুটি গোদা-গোদা পা তুলে দিয়ে বাজা-উজিব মাবছেন। ব্যাংককে তাঁব মোষসদৃশ দাদ-ঘষঘষ নিম্নাঙ্গ এবং থলথলে থাই ; থাই-মেয়েদের দিয়ে কেমন মালিশ কবিয়ে এলেন তাবই রসালো গল্প অথবা হংকংয়ে কেমন গ্রাণ্ড সেরিমনির সঙ্গে চিঁচিঁ-বাঁদরের ঘিলু খেলেন নীট ভি, এস, ও, পি ব্রাণ্ডি সহযোগে, সবচেয়ে দামি রেস্তোরাঁতে, তারও গল্প। এই মানুষগুলোর প্রতি অনুকম্পা ছাড়া অন্য কিছু নেই পৃথুব। ক্রোধ হয় চামচেগুলোব উপর। এই মোসাহেবরাই

কালচার্ড এবং আনকালচার্ড বাঙালিদেরও ঘুণপোকার মতোই কুরে খেয়ে যাচ্ছে অনুক্ষণ।

অজাইব সিং আবারও শুধোল পথের মোড়ে এসে ; কাঁহা সাহাব ?

ঠিক সেই সময়ই পৃথুর বুকের মধ্যে কে যেন আমূল ছুরি বসিয়ে দিল একটা। আত্মবিস্মৃত ; অকৃতজ্ঞ পৃথুর।

কুর্চি !

তার কুর্চি যে হারিয়ে গেছে !

কুর্চি-ই-ই-ই.....ই.....ই....

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল পৃথুর। কুর্চির চিঠিটি পাবার পর থেকে তাকে খুঁজে বের করার কোনোই চেষ্টা করেনি সে। কান্নাটাকে গিলে ফেলল। প্রায় অসম্ভব হলেও গিলল। ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক কাঁদে না, ড্রাইভারের সামনে তো নয়ই। মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ তাকে তার মূল স্বাভাবিকতা এবং মূল বাসভূমি প্রকৃতি থেকে বহু দূরেই নিয়ে এসেছে। ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে। 'শো অফ ইমোশান' প্রাকৃতজনেরই লক্ষণ।

ছিঃ।

বায়না চলো।

পৃথু বলল।

ভাটি বাবুকো ঘর ?

একটু অবাকই হল পৃথু।

অজাইব সিং লোকটা একটু বেশি বুদ্ধিমান। মালিকের চেয়ে তার কর্মচারী বেশি বুদ্ধি ধরলে, মালিককে খুবই সাবধানে থাকতে হয় এম্‌বারাসমেন্টের হাত থেকে বাঁচতে এবং এই সাবধানতার কারণে একটা বাড়তি টেনসনেরও সৃষ্টি হয়।

বলল, হাঁ।

মগর উনোনে তো হ্যায় নেহী বায়নামে।

গ্যায়া কঁহা ?

যেন, জানে না ; এমন ভাব করে বলল পৃথু।

জেল হো গ্যায়া না উনকো। মান্দলামে হ্যায়। মর্‌দানা ফটকমে। উনকা বিবি

বলেই, চুপ করে গেল চালাক অজাইব সিং। ওর বুকের মধ্যে ওর প্রিয় গানটা নীরবে বেজে উঠল : "হায়! ঝুমকা গীড়ারে। ব্যাবিলিকা বাজার মে ঝুমকা গীড়ারে। হাম দোনোকা ঘাবড়ার মে, ঝুমকা গীড়ারে। ঝুম্‌কা, ঝুম্‌কা, ঝুমকা গীড়ারে·

পৃথু বলল, কুর্চি মেমসাব ? উনোনে কাঁহা হ্যায় ? পাত্তা হ্যায় ?

মুঝে মালুম নেহি হ্যায়। মগর শুনে যে, যো বায়না ছোড়কর চলী গ্যয়ী।

মালুম কৈসে হুয়া ? ঔর গ্যয়ী কাঁহা ?

অজাইব সিং গাড়ি ঘুরিয়ে মান্দলার দিকের পথে চলল। স্টিয়ারিং শক্ত করে ধরে সোজা পথের দিকে চেয়ে বলল, আমার এক পিসতুতো শালাও ঐ চোরাচালানের দলে ছিল। তার হয়েছে দশ বছর।

একটু চুপ করে থেকে অজাইব সিং বলল, ভাটুবাবু কিন্তু মানুষ সুবিধের নয়। আগে যে চাকরি করতেন সেখান থেকেও চুরির দায়ে চাকরি গেছিল। সকলেই জানে। কুর্চি মেমসাব যায়সী আওরাতকি জিন্দগীই বরবাদ হো চুকি।

হুঁ।

লজ্জিত গলায় বলল পৃথু। আর কীই বা বলতে পারে ? ভাটু যে মানুষ গোলমেলে, গুলবাজ, এবং ধূর্তচূড়ামণি তা বুঝত ও। কিন্তু প্রেমিকার স্বামী অথবা কুকুরের আবার ভালমন্দ কী ? তাদের অ্যাকসেপ্ট করে নিতেই হয়।

কুর্চি মেমসাহেব আছেন কোথায় ? কোন জায়গায় ? কার বাড়িতে ?

ম্যায় ক্যায়সে কঁহু সাহাব ? মগর্ আপ হুক্‌ম্ করনেসে পাত্তা লগানে শক্‌তা।

কৈসে ? অজাইব সিং ?

যাঁহা যাঁহা ঢুঁড়না পড়েগা সবহি জাগেমে যাউঙ্গা। ছোড়েগা থোড়ি !

শেকোগে অজাইব সিং ?

পৃথুর গলাটা যেন ভয়ার্ত শোনাল নিজেরই কানে।

অজাইব সিং অবাক চোখে তাকাল তার সাহাবের চোখে। এমন কাকুতিভরা, দ্বিধাগ্রস্ত গলায় তার সাহেব কখনও কথা বলেনি। আর এমন অসহায়ের চোখে কখনও তাকায়ওনি তার জবরদস্ত্ কিন্তু ভোলেভালা সাহাব তার চোখে কোনোদিন।

ঘুরে বসে, গোঁফে হাত ছুঁইয়ে অজাইব সিং বলল, জরুর শেকেগা। হুজৌর্ কা মেহেরবানিসে। মগর্ এক আর্জি হ্যায় হুজৌর।

ক্যা ?

চারগো টি, এ বিল্ পড়া হুয়া হ্যায় বহত্ দিনোঁসে। উও খিট্‌মিটিয়া অ্যাকাউন্ট্যান্ট সাবনে পাস্ করতাহি নেহী। হামসে ভী কমিশন্ মাঙ্গ রহে হেঁ। ম্যায় বোলিন, ডাণ্ডা দেগা, কমিশন-উমিশন্ হামসে নেহী মিল্‌না। হাম ঘোষ সাহিবকা ড্রেবাইবার বা !

কৌন বাবু ?

পাণ্ডে বাবু হুজৌর। ঔর কোন্ ? ইতনা পইসা পিট লিয়া কা কঁহু ! কোই ভী পেমেন্ট দেহাতি নেহী বেগর পইসা। মৌগাও মে তো মোকান্ ভী বানা লিহিস্। ই কোম্পানি হুজৌর সব চোর ঔর ডাকুসে ভর চুকে হ্যায়। নতিজা ভারী খরাব নিক্‌লেগা।

পৃথু মনে মনে বলল, সমস্ত দেশেরই এখন এই অবস্থা। হাটচান্দ্রা শেল্যাক কোম্পানি ব্যতিক্রম হবে কী রে ?

ওসব কথার উত্তর না দিয়ে ওকে একটি কুড়ি টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমারা খানেপীনেকা লিয়ে রাখ্‌খো। আর আমাকে ভুচুর গ্যারাজেই নামিয়ে দিয়ে যাও। তারপর রায়না থেকে খোঁজ আরম্ভ কর। মান্দলা, টিকেরিয়া, বালাঘাট—যেখানে যেতে চাও যাও কিন্তু আমার খোঁজটা এনে দেবে। যদি দেখা পাও, তাহলে কুর্চিদিদির কাছ থেকে দু'লাইনের চিঠিও আনবে একটা। বলবে, খুবই চিন্তায় আছি আমরা সকলেই ! আর কী উপকার করা যেতে পারে, যে-কোনো উপকার, সে সম্বন্ধেও ভাল করে খোঁজ নিয়ে এসো। তুম্‌হারা দিমাগ্‌মে অকল হ্যায় অজাইব সিং। ইয়ে কাম হামারা ঠিক্‌ঠাক্ করকেই আনা। সমঝা ?

জী হুজৌর। সমঝা। ম্যায় আপ্‌কি কাম করকে তব্‌হি লওটুঙ্গা। ম্যায় নেহী লউটুঙ্গা তো মেরী ডেড্ বডি লওটেগা পাত্তা লে কর্।

এই হিন্দি সিনেমাগুলোই খেল সবাইকে। কথায় কথায় ডায়ালগ্ ঝাড়ে প্রত্যেকেই। ভাবল, পৃথু।

বিরক্ত গলায় বলল, ফজুল্ বাতেঁ বন্ধ করো। আভ্‌ভি জল্‌দি চলো গারাজ।

পৃথু ভাবছিল, কাল সকালে অফিসে গিয়েই পাণ্ডেকে বলে অজাইব সিংয়ের টি, এ বিলগুলো পাশ করে দিতে বলবে। আজকাল সংসারে একটি ছোট্ট উপকার চাইলেও কারও কাছে, সে যতটুকু পারে বদলে নিয়ে নেয়। চেয়েই হোক, কি কেড়েই হোক। অজাইব সিংও ব্যতিক্রম নয়।

দূর থেকে ভুচুর গারাজের সামনে একটু জটলামত জমেছে মনে হল। অনেক সময়ই হয়। কোনো কাস্টমার বিল পেমেন্ট করা নিয়ে ঝামেলা করে, কখনও মেকানিক্ আর মিস্ত্রিরা গোল হয়ে আড্ডা মারে। কখনও মারামারিও হয় নিজেদের মধ্যে। আপসে মেটে, কখনও-বা মাথাও ফাটে। যাইই হোক, অজাইব্ সিংকে আটকে না রেখে, ছেড়ে দিল পৃথু।

পৃথুকে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসতে দেখেই হুদা এগিয়ে এল। বলল, মালুম হোতা খত্‌রা বন্ গ্যয়ে দাদা।

খতরা ? কওন চিজকা ? ভুচু কোথায় ?

বেবিয়েছে। আসবে এক্ষুণি।

একটা বাবো তেবো বছবেব গাব্দাগোব্দা ছেলে ঘন সবুজ বঙা চেক-চেক লুঙ্গি আব লালবঙা গবম কাপডেব একটা পাঞ্জাবী পবে দুহাতে দুচোখ ঢেকে কাঁদছিল।

কে এ?

মৌলভী গিযাসুদ্দিনেব ছেলে।

ছেলেটিব নধবকান্তি চেহাবাব দিকে তাকিযে পৃথুব মনে হল, স্বাভাবিক। বোজই তেলওযালা মোবগা খেলে চেহাবা এবকমই হওযাব কথা।

হযেছে কি?

কাল শেষ বিকেলে মৌলভী মোবগা মাবতে গেছিল নই নদীযাব জঙ্গলে। কিন্তু এখনও ফিবে আসেনি।

বাতেই খবব দিলো না কেন?

ওবা ভেবেছিল, নইনদীযাব দিকে নাজিমুদ্দিনেব ডাণ্ডাব। সেখানে ছোট একটি মাদ্রাসাও আছে। হযত, বাতটা সেখানেই কাটিযে আসছে। নাজিমুদ্দিন হজ কবতে গেছিল। ভেবেছিল হজ এব গল্প শুনছে হযত বাতভব হাজীব কাছে। বেলা হযে যাবাব পবই ওদেব ভয ঢুকেছে। কী যে হল, কে জানে?

পুলিশে কি খবব দিযেছে?

না। দেযনি এখনও।

হুদাকে আডালে ডেকে নিযে গেল পৃথু। ... ভুচু, গেছেটা কোথায?

জেনাবেটবেব ব্যাটাবীটা চার্জ গেছে। তাবই জন্যে বাজাবে গেছে। এসে গেল বলে। আমবা বোজই যাচ্ছি, কিন্তু সুবতপাবাম গিদাই আমাদেব পাত্তাই দিচ্ছে না। এদিকে জেনাবেটবেব জন্যে বডো তকলিফ। তাই দাদা নিজেই গেছে সাইকেলে।

এখন পুলিশে খবব দিও না। ভুচু এলে, ভুচুকে বোলো যেন ও ও চলে আসে। জীপটা বাব কবে দাও তো আমাকে। ... আছে তো? আমি এগোচ্ছি।

ভুচুকে বোলো নইনদীযাব দিকে যেতে বলেই চলে গেল ধুলো উডিযে।

কাছাবীব পাশ দিযে যে বাইপাসটা আছে, তা দিযে টিকিযা চালিযে যাচ্ছিল ভুচু, এমন সময দেখে ওবাবেব বাস্তাব মোডে হান্নানেব দোকানেব সামনেই গাছেব গাযে সাইকেল ঠেস দিযে বেখে কাবাব আব বোটি খাচ্ছে ভুচু।

জীপটাকে দেখেই ও তাডাতাডি উঠে দাঁডিযে উঠল। কিন্তু দোকানেব দিকে আব গেলো না পৃথু। এখন ওখানে সকালেব খাওযাব জন্যে খুব ভীড থাকে। নানাবকম লোক।

স্টার্ট বন্ধ কবে দিযে গাছতলায বাখল জীপটাকে। ভুচু সাইকেল সম্বন্ধে হান্নানকে কী যেন বলে দৌডে এল, রুমাল দিযে মুখ মুছতে মুছতে। কাছে এসে বলল, ব্যাপাব কি? সাত সকালে?

বলছি। সাইকেলটা এখানে বেখো না। লোকে আমাকে দেখেছে। আমি এগোচ্ছি। শামীমেব দোকানেব সামনে দাঁডিযে পান খাব। তুমি সাইকেলেই এস তাডাতাডি। পথেই বলব যা বলাব। সাইকেলটা শামীমেব দোকানেই বেখে দিলে হবে।

হযেছেটা কি তা তো বলবে?

মৌলভী কাল মোবগা মাবতে গেছিল নইনদীযাব জঙ্গলে। এখনও পযন্ত ফেবেনি। তাডাতাডি এসো। আমি চললাম।

পৃথু জীপ চালিযে এগিযে গেল।

ভুচু ফিবে গেল হান্নানেব দোকানে। কী মনে কবে, বাবোটা রুটি আব কিছুটা মগজেব কাবিও নিযে নিল চটপট সাইকেলেব হ্যাণ্ডেলে ঝুলিযে। তাবপব এগোল শামীমেব দোকানেব দিকে।

শামীম বলল, সালাম আলেকুম। চাযে মাঙ্গাউ?

পান মাঙ্গাউ? আবাব বলল, শামীম।

আমিই আনাচ্ছি। সঙ্গে লাগবে।

তুমি কি খুবই ব্যস্ত শামীম?

ভুচু হঠাৎ জিজ্ঞেস কবল।

শামীম একচোখেব ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা না খুলেই বোকাবামতো তাকাল পৃথুব দিকে। পৃথুব মুখটা বোধহয আবছা অথবা অতিকায দেখাল ওব চোখে ঐ কাঁচেবই জন্যে। চট কবে কাঁচটা খুলে পৃথুব দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেযে বলল, ক্যা হুযা? পিবথুদাদা? শামীমকেও যে আবাব কখনও তাব দলেব মানুষদেব প্রযোজন হতে পাবে এ-কথা শামীম বোধহয ভুলেই গেছিল।

ধাবে কাছে কেউ নেই দেখে, পৃথু বলল, মৌলভী কাল বিকেলে মোবগা মাবতে গেছিল, আব ফেবেনি। নইনদীযাব জঙ্গলে।

মৌলভী? হয়া আল্লা!

হতভম্ব হযে বলল শামীম। তাবপব নিজেব মনে বিড বিড কবে কী সব বলল অস্ফুটে।

আমবা যাচ্ছি। পৃথু বলল, চাপা গলায।

আমবা মানে?

ভুচু আসছে।

আমিও যাব।

কি হতে পাবে? বাঘ? সাপ? ডাকু?

কী কবে বলব? আমবা যাচ্ছি। তুমি ভেবে দেখো। যেতেই হবে এমন মানে নেই। ঠুঠাকে নিতাম, সময নেই এখন।

পিবথুদাদা! ভাববাব কিছুই নেই। যদি কোনো খতবাই বনে গিযে থাকে? যাবা আমাব মেযেব জান বাঁচাল তাঁদেব বিপদে পাশে না দাঁডালে খুদাহ আমাকে দোজখ-এও জাযগা দেবেন না। আসছি আমি। এক সেকেণ্ড।

বলেই ও ভিতবে চলে গেল। ওব মেজ ছেলে সামসুদ্দিনকে দোকানে বসতে বলল। দোকান থেকেই গলা তুলে চেঁচিযে। সামসুদ্দিন বাপকো বেটা হযেছে। হীবো, আবেকজন। সে একটা জিনেব ফ্লেযাব পবে হাতে ফিলমফেযাব ম্যাগাজিন নিযে অনিচ্ছাসহকাবে দোকানে এসে বসল। ব্যাজাব মুখে। ভাবখানা বম্বেতে গেলে অমিতাভ বচ্চনই হতে পাবত, এখানে এই গর্তে বসে ঘডি সাবাই কববাব জন্যে এই দুনিযাতে সে পযদা হযনি।

ভুচু এসে গেল। পানও। শামীমেব সেজছেলেকে পাঠিযেছিল।

ভুচু আব শামীম দুজনেই সামনে বসল।

ভুচু বলল, চলো।

শামীম বলল, এক সেকেণ্ড। বন্দুকটা নেওযা হলো না।

ঠিক আছে। ভুচু বলল নিযে নাও।

গিবিশদাব বাডিব বাস্তায মাইলখানেক গিযেই একটা ঝাঁকডা অশত্থ গাছেব নিচে পথটা আসতেই বাঁযে একটা সরু কাঁচা বাস্তা বেবিযে গেছে। বযেল গাডি, জীপ অথবা মোটব সাইকেল এবং সাইকেলেব পক্ষেই তা উপযুক্ত। কাব যাবে না। এই পথটা অন্ধ। একটা শূন্য টাঁডে গিযে হাবিযে গেছে অনেক দূবে। সেখানে আগে নইনদীযা বলে মস্ত একটা গ্রামও ছিল। পানকাদেব। বসন্তব প্রকোপে আজ থেকে প্রায পনেবো বছব আগে সে গ্রাম ছেডে লোকে এদিকে ওদিকে চলে গেছিল। তাই এই পথে ক্বচিৎ কোনো পিকনিক কবা পার্টি ছাডা সদুদ্দেশ্যে কাবও যাবাব কথা নয।

পৃথু জীপটা দাঁড কবাল। বলল, দ্যাখো তো ভুচু অন্য জীপেব চাকাব দাগ পাও কী না পথেব ধুলোয?

ভুচু ও শামীম দুজনেই নেমে ভাল কবে দেখল। জীপেব চাকাব দাগ নেই তবে মোটব সাইকেলেব যাওযা আসাব দাগ আছে নিযমিত। সাইকেলেবও।

পৃথু বলল, চিন্তাব কথা।

তিনজনেই সাবধান হয়ে গেল। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। মাইলখানেক মতো আঁকাবাঁকা, দুধারে জঙ্গলঘের পথে এগোতেই শামীম আঁতকে উঠে বলল, ইয়া আল্লা!

ব্রেক করে দাঁড় করাল জীপটাকে পৃথু। ডানদিকে চেয়ে দেখল একটি শিমুল গাছের ডাল থেকে মৌলভী গিয়াসুদ্দিন ঝুলে আছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার লাল কালো চেক চেক লুঙ্গিটা পাকিয়ে তার গলাতে গিঁট দিয়ে ডালের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে কারা যেন। মৃতদেহটা ফুলে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন একটা অতিকায় লাল কালো বনমোরগ। একদল শকুন ছেয়ে আছে গাছটাকে। মাঝে মাঝেই মৃতদেহের কাছে পা রাখার জায়গা না পেয়ে উড়ে উড়ে এসে একএক কামড় মাংস খুবলে নিচ্ছে। যেখানে একসময় চোখ দুটি ছিল সেখানে বীভৎস দুটি ক্ষত। তরল রক্ত গড়িয়ে গেছে মুখ বেয়ে সারা শরীরে। কালো রেখায় শুকিয়ে গেছে।

পৃথু তাড়াতাড়ি জীপ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার অশথ গাছটার নিচে ফিরে এল। শামীম আর ভুচুকে বলল ফিরে গিয়ে মৌলভীর বাড়িতে খবর দিতে। ভোপালের সঙ্গেও ফোনে কথা বলতে বলল।

ভুচু সব শুনল।

জীপের স্টীয়ারিং-এ এসে বসতে বসতে ভুচু বলল, তুমি?

আমি একা গিয়ে দেখে আসব একটু।

ঠিক আছে। বলল ভুচু। কিন্তু পৃথুদা খুব সাবধান। তোমাকে একা ছেড়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

পৃথু বলল, বিলকুল ঠিক হবে। সময় নষ্ট কোরো না।

শামীমের বয়স যেন আরো দশ বছর বেড়ে গেল। বিড় বিড় করে আবার বলল, ইয়া আল্লা! খুদাহতাল্লা।

জীপটা চলে গেল। পৃথুও জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেল পথ ছেড়ে। ডানদিকে নয়, বাঁদিকে। তারপর পিস্তলটি হাতে ধরে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল, আহত বাঘকে যেভাবে শিকারের সময় অনুসরণ করত, প্রায় সেইভাবেই।

জঙ্গল এদিকে বেশ গভীর। শালই বেশি। তবে বেল, আমলকি, চিলবিল, ঢওঠা ঢৌঠর ইত্যাদিও অনেকই আছে। পিটিস, কেলউন্দা, করৌঞ্জ, পিলাবিবি ইত্যাদির ঝোপ-ঝাড়ও কম নেই। ময়ূর বনমুরগী, তিতির, বটের খড়গোশ আর চিতার আইডিয়াল কান্ট্রি। মিনিট পনেরো জঙ্গলের ভিতরে রাস্তা ছেড়ে ও হেঁটে গেল, তারপর নইনদীয়ার পাড় ধরে পথের সমান্তরালে যাবে ঠিক করল। কোনো বিশেষ কারণে নয়। মন বলল, তাই। এমন সময় যেখানে বুদ্ধি বা যুক্তি অচল সেখানে মন যা বলে তাই ই শুনতে হয়।

রোদটা এখন চড়েছে। সকাল দশটা এগারোটাতে শীতের জঙ্গলের শিশির সব বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ার পর গাছপালা থেকে যে এক ধরনের বিশেষ গন্ধ ছাড়ে, কোনো যুবতী মেয়ের চান করে ওঠার পর মুহূর্তের বাথরুমের গন্ধের মতো। সেইরকম গন্ধে ভরে আছে সমস্ত বন। একদল ছাতারে ডাকছে চ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে। টিয়ার ঝাঁক চলেছে মাথার উপর দিয়ে। সবুজ টুই পাখি টি টুই টি টুই করে চমকে বেড়াচ্ছে।

নইনদীয়া নদীর নামেই গ্রামটার এবং জায়গাটারও নাম। এই নদী একটা জায়গায় এসে একেবারে হেজেমজে গিয়ে কয়েক ফালং মতো গিয়ে যেন ভূস্তরের গভীরে ডুবসাঁতারে এসে আবার জেগে উঠেছে। তাই-ই এর নাম নইনদীয়া। নতুন নদী।

কান খাড়া করে চলেছে পৃথু। মৌলভীর কথা ভাবার সময় নেই এখন। মানুষ মরে গেলেও বারো ঘণ্টার বেশি সময় কেউই ভাবে না তার জন্যে। মৌলভী বারো ঘণ্টার অনেক আগে মরেছে ফুলে ঢোল। মোটেলাল। ডাকু শের সিং এর দলের মোটেলালকে ডাকু মগনলাল যে শুধু খতমই করেছে তাই-ই নয়, বড় নৃশংসভাবেই খতম করেছে। পৃথুর দৃঢ় বিশ্বাস, শিমুল গাছটার কাছে অথবা গাছের ডালে কোনো চিঠিও রেখে গেছে তারা বাকিদের সাবধান করে দিয়ে। ভয় দেখিয়ে। মোটেলাল মরে গিয়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে পৃথুর মধ্যে। এই-ই মৌলভীর মৃত্যুর

নীট ফল।

নুরজেহানের ঘটনার পর এই ব্যাপারে সব কিছুই থিতিয়ে গেছিল। সপ্তাহে দুদিন ভোপাল কথা বলেছে একবার করে ভুচুর সঙ্গে। কখনও কখনও পৃথুর সঙ্গেও। রাতেই। পরশুদিনের খবর ছিল এইটাই যে, ওঁরা ঠিক জানেন যে মগনলাল এই এলাকাতেই আছে। মৌগাওতে পর পর তিনটি ডাকাতি হয়েছে গত সাতদিনে। বালাঘাট থেকে আসা একটি ট্রাককে গভীর রাতে লুঠ করেছে পথে। ড্রাইভার এবং ক্লীনারকে গুলি করে মেরেছে। ভগবান শেঠ-এর দোকান এবং ভিনোদ ইদুরকারে বাড়িও লুঠ করার সম্ভাবনার কথা পরশুই এক ইনফরমার মারফৎ জেনেছেন ওঁরা। হাটচান্দ্রার বিলিতি মদের দোকান থেকে মদ কিনে নিয়ে মগনলালের দলের দুজন একটি সাইকেল রিক্সাতে করে গিয়ে নির্জন জায়গায় নেমে পড়েছিল। সাইকেল রিক্সাওয়ালা পুলিশকে ইনফর্ম করেছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক এবার। শিকারি মাত্রই জানেন যে, বড় বাঘকে জখমী করে ছেড়ে রাখার মানে হয় না। পাপ তো বটেই, নিজেরও শাস্তি হয় না। হোক এবার যা হবার।

ভোপালের খবরের ব্যাপারটাকে অত ইম্পরট্যান্সও হয়ত দেয়নি ভুচু। ভেবেছিল, ক্রীসমাস পেরিয়ে গেলে কিছু একটা ঠিক করবে। মোটেলালকে সরিয়ে দেওয়া মানে, এর পর সাঁওয়া, শের সিং নিজে এবং তার দলবলের অন্যদেরও যাওয়ার ওয়াক্ত আসবে।

হঠাৎই একটা শব্দে থমকে দাঁড়াল পৃথু। শব্দটা ঠিক কিসের ঠাহর করতে পারল না ঐখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দু পা মাটিতে গেঁথে গেল। আবারও হল শব্দটা একটু পরই। মনে হল, জলের মধ্যে থেকে এল। জঙ্গলের আড়াল ছেড়ে নদীর দিকে যাওয়ার সাহস হলো না, ধরা পড়ে যাবে বলে। আবারও হল শব্দটা। এবার বোঝা গেল। নদীর মধ্যে পাথরের উপর কেউ কাপড় কাচছে।

খুব সাবধানে, প্রায় লেপার্ড-ক্রলিং করে করে পৃথু এগোতে লাগল ঐদিকে। নদীর পারের দু মিটার মতো দূরে থাকতে একটা পিটিসের ঝোপের আড়ালে সটান শুয়ে পড়ল ও। শুয়ে পড়তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একদল বনমোরগ ভরর ভরর করে সামনের ঝোপ থেকে উড়ল একসঙ্গে। মৌলভীর খাদ্য। অনেকদিন মানা করেছিল পৃথু। পুলিশ যে গুলিগুলো তাকে ডাকাতের মোকাবিলা করতে দিয়েছিল সেই গুলির বেশি দিয়েই মোরগা-নিধন করেছে মৌল্ভী। এই মোরগ-মারতে এসেই তার প্রাণটা গেল।

পৃথু পিটিসের ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখল, একটা কালো, অল্পবয়সী মেয়ে নদীতে কাপড় কাচছে। লালরঙা একটি তাঁতের শাড়ি। কিন্তু তার পরনে কিছুমাত্র নেই। চান হয়ে গেছে। চুল ভিজে। ভারী সুন্দর তার গড়নটি। মেয়েটিকে এদেশী বলে মনে হল না। সরু কোমর। লম্বা। হাঁটু সমান কুচকুচে কালো চুল। লতানো দুটি বাহু। নিখুঁত সৌন্দর্য!

এমন সময় নদীর ঐ পারে দুজন লোককে দেখা গেল। তাদের কোমরে গুলির বেল্ট বাঁধা। হাতে রাইফেল। বড় বড় গোঁফ। অলিভগ্রীন ট্রাউজার, ফুলহাতা শার্ট এবং গরম সোয়েটার গায়ে। লোকগুলোর চেহারা দেখেই বুঝল পৃথু যে ডাকাত। মেয়েটির দিকে চেয়ে তারা একসঙ্গে কী যেন বলে উঠল। হো হো করে হাসল। জানোয়ারের মতো। ওরা সৌন্দর্যর কদর জানে না, মাংস খেতে জানে।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই কাচা কাপড়টি জড়িয়ে নিল গায়ে এবং পরিষ্কার বাংলায় বলল, মরণ! রাতে দিনে একমুহূর্ত নিস্তার দেবেনি গো হারামজাদারা!

পৃথুর গায়ের রোম সব সোজা হয়ে উঠল। এই-ই তাহলে সেই ভৈরবী!

লোকগুলো অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করল মেয়েটির দিকে চেয়ে। তারপর মেয়েটি জল ছেড়ে পাড়ে উঠে গেলে তার সঙ্গে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেল। পৃথুর মনে হল, খুব সম্ভব মেয়েটির এসকর্ট হিসেবেই এসেছিল লোকগুলো। যাতে পালিয়ে না যেতে পারে সেই জন্যও হয়ত।

ওরা অদৃশ্য হবার পরই পৃথুও নদী পেরুলো। তবে অনেকটা ঘুরে। খুব সাবধানে, তারপর

যেদিকে ওরা গেছিল, সেই দিকেই এগিয়ে চলল যতখানি নিঃশব্দে পারে।

ওদের পথটা ধরে ফেলতে কষ্ট হলো না বেশি। লোকগুলো যোধপুরী বুট পরে ছিল। পায়ের দাগ জঙ্গলের মাটিতে পাওয়া যাচ্ছিল সহজেই, সিকি মাইলটাক গিয়েই আস্তানাটার সন্ধান পেল পৃথু। আস্তানা মানে, পাশাপাশি দুটি বড় বয়ের গাছের ডালের সঙ্গে টেনে বাঁধা একটা বড় ত্রিপল। তার নিচে ভৌর ঘাস এবং কিছু বিচালি পাতা। ঘাস ও বিচালির চেহারা দেখে মনে হল কাল রাতেই পাতা হয়েছে। তারই উপর কম্বল-পাতা বিছানা। সবশুদ্ধ জনা ছয়েক লোক। পাশের একটি মহুয়া গাছের উঁচু ডালে একটি মাচা বাঁধা। তাতে একজন লোক টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। মগনলালের দলের স্নাইপার। একবার দেখতে পেলেই হলো। লোকটার গলা থেকে বাইনাকুলারও ঝুলছে।

পৃথু একেবারে গুলি-খাওয়া-চিতার মতো মাটির সঙ্গে লেপ্টে দিল নিজেকে। শরীরের সমস্ত পেশী আর স্নায়ুকে সচেতনতার চরমে পৌঁছে দিয়ে স্থির করে দিল। একটাই জিনিস করার আছে এখন ওর। এখানে সবশুদ্ধ কতজন লোক আছে? আর ওরা আজ রাতটাও এখানে কাটাবে কী না? সেটা জানা দরকার। দলের মধ্যে মগনলাল নিজে আছে কি নেই তাও। মগনলালের চেহারাটা ফোটো দেখে দেখে চিনে রেখেছে ও। দূর থেকে দেখতে পেলেও ঠিক চিনে নেবে। অনেক সময় স্বপ্নেও দেখেছে। মাচায় বসা স্নাইপার, বাইনাকুলারটা তুলে ধরল দু'হাত দিয়ে, রাইফেলটা পাশে নামিয়ে রেখে। এই সময় ওকে এক নিমেষে শেষ করে দিতে পারত পৃথু। কিন্তু এখনও নয়। সব কিছুই সময় মতো। গর্ভাধানের সময় থেকে জন্ম সময়ের মধ্যে যেমন এক নির্দিষ্ট ব্যবধান থাকে, তেমনই মৃত্যুর শমন জারি হওয়া আর মৃত্যুর সময়ের মধ্যেও থাকে।

এমন সময় সাইকেল করে একটি লোক এল ওই ক্যাম্পের উল্টোদিকের সুঁড়ি পথ বেয়ে। কে জানে? সাইকেলটা বোধহয় মৌলভী গিয়াসুদ্দিনেরই হবে। হ্যাণ্ডেলের যেখানে ধরবার সেখান থেকে লাল-নীল প্লাসটিকের ফালি ঝুলিয়ে রাখত মৌলভী। এতেও আছে। লোকটা সাইকেল থেকে নামতেই চিনে ফেলল পৃথু।

এই-ই ডাকু মগনলাল।

ডাকু মগনলাল ত্রিপলের তলায় এক আছাড়ে শুয়ে পড়ে ভৈরবীকে ডাকল। ভৈরবী এসে তার মাথার চুলে বিলি কাটতে লাগল। মগনলাল নিচু স্বরে একজন লোককে কি যেন বলল। রান্না করছিল আরেকজন লোক পাথরের উনুনে, কাঠ গুঁজে দিয়ে। তার পাশে আরেকজন বসে রুটি গড়ছিল দু'হাতে চাঁটি মেরে মেরে আর অন্য একজন একটা উনুনের উপর তাওয়াতে তা সেঁকছিল। নাস্তা তৈরী হচ্ছিল। আরও একটি লোক একটি পাঁঠার গলায় দড়ি বেঁধে হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে এল। কোথা থেকে, কে জানে? । স্নাইপারটা বাইনাকুলারটাকে স্থির করে চেয়েছিল পৃথুর পেছন দিকে। এতক্ষণে বুঝল পৃথু। লোকটা মৌল্ভীর ঝুলন্ত মৃতদেহর উপরই নজর রাখছে। কখন তাকে নামানো হয়, কে বা কারা নামায়, পুলিশ এল কি এলো না এই সবই দেখছে বোধহয়। মৌলভীকে মেরে তারই মৃতদেহর আধ মাইলের মধ্যে থাকা যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল ওদের পক্ষে। কিন্তু এই জন্যেই ডাকু মগনলাল ধরা পড়ে না। যা কেউ করে না, যা কারো ভাবনারও বাইরে, মগনলাল চিরদিন তাই-ই করে এসেছে। ও নিশ্চয়ই ভেবেছিল পুলিশ ডেড্‌বডি পেয়ে অন্যান্য সম্ভাব্য জায়গাতেই খোঁজ করবে ওর। ও যে এখানেই একেবারে নাকের ডগায় বসে আছে প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতো, তা কারো মাথাতেই আসার কথা নয়।

সময় বেশি নেই। আজকেই এই পুরোনো ফোঁড়ার মতো ঘিন্‌ঘিনে ব্যথাটিকে অপারেট করতে হবে। হয় ইসপার নয় উসপার। আস্তে আস্তে, খুব আস্তে আস্তে ; পৃথু পিছু হট্‌তে লাগল। পনেরো মিনিট ধরে এভাবে পিছনে গিয়ে যাতে স্নাইপারের বাইনাকুলারের নজরে না পড়ে তার জন্যে সবরকম সাবধানতা নিয়েই সে যত তাড়াতাড়ি হেঁটে পারে, মোড়ের অশ্বত্থতলার দিকে তত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল। তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে অথবা তাকে দেখতে পেয়ে কতগুলো হনুমান হুপ হুপ্ হুপ করে ডেকে উঠল।



ভূচুব গাবাজে বসেছিল পৃথু।

গাবাজ, বাইবে থেকে বন্ধ কবে দেওযা হযেছে। ভূচুব এক আত্মীয মাবা গেছেন মান্দলাতে এই মিথ্যে নোটিশ টানিযে দেওযা হযেছিল। সকলকে ছুটিও দেওযা হযে গেছে। গাবাজেব সকলেই জানে যে ভূচু আব পৃথু একটু পব মান্দলা বওযানা হযে যাবে।

ইন্দাবজিৎ লাল মানুষটিব মতো পুলিশ অফিসাব এ দেশে আবও অনেক থাকলে ভাল হত। এত অল্প সমযেব মধ্যে পুবো ব্যাপাবটা সম্বন্ধে ডিসিশান নিযে স্ট্যাটেজী ঠিক কবে দিলেন, যে, পৃথু সত্যিই অবাক। চাকবী কবাব জন্যেই শুধু চাকবী কবেন না এই ধবনেব লোক, পুবোপুবি ইনভলভড হযে পড়তে জানেন কাজে। এবং সেই কাবণেই এই ধবনেব মানুষবাই বোধহয নিজেব নিজেব কাজেব মধ্যে জব-স্যাটিসফেকশান খুঁজে পান।

লাল সাহেবও বলেছিলেন থানাকে এখন কিচ্ছুই বলবেন না।

পৃথু বলল, আমাব ইচ্ছে, পুলিশ খুব শোবগোল তুলে মৌলভী ওবফে ডাকু মোটেলালেব ডেডবডি ওখান থেকে নিযে আসুক সন্ধ্যেব মুখে মুখে মগনলালেব দল সম্বন্ধে ওদেব কোনোবকম ইনফবমেশান দিতেও চাই না। তবে যে সমযে এই সব হল্লাগুল্লা হবে সেই সমযেই আমাব দল নিযে আমি মগনলালেব ক্যাম্পেব চাব পাশ ঘিবে ফেলতে চাই। কিন্তু আমাকে অন্তত জনা ছযেক সাহসী ও ভাল মার্কসম্যান পুলিশ দিলে ভাল হত। আমাব লোকজন ত সীমিত। তাব উপব মৌলভী ত চলেই গেল। ক্যাম্পেব অন্যদিকে মানে নইনদীযাব উল্টোদিকে সামাবিযা বলে একটা গ্রাম আছে। তাব সামনে দিযে যে পথটা হাটচান্দ্রাতে এসেছে আটবাবোযা বস্তী ছুঁযে সেই পথ দিযেই মনে হয আমাদেব তাড়া খেযে ওবা পালাবাব চেষ্টা কববে। ওদেব খানা-পিনাব বসদ-টসদ সব ঐ পথ দিযেই আসছে মনে হয। নেহাৎ নিরুপায না হলে অথবা কোনোভাবে প্রোভোক না কবতে পাবলে ওবা কনফ্রণ্টেশান এড়িযে যাবে বলেই আমাব ধাবণা।

লালসাহেব কী একটু ভাবলেন। তাবপব বললেন, কটা নাগাদ দবকাব ওদেব? মানে ছজন পুলিশকে?

সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই আটবাবোযা আব সামাবিযাব পথেব মাঝেব আধমাইল পথটুকু কভাব কবে ফেলা দবকাব। এল এম জি থাকলে সুবিধে হয।

এল এম জি ত নেই হাটচান্দ্রা পি এস-এ।

আবও একটু ভেবে লালসাহেব বললেন, ঠিক আছে মোগাঁও-এ এবং মালাঞ্জখণ্ড এ আমি বলে

দিচ্ছি। একজন হেড কনস্টবল্‌কে পাঠাব। তার নাম দৌলত্‌ সিং। তার সঙ্গে আমি নিজেই কথা বলছি এক্ষুণি। সে আরও পাঁচজনকে নিয়ে বিকেল পাঁচটার আগেই সাদা পোশাকে একটি সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে হাটচান্দ্রার জলের ট্যাংকের নিচে মাছ কিনবে। আপনার কোনো লোককে সেখানে পাঠাবেন লাল-পাগড়ী মাথায় বেঁধে। সে গিয়ে, জোরে জোরে বলবে মাছের দোকানীদের যে, ডাকু মগনলাল এর দল ডাকু শের সিং এর দলের মোটেলালকে খতম্‌ করে দিয়েছে। সব ঘর ভাগ যাও, কওন জানে আজ কেয়া না কেয়া খাত্‌রা বনেগা। সেই কথা শুনে দৌলত সিং আপনার লোককে গাড়িতে তুলে নেবে। দৌলতের বড় বড় গোঁফ আছে। কাঁচা গোঁফ। সবুজ খদ্দরের পাঞ্জাবীর ওপর কালো আলোয়ান গায়ে দিয়ে থাকবে সে। সকলের পরনেই খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবী পায়ে নাগ্‌রা জুতো।

পৃথু ভাল করে শুনল।

বলল, ওক্কে।

দৌলতের দল আপনার লোকের কথা মতোই কাজ করবে। তারা সকলেই স্মল্‌-আর্মস্‌ নিয়ে যাবে। প্রত্যেকেই নির্ভুল মারে। সার্ভিস বিভলভার দিয়ে অন্ধকারেও পটাপট্‌ লোক ফেলে দেবে।

তারপর লালসাহেব শুধোলেন মগনলালের দলে কজন আছে বলে মনে হয় আপনার?

জনা ছয়েক। বেশিও হতে পারে। তাদের আমি দেখিনি।

ওক্কে। আর কিছু? মিঃ ঘোষ? উই ওল্‌ উইল বী গ্রেটফুল টুউ ওল্‌। আমি নিজেও কাল সকালে বম্বে থেকে যে হপিং-ফ্লাইট ইন্দোর ও ভোপাল হয়ে জবলপুর যায় তাতে জবলপুরে আসছি। আশা করি, সন্ধ্যে নাগাদ ভুচুবাবুর গাবাজে পৌঁছে যাব, কনগ্রাচুলেট্‌ করতে আপনাদের। কালকের পর থেকে মনে হয়, আপনাদের আর এই ঝামেলাতে জড়িয়ে রাখব না। মগনলালের দল কালই একস্টিংগুইশড্‌ হয়ে যাবে। আপনাদের হাত-যশে। যে দু একজন থাকবে, তাদের আমি ও আমার লোকেরাই জিম্মা নিয়ে নেব। ওক্কে। বেস্ট অফ লাক। গুড হান্টি। আই অ্যাম অফুলী সরী ফর মোটেলাল। গভর্নমেণ্ট অ্যাম্পলী কমপেনসেট করবেন ফ্যামিলীকে। আমাদের আই-জি অলরেডি হোম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং হোম মিনিস্টারও চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে। দিল্লীতে ডি জি কেও জানানো হয়েছে। এভরীওয়ান উইল বী একস্‌পেকট্যান্ট টু নাইট। এণ্ড উইল বী প্রেয়িং ফর উ্য অল।

হুদাকে ভুচুর জীপ দিয়ে পাঠানো হয়েছে ঠুঠাকে তার কোয়ার্টার থেকে তুলে আনাবার জন্যে। শামীমকে খাইয়ে-দাইয়ে ভুচুর ঘরেই ঘুমোতে বলা হয়েছে। তাকে ডাকু মগনলালের কথা এবং মৌলভীর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে দায়ী যে মগনলালই এ কথাও জানানো হয়েছে। এবং বলা হয়েছে বলেই, ছেড়ে দেওয়া যায়নি। শামীমের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে মৌলভীকে ঐ অবস্থায় দেখার পর থেকেই। ও বলেছে, খুদাহ্‌কি কসম, আমাকে এই ফয়সালায় তোমরা যদি না নাও, সুযোগ না দাও আমাকে, আমার মেয়ের বেঈজ্জতীর বদলা না নেবার, মৌলভীর মওত-এর বদলা না নেবার, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।

পুলিশ যখন গিয়ে পৌঁছবে তখন শকুনেরা মৌলভীর কিছু বাকি রাখবে কি না তা কে জানে? গুনাহ হলো বড়। কিন্তু উপায় নেই কোনো। পুলিশ আগে গিয়ে ব্যাপারটাকে মেস-আপ্‌ করে দিলে মগনলাল পুরো দল নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।

পৃথু ভুচুর কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ভাবছিল ধুঁয়োর রিং পাকাতে পাকাতে। ভাবার অনেক কিছুই আছে। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। চঞ্চলতার বা উত্তেজনার সময় এখন নয়। ঠুঠা এলে, ঠুঠাকে লালপাগড়ি পরিয়ে হুদাকে দিয়ে ভুচুর জীপে করে জলের ট্যাঙ্কের নিচে পাঠাবে। সব বলে; বুঝিয়ে। দৌলত সিং-এর দলকে পেলে ঠুঠা তাদের গাড়িকে হুদার জীপের পেছন পেছন যেতে বলে সামারিয়া আর আটবাঁরোয়ার দিকে হাটচান্দ্রা থেকে কাঁচা পথটা যেখানে বেরিয়েছে সেই অবধি যাবে। তারপর সাদা অ্যাম্বাসাডর সেখানেই রেখে জীপে করে হুদা ওদের আরও কিছুটা এগিয়ে দিয়েই ফিরে আসবে। ফিরে এসে, মোড়ের কাছেই যে চায়ের দোকানটা আছে

তার সামনে থাকবে জীপ নিয়ে।

হুদা ঠুঠাকে ধরে নিয়ে এল। শীতের দুপুরের ছুটির দিনে রোদে চৌপাই লাগিয়ে সুখনিদ্রা দিচ্ছিল ঠুঠা বাইগা।

হুদা কিছুটা আন্দাজ করেছিল। হয়ত এর আগেও করেছে।

পৃথু বলল, হান্নানের দোকানের রুটি আর ব্রেইন-কারী আছে। খেয়ে নাও হুদা। তোমাকে আজ আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে।

হুদা বলল, আমার বাড়িতে একটা ভাল ছোরা আছে, নিয়ে আসব দাদা ?

না। তার দবকার নেই। তুমি জীপটা চালালেই অনেক করা হবে। কাউকে মারতেই যদি হয়, তাহলে জীপ দিয়ে চাপা দিয়ে মারতেও ত পারবে। তুমি মারবে বললে প্রাণ নিয়ে পালাবে কে ? জীপ নিয়ে তুমি ত সার্কাসেব তাঁবুতে ভেল্‌কি দেখাও। কি ?

তা দেখাই দাদা ! আপনার আশীর্বাদে। একজন কেন ? জীপের স্টীয়ারীং হাতে থাকলে পাঁচ দশ জনকেও আমি একাই নিতে পারব।

আশা করি, নিতে হবে না।

হুদা বলল, জী। শামীম ভাইয়ের মেয়েকে ত এরাই বেঈজ্জৎ করেছিল না ? আমাকে একবার সুযোগ দিন দাদা। নুরজেহানের জন্যে আমি জানও দিতে পারি।

ওব চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল পৃথু। নতুন কিছু পড়ল ওর চোখে। ছেলেটা ভালবাসে নুরজেহানকে নিশ্চয়ই। ভালবাসার মতো মেয়েও বটে ! অমন রূপ সচরাচর দেখা যায় না।

ঠুঠাকে ডেকে সব বলল পৃথু। ঠুঠা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। ওর ঘুম ভাল করে ভাঙেনি এখনও মনে হল। একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল "হো বড়্‌হা দেও। আজ তুমহাবা পুজা হোগা।"

বলেই, পৃথুকে বলল, এসবেব মধ্যে সংসাবী লোক তুমি ফাঁসলে কেন ? বউ-ছেলে-মেয়ে আছে, তোমাব কি ঘরেব খেয়ে বনেব মোষ না তাড়ালেই নয় ? গিরিশবাবুকে খবর দিলে না কেন ? আমি, ভুচু, গিবিশবাবু এই তিনজনেই বেগব-শাদী-শুদা আদ্‌মী ! শামীমকেও না জড়ালেই ভাল করতে।

পৃথু বলল, শামীমের হক্ক আছে এই মামলায় নিজেকে জড়ানোর। "না" করা যায় না ওকে।

আমবা কি শামীমের কেউই নই ? না মৌলভীরও কেউ নই ? জঙ্গলের দোস্ত্‌, এক বন্দুক আর এক বোতলের দোস্তীতে তফাৎ কি ? জান কবুল।

হুদাকে বলল, পৃথু। এইবাব সময় হয়ে এল কিন্তু হুদা সকলেরই। ভাল করে কষে আদা দিয়ে ফারস্ট ক্লাস চা বানিয়ে আনো ত দেখি কেটলী ভরে। আর আমার পান। এ জীবনে আর খাওয়া হয় না হয় ! ভুচুও এসে যাবে এক্ষুণি। আব যাওয়ার আগে শামীমকে তুলে দিয়ে যাও। আব সময় নেই।

সে ঘুমোচ্ছে থোড়ী। বড় বড় চোখে চেয়ে চেয়ারে বসে আছে।

হুদা বলল।

আর সময় নেই। যখন শিকাব করত, পৃথু, বাঘের মড়িতে গিয়ে বসার সময় হত, অথবা ছুলোয়াতে জখম-করা বাঘকে ফলো-আপ করতে যাওয়ার সময় হত তখনও এমনই মনে হত। একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করত ভিতরে ভিতরে। হঠাৎই মনে হত, পৃথিবীটা কী সুন্দর ! এই আলো-ছায়া, মেঘ-রোদ্দুর, পাখির ডাক, ঘাসের গন্ধ, আকাশের নীল, টিয়ার সবুজ, সবই কী সুন্দর ! মনে হত, আর হয়ত দেখা নাও হতে পাবে এইসব ! সময় নেই।

তখন ত ব্যাচেলার ছিল।

আর এখন ! তার বউ রুষা, ছেলে, মেয়ে। কি করছে এখন রুষা ইদুরকারের সঙ্গে কে জানে ? খুউব মজা কবছে নিশ্চয়ই। হাসি, মজা, খেলা, খাওয়া দাওয়া। আহা ! করুক করুক। একটাই ত জীবন। পৃথু ত কিছুই দিতে পারল না।

আনন্দম্‌। আনন্দম। আনন্দম্‌।

কুর্চি-ই-ই-ই

ও কুর্চি।

কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি ? কোন্ অভিমানে ? আমাব উপবও কেউ অভিমান কবে ? যার, তুমি ছাড়া কেউই নেই ; সেও ? যাক্‌গে যাক্‌গে। "বুঝবে সেদিন বুঝবে, আমি যেদিন হাবিয়ে যাব, অস্তরবির সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে। গাইতে বসে কণ্ঠ ছিড়ে আসবে যখন কান্না, বলবে সবাই সেই যে পথিক, তার শেখানো গান না ?"

নজরুলের গানটি মনে পড়ে গেল। পৃথুর।

ভুচু জোরে জীপ চালিয়ে ঢুকল গারাজে। ধুলো উড়িয়ে। উত্তেজিত হয়ে। বলল, পুলিশের একটা গাড়ি আর একটা জীপকে যেতে দেখলাম নইনদীয়ার দিকে।

পৃথু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, তা ত যাবেই। সময় ত হল !

সকলের চা খাওয়া হয়ে গেল। আকাশের দিকে চাইল পৃথু। বেলা পড়ে এসেছে। আর দেরী করার উপায় নেই। হুদা ভুচুর জীপে ঠুঠাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্য জীপে উঠল, পৃথু, শামীম, আর ভুচু। স্টীয়ারীং এ বসল পৃথু এবার। ঠুঠা লালসাহেবের লোকেদেব সঙ্গে থাকবে।

হুদা যাবাব আগে পানের ঠোঙ্গা দিয়ে গেছিল পৃথুকে।

পৃথু ভুচুকে দিয়ে বলল, খোলো।

আমিও একটা খাই। ভুচু বলল।

পৃথুকে পান-জর্দা দিয়ে বলল, কী ঠুঠা ? তুমিও খাবে না কি একটা।

ঠুঠা কোনোদিনও পান খায় না। বলল, দাও দুটো। তাড়াতাড়িতে খৈনীটাও নিয়ে আসতে পারলাম কি ? ঘুমের মধ্যে গোঁত্তা মেরে তুলে দিয়ে জীপে বসিয়ে উড়িয়ে নিযে এল হুদা ! পিরথু বাবুব হুকুম। যমেও এমন ব্যবহাব করে না।

পৃথু আর ভুচু হেসে উঠল।

সকলেব মনেই একটা চাপা উত্তেজনা। কিন্তু প্রকাশ নেই কাবোই। এবকম পরিস্থিতিতে ওবা বহুবাবই পড়েছে। বন-জঙ্গল, বন্দুক-রাইফেল, বিপদ-আপদে ওবা অভ্যস্তই। জানোয়ারদের ওবা সামলে নিয়েছে চিরদিনই। কিন্তু জানোযার-হওযা-মানুষদেব পাববে, কী না : সেই চিন্তাই সকলের মনে।

অশ্বত্থ গাছটার বেশ কিছুটা আগেই, একটা নালাব মধ্যে ঢুকিয়ে দিল পৃথু জীপটাকে। কিছুটা গিয়েই একটা বাঁক নিয়েছে নালাটা। সেই বাঁকটা পেরিয়েই এঞ্জিন বন্ধ করে দিল। তখন সন্ধ্যে হব-হব।

জীপ থেকে নেমেই পৃথু বলল, ভুচু আরেকটা পান খাওয়াও। ভুচুও জীপ থেকে নামছিল। পৃথু হাত তুলে বারণ করল।

ভুচু অবাক চোখে তাকাল পৃথুব দিকে।

পানটা মুখে দিয়ে একমুঠো জর্দা ফেলে পৃথু বলল, পামেলাকে আমি তোমার মতো করে ভাল না বাসলেও দাদার মতোই ভালবাসি। অনেক কষ্ট করে জীবনে পায়ে দাঁড়িয়েছ তুমি। তোমার সামনে মস্ত জীবন পড়ে আছে। পামেলাবও অনেক স্বপ্ন আছে তোমাকে ঘিরে। তুমি জীপেই থাকবে। যদি আমার এবং শামীমের মধ্যে একজন না ফিরি অথবা দুজনেই না ফিরি তখন তুমি ও ঠুঠা থেকে যাবে। আমাদের মৃত্যুর বদলা নেবার জন্যে। মগনলালের কাছে হারলে আমাদের চলবে না। তাছাড়া, লালসাহেবেব বিশ্বাসও ত ভাঙ্গা যায় না। বিশ্বাস যে করে, তার চেয়ে অনেক বড় দায় বিশ্বাস যে রাখে তাব।

পৃথুদা ! এটা কী হল ? আমাকে তোমাদের ক্রেডিটের ভাগ দেবে না ? আমি একাই বাদ পড়ব ?

ডিসক্রেডিটেরও নয় ভুচু। তুমি একা রইলে বলে বিপদও কম নয় তোমার। সবচেয়ে বেশি বিপদ বোধহয় তোমারই। খুবই সাবধানে থাকবে।

কোড ওয়ার্ড ?

ভাল বলেছ। ভুলেই গেছিলাম। ঠুঠাকে বলে দিয়েছি অবশ্য। আজকের কোডওয়ার্ড, নুরজেহান্।

নুরজেহানের নামেই শামীমের গলার মোটা শিরাটা দপ্‌দপ্ করে ফুলে উঠল। আশ্চর্য এক গভীর কৃতজ্ঞতার চোখে চাইল সে পৃথুর দিকে।

ফিস ফিস্ করে বলল পৃথু, চলো শামীম ভাই। বলে শামীমের হাত ধরে নিয়ে এগোল।

ভুচ ফিস্‌ফিস করে বলল, মে গড বী উইথ ড্যু !

পৃথু জবাব দিলে' না ।গুলিতে পকেট ভারী'। শামীমেরও তাই। একটি করে শট্‌গান ; একটি করে রাইফেল। রাতে শর্ট এঞ্জে, শট্‌গান রাইফেলের চেয়েওঅনেকবেশি এফেক্‌টিভ্। এ ব্যাপারে মানুষ মাবা আর শুয়োর মারার মধ্যে কোনোই তফাৎ নেই।

কুড়ি-পঁচিশ গজ এসেছে ওরা সাবধানে ; নিঃশব্দে। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনেই এক ঝট্‌কায় ঘুরে গেল পৃথু। ভাল লাগল। এখনও রিফ্লেক্স অ্যাকশান্ এরকম সজাগ আছে দেখে। ঢিলে-ঢালা হয়নি একটুও।

কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েই অবাক হয়ে দেখল,ভুচু। ভুচু, পৃথুর হিপ্ পকেটে এবং শামীমের ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবীর পকেটে একটি করে থ্রী-এক্স্ রাম এর পাঁইট ঢুকিয়ে দিল।

কথা না বলে, হাসল পৃথু। রাইফেল সুদ্ধ হাত তুলল পৃথু। ধন্যবাদের হাত। শামীম বিড়বিড় করে বলল, অজীব্ লড়কা। পৃথু ঠোঁটে হাত দিয়ে কথা বলতে বারণ কবল ওকে। তারপর শামীমকে ইশারাতে ওর পিছনে আসতে বলে এগিয়ে চলল।

মিনিট পনেরো যেতেই অন্ধকাব হয়ে গেল চারপাশ। নইনদীয়াব নদী রেখার পাশে কতগুলো বড় বড় পাথরেব আড়ালে চুপ করে বসল ওরা দুজন কান খাড়া করে।

সামনে, দূরে, ডানদিকে মানুষেব গলার স্বর কানে আসছিল। পুলিশের গাড়ি ব্যাক করাব আওয়াজও পেল। মৌলভী গিয়াসুদ্দিনের মৃতদেহ নামাচ্ছে ওরা বোধহয় গাছ থেকে।

দ্রুত সবদিকের কথা চিন্তা করে পৃথু ঠিক করল যে পুলিশরা থাকতে থাকতেই মগনলালের দলেব সমস্ত মনোযোগ স্বাভাবিকভাবেই ওদিকেই থাকবে। পুলিশের দলের কেউ নদী পেরিয়ে বাঁ দিকে তাদের আস্তানার দিকে আসছে কী না তা দেখাই এখন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সময়টুকুতেই, নদীর বাঁদিকে, যেদিকে ওদেব আস্তানা , সেই পারে নিশ্চয়ই নজর তীক্ষ্ণ রাখবে না ওরা। এই শোবগোল থাকতে থাকতেই, পৃথু ঠিক করল ; যতখানি এগিয়ে যাওয়া যায় তাইই যাবে। ওদের পায়ের শব্দ আড়াল পাবে পুলিশের দলের হৈ-হল্লায়। হঠাৎ উঠে পড়েই শামীমকে নিয়ে আড়াআড়ি নদী-বেখাটা পেরিয়ে গেল ও। যত কম সময়ে পারে। নদীব সাদা বালিতে কিছু নড়াচড়া কবলে সহজেই চোখে পড়ে অন্ধকাবেও। তাইই যত কম সময়ে পাবে নদী পেবিয়ে অতি সাবধানে এক পা এক পা কবে যেখানে মগনলালেব আস্তানা দেখেছিল, সেদিকে আন্দাজে এগোতে লাগল। নদীর উল্টোদিকে পুলিশেব দলেব আওযাজ এখন বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে কথা। এবারে থেমে গেল ওরা দুজনে । একটা মস্ত শিমুল গাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে দুজনে দুদিকে মুখ করে রাইফেল রেডি পজিশানে ধরে বসল। নইনদীয়ার অন্য পারে। বড় শিমুলের গুঁড়িতে অনেকগুলো পার্টিশান থাকে। লুকিয়ে থাকলে, তিনদিক দিয়েই দেখা যায় না। যেতে পারে শুধু পিছন দিক থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোরগোল, টর্চেব জোরালো আলো থেমে এবং নিভে গেল। ভ্যান ও জীপ স্টার্ট কবার শব্দ এল এবং হেডলাইট জ্বলে উঠল অন্ধকার বনকে আলোয় ভরে দিয়ে। তাবপর ব্যাডলি মেইনটেইনড ভ্যান ও জীপ ঘড়ঘড় ধড়ফড় শব্দ করে উঁচু নিচু, রাস্তায় আলো নাচাতে-নাচাতে পেট্রলের গন্ধে জঙ্গল ভবে দিয়ে চলে গেল।



তিন চার মিনিট ওখানে শুয়ে থেকে পৃথু এক লাফে উঠে এবার দৌড়ে যেতে লাগল সকালে যেখানে মগনলালের ক্যাম্প দেখেছিল সেই দিকে। পেছনে পেছনে শামীম।

ত্রিপলটা সেই রকমই টাঙানো ছিল। তার কাছে একটা উনুন। সেটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাঠকয়লার আগুন তখনও ছিল। কেউ কোথাওই নেই। একটা পেঁচা ডেকে উঠল দুরগুম্ দুরগুম্ দুরগুম্ করে ঝাঁকড়া চিল্‌বিলগাছটার উপর থেকে। নইনদীযার অন্য পার থেকে, যেখানে মৌলভীকে ওরা মেরেছিল ; একটি কুট্‌রা হরিণ ব্বাক্ ব্বাক ব্বাক করে ডেকে উঠল হঠাৎ ভয় পেয়ে। পৃথু, যেদিকে মহুয়াগাছটার উপর মাচা ছিল সেদিক লক্ষ করে আন্দাজে রাইফেলের ম্যাগাজিন খালি করে দিল।

শামীম হঠাৎ অস্ফুটে বলল, ইযা আল্লা!

কাঠকয়লার নিভু নিভু অঙ্গারের আভায় পৃথু চেয়ে দেখল সকালের সেই মেয়েটিকে। এলোমেলো শাড়ি। কী এক করুণ অসহায় ভঙ্গীতে শুয়ে আছে ত্রিপলের নীচে কাত হয়ে। তার গলাটা জবাই-করা। মুরগির মতো। মৃত্যুর ঠিক আগের সময়কার অসহ্য ছটফটানিতে তাজা রক্ত ছিটকে গেছে চতুর্দিকে বিচালি আর ঘাসের উপর। কালো কালো ছোপ চারদিকে। টাটকা রক্ত। প্রায়ান্ধকারে লালকে কালো দেখাচ্ছে।

পুরুষ অথবা নারীর রক্তে কি কোনওই তফাত নেই? স্বভাবে ও চরিত্রে এত তফাত? কে জানে, আছে কি নেই?

পৃথু, শামীমকে ফিসফিস করে বলল, অব্ দৌড়কে চলো, জীপোযামে। মগনলাল নেহি মরা। জরুর ভাগা হোগা। আটবারোঁয়া ঔর সামারীয়াকে তরফ গায়া হোগা। জল্‌দি। জল্‌দি দৌড়কে চলো শামীম। টাইম নিকাল্ বহ্া হ্যায়। উহ কামিনে দুস্‌রেকো মারায়া, আপনা জান্ লেকে ভাগা। সদরী কী তরীকাই দুস্‌রা হ্যায় উস্‌কা।

শামীম যেন মস্ত এক ধাক্কা খেল। হতভম্বের মতো বলল, ডাকু মগনলাল আভ্‌ভি ভি নহি মরা? তো উওলোগ কওন থা?

বাত বাদ্‌মে করোগে। আভভি দৌড়কে চালো।

নদীর রেখা ধরে ওরা দৌড়ে ফিরে যেতে লাগল, তাড়াতাড়ি জীপের কাছে পৌঁছনোর জন্যে। মিনিট দশেক খুব জোরে হাঁচোর-পাঁচোর্ করে দৌড়নোর পরই হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে ভুচুর জীপের হেডলাইট জ্বলে উঠল।

ভুচু চকিত সংক্ষিপ্ত স্বরে বলল, হ্যাণ্ডস আপ।

নূরজেহান! নূরজেহান! বলে, চেঁচিয়ে উঠল ওরা দুজনেই একই সঙ্গে। শামীম্ আর পৃথু। ভুচুও বলল, নূরজেহান।

শামীম আবারও বলল। নূরজেহান। নূরজেহান বলতে বলতেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। পাগলের মতো।

পৃথু বলল, আঃ শামীম! কেয়া কর রহা হ্যায় ইযার? তেরা লেডকিকি বেইজ্জতকি বদলা আভভিতক পুরী নেহি হুয়া।-বাদ্‌মে, বাদ্‌মে রোণা।

ভুচু তাড়াতাড়ি জীপটা ঘুরিয়ে নিল।

বলল, মগনলাল?

পালিয়েছে।
জানলে কী করে?
মন বলছে ভুচু।
পৃথু বলল, সে আমাদেব সামনা কবতে চাইলে আমাদেব ফেরা নাও হতে পাবত। সর্দার এমনিই হয় না। তার এলেম্ থাকে। সকলেব আগে ভাবে সে, আগে চলে। কী যে ঘটতে যাচ্ছে, তার গন্ধ পেয়ে যায়।
ঐ মেয়েটা কে?
শামীম অবাক গলায় বলল।
ভৈরবী! সেই বাঙালি তান্ত্রিকেব ভৈরবী! ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাগনান না কোথাকার যেন মেয়ে। কোথায় জন্মেছিল, সবুজ ধানক্ষেতে আর বাবলাব ছায়ায় বড হল; আর মরতে এল কোথায়! মগনলালকে আমাদের পেতেই হবে ভুচু। লোকটা একটা জ্যাক দ্যা বিপাব। অ্যাপার্ট ফ্রম বীইং আ ড্যাকয়েট। মিঃ লালও সেকথা বলেছিলেন।
জোরে জীপ চালাল ভুচু সামাবীয়া আর আটবারোয়াব পথের দিকে। টপ গিয়ারে জীপটাকে ফেলে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ঠুঠার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না মগনলাল, যদি ওদিকে গিয়ে থাকে। আমাদের কালো-বাঘ সেদিকে বসে আছে। যত বড ডাকুই সে হোক না কেন। বাঁচা নেই।
হাঁ।
শামীম্ সায় দিল ভুচুব কথায়।
আলোর বন্যা বইয়ে ভুচু প্রচণ্ড জোরে টিকিয়া-উড়ান চালিযে যখন জীপটাকে আধ ঘণ্টাব মধ্যে মোড়টাতে পৌঁছে দিল, দেখল হুদা বসে আছে ভুচুর জীপে। গ্লাসে কবে চা খাচ্ছে ধীরে সুস্থে। সঙ্গে এক প্লেট নিমকি আব কালাজামুন।
ভুচু বিরক্তি-মেশা স্বগতোক্তি করল, পিকনিক্ কবতে এসেছে এখানে।
পৃথু বলল, এখানে এক সেকেণ্ড দাঁড়াও। হুদা আন-আর্মড। আমি ওর জীপে যাই।
পৃথু নেমে গিয়েই হুদাকে বলল, চলো, চলো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো। ঠুঠা আর দৌলত সিংয়ের দলের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। একদৌড়ে দোকানে চায়ের গ্লাস আর খাবারেব ডিশ ফেবত দিয়ে পাঁচ টাকার নোট একটা ছুঁড়ে দিয়ে এসেই জোবে ছোটাল জীপ হুদা। প্রায ভুচুরই মতো।
মিনিট দশেক জীপ চালানোর পরই পথের বাঁদিক থেকে একটা পাঁচ-ব্যাটারির টর্চের আলো এসে আগে আগে যাওয়া ভুচুর জীপের উইণ্ডস্ক্রিনে পড়ল। চোখ ধেঁধে গেল ওব। ভুচু স্পীড কমাল। সিটের পাশ থেকে ওর টর্চটা তুলে নিয়েই ভুচু হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে দুবার আলো দেখাল। সঙ্গে সঙ্গেই বাঁদিকের জঙ্গল থেকে টর্চের আলো যে ফেলেছিল সেও তাইই করল।
ঠুঠা বাইগা।
ভুচু বলল।
সিগন্যাল এইই ছিল।
জীপ দাঁড় করাল ভুচু হঠাৎই ব্রেক করে। হুদা, প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট করতে করতে কোনওক্রমে জীপ বাঁচিয়ে, ভুচুর জীপের বাম্পারে প্রায় ঠেকিয়েই দাঁড় করাল ওর জীপটাকে। পেছনে। পৃথুর মাথা ঠুকে গেল উইণ্ডস্ক্রিনের কাঁচের সঙ্গে অত জোরে ব্রেক করাতে।
ঠুঠা দৌড়ে এল। পৃথু ও ভুচু নামল, শামীম্ আর হুদাকে নামতে মানা করে।
কী হল?
পৃথু বলল।
নাঃ। এদিকে কেউ আসেনি।
কেউই না?
নাঃ।

একজনও না ?

একজন আহিব শুধু সাইকেল চড়ে গেল। ভোলেভালা লোক। গবিব আদমি।

বড় অবাস্তব কথা বল তুমি ঠুঠা। একটু আগেই কী বললে ? সাইকেল চড়ে ? উড়ে গেল ? আহীব ?

হ্যাঁ। আহীব।

হুদা জীপে বসে থেকেই বলল, হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমিও তো তাকে দেখেছি। দু' হ্যাণ্ডেলে দুধেব টিন ঝুলিয়ে, গান গাইতে গাইতে চলে গেল সে মোড় দিয়ে। দুধেব শব্দও হচ্ছিল ছলাৎ ছলাৎ। সন্ধ্যে লাগাব একটু পবই সে গেছে।

পৃথু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল তোমাব দৌলত সিংযেব দলেব লোকবা কোথায় ? তাবা কি ববযাত্রীব নেমন্তন্ন খেতে এসেছে এখানে। একটা ছুঁচো দেখলেও তোমাদেব তাকে আটকানো উচিত ছিল।

তিনবাব পব পব জোবে হর্ন বাজান জীপেব।

ঠুঠা বলল।

ভুচু দৌড়ে জীপে গিযে তিনবাব জোবে হর্ন বাজাল।

দেখতে দেখতে ধুলিধুসবিত নতুন-কাটা ছানা ছানা-গন্ধ শীতেব বাতেব ঘি-বঙা ঝিঁঝি পোকা-ডাকা পথে ছ জন পাযজামা পাঞ্জাবি পবা লোককে এক এক কবে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। তাদেব লোহাব নাল-বসানো নাগবাব শব্দ হচ্ছিল, পথেব পাথবে লেগে। ভুচুব মনে হল পোশাক দেখে, শালাবা যেন ববযাত্রীই খেতে এসেছে।

পৃথু বলল, আপনাবাও কাউকে দেখেননি ?

নাঃ।

একজনও না ?

ও হ্যাঁ। একজন আহীব, মানে গোযালা গেছিল শুধু। বহুতই পিযে-হুযে থে। গানা গাতে গাতে চলা গ্যযা।

কী গান গাইছিল ?

তা তো লক্ষ্য কবিনি।

গোঁফওযালা দৌলত সিং লজ্জিত হযে বলল।

ওদেব মধ্যে অন্য একজন বলল, গানটা আমাব মনে আছে। সেই আহীবটাকে আমি দাঁড়ও কবিযেছিলাম। শুধোলাম, কোথা থেকে আসছ ?

সে বলল, আটবাবোযাঁ।

নাম কী তোমাব ?

বলল, ছেদীলাল।

কী গান গাইছিল ?

গাইছিল, "প্রীত ভইল মধুবনোঁযা বামা, তোবা মোবা।" এই গানই বাববাব গাইছিল। আমাব কাছে থেকে খৈনিও চেযে খেল। ওইই তো বলল যে, বড়ই ভয পেযেছে। পথে আসবাব সময নইনদীযাব দিক থেকে অনেক গুলিগোলাব আওযাজ শুনেছে। ডাকু-ফাকু এসেছে বোধহয এই জঙ্গলে। দিনকাল খুব খাবাপ পড়েছে। তাবপব, হাতে খৈনি মেবে মুখে ফেলে বলল, তুমি নিজেও তো ভাই আবাব ডাকু-ফাকু নও ?

আমি কিষুণমহাবাজকে ভজন কবি। দুধ মাঠ্ঠা বেচে খাই। এবাব প্রাণ নিযে পালাই। ওব দুধেব পাত্র থেকে ছলাৎ ছলাৎ কবে দুধেব আওযাজও আসছিল। লোকটা সত্যিই আহীব।

পৃথুব বড় বাগ হযে গেল।

বলল, ইডিযটস্। সেই ছেদীলালকে কি আপনাব বিভলভাব দেখিযেছিলেন ?

বাম কহো। নেহী।

কোথায় ছিলো আপনার আবমস ?

বাঁ দিকেব কোমবে।

আপনাব নিজেব প্রাণ বেচেছে এইই ঢেব।

তাবপব পৃথু ভাবল অন্যদেব উপবে বাগ দেখানোব অধিকাব তাব নেই। এবা পুলিশেব লোক। মাথায় আব কিছু থাক আব নাই থাক গুমোবে ভবা ঠিকই আছে। বুঝেই ঠুঠাকে বলল, ছিঃ ছিঃ ঠুঠা। লোকটাকে ছেড়ে দিলে তুমিও। কালা-বাঘ হযে। তোমাব মাথাযও কি গোবব ? কী বলব তোমাকে। সাইকেলটা কেমন দেখতে ছিল ? তুমি ছিলে এদিকে কত ভবসা ছিল আমাব।

আমি তো ওকে থামাইইনি অন্যবা দেখে ছেড়ে দিল, তাই।

পৃথু আবাব বলল সাইকেলটা কেমন দেখতে ছিল ?

হুদা বলল আমি দেখেছি। চাযেব দোকানেব হ্যাজাকেব আলো পড়েছিল তো পথে।

কীবকম সাইকেল ? লক্ষ্য কবেছিলে ?

হ্যাঁ। দু' হ্যাণ্ডেল থেকেই লাল-নীল প্লাস্টিকেব ফালি ঝুলছিল। আমাদেব গিযাসুদ্দিন মৌলভীব সাইকেলে যেমন ছিল না, প্রায তেমনই।

মাই গুডনেস ! সিলী ফুলস। বলে, বাগে গজগজ কবতে লাগল পৃথু ঠুঠাদেব উপব।

ঠুঠা বলল, কেন বাগ কবছ ? বনে-পালা মোষেব ঘন দুধেব ছলছলানিব আওযাজও তো শুনেছে সবাইই দুধেব পাত্র থেকে। বলছে যে কনস্টেবলটি, লোকটা সতিাই আহীব। আবে, নইলে দাঁড়িযে পড়ে কনস্টেবলেব সঙ্গে গল্প কবে ? খৈনী চেযে খায ?

পৃথু মুখ বিকৃত কবল বিবক্তিতে।

তাবপব দৌলত সিংকে কাছে ডেকে বলল, বহুতই মেহেববানি আপলোগোঁকি। আপনাদেব আমাব আব দবকাব নেই। আপনি থানায গিযে আপনাদেব সঠিক পবিচয দিন।

দৌলত সিং নাগবা পবেই অ্যাটেনশানে কটাক কবে দাঁড়িযে সেলাম ঠুকেছিল একটা। বলল, জী স্যাব।

তাবপব পৃথু বলল, এবাব হুদা, তুমি ভাই ওঁদেব একটু পৌঁছে দিযে এসো ওঁদেব অ্যামবাসাডব গাড়ি অবধি। আমবা এগোচ্ছি। ঠুঠা, তুমিও কষ্ট কবে একটু যাও হুদাব সঙ্গে। কাজ আছে।

ঠুঠা অবাক হযে বলল, কাজ ? কী কাজ ?

ঠুঠাকে আলাদা কবে ডেকে পৃথু বলল, ওদেব নামিযে একবাব থানাতেও নিজে গিয়ে দেখে আসবে মৌলভীব লাশ মর্গে পাঠাল কিনা এবং কখন পোস্ট-মর্টেম কবে ছাড়বে বড়ি মান্দলা থেকে। মানে, কোন সময মান্দলায গেলে চলবে আমাদেব। সঙ্গে বাড়িব বা পাড়াব কেউ কি গেছে ? সাবীব সাহেব আব গিবিশদাদাকেও বলে আসবে মান্দলাব ভাবটা নিতে। অনেক উপকাবই কবেছ মৌলভীব। আসল লোককেই চোখেব সামনে দিযে গান গাইতে গাইতে চলে যেতে দিলে, এই শেষ উপকাবটা একটু কোবো ঠুঠা।

পৃথুব হতাশাব শেষ ছিল না। গলাটা ভাঙা মনে হল ভুচুব। দৌলত সিং ফিং সব আনজান লোকেব উপব ভবসা ওব বিশেষ ছিলোও না কিন্তু ঠুঠাব মতো জঙ্গলেব পোকা, বাঘেব মতো সাহসী, পাথবেব দেওযালেব মতো শক্ত মানুষও যে কি কবে এমন ধোঁকা খেল ভাবলেই বাগ ধবছে ওব। "প্রীত ভইল্, মধুবনোঁযা বামা, তোবা মোবা।" প্রীত ভইল্ই বটে।

হতাশাব সত্যিই শেষ নেই। ভেবেছিল, এই চাপা উত্তেজনা, নূবজেহানেব বদলা, মৌলভীব বদলা সব একই সঙ্গে নেওযা হবে আজ। আজই শেষ হবে এই ঘিনঘিনে, শিবা-দপ্-দপ্ কবা প্রতীক্ষাব। ছিঃ। ছিঃ। আবাব কতদিন চলবে এব জেব কে জানে। মগনলালই যদি পালিযে গেল, তবে

আবাব নতুন দল বানিযে ফিবে এসে সে হযত, পৃথু ভুচু, ঠুঠা সকলকে শেষ কবে দেবে একেক কবে। ততদিনে ভুচুব বিযে হযে যাবে হযত। হুদাও হযত বিযে কববে। তখন না আর ভাবতেও পাবছে না পৃথু।

আমরা চললাম। হুদা আর ঠুঠা ওদের নামিয়ে দিয়ে এসো।
ওরা বেরিয়ে যাবার মিনিট পনেরো পর পৃথুরা বেরুল।
ভুচুই চালাচ্ছিল। বলল, রাম্ আছে নাকি?
হ্যাঁ হ্যাঁ আছে।
বিরক্ত গলায় বলল পৃথু।
এই রাস্তা দিয়ে যেতে হলে জলের ট্যাংকির তলা দিয়ে যেতে হয় না?
হ্যাঁ। ভুচু বলল। সকালে বিকেলে মাছ নিয়ে বসে মাছওয়ালিরা। এই সামনেই ত জলের ট্যাংকি। এ জায়গাটাতেই দৌলত সিংদের অ্যাম্বাসাডরটার দাঁড়িয়ে থাকাব কথা।
ওরা এতক্ষণে চলে গেছে। পৃথু বলল।
একটা জটলামত হয়েছে মানুষের, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু। মাছওয়ালিবা কেউই নেই এখন।
কি হয়েছে?
ভুচু জীপ থামিয়ে শুধোলো।
নইমুদ্দিন বলে ভুচুরই কারখানাব এক হেল্পারের ভাই গিয়াসউদ্দিন বলল, বাবু কোতোযালীকা দারোগা মকবুল খাঁকো মার ডালিস্।
কওন?
চমকে উঠে বলল ভুচু।
এক আহীর নে। দুধোয়াকি ক্যানোয়া সাইকেল মে লেকর গান্হা গাতে গাতে আকর্ অচানক্ উহি দুধোয়াকো ক্যানোযাইসে রিভলভার উঠাকে ধড়্কা দিহিস্। তিন্নো গোল্লী। একদ্দম ছাত্তিমে।
উসকো বাদ?
ঔর ক্যায়া? গোলি অন্দব, জান বাহার। সাথে সাথ।
ও মাই গড!
ভুচু বলল।
উও ডাকু থা কওন।
কওন জানিস্। কোঈ কহ্যা রহা হ্যায় কি ডাকু শের সিংহি খুদ থে। কোঈ কহ রহা হ্যায়, যো উওতো মর্ চুকে হ্যায়, উও আদমী জরুর খতরনাগ্ ডাকু মগন্লালই থে। কওন জানে সাচ বাত্।
সকলে শোরগোল তুলল, খুদ দারোগা হি মর গয়ে, আভ্ভি হোগা ক্যা?
জলের ট্যাঙ্কের পিলারের সঙ্গে একটা সাইকেল হেলান দেওয়ানো ছিল। অথচ, পৃথুর মনে হল না যে, ভিড়ের মধ্যের কেউই সেই সাইকেলের মালিক। ও কিছু বললও না কাউকে। ভুচুকে আর শামীমকে ঐ জটলার লোকেদের সঙ্গে গভীরভাবে কথোপকথনে জড়িয়ে যেতে দেখে নিজেই জীপ থেকে নেমে পান-জর্দার দোকান থেকে পান আনতে গেল। দোকান থেকে ফেরার সময় ট্যাঙ্কির নিচে গিয়ে যেদিকে সাইকেলটা দাঁড় করানো আছে, সেদিকে গিয়ে পিক্ ফেলল।
ভুচু জীপটা নিয়ে ওদিকেই এগিয়ে এল। জীপটা সরতেই লোকগুলোও সরে এল জীপের দিকে। পরনিন্দা, খুন, জখম, বলাৎকার, স্ক্যাণ্ডাল্—এসবের গন্ধ পেলে ভ্যাগাবণ্ড মানুষ আর খবরের কাগজের ব্যস্ত লোকেরা উৎসাহী হয়ে ওঠেন।
এক সময়ে পৃথু চট্ করে নেমে সাইকেলটা পরীক্ষা করে এল কাছ থেকে। হুবহু। মৌলভীর সাইকেল। এমনকি যে লালরঙা নাইলনের দড়ির টুকরোটি কোনও কাজে হঠাৎ লাগতে পারে ভেবে পেছনের কেরিয়ারে সবসময় মৌলভী বেঁধে রাখত; সেই দড়িটি পর্যন্ত আছে। দড়িটাতে হাত দিয়ে দেখল ভিজে। চাকার স্পোক, প্যাডল, রড—এসবেও হাত দিয়ে দেখল, জল চলকে পড়ে ভিজে আছে। লোকে তাকে দেখছে দেখে পৃথু বলল, অ্যায়সা হি একঠো সাইকেল থা হামরা। কুছ রোজ্ পহলে চোরি হো গয়া থা। ইয়ে সাইকেল কিস্কা হ্যয়?
কেউই জবাব দিল না। বলতেও পারল না। একজন বলল, বাহারকা কোই আদমী মহল্লামে

ঘুষ্‌ষা হিঁয়েই ছোড়কে। ইভি তো দোবারা চোরিহি হো যায়গা।

ভুচু জীপ স্টার্ট করে বলল, জবলপুরসে হামলোগ জীপ চালাকে আ রহা হ্যায়। আজ টাউনমে ঈয়ে কা সব্‌ ঝামেলা মাচ্‌ গয়া, খত্‌রাহি খত্‌রা।

কে যেন জিগ্যেস করল, জবলপুর সে আপলোগ কওন কাম লে কর, গয়া থে?

কম্পানি কা কাম লে কর্‌। ঔর ক্যা?

ইতোয়ারমে ভি কাম?

ইতোয়ার? ফুঃ।

বলে, হাসল পৃথু।

ভুচু বলল, ছুট্টি সিরিফ্‌ কিরানীকি ঔর মজদুরোঁকি কাম মে মিল্‌তি হ্যায়, ম্যানেজারলোগোঁকো লিয়ে ছুট্টি-উট্টি কুচ্ছো নেহি।

পৃথু গলা নামিয়ে বাংলাতে বলল, অনেক হয়েছে। এবার চল ভুচু। কথায় কথা বাড়ছে। এর মধ্যে যে ওর লোক নেই জানছ কী করে? কাজও আছে।

ভুচু অ্যাকসিলারেটর দাবাল।

গারাজে পৌঁছবার একটু পরই ঠুঠা এবং হুদা জোরে জীপ চালিয়ে এসে উত্তেজিত হয়ে বলল, মৌলভীকে একেবারে জবাই করে মেরেছে পৃথুদা। গুলি করে নয়। আঃ কী বীভৎস! শকুনে সবই খেয়ে গেছে। ইঃ হিঃ তাকানোও যায় না। আর কী দুর্গন্ধ। কাল সকালে মান্দলা থেকে বডি দেবে পোস্টমর্টেম করে, তাও বেলা দশটা এগাবোটা হবে। একটু আগে ত বডি বোরোল। দারোগা, বডি রওয়ানা করিয়ে দিয়ে…

পৃথু বলল। মৌলভীও অবশ্য ওদের জবাই করেছিল। মৃত্যু মাত্রই দুঃখের।

কোতোয়ালির দরোগাকে, যে আহীরকে আমরা ছেড়ে দিলাম ; সেইই মেরে দিয়ে গেছে জানো? কী ডেঞ্জারাস লোক মকবুল মিঞা! কোয়ার্টারে গেছিল চা খেতে, মৌলভীর ডেড-বডি রওয়ানা করিয়ে ক্লান্ত হয়ে। এমন সময় গোয়ালা এসে দরজায় সাইকেল নিয়ে ক্রিং ক্রিং ক্রিং করল।

দুধ্‌ লায়া। দুধ্‌ লায়া বলে।

দুধ, দারোগার গোয়ালা বিকেলে সময়মতই দিয়ে গেছে। চাকর এই নতুন গোয়ালার খবব দিতেই বিরক্ত হয়ে মকবুল দারোগা নিজেই এগিয়ে এসে গালাগালি করছিল যখন গোয়ালাকে, তখনই দুধের পাত্রেব ঢাকনা খুলে তাব মধ্যে হাত ঢুকিয়েই রিভলবার বের করেছিল। বলেছিল, মুঝে নেহি না পাহচানলি রে?

বলেই, পব পর তিনটি গুলি। দুটি লাংসে। একটি হার্টে। গুলি করেই, সাইকেল চড়ে ঐ গানটিই গাইতে গাইতে অন্ধকার গলি ধরে হাওয়া।

কোন্‌ গান?

ঐ যে। "প্রীত ভইল্‌ মধুবনৌয়া রামা, তোরা মোরা।"

পৃথু একটা চেয়ারে বসে অন্য চেয়ারে পা দুটো তুলে দিয়ে নিজের মনে বল, 'প্রীত ভইল্‌ মধুবনৌযা রামা, তোবা মোবা।' দুশমন হো তো অ্যায়সা। টকরানেমে ভি মজা আ যাতা হ্যায়। ক্যা হুদা?

বিলকুল সাহী দাদা।

মগর্‌, জান ভি বাঁচানা মুশকিল হোতা। কভ্‌ভি কভ্‌ভি।

ইয়ে ফাটকা তো জান্‌হি না লেকর। নেহি তো, মজা কওন্‌ চিজ কা?

পৃথু বলল।

হুদা হাসল, বলল, জী হাঁ। কভ্‌ভি কভ্‌ভি।

তারপর পৃথু বলল, হুদা, তুমি শামীমকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। যাও শামীম, আজ ঘর্‌ যাকে নাহ-ধোকব্‌ ডাট্‌কে খানা খাও।

ভুচু বলল, হাঁ দাদা, ডাট্‌কে খাও ঔর মুতকে শো যাও।

অনেকক্ষণ পর হাসল ওরা তিনজনেই।

ওয়ারলেসটা নিয়ে বসেছিল ভুচু।

লালসাহেব লাইনে আসতেই সব খবব দেওয়া হল।

মগনলালই পালিয়ে গেছে শুনে প্রচণ্ড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলেন উনি। রেগে বললেন, দৌলত্ সিংদের সাসপেণ্ড করব আমি। ওদের কি সাদিতে দাওয়াত্ খেতে পাঠিয়েছিলাম আমি? ছিঃ ছিঃ।

পৃথু মনে মনে বলল, ওদের রকম-সকম দেখে আমারও সেরকমই মনে হল।

ভৈরবীর কথাও বলল ভুচু।

তারপর পৃথুর সঙ্গেও কথা হল। কিছুক্ষণ

সিক্স ডেড, ইনক্লুডিং ওয়ান ইয়াং লেডি। শি ওয়াজ টচার্ড ডে অ্যাণ্ড নাইট।

ইউ মীন, রেপড?

ইয়া। উইদাউট রেস্পাইট।

দিস বাস্টার্ড অ্যাপিয়ারস্ ট্ 'বি আ সেক্স-ম্যানিয়াক।

লালসাহেব বললেন, ফিলজ...ালী।

পুলিশের অফিসারদের ফিলজফার না হযে উপায নেই। সেন্টিমেন্ট, উত্তেজনা এসব মুছে না ফেললে ভাল অফিসার হওয়া যায না। অথচ, পুলিশের উপরতলার বেশিরভাগ অফিসারই প্রথম জীবনে নম্র, লাজুক, অধ্যাপনাও করেছেন, প্রত্যেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। বেশিরভাগই খুব ভদ্রলোক। একেই বোধহয বলে জব-হ্যাজার্ডস। ফিলজফার হয়ে যাওয়াটাও অন্যতম হ্যাজার্ড বলে মনে হয় পুলিশের উপরতলার অফিসাবদের। বেচ্চাবাবা!

মক্‌বুল খাঁ, ইয়োর লোক্যাল ওসি ইজ ওলসো···

ইয়া। আই নো, বাট হী ব্রট ইট হিমসেল্ফ অন হিম। সান অফ আ বিচ্। আ ট্রেইটর টু ওল। আমি একজন সৎ লোক পাঠাব। কালই জযেন কববে সে। কথা বলে নেব আই জি সাহেবের সঙ্গে।

পৃথু বলল, মোটেলালেব পোস্টমর্টেমট৷ কোনোবকমে ওযেভ কবা যেত না?

না। ঘোষ সাহেব। দেখতেও খারাপ হত। আমার যা প্রধান চিন্তা তা হচ্ছে এইই যে মগনলাল এখনও হাটচ'...তেই আছে। ও আবাব নতুন দল গডে নেবে, যদি একটু সময পায। দ্যাট ওয়ে হী ইজ আ উইজ...৩। তার আগে ওকে খত্‌ম ক'রতে পারলে আবাব যেই কে সেই। শেয়ালেবই মতো ধূর্ত ও। তবে আমি মান্দলাতে বলে দিচ্ছি যত তাডাতাড়ি পারে ওকে শেষ করে দেবে। দল ত আর নেই এখন। আরও একটা কথা। আপনাবা কেউই, যাবা নুরজেহানকে উদ্ধাব কবার সময গেছিলেন, ছদ্মবেশ না নিয়ে কিন্তু মান্দলার মর্গ এ অথবা হাটচান্দ্রাব কববখানাতে যাবেন না। নো-ওয়ান। সাবধান। ছদ্মবেশও যেন ভাল হয়। বডি ত একেবাবেই ডি-কমপোজ্‌ড হয়ে গেছে। হাটচান্দ্রাতে কি ফিরিয়ে নিতে পারা যাবে? না মান্দালাতেই কবর দেবেন?

সে ওর আত্মীয়বা যা ঠিক কববেন।

আমিও কাল এসে পৌঁছব একজন বিডি পাতাব ব্যবসাদাব সেজে। হলুদ গরম জওহরকোট থাকবে গায়ে। ধুতি, দেহাতী খদ্দরেব লালচে পাঞ্জাবি। মাথায হলুদ গোল টুপী। কাঁধে সাদা আলোয়ান। চিনতে ভুল করবেন না আবাব।

আজকের মতো আব কিছু কথা আছে?

না। রজার।

রজার। থ্যাঙ্ক উ ফর এভরিথিং মিস্টাব ঘোষ।

আওয়ার গভর্ণমেন্ট উইল রিমেম্বার উ্য ওল। এণ্ড উইল ডু হোয়াট ইট ক্যান ফব মোটেলালস ফ্যামিলি এণ্ড দ্যাট সাধু, হাজব্যাণ্ড অফ দা ডেড গার্ল। নূরজেহানেব জন্যে সাইকিযাট্রিস্টেব বন্দোবস্ত করেছি। মিসেস রোহতাগী। উনি আগামী সপ্তাহে ভোপাল থেকে আসবেন শুধু ওবই জন্যে।

ওক্কে। রজার। নেভার স্ল্যাকেন দি এলার্ট। মগনলাল এলোন ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু মেনি।

ডোন্ট আণ্ডার-এস্টিমেট হিম্‌। কাল আমার সঙ্গে অন্য আরও লোক আসবে। কালই আমরা ওকে ন্যাব্‌ করার চেষ্টা করব।

একটা কথা মিঃ লাল। পৃথু বলল। ওইরকম ঘটনা ও বিপর্যয়ের পর ডাকুরা সাধারণত কি করে? কোথায় যায়?

দে বুজ্‌। মদ খেতে খেতে ভাবতে থাকে। অনেক সময় খারাপ পাড়ায় যায় নয়ত কোনো মেয়েকে ধরে, দরকার হলে গায়ের জোরেও। ওই সময়েই কপ্যুলেশনে ওদের মাথা নাকি সাফ করে দেয়। আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডাক্তারদের কাছেই শুনেছি।

ওঃ। থ্যাঙ্ক য়্যু। উই উইল গেট ইন টাচ এগেইন অ্যাট সিক্স ও ক্লক। শার্প।

ওকে। রজার।

হুদা শামীমকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসতেই, পৃথু বলল, হুদা তুমি না থ্যাটার করতে? বহুরূপী সাজতে, মেলাতে? এক-সময় ত খুব নামডাক ছিল।

হ্যাঁ। কেন? হেসে বলল, হুদা।

আমাকে একটু দেঁহাতী করে দাও ত। ঐ আহীরেরই মতো। পারবে?

হ্যাঁ।

তাড়াতাড়ি ঠুঠা বাইগার ধুতি শার্ট আর নাগরা পৃথুকে পরালো হুদা। তারপর চুলের কায়দা বদলে দিল। নাকের দুপাশে একটা ভুষোকালি মাখিয়ে দিয়ে নাকটাকে বাঁশির মতো করে দিল। ঠুঠার চাদরটাকে কারখানার ধুলোয় ফেলে ময়লা করে দিল। এদিকে ঠুঠা বাইগা পৃথুর জামা কাপড় পরে পৃথুকে ইন্সপেক্ট করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

ওরা সকলেই রাম্‌ খাচ্ছিল। ভুচু মুগের ডালের খিচুড়ি আর আলুভাজা প্রায় করে এনেছে। খেয়েই বেরুতে হবে পৃথুর। এবার অবশ্য একাই। যদি তিথিনক্ষত্র সব ঠিক ঠাক থাকে, থাকে পৃথুর মৃতা মায়ের আশীর্বাদ, তবে ডাকু শের সিং-এর সঙ্গে ডাকু মগনলালের একটা টক্কর হয়ত আজ রাতেই হয়ে যাবে। হয়ত, আখ্‌রী টক্করই। কে বলতে পারে? হয় ইসপার, নয় উসপার।

ভুচু আর ঠুঠা বলল, একা যাবে কি? আর যাবেই বা কোথায়? খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজতে?

একাই। ভাল ভাল কাজ সব একা একাই করতে হয়। ভেবে দেখো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

ভুচুর মুখে এক চিলতে হাসি এসেই মিলিয়ে গেল।

ঠুঠার মুখটা রাগে আর চিন্তায় কুৎসিত হয়ে উঠল। কিছু বলল না। পৃথু যে, ঠুঠার কাছে ছেলেরই মতো। ছেলেরই মতো কোলে কাঁখে করে মানুষ করেছে। অবাধ্য সাবালক ছেলের সামনে অসহায় বাবার মতো ও নিরুপায়ে ছটফট করতে লাগল। পৃথুকে একা যেতে দিতে ওর কিছুতেই মন সরছিল না। দুহাতা খিচুড়ি খেয়েই আবও এক চুমুক রাম্‌ খেয়ে দুটি পান মুখে ফেলে পৃথু বলল, কে কে দেবে ধার? আমার পাঁচশ টাকা চাই। কালই ফেরৎ পাবে।

ভুচুই দিল ঘরে গিয়ে, আলমারী খুলে।

সাইকেল নেই কারো?

না!

নাঃ। মুণ্ডা চাচার ছিল, সে ত নিয়ে ঘর চলে গেছে।

হুদা, আমাকে তোমার জীপ নিয়ে একটু এগিয়ে দিতে হবে।

কোনদিকে যাচ্ছ? পৃথুদা?

রাণ্ডী মহল্লায়।

কখন খবর করব? রাতেই? তোমাকে আনতে যাব না?

একেবারে সকালেই খবর কোরো। অবশ্য তার আগেই যদি নিজেই খবর হয়ে না যাই। হুদা, আমাকে জলের ট্যাংকির একটু দূরে নামিয়ে দিয়ে আমার বাড়িতে গিয়ে একটা খবর দিয়ে আসবে যে, আমি মৌলভীর মৃত্যুর কারণে রাতে ডেডবডির সঙ্গে মান্দলা চলে গেছি। কাল অফিস করে

একেবারে রাতে বাড়ি ফিরব, ঠিক আছে।

ঠিক আছে।

হুদা বলল।

পিস্তলটা কোমরের ধুতির উপরের বেল্টে বেঁধে নিয়ে তার উপর জামাটাকে ফেলল।

ঠুঠাকে বলল, বাঃ। সাইজ ত একই। এর পর থেকে রোজই তোমার জামা কাপড় পরে বাবুয়ানি করা যাবে। ঠুঠার মেজাজ খারাপ; চুপ করে রইল। কথা বলল না।

চললাম। পানের পিক ফেলে পৃথু বলল। গুড্ নাইট্।

হুদা বলল, চালিয়ে দাদা, ম্যায় ছোড়কর আ রহা হ্যায়।

ঠুঠা আর ভুচু কোনোই কথা বলল না।

পথেও কোনোই কথা হলো না হুদার সঙ্গে।

চুপ করে ভাবছিল পৃথু।

হুদাও ভাবছিল।

হুদা ভাবছিল, দুস্স্ শালা। সারাদিন গাড়ির বেঁকা মাড্গার্ড পিটে পিটে সোজা করো, গরমে বর্ষায় শীতে তেলমবিল চিট্চিটে তেরপল বিছিয়ে গাড়ির নিচে শুয়ে হাঁ করে করে রাজ্যের কালি-ময়লা খাও। হয়ত, ওয়েলডিং করো, নয়ত স্প্রে করো গাড়িতে রঙ। নাক জ্বালা করে। তার চেয়ে এইই ভাল। শালা রঙবাজী ভি আছে এই কাজে। অ্যাডভেঞ্চার আছে। হিম্মৎদারী ভি। ভাবছিল পৃথু দাদাকে বলে, পুলিশেই একটা চাকরী জুটিয়ে নেবে। যদি পায়। লাউটা, কুমড়োটা, ডিমটা, মুরগীটা, ব্যসস্ এইই। ঘুষঘাষ নেবে না হুদা। ঘুষ নিলে মাথা নিচু করে অন্য কারো পিছনে লাথ্ মারা যায় না ক্যাঁক করে। নিজের মেরুদণ্ডটা সোজা রাখাটা নিজের জন্যেই দরকার। বেঁকা হয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে বেঁচে থেকে শালার সুখ নেই কোনো!

এইখানে।

পৃথু বলল।

জায়গাটা অন্ধকার। জলের ট্যাংকিটা প্রায় এক ফার্লং মতো দূর হবে। শীতের রাত। রবিবার। তার উপর রাত এখন সাড়ে নটা—দশটা। একেবারে সুন-সান্ হয়ে গেছে এলাকা। মহল্লা এখান থেকে দূর আছে। আধ মাইলটাক।

হাত দিয়ে ইসারা করে হুদাকে চলে যেতে বলে, কোমরে একবার হাত ছুঁইয়ে তারাভরা আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। তারপর এগোল পৃথু।

কাল কবর দিতে হবে মৌলভীকে। সাবীর মিঞার সেই শায়েরটা মনে পড়ে গেল পৃথুর। গুস্তাকি ম্যায় ত্রিফ করেঙ্গা ইকবার, যব্ সব প্যায়দল্ চলেঙ্গে, ম্যায় কান্ধে পর, সওয়ার।

"জীবনে পাপ একবারই করব আমি। বন্ধুরা যখন সব হেঁটে হেঁটে যাবে আর আমি তাদের কাঁধের উপর জানাজাতে শুয়ে যাব।"

মুঠো মুঠো মাটি ছড়িয়ে দেবে কাল সকলে কবরের গহ্বরে শোয়ানো জানাজার উপরে।

পৃথু মরলে, টুসুরই মুখে আগুন দিতে হবে। অতটুকু ছেলে। হিন্দুদের নিয়ম কানুন বড় নিষ্ঠুর। কেমন মনে হবে? টুসুটার? রুষা হয়ত যেতে দেবে না। না দিলেই ভাল। একে শ্মশানের হাহাকার-ভরা পরিবেশ, কান্না-কাটি, শকুনশিশুর ওঁয়া-ওঁয়া, মানুষের সাদা হাড়গোড়, মাথার খুলি, তান্ত্রিক, কারণবারি, বে-সুরে গাওয়া ভজন। আর তারই মধ্যে অপাপবিদ্ধ এক শিশু, তার প্রিয় বাবার মুখে আগুন দিচ্ছে পাটকাটি দিয়ে। ভাবাও যায় না।

সান্ত্বনা এইটুকুই যে, পৃথু কারোরই প্রিয় নয়। কাউকেই দুঃখ দিতে হবে না বলে যাবার সময় এইটেই মস্ত বড় রিলিফ। ওকে নিজেকেও নয়, যারা থাকবে তাদেরও নয়।

ঠুঠা বাইগার নাল লাগানো নাগরার পায়ের শব্দে পৃথু চম্‌কে চম্‌কে উঠছিল। পোশাকে-আশাকে বদলে গেলে, নিজের পুরো অস্তিত্বটাই, চাল-চলন, মেজাজটাই যেন কেমন বদলে যায়। আশ্চর্য লাগছে যদিও পুরোপুরি এখনও ঠুঠা বাইগা হয়ে উঠতে পারেনি। নিজেকে মুছে ফেলে অন্য মানুষ

হয়ে উঠতে সময় লাগেই। এই জন্যেই বোধহয় অনেক পুরুষ পোশাক-আশাক সম্বন্ধে এত মনোযোগী। নিজেরা যা নয়, পোশাকে তাইই হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু সত্যিই কি তা হয়? যে মনে-প্রাণে ভিখারী, সে রাজার পোশাক পরলেই কি রাজা হয়ে যায়? যে ইতর, সে মহতের পোশাক বা মহত্তর মুখোস পরলেই কি তার ব্যক্তিত্ব বদলে ফেলতে পারে? নাঃ। বোধহয় সহজ নয় অত! ময়ূর-পুচ্ছ পরা কাকই ধরা পড়ে যায়, আর ওরা ত মানুষ!

পৃথু ভাবছিল, বেঁচে থাকার মধ্যে যদি তেমন জৌলুস নাইই থাকে, তবে মরণে জৌলুস একটু এলে তাও ভাল লাগবে। যারা পারে; তাবা পারে। পৃথু ত তেমন কবে বাঁচতে পারল না।

"আগো চারো তরফ্ দহক্‌তি হ্যায়,
জীনা ইস্ বীচ কিত্‌না মুশকিল হ্যায়—
ফিরভী জাঁবাজ খেল্ লেতে হ্যায়
উন্‌কো আসান্ হরেক্ মঞ্জিল হ্যায়।"

তেমন জাবাঁজের মতো বাঁচা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনোদিনও সম্ভব হয়নি। এখন মরণে যদি জাবাঁজ হতে পারে। একটা বড কিছু, ভাল কিছু করতে গিয়ে, গর্বের, বৈশিষ্ট্যর মৃত্যু আর কীইই বা আছে?

জলের ট্যাঙ্কির কাছে এসে পৌঁছল। ডানদিকে মোড় ঘুরবার আগেই দেখল মৌলভীর সাইকেলটা, তখনও ঐভাবেই থামে হেলান দেওয়ানোই আছে। মগনলাল এই মহল্লার কোনো বাড়িতেই এখনও আছে নিশ্চয়ই। তার মুখ ত বটেই, তার ফিগার আর দাঁড়ানোর কায়দা বসার কায়দা সব মুখস্ত আছে পৃথুর ছবি দেখে দেখে। একবার দেখতে পেলেই চিনতে পারবে পৃথু।

রবিবার বলে, মহল্লা অপেক্ষাকৃত চুপ-চাপ। দু একটি বাড়ি থেকেই শুধু গান-বাজনা আর নূপুরেব আওয়াজ ভেসে আসছে। শুধুই বাজনা বাজছে শোবার ঘরে, হয়ত কোথাও কোথাও। সে বাজনা, শোনার নয়। অনুমানের, অনুভবের।

কোন্ বাড়িতে যাবে আন্দাজে? ভাবল, গলিব পানের দোকানের পাশের চবুতরাতে বসে থাকে। চুপচাপ চারদিকে নজব রাখতে পারবে তাহলে। গলির মধ্যে যখন ঢুকল পৃথু তখন একটা বাচ্চা ছেলে, নোংরা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা; ফুলওয়ালা টুলওয়ালা হবে; চটি ফটফট করে দৌড়ে উল্টোদিক থেকে এসে পৃথুকে পেরিয়ে চলে গেল। তার পেছনে পেছনে কালোরঙা একটা লেজকাটা দিশি কুকুরীও। এই কুকুরীটাকে পৃথু চেনে। বিজ্‌লীর বাড়ির এক তলার বারান্দায় শুয়ে ছিল সেদিন। এরই বাচ্চাটা নর্দ্দমায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল সকালে।

বিজ্‌লীর বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই সেই ছেলেটিই ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে মৌলভীর সাইকেলটাই চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ঠিক বিজ্‌লীর বাড়ির সামনেই থামল। প্যাডেলে ওর পা পৌঁছচ্ছিল না। তাই সীটেও বসেনি। মধ্যের রডটার ভেতরে ব্যাঙের মতো বসে চালিয়ে এল।

বিজলীর শোবার ঘর থেকে গান ভেসে আসছিল। বসবার ঘর থেকে নয়। এবং খালি গলার গান। তার মানে, ঘরে লোক আছে।

গায়ের রোমগুলো সব সোজা হয়ে উঠল এক মুহূর্ত। শরীরের সব পেশী টানটান। তারপরই রোম শুয়ে পড়ল, ঢিলে হয়ে গেল শরীর। ফিরে এল স্বাভাবিকতায়।

বাচ্চা ছেলেটা দরজা খুলে সাইকেলটা বিজলীর কোঠারই একতলার ছোট্ট পাথরের ঘরে ঢুকিয়ে রাখল। পৃথুও ওর পেছন পেছন ঢুকল ঘরে। পেছনের চাকাটা কিরকির শব্দ করে ঘুরছিল তখনও।

পৃথু বলল, সাইকেলটা, একটু দেবে?

ছেলেটা হাসল। নিষ্পাপ হাসি। যদিও অন্যে বলবে, পাপের মধ্যেই তার বাস।

বলল, আমার নয়। বাঈয়ের কাছে শেঠ এসেছে, তার।

ফুঃ। শেঠরা কি সাইকেল চড়ে আসে নাকি? গাড়িতে আসবে ত। পৃথু বলল।

দুসস কত গাড়িওয়ালা শেঠ দেখি , ঐ গাড়িই আছে শুধু। বটের পাখির মতো ছোট ছোট দিল। আর এই সব শেঠ হচ্ছে অসলি শেঠ। একশটাকার কম বকশিশই দেয় না কাউকে। আসলি রইস।

তাইই ?

পৃথু বলল।

এই শেঠ কি রোজই আসে নাকি বিজলী বাঈয়ের কাছে ?

রোজ ? না ত ! ছেলেটি অবাক হয়ে বলল। একে দেখিনি কখনও আগে। শেঠ জবরদস্ত মগর বহতই পিয়ে হুয়ে হ্যায়।

তাতে কি ? ম্যায়ভি ত পীয়ে হুয়ে হ্যায়। পীনেসেই ক্যা আদমী খারাব হোগা।

খরাব ? কাহে ? পরন্তু আচ্ছা হোতা। কিঁউ ? আপ পিয়ে হুয়ে হ্যায় ত আপভি মুঝকো শ রূপাইয়া দিজিয়েনাগা বকশিশ ? ক্যা খুশনসীবী আজ হামারা।

পৃথু ভাবল, সামান্য মত্ত অবস্থায়, এইই দোষ ! বাঈজী বাড়িতে চাকর দারোয়ান, কুকুর, বাঁদর, সব শালাই বোধহয় ডাকু আর চোর। পকেট কাটবার জন্যে কাঁচি এগিয়েই বসে আছে। না দিলে গলায় ছুরিও বসিয়ে দেবে হয় ত। এ সব জায়গা পৃথুর জন্যে নয়।

ও বলল, দেগা। জরুর দেগা। অন্দর যানে দেও পহিলে বাঈকো পাস। তারপর বলল কমলা বহীন কাঁহা ?

বাঈকী পাস ? বোলা না, ঘরমে মেহমান আয়ে হুয়ে।

কমলা বহীন ? ছেলেটি হতবাক হয়ে তাকিয়ে।

বোঝা গেল এ নতুন। কমলা বহীনকে দেখেইনি।

সারেঙ্গীওয়ালা হ্যায় ক্যা কি ? ক্যা থা উনহিকা নাম ? বিলকুল ভুল গায়ে।

ইমরান খাঁ। উওভি ত শো গায়া হোগা। কাম নেহী ত করনা ক্যা ?

জারা বোলাকে লাও ত সাহী।

বকশিশ ?

দুংগা। বে-ফিক্কর রহো।

লাল-সবুজ চেক-চেক মাফলার গলায় জড়িয়ে কুর্তা পাজামা আর জওহর কোট পরেই বেচারা সারেঙ্গীয়ালা ঘুমিয়ে কাদা হয়ে ছিল। তার দু হাতে আটটি আংটি। বুক পকেটে তিনটি ফাউন্টেনপেন। উপরের পাটির দুটি দাঁত সোনার। হাতে সোনার জল-করা ঘড়ি। পাঞ্জাবির চুবিদার হাতার প্রান্ত থেকে মুখ বের করে সে ঘড়ি দুনিয়া দেখছে। তাছাড়া, বোতামওয়ালা গুণী ব্যক্তির হাত যে ঘড়িহীন নয় , তা সকলেই যেন বিনা-মেহনতেই দেখতে পায় সেই উদ্দেশ্যও আছে।

এই সাংঘাতিক সময়েও পৃথুর চোখ এতসব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করল দেখে ও নিজেই অবাক হল। ইমরান খাঁ পৃথুকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারল না। পৃথুও অবাক হল। মনে হল, লোকটাকে চেনে না ! তারপরই মনে পড়ল যে, সে নিজেও ত আর পৃথু নেই, হুদার দৌলতে ঠুঠা বাইগাই হয়ে গেছে। ইমরান-এর দোষ কি ?

পৃথু বলল, নেহী না পহচানা মুঝে ইমরান। ম্যায় ঘোষ সাব। পিরথু ঘোষ।

ইম্‌রান সঙ্গে সঙ্গে আদাব করল। সালাম আইলেকুম। পৃথু বলল, আইলেকুম সালাম। বলল, বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। বড়ী ঠাণ্ডা আজ বাহার মে। অন্দর আইয়ে না, অঙ্গোঠা রাখ্‌খা হ্যায়। হামারা কামরামে চলিয়ে।

ওর ঘরে গিয়ে লোহার মালসার মধ্যে কাঠকয়লার আগুনের পাশে বসল পৃথু।

ইমরান এদিক ওদিক চেয়ে বলল, বাঈয়ের ঘরে একজন লোক এসেছে, সত্যি কথা বলতে কি বাবু, লোকটাকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি। এখানে কি আর সন্ত-সাধুজীরা সবসময় আসেন, তা নয়, তবে এ লোকটা অন্যরকম। সে গান শুনলো না, আমাদের সবাইকে বের করে দিল অসভ্যর

মতো ঘব থেকে। কোনো তাবিকা জানে না। বিজলী এবকম বে-এতলাখ বে-তমদ্দুনেব মেহমান নেয না কখনও কিন্তু লোকটা প্রথমেই হাজাব টাকা গুণে দিল বিজলীকে। আমাদেবও বলল, খুশ কবে দেবে পবে গান না শুনেই। বিজলী ওকে নিয়ে ঘবে গেল। বোঝেনই ত। টাকা এমনই জিনিস যে এব চেয়ে বড পুলিস এব চেয়ে বড উকীল, সওযাল এব চেয়ে বড বিচাব আব কিছুই নেই। টাকা দিলে বেহেস্তেবও টিকিট পাওযা যায, দোজখেব মুখও ঢাকা যায আব বিজলীবাঈ ত সামান্য বাঈজীই একজন

ভেতবে একটু আগে পর্যন্ত গান শুনছিলাম। বিজলীব খালি গলাব, নিচু স্ববেব গান। কিন্তু এখন ত আব কোনোই সাডা শব্দই নেই কী হল কে জানে? এমন আনজান মেহমান নেওযাটা ঠিক নয। ঘবে ঢুকেওছে ত সন্ধ্যে লাগাব কিছু পবই।

আমাব কথা একটু বলবে বিজলীকে?

পৃথু বলল।

বলব? লোকটা যদি গোলমাল কবে? ডাকু-ফাকুও হতে পাবে। আজকেব খবব শুনেছেন ত?

ইমবান দ্বিধাগ্রস্ত গলাতে বলল।

হু।

পৃথু বলল।

বলেই বলল এই সাইকেলটা কাব? ইমবান?

আমি ত জানি না।

ছোট্ট ছেলেটা কলকল কবে বলল, শেঠ-এব সাইকেল। আবাব কাব? শেঠ উপবে আমাকে ডেকে পাঠিযে বলল পানি ট্যাংকিব নিচে আমাব সাইকিলটা দাঁড কবানো আছে, গিযে নিযে আসতে। হ্যাণ্ডেলে লাল নীল প্লাসটিকেব ফিতে ভি আছে বললেন।

আমাকে একশ টাকাও দিলেন।

কখন বলেছে?

একটু আগেই।

তুমি গিযে বলেছ শেঠকে যে, সাইকেলটাকে নিযে এসেছ?

না।

যদি বাগ কবে শেঠ না বললে?

পৃথু বলল।

চিন্তা কবে ছেলেটা বলল, হ্যাঁ তা কবতেও পাবে। তবে, তুমি শেঠকে ইজ্জৎ দিযে আপ আপ কবে কথা বোলো, যে লোক একশ টাকা বকশিশ দেয তাকে আপনিই বলা উচিত।

যাইই হোক, বাগ যদি কবে? গিযে বলই তুমি।

আচ্ছা! ছেলেটা বলল।

পৃথু ভাবছিল, মৌলভীব মৃত্যু এবং ওদেব দলেব এতজনেব মৃত্যুব জন্যেই কি এই সাইকেলকেই বাহন কবল মগনলাল? লোকেব চোখে ধুলো দেবাব জন্যে? জীপটা হযতো কোনো গোপন জাযগাতে লুকিযে বেখেছে।

ছেলেটি ওপবে উঠতেই পৃথুও একটি একশ টাকাব নোট ইমবান এব হাতে দিযে বলল, আপভি যাইযে ভাইসাব উস্‌কো সাথ। বিজলীকে গিযে আমাব কথা একবাব বলুন। বলুন, আমি পথেব ভিখিবী হযে গেছি, তাই ধাব শোধ কবতে এসেছি। আজ বাতেই শহব ছেডে চলে যেতে হবে। দেখা হবে না আব এ জন্মেব মতো আমাব সঙ্গে। একমুহূর্ত দেখা কবলেই হবে। কিছু কথা আছে। দবজা ফাঁক কবে কথা বললেই চলবে।

ইমবান চিন্তিত মুখে উপবে উঠল। বিডবিড কবে বলল, ইযে আদমী হামাবা ঠিক নহী লাগ বহাঁ হ্যায হুজৌব। ঢাণ্ডুকে বোলা লেনা চাইযে।

ঢাণ্ডু কওন?

অবাক হয়ে শুধোলো পৃথু।

ইস্ মহল্লেকে গুণ্ডা। বাঈলোগীনকে পর্‌টেকশান, উনোনেই না দেঁতে হেঁ।

রহতা কাঁহা ?

এহিত। মোড়হি পব : নজদিকোযামে।

উনকা সাথমে রাখনাই জরুবী হ্যায়। ম্যায় গ্যয়া ঔব আয়া সিরিফ্ ইক্ সিকেণ্ড।

বলেই, ইমরান্ চলে গেল। তাব ঘোব সবুজ রঙা র‍্যাপাব আর কাশ্মীরী ভেড়ার লোমের টুপী চড়িযে। এই লোকগুলোর কোনো ফীজিক্যাল একসারসাইজ নেই বলেই বোধহয় এত ঠাণ্ডা লাগে।

ঢাণ্ডুকে ডাকতে গেল। ঠিক সময়মত যত ফ্যাচাং। বাগ হচ্ছিল পৃথুর আর ভিতরে ভিতরে বাড়ছিল উত্তেজনা। আজ মগনলালের একদিন কি ওরই একদিন ! আখ্‌রি দিন আজ। আখরি ওয়াক্ত এসে গেছে এখন। আর তব সয় না।

এই ঢাণ্ডু আবার কি নিক্‌লোবে তা ঈশ্বরই জানেন। ভাষাটাষা নিয়ে ভাবার সময় নেই এখন আর। যে মানসিক এবং শাবীবিক স্তরে সে নিজেকে নামিয়ে এনেছে, খুন্‌খারাপি, মেয়ে-খুনের সাক্ষী, বাঈবাড়ি—তাতে তাব ভাষাও নেমে এসেছে সেই স্তরে অনবধানে। নেমে আসা ত সবসময়ই সোজা। ওঠাই, কঠিন বড।

পৃথু কোমরের পিস্তলের হোলস্টাবেব বোতাম খুলে ফেলল। বাঁ হাত দিয়ে রাম্ এর পাঁইট্‌টা বের করে খেল ঢকঢক্ কবে। শীত ওব লাগছে না। ভিতবেব ভয়-মিশ্রিত উত্তেজনাটা প্রশমিত হল একটু।

পৃথুর বাবা বলতেন, জীবনের যে-কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতাতে একবাব নেমে পড়লে নিজের আলাদা সত্তা, স্বকীয়তা একেবারেই মুছে দেবে।

প্রতিযোগিতা জীবনেব সব ক্ষেত্রেই। দিনেব প্রতি সময়েই। যে-যোদ্ধার সঙ্গে লড়বে যখন, ঠিক তারই মতো, তারই সমতলে, উচ্চতায় বা নিম্নতায উঠে গিয়ে বা নেমে এসেই লড়বে।

বাবাব কথা মনে এল। পৃথুব। বাবাব মুখটি। নেমে তো এসেছেই। মগনলালের মোকাবিলা কবতে গিয়ে নিজেও তো মগনলালেরই শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। আব কত নীচে নামবে ? কোনটা যে ওঠা আব কোন্‌টা নামা তা বুঝতেও গোলমাল হয়ে যায়।

ঢাণ্ডু এল। ওর চেহাবাটা দেখে চেনা চেনা মনে হল পৃথুব। পবনে লালরঙা ট্রাউজার উপরে নীল রঙা ফুল-হাতা সোয়েটার। টাক-মাথা কিন্তু টুপী বা মাফলার কিছু নেই। লোকটার বোধহয় শীত খুব কম। অথচ কোথায যে দেখেছে, তা মনে করতে পারল না। হয়তো কারখানার গোলমালের সময় দেখে থাকবে। তখন কিছু গুণ্ডারা ঘোবাফেরা করত। ঢাণ্ডু, পৃথুর চেহারা দেখে, থুড়ি, ঠুঠার—নিশ্চয়ই চিনতে পাবল না, ইম্‌রানের কাছে নাম শুনে কিন্তু সেলাম করল 'সেলাম ঘোষ সাহাব' বলে।

ঢাণ্ডু ভাবল, পাছে বাঈ মহল্লায় লোকে চিনে ফেলে তাইই এই ভেক্। পড়ে-লিখে, বড়া খান্‌দানের মানুষ মাত্রই তো ভণ্ড হচ্ছে কিনা। তবে এখানে এসে নিজেব নামও ত কেউ বলে না। সাধারণত শত্রুর নাম বলে। এ মানুষটা নিজের নামই বলছে সকলকে, পরিচযও। অজীব আদমী।

ভাবুক যা খুশি, ভাবুক। মনে মনে বলল পৃথু। মগনলালকে চাই শুধু।

ঢাণ্ডু একদৃষ্টে পৃথুর চোখে চেয়ে ছিল।

পৃথু বলল, চলো। সঙ্গে যন্ত্র আছে ঢাণ্ডু ?

কী যন্ত্র হজৌর ? চাকু আছে আমার। বলেই, লাল ট্রাউজারের কোমবের কাছে দেখাল ডান হাত দিয়ে। সিঁড়ি উঠতে উঠতে বলল, এতেই মাখমের তালের মতো মুণ্ড নেমে যাবে।

ওতে হবে না ঢাণ্ডু। এ যদি সেই লোক হয়, তবে সাবধান। এ সাংঘাতিক লোক।

কে লোক ?

জানি না। যদি সে হয়, তবে।

অন্য যন্ত্র যে এখন নেই। কোন্ লোক্ এ ? যেই হোক,আগে ঢাণ্ডুর সঙ্গে খালি হাতেই টক্করে

দেখুক।

ঠিকই আছে। কিন্তু তুমি বরং এগোবে না। আমাকেই এগিয়ে দেবে। পরে আমার সাহায্যের দরকার হলে আমাকে কোরো সাহায্য, বারণ করব না।

লোকটাকে আপনি চেনেন না কি?

সেইই যদি হয়, তবে ফয়সালা আছে তার সঙ্গে আমার।

বিড়বিড় করে বলল পৃথু।

পৃথুর দিকে একঝলক অবাক চোখে চেয়ে, সরু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দরজায় পৌঁছেই ঢাণ্ডু চেঁচিয়ে উঠল, আবে শালা! খোল্ দরওযাজা।

চুপ। চুপ। আমি আগে। তোমাকে জানেই মেরে দেবে আগে গেলে।

চাপা গলায় পৃথু বলল।

ঢাণ্ডু অপমানিত হয়ে বলল, বাঙালি বাবু, জান্‌কা পরোয়া ম্যায় নেহি করতা। জান্ তো জানেকা-লিয়েই হ্যায়।

ছোট ছেলেটাও দরজায় ঠুকঠুক্ করছিল।

পৃথু ভাবছিল, বাঙালিদের এরা ভাবেটা কী! সাহেবদের তাড়াবার সময় কারা ছিল পুরোভাগে? বীণা দাস, ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দিনেশ? আর সাম্প্রতিক অতীতে ঠিক করুক কী ভুল করুক; মেধাবী সব নকশাল ছেলেগুলো? তাবা কি ভীতু ছিল?

জীবনেব ভয বাঙালী কবে না।

তবে এও ঠিক যে, বেশিরভাগ সুখী-সুখী, সখী-সখী বাঙালিই অন্যবকম। তাদের দেখেই এইরকম ধারণা কবে এবা সবাই। কজন বাঙালী দেখেছে এবা? কিন্তু বাঙালীর হয়ে লড়েই বা কি হবে? কলকাতার বাঙালীরা ত পৃথুদেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্রও খোঁজ রাখে না। কস্তুবী মৃগবই মত নিজেদের গন্ধেই নিজেবা মশগুল।

ভিতব থেকে কোনওই আওয়াজ নেই। মুজ্‌রা যেখানে করে, সেই ফবাস-পাতা ঘর পেরিযেই শোবার ঘব। হয়তো শোবাব ঘবের দবজাও বন্ধ। নিঃশ্বাসের শব্দও নেই।

এবারে খুব জোবে জোবে ধাক্কাল দবজা। ইমরান্ খাঁ। ভিতব থেকে জড়ানো গলার আওয়াজ এল, কওন্? সাইকিল্ লেক্‌র আয়্যা শেঠ।

ছোট ছেলেটা চিকন গলাতে বলল।

কওন্ চি?

সাইকিল। আপকা সাইকিল্।

তঙ্ক মত্ করো হারামিকো বাচ্চে। রাখ্‌খো নিচামে। বিস্তারামে সাইকিল্ লে কর্ ক্যা করনা মুঝে? বুরবক্ কাঁহাকা।

এবার ইমরান্ গলা তুলে বলল, বাঈ, বাঈ। বিজ্‌লী বাঈ!

গোঙানির মতো একটা উত্তর এল ভিতর থেকে। বোঝা গেল, বিজলী কথা বলতে পারছে না। কিন্তু কেন?

ক্যা হুয়া? চিন্তিত মুখে বলল ইম্‌রান। অ্যায়সি তো কভ্‌ভি নেহি হুয়ি। ইত্‌না দিনো সে দেখ্ রহা হ্যায় বাঈকো।

ঢাণ্ডু বোধহয় সন্ধে থেকেই মহুয়া টেনে ছিল। কোমরের বেল্‌ট্‌টা টাইট করে বেঁধে নিয়ে বলল, দর্‌ওয়াজা খোওল বে শেঠ্‌কা বাচ্চে।

কওন্ বে? তেরী জবান্ জারা মিঠ্‌ঠি করনা।

ভিতর থেকে বলল মৌল্‌ভীর সাইকেল আর জানহাপিস্—করা লোকটা।

এবার শব্দ শুনে মনে হল লোকটা এগিয়ে আসছে ঘরের ভিতর থেকে দরজার দিকে। কাছে এসেই বলল, কওন্ হ্যায় তু বাহেন্‌চোদ?

ম্যায় ঢাণ্ডু। ইস্ মহল্লেকে জিম্মাদার। বাঈকি আওয়াজ কাহে না মিলতি হ্যায়? তুম শালে

কওন হ্যায় ? রঙবাজী দিখানে আয়া হিঁয়া ?

তেরি বাঈ বহতই পি লিয়া বাচ্চে। আওয়াজ বিল্‌কুল্ বন্ধ। আওয়াজসে হামারা নফ্‌রত্ হ্যায়। সব্‌তরিকা আওয়াজসে। সম্‌ঝা না ঢাণ্ডু ? গান্ডু !

ঢাণ্ডু, ইমরান্ এবং পৃথুও জোরে জোরে দরজায় কিল ও লাথি মারল এবার একসঙ্গে।

লোকটা মত্ত হয়ে আছে। স্বগতোক্তির মতো কথা বলছে।

ঢাণ্ডু বলল, অব্ দর্‌ওয়াজা খোল্। হারামজাদা। নহি তো পোলিস্ লাউঙ্গা।

ফুচ্। পোলিস ? দারোগা মক্‌বুল্ খাঁ তো জানাজা মে হি চড়েগা কুছ্ দেব বাদ্। পোলিস্ কওন্ চিকি ? ইয়ে জাগেমে পুলিস হ্যায় থোড়ি ! ডর্‌পোক্ লোগোঁকা জাগে হ্যায় তোরা ঈ হাটচান্দোয়া।

জাদা বকোয়াস্ মত্ কর। দর্‌ওযাজা খুলা ছোড়। নহি তো· · · · · ·

ভিতব থেকে সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ এল। নেহীত ? নেহীত ক্যা ? জবান সাম্‌হাল্‌কে বাঁতে করনা।

ঢাণ্ডুও তেতে বলল, দিখোগে মেরী জবান ? দব্‌ওয়াজা খোল্, জবান্ দিখ্‌লাতা ম্যায়। শিখ্‌লাতা তুঝে।

বলতেই, ভিতরের খিল দড়াম করে খুলেই, এক ঝট্‌কাতে দরজা হাঁ হয়ে গেল। কিন্তু দরজার সামনে কেউই নেই। খোলা দরজার সামনে এল না সে নিজে। বহতই হোঁশিয়ার।

ঢাণ্ডু ভিতরে না ঢুকে বলল, বাঈকে লে কর্ আও হিঁয়া। উনকি তবিয়ত ঠিক্কে হ্যায় কি দিখ্‌না হ্যায় হামলোগোঁকো।

ঘরেব মধ্যের প্রায়ান্ধকারেব মধ্যেব অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে হেসে উঠল মগনলাল। হঠাৎ এঘবেব বাতিটাও নিবিয়ে দিল। ভিতরের ঘরেব ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল একটু। মগনলাল বলল, হাজাব রূপাইয়া লিয়া রাতভর্‌কে মৌজ্‌কে লিয়ে। মেরি রূপাইয়া ক্যা মেহনতসে নেহি কামাতা ? ইয়ে ক্যা হাবাম্‌কা পইসা মিলা ? হাজার রূপাইয়া কোঈ ছোটিসি বাত হুযা ? পবন্তু ম্যায উন্‌কি ক্যাযসি লাউঁ ! উনোনে তো পডি হুযি হ্যায, পীকে বে-হোঁস, জওয়ানিসে বে-হোঁস ঔর পেয়ারসে ভি বে-হোঁস। আও। দিখ্‌কে যাও। বিজলী বাঈকি ভাই। মেরী শালে !

বলেই, জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, মস্ত্ কব দো সাকী

মগব এক শর্ত্‌পব, হোঁস ইত্‌না রহে কি তুঝে ইযাদ বহে।

ছোট ছেলেটিকে ঠেলে পাঠাল ঢাণ্ডু ঘরের মধ্যে।

অ্যায় ! তুম্ কিঁউ আয়ে অন্দর ? বলেই, এক বিরাট ধমক্ লাগাল ভিতরের নেশাগ্রস্ত মগনলাল।

ছেলেটা বলল, সাইকিল। সাইকিল্।

সাইকিল্ ম্যায় কাঁহা ঘুষায়গা?

বলেই, ছেলেটা আলো-আঁধারিতে মোডা তাব চেহারা এবং মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেবিয়ে এল।

ডাকু মগনলাল, খুব সম্ভব ঘরের ডানদিকে ফরাসের উপব বসে ছিল। মনে হয়, একেবারে তৈরি হয়েই ; যে-কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে। তাকে খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল না। এমন "হাঁ"-করা দরজা দিয়ে আত্মহত্যার জন্যে ঢোকার তাড়াও ছিল না পৃথুর।

ইমরান এবার ঢুকে পড়ে সেলাম করল মগনলালকে। বলল, শেঠ ! অন্ধকারে একটি তাকিয়া সামনে নিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ফরাসে বসে আছে মগনলাল। দেওয়ালের আয়নায় তাকে এবাব দেখা যাচ্ছে। পৃথু দেখতে পাচ্ছে। ইমরান্ বলল, বাঈকি এক রিস্তেদাব আয়া, উনকি মিল্‌নেকি লিয়ে। আজই টাউন ছোড় কর্ চল্ দেগা উনোনে। জারাসে মিল্ লেঁতে থে ....পাঁচ মিনট্ কে লিয়ে।

কামওক্ত কাঁহাকা। রাতভর্‌কে কড়ারমে রূপেয়া দেনেকা বাদ তুমলোগ রিস্তেদারি দিখা রাখা হ্যায় হিঁয়া ? আজীব বাতেঁ কর রহ্যা হ্যায় ইম্রর। ফিন্ আওরত্ চু মারাকে খাতি, উন্‌কি রিস্তেদারি শ্রিফ একই চিজোঁসে হোতি। জানতে তু ? কৌন্‌সি চিজ হোতি উ ?

বলেই, ফুক্ করে হাসল নিজেই। পরক্ষণেই গলা তুলে হুঁকার ছেড়ে বলল, ভাগো হারামজাদে। তঙ্ক মত্ করো মুঝকো। কাল সুবে সব্‌কো বকশিশ দুঙ্গা। বাঈকো রিস্তেদার কো ভি। কওন্ হ্যায় উও ? মর্দানা ইয়া জেনানা ? জেনানা হোগী তো অন্দর্ ভেজো। উন্‌কি তবিয়ত্‌কিভি খুশ্ কর্ দুঙ্গা ম্যায়। ক্যেয়া, নেহি তো দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধ।

আর সময় নেই। ঢাণ্ডুকে এক ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়েই, ইমরান্‌কে পাশ কাটিয়ে পৃথু এক দৌড়ে মগনলালকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই বিজ্‌লীর ঘরের দিকে বিজ্‌লী বিজ্‌লী বলে ডাকতে ডাকতে চলে গেল।

কওন্ হ্যায় ইয়ে বদ্‌তমিজ আদ্‌মি ? কিস্‌কি ইত্‌না হিম্মত্ পড়ি যো .....

কী যেন করেছে মগনলাল বিজ্‌লীকে। বিজ্‌লীর মুখে ফেনা। সারা শরীরে, এই শীতের রাতেও ঘাম। খুবই অত্যাচার করেছে কি ? দেরি হলে হয়তো জবাইও করে যেত। এই রাতেরই প্রথম প্রহরে ভৈরবীকে করেছে জবাই।

জল্‌দি আও ইমরান্। ঢাণ্ডু ভাই।

ডাকল, পৃথু।

বলতেই ওরা দৌড়ে ঘরে এল। মগনলাল খুবই খেয়েছিল। নইলে এতক্ষণে সে দু' চারজনকে মেরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত। নেশা কিছু বিজ্‌লীরও ছিল। কিন্তু অসুস্থতা নেশাজনিত নয়।

পৃথু বলল, আভ্‌ভি হস্‌পিটাল লে চালো। কুছ্ খরাবি কর দিয়া ইয়ে আদ্‌মি। বিজ্‌লীর শরীরের পাশ থেকে একটা চকচকে বড় ছুরিও পাওয়া গেল। ঈসস !। বিজ্‌লীকেও কি ভোগ শেষ করে জবাই করত ও ? ঈসস্ ....ঈস্‌স্ ...

চকিতে পৃথু সেটা পাঞ্জাবির পকেটে ভরে নিল। মেঝেতে পড়ে থাকা শাড়ি জামা দিয়ে জড়িয়ে নিল ওরা বিজলীকে। বিজ্‌লীকেই দেখবে না, না ঐ লোকটাকে শিক্ষা দেবে তা ঢাণ্ডু ঠিক করতে পারছিল না। হতচকিত হয়েছিল। হতচকিত মগনলালও এঘরে এল। সামান্য টলছিল পা দুটো। চোখদুটো ফোলা। শুধুই পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে ছিল। নীচে ছিল না কিছুই। অনাবৃত রোমশ সুগঠিত দুটি পা দেখা যাচ্ছিল। সুপুরুষের পা দুটিই বোধহয় সবচেয়ে সুদৃশ্য অঙ্গ। ইতিমধ্যে একটা শাড়িতে ভাল করে জড়িয়ে .... মুড়ে ওরা সকলে বিজ্‌লীকে নামিয়ে নিয়ে গেছে সিঁড়ি দিয়ে। চেঁচামেচিতে নিচে লোকজনও জুটে গেছে। একটা জীপগাড়ির শব্দও শোনা গেল গলিতে। জীপের শব্দ কানে যেতেই, কান খাড়া করে, তীক্ষ্ণ, রুষ্ট চোখে পৃথুর দিকে তাকাল মগনলাল। ডাকু মগনলাল !

জীপের আওয়াজটা মিলিয়ে গেল। কার জীপ কে জানে ! কয়েকটি জুতো-পরা পায়ের দ্রুত শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে ওঠার।

মগনলাল হঠাৎই দৌড়ে গেল পাশের ঘরে দরজাটা বন্ধ করতে। সেই অবকাশে পৃথু পিস্তলটা বের করে, কক্ করে বিজ্‌লীর খাটের এক কোণায় বসে ; কোলের উপর একটা বালিশ টেনে ঢাকল ওটাকে।

করুক দরজা বন্ধ। যা হবার হোক দুজনেরই মধ্যে। এইই ভাল। অন্যদের এ মামলাতে ফাঁসিয়ে লাভ নেই। ইস্‌পার নহী ত উস্‌পার। শুধু একটা জিনিসে ভুল না হয়ে যায়। লোকটা মগনলালই ত। অন্য কেউ নয় ত !

মগনলাল এবার এসে আলোর নীচে দাঁড়াল। মেদহীন, ঋজু, ছ'ফিট লম্বা হবে। ধবধবে গায়ের রঙ। রোদে পুড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে থেকে লাল হয়ে গেছে। পৃথুর চেয়ে ইঞ্চিখানেক বেশি লম্বা। খাড়া, খড়্গের মতো নাক। কপালে বলিরেখা। সরু কোমর। মুখের মধ্যে অবিশ্বাস্য এক নিষ্ঠুরতা। ভারী সুন্দর সুগঠিত দুটি পা। বড় বড় পাকানো দুটি গোঁফ। একমাথা বাব্‌রি চুল, কুচকুচে কালো। বয়স, বড়জোর পঁয়ত্রিশ হবে। প্রায় সমবয়সী। সুন্দর শরীরের এক পুরুষ। সুন্দর শিঙাল শম্বরের মতো। শুধু যদি সে অমানুষ না হত।

পৃথু তার চোখের দিকে তাকিয়েছিল।

মগনলাল বলল, শুনো গাঁওয়ার। ওয়াক্ত জাদা নেহি হ্যায়। তুম কওন্ হ্যায় বাতাও মুঝে। নাম ক্যা তুম্হারা? ঠিক-ঠাক্ নহী বতানেসে জান্ লে লেগা।

পৃথু আস্তে আস্তে বলল, ডাকু মগনলাল কান খোল্কর শুনলে। ম্যায় হুঁ শেব সিং।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল ঘরের মধ্যে হাসিব দমকে ঘুরে গেল মগনলাল। বাঁদিকের গোঁফে হাত দিয়ে ঘুরে যেতে যেতেই এক ঝটকায় পিস্তলটা বেব করল কোমর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি থেমে গেল। বদলে গেল মুখেব চেহারা।

বলল, নেহি। নেহি। তু শের সিং নেহি। তু পির্থু ঘোষ। চুহাসিং। বাঙালিয়া বাবু। ফুঃ! ডাকু, দুস্‌রা খান্দান্ সে বন্‌তে হেঁ। পড়েলিখে, নোক্কব কিরানী কভ্‌ভি ডাকু না হোনে শকতা। ডাকুভি বন্‌নেমে কুছ্ হিম্মৎকি জরুরৎ পডতি হ্যায়। উও তুমলোঁগোমে হ্যাযই নেহী। অব মবো শালে! বাঙালি কি বাচ্চে! গোলিসে আজ ভুঞ্জেগা তুঝকো। শালে ইন্দারজিৎ লালকে কুত্তে।

পৃথু বলল, মারোগে তো জরুব। পহলে উও গানা তো শুনাঁও এক মরত্‌বে।

গানা? কওনসা গানা?

অবাক হল, মরার আগে বাঙালী বাবুকে ইয়ার্কি মারতে দেখে।

ওহি! "প্রীত্ ভইল মধুবনোঁয়া বামা, তোরা মোরা।"

হেসে ফেলল, ডাকু মগনলাল।

তাবপর বলল, ইতমিনানসে শুননা তু ইযে গানা উপ্পব যা কব। আভভি আখরিওয়ালা চিজোঁ কুছ মাঙ্গনেকি হ্যায ত' মাঙ্গ লে। হ্যায কুছ?

পাশের বাড়ির কোনো বাঈজী গাইছিল পৃথুর প্রিয গান, বসুলন বাঈর গাওয়া. কন্‌কর মোঁয়ে লাগ যাই হেঁ নাবে/ কনকব লাগলে কি কছছ ডব নহি/গগ্নব মোবা ফুট যাইহেঁ না বে/গগ্নব ফুট্‌লে কি কচ্ছ ডর নাহি ....

বোলো? হ্যায় কুছ?

জী হাঁ।

ক্যা?

তুমহাবা জান।

এহি কামিনেকে জান? ওয়াহ! ওযাহ

মগনলালের এই বাক্য শেষ হবার আগেই বালিশটা এক ঝট্‌কাতে তুলেই র‍্যাপিড সাক্‌সেশানে পর পর তিনটি গুলি কবল পৃথু, সেমি-অটোম্যাটিক্ পিস্তলটি দিয়ে।

গুম্। গুম্। গুম্।

ছোট্ট ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনি, বেড়ালের তাড়া-খাওযা পায়রার ঝাঁকের মতো হুড়োহুড়ি করতে লাগল।

গুলিকটি মগনলালের বুকের দু'পাশ ও পেটও মনে হল একেবারে ছেদড়ে-ভেদড়ে দিল। ওর মুখে তখনও বিস্ময়ের ভাবটা পুরো কাটেনি। কেরানি, বাঙালির বাচ্চা যে সত্যি সত্যিই ডাকু মগনলালের দলেরই শুধু নয়, তার নিজেরও মওত্ হয়ে আসবে এ ভাবনাকে সে কখনও আমলই দেয়নি। ভেবেছিল, সবজান্তা ইন্দারজিৎ লালের এও আর এক মূর্খামি! বিকেল ও সন্ধের অপারেশনটিকে ও ভেবেছিল মক্‌বুল খাঁ এবং লাল সাহেবই দুজনে মিলে করেছে অনেক প্ল্যান করে। পৃথুর সম্বন্ধে একবারও ভাবেওনি। সাঁওয়া ও শের সিংকে এই সপ্তাহেই ও একাই শেষ করে দিত। তারপর এই জায়গা ছেড়ে চলে গিয়ে নতুন দল বানাত অন্য কোথাও গিযে।

পড়ে যেতে যেতেও মগনলাল দেওয়াল ধরে ফেলল। এবং পৃথু ওর গুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই খাটের বাজুর দিকে দৌড়ে সরে যাচ্ছিল যদিও, কিন্তু তবুও মগনলালের ফোর্-নট-ফাইভ্ পিস্তলের দুটি গুলি অত শর্ট-রেঞ্জ্ থেকে এসে লাগল। ডান পাটা মনে হল টুকরো হয়ে গেল। ডানদিকের পেটেও কে যেন গরম ছোরা ঢুকিয়ে দিল একটা। ছিট্‌কে উঠল পৃথু! কোথায় লাগল,

কী হল তা বোঝার আগেই প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান ফিকে হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু বাঁ হাতে খাটের বাজু ধরে ঘষে ঘষে পড়ে যেতে যেতেও আরও তিনবার হাত সোজা করে, কনুই থেকে হাত ফ্রিজ করে, হাতের তেলো আর আঙুল স্কুইজ করে ; খোলা, বিস্মিত, বুঁজে-আসা চোখে ক্রমশই থেবড়ে-বসে-যেতে-থাকা মগনলালকে আরও তিনটি গুলি করল।

মগনলালও আরও একটি গুলি করল। কিন্তু সেটি লাগল বিজলীর খাটের মশারির স্ট্যাণ্ডে।

ওর জ্ঞান চলে যাওয়াব পূর্ব-মুহূর্তে পৃথু শুনতে পেল কে যেন, কারা যেন ; দরজা ভাঙছে আর ডাকছে পৃথুদা ' পিবথুবাবু ' হুজৌর।

গোলমাল। চিৎকার। চেঁচামেচি। মহল্লার নানা বাড়ির বাঈজিদের চিকন ভয়ার্ত ডাকাডাকি। জোরে দরজা বন্ধ করাব আওয়াজ। এবং সেই কাকাতুয়াটার বুলি। কুকুরের ভুক ভুক্।

এখন আর মনে হচ্ছে না কিছু। চাবধারে অনেক ঘটনাই ঘটছে। পৃথুর তাতে বিন্দুমাত্রও ভূমিকা নেই। খুব আবাম লাগছে ওর। ঘোব অমাবস্যার মতো। অজ্ঞান হয়ে গিয়েও প্রথমার চাঁদের আলোর মতোই একটু অস্পষ্ট জ্ঞান।

অনেক অনেকদিন পর একটু শান্তি পেল পৃথু।

নিজের সঙ্গে ওর অনেকই ঝগড়া ছিল। প্রত্যেক মানুষেরই আসল সব বিরোধ বোধহয় তার নিজেরই সঙ্গে। চিরদিনেরই জন্যে, নয়তো দীর্ঘদিনের জন্যে ; সেই ঝগড়া সব থেমে গেল। অনেক ঘুমও জমেছিল তার ভিতরে। অনেক ক্লান্তি, হতাশা ; গ্লানি। অনেকই দিন ধরে চলছে সে। জন্মাবার পর থেকে, হাঁটা শেখাব পব থেকে , বড় হবার পব থেকে। চলেছে ত চলেছেই। কাজে, ছুটিতে, জাগরণে, ঘুমে। জন্মালে, ইচ্ছে করুক আর নাইই করুক মৃত্যু অবধি মানুষকে চলতে হয়ই। নিরুপায় সে।

এবার কোনও মস্ত গভীর মহীরূহেব স্নিগ্ধ ছাযায ঘুমোবে লম্বা ঘুম। কোনও কাজ নেই। ওর উপরে কারোই দাবি নেই আব। ওবও দাবি নেই এ সংসারে একটি মানুষেরও উপর। শুধু ঝিরঝিরে হাওয়া, পাখির ডাক, ঝরাপাতার দীর্ঘশ্বাস, কালো মৌনী পাথরের বুকের উপর ব্যর্থ প্রেমের সব অভিমান নিয়ে দৌড়ে গিযে আছড়ে-পড়া রঙ-বেরঙের শুকনো পাতাদের অস্ফুট স্বর, কান্নার মতো ; আকাশের বুকে আব বনের ফ্রেমের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বদলে-যাওয়া তেলরঙ, জলরঙ, টেম্পারা আর ওয়াশের মুগ্ধ-কবা, ক্রমান্বয়ে ফুটে-ওঠা কত কত সব আশ্চর্য ছবি···

জীবনে এইরকম কোনও যতির বোধহয় খুবই প্রয়োজন থাকে। একটানা এই দীর্ঘ পথচলা বড়ই ক্লান্তির, একঘেয়েমির , নিশ্বাস বন্ধ হযে আসতে চায়। বুকের মধ্যে কষ্ট হয় বড।

আঃ কী আরাম ! গরম জল-ভর্তি বাথটাবে বড আরামে পৃথু ঘুমিয়ে পড়ল। মেবী কি আগে বাথ-সল্ট্ ছড়িয়ে দিয়ে গেছিল ? না। না। ও তো কখনও চান করে না বাথ্টাবে। নোংরা হয় বলে রুষা অ্যালাও করে না। ও তো অন্য বাথরুমে ···· ও তো ··· না না কল্পনাতেও চান করার অধিকাব নেই ওর।

এখন কোন্ বাথরুমে শুয়ে আছে ?

আসলে, জল নয় ; রক্ত। রক্ত-জল-কবা এই এতগুলো বছরের জীবনে জলকে রক্ত করে, অজানিতেই ও জল এবং রক্তের সঙ্গে যে আদিম সম্পর্কটি চিরদিনই ছিল ; তাতেই সম্পৃক্ত হল।

ভুচু, বাইগা, ঢাণ্ডু, ইমরান, মহল্লাব আরও অনেক ফুলওয়ালা, দালাল, ডিমসিদ্ধওয়ালা, ইত্বর্‌ওয়ালা, সারেঙ্গিওগালা, তবলচি সবাই ঘর ভরে ফেলেছে। তারা সবাই কুখ্যাত কিন্তু মৃত ডাকু মগনলালকে দেখছে। বিস্ফারিত চোখে দেখছে। উত্তেজনার শেষ নেই।

ঠুঠা তাদের ধমকে বলল, হাওয়া ছাড়ো ; হাওয়া।

জানালাগুলো খুলে দিয়ে খাটে তুলে শোয়াল ও পৃথুকে, যেমন ছেলেবেলায় খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে-পড়া পৃথুকে শোওয়াত।

শুইয়ে কী বা হবে ? এক্ষুনি কারখানার হাসপাতালে নিয়ে চলো। সেখানে ডাক্তার সঙ্গে করে অ্যাম্বুলেন্সে করে যেখানে বলেন সেখানেই নিয়ে যেতে হবে।

ভুচু বলল।
সময় নেই।
ঠুঠা ভুচুর দু' হাত ধরে বলল কাতর গলায়, আমার পিরথু বাঁচবে তো ?
চলো চলো ঠুঠা সময় নষ্ট করার, কথা বলার সময় নেই।
সময় যখন থাকে তখন তা জলের মতোই সস্তা। যখন থাকে না , তখন হঠাৎই বড় দামী হয়ে ওঠে তা। ভুচু রক্তাক্ত, অজ্ঞান পৃথুকে অন্যদের সঙ্গে ধরাধরি করে ওঠাতে ওঠাতে ভাবছিল।



পৃথু কোথায় ? নিজে সে জানে না
জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো এক ফালি জমিতে সে থিতু হয়ে বসেছে। এই ফালিটুকু নো-ম্যানস ল্যাণ্ডেরই মতো। জীবন অথবা মৃত্যুর কারোই অধিকার বর্তায় না এতে। এ শুধু মৃত্যুপথযাত্রীর বিশ্রামেরই জায়গা।
মৃত্যু এসে কালো দস্তানা পরে তার কালো চাবি দিয়ে বন্ধ না করে দিলে মস্তিষ্কর ঘড়ি বোধহয় চলতেই থাকে। কত গান, কত ছবি, কত সমুদ্রের কুয়াশা সবুজ ফ্রেম, পাহাড়ের উপরের সূর্যাস্ত এখন ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। দেখেও যেন দেখতে পাচ্ছে না, ছোঁওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার আর নেই, ভোগের বাসনা নেই, প্রেমের তীব্রতা নেই, বিরহের যাতনা নেই। একেই বোধহয় বলে আনন্দময় আবেশ।
আনন্দম। আনন্দম। আনন্দম।
চার/চার/চার/চার পাঞ্জাবী তালে তিলোক কামোদে ঠুংরী গাইছে যেন কে 'পিয়া পরদেশ মোরা মনহ/ রহে কৌন মোতন কে দ্বার/ না মোরি নৈয়া না রে খাবৈয়া/ কৌন বিঠো উতরোরো পার/ পিয়া পরদেশ মোরা মনহ
কুর্চি কে ?
কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি ?
কেনই বা কাছে এলে আবার দূরে গেলেই বা কেন ? দূরই ভাল। দূরই ভাল ছিল। দূরেই থাকবে তুমি ? কুর্চি ?
রুষা ? তুমি খুশি ত। আমি চলে যাচ্ছি।
কোথায় ?
তা ত আমি নিজেই জানি না। আর ফিরব না গো আমার সুন্দরী বউ। আর জ্বালাব না তোমাকে। অনেককেই কষ্ট দিয়েছি। ক্ষমা করে দিও। নিঃশর্ত ক্ষমা। চাইছি, সকলের কাছেই।
জীবন মানে ত জীবিত থাকার চেষ্টা ? তাইই কি ? টেড হিউজ-এর কবিতা ছিল না একটা ? টেড হিউজেরই ত।
মাথার মধ্যে বৈশাখের ভোরের মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ মাখা মন্থর হাওয়ার মতো,বসন্তবনের মন্থর মৌমাছির মতো,শ্রাবণের রাতের একটানা ঝরঝরানি ব্যস্ততাহীন এক পর্দায়-বাঁধা বৃষ্টির শব্দের মত কবিতার কলিগুলি মস্তিষ্কর কোষে কোষে। প্রথম গ্রীষ্মের উদ্বেল বনের কাঁচপোকার মতো তিরতির করে এখন ডানা নাড়ছে।

একটাই ত জীবন, সবাই বলে। কত কী করার ছিল, সবই বাকি রয়ে গেল যে। কবি হওয়া হলো না। গান গাওয়া হলো না। ছবি আঁকা হলো না। ভালোবাসা হলো না। কতজনকে, নিংড়ে দেওয়া হলো না নিজেকে, পাওয়া হলো না কতজনকে নিঃশেষে ; এরই মধ্যে চলে যেতে হবে ?

ফেরা কি হবে না আর ? হাঁটা হবে না ভোরের জঙ্গলে ? বন-বাংলোর চওড়া বারান্দার আরাম কেদারায় বসে চাঁদের বনে একলা চেয়ে রাত-পাখিদের ডাক আর যাবে না শোনা ?

"ডেথ ওলসো ইজ ট্রাইং টু বী লাইফ,
ডেথ ইজ ইন্ দ্যা স্পার্ম লাইক দ্যা অ্যানসিয়েন্ট ম্যারিনার
উইথ হিজ হরিবল্ টেল,
ডেথ মিউজ ইন দ্যা ব্ল্যাঙ্কেটস্—ইজ ইট আ কিটেন ?
টেড হিউজ। হ্যাঁ টেড হিউজই ত! "মুরটাউন!"

বাঃ! বাঃ! টুসু! কেমন আছিস বাবা ? ভাল আছিস ত ?

মিলি ? পড়াশুনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ? তোদের আমি খুব ভালবাসতাম রে! শুধু দেখাতে পারিনি। আমার মতো অনেকেই হয়ত আছে যারা দেখাতে পারে না নিজেদের। যাদের মন যা বলতে চায়, মুখ ঠিক তার উল্টোটা বলে। তারা, আমারই মতো অভিশপ্ত। এই অভিশাপ থেকে তোরা মুক্তি পাস যেন। এইই প্রার্থনা! বাবা খারাপ বলেই তোরা খারাপ হোস না। সমাজের, এই সভ্য পৃথিবীর, এই নব্য বিজ্ঞানের আশীর্বাদধন্য জীবনের সমস্ত যোগ্যতার প্রার্থনা তোদের জন্য করে যাচ্ছি। যে যেমনভাবে চাস, তোদের মা যেমন তার মতো চেয়েছিল ; তেমন করেই সুখী হোস তোরা। যার যার জীবন তার তার। তোদের অপদার্থ, অজীব্ বাবার পরিচয় যদি তোরা অস্বীকার করে ভারমুক্ত হতে চাস, তবে তাইই হোস। আমি কিছুমাত্র মনে করব না রে। বাবা, মা, বংশ পরিচয় এসব কিছুই নয়। প্রত্যেক মানুষকে, মানুষ হয়ে উঠতে হলে, তার নিজস্ব পরিচয় তৈরী করে নিতে হয়। তার জন্য দাম যা লাগে লাগুক। বিনামূল্যে এ জীবনে কি আর মেলে বল্ ? দাম দিতে ভয় পাস না। নিজের নিজের বিশ্বাসের পাশে পিস্তল হাতে করে দাঁড়াতেও ভয় পাস না। কোনো মানুষকেই নষ্ট করে দিতে পারে না অন্য কেউই, যদি সে নিজে না নষ্ট হয়।

আমি যেমন। তোর মা বলতেন, আমার মধ্যে খারাপ হয়ে যাবার প্রবণতা ছিল।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জীবনী পড়েছিস মিলি ? না পড়লে, পড়িস। "আ ম্যান ক্যান বী ডেস্ট্রয়েড, বাট ক্যানট বী ডিফীটেড।"

হারবি না কখনও। হেরে যাওয়া মানুষ, মানুষই নয়।

কে ? কে আবার কথা কয় মাথার ভিতরে ? পৃথু ঘোষ ? তুমি থামো। তোমার কথা ঢের শুনেছি। থামো তুমি।

কত কীইই ত' ভেবেছিলাম।

এটা করব, সেটা করব, বাড়ি করব পাহাড় চূড়োয় স্বপ্ন এবং সুখের কুটো দিয়ে। পায়ের কাছে বইবে নদী, নারীর মতো, সাধের নারী, বাধ্যতা আর নাব্যতাতে নীল। ভেবেছিলাম, লিখব আমি গানের মতো: গান গাইব যেমন করে লিখি। আঁকব ছবি খুন করে রঙ, রঙের রক্ত ছেনে। মধ্যবুকের সব ব্যথাকে আনব টেনে টেনে।

কিছুই ত হলো না সেই সব/ সেই সব, সেই অশ্রু সেই হাহাকার রব…

"সন্ধ্যে হলে জোনাক জ্বলে বাঁশ পাহাড়ে। হুক্কা-হুয়ায় শেয়াল দোলে নক্শী-কাঁথার মাঠ পেরিয়ে, নগ্ন-নিজন নীল-কুয়াশার উথালচুলের উড়াল-গন্ধ রাতে। আগল-খোলা বোকা-পাগল কাঁপা-গলায় গান গেয়ে যায় স্বপ্নমালা হাতে।"

মা। মাগো! কত্তদিন তোমার হাতের খিচুড়ি খাইনি। কড়াইশুঁটির চপ্। দেখা হবে কি তোমার সঙ্গে ? তুমি কোথায় ? শেষ পুজোতে আমার দেওয়া সেই মুগা-পাড়ের টাঙ্গাইল শাড়িটা পরে আসবে ত ?

কত্তদিন দেখিনি তোমাকে ?



ক্রীসমাস ঈভ-এব পার্টি খুব জমে উঠেছিল হাটচান্দ্রা ক্লাবে। প্রত্যেকেব হাতেই গ্লাস। ছেলে বুড়োব মাথায় লাল-নীল টুপি। হাতে পী-পী বাঁশি। আজ লনে সাকলিং পিগ-এব বাববীকিউ। জবলপুব থেকে ব্যাণ্ড এসেছে। বম্বে থেকে ক্যাবাবে-গার্ল। বড়দিন বলে ব্যাপাব।

যদিও মেম্বাবদেব একজনও ক্রীশ্চান নন।

মিঃ গাঙ্গুলী, মিঃ সেনকে বাবান্দাব কোণে ডেকে নিয়ে বললেন, বিয়্যালী,অ্যাম মিসিং রুথা ভেবী মাচ।

হু ইজ নট?

মিঃ গাঙ্গুলী এবং মিঃ সেন মদ খেলে বাংলা বিশেষ বলেন না। আব ওঁদেব দুজনেব বাড়িব ফক্স টেবিযাব আব ড্যাশহাউণ্ডেব সঙ্গে কখনই বলেন না। কুকুবগুলো নিশ্চযই কনভেন্ট স্কুলে পড়াশোনা কবেছিল। নইলে,ইংবিজী এত ভাল জানে কী কবে কুকুবগুলো পৃথুদেব কোম্পানীব ইংলিশ ডিরেক্টাবদেব সঙ্গেও বিনা অসুবিধায কথা বলতে পাবে

মিঃ সেন বললেন। গ্লাসে একটি সিপ দিযে। ওযাট আ গার্ল।

পুওব গার্ল। জবলপুবেই কি থাকবে কিছুদিন এখন?

বেশিদিন ত থাকতে পাববে না। ছেলেমেযেব স্কুল আছে না?

জবলপুবে, উঠেছে কোথায?

শাহ ওযালেসেব গেস্ট হাউস আছে। উধাম সিং-এব বন্ধু ঘটক সাহেব। ওকে কলকাতায টেলেক্স পাঠিযেছিলেন।

কোন ঘটক?

মিস্টাব আব এন ঘটক।

ওঃ। একবাব মীট কবেছিলাম দিল্লীতে, ওবেবয ইন্টাবকন্টিনেন্টালে। নাইস গাই।

পৃথু কি বাঁচবে?

কি কবে বলব বলুন? তবে, ইদুবকাবেব কাছে শুনলাম, ডান পাটা হাঁটুব উপব থেকে অ্যাম্পুট কবে দিতে হযেছে। মানে, থাইযেব অর্ধেকটা আছে।

ও মাই গড! সত্যি! পুওব চ্যাপ! জঙ্গলে পাহাড়ে হেঁটে বেড়াতে এত ভালবাসত। কী কববে এখন? তবে, একেবাবে হীবো বনে গেল। কী বলুন? প্রত্যেক কাগজেব প্রথম পাতায ছবি। আই জি, হোম মিনিস্টাব সব হাসপাতালে গেছিলেন। চিফ মিনিস্টাব কনগ্র্যাচুলেট কবেছেন। আমাদেব নন-এনটিটি পৃথু ঘোষ যে একেবাবে ভি-ভি-আই-পি হযে গেল। একটা জংলী লোক।

জংলীই ত মানুষ সে। এদিকে ইদুবকাব যে ভাবে অ্যাডভান্স কবছে তাতে হাসপাতাল থেকে ফিবে এসে দেখবে হযত পা ত গেছেই, বউও গেছে।

আই ডোন্ট থিংক সো। রুথা উডনট বী দ্যাট ক্রুযেল। ববং এই ব্যাপাবটা যদি না ঘটত, তবে কি হত তা বলা যায না।

তুমি মেযেদেব চেনো না।

মিঃ সেন বললেন। কজন মেযেকে জানো তুমি গাঙ্গুলী। জানলে, এ কথা বলতে না।

তা ঠিক। বেশি দেখিনি।

তবে ঘোষ-এরও দোষ আছে। ওদের কম্পানীরই একটা কাজের ব্যাপারে কাল গেছিলাম মিঃ সিং-এর অফিসে। যা শুনছি, তাতে ত ঘোষের চাকরিই থাকবে না। ওর এই বোহেমিয়ানিজম্-এ বিলেতের বোর্ড বহুদিন থেকেই রেগে ছিল। এখন এই সব ডাকাত-ফাকাত, প্রস্টিট্যুটের ঘরে গিয়ে গুলি-খাওয়ার ঘটনা-টটনা জানতে পেরে তাঁরা নাকি ফোন করেছিলেন। চেয়ারম্যান বলেছেন যে, এরকম লোককে হাই-পজিশানে রাখলে কোম্পানীর রেসপেক্টেবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে নাকি রেসিগনেশান দিতে বলা হবে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি সব দিয়ে ভাল হয়ে উঠলেই বিদায় করে দেবে।

ও যদি না দেয়?

না দিলে স্যাক্ করবে।

পৃথু ইজ আ ওয়েস্টার। ভদ্র ও সভ্য সমাজে বাস করার কোনো যোগ্যতাই নেই ওর।

তা ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, কত টাকাই বা পাবে পৃথু হাতে? ওর বয়স ত বেশি নয়। বেশি ত জমেনি।

কতই আর পাবে! আর যাইই পাক। স্যালারিড অর প্রফেশনাল মানুষদের ক্যাপিটালের রিটার্নই বা কি হবে? হয় ফিক্সড-ডিপোজিট নয় ইউনিট ট্রাস্ট। ট্যাক্স-ফ্যাক্স কেটে সংসারই চলবে না। গাড়িও ত কোম্পানীরই। মেয়েটা এবং ছেলেটাও ছোট।

যাইই বল, পৃথুর দোষও ছিল অনেক। যা তা মানুষদের সঙ্গে মিশত। কাউকেই কেয়ার করত না। আমাদের ত মানুষ বলেই গণ্য করত না। ও নিজে যে সমাজের মানুষ, সেই সমাজ সম্পর্কেই ওর এক দারুণ ঘেন্না ছিল। সকলের সম্বন্ধেই, সব কিছুর সম্বন্ধেই একটা হাই-ব্রাওড্ ক্যুডনট্, কেয়ারলেস অ্যাটিচুড। এটা কেউই পছন্দ করত না। সকলেরই রাগ ছিল ওর উপর।

থাকাই স্বাভাবিক। কাবণ, পৃথু ডিডনট্ বিলঙ্ টু দ্যা রান্ অফ দ্যা মিলস। স্বীকার আমরা কবি আর নাইই করি, হী ওজ্ এ্যান একসেপশন। এন ওরিজিনাল ইন দিস এজ অফ ইমিটেশান।

ভীষণ কমপ্লিকেটেড, আনপ্রেডিক্টেবল ক্যারাকটার। যাইই বল তুমি! যে সমাজকে ও ডোণ্ট-কেয়ার করত সেই সমাজই এখন ওকে বর্জন করবে। সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে? অত ঔদ্ধত্য কাবোবই থাকা ভাল না। ভীষণই আন-সোশ্যাল ছিল ও।

আন-সোশ্যাল কী, বলা উচিত অ্যান্টি-সোশ্যাল।

দুজনেই হেসে উঠলেন এই কথাতে।

সেদিন ওদেব কোম্পানীর ম্যাটেবিয়াল ম্যানেজার শর্মা বলছিল, পৃথু ঘোষ হচ্ছে এই যুগেব ডন-কুইকসো। যেখানে-সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে তরোয়াল বের কবে যুদ্ধ করতে লেগে যেত। এমন কি উইগুমিলের সঙ্গেও। আ মেণ্টাল কেস্।

কথাটা প্রায় সত্যি কিন্তু শর্মা? শর্মা ডন-কুইকসোর কথা জানলো. কি করে? ও ত গণ্ডমূর্খ। এবং চামচেগিরি কবা আব ঘুষ-খাওয়া ছাড়া অন্য কিছুই ত জানে না ও।

শুনেছে হয়ত কাবো কাছে। যে যা নয়, তাইই হতে সাধ ত সকলেরই যায়।

বেয়ারা! হুইস্কী লাও!



ঠুঠা বাইগা জবলপুরের মিলিটারী হাসপাতালের বারান্দার থামে হেলান দিয়ে বসেছিল। রাত হয়ে গেছে। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ। গিরিশবাবু, সাবীর মিঞা, শামীম মিঞা, ভুচুবাবু, হুদা এরা সকলেই জবলপুরে এসেছেন। সাউথ সিভিল লাইনস্-এ পাচপেডিতে গিরিশদার এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছেন গিরিশদা ঠুঠাকে নিয়ে। সাবীর মিঞা, ভুচু, ও হুদা উঠেছে একটি সস্তার হোটেলে। স্টেশানের কাছাকাছি। রুষা ও ছেলেমেয়েরা উঠেছে শাহ্-ওয়ালেসের গেস্টহাউসে।

ঠুঠা শুনেছে যে আজ সকালেই পৃথুর পাটা হাঁটুর অনেকখানি উপর থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। পেটে যে গুলিটা লেগেছিল সেটা মারাত্মক হয়নি। ডানদিকের পেট আর বুকের মাঝের মাংস ছুঁয়েই চলে গেছে। শিরা, মাংসর সুতো এসব ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে। ডাক্তাররা বলছেন, বেঁচে উঠবে পৃথু। ইনিশিয়াল শকএই মৃত্যু যখন হয়নি। তবে কম করে তিন চার মাস ত হাসপাতালে থাকতে হবেই।

এখনও জ্ঞান ফেরেনি পৃথুর। পাটা কেটে বাদ দেওয়ার পর।

গিরিশদা গাড়িতে বসে ছিলেন। পিছনের দরজা খুলে নেমে এসে ঠুঠাকে বললেন, চলো, আমরা যাই ঠুঠা। মিলিটারী হাসপাতাল। এখানের আইন কানুন খুব কড়া। আর বসে থেকে করবেটাই বা কি? বল? আমাদের করার ত কিছুই নেই।

উঁ?

ঠুঠা বলল।

তারপর বলল, কোথায় যাব?

আমার সঙ্গে। আমরা যেখানে উঠেছি, সেখানে যাব।

ঠুঠা উঠল। এতক্ষণ থামে হেলান দিয়ে বসেছিল বলে বুঝতে পারেনি। দাঁড়াতেই বুঝতে পাবল যে, ওর দু পায়ে কোনো জোরই নেই।

রক্ত দিয়েছিল ওরা প্রত্যেকেই শুধু ঠুঠাই দিতে পারেনি। ওর রক্তের সঙ্গে নাকি পৃথুর রক্তের মিল নেই। কী যে বলে এই ডাক্তারগুলো। যে, পৃথুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করল, যার সঙ্গে শিশুকাল থেকে পৃথু সবচেয়েই বেশি পরিচিত, তার সঙ্গেই নাকি রক্তের মিল নেই! বোঝেনা এ সব ব্যাপার স্যাপার। পৃথুর জন্যে ওর শরীরের সব রক্তই দিয়ে দিতে পারত ঠুঠা বাইগা অথচ এক ফোঁটা রক্তও লাগলো না কাজে। ভুচু, গিরিশদা, সাবীর মিঞা, শামীম ওরা সবতো দু দিনের চিড়িয়া। কতদিন হল চেনে এরা পৃথুকে?

চলো।

বলে গিরিশদা হাত ধরে নিয়ে চললেন ঠুঠাকে। প্রবল প্রতাপান্বিত একটি কালো ধুম্সো ভাবী প্যান্থারের মত চিরযুবক ঠুঠার এই প্রথম মনে হল যে, তারও বয়স হয়েছে। ঠুঠা এই সন্ধ্যেবেলাতেই প্রথমবার বুঝতে পারল যে, মানুষের শরীর বুড়ো হলেই মানুষ বুড়ো হয় না। বুড়ো হয়ে যায় মনের জোর কমে গেলে। পৃথুর জীবনের ভয়টা এখন যখন কেটে গেছে তখন ঠুঠা এবারে জঙ্গলেই চলে যাবে। এবার বাকি জীবন তার গ্রামের খোঁজ করবে অনেক দূরের অচিন অচেনা-গন্ধ আকাশে ডাল-পালা-ছড়িয়ে দেওয়া একটি কালো গাছ ফিরে যাবে এবারে তার নরম, চিরচেনা-গন্ধর কোমল নিভৃত সুগন্ধি মাটিতে। যেখানে ওর জন্ম। যেখানে ওর মৃত্যু নিহিত আছে।

ভুচু হোটেলের ঘরে সাবীর মিঞা আর শামীম মিঞার সঙ্গে বসেছিল। হুদাও ছিল। সিগারেট ধরিয়ে রাম-এর বোতল খুলে বসেছিল। হুদাকেও দিয়েছিল একটু গ্লাসে ঢেলে। যা গেছে, সকলের

উপর দিয়ে।

হুদা, ভুচুর সামনে না খেয়ে, বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসেছিল। দু রাত ঘুম হয়নি। চোখ জ্বালা করছে। এবারে ক্রীস্‌মাস ঈভটা ভালই কাটল। মনে থাকবে সারা জীবন।

সারা দিন রিপোর্টাররা জ্বালিয়েছে। খবরের কাগজের পাহাড় টেব্‌লের উপর। ভারতবর্ষের সব জায়গার কাগজে এই খবর বেরিয়েছে। পৃথুর ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। ভুচু, শামীম, ঠুঠা এবং মৌলভীর নামও বেরিয়েছে। খবরের কাগজেরই উপর দুটি কনুই রেখে হাতের তেলোর উপর মুখ রেখে বসেছিল ভুচু।

ভুচু কিন্তু একটুও খুশি হয়নি পৃথুদার প্রাণটা বেঁচে গেল বলে! একে কি বাঁচা বলে! পৃথুদার মতো একটা মানুষ, যে মানুষ এক ঝটকায় জীপে উঠত, এক ঝট্‌কায় নামত, রাইফেল বা বন্দুক হাতে নিলে এখনও এক ঝলকে কোমর ঘুরিয়ে এমন ফ্লাইং মারতে পারত, স্কীট এবং ট্র্যাপের বড় বড় মাস্তানরা পর্যন্ত হাঁ করে থাকত দেখে। একবার ওলিম্পিক-এর ট্রায়ালে ডেকেছিল পৃথুকে দিল্লি থেকে। সফদারজাং এয়ার পোর্টের রেঞ্জ প্রাক্‌টিস হত। সেখানেই পৃথুদার সঙ্গে গিয়ে আলাপ হয়েছিল ভুচুর মতো ফাল্‌তু একজন ছেলেরও বিকানীরের মহারাজা কার্নি সিং এর সঙ্গে। সব সময় হালকা সোনাব ফ্রেমের সান গ্লাস পরে থাকতেন। ফর্সা, মোটা-সোটা মানুষটি। হাসিখুশি কোটার মহারাজার সঙ্গেও। জনপথ হোটেলের কাছেই বাড়ি ছিল ওঁর। বিরাট এয়ারকণ্ডিশণ্ড গীয়ার-ছাড়া গাড়ি করে দুদিন লিফ্‌ট দিয়েছিলেন পৃথুকে উনি। পৃথুব সঙ্গে ছিল হাওড়ার দাশনগরেব আলামোহন দাশ-এব বড় ছেলে প্রভাত দাশ। তার দু ভাই রবি আর চাঁদু। আব আসানসোলেব কলিয়ারির মালিক প্রণব রায়। আরও কত সব নামী নামী মানুষ। পৃথুদা সকলেবই ভালবাসার এবং সম্মানের ছিল। অথচ মানুষটা এমনই চরিত্রর যে মান-সম্মান পিঠ-চাপড়ানি এই সবই হাঁসের গায়ে জল পডলে যেমন তা সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে যায় তেমনিই গড়িয়ে পড়ে যেত। ফিরে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখেনি তা কোনোদিনও, কুড়িয়ে নিতে যাওয়ার কথা ছেড়েই দিল। ভুচু জানে যে, তার পৃথুদা ঠিক কোন্‌-চরিত্রর মানুষ। কোন্ জাতের মানুষ। পৃথুদার দাম খুব কম মানুষই দিয়েছে। এই দেশে, এই সংসারে মানুষকে মানুষের দাম দেয় কম লোকই। টাকা পয়সা, ডিগ্রী, ক্ষমতা এইই সব। অথচ এ সবকিছুই যার হাতেব মুঠোয় ছিল, সেই মানুষটার সেই সবের কিছুব প্রতিই বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। যখন ভোগ করত তখন প্রচণ্ড ভোগী, যখন ত্যাগ করত তখন মহাত্যাগী।

দিগা পাঁড়ে একদিন ভুচুকে বলেছিল একা পেয়ে যে, তোমাদের মধ্যে একমাত্র পির্‌থুবাবুব মধ্যেই মহাপুরুষের সব লক্ষণ আছে। পিবথুবাবু হচ্ছে গিযে ছুপা সাধক। আমরা যাবা এই সব নিয়েই থাকি, আমরাও আত্মাব উদারত্বর ব্যাপারে তার কাছে কিছুমাত্রই নই। পিরথুবাবুর হৃদয়টা হচ্ছে পানুয়াম্না টাঁড়েব মতো। চার দিক গিয়ে মিলেছে দিগন্তে। মধ্যে একটিও কাঁটা ঝোপ নেই। সবটাই সবুজ চিকন ঘাসে ভবা।

শামীম মিঞা দবজা দিযে বাইবে চেযে ট্রাক আর সাইকেল রিক্‌শার যাওয়া আসার আওয়াজে ডুবে ছিল। রাম-এর গ্লাসে চুমুক দিযে হঠাৎ বলল, তখন পর্যন্ত বলাব সুযোগ পাইনি ভুচু কাউকেই, নুরজেহান কথা বলছে। জানো?

কি বললে?

চমকিত ভুচু এবং ইজিচেযাবে আধোশোয়া সাবীর মিঞা হঠাৎই উঠে পড়ে সমস্বরে বললেন।

হ্যাঁ। বলাব সময় আর পেলাম কই? পিরথু দাদাকে নিয়ে এতক্ষণ যা গেল। সেদিন যেই না হুদা এসে রাত দুটোতে খবর দিল যে ডাকু মগনলাল খতম হয়েছে। পিরথুদাদাই খতম করেছে তাকে। অথচ পিরথুদাদাই বোধহয় বাঁচবে না তক্ষুনি নুরজেহানকে ধরে তার আম্মাজানকে অন্দরমেহাল থেকে নিয়ে এল। আমি আর হুদা একই সঙ্গে কথাটা বললাম নুরজেহানকে। নুরজেহান ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলল। তারপরই ওর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। বলল কি জানো?

কি?

ভুচু শুধোল।

বলল, পিরথু চাচাকো...খুদাহতাল্লাকি সব দোয়া...বলেই আবার কেঁদে উঠল। তারপর ঘরে গেল পিরথুদাদার জন্যে নেমাজ পড়তে।

বাঃ বাঃ। এবার নুরজেহানের একটা শাদী দাও শামীম ভাই।

ব্যাপারটা মসজিদের মহল্লার অনেকেই জেনে গেছে। কাফির, ডাকু মগনলাল আমার মেয়ের ইজ্জৎ নিয়েছে। ওকে কোনো সাচ্চা মুসলমান বিয়ে করবে না।

ভারী গলায় কথা কটি বলেই শামীম গম্ভীর হয়ে গেল।

ভুচু বলল, করবে। আমাদের হুদা অনেকদিনই হল নুরজেহানেব প্রেমে পড়ে আছে। দয়ায় নয়, ভালোবাসায়ই ও বিয়ে করবে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো।

ও-ওত মুসলমান। ওরও ত ধর্ম আছে। ধর্ম মানা ত সকলেরই উচিত। শামীম বলল।

দ্যাখো শামীম। তোমাদের এই সব গোঁড়ামিই কাল হল। জাত, আসলে দুটোই আছে পৃথিবীতে। ভাল আর মন্দ। ভালর দলে যারা পড়ে তাদের চেয়ে বড আর কোনো ধর্মই নেই। হুদা ঠিকই বিয়ে করবে নুরজেহানকে আমি জানি।

কী জানো তুমি?

শামীম অবিশ্বাসের গলায বলল।

বলল, দেখো ভুচু ভাই। বদ্‌নসীবী-আদ্‌মীকো লেকব মজাক্ মত্ উড়ানা। ইয়ে ঠিক নেহী হ্যায়।

ক্যা ঠিক নেহী হ্যায়? অন্ধা কাঁহাকা!

চটে উঠল ভুচু।

এই দু'রাত আর দু'দিন যা গেছে সকলেব উপর দিয়ে, মেজাজ কারোই ঠিক নেই।

গলা তুলে ডাকল ভুচু, হুদা!

সাড়া নেই। বাইরে যা আওয়াজ! বাইরে বসে থাকলে, ভিতরের ডাক শোনা যায় না। জীবনেরই মতো। ভাবল ভুচু। জীবনেও বেশি মানুষই এমনি বাইরের বারন্দায় বসে কোলাহলের মধ্যেই কাটিয়ে দেয় সময়টুকু, ভিতরের ডাক তাইই আর শোনা হয়ে ওঠে না।

বেল বাজাল ভুচু এবার।

বেয়ারা এল। বলল, বরফ্ মাঙ্গাথা, হুয়া কেয়া? ঔর কিত্‌না টাইম লাগেগা জারা বরফ লানেমে।

লায়া হুজৌর।

ঔর শুনো, বাহারমে হামলোগোঁকো সাথ্‌থী বৈঠা হুয়া হ্যায়। উন্‌কো সালাম দেনা।

জী!

হুদা একটু পরে এল। চোখ লাল। ওরও চোখের পাতা মেলবার সুযোগ হয়নি গত বাহান্ন ঘণ্টা। হাতে রাম-এর গ্লাস।

ভুচু বলল, বোসো। গ্লাসটা দাও। বলে, রাম্ ঢেলে দিল আর একটু গ্লাসে, তারপর বলল, রাতে আজ কি খাওয়া যায় হুদা? একে আমাদের বড়দিন তায় পৃথুদাকে জানে বাঁচিয়ে তোলা গেল।

হুদা বলল, বাইরে গিয়ে খাব? জবলপুর শহরে খুব ভাল মটন বিরিয়ানি আর মোরগার চাঁব কোথায় করে তা আমি জানি।

ছোড়ো, বিরিয়ানীই খেতে হলে ভোপালের মদিনাতে। সাবীর সাহেব বললেন।

মদিনা কোন্ মহল্লাতে? সাবীর সাহেব?

ইব্রাহিমপুরাতে। ভাল খনা পাওয়া যায় আর এক জায়গাতেও যদিও একটু নোংরা ভীড়-ভাট্টার মধ্যে বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে 'পাকিজা' হোটেলে। লাল-কালো-সাদা খুসবুভরা চালের বিরিয়ানী, মধ্যে মধ্যে গোস্ত-এর টুকরো। অথবা পরোটা ও কালিজা। সঙ্গে বুরানি। ঘি-এর মধ্যে কালোজিরে সম্‌বার দিয়ে দইয়ের মধ্যে ঢেলে দেয়। আহাঃ। মধ্যে আবার আস্ত্ আস্ত পুদিনা পাতা। পাকিজা মালিকের নাম 'মোবিন্'। সকলে বলে, মোবিন, পেহলোয়ান। একটা স্কুটারের ফেলে-দেওয়া

টায়ারের উপর দইয়ের এক বিরাট হাঁড়ি বসিয়ে মোবিন্ পেহ্লোয়ান বসে থাকে। চেহারাখানা পেহলোয়ানেরই মত।

ভুচু বলল, তাহলে কি নুরজেহানের শাদীর সময় আমরা ভোপালের পাকিজা থেকেই বাওয়ার্চি আনানোর বন্দোবস্ত করব শামীম ভাই?

নুরজেহানের শাদীর কথাতেই হুদার মুখ কালো হয়ে এল।

ও বলল, আমি বাইরে গিয়ে বসি দাদা।

একটু দাঁড়াও হুদা। তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। এ বছরই নুরজেহানের বিয়ে দিতে চান শামীম ভাই।

শামীম অবাক হয়ে ভুচুর চোখের দিকে তাকিয়েছিল।

সাবীর মিঞা হুদার চোখের দিকে। দুষ্টুমির চোখে।

বললেন, সাবীর মিঞা বেঁচে থাকতে হাটচান্দ্রাতে ভোপালের 'পাকিজা' হোটেল থেকে বাবুর্চি আনতে হবে?

ভুচু বলল, হুদা, বিয়ের সবই ঠিকঠাক। একটাই মাত্র গোলমাল হচ্ছে।

কি? দাদা?

মুখ মাটির দিকে নামিয়ে হুদা বলল।

পাত্রই ঠিক করে উঠতে পারছেন না শামীম সাহেব। মানে, পছন্দ করে উঠতে পারছেন না। পাত্র, ভাল ভাল পাত্র অনেকই আছে যদিও।

আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি দাদা?

তুমি যা করতে পারো তা হচ্ছে ঐ পাত্রদের মধ্যে একজন হতে পারো। তোমার যদি ওই বিয়েতে মত থাকে তাহলে তোমার হয়ে নুরজেহানের বাবার কাছে উমেদারীটা আমিই করব। আর অন্য কোনো পাত্র যেন ধারে কাছে না আসে, তা আমি দেখব।

হুদার কালো, কিন্তু মিষ্টি মুখটা লজ্জা আর খুশিতে বেগনে হয়ে গেল।

মুখ নামিয়েই বলল, আমি যা রোজগার করি তাতে এক্ষুনি বিয়ে করা কি ঠিক হবে দাদা? নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে।

সেটা তোমারই ব্যাপার। এমন সুন্দরী পাত্রী, বেহেস্তের হুরীর মতো মেয়ে তোমার মতো মোটর-মেকানিক পাত্রর জন্যে বসে থাকবে না। আমরা যে লাইনের লোক, লোকে কি আমাদের মানুষ বলে মানতে চায় নাকি? মানুষই নই যেন আমরা, যেন শক্-অ্যাবজর্বার।

তাহলে.

বলেই, হুদা ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

ভুচু ও সাবীর মিঞা ওর হাবে-ভাবে হেসে উঠল ও উঠলেন। শামীম শুধু উপরে দু হাত তুলে খুদাহ্‌র কাছে কি দোয়া মাঙ্গলো তা সেইই জানে।

ভুচু বলল, শোনো শামীম ভাই, নিজে তো সারা জীবন হীরো-গিরি করলে। এমন দামাদ তোমাকে বেছে দিলাম যে, তোমার বুড়ো বয়সের জিম্মাদারী সেইই নেবে। তবে একটাই অনুরোধ দামাদের সঙ্গে কম্পিটিশান্ দিয়ে নিজেও ছেলেমেয়ে প্যায়দা কোরো না। এবার একটা অপারেশান-টপারেশান করিয়ে ইজ্জৎ বাঁচাও।

শামীম হেসে ফেলল। সাবীর মিঞাও।

এর আগেও একদিন বলেছিলাম সাবীর সাহেবকে। তোমরা যে-রেটে বাড়ছ তাতে ত এখানেই আবার পাকিস্তান বানিয়ে আমাদের দোবারা করে রিফুজী করে ছেড়ে দেবে। মতলব তোমাদের মোটেই ভাল নয় শামীম ভাই।

শামীম বলল, ব্যস্‌স্, করো। আভ্‌ভি। হুদা না শুন্ লে। ক্যায়া করতা হ্যায় তু ইয়ার? ভুচু বলল, হুদা শুন্‌নেসে ক্যা, ম্যায় ত চাহতা কি খুদাহ ভি শুন্ লিজিয়েগা।

তারপর, ভুচু বলল, হুদার মতো ছেলে হয় না। ওকে পরে আমি আমার পার্টনার করে নেব।

গাড়ির মেকানিকের অবস্থা দিনে দিনে ভাল হতেই চলবে। গাড়ি কত বেড়ে যাচ্ছে প্রতি বছর, দেখছ না ? পানওয়ালা মোমফুলি-ওয়ালাবাও গাড়ি কিনছে। হুদার মতো ছেলে হয় না। স্বভাব চরিত্র, এতলাক্ তমদ্দুন সব একেবারে রহিস্ খানদানেরই মতো। নুরজেহানের মতো মেয়েও হয় না। সত্যিই বেহেস্ত-এর হুবী-পরী। বাজে কেবল তাব বাপ্‌টা। ব্যাটা বেকাম্‌কা আদমী। জিন্দ্‌গীমে ব্রিফ একই কাম কিয়া—লড়কা-লড়কী প্যয়দা করনা। ঔর চোরী করকে শিকাব খেলনা। দেখো, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, এখন আবার প্রেম-টেম কোবো না নতুন করে।

তু বড়া ফাল্‌তু বকবকাতা হ্যায়।

বলে হাসল শামীম। মেয়েব বিয়েব সম্ভাবনাতে উজ্জ্বল হয়ে।

ভুচু সীবিয়াস্‌লী বলল, এবাব বিয়েব তাবিখ ঠিক কবে ফেলো শামীম ভাই, হাটচান্দ্রাতে ফিরেই।

একটু হাসি, ঠাট্টা এবং অন্য আলোচনাতে এই দুদিনের অসহ্য টেনসান, চিন্তা-ভাবনা সবই কেটে যেতে লাগল।

সাবীর সাহেব বললেন, আজ জল্‌দি শো যাও সব। সুবেব উঠ্‌কর পিরথুবাবুসে মিলকে চল্ না হোগা ওয়াপস্ ?

হাঁ। ঔর আধা ঘণ্টেমে খা-পীকে শো যাযগা সব। খনাকে লিয়ে কহাঁ যাইয়েগা সাবীর সব ?

আর্‌রে ছোড়ো ইয়ার। সবে থকাহুয়া হ্যায। হিঁয়াই খানা খাকে আজ জলদি শো যাও।

হুদা।

বলে, ডাকল শামীম। খাবাব অর্ডার ওইই দিক।

হুদা যথারীতি শুনতে পেলে না বাইরে বসে।

ভুচুর আবারও মনে হল, বাইবে বসে থাকলে ভিতরের ডাক শোনা যায় না। জীবনেরই মতো। প্রায় সব মানুষই জীবনেব বাইরেব বাবান্দায় বসে এমনই কোলাহলের মধ্যেই কাটিয়ে দেয় দামী সময়টুকু, ভিতরের ডাক তাইই পৌঁছয় না তাদেব কানে। ভুচু নিজেও এই রকমই। চেনা জানা প্রায় সকলেই। শুধু পৃথুদাই অন্য বকম।

একমাত্র পৃথুদাই।

পামেলাকে একটা ফোন বুক কবেছে। কখন যে পাওয়া যাবে লাইন ? ক্রীসমাসে ওকে একবাব উইশ্ না করলে কি ভাববে বেচাবী। লাইন পেলেও, ওকে পাবে কী না সন্দেহ। চার্চ-এর ফোন ত! কোয়ার্টারে ত আর কোন ফোন নেই।



কোথায় যেন ভোর হচ্ছে।

কোথায় ? নর্মদার পারে, টিকেরিয়ায় ? সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর সুগন্ধি স্তনসন্ধির মধ্যে ? কোনো ভোঁর ঘাসের শিশিরভেজা মাঠে কি ?

কে, জানে, কোথায় ভোর হচ্ছে !

জানে না পৃথু-উ।

বড় যন্ত্রণা ! অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা, বড়ই যন্ত্রণার। জ্ঞানহীনতা থেকে জ্ঞানে ফেরা ;

কৃত্রিম সুস্থতা থেকে সত্য অসুস্থতায় ফেরাও বড় কষ্টের।

একদল সাইবেরিয়ান্ রাজহাঁস কৌয়াক্ কৌয়াক্ কৌয়াক্ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে আসছে নর্মদার চরে। পৃথুর বাবা পাশে বসে আছেন। গায়ে একটা অলিভ-গ্রীন্ ফুল-হাতা সোয়েটার। পাইপ খাচ্ছেন। বন্দুকটা কোলের উপর পাথালি করে শোয়ানো। ইংলিশ ইলী-কীনক্ কার্টিজের পোড়া বারুদের গন্ধে নাক ভরে রয়েছে। তার সঙ্গে শীতের সকালের নদীর গন্ধ, বালির গন্ধ, ওপারের ছোলা আর সবুজাভ মটবছিম্মি ক্ষেতেব গন্ধ সব মিলেমিশে গেছে। বাবা হাসছেন। বলছেন, এবার তোর টার্ন পৃথু। ফায়াব বোথ্ দ্যা ব্যারেলস্।

আঁ-আ-আ-আ্…

বড় কষ্ট!

পবিযাযী সাইবেরিয়ান রাজহাঁসদের মতোই অনেক হাজার মাইল দ্রুত পেরিয়ে জ্ঞানে ফিরে আসছে পৃথু। কৌযাক্! কৌয়াক্! কৌঁয়াক্…

কুর্চি-ই-ই-ই-ই-ই

মিঃ ঘোষ। মিঃ ঘোষ।

কে যেন ডাকছে পৃথুকে।

সিস্টাব ডাকছেন।

সিস্টার জন্‌সন্। ফর্সা, অ্যাংলো-ইণ্ডিযান। কালো কুচকুচে চুলের ঢল নেমেছে দু কানের পাশে। টিকোলো নাকটি। দুটি দিঘল চোখ। চশ্‌মা-পরা।

সিস্টার বললেন, মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। মিঃ ঘোষ হু ইজ কুর্চি?

মিসেস ঘোষের নাম কি কুর্চি?

কুর্চি-ই-ই-ই-ই-ই…

মুখ বিকৃত করল পৃথু। তার অন্তরের, তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে, তার নাভিমূল থেকে উৎসারিত হল কুর্চির নামটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অজানিতে। সত্য যা, তা এমনি অমোঘভাবেই হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ-হারানো পৃথু আবারও বলল, কুর্চি।

মিঃ ঘোষ। হাউ ডু য়্যু ফীল?

হোয়াট্? হু আর য়্যু?

হাউ ডু য়্যু ফীল?

উঃ…। কুর্চি…ই…ই…ই…ই…

অ্যানাস্থেসিয়ার ঘোর কেটে যাচ্ছে। কুয়াশা কাটছে নদীর উপর। ছাইরঙা, মাছ-মাছ জলজ-গন্ধ-ভরা রাজহাঁসের ঝাঁক উড়ে আসছে বহু দূর থেকে। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে। শীত থেকে; উষ্ণতাতে। মৃত্যু থেকে, জীবনে।

আমার কী হয়েছে? মগনলাল কোথায়? ডাকু মগনলাল?

সে মবে গেছে। আপনিই ত মেরেছেন তাকে।

সিস্টার লাওয়াণ্ডে বললেন পৃথুকে।

সত্যি? আঃ। অ্যাট লাস্ট। মাথার মধ্যে বিজ্‌লীর মুখটিও ভেসে উঠল এক ঝলক্। না বলে বলল, আমি না, আমি না, আমি কাউকে মারিনি, চাই না মারতে। যে মেরেছে সে অন্য লোক। অন্য পৃথু।

ইয়েস্ মিঃ ঘোষ। ভারতবর্ষের সব খবরের কাগজে তোমার ছবি বেরিয়েছে। য়্যু আর আ হীরো। হীরো অফ দ্য নেশান্'।

হীরো?

পৃথু বলল।

ইয়েস্। য়্যু সার্টেন্‌লি আর।

হীরো! মাই ফুট্! আই ওয়ান্টেড টু বি আ পোয়েট্। অ্যান আর্টিস্ট্। আ সিঙ্গার। আ

নভেলিস্ট্। ডাকাত-মারা হীরো! আই ডেস্পাইস্ মাইসেলফ্। আই উড লাইক টু কিক্ মাইসেলফ।

বলতেই, পৃথুর ডান পায়ে একটি উত্তেজনা জাগল। বিছানাতে শুয়েই। পরক্ষণেই যন্ত্রণাতে কঁকিয়ে উঠল ও—উঃ...উ.. উ...।

বী কোয়ায়েট মিঃ ঘোষ। প্লীজ বী কাম।

কী হয়েছে আমার? আমার পায়ে? ডান পায়ে?

মিঃ ঘোষ। লিস্সিন্ মিঃ ঘোষ... তোমাকে বাঁচাবার জন্যে তোমার ডান পাটি আমাদেব কেটে ফেলতে হয়েছে।

পৃথু দু'চোখ খুলে আরেকবাব চাইল মিস জন্সনের চোখে। পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিল। মাথা ঘুরে উঠল। সিস্টারের দশানন দেখল।

কলেজের ছেলেরা হইচই করছে। জলপ্রপাতের মতো সেই শব্দে পৃথুর দু'কান ভরে রয়েছে। কাম্ অন্ পৃথু। বিষেণ সিং পাস দিয়েছে। লং পাস। সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলত ও। পৃথু রাইট্ উইঙ্গাব। ডান পা দিযে খুব জোবে-আসা বলটাকে স্টপ করল পৃথু। পাথরের মতো বলটা শক্ত হয়ে পৃথুর ডান পায়ের পাতার নিচে আর ঘাসের উপরে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপব বুটপরা ডান পায়ের পাতা দিয়ে বলটাতে প্রাণস্পর্শ করে সজীব, সচল কবল আবার ও। কবেই, চুনী গোস্বামীর মতো ড্রিবল্ করে এঁকেবেঁকে ঝড়েব মতো এগিয়ে গিয়েই শট্ করল গোলে। অ্যাঙ্গুলার শট।

গ্যালারি থেকে শোর উঠল গো-ও-ও-ওল্।

ফুলশয্যার রাতে, রুষা, নগ্ন পৃথুকে নরম চোখ' মেলে দেখল। প্রথমবার স্থলপদ্ম, যেমন কবে ভোরের সূর্যকে দেখে।

রুষা বলল, তুমি খুব সুন্দর।

তোমার চেযেও?

তোমার পা দুটি ভারী সুন্দর। তোমার পায়ের পাতা, উরু, কাফ্-মাস্ল। এ কী! মানুষের গায়ের তিল আবার লাল হয় নাকি?

পৃথু অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, হয়। হয়। রাজা-রাজড়াদের হয়।

তোমার ডান পায়ে আর ডান হাতে কত্ব কত্ব লাল তিল। কী সুন্দর, তুমি!

তোমার চেয়েও?

রুষার গেরোবাজ পায়রার মতো উদ্ধত কিন্তু মসৃণ রেশমিকোমল স্তনে হাত রেখে পৃথু বলেছিল।

রুষা বলেছিল, আমি শুনেছি, পুরুষমানুষের সব শক্তির উৎসই হচ্ছে তার পা-দুটি।

পৃথু উত্তরে কিছু বলেছিল।

রুষা লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, তুমি ভীষণ অসভ্য।

পৃথু বলেছিল, এই দেশে, এই ভণ্ডামির দেশে; অসভ্যতা শুধুমাত্র পুরুষদেরই প্রেরোগেটিভ; অভদ্রতা, যেমন লোকসভার সদস্যদের।

মিঃ ঘোষ! মিঃ ঘোষ! ডোণ্ট বী রেস্টলেস্। হু'জ কুর্চি? মিসেস ঘোষ? ও মাই! মাই! য়্যু রিয়্যালি লাভ হার।

ইয়া। আই ডু।

কুর্চিই-ই-ই-ই...

সিস্টার, হোয়াট ডে ইজ টুডে? আজকে কী বার? কত তারিখ?

সান্ডে।

হোয়াট টাইম ইজ ইট? কটা বেজেছে এখন? সিস্টার?

এইট ও' ক্লক। এইট পি· এম।

মান্দলার জেলে রবিবার কুর্চি ভাটুকে দেখতে যাবে বলেছিল। নিজের ঠিকানা না জানালেও অজানিতে তাকে ধরার হদিস দিয়েছিল পৃথুকে অথবা, কে জানে? হয়তো ইচ্ছে করেই দিয়েছিল। এই ছিল শেষ সুযোগ। হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল শেষ সুযোগও। হারিয়ে গেল কুর্চি, পৃথুর জীবন থেকে।

কুর্চি ই ই ই-ই ই-ই ।

মিস্টার ঘোষ ' প্লিজ বী রিল্যাক্সড। মিসেস ঘোষ অ্যাণ্ড ইওর কিডস আর ওল ইন জাবালপুর। য়্যু উইল মিট দেম টুমরো মর্নিং। কোনো চিন্তা নেই। ওঁরা শ ওয়ালেসের গেস্ট হাউসে আছেন।

এমন সময় ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন।

সিস্টার যেন কী সব বললেন ওকে। পৃথুর জ্ঞানে তখনও অস্পষ্টতা ছিল। ধোঁয়াশা ছিল চোখে

ডাক্তার কী একটা ইনজেকশন দিলেন।

ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল পৃথুর। আর ফুটবল খেলবে না ও কোনোদিন। ডান পায়ে আর কোনোদিন জোরালো অ্যাঙ্গুলার শট নেবে না। তার ডান উরু আর পা কোনো নারীরই বাঁ উরু আর পায়ের পরশ পাবে না। জঙ্গল পাহাড় পাহাড়ি নদীর গেরুয়া আঁচল মাড়িয়ে মাইলের পর মাইল একা একা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে বলতে আর হেঁটে বেড়াতে পারবে না কোনোদিন পৃথু অন্য পৃথু হয়ে গেছে হয়ে গেল। আধখানা পৃথু।

কুর্চি ই ই তুমিও হারিয়ে গেলে? তুমিও?

কুর্চি ই ই ই ই ই

সাইবেরিয়ান রাজহাঁসেদের ছাইরঙা মেঘ আবার ভোরের কুয়াশায় ঢেকে গেল। নিস্তরঙ্গ শীতার্ত জলে এখন কোনো তরঙ্গ আলোড়ন নেই নেই ডানা-ঝটপটানি গলা বেঁকিয়ে ঠোঁট-দিয়ে ডানা মাজাও নেই সব চুপচাপ এখন। চাপ চাপ নিস্তব্ধতা।

পৃথু আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

না কি অজ্ঞান হয়ে গেল?



ঠুঠা বাইগা বানজার নদীর পাশে বসে ছিল।

একা

ঝরঝর শব্দে বয়ে চলেছিল বানজার। তার একটানা ঝরঝরানি শব্দে আনমনা হয়ে গেছিল ঠুঠা। নিজের অস্তিত্ব নদীর অস্তিত্ব এই সূর্যোজ্জ্বল বনের অস্তিত্ব সবই তার চোখের সামনে থেকে, চেতনার মধ্যে থেকে ভোরের শীত সকালের ভোর ঘাসের মাঠের শিশিরের মতোই যেন বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছিল। সে তার অবচেতনে অতীতের তার ছেলেবেলায় ফিরে যাচ্ছিল বহু বহু বছর মাড়িয়ে গিয়ে।

ঠুঠা বাইগার ভবিষ্যৎ বলে আর কিছুই নেই। চাকরি, সে ছেড়েই দিয়ে এসেছে। যে, তার চাকরি করে দিয়েছিল তার নিজের ভবিষ্যৎই এখন পুরোপুরি অনিশ্চিত। যাকে, সে কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেছে সেই পৃথুকেই যখন একটা পা ছাড়া ক্রাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেঁচে থাকতে

দেখতে হবে বাকি জীবন, তখন সেই জীবনের প্রতি ঠুঠা বাইগার আর কোনই দুর্বলতা নেই।

দোষ তো তারই!

সে নাকি কালা-বাঘ! ফুঃ। সেই বদমাস ডাকু মগনলাল যদি আহির ছেদীলাল না সেজে "প্রীত্ ভইল্ মধুবনৌঁয়া রামা, তোরা মোরা" গাইতে গাইতে তাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে চলে না যেতে পারত তবে তো তার সঙ্গে মোকাবিলা হত ঠুঠারই! পৃথু হয়তো বেঁচে যেত তাহলে। ছিঃ! ছিঃ! এই খেদ রাখার জায়গা নেই ঠুঠার।

আহা! কতই বা বয়স পৃথুব! কী করবে সে তাব অনেকখানি বাকি জীবন নিয়ে? কী করে বাঁচবে জঙ্গল, পাহাড়, নদী-নালা, আকাশ বাতাসকে এমন করে—ভালবাসা পৃথু?

বউটাও যদি অন্য মেয়েদের মতো হত! ছিঃ ছিঃ! অমন অদ্ভুত মেয়েছেলে দেখে তার পুরো মেয়ে জাতটাব উপরই ঘেন্না ধরে গেছে। তবু গোন্দ্ বাইগা বা মারিয়া আদিবাসী মেয়েরা অনেক ভাল, অনেক সৎ ঐ সব ইংরেজি-ফুটোনো শহুরে মেয়েদের চেয়ে।

তাদের সমাজেও নারীদের অবাধ স্বাধীনতা আছে, তা বলে সেই স্বাধীনতা নিয়ে এমন করে অন্যকে নষ্ট করে না কেউ। স্বাধীনতার মানে বিবেকহীনতা নয়। মেয়েরা হল ঘরের লক্ষ্মী। ঘরে থাকবে, উঠোন নিকোবে, গাই দোয়াবে, ছেলেমেয়ে বিয়োবে, গ্রীষ্মদিনে স্বামীকে গাছের মতো ছায়া দেবে; শীতের রাতে নাগিনীর মতো জড়িয়ে থাকবে, তবেই না? পৃথিবীটাই বদলে যাচ্ছে। বড় তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি যে, ঠুঠা তাল রাখতে পারবেনি এই বেগের সঙ্গে। গাছ কেটে ফেলছে মানুষ। জঙ্গল সবে যাচ্ছে অভিমানে। মেযেরাও তাদের কালো ঢলঢলে মুখ দেখায় না আর রাগ করে। ধরতিমাতাব গবম বেড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি, প্রতি বছবই কমে যাচ্ছে। চাবদিকে বড় তাপ, বড্ড ভাপ জ্বালা।। ছেলেমেযেবা বডদেব সম্মান করতে চাইছে না। সবাই সবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবীতে। এই পৃথিবী, আর মানুষের থাকাব মতো জায়গা নেই!

একজোড়া বড বাদামি কাঠবিড়ালি ঝাঁপাঝাঁপি করছিল একটা মস্ত ঝাঁকডা চাঁরগাছের মাথার ডালে ডালে। সেই কাঠবিড়ালিদেব ঘন বাদামি আর কালো চিকন শরীরে রোদ পডেই তা চলকে যাচ্ছে কাঁপতে থাকা ঘন সবুজ পাতায় পাতায়। দৌড়াদৌড়িতে, ডাল ঝাঁকাঝাঁকিতে, পাতা কাঁপছে, কেঁপেই চলেছে—শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধাবায় যেমন কাঁপে।

কে জানে! মাঝে মাঝে আবার মনে হয় পৃথিবীটা আছে ঠিক সেই রকমই! বদলে গেছে শুধু ঠুঠা বাইগা নিজেই। আব ঠুঠা বাইগার চাবপাশেব মানুষজন।

যে-বছর তাদের বান্জারি গ্রামটা ছেড়ে সকলে পালিয়ে গেল সেই বছরের নানা ঘটনা এই অলস গন্তব্যহীন অবসরে মনে আসছে একে একে। ছবিব মতো। কেন যে এত পুরনো কথা একসঙ্গে মনে আসছে কে জানে?

ঠুঠা বাইগার কাকা "বাঘ দেও" হয়ে গেছিল। মানুষখেকো বাঘে খেয়েছিল তাকে তাইই। আর তার ছোটমামা? "নাগ দেও"। নাগে কেটেছিল, তাইই। তাবা মাঝে মাঝেই এসে ভয দেখাত ঠুঠাকে। পেঁচা আর বাঘ-ডাকা বাতে দেবদেবী ভূতপ্রেত যে কতরকমই ছিল তাদের ছোটবেলায়! নাঙ্গা-বাইগা আর নাঙ্গা বাইগীন। বড়হা দেব। চিচক্, মানে বসন্ত রোগ বাহিনী দেবী, বুর্হি মাতা। সিঙ্গার মাতা।

হাটচান্দ্রার আলো-ঝল্মল্ কারখানাতে এই কটা বছর থেকে ঠুঠা বাইগা আব ঠুঠা বাইগা নেই। ঠুঠা ছিল সাচ্চা মানুষ। মাটি, গাছ আর চাঁদ-সূর্যের আশীর্বাদে সম্পৃক্ত একজন সম্পূর্ণ মানুষ। বিজলী আলো, পাকা সড়ক, নানা আবামের লোভ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। ঠুঠাকেও দিয়েছে। একথা ঠুঠাব মতো ভাল করে আর কেউই জানে না। ও এখন শহবে থেকে থেকে ঠুঠা বাইগা নেই; ঝুটা বাইগা হয়ে গেছে। শহরের খারাপ প্রভাবের মতো সর্বনাশা রোগ চিচক্ও নয়। এই রোগ মানুষের মুখে নয়, মনেরই মধ্যে কুৎসিত সব ক্ষতের সৃষ্টি করে। মানুষের মনের চোখদুটিকে নষ্ট করে দেয়।

"হাইজার" বা কলেরার প্রলয়ঙ্করী মড়কের বছরটার কথাও তার মাথার মধ্যে ফিরে আসছে।

ভেসে ভেসে আসছে, যেমন করে ছোট্‌কি-ধনেশ পাখিরা নিষ্কম্প ডানা মেলে সূর্যাস্তবেলায় নীড়ে ফেরে।

গরমের শেষাশেষি লেগেছিল মড়ক। সে বছর, কে জানে কেন, কোনো শিমুলগাছেই ফুল ফোটেনি। এমন তোড়েই এল সেবারে "হাইজার" যে, সব শেষ হয়ে গেল বর্ষার প্রথম মাসেই। নর্মদাব জলের ঢল নামল সব শাখা নদীতে ঢল্‌ঢলিয়ে। ঢলানি মেয়ের মতো। ঐ বড় নদীর পারের গ্রামে গ্রামে আগেই মড়ক লেগেছিল। সেখানের সব আধ-পোড়ানো মড়া, নদীতে ফেলে দিচ্ছিল সেই সব গ্রামের লোকেবা। যথেষ্ট সুস্থ লোক ছিল না যে, ঠিকমত দাহ করবে। নদীর মাছ, সেই মড়ক-লাগা মডাদের ঠুক্‌রে খেল। আর বান্‌জার গ্রামের লোকে খেল সেই নদী থেকে ধেয়ে-আসা জল আর জলের মাছও। ব্যস্‌স্‌ শুরু হয়ে গেল বান্‌জারেও মড়ক। হায়! হায়! "হাইজার"! পাঁচ ছ'ঘণ্টা ভেদবমি আর পায়খানার পর পটাপট্‌ মরে যেতে লাগল বুড়ো-বুড়ি, জোয়ান সব ছেলেমেয়ে, আণ্ডা-বাচ্চাবা।

কোনো দেও-এর কোপেই এমন হয়েছিল নিশ্চয়ই! ঠুঠার মা বলতেন, দেও নয়; মাতা। মারাই-মাতা। যে-দেবী শুধু মাবেনই। বান্‌জার গ্রামের মানুষদের অপরাধ না হলে মাবাই-মাতা খামোকা চটবেনই বা কেন?

কত চেষ্টাই হয়েছিল। গ্রামেব বুড়ো গাওয়ান-এর নির্দেশে "দেওয়ার", মানে গ্রামেব পুরুত একটা লালরঙা ছাগলের গায়ে লাল হলুদ সবুজ সব রঙ চড়িয়ে তাকে ফুলের মালা পরিয়ে, গলা থেকে মুক্তোব হার ঝুলিয়ে, নতুন দোহব ঝুলিয়ে শোভাযাত্রা করে গ্রামেব এলাকার বাইরে নিয়ে এসে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। তাবপর, সকলে মিলে তাডিয়ে তাড়িয়ে পাঠিয়ে দিল যত দূরে পারে। ছাগল যখন অনেক দূবে চলে গেল তখন গ্রামের সীমানাতে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে হাত জোড় করে বলতে লাগল, "হে মাবাই-মাতা! এই ছাগলটাকে নিয়ে, আমাদের ছেড়ে দাও মা। বাঁচতে দাও এই ধর্‌তি মায়ের বুকে।"

ছাগলটা যেন আবাব চবেববে গ্রামে না ফিবে আসে তার জন্যে চৌকি পর্যন্ত বসানো হল গ্রামের সব দিকে। কিন্তু লাভ হল না কিছু। তবু উজাড হয়ে গেল গ্রাম। ঠুঠা বাইগার বান্‌জার।

সবাইই মরে গেল বলতে গেলে। হল না কিছুই শুধু 'দেওয়ার'-এব। সে যে সব সময়ই মদে চুর্‌ হয়ে থাকত। মাতালদের 'হাইজাব' অথবা কোনো জলবাহী রোগই বোধ হয় কখনও কাবু কবতে পাবে না।

যখন গ্রামের মানুষ সব প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন টনক নড়ল সকলের। যারা বেঁচেছিল, তারা পালাল গ্রাম ছেড়ে। জঙ্গলে গিয়ে পাহাড়ের গুহাতে ঠাঁই নিল। ঠুঠা পালাল তার বাবার সঙ্গে। সেইই তার কাল হল। গ্রামকে তাবা সকলে ছাডল বলে গ্রামও তাদের উপর অভিমান করে নিজেই গিয়ে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল। খোঁজো এখন তাকে!

মাটি যখন অভিমান কবে, তখন সে নারীর চেয়েও অনেক বেশি অভিমানী।

ঠুঠাব বাবা বাতের ব্যথায় বড়ই কাবু হয়ে পড়ল। 'হাইজার'-এর হাত থেকে বেঁচে মারা যাবে শেষে বাতে? পৃথুর বাবার বুড়ো মালী! সে বলল, বাঘের চর্বির সঙ্গে 'আসারিয়া' সাপের মাংস মিশিয়ে সর্ষে দিয়ে ভাল কবে ভেজে নিয়ে খেলেই বাত-টাত সব গায়েব হয়ে যাবে। কিন্তু বড় বাঘ চাইলেই পায় কোথায়? সে তো আর আত্মহত্যা করবে বলে বসে থাকে না। তাছাড়া, পৃথুর বাবার সাগ্‌রেদি কবে তাব দোসবও হয়ে ওঠেনি ওরা তখনও। ঠুঠাও ছোট্ট তখন। শিকারি অবশ্য ছিলই, তবে তীর-ধনুকের শিকারি; বন্দুক রাইফেলের ব্যবহার জানত না। পৃথুদেরই খামারের একজন মজুর বলল, বড় বাঘের চর্বি না পেলে শেয়ালের চর্বি হলেও চলতে পারে। একথা শুনে সেই সন্ধেতেই ঠুঠার বাবা নিজেই কেতরে কেত্‌রে গিয়ে নালার ধারে তীর-ধনুক দিয়ে মারল একটা কেঁদো-শিয়ালকে। ঠুঠাও ছিল বাবার সঙ্গে। সেও তীর ছুঁড়েছিল একটা। ঠুঠার বাবার তীরটা গিয়ে শেয়ালটার বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড কবে দিয়েছিল। তারপর সেখানেই শেয়ালটার চামড়া ছাড়িয়ে কয়েক খাবলা চর্বি বের করে শালপাতার দোনা বানিয়ে তাতে করে মুড়ে নিয়ে এল।

"আসারিয়া" সাপও তখন অনেকই ছিল চারপাশে। পৃথুর বাবার যে বুড়ো মালী, সেইই মেরে দিল একটা খুঁজে-পেতে। সেই যে বাত পালাল ঠুঠার বাবার, আর এমুখো হয়নি কখনও যতদিন বাবা বেঁচে ছিল।

ঠুঠার বড় মামা মারা গেছিল বান্‌জার গ্রামেই "ফুল্‌মি" রোগে। স্পষ্ট মনে আছে ঠুঠার। পেট ফুলে গেল, তো ফুলেই গেল। ফুলতেই লাগল। কিন্তু মরত না, যদি ঠুঠার বাবার কথা শুনত একবারটি। বড়মামা মানুষটা বড়ই একরোখা ছিল। ঠুঠার বাবা অনেকদিন আগেই একটা গোখরো সাপ মেরে, চামড়া ছাড়িয়ে ধিকিধিকি কাঠের আগুনে সেটাকে ভাল করে ঝলসে নিয়ে শুকনো করে রেখে দিয়েছিল। সেই শুকনো গোখ্‌রোর দু'টুকরো দিয়ে একটা ক্বাথ্‌ মতো বানিয়ে বাবা কত সাধাসাধি করল বড়মামাকে মামাবাড়ি গিয়ে। কিন্তু মাথাটা দুদিকে নেড়ে বড়মামা কয়েকবার কেশে, তার ফুলো টস্‌টস্‌ পেটে দুটি হাত রেখে বলল, সময় যখন হয়েছে, পিছুটানে দরকার নেই। এসেছিলাম যখন,তখন যেতে ত হবে জানতামই। বড়মামার দাঁত সবই পড়ে গেছিল। বলেছিলো ফোক্‌লাই এসেছিলাম, ফোকলাই যাচ্ছি।

তার বড়মামার কাছ থেকেই এই জেদ পেয়েছে ঠুঠা তার রক্তে। মামাবাড়ির প্রভাব বোধ হয় মানুষের উপর সাংঘাতিক হয়। ঠুঠা কিন্তু চেয়েছিল তার বাবার মতোই হতে।

কিছুটা ছোলার ছাতু শালের দোনায় নিয়ে আঁজ্‌লা করে জল তুলে নিয়ে ভাল করে মেখে কাঁচালঙ্কা কাঁচা-পেঁয়াজ দিয়ে খেল। তারপর আঁজ্‌লা ভরে আবারও জল। এইসব ছাতুটাতু সে খেতে শিখেছে বিহার থেকে আসা হাটচান্দ্রার কারখানার দরোয়ানদের কাছ থেকেই। ছেলেবেলায় এই দিকে ছাতুফাতুর তেমন চল ছিল না। মানুষ যখনই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে রুজির খোঁজে, তখনই তার খাওয়াদাওয়ার রকম বোধ হয় পালটে গেছে। হয়তো সব মানুষেরই যায়। পুরনো প্রথা ও রেওয়াজ ভেঙে নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সুবিধেমত করে নিতে হয়েছে তাকে। বাড়িতে না থাকলে আর বাড়ির আরাম পাওয়া যাবে কী করে?

ছাতু খেয়ে, জল খেয়ে পুঁটলিটা আর বন্দুকটাকে কাঁধে ফেলে রওয়ানা হল ঠুঠা।

নদীর পার থেকে যে জানোয়ার-চলা পথটা বনের গভীরে গিয়ে হারিয়ে গেছে মাইকাল, বিন্ধ্য আর সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর পায়ের কাছে আসন-কেটে-বসা বুড়ো বুড়ো সব গাছেদের মস্ত "মীটিং"-য়ের মধ্যে, সেই পথ ধরেই এগুতে লাগল সে।

জবলপুরে পনেরো দিন ছিল ও। ডাক্তার বলেছে, তিন-চার মাস পৃথুকে হাসপাতালেই নাকি থাকতে হবে। পৃথু যতক্ষণ হাসপাতালে আছে ততক্ষণ দেখাশোনার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু যখন ছেড়ে দেবে ওকে, তখনই গোলমাল। এই অদ্ভুত স্বার্থপর পৃথিবীতে কেইই বা কাকে দেখে? ঠুঠার গ্রাম হারিয়ে না গেলে, পৃথুকে ধরে সেখানেই নিয়ে আসত ঠুঠা। পাহাড়ে বনে মকাই, বাজরা আর তামাকপাতার কচি কলাপাতা-সবুজ, গাঢ় -সবুজ, হলুদ এবং লালের দিগন্তের সীমানায় এখনও যেসব গ্রাম বেঁচে আছে তাদেরও যে-কোনোটায় নিয়ে আসতে পারত ঠুঠা ওকে পৃথু যদি চাইত। একজন মানুষের বেঁচে থাকতে খুব বেশি কি লাগে? কিন্তু পৃথু কি শুনবে ঠুঠা বাইগার কথা? সে যে কারো কথাই শোনে না। হাটচান্দ্রার মানুষদের ভিতরে যদি একটা পা-হারানো পৃথু গিয়ে পড়ে তবে তাকে তারা জংলি-কুকুরের মতোই ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে তার কঙ্কালটুকুকেই শুধু ফেলে যাবে। এতদিন পৃথুরই দৌলতে শহরের মানুষদের ভিতরে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাস করে করেই ঠুঠার এই ধারণা হয়েছে।

মানুষ, 'মানুষ' হতে গিয়ে আসলে বড়ই অমানুষ হয়ে গেছে। জঙ্গলের বুনো কুকুরের দল অথবা মৃত্যুর অপেক্ষায় চুপ করে বসে-থাকা তীক্ষ্ণ ভয়াবহ ঠোঁট আর ন্যাংটো, লম্বা, গোলাপি গলার জংলি শকুনরাও বোধ হয় শহরের মানুষদের মতো নিষ্ঠুর বা ভয়াবহ নয়। শহরের জানোয়ারদের দেখে দেখে বড়ই ক্লান্ত হয়ে গেছে ঠুঠা। তাইই, ও জঙ্গলে ফিরেছে আবারও সব পিছুটান ফেলে।

অবশ্য সবই ফেলতে পারল আর কই? পৃথু যে রয়ে গেছে পিছনে। সেইই একমাত্র পিছুটান। যেহেতু ঠুঠা এখনও শহুরে মানুষ হতে পারেনি, পৃথু ফিরে এলে তাকে তাই আবারও ফিরতে হবে

শহরে, পৃথুর কাছে, পাশে পাশে তাকে থাকতে হবেই। যদি না, পৃথু জোর করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। যে ক-মাস পৃথু হাসপাতালে, সে ক-মাসই এখন ছুটি ঠুঠার।

তারপর ?

তারপর বড়হা দেব-এর যা ইচ্ছে।

তবে এই তিন চার মাস ঠুঠা জঙ্গলে জঙ্গলেই থাকবে। "বানজারি"-কে খুঁজে বেড়াবে। যে গাছের শিকড় শুকিয়ে বা মরে গেছে, সে দাঁড়িয়ে থাকে বটে মাটির উপর, দূর থেকে তাকে দেখে বোঝাও যায় না, কিন্তু সে তো মৃতই। মড়াকে দড়ি-দড়া দিয়ে বেঁধে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনই। তেমন বাঁচা, ঠুঠা বাইগা বাঁচতে চায়নি।

শিকড় যার নেই, তার কিছুই নেই। সংরক্ষণ করে রাখার মতো যার কিছু নেই, তার বাঁচা-মবায় তফাতও নেই। গাছে-গাছে, মানুষে-মানুষে, পাখিতে-পাখিতে, প্রজাপতিতে-প্রজাপতিতে শুধু এটুকুই ত তফাত্। নইলে, বাইরের চেহারাতে এক-এক জাতের প্রাণী বা প্রাণ সবাইই ত একই রকম !

এতসব ভাবনা, ঠুঠা অবশ্য ভাবে তার নিজস্ব ভাষাতেই। সেই ভাষা শিক্ষিত মানুষদের বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। বিপদে-পড়া বুনো শুয়োর যেমন ভাষায় কথা বলে, ঘোঁক্-ঘাঁক-ফোঁৎ-ফাঁর্র্। অথবা, দীর্ঘ সঙ্গমের পরিতৃপ্তির পরই পুরুষ শোন্‌চিতোয়া যেমন অস্ফুট আওয়াজ করে একরকম, কালা-বাঘ ঠুঠা বাইগার ভাষাও অনেকটা তেমনই। যতটা নিজে বোঝার জন্যে, ততটা বোঝাবার জন্যে নয়।

কত্ত দিন পরে জঙ্গলে এল ঠুঠা !

তার মৃতা মায়ের স্মৃতি মনে পড়ল। জঙ্গলই তো তার মা-বাপ। নাক ভরে নিঃশ্বাস নিল। এক এক করে পা ফেলে জানোয়ার-চলা শুঁড়িপথে চলেছে সে এখন আনন্দে বুঁদ হয়ে।

একটু এগিয়েই একদল বারাশিঙার খুরের দাগ পেল পথের ঝুরো-মাটিতে। খুব বড় একটা এক্‌রা শুয়োর পথ পার হয়েছে এখানে, তার খুরে খুরে ঝুরো মাটি ছিট্‌কে গেছে। আর একটু এগোতেই ময়ূর আর বনমোরগের পায়ের দাগ। বাঁদিকে একটি খোলা মাঠ। মধ্যে একটা দোলা মত আছে। ফরেস্ট ডিপার্ট্ খেতি করেছে এখানে। তার মানে, এখানে ফরেস্ট-গার্ডদের যাওয়া-আসাও আছে হয়তো। একথা ভেবেই, তাড়াতাড়ি পা চালাল ঠুঠা। তাদের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেলেই ঝামেলা। অথচ কেন যে এমন হয়, ভেবে পায় না ও। জঙ্গলও তো সুন্দরী মেয়েরই মতো। তাকে ফরেস্ট ডিপার্টও যেমন ভালবাসে, ঠুঠাও তার চেয়ে কম ভালবাসে না। যে-দুজন পুরুষ একই মেয়েকে ভালবাসে, তাদের দুজনের মধ্যে তো খুব ভাবই থাকার কথা। অথচ ঠিক উল্টোটাই হয় ! এতে ঝগড়া যে কিসের, তা বোঝে না ঠুঠা। ঝগড়াটা বোধ হয় এই কারণেই যে, মাটি আর নারীকে প্রত্যেক পুরুষ চিরদিনই নিজের একার মালিকানাতেই পেতে চেয়েছে। গায়ের জোরে। লাঠির জোরে। টাকার জোরে। অথচ, কখনোই ভালবাসার জোরে নয়। হয়তো সেই কারণেই কোনো পুরুষই কোনোদিনও কোনো নারীর পুরোপুরি মালিক হতে পারেনি। আহিররা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গরুদের প্রত্যেকের গায়ে যেমন ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়ে নম্বর লিখে রাখে মালিকানা জাহির করার জন্যে, পুরুষরাও তেমনই করতে চায়। নারীর গায়ে নিজের তক্‌মা এঁটে দিয়েই ভাবে যে, সে নারী তারই একারই বুঝি হয়ে গেল !

কিন্তু গাভী আর নারী তো এক নয় ! একথা পুরুষ বুঝল আর কই ? রুষাকে দেখে, কুর্চিকে দেখে, বিজলী বাঈকে দেখে এবং তার নিজের জাতের অসংখ্য নারীকে দেখেও এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে ঠুঠার। একজন নারীর মোকাবিলা করা আর পাঁচটি জখ্‌মি-বাঘের মোকাবিলা করা সমান বিপদের ! বহত্‌ই খতরনাগ্ এই জাত। তবু। ভাবে ঠুঠা ; এই নারীর মতো জঙ্গলকে তো ফরেস্ট ডিপার্ট তার সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে ভালওবাসতেও পারত।

তা হল কই ?

হঠাৎই একটা শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল ঠুঠা।

বাইসনেব আওয়াজ।

বাইসনেবাও গরু-মোষেব মতোই এক ধবনেব ডাক ডাকে। কিন্তু খুব কমই শোনা যায় এই বকম ডাক। একবাব এক সাহেবেব ডাবল-ব্যাবেল বাইফেল দিয়ে দূব থেকে একটি মস্ত একবা বাইসনকে গুলি কবেছিল ঠুঠা সাঁওনীব জঙ্গলে। গুলিটা জাযগামত লাগলে কোনো কথাই ছিল না। প্রায দুশো গজ দূবে ছিল বাইসনটা। গুলি কবাব ঠিক আগেব মুহূর্তেই এক কদম হেঁটে গেল বাইসনটা বাঁযে আব গুলিটা গিয়ে লাগল, যেখানে বুকেব পাঁজব পেটে নেমেছে তাবই ছ-আঙুল মতো নিচে। সেই বাইসনটাও, এক্ষুনি ঠুঠা যেমন আওয়াজ শুনল, ঠিক সেই বকম আওয়াজ কবেই লাফিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই বাঁদিকেব ব্যাবেল ফাযাব কবে মোক্ষম জাযগায মেবে তাকে অবশ্য ফেলে দিয়েছিল ঠুঠা।

এতদিন জঙ্গলে ঘুবছে অথচ বাইসনেব এই বকমেব আওয়াজ মাত্র এই দ্বিতীয়বাব শুনল। খুবই যন্ত্রণা বা দুঃখে বোধ হয় এমন আওয়াজ কবে বাইসনেবা কে জানে।

সাবধান হয়ে গেল ঠুঠা বাইগা। সতর্ক হয়ে গেল। তাবপব উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। কান খাড়া কবে শুনল। আওয়াজটা পশ্চিম দিকেব গভীব শালবনেব মধ্যে থেকেই আসছে। আব একবাবও শুনল। সাহেব শিকাবিবা ওই আওয়াজকে বলত "বেলোইং"। শুনেছে ও।

খুব সাবধানে কিছুটা পথ ঘুবে একটা টিলাব আডাল নিয়ে পুবে গিয়ে সেই টিলাতে উঠেই দেখবে ঠিক কবল ঠুঠা যে, ব্যাপাবটা কী।

মিনিট দশেক পব টিলাটাতে উঠে শীতেব সোঁদা গন্ধ জঙ্গলেব গভীব আণ্ডাবগ্রোথেব আডাল থেকে ঠুঠা ঠাহব কবে দেখল, নিচেব শালবনে একটি বাইসনেব বাচ্চা পড়ে আছে। তাব প্রায সবটাই খেয়ে গেছে বাঘে। পেছন থেকে খেয়েছে। শুধু কবোটি, ভাঙা কঙ্কাল এবং একটি নিটোল পা, ডান পাটি বাকি আছে শুধু। ডান পা-র সেই মডিব ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে বাইসনেব পুবো দলটি। মাথা নিচু কবে, অথচ উঁচুও কবে। অর্দ্ধ-বৃত্তে।

অবাক হয়ে বাইসনেব দলেব দিকে চেয়ে ঠুঠা ভাবছিল যে, সম্ভ্রমবোধ ব্যাপাবটা কিছু কিছু মানুষ আব কিছু কিছু জানোয়াবেব মধ্যেই শুধু দয়া দিয়েছেন বড়হা দেব। সকলেব মধ্যে কখনোই নয়। মৃত্যু, শোক, দুঃখ, ভীষণ বকম শাবীবিক কষ্ট অথবা প্রচণ্ড দাবিদ্র্যেও যে মানুষ বা যে-জানোয়াব বেঁকে না যায়, কুঁজো না হয়ে যায় তাবাই তো সম্ভ্রান্ত। বাইসনেবা সেইবকমই জানোয়াব। বাঘও। আব মানুষেব মধ্যে যেমন পৃথু। এবং রুষাও।

বাঘেই ধবেছিল বাইসনেব বাচ্চাটাকে। বড বাঘে। বোধ হয়, শেষ বাতে। বাচ্চা মানে, বছব খানেকেব হবে। বড বাঘ ছাডা বাইসনেব বাচ্চা ধবাব সাহস আব কোনো জানোয়াবেব দেখা যায় না সচবাচব। মাযেব বুক ফেটে একবাবই শুধু এই শাঁখেব মতো আওয়াজ বেবিয়েছিল। সে আওয়াজ যে শোনে, তাবই বুক ফেটে যায়। আব যে কবে তাব তো ফাটেই।

পুবো দলটিই দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে, মাথা নিচু অথচ মাথা উঁচুও কবে। এই নিচু অথচ উঁচু ব্যাপাবটাই সম্ভ্রমবোধ। ভাবটা ঠিক আছে বনেব বাজা বাঘ, তোমাকেও যদি কখনও পাই আমবা তোমাকে ঘিবে ফেলে শিং আব খুবেব গুঁতোতে মাটিব সঙ্গে মিশিয়ে দেব জেনো। সেকথা মনে বেখো। আমবাও বাইসন

ঠুঠাব মনে হল যেন ঠিক এই মা-বাইসনটাব ভঙ্গিতেই রুষা দাঁড়িয়ে ছিল পৃথুব হাসপাতালেব খাটেব পাশে। কুঁচকি থেকে অনেকই উপবে এবং কোমব থেকে আট ইঞ্চি মতো নিচ থেকে পৃথুব ডান পাটা কেটে ফেলাব পব যখন সাদা চাদবেব বুক অবধি ঢেকে পৃথুকে শুইয়ে বাখা হয়েছিল, তখন।

রুষাব চোখে জল ছিল না। আগুন ছিল। সেই আগুন পৃথুকে যতখানি পোডাত, পৃথুব জ্ঞান থাকলে তাব চেয়ে বেশি পোডাচ্ছিল যে মানুষটা পৃথুব এই অবস্থা কবেছে সেই অদেখা ডাকু মগনলালকে। রুষাব চোখেব মধ্যে এই মা-বাইসনেবই মতো তীব্র বাগ তো ছিলই, সঙ্গে তীব্র দুঃখ

ও অভিমানও মাখামাখি হয়ে ছিল। অথচ একটুও ভেঙে পড়ার ব্যাপার ছিল না। টুসু ও মিলিও তাদের মায়ের দু' পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাবার চোখ-বন্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে। আশ্চর্য! তাদের চোখেও জল ছিল না একফোঁটা। বাঘ ও বাঘিণীর বাচ্চারা তো বাবা মায়েরই মতন হবে! হওয়াই তো উচিত!

খুবই অবাক হয়ে গেছিল। শুধু ঠুঠা বাইগাই নয়। গিবিশদা, ভুচু, সাবির মিঞা, শামীম এবং হুদাও। সকলেরই খুব শ্রদ্ধা জেগেছিল এক ধরনের। রুষা এমন এক চরিত্রর নারী যে, তাকে তাচ্ছিল্য করা যায় না। তাকে ঠুঠা পছন্দ করুক কি নাইই করুক তার প্রতি এক ধরনের বিস্ময়-মেশানো শ্রদ্ধা জাগেই। একেই হয়তো বলে ব্যক্তিত্ব!

কে জানে!

রুষার চেহারাও বটে একখানা! আগুনের মতো রঙ্। তারপর যেমন গড়ন, তেমনই চোখ, মুখ, চিবুক, ভুরু। যত লোক হাসপাতালে ছিল সেই সময়ে, সুন্দরী সব নার্সদের আর ডাক্তারদের সকলকে জড়ো করেও, ঠুঠা এবং অন্যান্যদেব মতে রুষাকে সকলের চেয়েই সব দিক দিয়েই সুন্দবী এবং বড় বলে মনে হয়েছিল। বয়সে বড় নয়! এই বড়ত্বর মাপ বয়স দিয়ে হয় না।

ডাক্তার বলেছিলেন, ইংবিজিতে ; সরী! রুষাকে। আরও কী সব বলেছিলেন। ঠুঠা বোঝেনি। ইংবিজি, দু'একটা শব্দই বোঝে ও। কিন্তু উত্তবে রুষা হেসে ডাক্তারকে বলেছিল, থ্যাঙ্ক ঊ্য! আরও কী সব বলল, তাও বোঝেনি। কাটা-ছেঁড়ার এতবড় নামকরা ডাক্তারকেও রুষার সামনে কেঁচো বলে মনে হচ্ছিল। যখন ভীষণই কাঁদার কথা, ভেঙে পড়ার কথা, তখনও যারা ভদ্রতা বজায় রাখতে পারে, হেসে কথা বলতে পারে ; তারা কি মানুষ? না, বোধ হয়। রুষাও বোধ হয় কোনো "মারাই" দেবী। কে জানে! দেবী বলেই ভয় হয়।

রুষা কি পৃথুর কেটে-ফেলা পা-টা দেখতে চায়?

ডাক্তার জিগ্যেস করেছিল।

ঠুঠার মনে হয়েছিল, এক থাপ্পড় কষায় ডাক্তারকে। বেয়াকুফ্, শালার আক্কেল বলেও কি কোনো জিনিস নেই?

ভুচু আর শামীমও আগুনের চোখে তাকিয়েছিল ডাক্তারের দিকে।

রুষা মাথা নেড়েছিল দুদিকে। আবার বলেছিল, নো। থ্যাঙ্ক য়্যু। তারপর বলেছিল, যা পৃথুর নেই, তা দেখার কোনো কৌতূহলই নেই আমাব।

কিন্তু সেই বেয়াকুফ ডাক্তারের নির্দেশে, রুষা যখন দেখল না, তখন একটা মস্ত ট্রলিতে কবে পৃথুর পা-টা ঠুঠাদেরই দেখাতে নিয়ে এল ওয়ার্ড বয়।

ঈস—স্—স—স্……স্

ছেলেবেলায়, যখন পৃথুকে কাঁধে চড়িয়ে ঘুরিয়ে বেড়াত ঠুঠা তখন পৃথুর ছোট্ট ছোট্ট নরম পা-দুটো ঠুঠার গলার কাছে বাইসন-হর্ন-মারিয়া মেয়েদের মস্ত হারের লকেটেরই মতো ঝুলত। দুলত। পা-দুটিকে দু' হাত দিয়ে আলতো করে ধরে থাকত ঠুঠা। পৃথু তার ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাতে ঠুঠা বাইগার মাথাটা জড়িয়ে ধবে বসে থাকত ওর কাঁধে। বড় সুন্দর, দুধ-দুধ, ফুল-ফুল এক রকম গন্ধ বেবোত তখন শিশু-পৃথুর গা থেকে। সব শিশুব গায়েই কি ঐরকম গন্ধ থাকে?

কে জানে! তার পৃথুর গায়ে ছিল!

ঠুঠা বাইগার পৃথু।

হঠাৎই ঠুঠা তার গলাব কাছে শিশু-পৃথুর সেই সুন্দর সুগন্ধি পা-দুটির স্পর্শ পেল। হঠাৎ। এবং পেতেই, ওর অজানিতেই ; অনেকদিন আগের গুলি-খাওয়া সেই একরা বাইসনটারই মতো, গভীর ছায়াছন্ন শালবনের মধ্যের শিশু-হারানো বাইসন-মায়েরই মতো ঠুঠারও বুকের মধ্যে থেকে এক গভীর, অর্ধস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল, সমস্ত বুকটাকে কোনো হেভি-বোর রাইফেলের গুলির মতোই ছিন্নভিন্ন কবে দিয়ে। ঠুঠা বাইগার অনিচ্ছাকৃত ঐ হঠাৎ-শব্দে বাইসনের দলও হঠাৎ মাথা তুলল তার দিকে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাথার উপরের শিংগুলো এক ঝট্‌কাতে নিচু করল। কিন্তু পরক্ষণেই

ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল ওরা জঙ্গলের গভীরে। ভারী পায়ের খুরে খুরে জমিতে, পাথরে খটাখট্ আওয়াজ তুলে।

ঐখানেই দাঁড়িয়ে রইল ঠুঠা অনেকক্ষণ।

কী হল! কেন এমন হল? পৃথুর পা-টা তো গতকাল্ কাটা হয়নি। অনেকদিনই তো হয়ে গেছে। এই যন্ত্রণাটাকে, বুক-গুঁড়ানো এই চিৎকারটাকে এতদিন কী করে, কোন্ সান্ত্বনার পাথরে চাপা দিয়ে রেখেছিল ঠুঠা বাইগা?

এখন বাইসনগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। আলোড়ন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওরা শিং নামিয়ে আক্রমণ করবার কথা একবার ভেবে, তবুও পালিয়ে গেল। আক্রমণ সত্যি সত্যিই করলে, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেত ঠুঠা। তার রক্ত-মাংস বাইসনদের খুরে খুরে ওপ্‌ড়ানো ঘাস আর ছিট্‌কোনো মাটির সঙ্গে মিশে যেত। কিন্তু…

বাইসনের মতো শক্তিশালী জানোয়ার, বাঘের মতো বনের রাজা এবং আশ্চর্য! অনেক মানুষও, অন্য মানুষকে বড়ই ভয় পায়। বাইসন, বাঘ কী সেই মানুষগুলোও আসলে জানে না যে, মানুষের চেহারা ধরলেই মানুষ, মানুষ হয় না। মানুষের মতো মানুষ, বড় কমই আছে এই ধর্‌তি – মায়ের বুকে। লড়াই না করলে, বোঝাই বা যাবে কী করে; কে বেশি শক্তি ধরে?

টিলাটা থেকে নামতে নামতে আবারও আরেকবার পৃথুর কেটে-ফেলা ডান পা-টার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল ঠুঠার।

ওয়াক্ ওয়াক্ থুঃ উ…।

মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ল ঠুঠা। দমকে দমকে বমি করল। উগরে দিল বনের ঘাসের মধ্যে ছোলার ছাতু, পৃথুর কাটা পায়ের দুঃস্বপ্ন-ভরা স্মৃতি এবং নিজের যন্ত্রণা। অথচ এই ঠুঠাই কতরকম এবং কত শ' বিভিন্ন জানোয়ারের পা-ইই না, কুড়ুল দিয়ে, টাঙ্গি দিয়ে, ছোরা দিয়ে কেটেছে নিজে হাতে। চামড়া ছাড়িয়েছে। পিলে আর পিত্তি ছিঁড়ে এনেছে। ওদের বিরাট-বিরাট ফুসফুস্ আর মাংসল হৃদয় দুটি কামার্ত হাতে চেপে ধরেছে নারীর স্তনেরই মতো। একটুও ঘেন্না তো হয়নি কোনোদিন? রক্তে স্নান করে উঠেছে শুয়োর, কোট্‌রা, চিতল, শম্বর, বারাশিঙ্গা, চৌশিঙ্গা, চিংকারা, কৃষ্ণসার আর বাঘ এবং লেপার্ডের রক্তে।

তবে? তবে কেন? রক্তাক্ত, গুলিবিদ্ধ, বেগুনি কালশিরে-পড়া কর্তিত পা কি দেখেনি কখনও আগে? তবে?

দেখেছে! দেখেছে! কিন্তু পরের পা আর নিজের পা, পরের রক্ত আর নিজের রক্তে যে তফাত অনেকই। পৃথু, ঠুঠা বাইগার ঔরসে জন্মায়নি বটে কিন্তু পৃথু ঠুঠার কাছে ছেলের চেয়েও বেশি। ঔরস এবং গর্ভ ছাড়াও অনেক কিছু জন্মায় এই ধর্‌তি-মায়ের বুকে।

কিন্তু কাকে এসব বলবে ঠুঠা? কী করে জানাবে? একমাত্র যে-মানুষ তার চোখের চাউনিকেও বুঝত; সে ত' শুধু পৃথুই! সে কি আর এই পাহাড়ে জঙ্গলে কোনোদিন…। নাঃ…না…

ঠুঠার সব আনন্দ, দুঃখ, অনুভূতি, স্মৃতি—সবই ছাই হয়ে যাবে একদিন বান্‌জারের পাড়ের; চিতার আগুনে। যারা লেখাপড়া না জানে, তারা সত্যিই বড় অভাগা; নিঃসন্তান দম্পতিরই মতো, শিকড় বা বীজ বা দুইয়ের—জুড়ন ছেড়ে যে যাবে, তেমন কোনোই উপায় নেই তাদের…। বাজ-পড়া শিমুলেরই মতো; হঠাৎই শেষ-হয়ে-যাওয়া তাদের।

ঠুঠা আবারও নদীর দিকে ফিরে যেতে লাগল। যেদিক থেকে এসেছিল। ভাল করে মুখ-চোখ ধোবে। বমির গন্ধে গা গুলোচ্ছে। মুখ টক্।

সারাটা জীবনই যতটুকু এগোল ঠুঠা বাইগা, জীবনের সমস্ত টুক্‌রো-টাক্‌রায়, ফালিতে; তার চেয়ে পেছোল অনেকই বেশি!

কোনো কোনো মানুষের ভাগ্যর লিখন এমনি করেই লেখে বড়হ্-দেব; যতদিন না কোনো "মারাই-মাতা" এসে তা একেবারে মুছে দিচ্ছে চিতার আগুনে।



এখন দুপুরবেলা। বাইরের পথে হুহু করে ট্রাক যাওয়ার আওয়াজ। ঘরের মধ্যে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে।

জানালা দিয়ে একটি মস্ত অশ্বত্থগাছ চোখে পড়ে। শীত-দুপুরের রোদে হাওয়ায়-ওড়া পাতারা ঝিল্‌মিল্ করছে। এক ঝাঁক শালিক কিচিরমিচির করছে পাতার আড়ালে আড়ালে। তাদের দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, তারা অসংখ্য। মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটি পাতাই যেন কথা বলছে, শীৎকারের সঙ্গে। রোদের রঙ আর তাপ ঠিকরে বেরুচ্ছে তাদের শিরা-উপশিরা থেকে।

সিস্টার বসে আছেন ঘরেব এক কোণায়। ওঁর নাম মিসেস্ লাওয়াণ্ডে। মারাঠি। বয়স্কা। মা-মা ভাব মহিলার। চেয়ারে বসে একটি মাবাঠি নভেল পড়ছেন।

চোখে চোখ পড়তেই বললেন, এবার ইনজেক্‌শনটা নিতে হবে।

পৃথু চোখ দিয়ে বলল, দিন।

মুখে কথা বেশি বলতে ইচ্ছে করে না। ঘরের বাইরে দুজন আর্মড গার্ড বসে আছে সাদা পোশাকে। হাসপাতালের বাইরেও সাদা পোশাকে আছে কিছু লোক। যদি মগনলালের দলের কেউ বেঁচে থাকে এবং সে পৃথুর উপরে বদলা নিতে আসে, তাই-ই এই বন্দোবস্ত। পৃথুর মাথার বালিশের নিচেও গুলি-ভরা পিস্তলটা আছে। ইন্দারজিৎ লাল সাহেব আর কোনো ঝুঁকি নিতেই রাজি নন। তাঁকে এমনিতেই এই রকম আনকন্‌ভেনশনাল্ অ্যাক্শানের জন্যে অ্যাসেমব্লীতে অনেকই কটূক্তি শুনতে হয়েছে। অবশ্য দায়িত্ব যা,তা সব হোম মিনিস্টার এবং হোম সেক্রেটারি নিজেরাই মাথা পেতে নিয়েছেন।

জেণ্টামাইসিন্ প্রথম থেকেই দেওয়া হয়েছে। অ্যামপুটেশনের পর যাতে নিউরাইটিস্ না হয় সে জন্যে বি-ওয়ান বি-সিক্স্ বি-টুয়েল্‌ভেব ইন্‌জেকশন নিউরোবিয়ান্ দেওয়া হচ্ছে। ডঃ জয়াকার বেভিডক্স্ দেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু ফুল-কর্নেল্ ডঃ সিং, যিনি অপারেশান করেছিলেন তিনি নিউরোবিয়ান্ই দিতে বলেছেন। পৃথু শুনেছে যে টেট্‌ভ্যাকও দেওয়া হয়েছিল।

এই সবের ও বোঝে না কিছুই। বুঝতে চায়ও না। ও শুধু একটু আকাশ আর ঐ অশথগাছটাতে রোদের ঝিলিমিলিই দেখতে চায়। আর ভাবতে চায়...

এরকম মারাত্মক শারীরিক দুর্ঘটনার পর অনেকেই মানসিক রোগের শিকার হন। সাইকোসোম্যাটিক্ ডিসঅর্ডারের ভয় থাকে। সিজোফ্রেনিয়ার বা ন্যুরোস্ফেনিয়ার।

কী হবে? এই জীবন, এই পরমুখাপেক্ষী, পরাশ্রিত জীবনটা রেখে লাভই বা কী? ইচ্ছে করে যে, পিস্তলটাকে বালিশের তলা থেকে বের করে নিয়ে বাঁদিকের জুল্‌পির একটু উপরে ঠেকিয়ে টেনে দেয় ট্রিগারটা। সিস্টার ঘরে না থাকলে, মাঝেমাঝেই পিস্তলটা হাতের মধ্যে নেয় ও। পিস্তলের বাটটা হাতের মুঠোয় ধরলেই, কুর্চির অদেখা ভরা-মুঠি স্তন ধরারই অনুভূতি হয় যেন। আশ্চর্য!

সিস্টার লাওয়াণ্ডে ইন্‌জেক্‌শন্ দেবার পর দু' রকমের ওষুধ দিয়ে আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, জানালার পর্দাটা কি সরিয়ে দেব?

নাঃ। থাক্।

ও বলল। সিস্টার আবারও ডুবে গেলেন তাঁর বইয়ে।

এই ওষুধটা কিসের, তা জানা নেই পৃথুর। তবে খেলে, ঘুম-ঘুমই পায়। একটানা প্রচণ্ড ব্যথাটা আর হঠাৎ-হঠাৎ চিড়বিড়ানি একটু কম মনে হয়। শরীরের ব্যথাটাই! কিছুক্ষণের জন্যে। মনের ব্যথাটা সারতে সময় লাগবে অনেক।

হাটচান্দ্রাতেই কি থাকবে পৃথু? চাকরিও কি আর করতে পারবে? এই ঘটনার আগে চাকরি তো ছেড়ে দেবে বলেই এসেছিল। অতখানি উঁচু-নিচু এলাকা জুড়ে কারখানার মধ্যে সব সময় ঘোরাঘুরির কাজ। এ তো চেয়ারে-বসা কাজ নয়। চাকরি, এখন আর ইচ্ছে করলেও হয়ত করতে পারবে না। করার ইচ্ছেও নেই।

কী করে জীপ চালাবে পৃথু? কোন্ পা দিয়ে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দেবে? লাফিয়ে নামবে কী করে জীপ থেকে? জঙ্গলে পাহাড়ে আব কি ?

না, না, এসব এখন না-ভাবাই ভাল।

আজ কী বার সিস্টার লাওয়াং?

রবিবার।

আজও রবিবার? এক মাসের উপর হয়ে গেল। জানুয়ারির শেষে প্রতি বছরই ঝড়বৃষ্টি হয়। পাতা ঝরে যায়। পাখি মরে পড়ে থাকে বিবর্ণ-হলুদ অথবা কমলা বা কালো ঠোঁট নিয়ে বনের গভীরের গাছতলায়। তাদের বন্ধ-চোখে কী এক গভীব অভিমান আঁকা থাকে। প্রতি বছরই লক্ষ্য করে পৃথু।

ঐ ঝড়বৃষ্টির পরই শীত কমতে থাকে। ক্রমশঃ।

আজও রবিবার!

চমকে উঠল পৃথু।

তার মানে, কুর্চি মান্দলাতে এসেছিল চার সপ্তাহ আগে। অজাইব্ সিংও অবাক করল। তারও অসাধ্য কোনো কাজ আছে বলে জানা ছিল না পৃথুর। সেও পারল না কুর্চির ঠিকানা নিয়ে আসতে! পৃথু এখন জানে মনে মনে, কুর্চি হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে চিরদিনেরই মতো।

মিস্‌ফরচুন্ নেভাব কামস্ অ্যালোন্।

আজ আপনাকে দেখতে আসবেন অনেকে। রবিবার তো!

সিস্টার লাওয়াং পৃথুকে বললেন। হাসিমুখে। বোধ হয়, ওকে চাঙ্গা করবার জন্যেই।

পৃথুর মুখে একচিল্‌তে হাসি ফুটে উঠল। বড় পাণ্ডুর, ম্লান, রক্তশূন্য সে হাসি। পৃথু তো আর দশ-পাউণ্ড ওজনের গাব্‌লু-গুব্‌লু ধবধবে ফর্সা প্রথম পুত্রসন্তান প্রসব-করা ভীষণ-খুশি মা হয়ে হাসপাতালে শুয়ে নেই যে, ভিজিটিং আওয়ার্সে শাশুড়ি, স্বামী বা নিজের মা এসে তাকে কন্‌গ্রাচুলেট করবে বা ভেলপুরি খাইয়ে যাবে লুকিয়ে লুকিয়ে! জিজ্ঞেস করবে, কানে কানে; তার বুকে অস্ট্রেলিয়ান গাইয়ের মতোই দুধেব বান ডেকেছে কিনা!

পৃথু ঘোষ, কিছুমাত্রই নিয়ে যেতে নয়; শুধু হারাতেই এসেছিল এই হাসপাতালে। সকলে জানছে, শুধু তার একটা পা-ই কাটা গেছে। পেটের ডানদিকে যে-গুলিটা মাংস খুব্‌লে নিয়ে বেরিয়ে গেছিল সেটাকে কেউ কোনো আমলই দিচ্ছে না। শুধু পা-টার জন্যেই সমবেদনা সকলেব। পা-টা যদি আজ থাকত তবে এই সমবেদনা জানাতে-আসা সবাইকেই ঐ পা দিয়েই লাথি মারত পৃথু। কিন্তু কাটা গেছে কি শুধু একটি পা-ই? তার সঙ্গে...

কিন্তু পা-টাই বা গেল কোথায়? আস্ত ডান পা-টা? অনেক বছরের সুখদুঃখের সঙ্গী। ফেলে দিল কি এরা ডাস্টবিনে? কাক-শকুনে ছিঁড়ে খেল কি? নাকি, পচেই গেল; মাটি হল মাটির তলায়?

আস্ত মানুষ মরে গেলে তাকে কবর দেয়, পোড়ায় আর আস্ত একটি পা মরে গেলে? কাকে জিগ্যেস করবে, জানে না। সিস্টারদের, ডাক্তারদের জিগ্যেস করলেই তাঁরা ভাবেন, পৃথু মানসিক রোগী হয়ে গেছে। তাঁদের মুখ দেখে অন্তত তাইই মনে হয়।

কিন্তু সেইটুকুই সব নয়। প্রকৃত ঘটনা এইই যে, ঐ একটি পায়ের সঙ্গে পৃথুর এতগুলো বছরের

জীবনটাও কাটা গেছে। জীবনধারণের সঙ্গী, চাওয়া-পাওয়ার স্বাদ, তার স্ত্রী, তার বন্ধুবান্ধব, তার কুর্চি সবই বৃন্তচ্যুত হয়ে গেছে এই দুর্দৈবে, তার কর্তিত পায়েরই সঙ্গে সঙ্গে। তাদের একজনেরও পাশে পৃথু আর দু'পায়ে ভর দিয়ে মাথা-উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। কোনদিনও।

রবিবার! আজ রুষা আসবে, মিলি ও টুসুকে নিয়ে। টুসুটা কোনো কথা বলে না। পৃথুর খাটের গা ঘেঁষে বসে থাকে উদাস চোখে চেয়ে। মাঝে মাঝে হাত বোলায় পৃথুর হাতে। কার ভালোবাসার প্রকাশ যে কেমন,তা ভালোবাসা প্রকাশের সময় না এলে বোঝা যায় না বোধ হয়। সে শিশুপুত্রর ভালবাসাই হোক কী প্রেমিকার ভালোবাসাই হোক। মানুষের মনের মত দুর্জ্ঞেয় কিছু নেই! টুসু পৃথুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে, ও বাবা! বাড়ি চলো। তাড়াতাড়ি! তারপর কানের মধ্যে মুখ দিয়ে বলে, বাবা। জানো, একটা লাল পাখি এসেছে কুয়োতলায়। সে পাখি, কেউই চেনে না। কী পাখি জানি না আমি। তাড়াতাড়ি চলো, চিনিয়ে দেবে তুমি। তাড়াতাড়ি চলো।

কেন যে এমন করে বলে টুসু, বোঝে না পৃথু। এই "তাড়াতাড়ি চলো" কথাটা ওকে ভীষণই ভয় পাইয়ে দেয় মাঝে মাঝে। দেরি হলে, এখানে বেশিদিন শুয়ে থাকলে; পৃথুর সাংঘাতিক কোনো বিপদ ঘটবে হয়তো এমনই আভাস যেন প্রচ্ছন্ন থাকে এই তাগিদের মধ্যে। রাতের রেলগাড়ি, যেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে, পৃথুকে ফেলে; দুলতে দুলতে অন্ধকারের মধ্যে। গাড়িভরা ঘুম, কামরা নিঝুম!

বড় ভয় হয় পৃথুর। ভয়ে কেঁপে ওঠে।

রুষা একদৃষ্টে পৃথুর দু'চোখের দিকে চেয়ে থাকে। চোখ সরায় না, চোখ থেকে। কী যেন খোঁজে পৃথুর দু'চোখে। কী খোঁজে? তা, রুষাই জানে।

মিলিই শুধু কিছু বলে না। ফিট্‌ফাট সেজে, হাতে একটা ইংরিজি বই নিয়ে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকেই একবার হাসে। বলে, হাই বাবা!

আবার যাওয়ার সময় হাসে বলে, বাইই! বাবা!

রুষার রূপের খ্যাতি পুরো হাসপাতালেই ছড়িয়ে গেছে। রুষাকে একটু দেখবার জন্যে করিডরে, ঘরের সামনে, পার্কিং লট্-এ, এমনকি ঘরেও ইয়াং হ্যাণ্ডসাম্ আর্মি অফিসার, পুরুষ ও নারী ডাক্তার ও নার্সদেরও ভিড় লেগে যায়। কোনো মেয়েই বোধ হয় নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, তার চেয়েও সুন্দরী কেউ আছে! অসীম কৌতূহল তাদের এই বাউণ্ডুলে, ঘরের খেয়ে, বনের মোষ তাড়ানো, ডাকাতদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জীবনের মতো ল্যাংড়া হয়ে যাওয়া মানুষটার এমন মাণ্ডুর রূপমতীর মতো সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি। এমন মেয়ের সঙ্গেও এমন লোকের বিয়ে হয়? বিশ্বাস করতেই চায় না যেন কেউ।

ওরা যখন ভিড় করে আসে তখন রুষার মুখে এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি দেখতে পায় পৃথু। ওর সৌন্দর্য, তখন যেন আরো দেদীপ্যমান হয় হাওয়া পাওয়া আগুনের মতো আরো সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

বেশ লাগে পৃথুর তখন, রুষাকে দেখে। নামকরা চিত্রতারকা বা গায়ক বা যশস্বী কবি-সাহিত্যিকেরই মতো অনেকখানি বাড়তি গাম্ভীর্যও এসে জমা হয় তখন রুষার দু'চোখে। বেচারী ইদুরকার! রুষা যদি তার নিজের স্ত্রী না হত তবে পৃথুও আবার প্রেমে পড়ত এই রুষার। হেড ওভার হিলস্। ইদুরকার যেমন পড়েছে।

কটা বেজেছে কে জানে! ঘুমিয়েই পড়েছিল পৃথু। মাঝে মাঝে এরকম হয়। কখন জেগে থাকে, কখন ঘুমোয় নিজেই বুঝতে পারে না। খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন সবে ফেড-ইন করছিল মস্তিষ্কে, খুব আস্তে আস্তে, ঠিক এমনই সময় মিলি স্পষ্ট উচ্চারণে দরজা থেকে বলল, হাই! বাবা!

তাকিয়ে দেখল, রুষা, ভিনোদ ইদুরকার, মিলি ও টুসু চলে এসেছে ঘরের মধ্যে। সিস্টার পাশে দাঁড়িয়ে।

ভিজিটিং আওয়ার্সের আগে সিস্টারেরা ওকে ওডিকোলন্ মাখিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন। পাউডারও মাখাতে চান। পৃথু হাসে, মানা করে। দশ-পাউণ্ডের মাথা-ভরা কোঁকড়া চুলের

গাবলু-গুবলু ফর্সা বাচ্চা প্রসব করলেও না হয় কথা ছিল : অঙ্গহরণের কারণে এত রঙ্গ ওর পছন্দ নয়।

কেমন আছো ? পৃথুদা ?

ভিনোদ বলল। তার হাস্কি, সেক্সী গলায়।

বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু ভিনোদকে। অর্থের প্রাচুর্যরও একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। আগেও লক্ষ্য করেছে পৃথু ! সেই সৌন্দর্য, রূপ বা গুণ কিছুই হয়তো দিতে পারে না। তবু জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসেরই আলাদা, সুচিহ্নিত ভূমিকা হয়ত আছে ; দাম আছে। এসব কথা আগে বোধ হয় ঠিক এমন করে বুঝত না।

পৃথু একটু হাসল। কথা বলল না। কী বলবে ? কথা বেশি বললে ভিজিটিং আওয়ার্সের পর বড় ক্লান্তও লাগে।

ভিনোদ বলল, দুর্বল লাগছে ?

পৃথু আবারও হাসল। ফিকে হাসি।

মনে মনে বলল, ভিনোদ ইদুরকাব. তোমার যেটা বল, আজ আমার সেটাই দুর্বলতা। আমার দুর্বলতাই তোমাব বল।

রুষা, ইদুরকারকে পাত্তা না দিয়ে চেয়ার টেনে এনে কাছে বসল। তাবপর ভিনোদের দিকে একবাব অপাঙ্গে চেয়ে বলল, ভিনোদ, প্লীজ লীভ আস্ অ্যালোন্। মীট অ্যাট ফাইভ, অ্যাট্ দ্যা পার্কিং লট্।

ভিনোদ চলে গেলে, ব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করল রুষা। বলল, তোমার চিঠি। অনেকেই চিঠি আসছে প্রতিদিন, চেনা অচেনা বহু লোকের কাছ থেকে। সেগুলো খুলে আমি আর মিলি থ্যাঙ্কস্ দিয়ে উত্তব দিয়ে দিচ্ছি ! বলছি যে, তুমি ভাল হয়ে উঠলে এবং সময় পেলে নিজেই উত্তর দেবে। শুধু এই চিঠিটি…

পৃথু খামটি হাতে নিল। হাতেব লেখা দেখেই চিনল। কুর্চির। রুষাও নিশ্চয়ই চিনেছিল। নইলে, এই চিঠিটিই শুধু না-খুলে নিয়ে আসবে কেন ?

স্থিব দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল রুষা পৃথুর চোখে। পৃথুও স্থির দৃষ্টিতে চাইল রুষার চোখে। বলতে চাইল, চোখ দিয়ে ; অনুদাব, ঈর্ষাকাতর নারী ! কুর্চি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। অ্যাজ লাক উড হ্যাভ ইট অব অ্যাজ য়্যু উড হ্যাভ ওয়ান্টেড ইট্…। শী ইজ লস্ট ফর এভার। গান্ ফব এভাব। পৃথুব পক্ষে এখন কুর্চিকে খুঁজে বের কবা, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনেরই সমান। কোয়াইট্ লিটার্বেলি !

কোথায় আছে ওরা এখন ?

রুষা পৃথুর চোখে চোখ রেখে বলল।

পৃথু বালিশের দু'দিকে মাথা নাড়ল। জানে না। জানে না।

বলতে ভীষণ কষ্ট হল কথাটা। সত্যিই জানে না।

ওবা রাইনাতে নেই। কুর্চিকে আনতে গাড়ি পাঠিয়েছিলাম চিঠি দিয়ে। যদি তোমাকে দেখতে আসতে চাইত তো সঙ্গে নিয়ে আসতাম।

রুষা বলল।

কী হল ?

"কী হল" প্রশ্নটার কাণ্ডর দুটি শাখা ছিল। একটা, কুর্চির কী হল। অন্যটা ; রুষার কী হল। কী কাণ্ড !

ওরা ওখানে নেই। ভাঁটুর নাকি স্মাগ্‌লিংয়েব জন্যে জেল হয়েছে। কুর্চি কোথায় তা কেউই জানে না।

খামটা রুষাকেই দিয়ে পৃথু বলল, ঠিকানা দেয়নি ? খুলে দ্যাখো তো।

খামের উপরে তো নেই। থাকলে, ভিতরেই থাকবে। খুলে দ্যাখো।

রুষা বলল।

ঠিকানা যে নেই, তা জানত পৃথু। তবু রুষাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে ওর সামনেই খুলল খামটা। মধ্যে থেকে প্রসাদী ফুল ঝরে পড়ল। জবা ফুল। শুকিয়ে, কালো হয়ে গেছে।

রুষা নাক কুঁচ্‌কোল। বলল, তোমার মতো অ্যাগনস্টিক্ মানুষের এমন কালী-ভক্ত অ্যাডমায়ারার ? আনথিংকেবল্।

পৃথু বলল, ওরা যে হিন্দু ! এখনও কিছু হিন্দু আছে দেশে, যারা হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না। প্রাচীনপন্থী তো ওরা। সবাইই কি আমাদেব মত আধুনিক হতে পারে ? তবে, শুধুমাত্র ধর্ম না মানলেই, ভগবানকে অস্বীকার করলেই, বাবার শ্রাদ্ধ অথবা ছেলের পৈতে না দিলেই তো আর মানুষ আধুনিক হয়ে যায় না ! তেমন আবার উল্টোটাও সত্যি। আধুনিকতা, একটা মানসিক স্তর। গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের গোঁড়ামিরই মতো, অনেক তথাকথিত আধুনিকদের আধুনিকতাটাও এক ধরনের উৎকট অন্ধতা থেকেই জন্মায়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক। ঠিকানাটা কি আছে ?

চিঠিটির প্রথমে এবং শেষে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল রুষা, পৃথুকে নিশ্চিন্ত করে যে ; অত দ্রুত চোখ বুলোলে একটি অক্ষরও পড়া যায় না।

তবে, তাতে কীইই বা আসে যায় ! ভাবল পৃথু। চিঠিটির মধ্যে যে ভালবাসা আছে তা না—বোঝার মতো বোকা রুষা নয়। ভালোবাসা, কখনই টায়-টায় হয় না। আখের থেকে উপ্‌চে যায় : গড়িয়ে পড়েই।

তুমি কি উত্তর দিতে পারবে ? না, আমিই ধন্যবাদ দিয়ে···

আমি তো এখনও উঠে বসতেই পারি না। পায়ের জন্যে তো বটেই ; পেটের জন্যেও। তাছাড়া লিখব কোথায় ? ঠিকানা ? ঠিকানাই তো নেই।

কোনোদিনও কি ছিল ?

রুষা তির্যক চোখে পৃথুর চোখে চেয়ে বলল, বিদ্রূপের সঙ্গে। কিছু মানুষ থাকে পৃথিবীতে, তারা চিরদিনের রেফ্যুজী। এক গাছ-তলা থেকে অন্য গাছ-তলায় তাদের দৌড়। ঠিকানা, তাদের কোনোদিনও ছিল না।

মিসেস্ লাওয়াণ্ডে বাংলা বোঝেন না কিন্তু রুষা এলেই এটুকু বুঝতে পারেন যে, রুষার সঙ্গে পৃথুর সম্পর্কটা অন্য দশজন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো নয়।

এই যে। কেমন আছেন ?

বলেই, মণি চাকলাদার ঢুকলেন ঘরে। একমুখ হাসি এবং আলখাল্লার মতো একটি জামা পরে।

পৃথু স্মিত হাসি নিয়ে তাকাল মণি চাকলাদারের দিকে। মনে মনে খুবই বিরক্ত হল। রবিবারে রুষা ও ছেলেমেয়েরা আসে বলে ভুচু এবং অন্য কেউই আসে না। এই ভদ্রলোক, এই খবরটা ইচ্ছে করলেই নিতে পারতেন আসার আগে। যদি চাইতেন।

পৃথুর উত্তর না পেয়ে উনি আবারও বললেন, দেখুন। একেই বলে প্রভিডেন্স্। গগন দাশ একটি নাটক লিখে ফেলেছেন আগামী পঁচিশে বৈশাখে অভিনয় করার জন্যে। আমাদের পত্রিকার তরফ থেকেই অভিনয় হবে।

নাটকের সঙ্গে প্রভিডেন্সের কী সম্পর্ক ?

অবাক হয়ে রুষা শুধোল।

বলেন কী ? নেই ? নিশ্চয়ই আছে। ওতে একটি বাউলের চরিত্র আছে, যাব একটি পা নেই। খোঁড়া বাউল। আপনাকে দারুণ মানাবে। গানও গাইতে পারেন, পাও নেই···হিঃ হিঃ । জমে যাবে।

রুষার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। একবার তাকাল মণি চাক্‌লাদারের চোখে। একটু ইতস্তত করে বলল, মিঃ চাকলাদার, সপ্তাহে তো একদিনই আসি, অনেক দূর থেকে এই রবিবারেই···

রুষার কথা শেষ হবার আগেই মণি চাকলাদার বললেন, আমারও তো সেইই ডিফিকাল্টি।

রবিবার বলেই এলাম। আমি কিন্তু আপনাব সঙ্গেই ফিরব। দেখলুম, নিচে ইদুরকাব সাহেবের মার্সিডিজ্ দাঁড়িয়ে আছে।

রুষা ক্ষমা প্রার্থনার চোখে পৃথুর দিকে তাকাল। এই মানুষটির নিজের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই। এবং সেইটাই তার চার পাশের মানুষকে প্রায়ই নিদারুণ সংশয়ে এবং সঙ্কটেও ফেলে। যাঁদের ইন্‌টেলেক্ট ছাড়া আর সব কিছুই থাকে ; মণি চাকলাদার হচ্ছেন সেই বিশেষ জাতের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। হাটচান্দ্রাতে এই ধবনের ইন্‌টেলেকচুযালদেবই খুব রব্‌রবা এখন। ডাকু মগনলালদেব তবুও বোঝানো যায়, পিস্তলের নল দেখিয়ে হলেও, কিন্তু মণি চাকলাদাবেব মতো বুড়ো-খোকাদের দৌরাত্ম্য বন্ধ কবার একমাত্র উপায় হল ওঁর পেছনে কোনো পাগলা শেয়াল লেলিয়ে দেওয়া। কিন্তু অর্ডারি এবং ঠিক এই ধরনের ইনটেকচুয়ালদেব সম্বন্ধে আগ্রহ আছে অথচ সে পাগ্‌লাও, এমন রাজযোটক—যোগসম্পন্ন—শেয়াল চট্ করে পাওয়াও যে মুশকিল!

একটা কবিতা লিখেছিলাম। শুনবেন না কি মিঃ ঘোষ ?

পৃথু চুপ করে রইল। তাবাপদ রায়ের একটি কবিতা মনে পড়ে গেল ওব।

"কপালের চুল ছিঁড়ে, দাঁত দিয়ে মাটি কামড়ে ধবে/ কবিতা লেখাব কোনো মানে হয না/কবিতা তো ডাক্তারের স্টেথিস্কোপ নয়/ নয় উদ্বাস্তুর ভিটে বাড়ি/ জেলেব হাতেব জাল, কিংবা নয় চাষার লাঙল/"

ইদুরকার রুষাদের ঘবে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছিল। ছেলেটা ম্যানার্স জানে। দোষের মধ্যে···। না, না, তাকে দোষই বা বলে কী করে ? তার স্ত্রীকে ইদুর যে ভালবাসে সে তো···। ভালবাসা তো দোষের নয়। অন্তত পৃথুর চোখে নয়। কখনই নয়।

টুসু, পৃথুর হাতের উপর হাত রেখে কানে কানে আবার বলল, বাবা! আঙ্কল্ খাণ্ডেলওয়ালের বাড়ির সাদা অ্যালসেসিয়ানটার বিয়ে হয়ে গেছে। জানো ?

সত্যি ?

হ্যাঁ।

তোমাকে কে বলল ?

মা।

কী ?

রুষা শুধোল।

পৃথু বলল, টুসুর কথা।

রুষা হাসল। বলল, হ্যাঁ।

কেমন দেখতে হল বউ ?

ভাল। তবে ওর মতো ধব্‌ধবে ফর্সা নয়। মেটে রঙের। লাজুক লাজুক।

টুসু বলল।

তাইই··· ?

হাসতে হাসতে পৃথু বলল।

বাবা! রাতমোহানার কাছে, নদীতে না, "নাক্‌টা" হাঁস পড়েছে। গার্গনি, পিন্-টেইলস্, রেড-হেডেড পোচার্ড্। চখাচখিতে নাকি নদীর বালি ঢেকে গেছে সোনালি রঙে।

বাঃ। তাইই··· ?

কে বলল রে এতসব তোকে ?

আমি একদিন নিজেই গিয়ে দেখে এসেছি। ঠুঠা দাদার কথা শুনে।

অত দূরে ? একা একা ?

রুষাও উদ্বিগ্ন গলায় বলল, সে কি! কবে ?

অজাইব্ সিং দাদা নিয়ে গেছিল।

তাও তো অনেকখানিই হাঁটতে হয় গাড়ি ছাড়ার পরও।

তাতে কী ?

না, না। জায়গাটা ভীষণই নির্জন। একা একা আর যেও না। আমি ভাল হই, তখন আমি নিয়ে যাব।

তুমি…বাবা! তুমি…

টুসুর গলায় অবিশ্বাসের স্বর, ফুটে উঠল।

কী একটা বলতে গিয়েও, হঠাৎ থেমে গেল টুসু।

পৃথুর গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল হঠাৎ। পৃথু যে এ জীবনে আর কখনও উঁচু-নিচু পায়ে-চলা পথ ভেঙে দু' মাইল চলে রাতমোহানাতে যেতে পারবে না। এ জীবনে, আর না…

রুষা মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে মুখ তুলল।

মণি চাকলদার উঠে বললেন, টুসুকে, হ্যাঁ এবার থেকে তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে তোমার বাবাকে, তোমার বাবা আর…

তারপরই বললেন, আমি তাহলে তোমাদের ঐ মার্সিডিজ গাড়ির কাছে গিয়েই দাঁড়াচ্ছি। লোকে ভাববে, গাড়িটা আমার।

হিঃ হিঃ!

রুষা উঠে দাঁড়াল। ওর হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে একটি বই বের করে বলল, পড়েছ ?

কী ? কার ? কবিতা ?

না। আইগর আকিমুশকিন-এর লেখা। রাশ্যান ভদ্রলোক। বইটার নাম 'অ্যানিম্যাল ট্রাভেলার্স'। তোমার ভাল লাগবে। প্রথমে একটি লেখাই পড়ো। তারপর ভাল লাগলে অন্যগুলো…

কোন লেখাটা ?

"লাইফ্ রিটার্নস টু ক্র্যাকাটাও"।

ক্রেকাটাও ? সেটা কি জিনিস ? মানুষের নাম ?

পড়োই না। পরের রবিবার এসে জিগ্যেস করব কেমন লাগল। আর…। আর চেষ্টা করব আমি, ঠিকানা যোগাড় করবার। কুর্চির।

টুসু বলল, বাবা, তুমি ভাল হয়ে আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দেবে ? টেলিফোটো লেন্সসুদ্ধু ? হাঁসেদের ছবি তুলব আমি। জঙ্গলের ছবি তুলব। আমি ওয়াইল্ড-লাইফ্ ফোটোগ্রাফার হব বাবা।

হওয়াচ্ছি! বলল, রুষা।

পৃথু হাসল। বলল, করবে কী বলো ? ইট্ রানস্ ইন্ হিজ ব্লাড।

সে আমি বুঝব এত বড় বড় নদীতে ড্যাম বসানো যাচ্ছে আর সামান্য রক্তস্রোত ডাইভার্ট করতে পারব না ? ওসব বাজে চিন্তা একদম ছাড়ো টুসু। কখনও মনেও এনো না। তোমার ম্যানেজমেণ্ট অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট হতে হবে। এম বি এ। নইলে, নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। ওয়াইল্ড-লাইফ ফোটোগ্রাফার! কী অ্যাম্বিশান!

ওরা সকলেই ঘরের বাইরে চলে গেল। সিস্টারও গেলেন। ঘর ফাঁকা হতেই রুষা পৃথুর কপালে আর গালে চুম-ম্-ম্-ম্-ম্ আওয়াজ করে চুমু খেল দুটো। মিছিমিছি চোখমুখ বিকৃত করে বলল ঈঃ দাড়ি! খোঁচা-খোঁচা! লাগে!

পৃথু হেসে বলল, এবারে দাড়ি রেখেই দেব ভাবছি। পায়ের পরিচর্যাতে যা সময় যাবে, তাতে আর দাড়ি কামানোর মতো বিলাসিতার সময় থাকবে না।

রুষা শাড়ি ঠিকঠাক করে নিল। বাইরে অনেকে ওকে দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কুর্চির ঠিকানার জন্যে তুমি এত উদগ্রীব হয়ে উঠলে কেন ? হঠাৎ ?

রুষা বলল, কে বলতে পারে ? তুমি কুর্চির উপর এবং কুর্চিও তোমার উপর ভবিষ্যতে হয়ত অনেকই বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারো ও পারে। ভবিষ্যতের কথা অবশ্য ভবিষ্যৎই জানে। তবে, জানাশোনা কোনো মানুষকেই হারিয়ে যেতে দিতে নেই। কে কখন কোন্ কাজে লেগে যায়,

কে বলতে পারে ?

বোকার মতো তাকিয়ে থাকল পৃথু রুষার চোখে। প্রায়ান্ধকারে, বাহুবেষ্টনীর মধ্যে তার নিরাবরণা স্ত্রীকে পৃথু বুঝতে পেরেছে চিরদিনই। কিন্তু রুষার এই সত্তাকে বোঝার ক্ষমতা কোনোদিনই তার ছিল না। শরীরকে তাও বোঝা যায়। মেয়েদের মন বোঝা ভারী মুশকিল।

রুষা দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, ভাল থেকো। খুশি থেকো। সব সময় পা একটা হারিয়েছে বলে কখনই ভেবো না যে, কিছুমাত্র ও হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। একটু থেমে বলল, হারায় যে নি ; তা আমি প্রমাণ করে দেব। দেখো।

দুষ্টুমির হাসি, ঝিলিক মেরে গেল রুষার চোখে।

এই রুষাকেও বুঝল না ও।

পৃথু ডাকল ওকে। বলল, এ সপ্তাহে ভুচু আসবে একদিন। ওর সঙ্গে একটা বই পাঠিয়ে দেবে ? অজাইব্ সিংকে দিলে, ওই পৌঁছে দেবে ভুচুকে।

কী বই ? লীভস অব গ্রাস।

দ্যাটস্ গুড। হুইটম্যান জীবনকে ভালবাসতে জানতেন। পাঠিয়ে দেব। চলি। ভাল থেকো।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হলে, রুষার দিয়ে-যাওয়া কুর্চির চিঠিটা তুলে নিল পৃথু। এতক্ষণ দমবন্ধ উৎকণ্ঠাতে ছিল ও।

পৃথুদা,

রবিবার মান্দলাতে এসেছিলাম।। সেদিনই রাতে আমি যেখানে থাকি, সেখানে ফিরে গেছিলাম। পরদিন সকালের কাগজ খুলেই সব জানলাম। আমি জানি না, আপনি এখন কেমন আছেন ? এ চিঠি আপনার হাটচান্দ্রার অফিসের ঠিকানাতেই দিলাম। পাবেন কী না তাও জানি না।

আপনারা কোনোদিনও একটা কথা বোঝেননি। কার কাছে এবং কোথায় আপনাদের দাম সবচেয়ে বেশি, তা বোঝেননি বলেই, পাগলের মতো খবরের কাগজের খবর হতে চান। কে মনে রাখে, কী ছাপা হল না হল ; খবরের কাগজে ? খবরের কাগজ, পৃথিবীর কোনো খবরের কাগজই কাউকে স্থায়ী আসন দিতে পারে না অন্য কারো মনে। ডাকু মগনলালের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে, নিজের পা খুইয়ে, যে পৃথু ঘোষ সমস্ত দেশের মানুষের আজ শ্রদ্ধার পাত্র হলেন ; তাকেই সকলে এক মাসের মধ্যেই ভুলে যাবে। কাগজের ডাঁই নিয়ে গিয়ে ঠোঙ্গাওয়ালা ঠোঙ্গা বানিয়ে মোমফুলি বিক্রী করবে।

মানুষ মরে গেলেও তাকে বারো ঘণ্টার বেশি মনে রাখে না কেউই , তার অত্যন্ত নিকটতম মানুষরা ছাড়া। তাই নিজের ছোট বৃত্তের বাইরে কে আপনাকে মালা পরাল আর কে হাততালি দিল তাতে কীই বা যায় আসে ? এত বোঝেন আর এটুকু বুঝলেন না ? হীরো বনতে গেলেন !

যার সঙ্গে সামাজিক নিয়মে বিয়ে হল আমার সেই চোরাচালানি, নিজেই নাকি চালান যাবে জেল থেকে জেলে। গতকাল তাকে দেখে এলাম। এ কদিনেই তার যা চেহারা হয়েছে দেখলাম, অত বছর অবধি সে আদৌ বাঁচবে বলে মনেও হয় না ! সে ছাড়া, আর একজন যে ছিল আমার, যার আসন ছিল অনেকই উঁচুতে, সেও মহৎ কাজ করতে গিয়ে পা হারিয়ে বসল। যত কিছু খারাপ কি আমারই ভাগ্যে লেখা ছিল ?

এখন কী আমি করি ? কার ভরসাতে বাঁচি ? কার জন্যে ?

মনে মনে একথা ভেবে পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম এ কদিন যে, আমি ঠিকানা দিই আর নাইই দিই আপনি আমাকে ঠিকই খুঁজে বার করবেন। করলেনই বা একটু কষ্ট আমার জন্যে ! নাইই যদি বা পারতেন খুঁজে বার করতে,তবে বুঝতাম আপনার ভালবাসা মিথ্যা। মিছিমিছি সব বলতেন, বানিয়ে বানিয়েই। মিথ্যে ভালবাসার চিঠি লিখতেন এত। অথচ, এখন যা কাণ্ডটা বাধালেন তাতে আমারই আসতে হবে আপনার কাছে, ঠিকানা খুঁজে। কিন্তু অনেকই দূরে থাকি যে ! মন থেকে তো দূরেই, পথ থেকেও দূরে। ভাল যে আছেন, এইটাই বড় কথা। জানি না, পারব কিনা আপনাকে দেখতে আসতে। সহায় সম্বলহীন নারীর অসুবিধা অনেকই। নারীরা—একজন নারী, দেশের প্রধানমন্ত্রী

হওয়া সত্ত্বেও এখনও এদেশে একজন পুরুষের অভাবে সত্যিই অসহায়। এটাই ঘটনা। ভাবলেও লজ্জা হয়।

আপনার খোঁজ আমি যাতে পাই সে বন্দোবস্ত করেছি। আরও মাস তিনেক থাকবেন শুনেছি হাসপাতালেই। কতদিন দেখিনি আপনাকে! যদিও এমন অবস্থায় দেখতে চাইনি কখনও। যত তাড়াতাড়ি পারি যাব। তবে আমি সশরীরে গিয়ে আপনার এই শারীরিক অবস্থায় মানসিক সংকট ঘটাতে চাই না। রুষা বৌদি কি হাসপাতালেই আছেন? না জবলপুরের অন্য কোথাও?

ভগবানের উপর বিশ্বাস বাখবেন। যা কিছুই ঘটে, তার পেছনে এক গভীর উদ্দেশ্য থাকে। সবই প্রি-ডেস্টিনড্। এখানে জাগ্রত কালী আছেন জঙ্গলের ভিতরে। এখনও রাতে শিবাভোগ হয়। সেই মন্দিরে, শনিবার রাতে গিয়ে আপনার জন্যে পুজো দিয়ে এসেছি।

আপনার মতো একজন মানুষ কি শুধু তাঁর ডান পাখানির ভরসাতেই বেঁচেছিলেন এতদিন? একজন মানুষ,তিনি যদি মানুষের মতো মানুষ হন; তাঁর শরীরের অপূর্ণতা নিয়ে কখনোই শোকাবিষ্ট হতে পারেন না। হওয়া উচিত নয়। শারীরিক পবিচয় তো জানোয়ারের, মানুষের পরিচয় তো তার মস্তিষ্কের উর্বরতায়; তার হৃদয়ের ঔদার্যে! আমার পৃথুদা কি এমনই সস্তা একজন মানুষ যে, ডাকু মগনলালের পিস্তলেব গুলিতে ছিন্ন-হয়ে-যাওয়া একটি পা তাকে মানুষ হিসেবে বিচলিত বা পরিবর্তিত করে দেবে?

কক্ষনো না। তাইই যদি হবে, তবে কোথায় থাকবে আমার ভালবাসার গর্ব? আমি কি যাকে-তাকে ভালবাসতে পারি? ভাল তো বাসে সবাইই, সব মানুষই। কুকুর বেড়ালও তো মানুষের ভালবাসা পায়। যার নজর যত উঁচু, তার ভালবাসার জন ততই কম। তার ভালবাসায় ততই কষ্ট। সারা জীবনে একজনই মেলে, কী মেলে না। যখন খুঁজে পেয়েইছি, বাকি জীবনে তাকে হারাতে চাই না কোনোমতেই।

রুষা বৌদি আমার চেয়ে অনেক বিদুষী, অনেকই গভীরতা তাঁর। এই সময়ে তাঁকেই অবলম্বন কবতে হবে আপনাকে। তিনি সব জোর নিশ্চয়ই দেবেনও আপনাকে। সুখী যদি থাকেন, তাহলেই আমি সুখী। আমি তো আপনার সুখের বন্ধু নই; দুখের বন্ধু।

আমি তো আছিই।

এরপর যখন দেখা হবে নিভৃতে, অলস বেলায়, বিরক্ত করার কেউ থাকবে না আমাদের; থাকবে না দূরাগত ভাঁটুর মোটর সাইকেলের বেরসিক ভট্‌ভট্ শব্দ, তখন অনেক গান শোনাব আপনাকে। যাইই চান না কেন আমার কাছ থেকে, তাইই দেব। কিছুই অদেয় থাকবে না আপনাকে। এই আশায় অন্তত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন পৃথুদা। আপনাকে ঋজু গাছের মতোই অবলম্বন করে আমার মতো আরও কোনো স্বর্ণলতা বেঁচে আছে কী নেই তার খবর আপনিই জানবেন। অন্যদের কথা আমি জানি না। এক পায়েই আপনি আমার কাছে ঋজুতার সংজ্ঞা হবেন। আমি আধার হব; আপনি আধেয়।

মনে থাকে যেন।

ইতি—আপনার কুর্চি।

মনে মনে, হাসপাতালের খাটে শুয়ে কত অভিমান, অনুযোগ করেছে কুর্চির উপরে এবং বিরুদ্ধে। চিঠিটি লিখেছে কুর্চি সাত তারিখে, এই মাসের। ও পেল এতদিন পরে। অফিসের ঠিকানায় লিখেছিল। এই ঔদাসীন্য কার? না, নিষ্ঠুরতা? শর্মার না রুষার? এতদিন বাদে হাতে এল?

চিঠিটি পড়ে শরীরের মধ্যে বড় অস্বস্তি জাগল পৃথুর। মনের মধ্যেও। আজকের রুষার ব্যবহার আর কুর্চির এই চিঠি মাথার মধ্যে বড় পরস্পরবিরোধী ভাবনার ঝড় তুলল। চিঠিটা খামের মধ্যে পুরে বালিশের নিচে রাখল।

সিস্টার লাওয়াণ্ডে বললেন, কার চিঠি মিঃ ঘোষ। য়্যু লুক ভেরি চিয়ারফুল!

ডু আই?

বলেই, লজ্জামিশ্রিত খুশিতে হেসে ফেলল পৃথু।

হুজ্ ওজ্ ইট ?

সিস্টার আবারও শুধোলেন।

অন্যদিন, অন্য সময় হলে, পৃথু হয়তো বিরক্ত হত। কিন্তু আজ হল না। বলল, আ ফ্রেণ্ড অফ মাইন্। বাট্ আ ম্যাডক্যাপ। পাগলী একটা।

সিস্টার ইন্জেক্শানের ছুঁচটা ওর ডান বাহুতে ঢুকিয়ে দিতে দিতে হেসে বললেন, দ্যাট সাউণ্ডস্ ভেরি সুইট।

হোয়াট ?

অবাক হয়ে। পৃথু বলল।

উনি হাসতে হাসতে বললেন, যদি কেউ কাউকে গভীরভাবে ভালবাসে তবে প্রথম জনের চোখে ভালবাসার জন সব সময়ই পাগল। দিস ইজ্ ট্রু ইন কেস্ অফ বোথ্ দ্যা সেক্সেস্।

বলেই বললেন, হোয়াটস্ হিজ নেম ?

পৃথু ভাবল, মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু কুর্চি যদি দেখতে আসে তখন এই কল্পিত নামের একজন নারী আবার বাড়তি ঝামেলার কারণ হবে। একজনকে নিয়েই হিম্সিম্। একটুখন চুপ করে থেকে, বলেই ফেলল নামটা। আ লেডী !

তাছাড়া, কুর্চি নামটা উচ্চাবণ করলেও সিরসির করে ওঠে ওর সারা শরীর।

কুর্চি ?

বলেই, থেমে গেলেন সিসটার লাওয়াণ্ডে। ওঁর মনে পড়ে গেল সিসটার জনসন্ ওঁকে বলেছিলেন যে, অপারেশানের পর জ্ঞান আসার সময় পৃথু শুধু এই নামটিই বারবার চিৎকার করে বলেছিল। ঈসস্। বেচারী মিসেস্ ঘোষ। কী সুন্দরী ; কী অ্যাকমপ্লিশড্ মহিলা ! ফুলের মতো ছেলেমেয়ে দুটি। কী যে হল দিনকাল ! পুরুষ মানুষগুলো ভীষণই আন্‌ডিপেণ্ডেবল্, আন্‌ফেইথফুল হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

পৃথু বলল, আপনি যেন বলবেন কিছু আমাকে ? নামটি শুনে যেন চমকে গেলেন আপনি ?

নাঃ। কী বলব।

সিসটার গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বললেন, ফিমেল ওয়ার্ডের একজন আয়া আছে, তারও নাম কুর্চি। প্রথমে একটু চমকে গেছিলাম সেই জন্যেই। আর কিছু না।

পৃথু বুঝল, কোনো কারণে সিসটার অপ্রসন্ন। কারণটা, আন্দাজও কবতে পারল। তবু বলল, কুর্চি একটি ফুলের নাম। সুন্দর একটি ফুলের নাম।

তাবপরই বলল, সেই আয়াটি দেখতে কেমন ?

সিসটার বললেন, সেও অন্য দশজন আয়াদেরই মতো। আমি যেমন, অন্য সিসটারদের মতো।

বলেই, ওঁর চেয়ারে চলে গেলেন।

মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথুর, কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, অথবা ঠাণ্ডা ব্যবহার করলে যে মরে গেলেই ছিল ভাল। ডাকু মগনলাল তাকে প্রাণে না মেরে একেবারেই মেরে গেল।

টেড হিউজ-এর কবিতাটি আবারও মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। জ্ঞান ফেরার পর থেকে এই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে মন খারাপ লাগলেই কবিতাটি উষর গ্রীষ্মবনের জ্বালার মধ্যে যেমন রঙধরানো শিমুল তেমন করেই জ্বালা বাড়িয়ে দিচ্ছে। নাকি প্রশমিত করছে ?

"লাইফ ইজ ট্রাইং টু বী লাইফ।"
ডেথ ওলসো ইজ ট্রাইং টু বী লাইফ।
লাইক দ্যা শাউট্ ইন জয়
লাইফ দ্যা গ্লেয়ার ইন দ্যা লাইট্নিং
দ্যাট এম্পটিজ দ্যা লোন্‌লী ওক্।
এণ্ড দ্যাট্ ইজ ডেথ

ইন দ্যা অ্যান্ট্‌লারস্ অফ দি আইরিশ এল্ক্/ইট্ ইজ দ্যা ডেথ্ ইন্ দ্যা কেভ-ওয়াইফস্ নীডল্ অফ বোন্ ।

ইয়েট্ ইট্ স্টিল্ ইজ্ নট্ ডেথ—

ডাকু মগনলাল । তুমি মরে গিয়ে বেঁচে গেছ । অঙ্গহীন হয়ে বাঁচতে হবে না তোমাকে । তবে তুমি বেঁচে থাকলে সুখেই থাকতে অধিকাংশ মানুষের মতো; ভিনোদ ইঁদুরকারের মতো। সুখে থাকতে এই জন্যেই যে, অধিকাংশ মানুষেরই মতো কবিতা-টবিতার ধাবে-কাছেও তোমার যাতায়াত ছিলো না । সুস্থ থাকলেও, কবিতাকে যেসব মানুষ ভালোবেসেছে ; তাদের বড়ই কষ্ট ।

বড় কষ্ট ।



লাঞ্চে আজকে পাতলা করে মাছের ঝোল আর ভাত দিয়েছিল । সঙ্গে ডাল এবং আলু-টমেটোর তরকাবি একটা ।

কিছু খেতে ইচ্ছে করে না । তবু খেতে হয় । হাসপাতালের রান্না তো !

আসলে দোষটা রান্নার নয় । হাসপাতালে যে-মানুষ আসে, তার সুস্থ মানুষের মানসিকতাই থাকে না । কোনো কিছুই ভাল লাগে না তখন । খাওয়ার বেলা তো ব্যতিক্রম হবার কথা নয় !

খাওয়াব পর রুষার দিয়ে-যাওয়া বইটা তুলে নিল ।

"ক্রাকাটাও" সম্বন্ধে কেউই জানত না কিছু, সমুদ্রের মধ্যে এই ছোট্ট দ্বীপটি নিয়ে কোনো ভ্রমণপিপাসু বা আবিষ্কারকের মাথাব্যথাও ছিল না কোনো । আঠারশ তেত্রিশ খ্রীস্টাব্দে যখন এই ছোট্ট দ্বীপটাই সমস্ত পৃথিবীর কাছে খবব হয়ে উঠেছিল তখনই মানুষ প্রথম জানল এব অস্তিত্বের কথা ।

জাভা আর সুমাত্রার মধ্যের সুণ্ডা প্রণালীতে আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে এই তরুণ দ্বীপটি মাথা তুলেছিল, তাব বুকেব মধ্যে সর্বনাশের বীজ নিয়ে । পৃথুও যেমন, অনেক বছর আগে । এর পাশেই মাথা উঁচিয়ে ছিল আরও দুটি ছোট ছোট দ্বীপ । তাদের নাম 'লাঙ্গ' আর 'ভেরলাটান' । এই দুটি দ্বীপও জলের নিচের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরই ফল ।

আঠাবশ তিরাশি খ্রীস্টাব্দ অবধি আট মাইল লম্বা আর পাঁচ মাইল চওড়া এই দ্বীপটি বুকের মধ্যেব সামান্য ধোঁয়া ওঠা তিনটি জ্বালামুখ নিয়ে পৃথিবীর মানুষের উৎসুক দৃষ্টির বাইরেই পড়ে ছিল । তার দাবি ছিল না কারও উপরই । অন্য কেউ দাবি করেনি তাকে । পৃথুর সঙ্গেই যেন মিল ছিল খুবই দ্বীপটির । ঘন সবুজ সতেজ ট্রপিকাল জঙ্গলে 'ক্রাকাটাও'-এর প্রতিটি বর্গইঞ্চি জমি ঢাকা ছিল । সজীবতার সংজ্ঞা ছিল যেন । আগ্নেয়গিরির চুড়োগুলি থেকে তাদের পায়ের তলার সামুদ্রিক মেখলা পর্যন্ত সেই ঘন জঙ্গল বিস্তৃত ছিল । তার মধ্যে বাস করত অনেক রকম পাখি আর জন্তু-জানোয়ার ।

অনেক অনেকদিন আগে ক্র্যাকাটাওতে জাভা ও সুমাত্রার দণ্ডিত অপরাধীরা গিয়ে আস্তানা গাড়ত । কখনও কখনও-বা সুণ্ডা প্রণালীতে মাছ-ধরতে-যাওয়া জেলেরাও গিয়ে হাজির হত । তবে, তারা থাকত না সেখানে । যখন এই দ্বীপটিতে অগ্ন্যুৎপাত হয় সেই সময়ের বেশ কিছুদিন আগে

থাকতেই কোনো মানুষের সঙ্গেই সংস্রব ছিল না ক্র্যাকাটাওয়ের।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানীর, আজকের জাকার্তার তখনকার নাম ছিল বাটাভিয়া আর বোগোর্। সবুজ জাভা দ্বীপের সবচেয়ে বড় শহর ছিল এ দুটি। আঠারশ বিরাশির মে মাসের কুড়ি তারিখে বাটাভিয়া আর বোগোরের মানুষেরা হঠাৎ মেঘগর্জনের চেয়ে হাজার গুণ তীব্র ঘনঘন গর্জন শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল। এমন শব্দ তারা আগে কখনও শোনেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সেই আকাশব্যাপী গুরুগুরু ধ্বনি হতে লাগল আর কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলল। তাদের বুঝতে দেরি হয়নি যে, এ ক্র্যাকাটাও আগ্নয়গিরিরই অগ্ন্যুৎপাত। বুঝতে পেরে, ভয়েরও অন্ত ছিল না তাদের। কারণ, পৃথিবীর একেবারে গোড়াসুদ্ধ টান মেরে উপড়ে ফেলতে চাচ্ছিল সেই আগ্নেয়গিরি। সমুদ্রের উপরও তার জের এসে পড়েছিল।

সেই রাতে, ক্র্যাকাটাওয়ের তিনশ মাইল দূরের কোনো জায়গার মানুষও চোখের পাতা এক করতে পারেনি।

ঐ বছরেরই অগাস্ট মাসের সাতাশ তারিখে ভোর হবে-হবে যখন, ঠিক তখনই পর পর চারটি সাংঘাতিক অগ্ন্যুৎপাতে আকাশ বাতাস সব যেন বিদীর্ণ হয়ে ফালা ফালা হয়ে চিরে গেল। ক্র্যাকাটাও লাফিয়ে উঠল তার ভিত ছেড়ে এবং আকাশের অনেক উঁচুতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তার শরীরের সাড়ে চারশ কিউবিক বর্গমাইল জায়গা সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে গিয়ে পড়ল। তার লাভা আর মাটি, গাছপালা, জঙ্গল, পাহাড় এবং পশুপাখি সমেত।

সেলেবিস্ দ্বীপপুঞ্জের ম্যাকাসারের লোকেরা ভাবল, কোনো জাহাজই বোধহয় বিপদে পড়েছে এবং বিপদ-সংকেত পাঠাচ্ছে ঘন ঘন কামান দেগে।

সুদূর অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেতে-ক্ষেতে উৎকর্ণ কৃষকরা একে অন্যকে জিগ্যেস করল, তাদের সেনাবাহিনী কোনো যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে কি না! কেউ বলল, পাহাড়ে বোধহয় পাথর ব্লাস্টিং করা হচ্ছে। তারই আওয়াজ এ।

পাথর ব্লাস্টিং হচ্ছিল ঠিকই, তবে, মাত্র তিন হাজার মাইল দূরে।

সুদূর ভারত মহাসাগরের রড়রিগ্ দ্বীপপুঞ্জের পুলিশরা তাদের রিপোর্টে সেদিন লিখল যে, তারা খুব ভারী কামানের আওয়াজ শুনেছে পূর্বদিকে কোথাও। হয়তো বিপদে-পড়া কোনো জাহাজেরই বিপদ-সংকেত।

ক্র্যাকাটাওয়ের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হাওয়ার স্রোতেরও বদবদল হয়েছিল। সেই পরিবর্তিত বেগময় বায়ুস্রোত সমস্ত পৃথিবীকে বহুবার সামান্য সময়ের মধ্যে প্রদক্ষিণ করে গেল। ক্র্যাকাটাওয়ের চারপাশের বহু বর্গমাইল জুড়ে সমস্ত এলাকা উৎক্ষিপ্ত ছাইয়ে ভরে গেল। এত মাটি, পাথরই ছিট্‌কে উঠে পড়েছিল সমুদ্রে যে, একদিনেই সুণ্ডা প্রণালী গভীরতা হারাল। বাটাভিয়া ও বোগোরে দিনের বেলাতেই এমন অন্ধকার ঘনিয়ে এল যে, ঘরে ঘরে আলো জ্বালতে হল সবাইকে।

পৃথু এই অবধি অবধি পড়ে বইটা নামাল বুকের উপরে।

ভাবতে লাগল, ক্র্যাকাটাও পড়বার জন্যে এমন করে বলে গেল কেন রুষা? দশ হাজার বছর বয়সী এই দ্বীপ আর একশ বছর আগের ভূমিকম্পের কথা জেনে পা-হারানো পৃথু কী করবে? লাভ কী?

কিন্তু বইটি রুষা নিজে হাতে নিয়ে এসে যখন এই লেখাটিই বারবার করে পড়তে বলে গেল তখন এর তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে কিছু।

সিস্টার লাওয়াণ্ডে ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়েছেন। পৃথুর মাথার কাছের টেবল-ল্যাম্পটি জ্বালানো আছে আর ঘরের কোণাতে সিস্টারের টেবল ল্যাম্পটি। একবার চেয়ে দেখল ও। গভীর মনোযোগের সঙ্গে বই পড়েছেন উনি।

মারাঠিদের সঙ্গে বাঙালিদের অনেকই ব্যাপারে মিল আছে। তার মধ্যে সাহিত্যপ্রীতিও একটি।

ওর ঠোঁটের কোণায় হাসির আভাস ফুটে উঠল। বুঝেছে। বুঝেছে পৃথু। রুষা কেন এই বইটি পাঠিয়েছে তাকে। পৃথু যে নিজেই আজ একটি ক্র্যাকাটাও। সবুজ-হারানো, শরীর-মনের যা পরম

প্রাণ, সেই আনন্দ-হারানো ক্র্যাকাটাও। যেখানে পাখি ডাকে না, ফুল ফোটে না ; যা বন্ধ্যা। পৃথুর শরীরের এবং মনের মধ্যেও বিস্ফোরণ ঘটে গেছে প্রচণ্ড। ক্র্যাকাটাওয়েরই মতো।

কিন্তু তারপর ?

তারপর কী ?

তারপর বিজ্ঞানীরা ক্র্যাকাটাওকে নজরে রাখলেন। একটি দল গিয়ে পৌঁছলেন অগ্ন্যুৎপাতের ঠিক দু'মাস পর। তখনও ক্র্যাকাটাও ফুঁসছে। তখনও গরম সে। ধুঁয়ো উঠছে তখনও।

ছ'মাস পর কোট্টো বলে একজন জীববিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করলেন প্রাণের অস্তিত্ব।

শ্মশান হয়ে যাওয়ার মাত্র ছ'বছরের মধ্যেই ক্র্যাকাটাও আবার সুন্দর, সবুজ, ফুলে-ফলে ভরা একটি ছোট্ট দ্বীপে রূপান্তরিত হল। ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ল আবার। মাছিরাও ঘুরে ঘুবে প্রাণ দিতে লাগল ফুল ফলের। পোকামাকড়, গুব্‌রে পোকারা নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল আর তাদেব মধ্যে কেউ কেউ সেই অসমসাহসী অ্যাডভেঞ্চারার ও প্রাচীনতম শিকাবি মাকড়শাদের খাদ্যও হতে লাগল।

ক্র্যাকাটাওকে দেখে আরও কয়েক বছর পর আর বোঝারই উপায় রইল না যে, সে একদিন রিক্ত, দগ্ধ, সর্বস্বহৃত হয়ে গেছিল।

মিসেস্ লাওয়াঙে বললেন, আলোটা নিভিয়ে দিই এবার ? নটা বাজে। ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন এবারে।

পৃথু জবাব দিল না কোনো। সিস্টার নিজের কাজ সব সেরে নিলেন। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিলেন। উনি পৃথুর মাথার দিকে বসে থাকেন। ওঁর টেবলের আলোটাতে ঘরে একটা নীলচে আভা হয়। স্বপ্নিল পরিবেশ তৈরি হয় এই হাসপাতালেও।

ঘুম ভেঙে গেল পৃথুর। পুবের আকাশে সবে লালের ছোপ লেগেছে। বাইরের পথ দিয়ে ট্রাক যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূর স্টেশানে ডিজেল ইঞ্জিনের গম্ভীর বাঁশি।

ঘুম ভাঙতেই পৃথুর ক্র্যাকাটাওয়ের কথা মনে হল। রুষার কথাও। মিলি ও টুসুর কথা। কুর্চির কথা। রুষার কথাও। ঠুঠা, শামীম, সাবিরসাহেব, গিরিশদা, দিগা পাঁড়ের কথা।

দিগা পাঁড়ের কাছে আর কি ও অমন হুট্‌হুট্ করে চলে যেতে পারবে ? দিগা, পৃথুকে দুদিন দেখতে এসেছিল। কোনো ভালমানুষ কাছে এলেই মনটা বড় প্রসন্ন লাগে। ভাল আত্মা বোধহয় একেই বলে। আবার কিছু লোক কাছে এলেই মনে হয় অশুভ হবে। খুঁতখুঁত করতে থাকে মন। মনে হয় ; কখন যাবে ! সেই লোকগুলো বাজে। জাতকের খলের মতো। দিগার মধ্যে যে গভীর এক আধ্যাত্মিক সুখ আছে, সেই সুখ দিগার চারপাশের মানুষের মধ্যেও বিকিরিত হয়।

প্রকৃতিই পৃথুর কাল হল। মুক্তি চাইতে গিয়ে এক অদৃশ্য বন্ধনেই কেন জড়িয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিই তাকে এক অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করেছে। যে-শক্তি আকাশ থেকে খেয়াল-খুশিমত তারা খসিয়ে দিয়ে একটুও বিচলিত হয় না।

যে-শক্তিকে, পৃথু নীরবে অনুভব করেছে আশৈশব ; সন্ধ্যাতারার নরম নীলাভ দ্যুতিতে, কিশোরীর অপাপবিদ্ধ চোখের উৎসুক চাউনিতে, রুষার মান্য, মানসিক দৃঢ়তায়, কুর্চির নিভৃত নমনীয়তায়, বিজ্‌লীর নিক্কণিত, নিবিড় নগ্নতায় ; ঠুঠা বাইগার শিউলি-ঝরানো সারল্যে, ডাকু মগনলালের ক্রূর কিন্তু ভণ্ডামিহীন খলত্বে, চিতল হরিণীর দৌড়ে-যাওয়ার উড়াল ছন্দে , তাকেই বোধহয় অশিক্ষিত, অনাধুনিক, অকম্যুনিস্ট মানুষ ঈশ্বর বলে জানে।

কুর্চি, মা কালীর পুজো করে। কুর্চির ঈশ্বরের বাস মন্দিরে, যে-মন্দিরে মধ্যরাতে এখনও শিবা-ভোগ হয়। প্রদীপের কম্পমান আলোয় শ্যামা মা মুখব্যাদান করে তাঁর কালো পাথরের শরীরী নগ্নতার বেগুনী জেল্লায় কুর্চিকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। দিগা পাঁড়ের ঈশ্বরের নিবাস ছিল অযোধ্যায়। রামই তার সব। আর শামীমের খুদাহ্ থাকেন বাজারের মোড়ের বড়া-মস্‌জিদে। আর শুধুই কি বড়া মস্‌জিদেই ?

একজন লোক বসে মস্‌জিদে মদ খাচ্ছিল। তাকে যখন বলা হল যে, খুদাহ্‌র পবিত্র স্থানে বসে মদ খেও না, তখন সে বলল, "পীনে দে মুঝে মস্‌জিদমে বৈঠক্‌র, ইয়া উ জাগে বাতাঁদে যাঁহা খুদাহ্‌ না হো।"

মীর্জা গালীব কি? না, জিগর মোরাদাবাদী? না অন্য কারো?

কিছুই মনে থাকে না আজকাল পৃথুর।

মানে, মস্‌জিদেই বসে আমাকে পান করতে দাও হে, নইলে এমন কোনো জায়গা দেখিয়ে দাও আমাকে; যেখানে খুদাহ্‌ থাকেন না!

এই পৃথিবীর কোন্ ফালিতে থাকেন না খুদাহ্? দেখাও তাহলে?

যে-শক্তিকে পৃথু অন্তরে অনুভব করে দৃপ্ত সূর্যালোকে অথবা শান্ত চন্দ্রালোকে, যাকে সে পাহাড়ে, বনে, নদীতে, মনের চোখে প্রত্যক্ষ করে বারবাব শিউরে ওঠে, যে-শক্তি নারীর সৌন্দর্য, ফুলের সুবাস, পাখির চিকন সুরে এই সুন্দব পৃথিবী ভরে দিয়েছে, তাকে কোন নামে যে ডাকবে, ভেবে পায় না পৃথু। পৃথুর সেই অনামা, অদৃশ্য জন, কালীও নন, রামও নন, খুদাহ্‌ও নন, নন পরমব্রহ্মও।

"ওদের কথায় ধাঁধা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি। তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই ত সবই সোজাসুজি হৃদয় কুসুম আপনি ফোটে জীবন আমার ভরে ওঠে দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুঁজি।—"

সকাল হয়ে গেল। প্রেমিকার প্রথম পরশের মতো অস্ফুট উষ্ণতার চুমু এঁকে দিচ্ছে রোদ; পৃথিবীর কপালে। রুষা কেন যে বইটি পাঠিয়েছে, তা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে পৃথু। বিরাট সমুদ্রের একটি ছোট দ্বীপ ক্র্যাকাটাও-ও যদি নতুন করে বাঁচতে পারে; তবে মানুষ পৃথু পারবে না কেন? কেন পারবে না? পারবে। পারবে। পারবে। রুষার বিরুদ্ধে পৃথুর অনেকই অভিযোগ। তবু তার বুদ্ধির কারণে তাকে স্তুতি না করেও পারে না। রুষা। কুর্চি। বিজ্‌লী। ঠুঠা। ভুচু। সাবির সাহেব। গিরিশদা। তোমাদের সকলের জন্যই বাঁচবেই পৃথু। সত্যিই বাঁচবে। নিজের জন্যে যদি নাও বাঁচে, তোমাদের জন্যেই বাঁচবে। এত ভালবাসা, এত প্রীতি, এত সখ্য, চারিধারে এত গান, এত হাসি, এত চোখ-কাড়া সব দৃশ্য, কান ভরা সব সুব ছেড়ে যেতে কি ইচ্ছে করে? সরে থাকতে ইচ্ছে করে কি কারও, এই আনন্দভাণ্ডার থেকে?

আনন্দম্! আনন্দম্! আনন্দম!

নিশ্চয়ই বাঁচবে পৃথু।

সিস্টার লাওয়াণ্ডে খাটেব পাশে এসে বললেন, গুড মর্নিং মিঃ ঘোষ।

পৃথু বলল, গুড মর্নিং।

মনে মনে বলল, ভেরি গুড মর্নিং ইন্‌ডিড।

বুধবারে ভুচু এসেছিল। তারপব সারা সপ্তাহ আর কেউই আসেনি, কাছের মানুষরা।

কাছের মানুষ?

এখন সকাল ঝলমল করছে। ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে পৃথুর। আজ সকালের ডিউটিতে আছেন সিসটার লাওয়াণ্ডে। ওদের নিজেদের সুবিধেমত ডিউটি বদল করে নেন, উনি আব সিস্টার জনসন।

ইনজেকশান এবং ওষুধ দিয়ে, পৃথুকে বলে, বাইরে গেছেন উনি অন্য ওয়ার্ডে গল্প করতে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরবেন বলে গেছেন। যাওয়াব আগে খাটটাকে মাথার দিকে অনেকটা উঁচু করে দিয়ে গেছেন। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে। ধবধবে সাদা বিছানায় আধো-শোয়া হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের আলো-ঝলমল অশথ গাছ, তাতে ঝাঁপাঝাঁপি করা হরিয়ালের ঝাঁক আর তার হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর সব রঙ, শব্দ ও গন্ধের দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে আছে পৃথু।

পাখি উড়ে যাচ্ছে শীতের অস্পষ্ট ভোরের আকাশ থেকে মাঝ-সকালের আকাশে। অভ্রকুচির মতোরোদের নরম উজ্জ্বল টুকরোগুলি লাফিয়ে নেমেছে ঘরের সাদা টাইলের মেঝেতে গরাদের ফাঁক দিয়ে সোনালী বিড়ালছানাদের মতো।

কাল সন্ধ্যের পর কোলাহল থেমে গেলে, গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী এবং হেভী ভেহিকেলস-এর ফ্যাক্টরীর বাঁশি থেমে যাওয়ার পর হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের বাইরের ঝুপড়িতে কারা যেন বিয়ের গান গাইছিল। মানুষগুলো বিহারের। বোধহয়পালামৌ জেলার। নিস্তব্ধ রাতে মাদলের শব্দর সঙ্গে ওদের গান এক মধুর মোহাবরণের সৃষ্টি করেছিল। যে-পৃথিবী চিরদিনেরমতোপৃথুর নাগালেব বাইরে চলে গেছে, সেই পৃথিবীই সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যের ফস্‌ফরাসের মতো পৃথুকে হঠাৎ—আভাসিত করে দিয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্যে।

একটি সুরেলা নারী কণ্ঠ দেঁহাতী আনসফিস্টিকেটেড গলায় গাইছিল :

“একোবি জান্‌মালা ভাইত্‌ বহিনিয়া
দুয়ো দুধা আয়ো পিওলি ডাঁফোর
ই কেক্‌রাকে লিখাল চান্না-চৌপারিরে
কেকারো লিখালই দুরীন দেশ
ভাইকে লিখালেই চান্না-চৌপার
বহিনিকে লিখালেই দুরীন দেশ।
কাহে লাগিন ইয়া বেটি জনম দেলাই
কাহে লাগিন ইয়া আইওগে দেলে বেনাবাস
ই দুনিয়া চরিতর বেটি জনম্‌ দেলি
চুটাকি সেঁন্দর বাদে দেলি বনবাস.....”

রুষা হয়ত এই এক্‌রো-কেকবো ভাষা বুঝত না ; কিন্তু বুঝলে খুশি হত এ কথা জেনে যে, এই গানের মধ্যেও “উইমেনস লিব”-এর বক্তব্য নিহিত আছে। সমসময়ের প্রত্যেক নারী : সে সমাজেব বা দেশের যে-কোনো স্তর বা প্রান্ত থেকেই আসুক না কেন : নিজেদের মুক্তি খুঁজছে যে, তা বোঝা যায়।

এটা জেনে, ভাল লাগে পৃথুর।

ভাই আর বোন একই সঙ্গে জন্মাল, ডেঁটে (ডাঁফোর) দুধ খেল একই মায়ের বুকের অথচ, মেয়েকে সিঁথিতে সিঁদুব দিয়ে বনবাসে পাঠাতে হল আর ছেলে, নেহাৎ ছেলে বলেই ; বাড়িতে চান্না-চৌপরে থেকে গেল।

তার পরে আবও একটি গান গেয়েছিল সেই অদৃশ্য, অপরিচিত বন-পাহাড়ের মেয়ে ঃ

“কা লেকে যেবে মাইয়া আপন নইহার্‌
ঔর কা লেকে যেব্বে শ্বশুরার ?
আওডা চাওব লেকে যেব্বে নইহার
ঔব মাঙ্গমে সেঁদবা লেকে যেব্বে শ্বশুরার .....

কাল রাতে শোনা গানের সুরগুলি মাথায় দুলছে এখনও। দোলানি সুরের দোলা।

হঠাৎই কে যেন বাইরে থেকে বলল, সাহাব !

কওন ?

চমকে উঠে বলল, পৃথু।

দবজার বাইরের বডিগার্ডদের একজন মুখ বাড়াল পর্দার ফাঁক দিয়ে। বলল, ইক্‌ আওরাত আয়ী সাহাব, আপসে মিলনে।

চমকে উঠল পৃথু। ভিজিটিং আওয়ার্স কি সুরু হয়ে গেছে ?

বলল, ভেজ দিজিয়ে অন্দর।

লোকটির মুখ মিলিয়ে গেল। পর্দা ঠেলে, ঘরে ঢুকল বিজ্‌লী।

পৃথু উত্তেজনায় উঠে বসতে যেতেই বুঝতে পারল এখনও ওঠার অবস্থা তার আসেনি। যন্ত্রণায় ডানদিকের পেট আর ডান পায়ের অবশিষ্টাংশ কঁকিয়ে উঠল। গুলি-খাওয়া বাঘের মতো নেতিয়ে গেল ও।

বিজলী পৃথুর অবস্থা বুঝে দৌড়ে এসে ভাল করে শুইয়ে দিল খাটে পৃথুকে। এবং ঘরে কেউ নেই দেখে পৃথুর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফময় মুখে চুমুর পর চুমু খেতে লাগল, পাগলের মতো।

বানরী যেমন করে বানরকে খায়। প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবী তার প্রিয় গুহামানবকে যেমন করে চুমু খেত ; তেমন করে। নির্ভেজাল শরীরী উচ্ছ্বাসে। তার মধ্যে মনের ভেজাল ছিলো না কোনো।

চুমু খাওযার পর্ব শেষ করেই বিজলী পৃথুকে জড়িয়ে ধবে তার বুকে মুখ রাখল। বিজলীব নরম অথচ দৃঢ বুকেব ছোঁওয়া লাগল পৃথুব বুকে। কম্বলের আড়াল ভেদ করে।

ছটফট করে উঠল পৃথু। ডাকু মগনলালের গুলি খেয়ে যে শরীরী-পৃথু অবশ হযেছিল, সেই-ই দুবন্ত প্রমত্ততার হঠাৎ আবেগে আশ্চর্য হয়ে জেগে উঠল। তীব্র স্বস্তির সঙ্গে পৃথু হঠাৎই বুঝতে পাবল যে, সবই শেষ হয়ে যাযনি তাব এখনও। এখনও বাকি আছে কিছু।

বিজলীর চোখেব জলে পৃথুব বুকেব কাছেব কম্বল ভিজে উঠল। ভিজে উঠল ; বোধহয় পৃথুরও চোখের কোণও। কে জানে ? শিশুকালেব পর শেষ কবে যে কেঁদেছে মনে পড়ল না তা। আবাবও শিশু হয়ে যেতে ইচ্ছে করল খুবই। যদি পারত শৈশবে ফিরে যেতে এই মিশ্র, রুদ্ধ গোলমেলে পবস্পববিরোধী মানসিকতাব কারাগার থেকে, মুক্তি পেত ও তাহলে। কিন্তু ....

মুক্তি তো নেই। মুক্তি , শিক্ষিত, আধুনিক, তথাকথিত সংস্কারমুক্ত মানুষের জন্যে নয়। পৃথুর জন্যে নয়। রুষার জন্যেও নয়। মুক্তি ; শুধুমাত্র বিজলীর জন্যে। হয়ত ভগবৎ-বিশ্বাসী কুর্চির জন্যেও। বিশ্বাসের যে কোনোই বিকল্প নেই। সহজ এবং স্বাভাবিক না হতে পারলে মুক্তির সব পথই বন্ধ। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষ মুক্তি বলে যাকে জানবে, তাই হবে তার সবচেয়ে বড় বন্ধন। সেই বাঁধনের দড়ির চাপে সমস্ত সত্তা তার লাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠবে। চিরদিনেরই মতো নিজের নিজের মনেব কারাগারে হয়ত রুদ্ধ হয়ে থাকবে পৃথু আর রুষারা।

আবেগ, স্বাভাবিকতা যাদের চালিত করে, তারাই কেবল উছলে উছলে দৌড়ে যেতে পারে এই জীবনের পথ বেয়ে। পৃথুরা তাদের বিদ্যার গরিমা, অসাধারণত্বর শ্লাঘা, আধুনিকতার গর্বর গহ্বরেই পড়ে আছে। ছোট্ট হয়ে গেছে তাদের আকাশ; অনুভূতির বৃত্ত। নিরুপায়। ওরা নিরুপায় !



বিজলীর পিঠের উপর দুটি হাত রাখল পৃথু।

বিজলী তখনও কাঁদছিল। পৃথু ওর দু'কাঁধ ধরে একবার তোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অপারগতার যন্ত্রণাই বাড়ল শুধু।

বিজলী ওকে আবার একবার আদর করে খাটের পাশের চেয়ারে বসল। বেচারীর চোখের সুর্মা লেপটে গেছে। বিনুনী করে চুল বেঁধেছে। একটি লাল-কালো ফুল ফুল ছাপা শাড়ি পরেছে, সিল্কের। দুটি চোখে নিঃশর্ত সমর্পণের নীরব মুচলেকা।

বিনুনী-করা কাছে-বসা, সমর্পিতা বিজলীকে দেখে হঠাৎই কুর্চির কথা মনে পড়ে গেল পৃথুর। কতদিন দেখেনি কুর্চিকে। বিজলী যখন প্রথমে ঘরে ঢুকল তখন ওকে দেখে একবার রুষার কথাও মনে হয়েছিল। বিজলীর মধ্যে বোধ হয় সামান্য রুষা, সামান্য কুর্চি এবং অনেকখানি বিজলী আছে।

ওর মধ্যে এক টুকরো কুর্চিকে দেখতে পায় বলে, না-পাওয়া কুর্চিকে পায় বলেই কি এত ভাল লাগে ওকে ? কে জানে ? এই সুন্দর সকালে ভাললাগার ব্যবচ্ছেদ করতে ইচ্ছে করল না পৃথুর।......

বিজলী অনেকক্ষণ পৃথুর চোখে চেয়ে থেকে বলল, আমাকে বাঁচাতে গিয়েই ত আপনার এই হাল।

হাসল পৃথু।

বলল, না, না, তা কেন ? তা ঠিক নয়।

নিজেকে বলল, তোমাকে কি বাঁচাতে গেছিল পৃথু ? রাণ্ডী বিজ্‌লীকে ? পৃথু ঘোষ তোমাকে বাঁচাতে যায়নি সেই রাতে। আধুনিক, শিক্ষিত মানুষের' অন্য কাউকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিপন্ন করার শিক্ষা পায় না। বাহাদুরী নিয়ে দলের সমস্ত কৃতিত্ব একা একাই আত্মসাৎ করার জন্যেই কি গেছিল ও ? ফোটোগ্রাফার আর রিপোর্টারদের সব হাততালিই একাই পাবে বলে ? একা একাই মালাবান হবে বলে ? ফুলে এবং শ্লাঘায় ? বিজলী, বোকা গানেওয়ালি, তুমি জানো না যে-সমাজে আমার বাস সেখানে নিজের স্বার্থ না থাকলে কেউই কাউকে বাঁচাতে যায় না দৌড়ে গিয়ে। বরং পাবলে, বিষ খাইয়ে মারতেই চায়। সামনে দাঁত বের করে হাসে আর পেছন থেকে ছুরি মারে সব সারল্য ও আন্তরিকতাকে।

কে জানে কেন গেছিল আসলে ? মগনলালের সঙ্গে টক্কর দিতে ? ওর মধ্যের ক্রমশ ঘনীভূত এবং লুকিয়ে-রাখা হীনমন্যতাকে একটা সামান্য ইঁদুর বা শূয়োরের কাছে একটা বড় বাঘের পরাজয়ের গ্লানিকে পিস্তলের সশব্দ পৌনঃপুনিক গুলিতে মুছে দিতেই গেছিল হয়ত আসলে। অবচেতন কি যে চায়, তা কি চেতন জানে ?

বিজলী ওকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে বলল, কথা বলছেন না কেন ? আপনি ?

তোমার টাকাটা আজও দেওয়া হলো না। এখানে ত' টাকা নেই.....

বিজ্‌লী একবার তাকাল দুই ভুরু তুলে ; পৃথুর দিকে। মুখে কিছু বলল না। তবে ঠোঁট দুটি কাঁপল একটু। অভিমানে।

ওর দুটি চোখ নীরবে বলল পৃথুকে, কামিনা !

পৃথু নিজেকেও বলল, কামিনা।

খুবই ঘেন্না হল পৃথুর নিজের উপর। শুধু বিজ্‌লীকে ছোট করার জন্যেই নয়, নানা মিশ্র কারণেও। সেই মুহূর্তে ওর হঠাৎই মনে হল যে, একজন আধুনিক মানুষের বুকে নিজের প্রতি যতখানি মমত্ব এবং গর্ব থাকে, ঠিক ততখানিই বোধ হয় থাকে ঘৃণাও। নিজেকে সে মানুষ যতখানি ঘৃণা করে ততখানি বোধ হয় আর কাউকেই করে না। ভাঁটুকেও নয়। হয়ত এতখানি ঘৃণা হাটচান্দ্রা শেল্যাক কম্পানীর ইম্‌ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার শর্মাকেও করে না।

বিজলী কথা ঘুরিয়ে পৃথুর চোখে চোখ রেখে বলল, কবে ভাল হয়ে আমার কাছে যাবেন ? এবারে কিন্তু......

সিস্টার লাওয়াণ্ডে ঘরে ঢুকলেন।

বিজ্‌লী বলল, খুব ভাল লাগছে আমার। কতদিন পর দেখলাম আপনাকে !

পৃথু বলল, আমারও।

ওকে দিনের বেলায় এমন করে এত আলোর মধ্যে কখনও দেখেনি পৃথু। বিজ্‌লীর ঘরে এত আলো ছিলো না। কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে ! চান করে এসেছে বিজ্‌লী। ওর গায়ের শামামা ঈত্বর-এর গন্ধ উড়ছে হাওয়ায়।

পৃথু বলল, হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের এক কোণায় ভীমরুলের চাক আছে কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। ঐ দিকে এমন খুশবু নিয়ে যেও না। একেবারে মরেই যাবে কামড়ে।

বিজ্‌লী হাসল। আশ্চর্য এক বিষণ্ণ হাসি। বলল, যেখানে খুশবু, কামড় ত' সেখানে থাকবেই। ভয় করে কি হবে ?

পৃথু চমকে তাকাল ওর দিকে।

ডিমের মতো সুডৌল মুখ বিজলীর। বড় সুন্দর। কষা কি কুচির মতো নয়। অন্য রকম সুন্দর। এক একজন নারীর সৌন্দর্য এক এক রকম। চুলের রঙ একটু কটা। কে জানে, কোন বেদুইনের রক্ত আছে ওর শরীরে। অনেকই রঙের পিচকিরি লেগেছে ওর মা-দিদিমার রক্তে, যাদের কাছ থেকে নাচ শিখেছে, গান শিখেছে বিজলী, শিখেছে ভালবাসা—ভালবাসা খেলা, ছেনালী; ঢং-ঢাং।

বিজলী শব্দ না করে হাসছিল। ওর গলাতে, আর ঠোঁটেও তিল আছে অনেকগুলো কালো রং। পৃথু কার কাছে যেন শুনেছিল যে, ঠোঁটে যাদের তিল থাকে সেই মেয়েরা খুব মুখরা হয়। কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়।

চুপ করে গেলেন যে আবার?

বিজলী বলল। কথা বলুন। সময় ত চলে যাচ্ছে। যেতে হবে না বুঝি?

যেতে ত হবেই।

তবে?

তবে কি?

কথা বলুন।

পৃথু হেসে আবারও ওর পিঠে হাত রেখে বলল, কথা, না-বললে বুঝি কথা বলা হয় না?

যায় হয়ত। কিন্তু আমি যে এতদূর থেকে আপনার মুখের কথা শুনব বলেই এলাম এত কষ্ট করে।

কথা সব ফুরিয়ে গেছে বিজলী। আবার জমে উঠুক বলব। এখন তুমি বল, আমি শুনি।

আমাদের মুলক্-এ যাবেন? সেবে উঠে?

মুলক্! তোমার মুলক্! কোথায় সে?

উজ্জয়িন্-এর কাছে। সিপ্রা নদীর ধারেই আমাদের বাড়ি।

বাঃ। তবে ত মাণ্ডু কাছাকাছিই।

হ্যাঁ। তবে খুব কাছে ত নয়। মাণ্ডুতে ত যেতে হয় ধার্ হয়ে। ছোটবেলায় একবার গেছিলাম মায়ের সঙ্গে। আর বড় হওয়ার পর ভোপালের এক রহিস্ বাবুর সঙ্গে। রূপমতী মেহাল্-এ পূর্ণিমার রাতে আমার গান শুনেছিলেন তিনি। খুব রসিক, বড়া খানদান-এর বাবু। মিল আছে অনেকই আপনার সঙ্গে।

বাড়িতে কে কে আছেন তোমার?

মা আছেন। আর ছোট বোন। দিদিমাও ছিলেন, মারা গেছেন মাস ছয়েক হল। মা কিন্তু ছোট বোনকে গানেওয়ালি হতে দেননি, যদিও গান সে গায় আমার চেয়ে অনেক গুণ ভাল।

তাহলে? বিয়ে দেবে না বোনের?

দেবো ত। সেই জন্যেই ত হাটচান্দ্রাতে এলাম। শহর বাজার জায়গা, অথচ বেশি বাইজী নেই। কামাইও অন্য জায়গা থেকে বেশি। আর এক বছরেই যে টাকা জমাবো তাতে হয়ে যাবে বোনের বিয়ে। ছেলেও দেখে রেখেছি আমরা।

কি করে সে?

সে?

একটু চুপ করে থেকে বলল, তার প্রধান পরিচয় সে ডাকু ভিনোদ সিং-এর ছোট ভাই। এখন ভোপালে থাকে। বাড়ি ছিল গোয়ালিয়রে।

ডাকুর ভাইয়ের সঙ্গে……

আহা। দাদাই না হয় ডাকু, সে নিজে ত নয়। ওদের লেপ-তোশকের ব্যবসা আছে। ভাল ব্যবসা।

তবু, দাদা ডাকাত!

দাদার সঙ্গে ভাইয়ের কি? কুত্তা বিল্লীর বাচ্চারাই কি সব এক রকম হয়? হয় না। না চেহারায়, না স্বভাবে। তা আবার মানুষের বাচ্চা! এক একজন এক এক রকমভাবে বেড়ে ওঠে। মিল কি

খুবই দেখেন ভাইয়ে ভাইয়ে ?

তা হয়ত ঠিক। তবে, আমি ত একমাত্র ছেলে মা-বাবার। তোমার কথা ঠিক কী না তা বলতে পারব না।

তোমার বোনের নাম কি ?

রোওশ্‌নী। কি যাবেন ত ? থাকতে পারেন সেখানে যতদিন খুশি।

পৃথু মনে মনে বলল, পুরুষমানুষকে বিশ্বাস কোরো না। আগুন আর ঘি একসঙ্গে থাকলেই বিপদ।

মুখে কিছু না বলে, হাসল একটু।

ডাকুর ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনেই ঘাবড়ে গেলেন ?

না, ঠিক তা নয়……তবে

ডাকু মগনলালের ভাই কে তা জানেন ?

চমকে উঠল পৃথু।

বলল, কে ? জানি না ত।

হাটচান্দ্রায় আমাদের মহল্লার ভিস্তিওয়ালা। রোজ পাহাড়ের উপরের পিলাকুঁইয়া থেকে যে খাওয়ার জল বয়ে নিয়ে আসে ভিস্তি করে আমাদের জন্যে। সেরাই প্রতি, পঁচিশ নয়া করে নেয় ঐ উমদা পানির দাম হিসেবে।

কি বলছ তুমি বিজলী ? ভিস্তিওয়ালা, ডাকু মগনলালের ভাই ? আমি তার ভাইকে জান-এ মেরে দিলাম বলে রাগ নেই তার আমার উপর ? পুলিস কি একথা জানে ?

না, না রাগ নেই। কোনোই রাগ নেই। উলটে সে বলেছে কারখানার সাহেব আমার বড়ে ভাইয়াকে মুক্তিই দিয়েছেন। এবারে ওর আত্মা মুক্ত হয়ে যাবে। আগের আগের জন্মে অনেক পুণ্য না করে এলে মানুষের এত পাপ সয় না এক জীবনে। মুক্ত সে হবে, নিশ্চয়ই।

আপনারা, হিন্দুরা ত আত্মার মুক্তিতে বিশ্বাস করেন, তাই না ?

পৃথু চুপ করে থাকল।

ভিস্তিওয়ালা মানুষটা কিন্তু সন্ত্‌। গরীব, কিন্তু কোনো লোভ নেই। বিয়ে করেনি। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে ফুল নিয়ে আসে আমার জন্যে।

দেখো, আবার ভালটাল না-বেসে ফেলে তোমায়।

আমাকে কে ভালবাসবে ? আমি ত ঝুটা-বিজলী। আমার শরীরকে অনেকেই ভালবাসে। কিন্তু মনের কাছে আসার সাধ নেই কারোরই। হয়ত, সাধ্যও নেই।

সিস্টার ঘরে ঢুকলেন আবার। ভ্রূকুটি করলেন পৃথুর দিকে চেয়ে। বড় রাগ হয়ে গেল পৃথুর। বুনো-পৃথু জেগে উঠল হঠাৎ। এই ভলান্টিয়ারী-করা বিবেকরূপী মহিলাকে একটু শিক্ষা দিতে ইচ্ছে হল ওর। এক ঝট্‌কাতে দু' হাত দিয়ে বিজলীকে নিজের দিকে টেনে নিয়েই তার বুকের উপরে বিজলীর ইচ্ছুক মুখখানিকে ফেলে, চেপে ধরে নিঃশেষে ভিজে ঠোঁট দুটিকে শুষে নিতে লাগল নিজের ঠোঁটে। এই হঠাৎই আলোড়নে পৃথুর শরীরের ব্যথা এবং কাম দুইই ছড়িয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে বিজলীর ঠোঁটে, শরীরের আনাচে-কানাচে।

কিছুক্ষণ পরই ওকে ছেড়ে দিয়ে, সিস্টারের দিকে তাকাল কামরাঙা-লাল চোখে।

সিস্টার চোখ নামিয়ে নিলেন।

বিজলীর শারীরিক সান্নিধ্য পৃথুর শরীরের মধ্যে অনেকদিন হল ঘুমিয়ে থাকা জড়াজড়ি-করা কাম-কাঁকড়াগুলোর মধ্যে হইরই তুলে দিয়েছিল। তারা শরীরময় হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। খুব ভাল লাগতে লাগল ওর। শরীরের অসংখ্য ধমনীতে তার প্রিয় রক্তর দপদপানি অনুভব করল। একজন মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গে তার কামবোধের বোধ হয় এক ধরনের সরাসরি এবং গভীর যোগাযোগ আছে। কামহীনতা মানেই হয়ত এক ধরনের মৃত্যুও। নীতিবাগীশ আর উন্নাসিকেরা যাইই বলুন না কেন। তীব্র কাম ; তীব্রভাবে বেঁচে থাকারই অন্য নাম। জীবনীশক্তিরই

অন্যতর লক্ষণ।

দুঃখের বিষয় এইই যে, পৃথুর স্ত্রী অথবা প্রেমিকা এই সরল সত্যটি কোনোদিনই বুঝতে পারল না। হয়তো খুব কম পুরুষের স্ত্রী এবং প্রেমিকারাই বোঝেন। তাইই, পৃথুরই মতো অন্য অনেক পুরুষকেই তাদের যার যার রুষাকে না পেয়ে যাব যার কুর্চির দোরে গিয়ে ভিক্ষা চাইতে হয়। এবং সেখানেও ভিক্ষা না পেয়ে, আবারও বিজ্‌লীদের কাছে যেতে হয় টাকা ঝন্‌ঝনিয়ে।

নগ্ন আদম যেদিন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে প্রথমবার নগ্না ঈভের পুষ্পদলন করেছিল, সেই প্রথম দিনেই এই পরম সত্যটি স্থাপিত হয়ে গেছে। স্থিরীকৃত হয়ে গেছে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক।

বিজ্‌লী বলল, নিচে ইম্‌রানকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। শুধু আপনাকে দেখবার জন্যেই কাল দশটার বাস ধরে এখানে এসেছিলাম। আজই ফিরে যাব।

উঠেছিলে কোথায়? রাতে?

পৃথু শুধোল।

সব্‌জি-মণ্ডিতে। এক দোস্ত থাকে সেখানে, ইম্‌রানের। তারই বাড়িতে।

সব্‌জি-মণ্ডি!

হাটচান্দ্রাতেও সবজি-মণ্ডির কাছেই বিজ্‌লীর বাড়ি। বার্নার্ড শ'র পিগ্‌মেলিয়নের প্রফেসর হিগিনস লান্‌ডানের ফুল-মণ্ডির অক্ষর পবিচয়হীন এক সরলা বালা এলাইজা ডুলিটল্‌কে যেভাবে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন; তেমন করে বিজ্‌লীকেও শিক্ষিত করে তুলতে ইচ্ছে হয় পৃথুর।

কিন্তু সময় নেই।

সেই সময়ও নেই। যুগও ত পালটে গেছে। আজকের এই পৃথিবীতে প্রফেসর হিগিনস আর মিস ডুলিটল্‌দের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। "উও জমানা চলে গ্যয়ে যব্ খলীল্ খাঁনে ফাকতা উড়াহ্‌তে থে"।

কবে বাড়ি যাবেন?

বাড়ি?

চমকে উঠল পৃথু। বাড়ি তারও একটা আছে? আছে বুঝি?

বলল, আরও দু-আড়াই মাস।

কাঠের পা লাগাবেন?

নাঃ।

কেন?

কোনো নকল জিনিস ভাল লাগে না। যা আমার নেই; তা আছে বলে লোককে ধোঁকা দেওয়ার কী দরকার?

বাঃ। কত কাজে লাগে কাঠের পা। তার উপরে প্যাণ্ট পরবেন, পাজামা পরবেন; কেউ বুঝতেই পারবে না। গাড়ি চালাতে পারবেন। না, কেন? অদ্ভুত আপনার যুক্তি সব।

নাঃ। ও তুমি বুঝবে না। আমি ক্রাচ্‌ই নেব।

মহল্লার ছেলেগুলো ল্যাংড়া ল্যাংড়া বলে খ্যাপাবে।

যে সত্যিই ল্যাংড়া তার এই সত্যি কথাতে রাগ করার কোনো কাবণ তো দেখি না।

তবু, ভেবে দেখবেন, মন ঠিক করার আগে।

দেখেছি। পুনেতে আর্টিফিসিয়াল লিম্বসের দারুণ ফ্যাক্টরি করেছে, ইণ্ডিয়ান আর্মির উদ্যোগে। শুনেছি, সুন্দর সুন্দর পা পাওয়া যায়, হাতও। কিন্তু আমি লাগাব না।

জানি না, কেন এমন জিদ করছেন।

সেই সব পা যত সুন্দরই হোক না কেন, আমার নিজের পায়ের মতো সুন্দর পা কোথায় পাব?

বিজ্‌লী পৃথুর বাঁ পায়ে হাত বুলিয়ে বলল, তা ঠিক। অনেকগুলো লাল তিল ছিল আপনার পায়ে। মনে আছে। একদিনই দেখেছিলাম। আগুনের মতো।

বিজলী পৃথুর বাঁ উরুতে হাত ছোঁওয়াতেই কে যেন আবার ওর কামের মেইন-সুইচ অন করে দিল। শরীরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল, ঘণ্টা বেজে উঠল পুজোর, সানাই বাজতে লাগল শরীরের রোশনচৌকি থেকে।

বিজ্‌লীর হাতটা আস্তে করে সরিয়ে দিল পৃথু। চোখে কষ্টর ছায়া ফুটে উঠল, কালো হয়ে এল পৃথুর চোখ। কর্তিত ডানপায়ের সম্মুখভাগেও রক্ত এসে দাপাদাপি করছিল। মনে হচ্ছিল, এক্ষুণি ছিঁড়ে দেবে সব সেলাইগুলো।

এখন আবার শান্ত হয়ে আসছে আস্তে আস্তে দপদপানিটা। আলো নিবে যাচ্ছে এক এক করে শরীরের ঘরে ঘরে।

সৌন্দর্যর যেমন আলাদা এক আকর্ষণ আছে, মনের গভীরতার, অর্থর, প্রাচুর্যেরও যেমন আছে, তেমনই নিছক কামেরও আছে; বুঝল, পৃথু। সত্যি! রূপ-গুণ-মানসিকতা-বিবর্জিত নিছক কামেরও! পুরুষের সবচেয়ে কাছের দেবতা কি মদনদেবই? গণেশ বা লক্ষ্মী বা সরস্বতী নয়? বড়ই লজ্জার কথা। কিন্তু, সত্যি।

একটা গান শোনাবে বিজ্‌লী?

এখানে?

সিস্টার লাওয়াঙে জানালাব কাছে গিয়ে বাইবে চেয়েছিলেন। তিনি যে খুবই বিরক্ত হয়েছেন তা বোঝাবার জন্যে।

সেই গানটা গাও। "রস্‌কে ভরে তোরে নয়না, এরি সাঁবারিয়া, আয়েযা সাঁবারিয়া/ তোঁহে দরোমা লাগালুঁ/ রস্‌কে ভরে তোরে নয়না…।"

পৃথু বলল।

নাঃ।

কেন? না কেন? এখানে গান হয় না?

পৃথু বলল, বিজ্‌লীকে।

কোনো বাজনা নেই, তবলা নেই; কী করে হবে?

তারপর সিস্টারের দিকে চেয়েই; গলা নামিয়ে বলল, ভাল হয়ে আমার কাছে আসবেন, অনেক গান শোনার রাতভর। বলেই আঙুল দিয়ে পৃথুর মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল বিজ্‌লী।

বড় ভাল লাগতে লাগল পৃথুর। কী যে দেখেছে এই পাগ্‌লী অভাগী মেয়েটা ওর মধ্যে। কে যে কী দেখে কার মধ্যে কখন? এসব লীলা বোঝা ভার। কোনো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা হয় না এসবের। হৃদয়ের কোনো প্রশ্নরই উত্তর কি নেই মস্তিষ্কর কাছে?

বিজলী বলল।

থাকবেন? আমার কাছে? বাকি জীবন?

সিস্টার লাওয়াঙে এবার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিজলীর মুখের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি হানলেন।

পৃথু ভ্রূক্ষেপ না করেই বলল, বাকি জীবন? এক-পায়ের জীবন? আমি তোমার তো কোনো কাজে লাগব না। শুধু তোমারই কেন, কারোই আর কাজে লাগব না। যে মানুষের কাছে পাহাড়, বন, নদী জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল তার কাছে এই অঙ্গহানির ব্যাপারটা যে কতখানি তা হয়ত তুমি ঠিক বুঝবে না বিজলী। তোমার কাছে তোমার পালঙ্কটি যতখানি, যতখানি তোমার গান; আমার কাছেও বনজঙ্গলও ততখানিই! কতখানি যে হারাল আমার, হারিয়েছে; তা তোমাদের কাউকেই বোঝাতে পারব না। ঠুঠা বাইগা, ভুচু, সাবির সাহেব বা শামীমবা হয়তো বুঝলেও বুঝবে কিছুটা।

আপনাকে তো আমার কাজের জন্যে ডাকছি না। আপনার কাজে আমি যদি লাগি, কোনোরকম কাজে; সে জন্যেই ডাকছি। আমি সব কিছুই করব আপনার জন্যে। রোজগার করে খাওয়াব আপনাকে। শুধু কথা দিন যে, আসবেন।

রোজগার করে?

পৃথু হাসল। শব্দ করে।

হাসছেন যে!

তুমি রহিস্‌দেব নিয়ে পালঙ্কে শুয়ে রোজগার করবে আর সেই রোজগারেই খেয়ে তোমার সেই পালঙ্কেই শুয়ে থাকব আমি তোমাকে নিয়ে? বলেছ ভাল। তুমি একটি···

বিজলীর মুখ কালো হয়ে এল।

মুখ নামিয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ। কী করে ভাবলেন এমন কথা? দেখবেন আপনি! শুধু গানই গাইব বাকি জীবন। আর যতদিন বাঁচি ; বাজাব না কখনও।

মনে মনে বলল, শুধু আপনাকে ছাড়া।

আর আমি? আমি তো না জানি তবলার ঠেকা, না পারি বাজাতে সারেঙ্গী, শুধু তানপুরা ছেড়েই রোজগার করব, রাজি? সেটা কি ভাল দেখাবে?

আপনি আমাকে কষ্ট দিয়ে খুব আনন্দ পান, না সাহাব? আপনি শুধু আমাকে বাজাবেন। একজন আওরাতের কাছে একজন মরদের কী দাম তা আপনি কী করে বুঝবেন? মরদ ছাড়া আওরাত কি বাঁচে? আপনি কাছে থাকাটাই তো আমার কাছে বড় একটা ব্যাপার। আপনার সেবা করেই কাটিয়ে দেব সারা জীবন। আপনার গান শুনব। কী ভাল গাইতে পারেন আপনি। শুনেছিলাম না গিরিশবাবুর বাড়ি।

পৃথু হাসল। বলল, সিনেমার ডায়ালগের মতো শোনাচ্ছে তোমার কথা। তবু হয়ত তুমিই আমার জীবনে একমাত্র মানুষ যে, বদলে কিছুমাত্র না—চেয়েই···

একটু চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মতো বলল পৃথু, একদিন নিজে হাতে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াবে বলেছিলে না বিজলী? মনে আছে?

খিচ্‌ড়ি!

প্রথমে ও চমকে উঠল। তারপরই হেসে বলল, খিচড়ি আপ্‌কি বহত্‌ই পসন্দ কি খনা? পইলেভি আপনে এক মরতবে বোলেথেঁ। খিচড়ি পকানা কওন্‌সী বড়ী বাত?

বহত্‌ই বড়ী বাত্‌। বহত্‌ই বড়ী বাত।

রুষা যে জীবনে একদিনও নিজে হাতে খিচুড়িও রেঁধে খাওয়ায়নি পৃথুকে। বিজলী কী করে জানবে, কোথায় ব্যথা পৃথুর, কত জায়গায় ব্যথা? কার শূন্যতা যে কোথায় তা অন্যে জানবেই বা কি করে? বিশেষ করে সেই শূন্যতা যখন সব সময়ই আড়াল করেই বেড়াতে হয়। পাছে অন্যে জানে। পাছে রুষা কষ্ট পায়।

হাসছিল পৃথু। অনাবিল প্রসন্নতার হাসি। ও জানে কিন্তু বিজলী হয়ত জানে না যে, একজন শিক্ষিত মানুষের কাছে একটি উদগ্রীব নারী শরীর, সুরেলা গলার গান ; অথবা উপাদেয় খিচুড়ির চেয়েও বড় আরও অনেক কিছু চাইবার আছে ; থাকে। শিক্ষার এইই অভিশাপ। শিক্ষা ; পুরুষ কিংবা নারী, সকলকেই বড় গোলমেলে, বক্র করে দেয়। যা সে সহজে পায়, পেতে পারে তাকেই সস্তা বলে ভাবতে থাকে সেই মানুষরা। আর যা পায় না, তাইই দামী মনে হয় তাদের কাছে। রুষা তাকে যা দেয়, তা কুর্চি কখনও দিতে পারবে না। চাইলেও না। আবার কুর্চি যা দিতে পারত, তা বিজলী কখনও দিতে পারবে না। চাইলেও না। অথচ পৃথুর তিনজনকেই প্রয়োজন ; তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে। ও যে অনেকগুলো মানুষ। একজন নারীতে, একই ধরনের নারীতে যে ও আঁটেনি। আঁটবেও না কোনোদিন। পৃথুর দুঃখ খণ্ডাবে কে?

চুপ করেই রইল ও। বিজ্‌লীর প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতায় ; সে চেয়ে রইল নীরবে বিজলীর চোখে।

ওয়াক্ত্‌ কিতনা হুয়া সাহাব?

হঠাৎই শুধোল, বিজলী।

পৃথু সিস্টারকে জিগ্যেস করল, কটা বাজে সিস্টার এখন?

ভিজিটিং আওয়ার্স ওভার হয়ে গেছে। সাড়ে নটা বেজে গেছে।

সিস্টার বললেন ; মুখ না ফিরিয়েই। বিরক্ত গলায়।

ওঃ বাবাঃ। এবার তাহলে উঠি। হাটচান্দ্রার বাস যে দশটায় ছাড়বে। ইমরান্ নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে ছটফট করছে বোধ হয় দেরি দেখে।

উঠবে ? নিয়ে এলে না কেন ইমরানকে উপরে ?

ও এলে, আমি তো এমন একা পেতাম না আপনাকে।

পৃথু সিস্টারের দিকে তাকাল।

বিজ্‌লী ফিসফিস করে বলল সিস্টারের উদ্দেশ্যে, উনি ত চেনা নন। ওঁর সামনে লজ্জা কিসের ? আনজান্ আওরত।

বলেই বলল, আর কিন্তু আসতে পারব না আমি। যাব এবার। বলুন, আপনি আসবেন তো ? কথা দিন।

যাব।

পৃথু বলল।

চলি।

বলেই উঠে দাঁড়িয়ে বিজ্‌লী আবারও একবার পৃথুর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে চোখে চোখ রেখে, হাতে হাতটি এক মুহূর্ত নিয়েই আবার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভাল থেকো।

পৃথু বলল। গলা তুলে।

কথা দিলেন তো ?

দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল বিজ্‌লী।

মাথা নাড়ল পৃথু।

পর্দার আড়ালে মিলিয়ে গেল ওর শাড়ি। পর্দাটা হাতের ছোঁয়ায় অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে লাগল। যতক্ষণ কাঁপতে থাকল, ঐদিকেই চেয়ে থাকল পৃথু।

কথাও দিল, কিন্তু খুব সম্ভব কথা রাখা হবে না। জীবনে, কটা কথাই বা রাখা যায় ? মিথ্যার বেসাতিরই আর এক নামই তো জীবন। তবু, আশ্চর্য ! কথা দিতে হয় কতজনকেই কতবার। আর কথা দিলেই যদি কেউ খুশি হয়, তাহলে না দিয়েই বা কী করা যায় ? ভবিষ্যতের দুঃখর কথা ভেবে আজকের খুশি নষ্ট করার তো মানে নেই কোনো।

সিস্টার বললেন, হু ইজ দ্যাট লেডি ?

চমকে উঠল পৃথু।

বিজ্‌লীর কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। কত দূর থেকে বাসে করে এসেছে সে ধুলো মেখে পেত্নী হয়ে শুধু ওকে একটু দেখতে। কত ঋণই যে জমছে, কত জনের কাছে।

হু ও'জ দ্যাট লেডি ?

আবারও শুধোলেন সিস্টার লাওয়াঙে। রীতিমত সার্জেণ্ট মেজরের গলায়।

য়্যু আর ভেরি মাচ্ ইনকুইজিটিভ সিস্টার। লিমিট্‌লেসলি ইনকুইজিটিভ্।

অ্যাম আই ? ওয়েল...লজ্জিত হয়ে বললেন সিস্টার।

পৃথু ভাবল, বলে, দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস।

কিন্তু তা না বলে, বলল, শী ইজ আ হোর ! আ প্রস্টিট্যুট।

হোয়াট ?

হেঁচকি তুললেন সিস্টার।

ইয়েস। শী ইজ। আ বাইজী, হু ওলসো গিভস হার বডি ফর মানি।

মাই ! মাই ! য়্যু শুড বি অ্যাশেমড অফ ইওরসেলফ মিঃ ঘোষ।

পৃথু সিস্টারের চোখে চোখ রেখে বলল, আই নীড নট বী।

বাট হোয়াই ? হোয়াই মিঃ ঘোষ ?

বিকজ শী ইজ পিওরার দ্যান মেনি উইমেন আই নো অফ। ওর মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই। বড় পবিত্র মেয়ে এই বিজলী। মানুষ অনেকই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু একজন খাঁটি মানুষের দেখা এক জীবনে খুব কমই মেলে।

য়্যু আর আ স্ট্রেঞ্জ জেণ্টেলম্যান মিঃ ঘোষ।

আই ডু নট ক্লেইম মাইসেলফ টু বি আ জেণ্টেলম্যান। অন দ্যা কনট্রারি, আই ডেসপাইস্ ওল্।

য়্যু আর রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ। য়্যু হ্যাভ সাচ্ আ ওয়াইফ্, সাচ্ চিলড্রেন্ অ্যাণ্ড য়্যু হ্যাভ ইওর এড়ুকেশান ইন ইংল্যাণ্ড ; মাই! মাই!

কী জানেন এই মহিলা ? জীবনের কতটুকু জানেন ? বিরক্তি লাগছিল পৃথুর। ক্লান্তিতে ও দুচোখই বন্ধ করে ফেলল। মাথা ধরে আসছিল। কথাও বলেছে অনেকক্ষণ। তারপর শারীরিক উত্তেজনা।

সিস্টার লাওয়াণ্ডে আবারও স্বগতোক্তি করলেন, হোয়াট আ স্ট্রেঞ্জ পার্সন্ য়্যু রিয়্যালি আর মিঃ ঘোষ।

ও জানে। ও জানে তা। একজন অজীব আদ্‌মি হচ্ছে এই পৃথু ঘোষ। সকলেই জানে।



ঠুঠা বাইগা কুড়িদিন হল একটানা জঙ্গলে রয়েছে এবার। রোদে পুড়ে, চেহারাটা তামাটে হয়ে গেছে। জঙ্গলের রঙে এখন তার চোখ ভরা, শব্দেও ভরে আছে কান। জংলি, আবার জংলি হতে পেরে খুশি হয়েছে বড়।

কাল রাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। প্রতি বছরই জানুয়ারির শেষাশেষি একবার তুমুল ঝড়বৃষ্টি হয়ই। কিন্তু এবার আবারও একবার হল ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি।

কাল রাতের ঝড়ের মধ্যেই এক বিশেষ কাণ্ড ঘটে গেছে ঠুঠার জীবনে। সাংঘাতিক কাণ্ড।

গুহাটার মধ্যে ঝড়-জলের ঝাপ্‌টা বাঁচিয়ে দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে উৎকর্ণ হয়ে সাবধানে বসেছিল ঠুঠা। এইরকম রাতেই তো কাট্‌নেওয়ালা জানোয়ারেরা সব বেরোয়। গুহাটার কাছে পৌঁছে উঁকি মেরেই বুঝেছিল যে, এক ভালুক-দম্পতির বাসা সেটা। তাই-ই বিকেল-বিকেল এসেই দখল নিয়ে নিয়েছিল। ভালুকেরা যখন গুহার দিকে ফিরে আসছিল সন্ধের মুখে, তখন ওদের দিকে বন্দুক তাক্ করে ভয় দেখাতেই পালিয়ে গেছিল ওরা। মানুষের মতো, জংলি কুকুরেরই মতো, ভালুকেরাও বড় সামান্যতেই ভয় পায়। লুকোয়, ভীরুর মতো ; তাদের চেয়ে অনেক কম শক্তিমানদের চোখ-রাঙানিতেই। মানুষের মধ্যে যেমন, সব প্রাণীরও মধ্যে মেরুদণ্ডহীন থাকে অনেকেই !

কে জানে, বেচারা উদ্বাস্তু ভালুকেরা এই ঝড়-জলের রাতে মাথা গোঁজার কোনো আশ্রয় এখনও খুঁজে পেল কিনা !

ঘুমোতে যাবার আগে, গুহার মুখে একটি কাঁটা-ঝোপ কেটে বসিয়ে দিয়েছিল ঠুঠা। আগুন করেছিল গুহার মধ্যে, তারপর আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমোবার সময় যাতে কেউ হাম্‌লা করতে না পারে, সে সম্বন্ধে সাবধানও হয়েছিল। ওর পাতলা ঘুম ভেঙে গেছিল বাজ পড়ার কড়াক্কড় আওয়াজে। গাছপালা, পাতা, ঘাস, লতা সব উথালপাতাল করছিল ঝড়ে, মাঝরাতে। ঐভাবেই

কম্বলে গা-মাথা মুড়ে বসে থাকতে থাকতেই ঠুঠার তন্দ্রামত এসে গেছিল। এমন সময়, স্বপ্নই কি দেখল ও ? না, সত্যি ? ঠুঠা বাইগা দেখল, গুহামুখে ; সমস্ত গুহার বাইরেটা চাঁদের আলোর মতো এক নরম ভিজে আলোয় ভরে দিয়ে, নাঙ্গা বাইগিন্ এসে দাঁড়িয়েছেন। মেঘগর্জনের মধ্যে অথবা মেঘগর্জনের মতোই গলায় বাইগিন্ আদেশ করলেন ঠুঠাকে : পুবের দিকে দুই ক্রোশ। না গেলে বাইগিনের রোষ। ভোঁরের মাঠে মস্ত শিমুল। পুজো দেবি তার নিচেতে। আর কালো কুক্‌রা চারটো দেবি, লাল্‌চে হরিণ একটো। তাদের রক্ত দিয়ে সেই মস্ত শিমুল রাঙিয়ে দেবি। সে শিমুলের ডালে ডালে বেঁধে দেবি কাল্‌চে পাথর, কান খুলে শোন্ শিকড়হারা বাইগা ঠুঠা। বাঁধবি পাথর, আমার নামে ; হাজার হাজার। খুশি হলে ফিরিয়ে দেব ; তোর বান্‌জার।

পাথরের ভারে নুয়ে পড়বে শিমুল দু' পাশে, হাড়-জিরজিরে হয়ে যাবি তুই, নড়তেও পারবি না ; তখন সেই শিমুলই বলে দেবে তোকে মন্ত্র। তোর ছুটির মন্ত্র বলবে তোকে। ঠুঠা বাইগা। শহরে-যাওয়া, শহরে-থাকা ঝুঠা-বাইগা। সেই মন্ত্রে তোর শুদ্ধি হবে। অনেকই পাপ লেগেছে তোর গায়ে আর মনে শহরে থেকে থেকে। ফিরে দেব তোর গ্রাম আমি তোকে। কিন্তু সেই গ্রামে তুই একাই থাকবি। এক ভালুক্‌নিকে বিয়ে করবি। মনে থাকে যেন।

শহবের কোনো মানুষের পা যদি সেখানে পড়ে, তবে সেই মানুষকেও সঙ্গে সঙ্গে খুন করে তার বক্তে দিয়ে শিমুলের গুঁড়িতে সিঁদুর লাগাবি। জানবি, তা আমারই পুজো। না করলে 'মারাই দেবী' ঠিক খুঁজে নেবে তোকে। তারপর দেখিস্।

রোজ সকালে পুজো করবি গাছকে, নদীতে চান সেরে উঠে। একটি হাজার কালো পাথরেব চাঙড় অথবা গোলা যখন বাঁধা হবে, শিমুলের হাতগুলো আর মাথাটা দেখবি যখন একেবারে নুয়ে পড়েছে আমার আশীর্বাদে, তখন বললামই ত' শিমুলই তোকে বলে দেবে তোর গ্রামের হদিস, ঠিক্‌ঠাক। অথবা সে খুশি হলে আগেভাগেই হয়ত পারে বলে দিতে। সবই তোর কপাল।

বলেই, বাইগিন্ মিলিয়ে গেলেন।

যতক্ষণ ছিলেন, ঝড়বৃষ্টির আওয়াজ শোনাই যায়নি। সব আওয়াজই থেমে গেছিল।

চলে যেতেই, এবার আবার উথালপাতাল করতে লাগল প্রকৃতি। তার ভয়ংকর শব্দে ভয়ংকর ঠুঠা বাইগাও ভয় পেয়ে গেল। এর পরে ঘুম আর হল না ঠুঠার। শেষরাতে তন্দ্রা এসেছিল একটু আবার।

ভোব হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর ঠুঠার ঘুম ভাঙল। চোখ চেয়েই দেখল, গুহামুখের সামনে এক ভালুকী একা বসে আছে। ঠুঠাকে দেখেই লাজুক-লাজুক মুখ করে মুখ নামিয়ে নিল। ঠুঠা কাঁটা-ঝোপের আড়াল সরিয়ে বাইরে বেরুতেই সে লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগল পাহাড় বেয়ে। ঠুঠা তার দিকে চেয়ে বলল, বাইগিনের আজ্ঞা ! ভালই হবে বউ ! কালা-বাঘের বউ, কালি-ভালকিন্।

ভালুক্‌নি তার দিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ভাল করে চেয়েই আবার মিলিয়ে গেল জঙ্গলে।

এসব কি সত্যি ? না, স্বপ্নই ?

আহা ! কী রূপ। নাঙ্গা বাইগিনের ! নরম, সাদা আলোয় ভরে গেছিল যেন অন্ধকার ঝড়-জলের রাত। তাঁর গায়ে কদম ফুলের গন্ধ ছিল। হাসছিলেন যেন দেবী।

গুহার বাইরে এসেই আবার দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফেলল ঠুঠা। ভয় হল একটু। এবার কি সত্যি তার মরার সময় হল ? দেব-দেবীর দর্শন মানেই তো মৃত্যুর ঘন্টা বাজা। স্বপ্ন, না সত্যি ?

হঠাৎ ঝড়ে ঝরে-যাওয়া পাতার স্তূপের মধ্যে খচ্‌খচ্ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল ঠুঠা, একদল বুনো মোরগ চরছে সেখানে। উঁক্-কুঁক্-কুঁক্-কঁরর্- আঁ-আ- অঁরর করে পায়ে পায়ে পাতা ওলট-পালট্ করে পোকামাকড় খুঁজে বেড়াচ্ছে। সকালের রোদ তাদের রঙিন পালকে জেল্লা লাগিয়েছে।

দেবী বলেছিলেন : চারটো কাল্‌চে কুক্‌রা দেবি।

কী হচ্ছে এসব ! কি ?

আগে ভালুকী। তারপর কুক্‌রাও এসে হাজির। যেন ভোজবাজি। তবে কি সত্যিই ?

গা ছমছম্ করে উঠল ঠুঠা বাইগার। সকালের রোদ, ঝুপ্ করে ঠাণ্ডা মেরে গেল। ভীষণই শীত করতে লাগল ঠুঠার। ভয়ের জন্যই বেড়ে গেল শীত। বাইগিনের আদেশমতো নিঃশব্দে গুহাতে ফিরে গিয়ে বন্দুকটা থেকে বড় জানোয়ার-মারার সিসের বলটা বের করে, ঝুরি-সীসে ভরল নলে ; গেদে গেদে। মুরগি মারার জন্যে। বারুদও বের করে নিয়ে নতুন করে ভরল বারুদ দু' আঙুলি কস্কে। বারুদের মুখে দিল সীসে। শেষে, টোপি চড়াল তার গাদা বন্দুকে।

ইচ্ছে করেই দেরি করছিল ও, মুরগিগুলো কী করে, তা দেখবার জন্যে। যদি সত্যিই নাঙ্গা বাইগিন্ই এসে থাকেন কাল রাতে, তাহলে ঐ মুরগির দলের কোথাওই পালাবার উপায়টি থাকার কথা নয়। ঐ একই জায়গায় ঠুঠার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তাদের। ওদের মৃত্যুর ঘণ্টা তাহলে বেজে গেছে। দেখা যাক। পালায় কি পালায় না।

মনে মনে প্রার্থনা করছিল ঠুঠা, ও যখন গুহা থেকে বন্দুক হাতে বেরোবে, মুরগিরা যেন না থাকে ওখানে আদৌ। দেবদেবীর রোষ ও প্রসন্নতা দুই-ই সমান ক্ষতির। মাথাখারাপ হয়ে যাবে শেষে ওব ? হয়ে যাবে, হয়তো বদ্ধ উন্মাদই ! পৃথুর বাবার সেই দাদার মতো। ওর নিজের জাতের কোনো লোক এই অবস্থায় ওকে দেখতে পেলে কোনো 'দেয়ার'কে দিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে, পুজো চড়িয়ে ; তার কী বিধান দেবে কে জানে ! হয়তো বড়হাদেবের পায়ে বলিই দেবে নিয়ে গিয়ে তাকে। সকলকে বলবে, ভূতের ভর হয়েছে ওর ওপর।

ঠুঠা যখন বন্দুকটা ঠিক্ঠাক্ করে নিয়ে বাইরে এল, তখন ও চম্কেই গেল একেবারে। মুরগির দলেব পায়ে যেন সত্যিই কেউ আঠা লাগিয়ে দিয়েছে। ঐ ঝরা-পাতার স্তূপের মধ্যেই একে অন্যের গায়ে লেগে ওরা পোকা খুঁটে খাচ্ছে ঘুরে ঘুরে। অথচ এতখানি সময়ের মধ্যে খাবার খুঁজে খুঁজে ওদের অনেকই দূর চলে যাবার কথা ছিল।

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রইল ঠুঠা।

দলের মধ্যে পাঁচটা ছিল কালো কুক্রা। এমন করে নিশানা নেবে ভাবল ; যাতে এক ঘোড়ার দাবানিতেই অন্তত চারটে কালো কুক্রাই মরে, ঝুরি-সীসের ঝাপড়ে। এমন সময় হঠাৎই ময়ূরের কেঁয়া-কেঁয়া-কেঁয়া তীক্ষ্ণ চিৎকাবে বৃষ্টি-ভেজা রোদ-ঝল্মল্ সুগন্ধি জঙ্গল চম্কে উঠল। একটা সাপ ধরেছে ময়ূবটা, সামনের বেলগাছের নিচে। সাপটা ঠিক কোন্ জাতের বোঝা যাচ্ছে না। তার সোনালি আর কালো ডোরা রোদের সোনা আর বনের সবুজ আর ময়ূরের পাখার জেল্লা-দেওয়া বেগুনির মধ্যে মধ্যে ঝিক্মিক্ করে উঠছে। সাপটা ছট্ফট্ করছে। তাকে টুকরো করে কাটছে ময়ূর মনোযোগের সঙ্গে, তীক্ষ্ণ ঠোঁটে।

বন্দুকটা আস্তে করে তুলে নিয়ে নিশানা নিল ঠুঠা। বন্দুক ওঠানো দেখেই, মুরগির ঝাঁকের কঁক্কঁকিয়ে উড়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপও করল না। মুরগিদের দিকে চেয়ে ভাল করে নিশানা নিয়ে গুলি করল। লদ্কে পড়ল চারটে কালো এবং একটা লাল মোরগ ঝুরি-সীসের ছর্রা গুলিতে। বনে বনে হর্রা উঠল সম্মিলিত পাখি আর জানোয়ারদের। নেপালি ইঁদুরেরা উঁচু গাছের মাথার ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল চিক্-চিচিক্-চিক্ করে। হনুমানেরা হল্লা-গুল্লা ওঠাল দূরের বনে হুপ্-হুপ্-হুপ্-হুপ্ করে সংক্ষিপ্ত গম্ভীর অনবরত ডাক ডেকে। ময়ূরটা, সাপটাকে দু' পায়ে ঝুলিয়ে নিয়ে উড়ে গেল ভারী ভারী ডানায় সপ্সপ্ আওয়াজ করে।

সব শান্ত হয়ে গেলে, বন্দুক হাতে ঠুঠা বাইগা এবং পালক এলোমেলো-হয়ে-যাওয়া, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উল্টেপড়ে-থাকা মুরগিগুলোও ভোরের নিস্তব্ধতার ভাঁড়ারে সেঁধিয়ে গেল। একটা একলা মৌটুসকি পাখি ফিস্ফিস্ করে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে, সেই প্রভাতী বনের নিস্তব্ধতা আরও বাড়িয়ে দিল যেন হঠাৎই।

উঠল ঠুঠা ; পুঁটুলি আর বন্দুকটা নিয়ে। তারপর কী ভেবে, বন্দুকটাতে আবারও বারুদ গাদল, এবারও দু আঙুল। ছুম্মচ্কে। যে সীসের বলটা আগে বের করে নিয়েছিল এবারে সেটাকে আবার সামনে ভরে নিল। তারপর নেমে এল গুহা থেকে, কালো পাথর টপ্কে টপ্কে, ভাল্লুকেরই মতো। ভালুক্নি যে বউ হবে তার ! নিচে নেমে, লতা ছিঁড়ে নিয়ে কুক্রা পাঁচটিকে বাঁধল একসঙ্গে। কালো

চারটে দিয়ে পুজো চড়হাবে বাইগিনের। আর লালটা ওর নিজের জন্যে। ঝল্‌সে নিয়ে খাবে।

দু' ক্রোশ পুবে যেতে বলেছিলেন নাঙ্গা বাইগিন্।

ঠুঠা কি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছে ? যাবে কি ও ? পুবে ? নাঙ্গা বাইগিনের দেখা পাওয়ার পর তো কারোই বেঁচে থাকার কথা নয়। কী যে হল ! কী যে হল ঠুঠা বাইগার জীবনের এই শেষ বিকেলে পৌঁছে !

পেছন থেকে কোনো অদৃশ্য হাত যেন সামনের দিকে হঠাৎ ঠেলে দিল ওকে।

সূর্যটা ততক্ষণে দিগন্তজোড়া দেওয়ালেরই মতো পাহাড়-শ্রেণীর মাথায় উঠে এসেছে লাল-পাগড়ি পাহারাদারের মতো। একেবারে সূর্যর দিকেই মুখ করে, কাঁধের বন্দুকটাকে লাঠির মতো করে শুইয়ে দিয়ে, তার উপরে লতা-দিয়ে-বাঁধা মুরগিগুলোকে ঝুলিয়ে নিয়ে, অন্য হাতে পুঁটলিটা তুলে নিয়ে, রওয়ানা হল ঠুঠা, একেবারে সূর্যমুখী হয়ে। সূর্যের মধ্যেই সেঁধিয়ে যাবে বলে। বাইগিনের আদেশ ! ভাবতে ভাবতে ; গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে সূর্যর দিকে চেয়ে চলতে লাগল ঠুঠা।

দেখতে দেখতেই কি দু' ক্রোশ চলে এল ? একটা শিমুল গাছ ! নাঃ। এত ছোট্ট শিমুল ! তাছাড়া, দু ক্রোশ পথ বনের মধ্যে হাঁটতে সময়ও ত লাগে। এ তো আর হাটচান্দ্রার পিচ-রাস্তা নয়। অভ্যেসও চলে গেছে, এইসব পথে অনায়াসে হাঁটার। সব দিক দিয়েই এখন ঝুটা হয়ে গেছে ও।

এবার বাঁদিকে গভীর ঘন শাল বন। দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে আছে নিচটা। অনেকক্ষণ চলল তারই পাশে পাশে। শালবনের পরে একটা মস্ত ভোঁর ঘাসের মাঠ। একদল শম্বর চরছে সেখানে। দলে, দুটি শিঙাল আর পাঁচটি মাদিন্। ওকে দেখতে পেয়েই দলটা ঘবাক্ ঘ্বাক্ করে চম্‌কে ডেকে উঠেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কোনো শিশি থেকে ছিপি একটানে খুললে যেমন একধরনের হঠাৎ-আওয়াজ হয়, শম্বরদের ডাকটা অনেকটা সেইরকমই মনে হয় ঠুঠার। প্রথমে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েই পরে একই দিকে দৌড়ে যাওয়া শম্বরদের ঘন খয়েবি আর পাট্‌কিলে রঙের মোটা-লোমে মোড়া শীতের পোশাকের দিকে কয়েক মুহূর্ত অনবধানে চেয়ে রইল ও। অনবধানে ; কারণ বাইগিন্ এদের কথা বলেননি কিছুই। খুরে খুরে খটাখট্ আওয়াজ তুলে দৌড়ল ওরা, বাইসনদেরই মতো শব্দ করে ; পালাবার সময়।

মুখ ঘুরোতেই হঠাৎই চোখে পড়ল শিমুলটা। মস্ত শিমুল। ভিজে সকালের সূর্যকে যেন মুকুটের মতো মাথায় পরে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে। দুপাশে টান টান করে সমান্তরালে ডাল ছড়িয়ে দিয়েছে, যেন প্রভাতী-ব্যায়াম করছে কোনো ধব্‌ধবে ফর্সা মিলিটারি জওয়ান।

থ মেরে গেল ঠুঠা। ওর হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল থর্‌থর্ করে। কাঁধে রাখা বন্দুক থেকে পিছলে, নিচে পড়ে গেল লতা-বাঁধা মুরগিগুলো। থেবড়ে বসে পড়ল ও ভিজে ভোঁর ঘাসে ভরা মাটিতেই। এইই তো ! এইই তো সেই শিমুল ! এ তো তাদের বান্‌জারিরই শিমুল ! হ্যাঁ, ঠিকই ত ! কিন্তু বাইগিন্ তবে যে বললেন, এই শিমুলে পুজো আর পাথর চড়ালে তবেই শিমুল তাকে হদিস দেবে ?

আরে ! এ তো পেয়েই গেছি। একি ! তবে ? শিমুল কি এমনিতেই প্রসন্ন আছে ঠুঠার উপর ? না, না কথা এবারে রাখতেই হবে। সব কথাই রাখতে হবে এইবারে।

ঠুঠার কপালের শিরায় শিরায়, হাত পায়ের ধমনীতে ধমনীতে রক্ত দৌড়ে বেড়াতে লাগল জংলি-ইঁদুরের মতো। কী করবে এবার, ভাবতে লাগল ঠুঠা। ঠিক সেই সময়ই তার ডানদিক থেকে একটি লাল কোট্‌রা হরিণ ডেকে উঠল, ব্বাক্ ! ব্বাক্ ! ব্বাক্ !

চম্‌কে চাইল ও। শিমুলের ফুল ধরতে এখনও অনেকই দেরি। শিমুল ফুল খেতে ভালবাসে এরা। কিন্তু এখন ?

আশ্চর্য ! কোট্‌রাটাও নড়ল না। ঠুঠার দিকে মুখ করে ডাকতে লাগল, মুখ উঁচু করে, লেজ নেড়ে নেড়ে।

হাসল ঠুঠা, মনে মনে। বাইগিনেরই দয়া ! সারা জীবন জঙ্গলে কাটাল, এমন রকমসকম দেখেনি

কোনো কোট্‌রার কখনও। বন্দুকটা তুলে ধরল লাল হরিণটার দিকে।

সেটা আবার ডাকল, ব্বাক্ ব্বাক্ ব্বাক্।

কে যেন, তার পায়েও আঠা লাগিয়ে ভোঁর ঘাসের কিনারের পাথরের সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে পায়ের খুরগুলোকে। কোট্‌রাটা দৌড়ে পালাতে গিয়েও যেন পারছে না। গাড়ির ব্রেক কষ্‌লে যেমন চার-চাকায় দাঁড়িয়ে-পড়া হঠাৎ-থামা গাড়িটার শরীর সামনে উছ্‌লে যেতে চায়; তেমন করেই ওর শরীরটাও উছ্‌লে যেতে চাইছে।

ঠিক ঘাড় আর বুকের মাঝামাঝি নিশানা নিয়ে ঘোড়া টেনে দিল ঠুঠা। একবার ছল্‌কে উঠল কোট্‌রাটা উপরে, এবং সেই মুহূর্তেই কোন্ অদৃশ্য হাত যেন তার পা চারটিকে আল্‌গা করে দিল। পরক্ষণেই ছড়ানো-ছিটানো কালো পাথরের উপর আছড়ে পড়ল লাল হরিণটি। জিভটা হঠাৎ-আঘাতের আকস্মিকতায় বেরিয়ে গেছ্‌লি। দাঁতে ধরা ছিল সেটা।

ঠুঠা এবার ছুরিটা কোমর থেকে খুলে, এগোল। তার শরীরে কে যেন হঠাৎই অসুরের বল যোগাল। কোট্‌রাটাকে তুলে নিয়ে এল শিমুলতলিতে। কালো কুক্‌রা চারটেকেও আনল। তারপর সকলের গলা কেটে কালো কুক্‌রার আর লাল কোটরার জবা-লাল রক্তেব সিঁদুর দিয়ে লেপে দিল বাইগিনের স্বপ্নাদেশের শিমুলের সারা গা। লেপে দিল গুঁড়িতে, গুঁড়ির সব খোপগুলোতে। লেপে দিল যতদূর হাত পৌঁছায় ওর, ততদূর অবধি। যত রক্ত ছিল লাল হরিণের আব কালো কুক্‌রার সবই নিঃশেষে শুষে নিল সেই ভয়ংকর পিপাসার গাছ। রক্ত যখন লাগাচ্ছিল হাত দিয়ে তখন গাছের অদৃশ্য অসংখ্য খরখরে জিভগুলো ঠুঠার হাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। জ্যান্ত, পিপাসী জিভের গাছ।

গাছটাব পেছনেই নদী ছিল একটা। তার কুলকুলানি আওয়াজ ভেসে আসছিল অনেকক্ষণ থেকেই।

হাত-পায়ের রক্ত ধোবে বলে, নদীর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই নদীর পাড়ে পৌঁছে চমকে উঠল ও। চিৎকার করে উঠল উল্লাসে। এ তো তাদেরই বান্‌জার। তাব ছেলেবেলার বান্‌জার। প্রিয় সখা। সেই বড় বড় কালো পাথরগুলো নদীর মধ্যে দু'পাড় থেকে ঝুঁকে পড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঁর গাছগুলি। নদীর মধ্যের পাথরগুলোর মাথাগুলিই জেগে থাকে শুধু বর্ষায়। হেমন্তর প্রথম থেকে ওদের কালো কালো গা বের করতে থাকে ওরা, গ্রীষ্মের শেষে অবশ্য সমস্তটুকু গা-ই বেরিয়ে পড়ে। ডান দিকের মস্তবড়, কালো, চ্যাটালো পাথরটার উপরই বহুদিন আগের এক নির্জন গ্রীষ্ম-দুপুরে ঠুঠা বাইগা তার জীবনের প্রথম নারীকে অনাবৃত করে, শুইয়ে ফেলে, তার দু' উরুর মাঝের স্বাদু, নিভৃত এলোকেশী রেশমি নম্রতার স্বাদ নিয়েছিল। গবম বালির মধ্যে ছট্‌ফট-করা তিতিরের মতো, এক তীব্র, প্রায়-প্রাণঘাতী অস্বস্তিতেই ভরে গেছিল ওর সমস্ত শরীর। তার সঙ্গিনীরও রকম-সকম দেখে অনভিজ্ঞ, প্রথম-যৌবনের ঠুঠার মনে হয়েছিল, মেয়েটা মরেই গেল বুঝি। আনন্দেও যে মরণ হতে পারে, জানা ছিল না.....। সেই ছট্‌ফটানিটাই এত বছর পরে অসংখ্য গ্রীষ্ম-দুপুর পেরিয়ে আবার ফিরে এল ঠুঠার শরীরে, এই শীতের সকালে। জামা-কাপড় খুলে ঐ ঠাণ্ডা জলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর সাঁতরে গেল সেই পাথরটারই উপর। উপুড় হয়ে শুল তার বুকের উপর। তার সঙ্গিনীকে কল্পনা করল; যেন সেও আছে তার সঙ্গে।

তারপরই খল্‌খল্ করে হেসে; উঠে বসল ঠুঠা।

হাসির শব্দে চল্‌কে-চলা জলের বেগ বাড়ল, রোদের আয়না চম্‌কে জল থেকে উঠে লাফিয়ে গেল চাঁরগাছের পাতায় পাতায়।

হাসছিল ঠুঠা। অনেক অনেকদিন পর হাসছিল ও কেঁপে কেঁপে। যা চলে যায় তা আর ফেরে না; মন, শরীর; তীব্র সব অনুভব। থেকে যায় স্মৃতি; শুধু স্মৃতিই; এই মৌন অনড় কালো পাথর আর চল্‌কে-চলা নদীব চলমান গায়ে লেখা কত কথাই যে মনে পড়ছিল! শিকড়-পাওয়া ঠুঠা, খুশিতে বেহিসেবি হয়ে উঠেছিল।

চাঁর গাছের মিষ্টি ছায়ায় উচ্ছল নদীর মধ্যের কালো পাথরের উপরে যে সঙ্গিনীর সঙ্গে নিঃশেষে

শরীর জীবনে প্রথমবার ভাগাভাগি করেছিল একদিন, সেই সঙ্গিনী তার বুড়ি হয়ে গেছে। দেখা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। সাদা চুল, ফোকলা দাঁত, কোলে নাতি, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, অমন বুক দুটি ঝুলে পড়েছে বাড়ির চাল থেকে ঝোলা লাউকির মতো। ছিঃ ছিঃ। যৌবনের আয়ু কী যে কম! কিচুল রাজার জাত, কচ্ছপদেরও বড়হাদেব কত দীর্ঘ আয়ু দিলেন। তার বদলে মানুষের যৌবনের আয়ু যদি বাড়িয়ে দিতেন কিছুটা, বেশ কিছুটা ; কী ভালই না হত তাহলে!

অনেকক্ষণ ধরে চান সেরে বড় খুশিমনে পবিত্র হয়ে গাছতলায় ফিরে এল ঠুঠা। ঠিক করল, এবার একটু ছাতু খেয়ে নেবে। ওর নিজের কুক্‌রাটাকেও পাতা-টাতা চাপা দিয়ে রাখবে কোন গাছতলায়, যাতে একটু পর বা রাতের বেলা ঝলসে নিতে অসুবিধা না হয়। খেয়ে নিয়ে, তারপর পাথর এনে এনে জড়ো করতে হবে গাছতলায়, আর অনেক লতা ; শক্ত দেখে। তারও পর, এক একটি করে পাথর বয়ে গাছের উপরে চড়ে তাদের ডালে ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

ঠুঠা একবার কয়েক পা পেছনে হেঁটে এসে শিমুল গাছটার দিকে তাকাল ভাল করে। ঈবেঃ। বাবাঃ। কত উঁচু! কত যে ডাল ছড়িয়েছে সে দু'পাশে টান টান। কত বছর লাগবে তা একা একা এই গাছকে পাথর দিয়ে মুড়তে? পারবে?

গাছটার মগডালে-একটা গোলাপি-গলার জঙ্গুলে শকুন বসেছিল। ঠুঠাকে দেখে সে ডানা দুটো মেলল একবার। আবাব বন্ধ করল। নিজের মনে কি যেন বলল, কুৎসিত কর্কশ ভাষায়। অনেকক্ষণ রক্তে-লাল-গাছটার মাথার দিকে এবং শকুনটার দিকে চেয়ে থাকল ঠুঠা। ওর মুখ আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এল। তারপর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল। উপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল সে। নাঙ্গা বাইগিনের স্বপ্নের মানে বুঝতে পারল। এই প্রাচীন শিমুলের ডালে ডালে পাথর বাঁধতে বাঁধতেই জীবনের বাকি দিন কটি শেষ হয়ে যাবে। হয়তো তাব অনেক আগেই উপরের কোনো ডাল থেকে নিচের পাথুরে মাটিতে হাত বা পা ফসকে পড়ে ফওত হয়ে যাবে ও। তার মুখ থেকে ছিট্‌কে-ওঠা রক্ত, সিঁদুর হয়ে লেগে থাকবে বুড়ো-শিমুলের কাণ্ডে। তাবও পর শকুন। সে তো আছেই! সঙ্গে তার বন্ধুরাও আসবে।

কিন্তু পৃথু? পৃথুর প্রতি যে ঠুঠার এখনও অনেক দায়িত্ব কর্তব্য আছে বাকি!

আবারও মেঘ করে এল। হচ্ছেটা কি? কালকের মতো আজও কি দুর্যোগ হবে? এই অসময়ে?

ঝুর্‌ঝুর্ করে শুকনো শালপাতা উড়িয়ে গড়িয়ে ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাওয়াটা। হলুদ, লাল, খয়েরি, সবুজ, গাঢ-সবুজ সব পাতারা হাত ধরাধরি করে গিয়ে জঙ্গলের শাড়ির পাড়ের মতো জমা হচ্ছে এক জায়গায় ; আবার একটু পরই সরে যাবে বলে।

কে যেন ঠুঠার মাথার মধ্যে বলল, নাঙ্গা বাইগিনের আদেশ শিরোধার্য। ঠুঠা বাইগা, তুমি ভুলে যেও না যে, তুমি একজন বাইগা। গোন্দ্, বাইগা, অবুঝমার পাহাড়ের মারিয়ারা শহরের মানুষ নয়। শহবের মানুষরা তোমাদের কেউই নয়। তোমরা ওদের মতো হতে যেও না, ওরাও তোমাদের মতো হতে চায় না যেন। অত সহজে কি অন্য কিছু হওয়া যায়? বড় ভালবাসা লাগে তাতে। অত ভালবাসা কি সকলের বুকে থাকে?

কিন্তু পৃথু যে আমার সন্তানেরই মতো, ভাবল, দ্বিধাগ্রস্ত ঠুঠা। অনেকেই যে ভালোবাসি তাকে।

হাওয়াটা শনশন করে বলে উঠল, পারবে? সেই সন্তানকে এনে এই শিমুলের নিচে বলি দিতে? সিঁদুর চাই যে! অনেক সিঁদুর। রক্ত। টাট্‌কা, লাল ; গরম রক্ত।

দু'কানে হাত চাপা দিয়ে মাটিতে ধবপ্ করে বসে পড়ল ঠুঠা। বড যন্ত্রণা মাথাব মধ্যে। দু'কানের পাশে। পিপাসা বড়। পাগল হয়ে যাবে, পাগল হয়ে যাচ্ছে ঠুঠা। ঠুঠা দেখতে পাচ্ছে, নাঙ্গা বাইগিন্ শালবনের ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে আসছেন। ঠুঠার দিকে আঙুল তুলে কী সব বলছেন। ময়ূব ডেকে উঠল চারপাশ থেকে জোরে জোরে। ময়ূর, মেঘ বড ভালবাসে। ভালবাসে সাপ। সাপখেকো ময়ূর। ঠুঠা কি পৃথুকে খাবে!

অনেকক্ষণ পর যখন চোখ খুলল, ওর জ্ঞান হল, শুনল, বড়কি ধনেশ পাখিদের মেলা বসেছে

একটা কুচিলা (নোক্সভোমিকা) গাছে। আর তারা স্বগতোক্তি করছে ইক্ ইক্ হ্যাঁকো ইক্। দুপুরে গড়িয়ে গেছে সকাল। মেঘ, গাঢ় হয়েছে আরও। ধড়মড় করে উঠে বসল ও। এখনও অনেকেই কাজ বাকি। ঠুঠা বাইগার কাজ সবেত' শুরু হল।

কবে...... ? কে জানে শেষ হবে কবে। হবে কি ?

এমনি ঘোরের মধ্যেই কেটে গেল সারা দিনটা। একবার ঘুম একবার জাগা, একবার জাগা একবার ঘুম এই করে। মেঘ জমতে লাগল পরতে পরতে আকাশে। ক্রমাগত গাছে উঠে আর নেমে দাঁতে করে লতা আর হাতে করে পাথর বয়ে বয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে গেল ঠুঠা। শেষ বিকেলে বৃষ্টিও নামল তুমুল। মেঘ গর্জাতে লাগল ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। ঐ শিমুলেরই নিচে গুড়ি সুড়ি মেরে বসে রইল ঠুঠা। গাছে হেলান দেওয়ার সাহস হলো না। দেবীর গাছ। যদি চটে ওঠেন বাইগিন্ ? দু হাঁটুর মাঝে মুখ গুজে ঘুমিয়ে পড়ল ও ক্লান্তিতে।

বৃষ্টি কখন থামল জানেও না ও। যখন ঘুম ভাঙল তখন চোখ মেলে দেখল, রাত হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে নবমীর চাঁদ উঠেছে। বৃষ্টি-ভেজা বন পাহাড় চক্‌চক্ করছে রূপোঝুরি আলোতে আর নদীর ওপার থেকে পাহাড়ের খোলে কারা যেন গান গাইছে। মাদল বাজছে। বাজছে ধাম্‌সা। সঙ্গে ধুম্‌সো ছেলে আর ধুম্‌সী মেয়েরা কার্মা নাচছে আর গান গাইছে।

ঠুঠার শ্লথ মস্তিষ্কের মধ্যে হঠাৎ যেন রক্ত চলাচল শুরু হল। গানের সুরটি চেনা-চেনা ঠেকল ওর কানে। বৃষ্টি ভেজা চাঁদের পাহাড়ে আর জঙ্গলে ধামসার শব্দ আর গানের কলিগুলি ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল, পিছলে যেতে লাগল চাঁদের আলোরই মতো জল-পাওয়া মাটির আর গাছ-পাতার গায়ের সোঁদা-সোঁদা গন্ধের মধ্যে। ঘোর লেগে গেল ঠুঠার। গানের কথাগুলো এবার পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও।

আরে ! এ গান ত' শুনেছে ও আগে। এ গান ত' বান্‌জার বাম্‌নি-গ্রামে দেবী সিং-এর সঙ্গে সে শুনেছিল !

তবে ? এই শিমুলটা এত কাছে ছিল, অথচ এতদিন এত ঘোরাঘুরি সত্ত্বেও তার চোখে পড়ল না। পড়ল না দেবী সিং-এর তীক্ষ্ণ চোখেও ? কতদূরে হবে বানজার-বাম্‌নি গ্রাম এখান থেকে ? একবার ভাবল, যায় ঐ শব্দ লক্ষ্য করে। তারপরই মনে পড়ল যে, ও দেবীর আদেশে এখানে এসেছে। অন্য কারো সঙ্গেই দেখা করার উপায় নেই ওর এখন। ও এখন দেবীর বন্দী। বাইগিন-এর দাস। দেবী যখন দয়া করেছেন সেও দেবীর আদেশ পুরোপুরিই মানবে। কথার খেলাপ করবে না কোনো। আদেশ মানার আগেই দেবী তাঁর গ্রামকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাকে সে ত আর শহরের মানুষের মত অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন নয়। সে বেইমানী করবে না। ফেরারী আসামীর মতো জঙ্গলেই সে লুকিয়ে থাকবে, যতদিন না এই বুড়হা শিমুল পাথরের ভারে নত হয়। এর মধ্যে যদি বাইগিন্ আবার দেখা দিয়ে অন্য আদেশ দেন ত অন্য কথা।

গানের কলিগুলো ভেসে আসছিল চাঁদ-ভেজা নদী-বন পিছলে পরিষ্কার।

চলো সাজা-তেরিকা ডাবারি ছিছেলা যাবওওওও··
পরশা ভাদারি মারে হুদারি লাগোদারি
চলো টুরি কার্মা নাচালে খারানা যাবওওওও···

মেয়েরা বলছে :

রাত ভরা কার্মা নাচাইলে
দিনাকে উগত্‌মোলা ছট্টি দেই দেরি
হাম যাব, ঘরা ভাগি যাবওওওও···

ছেলেরা বলছে :

রাত ভরা কার্মা নাচায়োঁওওওও
দিনাকে উগত্‌টুরী ঘর লায়ি যাওওওও···

এই বন, পাহাড়, এই কার্মা নাচের গান, এই রাতের নদীতে পাহাড়ী-মাছের ঘাই-মারার শব্দ, ঘাই

হরিণীর ভয়-পাওয়া ডাক, শিশির পড়ার ফিস্‌ফিসানি, বুনো ফুলের গন্ধ, এইসব ছেড়ে কী করে যে ছিল এত বছর হাটচান্দ্রা শেল্যাক্ কম্পানির আলো-ঝল্‌মল্ কারখানায় ; ভাবলেও নিজের উপর ঘেন্না হয় ঠুঠার। একজন মানুষের বেঁচে থাকার সব কিছু উপাদানই তো বাইগিন্ হাতের কাছেই যুগিয়ে রেখেছিলেন। কেন যে লোভী মানুষ আনন্দ ছেড়ে আরামের পিছনে ছুটল, শান্তি ছেড়ে সুখের পিছনে ; কে জানে তা!

লেখাপড়া শেখাই মানুষের কাল হয়েছে।

আহা! কী করে যে ভুলে ছিল এই জীবনকে ঠুঠা এতদিন! এই গ্রাম, এই বান্‌জাব, নদী, এই বৃষ্টির পরের আশ্চর্য শান্তির রাতকে!

দুটো পেঁচা রুপোলি রাতের স্নিগ্ধ শান্তিকে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ঝগড়া করতে করতে উড়ে এল একেবারে শিমুলের মাথারই উপর ; কিঁচি - কিঁচি - কিঁচি - কিঁচর্ - কিঁচর্ - কিঁচি - কিঁচর্… । শিমুলের মগডালে, দিনের বেলায় যেখানে গোলাপি-গলার জংলি শকুনটা বসেছিল, সেখানে বসে একটি ময়ূর চাঁদ-ভেজা বন পাহাড়কে চমকে দিয়ে কর্কশ গলায় ডেকে উঠল কেঁয়া-কেঁয়া-কেঁযা। তার ডাককে চাঁদ-চক্‌চক্ ভোঁর ঘাসের মাঠ থেকে তুলে নিয়েই বনে বনে ছুঁড়ে দিল পশ্চিমের আধো-আলো আধো-ছায়ার রহস্যে ভরা ঘন শালবনের কালো গভীর থেকে একটা লাল কোট্‌রা : ব্বাক-ব্বাক্-ব্বাক্-ব্বাক্ করে।

বাঘ বেরিয়েছে। রাতের রোঁদে। বনের রাজা। একা একা। যে-রাজা ঘর জানেনি, কোনো রানীরই একান্ত হয়নি কোনোদিন, অপত্য স্নেহের ফাল্‌তু বাঁধনে যে কখনও বাঁধেনি নিজেকে। যে চিরদিনের একা, দোকা, শুধু অলক্ষণেরই। যে পুরুষের সংজ্ঞা। বেশিক্ষণ, বেশিদিন মাদিনের কাছে থাকলে যে মদ্দাও মাদিন্ হয়ে যায়। পুরুষকে নষ্ট করে দেয় নারী! চিরদিনই নষ্ট করেছে।

কত্তদিন বুনো বাঘের গন্ধ নেয়নি নাকে! কত্তদিন!

ঠুঠা ভাবল, বাঘ যদি কাছে আসেই তবে তাকে পাশবালিশ করে আজ রাতে শুয়ে থাকবে শিমুলতলিতে। বড় বাঘের মতো কোলবালিশ আর হয় না। যেন, বাইগিনেরই বরাত দিয়ে বানানো।

নদীপারের পাহাড়ের খোলের গ্রামে এখন মহুয়ায় মাতাল হয়ে উঠেছে ছেলেমেয়েরা। ধামসাতে চাঁটি পড়ছে জোরে জোরে, এলোমেলো-হওয়া হাতে। তাদের গান হয়েছে আগের থেকে আরও জোরদার। ছিপ্‌ছিপে মেয়েগুলোর গলার শিরাগুলি তাদের গলার রুপোর গয়নার ফাঁকে ফাঁকে গানের তোড়ে ফুলে ফুলে উঠছে এখন, গ্রীষ্ম-দুপুরের তৃষিতা তিতিরের গলার শিরার মতন। না-দেখেও, দেখতে পাচ্ছে ঠুঠা বাইগা। শুনতে পাচ্ছে ওদের গান :

> দিনাকে উগত্‌মোলা ছট্টি দেই দেরি
> হাম যাব, ঘরা ভাগি যাবওওওও……
> হাম যাব, ঘরা ভাগি যাবওওওও……



রুষা বসবার ঘরে বসে ছিল। মিলি টুসুর স্কুল খুলে গেছে জানুয়ারির প্রথমেই। ফেব্রুয়ারিতেই শীত কমতে শুরু করেছিল এখন সরস্বতী পুজোর পর শীতের প্রকোপ বেশ কমে গেছে। তবে এইসব জঙ্গুলে এলাকাতে শীত থাকবে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত। আমেজ, এপ্রিলেও।

ভিনোদ আজ লাঞ্চ খাবে বলেছে এসে। দুখীটা ভোলেভালা ছেলে। বেশি বোঝে না। কিন্তু মেরী তেমন নয়। কুক লছমার সিং লোকটাও নিজেব মনেই থাকে। চালাক হচ্ছে মেরী আর অজাইব সিং। রুষা যে সাংঘাতিক কিছু ঘটাতে যাচ্ছে তা ওরা দুজনেই যেন আঁচ করতে পেরেছে। এই দুজনেরই পৃথুব প্রতি এক বিশেষ দুর্বলতা আছে, হয়তো এক বোকা লোকের প্রতি অন্য বোকা লোকের থাকেই। এবং আছে বলেই, মেরীকে কাল রাতে দু'দিনের জন্যে ছুটি দিয়ে দিয়েছে রুষা। ছুটিটা মেরী নিতে চেয়েছিল পরের সপ্তাহের শেষে। কিন্তু রুষা এ সপ্তাহেই ওকে প্রায় জোর করেই পাঠিয়েছে। অজাইব সিংকেও ছুটি দিয়েছে। বলেছে, গাড়ি নিয়েই ওর বাড়িতে যেতে। সেখানে খেয়ে ও ঘুমিয়ে যেন বিকেলে মিলি ও টুসুকে স্কুল থেকে তুলেই ফেরে একেবারে। বাজারে দু'একটি কাজও দিয়ে দিয়েছে সেই সঙ্গে, বাহানা হিসেবে।

অজাইব সিং সবই বুঝেছে। আগে আগে ও মজা পেত। গাড়ির ক্যাসেট প্লেয়ারে ওর ক্যাসেট চাপিয়ে কেস গড়বড়-সড়বড় হলেই ও ওর প্রিয় গান 'ঝুমকা গীড়ারে, ব্যারিলিকা বাজারমে ঝুমকা গীড়ারে' শুনত। কিন্তু আজকাল ওর মনটা খারাপ লাগে। বিশেষ করে, পৃথুর পা কাটা যাওয়ার পর। শুনছে, তার সাহাব নাকি চাকরিও ছেড়ে দেবেন। তার উপর মেমসাহেবের এই বেলেল্লাপনা। আওরতদের সব সময়ই ডাণ্ডার উপরে রাখতে হয। জরু আর গরু শক্ত হাতে না সামলালে, থাকে না। ঢাল পেলেই, আওরত জলেরই মতো গড়িয়ে যায়। কোন্ জাহান্নামে যাচ্ছে যে, তা যাচাই না করেই। শুধু গড়ানোতেই আনন্দ ওদের।

অজাইব সিংয়ের নিজের আওরতেরও এই রকম ভীমরতি ধরেছিল একবার। তখনও শেল্যাক্ কোম্পানির চাকরিটা পায়নি অজাইব সিং। কাজ করত হনুমান ট্রান্সপোর্টে। ট্রাক চালাত তখন। হেভি ভেহিকেলস্-এর ড্রাইভিং লাইসেন্সও তার ছিল। লম্বা লম্বা ট্রিপ নিয়ে যেতে হত ইন্দোর, ভোপাল, উজ্জয়িন্, হোশাঙ্গাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গাতে। লাগাতার ঘরে থাকত না সাত-আট দিন। কখনও কখনও-বা আরও বেশি। অজাইব সিংদের বস্তিতেই থাকত ওর বন্ধু, রামখিলাওন। প্রায় পাশের ঘর। শাদি-শুদা আদমি। তবুও লন্দ্-ফন্দ্ শুরু করেছিল দোস্ত-এর আওরতের সঙ্গে। তলপেটের কাঁকড়া! কাকে যে কখন কামড়াবে কেউই জানে না। সে রাণ্ডিও ঢাল পেয়েই গড়াতে শুরু করল। সব আওরতের মধ্যেই এই গড়িয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি থাকেই। কম আর বেশি। একটা শাড়ি, একটা রুপোর মল, দু'খিলি পান, এমনকি একটু মিষ্টি কথাতেই তারা কী না কী যে দিয়ে বসে পরপুরুষকে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

তবে অজাইব সিং তো আর পিরথু ঘোষষা নয়। একদিন বারান্দার খোঁটাতে গামছা দিয়ে কষে বেঁধে এমন ঠ্যাঙান ঠেঙিয়েছিল তার আওরতকে যে, সব হিরোইনগিরি তার শুধরে গেছিল। আওরত ঘরে থাকবে, মরদকে পেয়ার দেবে, গরম গরম রোটি সেঁকে খেতে দেবে, আওলাদ প্যায়দা করবে—এইই তার কাজ। সে ঘরের লক্ষ্মী। মরদ বাইরেটা সামলাবে, রোদে ; জলে। আর আওরত ভিতরটা। তবে না?

তাব মেমসাহেবের মতো পড়ে-লিখে আওরতদের নিয়েই মুশকিল। মরদদের সঙ্গে সমানে টক্কর দেবে। নিজের মরদ ছেড়ে অন্য মরদদের সঙ্গে শোবে আর নিজের মরদকে শোওয়াবে অন্যর আওরতের সঙ্গে। রহিসি আর রহিসি হালচাল দেখে সাচমুচ থকেই গেছে একেবারে অজাইব সিং। শেষ পর্যন্ত তাকে কী যে দেখতে হবে সে সম্বন্ধে ও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না আদৌ। এরই মধ্যে একদিন মেমসাহেব জিগগেস করেছিলেন, সে ইদুরকার সাহেবের কাছে চাকরি করবে কিনা। অজাইব সিং চমকে উঠে বলেছিল, কাহে মেমসাব ?

নাঃ। এমনিই জিগগেস করছি।

মেমসাব বলেছিলেন।

নেহি মেমসাব।

কেন, না ?

হামারা সাহাব কা মাফিক সাহাব মিলেগা কাঁহা ?

কেন ? এত বড়লোক ইদুরকার সাহেব ! মার্সিডিস গাড়ি চালাবে। বেশি মাইনে পাবে। থাকার কোয়ার্টার। কোয়ার্টারে পাখা-টাখা সব আছে।

নেহি মেমসাব। জাদা পইসা হোনেসেই আদমি খরাব হো যাতা হ্যায়।

আরও কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেছিল অজাইব সিং। ভেবে পায়নি, ঠিক কী করে বলবে সে রুষাকে যে ; তার পান-চিবুনো, নস্যি-নেওয়া, পায়দল চলে-বেড়ানো পাগলা সাহাব তাকে বাড়ি করে দিয়েছে নিজের জমি বিক্রি করে, তার বোনের বিয়ে দিয়েছে নিজের বিলাইতি রাইফেল বিক্রি করে। পৃথু ঘোষের মতো মালিক সে কোথায় পাবে ? চাকরি যদি নাও করে সে আর, তবু এই কৃতজ্ঞতাবোধ তো থাকবেই ! ওরা তো আর পড়ে-লিখে-শেখা ভদ্রলোক নয়। কৃতজ্ঞতাবোধকে ওরা এখনও মনুষ্যত্বর বড় এক অঙ্গ বলেই জানে। আধুনিক তো হয়নি এখনও অজাইব সিংরা। হতে চায়ও না।

রুষা, কথাটা ওঠানোতেই ; অজাইব সিংয়ের বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠেছিল।

তবে কি রুষা ইদুরকার সাহেবের সঙ্গেই থাকবে ? তার সাহেবকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে ? পারবে ? আওরতদের মন নাকি খুব নরম হয় ? কী করে পারবে ? ছিঃ ছিঃ !

রুষা ঘড়ি দেখল একবার। এতক্ষণে ভিনোদের চলে আসার কথা ছিল।

পৃথু হাসপাতালে ভর্তি হবার পর না বলে-কয়ে কোথা থেকে যে সব আন-জান আজেবাজে লোক চলে আসে তাব খাল-খরিয়াৎ শুধোতে ! কিছু বাজে লোককে চিনতোও পৃথু ! ডিসগাস্টিং।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। উঠে, দবজা খুলে দিল রুষা। ভিনোদ নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে। রুপোলি ফিয়াট। দু'বছরের মধ্যে ভিনোদ হৈহৈ করে বড়লোক হয়ে গেছে। নিজের অধিকারেই। নিজের পিতা পিতামহর সম্পত্তি ও সম্পদের কথা ছেড়েই বলছে রুষা। জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশানে বড়লোক, চাকচিক্যময় হয়েছে ভিনোদ। এবং ঠিক ঐভাবেই হতশ্রী এবং অর্থহীন হয়ে গেছে পৃথু। এই ইনফ্লেশান ! বাঁধা মাইনের চাকরি ! এক পয়সাও উপরি রোজগার নেই। সহজেই উপায় করার উপায় থাকা সত্ত্বেও এক পয়সাও উপরি রোজগার করে না পৃথু। আ স্ট্রেঞ্জ পার্সন। আটার ইডিয়ট। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এভরিথিং হ্যাজ আ প্রাইস। অ্যাণ্ড স্ট্রেঞ্জনেস ইজ নো একসেপশান। ওয়েল, মাই ডিয়ার পৃথু, য়্যু হ্যাভ টু পে দ্যা প্রাইস ফর ইওর ইডিওসিনক্রেসিস, ইওর সেলফিশ স্ট্রেঞ্জনেস।

মুশকিল হয়েছে টুসুটাকে নিয়ে। মিলি ইজ আ গেম। ও তো নতুন, সচ্ছল, এয়ারকণ্ডিশানড জীবনের জন্যে উন্মুখই হয়ে আছে। টুসু স্ট্রেঞ্জ স্ট্যান্স নিয়েছে একটা। বোঝা যাচ্ছে না ঠিক ওকে। বাবার রক্তের স্ট্রেঞ্জনেসের অনেকটাই পেয়েছে ছেলেটা। বাবাকে ভালও বাসে খুব। অথচ ওর বাবা ওর জন্যে কিছুমাত্রও করেনি। অন্য সব ছেড়েই দিল, কোনোদিন একটু সময় পর্যন্ত দেয়নি নিজের ছেলেকে। এই রকম বাবার প্রতিও কী করে যে কোনো ফীলিংস গড়ে উঠল ছেলের দিক থেকে, তা ভাবাও যায় না।

ভিনোদ বলল, হাই।

হাই! বলল রুষা।

দরজাটা বন্ধ করেই বসবার ঘরেই রুষাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ভিনোদ। নিংড়ে নিল রুষার কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোঁটের স্বাদু সিক্ততা।

রুষা ধমকে, আবেগরুদ্ধ গলায় বলল, এনাফ, এনাফ। এভরিথিং হ্যাজ আ টাইম, হ্যাজ আ প্লেস ···

আরেকটা চকিত চুমু খেয়ে ও বলল, ইয়া! বাট য়্যু আর মাইন, ফর এভার। এভরিটাইম ইজ রুষা-টাইম।

ওরা বসবার ঘরেই বসল।

রুষা বলল, তোমার কথামতই তোমার প্রিয় পদ আজ রান্না হয়েছে।

কী?

ক্র্যাব, চাইনিজ স্টাইল আর ক্যা··· অনেক কষ্টে মিঃ গাঙ্গুলীকে দিয়ে বম্বে থেকে আনিয়েছিলাম।

না আনালেও পারতে। ঐ গাঙ্গুলী একটা গসিপ-মঙ্গার মেয়েছেলে!

আই ডোণ্ট কেয়ার।

রুষা বলল, দু'দিকে দু'হাত তুলে। কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক? হোয়াট? ভডকা?

নাঃ। আজকে বীয়ারই খাব। আছে ফ্রিজে? কাল রাতে মেহেরোত্রার বাড়ি পার্টি ছিল। ওঃ। অনেকগুলো হুইস্কি খাওয়া হয়ে গেছে। জানো তো? কালকেই আমাদের সোয়াবিন একসট্রাকশান প্লাণ্টের ফাউণ্ডেশান স্টোন লে করা হল।

তাইই···?

রুষা বলল, সোয়াবিন একসট্রাকশান প্লাণ্টের ভাবী মালকিনের মতো গলায়।

তারপর ডাকল, দুখী। 'দু' অক্ষরটার উপর জোর দিয়ে, লম্বা করে টেনে 'খী'টা ছোট্ট করে বলল. নিচু পর্দায়।

দুখী এসে বলল, জী মেমসাব।

সাবকা লিয়ে ··· লাও। ফ্রিজমে হ্যায়। ট্রেমে বীয়ার মাগ্ লে কর আও।

আর তুমি?

নাঃ। থাক্।

হোয়াই? থাকবে কেন? তোমাকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বানিয়ে দিই আমি?

ভিনোদ বলল।

রুষা হেসে অস্ফুটে বলল, আমার কি হয়েছে জানি না। আজকাল। ড্রিঙ্ক করলেই···

কি? ড্রিঙ্ক করলে কি···?

আই ফীল্ লাইক বীয়িং স্ক্রুড্। নট টু স্পীক অফ আ স্ক্রু-ড্রাইভার!

বলেই, লজ্জায় লাল হওয়া মুখটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল রুষা।

হাঃ! হাঃ। হাঃ। করে হেসে লাফিয়ে উঠল সোফা ছেড়ে ভিনোদ ইদুবকার। বলল, দ্যাটস্ লাইক মাই গ্যাল্। উ্য রিয়্যালী আর "মাই কাপ্ অফ টী" ডার্লিং। তাহলে ত খেতেই হবে তোমার। আমি বানিয়ে দিচ্ছি।

রুষার মুখ লজ্জায় এবং এক নিষিদ্ধ ভালোলাগায় লাল হয়ে রইল।

মাঝে মাঝে কি করে যে এত নির্লজ্জ হয়ে ওঠে আজকাল, ও নিজেই ভেবে পায় না। কে জানে, তার শিক্ষা, তার আধুনিকতাই বোধহয় তাকে এই নির্লজ্জতা দিয়েছে। দিয়েছে, সব ভাবতীয় আধুনিক মেয়েদেরই। অনেক হাজার বছর ঘোমটার আড়ালে থেকে, পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে, ইচ্ছের বাহক হয়ে হয়ে হয়ে তাদের নিজেদেরও যে জীবনে কোনো ভূমিকা আছে, স্বাধীনতা আছে, স্বাধীন ভাবে মনের ভাব, সত্যি ভাব প্রকাশ-করার উপায় আছে এসব ত ভুলেই গেছিল ওরা।

ইঁট-চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে, ইচ্ছের রক্তশূন্যতায় ভুগেছিল ওরা। কিন্তু এখন এক নতুন যুগ এসেছে। এই যুগে রুষারাও ভিনোদদের মতো,পৃথুদেরই মতো নিজের নিজের জীবন, নিজের নিজের ভালো লাগা, নিজের নিজের ইচ্ছাকে নিয়ে খেয়ালখুশিমত বাঁচবে, কারো কাছে কোনো জবাবদিহি না করেই। যাকেই ভাল লাগে, তাকেই সব দেবে। খোঁটায়-বাঁধা গাভীর মতো সকাল-সন্ধ্যেতে তাদের মালিক গোয়ালাদের মাপা-দুধের সরবরাহ বন্ধ করবে তারা। প্রত্যেকেরই জীবন তাদেরই। স্বাদু, মনোরম ; পুরুষের আলিঙ্গনেরই মতো গাঢ় উষ্ণ হয়ে উঠবে, দিন থেকে দিনে।

ভিনোদ উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে রুষার জন্যে স্ক্রু-ড্রাইভার বানিয়ে নিয়ে এল। ততক্ষণে দুখী ট্রেতে করে, ট্রের উপর লেস্-এর ছোট্ট কভার দিয়ে বীয়ার-মাগ আর বীয়ার নিয়ে এল। অন্য ট্রেতে ওয়েফার চিপস্, কাজু আর সেঁকা পাঁপড়।

ভিনোদকে এই জন্যেই ভাল লাগে এত রুষার। ওর হাবভাব একেবারে সাহেবদের মতো। টেনীসনের 'এনক আর্ডেন' কবিতার নায়কদেরই মতো তার বিবাহিত স্বামী পৃথু আর ভিনোদ। দুজনে দুই মেরুর লোক। পৃথুদের কবিতা বা উপন্যাস পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে এক উচ্চমার্গের ভাললাগাতে আপ্লুত হওয়া যায় মাত্র, কিন্তু তাদের নিয়ে ঘর করার বড়ই অসুবিধে। জীবনে, রক্ত মাংস, জীবনীশক্তির যত বড় ও ব্যাপক ভূমিকা সাহিত্যর বা কাব্যর ততখানি কখনই নয়। পৃথুরমতো ন্যাদনেদে, আলসে, ঘর-বিমুখ মানুষ যদি অন্যর স্বামী হত, তবে তাকে দূর থেকে ভালবাসা যেত ; এমনকি তার ফোটোও দেওয়ালে টানিয়ে মস্ত বড় কবি বলে হৃদয়ের সব নৈবেদ্য দেওয়া যেত কিন্তু হৃদয়ই ত মানুষের শরীরের একমাত্র যন্ত্র নয় ! শরীর, শরীরকে চায়। নারী মাত্রই সিকিওরিটি, অর্থ, আরাম, বিলাস চায়। চিরন্তন নারী তাইই চেয়ে এসেছে। আগেকার দিনে তাই রাজা মহারাজাকে বিয়ে করেছে তারা, এখন ভিনোদের মতো ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টকে করে। মহাকবি কালিদাস বা মিঞা তানসেন, বা বীটোভেন বা মোৎজার্টকে রাজ দরবারে বা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ড্রইংরুমে নেমন্তন্ন করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের শাল উপহার দিয়ে শিরোপা দেওয়া যায়, তাদের সবাইকেই বেডরুমে আনা যায় না। ঘর তো করাই যায় না ঐসব মুডি সেন্টিমেণ্টাল, স্ট্রেঞ্জ লোকদের সঙ্গে। পৃথু, এই সরল সত্যটা কোনোদিনও বুঝল না। বুঝল না বলেই, তাকে আঘাত পেতে হবে। সুন্দরী নারী, এই সুন্দর পৃথিবীরই মতো বীরভোগ্যা। বাঘ-মারার বীরত্বটা কোনো বীরত্ব নয় এই যুগে, মহাকবি হওয়াও আজকাল মূর্খদেরই সাজে। জীবনে যারা নায়ক-নায়িকা তাদের নিয়ে পৃথুরা লিখবে, চিরদিন লিখে এসেছে। নিজেরা কোনোদিনও নিজেদের জীবনে নায়ক অথবা নায়িকা হতে পারবে না ওরা। দিস্ ইজ্ রিয়্যালিটি ! ইয়া। দিস্ ইজ। পৃথু হ্যাজ টু ফেস্ ইট্। রুষা কাণ্ট হেল্প ইট্। নট্ এনী মোর !

বরফ লাগবে আর ? তোমার ?

ভিনোদ জিগগেস করল।

নো। থ্যাঙ্ক উ্য !

তোমার বেডরুমে নতুন পর্দা লেগে গেছে। নতুন পেল্মেট। যেমন বলেছিলে, পুরোনো বাথরুম ভেঙ্গে ফেলে, বাথরুমটা পিংক করে দিয়েছি। পিংক বাথ্-টাব, পিংক টাইলস্, পিংক ওয়াশ-বেসিন, কমোড, বিদে : সবই পিংক। তোমার ন্যুডিটির পিংকের সঙ্গে বাথরুমের পিংক মিশে যাবে। বাথরুমের দরজায় একটা কী-হোল লাগিয়েছি। তুমি যখন চান করবে, তোমায় দেখব আমি কী-হোল্ দিয়ে। যেন, তোমায় পেতে চাই, কিন্তু পাবার কোনোই উপায় নেই। দারুণ হবে, না ?

উ্য আর আ পারভার্ট !

রুষা বলল।

ওল মেন আর। কেউ সারফেস্-এ, কেউ গভীরে। তাছাড়া পাবভার্ট বলছ কেন ? জীবনকে ভালোবাসা, শরীরকে ভালোবাসা নিত্য নতুন ভাবে একে অন্যকে পাওয়াকে যারা পারভার্সন বলে, তারা নিজেরাই পাবভার্ট। হীপোক্রিট্।

রুষা কথা ঘুরিয়ে বলল, টুসুকে নিয়েই মুশকিল। বুঝেছো। হী ইজ গেটিং ডিফিকাল্ট ডে বাই ডে।

কিছু মুশকিল নয়। আমার বাড়িতে সাতদিন থাকলেই সে তার জংলী, বাবাকে ভুলে যাবে। দেখো।

আঃ ভিনোদ। ডোণ্ট বী ক্রুয়েল্। ইটস্ ব্যাড টেস্ট। ওরকম বোলো না। ভুলে যেও না যে এখনও পৃথুকে আমি ভালবাসি। ওরকম করে বললে, আমার লাগে। প্লীজ্....

মাই। মাই। এখনও ভালই যদি বাসো, তাহলে....

তুমি বুঝবে না ভিনোদ। সকলেই সব বোঝে না। পৃথু আমার জীবনেএকটি অশ্বত্থগাছেরই মতো গজিয়ে গেছে। তাকে নির্মূল করি এমন সাধ্য ত আমার নেই। তাছাড়া, করার ইচ্ছেও হয়ত নেই। সেই গাছকে কেটে ফেললেও তার শিকড় থেকেই যাবে আমার গভীরে। আমার শরীরে : মনে। যতটুকু আমিকে তুমি পাও, ততটুকু নিয়েই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

আই ডোণ্নো। দু'দিকে দু'হাত ছুঁড়ে দিয়ে ভিনোদ এবার বলল, য়্যু উইমেন আর আ স্ট্রেঞ্জ লট।

উই আর। ইট ওজ্ গডস্ প্ল্যান। নো ম্যান আণ্ডার দ্যা সান ক্যান চেঞ্জ আস। উই আর হোয়াট উই আর। অ্যাণ্ড হোয়াট উই ওলওয়েজ শ্যাল বী।

বিয়ারের ফ্রথে চুমুক দিয়ে ভিনোদ বলল, আঃ। আই লাইক ফ্রথ। জীবনের সঙ্গে ফেনার দারুণ মিল আছে। তাই না? একদিন সমুদ্রের ফেনাতেই ভেসে ভেসে, প্রথম বীজ, প্রথম অ্যালগী এসে বাসা বেঁধেছিল মাটির বুকে। মাটিকে আঁকড়ে ধরে তাকে প্রাণিত করেছিল। ফেনাতেই ভেসে গিয়ে আমার বীজ প্রোথিত হবে তোমার নরম নিভৃত জরায়ুতে। "সীজার প্লাওড্ ক্লিওপেট্রা"। মেয়ে মানেই মাটি। আমার কিন্তু মেয়ে চাই।

যেন ইচ্ছেমতই হয় সব কিছু।

অস্ফুটে বলল, রুষা।

টুইন্‌স হলে আরও ভাল। এক মেয়ে, এক ছেলে। আমার এত সম্পত্তি ভোগ করার জন্যে যথেষ্ট লোকেব দরকার। তাছাড়া, ফ্যামিলি বড হলে ইনকাম ট্যাক্স ও ওয়েলথ ট্যাক্সের প্ল্যানিংয়েরও সুবিধে হয়।

তুমি বড় বেশিদূর অবধি ভাব ভিনোদ।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা দুজন। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে।

রুষা বলল, পৃথুকে একটা চিঠি লিখব ভাবছি, বাড়িতে কাউকে না দেখতে পেয়ে ও শকড্ না হয়। ওকে তো মেণ্টালি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসতে দিতে চাই আমি। এত বড় ফিজিক্যাল শক-এর পর হঠাৎ এত বড় মেণ্টাল শক্। ওর হার্ট তো ইস্কিমিক্। এই ফাঁকা বাড়িতে ও বেচারা একা থাকবে!

অবশ্য, চাকর-বাকবরা সকলেই থাকবে, যদি ও চাকরী না ছাড়ে। আর ওরাই ত ওকে দেখত। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ত কখনই ওর জন্যে নিজে হাতে কিছু করিনি।

ও বাড়িটা ত পৃথুর দাদারই?

ভিনোদ শুধোল।

না। বাড়িটা ত আমার।

কি করবে? এই বাড়িটা?

ভাবছি, পৃথুকেই দিয়ে দেব। চাকরী ছেড়ে দিলে ও বেচারী থাকবে কোথায়?

সিলী! যার সঙ্গে সম্পর্কই রাখবে না, তাকে বাড়ি দিতে যাবে কোন্ দুঃখে। কী সে করেছে তোমার সুখের জন্যে?

আঃ ভিনোদ! করেছে, করেছে। সে সব তুমি বুঝবে না। সব বোঝার চেষ্টাও কোরো না। কিছু কিছু বিষয় আছে, যা তোমার সমস্ত বুদ্ধি জড়ো করেও তুমি কখনও নাগাল পাবে না।

আমি ভাবছিলাম, তোমার কাছ থেকে এই বাড়িটা আমার নতুন কোম্পানী ভাড়া নিতে পারত। হাজার টাকা করে ভাড়া দিতাম তোমাকে। ভাডার পুরো টাকাটাই জমত তোমার নামে। কোম্পানীর ম্যানেজার থাকত এই বাড়িতে। ভেবে দেখো। ল্যাংড়া পিরথু ঘোষের কি অধিকার

আছে এই বাড়ির উপর ?

আঃ ভিনোদ। উ্য আর সারপাসিং উওর লিমিট্। উ্য আর আ ভেরী গ্রস্ পার্সন্। একজন আন্‌ফরচুনেট মানুষের সম্বন্ধে কেউ এইভাবে কথা বলে ?

ওক্কে ! বেবী, ওক্কে ! ফরগেট্ দিস টপিক্। আর একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বানিয়ে আনছি তোমার জন্যে। দেন, আই উইল স্ক্রু উ্য, অ্যাজ উ্য ডেজায়ার।

নো !

হোয়াট, নো ?

না বলেছি, না।

কি না ? আর খাবে না ?

আর কিছু না।

কেন ?

না। আজকে না। আমি পারব না।

তুমিই না বললে···। তোমার বিবেক ? মাই ফুট্।

বলেছিলাম, কিন্তু আমার মন কুঁকড়ে গেছে····

হাঃ ! হাঃ ! করে হাসল ভিনোদ অনেকক্ষণ। বলল, মনের কি করণীয় আছে এতে ? মনের ত আর শরীর নেই। মন একটা অ্যাবস্ট্রাকট ব্যাপার। শরীর না কুঁকড়ালেই হল !

ভিনোদ ! তুমি শরীর শরীর করেই মরলে। মনই ত সব। মনই কুঁকড়ে গেলে, শরীরের বাকি আর কি থাকে ? সে ত তখন ডেড্-বডি।

আমার ডেড-বডি হলেও চলবে। ডেড-বডিকে আমি জ্যান্ত করে নেব। ওসব বায়নাক্কা রাখো ত ! আরেকটা খাও। আমি বানিয়ে আনছি।

বলেই, উঠে চলে গেল ভিনোদ রুষার উত্তরের অপেক্ষা না করে।

রুষার বড়ই ভয় করতে লাগল। নিজের জন্যে, পৃথুর জন্যে ; মিলি ও টুসুর জন্যে। ঠিক করছে কি ও ? এই মানুষটার সঙ্গে থাকতে কি পারবে বাকি জীবন ? যদি না পারে ?

ভিনোদ আর এক বোতল বীয়ার এবং রুষার জন্যে আর একটি স্ক্রু-ড্রাইভার বানিয়ে এনে রুষার হাতে দিয়ে বলল, পৃথুদাদা যদি ডিভোর্স্ দিতে রাজী না হয় ?

হবে।

রুষা বলল, মুখ নামিয়ে।

তুমি কি করে জানলে ?

আমি পৃথুকে জানি।

আমার সন্দেহ আছে। দেখো, আমার কাছ থেকে থোক টাকা ঝেড়ে নেবে। নইলে, অ্যাডালটারীরর কেস ঠুকে দেবে।

আঃ। ভিনোদ।

এবার জোরে চিৎকার করে উঠল রুষা। দুহাত দিয়ে দুচোখ ঢেকে ফেলল। যেন, চোখ দিয়েই শোনে রুষা।

ওক্কে। বেবী, ওক্কে।

বলেই ছিপ্‌ছিপে সুগন্ধি রুষাকে হঠাৎ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে রুষার আর নিজের গ্লাস আর বীয়ার মাগ এক হাতে ধরে, চলল ভিনোদ শোবার ঘরের দিকে। দুখী পাছে দেখে ফেলে, তাই চিৎকারও করতে পারল না রুষা। না দেখলেও, এ বাড়ির সকলেই এখন জানে। হয়ত পুরো শহরই জানে। প্রেম করতে হলে কলঙ্কর ভয় করলে চলে না। এমন ন্যাকা মেয়ে রুষা অন্তত নয়।

কী হল, তা বোঝাব আগেই বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিল ভিনোদ।

হেরে গেল। উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক, রুচিসম্পন্না রুষা হেরে গেল একটা জানোয়ারের কাছে। তাঁর শরীর, প্রাকৃত, প্রাগৈতিহাসিক নারী – শরীর অবহেলায় হারিয়ে দিল তার ঘষা-মাজা-গর্বভরা

সুরুচিসম্পন্ন উচ্চমন্য মনকে।

রুষা চোখ বুজে ছিল। ভাবছিল, তাইই যদি হবে, যদি তাইই হয়, তাহলে এই শিক্ষা, এই রুচি, এই বাছাবাছির দরকারটা কি? শরীরের কাছে যদি হেরেই যাবে, তাহলে…

বড়ই ধাঁধায় পড়ল ও নিজেকে নিয়ে। তার মত উচ্চশিক্ষিতা, মার্জিতরুচি সুন্দরী মেয়েরা কি সবাই-ই অবচেতনে কোনো পুরুষ জানোয়ারের কাছে তাদের শরীরি সত্তার কাছে হেরে যাবে বলেই অপেক্ষমান থাকে? মেয়েরা কি কোনোদিনও লিবারেটেড হতে পারবে না? পুরুষের মধ্যের চিরন্তন শরীরি জানোয়ারটি কি চিরদিনই সুন্দরীদের এমন করে অবহেলায় হারিয়েই দেবে?

ছিঃ! ছিঃ! কি করবে রুষা? মহিলা সমিতির মণি মাসীমাকে ত এসব বলা যাবে না! চামেলী, মণিদীপা, অনুরাধা, তার সমবয়সী যারা, তাদেরও না। সত্যি যা, তা গোপনই থাকে, মিথ্যেটাই জোর পায় বক্তৃতায়, সভাসমিতিতে; পুরস্কারে। এমন কি, আজকাল সমালোচনায়, তিরস্কারেও। মুক্তি যদি নেইই তাহলে কি লাভ মিছিমিছি…। লাভ কি?…. ?

পৃথু ও পৃথু; আমাকে ক্ষমা কোরো পৃথু। আমি খুব খারাপ। খুবই খারাপ আমি। কিন্তু বিশ্বাস করো, খুব লজ্জা করছে বলতে আমার, আমি কিন্তু খুব সুখীও। শরীরের মধ্যে যে এত আনন্দ লুকিয়ে ছিল, এত বছর কখনও জানিনি আমি। যে মুক্তি আমি চাইছিলাম, সে মুক্তির মনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে আমার শরীরের মুক্তির দরজা হাট করে খুলে দিয়ে গেল এই জানোয়ারটা! এই লোকটাকে আমি ঘেন্না করি পৃথু। বিশ্বাস করো। ঘেন্না, ঘেন্না, ঘেন্না। আবার তীব্র ভাবে ভালোও বাসি।

ভালোবাসা কি মানসিক অবস্থা নয় তাহলে? ভালোবাসা কি শুধুই শরীর? মানুষ কি এখনও জানোয়ারই আছে? ভালুক ভালুকীরই মতো?

ছিঃ ছিঃ।

পৃথু, ও পৃথু! আমাকে ক্ষমা কোরো তুমি।



আস্তে আস্তে ভিড় কমে আসছে হাসপাতালে। ফুল, চিঠি এইসবেরই স্রোত চৈত্র মাসের পাহাড়ী নালার জলের মতোই শুকিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

অবশ্য সমবেদনা বা করুণা সে চায়নি কোনোদিনও কারো কাছ থেকে।

যা পৃথু করেছিল, সেই পুরো ব্যাপারটাই এখন হিন্দি সিনেমার কোনো ঘটনা বলেই মনে হয়।

মগনলালকে তো ও প্রথম দর্শনেই মারতে পারত, বিজ্লীর ঘরের দরজা যেই সে খুলেছিল; অমনিই, সঙ্গে সঙ্গে।

তবে?

মারল না কেন?

কে জানে কেন! হয়তো একজন মানুষের পক্ষে পরিচয়-জানা অথচ অপরিচিত অন্য মানুষকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎই মারতে হৃদয়ের তীব্র কাঠিন্য লাগে। অথবা হয়তো পৃথুর মধ্যে একজন হিন্দি সিনেমার নায়কই ছিল। অবচেতন মনে। বাহাদুরি-প্রবণতা অনেক মানুষেরই রক্তের মধ্যে

নুনের মতোই মিশে থাকে। পৃথুরও ছিল। সময়মতই বাইরে এসেছিল তা। বাহাদুরি করে, হাততালি পেয়ে, তারপরই অনুশোচনা আর আপসোসে নিমজ্জিত হতে হয় সেইসব মানুষদের। এই ক্রমশ-ক্ষীণ-হতে-থাকা দর্শনার্থী ও হিতার্থীদের দলকে লক্ষ্য করে পৃথুর এখন মনে হয় যে, যা কিছুই নিজেরই জন্যে খুশি মনে একজন মানুষ করে, তাইই শুধু থাকে জীবনে। শুধু সেইটুকু আনন্দ এবং গর্বই বুকের মধ্যে বেঁচে থাকে। আর যা-কিছুই করা হয় নিজের বাহাদুরি-প্রবণতাকে খুশি করার জন্যে বা অন্যের হাততালি পাবার জন্যে, তার কিছুমাত্রই থাকে না।

দোষ বা মূর্খামি বা এই হাস্যকরভাবে অন্যর মামলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলার ভুলের মাশুল বাকি জীবন গুণতেই হবে পৃথুকে। উপায় নেই কোনো।

তবে সত্যিই কি শুধুমাত্র বাহাদুরি-প্রবণতার জন্যেই পৃথু করেছিল ? এই সবই ? নিজের নিস্তরঙ্গ পানা-পুকুরের ঘটনাবিহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনে হঠাৎই ডাকু মগনলালকে প্রতিপক্ষ পেয়ে ও নিজে কি উল্লসিতও হয়ে ওঠেনি ? দৈনন্দিনতার ক্লান্তিতে ন্যুব্জ, একঘেয়েমির জাঁতাকলে পিষ্ট প্রত্যেক আধুনিক মানুষই বোধহয় লড়াই করার জন্যে সর্বদাই তৈরি হয়ে থাকে। নিজের সঙ্গে, নিজের অনুষঙ্গর সঙ্গে ছায়ার লড়াই লড়ে লড়ে তারা ক্লান্ত। তাইই কোনো শত্রু যখন শরীর ধরে চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়, তখন সেই শত্রু তার ব্যক্তিস্বরূপ ছাড়িয়ে গিয়ে এক শ্রেণীরূপ নেয় ; বিবদমান ব্যক্তির সমস্ত শত্রুরই সে তখন প্রতিভূ হয়ে ওঠে। তাকে হারিয়ে দিলে, এমনকি হারাতে না পারলেও, তার সঙ্গে লড়তে পারলেও মনে হয় ; ক্লান্তি অপনোদিত হবে, শান্তি পাবে সে।

তবে দুঃখিত নয় পৃথু। জীবনে যা কিছুই নিজেরই কৃতকর্মর ফল, সেইসব ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতির জন্যে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হয়নি ও। পৃথুর বাবা বলতেন, 'নেভার লুক ব্যাক ইন লাইফ'। কত সুখ, কত দুঃখই তো পেছনে ফেলে এসেছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে খুবই হয় যে, ফাল্গুনের বনমর্মরের মধ্যে কোনো গাছতলায় বসে পেছনের বছরগুলোর সালতামামি করে। কিন্তু নাঃ, এখন আর তাও করতে ইচ্ছে করে না।

সিস্টার লাওয়াঙে একটু ঠাট্টা করেই বললেন পৃথুকে, সকালে তো একজনও এলেন না আপনাকে দেখতে, মিঃ ঘোষ ?

তাইই তো দেখছি !

পৃথু বলল, সিস্টারের বিদ্রূপকে উড়িয়ে দিয়ে।

মন খারাপ লাগছে ?

সিস্টার আবার বললেন।

নাঃ। ভালই লাগছে বরং। কথা বলতে হল না। কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ও ভাবছিল কত মানুষকেই তো দেখে, দেখল। দেখাশোনা তো দিনভরই চলে, জীবনভর ; জন্ম থেকে মৃত্যু, কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে মনের মানুষ থাকে কজন ? চোখ তো কতই দেখে ! সকলকেই কি মনে ধরে ? সারাজীবনে হয়তো একজন কি দুজনকেই তেমন করে চায় মানুষ ! আর যাকে বা যাদের সে চোখের চাওয়া নয়, মনের চাওয়া চায় ; তারাই তো হচ্ছে মনের মানুষ !

সিস্টার বললেন, কফি খাবেন নাকি এক কাপ ? কর্নেল সিং বলেছেন আর দিন কুড়ি বাদেই আপনাকে ডিসচার্জ করে দেবেন। আপনার রিকভারি, একেবারে মিরাক্যুলাস্‌লি স্পীডি। স্টিচ্‌ তো খুলে দেবেন এই শনিবারই। তারপর এখানেই সকাল বিকেল হাঁটবেন নিজের ঘরে। আর্টিফিসিয়াল লিম্বস্‌ থাকতে, আজকাল কেউই ক্রাচ্‌ নেন না। আপনি মানুষটা বড় জেদি। বড় বোকা-বোকা জেদ আপনার।

জানি, পৃথু বলল।

তারপর বলল, সিস্টার পিঠের দিকটা উঁচু করে দিন তো। বাইরেটা দেখব একটু ভাল করে। অশ্বত্থগাছটা। শীত চলে গিয়ে বসন্ত আসছে, বুঝতে পারছেন না ? এই জবলপুর শহরেও সারা রাত পিউ-কাঁহা আর কোকিল ডাকে। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতের আবছা, জল-মেশানো দুধের মতো

আলোয় কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে এই ঘুমন্ত পৃথিবী। উৎসাহর সঙ্গে উৎকর্ণ, উন্মুখ হয়ে দিনেব সঙ্গে মিলিত হবে বলে ছটফট করে শীতশেষের রাত, আর পাগলেব মতো পাখি ডাকে তখন।

আপনি বড় বেশি রোম্যান্টিক মিঃ ঘোষ। আপনি কবি-টবি হলেন না কেন? এঞ্জিনিয়ব না-হয়ে?

পৃথু কথা না বলে চেয়ে বইল সিস্টারের চোখের দিকে।

মনে মনে বলল, আমি তো কবিই! ছন্দ মিলিযে অথবা গাযেব জোরেই ছন্দ না-মিলিয়ে যাঁরাই কবিতা লেখেন, পত্র-পত্রিকায় যাঁদেব কবিতা ছাপাও হয; কবি কি শুধু তাঁরাই? জীবনানন্দই বলেছিলেন না, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'?

বাঃ।

পৃথু বলল, বেশ লাগছে এবার। রোদের মধ্যে শীত-যাই-যাই ভাব, সত্যিই বসন্ত আসছে। দেখতে পাচ্ছেন? বসন্ত আপনাব ভাল লাগে না সিস্টার? স্প্রিং—টাইম?

একেবারেই না। সিস্টার বললেন।

কেন?

বড় খাটনি বাড়ে। পক্সের কেস্ আসে হাসপাতালে অনেক। আর পক্সের রুগীরা বড় বাযনাক্কা করে।

ও।

বলল, পৃথু। থ হয়ে। নানারকম মানুষ আছে বলেই এত ইণ্টারেস্টিং এখনও এই ধূসর পৃথিবী।

তাহলে আনি কফি?

আনুন। সময় আর কাটে না। কফিই খাই।

সিস্টার চলে যেতেই ওয়ার্ড-বয় এল। একটা চিঠি দিল। বেশ মোটা খামটা। ভারীও। পথুর নামে, কিন্তু রুষার এবং শ' ওয়ালেসের গেস্ট হাউসের প্রযত্নে লেখা। কুর্চির চিঠি। কে জানে, ও হয়তো শুনেছে যে, রুষা জবলপুরেই আছে যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠছে পৃথু।

কে দিল?

শ' ওয়ালেস কোম্পানির লোক হাসপাতালেব রিসেপশানে দিয়ে গেছে।

ও।

পিঠটাকে আরও একটু ঠেলে দিল পেছনের দিকে। আরও সোজা হয়ে বসল উঁচু-করা বিছানাতে বালিশে হেলান দিয়ে। তারপর খামটা না-খুলে, হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে পাতা ঝিলমিল অশ্বত্থগাছটার দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎই বিধুর হয়ে গেল ওর চোখের দৃষ্টি। ট্রাকের হর্ন, দূরের অর্ডন্যান্স কারখানার ট্রেনের শব্দ, সাইকেল-রিকশার পঁক্ পঁক আর ক্রিরিং ক্রিরিং শব্দের সঙ্গে পানের দোকানের সামনে থেকে ভ্যাগাবণ্ড আর আড্ডাবাজ, কাজ ফাঁকি দেওয়া কিছু মানুষের মিশ্র শোরগোল ভেসে আসছে।

চিঠিটা এখন খুলবে না ও। কফিটা খেয়েই নেবে আগে। তারপর সিস্টারকে ঘর থেকে একটু বাইরে যেতে বলবে। চিঠি, লেখা বা পড়ার সময় মনে মনে ও নিরাবরণ হয়ে যায়। ঘরে কেউ থাকলে লজ্জা করে। অস্বস্তি লাগে।

সিস্টার কফি নিয়ে এলেন। কফিটা তারিয়ে তারিয়ে খেল পৃথু, চিঠিটাকে কোলের উপর রেখে। আর কোল! কোল মানে তো দুই উরু আর তলপেট। উরুই যার নেই তার আবার কোল কী!

রাগ এবং অভিমানও কম জমেনি এতদিনে কুর্চির ওপর পৃথুর। বিজলী পর্যন্ত দেখে গেল তাকে। আর যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, অপারেশানের পর অজ্ঞানাবস্থা থেকে প্রথম জ্ঞানে ফেরার সময় যে মানুষের নামটি সে অবচেতনের গভীর থেকে মন্ত্রোচ্চারণের মতো করে অসহায়ে উচ্চারণ করেছে বারবার; সেই মানুষটিরই সময় হল না একটিবারের জন্যেও তাকে দেখতে আসার?

কফি খাওয়া শেষ হলে পৃথু সিস্টার লাওয়াণ্ডেকে বলল, আপনি অন্য ওয়ার্ড থেকে একটু

ঘুরে-টুরে আসতে পারেন। লাঞ্চের আগে তো আর কোনো ওষুধ বা ইন্‌জেকশান দেওয়ার নেই। শুধু শুধু ঘরে আটকে থাকবেন কেন?

সিস্টার বললেন, গাইনি ওয়ার্ডেই যাই। আমাদের কোলিগ সিস্টার খান্নার নাতি হয়েছে। প্রথম নাতি। পাঁচ কিলো ওজন। একেবারে রোম্যান ফিচারস। অথচ মা বাবা দুজনেই খারাপ দেখতে। যাই, গল্প করে আসি গিয়ে ওদের সঙ্গে।

আসুন।

পৃথু বলল।

এই সময়ে মিসেস খান্নার নাতির জিন অথবা মেয়ের চরিত্র নিয়ে ভাবিত হতে চায় না পৃথু আদৌ। সিস্টার চলে যেতেই, খামটা খুলল। বড় খাম একটা। বেশ ভারী। নিউজপ্রিন্টের মতো খসখসে কাগজে লিখেছে কুর্চি, গোটাগোটা অক্ষরে। কোনো তারিখ দেয়নি।

পৃথুদা,

আপনি আমাকে কী ভাবছেন তা আমি অনুমান করতে পারি। কিন্তু আমার কথা শুনলে আমাকে ক্ষমা করতে বাধ্য হবেন।

এই নতুন জায়গাতে এসে কোনোমতে একটি ডেরা যোগাড় করে একেবারে নতুন করে জীবন আরম্ভ করার চেষ্টা করছিলাম। এরই মধ্যে আবারও বিপদ এল। বিপদ নাকি কখনও একা আসে না, শুনেছিলাম। এখন জানলাম, কথাটা সত্যিই। দিন দশেক আগে আমার বাড়ি থেকে আমার সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। সর্বস্ব মানে,জাগতিক সম্পত্তি বলতে যা-কিছু। মনের ধন যা-কিছু ছিল তা তো চুরি গেছে অনেক দিন আগেই।

গয়না, যাইই আমার বিধবা মা আমায় দিয়েছিলেন; শাড়ি, জামা এমনকি আমাকে লেখা আপনার চিঠিগুলো পর্যন্ত। আর সবকিছুই রেখে দিয়ে, যদি চিঠিগুলোকেও ফেরত দিত। এই ক্ষতিই আমার সবচেয়ে বড় ক্ষতি। তবু বাঁচোয়া, চোর বাঙালি নয়। মানে, আশা করছি যে; বাঙালি নয়।

সুখের কথা এরই মধ্যে এইটুকুই যে, ভারী পা-মেশিনটা রেখে গেছে। এই সেলাইকলটিই এখন আমার জীবিকা অর্জনের একমাত্র সহায়। কুড়ি গজ ছিট-কাপড় কিনেছিলাম, ব্লাউজ বানাব বলে। আমার ব্লাউজ নয়। বিক্রির জন্যে। সেগুলোও নিয়ে গেছে। রঙিন কাপড়ের ঘাগ্‌রা বানানো ছিল ছটি। সেগুলোও।

এইখানে হাট বসে রবিবারে। আর এখান থেকে তিন মাইল দূরেই অন্য একটি জায়গাতেও হাট বসে প্রতি শুক্রবারে। দুটি হাটই বেশ বড। স্থানীয় লোক তো বটেই, বহু দূর দূর থেকে আদিবাসীরা সব আসে এই দুই হাটে। রঙের আর গন্ধের আর শব্দেরই মেলা বসে যেন। এইসবই আদিবাসী অঞ্চল। বেশিই গোন্দ, বাইগা, পানকা, কুর্‌মি। কিছু মারিয়াও অবশ্য আছে। তারা স্থানীয় বাসিন্দা নয়। বাস্তার থেকে এসেছে কাছাকাছি কারখানাও আছে দুটি। সেখানেই ওদের বেশিরভাগ কাজ করে। কাঠের ব্যবসা তো এখন ফরেস্ট করপোরেশান হবার পর বন্ধই হয়ে গেছে। তবে করপোরেশানের কাঠের ডিপোতে এবং অন্যান্য কাজে অনেকে লেগেও গেছে। ট্রাকের কুলি। ছুট-ছাট কাজের কামিন। বিড়িপাতা, লাক্ষা, বাঁশ এইসবের সঙ্গেও জড়িত আছে অনেকেরই জীবিকা। এদের বউ-মেয়েদের কাছেই হাতে তৈরি নতুন নতুন ডিজাইনের ব্লাউজ, ঘাগ্‌রা এসব বানিয়ে বিক্রি করি। শায়া-ব্লাউজ, বড় বড় ব্যবসাদাররা পাইকারি হারে বানায় এবং অনেক সস্তাতে দেয়; আমার মতো সামান্য জনের ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতে পেরে ওঠার উপায় নেই। তাইই, মাথা খাটিয়ে নতুন ডিজাইন বের করি, নানা-রঙা কাপড় জুড়ে-টুড়ে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করি। মোটামুটি গুছিয়েও এনেছিলাম। ভাবছিলাম। আরও দুটি মেশিন কিনব আগামী সপ্তাহে এবং দুটি মেয়েকে রাখব সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করার জন্যে। ওদের শিখিয়ে-পড়িয়েও নিচ্ছিলাম। এমন সময় এই বিপত্তি। একটা পেট, চলে যাচ্ছিল কোনোরকমে; সম্মানের সঙ্গেই। তবে এই হঠাৎ ক্ষতিটা বেশ কিছুদিনের জন্যে আমাকে পেছিয়ে দিয়ে গেল।

গয়না পরেছি খুব কমই ; তবু বাক্সের কোণে যে আছে ; এই জানাটাই মনে বড় ভরসা জাগাত। ভাঁটু চলে গেছে, আমার পৃথুদার সঙ্গে আর বোধহয় দেখা হবে না, এখন গয়নাগুলোও গেল। সিকিওরিটি বলতে আমার আর কিছুমাত্রও রইল না। সিকিওরিটি বোধহয় একধরনের মানসিক ব্যাপার, যতখানি না জাগতিক তা। চলে যাওয়ায়, এখন বুঝি।

আপনাকে এতক্ষণ শুধু আমার কথাই শুনিয়ে গেলাম। আপনি ভাবছেন, কী স্বার্থপর এবং আমি-ময় আমি। আপনি কেমন আছেন সে কথাটাই একবারও জিগ্যেস করলাম না এতক্ষণে। আপনি ভাল আছেন এবং খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছেন একথা আমি তো জানিই। জানার উপায় আছে বলেই জানি। আপনার দ্রুত সুস্থতায় যতই আনন্দিত হচ্ছি, আবার ততখানি ভীতও হয়ে উঠছি। ভীত হচ্ছি এই কারণে যে, আমি জানি আপনি সুস্থ হয়ে উঠলেই আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়বেন হয়তো। কী বলব, আমি আপনাকে এড়াতে এবং আমার সম্মান বাঁচাতেই এত দূরে এসেছি যদিও তবু মনে মনে সব সময় ভাবি আপনি এসে দরজাতে দাঁড়িয়েছেন। নিজের সঙ্গে কেন যে অমন লুকোচুরি খেলা খেলি তা আমি নিজেই বুঝি না। ধরা যখন ইচ্ছে করলেই দেওয়া যায়, তখনই ইচ্ছে করে অন্য পক্ষ খুজে মরুক। যে লুকোচুরি খেলায় চোর ইচ্ছে করে ধরা দেয়, তাতে আর যাই থাক ; মজা থাকে না একটুও। সত্যিই জানি না, অঙ্গহৃত বেচারী আপনি যদি আমার পর্ণকুটিরের দুয়ারে এসে দাঁড়ানই, ডাক দেন আমাকে, কুর্চি বলে ; তখন আমি আমার জীবনে, আমার শরীরে আর বোধহয় আপনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। সেই ভয়েই মরে থাকি অনুক্ষণ। চাইতে চাইতে চাওয়ার রঙ জ্বলে যায়, জেল্লা নিবে যায় এবং বোধহয় কোনো চাওয়াকে পাওয়াতে যদি পর্যবসিত করতেই হয় আদৌ তাহলে তা বিবর্ণ হওয়ার আগেই হযতো করা ভাল।

কোনো চাওয়ারই নিজের তো কিছুমাত্রও মূল্য নেই, যদি না তা একদিন পাওয়াতে এসে লীন হয়। বড়ই ভয়ে ভয়ে আছি আমি পৃথুদা। কাঙালেরই মতো আপনি আমাকে চেয়েছেন, কত না ছোট করেছেন নিজেকে আমার কাছে ! আর আমি দিনের পর দিন নিজেরই চোখের জলে-ভেজা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। যাকে মন তীব্রভাবে চায়, সে যখন এসে ভিখিরির মতো এই সামান্য শরীরটাকেই ভিক্ষা চায় তখন 'না' বলতে বুক ভেঙে যায়। সত্যিই যে ভেঙে যায়, তা এদেশে আমার মতো লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত, স্বল্পশিক্ষিত, অত্যাধুনিক হয়ে উঠতে না পেরে ওঠা মেয়ে মাত্রই জানে।

আমাদের কথা, আপনারা কোনোদিনই বুঝবেন না।

ভগবানের কাছে তাইই প্রার্থনা করি, আপনি যেন আমাকে খুঁজে না পান এ জীবনে আর কোনোদিনও। না পেলেই আপনি আমারই থাকবেন চিরদিনের মতো, আমিও থাকব আপনার। আপনি যা চান তা পেয়ে গেলে আমাকে আর চাইবেনই না হয়তো। ভালও বাসবেন না। ভালবাসায় শরীর এসে পড়লে, ভালবাসা মরে যায় পৃথুদা। এ আমার গভীর বিশ্বাস। মায়ার খেলার সেই গানটির মতো সত্যি আর কিছু নেই, "আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে"। অমন দুর্দৈব যেন আমার জীবনে না ঘটে কোনোদিনও।

আপনাকে আরও একটা কথা বলে ফেলি এইবেলা। যদিও একথা বোধহয় না বললেই ভাল হত। না বলেও পারছি না যে ! ভাঁটুকে, ও দূরের জেলে চলে যাবার আগে, দেখতে গেছিলাম। ওকে জিগগেস করেছিলাম, ও এমন করল কেন ? জীবিকার জন্যে ও যা করছিল, যতটুকুই রোজগার ছিল ওর ; আমি তো তা নিয়েই সুখী ছিলাম। ও হঠাৎ বড়লোক হবার জন্যে, আমাকে সুখে মুড়ে দেবার ইচ্ছেয় গাঁজার চোরাচালানের ব্যবসা কেন করতে গেল ?

ও কী বলল জানেন, উত্তরে ? বলল, তোমার পৃথুদারই জন্যে।

অবাক হয়ে আমি জিগগেস করলাম, পৃথুদারই জন্যে ? কেন ?

ও বলল, রাইনাতে আসার পর থেকে পৃথু ঘোষের সঙ্গে নতুন করে দেখা হওয়ার পর থেকেই তুমি বদলে গেছিলে কুর্চি। দেখা হলে তো বটেই, এমনকি তার নাম উচ্চারণ করলেই তোমার মুখচোখের ভাব বদলে যেত। লেখাপড়া তো আমি শিখিনি। আমি যা, আমি তাইই। আমি

তোমাকে কোনোরকম মিথ্যাচার করেও বিয়ে করিনি। তোমার মা আমার সঙ্গে তোমার বিয়েটা সম্বন্ধ করেই দিয়েছিলেন। আমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি তোমার সঙ্গে। অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাইনি। তুমি ছাড়া অন্য কোনো সুখের কথা ভাবিনি। শুধু তোমাকে খুশি রাখতে আমার যতটুকু সাধ্য সবই আমি করেছিলাম। সাধ্য হয়তো আমার বেশি ছিল না; কিন্তু আন্তরিকতার অভাব হয়নি কোনোদিনও, তা তুমি জানো। পৃথু ঘোষ বিলেতে লেখাপড়া করেছেন, তিনি বিরাট কোম্পানিব বিরাট অফিসার। তার বাড়ি, গাড়ি, ক্লাব, তার বড়লোক সব বন্ধুবান্ধব। আমি কোনোদিক দিয়েই তাঁকে এঁটে উঠতে পারিনি। আমাকে তো কোনো ক্লাবই মেম্বার করত না! আমার পরিচয় কী! মোটব-সাইকেল ভট্‌ভটিয়ে যাওয়া-আসা করা একজন জঙ্গলের ঠিকাদার ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় ত ছিলো না আমার। অর্ডার-সাপ্লায়ার। পুরুষের জগতে আমি নিতান্তই অকুলীন। অথচ কুলীন বলে কখনও দাবিও করিনি আমি নিজেকে। তোমার কাছে তো নয়ই!

পৃথু ঘোষের সঙ্গে নতুন করে দেখা হওয়ার পরই তুমি আমার কাছ থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকলে। তোমাকে যখন আদব করতাম, তখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম যে; চোখ বুঁজে তুমি আলো-নিবোনো ঘরে পৃথু ঘোষকেই কল্পনা করছ। আমাকে নেহাত আদরের যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করছ। আমি কি বুঝতে পারতাম না ভেবেছ? তখন আমার মনে হত, বোধহয় কোনো মৃতদেহকেই আদর করছি। তারপর ভেবে দেখলাম, আমারও একটা গাড়ি কিনতেই হবে, বাড়ি করতেই হবে; ঐ হাটচান্দ্রাতেই। এবং সে গাড়ি, সে বাড়ি, সেই বসবার ঘর, বাবুর্চি-বেয়ারা-চাকরবাকর সবাই পৃথু ঘোষের যা আছে তার চেয়ে অনেকই ভাল আমার চাই। পৃথু ঘোষকে স্বক্ষেত্রে হারাতে না পারলে, তোমাকে ফিরে পাবার কোনোই উপায় ছিল না আমার। অত টাকা চোরাচালানেব দলে না ভিড়লে আমি কী করে পেতাম বলো কুর্চি? কে আমাকে অত তাড়াতাড়ি অত টাকা দিত? এই পৃথিবী আজকাল এমনই হয়ে গেছে যে, যেন-তেন-প্রকারেণ কিছু টাকার মালিক হয়ে যেতে পারলেই সকলেই সেই মানুষের অতীত সহজে ভুলে যায়। যে এইভাবে বড়লোক হয়, বা সমাজের একজন হয়ে ওঠে; সে নিজেও বোধহয় ভুলে যায় তাব অতীতকে সবচেয়ে আগে। নিজেকে বোঝাতে থাকে যে, চিরদিনই সে এমনই ছিল। টাকাটা এসে গেলেই, সে যেমন করেই আসুক না কেন; টাকাওয়ালা মানুষ তখন রেস্‌পেক্টেবল্ হয়ে ওঠে। তাব বাড়িতে তখন বড় বড় লোকের আনাগোনা। ক্লাবে গিয়ে সে যদি অনেক সই করে, তাহলে সে, সব ক্লাবেরই একজন মান্যগণ্য মেম্বার। তাইই তাড়াতাড়ি অনেক টাকা রোজগার করার জন্যেই ঐ পথ বেছে নিয়েছিলাম আমি, এই পরিচয়হীন গুণহীন ভাঁটু। তোমাকে আবার আমার কবে ফিরে পাব এই আশাতেই পৃথু ঘোষকে আমাদের জীবন থেকে তুলে নিয়ে পিত্তি-গলে-যাওয়া পাড়হেন্ মাছেরই মতো ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিতে পারব বলে।

ভাঁটু আরও কী বলল জানেন পৃথুদা? তা শোনা অবধি আমি ভয়ে আধমরাই হয়ে আছি। শুনলে, আপনিও হয়তো তাইই হবেন। ভাঁটু বলল, জেলে এত বছর কাটানোর পর কী আর বাকি থাকবে আমার জীবনের? চোর, বদমাস, ডাকাত, খুনী, বলাৎকার-করা সব মানুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে আমি তো ওদেরই মতো হয়ে যাব। কী ব্যবস্থা বলো এই দেশে! অপরাধীদের কোনোই শ্রেণীবিচার নেই। ভাল লোকও জেলে ঢুকলে অপরাধী হয়েই বেরিয়ে আসে; নেহাত সঙ্গদোষেই। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যেদিন তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছব, সেদিন তুমি আমাকে হয়তো চিনতেই পারবে না, চিনতে পারলেও তুমি হয়তো অস্বীকার করবে আমাকে। এ যে অনেকই লম্বা সময়! তুমি যত লম্বা ভাবছ কুর্চি, তার চেয়েও অনেকই বেশি লম্বা। এবং জেল থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্ত থেকেই আমি, আবার জেলে যাবার জন্যে অথবা ফাঁসিতে ঝুলবার জন্যেই তৈরি হতে থাকব হয়তো।

পৃথুদা, আমি অবাক হয়ে ভাঁটুকে বললাম, কেন? তা কেন?

ও বলেছিল, খুন করব আমি, তোমার পৃথুদাকে। জেল থেকে বেরিয়েই আমি খুন করব তাকে, যে আমার জীবনের শনি, যে আমার আজকের এই অবস্থার জন্যে দায়ী, সে কি ভাবত, আমি এতই

বোকা যে, কিছুই বুঝতাম না ?

আমি ভাঁটুকে বললাম, পৃথুদার কী দোষ ? দোষ তো আমারই ! তুমি না হয় তার চেয়ে আমাকেই খুন কোরো। ভালবাসা কি মানুষ ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে বাসতে পারে ? ভালবাসা হয়ে যায় ; ঘটে যায়। যখন তা ঘটে, তখন দোষ-গুণের প্রশ্ন থাকে না ভাঁটু। যা অবধারিত, তাইই ঘটতে থাকে। দোষ তো আমারই বেশি। আমাকেই শাস্তি দিও তুমি।

ভাঁটু জ্বালা-ধরা চোখে আমাব দিকে তাকিযে ; একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, দরকাব হলে তোমাকেও খুন করব আমি। যার সবই হারিয়ে গেছে তার হারানোর ভয় তো আর থাকে না। মান-সম্মান, তুমি ; সবকিছুই তো হারিয়ে গেছে আমার। পাঁচ বছর পর জেল থেকে যে-মানুষটা ছাড়া পাবে সে তো এই ভাঁটু নয় ! সে যে কী করবে আর করবে না, তা একমাত্র সেই ভাঁটুই জানে।

কী করব এখন আমি পৃথুদা ? কী হবে আমার ? আমাব জীবনে, এত অসহায়, একা-একা, কষ্টর জীবনের নিত্যসঙ্গী এখন শুধুই ভয। অনেক রকম ভয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আপনি যদি আমাকে খুঁজে বের করেন, সেই ভয়। জেলখানা থেকে বেরিয়ে ভাঁটু এসে যদি আপনাকে সত্যিই খুন করে ; সেই ভয়।

আপনার জন্যে বড় কষ্ট হয় পৃথুদা। ভাঁটু যেমন মনে করে, তার জীবনের সমস্ত অসুখের মূলে আপনি ; আপনিও কি তেমনই মনে করেন যে, আপনার জীবনের সমস্ত অসুখের মূলেও আমিই ? রুষাবৌদিও কি মনে করেন যে, আপনাদেব দুজনের জীবনেব সব অসুখেব জন্যে আমিই দায়ী ?

এসব ভাবতে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। আপনি বড়ই একা হয়ে গেছেন পৃথুদা। বড় একা। একা একা এমন করে একজন মানুষ কি বাঁচতে পারে ? আপনার জন্যে সত্যিই বড় কষ্ট হয় আমার। কিন্তু আমি নিরুপায়। যদি পারেন, তাহলে আমার এই লজ্জাময় অপারগতা ক্ষমা করে দেবেন। নিজগুণে।

জানবেন যে, আপনার কথা আমার সব সময়ই মনে পড়ে। দিনে রাতে প্রতিটি মুহূর্ত। আমার এই পর্ণকুটিরের পেছনেই একটি পাহাড়ী নালা আছে। আর সামনেই মাথা উঁচু করা গহন জঙ্গলে মোড়া সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর পাহাড়ের পব পাহাড়। শীত চলে যাচ্ছে। বসন্তর পায়েব শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি। আমার বাড়ির ঠিক পেছনের জঙ্গলেই, নালার এপাশে একটি পাগলা কোকিল থাকে। বসন্ত কবে আসবে তার ঠিক নেই, তাব দোসরও নেই, তবু সারা রাত সারাদিন সে গলার শির ফুলিয়ে কেবলই পুলকভরে ডাকে কুউ-উ-উ, কু-উ-উ-উ-। মাঝে মাঝে আবার একসঙ্গে ঘন ঘন ডাকে বার বার কু-কু-কু-কু-উ-উ--। আর সারা রাত ধরে ডাকে পিউ-কাঁহা পাখি। মনটা হু হু করে। সাহেবরা ঠিক নামই রেখেছিল এই পাখির। ব্রেইন্-ফিভার। মস্তিষ্কের জ্বরই বটে !

প্রহরে প্রহরে পেছনের নদীর খোলে শেয়াল আব শেয়ালনি হুক্কা-হুযা হুক্কা-হুয়া করে তাদেব সহজ শরীরী আনন্দ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কত হল তা ঘোষণা করে।

শেয়াল-কুকুর হয়ে জন্মালেও বেশ হত ! তাই না পৃথুদা ? মানুষ হয়ে জন্মানো বড়ই কষ্টের।

—ইতি আপনার কুর্চি।

চিঠিটা পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ উদাস চোখে অশ্বত্থগাছটার দিকে চেয়ে রইল পৃথু। চিঠিটা খোলা রইল তার বুকের উপরে।

বেচারি কুর্চি ! বেচাবি রুষা ! বেচারি বিজ্‌লী ! বেচারি ভাঁটু ! অন্য সব মানুষের দুঃখের কাছে নিজের দুঃখটাকে দুঃখ বলেই মনে হয় না আর। ভাগ্যিস অন্যর দুঃখে দুঃখী হওয়ার ক্ষমতা হারাযনি এখনও।

একা কে নয় ? কোন মানুষ একা নয় এই সংসারে কুর্চি ? যে-মানুষ ভাবে যে, সে নয় ; তাব ভাবনা বোধ হয় এখনও পুরোপুবি জমাট বাঁধেনি। আসলে, সকলেই একা। একা আসা, একা ভাসা ; একা চলে যাওয়া। আসা, আর যাওয়া। এই দুই মেরুর মধ্যে যা কিছু ঘটনা ঘটে, সান্নিধ্য, উষ্ণতা, পুতুলের সংসারের লীলাখেলা ; সেই সবই আধিক্য। মেরুমিলনের চিহ্ন আদৌ নয়। কুমেরু এবং সুমেরু চিরদিনই একা, তাদের মাঝের পৃথিবীতে যত কলরোলই থাকুক না কেন !

পৃথু ভাবছিল, কার যে কার কাছে কখন হেরে যেতে হয় অসহায়ের মতো ; তা যদি আগে জানা যেত ! দুর্ধর্ষ ডাকু মগনলাল হেরে গেল কবিতা-লেখা বাঙালি পৃথুর কাছে। পৃথু হেরে গেল একটা অশিক্ষিত, কুদর্শন, সামান্য, মোটা দাগের মানুষ ভাঁটুর কাছে।

ভাঁটু তাকে সত্যিই কি হারিয়ে দিল ?

একটা শালিক উড়ে এসে বসল জানালার তাকে। তারপর, ঘর নিস্তব্ধ দেখে, পর্দার ফাঁক দিয়ে সাহস করে রোদ যেখানে লাফিয়ে নেমেছিল ঘরের মেঝেতে, সেই রোদের হলুদ কাঁথার উপরে লাফিয়ে নামল সেও। ডাকল একবার কিচির্ করে।

একা-শালিক দেখলেই টুসু বলে, ওয়ান্ ফর সরো।

কমলা রঙা রোদ ও খয়েরী রঙা শালিকের দিকে চেয়ে-থাকা পৃথু চোখ দুটি বন্ধ করে, মাথাটা বালিশে হেলিয়ে দিল।

টুসু ছেলেমানুষ, তাই জানে না যে শুধু শালিক নয়, ওয়ান ইজ ওলওয়েজ ফর সরো। অ্যাণ্ড টু ; ওলমোস্ট ওল্ওয়েজ ফর জয়।

ওলমোস্ট।



আজ ছুটি হবে পৃথুর। কতদিন পরে বাড়ি যাবে ও। কোনো সাড় নেই। মন বড় অশান্ত হয়ে রয়েছে ক'দিন হল। বার বার 'কু' ডাক দিচ্ছে। নানা কথা মনের মধ্যে ঝড় তুলছে।

পাগল হয়ে যাবার আগে কী মনের অবস্থা এরকম হয় ?

কে জানে ?

দীর্ঘদিন আমি এমন প্রবাসী হয়ে আছি।
বড়ো দীর্ঘদিন, দীর্ঘবেলা।
জলের ভিতরে ক্রমে জমে-ওঠা শ্যাওলার সবুজ,
হাওয়া ভারী হয়ে আসে, স্রোত
থেমে যায়, ক্রমে
কুসুমের বুক থেকে ঝরে পড়ে নিহিত কুসুম।
দীর্ঘদিন বিজনে একেলা।
প্রণব মুখোপাধ্যায়।"

বড়োগাড়িতেই যেতে পারত। কিন্তু ভুচু বলেছে যে, সে জীপ নিয়ে আসবে। ভালই। কতদিন জীপে চড়ে না।

ব্রেকফাস্টের পরই ওরা এসে গেল। ভুচু, লাড্ডু আর দিগা।

দিগা হাসল।

দিগার হাসিটা আশ্চর্য। অন্য দশটা সাধারণ মানুষের হাসির সঙ্গে একেবারেই মিল নেই। ও যেন পৃথুর বুকের মধ্যেটা সহজেই দেখতে পায়। তার সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, একাকিত্ব। কিন্তু দিগা

সমবেদনা জানায় না কখনও। করুণা করে না। যেন, না-বলেই বলে, মানুষ হয়ে জন্মেছ বলেই ত দুঃখ। দুঃখবোধ যার নেই সে ত মানুষই নয়! দুঃখে, দুঃখিত হবে কেন। দুঃখ সাঁতরে যাওয়ার আরেক নামই ত জীবন!

ওরা একটা খারাপ খবর নিয়ে এল। সাবীর মিএগরও আসার কথা ছিল ওদের সঙ্গে। পাঁচদিন আগে রাতে তাঁর ম্যাসিভ একটা হার্ট-অ্যাটাক্ হয়ে গেছে। লেফ্‌ট ভেন্ট্রাকুলাব ফেইলিওর। চলেই যেতেন। দুদিন অক্সিজেনে ছিলেন। গিরিশদা, শামীম আর হুদা ওঁর বাড়িতেই আছেন। লাড্ডু আর ভুচু বলছিল যে, পৃথুর এই পা-হারানো ব্যাপারটা সাবীর সাহেবকে বড়ই ধাক্কা দিয়ে গেছে। কেবলই বলতেন, খুদাহ্ এ কী করলেন। এত ভরসা ছিল খুদাহর উপরে!

পৃথুর টুক্‌টাক জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিচ্ছিল ভুচু। পাউডারের কৌটো, ওডিকোলোনের শিশি : ওষুধপত্র। সিস্টার জন্‌সন্-এর ডিউটি ছিল আজ সকালে। ওষুধ কখন কি খেতে হবে, সব ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি।

অশত্থগাছটার মাথায় রোদ ঝিল্‌মিল্ করছে। ঘরে অত লোক থাকলেও সেই শালিকটা সাহস করে উড়ে এল ঘরে। সাহসী একলা শালিক। ওয়ান ফর সরো।

ক্রাচ্‌এ ভর দিয়ে দাঁড়ানো পৃথুর দিকে ভুচু ভাল করে চাইতেও পর্যন্ত পারছিলো না। খারাপ লাগছিল ভীষণ। ভাবছিল, ঈশ্বর যাইই করেন তারই পেছনে যুক্তি নিশ্চযই থাকে। সেই যুক্তি, আমাদের খোলা ও অদূর-দৃষ্টি চোখে চেয়ে আমরা বুঝতে পারি না। পৃথুর শাস্তি পাওয়াব হয়ত দরকার ছিল। সমস্তরকম অনুভূতির মধ্যে দিয়ে তাকে পার করাবার পেছনে কোনো গভীর উদ্দেশ্য হয়ত আছেই। তাঁকে বা তাঁব স্বরূপকে বোঝার ক্ষমতা নেই বলেই হয়ত মনে হয় ঈশ্বর নিষ্ঠুর।

পামেলা এসব কথা খুব সুন্দব করে বলতে পারত; বোঝাতে পারত। আব পামেলা!

ক্রাচ্‌এ ভর দিয়ে ঘর থেকে বেরুল পৃথু। ঘরের বাইরেটা তার একেবারেই অচেনা। করিডর, সিঁড়ি, লবী, সবই! যখন এসেছিল, তখন ত হুঁশ ছিলো না। সার্জনরা দুজনেই এসেছিলেন সাত সকালে। হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, টেক ইট ইন ইওব স্ট্রাইড মিঃ ঘোষ। দিস্ ইজ লাইফ।

থ্যাঙ্ক উ্য।

বলেছিল পৃথু।

ও জানে। এমন কিছুই কোনো মানুষেব জীবনে ঘটতে পারে না, তা যতই দুঃখবহ বা যন্ত্রণার হোক না কেন; যা তার আগে অসংখ্য অন্য মানুষের জীবনে ঘটেনি। তাব পা-ই ত প্রথম কাটা গেলো না! তবে দুঃখটা কিসের? এইটে ভাবলেও খারাপ লাগে। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই আগে অন্য কোনো না কোনো মানুষেব হয়েছেই। আনন্দর এবং দুঃখের সব অভিজ্ঞতাই। কোনো বিশেষ আনন্দ বা দুঃখের অবকাশ নেই তাই এতে।

সিস্টার জনসনকে ধন্যবাদ দিয়েছিলো পৃথু।

উনি বলেছিলেন, এ ত আমাদের কর্তব্য!

কর্তব্যকর্মই বা কজন করে ভাল করে?

পৃথু হেসে বলেছিল। বলেছিল, সিস্টার লাওয়াণ্ডেকে বলে দেবেন। দেখা হলো না যাবাব সময়।

ক্রাচটা নিয়ে জীপের সামনের সীটে উঠে বসতে গিয়েই টাল সামলাতে না পেরে, পড়ে গেল পৃথু। একটা ক্রাচ অনেকটা দূরে ছিটকে গেল। ভুচু দৌড়ে এসে তুলতে গেল ওকে।

পৃথু বলল, একদম্ না। দাঁড়াও দূরে। আমি নিজেই উঠব। আর না পারলে; উঠব না। করুণা কোরো না তোমরা আমাকে। প্লীজ্।

ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, ওদের কারোই সাহস হলো না কাছে যাবাব।

আবাবও চেষ্টা ক'রে আগে বাঁ পা-টা ঢুকিয়ে দিয়ে সীটে বসল কাৎ হয়ে প্রথমে। তার পব এক-ঝাঁকিতে কোমর নাড়িয়ে ঠিক হয়ে বসল। ক্রাচ দুটিকে দেড পায়ের মধ্যে রেখে বাঁ কাঁধের উপরে শুইয়ে রাখল।

ভুচু, পৃথুর গায়েব ধুলো ঝেড়ে দিল।

পৃথু তাকাল একবার ওর দিকে। মুখে কিছু বলল না।

পেছন থেকে দিগা বলল, সন্তত ধরণী ধরত সির রেণু। অর্থাৎ, ধরণী সর্বদাই তার মাথাতে ধুলো ধরে আছে।

কেন যে বলল, তা পৃথু বুঝল না।

জীপের সামনের সীটে বসে উইণ্ডস্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে যে-পৃথিবীকে দেখল ও অনেকই দিন পর, তাকে নতুন বলে মনে হল। আগের মতোই ত সুন্দরই দেখাচ্ছে তাকে। তফাৎ ত কিছুই নেই।

পান খাবে ত পৃথুদা ?

ভুচু শুধোল।

এতদিন খাইনি। অভ্যাস চলে গেছে। ছেড়ে দিলেই ত হয়। আবার কেন ?

মনে মনে বলল, অনেক কিছুব অভ্যাসই চলে গেছে। শুধু পানই ত আর নয়।

ছাড়লে ছেড়ো। আজ ত খাও একটা। বাজারের, ছোটুয়ার দোকান থেকে তোমার জন্যে স্পেশ্যাল করে সাজিয়ে এনেছিলাম কাল। রুমাল ভিজিয়ে, তাতে জড়িয়ে, উপরে শালপাতা মুড়িয়ে রেখেছি। এই নাও। আর এই নাও জর্দার কৌটো।

কটা বাজে ?

পৃথু শুধোল।

দশটা প্রায়।

জীপ ত আর কার-এর মতো জোরে যাবে না ! পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। তাই না ?

তা হবে। মান্দলাতে, টাইগার প্রজেক্টের অফিস ছাড়িয়ে, নদী পেরিয়েই সামনটা জায়গায় একটা নতুন ধাবা খুলেছে। কাল ট্রায়াল দিয়ে এসেছি। সেইখানেই গাছতলায় বসে রুটি, আণ্ডা-তড়কা আর তন্দুরী চিকেন খাব। তোমার জন্যে কাল আসবার সময় মোরগা পছন্দ পর্যন্ত করে এসেছি। সঙ্গে ভড়কা আছে। লেবুও নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে। তোমাকে একটা জম্পেস্ ভোজ দিতে হবে না ! কত্বদিন পর, প্রাণে বেঁচে ; ঘরে ফিরছ !

লাড্ডু বলল, আমার বাড়িতেও একদিন কিম্তি খানা হবে। খ্যয়েব, যে নিজে হাতে পেয়ারভরে রান্না করে খাওয়াত, সেই সাবীর সাহেবই পট্‌কে গেলেন।

ভাল ত হয়ে উঠবেন ! পট্‌কালে কী হয় !

পৃথু বলল।

সন্দেহ আছে। বুড়ো বোধ হয় আর সেই বুড়ো থাকবে না। আমাদের সময়টা, সকলেরই খুবই খারাপ যাচ্ছে পৃথুদা।

পামেলা কেমন আছে ? বিয়েটা হচ্ছে কবে ? বেশ কিছুদিন আগে জানিও কিন্তু।

বিয়ে ?

বলেই থেমে গেল ভুচু।

তারপর বলল, পরে বলব। তোমাকে ত বলতেই হবে সব।

পেছন থেকে ফুট্ কাটল দিগা, জানি না জাই নারী গতি ভাই। নারীর গতিপ্রকৃতি জানা যায় না ভাই। তারপরই বলল, 'করত্ মনোরথ জস্ জিআঁ জাকে' মানে যার হৃদয় যেমন, সে সেই রকমই ইচ্ছে করে। হৃদয়ের উপর কি জারিজুরি খাটে ?

দিগাকে পৃথু চিরদিন পছন্দই করে। তবু, এ মুহূর্তে ওর এই জোর করে তুলসীদাস শোনানো ওর মোটেই পছন্দ হলো না। বিরক্তির সঙ্গে পেছনে তাকাল একবার। সব কিছুরই সময় আছে।

জীপ স্টার্ট করল ভুচু।

পৃথু পানের পিক্ ফেলল। অনেকদিন পর জর্দা মুখে দিল। মুখটা ভরে গেছে জলে। জর্দা খুব জল কাটায়। পিক্ ফেলল, মুখ বাড়িয়ে।

জীপটা এগিয়ে চলল। সব সময়ই এই লেফ্‌টহ্যাণ্ড ড্রাইভ্ জীপে ডান পা-টাই বাইরে বের করে

জীপের ছোট্ট পাদানীর উপর রেখে বসত পৃথু। ট্রাউজারের ফাঁক-ফোকর দিয়ে হাওয়া ঢুকত। পত পত্ করে নড়ত তলাটা। আর......

ভুচু বলল, কী দাদা? টিকিয়া-উডান্ চালাই?

না। না। ডান পায়ে ভর দিতে ত পারব না। যদি হুমড়ি খেয়ে পড়ি? রইয়ে-সইয়ে। ভুচু। রইয়ে-সইয়ে।

টিকিয়া-উড়ান না হলেও বেশ জোরেই চলতে লাগল জীপ। টিকেরিয়ার পথে। দেখতে দেখতে জবলপুর শহরের ভীড় পাৎলা হয়ে এল। শহরের বাইরে এসে পড়ল ওরা। হাওয়ায় ভাপ লেগেছে। শুকনো পাতা উড়ছে। তবে লু বইবার দেরী আছে এখনও অনেকই!

দুহাতে ক্রাচ্ দুটিকে জড়িয়ে ধরে বসে। সামনে পথের দিকে চেয়ে রইল ও মুখে কোনো কথা নেই।

দিগা পাঁড়ে ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, চিন্তা সাঁপিন্ কো নহি খাযা? চিন্তারূপী সাপ, কামড়ায় না কাকে?

জীপের পর্দা উড়ছিল পত পত্ করে, রডের উপর আছড়ে পড়ার আওয়াজ আসছিল ধ্বপ্-ধ্বপ্।

ভুচু? অনেকদিন আসেনি রুষাবা।

ভুচুর চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল। চমকেও উঠেছিল যেন ও একটু। বলেছিল, অনেকদিন ওদিকে যেতে পারিনি পৃথুদা। ভালই নিশ্চয়ই।

পৃথু বুঝেছিল, এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বোঝেনি, কেন? বাড়ি ছেড়ে রুষা কোথাও গেলেও যেতে পারে, কিন্তু মিলি টুসু যাবে কোথায়? পামেলারই বা কি হল?

ক্যা হো গ্যযা? সবেব একদম চুপচাপ?

লাড্ডু বলল। জীপের মধ্যের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে।

দিগা বলল, এই পৃথিবীতে বড় বেশি অপ্রয়োজনীয় কথা হয়। চিরদিনই হয়ে এসেছে। যে যতক্ষণ পারে চুপ করে থাকাই ত ভাল। মুখ চুপ করলে ত আর মস্তিষ্ক চুপ করে থাকে না। আগুন জ্বালায় শরীরকে; আর চিন্তা জ্বালায় মনকে।

হাওয়া লাগছিল চোখে মুখে। দাড়িটা বেশ বড় হয়ে গেছে। তবে ট্রিম করা হয়নি বলে পাগলের মতই দেখাচ্ছে। চুলও কাটেনি সাড়ে তিন মাস। মাথার চুল আর দাড়ি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। দুটি ক্রাচ-এর উপর দুটি হাতের পাতা রেখে তার উপরে মুখখানি রেখে বসেছিল পৃথু। জীপ এখন একেবারে নির্জনে এসে গেছে। নর্মদা এখনও দেখা যাচ্ছে না। আরও ঘণ্টা খানেক পর থেকে মান্দলার পথের পাশে পাশে চলবে নর্মদা।

কী হল পৃথুদা। একেবারেই চুপচাপ যে! নাও, ড্যাশবোর্ডের ড্রয়ারটা খোলো। পান খাও আর দুটো। তুমি যেন কীরকম হয়ে গেলে। নাকি, ভড়কাই বানিয়ে দেব জীপ থামিয়ে? তোমাকে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরছি কত আনন্দের দিন আজকে। আর তুমি নিজেই কেমন মুষড়ে রয়েছো।

ঠিক আছে। খাচ্ছি পান। অন্য কিছু এখন নয়। আসলে আমি এই রকমই ভুচু। আমার কলেজের ফ্রেঞ্চ-এর প্রফেসার বলতেন, লা গাঁর্সো দ্য ল্যুন। ছেলেটা চাঁদে চলে গেছে। আমি কখন যে কোথায় থাকি, নিজেই জানি না। সত্যিই জানি না।

পান মুখে দিয়ে জর্দা ফেলে, মুখ বাড়িয়ে পৃথু পিক ফেলল আবার। কবিতা, কবি, এই সবেই পেয়েছিলো তাকে। কথা বলতে সত্যিই ইচ্ছে করছিল না। এরকম হয় মাঝে মাঝে। অনেক অনেকদিন পর। কতদিন লেখে না একটিও লাইন। তার লেখার টেবলেও কি ধুলো পড়ে আছে? কতদিন কতদিন লেখে না....

"কবিতা লেখার জন্য সময়ই পান না

বুঝি না?

উত্তর না দিয়ে জনান্তিকে মুখ মুচকে হাসি

ফাঁকা ঘরে জানালার ওপারে দূর
নীলাকাশ থেকে আসে
প্রিয়তম হাওয়া
না-লেখা কবিতাগুলি আমার সর্বাঙ্গ
জড়িয়ে আদর করে, চলে যায়, ঘুরে ফিরে আসে
না হয়ে ওঠার চেয়ে, আধো-ফোটা, ওরা খুনসুটি
খুব ভালবাসে।"

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

বডই দুঃখেব কথা এই মহৎ কবি আজকাল সত্যিই বেশি কবিতা লেখেন না। এবং তাই-ই বোধ হয় মণি চাকলাদাবদের মতো কবিদেবই লম্ফ-ঝম্ফ বেড়ে যেতে থাকে দিন দিন।

এবার নর্মদা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে চলেছে সে। এ নর্মদাকে দেখে জবলপুরের ভেড়াঘাটের মার্বল বক্ এব মধ্যে থেকে বেরুনো পাথবেব স্বপ্নিল যাদুব মধ্যেব সরু নদীটিই যে এব পিতৃপুরুষ, এ কথা বিশ্বাস করাই মুশকিল। টিকেবিযায় এসে পৌঁছল ওরা। বাবার কথা, ঠ্ঠা বাইগার কথা অনেকই পুবোনো কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন দেখেনি ঠ্ঠাকে। ভুচুদেব কাছে শুনেছে যে, ঠ্ঠা জঙ্গলে গেছে। কবে ফিববে কে জানে?

মান্দলায় পৌঁছে টাইগাব প্রজেক্টেব অফিসের ঠিক সামনেই পারিহার সাহেবেব সঙ্গে দেখা। জীপ চালিযে বাড়ি যাচ্ছিলেন লাঞ্চ-এর জন্যে। বললেন, পেঞ্চ ন্যাশানাল পার্ক-এব ডিরেকটব হয়েছেন এখন। এখানে এসেছিলেন লাওলেকার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। জীপ থেকে নেমেই জড়িয়ে ধরলেন তিনি পৃথুকে। বললেন, আপনি ত এখন হীরো। আমরা যে আপনাকে চিনি এ কথা বিশ্বাসই কবতে চায না লোকে।

পৃথু হাসল। লাজুক হাসি।

পারিহার সাহেব বললেন, চলুন। চলুন। আমার বাড়ি লাঞ্চ খাবেন।

পৃথু বলল, আমাব সঙ্গে যে মস্ত দল। বিনা-নোটিসে এত লোক মিলে ভদ্রলোকেব বাড়ি যাওযা যায় না। পারিহার সাহেব দল দেখে বুঝলেন এবং আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

পারিহার সাহেব একবার পেঞ্চ ন্যাশানাল পার্কে যাবার নেমন্তন্ন জানালেন। সীওনী হয়ে যেতে হয়। সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীব বুকের মধ্যে। ভারী সুন্দর জায়গা। লাল নীল নদী, সবুজ পাহাড়। পরীরা খেলা কবে সেখানে। ঠ্ঠা বলত। এক সময অনেক শিকাব করেছে সেখানে পৃথুবা। বাবাব আমলে।

বলল, যাব একবাব সময কবে। নিশ্চযই যাব।

ধাবাটা নতুন হলেও, ভালই। সঙ্গে সঙ্গে চৌপাই বের করে দিল গাছতলায। ছায়াও আছে। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে।

ভুচু নেমে তাড়াতাড়ি গুরুব জন্যে ভড়কা তৈবী করল। কাপালিকের চেলারা যেমন গাঁজা সাজে। তারপর নিজের জন্যেও সেজে নিল। লাড্ডু আর দিগা ত নিরামিষাসী। লাড্ডু ঠিক নিরামিষাসী নয। সবুজ-বঙা সিদ্ধির গুলিব লাথি সে খেতে ভালবাসে। সে খায জমিয়ে, বাদাম-পেস্তা দিয়ে শরবৎ বানিযে। তবে সন্ধ্যের পর চান-টান করে শুদ্ধ হযে, ঈত্তব টিত্তব ইস্তেমাল করে তানপুবা বেঁধে নিয়ে।

পৃথু বলল, এবার একদিন তোমার গান শুনতে হবে লাড্ডু সারারাত ধরে। গিরিশদার বাড়ি এখন আর কাকেদের ঝামেলাও নেই। কত্তদিন শোনা হয়নি।

কাক না থাকলে কি হয়? পণ্ডিত ত আছে। সে কখন যে কী পণ্ডিতী করে বসে সে সেই-ই জানে।

ভুচু বলল।

কে পণ্ডিত?

পৃথু শুধোল।

আরে শেয়াল পণ্ডিত। সে ত এখনও বহাল তবিয়তেই আছে। ভাল খেয়ে দেয়ে ভুঁড়ো শেয়াল একেবারে জার্মান অ্যালসেসিয়ানের চেহারা ধরেছে। তার হরকৎই আলাদা। গলায় চকচকে বকলেস। পাঁঠার টেংরী ছাড়া খায় না।

গিরিশদার এখন নতুন পাগলামি কি?

ডায়াসকোরিয়ার চাষ করছেন টাঁড়ে। বম্বের এবং কলকাতার ওষুধ কোম্পানীর সঙ্গে রেগুলার চিঠিচাপাটি চলছে। এইখানেই ট্যাবলেট বানাবেন কনট্রাসেপটিভ-এর।

পাগল একেই বলে। এই বয়সে কেউ কনট্রাসেপটিভ নিয়ে মাথা ঘামায়? কোথায় অ্যাফ্রোডিসিয়াক নিয়ে পড়বেন তা না। কবিতা লিখেই দাদার মাথাটা গেছে।

পৃথু বলল।

ডান পাটা টনটন করছিল। রক্ত দপদপ করছিল কাটা জায়গাটাতে। ক্রাচ পাশে রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল পৃথু চৌপাইয়ে। হঠাৎই মনটা খারাপ হয়ে গেল। বড়ই খারাপ। মন থাকলেই এমন হয় মাঝে মাঝে।

ভুচু এসে ভডকার গ্লাস দিল হাতে। শুয়ে শুয়ে খাওয়া যায় না। কাৎ হয়ে আধশোয়া ভঙ্গীতে উঠে বসল।

ঠিক সেই সময়ই একটা জীপ এসে ওদের পাশে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড বড় বড় কালো কুচকুচে গোঁফওয়ালা একজন লোক ড্রাইভারের পাশে। পেছনে দুজন লোক। পেছনের লোকদের বুকে গুলির বেল্ট আর হাতে চকচকে জার্মান রাইফেল। সামনের গুঁফো লোকটিরও বুকেও গুলির বেল্ট। কোমরে পিস্তল। এবং হাতে অটোম্যাটিক রাইফেল।

সে নামতেই, পেছনের লোক দুজন তার দু পাশে দাঁড়াল নেমে এসে। বডি গার্ড।

গুঁফো লোকটি বলল, পিরথুবাবু আপই না হ্যায়?

আধো শুয়েই পৃথু তাকাল তাদের দিকে।

পৃথুর মনে হল এ বোধ হয় মগনলালের লোক। শেষ করতে এসেছে ওকে। কিন্তু তাতে পৃথুর কোনোরকম উত্তেজনা বা ভয় হলো না। বরং ভাবল, দিক শেষ করে। ফুরিয়ে যাক সবকিছু। ক্লান্তি জমেছে বড়ই।

ভুচু পৃথুর হয়ে উত্তর দিল। বলল, জী হাঁ। আপ কি শুভনাম?

বলেই, কোমরের দিকে হাত চালান করল।

পৃথুর কোমরেও ছিল। কিন্তু ওর ইচ্ছেও হল না হাত নামাবার।

ম্যায় ভিনোদ সিং। মগনলাল হামারা ইক্-নাম্বারী দুশমন থে।

পররনাম পিরথুবাবু। বলেই, চোখ দিয়ে বারণ করল ভুচুকে পিস্তলের দিকে হাত না বাড়াতে।

বলল, আপসে মিল্‌কর বড়া খুশী আয়া। মা আপকি ভালা করেঙ্গী।

ততক্ষণে ড্রাইভার একটি ঝুড়ি নিয়ে এসে রাখল পৃথুর চৌপাইর সামনে। তাতে দু'বোতল জনি-ওয়াকার রেড লেবেল স্কচ হুইস্কী, কিছু ফল এবং চারটে তাগড়া লাল মোরগা।

ভিনোদ সিং বলল, আপনি গ্রহণ করলে, খুশি হব।

পৃথু কিছু বলার আগেই ভিনোদ সিং স্যালুট করল পৃথুকে। তার রকমটা অনেকটা উগাণ্ডার ভ্যাডা ফিল্ডমার্শাল ইডি আমিন পি এইচ ডি ডাডার স্যালুটেরই মতো। হাসি পেল পৃথুর।

বলল, ইন্দার সিং লালসাহেব ভি হামারা দুশমন। মগর আপ্ নহী। কোঈ জরুরৎ পড়নেসে মুঝে জারা ইয়াদ কীজিয়েগা। হামারা মদত্ আপকি লিয়ে বরাব্বর রহেগা। সিরিফ্ পুকারকা জরুরৎ। আপকা লিয়ে মেরী জান কবুল্।

বলেই, স্যালুট্ করে আবার ফিরে গেল জীপে। ড্রাইভার জীপ স্টার্ট করে জোরে চালিয়ে চলে গেল, পৃথুরা যেদিকে যাবে; সেই দিকেই।

ভুচু বলল, খুদাহ্ যব দেতা ছপ্পর ফাড়কে দেতা। চলো, আজ রাতেই লাড্ডুর গানের সঙ্গে

হুইস্কীর সেবা হবে।

লাড্ডু বলল আজ নয়।

পৃথুও বলল, আজ নয়। ঝুড়িটা ভুচু তুমিই নিয়ে যাবে। পরে হবে একদিন। সাবীর সাহেব সুস্থ হয়ে উঠুন। গিরিশদার বাড়িতেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভুচু টিকিয়া-উড়ান চালাল গাড়ি। পৃথু ভাবছিল, ভিনোদ সিং নামটা যেন কোথায় শুনেছে! কোথায় শুনেছে, মনে করতে পারল না অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও। তারপর হঠাৎই মনে পড়ে গেল। বিজলী বলেছিল। ভিনোদ সিং-এর ভাইয়ের সঙ্গে বিজলীর ছোট বোনের বিয়ে হবে না কী যেন বলেছিল বিজলী।

দূর থেকে হাটচান্দ্রা দেখা যাচ্ছিল। কারখানার পাঁচিল। বয়লারের চিম্‌নি। ক্লাবের কম্পাউণ্ডের মধ্যে স্কোয়াশের কোর্ট-এর উঁচু দেওয়াল। নিশ্ছিদ্র। ভারী ভাল লাগছিল ওর। একেই বোধ হয় সাহেবরা হোম-কামিং বলে।

বাড়ির সামনে যখন জীপটা এসে পৌঁছল বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল হঠাৎ পৃথুর। সন্ধ্যে হয়ে যাবে একটু পরই কিন্তু বাড়িতে আলো জ্বালেনি কেউই। রুষার ও মিলি টুসুর বেডরুমের আলোও নেবানো। জানালা সব বন্ধ। ড্রইংরুমের জানালাও সব বন্ধ। শুধু বাইরের দিকের দুটি জানালা খোলা। গাড়িটা অবশ্য পোর্টিকোতে আছে।

দুখী জীপের আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে এসে দরজা খুলল।

মেরীও দৌড়ে এসে পৃথুকে ক্রাচ্-এ ভর করে কষ্ট করে নামতে দেখেই, দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

দুখী, পৃথুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। হাত তুলে বারণ করল পৃথু।

পৃথু বলল, মেমসাব?

ওরা কোনোই উত্তর দিলো না।

দুখী জীপ থেকে মাল নামিয়ে নিল।

টুসুবাবা? মিলি? পৃথুর গলাটা শুকিয়ে এল। তেষ্টা পেতে লাগল খুব। বুকের মধ্যে অব্যক্ত চাপা একটা কষ্ট। এমন কষ্ট কখনও পায়নি ও।

পৃথু আবারও বলল। টুসুবাবা?

তাতেও জবাব দিলো না ওরা কেউ। মেরী বা দুখী।

পৃথু ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার ভুচুর মুখে তাকাল।

দিগা আর লাড্ডু অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভুচু মুখ নামিয়ে নিল। মুখ নিচু করেই বলল, কাল সকালে আমি আসব পৃথুদা। এখন যাই। আমি জানতাম। তোমাকে বলিনি। কী লাভ?

তারপর বলল, আমি কি ফিরে আসব পৃথুদা রাতে? তারপর নিজেই বলল, না। আজ তুমি একা থাকো। একা থাকা দরকার।

দিগা বলল, রাতটা ভুচুবাবুর গারাজে কাটিয়ে আমি কাল সকালেই ফিরে যাব ডেরায়। আসবেন পৃথুবাবু। মন খারাপ লাগলেই আমার কাছে চলে আসবেন। এখনও অনেক ভালোলাগা আছে। রোদ, বৃষ্টি, জঙ্গল, চাঁদ। ভালোলাগাটাকে শুধু সরিয়ে আনতে হবে। আর কিছু নয়।

ওরা চলে গেল, জীপ ঘুরিয়ে নিয়ে।

খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের কালো কুচকুচে যুবতী আয়া সাদা ধবধবে জোয়ান অ্যালসেসিয়ান কুকুরটি এবং লালচে রঙের একটি কুকুরীকে নিয়ে ফিরে এল।

প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের মুক্তি নিহিত আছে। হয়ত কুকুরদেরও।

আয়াটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পা-হীন পৃথুকে দেখল এক ঝলক। তারপরই দৌড়ে চলে গেল ভিতরে। হয়ত স্ত্রী-পরিত্যক্তা, ল্যাংড়া পৃথু ঘোষের প্রত্যাবর্তনের রসালো খবরটা ভিতরে পৌঁছে দিতেই।

পৃথু, আস্তে আস্তে ভিতরে গেল। সিঁড়ি টপ্‌কে উঠতে খুবই কষ্ট হল ওর।

জানল, যে বাকি জীবনটা সিঁড়িকে ভয় করেই চলতে হবে ওর। সে সিঁড়ি, আরোহণেরই হোক ; কী অবরোহণেরই হোক।

লছ্‌মাব সিং কুক্ এসে সেলাম করে জিগগেস কবল, কী খানা পকাব হুজৌর ?

খনা ?

খাবার যে পাকাতে হয় এবং তাও যে আগে থাকতে বলে দিতে হয এসব পৃথুব জানা ছিলো না। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে বলল, কিছু খাবো না।

মেবী বলল, আপনার শরীব এখনও সুস্থ হয়নি স্যাব। কিছু না খেলে চলবে কী করে ? স্যুপ আর মুরগীর বোস্ট বানিয়ে দিতে বলছি।

পৃথু অবাক হয়ে চেয়ে বইল। স্যুপ্ কী দিয়ে বানায ? মুবগী কোথায় পাওযা যায় ? দাম কত ? এসব কিছুই ত ও জানে না।

মেবী ওব মনেব কথা বুঝতে পেবে বলল, মুবগী ফ্রিজেই আছে। অন্য তবিতবকারীও আছে। চাল ডাল মশলাপাতি। কয়েকদিনের মতো সবই আছে। মেমসাহেব সবই রেখে গেছেন বন্দোবস্ত কবে।

ওঃ। তাই-ই।

বলল, পৃথু।

তাবপব পা টেনে টেনে নিজেব ঘবেব দিকে যেতে লাগল।

মেবী বলল, গীজাব চালানো আছে। পাযজামা পাঞ্জাবি বেব কবা আছে। বাথরুম স্লীপাবও। চান কবে নিন স্যাব। এতখানি পথ এলেন।

এমন সময় দুখী এসে একটি মোটা খাম দিল পৃথুর হাতে।

বলল, মেমসাব দিয়ে গেছেন। আপনাকে দিতে বলেছেন।

ওরা কবে চলে গেছে ?

তা, প্রায় দশদিন হল।

টুসু ? টুসু যাওয়াব সময কিছু বলেনি আমাকে ? আমাকে বলাব জন্যে ? কিছু না ?

না। কাঁদছিল শুধু।

কাঁদছিল ? তা যেতে দিলে কেন তোমবা ?

আমবা কী কবব স্যার ? আমবা কে ?

প্রথমে নিজেব ঘবে না গিয়ে ও বলল, সব ঘর খুলে দে দুখী। সব ঘবে আলো জ্বেলে দে। এ বাড়িতে থাকতে পাবব না আমি।

বলে, ও চান কবতে গেল রুষাব খামটি ওব ঘবেব লেখাব টেবলে রেখে।

ক্রাচ দুটো বাথরুমেব দবজার বাইবে রেখে গেল। ক্রাচ্ ছাড়া দাঁড়াতে পারছিলো না। বাথটাবেব কোণায় বসে কোনোরকমে চান কবল।

বাথরুম বা বাথটাবও নোংবা হলে ওকে বলার আর কেউই নেই। রুষা আর চেঁচামেচি করবে না তা জানে বলেই ও আরও বেশি সাবধানে চান করল। যা ঘটেছে বলে এবা বলছে, তা কখনও সত্যি হতে পারে না। রুষা ওকে ভয দেখাতে গেছে। বাকি জীবন যাতে পৃথু একজন ভদ্র, সভ্য, সামাজিক মানুষ হয়ে, রুষা যেমন চিরদিন চেয়েছিল, তেমন তার মনোমত হয়ে যাতে রুষার সঙ্গে থাকে ; তারই ওয়ার্নিং এ। চলে যাবে ! হুঁঃ। ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাকে ছেড়ে ইদুরকারের কাছে চিরদিনের মতো চলে যাবে এ কখনও হতেই পাবে না। অসম্ভব। এই অশিক্ষিত মেবী আব দুখী রুষাকে কতটুকু জানে ?

পৃথু ফিরে এসেছে এই খবব পেয়েই এক্ষুনি ফিরে আসবে সদলবলে ওবা।

জানে, পৃথু জানে তা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পৃথু মেরীকে ডাকল আবার।

বলল, ওদের জন্যে কী রান্না করছ ?

কাদের জন্যে স্যার ?

আঃ। তোমার মেমসাহেব, মিলি, টুসু...

মেরী চুপ করে থাকল।

তোমরা কী পেয়েছটা কি ? খবর দিয়েছ একটা মেমসাহেবকে ? আমি যে এসেছি, তা তারা জানবে কি করে ?

আপনি আজ আসবেন জানেন বলেই ত মেমসাব সকালে এসেছিলেন। এসেই ত আমাদের সব বলে-টলে গেলেন।

কার সঙ্গে এসেছিলেন ?

ইদুরকার সাহেবের সঙ্গে।

বড় লজ্জা হল পৃথুর। ওদের সামনে, ওর ইচ্ছে হল মাটিতে মিশিয়ে দেয় নিজেকে। আন্‌ইউজুয়াল পৃথু, কবি, পণ্ডিত, প্রকৃতি বিশারদ, ভার্সেটাইল, ডাকু মগনলালকে খতম-করা. বিলেত-ফেরৎ এঞ্জিনীয়ার হাটচান্দ্রা শেল্যাক কম্পানীর ভারিক্কী অফিসার পৃথু ঘোষের হঠাৎই মনে হল যে, ও সম্পূর্ণই ভাবশূন্য হয়ে গেছে। সুন্দর প্লাস্টিক ইমাল্‌শানে রাঙানো নরম সুরুচিপূর্ণ প্যাস্টেল-রঙা দেওয়ালে ও এতদিন সুদৃশ্য এক ওরিজিনাল মহামূল্য ছবির মতই শোভা পাচ্ছিল। রুষা ছিল, মিলি ও টুসু ছিল বলেই, সেও ছিল। সেই দেওয়ালটিই রাতারাতি অপসারিত হয়ে গেছে। সেই নিশ্চিহ্ন দেওয়ালেরই সঙ্গে সঙ্গে সেও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এও এক আবিষ্কার। বড় বুক-ভাঙ্গা আবিষ্কার।

রুষার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল ক্রাচ্‌এ ভর করে। ডাবল-বেড খাট, দেওয়ালে তাদের বিয়ের সময়কার ফোটো, আসবাবপত্র, বেডকভার, ডিম্বাকৃতি হালকা কমলা-রঙা কার্পেট খাটের পাশে, হাল্‌কা কমলা-রঙা বাথ্-ম্যাট্‌ সবই আছে। যেমন ছিল। ড্রেসিং টেবলের ওপর ওর ব্রাশ, চিরুনী, রোলার, লিপস্টিক্‌ পাউডার, অয়েল অফ উলে, নেইলপালিশ, নেইলপালিশ রিমুভার সব কিছুই ঠিকঠাক, যেন এক্ষুনি ফিরে আসবে রুষা। যেখানে যে জিনিসটি থাকার কথা ঠিক সেখানেই তা আছে। মনে হল বিকেলে ঘর ডাস্টিংও করেছে দুখী। এমন রুষার গায়ের গন্ধটিও রয়ে গেছে সেই ঘরে। শুধু সেই-ই নেই।

মিলির ঘরেও তাই। সবই পড়ে আছে, ওর দরজার ভিতরের দিকে মাইকেল জ্যাকসন-এর পোস্টার ছিল একটা, সেটা ও সযত্নে তুলে নিয়ে গেছে।

টুসুর ঘরে গিয়ে দেখল সে তার ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটা নিয়ে যায়নি। ফেলে গেছে সালিম আলির পাখির বইখানি। ফেলে গেছে দেওয়াল-জোড়া ব্রুস-লীর পোস্টারখানি। বইটি ওর আগের জন্মদিনে পৃথুই উপহার দিয়েছিল। বড় প্রিয় বই ছিল সেটি টুসুর। বইটি দু হাতে ধরল পৃথু ক্রাচ-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। মলাট ওল্টাল। লেখা আছে : মিষ্টি এবং দুষ্টু টুসুকে, জন্মদিনে ; তার খারাপ বাবা। ২০/৬/৮৪

সে ত কখনও ভালত্বর দাবী করেনি কারও কাছেই। এমন কী, তার ছোট্ট ছেলের কাছেও নয়। তবু তারা ছিল। বাড়ি ভরে ছিল। তার নিজের ঘরের লেখার টেবলের নির্মোকে নিজেকে মুড়ে ওদের তুলনায় নিজেকে অনেক আলাদা ও অন্যরকম ভেবে, ওদের গলার স্বর, রুষার সংসার চালানোর বকাবকি, টুং-টাং বাবুর্চিখানার, প্যানট্রির ডাইনীং টেবলের নানা শব্দের মধ্যে সে একা ঘরে থেকেও তাদের নিশ্চিত সঙ্গ ত পেয়েছিল। জানত ত যে, হাতের কাছের বেল টিপলেই একটি জীবন্ত, প্রাণবন্ত, দুরন্ত ফেনিল সংসার সমুদ্রের ঢেউয়েরই মতো তার ঘরে ঢুকে পড়বে। রুষাও ঢুকে পড়বে, "শী, শী ; লাইক আ ভিজিটিং সী, হুইচ নো ডোর কুড এভাব বেস্ট্রেন" ব্যবধান ঘুচে যাবে। রুষা এসে বলবে কী চাই তোমার ? না থাকলে মিলি আসবে, বলবে কী হল আবার ? টুসু এসে

বলবে, কাল আমার জিওগ্রাফীর টেস্ট তুমি এত ঝামেলা করো কেন ?

ওরা কেউই না থাকলেও দুখী, মেরী, অথবা লছমার সিংও এসে বলবে সাব ? স্যার ? হুজৌর !

চাইবার মতো কিছুই তেমন চাইত না কুঁড়ে পৃথু। কখনও ছেলেমেয়ে অথবা রুষাকে ডেকে বলত, জানালাটা বন্ধ করে দাও। কখনও বলত, ঐ যে, নীলরঙা বইটা তিন নম্বর তাকে ? সেটা নামিয়ে দাও। কখনও বলত এক কাপ চা। ব্যাসস এইটুকুই।

রুষার সংসারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে না থেকেও ও দারুণ ভাবেই জড়িয়ে ছিল যে, আজ এতদিন পরে, তা বুঝল ও। বুঝল একজন স্বামীর, একজন বাবার ; তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছাড়া কোনো অস্তিত্বই নেই। সে যতবড় তালেবর পুরুষই হোক না কেন ?

বুঝল পৃথু, বুঝল সবই ; ফিরল ঘরে, গুমোর ছেড়ে ; কিন্তু বড়ই দেরী করে। ছেড়ে যাওয়া যায়, যে কোনো সময়েই, দম্ভ ভরে, কিন্তু সময়ের মধ্যে না ফিরলে ঘর আর ঘর থাকে না। সব পাওয়াই তখন মিথ্যে হয়ে যায়। বড় বাঘেরই মতোবোকা পুরুষের সব দম্ভ, গর্ব, উচ্চমন্যতা, কোনো চালাক ইঁদুর এসে সময় বুঝে তার ইতর ছোট ছোট দাঁতে কেটেকুটে রেখে যায়।

পৃথু এ কথাটাই এখনও বিশ্বাসই করে উঠতে পারছে না। বুনতে সময় লাগে জীবনভর , কাটতে লাগে এত সামান্য সময় !

যে-ঘর ছেড়ে পৃথু বেরোতই না, যে ঘরের দরজা একটু সময় খোলা থাকলেও নানারকম সাংসারিক মানডেন ক্রিয়াকর্মে তার সৃষ্টিশীলতার ব্যাঘাৎ হত ভেবে সে বিরক্ত হত , সেই দরজাই সে এখন হাট করে খুলে রাখল। তার সেই কবিতা লেখার ঘরে সে এক মুহূর্তও থাকতে পারল না। এই প্রথম, সর্বজ্ঞ পৃথু ঘোষ চমকে উঠে বুঝতে পারল যে, কবিতা আসে, বোধ হয় শুধুমাত্র সুপারফ্লুইটি থেকেই। শূন্যতাকে কবিতায় পর্যবসিত যাঁরা করতে পারেন, তেমন বড় মাপের কবি পৃথু ঘোষ অন্তত নয়। হয়ত, অনেক কবিই নন। জীবন পূর্ণ হলে, পূর্ণ থাকলে তবেই তার শব্দমঞ্জরী, গন্ধপুঞ্জ, ভালবাসার নারীর শরীরের সুগন্ধ, শিশুর দুরন্তপনা এইসব ছাপিয়ে উঠে এসে জন্ম নেয় কবিতা। এতদিন সৃজনশীলতার বাহাদুরী, সে তার একার বলেই মনে করে এসেছিল। আজ বড় বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে জানল যে, কৃতিত্বের প্রায় সবটাই ছিল রুষা এবং মিলি টুসুরই। যা এতদিন তার প্রতিবন্ধক বলে জেনেছিল, আজ তাকেই জানল তার জোর বলে : যা ছিল বন্ধনের প্রতীক তাই-ই প্রতিভাত হল মুক্তি হয়ে।

রুষার খামটা হাতে করে ও রুষারই ঘরে এল। খোলা পড়ে থাকল নিজের মহামূল্য ঘর, কাগজ কলম, বই পত্র, সব কিছুই। উদলা গায়ের পথের কাঙালীর মতোসে অনাদৃত অনাবৃত করে দিল নিজের মনের জমিয়ে রাখা সমস্ত পণ্ডিতমন্যতাকে, অহমিকাকে। রুষার খাটে বসে একটানে বেডকভার সরিয়ে ফেলে তার পরমাসুন্দরী স্ত্রীর বালিশ টেনে নিয়ে নিজের ছেঁটে দেওয়া অস্তিত্বেরই মত দেড়খানা পা নিয়ে জবুথবু হয়ে বসল বিছানাতে। খামটা ছিঁড়ল ভয়ে ভয়ে।

তিক্ততাকে বড় ভয় পায় পৃথু। বড় বেশি আঘাত না পেলে ও নিজে কখনও তিক্ত হয়ও না। অন্য কেউও তার প্রতি তিক্ত হোক, তাও সে চায় না।

একটা লম্বা হিসাব বেরুলো প্রথমে।

বাঁদিকে জমা ; ডানদিকে খরচ। তার অবর্তমানে অফিস থেকে যে টাকা সংসার খরচ হিসেবে পেয়েছিল রুষা তাইই জমা করেছে বাঁ দিকে। মাসে মাসে ডান দিকে সব খরচ। বাজার, দোকান, মুদিখানা। একজন চাকর ও বাবুর্চির মাইনে অফিস থেকেই দেয়। শুধু দুখীর মাইনেটা নিজেদের দিতে হত।

অবাক হয়ে দেখল পৃথু, যে খরচের হিসেবের মধ্যে রুষার ব্যক্তিগত কোনো খরচই নেই। না পারফ্যুম, না লিপস্টিক, না জামা কাপড় না অন্যকিছু। একটি চুলের কাঁটাও পর্যন্ত কেনেনি রুষা পৃথুর পয়সাতে। সে কী গত সাড়ে তিন মাসেই কেনেনি, না কোনোদিনই না ?

মুখে অবশ্য বলত রুষা, আমার সব খরচ আমার। আমার আত্মসম্মান আছে। তোমার টাকা আমি নিই না।

বিশ্বাস করেনি সে কথা কোনোদিনও।

রুষা বলত, আজকাল শুনতেই হাজার হাজার টাকা। টাকা ত পয়সাই হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের ত না খাইয়ে রাখতে পারি না। জিনিসপত্রর যা দাম হয়েছে তার উপর ওদের শখ স্বাচ্ছন্দ্যও দেখতে হয়। আফটার অল ওরা হল গিয়ে টুয়েন্টীওয়ান ইয়ারস গেস্ট। টাকা নিয়ে স্বর্গে যাবে ভাবে অশিক্ষিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা। টাকা ত কাগজ বই নয়। বদলে কী পাওয়া যায়, টাকার দাম শুধু সেইটুকুই। ছেলেমেয়েদের জীবন কাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে। তারপর করার ইচ্ছে বা সামর্থ্য থাকলেও করার কোনো উপায়ই থাকবে না ওদের জন্যে।

রুষা বলত, আমার রোজগারের কত টাকা যে তোমার সংসারে ঢালতে হয় তা আমিই জানি। প্রতি মাসেই।

রুষার একটি কথাও বিশ্বাস করত না পৃথু। মেয়েরা টাকা পয়সা খুবই ভাল চেনে। সংসারের খরচ থেকে জমিয়ে গয়না না বানায়, এমন স্ত্রী বিরল।

বিশ্বাস করেনি রুষার একটি কথাও।

আজকে রুষা যবে যা বলেছিল, ছোট কথা, বড় কথা, অকিঞ্চিৎকর কথা, সব কথাকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল ওর। বলতে ইচ্ছে করছিল ভুল করেছি। হিসেবের ফর্দর সঙ্গেই আছে ন'শ আঠাশ টাকা। মাস পোয়ানো অবধি কি কি খরচা তার থেকে করতে হবে, তার নির্দেশ। লিখেছে আমরা দশদিন কম খেলাম। এই টাকা শুধু দৈনিক বাজার খরচের সেভিং।

এবার চিঠিটা খুলল পৃথু।

বিয়ের পর থেকে কটি চিঠি লিখেছে রুষা ওকে সবশুদ্ধ তা চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। চিঠি লেখার অভ্যেস রুষার একেবারেই ছিলো না। কিন্তু হাতের লেখাটি ওর খুবই সুন্দর। বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লেখে। প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যে অনেকখানি করে ফাঁক। প্রত্যেকটি লাইনের মধ্যেও অনেকখানি ফাঁক। যাদের চিন্তার স্বচ্ছতা থাকে তাদেরই হাতের লেখা এরকম হয়। বাংলায় চিঠি ও লিখতেই পারে না। ইংরিজিতেই লিখেছে।

মাই ডার্লিং পৃথু, মাই ডিয়ার হাজব্যাণ্ড,

কী বলে যে, আরম্ভ করব তাই-ই বুঝতে পারছি না।

এই চিঠি এর আগে দশবার লিখেছি, গত তিনরাতে, প্রায় না ঘুমিয়েই। তবুও যা বলতে চাই তা স্পষ্ট করে বলে উঠতে পারিনি। এই চিঠিটিও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তুমি ত কাল সন্ধ্যে নাগাদ এসে পৌঁছবেই আর দেরী করলে হবে না।

প্রথমেই কটি কথা বলে নিতে চাই। তোমাকে আমি ভালবাসি। বিশ্বাস করো, আজও তোমাকে আমি ভালবাসি। ভবিষ্যতেও তুমি আমাকে ভালবাসতে দেবে আশা করব।

এখনও শেষ হয়নি কিছুই। তবে, হতে পারে। আমাকে আর একটু সময় দাও ভাববার। তোমার সঙ্গে থেকে তোমাকে ছাড়ার ভাবনা ভাবাটা ঠিক হতো না। তাইই ওর অনেক পীড়াপীড়িতে চলে এসেছি এখানে।

সমাজকে ত তুমি কোনোদিনও মানোনি। তুমি ত বনের বাঘ। আমি মেনেছিলাম। মেনেছিলাম নিজেকে আমি একজনের স্ত্রী এবং তার ছেলেমেয়েদের মা বলে। সমাজে থাকলে, সমাজকে মানতে হয়ই। নইলে বনে গিয়েই থাকতে হয়। সে কথাটাই তোমাকে কখনও বোঝাতে পারিনি।

এখন আর কিছু লিখতে পারছি না। তবে লিখব। যদি তোমাকে বুঝিয়ে না বলি কেন একজন মানুষ হঠাৎ এই রকম বুক-ভাঙা আপাতঅবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত নেয়, কী করে নেয় তা না বললে, তুমি চিরদিনই আমাকে ভুল বুঝে থাকবে।

তোমার ছেলেমেয়েরাও তোমার। আমরা দুজনে মিলে অনেক কল্পনায় আর সুখে ওদের বানিয়েছিলাম। তুমি যে-কোনোদিনই এসে ওদের নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু ওরা যেতে চাইছে না তোমার কাছে। চাইবেই বা কেন ? তুমি ত ওদের কেউই ; কিছুমাত্রও ছিলে না। যে বাবারা সন্তান পালনের দায়িত্বের কিছুমাত্রও ভাগ নেয় তাদের উপর ছেলেমেয়েদের টান কিছু থাকেই। তুমি ত

টাকা রোজগার করা ছাড়া চিরদিন তোমাকে নিয়েই থেকেছ। তোমাব সিলী কবিতা চর্চা, তোমার হাস্যকর টপ্পা, উটওয়ালাদের গান, তোমার লাফাঙ্গা, বেওয়াকুফ বে-বহিস সব বন্ধুবান্ধব, তোমাব অসহ্য জঙ্গল-প্রীতি! ছেলেমেযেবা ত কোনোদিনও পায়নি তোমাকে। পাযনি এমনকি তাদেব জন্মদিনেও। তারা আজ যে তোমাকে চাইবে, এটা আশা কবাই অন্যায।

পৃথু, আমাদের এই জীবনে প্রতিটি প্রাপ্তির গাযেই একটি কবে দামেব টিকিট লাগানো থাকে। বিনা দামে, ধুলোকণা পর্যন্ত পাওয়া যায না এখানে। প্রেম, ভালবাসা, মান, সম্মান ত দূরেব কথা। বিবাহিত জীবনকে তুমি বিনামূল্যেই পেতে চেয়েছিলে তাই-ই সে জীবন হাতেব আঁজলা গলে গড়িযে গেল।

দোষ আমাকে দিও না। যাব যাব কৃতকর্মেব ফল তাকে ভোগ কবতেই হয।

ও বাড়িব মালিক যদিও আমি, কিন্তু এব মালিকানা আমি দাবী কবব না। আমাব এখন অনেকই আছে। কিছুরই অভাব নেই আমার। কিন্তু বিশ্বাস কবো, এ সবেব কণামাত্রও চাইনি আমি। ও বাড়িতে তুমিই থাকো। আমাব বিবাহিত স্বামীকে এ আমাব দান। তাব সঙ্গে অনেক স্মৃতিও।

তুমি প্রায়ই বলতে, কী তোমাকে দিইনি আমি? কী চাও তুমি আমাব কাছ থেকে?

আমি বলতাম, চোখ লুকিয়ে; বলব কেন?

তখন আবও ছেলেমানুষ ছিলাম ত। আশা তখনও ছিল, এই জীবন নিয়েই অনেক। তাইই চোখ ছলছল কবে বলতাম তা বলব কেন?

না-বলা কথা বুঝে নেবার মতো ধৈর্য তোমাব ছিলো না কোনোদিনও। তুমি তোমাকে নিয়ে আব তোমাব আশ্চর্য ঘর-বিমুখ শখেব বাউণ্ডুলে জীবন নিয়েই মেতে ছিলে। ঘব না থাকলে, আমবা না থাকলে তোমাব অন্তত দুঃখ পাওযাব মতো কিছুই দেখি না। ববং জানব, নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে, খুশিই হবে। আব যদি দুঃখ পাও তবে জানব, তোমাব বোহেমিযানিজম, তোমাব বন-জঙ্গল প্রীতি, আসলে একটা ভান মাত্র ছিল, একটা পোজ মাত্র, একজন নিচুদরেব এসকেপিসট-এব সস্তা বাহানা। তুমি আসলে যে কী, তা তুমি নিজেই জানবে একদিন।

উইমেনস্ লিব্ বলতে কী বোঝায আমি জানি না। ওঁদেব সব কথায সাযও দিই না আমি। আমার জীবন দিয়ে আমি এটুকু বুঝেছি যে, এদেশে তোমরা, মানে পুরুষেরা আমাদের হাজাব হাজার বছব ধবে হয় কুলঙ্গীর দেবী বলে পুজো করেছ নয কচি নধব পাঁঠাব মতো তোমাদেব কামেব যূপ কাষ্ঠেই বলি দিযেছ। আমরা মেযেবাও যে তোমাদেবই সমান, মানসিক, শারীবিক সব ব্যাপারেই আমাদের যে সমান ভূমিকা, সমান চাইবাব, তা তোমাদের মতো তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবিত্ত, সমাজের এলিট্ পুরুষবাই এখনও স্বীকাব কবো না। তোমরা যদি না করো, তাহলে তোমাদের চেয়ে যারা লেস ওয়েল-প্লেসড, লেস ওযেল অফফ তাবা করবে কী কবে। অসম্ভব।

আমার আজ মনে হয, এও এক ধবনের লিবারেশান্। মুক্তি, আমাদের। মন ত অনেকই বড ব্যাপার। ক'জন মানুষ আব মনেব কথা বোঝে? তুমিই কি বোঝ? ন্যাকা ন্যাকা চিঠি লিখে প্রেম-প্রেম খেলা কবো কুর্চিব সঙ্গে। তুমি একটা ডিসঅনেসট, ক্যাব্যাকটাবলেস মেযেব সঙ্গে কলেজের ছেলের মতো ডায়লগসর্বস্ব ভালোবাসায় মাতো।

আসলে সে টাকা পেলেই তোমাব বিছানাতে এসে ওঠার জন্যে তৈবী হয়ে আছে। বিজলীও তার চেয়ে অনেকই ভাল। তাদের কোনো প্রিটেন্স নেই। কিন্তু কুর্চিরা নেকু নেকু মুখ কবে বলে, কেন দেন? আহাঃ কী দরকাব ছিল? ভাঁটু জানলে কিন্তু ভীষণই রাগ কববে!

এ সবই তোমাব বাহানা। তুমি একদিন জানবে যে, কুর্চিরা, বিজলীদেব চেয়ে অনেকই নিচুদরের প্রসটিট্যুট। খারাপ লোকেরা কী একটা কথা বলেন না? মিসটার সেনরা একদিন পার্টিতে আলোচনা করছিল। ওরা তাইই। হাফ-গেবস্থ। সন্দেহ হয আমাব হাটচান্দ্রা ক্লাবেও তেমন আছে কিছু। তোমার কুর্চিবই মতো। আরও ভাল শাড়ি, হীরের এক জোড়া ইয়ারটপ্ একটি কোজী—হলিডে, অ্যাণ্ড দে আর গেম। শিওর গেম্। ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে।

পৃথু। তুমি আমাকে আর যাইই মনে করো, করতে পারো, আমি কুর্চি নই, আমি বিজলীও নই।

আমি সৎ। ছিলাম অন্তত দীর্ঘদিন। এবং যখন অসৎ হলাম, তখনই বাঁধন ছিঁড়লাম। ঘোমটার তলায় খেমটা নাচের ট্রাডিশান আমার নয়।

আমার জীবনকে আমি খুব ভালবাসি। মিলি-টুসুও ভালবাসে তাদের জীবনকে। তুমি একটি মেন্টাল কেস ছিলে, এখন ত ফীজিকালী ডিসএবলডও বটে। আমাদের সকলের জীবনকে তোমার মরবিড, মনোটোনাস, নির্জন বর্ষার সমুদ্রপারের টার্ন-এর ভীষণ ভীষণ ভীষণ মন-খারাপ করে দেওয়া কান্নার শব্দের মতোবিষণ্ণ আপসোস আর হতাশার জীবন থেকে আনন্দে নিয়ে যাবার জন্যেই আমার এই সিদ্ধান্ত। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ে ফেরা।

আমাকে ক্ষমা কোরো পৃথু। ওল থিংগস আপার্ট ড্যু আর আ ভেরী ভেরী ভেবী নাইস্ গাই। ট্যু সফ্‌ট্ ইন লাইফ, ট্যু সফ্‌ট্ ইন বেড এণ্ড ট্যু সফ্‌ট উইথ্ ইওরসেল্‌ফ অ্যাজ ওয়েল। ওল দীজ্ ওয়্যার ইওর ভার্চু। অ্যাণ্ড ইওর ভাইস, অ্যাজ ওয়েল। ইটস্‌আ পিটী দো।

ভালো থেকো। পরে ভাল করে চিঠি লিখব। তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করব একবার। মানে, ডেটিং। ক্যাণ্ডেলনাইট ডিনার খাওয়াবে কোথাও ? এটা একটা হরিবল্ জায়গা। লেট আস পার্ট উইথ গ্রেস্, উইথ আ টিয়ারফুল স্মাইল !

বাড়ির চাবি রেখে গেলাম। সব আলমারির চাবি, স্টেট ব্যাঙ্কের লকারের চাবি, টাকা পয়সা যদিও কিছু নেই, কলকাতার প্রকাশনীর কামসূত্রের বাংলা বইটা আছে শুধু। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে বলে তুমি রেখে দিতে বলেছিলে সেখানে। কী কাণ্ড ' যে দম্পতি সচিত্র কামসূত্রের বই ব্যাঙ্কের লকারে রাখে, তাদের ঘর যে ভাঙবেই এতে আর আশ্চর্য কী !

তুমি একটা অ্যাডোলেসেন্ট ছেলেমানুষ, কাণ্ডজ্ঞানহীন একটা ড্রীমার। একটা ডন কীযটে। তোমাকে পুজো করা যায়, তোমার নামে চৌপট্টিতে মনুমেন্ট বানানোও যায়, তুমি একটা রিয়্যাল ডার্লিং কিন্তু তোমাকে নিয়ে ঘর করা যায় না। আটার্‌লী ইমপসিব্‌ল অথবা আমি তেমন অসাধারণ নই ; তাইই হয়ত পারলাম না।

ভালো থেকো। ভালবাসা নিও। ড্যু নো, আই মীন এভরী ওয়ার্ড অফ ইট।

—তোমার রুষা

পুনশ্চ ঃ ডিভোর্স-টিভোর্স নিয়ে এখন আলোচনা করা প্রিম্যাচিওর। তুমিও ওসব ফর্ম্যালিটিতে বিশ্বাস করো না জানি। তাছাড়া, ফিরে যদি আসি আবার কখনও ? এমন কি, শীগগিরই ?

ইঁদুর যে পোষ মানবেই তা কে জানে ? যদি এও কামড়ে দেয় ? তবে ভরসা এইই যে, এ বাঘ নয় যে হালুম করে কামড়াবে। তবুও যদি ফ্রাইং-প্যান থেকে আভেনে পড়তে হচ্ছে দেখি, তখন দৌড়ে আসব তোমারই কাছে। তুমি ছাড়া, আফটার অল, কে আর আমার আছে বল ?

চিঠিটা শেষ করে চুপ করে বসে রইল পৃথু। ও নিজেকেই পাগল বলে জানত কিন্তু এ যে উন্মাদ।

গভীর এক ভালোবাসায় রুষার প্রতি ও স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রুষার খাটে৷ যে খাটে,রুষা বার বার বলেও তাকে শোওয়াতে পারেনি, পারেনি সেই ঘরেই কখনও। যে ভালোবাসা তেমন করে কখনও প্রকাশ করার সময় হয়নি রুষার কাছে পৃথুর, অথচ, রোজই ভেবেছে যে, প্রকাশ করবে, অথচ করবে করতে দেরী হয়ে গেছে বড়।

সময় বড় সাংঘাতিক। সময়ে সময় না রাখলে, সময় পায়ে দলে চলে যায়।

পৃথু ভাবছিল, একদিন ওর রাইফেলটাকে নিয়ে সময়ের চেয়েও অনেক বেশি জোরে দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁকের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে অ্যামবুশ্ করবে বলে। সময় যখন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছবে মোড়ে তখন দেবে ট্রিগারটা টেনে। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে সময় নির্জন বনবাসে। সেদিন থেকে সময়ের খবরদারী ও আর মানবে না।



ঘুম নেই। অনেকই ঘুমিয়েছে হাসপাতালে এ কদিন। ঘুমের মধ্যে ঘুমকে, স্মৃতির মধ্যে স্মৃতিকে এতদিন কাঁথা কম্বলেরই মতো জড়িয়ে শুয়েছিল দিন রাত। "স্লেপ্ট ইন মী স্লীপ দ্যাট ওজ এভ্‌রীথিং/ ট্রীজ আই হ্যাড ওলওয়েজ লাভড দ্যা আন্‌বিভীলড ট্রেডেবল্ ডিসট্যানসেস, দ্যা ট্রডেন ফীল্ড অ্যান্ড ওল্ মাই স্ট্রেনজেস্ট ডিস্‌কভারিজ"।

দুখীকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে, দরজাটা বন্ধ করতে বলে, বেরিয়ে পড়ল পৃথু।

দুখীর আপত্তি ছিল। আতঙ্কও ছিল। যে মানুষ, ড্রইংরুম এর সিঁড়ি উঠতে গিয়েই পড়ে যাচ্ছিল বিকেলবেলা সে এই গভীর রাতে কোথায় যাবে?

বলেছিল, সাব! কাঁহা যা রহেঁ আপ?

কাঁহা?

বলে, একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল।

কোথাওই যাবার নেই। যে-মানুষ নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যেতে চায়, চেনা আলো থেকে যেতে চায় অজানা অন্ধকারে তার জবাবদিহি করবার থাকে না কিছুই, কারো কাছে।

দুখীকে বলেছিল, এইসেহি। জারা ঘুম-ঘাম্‌কে আরহা হ্যায়।

তিন ত বাজই গায়া। উজলা হোনেকা বাদহি নিক্‌লিয়ে সাব!

নেহী রে বেটা।

নিজেরই বেটার মতো দুখী, যতক্ষণ না পৃথু তার চোখের আড়ালে চলে গেল, ততক্ষণ দরজা খুলে দাঁড়িয়েই রইল। খোলা দরজা দিয়ে আলোর হাত লম্বা হয়ে এসে পড়েছিল বাগানে, পথে। দুখী দেখল, পৃথুর কাঁধটা একবার নামছে আর একবার উঠছে। কেমন ভুতুড়ে অচেনা দেখাচ্ছিল তার চেনা সাহেবকে।

আলোর হাতছাড়া হতেই অন্ধকারটা গভীরতর হল।

চলতে লাগল পৃথু। পথের কুকুরগুলো ভুক ভুক্ করে ডাকতে ডাকতে ওর পেছন পেছন আসতে লাগল। একটা ঝগড়াটী মাদী কুকুর হঠাৎ ওর সামনে এগিয়ে গিয়েই ঘুরে এল দৌড়ে ডান পায়ে কামড়াবে বলে। ও ডান পায়ে লাথি ছুঁড়তে গেল। কাটা পা-টা ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো যন্ত্রণায়। ভুলেই গেছিল যে। তার ডান পাইই নেই, কুকুরী কামড়াবে কিসে?

সিস্টার জনসন বলে দিয়েছিলেন যে, এই রকমই মনে হবে বহুদিন। পঁয়ত্রিশ বছরের সঙ্গী যে ছিল, তাকে কি অত সহজে ভোলা যায়? সার্জনদের ভাষায় এই সীম্পটম্-এর নাম "ফ্যান্টাম-লিম্ব"।

সহজে ভোলা কিছুই যায় না। তবে, সময়ে হয়ত সবই যায়। রুষা, মিলি, টুসু, হারানো পা সবই এখন ফ্যান্টম্। সবাইই ভূত! ভালই!

হেঁটে যাচ্ছে পৃথু নিস্তব্ধ ঘুমন্ত হাটচান্দ্রার লাল ধুলো আর নুড়ি ভরা পথে। শুধু তার-ক্রাচ্ এর শব্দে সেই নিস্তব্ধতা ছিদ্রিত হচ্ছে।

মাথার ওপরে আদিগন্ত আকাশ। এখন গরম। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মধ্য গগনে মিথুন রাশি আর কালপুরুষ। দক্ষিণের আকাশকে নরম উজ্জ্বলতায় ভরে দিয়ে, অসভ্যর মতো ঘুমন্ত নারী পৃথিবীর বুকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে এই মাঝ রাতে লুব্ধক এবং অগ্যস্ত। তাদের উত্তরে বৃদ্ধহৃদয়। ছায়াপথ উড়ে গেছে স্বর্গের নারীর স্বচ্ছ শাড়ির আঁচলের মতো, দক্ষিণ-পুব থেকে উত্তর-পশ্চিমের আকাশে।

ক্লান্ত লাগছে পৃথুর। দু বগলে বড় লাগছে। ঘা হয়ে যাবে বোধ হয়। কাটা পা টা দুলতে থাকায় গরম রক্ত সোচ্চার হচ্ছে সেখানে। উষ্ণ রক্তর জীব না হয়ে সাপের মতো ঠাণ্ডা রক্তর জীব হলে বেশ হত। মনে হল ওর। রক্তর উষ্ণতা বড় সর্বনেশে।

টুসু যে শালবনের কুঁয়োর সামনে একদিন আত্মহত্যা করতে গেছিল, সেই শালবনের কাছে এসে একটি কালভার্টের উপর বসল পৃথু।

"আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখায় অগ্নি জ্বলে, নিদ্রাবিহীন গগনতলে"/ পুবাকাশে সিংহ রাশির উত্তরফাল্গুনী, পূব গল্গুনী। তার পশ্চিমে কর্কটরাশির পুষ্যা। তারও একটু উত্তর-পশ্চিমে মিথুনরাশি। সমস্ত আকাশময় শিশুমার, ধ্রুবতারা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, কৃত্তিকা, রোহিণী, প্রশ্বন্ এবং আরও কত অসংখ্য নামা ও অনামা তারা চাঁদোয়ার মতো ঘুমন্ত পৃথিবীর মাথার উপরে। কত অসংখ্য আলোকবর্ষ দূরে আছে তারা। তবু, কত কাছে বলে মনে হয়।

ধ্রুবতারা উত্তর আকাশে দাঁড়িয়ে সব পথ-ভোলা পথিককেই চিরদিন পথ দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু পৃথুর পথের নির্দেশ সেই উজ্জ্বল চিরন্তন তারার কাছেও নেই। জীবনে এমন দিশেহারা কখনও বোধ করেনি আগে। তার ডান পাটাব সঙ্গে পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনটাও যেন কাটা গেছে। ফ্যান্টম্ লিম্ব্-এর মতো এর ফেলে আসা জীবনটাও যেন ফ্যান্টম্ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই ভুল করে মনে হয় যে, আছে। কিন্তু পরক্ষণেই অপ্রিয় সত্যটাকে মেনে নিতেই হচ্ছে।

রিল্‌কের কবিতা এখন ওকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একজন কবিই শুধু অন্য কবির এবং কবিতা-মুগ্ধ সব মানুষের ব্যথিত হৃদযকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করতে পারেন। কবি যদি কবির মতো কবি হন তাঁকে আবিষ্কার কবে একই পাঠক, তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে মরকত মণির দ্যুতির মতো বিভিন্ন রঙে।

"ইফ সামটাইমস্ হ্যাপীনেস ফাউন্ড আস, নো-ওয়ান পজেসড ইট, হুজ ক্যুড ইট বী?"

মনে পড়ল পৃথুর।

হাসপাতালেব বিছানাতে শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল রুষা আর ছেলেমেয়েদেব নিয়ে এবার মাণ্ডুতে যাবে। দিন সাতেক থাকবে মাণ্ডুর ট্যুওরিস্ট লজ্‌এ। অতীত সেখানে কথা বলে। কতদিন আগে আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসে লাগানো বাওবাব গাছগুলি প্রাচীনতার সংজ্ঞাব মতো ঘিরে আছে এই দুর্গকে। স্থানীয় লোকেরা বলে "খুরসান্ ইমলি।" অনেকে বলেন "দ্যা আপসাইড ডাউন ট্রীজ।" কুমুদিনী আব পদ্ম ফোটে মাণ্ডুর জেহাজ মেহালের সামনের তালাও এ। জলপিপি আর ডুবডুবা হাঁসেরা ইলিবিলি সাঁতাবে অলস হাওয়া আর মেঘলা দুপুরকে ঠোঁটে করে উড়িয়ে নিযে যায় রূপমতী মেহালের দিকে। জলভরা ধূসর মৃদুগতি মেঘের গন্ধে তাদের ডানার আঁশটে গন্ধ মুছে নিযে তাবা উৎসাহে ওড়াউড়ি করে।

হলো না, হলো না যাওয়া। "কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া, চলে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া॥ যবে ঘাটে ছিল নেযে তারে দেখি নাই চেয়ে, দূর হতে শুনি স্রোতে তরণী-বাওয়া।"

"আসলে এবার কোনো সমুদ্রে বেড়াতে যাওয়া ছিল। গেস্ট হাউসের ঘর ছিল, রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল। ভি আই পি স্যুটকেস ছিল, নরম এয়ার পিলো ছিল অথচ হলো না। সঙ্গে ভালোবাসা যাবে কথা ছিল। সে কখন একা একা আঙুল ছাড়িয়ে চলে গেছে।" সুবজিৎ ঘোষ।

অনেকক্ষণ পর উঠল পৃথু। ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্ শব্দ করে বাজারের দিকে যেতে লাগল। ওর নিজের পায়ের পাতা ফেলার প্রায় নিঃশব্দ শব্দ আর কখনও শুনবে না জঙ্গল-পাহাড়; শুনবে না সে নিজেও। বড় রাস্তায় এসে উঠতে উঠতেই অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। ইদুরকারের বাড়ির দিকে এগোল ও। ঠক্-ঠক্, ঠক্-ঠক্ শব্দ করে তার অহং লজ্জা-শরম, মানের মাথা ও জোড়া ক্রাচের তলায় গুঁড়ো করে দিতে দিতে। চলতে হবেই ওকে যতক্ষণ না সেই সব একদা-প্রিয় বোধ মিহি ধুলোর সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যায়।

পৌনে এক মাইল মতো একটানা গিয়ে ওর মনে হল এবার পড়ে যাবে। বগলের নিচের নরম মাংস যেন কেটে গেছে। ডান-পাটাতে রক্তের দপ্‌দপানি বেড়ে গিয়ে নার্ভগুলো যেন দলা পাকিয়ে

উঠেছে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে পায়ে। তবু, সে যন্ত্রণা তার মনের যন্ত্রণার কাছে কিছুই নয়।

একটি ছোট্ট চা-ফুলুরীব দোকানে ঝাঁপ খোলা হচ্ছিল। ফরসা হয়ে যাবে একটু পবই। পাখিবা সব জেগে গেছে। কাকলিমুখব হয়ে উঠছে হাটচান্দ্রাব সকাল। একটা কালোরঙা কুকুব দোকানেব সামনে শুয়েছিল। সে উঠে একটু সবে গিয়ে আবাব শুল। কুকুবটাবও সামনেব ডান পাটা নেই। না থাকলেও, অন্য তিনটে পা ঠিকই আছে। প্রথমে ও সমব্যথীব বেদনা অনুভব কবল কুকুবটাব দিকে চেয়ে। পবক্ষণেই ঈর্ষা হল। একটা গেলেও তিনটে ত আছে।

চায়ে হোগা ?

হোগা বাবু।

কিত্না দেড় লাগেগী ?

চুল্লা জ্বালনেমে যিত্না টাইম লাগতা। মগর দুধ নেহি হ্যায়। আহীর আযেগা জাবা বাদ।

পৃথুর তাড়া নেই। সকাল একটু বয়স্ক না হলে ইদুরকারের বাড়িতে যাওয়াও যায় না। গিয়ে লাভও নেই। ওরা সবাই ঘুমিয়েই থাকবে হয়ত এখন। দ্বিতীয় মধুচন্দ্রিকাব সুখ হয়ত প্রথমের থেকে অনেক বেশি গাঢ়।

পৃথু বলল, দোকানীকে, ম্যায় ইন্তেজার করুঙ্গা। ইতমিনানসে বানাও।

দোকানী বলল, প্যায়ের ক্যায়সা কাট গয়া। মালুম হোতা জাদা দিন নেহী হুয়া ?

জী।

টেরাক্কা নিচুমে গীড়া থা ক্যা ? উও শালেলোগ আহিসেহি টেরাক চালাতেঁ যো দিল্ কর তা কি ডাণ্ডা সে উলোগোঁকা শব্ ফাড় দুঁ।

পৃথু চুপ কবে রইল।

বাল-বাচ্চা ত হোগা বাবুকো ? বিবি ?

চম্‌কে উঠল পৃথু।

ভাবল, ভারতীয়রা বড়ই কৌতূহলী জাত। প্রথম পবিচয়েই তাদেব সবই জানা চাই। পশ্চিমেব দেশে এইরকম অসভ্য কৌতহল থাকে না কারোই।

সবেব মব গ্যয়া ক্যা ? ও হি টেবাকে ইক্‌সিডেন্টমেহি ?

পৃথু মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

মনে মনে বলল, তোমরা কি সবসময়ই কলকল করে কথা বলবেই ?

এখনও দিন ভাল করে ফোটেনি ! এখন থেকেই ?

আস্তে আস্তে মানুষের যাতায়াত আরম্ভ হল। তিনজন সাইকেল রিকশা-ওয়ালা তাদেব রিকশা নিয়ে দোকানে এল। রিকশাগুলো দোকানের সামনে রেখে দোকানীর কাছ থেকে লেডে-বিস্কুট চাইল। গোগ্রাসে খেতে লাগল তারা।

দোকানী পৃথুকে বলল, আপকো ?

পৃথুও আটটি বিস্কুট নিয়ে চারটি পা-হারানো কুকুরটিকে দিয়ে আর চারটি নিজে খেল। দাঁত মাজেনি, চোখে জল দেয়নি, চোখের পাতা এক করেনি কাল রাতে। অবসন্নও লাগছিল। হাসপাতালে এই কমাস এত নিয়মে থাকার পরের দিনই এত অত্যাচার সহ্য হবার কথাও নয়। বিস্কুট খেয়ে খোঁড়া কুকুরটা পৃথুর পায়ের কাছে এসে বসে লেজ নাড়াতে লাগল। হাসি পেল পৃথুর। ভাবল, শ্রেণী ভেদকে কোনোদিনও ওঠানো যাবে না এ দেশ থেকে। পা-হারানো কুকুবও পা-হারানো মানুষের সঙ্গে একজোট হয়ে এক নতুন শ্রেণী তৈবি করে।

একজন রিকশাওয়ালাকে শুধোলো,তাকে ইদুরকারের বাড়ি নিয়ে গিয়ে আবার তার বাড়িতে ফেরত দিতে কত নেবে ? সে বলল, বউনি করবে এই সকালে। দরটর করবে না। যা দেবে পৃথু, খুশি হয়ে ; তাইই নেবে।

পৃথু ভাবল, খুশিরই দিন বটে।

একমাথা চুল আর একমুখ দাঁড়ি-গোঁফ সমেত পৃথুকে চিনতে কেউই পারল না। আহীর এসে দুধ

দিয়ে গেল সাইকেলে চড়ে। মগনলালের কথা মনে পড়ে গেল ওর। তার গানের কথাও। "প্রীত্ ভইল্ মধুবনোঁয়া রামা, তোবা মোরা।"

কতকগুলো ভূতের মত দেখতে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে পথের কাছের ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এল হল্লা-গুল্লা করে। তারপর পৃথুকে দেখতে পেয়েই সকালের প্রথম বিনি-পয়সার এন্টারটেইন্‌মেন্টে মেতে গেল।

ছেলেগুলোর মধ্যে যে বয়সে ছোট, সেইই ওদের নেতা বলে মনে হল। সে সঙ্গীকে বলল, রে গিরধারী, এহি না উও ল্যাংড়া, যো একরাম্‌কো মাকো।...

বলতেই, অন্য ছেলেগুলো বলল, আররে! ওহি ত।

নেতা বলল, মার্ শালেকো।

তার কথা শেষ না হতেই পথ থেকে নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ফটাফট্ পৃথুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল ওরা। পৃথুর বুকে, গায়ে, মাথায় এসে লাগতে লাগল নুড়িগুলো। একটা লাগল এসে ঠিক নাকের উপরে। বেশ চোট লাগল নাকে। দবদব করে রক্ত ঝরতে লাগলো নাক থেকে, ঠোঁট চিবুক চুঁইয়ে।

দোকানী ধম্‌কাল ওদের। রিকশাওলাবাও চেঁচিয়ে উঠল। কতটা যে পৃথুকে রক্ষা করার মহৎ তাগিদে আর কতটা তাদের সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে, তা ও বুঝল না।

কিন্তু ওদের চেচাঁমেচীতে ছেলেগুলো পাথর মারা বন্ধ করল। বন্ধ করে ওইখানেই দাঁড়িয়ে যে অমূলক অভিযোগ পৃথুর বিরুদ্ধে এনেছিল তাইই, চেঁচিয়ে বলতে লাগল বাববার।

রিকশাওয়ালা এবং দোকানী মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। অভিযোগটা সাংঘাতিক।

পৃথু প্রমাদ গনল। যদি বড়রাও একবার ক্ষেপে ওঠে তাহলে তাকে পাথর মেরেই এই ধুলোর মধ্যে ফেলে শেষ করে দেবে। একবার ও ভাবল, ক্রাচ-এ ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর পরিচয় দেয় এইসব ফালতু লোকদের কাছে। বলে যে, সেইই হচ্ছে হাটচান্দ্রা শেল্যাক কোম্পানীর পৃথু ঘোষ। পুলিশ সুপারকে বলে এক্ষুনি তাদের সে থানায় নিয়ে যেতে পারে। ভাবল বলে, ওইই হচ্ছে ডাকু মগনলালকে খতম-করা হাটচান্দ্রার সেই হীরো!

না। কিছুই বলল না পৃথু। সে পৃথু ঘোষ, আর নেই। সেও কাটা গেছে আধখানা। আজ থেকে নতুন জীবন শুরু করবে অতীত মুছে ফেলে। সেই পৃথু ঘোষের কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য বা দয়াই এই আধখানা মানুষটা চায় না।

যে-কারণেই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই দোকানী এবং অন্যরা বুঝল যে, ছেলেদের কোথাও ভুল হয়েছে। ইদুরকার সাহেবের বাড়ি যাবে শুনে এও হয়ত ভাবল ওরা যে, এই ছন্নছাড়া পাগলের মতো ল্যাংড়া মানুষটার কানেকশানস, বেশ ভাল। নইলে ইদুরকার সাহেবেরমতোএত পয়সাওয়ালা মানুষকে এই বাউণ্ডুলে চিনল কী করে?

ওরা চুপ করে গেল।

চা খেয়ে, পৃথু রিকশাতে উঠতে গেল। সাবধানে উঠতে গিয়েও পারল না। আধখানা ডান পা আগে ওঠাল কিন্তু আস্ত বাঁ পাটা দড়াম্ করে গিয়ে ধাক্কা খেল পা-রাখার জায়গাতে। খুবই লাগল ওর। অন্য একজন রিকশাওয়ালা দৌড়ে এসে, পৃথুকে সাহায্য করল রিকশাতে বসতে।

খুব রাগ হয়ে গেল ওর। তারপরই নিবে গেল। বুঝতে পারল যে, যতবড় দাম্ভিক এবং স্বাবলম্বীই কেউ হোক না কেন, করুণা এবং সাহায্য কখনও কখনও প্রয়োজন হয়ই। মাথা নিচু করে বসে রইল ও।

রিকশা-চলতে লাগল।

সুস্থ অবস্থায় কোনোদিনও সে রিকশা চড়েনি। অন্য মানুষে চালাবে আর সে তার ঘাড়ে বসার মতোই বসে থাকবে এ কথা ভাবলেই ঘেন্না হত। হাটচান্দ্রার ভিতরেও প্রয়োজন হলে পাঁচ মাইলও হেঁটেছে তবু রিকশা চড়েনি একটুক্ষণের জন্যেও।

মাথা আরও নিচু হয়ে গেল ওর।

দোকান পাট খুলছে এক এক করে। লোকজনের চলাচল আরম্ভ হয়েছে। নাক থেকে রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়েছে যদিও কিন্তু জমাট বাঁধা রক্তে নাক বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। তার গোঁফ দাড়িতে, সাদা পাঞ্জাবিতে রক্ত ভরে গেছে। নিচের দিকে না চেয়ে ও সামনের দিকে চেয়ে রইল।

দুটো হাতী নিয়ে আসছে পথ বেয়ে দুজন লোক। হাতীদেব মাথায় নানারঙা আলপনা কাটা। কোথায় যাচ্ছে কে জানে।

দূর থেকে ইদুরকারের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ি ত নয়, প্রাসাদ। চারদিকে উঁচু পাঁচিল ঘেরা। গেটের দুপাশে দুটো জ্যাকারাণ্ডা গাছ। এই বাড়িটা আসলে চম্পকলালের ছিল। খুব বড় বিড়িপাতার কারবারি। তার একমাত্র সাবালক ছেলে আত্মহত্যা করায় সে এই বাড়ি ইদুবকারের কাছে বেচে দিয়ে চলে গেছে আহমেদাবাদে। ভিনোদ ইদুরকাব নেওয়ার পর অবশ্য ভোলই পালটে ফেলেছে।

বাড়ির একটু আগেই পথটা বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে রিকশাওযালাকে বাখতে বলল রিকশা। তারপর রিকশা থেকে, রিকশাওযালাবই সাহায্যে নেমে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল বাড়ির বড লোহার গেটের দিকে। গেটের পাশেই দারোযানের ঘর।

কোঈ হ্যায় ?

পৃথু বলল গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে।

জবাব পেল না।

আবারও বলল, হ্যায কোঈ ?

এবার চায়ের অ্যালুমিনিয়ামেব গ্লাস হাতে কবে একজন পাঠানের মতো দারোয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পৃথুকে ভাল কবে দেখল একবাব। তাবপব বলল, কিস্‌কা মাঙ্গতা, তু ?

টুসু বাবাকো।

উস্‌সে তুমহাবা ক্যা মৎলব ?

এইসাহি। জারা মিল লেতেথে। পাঁচ মিনট্ কা লিয়ে।

তু কোন্ হো ?

ম্যায়····

আররে হাঁ কামওক্ত। কোন হ্যায় তু ?

মুসাফির। শব্দটা হঠাৎই বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। মনে মনে খুশি হল ও। জবাব একটা খুঁজে পেয়েছে বলে।

এমন সময দারোয়ানেব ঘর থেকে আরও একজন লোক, খুব সম্ভব বড় দরোয়ান ; বেরিয়ে এসে পৃথুকে দেখিযে প্রথম দাবোযানকে বলল, লোকটাকে ছেলেধরার মতো দেখতে না ? ঝাঁঝি বস্তি থেকে তিনটে ছেলে চুরি গেছে। এখনও তাব কিনারা হয়নি। এ লোককে এক্ষুনি ভাগা। নইলে, ডাণ্ডা মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব। ওব নাক ফাটল কি করে জিজ্ঞেস কর ত।

পৃথু বলল, কতগুলো বাচ্চা ছেলে ঢিল মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে।

এই সাংঘাতিক সময়ে এই কথাটা পৃথু বুদ্ধিমান হলে চেপে যেত। বলতে পারত, ল্যাংড়া লোক, রিকশা থেকে পড়ে গেছে। অথবা, অন্য কিছু। কিন্তু সেই মিথ্যাচারের বুদ্ধি ওর মাথায এলো না। যে বুদ্ধি, যে মেধা বোর্ডরুমে, কী একটি মস্ত কারখানা ঠিকমত চালাতে লাগে, লাগে বৈজ্ঞানিক রিসার্চ-এ সে বুদ্ধি কোনো কাজে আসে না এদের কাছে, এমন এমন সময়। তা ছাডা, মিথ্যা বলার ওর কোনো ইচ্ছাও ছিল না। যা হবার তা হোক।

এই দারোযানবা কি পৃথুকে এর আগে কখনও দেখেনি ? ওর চেহাবা দাড়ি-গোঁফ আব পা-হাবানোব জন্যে এতই কি বদলে গেছে নাকি ? না দেখলেই, ভাল। দেখলেও পৃথু মোটেই বলতে পারবে না যে, যে রুষা এখন ইদুরকারের খাটে তাকে জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে সে তাবই স্বামী। অথবা, মিলি-টুসুর বাবা সে। এই চেহারায়, এই অবস্থায় তার প্রকৃত পরিচয় দিয়ে তাব স্ত্রী অথবা ছেলেমেযেদের ছোট কবতে চায় না সে।

দারোয়ান দুজনই গেট খুলে বাইরে এসে ওকে শাসাল। বলল, টুসু হচ্ছে গিয়ে ইদুরকার সাহেবের ছেলে। তার সঙ্গে তোমার মতো লাফাঙ্গার কি দরকার হে?

ইদুরকার সাহেবের ছেলে?

অবাক হল পৃথু। ছেলেচোর আসলে ত ইদুবকারই। পৃথুকে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে এরা।

বড় দাবোয়ান বলল, হ্যাঁ। আমাদের মালিক, বাচ্চাওয়ালী জেনানা শাদী করেছেন। কিন্তু এত সব কথায় ত' দরকার নেই। তুমি মানে মানে পালালে পালাও এখান থেকে। নইলে মালিক এক টেলিফোন ঠুকে দেবেন থানায় অথবা কাম্পানিতে, দেখবে তোমার কি হাল হয়। ভাগো হিঁয়াসে বদমাস্।

বলেই, এক ধাক্কা দিল পৃথুকে পিঠে।

টাল সামলাতে না পেরে ও পড়েই যাচ্ছিল। কোনো রকমে সামলে নিল ডান ক্রাচটা এগিয়ে দিয়ে।

পৃথু বলল, ম্যায় যা রহা হুঁ। মগর টুসু বাবাকা বোল্ না যো ম্যায় আয়া থা।

কোন্ হ্যায় তুম্, নাম ক্যা তুমহারা?

নাম নেহী হ্যায়, ম্যায় মুসাফির হুঁ। টুসু বাবাকে আমার চেহারার বর্ণনা দিলেই ও বুঝে নেবে আমি কে! আমাকে ও চেনে।

চেনে? টুসুবাবা? তোমাকে? অজীব বাঁতে কর রহে হেঁ তু।

সাচ্‌মুচ্। বলেই দেখো, চিনবে টুসু। তাকে বলো যে একবার দেখতে এসেছিলাম তাকে। আমার চেহারার বর্ণনা দিলেই হবে।

ব্যসস্.. ?

ব্যসস্ এইটুকুই।

বলেই, পৃথু ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে লাগল রিকশার দিকে।

কোনওবকমে উঠে বসল তাতে। চলতে লাগল রিকশা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ্ করে। দারোয়ান দুজন পরস্পরের মধ্যে কী সব বলাবলি করছিল।

পৃথু ভাবছিল, মানুষের জামা-কাপড়, চেহারা, গাড়ি এই সবই তার পরিচয়। মানুষের নিজস্ব কোনো পরিচয় বোধ হয় হারিয়ে গেছে। ও যদি গাড়ি করে আসত, তাহলে এই দাবোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দিত। তার মালিকের শ্রেণীর মানুষ বলে মেনে নিত ওকে। এই দেশের চাকরদেব মতো চাকর সত্যিই হয় না। মালিকের সেবা করতে করতে একটা সময় তারা নিজেরা নিজেদেরই মালিক ভাবতে থাকে। এবং এই মিথ্যে হীনমন্যতার শিকার হয়ে স্বজাত, স্ব-স্বভাব এবং সম-অবস্থার অন্য মানুষদের সঙ্গেও অমানুষিক ব্যবহার করে।

টুসুটার সঙ্গে দেখা হল না। একদিক দিয়ে ভালই হল। টুসু তার এই রক্তাক্ত চেহারা দেখে আঁৎকে উঠত। ছেলেটা বড় নরম প্রকৃতির হয়েছে। অশেষ দুঃখ ওর কপালে।

বাড়ি যখন পৌঁছল, তখন সকাল আটটা। দেখল, গেটের সামনে ভুচুর জীপটা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে ভুচুকে দেখতে পেল না। দুখী, পৃথুকে দেখে ঘাবড়ে গেল। মেরী চেঁচিয়ে উঠল। পেছনের কিচেন-গার্ডেনে ঘুরে-ঘারে ভুচু রুষার লাগানো গাছ-গাছড়া দেখছিল। দুখী গিয়ে খবর দিতেই দৌড়ে এল।

আঁৎকে উঠে ভুচু বলল, 'এ কি অবস্থা। কী হল?

পড়ে গেছিলাম।

দুখী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি বলেছিলাম। আগেই বলেছিলাম।

কী ব্যাপার ভুচু? এত সকালে?

সকলের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে বলল, পৃথু।

তোমার খবব নিতে এলাম। আর খবর দিতেও এলাম অন্য সকলের।

কি খবর?

সাবীর সাহেবের অবস্থা ভালো না। দু'একদিনের মধ্যেই যা-কিছু ঘটতে পারে। ডাক্তাররা বলছেন। এখন ছেড়ে দিয়েছেন খুদাহর উপর। কিন্তু আশ্চর্য! দেখে মনে হচ্ছে, অসুখ সেরে গেছে। তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। বিশেষ করে যেতে বলেছেন।

ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখলে না কেন ?

থাকলে ত ! হাটচান্দ্রা ছেড়ে কোথাওই গিয়ে উনি মরতে রাজী নন। তোমাকে বারবার দেখতে চেয়েছেন।

নিশ্চয়ই যাব। এক্ষুনি চল।

না না। চানটান করে ব্রেকফাস্ট করো তারপর আমি নিয়ে যাব। তার আগে চলো, তোমার নাকটার একটু পরিচর্যা করি। ব্যথা করছে নিশ্চয়ই। আমি বরং ঝিংকু ডাক্তারকে চট্ করে নিয়ে আসি জীপটা নিয়ে গিয়ে।

কিছু দরকার নেই ভুচু।

দরকার নেই কি ? রাস্তায় পড়ে গেছ। —অ্যান্টি-টিটেনাস্ ইন্‌জেকশান্ দিতে হবে।

কিচ্ছু হবে না। তুমি বোসে। আমি চান করে আসছি। একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব। আমাদের জন্যে কিছু বানাতে বলে দাও ত লছমার সিংকে।

দুখী অফিস যাবার জামা-কাপড় বের করে দিল।

পৃথু বলল, পায়জামা পাঞ্জাবি দে। আজ অফিস যাব না। কাল।

চান করতে করতে পৃথুর মনটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে এল। ডেটল পড়তেই নাকের ক্ষতটা যত জ্বলতে লাগল ওর মনও ততই জ্বলতে লাগল। রুষা থাকতে এ বাড়িতে ভুচু, সাবীর মিঞা, দিগা, শামীম,গিরিশদা ওদের কাউকেই একবেলার জন্যেও নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে পারেনি পৃথু। এই সব মানুষদের সোনা দিয়ে ওজন করলেও এদের তুল্যমূল্য হয় না। এদের কাছ থেকে শুধু নিয়েই এল ও। এক-তরফা। বদলে, দিতে পারল না কিছুমাত্রই। এ বাড়ি তার নয়, এখানে কোনো মতেই খাটেনি তার। ও যে ছন্নছাড়া, বোহেমিয়ান হয়ে গেছে তার মূল কারণ রুষা। সাধ ছিল, একটি স্বল্পশিক্ষিতা, নরম, মেয়েলি-মেয়ে তার স্ত্রী হবে। সে যখন লেখার টেবিলে বসে লেখাপড়া করবে তখন সে স্ত্রী তার পেছনে এসে দাঁড়াবে। আড়াল থেকে তার কবি-স্বামীকে দেখে সে গর্বিত হবে। কখনও বলবে, চা খাবে নাকি ? বা সব সময় এত কি লেখা-পড়া করো ? দেখো, একদিন তুমি খুব বড় কবি হবে।

খাবার টেবিলে এসে বসে দেখল, পুরী আর আলুর চোকা আর নরম ওমলেট বানিয়েছে লছমার সিং।

অবাক হয়ে ভুচুর দিকে চেয়ে বলল, এ সব কি ?

কেন ? আমি ত সাতটার সময় এসেই এই মেনু ঠিক করে বলে দিয়েছিলাম। তুমি এ সব ভালবাসো। কত্তদিন খাওনি। হাসপাতালে ত একই খাবার রোজ রোজ !

বুকের মধ্যেটা টনটন করে উঠল ওর। এ বাড়ির ডাইনিং-টেবিলে কোনোদিনও ব্রেকফাস্ট-এ এ সব দিশী খাওয়ার দেখেনি ও।

ঠুঠার কোনো খবর জানো ?

পৃথু জিগগেস করলে ভুচুকে।

ঠুঠা ত প্রায় পাগলই হয়ে গেছিল। নাঙ্গা বাইগীন-এর আদেশ পেয়ে ও নাকি জঙ্গলের মধ্যের একটা মস্ত শিমূল গাছের ডালে ডালে দিন রাত পাথর বেঁধে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় দেবী সিং তাকে আবিষ্কার করে। বানজার-বাম্‌নী বস্তী থেকে জায়গাটা নাকি কাছেই। মধ্যে শুধু নদী। দেবী সিং ত বলছিল, সময়মতো ভাগ্যক্রমে ও যদি গিয়ে না পৌঁছত তবে জংলী শকুনরাই ঠুঠাকে খেয়ে সাফ্ করে দিত।

তারপর ?

তারপর আর কি। লোকজন নিয়ে গিয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় ওকে নিয়ে আসে নিজের

বাড়িতে, মানে ওদের বস্তীতে। ঝাড়ফুক্ করা হয়। এখন নাকি অনেকটা সুস্থ। তবে দুব্‌লা হয়ে গেছে খুবই। ভাল হয়েই সকলকে বলছে, তোমার কাছে যাবে। তোমার নাকি ঠুঠা বাইগা ছাড়া আর কেউই নেই এ সংসারে।

তাইই?

পৃথু বলল।

ওর হারানো গ্রাম? পেয়েছে খুঁজে?

হ্যাঁ। পেয়েছে ত।

এখন তাহলে অন্য কিছুর খোঁজে বেরোবে ঠুঠা। কিছু মানুষ থাকে, যারা খুঁজে বেড়াবার জন্যেই আসে এখানে। যা খুঁজছে, তা পেয়ে গেলে তাকে অবহেলায় ফেলে দিয়ে অন্য কিছুর খোঁজ শুরু করে। ঠুঠা এক আশ্চর্য মানুষ।

পৃথু বলল স্বগতোক্তির মতো।

ওরও, আমি ছাড়া কেউই নেই। আসবে কবে, মুক্কি থেকে?

যে-কোনোদিন এসে পড়তে পারে।

হুঁ।

পৃথু বলল, স্বগতোক্তির মতো।

সাবীর সাহেবের বাড়ি বোধহয় হাজারদিন নেমন্তন্ন খেয়েছে কিন্তু অন্দরমেহালে ঢোকবার সুযোগ হয়নি কখনও। কড়া পর্দা ছিল। আজ ওরা গিয়ে পৌঁছতেই ওঁর ন-নম্বরী ছেলে হায়দার, ওদের নিয়ে গেল দোতলাতে। একতলার উঠোনে, যেখানে প্রতি বছরই বক্‌রী-ঈদে কুরবানী দেওয়ার জন্যে প্রকাণ্ড দুধ-সাদা লম্বকর্ণ বাঁধা থাকত রাতের বেলা, সেই জায়গাটা নোংরা হয়ে আছে। শয্যাশায়ী মানুষের বাড়ির এইই হাল হয়। যতই অন্যরা থাকুক না কেন। সরু সিঁড়ি। পর্দা শুধু মনেই নেই, পরিবেশেও আছে বলে মনে হল। কেমন অন্ধকার, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা থম্‌থমে ভাব একটা। খোজা প্রহরী হঠাৎ তরোয়াল হাতে লাফিয়ে পড়লেও আশ্চর্য হতো না।

অন্দরমহলের দুপাশের সার-সার ঘরের মধ্যের সরু করিডর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে পৃথু অনুভব করছিল বহুজোড়া কৌতূহলী চোখ আড়াল থেকে তাদের দেখছে। নিশ্চয়ই সুর্মাটানা চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলছে, এই পিরথুবাবু? এহি হ্যায় ভুচুবাবু! কেউ বা বলছে, আহা। পাটা একেবারেই গোড়া থেকেই কেটে দিয়েছে গো বেচারীর।

হায়দার, সাবীর সাহেবের ঘরে ঢুকে বলল— আব্বা, দ্যাখো কে এসেছেন। কারা এসেছেন।

সাবীর সাহেব ধড়ফড় করে উঠে বসার চেষ্টা করলেন একবার। তারপরই হাকীম সাহেবের বাধাতে শুয়ে পড়লেন।

পৃথু কষ্ট করে তাঁর বিছানার একপাশে বসল। পৃথুকে কোনো সমবেদনা জানাবার আগেই পৃথু বলল, কবে ভাল হচ্ছেন বলুন? বনক্ষেতিতে বহুদিন যাওয়া হয় না। সকলে মিলে একবার যাওয়া দরকার, সেই আগেকার দিনের মতো, আপনার ক্ষেতি-জমিন দেখবার জন্যে। বড়কা বড়কা শুয়োর, সম্বর, বারাশিঙা, আর ঝুণ্ডুকে ঝুণ্ড মোরগা সব ফসল শেষ করে দিচ্ছে যে।

বনক্ষেতির সাংকেতিক ভাষা বুঝলেন সাবীর সাহেব। বনক্ষেতি নামটা শুনেই ওঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাসি ফুটে উঠল মুখে। কিন্তু সাবীর সাহেব কিছুই না বলে, মাথাটা বালিশের উপর এপাশ-ওপাশ করলেন দুবার। দু চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল বালিশে। যেন, বলতে চাইলেন, পৃথুকে আমার সঙ্গে মজাক্ উড়িও না। আমি জানি যে, আর তা হবে না। আর নয়। এ জন্মে এই ঘর ছেড়ে আর কোথাওই যাবার উপায় নেই আমার।

প্রায় একঘণ্টা বসেছিল পৃথুরা। সাবীর সাহেবের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ। অমন লম্বা-চওড়া শরীরটা একেবারে ছোট্ট হয়ে গেছে। ঐ জবরদস্ত, জিন্দা-দিল, ইমানদার, দোস্তোকো লিয়ে— জান্ কবুলকরা মানুষটাকে বর্তমান অবস্থায় একেবারেই মানায় না। বড় দুঃখ হয়।

একসময়, পৃথু বলল, উঠি সাবীর সাহেব। আবারও আসব।

আবার যে আসবে না, তা পৃথু জানে।

গলার মধ্যে সেই দলাটা আবারও একবার পাকিয়ে উঠল। সাবীব মিঞাব কাছে বিদায় নেবার সময়।

সাবীর মিঞা, ভুচু আর হাকীম সাহেবকে মিনমিনে গলায় করুণ আর্জি করলেন একবাব দাঁড়িয়ে উঠে, তাঁর জঙ্গলকা দোস্ত পিবথুবাবুব সঙ্গে ছাতি মিলাবেন। ঈদের দিনের মতো।

কী ভেবে, হাকিম সাহেব ভুচুকে ইসাবা কবলেন। ওঁবা দুজনে মিলে আস্তে তুলে বসিয়ে দিলেন ওঁকে। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠেও দাঁড়ালেন সাবীর সাহেব, কাঁপতে কাঁপতে। পৃথুও উঠে দাঁড়াল তার দুই ক্রাচে ভর দিয়ে। ওও কাঁপছিল, অনেকক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ-ওঠাতে। সাবীর মিঞা দুটি হাত প্রসাবিত কবে পৃথুকে বুকে নিয়েই ঝবঝব করে কেঁদে ফেললেন। খুদাহর কাছে কী সব দরবাব করলেন বিড়বিড় কবে, আগাগোড়াব মতো ফার্সী না আববীতে বোঝা গেল না বোঝা গেল না তাব একবর্ণও। তাবপবই খাটে বসে পড়ে, ক্র্যাচ্-এ ভর দিয়ে দেড়পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা পৃথুর দিকে চেয়ে বড় গভীর স্নেহ-প্রীতিব সঙ্গে বললেন, বেচাবা! দীর্ঘশ্বাস পড়ল সাবীর সাহেবেব।

সেই বে-চারা কথাটা পৃথুর বুকে যত না বাজল, তার চেয়ে তাঁর নিজের বুকেই বোধহয় বাজল অনেক বেশি করে। দু হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন সাবীর সাহেব। পৃথু ওঁর হাতে হাত দিয়ে বলল, ফারস্ট ক্লাস হ্যায় সাবীর সাহেব। খুউব মজেমে হ্যায়। আপ্ কোঈ ফিক্কর মত কিজিয়ে। ম্যায় অব্ চলে। ফিন্ আউঙ্গা।

সাবীর সাহেব মুখ খুলে বললেন, হাঁ। হাঁ। আনা বহত্ই জরুরী হ্যায়। সুব্বা-সাম্ আনা।

তারপরই বললেন, খুদাহ হাফিজ্।

সাবীর মিঞার বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পৃথুর মনে হল, যে কদিন আর আছে এখানে, সে কদিন এমনি কবেই বিদায় নিতে হবে অনেকেবই কাছ থেকে। মনটা বড়ই বিষণ্ণ হয়ে এল।

মার্টিন লুথাব কিং (জুনিয়রের) উপবে লেখা লেরোন বেনেট্ (জুনিয়র)-এর বই "হোয়াট ম্যানাব অফ ম্যান"-এর কটি পংক্তি মনে পড়ে গেল ওর। "ইট ইজ গ্রেট আর্ট, পসিবলী দ্যা গ্রেটেস্ট আর্ট, টু নো হোয়েন টু মুভ, হোয়েন টু ব্রেক রুটস্— অফটেন্ ইন পেইন অ্যাণ্ড টিয়ারস্— টু শেক হ্যাণ্ডস, অ্যাণ্ড সে গুডবাঈ, নট লুকিং ব্যাক, সীক্ দ্যা নিউ"।

চোয়ালটা শক্ত হয়ে এল পৃথুর।

জীপে বসে, ভুচু বলল, কোথায় যাব এবারে বল?

তোমার কারখানা কি তুলে দিয়েছ নাকি? আমার খিদম্দগাবি করে তোমার লাভ কি হবে? ব্যবসা যে সব নষ্ট হয়ে গেল তোমার।

ব্যবসা আর করবই না ভাবছি পৃথদা।

সে কি? বলছ কি তুমি?

অবাক হয়ে বলল পৃথু।

প্রায় মনস্থ করেই ফেলেছি। ব্যবসা অবশ্য বন্ধ ঠিক করব না। বন্ধ করলে এতগুলো লোক বেকার হয়ে যাবে। হুদাই চালাবে। ওকেই কিছু শেয়ার দিয়ে ওযার্কিং পার্টনাব কবব। পার্টনারশিপ করে। কাজ আর করব না অমন পাগলের মতো। তুমি ত জানো, আমি কী থেকে কী হয়েছি। পয়সার লোভ আমার নেই।

তোমারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভুচু। পাগলা ঘোষযার সঙ্গে থেকে থেকে।

বিরক্ত গলায় বলল পৃথু।

হয়ত তাইই।

প্যামেলা কিছু বলছে না? বিবাহিত মানুষ, অথবা যারা বিয়ে করতে যাচ্ছে এমন মানুষদের ওসব পাগলামি মানায় না ভুচু। বড় বেশি দাম দিতে হয় পরে। চোখের সামনে আমাকে দেখেও শিখলে না।

পৃথু উত্তরে কিছু বলার আগেই ভুচু বলল, পান খাও। বলেই, ড্যাশবোর্ড-এর ড্রয়ার খুলল।

পৃথু বুঝলো, প্রসঙ্গ বদলাতে চায় ভুচু।

পান এগিয়ে দিতে দিতে ভুচু বলল, বলো, কোথায় যাবে এবারে ? অফিস ত আজ যাচ্ছো না ?

না। চলো, বড়া মসজিদের কাছাকাছি যখন এসেই গেছি, শামীমের সঙ্গেও দেখা করে যাই একবার। তারপর চলো, লাড্ডুর দোকানে। সবশেষে গিরিশদার বাড়ি। সেখানেই লাঞ্চ খাওয়া যাবে। কী বল ?

ফারস্ট ক্লাস। তবে তুমি এক মিনিট বোসো, আমি পেট্রল পাম্প থেকে একটা ফোন করে দিই গিরিশদাকে। গিরিশদা তোমাকে নেমন্তন্ন করেই রেখেছেন। এখন আমার শুধু কনফার্ম করতে হবে। দু একটা বেশি পদ হবে তাহলে।

ওর কথা শুনে হাসল পৃথু।

ভুচু বলল, হোম কামিং লাঞ্চ বলে কথা। ভালমন্দ খাওয়াবেন না গিরিশদা ? কনফার্ম না করলে আমার উপর রাগ করবেন খুউব।

হোম-কামিংই বটে !

পৃথু বলল, না বলে।

ভুচু পথের বাঁদিকে একটা পিপ্পল গাছের ছায়ায় জীপটাকে দাঁড় করিয়ে এক লাফে নেমে চলে গেল ফোন করতে। ওকে লাফিয়ে নামতে দেখেই নিজের জন্যে মনটা খাবাপ হয়ে গেল।

সুস্থতার দান যে কত বড় দান ঈশ্বরের, তা সুস্থ থাকাকালীন কেউই বোঝে না। সুস্থ ও নীরোগ মানুষেরই বিধাতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অনুযোগ এবং অভিযোগ থাকে। ফোন করে ফিরে এসে এঞ্জিন স্টার্ট করে বড়া মসজিদের জনাকীর্ণ ধূলিধূসরিত কাঁচা পথে জীপ ঢোকাল ভুচু। এক পাল ভেড়া নিয়ে যাচ্ছে ভেড়াওয়ালারা। পথ আটকে দিল তারা। উল্টো দিক থেকে একটা মার্সিডিস্ ট্রাকও ঢুকল সেই সময়ই। আর যেন সময় পেলো না।

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে ভুচু জীপটাকে বাঁ পাশের কাঁচা নর্দমার মধ্যেই প্রায় নামিয়ে দিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল। ভেড়ার পাল এবং ট্রাক চলে গেলে তবেই এগোনো সম্ভব হবে। ধুলোয় গা-মাথা ভরে গেল দুজনেরই।

ভুচু ভাল করে একবার পৃথুর দিকে চেয়ে বলল, তোমার এই চুল দাড়ি গোঁফ-এর একটা গতি করো পৃথুদা। তাকানো যাচ্ছে না তোমার দিকে।

পৃথু হাসল। বলল, এখন থাক। যে পৃথু ঘোষকে লোকে জানত সে ত আর নেই। ফিরবেও না কোনোদিন। এই পৃথু ঘোষকে, নানা কারণেই কারো না-চেনাই ভাল।,

পানের পিক ফেলে পৃথু বলল, তোমার কখনও কি মনে হয় না ভুচু যে, যত মানুষ আমাদের চেনে, তার চেয়ে অনেক কম মানুষ যদি চিনত আমাদের, জীবনটা অনেক বেশি শান্তির.এবং হয়ত সুখের হত ? চেনা মানুষের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষকেই কোনো প্রয়োজন ছিলো না আমাদের, তাদের মধ্যে খুব কম জনই আমাদের সত্যিকারের শুভার্থী, তবু এক জীবনে কত মানুষকেই না চিনতে হয়। ভীড়, ভীড়, ধুলো, আওয়াজ ; মিছিমিছি···

কথাটা ভাবার মতো৷ যদিও আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। তোমার বর্তমান মানসিক অবস্থাতেই বোধ হয় এমন মনে হচ্ছে তোমার।

না ভুচু। আমার মানসিক অবস্থা একই আছে। এ কথাটা আজই এখন ভাবছি না। বহুদিন থেকেই ভাবছি। তোমাকে একটা কথা বলব। উপদেশ বা জ্ঞান বলে নিও না, কারণ তা দেবার যোগ্যতা আমার নেই। তুমি বিয়ে করবে, সংসার করবে, তাইই বলা। এই ছোট্ট জীবনে যদি সুখী হতে চাও নিজের চেনা-জানার বন্ধুত্বর জগতকেও ছোট্ট করে রেখো। যাবা তোমার কাছের মানুষ হবে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর কোরো। পাঁচ শ জন পরিচিত মানুষেব চেয়ে পাঁচ জন কাছের মানুষ অনেকই বেশি দামী। মানে, কী করে বলব : আমি বলছি, একস্টেনসিভ রিলেশানশিপের চেয়ে ইন্‌টেনসিভ রিলেশানশিপ অনেক জরুরী।

ভুচু একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্য একটা পৃথুকে দিল। লম্বা একটা টান দিয়ে বলল, সেই পাঁচজনই যদি তোমাকে একদিন ডিচ্ করে ? তুমি ত বলতে গেলে পাঁচজন নিয়েই ছিলে পৃথুদা। তবু দুঃখ কি ঠেকিয়ে রাখতে পারলে ? কীসে যে কী হয়, বলা ভারী মুশকিল। জীবনে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম বা সেট-ফরম্যুলা নিয়ে বাঁচা যায় না বোধহয়। এগোতে এগোতে যেমন যেমন দরকার তেমন তেমনই পথও বদলাতে হয়।

পৃথু উত্তর দিলো না। ক্রাচ দুটিকে ডান কাঁধের উপরে রেখে ঘুরে ধুলো-উড়োনো ভেড়ার পালের দিকে চেয়ে বসে রইল চুপ করে। ভেড়ার গায়ের গন্ধ, পথের ধুলোর গন্ধ, গরুর মাংসের শিক-কাবাবের গন্ধে নাক ভরে গেল।



উধাম্ সিং সাহেব বললেন, ভেবে দ্যাখো। ওঁরা যা বলেন তার উপরে আমারও কিছু বলার আছে পৃথু। এরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিও না।

দেখেছি ভেবে।

টাকাও বা কত পাবে ? এমন কিছু ত নয় ! প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, কমপেন্‌সেশান সব নিয়ে লাখ আড়াই। মানে, মাসে দু'হাজারের একটু বেশি আয়। ফিক্সড ডিপোজিটেই রাখো কী ইউনিটই কেনো।

যাদের জন্যে টাকার দরকার ছিল তারাই যখন নেই, তখন টাকা দিয়ে করব কি আমি ? দিন, কাগজ দিন। লিখে দিই রেসিগণেশান্।

বোকা কোথাকার। তুমি রেসিগণেশান্ দিলে ওরা তোমাকে কমপেনসেশান্ দেবে ভেবেছো ? কাল ফোনে কথা হয়েছে আমার লানডান্-এর সঙ্গে। কমপেনসেশান্ না পেলে তুমি মোটে দু' লাখ পাবে। আমি তোমার বড় ভাই-এর মতো। কথা শোনো আমার।

পৃথু ভাবল একটু। তারপর বলল, ঠিক আছে। তাই-ই হোক। তবে, কাগজ দিন, আপনাকেই দায় দিয়ে যাচ্ছি। পঁচিশ হাজার টাকা আমি নেব। বাকি টাকা আপনারই হেফাজতে থাক। ফিক্সড-ডিপোজিট করে মাসে মাসে যা সুদ হয় তার অর্দ্ধেক রুষাকে পাঠিয়ে দেবেন। অর্দ্ধেক জমা থাকবে ইকুয়ালী, মিলি ও টুসুর নামে। টুসুর পড়াশুনোর খরচ। মিলির বিয়ে। এই টাকা তখন যেন রুষা খরচ করে।

আমাকে এর মধ্যে জড়াবে ? আমি ত বাইরের লোক পৃথু।

বাইরের লোকই মানুষের সবচেয়ে আপন লোক সিং সাহেব। আপনরা যখন পর করে দেয় তখন পরই হয় সবচেয়ে আপন। রুষাকে আমি চিঠি লিখে সব জানিয়ে দেব। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে দেব ওকে।

পৃথু, তুমি, মানে তোমার জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি ?

নাঃ। কী করবেন ? কেউই কারো জন্যে কিছু করতে পারে না সিং সাহেব। করার মতো যা-কিছু সব নিজেরই করতে হয় একা একা।

তোমার কোনো ইচ্ছা কি আমি পূরণ করতে পারি না পৃথু ?

ইচ্ছা ?

হ্যাঁ।

হাসল পৃথু।

বলল, আমি যেন ফাঁসীর আসামী ! আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে সবাই এখন খুউবই ব্যগ্র।

ওরকম করে বোলো না। তুমি আমার ভাইয়ের মতো। মতো কেন, ভাই-ই !

একটা ইচ্ছা ছিল। পূর্ণ হলো না।

কি ? কি ? সেটা কি ? আমাকে বলো।

টুসুকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে ছিল। জানতে ইচ্ছে ছিল, ও-ও কি আর দেখতে চায় না আমাকে একবারও ?

স্তব্ধ হয়ে গেলেন সিং সাহেব।

বললেন, এ আর এমন কথা কি ? ডিভোর্স্ ত আজকাল ঘরে ঘরেই হচ্ছে। সেপারেশান্। তাছাড়া, টু বী ফ্র্যাঙ্ক, তুমি ত ইদুরকারের বিরুদ্ধে অ্যাডালটারীর কেসও আনতে পারো। রুষাকে ডিভোর্স না-ও দিতে পারো। তুমি ত কোনো জোরই খাটালে না। আইন ত তোমার দিকেই। আশ্চর্য মানুষ তুমি ! ইদুরকারকে এমন করে ছেড়ে দিলে লোকে তোমাকেই ভীতু ভাববে। যে মানুষ ডাকু মগনলালকে মারতে পারে একা একা তাকে কি সবাই ভীতু বলেই জানবে ?

সাহসের ডেফিনিশান প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা। মন যখন মন থেকে সরে যায় তখন আদালতে গিয়ে সরে যাওয়া মনকে ফিরিয়ে আনার দরবার করা, কী আইনের জোরে অন্যকে শিক্ষা দেওয়াতে আমি বিশ্বাস করি না। রুষা ত আমার বিবাহিতা স্ত্রী, মিলি টুসু ত আমারই ছেলেমেয়ে। ওরা যদি কেউই আমাকে না চায় তাহলে আমি যে খারাপ এতে আমার নিজের অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। তাই-ই আদালতে যাব কোন মুখে ? আর যাবোই বা কেন ? সব আইন সকলের জন্যে নয়।

টুসুকে দেখতে পাওয়ার অসুবিধা কি ? তুমি চলে যাও এক্ষুনি আমার গাড়ি নিয়ে। অজাইব সিং ত অসুস্থ।

গেছিলাম কাল ভোরে।

গেছিলে ?

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সিং সাহেব।

তারপর ? গেছিলে, তবু, দেখা হলো না ?

দারোয়ানেরা আমাকে ঝাঁঝি বস্তীর ছেলেধরা বলে মারতে এসেছিল, ঢুকতেই দিলো না।

এ তোমার মিথ্যে অভিমান। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো। জোর যেখানে খাটাবার, সেখানে জোর খাটাতে হয় পৃথু।

দারোয়ানেরা তোমাকে ঠেকিয়ে রাখবে কী এত সাহস তাদের ? তুমি বললে না কেন ইদুরকারকে ডাকতে ?

ইদুরকারের সঙ্গে আমার কি ? আমি ত টুসুকেই শুধু দেখতে চেয়েছিলাম।

ঠিক আছে। আমি ফোন করছি এক্ষুনি। রুষা অথবা ইদুরকার নিশ্চয়ই জানেই না যে, তুমি গেছিলে।

হয়ত জানে না।

অপারেটরের কাছে লাইন চাইলেন সিং সাহেব।

হ্যালো ! আই অ্যাম উধাম সিং। ভেরী গুড মর্নিং ভিনোদ। আই অ্যাম সেন্ডিং পৃথু ডাউন ট্যু ইওর প্লেস। হী ওয়ান্টস্ টু সী টুসু।

আই সী ! হী ইজ ইন দ্যা স্কুল ন্যাউ ? হোয়াট টাইম উইল হী বী ব্যাক ? ফোর ও ক্লক ? ...হোয়াট ? টুসু ডাজনট্ ওয়ান্ট টু সী হিম ?

উধাম্ সিং সাহেবের মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল।

বললেন, লুক্ ভিনোদ, উ্য শ্যুড নো হুম আর ইউ টকিং টু। আই অ্যাম নট পৃথু ঘোষ দ্যাট উ্য ক্যান টেক মী ফর আ রাইড। উ্য সান অফ আ বিচ্। উ্য লেচারাস্, নাস্টী ডগ্। ..হ্যাড আই বীন পৃথু আই উ্যড্ হ্যাভ শট্ উ্য!

হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

হু? রুষা? আমি, অ্যাম্ উধাম সিং। পৃথু ওয়ান্টস্ টু সী টুসু বিফোর হী লীভস্ দিস্ লাউজী প্লেস্.।

হোয়াট? হী, কান্ট? হাউ ড্যু য়্যু মীন? কান্ট্ হী সী হিজ সান্?

আই সী! আই সী। ...

বলেই ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে রেখে দিলেন উধাম্ সিং।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, লুক্ পৃথু। এক্সকিউজ মাই সেয়িং সো, দিস্ ওয়াইফ্ অফ ইওরস্ ইজ আ বিচ্। উ্য মাস্ট টিচ্ হার আ লেসসন্। আমাকে তুমি একবার "হ্যাঁ" বলো, আমি ভোপালে ফোন করছি। নয় ত বম্বেতেই। কালকেই মিঃ কোলাকে আনাব আমি। তারপর শিক্ষা কাকে বলে তা আমি দেখাচ্ছি ওদের দু'জনকেই। তুমি এইভাবে ভীরুর মতো যা তোমারই,তা ছেড়ে চলে যেতে পারো না। উ্য কান্ট। আই উড নট আলাও উ্য টু ডু দ্যাট।

পৃথু জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল।

অনেকক্ষণ পর, সিং সাহেব একটু ঠাণ্ডা হলে বলল, আপনার প্রেসার হাই। আমার কারণে অযথা উত্তেজিত হবেন না সিং সাহেব। আপনার স্বাস্থ্যর জন্যে আমার চিন্তা হয়।

. ড্যাম ইট্ পৃথু। স্বাস্থ্য! টাকা-পয়সা! ইফ্ দিস ক্যান হ্যাপেন ট্যু উ্য টুডে, দিস ক্যান হ্যাপেন টু এনীওয়ান টুমরো। ডু উ্য থিংক দ্যাট উই উইল টেক দিস লায়িং ডাউন?

তা বলিনি আমি। আমার মতে, সবাই-ই কেন হবে?

কিন্তু না কেন? হোয়াই নট? উ্য আর নট আ ম্যান পৃথু। উ্য আর নো বিগ-গেম হান্টার। উ্য, উ্য উ্য আর অ্যান্..

আই নো। আই নো, হোয়াট আই অ্যাম্।

বলেই উঠে দাঁড়াল পৃথু।

স্যাক্ মী মাই বস্স। উইল উ্য প্লীজ ডু মী দিস ফেভার? গিভ্ মী দ্যা স্যাক অ্যান্ড ফরগেট্ মী। প্লীজ।

উধাম্ সিং আবার চেয়ারে বসে পড়ে দুটি হাত মাথায় দিয়ে বললেন, উ্য রিয়্যালী আর আ স্ট্রেঞ্জ পার্সন্। মাচ্ মোর স্ট্রেঞ্জ দ্যান আই এভার থট্ অফ।

আই অ্যাম্।

পৃথু বলল।

তারপর ক্রাচ্ দুটি পাশের চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে সিং সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর পিঠে হাত রেখে বলল, আপনি আমাকে সত্যিই ভালবাসেন সিং সাহেব। আমার দাদা নেই। কিন্তু আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি যে, না থেকেও তিনি আছেন। আমার জন্যে কষ্ট পাবেন না আর। ভাবীজীকে আমার নমস্কার দেবেন। কাল যদি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ দ্যান ত ভাল হয়। পরে, আমার ঠিকানাতে বাকি কুড়ি হাজার টাকার অ্যাকাউন্ট-পেয়ী ড্রাফট পাঠিয়ে দেবেন একটা। আর বাকি টাকাটা...যেমন বললাম...।

বলেই, প্যাডটা টেনে নিয়ে, সাদা প্যাডের চার পাঁচটি পাতার নিচে সই করে দিল, তারিখ দিয়ে।

বলল, রইল সই-করা। যা কিছু লেখার লিখে নেবেন।

তুমি ব্ল্যাঙ্ক কাগজে সই করে দিলে? আমি যদি মেরে দিই টাকাটা?

মারলে, মারবেন। যদি পারেন। কেউ কেউ ঠকায়। কারণ ঠকানোই তাদের ধর্ম। কেউ কেউ সুযোগ থাকলেও ঠকাতে পারে না। সেটাই তাদের ধর্ম বলে। আপনি ঠকানোর দলের নন সিং

সাহেব। ঠকার দলে।

একটু চুপ করে, দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, ভাবলে অবাক লাগে যে, যারা কাউকেই ঠকায় না কখনও, তারাই সবচেয়ে বেশি ঠকে যায় এখানে। আশ্চর্য নিয়ম ? তাই-ই না ?

সিং সাহেবের দু'চোখের কোণায় জল চিক্‌চিক্ করে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পৃথুর পাশে এসে তার দু'কাঁধে দু'হাত রেখে বললেন, আই রিয়্যালী অ্যাম্ সরী ফর ট্যু পৃথু। জানি না, তুমি কোথায় যাবে, কী করবে জীবিকা হিসেবে, কোথায় থাকবে ? তবে, আমার বাড়ি আর তোমার ভাবীজীর স্নেহ তোমার জন্যে থাকবে চিরদিন। তুমি ত জানো ! আমি যদি নাও-ও থাকি, তবুও থাকবে। ডোন্ট ফর গেট্ দ্যাট ট্যু হ্যাভ আ হোম, ফুল অফ ওয়ার্মথ্, ফর দ্যা রেস্ট অফ ইওব লাইফ।

উধাম সিং সাহেবের ড্রাইভার পেছনের দরজা খুলে দিল গাড়ির।

পৃথু বারণ করল। বলল, হেঁটেই যাবে।

হেঁটে যাবে ? হোয়াই ?

ভীষণ রেগে গেলেন সিং সাহেব।

বিড় বিড় করে বললেন, হাঁটার ক্ষমতাও যদি থাকত ! হোয়াট্ আ পিটী ! কী দিনকাল হল। সংসার কী হয়ে গেল !

উধাম সিং সাহেব বললেন, আর কথা না বলে গাড়িতে ওঠো। আমাকে আর বাগিও না বলে দিচ্ছি।

আমি ভুচুর গারাজে যাব। গাড়ি কি হবে ?

তুমি যে জাহান্নামেই যাও। আমার গাড়িতেই যাবে। ডোন্ট ইন্টারাপট্ মী পৃথু। আই হ্যাভ মাই রিভলবার ইন্ মাই ড্রয়ার। আই উইল শ্যুট ট্যু ইফ ট্যু ডিসওবে মী। আর অসহায়ের মতে বললেন ; অর আই উইল শ্যুট মাই সেল্ফ্। আই বিলঙ টু দ্যা পাস্ট জেনাবেশান্। তোমাদের এই প্রজন্মর নারী বা পুরুষ কাউকেই বোঝার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার নেই। আই ফীল রেচেড্। রিয়্যালী রেচেড।

এঞ্জিন স্টার্ট করে বাহাদুব বলল, কাঁহা যাইয়েগা সাব ?

অজাইব সিংকা ঘর মালুম হ্যায় বাহাদুর ?

জী সাব।

হুঁয়াই চলো।

জী সাব।

অজাইব সিং-এর যে কি হয়েছে তা কেউই নাকি ডায়াগনাইজ করতে পারছে না। পেটে অসম্ভব ব্যথা। জ্বরও থাকে। ক্ষিদে নেই। ঘুম নেই। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে নাকি ! কোম্পানীব ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিল পৃথু সকালে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন, ক্যানসার বলে। টিউমাবটা বেশ বড়ও হয়েছে। অপারেট্ কবলেই যতটুকু আয়ু আছে তাও শেষ হয়ে যাবে বলে জবলপুরের সার্জন-এর ধারণা।

এমনিতে কতদিন বাঁচবে আর ?

মাস তিনেক। তবে, কষ্ট পাবে বড়।

হুঁ।

বলেছিল পৃথু।

গাড়িটা বাজারের দিকে যাচ্ছে। লাড্ডুর দোকানে যেতে বলল পৃথু। পঁচিশ টাকার লাড্ডু কিনে নিয়ে যাবে অজাইব সিং-এর জন্যে। চাকরীতে ঢোকার প্রথমদিন থেকে অজাইব সিং-ই ওর গাড়ি চালিয়েছে। চমৎকার ড্রাইভার। শুধু গীয়ারেই গাড়ি চালাতো, মোড় নিতো গীয়ারের উপর। ক্লাচ্-এ কখনও পা ছোঁয়াতো না গীয়ার চেঞ্জ করার সময় ছাড়া। আর ব্রেক-এও ছোঁয়াতো না অ্যাক্সিডেন্ট সামলানো ছাড়া। কে কোন কাজ করে, কার কোন্ জীবিকা, কে কত বড় শিক্ষিত তাতে কিছুই আসে যায় না। যে, যে-কাজটা করে, সেই কাজে যদি সে গর্ব বোধ না করে ; যদি না

চেষ্টা করে যে তার কাজটি ঠিক তার মতো ভাল আব খুব কমই লোকই করতে সক্ষম, তবে সে মানুষই নয়। অজাইব সিং সেই জাতের মানুষ ছিল, যার কাছে তার জীবিকাটা শুধুই অন্ন-সংস্থানেব উপায় নয়, তাব চেয়ে আরও বড় কিছু। এই কারণেই পৃথু, চিরদিন ওকে শ্রদ্ধা করে এসেছে। ওব গাড়িতে রুষা, মিলি টুসুকে পাঠিয়ে কখনও ওব চিন্তা হয়নি এক মুহূর্তও।

লাড্ডু ছিলো না। তাব কর্মচাবী পয়সা নিতে চাচ্ছিল না। পৃথু বলল, নেবো না তাহলে। মারীজ্ আদ্‌মীর জন্যে লাড্ডু নিয়ে যাচ্ছি, তাব অমঙ্গল হবে বিনা-পয়সাব মিষ্টি নিয়ে গেলে।

শেষে রাজী হল লাড্ডুব লোক।

অনেক দূর অজাইব্ সিং-এব বস্তী। ও কোযাটারে থাকত না। ওর বৌকে নিয়ে কী একটা গোলমাল হয়েছিল কোয়ার্টারে। এতদূব থেকে ও সাইকেলে করে রোজ সকাল আটটাতে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় কী করে যে পৃথুব বাংলোতে ডিউটিতে আসত, তা ভাবলেই অবাক লাগছে। গাড়িতে পৌঁছতেই প্রায় মিনিট কুড়ি লেগে গেল। কে জানে, হয়ত কোনো শটকার্ট রাস্তাতে আসত, জঙ্গল-টাঁড় পেরিয়ে।

বাহাদুরই দেখিয়ে দিল বাড়িটা। গাড়ি দেখে কয়েকটি কৌতূহলী বাচ্চা এগিয়ে এল। অজাইব সিং-এর সারাটা দিন কাটে গাড়িব মধ্যে বসে অথচ তাব বাড়ির মানুষদের এবং প্রতিবেশীদেরও গাড়ি সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল। আজকে পৃথুব মনে হল, একদিনেব জন্যে গাড়িটা অজাইব সিংকে ধাব দিলেও হয়ত পাবত। ওর বৌ-বাচ্চাদেব নিয়ে গাড়ি চড়িয়ে আনতে পাবত ও। এবকম অনেক কিছু করণীয় কাজের কথাই মনে যখন পড়ে, তখন হয়ত অনেকই দেবী হয়ে যায়; পৃথুব সংসারী হওযার কর্তব্যবই মতো।

একজন সুন্দরী মেয়ে ঘব থেকে বাইবে এল। ছিপ্‌ছিপে শবীব। গায়েব বঙ ফর্সা। সবচেয়ে বড় কথা, মুখে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রসাধন। সে বাহাদুরের উর্দী দেখেই এবং গাড়ি দেখেই বুঝল এক ঝলকে, যে, কোম্পানী থেকে এসেছে কোনো সাহেব।

মেয়েটি বলল, সেলাম সাহাব্। বলেই, পা-হাবানো পৃথুব দিকে এমনভাবে তাকাল তাতে পৃথু বুঝল পৃথুকে চিনেছে ও। ওব চোখে সম্ভ্রম এবং অনুকম্পাও ফুটে উঠেছিল। খাবাপ লাগল পৃথুব।

পৃথু বলল, সালাম! অজাইব সিং কাঁহা হ্যায়?

লেটা হুয়া হ্যায় সাহাব। উঠনে নেহি শক্‌তা।

ম্যায় জাবা মিল্‌নে শক্‌তা?

জরুর! কাহে নেহি সাহাব। ম্যায় উসকো জানানা।

বলেই, পৃথুকে নিয়ে গেল ঘবে। অজাইব সিং চৌপাইতে শুয়েছিল লাল আব সবুজ চেক চেক একটা লুঙি পরে। গেঞ্জি গায়ে। চেহারার বিশেষ পরিবর্তন দেখল না পৃথু। কেবল রোগা হয়ে গেছে বেশ আর পেটটাই যেন শবীরের সব হয়ে উঠেছে।

পৃথুকে দেখেই, ভূত দেখাবামতো চমকে উঠল অজাইব সিং। তড়াক করে উঠে বসতে গিয়েই পেট ধরে শুয়ে পড়ল আবার। হাসপাতালের দিনগুলোব কথা মনে পড়ল পথুব। শুয়ে শুয়েই সেলাম কবল অজাইব সিং ওকে। পৃথু, লাড্ডুর প্যাকেটটা ওর স্ত্রীর হাতে দিয়ে চৌপাইরই এক কোণাতে ক্রাচ দুটো বাঁ কাঁধের উপর শুইয়ে রেখে বসল।

কৈসা হ্যায়? অজাইব সিং?

অজাইব সিং পেট দেখিয়ে বলল, বহুৎই দর্দ্ সাহাব।

বলেই বলল, আপ কৈসা হ্যায় হুজৌর?

ম্যায় ফারস্টক্লাস। তুমকো জল্‌দি ঠিক হো যানা চাইযে অজাইব সিং।

অজাইবের বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে ওব পেটেব ব্যথার চেয়েও যেন বুকের ব্যথাটাই বেশি তীব্র হয়ে উঠল। ইশাবায় ও তাব স্ত্রীকে বাইরে যেতে বলল ঘবের। সে বাইরে চলে গেলে, পৃথুর ডান হাতটা টেনে নিয়ে নিজেব পেটের উপর রেখে বলল, ইয়ে মেরী পাপ্‌কা নতিজা হুজৌর।

তুম্‌হারা পাপ ? কওন্‌সা পাপ্‌কা বারেঁমে কহ্‌ রহা তুম ?

হুজৌর !

বলেই, থেমে গেল অজাইব সিং। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল।

বোলো অজাইব সিং। বোলো, ক্যা তুম্‌ বোল্‌নে মাংগতা বোলো।

হুজৌর, ম্যায় সবকুছ্‌ জানতা থা ইদরকার সাব্‌কা বারেমে, মগর, ম্যায় আপকো কুছ্‌ভি বাতায়া নেহী। ওহি পাপ্‌সে ম্যায় ঈ বিমাবিসে পরিসান্‌। ভগোয়ান্‌নে মুঝ্‌পর থুক্‌ দিয়া। মেরী মওত্‌কা ওয়াক্ত আ চুকা হ্যায়।

ক্যা ফাল্‌তু বকবকাতা তুম্‌। আরাম করো। সব ঠিক্‌ হো যায়েগা। মারীজ্‌কো তক্‌লিফ্‌ হোতাহি হ্যায়, মগর উস্‌কো মতলব্‌ ঈ নেহী কি ওয়াক্ত্‌ আ চুকা হ্যায়। ঈ সব গলদ বাঁতে বিলকুল্‌ মত্‌ শোচ্‌না।

অজাইব সিং পৃথুর হাতটা শক্ত করে পেটের উপর চেপে ধরে বলল আমার মৃত্যুর জন্যে আমি ভয় করছি না। আমার ভয়, আপনার জন্যে। বলেই পা-হীন পৃথুর দিকে চেয়ে বলল, আপনার এই অবস্থা, তার উপর আপনাকে এই সময়ে মেমসাব ছেড়ে চলে গেলেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে। আমি বিছানাতে শুয়ে। আর কখনও উঠবো না। আপনিও হয়ত আর কোনোদিনও গাড়ি চালাতে পারবেন না। কী হবে হুজৌর আপনার এখন ?

আমি ঠিক আছি অজাইব সিং। তুমি ভাল হয়ে উঠে তোমার গাড়ি আবার চালাবে। তুমি ত কম্পানীর লোক। আমার ডিউটি না করে অন্য কোনো সাহেবের ডিউটি করবে। কোনো চিন্তা নেই। আমার জন্যে কোনো চিন্তা করতে হবে না তোমার। ঠিক আছি আমি। ফারস্টক্লাস আছি।

ফা-র-স্ট-ক্লা-শ ?

কথাটা টেনে টেনে পুনবার্বৃত্তি করল অজাইব্‌ সিং আস্তে আস্তে। তারপর বলল, সব্‌হি আদমী নে আপকো পাগলা সাহাব এইসেই নহী কহতে থে। পাগলা আপ্‌ ত সাচমুচই হ্যায় সাহাব।

পৃথু ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওর স্ত্রীকে ভিতরে আসতে বলল। ঘরটার মধ্যে আলো-হাওয়া খেলে না মোটে। এই এপ্রিলের সকাল এগারোটাতেই অন্ধকার। অথচ পৃথু ঘোষের বাংলো কত চমৎকার। আজ অবধি একদিনও খেয়াল হয়নি পৃথুর, অজাইব সিং কেমন ঘরে থাকে তা দেখে আসবার। যে তার জন্যে এত করে, এতবছর এত করল, তার জন্যে পৃথুর যে কিছুমা করণীয় ছিল, তা সত্যিই মনেও হয়নি একবারও। কোম্পানীর দেওয়া টেরিলীন টুপী আর হাতের এইচ-এম-টি ঘড়ি দেখেই মনে হত, অজাইব সিংও পৃথুর মতই ভাল থাকে, ভ খায়।

মনটা হঠাৎই বড় খারাপ হয়ে গেল।

বলল, লাড্ডু খাও একটা। আমি দেখি।

ওর স্ত্রী বলল, আপনি খাবেন না একটা ?

পৃথু হেসে বলল, তোমার ঘরে এসেছি, তোমাদের জিনিসই খাব আমি। ঘরে কি আছে ?

ঘরে ?

লজ্জায় পড়ল আজাইব সিং-এর বৌ।

বলল, যবের ছাতু।

ফারস্টক্লাস। তাই-ই দাও এক গ্লাস শরবৎ করে। নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। গরম ত পড়েই গেল, কী বল ? তার আগে তোমরা লাড্ডু খেয়ে নাও। ছেলে মেয়েরা সব কোথায় ?

ছেলেমেয়ে ?

লজ্জা পেল অজাইব্‌ সিং-এর বৌ।

অজাইব সিং-এর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে, ওর পেছনে শয্যাশায়ী মানুষটার ওর প্রতি মঙ্গল কামনার দৃষ্টিকে অনুভব করল ও। কি যেন বলল বিড়বিড় করে অজাইব্‌ সিং। ঠিক বুঝতে পারল না। সেই সাংকেতিক ভাষা শুনে ওর বৌ ঘরে ফিরে গিয়েই আবার ফিরে এল হাতে একটি

সস্তা ক্যাসেট নিযে।

এটা কি ?

অবাক হয়ে বলল পৃথু।

অজাইব্-এর স্ত্রী বলল, এটা ও আপনাকে দিল হুজৌর। কখনও মন খাবাপ হলে, শুনবেন।

অবাক হয়ে ক্যাসেটটা বুক পকেটে রাখল পৃথু।

বাহাদুর গাড়ির দবজা খুলে দিল। গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, অজাইব্ ভাল হলেই যেন ডিউটিতে আসে। আমি অপেক্ষা কবে থাকব ওব জন্যে। ওকে বোলো সে কথা।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই, পৃথুব দুটি চোয়াল শক্ত হয়ে এল। এইভাবে, ওব পক্ষে হাটচান্দ্রায় থাকা আর সম্ভব হবে না। প্রত্যেকটি মানুষের এত ভালবাসা এবং অনুকম্পার এক কণাও ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা যে ওর নেই। এখান থেকে না-পালালে নিজের কাছে নিজে মুখ দেখাতে পারবে না আর।

হঠাৎই বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পডল কথাটা। সেই কথাটাই জিগগেস কবা হলো না অজাইব সিংকে।

বাহাদুরকে বলল, গাড়ি ঘোবাতে।

অবাক হয়ে হঠাৎ ব্রেক কবে, গাড়ি ঘুবিযে নিল বাহাদুব। বাহাদুব বড সাহেবেব ড্রাইভাব বটে কিন্তু অজাইব্-এব মতো নিখুঁত হাত নয় তাব। গাড়িকে বড কষ্ট দিযে গাড়ি চালায় ও। পৃথুর বাবা বলতেন, গাড়িও, ঘোড়াবই মতো। এঞ্জিনেরও প্রাণ আছে। তাকে ভালবাসিস, সেও তোকে ভালবাসবে। অজাইব সিং এই কথাটা বুঝত, যেমন বোঝে ভুচুও।

ওকে ফিবতে দেখে অবাক হল অজাইব-এব বৌ।

পৃথু বলল, একটা কথা ভুলে গেছি।

গাড়ি থেকে ঘবটা কতটুকু পথ, সেটুকু ; আগের দিন হলে দৌড়ে চলে যেত কিন্তু ক্রাচে ভর দিযে যেতে অনেকই সময় লাগল।

অজাইব্ সিং-এব দুচোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল। কতখানি তার নিজেব জন্যে, আর কতখানি পৃথুর জন্যে কে জানে তা। সবটাই অজাইব্ সিং-এর নিজের জন্যে হলেই খুশি হত পৃথু।

করুণা কোরো না। করুণা কোরো না। মনে মনে বলছিল ও।

অজাইব্ সিং, আখ্‌রী কাম যো দিয়াথা তুমকো, ইয়াদ হ্যায় ?

হুজৌর ?

যেন অনেক দূর থেকে বলল অজাইব সিং। কিছুই মনে পড়ল না ওর। মাথাও কি কম কাজ করছে ? কে জানে ?

কিছুক্ষণ ওর মুখে তাকিয়ে থেকে পৃথু বলল, ঠিক হ্যায়। তুম্ আরাম করো। বলেই, বেরিযে আসতে যাচ্ছিল যখন, সেই সময় অজাইব সিং বলল, জী হাঁ। হাঁ হুজৌর। তালাস্ কিয়া থা। পড়া ইয়াদ।

মিলা নেই ?

মিলাথা হুজৌর।

মিলাথা ?

স্তব্ধ হয়ে গেল পৃথুর দিশেহারা ক্লান্ত হৃৎপিণ্ড।

অজাইব সিং বলল, সীওনী।

সীওনী ? ও ? সাওনী। মগর, পাত্তা ক্যা ?

পুরা পাত্তা নেহি মিলা হুজৌর। শ্রিফ্ সীওনী।

বহুত মেহেরবানী অজাইব্ সিং।

নহী হুজৌর। কুছ্ নহী।

তারপরই অজাইব সিং পৃথুকে বলল, হুঁয়াই আপকি যানা চাহিয়ে হুজৌব।

বলেই, ভাবল, ধৃষ্টতা হল।

তাড়াতাড়ি বলল, টুসুবাবাকে সাথ্ লেকর যানা চাহিযে হুজৌর। বহুত্ই পেযার হ্যায় উ বাচ্চোঁকা দিল্মে, আপ্কো লিয়ে।

পৃথু আর কিছু না বলে, আরেকবাব ওর মাথায় হাত বেখে চলে এল।

ঘরের বাইরেই একফালি উঠোন। ঘন ম্যাজেন্টা-বঙা বোগোনভোলিয়া ফুটেছে। পুর্টোলেকার দল আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দেওয়ালের পাশে পাশে। কে জানে হয়ত পৃথুব মালীব কাছ থেকেই নিয়ে এসেছিল বীজ ঘুঘু ডাকছে মস্ত কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ার বসে। ঘুঘুররর-ঘু-ঘু-ব্-র্-র-ব যেখানেই শৌখীন নারী, সেখানেই গাছ, সেখানেই ফুল ; পাখি। পৃথুর বাড়িও এরকমই ছিল।

একদিন !

ছিল !

গাড়িটা জোরে ছুটে চলেছে। ভুচুব কাছে পৌঁছে এ গাড়ি ছেড়ে দেবে। ভুচুর কাছেই খাবে আজ দুপুবে। রাতে আজ একবার বিজ্লীব সঙ্গে দেখা করে আসবে। বাতটা তার একাব। অনেককিছু ভাবার। রুষাকে চিঠি লেখার। তারপর ভোরের আলো ফোটাব সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়বে ও এ জায়গা ছেড়ে। চোরের মতোই যাবে। অনেকদিন ত হল একই জায়গায়।

দিগা প্রায়ই একটা দোঁহা বলত তুলসীদাসের মানসমুক্তাবলী থেকে।

"মাগি মাধুকবী খাত তে সোবত গোড় পসারি
পাপ প্রতিষ্ঠা ববি পবী তাতে বাড়ী বাবি"

মানে, যতদিন মাধুকরী করে খেত, ততদিনই ছিল ভাল। নিশ্চিন্তে ছিল। পা ছড়িযে শুত। কিন্তু এদিকে পাপময়ী প্রতিষ্ঠা বাড়ল, তাতে শুধু ঝঞ্ঝাটই বাড়ল। বড় বেশি নিশ্চিন্ত আবামে ছিল পৃথু এতদিন। চাকরী, গাড়ি, সুস্থতা, স্ত্রী, বাড়ি, প্রতিষ্ঠা। ভালই হল, যা হল। দিন আনবে, দিন খাবে। অঙ্গহীন, প্রেমহীন, আরামহীন, অনিশ্চিত জীবনই ত আসল জীবন। প্রতি মুহূর্তে জীবনেব নতুন নতুন মানে খুঁজে পাবে। মুহুর্ত থেকে মুহূর্তে বাঁচবে এব্যব। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তীব জীবনদর্শনেব স্বাদ পাবে। ঈশ্বর হয়ত যা কিছুই করেন, মঙ্গলেব জন্যেই "সত্য মূল সব সুকৃত সুহাত্র।" সমস্ত সুন্দর সুকৃতের মূলই সত্যই থাকে? যা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে জীর্ণ বস্ত্রব মতো ছেড়ে ফেলে তার নিজের জীবনের সত্যকে এবাব দেড়খানা পায়ে হেঁটে হেঁটে খুঁজে বেড়াবে বাকি জীবন। দিগাই বলেছিল, দুঃখ কিসেব? রোদ আছে, চাঁদ আছে, ফুল আছে, পাখি আছে। জীবনে এখনও অনেকই সুন্দর কিছুকে অনুভব করার, প্রত্যক্ষ কবার বাকি আছে। পৃথু বলল, নিজেকে। তাই-ই ত। সেই প্রকৃত সুন্দরের ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত করো। একজন সামান্য নারীব দেওয়া দুঃখ অথবা অন্য একজন সামান্য নারীব কাছ থেকে প্রত্যাশার আনন্দর আকাঙ্ক্ষার চেয়েও অনেক অনেক বড় কিছু পাওয়ার আছে জীবনে। জীবনের মূলে চলে যাও, অনুভূতিব মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে।

আনন্দম্। আনন্দম্। আনন্দম্।

আনন্দম্ কথাটির প্রকৃত অর্থ এতদিনে যেন ধীরে ধীবে স্পষ্ট হচ্ছে তার কাছে। দাবী আব কর্তব্য আব দৈনন্দিনতার ভারে চাপা-পড়া ইঁট-চাপা ফ্যাকাশে জীবন নয়। "আকাশ ভবা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ"-এর আভাস যেন পেতে আরম্ভ করেছে পৃথু ইতিমধ্যেই একটু একটু করে। "তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।... কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি, জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান, বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান... আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ....."

ভুচু রান্না ঘরেই ছিল। খিচুড়ি রাঁধছিল। বুকে অ্যাপ্রন লাগিয়ে। বাবুর্চির মত। ভুনি খিচুড়ি। পৃথু ভালবাসে বলে। পৃথু যেতেই বলল, আমাব মন বলছে, তোমার চোখ দেখেই যে ; তুমি কোনো ফন্দী আঁটছ পৃথুদা।

কিসের ফন্দী ?

পালাবার ফন্দী। আমাদের সকলকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার ফন্দী। বলো, ঠিক বলছি কিনা?

পৃথু, ক্রাচ্ দুটো রেখে, ইজীচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বলল, এত ভালোবাসা, এত আদর ছেড়ে পালানো কি সোজা ভুচু?

সোজা হয়ত নয়। কিন্তু তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। তবু, তোমার ত পালিয়ে যাবার জো আছে পৃথুদা। আমাদের কথা কখনও কি ভেবেছ? তুমি না থাকলে, আমার কি হবে? আমার যে আর কেউ নেই। ছেলেবেলায় বাবা মাকে হারিয়েছি। তোমাকে পেয়ে, সব শূন্যতাই ভুলে ছিলাম। তুমিও এখন বদ্-বুদ্ধি আঁটছো। পৃথু চুপ করে রইল। মনে মনে বলল, বদ্-হাওয়া লেগেছে তার গায়ে, পাখি কখন উড়ে যায়?

বলল, যেখানেই যাই না কেন, ঠিকানা একটা ত থাকবেই। না থাকলেই হয়ত ভাল হত। তবু, থাকবে। আর থাকলে, সেটা তোমার অজানা থাকবে না। নিজের ক্ষতি করেছি কি ভাল, সেটা এখনও জানার সময় আসেনি। তবে, তোমাদের সকলেরই যে ক্ষতি করেছি, সেটা বুঝি। এবার পামেলাকে বিয়ের কথাটা বলো। একটু গুছিয়ে বোসো এবারে। অনেকদিন ত বাউণ্ডুলেপনা করলে। রোজগারও কম করনি এবং করছ না।

ভুচু বলল, দাঁড়াও পৃথুদা। ফ্রিজ্-এ বীয়াব রেখেছি; নিয়ে আসি। খিচুড়ির সঙ্গে বীয়ারই জমে ভাল।

বলেই, ভুচু চলে গেল।

পৃথু চলে-যাওয়া ভুচুর দিকে চেয়ে বলল, দাও। শেষ-খাওয়া খেয়ে নি। এর পরে ত ডাল-ভাতই জুটবে কিনা ঠিক নেই। এসব আর পাব কোত্থেকে? তুমি, গিবিশদা, সাবীর সাহেব, তোমরা সব অভ্যেসই খারাপ করে দিয়েছ আমার।

ফেনাসুদ্ধ বীয়ার নিয়ে এল ভুচু দুটি বীয়ার মাগ্ এ করে। একটা তেপায়া এনে রাখল পৃথুব জন্যে ইজীচেয়ারের ডানদিকে। যাতে বার বার ওকে কষ্ট করে না উঠতে হয়। নিজেব বীযার মাগ্‌টা কোলে নিয়ে বসল চেয়ারে। মুখোমুখী।

চীয়ারস্।

ভুচু বলল।

চীয়ারস্। কিন্তু তুমি আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছো ভুচু। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর এনিয়ে আমি বার তিনচার তোমার বিয়ের কথাটা ওঠালাম। তুমি অ্যাভয়েড করছ।

বিয়ে হচ্ছে। হুদার সঙ্গে নুরজেহানের। তোমাকে বলিনি। সময়মত দাওয়াত্‌ও পাবে। বেচাবী সাবির সাহেব হয়ত থাকবেন না ততদিন। কিন্তু আমি থাকব। আমিই ত বর-কর্তা। আর শামীম, ন্যাচারালী, কনে-কর্তা।

এই সম্বন্ধ আবার কবে হল?

যেদিন তোমার পা হারালে তুমি, সেই বাতেই হুদা পেল নুরজেহানকে। মানে, কথা পাকা হল। জবলপুরের হোটেলে। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস। হুদা খুব ভালোবাসে নুবজেহানকে।

তা না হয় হল, তোমার বিয়েটা ঠেকছে কিসে?

দাঁড়াও, মনোমত পাত্রী পাই; তবে ত! না হয়, তুমিই একটি দেখে শুনে দাও। আসলে, তোমাকে চোখের সামনে দেখে, বিয়ে করার কথাতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে আজকাল পৃথুদা। বিয়ের এত দিন পরে তোমার মতো স্বামীকেও ছেড়ে দিতে যে জাতের পাঁচ মিনিট সময় লাগে, আব যাই হোক তাদের বিয়ে করার কথা ভেবে দেখতে হয় নতুন করে। সত্যিই সাহস হয় না।

পৃথু বলল, ভুচু, তোমাকে একটা কথা বলব। রুষার সম্বন্ধে আমাব আড়ালে তোমরা যা খুশি তাইই বলো; আমি শুনতে আসব না। কিন্তু আমার সামনে ওবকম করে বলো না। একটা কথা মনে রেখো, আমি রুষাকে ভালোবাসি। ওর মতো মেয়ে হয় না। দোষ, সবই আমার। সব দোষ। বিবাহিত জীবনের যোগ্য আমি নই।

অবাক চোখে তাকাল ভুচু পৃথুর দিকে কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সরী পৃথুদা। বলেই, এক চুমুকে

বীয়ার শেষ করে দিল নিজেব।

বলল, দাঁড়াও। বীয়ার আনি। অনেক আছে। ভাল করে খাও তুমি।

ফ্রিজ্ খুলতে খুলতে নিজের মনেই বলল ভুচু, সাধে কী লোকে বলে, পাগলা ঘোষ্‌বা। ভাবা যায় না। একজন হারামজাদী মেয়ের জন্যে এখনও এত প্রেম। সব মেয়েই হারামজাদী!

ভুচু ফিরলে, পৃথু বলল, মেয়ে দেখার কথা উঠছে কিসে? পামেলা কি এক্ষুনি বিয়ে করতে রাজী নয়?

বীয়ারের বুড়বুড়ি-কাটা হলুদ-রঙা মাগ্-এর গভীরে চোখ রেখে ভুচু বলল, পামেলার বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, শী ইজ্ ইন্ দ্যা ফ্যামিলি ওয়ে। দু'মাস হলো প্রেগ্‌নান্টও হয়েছে। আ ফাস্ট ওয়ার্কার। চম্‌কে উঠে পৃথু, সোজা হয়ে বসল। বল কি? সে কি?

হ্যাঁ। তাইই। মনে কোরো না যে এ পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র শকঅ্যাবজর্বার। তোমাব এই চেলাও কম যায় না।

কাকে বিয়ে করল?

একজন আই এ এস ছেলেকে। ওদেরই স্বজাতি। মুণ্ডা। রাঁচীর কাছেই বাড়ি।

এই সাড়ে তিন মাসে ঘটে গেল ব্যাপার? এত কম সময়ে?

হ্যাঁ। সাড়ে তিন মাস কি কম সময় পৃথুদা? এরই মধ্যে ত তুমি কত কিছু হাবালে। ক্রীসমাস ঈভের রাতে তোমাকে হাসপাতালে রেখে আমি হোটেল থেকে অনেকই চেষ্টা কবেছিলাম ট্রাঙ্ক কল্-এ ওর সঙ্গে কথা বলবার। জবলপুর থেকে লাইন কিছুতেই পেলাম না। ক্রীস্‌মাস ঈভের পার্টিতেই ওর সঙ্গে প্রথম আলাপ পামেলার। তাছাড়া আমার এই ডাকাত-ফাকাতদের সঙ্গে এন্‌কাউন্টার, ওর পক্ষে প্রচণ্ড ডিস্‌টার্বিং ছিল। ওর মায়েবও আপত্তি ছিল ভীষণ। কোথায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বউ আব কোথায় অশিক্ষিত এক মোটব-মেকানিকের বউ। আমাকে তোমবা ভালোবাসো, তোমাদেরই গুণ সেটা। সমাজে আমার দাম আব ক' পয়সা?

পৃথু স্তব্ধ হয়ে রইল।

ভুচু বলল, আসলে, সকলে ত বাইবেটাই দেখে পৃথুদা। জেলাস ভিতর অবধি নজব চলে এমন চোখ ত সকলকে দেনও না আব ক্রাইস্ট্। দিলে কি, রুষাবৌদি তোমাকে ফেলে ভিনোদ ইদুরকারের কাছে চলে যেতে পারত? তাঁর তুলনায়, পামেলা ত অতি সাধারণ মেয়ে।

বীয়ার মাগ্-এ চুমুক দিয়ে পৃথু বলল, আসলে হয়ত বেশিরভাগ মেয়েই সাধারণ। কবি-সাহিত্যিকরাই তাদের কল্পনা দিয়ে তাদেব আহামরি করে তোলে। কিন্তু সে যাই হোক, তোমাব এই ট্রাজেডির জন্যেও আমিই দায়ী। ক্রীসমাস্ ঈভ-এ তুমি থাকলে, এটা হযত ঘটত না, ডাকাত ফাকাতের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেও·....

ঘটত। যা ঘটার তা ঠিকই ঘটত। সবই প্রি-ডেসিটিনড্ পৃথুদা। তাছাড়া, বিশ্বাস করো, তোমাব দুঃখই যদি তোমাকে অভিভূত না করে থাকে, তাহলে আমার এই সামান্য দুঃখ····। কোনো ব্যাপাবই নয। তাছাড়া, দুঃখই বা বলব কেন? বলব, আনন্দই। যে মেয়ের মন অত সহজে সরে যায, তার মন তো রুষা বৌদিব মতো বিয়েব অনেক বছর পরও সরতে পারত।এসব কথা ববং থাক। অন্য কথা বলো। আর কি খাবে বলো? ওমলেট্ ভেজেছি, কড়্কড়ে কবে আলুভাজা, বেগুন-ভাজা আব শুকনো লংকা ভাজা। আচারও আছে সঙ্গে। লেবু আর বড লংকার।

অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল পৃথু। জবাব দিল না কোনো।

ভুচু বলল, ভাবছ কি অত? খাও। ভাল করে বীয়ার না খেলে আমার বান্না কি মুখে দিতে পারবে?



সন্ধে লাগাব আগেই নামিয়ে দিয়ে গেছিল ভুচু পৃথুর বাংলোতে।

জীপ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, কাল সকালে আমি আসতে পারব না পৃথুদা, হুদাকে দিয়ে জীপ পাঠিয়ে দেব এগারোটা নাগাদ। শামীম খেতে বলেছে তোমাকে আমাকে আর গিরিশদাকে। মনে আছে ত?

আছে।

পৃথু বলল।

তারপর বলল, হুদাকে সকাল সাতটা নাগাদ একবার পাঠাবে ভুচু? কাজ ছিল আমার একটু।

সাতটাতে? হুদা ত অত সকালে আসে না। রামদীনকে পাঠিয়ে দেব। ভেবো না কিছু। তুমিই তাহলে আমাকে তুলে নিয়ে যেও। গিরিশদা সোজাই আসবেন শামীমের বাড়ি।

তাহলে ওই কথাই রইল। বলেই হাত তুলে, জীপ চালিয়ে চলে গেল।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখল, কম্পানীর ক্যাশিয়ার সুব্রাহ্মনিয়ম্ বসে আছে। মাথায় ফোঁটা-তিলক কাটা, পরনে সাদা টেরিলিনের ট্রাউজার এবং হাফ শার্ট। এই ঠাণ্ডা মাথার মিতভাষী সুব্রাহ্মনিয়ম্‌কে দেখে আসছে এই রকমই। এই রকম সাদা পোশাকেই। বহু বছর। পৃথুকে দেখেই, উঠে দাঁড়াল সে। একটি খাম দিল পৃথুর হাতে। বলল, মিস্টার সিং।

থ্যাঙ্ক উ্য, সুব্বু।

নো মেন্‌শানা। স্যার্‌রা! বলে, দুদিকে মাথা নাড়ল সুব্বু। হিয়াব ইজ্ আ লেট্টারা ফ্রম্ মিসেস্ সিংআ স্যার্‌রা।

একটি চিঠি এগিয়ে দিল।

থ্যাঙ্ক উ্য সুব্বু।

আই অ্যাম্মা সররী স্যার্‌রা।

সরি? ফর হোয়াট?

ভিতরে ভিতরে রেগে গেল পৃথু। সুব্বুও যদি কিছু বলতে যায় ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তাহলে ও কার্টলি বলবে: দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস। কিন্তু সুব্বু বলল, আই অ্যাম্মা সরী অ্যাজ আই হিয়ারা দ্যাট্টা উ্য আব লীভভীং আস্‌সা।

আই এলসো অ্যাম্ সরী সুব্বু।

গুডনাইট্ট্ স্যারবা। উইশ উ্য আল দ্যা বেস্টা।

থ্যাঙ্ক উ্য সুব্বু। আই ডু দ্যা সেম।

বেশি কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা পৃথুর ছিল না। শারীরিক অবস্থা ত নয়ই। দরজা অবধি এগিয়ে দিল সুব্রাহ্মনিয়মকে।

সে চলে যেতেই, মেবী বলল, মেমসাহেব চিঠি পাঠিয়েছেন একটা।

কাকে দিয়ে?

ইদুবকাব সাহেবের ড্রাইভারকে দিয়ে।

লছমার সিং এসে বলল, ডিনারমে ক্যা বানাউঁ সাব?

যা-কিছু আছে সবই বানিয়ে ফেলো। আমাদের সকলেরই জন্যে।

জী সাব্।

দুখীকে ডেকে পৃথু বলল, মেমসাহেবের চিঠিটা আমার টেবলে রাখ্। পায়জামা পাঞ্জাবি দে। আমি চান করতে যাব। গীজার চালিয়েছিলি ত?

জী সাব্।

চান হলে ভাল করে এক কাপ কফি খাওয়াতে বলিস্ ত আমাকে, মেরীকে। কম চিনি, কম দুধ দিয়ে; পাৎলা করে।

জী সাব।

চান করতে করতে পৃথু ভাবছিল, তার সুখের দিন এবারে শেষ হয়ে এলো। কাল অন্ধকার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়বে সীওনীর দিকে। বাসটা কটায় ছাড়ে, ঠিক জানে না। তবে বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছতে হবে ভোর ভোর। যাতে প্রথম বাসই ধরতে পারে। অনেক দূরের পথ। মুক্তি হয়ে, যেতে হবে লাল নীল অনেক নদী পেরিয়ে অনেক পাহাড়ের গা বেয়ে নতুন অচেনা রঙের জীবনের দিকে।

কুর্চির সঙ্গে দেখা কি হবে? রুষাকে দেখে; পামেলার কথা শুনে, ভুচুর কাছ থেকে; মনের মধ্যে মেয়ে জাতটা সম্বন্ধেই একটা ভীতি জন্মে যাচ্ছে যেন। কুর্চির সঙ্গে এ জীবনে দেখা না হলেই ভাল। অজাইব্ সিং-এর কাছ থেকে কুর্চির কোথায় বাস তা জানার পরও কোনওরকম উত্তেজনাই বোধ করছে না। সীওনীতে যে যাবে, সে কথা ও আগেই ঠিক করে রেখেছিল। কারণ, তাব জানাশোনা এক বিড়ি পাতার কারবারী আছেন সেখানে। তাঁর কাছে যদি জঙ্গলের কোনো কাজ জুটে যায় একটা! তাছাড়া, পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক-এর ফিল্ড ডিরেক্টর পারিহার সাহেবও আছেন। সামান্য একটি জীবিকার বন্দোবস্ত উনিও হয়ত করে দিতে পাববেন। তার নিজের প্রয়োজন আর কতটুকু?

সত্যিই কি তাইই? নিজেব প্রয়োজন তার কিছুমাত্রও নেই?

এবার বোধ হয় তার পরীক্ষা হবে।

চান করে পায়জামা পাঞ্জাবি পবে ঘরে এসে একটা বড় স্যুটকেসে তার প্রিয়তম কটি বই আর লেখালেখির সরঞ্জাম ভবে নিল। বাকি সবই থাকবে এখানে। কখনও সম্ভব হলে নিয়ে যাবে; নিজে থিতু হয়ে। নইলে, ছেলেমেয়েরা তাদের খারাপ, পরিত্যক্ত বাবার স্মৃতি হিসেবেই পাবে এইটুকুই। সম্পত্তি বলতে, এইই সব। এইই পৃথু ঘোষের দেওয়া উত্তরাধিকার। আর বদ্নাম। নিজের কারণে, নিজের ছেলেমেয়ের কাছে ও লজ্জিত। অন্য কারো কাছে না হলেও।

মেরী, দুখীর হাত দিয়ে কফি পাঠিয়ে দিল। ড্রয়ারটা খুলতেই নস্যির কৌটো বেরোল একটা। গিরিশদার অর্ডার মতো এখানের স্যাকরাই রূপো দিয়ে বানিয়ে দিয়েছিল। নস্যিও ভরা আছে। কৌটোর উপরটাতে কাঁচ দেওয়া। দেখা যায়; কতটা আছে।

কফি খেয়ে, এক টিপ্ নস্যি নিয়ে রুষার চিঠিটা খুলল পৃথু। ছোট্ট চিঠি। কিন্তু খামটা খুলতেই, একটি আরও ছোট্ট চিঠি খসে গিয়ে মাটিতে পড়ল। তুলে নিতেই দেখল, টুসুর। কাঁচা, শিশুসুলভ হাতের লেখা। কিন্তু বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই।

মাই ডিয়ার বাবা,

এভ্রী বডি সেজ দ্যাট উ্য আব ভেবি নটি। আর উ্য রিয়্যালি? আই উইল পানিশ্ উ্য অ্যাজ মিস্ আডুয়াল্পালকার পানিশেস্ মী ইন্ দ্যা ক্লাস ফর রং-আন্সারস অফ সামস্।

বাট হোয়েন আর উ্য কামিং? আর উ্য অ্যাফ্রেইড অফ দ্যা পানিশমেন্ট? উ্য আর আ ব্যাড কিড্ বাবা!

কাম সুন! আই উইল ওল্সো প্লে গেমস্ উইথ উ্য আফটার আই পানিশ উ্য।

—ইয়োবস্ অ্যাফেকশনেটলী টুসু।

পি· এস· লিখে, বাংলায় ভাঙাচোবা অক্ষরে লিখেছে . বাবা। এখানে অনেক ফুল, পাখি,

প্রজাপতি আছে। বড় বড় সাদা লেগহর্ন আব সোনালী রোড-আইল্যাণ্ড মুবগীরা গরম গরম ডিম পাড়ে বাবা। আমি কাল একটা ডিম ক্যাচ্ ধরেছিলাম। নবম আর গবম ছিলো। ধবার পরেই শক্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। জানো?

টুসুর চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে গেল পৃথু। বসে থাকল চুপ করে। মনটা বডই খাবাপ হয়ে গেল।

রুষা লিখেছে,

পৃথু,

তোমার আর যাইই দোষ থাক, আত্মসম্মানের অভাব কোনোদিনও ছিলো না। ইদুরকাবের এই বাড়িতে এসে এবং অন্যাকে দিয়ে ফোন করিয়ে আমাদের বিরক্ত কবার চেষ্টা আব কোবো না। মিলিরও ওইই মত। টুসুর নিজস্ব মতামতের বয়স এখনও হয়নি। যখন হবে, তখন তাব মতও যে এইই হবে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের চোখে ত তুমি ছোটই আছ। অন্যদের চোখেও নিজেকে এমন কবে ছোট কোবো না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা কোবো না কোনো।

মিলি রুষার চিঠির নিচে লিখেছে, বাবা! তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমাদেব খুবই অশান্তি হয়। মা বলল যে, তোমার চোখের মলমটা তোমার লেখার টেবলের বাঁ দিকেব ড্রয়ারে আছে। চোখে ব্যথা যদি হয় লাগিও। নিজের যত্ন নিও। আমরা ভাল আছি। খুব আনন্দে আছি। —ইতি মিলি।

পৃথুব চোখটা জ্বালা জ্বালা কবতে লাগল। নস্যির জন্যেই হবে। অনেকদিন পব ত নিল নস্যি।

রুষাকে অনেক কিছু লিখবে ভেবেছিল : জীবনে সে যত কবিতা নিজে লিখেছে অথবা পডেছে সেই সবের মধ্যে বিধুরতমর চেয়েও বিধুরতম একটি কবিতা লিখবে ভেবেছিল রুষাকে।

স্ত্রী-পরিত্যক্তা স্বামীর চিঠি।

শব্দটাও কেমন নতুন নতুন শোনায় এই পুরুষশাসিত সমাজের অনভ্যস্ত কানে। কিন্তু রুষা প্রমাণ কবেছে যে, স্বামীকে সহজেই পবিত্যাগ করা যায়। পৃথুর মনে হয় যে, সবাইকে সাবধান করে দেয়। কোনো স্বামীই যেন না ভাবেন যে, এমন ঘটনা শুধু তাঁর অবসরে-পড়া গল্প-উপন্যাসেই ঘটবে চিরদিন, তাঁদের নিজের নিজের জীবন চিরদিনই নিস্তরঙ্গ থাকবেই। তাহলে মস্ত ভুল হবে। কবে, কখন, কোন্ বয়সে এসে যে এমন ঘটনা ঘটবে, তা পূর্ব মুহূর্তেও হয়ত বলা মুশকিল।

রুষার জন্যে এক ধরনের গর্ববোধও করে পৃথু। মহিলা সমিতির সভ্যরা যে ধরনের উইমেনস্ লিব্ নিয়ে হাটচান্দ্রায় সচবাচর হইচই করেন, তাঁরা রুষাকে মন্দ বলতে পারেন, রুষা সম্বন্ধে কুৎসাও রটাতে পারেন কিন্তু পৃথুর পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র রুষাই সত্যিকারের লিবারেটেড্। নিজের জীবনে মুক্ত হওয়া যে যায়, তা করে ত ও দেখিয়ে দিয়েছে। চিৎকার মারামারি না করে, কারো মতামতের দাম না দিয়ে, শুধুমাত্র নিজেরই নয়, নিজের সন্তানদের পক্ষেও যা মঙ্গলের বলে মনে করেছে, তাইই ও করেছে। পুরুষ বাঘের মতোই, সন্তানোৎপাদনের পরই ছুটি দিয়ে দিয়েছে তার খেলার সাথীকে ওই বাঘিনী। বাঘিনীরা স্বাবলম্বী হয়। আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর থাকে। বাচ্চাদেব রক্ষা এবং বড় করে তোলার ক্ষমতার ওপরও পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাদেব।

প্রথমটা ধাক্কা খেয়েছিল যদিও তবু, রুষার এই ব্যবহাবে তার পবিচিত অন্য সকলে যতখানি বিচলিত, পৃথু কিন্তু অতখানি হয়নি। নিজের জীবন থেকে বাইরে এসে ও নিজেকে দেখছে একজন তৃতীয় ব্যক্তির মতো। উত্তেজনাহীন, অনুযোগহীন, অনুতাপহীন নৈর্ব্যক্তিক চোখে। ভাবী একটা মজা বোধ করছে সে, তার এই আপাত-অসহায়তায়, তাব পঙ্গুতায়। একটি আস্ত পা দিয়ে বাকি জীবনকে লাথি মেরে চলতে পারে, কী পাবে না তাইই দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে যেন ও।

চিঠিটা কবিতা হলো না। কোনো কবিরই ব্যক্তি-জীবনে কবিতা হয়ত থাকে না। এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী।

লিখল :

রুষা।

তোমার বাড়ির চাবি ফেরত পাঠালাম। আমি কাল ভোরে চলে যাব। কোথায়, তা এখনও ঠিক জানি না। তবে, পাকাপাকি একটা আস্তানা হলে, ঠিকানা নিশ্চয়ই পাঠাব। অন্য প্রয়োজন না থাকলেও, মিলি ও টুসুর স্বর্গীয় পিতার নিবাস ত একটা থাকা চাই। নইলে, ওদের পিতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

তুমি হয়ত বলবে, ভবিষ্যতে কোনো পিতা ছাড়াই ওদের চলে যাবে। ওদের মাতৃপরিচয়ই ওদের যথেষ্ট পরিচয়। কথাটা হয়ত মিথ্যেও নয়। পিতার পরিচয়েই চিরদিন পুরুষশাসিত সমাজে ছেলে-মেয়েরা পরিচিত হয়ে এসেছে। দিন বদলাচ্ছে। বদলেছে। তুমিই সেই বদলের পতাকা বহন করে মুক্তি-মিছিলের পুরোভাগে চলেছো। তোমার এবং তোমাদের মতো অগণিতা মুক্তি-যোদ্ধাদের প্রতি আমার আন্তরিক ও অকৃত্রিম শুভেচ্ছা রইল। ঠাট্টা নয়, সত্যিই বলছি।

ভবিষ্যতের দাম্পত্য সম্পর্ক : যাই-ই বলো, এই দেশেও যে দারুণ ইনটারেস্টিং, আন্সার্টেন হয়ে উঠবে যে, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। অনুক্ষণ হারানোর ভয় না থাকলে, পাওয়াতে বোধ হয় কোনো মজাই থাকে না। তাই-ই না ? আমাদের সম্পর্কর মতো, অনেক দম্পতির সম্পর্কই বোধ হয় গোথিক্ স্থাপত্যের মতো, মিড্-ভিক্টোরিয়ান যুগের আসবাবপত্ররই মতো ভাবী, অস্থাবর এবং অনড় হয়ে আছে। সেটা আদৌ অভিপ্রেত নয়।

ভালো থেকো। খুশি থেকো। মিলি টুসুকে সুখে রেখো। কোনো প্রয়োজন বোধ করলে আমাকে ডেকো।

টাকা পয়সার ব্যাপারটা উধাম সিং সাহেবকে বলা আছে। এও বলেছি যে, তোমার কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে উনি মাথা ঘামাবেন না।

টুসুকে একবার দেখার ইচ্ছে ছিল বড়। যাই-ই হোক, এখন থাক। ও যখন বড় হবে আরও একটু, তখন মিলির মতো তার মতামতটাও তার নিজের মুখ থেকেই শোনা যাবে।

আমাকে হঠাৎই সব ভার মুক্ত করে দিলে তোমরা সকলে মিলে। এতদিন যেন ক্লাচ্-এ পা রেখে জীবনের গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হঠাৎই পা সরিয়ে দেওয়াতে হাল্কা হয়ে গেছে গাড়ি। জোরে ছুটে চলেছে পাখিরই মতো…

রুষা। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। সত্যিই বলছি। জীবনে বাঁচার মানে তুমি নিজে যেমন আবিষ্কার করেছো সাহসের সঙ্গে, আমাকেও বাঁচতে দিয়েছ। আমি জানি, তোমার এই সাহস, আমার ডাকু মগনলালকে একা গিয়ে মারার সাহসের চেয়েও অনেকই বড় সাহস। আমি সেই "অসমসাহসী" বলেই তোমাকে এই কথা বলতে পারছি। শারীরিক সাহস হচ্ছে সাহসের বহুতলা বাড়ির সবচেয়ে নিচুতলার বাসিন্দা, কমদামী ; সস্তা। মনের সাহসটাই সাহস। মানুষ সেই সাহসের জন্যেই চিরদিন গর্বিত বোধ করে এসেছে। সেই সাহসেই তুমি হারিয়ে দিলে আমাকে। সত্যিই রুষা ! আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে পারতাম না বোধ হয়।

কনগ্রাচুলেশান্স। আমার অশেষ শুভেচ্ছা তোমার নতুন জীবনের প্রতি।

—ইতি—তোমার অশেষ প্রীতিধন্য পৃথু ঘোষ।

চিঠিটা পড়ল একবার লেখার পর।

নিজেকে যাত্রার নায়ক বলে মনে হল। সচরাচর পৌরাণিক থিয়েটারে বা যাত্রাতেই এই রকম রঙ-মাখা ঝল্‌ঝলে সিল্কের পোশাক-পরা মহৎ বাক্যবিন্যাসে অভ্যস্ত নায়ক দেখা যায়। ও নিজেও কি নিজের সত্যি-আমিত্বর ছোট্ট মাপটিকে ছাপিয়ে ওঠার অপচেষ্টাতে মেতে এমন একটি ঐতিহাসিক চিঠি লিখল রুষাকে ? আসলে কি ও, ওর মনের কান্নাকেই লুকোবার জন্যেই একজন লিলিপুটিয়ান হয়েও এই রকম গালিভার হবার উচ্চাশায় মাতল ?

ব্যাপারটাকে ভাল করে আবারও ভেবে দেখল পৃথু। ভেবে দেখে, আশ্বস্ত হল যে, যা করেছে তা সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই করেছে ; একজন আধুনিক, জীবন্ত, প্রগতিবাদী, সমস্তরকম বদলে-বিশ্বাসী মানুষের মন নিয়ে। যারা মানুষের সঙ্গে মানুষের, নারীর সঙ্গে পুরুষের ; স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কের

পরিবর্তনকে, বদলকে বাধা দেয় তারা সামাজিক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বদলও আনতে কোনোদিনও সক্ষম হবে না "চ্যারিটি বীগিনস অ্যাট হোম' এরই মতো ওল্ড চেঞ্জেস বীগিনস অ্যাট হোম অ্যাজ ওয়েল।

পৃথুর ব্যক্তিগত জীবনের ঝড়কে, যে ঝড় অন্য যে কোনো মানুষকেই বিধ্বস্ত করে দিতে পারত সেই ঝড়ের প্রমত্ততাকে সে ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে যে ভেতরে ভেতরে কিছু গড়বার কাজে লাগাতে পেরেছে এই কথাটা ভেবেই এক গভীর অব্যক্ত আনন্দ বোধ করতে লাগল। সেই আনন্দ ... ওর একার। তার ভাগ, ইচ্ছে করলেও, আর কাউকেই দেওয়া যাবে না।

খাওয়া দাওয়ার পর ওদের ডেকে প্রত্যেককে পাঁচশ করে টাকা দিল পৃথু। বলল কাল খুব ভোরে আমি চলে যাব। মেমসাহেবের বাড়ির এই চাবি আর এই চিঠি মেরী আর দুখী ভুচুবাবুর কাছে নিয়ে যাবে। ভুচুবাবুর লোক আসবে সকাল সাতটাতে। অত ভোরে তোমাদের কারোরই ওঠবার দরকার নেই আমার জন্যে। দুখী বসবার ঘরে শুয়ে থাকুক। আমি এলে দরজাটা খুলে দিস বাবা একটু। আবার যাওয়ার সময় ... তোরা অনেক করেছিস আমার জন্যে। মেমসাহেব যদি তোমাদের রাখেন তাহলে রাখবেন ... দুখী চলে যায় তবে এই টাকা দিয়ে দু একমাস চালিয়ে নিয়ে অন্য চাকরি দেখে নিস। লছমার ... কাল অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করবে। তোমাকে অন্য কোনো সাহেবের কাছে অথবা গেস্ট হাউসে ... দেবেন হয়ত ফোতেদার সাহাব।

মেরী বলল আমি মেমসাহেবের কাছে ... না ... দুখীও বলল আমিও না।

ওরা ভেবেছিল এই কথায় খুশি হবে পৃথু। কিন্তু ... বলল তোমরা তোমাদের মেমসাহেবকে চিনতে পারোনি। মেমসাহেব আমার চেয়ে অনেক ভাল।

যে-কথাটা ওদের বলতে ... যাচ্ছিল কিন্তু বলে লাভ নেই বলে বলল না তা হচ্ছে কথা আগামীদিনের মেয়ে। আর ... বর্তমানের যা ... মান, তা অতীত হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আর ভবিষ্যৎকে ছুঁতেও ... লাগে বর্তমানের। ওরা এসব বুঝবে না।

পৃথু বলল, দুখীকে ... টা রিকশা ডেকে আনতে পারবি দুখী আমার জন্যে। ... এর মোড়ে পাবি না গেলে?

পাব ... কিন্তু ... করবে কোথায় যাবেন।

বলবি, বাণ্ডীমহল ... যাব।

মেরী মুখ নামিয়ে নিল। লজ্জায় ওর মুখ ... হয়ে উঠল ... দুখী ... চলে গেল রিকশা আনতে।

মেরী একটু ইতস্তত করে চলে গেল ঘর ছেড়ে। কিছু বলতে বা শুধোতে চাইছিল ও।

পৃথু বলতে পারত যে, বিজলীর কাছে যাবে। বিজলীর ঘরেই ... মগনলালকে মেরেছিল। সেই ... তার পায়ে গুলি লেগেছিল। বিজলী ... চলে যাবার আগে একবার ধন্যবাদ ত দিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু মুখে বলল না কিছুই। কী লাভ? কতজনের কাছে জবাবদিহি করবে? তাছাড়া, করবেই বা কেন? নিজের কাছে জবাবদিহি যদি করা যায় তাহলে আর অন্যের কাছে তা করবার দায় থাকে না।

রিকশাতে যখন উঠে বসল পৃথু, তখন রাত সাড়ে নটা।

দুখী বলল, কখন ফিরবেন সাহেব?

জানি না। তোরা সকলে খেয়ে দেয়ে নে। বাইরের আলোটা জ্বেলে রাখিস দুখী আর এখানেই শুয়ে থাকিস পাখা চালিয়ে। আর; কাল কোম্পানীর ড্রাইভার এসে গাড়িটা নিয়ে যাবে। চাবি চাইলে দিয়ে দিস।

অজাইব সিং?

অজাইব সিংকে আজ দেখতে গেছিলাম রে দুখী। পারলে, তোরাও সকলে যাস একদিন। বাহাদুর ড্রাইভার বাড়ি ... । অজাইব সিং আর বাঁচবে না বেশিদিন।

মরে যাবে?

আতঙ্কিত গলায় শুধোল দুখী।

হ্যাঁ। পৃথু বলল।

—ছেলেটাব বয়স বড়জোর তেবো-চোদ্দ হবে। চাইল্ড-লেবার। এই বয়সে জীবন সম্বন্ধে বড় বেশি মায়া-মমতা থাকে। তাই-ই, ওব কাছে মৃত্যু বড়ই ভয়ের।

ইমবান্ নিচেব ঘবেই ছিল। বিজলীব ঘবে গান শুনছিলেন মালাঞ্জখণ্ড-এব এক বাবু। রাত কাটাবেন অন্য কাবো ঘরে। গান শুনেই চলে যাবেন।

ইমরান্ আদব করে বসালো ওব ঘরে এবং দৌড়ে উপরে গিয়ে খবর দিল। তাড়াতে ত আর পারে না। বাবু লক্ষ্মী।

বলল, স্রিফ পনবা মিনট।

সেই বাচ্চা ছেলেটাকে দেখল না পৃথু। কী যেন নাম ছিল ওব ভুলেই গেছে। কোথায গেল সে?

ইনবান, পান দিযে জর্দাব ডিবে এগিযে দিতে দিতে বলল, ওহ্। উও ছোকবা? উ ত মব গ্যযে।

মব গ্যয়ে? কেইসে?

চীচক্‌সে। ইস্ মহল্লেকে বহতই আদমীনে গুজব গ্যয়ে বাবু। ডাকু মগনলালকা যো ভাই থে না, উও ভিস্তিওয়ালে। উ ভিব মব চুকে।

বল কী! কবে?

দশ পনবা দিন হোগা।

তা তোমরা টিকে-টিকে নিযেছ ত? শহরে ত এরকম শুনিনি। কী কবছ তোমরা?

পান খেতে খেতে ইমরান বলল,করব আব কি? সন্ধের আগে আগে নিমপাতা পুড়িযে ধুঁয়ো দি ঘরে ঘরে। আর মশারী টাঙিযে শুই। কিন্তু তাতে কি? ঈ দেখিযে, বলেই চটাস করে একটা বড় মশা মারল নিজের বাঁ হাত দিয়ে বাঁ গালে।

চীচ্‌ক হলে চিকিৎসা কে করে?

কাহে? হাকিমসাহাব। হাকিম, বড়া জবরদস্ত্। মগর ইস সাল, ঈ শালে চীচক্ ঔর্‌ভি জবরদস্ত নিক্‌লা।

পৃথু রীতিমত উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তোমাদের এই কাঁচা নর্দমা-টর্দমাতে মিউনিসিপালিটি ওষুধ-টষুধও ত দিতে পাবে?

ইমরান বলল, শালে লোগোঁনে সব হিঁয়া আতা' মগর···। মচ্ছর মারনে থোরী আতা। রাণ্ডী মহল্লেকে আদমী ঔর আওরাতকা জানকা কোঈ কিম্মত নেহি সাব। কিস্মত স্রিফ্ গল্লে ঔব উও চিজ্‌কি? কিস্‌কা আয়া-গ্যয়া?

তারপরই মিউনিস্যাপেলিটি ওষুধ চেয়ারম্যানের এবং কমিটি মেম্বারদের সম্বন্ধে এমন এমন সব কথা বলল তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ইমরান,তাতে পৃথুর মনে হল যে, শুধু মুখের কথাতেই যদি বংশবৃদ্ধি হত তবে এতক্ষণে এই মহল্লায় হাজারখানেক মানুষের বাচ্চা মশারই মতো কিলবিল করত।

একটু পরই, সিঁড়ি বেয়ে মালাঞ্জখণ্ড-এর বাবুর নেমে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। বিজলী, নিজেই তরতর্ করে নেমে এল। ওর পায়ের রূপোর পায়জোরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল ঝুন্‌ঝুন্ করে। হালকা নীল-রঙা রেশমী শালোয়ার-কামিজ পরেছে ও। পৃথুকে দেখেই, আদাব করে বলল, ক্যা খুশ্‌নসীবী ঈ বান্দীকি!

বলেই, পৃথুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ওপরে।

টানলেই ত আর তাড়াতাড়ি যেতে পারে না পৃথু। সিঁড়িটার মাঝের ল্যাণ্ডিং-এ মুখ-থুবড়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ও। বিজ্‌লী সময়মত জড়িয়ে না ধরলে, পড়েই যেত।

পৃথুকে সোজা ওর শোবার ঘরে নিয়ে গেল বিজ্‌লী। খাটে নিযে, পিঠে বালিশ দিয়ে, আরাম করে বসিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে চোখে, চিবুকে, গলায় পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল শব্দ করে।

পৃথু হাসতে লাগল। বলল, ছোড়ো, ছোড়ো, গুদগুদি লাগ্ রহা হ্যায়।
সত্যিই কাতুকুতু লাগছিল ওর ভীষণই।
হাঁটু গেড়ে ওর দেড়খানা পায়ের মধ্যে, মাটিতে বসে পৃথুর কোলে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে নাক ডুবিয়ে চুমু খেল ও উম্-ম-ম্-ম, শব্দ করে।
পৃথুর শরীরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলতে শুরু করল। কিন্তু বিজলীকে আলগা করে সরিয়ে দিয়ে পৃথু বলল, ওঠো, ওঠো, উঠে পাশে বসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।
নাঃ। কোনো কথা নেই।
বিজলীর নাকের নিঃশ্বাস উষ্ণ হয়ে উঠল। দু চোখের তারা স্পন্দিত হতে লাগল। উত্তেজনায় রাজঘুঘুর মতো পেলব কোমল বুক দুটি দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। নরম সবুজ ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পাট্‌কিলে রঙা খরগোশের গন্ধ পেয়ে তার দিক শিকারির ল্যাব্রাডর গান্-ডগ্ যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যায় তেমনই করে পৃথুর কাম ঝিলিক তুলে বিজলীর সুগন্ধি, আমন্ত্রণ-জানানো শরীরের দিকে ছুটে যাচ্ছিল।
পৃথু তীক্ষ্ণ শিস্ দিয়ে ডাকল তাকে। ফিরে আসতে বলল তার নিজের ভেতরে। কুকুরটা অত্যন্ত অনিচ্ছায় ফিরে এসে পৃথুর পায়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আশাভঙ্গতার উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল।
বিজলী আজ নয়। তোমাকে একটু দেখতেই এলাম আজ। পরে আসব তোমার কাছে। সময় নিয়ে। রাতভর থাকব। হয়ত জীবনভর। তবে, এখন আজকে সে সব ভাবারও সময় নেই।
কেন ?
এমনিই! কালই তো এলাম মোটে। এখনও যে ভাল করে হাঁটতে পারি না। তুমিও পালাচ্ছ না। আসব আমি। দেখো।
তারপরই অবাক হয়ে বলল, ও কি ? তোমার পালঙ্কর বাজুতে যে মগনলালের গুলির দাগ লেগেছিল, তা মেরামত করাওনি এখনও ?
মেরামত্ ? কেন করাব ? ঐ দাগ যে আমার কাছে বহতই ইজ্জতের নিশানী সাহাব। ঐ দাগ যে, আমার বুকের ভেতরেও আছে।
হাসল পৃথু। ও ভাবছিল, কোথায় যেন পড়েছিল ; বেনারসের বাইজীকে নিয়ে, লেখা কোনো উপন্যাসে, খুব সম্ভব, এই রকমই কিছু কথা। শরৎবাবুর লেখা নয়, আধুনিক কোনো ঔপন্যাসিকেরই। তবে, সেই উপন্যাসের ভাষাটা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সেকেলে করেছিলেন লেখক। "সংসারে বোধ হয় এইরূপই ঘটে ! যাহার নিকট হইতে যাহা বড় তীব্র বেদনার সহিত কামনা করা যায়, সে জন তাহা কখনই দিতে রাজী থাকে না। আর যে অন্যজনে তাহা বড়ই আনন্দমিশ্রিত বেদনার সহিত দিতে স্বীকৃত হয় তাহাও সেই অন্যজনের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার কোনই উপায় থাকে না।..."
কী ভাবছেন সাহাব ?
তোমাকে একটা কথা জিগ্‌গেস করতে এসেছি বিজলী।
মোটে একটা ? ভেবেছিলাম, অনেক কথা জিগগেস করবেন।
ঠাট্টা নয়। মন দিয়ে শোনো যা বলছি।
বলুন।
তুমি কি কখনও বিয়ের কথা ভেবেছ বিজলী ?
বিয়ে ?
বলেই মুখে ওড়না চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ও। পর মুহূর্তেই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল।
কী হল ?
পৃথিবীতে এমন কি একজনও মেয়ে আছে যে কখনও না কখনও তার পুতুলখেলার দিন থেকে

বিযেব কথা ভাবে না ? মগর্ আপভি মজাক্ উড়াহ্ রহা হ্যায় সাহাব ?

মজাক্ নেহি। বিলকুলই নেহি। জারা শোচ্-সমঝকে বাঁতেঁ করো। ইয়ে মজাককি বাঁতে নেহি।

শাদী ? কিস্সে ? আপসে ?

বিজলীর দু'চোখ বাগে ঝলমল করে উঠল।

নেহী। হাম তো শাদী-শুদা আদমী। দো বাচ্চোকো বাপ্। এক পায়ের ভি খো চুকা। হাম্ নেহী। মগর, পহিলে জবাব তো দো, মেরী সওয়ালকে।

কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বিজলী বলল, কওন শাদী কবেগা হাম্সে ?

পৃথু চুপ কবে রইল।

এত গভীবভাবে ব্যাপারটা ভেবে দেখেনিও। সত্যিই তো! বিযের পর ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন সুখেব সংসাব পেতেছে দুজনে তখন কোনো পার্টিতে, কোনো চার্চ-এ, কোনো মজলিসে হঠাৎ কোনো পুবোনো বাবু যদি বলে বসে, আবে! বিজলী বাঈজী না ? মেয়েব বিয়ে হবে না। যা কিছু গডে তুলবে ওবা, সবই ভেঙে পডবে হুডমুড কবে এক লহমায।

বিজলী বলল, এই দুনিয়া বডই খারাপ জাযগা সাহাব। গিধ্বড-এব মতো এ। কোথাও কাউকে একটু সুখী দেখলে সে ছোঁ মেবে সেই সুখকে ধারালো ঠোঁটে করে তুলে নিযে ভাগাডে নিয়ে গিয়ে দু পায়ে চেপে ধবে টুকরো কবে খায। এ দুনিযাব আপনি কতটুকু জানেন ? আব জানতেনই যদি তো আপনাব আজ এই দশা হবে কেন ?

চমকে উঠল পৃথু।

নিজের পাযেব দিকে চেয়ে বলল, এই দশাব কথা বলছ ?

না। এ তো কিছুই নয। আপনার কথা হাটচান্দ্রার কাক-শালিকও জানে। ইমবান-এর কাছে সব শুনেছি আমি।

পৃথু লজ্জায মুখ নামিযে নিল।

লজ্জা তো আপনার নয় সাহাব! লজ্জা তো আপনাব বিবিব। শবীবেব মধ্যে কী বা কতখানি সুখ লুকোনো আছে তা তো তিনি আমাব চেযে আব বেশি জানেন না ? ছিঃ ছিঃ এই সস্তা শবীবের সুখের জন্যে তিনি আপনার মতো মানুষকে···

পৃথুব কান লাল হযে গরম হযে উঠল।

বলল, আমার মতো মানুষ মানে কি ? আমি কী এমন অসাধারণ মানুষ ? তুমি আমাব বিবি বাচ্চাদেব সম্বন্ধে সব জানো না। তাবা খুব ভাল। আমিই তাদেব যোগ্য নই।

আপনি যা খুশি বলে নিজেকে বুঝ দিন তাতে আমার কিছুই যায আসে না।

বিজলী, বিজলী! বিজলী তুমি চুপ কবো। তুমি সব বোঝো না। আমি আমাব স্ত্রীকে ভালবাসি বিজলী!

বিজলী দু' চোখ তুলে পৃথুব চোখে তাকাল। তারপব ওব দুটি হাত তুলে নিযে নিজের কোলে বাখল। মুখ নিচু করে বলল, অজীব্ আদমী হ্যায় সাহাব আপ্। খ্যযেব··। পবেব জন্মেও তো বাঙী হবো না। খুদাহ্র কাছে আর্জি কবব পবের জন্মে, যেন আপনার মতো স্বামী পাই।

ছিট্‌কে উঠল যেন পৃথু।

বলল, আমাব মতো স্বামী ? পাগল হযে যাবে তুমি। নযত খুন করবে এমন স্বামীকে। আমি একটা বাজে লোক। একটা যাচ্ছেতাই, থার্ডক্লাস··

দুটি হাতের পাতা তুলে নিজেব মুখ ঢাকল পৃথু।

বিজলী পৃথুকে তাব দু হাত দিয়ে জড়িযে পৃথুব মাথাটি তার বুকেব মাঝে নামিয়ে আনল।

চোখ বুঁজে ফেলল পৃথু।

অনেকক্ষণ পরে চোখ যখন খুলল তখন দেখল বিজলীব দু চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে। দু হাতে তাব মাথার চুল-দাড়ি সব এলোমেলো করে দিতে দিতে বিড়বিড় করে কী সব বলছিল বিজলী। অস্ফুটে। কিছুই বুঝতে পাবল না পৃথু।

পৃথু বলল, আমি এবার যাব।

যাবেন বইকি! যখনই আপনার খুশি। আপনাকে আটকাব না আমি। থাকতে বলব না। বলতাম, বলেছিলাম; যখন জানতাম যে আপনার সব কিছু আছে। যার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী আছে, সুন্দর ছেলেমেয়ে আছে; তাকে বশ করাব মধ্যে এক গভীর আনন্দ দেখি আমি। চিরদিনই! আজকে সাহাব, আপনি আমারই মতো দুঃখী হয়ে গেছেন। যে দুঃখে দুঃখী ছিলাম বলে আপনাকে বরাবরেরমতো পেতে লোভ হত বড়, সেই দুঃখে আজ আপনিও দুঃখী। আজ আমি যদি আপনাকে পাই তবে আপনাব বিবিব কাছে মস্ত হাব হবে আপনারই। আপনাব বিবি বলবেন, আপনি আমাব মতো এক রাণ্ডীরই যোগ্য।

পৃথু মুখ তুলে কিছু বলতে গেল বিজলীকে।

বিজলী কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আমি আপনাবই ছিলাম। আপনারই থাকব। যখন খুশি আসবেন। যা চাইবেন, সবই আপনাব। গান শুনবেন। আমাকে বুকেব মধ্যে করে শুয়ে থাকবেন, যা-খুশি করবেন আমাকে নিয়ে। যেখানে খুশি ডেকে পাঠাবেন আমাকে, আমি সব কাজ ফেলে দৌড়ে যাব। শুধু, কখনও আমার চিরদিনেব হতে চাইবেন না। আমিও চাইব না। কথা দিলাম। আমি যে, আমি যে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি সাহাব। আপনাকে কি আমি ছোট করতে পারি?

বিজলী! আমি কাল অন্ধকার থাকতেই হাটচান্দ্রা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

হতবাক হয়ে গেল বিজলী।

বলল, কোথায়?

সীওনীতে।

সীওনী? সে যে শুনেছি, অনেকই দূর এখান থেকে। আপনাকে একটু চোখেব দেখাও কি দেখতে পাবো না আব?

আর কাউকেই বলিনি, কোথায় যাচ্ছি।

তুমি চিঠি লিখো। আমাকে দেখতে ইচ্ছে হলে, তুমি যেখানে বলবে সেখানেই যাব। তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে কবলে, আমিও লিখব। কিন্তু এই হাটচান্দ্রাতে আব ফিবব না। আমাব জীবনেব আধখানা আব একটি পা এখানেই ফেলে গেলাম বিজলী।

কী যেন ভাবছিল বিজলী।

এমন সময় দরজায় কেউ টোকা দিল।

বিজলী বলল, কেউ গাইতে বা বাজাতে এসেছে। আব কী হবে? কত কীই স্বপ্ন দেখেছিলাম, খোয়াব দেখেছিলাম আপনাকে চিরদিনেব মতো কাছে পাব। আব হয় না তা। আজকে আপনি ববং উঠে পড়ুন সাহাব। কাল ভোরে বেরুবেন তো। যাবেন কিসে?

বাসে।

বাসে? ইসস এই ক্রাচ নিয়ে। আমাদের তো বাসেই চলাফেরা অভ্যেস। আপনাব তো অভ্যেস নেই না। যান। ঘুমিয়ে নেবেন একটু।

আমারও অভ্যেস হয়ে যাবে। চাকরী তো আব নেই। অভ্যেস কবতেই হবে।

জানি।

তাও জানো?

সব জানি।

তবু, আমাকে তাড়িয়ে দিলে না প্রথমেই?

হাসল বিজলী। বলল, ইচ্ছে করল না; তাই-ই।

পাঞ্জাবীব পকেট থেকে খামটা বেব করল। বলল, এক হাজাব টাকা আছে। বাখো।

কিসের টাকা?

বিরক্ত হয়ে বলল, বিজলী।

আমি যখন ডাকব তোমাকে, তখন ট্যাক্সি কবে যেও। আমার জন্যে তুমি কষ্ট করো, তা আমি

চাই না।

কী ভাবল একটু বিজলী। তারপর বলল, আগের আপনি হলে এ টাকা ছুঁড়ে মারতাম আপনার মুখে। আজকে, সাহাব এই টাকার অনেকই দাম আমার কাছে। এ টাকা কখনও খরচ না করে তুলে রাখব আলমারীতে রেশমী রুমাল জড়িয়ে। আমার নোংরা রোজগারের টাকার সঙ্গে মেশাব না কখনও। যাব। ডেকেই দেখবেন। আর একটা কথা। এই জীবনে, আর কিন্তু কখনও টাকা দেবেন না আমাকে। ভাল হবে না তাহলে।

চললাম তাহলে বিজলী।

বিজলী এতক্ষণ খুব কঠিন কঠোর ভাব দেখাচ্ছিল। পৃথু "চললাম" বলতেই, হঠাৎই গলে গেল যেন। ভেঙে পড়ল। নিচু ধরা গলায় বলল, চললাম, বলে না। চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে নিচ অবধি।

কেউ এসেছে তোমার জন্যে। কোনো বাবু।

বাবুবা তো আসবে যাবেই। জীবনভব। আমার সাহাব তো রোজ রোজ আসবেন না।

যতক্ষণ না সাইকেল বিকশাটা মহল্লাব গলির মোড়ে না পৌঁছল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল বিজলী। হাত তুলল, রিক্‌শাটা মোড়ের মুখে হারিয়ে যাবার মুহূর্তে।

পৃথুও হাত তুলল।

বিক্‌শাতে, লম্বা-চওড়া মানুষটাব ক্রাচ্ নিয়ে বসতে কষ্টই হয়। বেঁকে বসতে হয়।

তবুও বেশ লাগছে এখন। হিম হিম ভাব বয়েছে এখনও রাতে। ভোর অবধি থাকবেও। ঝিরঝির করে হাওয়া দিয়েছে একটা। এখানে মহুয়া আব কবৌঞ্জের গন্ধ নেই। পৃথুদের বাড়ির দিকটা অনেক ফাঁকা। ওদিকে পাওয়া যায়। কিন্তু মহল্লার নুপুব, সাবেঙ্গী আব গানের সঙ্গে ভেসে-আসা তবলার মিশ্র আওয়াজ এই গভীর রাতে বহুদূব থেকে শোনা যাচ্ছে। বাতাসে আরও ভেসে আসছে ঈত্বর আর ফুলের গন্ধ।

ক্যাঁচার-কোচোর করে চলেছে বিক্‌শাটা। ক্যাঁচাব-কোঁচব, কোঁচোব-ক্যাঁচব।

যারা চিবদিন গাড়িতে চড়ে অভ্যস্ত তাদের রিক্‌শায় চডতে বেশ মজাই লাগে। হঠাৎই যেন সময়ের দাম কমে যায়। দূরত্ব বেড়ে যায় পথেব। গাড়িতে বসলে, যে হাওয়াটা এসে অসভ্যর মতো থাপ্পড় মারে, চুল এলোমেলো কবে দেয়, বিকশায় বসে সেই হাওয়াটাকেই তাল বা বাঁশের চাটাই-এর হাত-পাখার হাওয়ার মতো মিষ্টি লাগে।

অনেকই পরিবর্তন!

আবো অনেক পরিবর্তন অপেক্ষা কবে আছে পৃথুর জন্যে সীওনীতে। উঁচু উঁচু পাহাডঘেবা প্রায় দেড হাজাব ফিট উঁচু হবে জায়গাটা। গবম গ্রীষ্মব প্রখর দিনেও বিশেষ থাকবে না। কিন্তু এই হাটচান্দ্রাই ছিল ভাল। চারধারে অনেকই সমান জায়গা থাকাতে পৃথুর পক্ষে হেঁটে চলে বেড়াবার সুবিধে ছিল অনেক। অনেক অনভ্যাসকেই অভ্যেস কবতে হবে এখানে।

মাইকাল পাহাড়শ্রেণী হাত ধবাধরি করে এসে বিন্ধ্য ও সাতপুবা পর্বতশ্রেণীকে ছুঁয়ে বয়েছে দুপাশ থেকে। আর এই বেষ্টনীব বুকের মধ্যেই আদরিণী মেয়ের মতো পালিত হয়েছে যুগযুগান্ত ধরে দুটি সুন্দরী নদী। কালো হালো আব ফর্সা বানজারেব উপত্যকা ঘুমিয়ে রয়েছে এদেবই পাহারায়; ঘন, গভীর, প্রায় নিশ্ছিদ্র অরণ্যে ঘেবা। এবই একটি পাশে সীওনী। মধ্যপ্রদেশের ট্যুওবিস্ট ম্যাপে এই জায়গা কেউ খুঁজে পাবে না। তবে কেউ যেতে চাইলে অবশ্যই খুঁজে নিতে পারবেন। ছবির মতো জায়গা। সীওনী, রুডইয়ার্ড কিপলিং-এব মোওগলির জায়গা বলে এবং বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় এখানে বহুবাব আসাতে এই ছোট্ট জাযগাটি সম্বন্ধে চিরদিনই পৃথুর একটু বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এখন তো কপালেব লিখনেই যেতে হচ্ছে সেখানে বলতে গেলে। কে জানে, তাব লিখন, ধূলায় ধূলি হবে কী না?

ঠুঠা লাইংড়াতেও যাওযাব আগে এসে পৌঁছলে ভাল হতো। কেমন আছে সে কে জানে? অবশ্য মুক্তি হয়ে বাইহাব হয়েই বালাঘাটের দিকে যেতে হবে। পথে দেবী সিং-এর খোঁজ কবে নেবে

সান্‌জানা সাহেবেব বাড়িতে একবাব। মুক্কি ট্যুওবিস্ট লজ পেবিয়ে কিছুটা গেলেই বাঁ দিকে পড়ে সানজানা সাহেবেব বাড়ি। মুক্কিতে তো বাস দাঁড়াবেই।

বিকশা এবাব এসে বড় বাস্তায় পড়ল, জলেব ট্যাঙ্কিব পাশ দিয়ে। এখনও বহু পথ। গাড়িতে চলেফিবে সত্যিই পথেব দূবত্ব সম্বন্ধে ধাবণাটাই নষ্ট হয়ে গেছে, বুঝতে পাবল। বাড়ি এখনও অনেকই দূব।

আব বাড়ি।

আনন্দ বাগচীব বড় ভাল কবিতা পড়েছিল কিছুদিন আগে কবিতাটি মনে এল। কিন্তু ভাল গানেবই মতো কবিতাও যদি স্থান ও সময় বিশেষে মনেই না আসে, তাহলে তা পড়া বা জানা অবাস্তব। এই বাবদে, ওব বাজে স্মৃতিশক্তিব কাছে পৃথু অশেষই কৃতজ্ঞ নইলে, এমন এমন সময়েও কবিতা আসত কি মনে?

বিকশা চলছে এক লয়ে এক তালে। সামনে ঝুঁকে পড়েছে তাব মাথা। মানুষকে পিঠে কবে মানুষ চলেছে। দুজনেই পঙ্গু আসলে একজনেব একটা পা কাটা গেছে আব ও বেচাবাব থেকেও নেই। বাঁধা পড়ে আছে সাইকেলেব চেনেব সঙ্গে

'শেষ ইস্টিশানে নেমে কি থাকে তোমাব হাতে? কিছুই থাকে না/ ডাইনে বাঁয়ে, সীমাহীন বেললাইন চলে গেছে/ অনেক উঁচুতে শুধু ভুতুড়ে সিগন্যাল দেখে লাল নীল চোখ/বুকেব কিনাব ঘেঁষে বেহালাব ছড়েব মতন/ডুবে গেছে অদৃশ্য হুইসেল / ঘুমেব ভেতবে পাশ ফিবতে ফিবতে সমস্ত পল্লাব/গেবস্থালি বয়ালেব শব্দ শোনে খস খস/মশাবিব বাইবে জাগে স্থিব শব্দে মশা শেষ ইস্টিশনে নেমে মধ্যবাতে দবজাব অচেনা মানুষ/যে যাব পায়েব শব্দ কাছে টেনে ছায়াব ভেতবে/মুছে যায়—/

পকেটে ডোবাও হাত কিছু নেই, মুঠো খোলো কিছু নেই/একমাত্র চেকাবেব হাতে/তোমাব মুদ্রিত পুঁজি বেখে এলে, শেষ তাস, খেলাব টিকিট।



বাস্‌টা ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ। পূবে আলো ফুটেছে সবে। আবও এগিয়ে চিল্‌পিতে গিয়ে ডানদিকে মুক্কিব দিকে মোড় নেবে। তাবপব মুক্কিব চেকনাকা, কানহা টাইগাব প্রোজেক্টে ঢোকবাব পথকে ডানদিকে এবং বেঞ্জাবেব বাংলোকে বাঁদিকে বেখে বানজাব নদীব উপবেব ব্রিজ পেবিয়ে আই টি ডি সিব কান্‌হা সাফাবী লজ্‌কে বাঁয়ে বেখে চলে যাবে বাইহাবেব দিকে। বাইহাব থেকে বাঁদিকে চলে গেছে পথ ভাবতব সবচেয়ে বড় তামাব খনি ও কাবখানা মালাঞ্জ খণ্ড-এ। পৃথু যাবে সোজা বালাঘাটেব দিকে।

এতক্ষণে নিশ্চয় খাণ্ডেলওয়াল সাহেবেব কালো কুচকুচে যুবতী আয়া সাদা ধবধবে জোয়ান অ্যালসেসিয়ান কুকুব ও তাব নববিবাহিতা লালচে বঙা স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটতে বেবিয়েছে জঙ্গলেব দিকে। অ্যালসেসিয়ানেব বঙ ত সচবাচব লালচে হয় না। হয়ত বিয়ে হয়েছে তাব অন্য জাতেব কুকুবীব সঙ্গে। বিয়ে হয়নি এখনও শুধু আয়াটিব। কবে হবে, কে জানে? তবু, বিয়ে হোক কী নাই-ই হোক, প্রত্যেক মানুষ এবং জীবেব প্রকৃত মুক্তি নিহিত থাকে প্রকৃতিবই মধ্যে।

কুকুররা এ কথাটা অনেক আগেই বুঝেছে ; মানুষ কবে বুঝবে কে জানে ?

হাটচান্দ্রার সকলে যখন শুনবে তার না-বলে চলে আসার কথা, ওরা ভাববে পৃথু ঘোষ ভীরু হয়ে গেছে। ভীরুর মতো চলে গেল। শামীম দুঃখ পাবে, ইন্তেজাম করার পরও না-খাওয়াতে। কিন্তু···জবাবদিহিও করতে চায় না কারো কাছেই। জবাবদিহি করার ভদ্রতা, শিষ্টতা, সামাজিকতার একটা সময় এবং বয়স থাকে। তার পর সবই মনে হয় বাহুল্য। কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। বড় বেশি এবং বড় বাজে কথা বলা হয় এই পৃথিবীতে। যার নব্বুই ভাগ বলা এবং শোনা না হলে এই জায়গাটি মানুষের বাসের পক্ষে অনেকই বেশি উপযুক্ত থাকত।

গিরিশদার কথা মনে হল। কাল দুপুরে ভোজ যা খাওয়ালেন তার তুলনা নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

অন্য কথা, মন খারাপের নয়, মন ভাল হওয়ার ভাবনা, ভাবতে চাইল ও।

আজ ভোরে এক অচেনা, অজানা, অনিশ্চিত জীবনের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মনকে একেবারেই ভারাক্রান্ত করতে চায় না পৃথু।

ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। মাথাটা বাসের দেওয়ালে ঠুকে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। রাত বিজ্‌লীর বাড়ি থেকে ফেরার পর যতটুকু বাকি ছিল, তা তো গোছগাছ করতেই গেছে। চোখের পাতা এক করেনি একবারও। বিজলীর বাড়ি থেকে ফিরেওছে প্রায় একটার সময়। শরীরটা তো এখনও অসুস্থই! একটু জ্বর ভাবও হয়েছে। কাটা পা-টা মাঝে মাঝেই থর্‌থরিয়ে কেঁপে ওঠে। অসহ্য যন্ত্রণা হয় তখন। পা-টা যেন কী বলতে চায় পৃথুকে, যে সব কথা সে কর্তিত হওয়ার আগে বলে উঠতে পারেনি ; অথচ ইচ্ছা ছিল খুবই বলার।

মুক্কিতে সামান্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই বাসটা ছাড়ল আবার। মুক্কির পরেই সান্‌জানা সাহেবের বাড়ির ঠিক সামনেই দেখে ঠুঠা বাইগা দাঁড়িয়ে আছে আর দেবী সিং পায়চারি করছে। সানজানা সাহেবের কোনো কর্মচারীর পরিবারও বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। দু'জন মহিলা, একটি শিশু এবং খাঁচার মধ্যে একটি ময়না পাখি। ময়না, শেখানো বুলি বলল, সারভিস্, রোক্কো রোক্কো!

বাসসুদ্ধ লোক হেসে উঠল।

ঠুঠাকে দেখেই, পৃথু চেঁচিয়ে ডাকল। মনে হল, শুনতে পেল না ঠুঠা। পৃথু যে একদৌড়ে নামবে বাস থেকে তা তো আর হবার নয়!

দেবী সিং শুনে দৌড়ে এল। বলল, কোথায় চললেন আপনি ?

সীওনী।

আজই যে আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম হাটচান্দ্রায়। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল।

যেও না সেখানে। এখন থেকে আমার ঠিকানা সীওনী।

তারপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঠুঠার দিকে চেয়ে বলল, ঠুঠা বাইগা ?

দেবী সিং বলল, সেই-ই তো কথা! ঠুঠার কী হবে ? চাকরিও ত' ছেড়ে দিয়ে এসেছে, প্রাণটা কোনোক্রমে বাঁচিয়েছি আমি। ও তো বলে, আপনার জন্যেই এখন ওকে বেঁচে থাকতে হবে। আপনার একমাত্র গার্জেন নাকি ও।

পৃথু বলল।

এখনই বাসে তুলে দাও।

পৃথু বলল।

ওর যে জিনিসপত্র আছে কিছু। সারা জীবনে, বান্‌জার নদীর বুকের মধ্যে মধ্যে গড়িয়ে-চলা পাথরের গায়েও কিছু শ্যাওলা জমেই।

দেবী সিংয়ের উপমাতে চমকে উঠল পৃথু। জীবনানন্দ কি ঠিক বলেছিলেন ? সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি ? কবি বোধহয় সকলেই। কেউ পাতায় লেখে, কেউ কথায় লেখে ; কেউ বা লেখে মনে মনে।

অন্যমনস্ক পৃথু, দেবী সিংকে বলল, তবে কালকের বাসেই তুলে দিও ওকে। আমি নিজে

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে নিয়ে যাব।

আপনার ঠিকানা সাহাব?

জানি না আমি।

ঠিকানা জানেন না মানে?

দেবী সিংয়ের এই কথাতে বাসসুদ্ধ লোক পৃথুর দিকে তাকাল।

সত্যি জানি না এখনও। তবে ঠিকানা একটা জুটবেই। মানুষের ঠিকানা না থাকলে যে উপায় নেই কোনো। সেজন্যে কোনো চিন্তা কোরো না। কাল ঠুঠাকে পাঠিয়ে দিও। টাকা দিয়ে যাব কিছু?

টাকা আছে। ঠুঠার নিজের টাকাই আছে। তবে ···

কথা শেষ হল না। বাসটা সেই দুই মহিলা, এক পুরুষ, তাদের মালপত্র এবং ময়না পাখিকে তার পেটের খোলে ভরে নিতেই কনডাকটর বাঁ পায়ে এক লাথি মারল বাসের ঘাড়ে। বলল, ওকে উস্তাদ।

বাসটা ছেড়ে দিল।

কথা শেষ হবার আগেই বাহন যে ছেড়ে দিতে পারে, এমন অভিজ্ঞতায় পৃথু অভ্যস্ত ছিল না কখনও। চিরদিনই গাড়ি বা জীপেই যাতায়াত করেছে। বুঝতে আরম্ভ করল ও যে, নিজের আর্থিক জোর না থাকলে বা অন্যকে ভয় পাওয়ানোর ক্ষমতা না থাকলে জীবনের বহু ক্ষেত্রেই সেই মানুষের নিজের স্বাধীনতাকে একটু একটু করে বাঁধা দিতে হয়ই অন্যের হাতে। নিরুপায়েই। এই হঠাৎ-ছেড়ে-দেওয়া বাসটিই তার প্রথম প্রমাণ হয়ে এল একদা "সম্ভ্রান্ত" পৃথুর কাছে। অর্থ আর সম্ভ্রম এখন যে একাত্ম হয়ে গেছে।

সার্ভিসের বাস ড্রাইভারেরও কিছু করবার নেই। বাসের স্টিয়ারিং-আঁকড়ে-থাকা দুটি রোমশ হাতে অনেকই মানুষকে যে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক বিশেষ গন্তব্যে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সে মানুষটা স্বীকার করে নিয়েছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, গেঁহু-বাজরার বা ভাব-ভালবাসার আলোচনার জন্যে বাস থামালে তার চলে না। সমষ্টির স্বার্থের কারণে ব্যক্তির স্বার্থ যে সমর্পণ করতে হয়ই, এই কথাটা পৃথুকে চমকে দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ-ছাড়া এই বাসটি যেন বুঝিয়ে দিল। ব্যক্তির ছোট ঘেরাটোপের জগৎ থেকে সে যে সমষ্টির জগতে তার দেড়খানা পা নিয়ে জীবনের মাঝবেলাতে এসে প্রবেশ করল, এই কথাটা জেনে শিহরিত বোধ করল পৃথু। চলেছিল বাসে বসে, ভাবতে ভাবতে পৃথু। একজন কবি অথবা কবি-ভাবাপন্ন মানুষের জীবনে বোধহয় কোনো উপলব্ধিই ফেলা যায় না। সুখ, দুঃখ, সম্মান, অপমান, অভ্যর্থনা ও উপেক্ষা সবকিছুই তার জীবনকে, তার অভিজ্ঞতাকে যে সমৃদ্ধ করবেই, সেই আলখাল্লা-পরা বুড়ো যেন হঠাৎই বলে উঠল ওর বুকের মধ্যে থেকে, "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পাদপরশ তাদের পরে।"

ঠুঠা বাইগাকে দেখে আদৌ স্বাভাবিক মনে হল না পৃথুর। ও এমন চোখে চাইল পৃথুর দিকে, যেন তাকে সে চেনেই না আদৌ। চোখের দৃষ্টি ঘোলা। তার চারদিকের কোনো দৃশ্য, শব্দ বা গন্ধই যেন তাকে আর স্পর্শ করছে না। সে যেন তার সমস্ত অনুষঙ্গকে অবহেলায় অগ্রাহ্য করার এক দৈবী ক্ষমতায় ঋদ্ধ হয়েছে।

চমৎকার দৃশ্য কিন্তু পথের দু'পাশের! ছোট ছোট গ্রাম। মাঝে দু' একটি জায়গাতে কলকারখানা হয়েছে ছোটখাট। আদিবাসী এলাকা এসব। পথের দু'পাশে মাথা উঁচু পাহাড়। লাল-নীল নদী। মাইলের পর মাইল জনবসতিহীন গভীর নিবিড় অরণ্য। পাহাড়চুড়োয় উঠেই আবার উপত্যকায় গড়িয়ে গেছে।

পারিহার সাহেবের হেড কোয়ার্টার্স সীওনীতেই হবে কি? পারিহার সাহেব ছাড়াও, কান্তি দিসাওয়াল্ আছেন এখানে। বিড়িপাতার বড় কারবারী। লাক্ষার কারবারী মুঙ্গেশ শুক্ল ত আছেনই! আজ রাতটা তাঁদেরই কারো আশ্রয়ে থেকে তারপর থেকে নিজস্ব একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

আসলে, ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, হাটচান্দ্রা ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্তটি যে কাউকে এক লাইন লিখেও জানাবে তাও পারল না আগে। আগে জানিয়ে এলে, কেউ নিতেও আসত হয়ত বাস স্ট্যাণ্ডে।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে নিল সব যাত্রীরা বালাঘাটের শেষ প্রান্তের এক দোকানে। বেলা বারোটাতে যখন বাস থামল। ভাত আর শুয়োরের মাংস ঝোল খেল পৃথু, পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। ভুচুকে সত্যি মিস্ করছে এখন। লক্ষ্মণের মতো অনুজ বোধহয় একেই বলে! ভুচু থাকলে কত আদর করত! কতবাব পান খাওয়াত। খাওয়ার আগে বলত, একটা চুরুট দিই তোমাকে বানিয়ে?

খাওয়া দাওয়ার পর পাশের দোকান থেকে পান কিনল দুটো। জর্দা দিয়ে খেলও। কিন্তু ভাল লাগল না। ফেলে দিল মুখ থেকে। মনে হল পৃথুর যে,পান শুধু মিষ্টি বা কলকাতা পাত্তি হলেই ভাল হয় না, সঠিক পরিমাণে চুন খয়ের বা এলাচ জর্দা পড়লেও হয় না। আসলে, তাব মধ্যে বোধহয় ভালোবাসাও মুড়ে দিত ভুচু বা গিবিশদা বা সাবীব সাহেব অথবা শামীম। ওদেব কথা মনে হতেই মনে হল পুরুষের গভীর সখ্যতার মতো বোধ বোধহয আব কিছু নেই। পুরুষেব সঙ্গে একমাত্র অন্য একজন পুরুষেবই নিঃস্বার্থ ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে · যদি ওঠে।

একজন মোটা-সোটা লোক এক ছড়া কলা দিয়ে খাওয়া সারছিল। চেহাবা দেখে মনে হল, মাড়োয়ারী। এই ভদ্রলোকেরা নিজেদেব খাওযা-দাওয়াব ব্যাপারে বডই সাবধানী। পথে বেবিয়ে, কী ট্রেনে, কী বাসে, ফলমূল ছাড়া অন্য কিছুই খান না এঁরা। রান্না-করা খাবারের তেলে, ঘিতে, আটাতে, ময়দায়, চালে ডালে, মশলায় যে ভেজাল থাকেই সে সম্বন্ধে এঁরা এত নিঃসন্দেহ কী করে যে হন তা জানার কৌতূহল হয পৃথুর মাঝে মাঝেই।

দোকানটার সামনে বেঞ্চে বসে ভদ্রলোক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটাব পব একটা কলা খেয়ে যাচ্ছিলেন, চোখ তাতেই নিবদ্ধ করে। এমন সময় দামড়া, মাস্তান এক হনুমান লম্বা লেজ নিয়ে একলাফে উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে লাফিয়ে এসে কলার ছড়াটা কেড়ে নিল। সম্পত্তি নাশের আশংকায় কিছু মানুষ সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হন। উনিও তাই-ই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁব মধ্যে প্রকৃত দর্শন জাগাবার জন্যেই বোধহয় হনুমানটি মারল এক জব্বর থাপ্পড় তাঁর গালে। হায় রাম! বলে, গালে হাত দিয়ে বেঞ্চ থেকে পড়ে গেলেন ভদ্রলোক। একজন প্রকৃত রামভক্তের সঙ্গে হনুমানজী এমন ইনকামট্যাক্স্ ডিপার্টমেন্টের মতো ব্যবহার করবেন এটা বোধহয় তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল।

পৃথুর সাবীর মিঞার কথা মনে পড়ে গেল। একদিন রামভক্ত দিগাপাঁড়ের হাত থেকে এমনি করেই হনুমানে কলা নিয়ে যাওযাতে রসিক সাবীব মিঞা অধিক হতচকিত দিগাকে ততোধিক দুঃখিত করে দিগাব কাছ থেকেই শেখা একটি মানসমুক্তাবলী আউড়ে দিয়েছিলেন

"মঞ্জুল মঙ্গল মোদময় মূরতি মারুতি পূত।

সকল সিদ্ধি কব কমল তল সুমিরত রঘুবর দুত॥

অর্থাৎ, শ্রীরামচন্দ্রর দূত পবন-নন্দন হনুমানজী মনোহর মঙ্গল এবং আনন্দর মূর্তি। তাঁকে স্মরণ করতেই সমস্ত সিদ্ধি করতলগত হয়।

বাস ছাড়ল আবার। পৃথু ফাঁকা-বাসে হাটচান্দ্রাতেই ড্রাইভারেব পেছনে প্রথম সীট দেখে বসেছিল। যাতে ক্রাচ্-টাচ্ নিয়ে আরামে বসতে পারে একটু। ক্রাচ্ দুটো সবসময় কাঁধে রাখাতে কাঁধের হাড় টনটন করছে।

এখন পথের দুধারে কাটাং-বাঁশ আর ছোটা-বাঁশ এর জঙ্গল। জঙ্গলে জঙ্গলে ধাওয়াই ফুটেছে লালে লাল হয়ে পথের দু পাশের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ফায়ার লাইনের জন্যে কাটা নালার পাশে। লণ্ডিয়া, এখন শেষ হয়ে গেছে। বড় বড় সুপুরীর মতো দেখতে। তরকারী করে খেতে বেশ লাগে। লভেরা ফোটবার সময হয়েছে। লট্‌কার মত। হররাও। বাঁদরে হনুমানে আর মানুষে সমান ভালবাসায় খায় হররা। হজমীর কাজ করে। কাশিরও ওষুধ। কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে তারপর

কালো হয়ে যায় পাকলে। এ দিয়ে বঙ তৈবী কবে গোন্দ বাইগা কুর্মি পান্‌কারা, বাড়ি—ঘব বাঙায় হালকা হলুদ রঙে। এসব নানা ফলমূল কাজে লাগে এই গরীব-গুরবোদের বর্ষাব সময়েই বেশি। তখন অন্য সব্‌জী ত কিছু থাকে না! এই সবই খেয়ে থাকে বলতে গেলে জঙ্গলেব লোক। পিহিরি বা কুকুরমুত্তায় ছেয়ে যায় শালবনের নিচের সবুজ অন্ধকার। লালচে, ক্ষযেরী, সাদা কালো এই সব ব্যাঙের ছাতার স্বপ্নিল ফুলেব মতো ফুটে থাকে তখন।

মাশরুম্‌স্‌।

লছমাব সিং খুব ভাল স্যুপ কবত, চিকেন উইথ মাশরুম এর মনে পড়ে গেল পৃথুব। কিন্তু এই সব মাশরুম কোনোদিনও রুষা ছুঁতোও না। সে বম্বে বা জবলপুব বা ভোপাল থেকে আনাত।

বর্ষার সময় পুট্‌পুরাও হবে। আষাঢ় শ্রাবণে। এও শালবনের নিচে নিচে হয। খেতে ডিমসেদ্ধব মতো। যেন, মুরগীর ডিম। গবীবেব কাছে এই-ই কুক্কুটাণ্ড। সোর্স্‌ অফ্‌ প্রোটিন।

আকাশে মেঘ কবে আসছে। ঘন কালো মেঘ জমছে পরতের পর পবত কচি-কলাপাতা-রঙা জঙ্গলেব মাথার উপরে, চাঁদোযাব মতো। দবাগত মাদলেব আওয়াজের মতো গুগুম-গুগুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। উর্বশীরা মেঘেব গালচেব উপব নাচ শুরু কববে যেন কিছু বাদে। তারই প্রস্তুতি চলেছে। বাসটা যতই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ঘন জঙ্গল আব পাহাড়ের মাঝেব আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে, ততই দ্রুত পেছনে ফেলে আসছে পৃথু তার অনেক স্মৃতি, পরিচিতি, উষ্ণতা, বোবা-বোধকে। রুষা, মিলি, টুসু, গিরিশদা, ভুচু, সাবীব সাহেব, শামীম, লালু, দিগা পাঁড়ে, বিজলী, আজও কত মানুষকে। ফেলে আসছে চেনা নাম। এখন চাবধাবে সাজা, শাল, ধাওযা, হাবরা, বহেড়া, কাসসী, কুর্হমি, বেল, চাঁর, জামুন, বুনো চাঁপাব গাছ। মঙ্গলার ঝাড।

ভোঁর আর ছিঁর ঘাসেব বিস্তীর্ণ মন-উদাস করা তৃণভূমি কিন্তু এখানে নেই। সেই সবই বয়ে গেল কানহা-কিসলীর জঙ্গলে। মেমসাহেবের মতো ফর্সা বানজাবের বালি বেখা, কালো মেয়ে হাঁলোব জলবাশি। সিমবাহি, খাড়াবি, ইনকোব, গৌন্দলা, বাঘমাব আব ঘঙ্গার নালাকে, যারা কান্‌হা-কিসলিব বিধুর বিধবার পোষাকেব মতো মলিন সাদা পথটিকে কেটে কেটে বয়ে গেছে ঘন অবণ্যেব গভীরে গভীরে।

ঘন কালো মেঘের পটভূমিতে এক ঝাঁক সাদা বক হাওযাব তোড়ে দুলতে-দুলতে, উঠতে-নামতে, কাঁপতে-কাঁপতে উড়ে যাচ্ছে পূব থেকে পশ্চিমে। "মেঘের কোলে কোলে যায় বে চলে বকের পাঁতি ওরা ঘর ছাড়া ; ওরা ঘর ছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি আজ গাঁথি গাঁথি/ মেঘের কোলে কোলে যায় বে চলে বকের পাঁতি-ই-ই-ই।"

বিছিযা, চিল্‌পি, নাইন্‌পুব, সোন্ধাব, আওরাহী, সুফ্‌কব, সেথাডোংবি, কত চেনা নাম সব মস্তিষ্ক থেকে সরে যেতে যেতে নতুন এক জগতের জন্যে জায়গা খালি করে দিচ্ছে। চেনা জঙ্গলেব গোন্দ বাইগাদেব সব দেবতাবাও, মাবাই দেবী, ধারোয়া, সাইসাম্‌, ইযাম্‌, উইকে। বডাদেও, কুসুরে দেও। নাঙ্গা-বাইগা নাঙ্গা বাইনীন্‌। বান্‌জার-এর বুক আলো-করে ফোটা গান্ধালা আব গাংগারিয়া ফুলের হাসি, সবই যেন পিছনে মিলিয়ে যাচ্ছে, ফেড-আউট করার মতো।

কুর্চি ?

কুর্চি এখন কি করছে ? সীওনীর কোথায় আছে কুর্চি ? পৃথু তাকে খুঁজতে যাবে না। সে যদি জানতে পেরে খুঁজতে আসে, ত' খুঁজবে। অনেক অভিমান জমে আছে পৃথুর তার ওপরে। এই ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়া এই বোকা-বোকা অন্ধ ভালবাসার দাম কি ? এত লোকে তাকে হাসপাতালে দেখে যেতে পাবল, শুধু পারল না সেই-ই ! ঠিকানা পর্যন্ত না জানিয়ে এই চিঠি-খেলার মানে পৃথুর বোঝাবুঝির বাইরে।

পৃথুর শরীরের জ্বরটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। বেড়ে, চারিয়ে যাচ্ছে মনের ভিতরে ধীবে। বেশ বুঝতে পারছে পৃথু। কর্নেল সিং বলেছিলো যে, হাসপাতাল থেকে ফিরেও মাসখানেক যথাসম্ভব কম স্ট্রেইন করতে। অথচ, চূড়ান্ত করেছে ও ফেরার পর মুহূর্ত থেকেই। শবীরের জ্বরের সঙ্গে মনের জ্বরটাও বাড়ছে বাসটা যত এগিয়ে যাচ্ছে সীওনীর দিকে।

হঠাৎই মনে হল, এমনও ত' হতে পাবে যে, বাস থেকে নেমেই দেখা হয়ে গেল কুর্চিব সঙ্গে। কুর্চি পৃথুব কনুই ধবে তাকে তাব বাড়িব দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল, অন্য কোথায় উঠবেন আপনি পৃথুদা? আপনি কি পাগল নাকি?

কুর্চিকে দেখেই পৃথুব সমস্ত চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেই একটা শেব আছে না? "উনকো দেখনেসে চেহেবেপে যো আ যাতি হ্যায় বওনক্ ও ইয়ে সমঝতে হ্যায় কি বিমাব ক্যা হাল আচ্ছা হ্যায়।"

ওকে দেখলেই আমাব চোখেমুখে উজ্জ্বলতা আসে, আব তাই-ই দেখে ও ভাবে, আমাব সব অসুখই বুঝি ভাল হয়ে গেছে।

আসীক আব মাশুক দুজনেব বেলাতেই এই শেব সমানভাবে প্রযোজ্য।

তাই-ই কি হবে?

স্বপ্নেব পুলাউতে ঘি ঢালে পৃথু দবাজ হাতে। জ্ববে এবং পায়েব যন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে।

চাবদিকে ঘনান্ধকাব নেমে এসেছে। যে হাওয়াটা, বকেব পাঁতিকে কুন্দফুলেব মালাব মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল পাহাড়চূড়ো পাব কবিয়ে অন্য পাহাড়চূড়োয়, সেই হাওয়াটাই মেঘপুঞ্জকে না উড়িয়ে বিন্ধ্য, এবং সাতপুবা পর্বতমালাব আব মাইকাল পাহাড় শ্রেণীব বুকেব সব কালিমাই যেন উড়িয়ে নিয়ে এল উড়াল মেঘ কবে।

জানালাব ফ্রেমে মাথা বেখে পৃথু ঘুমিয়েই পড়েছিল। তাব আগেই কাচ উঠিয়ে দিয়েছিল অবশ্য। বৃষ্টিব পুটুব পুটুব শব্দ আব হাওয়াব সোঁ সোঁ আওয়াজ তাব জ্বকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছিল আবও। ঘোবেব মধ্যেই ছিল পৃথু।

বাসটা কখন থেমে গেছে জানেওনি। যখন যাত্রীদেব কোলাহল, ছাদেব উপব দুপ-দাপ্ কবে কন্ডাক্টবদেব দৌড়াদৌড়ি কবে মাল নামানোব শব্দ এবং বাস-স্ট্যাণ্ডেব নানা মিশ্র আওয়াজ ওব কানে পৌঁছল তখনই চোখ খুলল ও।

ড্রাইভাব বলল, হ্যাণ্ডিম্যানকে, আববে এ শ্রীকান্ত, উও ল্যাংড়া মালুম হোতা কি বাসমেই বহ যায় গা বাত ভব। উঠাও উসকো।

পৃথু খুবই উত্তেজিত বোধ কবল। ভাবল, এই অ্যাবোগ্যাণ্ট্ ড্রাইভাবটা কি জানে যে, কাব সম্বন্ধে এ সব বলছে সে? বিলেতে লেখাপড়া-কবা, সাহেবী হাটচান্দ্রা শেল্যাক কম্পানীব ঘোষ সাহাব যে এই ল্যাংড়া মানুষটি, তা জানলে কি তাব এমন সাহস হত?

পবক্ষণেই নিজেকে সংযত কবল। সেই ঘোষ সাহাব ত' মবেই গেছে। চেয়াব নেই, উর্দি পবা ড্রাইভাব নেই, পবমা সুন্দবী উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী নেই, সম্পত্তি নেই কোনো। সে এখন শুধুই পৃথু। অথবা পবিচিতদেব কাছে পৃথু বাবু। বাইবে টিপ্ টিপ কবে বৃষ্টি পড়ছে। শীত কবছে বেশ। বাবাব কাছে শুনেছিল যে, সীওনীব উচ্চতা প্রায় দেড় হাজাব ফিট মতো হবে। তাব উপব এই প্রথম বসন্তেব বৃষ্টিব সঙ্গে কোনো গবম জামাও বাখেনি। জ্বব আজ ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে।

দুজন লোকেব মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ও ভাবল প্রথমে মুঙ্গেশ শুক্লব কাছেই যাবে। হাটচান্দ্রা শেলাক কোম্পানীব সঙ্গে ওঁব একসময় অনেকই লেনদেন ছিল। শেষ টাকাব একটা বিল আটকে বেখে ছিল ইম্‌ম্যাটেবিয়াল ম্যানেজাব শর্মা। পৃথুই উধাম সিং সাহেবকে বলে সেই বিল পেমেন্টেব বন্দোবস্ত কবে দিয়েছিল মাস ছয়েক আগে। স্বাভাবিক কাবণেই, মুঙ্গেশ শুক্লব কিছু কৃতজ্ঞতা থাকবেই।

মাটি ভিজে গেছে। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে মাটি থেকে বহুমাস পব বৃষ্টিব সঙ্গে প্রথম সঙ্গমে। হাওয়াতে বনেব স্তনসন্ধিব গন্ধ। ভেজা মাটিতে ক্রাচ নিয়ে তাব এই প্রথম হাঁটা। ক্রাচেব সঙ্গেও বৃষ্টিবও এই প্রথম পবিচয়। অসুবিধে হচ্ছে। বাবাবেব তৈবী ক্রাচ-এব জুতো দুটো মাটি মাখামাখি হয়ে গেল। তা হোক।

মাল-বওয়া লোকটিই বলে দিল যে। মুঙ্গেশ শুক্লব বাড়ি কাছেই। ভালই হল। চলতে লাগল

পৃথু। পেছন থেকে কে যেন হঠাৎ চিকন গলায় ডেকে উঠল, বাপু।

খমকে দাঁড়াল ও।

টুসু ?

বুকের মধ্যে কী যেন গলে গেল। কী যেন যেন নয়, পুরো বুকটাই যেন গলে গেল। থরথর করে দেড়খানা পা-ই কাঁপতে লাগল। চমকে তাকাল ও পিছনে।

মাল-বওয়া লোকদের মধ্যে একজন বলল, রোক গ্যয়া কাহে ল্যাংড়া বাবু ? জলদি চালিয়ে। পানিসে হামলোগোনে পবিসান হ্যায়।

পৃথু দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনে চেয়ে রইল। হ্যাজাক জ্বলছে একটা ছিট কাপড়ের দোকানের বারান্দায়। প্রথম বৃষ্টির আদর সমস্ত অরণ্যকে গর্ভবতী করে দিয়েছে। তাই অসংখ্য ছোট ছোট সবুজ পোকা এসে হ্যাজাকের অভ্রর ঘেরাটোপের উপরে আছড়ে পড়ে মাথা কুটছে আগুনে পুড়ে মরবার জন্যে। জন্মের আনন্দ, ওরা মৃত্যু দিয়েই উদ্‌যাপন করতে চায়। একমাত্র প্রকৃতিই জানে এইসব গোপন প্রেক্ষাপটের জন্ম মৃত্যুর কথা।

একটা ছেলে, টুসুরই বয়সী, চোখে কেতুর, নাকে সর্দি, গায়ে জামা নেই, দোকানের অন্ধকার অভ্যন্তরে তাকিয়ে আবার ডেকে উঠল, বাপু।

সেই ছেলেটির বাবা অন্ধকার থেকে আলোয় এসেই এক থাপ্পড় কষাল ছেলেটির নরম গালে। বলল, আমি ক্যাশ মিলাচ্ছি এখন। তোর আর বাপু বাপু করবার টাইম হলো না।

পৃথুর গলে-যাওয়া বুকে সেই দোকানীর থাপ্পড়টা বর্শার ফলার মতো এসে বিঁধল।

ভাবল, বলে কিছু। তারপরই ভাবল, যে নিজের ছেলেকেই ভালোবাসার জোরে নিজের কাছে রাখতে পারল না, চলে আসার আগে একবার চোখের দেখা দেখতে পর্যন্ত পারল না ; তার কীই বা অধিকার আছে অন্যর অপত্য সম্পর্কে প্রবেশ করার ?

মুঙ্গেশ শুক্ল নাগপুরে গেছেন তার বড় ছেলে বলল। পৃথু পরিচয় দিয়ে বলল, আজকের রাতটা কি এখানে ও থাকতে পারে ?

ছেলেটি পোষাকে-আশাকে আধুনিক। এমন পাণ্ডব-বর্জিত জায়গাতেও তার পরণে টেরিলীনের দামী জামা-প্যান্ট। থ্রী-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টরে ফিল্মী গান শুনছিল ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে বসে। সে বলল, বাবা নেই, আমি আপনাকে চিনি না, তাইই সম্ভব নয়।

ওঃ। আচ্ছা। বলে, পৃথু সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবল কান্তি দিসাওয়াল-এর কাছেই যায়। কিন্তু হলো না। মুঙ্গেশ শুক্ল নাগপুর থেকে ফিরে এসে তাঁর ছেলেকে খুব একচোট শাসন যে করবেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না ওর। তিনি হয়ত মাপই চাইতে পাঠাবেন ছেলেকে পৃথুর কাছে। তবু এর পরও অনেক কম-জানা দিসাওয়াল সাহেবের কাছে না-যাওয়াই সাব্যস্ত করল।

মাল-বওয়া লোকেরা বলল, দিসাযাল সাহেবের বাড়ি অনেকই দূর। এই বৃষ্টিতে অতদূর যেতে পারবে না তারা। পৃথুও চিন্তিত ছিলই। আর কিছুর জন্যে নয় ; ওর বইগুলোর জন্যে। বৃষ্টিতে যদি ভিজে যায় সেগুলো ?

জিগগেস করল, রাতটা কাছাকাছি কোথাও থাকা যায় না ?

ওরা বলল, দু কদম গেলেই এক সর্দারজীর ধাবা আছে। অনেকই জায়গা সেখানে। ট্রাক ড্রাইভাররা সার সার শুয়ে রাত কাটায়। চৌপাইয়ে শুয়ে আপনিও রাতটা কাটিযে দিতে পারেন আরামসে। কাল সকালেই যা করার করবেন। এখন আমাদের ছেড়ে দিন।

পৃথু বলল, তাইই চলো।

তার মাথা ভর্তি চুল, দাঁড়ি, গোঁফ, জামা-কাপড় সবই ততক্ষণে ভিজে চুপচুপ করছিল। ওষুধও খাওয়া দরকার। জ্বরটা মনে হচ্ছে অনেকই। তার উপর পায়ের ব্যথাটাও সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। এক জান্তব বিদ্রোহর মতো কাটা-পাটি দুলতে দুলতে চলছিল। টনটন করছিল ব্যথায়।

মালপত্র নামিয়ে দিয়ে দশ টাকা নিয়ে চলে গেল ওরা দুজনে। দরদাম করবে ভেবেছিল প্রথমে। এখন থেকে প্রতিটি পয়সা বুঝে-শুনেই খরচ করতে হবে। কিন্তু করল না। অথবা পারল না।

বৃষ্টিতে অনেকই ভিজেছে মানুষ দুটি। মালও নেহাৎ কম নয়।

সর্দার ইন্দার সিং ধাবার মালিক। চোঙাওয়ালা অ্যান্টিক গ্রামোফোনে যেরকম গ্রামোফোন বহু বছর দেখেইনি পৃথু, কারো বাড়িতেই ; কমলজিৎ কৌর-এর রেকর্ড বাজছিল উঁচুগ্রামে।

সর্দার বলল, কোঈ ফিক্কর মত কিজীয়ে বাবুজী। হামারা হিঁয়া আরাম জারা কম হ্যায়, মগর পেয়ার কাফি হ্যায়। ক্যা পীজিয়েগা ? বীর দুঁ ?

বীর্ ?

অবাক হল পৃথু। বীর্ বলে কোনো পানীয় যে আদৌ আছে তা এই বীরের জাতের মুখেই প্রথমবার শুনল।

চৌপাইয়ে দেড়-পা উঠিয়ে বসে পৃথু বলল, বীর ? বীর ক্যা চিজ ?

বীর নেহি জানতেঁ আপ ? অজীব আদমী। আরে এ ছোকরা। সাবকো বীর দিখলাও।

একটি অল্পবয়সী ছেলে বীয়ারের বোতল নিয়ে এল।

পৃথু বলল এখন বুঝলাম। কিন্তু আমার জ্বর। বীয়ার খাবো না।

তব ক্যা দুঁ ? মহুয়া ?

কখনও খায়নি পৃথু। বলল, আর কিছু কি আছে ? ব্রাণ্ডি ? আমার জ্বর।

সর্দার ইন্দার সিং বলল, না নেই। আমার নিজের রাম আছে। আর্মির রাম। জওয়ান আর ঘোড়া খায়। দু পেগ খেয়ে আমার এখানের আণ্ডা-তড়কা আর তন্দুরী চিকেন সাঁটিয়ে শুয়ে পড়ুন। গোড় দেবে দেবার ছোকরাও দিয়ে দেব একটা। তাছাড়া আপনার ৩ সিকি খানা গোড়। ঝামেলা কম।

তথাস্তু। বলে পৃথু স্যুটকেস খুলে ফুলহাতা পুলোভার বের করে পরে নিয়ে ক্রাচ দুটি পাশে রেখেই শুয়ে পড়ল।

সর্দারজীর ছোকরা রাম-এর গ্লাস নিয়ে এল দুটি সেঁকা পাঁপড়ের সঙ্গে। শরীরের ক্লান্তি, জ্বর এবং নিজের উপর এক গভীর বিতৃষ্ণায় এক চুমুকে শেষ করে দিল সেই গ্লাস।

ইন্দার সিং বলল, এ ছোকরা ফিন লাও। ঔর হিসাবভি রাখনা কিতনা দফে দিয়া।

পয়সা নেবে তাহলে সর্দার ? পৃথু ভেবেছিল, ভালবেসে খাওয়াচ্ছে।

এইই ভাল। ভালবাসা, যতটুকু পয়সা দিয়ে কেনা যায় ততটুকুই থাকে। বিনা পয়সার ভালবাসার উপর জোর থাকে না একটুও।

ছেলেটি আবারও এনে দিল। ওষুধ বের করে তার সঙ্গে ক্রসিন আর রেফাগানও গিলে ফেলল রাম দিয়ে। বলল চারটে খাব। তারপর খাবার আনবে। আমি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব। বহুতই থকা হুয়া হ্যায়। আমার মাল-পত্রর জিম্মাদারী তোমাদেরই।

ছেলেটি কি বুঝল বোঝা গেল না। মাথা নাড়ল দুবার।

সর্দার কি বুঝল পৃথুর দিকে একবার চেয়ে তার চট-জলদি রাম গেলা দেখে হেসে বলল, "কিউ কৌসরতক্ মুসাফৎ তয় করে/ ম্যায়কাদা ফিরদৌস্সে নজদিক হ্যায়।"

পৃথু হেসে গ্লাসশুদ্ধু ডান হাত তুলে আদাব জানাল। রসিক মানুষ, অন্য রসিককে ঠিকই চিনে নেয়। কৌসর নদী পেরোলেই নাকি ফিরদৌস, অর্থাৎ বেহেস্ত বা স্বর্গ। সব মুসলমানই জানেন। কিন্তু কৌসর নদী পেরিয়ে অত কষ্ট করে স্বর্গে যাবার দরকারটা কি ? স্বর্গ বা ফিরদৌস এর চেয়ে অনেকই কাছে ঃ ম্যায়কাদা অথবা ম্যায়খানা, সেখানে পৌঁছে গেলেই ঃ হল।

হাসল বটে। আদাবও করল, কিন্তু পৃথুর শরীর মনের অবস্থা তখন এই মাতাল ও মদের স্তুতিভরা কথা নিয়ে মাতামাতি করার মতো ছিলো না।

কোনো ট্রাক এসে থামছিল। কোনো ট্রাক নাগপুর বা জবলপুর বা লামটার দিকে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছিল মার্সিডিস এঞ্জিনের ধড়ফড় আওয়াজ তুলে। কমলজিৎ কৌর-এর গানের সঙ্গে শিখ মরদদের বোলি, আর উরত ডালের তড়কার গন্ধের সঙ্গে বৃষ্টিভেজা রাতের মিলে-মিশে যাওয়া গন্ধর মধ্যে অত লোকের মাঝখানে চৌপাইয়ে বসে থেকেও বড় নির্জন বোধ করছিল পৃথু।

ও মনে মনে বলল, রাম-এর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে, "ক্যা ইসীলিয়ে তকদিরনে চুনওয়াসে

তিনকে/ কি বন য্যায়ে নেশেমন ত কোঈ আগ লাগা দে" ?

এই জন্যেই কি ভাগ্য একটি একটি করে তৃণ-কুটো ঠোঁটে করে এনে এনে নীড় বানিয়েছিল ? এই নেশেমন ? এই নীড় গড়ে তোলবার পরে কেউ তাতে আগুন লাগিয়ে দেবে বলেই ? এই জন্যেই ?

ভিনোদ ইদুরকার। পৃথু বলল, মনে মনে ভেবেছিলাম পুরোপুরি ক্ষমা করতে পেরেছি তোমাকে !

পায়ের যন্ত্রণা, জ্বর, কড়া আর্মি-রাম, আর মানসিক কষ্টে মুখ বিকৃত করে পৃথু বলল, না বলেই। পারিনি ভিনোদ। পারলাম না। নিজেকে যত বড়, যত উদার, যত নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তি বলে ভেবেছিলাম, আসলে আমি তা নই। আমি একজন সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষ। আদমী যতই অজীব হোক না কেন ; সে ত আদমীই বটে। তার পা হারানোর দুঃখও তাকে যেমন বাজে, তার নীড় তার "নেশেমন" আগুন লেগে পুড়ে গেলেও বাজে।

আবারও বৃষ্টি নামল। দমকে দমকে হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট আসতে লাগল। কাঁপতে লাগল পৃথু হিহি করে। সেই মুহূর্তে ওর মনে হল, হাটচান্দ্রা ছেড়ে এসে খুবই ভুল করেছে। যা ওর নিজের তাকে দাবী না করে, তাকে পুনর্দখল না করে এমন ঔদার্যের মুখোশ পরে চলে আসার মতো মূর্খামি আর হয় না। কিন্তু…

কিন্তু মুখোশ একবার পরলে মুখ দেখানোও যে যায় না আর।

চোখ দুটি জলে ভরে এল।

ছিঃ ছিঃ। পৃথু !

ধাবার সর্দার বলল, আররে এ ছোক্‌রা, বাম লাও বাবুকে লিয়ে।

পৃথুকে বলল, পিও সাহাব। জী ভরকে পিও। গম্‌ ডুবাকে পিও।

খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়ল পৃথু। চৌপাইয়ে। পাঁচটা বড় রাম খেয়েও ওর শীত করছিল। শীতে যখন মানুষকে তেমন করে পায় ; শরীরের শীতে বা মনের শীতে, তখন কিছুতেই কিছু হয় না।

একটা পথের কুকুর বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কুয়োতলায় ফেলে-দেওয়া পাঁঠার মাংসর হাড়, মুরগীর টুকরো-টাকরা, রুটি-তড়কার অবশিষ্টাংশ খুঁটে খাচ্ছিল। সে কাঁপতে কাঁপতে এসে পৃথুর আস্ত পাটিতে একবার তার কুকুর-গন্ধী ভেজা লেজটি বুলিয়ে দিয়ে চৌপাইএর নিচে শুয়ে পড়ল সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

শব্দ মরে গেছে এখন চারদিকে। রাত গভীর। ট্রাকের চলাচল এখন নেইই বলতে গেলে। শালকাঠের খুঁটির মাথায় ঝোলানো ন্যাংটো ইলেকট্রিক বাল্বটি বৃষ্টি-ভেজা হাওয়ায় দুলে দুলে এক ভৌতিক আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। পৃথুর ঘুম নেই। চোখ দুটো জ্বালা করছে জ্বরে। ওর মনে হচ্ছে চৌপাইএর নিচে শুয়ে-থাকা এঁটো খাওয়া উদবৃত্ত-চাটা নির্লজ্জ সম্মানজ্ঞানহীন কুকুরটারই মত হয়ে গেছে যেন নিজেও। পথ আর অনাদর আর অপমান এখন একসময়ের বিনয়-চাপা অহমিকারই মতো, তার গায়ের গন্ধ হয়ে জড়িয়ে থাকবে তাকে অনুক্ষণ। অশুচি, অভিশপ্ত হয়ে গেছে ও।

শব্দ করে হাই তুললো পাশের চৌপায়ার এক সর্দার ড্রাইভার। অন্য পাশের চৌপাইয়ে একজন ক্লীনার প্রচণ্ড শব্দ করে নাক ডেকে চলেছে। অথচ খুবই রোগা-পাতলা মানুষটি। উনুনের উপর এখন মিস্তিরী রুটি সেঁকে যাচ্ছে। আগুনে আটা পোড়ার মিস্টি গন্ধ ভেসে আসছে জঙ্গলের গন্ধর সঙ্গে মিশে হাওয়াতে। অনেক দূরে কে যেন কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে। একটি নারীকণ্ঠ। গোন্দ ভাষায় বিলাপ করছে। কে এই নারী ? রুষা, তুমি ? বিজলী কি ?

তিনদিক খোলা ছিরঘাসে ছাওয়া আচ্ছাদনের মধ্যে হিমেল হাওয়ায় শুয়ে শুয়ে পথু আবৃত্তি করতে লাগল নিঃশব্দে শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা। তার শ্বাসের মতো।

"সবাই সতর্ক থাকে দুপুরে বা মধ্যরাতে তুলে দেয় খিল পথের ভিখারি মা-ও ভাঙা ক্রাচে ভর করে বুঝে নেয় মাছির গুনুন আমারই সহজ কোনো প্রতিরক্ষা নেই চুরি হয়ে যায় সব বাক্স বই সামঞ্জস্য অথবা শুচিতা।

তাই পথে পথে ঘুরি, ফিরে যায় গৈরিক গোধূলি
এমন মুহূর্তগুলি চিতায় তুলেছি আজ চণ্ডালের মতো তবু কেন
আমি যদি এতই অশুচি তবে পথিকেরা আজও কেন জল চায় আমার দুয়ারে ?

এই কবিতাটির বইয়ের কথা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। তবে মনে পড়ছে, "পাঁজরে দাঁড়ের শব্দর" কবিতাগুলির কথা। পৃথুর অন্যতম প্রিয় কবিতা সেটি।

"পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে
নৌকোর গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ
জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে।

বৃত্ত আঁকা হয়ে গেছে বৃত্তের ভিতরে জল আঁকা জলের ভিতরে আমি আমার উপরে ওঠে জল,
ছোটো ছোটো ঘাত লেগে বৃত্ত ভেঙে বৃত্ত বেড়ে যায় আচম্বিত জলস্রোতে সমস্ত বৃত্তের অবসান।"

গায়ে কী যেন পড়ল পৃথুর। বোঁটকা গন্ধে গা-গুলিয়ে উঠল।

জ্বরে ঘোলা চোখ মেলে দেখল, সাড়ে ছ ফিট সর্দার ইন্দাব সিং কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে তার চৌপাইয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে ধাবার একটি জনপদ-কম্বল তার গায়ে সস্নেহে বিছিয়ে দিচ্ছে।

কৃতজ্ঞতায় পৃথুর গলা রুদ্ধ হয়ে এল। ঐ বদ-গন্ধ কম্বলটি দু হাতে শরীরের উপর টেনে নিল। আঃ কী আরাম !

চৌপাইর নিচে ভিজে কুকুরটা কুঁই কুঁই করে উঠল। আনন্দে, কী ঈর্ষায় বুঝতে পারল না।

সর্দার বিড় বিড় করে কী যেন বলল, পৃথুর পায়ের দিকটা ভাল করে কম্বলে ঢেকে দিতে দিতে।

পৃথু শুনল সর্দার ইন্দার সিং বলছে, "দরওয়াজ্ বন্দ না করো কোঈ আউন্দা হোভেগী।

বলেই, চলে গেল সর্দার।

কে জানে ? সর্দার এই তিনদিক-খোলা খড়ের ছাউনির কোন্ দরওয়াজার কথা বলল ? কার আসার কথা বলল ? ঠিক শুনল কি ও ?

কম্বলটা দিয়ে বুক গলা ভাল করে ঢেকে চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। এখন ঘুমোবে। এই সিক্ত, শীতার্ত, উষ্ণতাহীন পৃথিবীতে এখনও অনেক গভীর সহমর্মিতার সমবেদনার বোধ বেঁচে আছে।



সীওনীতে বেশ থিতু হয়েই বসেছে পৃথু সাতদিন হল।

যাঁর কাছ থেকে পৃথুর প্রত্যাশা ছিল, এবং হয়ত অন্যায্য কারণেও নয়, সেই মুঙ্গেশ শুক্ল, তাঁব ছেলেকে পাঠানো দূরে থাকুক, পৃথুব সঙ্গে একবাব দেখাও পর্যন্ত করেননি। হটচান্দ্রাব অফিসঘরে যে চেয়ারটিতে পৃথু বসত, সেই চেয়ারটির দাম যে পৃথু ঘোষের নিজেব দামের চেয়েও অনেকই বেশি তা এতদিন বুঝতে পারেনি। মানুষের চরিত্রর এক নতুন দিক উন্মোচিত হল ওর কাছে। অথচ, কান্তি দিলাওয়াল যে এতটা ভাল ব্যবহার করবেন তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

পৃথুকে দেখামাত্রই "স্যার" "স্যাব" করছিলেন ভদ্রলোক।

পৃথু বলেছিল, পৃথু বাবুই বলবেন। পৃথু যখন আর সাহেব নেই। থাকতে চায়ও না। উনি বললেন, একবার স্যার হলে অলোওয়েজ স্যার।

শুধু চমৎকার বাসস্থানই নয়, যথেষ্ট ভাল. আশাতীত একটা চাকরীও ভদ্রলোক পৃথুকে দিয়েছেন।

বলেছিলেন, ভগবানই আপনাকে পাঠিয়েছেন স্যাব। আমাব ম্যানেজার সাহেবের বাড়ি মাইহাব-এ। নাজিমুদ্দিন সাহেব। তাঁব একমাত্র ছেলে হঠাৎ মাবা যাওয়াতে চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি মাইহাবে চলে গেলেন গত শুক্রবাবে। সত্যিই ভগবান পাঠিয়েছেন আপনাকে।

মাইহাব মানে? উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এর মাইহার?

হ্যাঁ। দেখুন, তাই-ই লোকে বলে স্বদেশে পূজ্যতে, রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। শুধু পুজোই নয়, যে গুণী ব্যক্তিকে মাইহারের রাজাবা আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁদেরই আমবা ভুলে গেছি। টাকা থাকে না, ক্ষমতা থাকে না দুনিয়াতে, থেকে যায় শুধুমাত্র গুণ।

তা সত্যি। কিন্তু আমি কোন কাজে লাগব আপনার? বিড়ি পাতাব কাজ ত সীজনাল কাজ। গরমেব সময় জঙ্গল থেকে বিড়িপাতা সংগ্রহব কাজ ত এখন শেষই হয়ে গেছে। বিড়ি ত আব বানান না আপনাবা!

বিড়ি বানাই না, তবে আমার ত অন্য ব্যবসাও আছে। একটু আধটু সিভিল কনসট্রাকশানও কবছি। নানা ধরনের অর্ডার সাপ্লাই। মায়েব নামে একটা স্কুলও কবেছি এখানে। আদিবাসী ছেলেমেয়েদেব জন্যে এতদিন যা করার তা ত ক্রীশ্চান মিশনাবীবাই কবল, আমরা তাদেব নামে যাই-ই বলি না কেন। আমিও তাই বিনি-পয়সার স্কুল খুলেছি একটা। চারজন টিচাবও আছেন। গ্রাজুয়েট।

আমাকে কোন কাজে লাগবেন আপনি দিসাওয়াল সাহাব?

অনেকই কাজে লাগবেন। আপনি সবকিছুর, সব স্টাফেব উপরে থাকবেন। জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আব অ্যাকাউন্টসটাও একটু দেখবেন শুধু আপনার নামেই আমাব অনেক কাজ হবে এমনিতেই। এইখানে তো বটেই, অন্যত্র নাম ভাঙিয়ে।

অ্যাকাউন্টস। ভাল লোককেই বলেছেন। ও সব আমি কিছুই বুঝি না।

বোঝেন। বোঝেন। অ্যাকাউন্টস বোঝেন না এমন মানুষই নেই। যে-কোনো শহরের চৌমাথাব মোড়ে বসে থাকা জুতো-পালিশ কবা ছোকবা থেকে টাটা-বিড়লা-মালীযাবা সকলেই বোঝে। অ্যাকাউন্ট্যান্সীব চেয়ে বড় সত্য জীবনে কি আব কিছু আছে?

অবাক হয়ে পৃথু বলেছিল, তাব মানে?

তার মানে, এভরী ডেবিট হ্যাজ আ ক্রেডিট। জীবনেও কি এই একই নিয়ম খাটে না স্যাব? কিছু পেলে, কিছু দিতে ত হয়ই। কিছু দিলে, কিছু পাওয়াও যায় বদলে।

গম্ভীব হয়ে গেছিল পৃথু।

বলেছিল, প্রায় স্বগতোক্তিবই মতো, সব ক্ষেত্রেই কি এই নিয়ম খাটে?

কখনও কখনও খাটে না। না খাটলে, জীবনের ট্রায়াল-বালান্সেও ডিফারেন্স হয়। তখন সেই ডিফারেন্সকে ডেবিট বা ক্রেডিট করে দিতে হয় প্রফিট অ্যাণ্ড লস অ্যাকাউণ্টে। মুনিববাবুরা একে "খাইয়ে দেওয়া" বলেন। এত কিছুই নয়, কত বড় বড় পাওনা টাকা "পানিমে পানি হয়ে যায়", যখন তা পাওয়া যায়ই না, তখন তাকে "নাগাই" খাতে লিখে দিয়ে ভুলে যাওয়া হয়। আপনাব ও আমার অথবা অন্য সকলেরই জীবনে অত সহজে আমবা নাজাই খাতে লিখে দিয়ে ভুলে যেতে পাবি কি অনাদায়ী পাওনাগুলো? পারি না। সাবাজীবন আপসোস করি; অনুযোগ করি। অন্যাব বঞ্চনার কারণে নিজেদের কুরে কুরে খাই। অ্যাকাউন্ট্যান্সী কারো মুখ চেয়েই বসে থাকে না স্যার। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেমন ব্যবসার বালান্স-শীট বানাতেই হয়, জীবনের বেলাতেও হয়ত তাই-ই হওয়া উচিত ছিল। জীবন-ভব তা ফেলে রাখা উচিত নয়। গরমিল যা, তা "যানে দো কনডাকটর" বলে প্রফিট-অ্যাণ্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট করেই এগিয়ে যেতে হয়। আকাউন্ট্যান্সীর মতো এইরকম

জীবনধর্মী, গতিমান, আধুনিকতম বিজ্ঞান আর নেই-ই বলতে গেলে। জীবনের সঙ্গে অ্যাকাউন্ট্যান্সীর যতখানি মিল, ততখানি মিল অন্য কোনো বিদ্যার সঙ্গেই নেই।

আমি যে জানি না কিছুই অ্যাকাউন্ট্যান্সীর। সত্যিই কিছুই জানি না।

জানতে হবে না। আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট টিব্‌রেওয়াল, মাড়োয়ারী, ঝানু এক নম্বরের। সব সেই-ই করে। কিন্তু আজকাল "গুরু গুড, চেলা চিনি" হয়ে উঠছে। আমার কাছেই কাজ শিখে, এখন আমাকেই টেক্কা মারার চেষ্টা। টাকার চেয়ে বড় ওর জীবনে চাইবার আর কিছুই নেই। ওদের সমাজে নাকি যার যত টাকা সে তত সম্মানেব লোক। টাকার সঙ্গে টিবরেওয়াল সম্মান ব্যাপারটাকে গুলিয়ে ফেলেছে। এটা কি দুঃখের নয় ? খ্যয়ের, ঘোৎ-ঘাৎ সব আমি দেখিয়ে দেব একদিনে। আমার সব এক নম্বরের ব্যাপার। দু নম্বরী তিন নম্বরী ধান্দা আমার নেই কোনো। স্যার, আপনাব বুঝতে একটুও সময় লাগবে না। অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে হলে, এমন কিছু মাথা লাগে না। বরং, মাথাওয়ালা লোক বলেই আপনার প্রথম প্রথম বুঝতে একটু অসুবিধে হতে পারে।

পৃথু হাসল, বলল কোনো অ্যাকাউন্ট্যান্ট এ কথা শুনলে রাগ করতে পাবেন।

করলে করবেন। আর্‌রে ইদানীংই না সব ভাল ভাল ছেলেরা চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সীব লাইনে আসছেন। চার্টার্ড, কস্ট, ম্যানেজমেণ্ট, কত রকম অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয় এখন। আগে মানে, তিরিশ চল্লিশ বছর আগে কি হত ? যাদের প্রফেসর, ডাক্তাব, এঞ্জিনীয়র কিছুই হওয়া হলো না তারাই ভিড করত এ লাইনে। "কম্মী" ছিল বলেই না বলত আই-কম্, বি-কম।

সে সব অনেক দিন আগের কথা।

পৃথু বলল। এত কঠিন পরীক্ষা। কত ভাল ভাল ছেলেবা পাস করতে না পেরে লাইন ছেড়ে দেয়। তবে এটা ঠিক, পরীক্ষাটা যে পুরোপুরি মেধার পরীক্ষা তা হয়ত বলা যায় না। মেধার চেয়ে জেদ হয়ত বেশি লাগে আমাকে অবশ্য একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টই বলেছিলেন।

আররে, আমি কি আর তা জানি না ? আমিও ত নাগপুরে আর্টিকেলড্ ক্লার্ক ছিলাম সিং কোম্পানীতে।

হেসে বললেন দিসাওয়াল সাহেব।

তারপর বললেন, বিয়েও ঠিক হয়ে গেছিল। নাগপুরের এক বড় ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে। পরীক্ষাই পাস করতে পারলাম না। সেই শালা উড-বী-ফাদার ইন-ল শেঠ বিয়েটাই কেঁচিয়ে দিল। তারপরই ত আমার এক মামার কাছ থেকে দু হাজার টাকা কর্জ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভাগ্যের খোঁজে। তখন থেকেই মনের জ্বালায় পুরো অ্যাকাউন্ট্যান্সী প্রফেশনের উপরই থুথু দিচ্ছি স্যার। এই জঙ্গলে এসে বিড়ি পাতার কাজে ত সেই সময়ই লাগলাম।

ভালই করেছেন। যে-কোনো প্রফেশনেই সম্মান যত আছে, টাকা ততটা নেই। ব্যবসা যারা করে তাদেরই ত সেবা করতে হয়। তারা স্যারই বলুক আর সাহেবই বলুক, আসলে তারাই ত মালিক। আপনি যেমন আমার।

তা যা বলেছেন। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। বলেই, বললেন, ছিঃ ছিঃ। বুঝতে পারিনি। এরকম বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

দিসাওয়াল মানুষটা একটু অদ্ভুত ধরনের। অবিবাহিত। কিন্তু এই সাতদিনে কোনো সূত্র থেকেই তার চরিত্রের কোনোরকম দোষের কথাই শোনেনি পৃথু। এমন কি চা-পান-সিগারেট পর্যন্ত খান না। নারীঘটিত কোনোরকম ব্যাপারও যে আছে তেমনও শোনেনি। এখনও পৃথিবীতে এরকম দোষহীন নিপাট ভালমানুষ যে রয়ে গেছেন তা জেনেও ভাল লাগে।

দিসাওয়াল সাহেবের মুখ দেখে মনে হয়েছিল, কিছু কিছু মানুষ নিজেকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েই সবচেয়ে আনন্দ পান। উনিও হয়ত তাঁদেরই একজন।

ভালবাসার জন কেউ না থাকলে কি চলে ? ছেলেমেয়েও ত নেই। কাকে দিয়ে যাবেন, আপনার এত সম্পত্তি।

পৃথু তবু বলেছিল। মেয়েরা যেমন করে পুরুষদের বলে।

দিসাওয়াল সাহেব হেসে, রঙ-চটা ছাই-রঙা অ্যামবাসাডরেব পেছনের বাঁদিকের দরজা খুলে উঠে বসতে বসতে বলেছিলেন, দেনেওয়ালা যদি খাঁটি হয় স্যাব, তবে ভালবাসা লেনেওয়ালার অভাব ঘটে না কোনোদিনও।

বলেই, দূরের পাথবের উপব চুনকাম-করা স্কুল-বাড়িটাব দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিলেন।

উনি যে শুধু ছোট ছেলেমেয়েদেব জন্যে বিনা পযসায লেখাপড়ার বন্দোবস্তই কবেছেন তাই-ই নয়, তাদের জামাকাপড, বই-পত্র এবং টিফিন এ সমস্তই বিনা পয়সায় দেওয়া হয।

গাড়িটা চলে গেলে, অবাক হয়ে অপস্রিয়মান গাড়ির চাকায়-ওডা লাল ধুলোর মেঘেব দিকে চেয়ে থেকে ও ভেবেছিল সত্যিই হয়ত তাই-ই। ভালোবাসা ব্যাপারটা, নিজেই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বোধ। কাকে তা দেওয়া হবে তাব বাছ-বিচাব বেশি না কবলে হৃদয নিংড়ে দিলেই হয়ত হৃদয় ভবে ওঠে। তবে, দিসাওযাল সাহেববা অন্য ধবনের মানুষ। দিগা পাঁড়েরই মতো এক বিশেষ মানসিক উচ্চতাতে পৌঁছে গেছেন উনি, জাগতিক, জীবনের সাধারণ সব সম্পর্ক-জাত দুঃখবোধ বলে কোনো কথাই নেই ওঁদের অভিধানে। এই পৃথিবীব কোনো নারী বা পুরুষই সেই সব মানুষকে কোনোরকম দুঃখ দেবার ক্ষমতা রাখেন না, অথচ আনন্দ তাঁবা আহবণ করতে পাবেন ভোবের রোদ কী পাখির স্বর, কী অনাত্মীয়, স্বার্থসম্পর্কশূন্য আদিবাসী শিশুদের হাসি থেকে। এই সব মানুষেব কাছে কোনো বিশেষ ব্যক্তিব বিন্দুমাত্রও দাম নেই। সমস্ত মানুষই বোধহয এক বিশেষ জাতি হিসেবে তাঁদেব অশেষ স্নেহ প্রীতি এবং ভালবাসাব পাত্র।

খুবই কৃতজ্ঞবোধ করে পৃথু। এমন এমন মানুষের কাছে এলেও মনটা প্রসন্নতায ভরে ওঠে। দিগা পাঁড়ের কাছে গেলে যেমন হত। মন, যে-মানুষের ছোট ; তাদেব কাছাকাছি হলেই এক গভীর অস্বস্তি বোধ করে ও, বুকের মধ্যে এক ধবনেব কষ্ট হতে থাকে। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে। তা সে-মানুষ যতই মহত্বব ভান করুন না কেন। ফুলের গন্ধর মতোই,ভাল মানুষের মনের গন্ধও আপনিই ছড়িযে যায অন্য মানুষের মনে।

যে বাংলোটিতে আস্তানা গেড়েছে পৃথু সেটি নাজিমুদ্দিন সাহেবেবই বাংলো ছিল। কখনই পরিবার নিয়ে উনি থাকেননি নাকি এখানে। মাইহারেই থাকতেন তাঁরা। ছেলে কাট্‌নিতে পড়ছিল। বেশি বয়সে বিয়ে এবং দেরী কবে সন্তান হয ওঁর। প্রত্যেক দু মাস অন্তব নাকি সাত দিন ছুটি নিয়ে চলে যেতেন মাইহারে।

ভদ্রলোকের সাকুলেন্ট এবং ক্যাকটাই এবং প্লান্টস-এর শখ ছিল প্রচণ্ড। ফুলেবও। বাংলোটিকে প্রথম দর্শনে দেখে পৃথুর মনে হয়েছিল কোনো হর্টিকালচারাল গার্ডেনই বুঝি ! অর্কিডও করেছিলেন উনি অনেক রকম।

বাংলোটা সত্যিই ভারী পছন্দ হয়ে গেছিল পৃথুর। একটি ছেলে আছে তার নাম বিশু। সেই দেখাশোনা করত নাজিমুদ্দিন সাহেবের। অনেকদিন আগেই দিসাওয়াল সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে এখানে এসে মৌরসী পাট্টা গেড়ে প্রথম দিন থেকেই সীওনীতেই থাকতে পারত ও। এ রকম স্বপ্নের মতো জায়গা !

কাছেই দুর্গাবতী দুর্গ আছে। কাছে মানে,বত্রিশ-তেত্রিশ মাইলের মতো। আড়ি বলে একটি জাযগা হয়ে যেতে হয় ; শর্টকাট অবশ্য একটা আছে, তাতে সময় কম পড়ে। তবে সে পথে গাড়ি যায় না। চার মাইল দূর দিয়ে ওয়াইনগঙ্গা নদী বয়ে গেছে। পাহাড়ী নদী। ওপর দিয়ে চলে গেছে কজ্‌ওযে-পিপারদাহি, চৌবাহিস, চাঁদ, অমরওয়াড়া এসব জায়গায়। আরও এগিয়ে গেলে পড়ে পেঞ্চ নদী। তার ওপবেও কজওয়ে। মানে, সাব্‌মার্সিবল্ ব্রিজ আর কী ! পেঞ্চ নদী পেরুনোর পরই ঝিল্‌মিলি। সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলে মাইল পনেরো ষোলো, চিন্দোয়াড়া।

পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক-এর মধ্যে সুন্দর সুন্দর সব ফরেস্ট বাংলোও আছে। একটা বাংলোয় দেখলো সোলার এনার্জীতে আলো জ্বলে আর একটি বাংলোতে ফ্রিজও আছে। গত শনি-রবিবার পারিহার সাহেব নিজে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন পৃথুকে। যাকে বলে ফ্যামিলিয়ারাইজেশন্ ট্যুওর। তবে সব দেখতে এখনও অনেকই বাকি। পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্ক-এর

গড় উচ্চতা হচ্ছে প্রায় দেড় হাজার ফুট-এর মতো। সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পেঞ্চ । দক্ষিণবাহিনী। পোআনির চেক-পোস্ট দিয়ে ঢুকে গেলে সিলারি, সুরেরা (কোলিথমারা), রানীদোহ তোত্‌লাদোহ আর ঘাটপেন্ঢারি পড়ে। অন্য একটি পথ দিয়েও ঢোকা যায়। সেদিক দিয়ে ঢুকলে, নাগপুরের মাইল পনেরো উত্তরে সাত নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে খাপা আর সালাইঘাটে যাওয়া যায়। ওদিকটাতে যাওয়া হয়নি এখনও এবারে এসে। ছেলেবেলায় যখন বাবার সঙ্গে আসত শিকারে, তখন ঘাটপেণ্ঢারিতে ছিল একবার। নামটা তাই-ই মনে আছে।

আজকে রবিবার।

পৃথু নাজিমুদ্দিন সাহেবের বাংলোর বারান্দায় বসে ছিল। বেতের টেবলের ওপর খাতা কাগজ বই কলম নিয়ে।

সমস্ত বাংলোটার এমন বাগানের মতোপরিবেশ যে, তার জীবনে যে এত বড দুটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল সে কথা নিয়ে ভাববার ইচ্ছেও যেন হয় না এমন স্বর্গীয় পরিবেশে বসে। বারান্দা এবং সিঁড়ির ধাপগুলো শুধু ফার্ন-এই ভর্তি। কত রকমের যে ফার্ন! এই বাংলোতে যদি রুষাব সঙ্গে থাকতে পারত ও, তাহলে তাদের জীবনে হয়ত কোনো ছেদই ঘটতো না। এমন একটি ফুল-ফলন্ত বাগান-ওয়ালা বাড়ি দাম্পত্য সম্পর্কের জীবনবীমা, অকৃতদারের স্ত্রী, মৃতদারের সান্ত্বনা। রুষা এই সব পৃথুর চেয়ে বেশি ভালবাসে। পৃথু ত জংলী লোক। জঙ্গলেব উলঝি-সুলঝি অযত্ন-বর্ধিত খামখেয়ালি গাছ-গাছালিব রূপই তার মন কেড়েছে চিরদিন। যা-কিছু সযত্ন-লালিত, মানুষের চেষ্টাকৃত, নিয়মবদ্ধ সেই সব কিছুর প্রতিই ওর গভীর অনীহাই শুধু নয়, অসূয়াও আছে। সেই কারণেই হয়ত পৃথুর চরিত্রটাও সুন্দর লাল-বঙ-করা কাঠেব টবেব মধ্যের নির্যমিত সেবা এবং পরিমিত আলো হাওয়া এবং অবশ্যই পরিমিত ছায়াতেও প্রস্ফুটিত, প্রীতি-বদ্ধ, সুন্দব, প্রাইজ-পাওয়ার মতো হলো না কোনোদিনও। রুষার চরিত্রর মানসিকতাব এবং সৌন্দর্যব মতোই, যেন এই বাংলোর সবকিছু মেমসাহেবী ছিমছাম। খুঁতহীন। এসে অবধি, রুষাব কথা অন্যান্য নানা কারণের সঙ্গে এই কারণেও খুবই মনে পড়ে।

বারান্দাতে এবং সিঁড়ির ধাপে ধাপে কোন্ ফার্ন যে নেই, তাই-ই কষ্ট কবে খুঁজে বের কবতে হবে। টেবল ফার্ন, বোস্টন ফার্ন, বার্ডস্‌নেস্ট ফার্ন র‍্যাবিটস-ফুট ফার্ন, অ্যাসপারাগাস ফার্ন, মেইডেনহেয়ার ফার্ন, এমনকি স্ট্যাগহর্ন ফার্নও। পৃথুর চেনা ভ্যারাইটিব মধ্যে দেখছে না কেবল অ্যাসপ্লেনিয়াম বুল্‌বিফেরাম্। ওদের কমোন নামটা যে কি, তা কিছুতেই মনে করতে পারছে না এই মুহূর্তে।

গেট থেকে ঢুকে বাংলোর বারান্দার দিকে আসতে দু পাশের খোলা জায়গা, বাংলোর পেছনটা, ভিতরের উঠোন, বাউণ্ডারি ওয়ালের আশ-পাশ দেখে মনে হয়, উটির বটানিকাল গার্ডেনেই যেন এসেছে বুঝি। কতরকম যে বাল্বস, ব্রমেলিয়াডস্, আফ্রিকান ভায়োলেটস্, ক্যাক্‌টাই আর সাকুলেন্টস্ কত ভ্যারাইটির টেরারিয়ামস্ আর প্যাশিও প্লান্টস্ তা আর বলে শেষ করা যায় না। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা বোধহয় এই রকমই হওয়ার কথা ছিল।

ঠুঠা এই বাগান পেয়ে যেন ওর বান্‌জারী খুঁজে পাওয়ার চেয়েও বেশি খুশি হয়েছে। সারাদিনই খুপ্‌রী আর জলের ঝারি হাতে এই সব প্লান্টস আর ফার্ন-এব তদারকি করে। মালকোঁচা মেরে ধুতি উপরে তুলে, খালি গায়ে। বিকেল হলেই অবশ্য ধুতি নেমে যায়; জামা ওঠে গায়। রাতের দিকে এখনও বেশ ঠাণ্ডা এদিকে।

ঠুঠা বাইগা মানুষটা কিন্তু একেবারেই বদলে গেছে। জঙ্গলে ও নাকি নাঙ্গা বাইগার স্বপ্ন পেয়েছিল। প্রায় বোবারই মতো হয়ে গেছে। ওর অন্তবিহীন কথা যে জঙ্গলের কোন্ মারাই দেবী গিলে ফেললেন্। সারা দিনে ও দু' একটিই কথা বলে এখন। দশটা প্রশ্ন করলে, একটার উত্তর দেয়। মানুষের যে ছাতারে পাখির মতো কথা বলা উচিত নয় এতদিন পরে বুঝছে ওরা। বেলা পড়ে এলেই বারান্দার সিঁড়িতে এসে বসে সামনের ঘন জঙ্গলাবৃত মাথা-উঁচু মেঘের মতো পর্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে থাকে ঠুঠা বাইগা। হাওয়ায় কর্কশ চাবুক মেরে টিয়ার ঝাঁক এক স্কোয়াড্রন মিগ্ ফাইটারের মতো বাড়ি ফেরে। কোনোদিন বিকেলে ছাড়া-ছাড়া জোড়াজোড়া ছোট্‌কি ধনেশ, মানে লেসার ইণ্ডিয়ান

হর্নবিলস্, নিষ্কম্প ডানায় গ্লাইডিং করে গোলাপী আকাশের পটভূমিতে হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া ধূসর পাণ্ডুলিপির মতো দেখা দিয়েই আবার ঘনায়মান অন্ধকারের ধুলো-রঙা পূবের পাহাড়েব দিকে শেষ সূর্যর পশ্চিমী আলোর অস্পষ্ট রেশের মধ্যে ভেসে যায়।

পাখিরা মুছে যায়।

তারারা ফুটে ওঠে।

পৃথুও মাঝে মাঝেই মানুষেব হাতে বানানো এই সুন্দর স্বর্গোদ্যানের মধ্যে বসেও ঠুঠা বাইগারই মতো উদাস হয়ে যায় পৃথু।

বাংলোর পেছনেও পাহাড়। সাবা বাত একটা কপারস্মিথ পাখি ডাকে আর তার দোসর সাড়া দেয় দূবের জঙ্গল থেকে। পাখিবা মানুষ নয়। অনেক সুখ ওদের। সহজ সুখ। দোসর জোটায়, নীড় বানায়, ডিম পাড়ে। সহজে! কোনো কষ্ট নেই ওদের। রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে নানা সম্ভাবনার অশরীরী আভাস হাওয়ার ফিস্‌ফিসানির মধ্যে চমকে চলে, থম্‌কে থেমে, আবারও চমকে চলে যায়। পৃথু, বোঝে ঠুঠা বাইগাকে। যারা একবার জঙ্গলের প্রেমে পড়েছে তাদের ইহকাল পরকাল সবই ঝরঝরে। স্বর্গোদ্যানেও তাদের মন বসে না।

ঠুঠা মুখ দিয়ে অমানুষিক একটা নিচু আওয়াজ কবে, মুখটা উঁচু কবে পৃথুব দিকে চেযে বলল, পা কেমন?

ওর প্রশ্নটা গোঙানির মতো শোনাল।

পৃথু বলল, ভাল।

পৃথুর উত্তরটাও বোধহয সে রকমই শোনাল।

তুমি কেমন আছ এখন ঠুঠা?

ঠুঠা আবারও একটা অমানুষিক শব্দ করল, সজারুবা সঙ্গমের সময যেমন করে।

কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল যে, ঠুঠা ভাল নেই। যদিও বলছে যে, ভাল আছে।

ঠুঠা আবার বলল, আজ হাটে যাওয়া দরকার ছিল তোমাব। তোমার নিজেব।

কেন এ কথা বলল ঠুঠা, কে জানে?

আর কোনো দরকার নেই পৃথুব। হাটবাজাব সওদা—আনাজ-মুবগী এ সবে ওর কিছুই দরকার নেই। ঠুঠা ভাল মনে করলে যাবে, নইলে খিচুড়ি খেয়েই থাকবে। একজন মানুষের নিজেব জন্যে কিছুরই প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন সব ভালবাসার জনেদেরই জন্যে। আর..

ঠুঠাকে দেখে আজকাল ন্যতরদাম্-এর হাঞ্চব্যাকের কথা মনে হয় পৃথুর। কোয়াসিমোদোর কথা। প্রত্যেক পুরুষের জীবনেই এস্‌মারাল্ডা দরকার। ক্ষণিকের জন্যে হলেও। সে পুরুষ ঠুঠার মত প্রাকৃতই হোক অথবা পৃথুর মতো অত্যাধুনিকই। নারীরা, সুন্দর লাল-রঙা কাঠের টবেরই মতো যাদের বুকের মধ্যে থাকলে স্ট্যাগহর্ন ফার্ন-এর শোভা খোলে।

পৃথুর বাবা যখন ছেলেবেলায় পৃথুকে প্রথম ফোটো তুলতে শিখিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, যে, পটভূমিই হচ্ছে আসল। ব্যাকগ্রাউণ্ড। বলেছিলেন, শুধু প্রকৃতিরই ছবি : যেমন সমুদ্র, প্রান্তর, নদী, পাহাড় কখনও তুলবি না। সাবজেক্ট হিসেবে প্রকৃতি একা একেবারেই "ডাল্"। সব সময়ই মানুষ রাখবি ফ্রেমের মধ্যে। অথবা নিদেন পক্ষে অন্য প্রাণী। একটি বাচ্চা ছেলে মোষের পিঠে চড়ে চলে যাচ্ছে বাঁশি বাজাতে বাজাতে। তবেই না, জঙ্গলের চরিত্রটা ফুটে উঠবে। মনে কর জেলে তার জাল উড়িয়েছে আকাশে। একটি সামান্য মানুষ, তার ছোট্ট একটি জালে, ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি মাছ ধরার ছোট্ট আশাটুকু ছড়িয়ে দিচ্ছে বিরাট, গুরুগর্জনে অনন্তকাল ধরে বয়ে যাওয়া নদীর পটভূমিতে। নীল আদিগন্ত আকাশের কাছে যেন ভিক্ষা চাইছে সেই উদ্‌লা গায়ের কালো কোলো মানুষটি। পটভূমিতে তবে না নদী ফুটবে। নদী, কী বন, কী পাহাড় নিজেই নিজে ফোটে এমন সাধ্য কি তাদের?

জীবনও এক ধরনের ফোটোগ্রাফী। ঠুঠা বাইগা আর পৃথু ঘোষ জীবনের ভিউফাইণ্ডারের ফ্রেমে কোনো মানুষকে আঁটাতে পারেনি। নারীকে ত নয়ই। তাই-ই তাদেব জীবনের ফোটোগুলিতে

পটভূমি তেমন করে ফুটল না বোধহয় এই জন্যে।

বিগু বারান্দায় এসে দাঁড়াল বাংলোর ভিতর থেকে। চায়ের পট ট্রেতে বসিয়ে। দুধ ও চিনি আলাদা করে এনে ছোট ছোট পটে। প্লেটে চারখানি থিন-অ্যারারুট বিস্কিট। ওর খসখসে পায়ের পাতা বারান্দার মসৃণ মেঝেতে জানোয়ারের পায়ের আওয়াজেরই মতো খস্‌স্‌ খস্‌স্‌ আওয়াজ তুললো।

চা-এর ট্রেটা নামিয়ে রেখে বিগু বলল, ক্যা বানায়গা খানা, ম্যানিজাব সাহাব ?

সন্ধ্যে হয়ে এল। বাঁ পাশের টাঁড় থেকে তিতির আর হট্টিটিরা তারস্বরে চিৎকার করে জানিয়ে দিল যে, এই মাত্র দিনের মৃত্যু হল। দিনকে কালো কাফানে ঢেকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেঁচা আর পেঁচানি তাদের কিচি কিচির কিচি—কিচর-র, কিঁচি-কিচর্‌ চ্যাঁচানি শুরু করল।

পৃথু বারান্দার আলোর নিচে বসে বাইরের তুমুল অন্ধকারকে তার গায়ের মিশ্রগন্ধ দিয়ে চিনে নিতে চেষ্টা করতে করতে ভাবছিল, প্যাঁচাদেব প্রেমও বোধ হয় এই রকমই হয়। অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে তারা। হয়ত ওদের ঝগড়া ও ভালোবাসার রকমে কোনো তফাত নেই।

কাহলিল্‌ গিব্রান্‌-এর 'প্রফেট' বইতে আছে যে, বিয়ের উপরে কিছু কথা ?

"লেট দেয়ার বী স্পেসেস্‌ ইন ইওর টুগেদারনেস্‌"।

ভেবেছিল, রুষাকে যখন চিঠি লিখবে, রুষাকেও বলবে এই কথা ; শুধু পেঁচাদেরই নয়। আরও আছে :

"লাভ ওয়ান অ্যানাদার বাট মেক নট
আ বণ্ড অফ লাভ :
লেট ইট্‌ রাদার বী আ মুভিং সী বীট্‌উইন দ্যা শোরস্‌
অফ ইওর সোওলস্‌।"

পৃথুর যথেষ্ট পয়সা থাকলে প্রত্যেক দম্পতীকে কাহলিন্‌ গিব্রানের "প্রফেট" বইটি কিনে উপহার দিত। ভাল বই একা একা পড়লে বড় ছোট লাগে নিজেকে। ভাল বই কিনে যদি জনে জনে উপহার না দেওয়া যায় মন খারাপ্‌ হয়ে যায় বড়।

বিগু কি রাঁধবে তার উত্তর পৃথুর কাছে পেল না।

দুখী ও মেরীর এবং লছমার সিং-এর হাত থেকে বেঁচে এসে এবার এই ক্ষুন্নিবৃত্তির দায় সে ঠুঠার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছে। পুরোপুরিই।

ঠুঠা বড়ই বিব্রত বোধ করে এতে।

কিন্তু পৃথু নির্বিকার।

বিগু প্রায় রোজই বলে, সে বেহেতরীন "হাওয়াই পুটিন্‌" বানাতে পারে।

বস্তুটি কি ? জিগগেস করাতে জানতে পেরেছিল যে, এক ধরনের পুডিং।

মনে মনে বলেছিল, নো থ্যাঙ্ক উ্য। নো পুডিং ; নো স্যুপ্‌।

বিগু ছেলেটা খুবই হাসি খুশি। উজ্জয়িনীর কাছে বাড়ি ওর। সময় পেলেই, মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে ঠুঠার কাছে শিকারের গল্প শুনতে চায়। ঠুঠা রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারে না। প্রকৃতই যারা ভাল শিকারী, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই পারেন না। তাতে হতাশ হয়ে, বিগু নিজেরই গল্প বলে চলে, উৎসাহের সঙ্গে ঠুঠা বাইগাকে হাত পা নেড়ে। ঠুঠা বাইগা কোনো প্রাচীন গাছের মতো ঝিম্‌ ধরে বসে থাকে। মাঝে মাঝে পাতা একটু কাঁপে। বিগু বলে চলে ওর অমরকন্টক বেড়ানোর গল্প।

পৃথু চুপ করে বসে অন্যদিকে চেয়ে বিগু আর ঠুঠা বাইগার কথাবার্তা শোনে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। বিগুর গলার স্বরের সঙ্গে টুসুর গলার স্বরের আশ্চর্য মিল আছে। অথচ টুসুর চেয়ে বিগু কম পক্ষে পাঁচ বছরের বড়।

টুসুর কথা মনে পড়ে। হঠাৎই মন খারাপ হয়ে যায় পৃথুর। যন্ত্রণা বোধ করতে থাকে এক রকম। যে যন্ত্রণাটা, ওর পায়ের যন্ত্রণার চেয়েও অনেক অনেকই বেশি তীব্র।

"ইওর পেইন্‌ ইজ দ্যা ব্রেকিং অফ দ্যা

শ্যেল্ অফ ইয়োর আণ্ডার স্ট্যাণ্ডিং.....

মাচ্ অফ্ ইওর পেইন্ ইজ সেল্ফ চোজেন্।"
কাহলিল গিব্রান।)

পৃথু মনে মনে বলল, মণি চাকলাদার, কবিতা নিজে না লিখে এ সব কবিতা পড়ুন। আত্মশুদ্ধি হবে। এই জন্মে কবিতা কাকে বলে তা জেনে নিন ; পরের জন্মেই না হয় লেখালেখি করবেন।

যদি পরজন্ম না থাকে ? মণি চাকলাদার যেন তাঁর শেয়ালের মতো ধূর্ত চোখ দুটি তুলে বললেন।

ওয়েল ! ক্যুডন্‌ট কেয়ারলেস্। উ্য জাসট মিসড্ দ্যা বাস্। সরী পোয়েট্। আই মীন, অ্যান্ অ্যাপলজী ফর আ পোয়েট !

"সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি।"

হঠাৎ লোড-শেডিং হয়ে গেল। একটা লেপার্ডের কবাতের আওয়াজের মতো শব্দ সামনের ঘোরান্ধকার পাহাড়টার কাঁধের কাছ থেকে ভেসে আসে।

একটা ব্যথা, করাতে কাটার মতোই ব্যথা অথচ আওয়াজহীন, পৃথুর বুকটাকে চিরে চিরে যায়।

একটা একলা টি টি পাখি পাহাড়তলির সব রাতচরা জানোয়ারদের সাবধান করে দিয়ে অন্ধকারে হোগল-বাদায় শালটি বাওয়াব মতো করে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে উড়তে থাকে। ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে উড়তে উড়তে ডাকে সে : হট্টি-টি-টি হুট্ টি-টি-টি হুট।

মানুষদের জগতে কোনো বন্ধু টি-টি পাখি নেই। এই সব অব্যক্ত অস্ফুট তীব্র যন্ত্রণা আচমকা অবচেতনের অন্ধকার থেকে হিংস্র লেপার্ডেরই মতো লাফিয়ে পড়ে অসহায় অপ্রস্তুত চেতন মনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যায় তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে আঘাতে।

হঠাৎই।

টি টি পাখি ডেকে চলে, স্তব্ধ জমাটবাঁধা, সুগন্ধি চৈতি পাহাড়তলির অন্ধকারে হট্টি-টি-টি-টি হুট্, টি-টি-টি-হুট।



সীওনীতে এসে অবধি স্কুলটাই দেখা হয়নি।

দিসাওয়াল্ সাহেব বলে গেছিলেন যেন একবার অবশ্যই যায় পৃথু। উনি ফিরে আসার আগেই। কাল খবর পাঠিয়েছিল স্কুলে যে, আজ যাবে।

বিশু নাস্তা বানাচ্ছিল। আজ তাড়াতাড়ি নাস্তা এবং দুপুরের খাওয়া সেরে ওরা সকলে মিলে হাটে যাবে। ঠিক আছে এই রকম।

যে কোনো জঙ্গুলে পাহাড়ী জায়গার চরিত্র বুঝতে হলে তার হাটে গেলেই চলে। হাটই স্টক্-এক্সচেঞ্জ, যাত্রা-থিয়েটার, ক্লাব, সবকিছুই। হাটের গায়ের গন্ধেই সেই জায়গার পুরো পরিবেশটি ধরা পড়ে। সবচেয়ে ভাল জামাকাপড়ে সেজেগুজে নারী পুরুষ সবাইই হাটে যায়। যাদের সঙ্গে রোজই ছেঁড়া ময়লা ধুতীতে আর শাড়িতে দেখাশোনা হয়, তাদের কাছেই একেবারে অন্য মানুষ হয়ে পৌঁছতে চায় সেদিন সকলেই। নিম অথবা করৌঞ্জের তেল মেখে মেয়েরা চকচকে

হয়ে ওঠে। তাদের কাটা-কাটা নাক-চোখকে তখন গর্জন-তেল-মাখা, কৃষ্ণা, কোনো দেবীর মুখ বলেই মনে হয়।

পৃথুর ভুলও হতে পারে।

নাস্তা এনেছিল বিগু বারান্দাতেই। এখানে ত আর রুষা নেই! মেরীও নেই। ভারত একেবারেই স্বাধীন। বারান্দায় বসেই নাস্তা করছিল ও। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। কুর্চি আর টুসুকে স্বপ্ন দেখেছিল। অনেকক্ষণ ধরে। আশ্চর্য! কুর্চি নাকি সীওনীতেই আছে! অথচ, এসে অবধি তার সঙ্গে দেখাই হলো না। এত ছোট্ট জায়গাতেও! অবশ্য তার খোঁজ করার কোনো চেষ্টাও পৃথু করেনি। কেন যে করেনি, তা ও নিজেও ঠিক জানে না। আসলে, হাসপাতাল থেকে হাটচান্দ্রাতে ফিরে আসার পর নানা ঘটনা পরম্পরায় পৃথু মানুষটাই বদলে গেছে অনেক। যা একদিন তাব কাছে পরম প্রার্থিত ছিল, আজ তাইই চরম ভীতির হয়ে উঠেছে। ভয়, ঠিক না করলেও; মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে ও উদাসীন হয়ে উঠছে।

ঐ স্বপ্ন দেখার পরই ঘুম ভেঙে গেছিল মাঝরাতে। পাশের ঘরে ঠুঠা বাইগা আর ঢাকা বারান্দায় বিগু অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। পৃথু এসে বাইরের বারান্দাতে বসেছিল বেতের চেয়ারে। ঘুম যদি না-আসতে চায়, তবে মিছিমিছি বিছানায় শুয়ে তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করায় বিশ্বাস করে না ও। নিশুতি রাত। সীওনীর পরিবেশটাই এমন যে মনে হয় কোনো বনের গভীরেই আছে বুঝি। বাংলোটা থেকে চারধারে চাইলে এটি যে বন-বাংলো নয় তা বোঝার মোটেই উপায় নেই। কিপ্‌লিং এর মোওগ্‌লির দিন থেকে খুব একটা বদলায়নি বোধ হয় সীওনী।

বাইরে চৈত্রর বনের রাত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দুটো পেঁচা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কিঁচি-কিঁচি -কিঁচর -কিঁচি-কিঁরে, ডাকে ঘূর্ণী হাওয়ায় পাকিয়ে ওঠা শুকনো পাতার মতো উপরে উঠে যাচ্ছে। তাদের সেই চেঁচানির নখরাঘাতে চৈত্র রাতের স্নিগ্ধ সুগন্ধি শান্তি চিরে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। ঘুমন্ত সাতপুরা পর্বতমালার গায়ে ওদের কর্কশ চিৎকার ধাক্কা খেয়ে ফেটে গিয়ে আবার ফিরে আসছে।

এমন এমন অনুভবের রাতে মনের ভিতরে যেমন, তেমন প্রকৃতিতেও নানা দীর্ঘ ও হ্রস্ব ছায়া নড়ে চড়ে। এই গা-ছম-ছম নানা দৃশ্যরই মতো, অবচেতনের এবং রাতের অন্ধকারের অন্ধকারতর ঝোপ-ঝাড়ের অভ্যন্তর থেকে অনেক কিছু শব্দ ও দৃশ্যই উঠে আসে; না উঠেই।

অন্ধকারে একটা মস্ত শঙ্খচূড় সাপ রাস্তার ওপাশের বুড়ো পিপ্পল গাছের ছায়ার গভীরের অন্ধকার গহ্বরে মধ্যরাতের টহল সেরে ফিরে আসছিল। নিঃশব্দে সে অবশ্য আসতে পারেনি। তার ভারী মসৃণ বুকের চাপে লাল হলুদ খয়েরী আর ন্যাবা-রঙা পাতারা নরম মুচমুচানি তুলে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার দীঘল পিছল ঠাণ্ডা শরীরটাকে সে আস্তে, খুবই আস্তে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে, মাথা আগে করে। লেজটা অদৃশ্য হতে, মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল লেগে যাবে। তারপরই এক সময় এই গন্ধভরা ক্কচিৎ শব্দ-ওড়া রাতকে গহ্বরের বাইরে যেন তার খোলসেরই মতো হঠাৎই ছেড়ে রেখে সে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল। গহ্বরের ভিতরে ঢুকে তার নিজের নগ্নশরীরের সুগন্ধে বুঁদ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আদর-খেয়ে ওঠা কোনো যুবতী নারীর মতো। গভীর অবসাদের আশ্লেষে।

অনেক দূরের ওয়াইন্‌গঙ্গা নদীর শব্দ এখান থেকে শোনা যায় না। তবে দশ মাইলের মধ্যেও কোনো নদী থাকলে নদীর শিরা-উপশিরা মাটির আর পাথরের গভীরে গভীরে ছড়িয়ে যায়। জলের গন্ধ পাওয়া যায় দূর থেকে নারী আর ইলিশ মাছের গন্ধর মতো। বাংলোর সামনেই একটা কালভার্ট। এ পথে গাড়ি বা ট্রাকের চলাচল নেইই। পথটা আগে ছিল কানা। এখন অন্ধ হয়ে গেছে একেবারে। পুরোপুরিই মুছে গেছে, পাহাড়ের আঁচলে এসে, বাংলোর বাঁ দিকে। বাঁদিকটা পুরোই জঙ্গল আর একটা মাঝবয়েসী পাহাড়।

পাহাড় থেকে নেমে, রাতের কালো লালমাটির পথ বেয়ে লটরপটর করতে করতে চলে গেল ডানদিকে, যেদিকে দিসাওয়াল্ সাহেবের স্কুল বাড়ি। অন্ধকারে অন্ধকার অনুষঙ্গর মতো বসে-থাকা পৃথুকে দেখতে পেল না ও।

পৃথুর নিঃশব্দ আশীর্বাদ চিতাটার গায়ের চৈত্রর বনগন্ধমাখা মাথায় গিয়ে যে আল্‌তো হাতে পৌঁছল তা সে জানতেও পারল না। পৃথু বলল, বাঁচো, বাঁচো। সকলে মিলে, মিলে—মিশে বাঁচো। দারুণ ভাবে বাঁচো। রুষা বাঁচো, ইদুরকার বাঁচো, কুর্চি বাঁচো, ভাটু বাঁচো, বাঁচো মিলি টুসু, চিতা. সাপ, পেঁচা, জঙ্গলী, ইঁদুর পোকা মাকড়, বাঁচো সাবির মিঞা, ভুচু, গিবিশদা, নুরজেহান্, বিজ্‌লী সবাই বাঁচো। আকাশের তারারা যেন তাদের নীলাভ সবুজাভ দ্যুতিতে এই বাঁচাব আশ্বাসই ছড়িয়ে দিচ্ছে রঙীন জলকণার মতো সকলের শিরে শিরে। বাঁচো। বাঁচো। সকলেই দারুণ ভাবে বাঁচো। ইতর বাঁচো, খল বাঁচো, ধূর্তও বাঁচো, ভালদেরই সঙ্গে।

ঠুঠা বাইগা ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে যেন কি বলে উঠল। কে জানে ? আবারও নাঙ্গা বাইগীনকে স্বপ্নে দেখল কি ঠুঠা ?

হা হা হা রে বুক কাঁপিয়ে একটা হায়না হঠাৎ ডেকে উঠল পাহাড়তলী থেকে।

গা ছম্‌ছম্ করে উঠল পৃথুর। অতি বড় সাহসী লোকেরও কোনো কোনো নগ্ন নির্জন মুহূর্তে এমন গা ছম্‌ছম্ করে। এমন পরিবেশে যারা থেকেছেন তাঁবা প্রত্যেকেই তা জানেন। নাস্তা শেষ করে চাটা খেয়েই, উঠে পড়ল পৃথু।

হাট লাগবে দশটা থেকেই। কিন্তু জমতে জমতে সেই বেলা একটা দেড়টা।

পৃথু বলল, আমি আর বাংলোয় ফিরব না। হাটেই যা হয় খেয়ে নেব। তোমরা দুজনে খেয়ে দেয়ে এসো ঠুঠা। স্কুল থেকেই পৌঁছে যাব আমি সোজা। একটা-দেড়টা নাগাদ।

স্কুলটা ওর বাংলো থেকে আধ-কিমির চেয়েও কম পথ। হেঁটে চলল পৃথু সকালের বোদে, গাছ গাছালির ছায়ায় ছায়ায়। সেভেন-সিসটারস্ পাখিরা লাফিয়ে লাফিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলছে পথের দুপাশের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। প্রজাপতি উড়ছে। বেশ লাগছে।

জবলপুরের হাসপাতাল থেকে সেদিন হাটচান্দ্রায় ফিরে রুষার আলো-না-জ্বলা, জানালা-বন্ধ বাংলোটাকে, ভুচুর জীপে বসে দেখামাত্রই পৃথুর বুকের মধ্যে কে যেন তীক্ষ্ণ ছুবি বসিয়ে দিয়েছিল আমূল। ও ভেবেছিল, বাঁচা আব হলো না এ জীবনে ! রুষাকে ছাড়া, মিলি টুসুকে ছাডা, ও বাঁচবে কি করে ?

কিন্তু বেশ ত বেঁচে আছে। আজ, এই মুহূর্তে।

আসলে যে-কোনো মানুষেরই, বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, তা তার নিজেকে নিজেকে নিজে একটু সময় না দিলে, ভাল না বাসলে, দিনান্তে আয়নার সামনে একবারও না দাঁড়িয়ে ভালবেসে নিজের মুখের দিকে না চাইলে তার অন্যর বা অন্যদের জন্যে প্রাণাতিপাত পরিশ্রম করার মানে হয় না কোনো। আসলে, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ হয় সে নিজেই কেন্দ্রবিন্দু। সে আছে, তাইই তার চারধার ঘিরে অন্যান্য সব সম্পর্ক আছে। সেই সব সম্পর্ক না থাকলেও বা চুকে গেলেও একজন মানুষ দিব্যি সুখে বেঁচে যে থাকতে পারে, এই সত্যটা আবিষ্কার করে এখন পৃথু খুবই সুখী মনে করে নিজেকে। যা ঘটেছে, তা না ঘটলে জীবনটা একটা একঘেয়ে অভ্যেস, দৈনন্দিনতার ছাপে সাধারণ, সকালের গরম চা অথবা টাটকা ছাপা নিউজপ্রিন্টের গন্ধভরা খবরের কাগজের মতোই সামান্য হয়ে যেত।

আনন্দম্। আনন্দম্। আনন্দম্।

নিজেই নিজেকে বলল, পৃথু।

স্কুল বাড়িটার গেটে ঢুকতে যাবে ও, এমন সময় দেখল ভিতর থেকে দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে গেটের সামনে তিনজন মহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে।

সকলেই হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। বললেন, গুড মর্নিং ম্যানেজার সাব।

দাঁড়িয়ে পড়ে পৃথু ক্রাচ্ থেকে হাত তুলে নিয়ে বলল, পররনাম্। গুড মর্নিং।

তারপর ওঁরা স্কুল বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালেন পৃথুকে। দেখিয়ে, অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। স্কুল আজ ছুটি। প্রতি হাটবারেই ছুটি থাকে। ছেলেমেয়েদের অনেক কাজ থাকে বাড়িতে।

পৃথু লজ্জিত হয়ে বলল, ঈসস্। আজ স্কুল ছুটি ত আপনারাই বা এলেন কেন ? আমি না হয়

কালই আসতাম।

ওঁরা বললেন, তাতে কি স্যার? ঠিক আছে।

একটি মেয়ে গোন্দ্। ভারী মিষ্টি। অন্য দুজনের একজন বেওয়ার মেয়ে। অন্যজন ইন্দোরেব। সকলেই গ্র্যাজুয়েট। আরও একজন আছেন। বাঙালী, উনি আজ ছুটি নিয়েছেন। স্কুলে হেড মিসেট্রস কেউই নেই। সকলেই সমান। সমান মায়না সকলের।

দিসাওয়াল সাহেব ছেলেমেয়েদের পণ্ডিত বানাতে চান না। শিক্ষিকারা জানালেন পৃথুকে। মোটামুটি ইংরিজি, অঙ্ক, আর হিন্দী শেখানোই উদ্দেশ্য। যাতে, মহাজনবা ওদেব ঠকিয়ে কাঠ বা বিড়িপাতা বা লাক্ষা না কিনতে পারেন। যা এখানে শেখানো হবে, তাতে লেখাপড়ার জগত সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্যই জাগিয়ে তোলা হবে শুধু। এই মাত্রই। তারপর যদি কোনো ছাত্র ছাত্রীব ভাল লাগে আরও বেশি পড়তে এবং সে যদি মেধাবী হয়, তবে দিসাওয়াল সাহেবই তাদের জবলপুব বা নাগপুর বা রাইপুর এবং ভোপালের স্কুলে পড়ার বন্দোবস্ত কবে দেন। হস্টেলে থাকাব সব খবচও দেন। বইপত্রও কিনে দেন।

ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলাটাই ত আসল। "দ্যা পারপাজ অফ আ উ্যানিভার্সিটি ইজ টু ব্রিং দ্যা হর্স নিয়ার দ্যা ওয়াটাব অ্যাণ্ড টু মেক ইট থারস্টি।"

কোথায় যেন পড়েছিল কথাটা পৃথু!

দিসাওযাল সাহেবেরমতোঅনেকই ব্যবসাযীর দরকাব ছিল এই দেশে। ভাবছিল পৃথু। সকলেই সব দোষ ও দায় সরকারেব ঘাড়ে চাপিযেই খালাস। নিজেদেবও যে কিছু করাব ছিল সে সম্বন্ধে ভাবেন কজন মানুষ?

ওঁরা বললেন, ছাত্র-ছাত্রীদেব মধ্যে দুটি বাঙালী ছেলে এবং একটি বাঙালী মেযেও আছে। বিড়িপাতার কোম্পানীব কেবানী আর স্টোবসবাবুব ছেলেমেযে তাবা। তাদের বাংলা পড়ান মিসেস কে রায। বাঙালী!

মিস কে রায়ের, পুবো নামটি জানাব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জানা গেল না। জিজ্ঞেস কবতেও লজ্জা কবল খুবই। এক সময় স্কুল-ইনস্পেকটবেব মতো ইনসপেকশান সেরে পৃথু হাটের দিকে এগোল।

পথেই অ্যাকাউনট্যান্ট টিব্‌রেওযালের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে আরেকজন মোটা-সোটা ভদ্রলোক। আলাপ করিয়ে দিল টিবরেওযাল। বলল, আমাব সাডুভাই। জবলপুরে চালেব ব্যবসা আছে। বেড়াতে আর ব্যবসার ধান্দা করতে এসেছে এখানে।

কি ব্যবসা? বিড়ি পাতার না লাক্ষাব? কাঠের ব্যবসা ত এখন ফরেস্ট কবপোবেশান্ একচেটে করে ফেলেছেন।

না। না। সে সব নয়। লেগে গেলে, আমিও পার্টনার হব সাড়ুভাই-এর।

পৃথু বলল, সারি দুনিয়া একতরফ্ ঔর জরুকি ভাই এক তরফ' এই রকম কি একটা কথা আছে না? তা ভায়রাভাইও যে এমন ইম্পর্ট্যান্ট লোক তা আপনাকে দেখেই জানছি।

করি কি? জরুর ভাইই যে নেই। ওরা মোটে বারো বোন।

বলেন কি? বারো বোন?

মনে মনে বলল, সাবির সাহেব শামীম সাহেবদের টেককা দিলে আপনারাই দিতে পারবেন।

ঔর ভি হলে ত ভাল হত। ফেমিলিতে যত মেম্বার বাড়বে ততো বেশি ইনকাম ট্যাক্স ঔর ওয়েলথট্যাক্সের ফাইল ভি বাড়বে। ফেমিলির সেভিংস ভি বাড়বে। সোক্কোলে ভালো খাবে, ভালো পরবে। পরে, বেওসা কী ইনডাসট্রীভি বানাতে পারবে।

তা এখানে কোন্ ব্যবসা করবেন ঠিক করেছেন?

মহুয়া, নিম, আর করৌঞ্জের সীড থেকে তেল বানাবো একস্ট্রাকশান প্লানট বসিয়ে লিয়ে।

এই তেল কারা কিনবে?

আর্‌রে ম্যানেজার সাব!

বলে তাচ্ছিল্যব দৃষ্টিতে তাকাল পৃথুর দিকে অ্যাকাউন্ট্যান্ট টিবরেওয়াল। বলল, সব শালা

কিনবে ?

সব শালা মানে ?

টিববেওয়াল বলল, যদি শেষমেস ফেক্টবী হয ত হাটচান্দবা শেল্যাক ফ্যাক্টবী থেকে দু একজন লোক ভাগিয়ে আনতে হবে ম্যানেজাব বাবু।

পৃথু জবাব না দিয়ে একবাব তাকাল টিববেওয়ালেব মুখেব দিকে। টিববেওয়াল কি দেখল পৃথুব মুখে বুঝল না, কিন্তু ওব মুখটা হঠাৎই অপ্রতিভ দেখাল

বলল, চলি ম্যানেজাববাবু!

যে শালাদের তেল-ফেলেব সাবুনেব কাববাব আছে। কিনবে না কোন্ শালা ?

এতদূর থেকে পাঠাবেন, ট্রান্সপোর্ট কস্ট বেশি পড়ে যাবে না ? টিববেওয়াল পৃথুকে অ্যাপ্রিসিয়েট কবে তার পিঠে এক চাপড় মেরে বলল, সেইই ত হচ্ছে কোথাবে ভাই ! ট্রান্সপোর্ট কেস্টেই তো সত্যনাশ হোবে। সেইই ত হচ্ছে পোবেবলেম। ভাবতেছিলম কি, দুই সাড়ুভাইতে যুক্তি করে ইখানে ইকটা সাবুনেব ফেকটবী বসিয়ে দলে কেমোন হয ?

কেমোন হয় তা পৃথুর জানা ছিলো না।

দূব থেকে হাটেব কোলাহল ভেসে আসছিল। লাল ধূলোব মেঘ ঝুলে আছে চাঁদোয়াব মতো হাটের উপরে। গরু-মোষেব গাযেব গন্ধ। কেরোসিন তেল, শবেব তেল খোল আর শুখা মহুযাব গন্ধব সঙ্গে মিশে গেছে গুড় আব পাকৌড়া আব নাবী পুরুষেব গাযেব গন্ধ। এক একটি হাটের গাযের গন্ধ একেক বকম! নাবীব গাযেব গন্ধেরই মতো।

যাতে সহজে নতুন হাটে একে অন্যকে খুঁজে পায়, তাই দিগা পরেছিল পৃথুব পুবোনো-হয়ে-যাওযা ঘোব লাল রঙা একটি ফ্লানেলেব গেঞ্জি তাব ধুতিব উপবে। যদি সেই ঘোব লালিমাব প্রতি মোষ এবং ষাঁড়েব ক্রোধ থেকে প্রাণে বেঁচে ঠুঠা আদৌ হাটে পৌঁছতে পেবে থাকে তবে তাকে খুঁজে বেব করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। বিগু বলেছে, সে ঠুঠাকে হাবিযে যেতে দেবে না। পৃথুকে খোঁজা ত আজকাল কোনো কঠিন কাজই নয। ও ছাড়া হযত আব একজন দুজন খোঁড়া ভিখিরী-টিখিবী থাকবে হাটে।

হাটের ভেতরে মানুষের নানাবকম বিপবীত স্রোত থাকে। ক্রাচ-এ চলাফেরা কবতে এখনও অনভ্যস্ত পৃথু তার ভিতবে গিয়ে পড়লে হযত টাল সামলাতে পাববে না এ কথা ভেবে হাটের কাছেই একটি কালভার্টের উপবে বসল শিবিষ গাছেব ছাযায। ক্রাচ দুটোকে শুইয়ে রাখল পাশে। তাব চারপাশে প্রচণ্ড শব্দে নানা মানুষের জীবন দ্রুত বযে যাচ্ছে। দেনা পাওনা, ক্ষিদে তৃষ্ণা, ছিটের ব্লাউজের মধ্যে করে সাবধানে দূব থেকে নিযে আসা মুবগী তিতিবেব ডিম। সুন্দবী সব নানাবঙা পবিষ্কাব- পরিচ্ছন্ন মুরগী। এই সব মুরগী দেখলে পুষতে ইচ্ছে কবে। খেতে মন চায না। অনেক নারীকে দেখে যেমন মনে হয যে, তারা শুধু দেখার জন্যে, স্তুতি করার জন্যে, আদর কবাব মতো নোংরা ব্যাপারের কথা যাদের সম্বন্ধে ভাবাই যায় না।

ওর চারধারের এই আবর্তিত জলরাশির মতো নারীপুরুষের আবর্তন, মাতালেব চিৎকার, নাপিতের কাঁচির কচ্‌কচ্, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি খারাপ মেয়ের গ্রাহকদের সঙ্গে নিচুগলায় দরদস্তুর করা, এই সবের কিছুমাত্রও পৃথুকে ছুঁতে পর্যন্ত পাচ্ছে না। যে রাতে এসে বৃষ্টির মধ্যে সীওনীতে বাস থেকে নেমেছিল সেই রাতে যে ছোট্ট ছেলেটি হঠাৎ 'বাপু' বলে ডেকে তাকে টুসুর কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল, সেই ছেলেটিকে যদি আরেকবার দেখতে পায় পৃথু সেই আশায় চেয়ে ছিল সে ভীড়ের মধ্যে।

নিজের ভাবনার মধ্যে বেঁহুশ হয়েছিল পৃথু। আবারও চাঁদে চলে গেছিল। "ল্য গার্স এ দাঁ লা লুন্যে"। ওর চাঁদে এখনও কোনো শব্দ নেই, কোনো নভোচারী হাঁটে না এখানে, চরকা-কাটা বুড়ি এখনও নিশ্চিন্তে বসে চরকা কাটে সেখানে, পুব আফরিকান রুয়োঞ্জোরী রেঞ্জেব মাউনটেইন অফ দ্য মুন—চাঁদের পাহাড়ের মতোই শান্ত স্নিগ্ধ সেই চাঁদ, তার ভাবনার জগৎ।

কে যেন তার পাশে এসে বসল কালভার্টে। ছাগলটাগল হবে। ছাগলের পাশে ছাগল ছাড়া কেই

বা বসবে ? পাঁঠাও বসতে পারে। চোখের কোণে লক্ষ্য কবল।

ছেলেটা কোথাওই নেই ভীড়ের ভিতরে। টুসু এখন কী করছে কে জানে ? মিলি ? তুই আমাকে না ভাল বাসতে পারিস, আমি তোকে খুউব ভাল বাসি রে মিলি। তুই যখন ছোট্ট ছিলি, তখনও টুসু হয়নি, তোর গা দিয়ে বেবী পাউডারের গন্ধ বেরুত মিষ্টি মিষ্টি। সেই মিষ্টি আধো-আধো কথা বলা মিলিটা কত কঠিন কঠিন কথা লিখলি তোর বাবাকে। কষ্ট হলো না ? এতটুকুও ? যাকগে যাক। আমি ত বাবা! আমি কি তোকে ভাল না বেসে পারি ?

আর রুষা ? তুমি কি করছ গো ? আমার সুন্দরী বিদুষী বৌ ?

এখন ত তুমি নাকে চশমা এঁটে গম্ভীবমুখে ভবিষ্যৎ ভারতের ইংলিশ মীডিয়াম স্কুলে-পডা তালেবর সব নাগরিক তৈরী করতেই ব্যস্ত।

ঠুঠা আর বিগুন কোনো টিকিই দেখা যাচ্ছে না। গেল কোথায় তারা ?

পৃথু ভাবল, উঠে একটু খোঁজ কবে।

উঠতে গিয়ে হাত বাড়িয়েই দেখল পাশে ক্রাচ দুটি নেই। ডানদিকে তাকাতেই থমকে গেল চোখ। কুর্চি! একটি কালো তাঁতের শাড়ি পরে কালভার্টের উপর বসে তার দিকে চেয়ে আছে। রোদে তাব কানের লতি আর গাল লাল হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না পৃথু।

কথা বলবেন না ?

প্রথম কথা বলল কুর্চি। হাসি-হাসি মুখে। রোগা হয়েছে। রোগা হয়ে যেন আরও বেশি সুন্দবী হয়েছে কুর্চি। উজ্জ্বল দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখের মণিতে ক্যামেবার লেন্সের মতো নানাবঙে-বাঙা হাটেব ছায়া পড়েছে।

পৃথু কথা না বলে মোহাবিষ্টের মতো চেয়ে রইল তখনও কুর্চির মুখের দিকে।

কুর্চিই আবার বলল, কাকে খুঁজছেন ? কাউকে কি খুঁজছিলেন ?

পৃথু বলতে গেছিল, তোমাকেই। কিন্তু বলল না। মুখে বলল, ঠুঠা বাইগা।

ওঃ। তা সে ত শিশু নয়, হারিয়ে যাবে না।

যেতেও পাবে। বলা যায় না। আসলে ও কিন্তু শিশুই। শরীরেই বড় হয়েছে ও।

কুর্চি হাসল। বলল, আপনারই মতো অনেকটা।

তারপরই বলল, ছেলেধরা দেখেছেন কখনও ?

না। কেন ? তবে, ছেলে ধরতে এসে যারা ধরা পড়ে তাদের মেরে প্রাণ বের করে দেয় শুনেছি।

হুঁ। আমিও তাইই শুনেছি। তাইই ভয় হয়। নইলে শিশু চুরি কবতে খুব ইচ্ছে করে আমারও। মাঝে মাঝে।

পৃথু বোকার মতো বলল, কেন ? হঠাৎ ?

না। মানে প্রাপ্তবয়স্ক শিশু।

হেসে ফেলল পৃথু।

তোমার হাট হয়ে গেছে ?

না। কুন্তীকে পাঠিয়েছি। ঐ যা হয় নিয়ে আসবে। মহারানীর হাট ত নয় আর!

নিজে হাটে যাওই না ? ভাল লাগে না তোমার ?

লাগে। তবু। একা একা ভাল লাগে না। মানুষকে বোধ হয় ঈশ্বর একা থাকার জন্যে তৈরী করে পাঠাননি।

তাইই ?

পৃথু বলল।

চলুন উঠি আমরা।

ওরা ?

ওরা ঠিক খুঁজে নেবে আমাদের যার যার ডেরায়। হারাতে চাইলেই কি আর চিরদিনের মতো

হারানো যাবে ? কী অবিচার বলুন ত ! হারাবার সুখটাও ত অবিচ্ছিন্ন হতে পারত ! তাও কত কম স্থায়ী। কোনো মানে হয় ?

তোমার বাড়ি কতদূর ?

কাছেই।

এখন কাছই আমার কাছে অনেক দূর। অনেক সময় লাগে একটু যেতে।

জানি। যত সময়ই লাগুক। অপেক্ষা করব আমি।

আগে আগে না গিয়ে আমাব সঙ্গে সঙ্গে চল। পৃথু বলল।

মুখ তুলে তাকাল কুর্চি পৃথুর মুখে' বলল, তাইই ত চেয়েছিলাম একদিন। আপনিও ত আগে চ'লে গেলেন আমাকে পিছনে ফেলে।

অন্য কথা বল। কেমন আছো ? সুখে আছো ত ?

হ্যাঁ। না থাকার কী ? সুখ মনে করলেই সুখ। সুখকে ত আব হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায় না। মনেরই একটা অবস্থামাত্র তা। মনকে সুখী সুখী ভাব করতে বললেই মন সুখী হয়।

তাইই ?

হাসি হাসি মুখে বলল, পৃথু।

সুখী সুখী ভাব হলে কেমন দেখায় মনকে ?

কুর্চিও হাসি হাসি মুখে পৃথুর মুখের দিকে তাকাল পাশে হাঁটতে হাঁটতে। মুখ তুলে বলল, গেরোবাজ মেয়ে-পায়রার মুখে মনোযোগ সহকারে তাকিয়েছেন কখনও ? ওদের মুখে যেমন সুখী সুখী ভাব থাকে, চোখেব লাল মণি যেমন চমকে চমকে ঘোরে, তেমন।

পৃথু ভাবছিল, এও এক রকম ওয়ার্ড-মেকিং খেলা। শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন নয়, ছবি দিয়ে ওয়ার্ড-মেকিং। বেশ খেলা। নির্দোষ আনন্দের।

কুর্চি বলল, আজ রাতে আমার কাছে খাবেন ত ?

কি খাওয়াবে ?

এখন ত আমি গরীব হয়ে গেছি। অতি সাধারণ খাওয়া। কিন্তু এর একটা আনন্দ আছে। আমরা এ দেশেব মেয়েরা যেদিন সত্যিকাবেব স্বাধীন হব, আজ আমি যেমন হযেছি, দাযে পড়ে, সেদিনই আমাদেব জীবনে প্রেমের সার্থকতা অনুভব কবতে পারব আমরা। স্বামীর রোজগারে যে মেয়েরা খেয়ে-পবে থাকে, সে রাজবানীর মতো থাকলেও, তাদের অনেক কষ্ট। পোষা বার্ড অফ প্যাবাডাইস তারা। তার চেয়ে আমার মতো ছোট্ট মযনা বা কোকিলেবও স্বাধীনতার দাম অনেক। আজ আপনাকে আমি খাওয়াব কলাই ডাল, আর আলু পোস্ত, আর মোটা চালের ভাত। আপনি চাইলে, কাঁচা লঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজও দেব। আজ যে আমার কত আনন্দ হবে কী বলব ! যাকে ভালবাসি, তাকে স্বামীর পয়সায় খাওয়াতে বিবেকে বড় লাগে। সব মেযেবাই এ কথা জানে। এখনও আমরা বাঁদী হয়েই আছি। অন্তত নিজের হাত খরচটা নিজে রোজগার করে নিলেও অনেক। নইলে, স্বামীর সঙ্গে থাকতে থাকতে নিজের চরিত্রটাও স্বামীরই মতো হয়ে যায়।

তা হয়ত হয়। প্লান্ট লাইফে অ্যাকুযার্ড ক্যাবাক্টাবিস্টিক্স বলে একটা কথা আছে। আনারসের বনে যদি কলাগাছ পুঁতে দাও, কিছুদিন পরে নাকি কলাগাছের পাতাও আনারসের পাতার মতো হয়ে যায়। তবে আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে ত কোনো তফাৎ নেই। যা স্বামীর, তাইই স্ত্রীর।

এ সব কথা পুরুষেরা তাদের সুবিধার জন্যেই এতদিন বলে এসেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে মেয়েব নেই তাকে বাঁদী হযেই থাকতে হয়। আপনারা যাইই বলুন না কেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে গেল ওরা কুর্চির বাড়িতে। শাল কাঠের খুঁটি দেওয়া উঠোন। তাতে নানারকম লতানো ফুলেব গাছ। লাইন করে সোনাঝুরি গাছ লাগানো অনেক। থোকা থোকা ফুল ধরেছে তাতে। দুটি ঘর। পিয়াশাল কাঠেব দরজা জানালা। মাথার উপরে খড়ের চাল। মাটির দাওয়া। মাটির দেওয়াল। আদিবাসীদের বাড়ির মতো রঙ কবা দেওয়ালে। ছবি আঁকা তাতে।

বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার বের করে দিল কুর্চি। ক্রাচ দুটো নিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে

রাখল। বলল, বেলা বড় তাড়াতাড়ি পড়ে যাবে। লম্ফ জ্বেলে রান্না করা ত অভ্যেস নেই। আমি তাড়াতাড়ি রান্না সেরে নিই। কুন্তী ডিম নিয়ে আসবে। ওমলেট্ আর চা করে দেব তখন আপনাকে।

পৃথু বারান্দায় বসে ভাবছিল, যদি ভালবাসা থাকে তবে ঘরবাড়ি কেমন তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না। মনের, রুচির, মানসিকতার মিলই হচ্ছে আসল। সেই বাঁধনে বাঁধা হলেই ঘর হয়, নইলে নয়।

কাঁচা কলাই-এর ডালে শুকনো লঙ্কা আর কালোজিরের ফোড়ন দিল কুর্চি একটু পর। নিজেও হেঁচে উঠল হ্যাঁচ্চো বলে। বারান্দায় বসে পৃথুও হাঁচল। কুর্চির চিঠিতে-লেখা সেই পাগলা কোকিলটা ডেকে উঠল। বারবার ডাকতে লাগল। বসন্ত অপগত হলেও ও যেন কী করে জেনে গেছে যে বসন্ত এসেছে এই কুঁড়ে ঘরে। খুব ভাল লাগছিল পৃথুর।

ঠুঠা বাইগা আর বিগু এতক্ষণে হয়ত গরু খোঁজা খুঁজছে তাকে। ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে। খুঁজুক একটু। অনেক অনেকদিন ধরে ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়া কুর্চিকে খুঁজছে পৃথু। আজকে ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়া পৃথুকে খুঁজলই না হয় একটু ওরা।

একটু পরে কুন্তি এল ঝুড়ি মাথায় করে। পৃথুকে দেখে অবাক হল। লাল একটি ব্লাউজ, নীল শাড়ি, লম্বা ছিপছিপে পরমা সুন্দরী গোন্দ মেয়ে সে। পৃথুর দিকে একটু সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে সে ভিতরে গেল। ও আসতেই কুর্চি বেরিয়ে এল বাইরে। বলল, চায়ের জলটা চাপিয়ে দে কুন্তী। আর দুটো ডিম ভেঙ্গে পেঁয়াজ লঙ্কা কুচিয়ে ফেটিয়ে রাখ্ আমি আসছি। নুন টুন দিস না।

দাওয়ায় বসে কুর্চি বলল, বলুন এবারে।

আজ স্কুলে যাওনি কেন ?

কোন্ স্কুলে ?

দিসাওয়াল সাহেবের স্কুল।

হেসে ফেলল কুর্চি। বলল, ও, কে রায় ? সে আমি নই। কাকলী রায় বলে একটি মেয়ে আছে। দিসাওয়াল সাহেবের বিড়িপাতা বাবু শ্যামাকান্ত রায়ের শালী সে।

তুমি নও তাহলে ?

না স্যার। সব কে রায়ই কি এক ? আমি কুর্চি। কুর্চি একজনই হয়।

হাসল পৃথু।

খাওয়াচ্ছ ত খুব। তারপর ভাঁটু এসে যখন আমার পেট ফাঁসাবে তখন কি হবে ?

হাসতে গিয়েও থেমে গেল কুর্চি। বলল, ওর কথা থাক।

ভাঁটুর কাছে হেরে গেলাম আমি, কুর্চি।

আমিও। কুর্চি বলল। কখন কে যে কার কাছে হারে কে তা বলতে পারে ? আমার কাছে, আমার মতো একটা সামান্য মেয়ের কাছে হেরে গেলেন রুষা বৌদি। ইদুরকার কোনো ব্যাপারই নয়। আপনারা মেয়েদের একটুও বোঝেন না। আসলে রুষা বৌদির অভিমানে এতই লেগেছিল যে ঐ ভাবে আপনাকে শিক্ষা দিলেন আপনি। দারুণ মেয়ে কিন্তু উনি। ওঁর মতো হতে হয়ত সব মেয়েরই ইচ্ছা যায়, কিন্তু সাহসে কুলোয় না।

পৃথু বলল, তোমাকে একটা কথা বলব ? যতদিন আমি সীওনীতে থাকি, আমবা দুজনেই রুষা এবং ভাঁটুকে নিয়ে কোনো আলোচনা করব না। আমার আর তোমার এই দুজনের মধ্যে কি আলাদা কোনো সম্পর্ক হতে পারে না ?

পারবে না কেন। প্রত্যেকটি সম্পর্কই আলাদা আলাদা। কিন্তু চলে যাবেন কেন ? যাওয়ার জন্যেই কি এসেছিলেন এত জায়গা থাকতে সীওনীতে ?

যাবই যে, তা ত বলিনি কুর্চি। আসলে আমি কখন যে কি করি তা তার আগের মুহূর্তেও নিজেই জানি না।

যা ভাল মনে করেন ! আপনার ওপর জোর ত আমার কিছু নেই।

কুর্চি বলল, মুখ জঙ্গলের দিকে ঘুরিয়ে।

পৃথুর খুব ইচ্ছে করল কুর্চির বিমর্ষতাকে একটু আদর দিয়ে খুশিতে ভরে দেয়।

যখন অনেকই বাধা ছিল তাকে একটুক্ষণের জন্যে কাছে পাওয়াব তখন ছিঁচকে চোরের মতো মানসিকতা ছিল ওর। এখন, যখন জানেই যে কুর্চি দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই তারই হতে পারে তখন আর তাড়া বোধ করল না কোনো। ও যে কাছে আছে, খুবই কাছে ; হাত বাড়ালেই যে তাকে পেতে পারে এই জানাটাই তাকে সংযমী, উদাসীন করে তুলল। যা সহজেই পাওয়া যেতে পারে, তা না পাওয়ার মধ্যে যে সংযম তার গভীর আনন্দে বুঁদ হয়ে,বসে-থাকা কুর্চির মুখখানিকে পাশ থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল পৃথু।



এই নতুন কাজে কিন্তু বেশ মন লেগে গেছে। হাটচান্দ্রাতে শুধুই একজন এঞ্জিনীয়ার ছিল ও। "মাস্টার অফ ওয়ান ট্রেড"। আর এখানে এখন "জ্যাক অফ ওল্ ট্রেডস্, মাস্টাব অফ নান্"।

"জ্যাক্" হওয়াতে যে এত আনন্দ, সে সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই ছিলো না। অনেকরকম কাজ একটু একটু করে করার মধ্যে যে বৈচিত্র্যব ঘনঘটা তা একই কাজ অনেকক্ষণ ধবে করার মধ্যে একেবারেই নেই। এ এক নতুন আবিষ্কার। কাহলিল্ গিব্রানেবই 'দ্যা প্রফেট'এ আছে না ? কাজ সম্বন্ধে কিছু কথা ?

"ওয়ার্ক ইজ লাভ মেড ভিজিবল্"।...এণ্ড ইফ উ্য ক্যানট ওয়ার্ক উইথ লাভ বাট ওন্‌লী উইথ ডিস্‌টেস্ট, ইট ইজ বেটার দ্যাট উ্য শুড লীভ ইওর ওয়ার্ক এণ্ড সিট অ্যাট দ্যা গেট অফ দ্যা টেম্পল্ এণ্ড টেক্ আল্মস্ অফ দোজ হু ওয়ার্ক উইথ জয়"।

"ওয়ার্ক ইজ ওয়রশিপ্" কথায়ই বলে। কাজ যদি আনন্দই না হয়ে ওঠে, যদি ব্রত না হয়, না হয় পুজো তাহলে সে কাজে সিদ্ধি ত আসেই না, উল্টে এক গভীব ঘৃণাই ক্রমশ অবচেতনে জমতে জমতে নিজেকে কুরে কুরে খেয়ে যায়।

কাজ করাটা, যতটা মালিকের জন্যে তার চেয়েও অনেকই বেশি যে নিজেরই ভালর জন্যে, মানুষ হিসেবে আত্মসম্মান নিয়ে, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্যে ; এই কথাটা অনেকেই বোধহয় পুরোপুরি বোঝেন না।

দিসাওয়াল সাহেবের অফিস ঘরেব দবজার কাছে একটি পোস্টার আছে। তাতে লেখা "নাথিং ক্যান ডিস্টার্ব মী: বাট মাইসেল্ফ"। কী চমৎকার কথাটা। সত্যিই ত ! মানুষকে সে নিজে ছাড়া অন্য কেউই বিরক্ত বা বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত করতে কি পারে ? যদি মানুষের মতো মানুষ হয় সে।

কোথায় যেন পড়েছিল, কোনো মনস্তত্ত্বর বইয়েই বোধহয় যে, মানুষ যখন একেবারে একা থাকে তখন সে যে-মানসিক স্তরে থাকে, সে আসলে ঠিক সেই স্তরেরই মানুষ। অর্থাৎ, যে মানুষ একা হলেই ঈশ্বরচিন্তা করে সে ধার্মিক। যে প্রেমিকার কথা ভাবে, সে প্রেমিক। যে ছেলেমেয়ে স্ত্রীর কথা ভাবে সে সংসারী। যে খাওয়ার কথা ভাবে সে পেটুক। টাকার চিন্তা যে করে, সে বৈষয়িক। যে বলাৎকারের কথা ভাবে সে বলাৎকারী। আর যদি কেউ লেখক হবার কথা ভাবে, পৃথু ঘোষের মতো, সে লেখকই। মানুষের বাইরের আবরণ, তাব পেশা, তার বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব যাই-ই হোক না কেন ? নির্জনের অবকাশের একাকী ব্যক্তিত্বটাই তার আসল ব্যক্তিত্ব।

এত কথা ভাবছিল পৃথু, কুর্চির বাড়ির দিকে একা একা হেঁটে যেতে যেতে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জায়গাটা এতই নির্জন যে, সন্ধ্যের পর কেউই বিশেষ বের হয় না বাড়ি থেকে এদিকে। ক্রাচ্ নিয়ে, হাতে টর্চ নিয়ে হাঁটতে অসুবিধে হয় একটু। পরে, অভ্যেস হয়ে যাবে।

দূর থেকে পা-মেসিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। ঝর্‌ঝর্।

খুবই পরিশ্রম যায় কুর্চির। 'ওকে আর্থিক সাহায্য সহজেই করতে পারে পৃথু, কিন্তু করে না। অবশ্য কুর্চি গ্রহণ করবে না জানে বলেই করে না। খুবই ভাল লাগে ওর কুর্চির এই নরমহাতের জীবন-সংগ্রামকে, খুব কাছ থেকে দেখতে। রুষা আর কুর্চি দুই মেরুর নারী। কিন্তু এক জায়গায় ওদের খুবই মিল। ওরা দুজনেই এক নতুন প্রজন্মের নারী। নারীরা যে শুধুই কাব্য করার নয়, আদর করার রাবার-ডল নয়, বাবা বা স্বামীর আশ্রিত এবং শাসিত দম-দেওয়া কলের খেলনা নয় ; তারাও যে আলাদা মানুষ এবং মানুষের মতো বাঁচার অধিকার শরীরে এবং মনে তাদেরও যে পুরোপুরিই আছে এই জানাটা ওরা দুজনেই জেনে গেছে। ওরা দুজনেই ভারতবর্ষের আগামী প্রজন্মর নারী। যে নারীদের নিয়ে বহু সহস্র বছরের বদভ্যাসে-অভ্যস্ত পুরুষমাত্রেরই সমূহ বিপদ ঘটবে। অথচ উদার পুরুষেরা এমন নারীদের চিরদিনই সম্মান করে এসেছে এবং করবে। ঔদার্য্যের মুখোস-পরা পুরুষ নয় ; প্রকৃতই যারা উদার মনের পুরুষ।

পৃথুর পায়ের শব্দ পেয়ে কুকুরটা ভুক্ ভুক্ করে উঠল। কুকুরটাকে সেদিন লক্ষ্য করেনি।

কুর্চি বলেছিল, হাটের দিনে হাটে অনেকই লাল কালো সাদা যুবতী কুকুরী আসে। তাইই যতক্ষণ হাট থাকে, ততক্ষণ সেখানেই কুকুরটা মজা করে, কুকুরদের আড্ডাবাজী, কাঁকড়া-কাঁকড়ি করে তারপর বাড়ি ফেরে। কুকুরটার নাম 'বেটা'। কুন্তীর কুকুর।

পৃথু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, কুন্তী। কুর্চি।

সাড়া নেই।

কুন্তীর কুকুর ভুকে এল ওকে তাড়া করে।

ভেতর থেকে এবারে কুর্চির গলা শোনা গেল। "বেটা। বেটা!"

তারপর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কুর্চি বলল, কওন্ ?

আমি ! কুর্চি আমি।

পৃথু বলল।

ও। আসুন ! আসুন ! বলেই, কুকুরটাকে বলল, এই বেটা ! আমাদেরই লোক। আমার লোক। চুপ কর্। একদম চুপ। চিনে রাখ্ ভাল করে।

লণ্ঠন হাতে করে পৃথুকে সঙ্গে করে ঘরে গেল কুর্চি।

কুন্তী কোথায় ?

আর বলবেন না। কী ঝামেলায় যে পড়েছি না ! রমেশ শুক্লা তার সব কামিনদের জন্যে ব্লাউজ আর সায়ার অর্ডার দিয়েছেন। মুনাফাও ভালই থাকবে। দিতে হবে তিনদিনের মধ্যে। মেয়ে দুটি আর আমি ত সারা দিন কাজ করিই। তারপর রাতের বেলাও কাজ করতে হয় আমাকে। ওরা বেলাবেলি চলে যায়। তারপর কি আর কারো রাঁধতে ভাল লাগে ? বলুন ? ও থাকলে, যা হয় একটু নেড়ে চেড়ে দিত। তাছাড়া, নিজের জন্যে কোনো মেয়েরই রাঁধতে ভাল লাগে না। কেউ সেই রান্না তারিফ করার থাকলে, তবেই না....।

পৃথুকে বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, কুন্তী আজ বিকেলে হুট্ করে চলে গেল। বলল, পরশু দিন ফিরবে। ওর ঘরে নাকি কি গণ্ডগোল হয়েছে।

তাহলে ? আজ খাবে কি ?

খাবো না কিছুই। দুধ আছে। এক গ্লাস গরম করে খেয়ে শুয়ে পড়ব।

বাঃ। এমন করলে, শরীর থাকবে ?

শরীর ? শরীর কি আছে নাকি আমার ? ..তবে শরীর নাইই বা থাকল, মন ত থাকবে।

কথার খোঁচাটা বুঝল পৃথু।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আজকে তাহলে তুমি একাই রাত কাটাতে এখানে ? ভয় করত না ?

নাঃ। কেন ? বেটা আছে ত'!

সত্যিই কি ভয় করত না ? শুধুমাত্র বেটার ভরসায় এখানে থাকতে ত আমারও ভয় করত।

পৃথু বলল।

সত্যি বললে বলব, করত ভয়। কিন্তু আমি ত একা নই পৃথুদা। আমার মতোএবং আমার চেয়েও অনেক বেশি অসহায় অবস্থায় অনেক মেয়েই আছে। ভয় করার যাদের উপায় নেই ; তাদের ভয় করাব বিলাসিতা কি মানায় ?

তুমিই না লিখেছিলে, চুরি হয়ে গেছিল সব একবার ?

হ্যাঁ। তবে সব মানে ? সম্পত্তি ? হ্যাঁ ! তা গেছিল। আপনার লেখা চিঠিগুলোও। সেটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি আমার। জানি, এই জীবনে এরকম চিঠি আর আপনি লিখতে পারবেন না। আমিও পারব না লিখিয়ে নিতে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, জানেন ? পরে সে চোর ধরাও পড়েছিল। এখানের কোতোয়ালীর দারোগাসাহেব খুব জবরদস্ত মানুষ। চোবকে দেখে কিন্তু আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছিল।

তোমার ? কেন ?

পৃথু শুধোল।

চোরটা কী ভাল আর নির্দোষ যে দেখতে ! কী বলব আপনাকে ! ও চুরি করতেই পারে না কিছু, কাবো মন ছাড়া।

বাঃ শুনতেও ভাল। চোরকে ভাল দেখতে, তাতে তোমাব মন খাবাপ হবে কেন ?

পৃথু হেসে বলল।

হবে না ? আমি যে একা-ঘরে ঘুমিয়ে ছিলাম। সেই হ্যাণ্ডসাম হতভাগার কাছে আমার মতো একজন ঘুমন্ত নারীর চেয়েও ছিট-কাপড়েব গাঁটরীটার দামই বেশি হল ? অপমান করুক সে, তা চাইনি তবে আমাকে না জানিয়েও আমার ঘুমন্ত সৌন্দর্যর সম্মান ত দেখাতে পারত একটু !

একটু চুপ করে থেকে বলল, কত রকম পুরুষই যে থাকে। সত্যি। আচ্ছা আপনি যদি আমার ঘবে সিঁদ কেটে চুবি কবতে আসতেন তবে প্রথমেই কি চুরি করতেন ? ঐ গাঁটরীই কি ?

কথাটা ঠাট্টা হিসেবেই বলেছিল কুর্চি এবং ঠাট্টাই থাকার কথা ছিল। কিন্তু ঠাট্টা থাকল না।

পৃথু গম্ভীব হয়ে গেল। কুর্চিও মুখ নামিয়ে নিল।

হ্যারিকেনের আলোর বিপরীতে দাঁড়ানো কুর্চির খোঁপা, ওর মরালী গ্রীবা ছায়ার তুলিতে এমনভাবে মাটির দেওয়ালে আঁকা হয়ে গেল যে, জীবনানন্দর কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল পৃথুর।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ঝর্ণাটা বয়ে যাবার কুলকুল শব্দ, জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসছিল। সেই শব্দ আর উঠোনে শুয়ে থাকা বেটার খচর-খচর করে পা-দিয়ে গা-চুলকানোর শব্দ ছাড়া এখন আর কোনোই শব্দ নেই। পিয়া শাল কাঠের টেবলের উপরের রাখা ছোট্ট টাইম-পীসটাই, শুধু ঝিক ঝিক্ ঝিক ঝিক শব্দ করে ক্ষুদে-দাঁতি করাতের মতো, সময়কে চিবে চিরে ফালা ফালা করছিল।

হঠাৎই একটা পিউ-কাঁহা পাখি ওদের দুজনের মস্তিষ্করই মধ্যে যেন চিৎকার করে উঠল : পিউ-কাঁহা ? পিউ-কাঁহা ? পিউ-কাঁহা বলে। তারপরই, তাব আওয়াজটা ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল পাহাড়তলার দিকে।

ব্রেইনফিভার।

স্বগতোক্তির মতো বলল কুর্চি।

ব্রেইনফিভারই বটে !

নিরুচ্চারে বলল পৃথু।

পৃথু কুর্চির একটু আগেই বলা কথাটির খেই ধরে বলল, আমি কি কখনও কিছু চুরি করতে চেয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে ? মনে ত পড়ে না।

কুর্চি মোড়ার উপরে বসল এসে। চুড়ো করে চুল বেঁধেছে। হলুদ-সাদা ছাপা শাড়ি। খোঁপাতে হলুদ সোনাঝুরি ফুল। এবার তার ছায়াটা অন্যরকমভাবে পড়ল দেওয়ালে।

কুর্চি ভুরু তুলে বলল, ডাকাতরা কি ছিঁচকে চুরিতে বিশ্বাস করে ? ডাকু মগললাল ? মগনলালকে যে ডাকাত মারল, ডাকু পৃথু ? যাইই বলুন, আর তাইই বলুন, হৃতই যদি হতে হয় তবে ডাকাতের হাতেই হওয়া ভাল। এমনকি সর্বস্বহৃতও। সেই সুন্দর চোরটাকে দেখে এই কথা বলেই বুঝ দিলাম নিজেকে। তবু, চোরের দ্বারা হৃত হওয়া আর মারুতি গাড়ি চাপা পড়ে মরা একই ব্যাপার। চাপা পড়েই যদি মরতে হয়, টাটার ট্রাকের নিচেই মরব। সবাই বলবে, আহা ! বড্ড লেগেছিল গো।

মেয়েদের চোখে বোধহয় সব চোরই সুন্দর। রোম্যান্টিকতার সীমা একটা থাকা উচিত।

বলেই হেসে উঠল পৃথু।

হেসে উঠল কুর্চিও।

ঠিক কতদিন পরে যে ওরা দুজনে এমন করে মুখোমুখি বসে হাসল তা মনে করতে পারল না দুজনের কেউই। হাসতে ভুলেই গেছিল বোধহয় ওরা। নিজের নিজের কারণে। আলাদা আলাদা কারণে।

পৃথু বলল, সেলাই রাখো এখন। চলো আমার সঙ্গে, আমার বাংলোতে। আজ ওখানেই খাবে। থাকবেও রাতে ওখানে।

না, না। তা হয় না। থাকব ? আমার ভয় করে পৃথুদা। খুবই ভয় করে।

কেন ? ভয় করে কেন ? কিসের ভয় ?

জানি না। করে। হয়ত নিজেকেই। তার চেয়ে বরং আপনিই থাকুন এখানে। কুন্তী নেই। একদম একা থাকতে ভয়ও করত।

তারপর মুখ নামিয়ে বলল, কিন্তু আপনি আমার সমস্ত সম্পত্তি আগলে রাখতে পারবেন ত ?

তা না হয় সামলে-সুমলে আগলে রাখলাম। কিন্তু আমার লোভ ? সেই সর্বনাশাকে কে আগলাবে ?

যা আপনারই, তার প্রতি লোভ হবেই বা কেন ? শিশুরাও ত নিজের বাড়ির ফ্রিজে-রাখা চকোলেট চুরি করে খায় না ? কি ? খায় ?

পৃথু জবাব দিলো না।

না বলে, বলল, বাধাটা সেখানে নয়। যখন বাধা ছিল, প্রচণ্ড বাধা ছিল তোমারই দিক থেকে, তখন সেই বাধা অতিক্রম করার জন্যে এক দুর্মর জেদ পৃথুকে কামড়ে খেত অনুক্ষণ, জংলী কুকুরেরই মতো। আর বাধাটাই যখন অপসারিত হয়ে গেল, কুর্চির সম্মতিতে তখনই প্রচণ্ড ভাবে ওকে পাওয়ার ইচ্ছা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ! এই সামান্য পথটুকু অতিক্রম করতেই বড় দ্বিধা, ভয়, সংকোচ। কুড়েমিও লাগছে একধরনের। আসন্নপ্রসবা হরিণীরই মতো যেন শ্লথ হয়ে গেছে সেদিনের চকিতচিতার মত তীব্রগতি কামনা।

এখন কুর্চিকে পেতে তারই অনেক বাধা। ভিতরের বাধা। ভাবছিল, টুসু যদি তাকে আর কোনোদিনও বাবা বলে সম্মান না করে ? যদি টুসু কোনোদিনও জানতে পেরে যায় কুর্চির সঙ্গে তার ওই সম্পর্কর কথা ? জানতে পাবলে, টুসুর চোখে রুষার সঙ্গে পৃথুর তফাৎ আর থাকবে কতটুকু ? শরীরই ত মানুষের সব নয় ! হয়ত অনেকখানি, তবুও কখনই সব নয়। তার চাহিদা যতই থাকুক না কেন, মনের শাসন, মনের বক্তব্যর চেয়ে শরীরের ভূমিকা কখনই বড় হলে চলে না কোনো মানুষেরই জীবনে। রুষা তার ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে পৃথুর অদ্ভুত জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহর সঙ্গে তার শারীরিক সুখকে পুরাপুরি গুলিয়ে ফেলেছিল। কন্‌ফিউসড হয়ে গেছিল বেচারী। নইলে, অফ ওল্ পার্সনস ইদুরকারের কাছে সে যেতো না।

কুর্চিকে সে মনে মনে এতই তীব্রভাবে ভালবাসে, আজও বাসে যে, শারীরিক সম্পর্ক সত্যি

সত্যিই হয়ে গেলে, কুর্চির সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়বে বাকি জীবনের মতো। বিজলীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক আর কুর্চির সঙ্গে শারীবিক সম্পর্ক হওয়া এক নয়'। তাহলে, আবারও অন্য মিলি, অন্য টুঁসু, আবারও দুখী, মেরী, আবার সেই সংসার ! নতুন করে। না। না। না। একবারেই যথেষ্ট হয়েছে। আর না ! তাছাড়া, ও ত সংসারী টাইপ নয়। কুর্চিকে ভালবাসে বলেই ঠকাতে পারবে না ওকে পৃথু। এই কুর্চিকেও যেন একেবারে অচেনা, নতুন কোনো মানুষ বলে মনে হচ্ছে। নারীরা সাপেরই মতো। কখন যে তারা পুরোনো জীবন, পুরোনো স্মৃতি, এমনকি পূর্ব-মুহূর্তকেও খোলসের মতো ছেড়ে ফেলে নতুন জীবনের গর্তে সেদিনের রাতের শঙ্খচূড় সাপটারই মতো সেঁধিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, তা তারাই জানে।

পৃথু চুপ করে ছিল। কুর্চি চেয়েছিল তাব দিকে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। উঠোনের কোনো গাছ থেকে তক্ষক ডেকে উঠল।

পৃথু বলল, চলো। যাবে না ?

কুর্চি গভীর দৃষ্টিতে তাকালো পৃথুর চোখে। বলল, যাবো, খাবোও। তবে রাতে থাকবো না। আপনার ঠুঠা বাইগাকে বলবেন, আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

না। যতদিন আমি সীওনীতে আসিনি, অন্য কথা ছিল। যখন এসেই গেছি, এই নির্জন কুঁড়েঘরে তোমাকে আমি একা থাকতে দিতে পারি না, চলো, আমার বাংলোয় থাকবে আজ রাতে। পার্মানেন্টলীও থাকতে পাবো।

কুর্চি মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। দেওয়ালে তার মুখের ছায়াটাও ঘুরল। ছায়াটাকে এখন একটি বাইসনের মুখের মতো দেখাচ্ছে। যেন কোনো গুহাচিত্র বা রক্-পেইন্টিং দেখছে পৃথু। আলো আর ছায়াই ত পৃথিবীর সব ছবি, সব ফোটোগ্রাফীব মূলে !

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল পৃথু।

মুখ ঘুরোনো অবস্থাতেই কুর্চি বলল, কেন ? পার্মানেন্টলী থাকব কেন ? কিসের দাবী আপনার আমার উপর ? যার দাবী নেই, তার ত দায়ও থাকার কথা নয় কোনো নাঃ। আমি একাই থাকব এখানে। আমার জন্যে মিছে চিন্তা করতে হবে না আপনাকে। অনেক ধন্যবাদ !

ভীষণই ইচ্ছে করছিল পৃথুর যে, সেই মুহূর্তে কুর্চিকে একবার বুকে নেয়, তারপর তার অভিমানী ঠোঁট-দুটিকে নিজের ঠোঁটে নিষ্পেষিত করে তার যত দুঃখ, যত অভিমান সব শুষে নিয়ে ওকে নীল করে নীলপদ্মর মতো ফুটিয়ে তোলে। হাত বাড়ালেই পরম ভালোবাসার, পবম প্রার্থনার তীব্র ভালোলাগাবাহী প্রিয়জনের শরীর। তবু, হাত বাড়াতে পারল না পৃথু।

কখনও কখনও সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ পরে গলায় হাল্কা সুর এনে কুর্চি বলল, রাতগুলো বড় বাজে, না ? বিশেষ করে অন্ধকার রাত।

কেন ? তারারা তো থাকেই। অনেকেই আলো দেয় তারা।

পৃথু বলল।

হয়ত থাকে। তবে সকলকেই তাবা তবিয়ে দেয না। হয়ত কিছু ভাগ্যবানের চোখই সে আলো খুঁজে পায়। আপনার মতো।

হয়ত। তুমি তাহলে যাবে না সত্যি আমার সঙ্গে ?

না।

দৃঢ় গলায় বলল কুর্চি।

এটা তোমার অন্যায় জেদ।

হয়ত।

কেন ?

জানি না। আপনি ত জানেনই। আমি এইবকমই।

পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে পৃথু বলল, তুমি জেদী না হলে তোমাকে ভালই বাসতাম না !

অনেকদিন ত ভালবেসেছেন। আর নাই-ই বা বাসলেন। ব্যাপারটা কী জানেন ? যখন ভাঁটু ছিল আমার সঙ্গে, তখন আপনাকে আমার অদেয় অনেক কিছুই ছিল। অথচ এখন বুঝতে পারি দেবার সুবিধে ছিল তখনই সবচেয়ে বেশি। এ দেশে 'ঘোমটার তলায় খেম্‌টা নাচা'টাই সবসময় সুবিধাজনক। এইটেই মেনে নেওয়া রীতি। এখন ত আমি একজন একা মেয়েমানুষ। নির্জনে, জঙ্গলে থাকি। আপনিও একা পুরুষমানুষ। দিসাওয়াল্ সাহেবের ম্যানেজার আপনি। ছোট্ট জায়গা এটা। হাটচান্দ্রা বা আমাদের রাইনাব চেয়েও ছোট্ট জায়গা। পুরুষের গায়ে ত' কলঙ্ক লাগে না। কলঙ্কর ভয় অবশ্য আমি করি না। কিন্তু এখানে আপনি আমার কাছে এমনভাবে এলে, অন্য দশটা বাজে লোকও আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করবে। অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত পয়সাওয়ালা মানুষের অভাব নেই এখানেও।

তবে ? আমি তাহলে আর আসব না তোমার কাছে ? কি বলতে চাও তুমি কুর্চি ?

পৃথু বলল।

আপনাকে ভেবে দেখতে হবে পৃথুদা, আমরা দুজনে কীভাবে থাকব এখানে। যদি আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকে আমাদের তবে তা কিরকমের হবে ? ভাই-বোনেরই মতো হবে কি সেই সম্পর্ক ?

ভাইবোনের মতো ?

অবাক হয়ে পৃথু বলল।

হ্যাঁ। হয় ভাইবোনেব মতো থাকতে হয়, নয় স্বামী-স্ত্রীব মতো। রুষা-বৌদি ইচ্ছে করেই চলে গেছেন। আর ভাঁটুও স্মাগলিং করে জেলে গেছে। তাদের অপরাধের জন্যে আমরা কেন নিজেদের কষ্ট দেব এমন করে ? এই মুহূর্তে আমরা যখন দুজনকে দুজনে চাই-ই এবং আমরা যখন আমাদের নিজেদের কোনো দোষ ছাড়াই একা হয়ে গেছি, তখন আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে বাধাটাই বা কোথায় ? আমি ত বুঝি না। বিয়ের দরকার নেই। একসঙ্গে থাকব শুধু। কারো সম্পত্তিব ওপব অন্য কারো দাবী থাকবে না। দাবী যা, তা শুধু শরীব আর মনেব ওপর। যখনই ইচ্ছে হবে, আলাদা হয়ে যাব আমরা, কোনো ঝগড়া, চিৎকার চেঁচামেচি না কবেই। বাজী ?

পৃথু চুপ করে রইল।

ভাবছিল, কী অসম্ভব বদলে গেছে তার চেনা রক্ষণশীল কুর্চি। অন্তত কথাবার্তায় ও তো রুষার চেয়েও বেশি আধুনিকা হয়ে গেছে ! কী কবে হল এমন ?

হঠাৎই কুর্চি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল দু হাতে মুখ ঢেকে।

বলল, বাজে। একটা বাজে লোক আপনি ! ভালবাসতেন না ছাই ! ভালবাসাটা আপনাব কাছে একটা খেলামাত্র। আপনাকে কেন যে ভালবাসতে গেলাম ! বেচারা ভাঁটু ! মিছিমিছি ! আপনি কেন আমার ঘর ভেঙে দিলেন এমন করে ? কি করেছিলাম আমি আপনার ? আপনি কি পুরুষমানুষ ? ছিঃ ! ছিঃ !

মাঝে মাঝে পৃথুর নিজেরও ঘোরতর সন্দেহ হয় যে ও পুরুষমানুষ কি না ! রুষাও এরকম বলত। উধাম সিংও বলেছিলেন। এখন কুর্চিও বলছে। কে জানে, ও কেন পুরুষমানুষ হতে পারল না ! কখনও কি হতে পারবেও না তা ?

কুর্চি কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে। চুড়ো করে বাঁধা চুল গ্রীষ্মদিনের সমুদ্রের ফণা-ধরা ঢেউয়ের মতো হঠাৎই ভেঙে পড়ে পিঠ এবং কাঁধময় ছড়িয়ে গেল। তার চুলের ঢেউয়ে ফসফরাসের মত কী যেন জ্বলতে লাগল। না কি পথুর চোখেরই ভুল ?

নিজেকে সংযত করল পৃথু। এখন কুর্চির শরীরের কোথাও ওর হাত লাগলে কুর্চি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ও নিজেও অঙ্গার হয়ে যাবে। আরও একটু ভাবতে হবে। জীবনে অনেকই ভুল করেছে ও। আর যাই-ই করুক, হঠকারিতা, আর নয়। ও-ও বদলে গেছে অনেক। তবে কুর্চি আর ওর বদলটা বিপরীতমুখী হয়ে গেছে।

পৃথু উঠে দাঁড়াল।

বলল, চলি।

আবারও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কুর্চি।

পৃথু ক্রাচ-এ ভর দিয়ে ঘরের বাইরে এল। ও যখন বেড়ার গায়ের দরজা অবধি চলে গেছে তখন এলোচুলে দৌড়ে এল কুর্চি। বলল, শুনুন। আপনি আর কখনও এখানে আসবেন না।

বলেই আবার দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

পৃথু হাসল।

বলল, একশবার আসব। আমি এলে, তুমি ঠেকাবার কে?

'বেটা' এতক্ষণে পৃথুকে বন্ধু ভেবেছিল কুর্চির। কুর্চির ব্যবহারের হঠাৎ তারতম্যে সে দৌড়ে, ভুকে কামড়াতে এল পৃথুকে। ডান পায়ে জোর লাথি ছুঁড়ল একটা বেটার দিকে পৃথু। আধখানা পায়ে, ভুলবশত। আর অমনি এক কাঁপুনি এল সেই পায়ে। সঙ্গে, অসহ্য যন্ত্রণাও। থরথর করে কাঁপতে লাগল পা'টা। সেই কাঁপনি আর থামেই না। এ অবস্থায় ওর পক্ষে বসে-পড়া ছাড়া উপায় ছিল না কোনো। কিন্তু বসল না পৃথু। এখন এখানে বসলেই তার জীবনও হাঁটুমুড়ে বসে পড়বে কুর্চির এই পর্ণকুটিরে। একজন নারী একবার তার জীবন নষ্ট করেছে, বার বার তা হতে দেবে না ও। অনেকই হয়েছে। ঘরসংসার, ছেলেমেয়ে। আর নয়। আবার নয়। যা পেয়েছে; দিয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি।

এক ঝাঁকুনি দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল পৃথু। বেটা ওকে ভয় দেখাতে দেখাতে বেশ কিছুদূর এলো পেছন পেছন। সে ফিরে যেতেই আর দু পা এগিয়েই ধবপ্ করে পড়ে গেল পথের ওপরে পৃথু ঘোষ।

কোনোদিনও কারো করুণা চায়নি। কারো কাছেই নয়। এই-ই প্রথমবার অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় সদা-পরিচিত জায়গার অপরিচিত রাতে অসহায়ের মতো ধুলোর মধ্যে আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়ল। বড় করুণা হল নিজের, নিজেরই ওপর। এই নতুন বিড়ম্বনা, এই অনবরত থরথরানি আর শিরা-উপশিরা-স্নায়ু সব ফেটে যাবার মতো যন্ত্রণার নামও জানে না। নাম নিশ্চয়ই আছে একটা। হয়ত ওষুধও আছে।

ওরকমভাবে অর্ধচেতনে প্রায় আধঘণ্টা শুয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে উঠে ওর বাংলোর দিকে চলতে লাগল পৃথু। আজ রাতেই যেন প্রথমবার ভুচুর অভাব, একটা জীপগাড়ির অভাব এবং নিজের সুস্থ শরীরটার অভাব দারুণভাবে অনুভব করতে লাগল ও।

মানুষের জীবন মানুষকে কোথায় না কোথায় নিয়ে যায়। রাজাকে ভিখিরি করে, ভিখিরিকে রাজা। সুস্থ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষকে হঠাৎ পঙ্গু। এই-ই ত জীবন! জীবনের সঙ্গে, এই জীবনের স্রোতে অন্ধকারে দেড়খানা পায়ে লাফাতে লাফাতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে তার নতুন জীবনের, নতুন বাসের দিকে এগিয়ে চলল পৃথু।

পৃথু চলে গেলে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুলো কুর্চি। 'বেটা' পৃথুর সঙ্গে অমন অসভ্য ব্যবহার করেছে বলে লাঠি দিয়ে তাকে বেদম পেটালো। কুকুরটা রেগে গিয়ে একসময় কুর্চিকেই কামড়াতে এলো প্রায়।

আয়নার সামনে গিয়ে বসে হ্যারিকেনের আলোয় আবার চুল ঠিক করল ও। চোখে কাজল দিল নতুন করে। চান শেষ বিকেলেই করে নেয় রোজ। বহুদিনের অভ্যেস। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল পৃথুকে।

আমার পৃথুদা, রাগ করবেন না।

আমাকে ক্ষমা করবেন।

নানা কারণে আমার মাথার ঠিক নেই। আমার চোখের সামনে আপনার এই শারীরিক অবস্থা দেখে আমি বড় পীড়িত বোধ করি। নিজের উপরে রাগ হয়। কেন জানি না।

আপনি এখানে আসবেন যে, আমি জানতাম। সেই দিনের অপেক্ষাতেই এত মাস বসেছিলাম। যখন এলেন শেষ পর্যন্ত, তখন এই রকম ব্যবহার করলাম! যাই-ই হোক, কাল দিনের আলো ফুটলেই পুরো ব্যাপারটাকেই দুঃস্বপ্ন বলে মনে হবে। আমি জানি, আপনারও তাই-ই হবে। রাতকে

আমি এই জন্যেই ভীষণ অপছন্দ করি।

আমরা সব মানুষই ভারী দুর্বল। আপনি চলে যাবার পর ভাবছিলাম সেই কথাই। ভাগ্যিস আপনি শক্ত হয়ে ছিলেন। কোন্ মানুষ কত সবল, তা দিয়ে তার জোরের বিচার হয় না। তাই না? কোন্ মুহূর্তে সে সবচেয়ে বেশি দুর্বল, সেই ক্ষণিক দুর্বলতা দিয়েই তার বলের বিচার হয়।

চিঠিটা লেখা শেষ হয়নি, এমন সময় বেটা আবার জোরে ভুক্ ভুক্ করে ডেকে উঠল।

রাত হয়েছে এখন। টর্চটা হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুর্চি বলল, কওন?

শালকাঠের বেড়ার মধ্যের দরজার ওপাশ থেকে একজন লোক গলা খাঁকরে বলল, ঠুঠা বাইগা!

কুর্চি গিয়ে দরজা খুলল।

হাতে টিফিন ক্যারিয়ার এবং একটি চিঠি। ঠুঠার কাঁধে একটি কম্বলও। অবুঝমারের বাইসন-হর্ন মারিয়াদের। বাইরে শুলে ঠাণ্ডা লাগবেই। রাতে এখনও বেশ ঠাণ্ডা এখানে।

ঠুঠা, কুর্চির অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই দাওয়ায় বসল, পিয়া-শালের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। লম্বা হাই তুলল একটা। তারপরই পকেট থেকে চুট্টা বের করে শজারু-মার্কা দেশলাই-জ্বেলে চুট্টা ধরাল।

কুর্চি ভিতরে গেছিল চিঠিটি পড়তে। টিফিন ক্যারিয়ারটা দাওয়ার ওপর রেখে।

'বেটা' এসে শুঁকল একবার।

ঠুঠা নিজের ভাষায় খারাপ গালাগালি দিল একটা। 'বেটা' বাংলা বোঝে না বটে কিন্তু এই ভাষা বুঝল। বুঝে, ঠুঠাকে সমীহ করে সরে গিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধুলোর মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে স্বগতোক্তির মতো বিড় বিড় করে কী যেন বলে, ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যে গিয়ে চিঠিটা খুলল কুর্চি।

কুর্চি।

আমাদের দুজনের কেউই এই মুহূর্তে শরীরে মনে প্রকৃতিস্থ নেই। কিছুক্ষণ আগে যে-সব কথা হল তোমার সঙ্গে, সে সব ভুলে যেও।

ঠুঠাকে পাঠাচ্ছি। রাতে একা থাকা হবে না তোমার অমন নির্জন জায়গায় কোনোমতেই। ওর কাছে জোর দেখিও না। দেখালে, ও তোমাকে কাঁধে করেই নিয়ে আসবে আমাব কাছে। যতই হাত-পা ছোঁড়ো আর চেঁচাও, নিস্তার পাবে না। ও হচ্ছে আমার "গলিয়াথ্"। বুঝেছো?

আজ বিণ্ড, পাঁঠার মাংসর ঝোল, রুটি আর রায়তা করেছিল। পাঠালাম তোমার জন্যে। এতটুকু মেয়ে! খালিপেটে সারারাত থাকবে না। ভাল করে খাবে। ঠুঠা তোমাকে পাহারা দেবে। কোনো চিন্তা নেই। ভাল করে ঘুমোও। ঠুঠার সঙ্গে পিস্তল আছে। ডাকাত এলেও তার নিস্তার নেই। আর হ্যান্ডসাম চোরের প্রাণ ত যাবেই।

একটা কথা!

সেই কথাটা, কখনও ভুলবে না। আমার আর তোমাব মধ্যে যত ভুল বোঝাবুঝিই হোক না কেন! কথাটা হচ্ছে এই-ই যে, আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার মতো ভাল আমি জীবনে কাউকেই বাসিনি। এই কথাটা বিশ্বাস করে আমার ছোটখাটো খারাপ ব্যবহার, অপূর্ণতা, আমার খামখেয়ালিপনা নিজ গুণে ক্ষমা করে দিও।

প্রতি হাটবারে ভোরবেলা তুমি এখানে চলে আসবে। ডে-স্পেণ্ড করবে আমার সঙ্গে। যদি গাড়ি বা জিপ জোগাড়-করা যায়, নইলে বাসে করেই; কাছাকাছি বেড়িয়ে আসব আমরা। ফিবরে তুমি রাতে খাওয়াদাওয়ার পর। ঠুঠা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তোমার কুন্তীরও নিমন্ত্রণ রইল। তোমার সঙ্গে। ঠুঠা তোমার কাছে রোজ রাতে শুতেও পারে। তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

এখানেই শেষ করি।

—ইতি তোমার পৃথুদা

চিঠিটা পড়া শেষ করে বারান্দায় বেরিয়ে এল কুর্চি লণ্ঠন হাতে। প্রসন্নতা, ওর মুখে প্রতিমার মুখের গর্জন-তেলের মতো চকচক করছিল। ঠুঠাকে বলল, চা খাবে না কি ঠুঠা দাদা?

ঠুঠা মাথা নাড়ল।

মুখে আজকাল খুবই কম কথা বলে ঠুঠা।

দুধ খাবে একটু ?

আবারও মাথা নাড়ল ঠুঠা।

তুমি কিন্তু বাইরে শুয়ো না। ভিতরেই, পাশে অন্য একটি ঘর আছে। বিছানা আছে তাতে। বিছে বা সাপ কামড়াতে পারে বাইরের দাওয়ায় শুলে।

ঠুঠা মাথা নাড়ল আবারও।

অদ্ভুত লোক !

মনে মনে বলল, কুর্চি।

কুর্চি চলে গেলে, এক গাল চুট্টার ধুঁয়ো ছেড়ে ঠুঠা ভাবল, এই মেয়েটার সঙ্গে তার পৃথুর যদি বিয়ে হত, বেশ হত তাহলে ! মেয়ে-মেয়ে আছে মেয়েটা। রুষার মতো মর্দানা নয়। অবশ্য রুষার মতো সুন্দরী এ না, অতরকম গুণও এর নেই। কিন্তু ঠুঠার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় ঠুঠা বাইগা দেখেছে যে, ভাল বউ পেতে হলে বিয়ে করতে হয় একেবারেই সাদামাটা মেয়ে। মোটামুটি সুন্দরী ; মোটামুটি বিদ্যে-বুদ্ধি। সুন্দরী বউ হবে অন্যর। এমনকি শত্রুরও হতে পারে। যাতে নিজেদের দেখে সুখ হয়। শুয়ে সুখ হয়। অতি সুন্দরী, অতি গুণবতী কখনও ভাল বউ হয় না।

পৃথুর বিয়ে ত আর ঠুঠা দেয়নি। যা হবার তা হয়ে গেছে। এই কুর্চি মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে পৃথু ছেলেটার বাকি জীবনটা বেঁচে যায়। দেড়খানা পায়ের মতো, দেড়খানা জীবন !

ঘটনা ত তাদের সমাজে আকছারই ঘটে। বনিবনা যে চিরদিনই হবে স্বামী-স্ত্রী দুজনের এমন কথা কি ? বনল না ত বনল না। নতুন কারো সঙ্গে ঘর বাঁধো গিয়ে। ছেলেমেয়েগুলো ভাগ করে নাও শুয়োর মোরগার মতো। সে তো গাওয়ানই সভা ডেকে সব বিলিব্যবস্থা করে দেবে। কিছু দণ্ড দিতে লাগবে এই-ই যা।

এমনই ত ঘটে আসছে চিরদিন আদিবাসী, হরিজন এবং রাজা-মহারাজা অথবা পুরোপুরি সাহেবী, দিশি লোকদের সমাজে। মারা পড়ল এই মাঝামাঝিরা। বিয়ে একবার করল ত' মরল। না পারল গিলতে ; না পারল ফেলতে। দুর ! দুর ! এদের কোনো হিম্মৎই নেই। যেমন মেয়ে, তেমন ছেলে। মিষ্টি কথায় ফারাক হয়ে গিয়ে বাকি জীবনও ত' বন্ধুর মতো থাকা যায়? যায় না কি ? হাটে দেখা হলে এ ওর কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে খায়, কেউ কাউকে মহুয়া খাওয়ায়। এর নতুন সঙ্গী, তার নতুন সঙ্গিনীর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশাও করে ! আরে একটাই ত' জীবন, ঠুঠার মতো সৃষ্টিছাড়া যারা, তাদের কথা অন্য। যারা বিয়ে করল, বিয়ে ভাঙল ; আবারও বিয়ে করল তাদের দুঃখটা কোথায় ? সারাদিন কাজ করে ঘেমেনেয়ে যাও। দুপুরে ঝরনার পাশে বসে শালপাতার দোনায় গাছতলায় কিছু খাবার, বাড়ি থেকে আনা খেয়ে নাও। তারপর সন্ধ্যের পর মহুয়া খাও, নাচো, গাও। মাদলে আর ধামসাতে চাঁটি মারো। তারপর যার যার মেয়েছেলের নরম বুকে, সে নিজের বৌই হোক, কি পরের বৌইই হোক, হাত রেখে আরামে ঘুমিয়ে পড়ো। রোজ রোজ কি বাঁচবে শালা কেউ ? না চিরদিনই বাঁচবে ? এই সরল কথাটা এই লেখাপড়া জানা ইংজিরি জানা মানুষগুলোর মগজে ঢোকে না যে কেন, তা ঠুঠা বাইগার বুদ্ধিতে আসে না। এত ঝগড়া কিসের ? ঝগড়াই করবে ত' বাঁচবেটা কখন ?

কুর্চি বলল, চুট্টা খাবে ঠুঠা দাদা ? কুন্তীর বর খায়। তাই-ই ও হাট থেকে এনেছিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। খাবে ? এনে দেব ?

ঠুঠা বাইগা আবারও মাথা নাড়ল।

আচ্ছা লোক ত' !

মনে মনে বলল, কুর্চি।



আগের মতো সুস্থ থাকলেএমন চৈত্র শেষেব ভোবে জঙ্গলের ভিতবে কোনো পাহাড়ী নদীর বেখা ধরে হাঁটতে যেত পৃথু।

পয়লা বৈশাখ যদিও চলে গেছে, তবু স্কুলের বাঙালী টিচাবরা স্কুলের হলে ববিবাব সন্ধ্যেবেলায় নববর্ষ উপলক্ষে একটি প্রীতি সম্মিলনীব আযোজন করেছেন। সমস্ত বাঙালীদের কাছ থেকে সাধ্যমত চাঁদা তুলেছেন ওঁরা।

কুর্চি গান গাইবে। স্কুলেব টিচাব, সেই অদেখা মিস কে· রায়ও গাইবেন। আবৃত্তি করবেন শ্যামল বোস আব হারাধন হোড। নিধু মণ্ডল গীটাবে পল্লীগীতি বাজাবেন। কুর্চি খুব ধরেছে যে, পৃথুকেও গাইতে হবে। পৃথু যে গান একদিন গাইত তা আজ আর মনেই পড়ে না। তাছাড়া সভায় গাওযার মত গানও গাইতে জানে না। অগণিত বাথরুম সিঙ্গাবদের দলেই পড়ে ও।

ঠুঠা বাইগার খস্‌খসে পায়েব শব্দ শোনা গেল গেটের কাঁকরের কাছে। কুর্চিকে পাহারা দিয়ে ফিরে এল ঠুঠা। রোজই যায়। আজকাল ওর কথা একেবারেই কমে গেছে। কথা মোটে বলেই না সাবা দিনে। দাড়ি-গোঁফ কামায় না, চুল কাটে না। ওব সামনে ঝুঁকে-পড়া ভালুকের মতো চাল-এ ওকে এখন প্রাগৈতিহাসিক কোনো মানুষ বলেই মনে হয। চোখ দুটোব উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে অনেক। জানোয়ারেব চোখেব মতোচক্‌চক করে চোখ দুটো। যখন চুট্টায টান মাবে, তখন ওর চোখ দুটো আরো জ্বলে ওঠে। জ্বলজ্বল করে। ভয় করে তখন ওর চোখের দিকে চাইতে। একদিন কুর্চিও বলেছিল, পৃথুদা নাইই বা পাঠালেন আপনি ঠুঠাদাকে। আমাদেব কেমন ভয ভয় করে।

আমাদেব মানে? পৃথু শুধিয়েছিল।

মানে, কুন্তীরও। কুন্তী বলছিল, লোকটাকে দেখে মনে হয় ভাল্লুক। ওকে ভয় কবেই সারাবাত ঘুম হয় না। রাতে বাইরে যেতে পাবি না। তাব চেয়ে অন্য জানোয়াব ছিল ভাল। চোব ডাকাতও। বাইরের চোর ডাকাতের ভযে শেষে কি ঘরেব ডাকাতেব হাতে সব খোয়া যাবে?

পৃথু হেসেছিল।

বলেছিল, তোমরা এই মেয়েরা এক আশ্চর্য জাত। পুরুষমাত্রই কি জানোয়ার? এই ভয়, তোমরা শিশুকাল থেকেই বুকে করে বড় হও বোধহয়। ঠুঠা আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ কবেছে। ও ঈশ্বরের মতো ভাল।

অত শত জানি না। ভয় করে, তা কি কবব। পুরুষ ত শত হলেও। বিশ্বাস করি কি করে?

ঠুঠা একবার তাকাল পৃথুর দিকে। নিবে-আসা চুট্টাটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। সুন্দর একটি ব্রমেলিয়াড-এর টবের মধ্যে গিয়ে পড়ল সেটা। বিরক্ত হয়ে, পৃথু উঠে সেটাকে তুলে নিয়ে নোংরা ফেলার জায়গায় ফেলল। যেখান থেকে পাহাড়ী ঝাড়ুদার পরিষ্কার করে নেবে।

পৃথু লক্ষ করল যে, ঠুঠা দাঁড়িয়ে পড়ে পৃথুকে দেখছে জ্বলজ্বলে চোখে। ওর ফেলে-দেওয়া চুট্টাটার প্রতি অপমানকে যেন নিজের প্রতিই অপমান বলে মনে করল ও। এরকম ছিলো না ঠুঠা। কেমন যেন হয়ে গেছে।

ঠুঠা খস্‌খসে পায়ে জানোয়ারেরই মতো শব্দ করে উঠে এল মোজাইক কবা বারান্দায়। একটা চিঠি বের করে পকেট থেকে যে বেতের চেয়ারে পৃথু বসেছিল তার সামনের টেবলে ফেলে দিল।

চিঠিটা খুলল পৃথু। কুর্চি লিখেছে।

পৃথুদা। আমি কাল সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। অতি নির্লজ্জর তো লিখছি এ চিঠি। আমি আর পারছি না পৃথুদা।

আপনাকে আমি একটুও বুঝতে পারি না।

আমি এ কী ভুল যে করলাম জীবনে ' আপনি যা করেছেন, আমি যা করেছি, সবই কি ভুল ?

—ইতি আপনার অবিনাস্ত কুর্চি

ভুল। ভুল। হয়ত সবই ভুল। ভাবল পৃথু।

"লোকে বলে ভুল, আর আমিও কি জানি না যে ভুল ?
তবু তার মাঝখানে ডুবে আছি, যে ভাবে মহিষ
নিজেকে নিহিত রাখে নিরুপায় জ্যোৎস্নের ডোবায়
বাতাস শুয়েছে যার অবল চোখের অলসতা।"

কি করে পৃথু ? কী যে করে, ও নিজেই জানে না।

কখনও কখনও এমনই হয়। 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ', শঙ্খ ঘোষের এই কবিতাগ্রন্থখানির একটি কবিতা মনে এলেই পর পর কেবলই অন্য কবিতাও মনে আসতে থাকে।

সত্যিই কি অন্যায় করছে ও কুর্চির প্রতি ? ভেবে দেখার সময় হয়েছে বোধহয়। অন্যায় নিজের প্রতিও করছে না কি ?

"প্রগাঢ় অন্যায় কোনো ঘটে গেছে মনে হয় যেন
কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল ?
থেমে-থাকা বৃষ্টিবিন্দু হাড় থেকে টলে পড়ে ঘাসে
ভেজা-বিকেলের পাশে ডানা মুড়ে বসে আছে আলো।"

বিশু এসে বলল, নাস্তা লাউ ?

প্রচণ্ড বিরক্ত হল ও।

সেদিন থেকে ঠিক ছ'দিন পর

কিবুরু বাংলোর বারান্দায় বসে ছিল পৃথু আর কুর্চি। আজ হাটবার। কুন্তীকে দিয়ে ছিটের ব্লাউজ আর শায়া বেচতে পাঠিয়ে ছিল কুর্চি হাটে। ওরা সকালের বাসে চলে এসে পথে নেমে গেছিল। পথ থেকে সোয়া মাইল মতো ভিতরে বাংলোটা। সেগুনের বন, গভীর। অন্য গাছের মধ্যে সাহাজ করম, আর বয়রা আছে। চাঁর গাছ আছে বড় বড়। আরো নানা হরজাই গাছ। রাতটা এখানেই থাকবে ওরা। কাল ভোরের বাসে ফিরে যাবে সীওনীতে।

এখন বিকেল। শেষ বিকেল। বাংলোর হাতায় মস্ত শিমুলের অসংখ্য সমান্তরাল নরম হাতে কমলারঙা রোদ লেগেছে। পশ্চিমের আকাশে লাল সূর্য। পূবের আকাশে ফানুসের মতো চাঁদ। বনের গভীর থেকে ময়ূর আর তিতির আর একটি ভয়-পাওয়া কোটরা হরিণের ডাক ভেসে আসছে।

দুপুরে মুরগীর ঝোল আর ভাত রেঁধেছিল কুর্চি। রাতে চৌকিদার খিচুড়ি করবে। ডিম আর আলুও ভেজে দেবে বলেছে। সঙ্গে শুকনো লংকা ভাজা।

কুর্চি বলল, যাবেন না ?

চলো। বলল, পৃথু।

তারপর বাংলোর বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে, লালমাটির পথ বেয়ে, ওয়াইন গঙ্গা নদীর শাখা নদীটার বুকে নেমে এল ওরা। একপাশ দিয়ে জল চলেছে। মাঝেও জল আছে কোথাও কোথাও। বড় বড় কালো পাথর, নদীর বুকের মাঝে। পৃথুর পা থরথর করে কাঁপছিল। ক্রাচ দুটি শক্ত করে চেপে ধরল ও। ভয়ে কাঁপছিল এবং চাপা উত্তেজনাতেও।

পৃথু কিন্তু চায়নি। কুর্চিই চেয়েছিল। কাঙালের মতো চেয়েছিল।'

একটু এগোতেই দূরাগত এক এঞ্জিনের বনাঞ্জা এয়ারোপ্লেনের মতো একটা আওয়াজ শুনল। কাছে পৌঁছেই দেখে হাজার হাজার বাসন্তী রঙা প্রজাপতি উড়ছে এক জায়গায়। তাদের ফিনফিনে ডানার সমষ্টিগত আওয়াজকেই দূর থেকে প্লেনের শব্দ বলে মনে হচ্ছিল। নদীর ভিজে বালিতে মুখ

ছুঁইয়ে আর তুলে, তুলে আর ছুঁইয়ে ডানা তির্‌তির্‌ করে তাবা জল খাচ্ছিল। ঐ দৃশ্যের চমৎকাবিত্ব ওদের দুজনকেই বিস্মিত করে দিল। কুর্চিকে, বিশেষ কবে। ও ত নগ্ন নির্জন বনেব অন্তবঙ্গ রূপ পৃথুর মতো দেখেনি কখনও।

অন্ধকার হবে না আজ। সূর্যের হাত থেকে লাল শিখাটা তুলে নিয়ে চাঁদ তাব হলুদ নবম ফানুস-আলো ইতিমধ্যেই জ্বেলে দিল পৃথিবীর বুকে। একটা টিটি পাখি চাঁদেব দেশ থেকে উড়ে এসে তার লম্বা পা দুটি দুলোতে দুলোতে যেন ডুবন্ত সূর্যকে ধাওয়া কবেই তার মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। সূর্যের উত্তাপে যেন গ‍ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভ্রষ্ট হওযার দুঃখেই বোধহয় সূর্যও তক্ষুনি নিভে গেল।

আরও একটু এগিযে গেল ওবা। নদীব বুকে বর্ষায় ভেসে আসা একটা আস্ত জাম গাছ পড়ে আছে। তার মাথাটা আটকে গেছে একটা পাথরেব স্তূপে। পায়েব দিকটা নদীব বুকে। তাব পা ধুযে দিয়ে যাচ্ছে নদীর ধারা।

প্রথম গ্রীষ্মের সন্ধেব বনের গায়ে আদিবাসী নাবীব মতো এক বকম তীব্র কটুগন্ধ থাকে। সন্ধ্যেব মুখে সেই গন্ধটাই হঠাৎ শাড়ি-সরিয়ে-নেওযা উদলা স্তনের গন্ধবই মতো উড়ে আসতে থাকে সান্ধ্য হাওয়ায়। ঝিমঝিম করে ঝিঁঝি ডাকে। নেশা ধবে যায় তখন।

একটা বড় পাথরেব উপব বসল ওবা। ক্রাচ দুটো আব বগলেব হোলস্টাব থেকে পিস্তলটাকে খুলে, পাশে রাখল পৃথু। মরে-যাওযা সাদাবঙা একটা চিল্‌বিল্‌ গাছে একজোড়া ময়ূব বসে আছে। উদভ্রান্তর মতো। যেন পৃথু আর কুর্চিই। পৃথুর মস্তিষ্কও উড়ে গিযে বসল তাদের পাশে। বসে, পৃথুকে দেখতে লাগল সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে গাছের ডাল থেকে।

জ্বর জ্বর লাগছে পৃথুর। কামজ্বব কি? পবকীয়া প্রেমে কি এমনই হয?

একদিন কুর্চিকে এক পলকেব জন্যে অনাবৃত দেখাব বড সাধ ছিল। স্বপ্ন দেখত, ওকে নিজে হাতে চান কবিয়ে দিচ্ছে সোহাগভবা আঙুলে। আজকে সেই সব স্বপ্ন, স্বপ্নমঞ্জবীব সবই সত্যি হতে যাচ্ছে। কিন্তু কত অপবাধবোধ! কত দ্বিধা। শংকা, কতবকম! টুসুব মুখ মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, মিলিব মুখ। রুষা, তাব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখে চেযে আছে পৃথুব মুখে যেন। তাব ঠোঁটেব ভঙ্গীতে বিদ্রূপেভবা হাসির আভাস। মোটা-সোটা গবেট ভাঁটুও যেন চেযে আছে জঙ্গলেব গভীরের ঝোপ ঝাড়ের ফাঁকফোঁক দিয়ে তাদের দিকে। যেন বলছে, লেহ লটকা।

থার্মোফ্লাস্কটা বের করে, প্লাস্টিকেব গ্লাস দুটো বের করে কফি ঢালল কুর্চি। কুর্চির কোনো দ্বিধা নেই, পাপবোধ নেই, ভয় নেই কোনোবকম। অধীব আগ্রহে ও অপেক্ষা কবছে এমন কিছু পাওযার, যাব জন্যে দাম দিয়েছে সে তাব জীবন দিয়ে। অপরাধী পৃথুই। ঘর ভেঙেছে কুর্চির সেইই। অথচ যে অভিলাষে ঘব ভাঙা, তাইই আজ চবিতার্থ হওয়ার মুহূর্তে অনুশোচনার শেষ নেই যেন পৃথুর।

সত্যিই এক অজীব আদমী এই পৃথু ঘোষ।

কুর্চি লাল আর কালো একটা ডুরে শাড়ি পরেছিলো। লাল ব্লাউজ। চুল খোলা। শিকাকাই ঘষেছে মাথায়। চুল ফুলে ছড়িয়ে আছে পিঠময়। আবও কী সব প্রসাধনের গন্ধ মিশে ওর শরীরের গন্ধ বনের রাতের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে। নানারকম মিশ্র গন্ধর উৎসারে ম ম কবছে পৃথুব চারপাশ। পৃথু তার নিজের গায়ের খস্‌স আতরের গন্ধই পাচ্ছে না নাকে। কে জানে, কুর্চি পাচ্ছে কি না? চাঁদেব আলোয় কুর্চির শাড়ি জামা সব কালো দেখাচ্ছে।

কফির গ্লাসটা হাতে ধরে বসে-থাকা পৃথুর মনে হচ্ছে কফিটা না ফুরোলেই যেন ভাল হত। কফিটা ফুরিয়ে গেলেই ত এক নতুন অনাস্বাদিত মুহূর্তর মুখোমুখি হবে সে। আনন্দে কি মরে যাবে ও? না কি দুঃখে? তবে, নিজেকে বলল, দ্যাখো পৃথু ঘোষ! এইই প্রথম এইই শেষ! এ প্রতিজ্ঞার যেন অন্যথা না হয়।

কফি খাওয়া শেষ হল ওদের। কুর্চি গ্লাসদুটো ও ফ্লাস্কটা পাশে সরিয়ে রেখে বলল, আমি কি সাহায্য করব?

পৃথু মাথা নাড়ল।

মনে মনে বলল খোলা সোজা, পরা কষ্টর। তারপর, কষ্ট করে অনাবৃত করলো নিজেকে। ততক্ষণে কুর্চিও, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অনাবৃত করেছে নিজেকে কালো পাথরের উপর সে তার নিতম্বে-নামা চুল নিয়ে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল, তখনও মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে সরে সন্ধে-নামা-বনের পটভূমিতে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে গ্রীষ্মবনের এক উষ্ণ অনুষঙ্গের মতো কুর্চির নিভৃত নগ্নতায় নিমগ্ন হল পৃথু।

পৃথুর মনে হল, সব নারীর শরীরই বাহ্যত এক। অ্যানাটমিক্যালি এক। কিন্তু কত আলাদা তারা, এক একজন। কী বিচিত্র তাদের আসা এবং যাওয়া, তাদের অভিব্যক্তি, তাদের কামনার ধরন, তাদের আদর খাওয়া এবং আদর করার ঢং।

ভাঁটু কি দেখছে তাদের? জেলখানার লোহার গরাদের মধ্যে তার কুমড়োর মতো নীরেট মাথাটি রেখে? ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে কি? প্রতিহিংসার চোখে? রুষাও কি দেখছে দূর থেকে? জাইসের বাইনাকুলার দিয়ে।

আনন্দম। আনন্দম। আনন্দম।

কুর্চি কাঁদছিল।

ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে তার কান্না মিশে গেছিল। আনন্দে মানুষ কাঁদে, একথা শুনেছিল পৃথু। আজ প্রথম দেখল।

ভিজে বালির মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছিল কুর্চি।

পৃথু বলল, ওঠো কুর্চি গরমের দিন সাপ আছে নানারকম বিছে আছে। অমন করে শুয়ে থেকো না বালিতে।

মনে মনে বলল, সাপিনীকে সাপে কেটেছে। বিষ ছড়িয়ে গেছে সারা শরীরে এই দংশিতা কি বাঁচবে আর?

ঠিক সেই সময়ই চিলবিল গাছ থেকে উড়ে এসে পৃথুর মস্তিষ্কটা খুলির মধ্যে বিনা নোটিশে অবিবেচকের মতো সেঁধিয়ে গেল মস্তিষ্কের ডানা কেমন কে জানে? সে ডানার চেহারা দেখা গেল না। বাদুড়েরই মতো কি? নাইটজার পাখির মতো?

তার ডানার আওয়াজেই বোধহয় ময়ূর দুটি উড়ে গেল তাদের ডানায় সপ সপ শব্দ তুলে। গ্রীষ্মবনের তীব্রগন্ধী বাতের ঝাঁঝকে পিচকিরির মতো বিবসনা আদম আর ঈভের দিকে ছুড়ে দিল ময়ূর, দূরে গিয়ে কেঁয়া! কেয়া! কেঁয়া বলে। আরও দূরে হনুমানের দল হুপ হুপ হুপ্ হুপ করে ডেকে উঠল। যেন, বলে উঠল, হিপ হিপ হুররে। হিপ হিপ হুররে! পৃথুর একটি এবং কুর্চির দুটি নগ্ন পায়ের নিচে খয়েরী আর কালো আর লাল মুচমুচে শুকনো পাতার মতো গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল বহুশতাব্দীর সংস্কার, ভণ্ডামি আর ভান।

গান গেয়ে উঠল ঝিঁঝিরা।

মনে মনে যাকে ভালোবাসা যায় গভীর ভাবে, একমাত্র তাকেই এমন যতনে আদর করা যায় শুধু। রুষা এবং বিজলীও তার আদর খেয়ে খুশি হত কিন্তু পৃথু নিজে এত খুশি কখনও হয়নি। হয়ত, ওরাও কুর্চির মতো খুশি হয়নি কখনই। আসলে মনটাই সব। শরীরটা কিছুই নয়। মন ছাড়া, শরীরের দাম নেই কানাকড়ি। রতি যদি দুজনকে নিঃস্বই না করল, তার চেয়ে আত্মরতিও অনেকই বেশি সম্মানের।

ছিঃ ছিঃ! এত বয়স হল, অথচ জীবনের এমন এক গভীর গোপন পরম সত্য তার আজ অবধি জানা ছিলো না? নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছিল মনে মনে পৃথু। সংস্কারের দাসী, মধ্যবিত্ত মানসিকতার এই সামান্য কুর্চিই, হারিয়ে দিল শেষকালে অত্যাধুনিক রুষাকে, দেহপসারিণী বিজলীকে। আসলে, শরীরেরও হয়ত কোনো বিকল্প নেই।

বাংলোয় যখন ফিরে এল ওরা, তখন প্রায় নটা বাজে। সাড়ে তিনঘণ্টা? এতক্ষণ সময় কেমন করে কাটল? ভেবেই পেলো না পৃথু।

চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে এল। সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে নিয়ে যেতে বলল পৃথু। এমন রাত

আজ বাইরে। কোনো সাপেরই মতো পৃথু ওর পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো খোলসটাকে ওয়াইনগঙ্গা নদীর নাম-না-জানা শাখা-নদীর বালুবেখায় ছেড়ে এল এই মাত্র। দ্বিজ হল।

কুর্চি বলল, আমি চান করে আসছি। এক্ষুনি আসব।

এসো। পৃথু বলল।

কুর্চি চেয়ার ছেড়ে উঠতেই মনে মনে বলল যাও। আমাব বুকেব আতবের গন্ধ, আমাব শবীবের গন্ধ, তোমাব শরীরে এখন যা-কিছুই আমাব;সব ধুয়ে এসো। স্মৃতি, উষ্ণতা ; সবকিছু। তিক্ততাও, যদি কিছু থেকে থাকে। ধুয়ে যাবার পবও যদি বাকি থাকে কিছু. তবেই বোঝা যাবে এই মিলনে ভালবাসা ছিল!

পৃথুও উঠে নিজেবপাশেব ঘবেব বাথরুমে গেল। বাথরুমেব জানালাটা খোলা। পর্দা বা গবাদ নেই তাতে। বনবাংলোর চানঘব। তা দিয়ে. চন্দ্রালোকিত বনপথ আব প্রান্তব দেখা যাচ্ছিল। কমোডেব সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে হঠাৎই পৃথুব মন ঘেন্নায ভবে গেল নিজের প্রতি। ছিঃ!

তবে?

কি তুমি চেয়েছিলে পৃথু ঘোষ? কুর্চিও তাহলে তোমার নারী নয? না, তুমিই কোনো নারীর যোগ্য নও?

কে যেন বলে উঠল তাকে। তাব ভিতব থেকে।

কাকে বলবে, কেমন করে বলবে পৃথু? কে বুঝবে তাকে? সে যে কবি? বনলতাসেনের মতো, তাবও মনের কোণে কোনো নাবী ছিল, যাকে সে তিলতিল করে গড়ে তুলেছিল তাব কল্পনা দিযে। প্রথম প্রেম বোধের, প্রথমতম যৌনতাবোধের দিন থেকে। কিন্তু তাব জীবনের কোনো নাবীর সঙ্গে যে মিল হলো না তাব মানসীর। সে যে বড সুন্দরী, বড রুচিশীলা, বড নরম, বড লাজুক। তাকে কোথায পাবে পৃথু? কোথায সে থাকে? কোন নীল সমুদ্রব জলের তলাব গোলাপী কোবাল রীফসএ? না কি সে থাকে আফ্রিকাব রুয়েঞ্জোরী রেঞ্জের চাঁদের পাহাড়ে? কুর্চিও ত নয় সে? সে তবে কে? সে কি এই মর্তলোকেব বাসিন্দা নয তবে?

কুর্চি খুশিতে ডগমগ হয়ে গুন গুন কবে গান গাইতে গাইতে বাবান্দায় এসে কর্কশ শব্দ করে চেযাব টেনে বসল এই কুর্চিকে চিনত না পৃথু। বাইবেব স্নিগ্ধ নিক্বনিত নির্জনতা খান খান হয়ে গেল চেয়ার-টানাব শব্দে। বিবক্ত হল পৃথু। ঘেন্না হতে লাগল কুর্চির উপব।

বুঝতে পারল, কবি যাকে ভালবাসে, কখনই তাকে শবীবে পেতে নেই। শরীর বড স্থূল, বক্ত মাংস, আঁচড কামড়। ছিঃছিঃ। মানসী যে, তাকে চিরদিন মনেই বাখতে হয় যে! এমন সুগন্ধি বাতে শুধু স্বপ্নে অথবা কল্পনাযই তার সঙ্গে মিলিত হতে হয। বনলতা সেনেবা কোনোদিনও বক্তমাংসর নাবী হযে উঠলে কবিদের অথবা তাঁদের কবিতারও মৃত্যু ঘটত অনেকদিন আগে।

ভাল করে গান শেখাবে কুর্চিকে, ওস্তাদ রেখে। নিজেও শুরু করবে নতুন কবে। চুপ করে রাম্-এর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে, কুর্চির চান-কবে-ওঠা শবীবেব সাবানেব গন্ধে বুঁদ হয়ে ও ভাবছিল। শার্দ্যার কাছে ভালবাসা ছিল তিনটি শব্দের সমষ্টি। পুরুষ, নাবী আর ঈশ্বব। রবীন্দ্রনাথেবও কাছে ভালোবাসাব মানে প্রায়ই একই। আমি, তুমি আব গান। গান, মানুষের এইসব জীবনে যে কত বড় জিনিস, কী বিপুল ব্যাপ্তি তার, কী মুক্তি তার ভিতরে তা যারা জানল না তাদের জন্যে বড় দুঃখ হয় পৃথুর।

রাত ছমছম্ করছিল বাইরে।

চওড়া বারান্দাতে থামের ছায়া পড়েছিল দুধলি চাঁদের আলোয়। এখন চাঁপা-ফুল-হলুদ ভাবটা কেটে গিয়ে কাশফুল-সাদা হয়েছে চাঁদের আলো।

পৃথু বলল, কুর্চিকে, এখন? কি?

কি? গান?

কুর্চি বলল। আপনি গাইবেন।

শুধুই গান? আর কিছু না?

নাঃ। লজ্জা-পাওয়া গলায় বলল কুর্চি, মুখ ফিরিয়ে।
এত লজ্জা যে কোথায় ছিল ওর কিছুক্ষণ আগে, কে জানে?
কি? বল কিছু?
আমি জানি না।
বলে, আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল কুর্চি।
ওর মুখের তীব্র কামনা মেশানো তীব্রতম লজ্জার মুখটিকে ভাল করে দেখতে পাওয়ার আগেই চৌকিদার বলল, আপনারা রাতের বেলায় জঙ্গলে কি করছিলেন?
জঙ্গল দেখছিলাম।
রাতের বেলা! পায়ে হেঁটে?
হুঁ। তোমার নাম কি?
পৃথু বলল।
সূরজ নারায়ণ ঝা।
দেশ কোথায়?
বিহারের মধুবনীতে।
এখানে কি করে এলে? এতদূর?
জীবনই নিয়ে এল। কোনো মানুষই কি আর পায়ে হেঁটে কোথাও যেতে পারে? অথবা, বাসে বা ট্রেনে? সে যাওয়াটা আসলে যাওয়া নয়। আপনারা আজ যেমন এসেছেন? এটা কি আসল আসা? আসলে যার জীবন যাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেখানে পৌঁছে ছেড়ে দেয় সেইখানেই থিতু হয়ে বসতে হয়।
ওরা দুজনে, দুজনের দিকে চাইল।
এখন এখানেই। এখানেরই মেয়েই বিয়ে করেছি। তার বাবাও জঙ্গলেরই মানুষ।
সূরজ নারায়ণ ঝা বলল।
তোমার কি মজা না? এমন জঙ্গলের মধ্যে থাকো।
কুর্চি ঈর্ষার গলায় বলল।
মজা? মজাক উড়াচ্ছেন আপনি মেমসাব?
কুর্চিকে বলল, ঝা।
বাঃ রে। মজাক কেন উড়াবো?
অপ্রস্তুত গলায় কুর্চি বলল।
জঙ্গলে মানুষ থাকে? না, সিনেমা, না টিভি, না কিছু। থাকার মধ্যে এক ট্রানজিসটার। তাও ব্যাটারী খতম হয়ে গেছে কাল। আনব গিয়ে, আপনারা চলে গেলেই।
পৃথু ইংরিজীতে বলল, থ্যাংক গড।
কুর্চি হাসল। বলল, যা বলেছেন। আইন করে দেওয়া উচিত জঙ্গলে কেউ ট্রানজিস্টার বাজাতে পারবে না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্থায়ী বাসিন্দারাই শুধু বাজাতে পারবেন। তাও খুবই আস্তে।
ঠিক বলেছো। কথাটা পারিহার সাহেব আর লাওলেকার সাহেবের কানে তুলে দিতে হবে। তবে 'নিয়ম এরকম একটা আছেই, আইন আছে কি না তা অবশ্য বলতে পারব না।
কুর্চির কি অপরাধবোধ আছে কিছু? ওর মুখে বারান্দার থামের ছায়া পড়েছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। চান করে ও-একটা হালকা হলুদ-রঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে চাঁদের আলোয়।
ভাবল, কথাটা বলে, পরিবেশটা, মুহূর্তটা নষ্ট করবে না। তবুও, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা।
পৃথু বলল, কি? ভাটুর কথা মনে পড়ছে?
হ্যাঁ।

স্পষ্ট গলায় বলল কুর্চি।

অপরাধবোধ ?

নাঃ। আমার ত কোনো অপরাধবোধ নেই। আমার ছেলেমেয়েও হয়নি। তাছাড়া, আমার বাবার আর্থিক সঙ্গতি ছিলো না এবং আপনি তখন আমাকে বিয়ে করলেন না বলেই ভাঁটু আমাকে বিয়ে করতে পেরেছিল। ও, সে কথা ভাল করেই জানত। অর্থ না থাকার জন্যে আমার জীবনটা ওকে দিতে হয়েছিল আমায়। আমার শরীরটাই। মন অবশ্য পায়নি কোনোদিনও। আমি ত সব কিছুই করেছিলাম ওর জন্যে। ও যা খেতে ভালবাসে রেঁধে খাওয়াতাম, ও যখনই আদর করতে চাইত আদর করতে দিতাম। দেবো না কেন ? ও যে আমাকে খেতে-পারতে দিত। কোনো মেয়ে শুধু খাওয়া-পরার বিনিময়েই নিজেকে বিকিয়ে দেয়, কেউ বিকোয় শাড়ি, গয়না ভি সি আর এর জন্যে। এদেশের সব বিবাহিতা মেয়েই কম বেশি একই রকম, মানে, যাদের আর্থিক স্বাধীনতা নেই।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

কুর্চি বলল, আর কেউই না জানুক, আপনি অন্তত জানেন যে, যতদিন ভাঁটুর ঘরে ছিলাম, ভাঁটুরই কৃপাপ্রার্থী হয়ে, আপনার জন্যে আমার মনে যাইই থাকুক না কেন ; কখনও এমন কিছুই করিনি, যাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা চলে। বেশ মজার দেশ কিন্তু আমাদের। প্রায় প্রতি রাতেই আপনাকে আমি স্বপ্ন দেখতাম। ভাঁটু, যখন আমাকে আদর করত, তখন চোখ বন্ধ করে আপনার কথাই ভাবতাম। তাতে কোনো দোষ হতো না। সমাজের বাজপাখি এসব দেখে না। কিন্তু আপনার হাতে যদি হাত রাখতাম একবারও তাতেই দোষ। শরৎবাবুর দিন থেকে আমাদের সমাজ কিন্তু খুব বেশি এগোয়নি। রুষা বৌদিকে আমি এই জন্যেই সম্মান করি। উনি কিন্তু প্রথম থেকেই অন্যরকম। শুধু স্বাধীন নন, স্বাধীনচেতাও। যা হয়ে গেল, তা হয়ে গেল আমাদের সময় অবধিই। এর পরের প্রজন্মর এদেশি মেয়েরা আমাদের মত নষ্ট করবে না নিজেদের জীবন। রুষা বৌদির সাহস খুবই। আপনি যতই দোষী করুন তাঁকে। তাঁর দিকটাও ত ভেবে দেখবার। একজন মানুষের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা বেড়ে ওঠার পথে যদি বাধা পায় তবে মানুষ হয়ে জন্মানোই বা কেন ?

তোমাকে কে বলেছে যে, দোষী করেছি আমি। এতে দোষগুণের কি আছে ? একজন মানুষকে অন্য জনের যে সারাজীবন ভাল লাগতেই হবে তারই বা মানে কি ? তাকে অন্যজনের ভাল লাগে। আমারও অন্য কাউকে ভাল লাগে। এই অবস্থায় একসঙ্গে থাকাটাই ত একটা ভণ্ডামি। তবে··

তবে কি ?

ছেলে মেয়েদের কথাটা ভেবেই····

ছেলেমেয়েরা যখন বড় হবে তখন কি আমাদের যৌবন, এই মন, এই রাত ফিরিয়ে দেবে আমাদের ? কি দেবে, বদলে ওরা ? বুড়ো বাবা-মাকে কেমন ভাবে দেখবে, এখনই যারা যুবক-যুবতী তাদের দেখে বোঝেন না ? আমাদের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে আমাদের দেখবে তাইই কি ভাবেন আপনি ?

ওরা দেখুক আর নাইই দেখুক, বাবা মা হলে একটা অন্য ব্যাপার, অন্য একটা ফীলিং হয় কুর্চি। জানি না, তোমাকে বললে তুমি ঠিক বুঝবেও না হয়ত। কিছু কিছু বোধ থাকে কুর্চি যা নিজে বাবা অথবা মা না হলে বোঝা যায় না। ওরা করুক আর নাইই করুক, ওদের জন্যে করতে পারলেই দারুণ আনন্দ হয়।

আপনি ত কিছুই করেননি ছেলেমেয়েদের জন্যে। আপনি এই আনন্দর কথা জানলেন কি করে ?

শ্লেষের গলায় বলল কুর্চি।

ঠিক। করিনি বলেই ত এখন তা পুষিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। মিলি টুসু যে আমারই রক্তে তৈরী অবশ্য, ওদের মায়ের রক্তও আছে। ওরা আমাকে ভালবাসে না, কারণ আমি ভালবাসতে দিইনি কখনও।

বাজে কথা পৃথুদা। আপনার স্ত্রী আপনার বাড়ি আপনার ছেলেমেয়ে কিছুই আপনার ছিলো না। কোনোদিন হয়ত হবেও না। সব হওয়ারই সময় থাকে, সময় পেরিয়ে গেলে, হয় না আর কিছুই। যে-বাড়িতে একজনও অতিথি নিয়ে যাওয়ার অধিকার ছিলো না আপনার, তাকে আপনি বাড়ি বলেন? সেই জীবনকে আপনি বিবাহিত জীবন বলেন? কারখানার ডিউটির পর যতটুকু সময়, যত ছুটি সব কি আপনি এমনিই ভুচু আর অন্যদের সঙ্গে শখ করে কাটাতেন? আমার শরীরের জন্যে দৌড়ে এসে কাঙালপনা করতেন কি শুধুই আমাকে ভালবাসেন বলে? নিজের শোবার ঘরে প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত হয়েও কি নয়?

তা ঠিক নয়।

তবে কিসের জন্যে দৌড়ে আসতেন। আসতেন, আপনি সেক্স-স্টার্ভড বলে। যা আপনার সামান্যতম প্রয়োজন, যা মানুষ ত দূরের কথা, পশুরও প্রয়োজন তাও আপনি পেতেন না। ভালবাসাটাসা অনেকেই বড় ব্যাপার পৃথুদা। আমার অপদার্থ স্বামীকে চোখ বুঁজে দিলেও যা থেকে আমি বঞ্চিত করিনি, রুষা বৌদি অতি-আধুনিকা বলেই, অতি-শিক্ষিতা বলেই তাও আপনাকে দিতেন না। আপনার অবস্থা আমি বুঝতাম, তাইই আপনাকে তখন কিছুমাত্রও দিয়ে আপনাকে অথবা আমাকেও অপমানিত করতে চাইনি আমি। দেখুন। ভাল ত আমিও কখনও বাসতে পারিনি ভাঁটুকে। বিশ্বাস করুন। একমুহূর্তের জন্যেও না। সেই শুভ দৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই।

এখন এত কথা বলছ তুমি। তোমার চিঠিতে ত লিখেছিলে একেবারেই অন্য কথা। পৃথু বলল।

আর কি লিখব চিঠিতে? আজকে আমি, আপনাকে যা বলতে পারি, গতকালও কি তা বলতে পারতাম পৃথুদা? এখন ত আমার আর আপনার মধ্যে কোনো আড়াল নেই। লুকোচাপা নেই কিছুই। আজকে সন্ধেবেলার এই ঘটনাই বলুন আর দুর্ঘটনাই বলুন; যাইই বলুন তা যে অন্যরকম। সেই ফ্রক-পরার দিন থেকে এত বছরের ঘনিষ্ঠতাতে আপনাকে যতখানি আপন না করতে পেরেছিলাম তার চেয়ে অনেকই বেশি আপন করে দিল যে এই রাত! রেখে ঢেকে কিছু বলার আর দরকার কি?

পৃথু চুপ করে ছিল।

ভাবছিল, সঙ্গমে পরিতৃপ্ত হবার পর, মেয়েরা হয় ঘুমোয়, নয়ত বড় বেশি কথা বলে। কেন? কে জানে? মনস্তাত্ত্বিকরা জানবেন। শরীর-বিশেষজ্ঞরাও জানতে পারেন।

কুর্চি বলল, বড় বেশি কথা বললাম আমি, না?

হ্যাঁ।

পৃথু বলল।

জঙ্গলে এলে, চুপ করে থাকতে হয়। তোমাকে অনেক কিছুই শিখতে হবে এখনও। অবশ্য শিখে যাবে, আস্তে আস্তে। তোমার নিচুস্বরের গলাও দশটা ট্রানজিস্টারের মতো শোনায় রাতের নির্জন জঙ্গলে। একটা শুকনো পাতা খসে পড়ার আওয়াজকেও যদি স্পষ্ট এবং জোরে শোনা যায়, পটকা ফাটার আওয়াজেরই মতো; তাহলে বুঝতেই পারো। যা বলাবলির, সব ফিরে গিয়েই বলো, সীওনীতে। এখন শুধুই শোনার সময়। চুপ করে বোসো। জন ডান-এর সেই কবিতার কথা জানো? ডান না পড়লেও শেষের কবিতাতে নিশ্চয়ই পড়েছো। "ফর গডস সেক, হোল্ড ইওর টাঙ্গ অ্যাণ্ড লেট মী লাভ।"

কুর্চি বলল, পড়েছি। কিন্তু এখন চুপও করব না বসবও না চলুন। বসব না আমি বললাম, না।

কোথায় যাবে?

বাঃ রে।

মানে?

আমি জানি না।

জঙ্গলেই? আবার? না, ঘরে চলো।

না। দৃঢ় গলায় বলল কুর্চি।

বেশ। চলো, তাহলে।

মোহাবিষ্টর মতো বলল, পৃথু।

চাঁদে পেয়েছে তাকেও।

চৌকিদার ওদের বোরোতে দেখেই হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এল।

বলল, কোথায় যাচ্ছেন এত রাতে ল্যাংড়া সাহাব? বারোটা বাজে। পড়ে মরবেন যে!

কুর্চি বলল, জঙ্গলে।

পাগল নাকি আপনারা?

তারপরই দুটি হাত ভেঙ্গে বুকের সামনে সমান্তরাল তুলে উচ্চতা দেখিয়ে বলল: এত উঁচু উঁচু বাঘ আছে এই জঙ্গলে। সাপ আছে। বিরাট বিরাট। শঙ্খচূড় কারাইত্। চিতি। দাঁত-ওয়ালা খতরনাক শুয়োর। বুনো কুকুর। বাইসন। চিতাবাঘ। নেই কি?

ঠিক আছে।

কুর্চি বলল।

ঠিক আছে?

অবাক গলায় বলল চৌকিদার। কুর্চির দিকে মুখ ঘুরিয়ে।

পৃথু বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়েই রাম্ গেলাসে ঢেলে নিয়ে পাঁইটের বোতলটা চৌকিদারকে দিয়ে দিল। ইচ্ছে করেই, তাতে কিছুটা রেখে দিল।

বলল, যাও। তোমার কাছে মাদলটাদল নেই?

কুর্চি বলল একটু গান-বাজনা করো না বাবা। আমরা না ফেরা পর্যন্ত। এমন চাঁদের রাত আজ! তুমি কী রকম বেরসিক মানুষ?

সূরজ নারায়ণ ঝা, বাঁ হাতে রাম্-এর বোতলটা ধরে, ডান হাতের দ্রুত হিল্লোলে এই দুর্জ্ঞেয় নারী ও পুরুষটির উদ্দেশে একটি অসহিষ্ণু ভঙ্গিমা প্রকাশ করল।

পৃথু বলল, পা ফেলবে সাবধানে, দেখে। সাপের মাথায় ফেলো না আবার।

ঠাট্টার গলায়।

পৃথুর ক্রাচ্ পাথরে লেগে শব্দ করছিল। জঙ্গলে নিঃশব্দে পা ফেলে ঘুরতে শিখেছিল ছোটবেলায়। সবই ফেলা গেল। নিঃশব্দে, জীবনের সব জঙ্গলেই ওর প্রবেশ বুঝি নিষেধ হয়ে গেছে।

সাবধান কুর্চি। সত্যিই সাবধান।

বড় কালো পাথরটার উপরে দৌড়ে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে, কুর্চি বলল, বড় বেশি সাবধানী আপনি! বড় বুড়ো বুড়ো ভাব আপনার। একটু বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে শিখুন পৃথুদা, লক্ষ্মীটি! আগেও ত বলেছি। পুতু পুতু করে বেঁচে কি লাভ?

পৃথু, থেমে দাঁড়াল ক্রাচে ভর করে। রাম্-এর গ্লাসটা নিঃশেষ করে, তাকাল চোখ তুলে কালো পাথরের উপর দাঁড়িয়ে-থাকা কুর্চিকে আদিগন্ত চন্দ্রালোকিত রাতের পটভূমিতে সুন্দরভাবে ফ্রেমিং করে অনেকক্ষণ ধরে নিজের চোখের জোড়া লেন্স দিয়ে দেখল ও। প্রার্থনা করল, এই ছবিটি, তার চোখদুটি; যখন চিতার আগুনে গলে যাবে, তার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যেন এই মুহূর্তরই মতো অম্লান থাকে। নাকে যেন থাকে এই উড়াল রাতের গন্ধ। কানে সব রাত-পাখির ডাক, ঝিঁঝির রুমঝুমি। তার সমস্ত শরীরের চামড়াতে, তার পরমাণুতে থাকে যেন কুর্চির সমস্ত শরীরের পরশ, উত্তাপ। এই সমস্ত দৃশ্য, গন্ধ শব্দ, স্পর্শকে বাইরে খোলসের মতো ফেলে রেখে সেদিন রাতের শঙ্খচূড় সাপটারই মতো একদিন এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। একদিন। যে-কোনোদিন!

তাড়া নেই কোনো। জীবন এইই ত শুরু হল সবে! বেঁচে থাকা কী সুন্দর এক অভিজ্ঞতা!

বন্দুক-রাইফেল হাতে বনে বনে ঘোরাকেও এক ধরনের বিপজ্জনক ভাবে বাঁচা বলে জেনে এসেছিল, মগনলালের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো নানারকম দুঃসাহসিক কাজকে অবহেলায় হাতে

তুলে নিয়েও। অথচ, নিজের নিভৃত, ব্যক্তিগত জীবনের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যেও যে এরকম বিপজ্জনকভাবে বাঁচা যেত, তা একবারও মনে হয়নি ওব আগে। হারিয়ে দিল কুর্চি তাকে। সত্যি! কে যে কখন কেমন করে হেরে যায় কার কাছে এই জীবনে!

প্রথমে ইদুরকারের কাছে হেরেছিল। তাবপর রুষার কাছে। তারও পব ভাটুব কাছে। বিজলীর কাছেও। আর আজ রাতে, কুর্চির কাছে। হেরে যাওয়ার মধ্যেও যে এমন গভীর আনন্দ সুপ্ত থাকে তা পৃথু ঘোষের কল্পনারও বাইবে ছিল।

সোঁদা গন্ধ, সিক্ত, জঙ্গলঘেরা দুধলি চাঁপাফুল-বঙা বালির মধ্যে, দুটি সোঁদাগন্ধ, সিক্ত, দৈব-আশীর্বাদে ঋদ্ধ, উপোসী শরীর এক গভীব নিবিড় আশ্লেষে একাত্ম হয়ে গেল। শবীরের আনন্দর মধ্যে যে কোনো পাপ নেই ববং তীব্র একধরনেব পুণ্যই আছে, তা যেন পৃথু এই প্রথমবার জানল। কত কিছুই জানে না ও। আবও কত কিছু জানাব আছেও হয়ত এখনও!

কপারস্মিথ পাখির দোসর দবেব চাঁদ-ভাসি বিধুর বন থেকে সাড়া দিতে লাগল: টাকু-টাক-টাকু-টাকু-টাকু-টাকু!

পৃথু ভাবছিল, জীবন যদি এতই আনন্দর হতে পারে, তবে পৃথিবীর সকলেই কেন এই মুহূর্তের পৃথু আর কুর্চিব মতই বাঁচে না? না কি, এই "সুপ্ত" আনন্দর কথা, "বিপজ্জনকভাবে বাঁচাব" কথা, কুর্চির মতো করে কেউই বলেনি তাদের? অন্ধ হয়ে অথবা বাধ্য হয়ে যা স্বতঃস্ফূর্ত যা সুন্দর, যা স্বাভাবিক তাকে বর্জন কবে চলার আরেক নামই কি সভ্যতা? বিবেক? যাত্রাদলে গান-গাওয়া বিবেকেরই মতো? যে বলার জন্যেই অনেক ভাল ভাল কথা বলে যাত্রার নায়ক নায়িকারা তাতে কর্ণপাতও করে না। অথচ জীবনের নায়ক-নায়িকাবা এই বিবেকের ভয়েই জবুথবু। মুক্তি হয়ত অনেকরকমের থাকে। বড় ধবনেব মুক্তি সে সব। অর্থনৈতিক মুক্তি, বাজনৈতিক মুক্তি।

কিন্তু একঘেয়েমি, অভ্যেস ও সংস্কারের হাত থেকে একজন মানুষ যদি নিজেকে প্রথমে মুক্ত না করতে পারে, তবে তার জীবনের অন্য সব মুক্তিই বোধহয় মূল্যহীন হয়ে যায়।

কুর্চি বলল, কি ভাবছেন? উঁ?

কিছু না। চলো এবারে। পৃথু বলল।

খিচড়ি বন্ গ্যয়া সাব। ফিবতেই, চৌকিদার বলল।

খিচ্‌ড়ি?

জীবনটাই খিচুড়ি হয়ে গেল একটা।

কি ভাবছেন?

আদুরে গলায় কুর্চি বলল। পৃথুর দু চোখে চেয়ে।

পৃথু বলল, মনে মনে চুপ করে থাকো। নির্লজ্জ পাজী মেয়ে। অসভ্য, বাজে মেয়ে। নোংরা মেয়ে। কবিদের নষ্ট ভ্রষ্ট কবো তোমরা। কল্পনা আর কাব্যকে লাল পিঁপড়ের মতো খাও কুবে কুবে।

মুখে বলল, কিছু না।

আপনি খুশি ত? পৃথুদা?

হুঁ।

দায়সারা গলায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল পৃথু।

শুধুই, হুঁ?

আর কী?

পৃথু বলল।

কুর্চি বলল, একটা গান শোনান না পৃথুদা। কতদিন গান শুনি না আপনাব!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, বরং তুমিই গাও।

আমি?

হ্যাঁ।

হয়ত একমাত্র গানই এখন ওর মস্তিষ্কের এই জট খোলাতে পারে। গান এবং পরম তৃপ্তির

মিলনও। জট খোলে যেমন, মাঝে মাঝে, পাকিয়েও তোলে।

ভাবল পৃথু।

কুর্চি ধরল হঠাৎ।

এই গানটি যে ও ধরবে ভাবতেও পারেনি। আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে এই গানটি তার কাছ থেকেই শিখেছিল কুর্চি। নিধুবাবুর গান।

"মিলনে শতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যাজা যায় না॥
চাতকীর ধারা জল তাহাতে হয় শীতল
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না॥"

নিধুবাবুর ('রামনিধি গুপ্ত') সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত এই গানটি প্রায় একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়ানো এক মননশীল দ্বিধাগ্রস্ত মানুষের মনের ভার যেন মুহূর্তেই হালকা করে দিল। পৃথু স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল কুর্চির মুখে।

পৃথু ভাবছিল, তেইয়ার দ্যা শার্দ্যাঁর কথা। রবীন্দ্রানুরাগিণী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথকে মনে করার সময় শার্দ্যাঁরও মনে করেছিলেন। শার্দ্যাঁর বলেছিলেন ঃ "নিজেকে যদি বিশ্ব পরিধিতে বাড়িয়ে না নিতে পারে মানুষ, তবে সে আলিঙ্গনও করতে পারে না তার প্রিয়াকে। নারীর মধ্য দিয়ে পুরুষ তার ছিন্নতা থেকে, তার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্তি পায়।"

শার্দ্যাঁর এই কথা ও পড়েছিল, কবি শঙ্খ ঘোষের লেখা 'এ আমির আবরণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে "রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান" নামের একটি প্রবন্ধ সংকলনে। কুর্চিই তাকে রায়নায় থাকতে বইটি উপহার দিয়েছিল।

চুপ করে গেলেন যে! গান ভাল লাগল না?

না, ভাবছিলাম, এক একটি গান কেমন করে পুরোপুরি নতুন হয়ে ওঠে কোনো কোনো গায়ক গায়িকার গায়কীতে, তাদের শিক্ষার গুণে, গানের প্রতিটি কথার প্রকৃত তাৎপর্যর গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতাতেও। আমি যার কাছে এ গান শিখেছিলাম, তাঁর যোগ্য মর্যাদা হয়ত হতো না এ গান যখন আমি নিজে গাইতাম। কিন্তু তুমি এই গানকে একেবারে গলিয়ে নিয়েছো নিজের গায়কীর গুণে। তোমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে উঠেছে বলেই তা এমন করে আমার হৃদয়কে ভাল লাগায় স্তব্ধ করে দিল। নিধুবাবুর নিজেরও হয়ত দুর্ভাগ্য যে, তাঁর এমন গানখানি তোমার মতো গায়িকার গলায় শুনে যেতে পারলেন না নিজে। জানো, আমার মনে হয়, একজন কবি, গীতিকার বা লেখক তাঁর পাঠক-পাঠিকার এবং তাঁর গানের গায়ক-গায়িকার উপর নিজের পূর্ণতার ও সার্থকতার জন্যে অনেকখানিই নির্ভরশীল। একমাত্র তাঁরাই যোগ্য মর্যাদায় এবং যথার্থ অনুধাবনে তাঁর প্রাপ্য পরিপূর্ণ সম্মান দিতে পারেন। একমাত্র তাঁরাই! গায়ক-গায়িকা এবং পাঠক-পাঠিকারা না থাকলে মৃত্যুর পরেও তাঁদের বাঁচিয়ে রাখতেন কারা?

কুর্চি বলল, কী সুন্দর করে বলেন আপনি পৃথুদা! এমন করে কথা কেউ বলে না! আমাকে অন্তত নয়।

পৃথু হাসল, বলল, এমন করে কেউ শোনেও না আসলে তোমার মতো!

"যোগাযোগের" কুমুকে মনে আছে আপনার?

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'এর কথা বলছ?

হ্যাঁ!

পৃথু নড়ে বসল চেয়ারে তার দেড়খানা পা ঢিলে করে দিয়ে। বড়ই আনন্দ হতে লাগল ওর। প্রকৃতির মধ্যে এমন আপন-ভোলা চাঁদ-ভেজা, বে-আব্রু অথচ গা-সিরসির আদরের পর প্রায় ভুলে যাওয়া নিধুবাবুর টপ্পা, তারপর রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'এর কুমুর কথা। আশ্চর্যই 'যোগাযোগ'-এ। একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে ত শুধু শরীরী সহবাসের সূত্রেই গাঁথা থাকে না! মনের মিল, রুচির মিলটাই ত আসল! রুষার সঙ্গে বা বিজলীর সঙ্গে সহবাসের পর এমন আলোচনা, এমন

পুরোপুরি বাঙালিপনার সুখ মধ্যপ্রদেশীয় পৃথু ঘোষের পক্ষে কল্পনারও বাইরে ছিল। নিজেব মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির কোনো বিকল্প বোধহয় নেই।

কুর্চি বলল, আমার মনে হয় যোগাযোগের কুমুর সঙ্গে আমার যেন অনেকই মিল।

তখন ত' বলছিলে, 'তিনসঙ্গীর' 'শেষকথা'-র অচিরার সঙ্গে মিল ?

হ্যাঁ। তাও বলেছিলাম। আপনারই মতো, আমিও ত একটিমাত্র মানুষ নই।

হাসল পৃথু।

বলল, 'যোগাযোগ' অনেকদিন আগে শেষবার পড়েছিলাম। আছে তোমাব কাছে ?

হ্যাঁ। রায়না থেকে নিজে এসেছিলাম একা, কিন্তু টেম্পো করে বই আনতে হয়েছিল পরে। যে বাঙালীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সব সময় থাকেন না, 'ক্ষণিকা' থাকে না, তিনি কি বাঁচবেন ? মানুষ কি বাঁচে ? মনের যক্ষ্মা হলে ?

তা জানি না। এবং এই দূরপ্রবাসের বাঙালীদের কথাই শুধু নয়, শুনতে পাই পশ্চিমবঙ্গর বাঙালীরাও এখন ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ব, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, উকীল হবার পর, ভাল চাকরী করার পর, ধনী ব্যবসাদার হবার পর বাংলা বই, বাংলা গানের আব কদর কবেন না। বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি এখন বাঁচিয়ে রেখেছেন শুধুই মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তরা। অন্যরা ত দিব্যি বেঁচে আছেন।

সে রকম বেঁচে থাকাকে কি বেঁচে থাকা বলে পৃথুদা ? বাঁচবেন কি তাবা ?

তাঁরা ঠিকই বাঁচবেন। তাঁদেব বাঁচা বলতে যে শুধুই ভাল-থাকা, ভাল-খাওযা, নিজেদেব ছেলেমেয়েদের ভাল-থাকা এবং ভাল পবাব যোগ্য কবে তোলার সাধনাতে মগ্ন থাকা। বাঙালী হয়ত বেঁচেবর্তে থাকবে আবও বহুদিনই কিন্তু বাঙালিযানা বোধহয বাঙলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাওই বেঁচে থাকবে না।

বাঙলাদেশ মানে ?

বাঙলাদেশ মানে, আগেব পূর্ব-পাকিস্তান। তাঁবা ত ভাষাকে ভালোবাসার জন্যে বুকের বক্ত, নাবীর সম্মান সবই দিয়েছেন। বক্তব মূল্যে যা-কিছুই কেনা যায় ; তা থাকেই। মণি চাকলাদারদেব সঙ্গে ত আমার এই নিয়েই তর্ক লাগত। ওবা কেবল সার্ত্র, ক্যামু, ব্রেশটদেরই মহৎ বলে জানেন। ওঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের নাকি সত্যিকাবেব কোনো প্রভাবই নেই পরবর্তী লেখককুলের উপর।

তাইই ? ত ওঁরা নিজেরা কি লিখলেন ?

সে ওঁরাই বলতে পারবেন। আমি ত অশিক্ষিত এঞ্জিনিয়ব, বাংলা বানান পর্যন্ত শুদ্ধভাবে লিখতে জানি না। আমি কি তর্কে পারি ওঁদেব সঙ্গে ?

শুধুই বানান জানলে, বড়জোর কোনো স্কুলে বাংলা ব্যাকরণ পড়ানো যেতে পারে। শুধুমাত্র বানান জ্ঞানেই ত আর কেউ লেখক হন না!

যাকগে। যাক এসব কথা। তবে, এইটুকু জানি যে, আমার না শেখা হল লেখা ; না ব্যাকরণ!

এমাঃ। দেখেছেন ? একদম ভুলে গেছি। আপনাকে চমকে দেব বলে আপনার জন্যে আমি একটা জিনিস এনেছি। মানে, আনিয়েছিলাম, কুন্তীর বরকে দিয়ে।

কি ?

রাম্। ভালবেসে খান আপনি। ওয়াইন গঙ্গার কাছে বসেই ত' ওয়াইন্...

বোকা কোথাকার। রামটা ওয়াইন-এর মধ্যে পড়ে না। মনে মনে বলল, ভালবেসে ত' তোমাকেও খাই। ভালবাসার জিনিস সবসময় খেতে নেই। ভালবাসা মরে যায় তাতে।

যাই, নিয়ে আসি। কত্ত যত্ন করে আনলাম, পুরোনো শাড়িমুড়ে, পাছে বাসের ঝাঁকুনিতে ভেঙে যায়!

বলেই, উঠল কুর্চি। চৌকিদারকে একটি গ্লাস এবং জলের জাগ্ দিতে বলে।

তুমি খাবে না ?

আমি ? আমি ত খাই না এসব।

একদিন খেয়ে দেখতে পারো।

তার জন্যে নয়, কত কিছুই ত খাই না। সব ব্যাপারেই আমাদের মিল থাকুক তা আমি চাই না। বলে, ঘরে গেল।

পৃথু ভাবছিল। না খাওয়াই ভাল। রুষাও আগে কুর্চির মতোই ছিল। এখন, মনে হয়, যাকে বলে অ্যাল্‌কহলিক তাইই হয়ে গেছে। নেশাকে মানুষ পেতে পারে কিন্তু কোনো নেশা মানুষকে পেয়ে বসবে এটা পৃথুর পছন্দ নয়। ও খায় না এমন বিষ নেই, অথচ এটা না হলে চলে না, ওটা না হলে নয়, এমন কোনো ব্যাপারই নেই।

কুর্চি ফিরে এল। রয়্যাল রিসার্ভ রাম্‌-এর একটি ছোট বোতল নিয়ে।

খুলল পৃথু।

কুর্চি নাক কুঁচকে বলল, কী বিচ্ছিরী গুড় গুড় গন্ধ। খান কি করে এগুলো?

পৃথু হেসে উঠল বলল: ঢাক ঢাক; গুড় গুড়।

ওরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

ভাঁটু কিন্তু এসব খেতো না। কুর্চি বলল হাসি থামলে।

কি খেত ও?

হুইস্কী। কী একটা স্পেশ্যাল যেন। ডিরেক্টবস স্পেশ্যাল।

যে স্পেশ্যালই হোক, দিশি হুইস্কী সহ্য হয না আমার।

কুর্চি বলল, দাঁড়ান না, আমি ত' বিভিন্ন কোম্পানীর সঙ্গে কনট্রাক্ট করছি। আমার ব্যবসা দাঁড়িয়ে যাবে অল্পদিনের মধ্যেই। বড়লোক হয়ে যাব আমি। তখন আমিই আপনাকে স্কচ্‌ খাওয়াব। কোথায় পাওয়া যায় তা ত আমি জানি না। আমি টাকা দেব; আপনি জোগাড় করে নেবেন।

হাসল পৃথু। অভিভূত হয়ে।

এমন রাতে টুসুটা সঙ্গে থাকলে বেশ হত। রাতের পাখি চেনাত ওকে, ডাক শুনিয়ে শুনিয়ে। কিছু কিছু পাখি দিনে এবং রাতেও ডাকে। কিন্তু কিছু পাখি শুধুই রাতের।

ফিরে এসে কুর্চি বলল, পৃথুব রাম-এব গ্লাসে জল ভরে দিয়ে। যোগাযোগেব কথা কেন বলছিলাম জানেন?

কেন?

যোগাযোগের বিপ্রদাস, কুমুকে কিছু কথা বলেছিলেন। আজ গানের মধ্যে দিয়ে, এই রাতের মধ্যে দিয়ে, আমার আর আপনার এই কাছাকাছি আসার মধ্যে দিয়ে কুমুকে আমি যেন আজ ছাপিয়ে গেলাম। ওর স্বপ্ন সত্যি হয়নি। আমারটা হল। ওর প্রার্থনার প্রিয়তমর কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে কুমু তার নিজের হৃদয়ের খিদে মেটাতে চেয়েছিল, তাই-ই বোধহয় নানারকম পূজো, ব্রত, পুরাণ কাহিনী এই সমস্ত দিয়েই সে তার কল্পনার মূর্তিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইত। তার প্রেম, গড়িয়ে গেছিল পুজোতে। কিন্তু তবুও ত' হলো না। অবশ্য সত্যিকারের ভালবাসা পেল না বলেই যে তার প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেছিল তাও নয়। যদিও অনেকের ক্ষেত্রেই অবশ্য পাওয়া হয়ে উঠলেই, তার প্রেম ব্যর্থ হয়ে যায়।

একটু চুপ করে থেকে, কুর্চি বলল, দুঃখেরই বলব, কী আনন্দর বলব জানি না তা, কিন্তু কথাটা এইই যে, কুমু নিজে ভালবাসতে পারল না বলেই তার প্রেম ব্যর্থ হল। আমি কিন্তু পেরেছি ভালবাসতে। ভালবাসা কাকে যে বলে, তা না জেনেই পায় অনেকে কিন্তু ভালবাসতে কজন পারে, বলুন? সব আনন্দ ত ভালবাসতে পারারই মধ্যে। আমার মতো সুখী কজন হয়?

পৃথু, বাঁ হাত দিয়ে পাশে-বসা কুর্চির ডান হাতখানি টেনে নিল।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে বিপ্রদাস কুমুকে বলেছিলেন, "তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায়, তাই বলি নে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে: তাকে নাম দিতে পারিনে।

জানেন পৃথুদা, আসলে এইই ধর্ম হয়ত আপনারও। আপনি আর যা-কিছুই হোন না কেন, গান আর প্রকৃতি এই দুই নিয়েই আপনার আসল জীবন। এবং, হয়ত কবিতাও।

অথচ সারাজীবন··· । বিপ্রদাস যোগাযোগেবই আরেক জায়গায় কুমুকে বলছেন "সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় কুমু, চিবকালটা থাকে আড়ালে ; গানের চিরকালটাই আসে সামনে ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে। তাতেই মন মুক্তি পায়।"

পৃথু চুপ করে রাম-এর গ্লাসে বড় চুমুক দিল একটা।

ওর মনে পড়ল, শার্দ্যাঁরই মতো রবীন্দ্রনাথও বলতেন যে, মানুষ মুক্তি পায় বিশ্বের দিকে, আর বিশ্ব তো কেবলই জায়মান, কেবলই সঞ্চরমান, অপূর্ণ কেবলই, তাই ভালোবাসার জন্য মানুষের সামনে পড়ে থাকে নিরন্তর এক আত্মনির্মাণ। এই নির্মাণেরই জন্য হয়ত শার্দ্যাঁও বলেছিলেন, আমাদের আহ্বান করছে বিশ্বের এক সংগীত, জাগিয়ে তুলছে আমাদের ভিতরকাব এক সুর। এই সংগীতের নাম শার্দ্যাঁব কাছে ছিল ওমেগা। এক আনন্দকিরণ। ওমেগা, ইন হুইচ ওল থিংগস্ কনভার্জ, ইজ রেসিপ্রোকালি দ্যাট , ফ্রম হুইচ ওল্ থিংগস র‍্যাডিয়েট্। নিজেব নিজের সত্তার বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এই "ওমেগার" বা এই আনন্দকিবণ বা বিকিবণের সঙ্গেই মিলতে চাই আমরা সকলেই।"

চুপ করে যে ? কি হল আবার ? আপনাকে নিয়ে পাবি না। সত্যিই একটি পাগল আপনি। কি ? হলটা কী আপনার ?

ভাবছি।

ভাবনা কি দেখানো যায় না আমাকে ? কোনোক্রমেই ?

হাসল পৃথু।

এতদিন তার ভাবনা দেখানোব মতো যোগ্য মানসিকতার মানুষ সত্যিই একজনও ছিলো না ওর জীবনে। তাইই বলত, ভাবনা দেখানো যায় না। এখন হয়ত তা বলবে না আব। ভাবনাও এখন থেকে দেখানো যাবে।

মুখে বলল, পরে বলব, কী ভাবছিলাম। এখন আব একটা গান শোনাও ত!

গান ?

একটু ভেবেই বলল, অতুলপ্রসাদের গান গাই একটা ?

কুর্চি ধবল : আমি বাঁধিনু তোমাব তীবে, তবণী আমার/ একাকী বহিতে তাবে পারি না যে আর।

প্রভাত হিল্লোলে ভুলে দিয়েছিনু পাল তুলে/ ভাবিনি সহসা হবে এমন আঁধার/ আমি বাঁধিনু তোমার তীরে, তরণী আমাব/ ···

এখনও যা কিছু আছে তুলে লহো তব কাছে/ রাখো এই ভাঙ্গা নায়ে চরণ তোমাব/
আমি বাঁধিনু তোমার তীবে তরণী আমার/

আবারও প্রকৃতি যেন উন্মুখ, উৎকর্ণ, উৎসুক হয়ে উঠল এই ছমছমে নির্জনতায় কুর্চিব গান শুনে। ঘাসের মধ্যে সাপ থামিয়ে দিল তার সর্পিল্ চাল। থমকে গেল শুঁড়ি-গোড়ায়, সাদা-রঙা সুন্দরী জংলী ইঁদুর। মুগ্ধ চোখ তুলে চাইল জাবর-কাটা মিষ্টি-গন্ধী হরিণী, জঙ্গলের গভীরের প্রান্তর থেকে, যেখানে নিশি-ডাকা গভীর রাতে জিন্ পরীরা খেলতে নামে। পৃথু, মন্ত্রমুগ্ধর মতো গান শুনছিল। ওর বিষণ্ণ, অনেকদিন ধরে বড় ক্লান্ত, অবসন্ন উদ্দেশ্যহীন মন ভাবছিল, সীওনী থেকে এবারে চলে যাবে অন্য কোনো জায়গায় কুর্চিকে নিয়ে, যেখানে কেউই আর তাদের খুঁজে পাবে না। এতদিন শুধুই নিঃশ্বাস ফেলেছিল আর প্রশ্বাস নিয়েছিল। এবারে বাঁচা যাকে বলে তেমন করেই বাঁচবে। 'বেটার লেট দ্যান নেভার।'

রুষাও কি এমনই ভেবেছিল ? কে জানে ?



ভুচুর চিঠি এল আজ বিকেলে। পোস্ট করেছিল পরশু। তাহলে খুব একটা দেরী হয় না চিঠি আসতে যেতে। রুষাকে এবং মিলি টুসুকে ও যদিও লিখেছিল, রুষার কোনো চিঠিই আসেনি আজ অবধি। মাস খানেক হতে চলল ও ছেড়ে এসেছে হাটচান্দ্রা। বেশ তাড়াতাড়িই ছিঁড়ে ফেলল ত সম্পর্কটা রুষা। বাসী ফুলের মালারই মতো।

ভুচুর|মতো প্রাণবন্ত উদার ছেলে কাছে এলে বা তার চিঠি এলেও কিছুক্ষণের জন্যে মন ভারী চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বৈশাখের ভোরের হাওয়ায় যেমন হয়। সব মানুষেরই কমবেশি দুঃখ কষ্ট থাকেই। কিন্তু তাদের রকমটা আলাদা আলাদা। সেই দুঃখকষ্টকে দেখার বা গ্রহণ করাব দৃষ্টিকোণ এবং ক্ষমতাও একেকজন মানুষের একেকরকম। ভুচুর সঙ্গে পামেলার বিয়ে যে হতে পারে না, পামেলার যে বিয়ে হয়ে গেছে শুধু তাইই নয়, সে মা হতে চলেছে এই খবরটা পৃথুকে হাসিমুখে দিয়ে ভুচু তার "মোটর-মিস্ত্রীর-বুলিতে" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল :"তুমিই একমাত্র শক-অ্যাবজর্বার নও দাদা। আমরাও আছি"। যখন বলেছিল, তখন যেন ব্যাপারটার তাৎপর্যটা, শূন্যতাটা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গমই করা যায়নি। এখন যাচ্ছে। এতদূরে বসে, নিজের হৃদয়ের অনেক ফাঁক-ফোকর খাঁজ-খোঁজ, আলোর মধ্যে কুৎসিত ক্ষতরই মতো যেমন ফুটে ওঠে, যা আগে প্রকট হয়নি ; বা দেখার বা বোঝাব সময়ই হয়নি কখনও, তেমনই ; ভুচুব দুঃখর স্বরূপটাও।

প্রতিদিন আলো ফোটার আগে উঠে সব দরজা-জানালা খুলে দেয় পৃথু। পূবের অন্ধকাব পর্বতমালার রোমশ গায়ের একটি ফোকরের উপরের আকাশে ধীরে ধীরে কে যেন একটি জবা-লাল চাঁদোয়া টাঙিয়ে দিতে থাকে। তার ক্ষীণ রঙ ক্রমশঃ গাঢ় হতে থাকে। আর সেই লালিমাব অস্পষ্টতা যেমনই স্পষ্ট হতে থাকে তেমনই দূরের মসজিদেব ভোরের আজান ক্ষীণ থেকে তীব্র হয়ে ভেসে আসতে থাকে। দু কান, মস্তিষ্কর সব কোষ ভবে যায় আস্তে আস্তে সেই প্রতিধ্বনিত আওয়াজে।

প্রতি ভোরে এই ভোরের আজান শুনতে শুনতে বারান্দায় বসা পৃথুর মনে হয়, যুগযুগান্ত ধবে কত দূব দেশ থেকে কত মুসাফির, কত ব্যবসায়ী কত গিরিসংকট পেরিয়ে এসেছে তাদের উট বা ঘোড়া বা অশ্বেতরদের পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে এই ভোরের আজান শুনতে শুনতে। বুখারা, সমরখন্দ, কাবুল, কান্দাহার, শিশুকালের কত সব গা-ছমছম্ স্মৃতি-ভরা নামেব জায়গা থেকে, অজানা, বিজাতীয় গন্ধ ; অচেনা দ্রুতগতি ঘুম-ভাঙানো সব ভাষা তাদের রোদে-পোড়া রুক্ষ মুখে করে।

ঐ সব মানুষদের কারোই কি ঘর ছিলো না কোনো ? রুষা ছিলো না ? মিলি, টুসু ? পামেলা ? প্রেমিকা ?

কুর্চির মতো কেউ ?

তাদের মত হওয়ার সাধ্য নেই সামান্য পৃথুর। সেই সব পুরুষই মানুষের ইতিহাসকে বেগবান করেছে চিরদিন। সাধ ছিল, কিন্তু পারল না পৃথু। সহজ সুখে সুখী হয়ে ও বাঁচা বলতে ও যা বুঝেছে তেমন করে বাঁচা হলো না। অথচ পৃথু ঘোষ একজন মানুষের মতো মানুষই হতে চেয়েছিল। যে-কোনো মানুষ হতে চায়নি সে কোনোদিনও।

ভুচুর চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ হালকা লেগেছিল মন।

ভুচু লিখেছিল :

দাদা, আমরা সদলবলে পৌঁছে যাচ্ছি আগামী রবিবারে। "ফাইভ হাংগ্রী মেন কামিং৷কীপ দ্যা ব্রথ্ বয়েলিং।"

পাঁচজন কে কে ? তাহলে কি সাবীব মিঞা ভালই হয়ে গেলেন এ যাত্রা ? তবে ত খুদাতাল্লার অসীম দয়াই বলতে হবে !

ভুচু লিখেছিল, আমিও আজকাল তোমাকে আর মণি চাকলাদারকে দেখে কবিতা লিখতে শুরু করেছি। গিরিশদা বলছিলেন, কবিতা হচ্ছে হজমী-গুলির মতোই। খিদে হওয়ার জন্যে যেমন খানার আগেই ইস্তেমাল করতে হয়, কবিতাও নাকি তাইই। অর্থাৎ, বিয়ে যাদের হয়নি তারাই ফটাফট-মেশিনের মতোই কবিতা লিখে যায়। বিয়ে হলেই ব্যসস্। ঘি পড়ে গেলো বিবিযানিতে। তুলবে আর কি করে ? সে ত আলু, জাফরান, বাদাম, পিস্তা, আর গোস্ত-এর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

তা আমিও ছাড়বার পাত্র নই। বললাম, কিন্তু গিরিশদা, আপনারও ত বিয়ে হয়নি। কবিতা থামল কেন ?

গিরিশদা বললেন, কেবানীগিবির মতো কবি গিরিরও সুপার-অ্যানুয়েশানের একটা সময় থাকে। থাকা উচিত অন্তত। এটা অনেক কবিই বোঝেন না। এখন আমি রিটায়ার্ড। চুনী গোস্বামীর মতো অতুলা ঘোষের মতো জীবনের সব ক্ষেত্রেই চূড়োয় থাকতে থাকতে, উপত্যকার দিকে স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়ে যাওয়ার আগেই রিটায়ার করায় বিশ্বাসী আমি। কারণ, চুড়ো-মাত্রই পিচ্ছিল। সে মাউন্ট এভারেস্টই হোক, কী কাব্য-যশের চূড়োই হোক। সেখানে বুদ্ধিমান মানুষ পৌঁছে গিয়ে পতাকা তুলেই তরতর করে নেমে আসে। আমিও তাই করেছি। অবশ্য, আমার এভারেস্ট হচ্ছে হাটচান্দ্রার কবিতার কাগজ।

ভুচু লিখেছে, জীপেই যাব। বিবিযানী আমরা বেঁধেই নিয়ে যাব। বিবিযানীর হাণ্ডিকে বিমারী-আদমীর মতো৷কম্বলে ভাল করে মুড়ে-টুড়ে নেব। ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। তুমি বাইতা আর আনুষঙ্গিক সব কিছু বানিয়ে রেখো। ওখানকার কিমতি জিনিস যদি কিছু থাকে ত আনিয়ে রেখো। বীয়ার খাবো কিন্তু এতখানি পথ জীপ চালিয়ে যাওয়ার পর।গরমও পড়ে গেছে। স্টক যথেষ্টই রেখো। গিরিশদা বলেছেন, গোঁড়া লেবু, (সে যতই টক হোক না কেন) শুকনো তেঁতুল আর কাঁচা লংকাও মজুত রেখো। বীয়ারের সঙ্গে মিশিয়ে উনি কী সব করবেন। এক এক চুমুক দেবে আর বকি মার্সিয়ানোর আপার-কাট। চ্যাক্-ট্যাক্-চ্যাক।

ব্যাটা লাড্ডু যেতে গররাজী ছিল। ওর নাকি জোর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। কোন্ মেয়ে যে ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে ঘি-এর গন্ধে ভিরমি খেয়ে মরবে তা সে ওইই জানে। ওকে বিয়ে করার চেয়ে ওর গানের সঙ্গে প্রেমে পড়া অনেক সোজা। কিন্তু গায়কের সঙ্গে ? আমি যদি কোনো সামান্যা মেয়েও হতাম, তবুও উস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেবকে বিয়ে করতে রাজী হতাম না। তাঁর বান্দী হয়ে থাকতাম, সেও ভি আচ্ছা ! বিয়েটা একটা প্রচণ্ড গোপন, ব্যক্তিগত ব্যাপার। কী বল ? না করেও বুঝেছি। যাকে তাকে কি বিয়ে করা যায়, বলো ? সে জন্যেই বোধহয় আমার বিয়েটা করাই হয়ে উঠবে না। কাবাবমে হাড্ডি হয়ে থাকার চেয়ে শুধু হাড্ডি হয়ে স্বাধীনতা বজায় রাখা ভাল।

আরেকটা কথা ! অসম্ভব না হলে অন্তত একজন মহিলাকে আনিয়ে রেখো। নুরজেহান যাচ্ছে নিকাহর আগে তোমাকে প্রণাম করতে। আমাদের মতো অসুরদের সঙ্গে ও বেচারি কি করে সময় কাটাবে ? হুদার খুব ইচ্ছে ছিল সঙ্গে আসার। আমিই কাটিয়ে দিয়েছি। কদিন পরে ত হুরীকে নিয়ে একা ঘরে শোবেই। এত অধৈর্যপনা কিসের ? আসলে, হয়ত আমার উপোসী মন আজকাল অন্যকে দুঃখ দিয়ে একটু আনন্দও পাচ্ছে। সুস্থ জীবন, স্বাভাবিক জীবনযাপন না করতে পারলেই বোধহয় বড় এবং ভাল মানুষরাও এমন টেঁটিয়া, খচ্চর হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে। শেষে, স্যাডিস্ট ?

যাই হোক, রাতটা আমরা থেকে, পরদিনই ফিরব। রাতের খানা কি হবে না হবে, সেসব সকলে মিলে যুক্তি করে ঠিক করব। ডাকু ভিনোদ সিং-এর প্রেজেন্ট করা স্কচ্-এর বোতলটাও নিয়ে যাব। তার মোর্গাগুলো আমার পেটে আছে। মাঝে মাঝে বলে ওঠে, বেশরম্ কাঁহাকা! আশাকরি, তুমি রাগ করবে না। একটা মেয়েকে, মানেপামেলাকেই সামান্য কটা দিন সামলে রাখতে পারলাম না আমি। তার মুরগী! সবার দ্বারা সব হয় না গো। আমার ভালোবাসাও এখন "মুসলমানের মুর্গী পোষার মতো" হয়ে গেছে।

লড্ডুর জন্যে ম্যায়ফিল্ বসিও রাতে। ওখানের কোনো পুরুষ বা মহিলা গাইয়ে থাকলেও বলে রেখো। যাঁদের নেমন্তন্ন কববে তাঁদেরও বলে বেখো। গাইযে আর কেউই না থাকলে, তুমি ত আছোই। হাতেব পাঁচ। তোমার বাড়িতে আবার কাক-ফাক নেই ত?

গিরিশদার পণ্ডিত মরে গেছে। এখন সিরিয়াসলি কথাবার্তা চালাচ্ছেন ধোবী বস্তীর লোকদের সঙ্গে। এবার একটা গাধা পুষবেন। নাম দেবেন "মূর্খ"।

ঠুঠা বাইগা কেমন আছে? মানুষটাকে নাঙ্গা বাইগীনই খেল। ওব যা দরকার, তা একটা শক্ত-সমর্থ মেয়েছেলের। রেঁধে বেড়ে খাওয়াবে, রাতে "ঘুঘুর-সই! ঘুঘুর-সই!" খেলবে। তোমার মতোপুরুষ কি অন্য একজন জংলী পুরুষেব শরীর মনের সব শূন্যতা পূর্ণ করতে পারে পৃথুদা? সংসারের এই পৃথিবীর, কতগুলো স্বাভাবিক নিযম আছে।খাদ্য এবং জলেরই মতোআবোও কিছুব প্রয়োজন প্রত্যেক নারী ও পুরুষেরই বেঁচে থাকার জন্যে। তোমাকে আমি আব কি শেখাবো বল? তবে, শেখাতে ইচ্ছে যে করে না একেবারে তাও নয়। বেশি জেনেই ত এই হল তোমাব। তোমার ওখানে যাওয়ার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। দেখি, তোমার ইস্কুলেব টিচারদের ইণ্টারভ্যু নিয়ে। "মোটর-মেকানিককে" বিয়ে করে তাঁবা কি কেউ "জাতিচ্যুত" হতে রাজী আছেন? সম্ভব হলে জিজ্ঞেস করে রেখো। আমার যদি পছন্দ হয় কাউকে তাহলে…

তবে, যা ভাবছ তা নয়। তাহলে, তোমাব সঙ্গেই ঝুলিয়ে দেব। তুমি স্বীকার করো আর নাইই করো, একা থাকার মানুষ তুমি নও। আমি যা পাবি, গিরিশদা যা পেরেছেন, তুমি তা পারবে না। সবাই সব পারে না। তুমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন কাছাখোলা, কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে না-খেতে-পারা বড়লোকের লালু ছেলে! তাও আবার একটা পা কমে গেছে, একজন সঙ্গিনী, সাথী নিতান্তই প্রাণে বেঁচে থাকাব জন্যেও তোমার প্রয়োজন। বিলাস নয়, প্রয়োজন। বেশিদিন একা থাকলে তোমার অবস্থাও ঠুঠারই মতো হবে। ম্যাড হয়ে যাবে; ম্যাড। তোমার সেই জ্যাঠার মতন। সেটা কি ভাল হবে পৃথুদা? তাছাড়া চোরের উপব রাগ করে যে মাটিতে ভাত খায়, সে ত ইডিয়ট। তুমি ত ইডিয়ট নও।

আচ্ছা পৃথুদা, তোমার সেই কুর্চির খোঁজ কি পেলে?

আজকে সাহস করে বলতে পারি, ভদ্রমহিলা কিন্তু তোমাকে খুবই ভালবাসতেন। আর তুমি? তুমিও ত লুকোতে পারোনি আমার কাছে। ভালোবাসায় ত কোনো পাপ নেই পৃথুদা। ভালোবেসে, তা অস্বীকার করাতেই পাপ। ভালোবেসে, ভালোবাসার লোককে খুশি না-করাই পাপ। নিজেও খুশি না-হওয়া পাপ। একজন মানুষের সঙ্গে অন্যজনের একসময় বিয়ে হয়েছিল বলে কি বাকি জীবনের মতোতার সমস্ত শরীর মনের দরজা বন্ধ করেই রাখতে হবে? রুষা বৌদিকে ত তোমার মহৎ হাত তুলে 'টা টা' করে চলে যেতে দিলে, আর অন্যকে "প্লীজ ডু কাম' বলে ভিতরে ডাকতেই যত অপরাধ বোধ?

জানি না, তার খোঁজ পেয়েছো কি না।পেলে, আমার মতো খুশি আর কেউই হয় না। সে শালা ভাঁটু না ডাঁটুকে মারো গোলি। স্মাগলিং করলে, জেল হয়ই। ও যাইই করুক না কেন' ঐ মহিলার যোগ্য স্বামী সে কোনোদিনও হতো না। কুর্চি যদি আমার বৌদি হয় কোনোদিন, তখন আমি লক্ষ্মণের মতোদেওর হয়ে তার পিছনে পিছনে ঘুরব। নাটক জমে যাবে একেবারে। তোমাকে এত ভালবাসলাম, আমাকে তুমি কিছুই দিলে না। এমন একটা বৌদি অন্তত দাও। কিছু ত দেবে!

শেষ করলাম।

আমরা অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে একেবারে টিকিয়া-উড়ানে চালিয়ে লাঞ্চ-এর সময় পৌঁছে যাব। বীয়ার যেন যথেষ্টই ঠাণ্ডা থাকে। ফ্রিজ না থাকলে, বরফ এনে গামলাতে রেখো। তাও না পারলে, পাহাড়ী নদীর ভিজে-বালি দেড়হাত মতো খুঁড়ে নিয়ে তার নিচে লাইন লাগিয়ে রেখে দিও। ঐখানেই না হয় পিকনিক হবে।

চিয়ার্স! পৃথুদা। ভালো থেকো।

তুমি আছো বলেই আমি আছি।

—এভার ইওরস্ ভুচু।

চিঠিটা অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে রইল পৃথু। চোখ দুটো একবার জ্বালা করে উঠল। স্বাভাবিক নিয়ম বলে এদেশে যা বোঝায়, এ দেশের বেশির ভাগ স্বাভাবিক নিয়মই ত অস্বাভাবিক ; তাতে, ভুচুর মতো মোটর মেকানিকের সঙ্গে পৃথুর মতো একজন মানুষের সখ্যতার কথা ভাবাই যায় না। অথচ এত নিছক বন্ধুত্বই নয়। জঙ্গলের বন্ধুত্বর রকমই অলাদা। দিনে রাতে বন্দুক হাতে বিপদের মুখোমুখি হওয়াতে এক দারুণ কমরেডশিপ্ জন্মায়। যার তুলনা হয়ত একমাত্র সৈন্যদের বন্ধুত্বের সঙ্গেই হতে পারে। কিন্তু সে ত শামীম, সাবীর মিঞা, গিরিশদা এঁদের সঙ্গেও আছে। কিন্তু পৃথুর জীবনে ঠুঠা বাইগা আর ভুচু এক বিশেষ আসনে আসীন। বন্ধুত্ব, উষ্ণতা, হৃদয়ের মাপ, ত্যাগ এই সবের পরীক্ষাতেই পৃথু যে কতবার হেরে গেছে এই দুজন মানুষের কাছে তার হিসেব রাখাও সম্ভব হয়নি। তবু, সান্ত্বনা এইই যে, কিছু কিছু হারের ব্যাপার প্রত্যেক মানুষের জীবনেই থাকে, ছেলের কাছে বাবার হেরে যাওয়ার মতো, যা দুঃখর নয় ; গভীর আনন্দরই।

বড কষ্ট পায় পৃথু, ওদের হৃদযের উষ্ণতার কণামাত্রও ফিরিয়ে দিতে পারে না বলে ওদের। এই অপারগতার কষ্টর পিছনেও হয়ত কারো হাত কাজ করে। সে যে কে, কেমন সে দেখতে, আদৌ সে আছে কি নেই, এসব প্রশ্নর উত্তরও পৃথুর নিজের কাছে নেই। দিগা পাঁড়ে যত সহজে বিশ্বাস করতে পারে, পৃথুর ইংরিজি-শিক্ষা, বিজ্ঞানী-মন অত সহজে তা বিশ্বাস করতে দেয় না। অথচ সহজ বিশ্বাসের মতো সহজীয়া ব্যাপার আব কীইই বা আছে। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।"

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল পৃথুর। খুব সম্ভব কিশলয় ঠাকুরের চমৎকার লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী, 'পথের কবি'তে পড়েছিল। কলকাতার সেনেট হল-এ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট ডেভিস মীড এসেছিলেন বক্তৃতা দিতে, নীহারিকা পুঞ্জ সম্বন্ধে। জেমস জিনস্ সভাপতি। বিভূতিবাবু তাঁর লেখার এক অনুরাগিণীকে নিয়ে গেছিলেন সেই বক্তৃতা শুনতে।

মীড বলেছিলেন, "আলটিমেট রিয়ালিটিজ অফ দ্যা উনিভার্স আর অ্যাট প্রেজেন্ট কোয়াইট বীয়ণ্ড দ্যা রীচ্ অফ সায়ান্স অ্যাণ্ড প্রোব্যাব্‌লী আর ফর এভার বীয়ণ্ড দ্যা কমপ্রিহেনশন্ অফ দ্যা হিউম্যান মাইণ্ড।"

বিভূতিভূষণ বললেন, "শোনো সুপ্রভা, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে পরম সত্যকে অস্বীকার করতে চায় বাতুলেরা। ওদের বলতে চাই কথাটা। আমিও বোঝাতে পারি না, ওরাও বুঝতে চায় না। এলে, আজ শুনতে পেত ওরা।"

ওরা, মানে ওঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা।

আজকের সায়ান্সের "রীচের" সঙ্গে সেদিনের সায়ান্সের "রীচ"-এর তুলনা হয় না কোনো। বিজ্ঞান যেন 'অজানা' কথাটাকেই অভিধান থেকে মুছে দিতে চাইছে। হিউম্যান মাইণ্ডের কমপ্রিহেনশানের বাইরে যে কিছুমাত্র থাকতে পারে না, এমনই এক গভীর বিশ্বাস জন্মে গেছে প্রত্যেক আধুনিক মানুষেরই মনে।

তবু, পৃথুর নিজের মনে সংশয় আছে এখনও। বিজ্ঞান যাকে 'উদ্ভাবন' বলে থাকে, তা আসলে হয়ত নিছক আবিষ্কারই। নতুন কিছুর উদ্ভব হয়নি আসলে। সবই আবিষ্কার। এবং যা মানুষের আজকের উদ্ভাবনের গর্ব, তা হওয়া উচিত ছিল আবিষ্কারের মুগ্ধতা! হয়ত সে মূর্খ বলে, হয়ত সে প্রাকৃত বলে, হয়ত সে বিজ্ঞানই শেষ কথা নয় বলে এখনও বিশ্বাস করে বলে। মানসিকতায়, পৃথু

এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলেই। ও জানে যে, তাদের দল সংখ্যালঘু।

তবু...।

সকাল থেকেই মনটা ভাল নেই পৃথুর।

বাসের কনডাকটর কাল সন্ধের পর চিঠি দিয়ে গেছিল অফিসের দারোয়নের হাতে। দারোয়ান পৌঁছে দিয়েছিল। গিরিশদার চিঠি।

সাবীর সাহেব পড়শু দুপুরে চলে গেলেন। শেষের কদিন পৃথুর কথা নাকি অনেকবার বলেছিলেন। একবার দেখতেও চেয়েছিলেন।

গিরিশদা লিখেছিলেন যে, ওঁকে কবর দিয়ে এসেই পৃথুকে ঐ চিঠি লিখতে বসেছেন উনি।

এক একজন মানুষ থাকেন, যাঁরা নিছক ব্যক্তিমাত্রই নন। বড় বা বিখ্যাত মানুষদের কথা বলছে না পৃথু। নিজেদেরই গণ্ডীর অখ্যাত চেনা-পরিচিতদেরই মধ্যে এমন মানুষ কেউ কেউ থাকেন যাঁরা এক একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। বড় গাছেরই মতো। যাঁদের ঘিরে অনেক ছায়া, অনেক পাখির ডাক, অনেক ঝড়-বাদলের রাতের শুকনো আশ্রয়। যাঁরা ভূপতিত হলে, অনেকেরই বড় ক্ষয়। এবং ক্ষতি। কত হাসি, কবিতা, গান ; কত খাওয়া-দাওয়া, কত শিকার আর শিকারের গল্প, আতর, গুলাব, কত রাত-কি-রাণী। সত্যিই ! সাবীর মিঞার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠানই যেন শেষ হয়ে গেল। পৃথুদের প্রজন্মর কেউই ইচ্ছে করলেও অমন প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পাববে না কোনোদিনও। গিরিশদারা যদিও আছেন এখনও। হাটচান্দ্রা থেকে যেদিন গিরিশদা এবং ভুচুও সবে যাবেন, উপবে কিংবা পাশে, সেদিন ঐ জায়গাটি শুধুমাত্র একটি নামই হয়ে যাবে পৃথুর কাছে। মরা-নাম। ফাঁকা-নাম। যদি না, মিলি-টুসু আবাব 'বাবা' বলে তাকে কাছে ডাকে।

খুব ভোরে উঠে সাবীর সাহেবের বড় ছেলে ওয়াজ্জু মহম্মদকে চিঠি লিখতে বসেছিল ও। অনেকই বড় হয়ে গেল চিঠিটা। কত কথাই যে মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওয়াজ্জুর কাছে এ চিঠির কোনো দাম আছে কি নেই তা জানেনা ও। নিজেকে হালকা করার জন্যেই দরকার ছিল লেখার।

অফিস থেকে আজ ফিবতে সন্ধ্যেই হয়ে গেল। বারান্দায় বসে ছিল পৃথু অন্ধকারে। পরিবেশে মহুয়ার আব প্রথম গ্রীষ্মর বন-পাহাড়ের গন্ধ থম মেবে আছে। একটু পবই হাওয়া চলতে শুরু করবে একটা। শুকনো পাতা আর গন্ধ নিয়ে চালাচালি কববে তখন। রিলে-রেস-এর মতো সুগন্ধর রুমাল এক হাওয়া পৌঁছে দেবে অন্য হাওয়ার হাতে।

এখন, প্রকৃতি মৌন। দিগা পাঁড়ের মতো ধ্যানে বসেছে যেন। দিসাওয়াল্ সাহেব গাড়িতে সফর কবতে করতে এ কদিন একটি নোটবুকে, যখনি যা মনে হয়েছে, ওর সঙ্গে আলোচনার যোগ্য সবই পবপব নাম্বার দিয়ে টুকে রেখেছিলেন। সেই সব কটি ব্যাপার নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা করে এল পৃথু।

মানুষটির ভারী সুন্দর একটি মানবিক মন আছে। টাকা-পযসা, লাভ-লোকসানের মধ্যে ডুবে থেকেও নিজেব জীবনকে জীবিকা থেকে পুরোপুরি আলাদা করে রাখতে পারা বড সোজা ব্যাপার নয়। খুব কম মানুষই তা পারেন। দিসাওয়াল্ সাহেব সেই মুষ্টিমেয়দেরই একজন। ওর স্কুল সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে পৃথু বলেছিলো, আপনার মতো এমন উদার মনের ব্যবসাদার খুবই কম দেখা যায়।

বিদায়ী সূর্যর চৈত্রী আলো ; শিরিষগাছের ঝিলামল-করা পাতার ফাঁক দিয়ে এসে খোঁচা-খোঁচা পাকা-দাড়িময় তাঁব রুক্ষ মুখে এবং উস্কোখুস্কো কাঁচা-পাকা চুলে এসে পড়েছিল। উনি বলছিলেন, দেখুন ঘোষসাহেব, এই পৃথিবীতে ভগবান কিছু কিছু মানুষকে বেছে বেছে চওড়া-কাঁধ দিয়েই পাঠান। তাঁদের ভাগ্যবান কবে পাঠান, অন্যদেরই জন্যে। যাঁরা "ভাগ্য" ব্যাপারটার মানে আদৌ বোঝেন না, তাঁরাই এমন লোকদের বোকা ভাবেন। আমাকে যদি ভগবান অনেকই দিয়ে থাকেন তবে তা আমার একার ভোগের জন্যে কখনই দেননি। আমার চারপাশের সকলের বোঝা লাঘব

করার জন্যেই তা দিয়েছেন।

ভগবান কোথায় দিলেন ? আপনি ত সব নিজে হাতেই গড়েছেন। ভাগ্য ত আপনার নিজেরই গড়া।

পৃথু বলেছিল।

একেবারেই ভুল কথা। এসব সত্যিই সব মূর্খ দাম্ভিকেব কথা। শুধুমাত্র পুরুষকারেই কিছুমাত্র পেতে পারেনা কেউই,ভাগ্য যদি সহায় না হন।যেসব সফল মানুষ ভাগ্যকে অস্বীকাব করেন, তাঁরা মানুষবোধহয় ভাল নয়। তাঁদের চেয়ে অনেকই বেশি যোগ্য মানুষ এই মুহূর্তেই ভাগ্যর হাতে মার খেয়ে ডানা ভেঙে পড়ে আছেন চারপাশে, তা কি তাঁরা দেখতে পান না ?

তাছাড়া অন্যের জন্যে যে করে, সে মহৎ নয়। নিজেব বোঝা ত একজন ভিখিরীও বয়ে নেয়, কঁকিয়ে-কেঁদে হলেও, পরের বোঝা যে বয়, সেইই ত মানুষ। না, কি বলেন ?

এক দারুণ দীপ্তিতে ওঁর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন, ঘোষ সাহেব, অনেকদিন আগে আমাকে একজন বাঙালী ভদ্রলোক বলেছিলেন জাবালপুরে যে, বাঙলা ভাষাতে আপনাদেব একটি প্রবাদ আছে : ("পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী") বড ভাল প্রবাদটা। আমারও এখন সেই কথাই মনে হচ্ছে, আপনার মন বুঝে। আমি নিজেকে জানি। জানি যে, আমি কেউই নই।

পৃথু চমকে উঠল, তাবপর হেসে বলল, ওটা প্রবাদ এখন হয়ে গেছে যদিও কিন্তু ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই কথা আসলে।

কোন ঠাকুর ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব।

ওঃ, তাইই ! তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব কি ? ছেলে, না মেয়ে ? কোথায় মন্দিব আছে ওঁর ? আপনাদের কলকাতার কালীঘাটেই কি ? নাকি বৈদ্যনাথধামে ?

পৃথু হেসে ফেলল। বলল, না, না, ঠাকুব,মানে দেবতা নন। আমাদেব গ্রেটেস্ট পোযেট হচ্ছেন উনি। পদবী ওটা।

কভি ? বাবাঃ তাইই ত ! তা, কভি ছাডা এমন কথাই বা কাব মনে আসবে ? সব দেওতাই ত আসলে কভিই। কবিতাই ত পথ বেঁধে দেয দেবতাব দেউলেব।

আমিও কি বোঝা আপনার ? পৃথু বলল, মুখ নামিয়ে।

চেয়ার ছেড়ে এসে, পৃথুব কাঁধে হাত দিয়ে দিসাওযাল সাহেব বললেন, "বোঝা" কথাটা আমি বলেছিলাম অন্য অর্থে, তা নিযে অন্য কোনো সময়ে আলোচনা কবব। আজ ভাবী ক্লান্ত আছি। আপাতত এইটুকুই জেনে বাখুন যে, আপনি আমার বোঝা নন আদৌ। আমাব নিজেব বোঝার ভার সোজা করতেই ভগবান আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন ঘোষ সাহাব। আপনি ক্রাচ-এ ভর করে কষ্ট করে যেই মুহূর্তে আমার কাছে এসে পৌঁছেছেন সেই মুহূর্তেই আপনাকে আমাব ভীষণ দরকার ছিল। এসবই আসলে প্রি-কন্ডিশানড। ঘটবে বলে লেখা ছিল। আমি বিশ্বাস করি তাইই। নইলে এত বছর পরে, এমন ভাবে এমন সময় আপনি এসে পৌঁছবেনই বা কেন ?

তার নিজের আধুনিকতাবোধ বা বিজ্ঞান-বিশ্বাস যাইই বলুক না কেন, দিগা পাঁড়ে, বা দিসাওয়াল সাহেব বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লিখিত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট ডেভিস মীডের মত মানুষেবা মাঝে মাঝেই যে তার আধুনিকতাকে চকিত-টুসকি মেরে চলে যান না, তাব বিজ্ঞান-বিশ্বাসকে অদৃশ্য বিছের মতো অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে যান না এমন কথা হলফনামায় বলতে পারে না ও। তাছাড়া, দ্বিধাহীন ঋজু বিশ্বাস, প্রকৃতার্থে শিক্ষিত মানুষদেব পক্ষেই একমাত্র থাকা সম্ভব। সে মানুষ 'অ্যাগনস্টিক-ই' হন আর নাইই হন !পৃথু ঘোষের মতো অশিক্ষিত, বানান-না-জানা মানুষের সঙ্গে দিগা পাঁড়েদের তফাত ত খুব বেশি নেই ? বেশি হোক ; তা চায়ও না ও।

ওঠবার সময় দিসাওয়াল সাহেব বললেন, আজকে আরও একটা কথা বলেছি আপনাকে। পাছে,

এ নিয়েও ভুল বোঝাবুঝি হয় পরে।

কী কথা ?

যে বাঙালী মেয়েটির সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব, তা নিয়ে এখানে ইতিমধ্যেই অনেকই কথা হচ্ছে। আপনারা দুজনে যে কিবুরু বাংলোতে রাত কাটিয়ে এসেছেন সে কথাও আজ এখানে আসামাত্রই আমার কানে তোলা হয়েছে। বন্ধুর সংখ্যার শেষ নেই আমাদের। এই বন্ধুরাই জীবনের পথ সবচে' বেশি বন্ধুর করে তোলে।

পৃথু, উঠে পড়েছিল। দু ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দিসাওয়াল সাহেবের মুখের দিকে চাইল। ভাবল, বলেই দেয় যে, আমাকে ছেড়ে দিন। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে···চাকবী আমার দরকার নেই। চলে যাব অন্য কোথাও।

কিন্তু ও কিছু বলার আগেই দিসাওয়াল সাহেব বললেন, লোকে ত বলবেই। এই নিষ্কর্মাদের দেশে, সেক্স-স্টার্ভড দেশে যে-কোনো পুরুষ-আর নারীর একটু সুখ দেখলেই সকলে বুনো-কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপব। আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। তবে আমি বলব, লুকিয়ে পালিয়ে কেন ? আপনারা এখানেই থাকবেন স্বামী-স্ত্রীর মতো। আমি আপনার পেছনে আছি। জানবেন, এও কিন্তু প্রি-কণ্ডিশনড। জীবনে যা কিছুই ঘটে, সব কিছুর পেছনেই মানে থাকে, তাৎপর্য থাকে। আমরা অন্ধ, তাইই দেখতে পাই না।

আপনি ? আমার পেছনে আছেন কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না।

সন্দিগ্ধ-চোখে তাকিয়েছিল পৃথু, পয়সাওয়ালা, জঙ্গলে-থাকা, জংলী অকৃতদাব মানুষ দিসাওয়াল সাহেবের মুখে।

আপনার কী ইন্টারেস্ট ?

পৃথু বলল।

আমার ?

বলেই, আবার সেই দীপ্ত হাসি হাসলেন দিসাওয়াল সাহেব।

একটু থেমে বললেন, তাছাড়া আপনার দ্বিধাটা কিসেব ? আররে ! আপনি ত আর পরের বউ ভাগিয়ে আনেননি ; ঘর ভাঙেননি কারো। সে বিচারীও একা, আপনিও ত একাই হয়ে গেছেন। বললাম না, সব প্রি-কণ্ডিশানড।

বাইরে বেরিয়ে বললেন, গাড়িতেই আসুন, নামিয়ে দিয়ে যাব।

পৃথু বলল না। একটু একসারসাইজের দরকার।

বাংলোর দিকে আসতে-আসতে দিসাওয়াল সাহেবেব কথাটা ভাবছিল · "আপনি ত আর ঘব ভাঙেননি কারো ?'

ভাঙেনি কি ?

বিগু চা নিয়ে এল। হ্যারিক্যান রেখে গেল বারান্দায়। তারপর ট্রেতে বসিয়ে চা, হালুয়া, এবং সেঁকা পাঁপড় নিয়ে এসে রাখল। দেখল, চায়ের ট্রের এক কোণে বাখা আছে একটি চিঠি।

ট্রেটা নামিয়ে বিগু বলল, ঠুঠা চাচা নিয়ে এসেছিল। বিকেলের বাসে এসেছে চিঠি।

সে কোথায় ? ঠুঠা বাইগা ? তাকে যে দেখাই যায় না আজকাল।

চরা-বরা করতে গেছে।

বিগুর কথার ধরনের হাসি পেল পৃথুর, কিন্তু হাসি চেপে বলল, এ কীরকম কথা রে ? ঠুঠা বাইগা আমার বিশেষ সম্মানের মানুষ, জানবি। কোলে-পিঠে কবে মানুষ করেছে আমাকে। এমন করে কথা বলবি না।

তা কি করব ? মানুষ যে আদৌ তাইই বা বুঝব কি করে ? সাবা দিনে ত একটিও কথা বলে না। গরু ছাগল হলেও বোঁওও অথবা ব্যাঁ-এ-এ কবত দিনে একবার দুবার অন্তত। এ শুধু চেয়েই থাকে আর বিড়বিড় করে। আমার ভয় হয় সাহাব, কোনদিন আমাকে কেটে না ফেলে দেয় ঠুঠা চাচা। যা রাগী !

রাগী ? রাগ কোথায় দেখলি তুই ?

বাবাঃ। রাগ নেই ? সবসময়ই ত ফুঁসছে রাগে।

কার উপর ?

সেইই ত হচ্ছে কথা ! কার উপর নয় ? আকাশ, বাতাস, বন. পাহাড়, সকলের উপর। কখনও আপনার উপর, কখনও আমার উপর, কখনও কুর্চি মেমসাবের উপর। তবে বেশি সময়ই, নিজের উপর।

কুর্চি মেমসাহেবের উপর কেন ? কথাটা মনে ভাবল। মুখে বলল না। বলল, নিজেরই উপর ? কি করে বুঝলি ?

না বোঝার কি আছে ? বারান্দার মুখ-ধোওয়া বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে মুখ ভ্যাঙায়। নিজেই, নিজেকে লাথি মারে।

সে কিরে ? নিজেকে নিজে লাথি মারা যায় ?

অবাক হয়ে শুধোল পৃথু।

হ্যাঁ। কেন যাবেনা ? আপনার এক পায়ে আপনি পারবেন না। এই দেখুন ! বলেই, দিব্যি নিজের পেছনে নিজে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পায়ে লাথি মেরে দেখিয়ে দিল। পৃথু ভাবল, অন্য পা হারিয়ে সত্যিই ওর বড় হেনস্থা। নিজের পেছনে নিজে লাথি মারার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়েছে ও।

বিশু বলল, চলি। বাজরা-তড়কা ডাল বসিয়ে এসেছি উনুনে। পুড়ে যাবে। আরও চা লাগলে, ঘণ্টা বাজাবেন সাহাব।

গরুর গলায় বাঁধার একটা পেতলের ঘণ্টা. গরু-বাঁধা দড়ি দিয়ে বেঁধে, বিশু বারান্দায় ঝুলিয়ে রেখেছে। বাংলোটাতে ক্যাকটাই, আর অর্কিড আর ব্রমেলিয়াডস্ আর বহু রকম হাউস-প্ল্যান্ট'স্ যা সফিসটিকেশন্ এনেছিল, যা রুচির ছাপ, তার সবই এই একটা গরু-ঘণ্টা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে দিয়েছে। তবুও বিশুকে কিছু বলেনি পৃথু। এইটে বাজালেই, হয় বিশু নয় ঠুঠা আসে। ঐ ঘণ্টাটা বাজলে ওর মাথার মধ্যেও ঘণ্টা বাজে, ডং-ডডং-ডং। চেঁচামেচি কোনোদিনই পছন্দ নয় ওর। তাতে শান্তি ভঙ্গ হয়। ঐ ঘণ্টাটা বাজলে ওর মধ্যেও ঘণ্টা বাজে, ডং-ডডং-ডং।

"ফর হুম দ্যা বেল টোলস ? দ্যা বেল টোলস্ ফর দী ?"

হোক্। হোক্। উল্টোপাল্টা হোক কিছু কিছু। রুচিশীলতা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যজ্ঞানে ঘাটতি পড়ুক কিছু। এলোমেলো, বিস্রস্ত, অবিন্যস্ত হয়ে যাক অনেকই দিন ধরে অভ্যস্ত, রুষার সংসারের বড়-বেশি বিধিবদ্ধ জীবন। ঘণ্টা বাজুক এলোমেলো। ডাকুক পাগ্‌লা কোকিলের মতো ফুলে ফুলে, দুলে দুলে। ফ্রেমিং খারাপ হয়ে যাক যাক। যাক। আউট-অফ ফোকাস্ হয়ে যাক জীবন ! শট্ এলোমেলো হোক। ডিটেইল্‌স্-এর অভাব ঘটুক ; কিন্তু পরিপূর্ণ নিবিড় ভালোবাসার বেনিয়মের গভীর স্বাদে স্বাদু-সুগন্ধি হোক পৃথুর কর্তিত এই নতুন জীবন। অনেকগুলি অসম্ভব ভাল, কিন্তু অসংলগ্ন, পয়েন্টলেস শটস্-এর চাইতে পুরো ফিল্মটি প্রাণবন্ত, অর্থবাহী, বাঙ্ময় হয়ে উঠুক। জীবনের স্টুডিওতে অনেকই ইংরিজি বুকনি, আঁতেলপনা, কুরোসাওয়া, আন্তোনিওনি, ফেলিনি, বার্জম্যান হয়েছে এতদিন। ফাটা বাঁশীতে সজোরে কিন্তু ফাঁকা ফুঁ-এরই মতো। বাকি জীবনের ফ্লোরে দিশি শাঁখের আওয়াজ, গাছ-কোমর-করে শাড়ি পরা কুর্চি, আলুপোস্ত, সজনের-চচ্চরী, সোজাসুজি বাঙলা কথা, বাঙলা গান এবং সাদা-মাটা একটি প্রেমের গল্পর শুটিং হোক। এই স্ক্রিপ্টে কোনো ভিলেইন থাকবে না। না।

গরুর গলার ঘণ্টাই বাজুক ঘন ঘন।

চা খেতে খেতে পৃথু চিঠিটা তুলে নল। রুষার চিঠি। থাক। হালুয়া এবং সেঁকা-পাঁপড় শেষ করে তারপর হাত ধুয়ে এসেই খুলবে চিঠিটা। বেশ ভারীও আছে। খুব বড় চিঠি লিখেছে রুষা। কেন, কে জানে ?

বেশি বলার মতো বাকি কি আছে কিছু ?

বেসিনে হাত ধুতে ধুতে রিল্‌কের কবিতার লাইন উঠে এল যেন ফার্নগাছের পাতাদের গা থেকে। রুষার চিঠিরই পরিপ্রেক্ষিতে।

'জাস্ট ওয়ান্স/
এভরীথিং. ওনলী ফর ওয়ান্স, ওয়ান্স এণ্ড নো মোর/ এণ্ড উই ট্যু/
ওয়ান্স এণ্ড নেভার এগেইন/ বাট দিস/
হ্যাভিং বীন ওয়ান্স. দো ওন্‌লী ওয়ান্স,
হ্যাভিং বীন ওয়ান্স অন আর্থ—ক্যান ইট
এভাব বী ক্যানসেলড ?"

কী করা যাবে রুষা ?

কারোও দোষগুণেব কৃথা এখানে আসছে না। তোমার আমার 'একবার' মাত্রর একটি জীবন এবাবেব মতো 'ক্যানসেলড্‌ই হয়ে গেছে।

তবে জীবনেব মধ্যেই অন্য জীবন সুপ্ত থাকে, যেমন ফুলের মধ্যে থাকে রেণু, শুকনো কুদৃশ্য ফলের বুকে থাকে বীজ। পাখির ঠোঁটে, হাওয়ার হাসিতে অথবা নদীর উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে কোন দূব দূরান্তরে প্রান্তবে সেই সুপ্ততা থেকে প্রকাশিত হয় কত নতুন সব কচি কলাপাতারঙা জীবন, তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে ?

সেদিন রাতে কিবুরু বাংলোর বাবান্দায় বসে কুর্চির গান শুনতে শুনতে পৃথুর মনে হয়েছিল যে, গানেব মধ্যে দিয়ে বিশ্বভুবনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সে তাব অন্তর্লোকের ভুবনকেও নতুন করে আবিষ্কার করছে। এই গানেব জীবনকেও।

"ফব সঙ, অ্যাজ টট বাই উ্য ইজ নট ডিজাযার,
নট উয়িং অফ সামথিং ফাইনালী অ্যাটেইণ্ড সঙ ইজ এগজিণ্টেন্স ফব দ্যা গড আনস্ট্রেইনড,
বাট হোয়েন শ্যাল উই এগজিস্ট ?
বাট হোয়েন শ্যাল উই এগজিস্ট ?

বাবান্দায় ফিবে এসে লণ্ঠনেব ফিতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে টেবলের উপব বাঁ-পাটি তুলে দিয়ে চিঠিটি খুলল। ডান পায়ের অবশিষ্টাংশটি আজকাল স্মৃতিচিহ্নর মতো চেয়ারেই পড়ে থাকে। তাকে না পাবা যায় ওঠাতে, না নামাতে। তবু সে নিজেই থরথরিয়ে উঠে তার কল্পনাতে নড়াচড়া কবে।

মাই ডিয়ার পৃথু,

এ চিঠি জবাবদিহি করার জন্য লিখছি না। জবাবদিহি. কারো কাছেই করা আমাব স্বভাবও নয়। একে হয়ত চিঠিও ঠিক বলা যায় না। তোমার আমার জীবনের, একসঙ্গে কাটানো দিনগুলির দিকে পিছনে ফিরে, তোমার আমার নতুন জীবনের দিকে প্রত্যাশার সঙ্গে তাকানোর ভাল মন্দরই আলোচনা হয়ত।

তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা আমার দরকার। তোমার বিরুদ্ধে আমার অনেকই অনুযোগ অভিযোগ ছিল, সুখী-দম্পতির মধ্যেই এইসব অনুযোগ অভিযোগ থাকেই, ছাই-চাপা আগুনেরই মতো। কিন্তু তার জন্যে বিবাহিত জীবন থেমে থাকে না। রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠা, চা খাওয়া, ব্রেকফাস্টের তদারকি করা, ছেলেমেয়েকে স্কুলের জন্যে তৈরী করা, স্বামীব অফিসের প্রস্তুতিতে সাহায্য করা এই সবের মধ্যে আমার মতোই বেশির ভাগ স্ত্রী কোন্ মুহূর্তে যে নিজের সব নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে এক অবশ বিধিবদ্ধ একঘেয়েমির শিকার হয়ে পড়ে তা বোঝাব মতো মনটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না আর।

ইদুরকার তোমার থেকে কোনো দিক দিয়েই ভাল নয়। তবু, সে অন্য একজন মানুষ।

তোমার আমার জীবনের একঘেয়েমির অবসান হল তারই জন্যে। হয়ত কুর্চিরও জন্যে। ঐ সাধারণ, অশিক্ষিত, ইনসিপিড একটি মেয়ের মধ্যে তুমি যেমন করে নিজের জীবনের একঘেয়েমিব অবসানের সূত্র খুঁজেছিলে আমিও হয়ত তেমন, ইদুরকারের মধ্যে।

পরিবর্তন, সবসময়ই যে বেশি সুখের তা নয়। কিন্তু পরিবর্তনের একটি নিজস্ব মূল্য আছে। পুরোনোকে সে নতুন করে তোলে।

কিন্তু সত্যি বলতে কি এই কদিনেই আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। প্রথম প্রথম বেশ লাগত। নতুন জীবন, নতুন আদর, নতুন নিয়ম, অপরিসীম স্বচ্ছলতা, কিন্তু এখনই আমার একেঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে। জানিনা, হয়ত ভুলই করলাম। কিন্তু ভুল করি আর যাইই করি, তোমার বুকে কেঁদে পড়ব গিয়ে, এমন মেয়ে আমি নই।

রেলগাড়ির কামরায় বারো ঘণ্টা কোনো সহযাত্রী বা সহযাত্রিণীর সঙ্গে সফর করলেও, নিজেব স্টেশানে ট্রেন এসে থামলে ট্রেন থেকে নেমে যাওয়াব সময়, "চলি, আবার দেখা হবে" বলবার সময় বুকের মধ্যে একটু মোচড় দিয়ে ওঠেই! যদিও জানা কথা যে, সে শুধু কথারই কথা। রেলগাড়ির কামরার নৈকট্য, উষ্ণতা, একই টিফিন ক্যাবিয়াব থেকে খাবাব ভাগাভাগি করে খাওয়ার সহৃদযতা ঐ কামরাতেই ধুলোর মধ্যে পড়ে থাকে। নামাব সময় খালি বুকেই নামতে হয়, সেই কামরার সম্পর্ককে, ধীরে ধীরে আউটার সিগন্যালেব সবুজ আলো পেরিয়ে ক্ষয়েরী রঙা দীর্ঘ সাপের মতো ট্রেন তার বুকের কোবকে করে অজানা গন্তব্যব দিকে রিকি-ঝিকি-ঝিকি-রিকি করে বয়ে নিয়ে যায়, নতুন স্টেশানেব নতুন যাত্রীদের হাতে তা তুলে দেবে বলে। সেই সব সহযাত্রীদের সঙ্গে এই ছোট্ট জীবনে দেখা হয়ই না আব। তবু, ভাললাগা থাকে, কিছুদিন; ভাল পারফ্যুমের গন্ধরই মতো। আলতো হয়ে লেগে থাকে, শার্টে, ব্লাউজে, মনে। পৃথু, তোমার স্মৃতিও তেমনই জড়িয়ে আছে আমায়। সেই গন্ধ এখনও উবে যায়নি।

তুমি বলবে, মিলি টুসুর কথা আমার কি ভাবাব দবকাব ছিলো না? আমি বলব নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাদের কথা ভেবেওছি। তুমি মানবে কী না জানিনা, আমাদেব ছেলেমেয়েবা আমাবই হাতে বড় হয়ে উঠেছে, তাদের খুব কাছ থেকে দেখেছি বলেই বলছি, তাদের প্রতি অবিচার কিছুমাত্রও কবিনি।

আমরা যে প্রজন্মেব মানুষ, সেই প্রজন্মকে সমাজ শাঁখের করাতেবই মতো দু ধাবে কেটে গেছে সর্বদা। অগ্রজদের প্রতি শ্রদ্ধা, কর্তব্য আমাদেব মনে অটুট আছে। অনুজদেবও প্রতিও স্নেহ এবং কর্তব্য। কিন্তু এব পরেব প্রজন্মর ছেলে মেযেবা আমাদের দিকে ফিবেও তাকাবে না। এটা ওদের দোষ নয়। ওদেব প্রজন্মব পক্ষে এইটাই নিয়ম। ব্যতিক্রম যদি কখনও ঘটেও তবে তা সেই নিয়মকেই দৃঢ়তর করে প্রতিষ্ঠিত কববে। পৃথু, এ কথা আমার চেয়ে ভাল তুমি জানো না। ওদের জন্যে জীবনের সবচেয়ে ভাল সমযটুকুই নিংড়ে দিলাম। অন্য বাবারাও দেয় মায়েদের সঙ্গে, তুমি যদিও দাওনি। তাই-ই আমার মতো কবে ওদেব বোঝা তোমাব পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা যাকে জীবন বলে জেনেছি সে ত প্রায়শই একটা অভ্যেসই মাত্র। অতিস্বাচ্ছল্য অথবা দারিদ্র্য, দুজনের মধ্যে অমিল অথবা ঘোরতব মিল সবই শেযে একঘেয়েমিতেই গিয়ে মেশে। আমার কেবলি মনে হয়, আধুনিক মানুষের জীবনে একঘেয়েমির চেয়ে বড বিপদ আব কিছুই নেই। একঘেয়েমির চেয়ে একাকিত্বর দুঃখ অনেক ভাল। কারণ তাকে বোঝা যায়, তা পীড়িত করে আব একঘেয়েমি, হাঙ্গরের দাঁতের মতো কারণ যে, জীবনের শরীর থেকে সমস্ত কটি সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৈনন্দিনতার জলের নিচে কেটে দিয়ে যায়, তা সেই জলের উপরে জীবনকে টেনে না তোলা পর্যন্ত বোঝা পর্যন্ত যায় না।

সমাজ তৈরি হয়েছিল নিছকই প্রয়োজনে। একদল চাষ কবত, অন্যদল যুদ্ধ করত, আরেকদল সকলেব সুখ সুবিধে দেখত, আইনকানুন বানিয়ে শৃঙ্খলা আনত। তখন শৃঙ্খলার দবকারও ছিল। কিন্তু আমবা এমন এক জাযগায় এসে পৌঁছেছি এখন যে, আমাব মনে হয সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা এখন একটা বন্ধন আর কিছুই নয়। আজকের সমাজ তোমাব সুখে ঈর্ষা বোধ করে, তোমার ভাল হলে দুঃখিত হয়, তোমার খারাপ হলে সুখী হয়, তোমাব ব্যক্তিগত সমস্ত আনন্দর চৌকাঠে যমের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এই সমাজকে আর দবকাব নেই আমাদের।

তুমি ত রিচার্ড বাখ-এর 'ইল্যুসনস' বইটা পড়েছো। তোমারও কি মনে হয় না যে,

"ইওর ওন্‌লী
অব্‌লিগেশন ইন এনী লাইফটাইম
ইজ টু বী ট্রু টু ইওরসেল্ফ্‌।
বীইং ট্রু টু এনীওয়ান্‌ এলস্‌ অর
এনীথিং এলস্‌ ইজ নট ওন্‌লী
ইমপ্‌সিব্‌ল, বাট দ্যা
মার্ক অফ আ ফেক্‌
মেহসারা।
দ্যা সিম্‌প্লেস্ট কোয়েশ্চেনস্‌
আর দ্যা, মোস্ট প্রোফাউণ্ড।
হোয়্যার ওয়্যার উ্যা বর্ন ? হোয়্যার ইজ ইওর হোম ?
হোয়্যার আর উ্যা গোয়িং ?
হোয়াট আর উ্যা ডুয়িং ?
থিংক অ্যাবাউট
দীজ ওয়ান্স ইন্‌ আ হোয়াইল, এণ্ড
ওয়াচ্‌ ইওর আন্‌সারস্‌

দ্যা বণ্ড
দ্যাট লিংকস্‌ ইওর টু ফ্যামিলি
ইজ নট্‌ ওয়ান্‌ অফ ব্লাড, বাট
অফ রেস্‌পেক্ট অ্যাণ্ড জয় ইন্‌
ইচ আদারস্‌ লাইফ
রেয়ারলি ডু মেম্বারস্‌
অফ ওয়ান ফ্যামিলি গ্রো আপ
আণ্ডার দ্যা সেম
রুফ্‌।

মিলি ও টুসুও আলাদা আলাদা মানুষ। যেমন আমি ও তুমি। এই 'ইল্যুশানস্‌' বইটি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। "আই ওয়ান্টেড টু স্যে, ফর দ্যা লাভ অফ গড, ইফ্‌ উ্যা ওয়াণ্ট ফ্রীডম অ্যাণ্ড জয় সো মাচ, কাণ্ট উ্যা সী ইটস নট এনিহোয়ার আউটসাইড অফ উ্যা ? স্যে, উ্যা হ্যাভ ইট অ্যাণ্ড উ্যা হ্যাভ ইট ! অ্যাক্ট অ্যাজ ইফ্‌ ইটস্‌ ইওরস্‌, অ্যাণ্ড ইট ইজ ! রিচার্ড, হোয়াট ইজ সো ড্যামড্‌ অ্যাবাউট দ্যাট ?"

আমি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি পৃথু। তোমাকেও ভাসিয়ে দিয়েছি, তুমি যাকে পেলে সত্যিই খুশি হও তারই দিকে। মিলি টুসু আমার তোমার সাহায্য ছাড়াই ভেসে যাবে নিজের নিজের গভীর গন্তব্যর দিকে, নিজের নিজের প্রকৃত সুখের দিকে, ভান, ভণ্ডামি, লোকভয় সব ছিঁড়ে ফেলবে ওরা। ওরা বাঁচবে। আমাদের মতো প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলাকে ওরা বাঁচা বলে ভুল করবে না কখনও। তুমি দেখো।

মিলি টুসু সম্বন্ধে তোমার গভীর দুঃখ আছে। আমি জানি। মিলির চিঠি পড়ে তুমি হয়ত আঘাত পেয়েছো। কিন্তু ভেবে দ্যাখো ত, তুমি তোমার বাবাকে অমন চিঠি কি লিখতে পারতে ? তোমার বাবা না হয় অন্যরকম ছিলেন, কিন্তু তুমি কি বলতে চাও আমাদের প্রজন্মর সব ছেলে-মেয়েই বাবা মাকে নিয়ে সুখী ছিল। কিন্তু যেহেতু বাবা-মায়েরা খেতে পরতে দিতেন, দেখাশোনা করতেন, আমরা বোবার মতো তাঁদের সবকিছুকেই মেনে নিতাম। আমরা ভীরু ছিলাম, অসৎ ছিলাম।

মিলির শ্রদ্ধা বা আমার সঙ্গ ছাড়াও তোমাব দিব্যি চলে যাবে পৃথু। দেখো তুমি। তুমি আমি এবং প্রত্যেকটি মানুষই যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজের মধ্যের এবং শুধুমাত্র নিজেরই আনন্দর খোঁজে এবারে বেরিয়ে পড়ো। বুঝতে পারবে, দুঃখ যা পাবার তা আমরা নিজেরাই নিজেদের দিই, অন্যকে দায়ী করি মিছিমিছিই; নিজেরা ভীরু এবং অসৎ বলে। ভণ্ড বলে।

মিলির জন্যে আমার ত গর্বই হয়। তোমারও হওয়া উচিত। তুমি ভাবো যে, ওরা তোমার সম্পত্তি। তা ত নয়। ওরা যে আলাদা আলাদা মানুষ।

কোহলিল্ গিব্রান্ ত তোমার এত প্রিয় কবি! বাংলা আমি কিছুই পড়িনি, পড়তে পারিও না তা ম' । কিন্তু ইংরিজি ত পড়ি। পড়লেই হল! গিব্রান্ ওব "দ্যা প্রফেট" বইতে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে তা বুঝি মনোযোগ দিয়ে পড়োনি?

"ইওব চিল্ডবেন আব নট ইওর চিল্ডরেন
দে আর দ্যা সানস অ্যাণ্ড ডটাবস অফ লাইফস লংগিং ফর ইটসেল্ফ
দে কাম থ্রু উ্য,   ণট ফ্রম উ্য
এণ্ড দো দে আব ওইথ্ উ্য ইয়েট দে বীলঙ্ নট্ টু উ্য।
উ্য মে গিভ দেম ইওর লাভ বাট নট ইওর থটস্,
ফর দে হ্যাভ দেয়াব ওন থটস্
উ্য মে হ্যাভ দেযাব বডীজ বাট নট দেযার সোওলস্,
ফর দেয়াব সোওলস্ ড্বায়েল ইন্ দ্যা হাউস অফ টুমরো,
হুইচ উ্য ক্যানট ভিজিট, নট্ ইভিন্ ইন্ ইওব ড্রীমস্
উ্য মে স্ট্রাইভ টু বী লাইক দেম্, বাট সীক নট টু মেক দেম্ লাইক উ্য
ফর লাইফ গো'জ নট ব্যাকওয়ার্ড নর্ টারিজ উইথ ইয়েস্টারডে"

পৃথু, আমি আমাব নতুন জীবনেব নতুনত্ব নিয়েই অভিভূত আছি। এ ভাল কী মন্দ তাব বিচার কবার সময় এখনও আসেনি। আমাদেব বিযেব পবদিন থেকেই আমবা অসুখী। আমিও তোমাকে বিয়ে কবতে চাইনি, তুমিও চাওনি আমাকে। অথচ আমাদেব কারোই সাহস ছিলো না যে, গুরুজনদের বিরুদ্ধে যাই। আমবা জেনেশুনেই এই জীবনে শুধু প্রবেশ করেছিলাম তাইই নয়, এক বকম ঘোবের মধ্যেই, এই অসীম ক্লান্তিকর অভ্যাসেব মধ্যে জাবনার সামনে দাঁড়ানো গরুব মতো এতগুলো বছব না-বেঁচেও বেঁচে এলাম। মিলি টুসুকে আমাদেব আনা অন্যায হযেছিল, কিন্তু ওবা ত "সানস্ অ্যাণ্ড ডটাবস্ অফ লাইফস লংগিং ফব ইটসেল্ফ।" আমাদের মধ্যে দিযে এসেছে ওবা শুধু কিন্তু ওরা আমাদেব কেউই নয়। যা ভুল হয়েছে, হয়েছে। বাকি জীবনে আব অমন ভুল হবে না। আমি যা করলাম তাকে তুমি এবং হয়ত অন্য সবাইই বলবে "স্বার্থপরতার চরম"। কিন্তু নিজেব স্বাথ নিজে দেখার মধ্যে লজ্জা, আমি অন্তত দেখি না। পরার্থেই বেঁচে থাকে বলে যাবা বলে, সে নিজের সংসার স্বামী বা ছেলেমেয়ে যাদের জন্যেই হোক না কেন, তারা হয ভণ্ড নয বাঁচা কাকে যে বলে তা জানতে পর্যন্ত ভয় পায়, পাছে তাবা যে বেঁচে নেই এই নগ্ন সত্যটা প্রকাশ হযে পড়ে।

এই দেশে বেশির ভাগ দম্পতিই অভ্যাসেরই আলোয় "ঘব" কবে, জীবনেব আলোয নয়। জীবনের শেষে এসে পরনির্ভব হযে, জবাগ্রস্ত হয়ে তখন হা-হুতাশ করে মবার চেয়ে সময থাকতে থাকতেই নোঙর ছেঁড়াকে ভাল বলে মনে করেছি আমি।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। আমি চাই যে, তুমিও সুখী হও। সত্যিকারেব সুখী। তোমাব প্রেমিকার খোঁজ পাও। তার সঙ্গে নতুন কবে ঘর পাতো। তোমাব পা হাবিয়েছে বলেই ছেলেমেয়ের দায়িত্বও আমি আমাব কাঁধেই নিযেছি। তুমি ত ঝাড়া হাতপা। সুখী হতে তোমার বাধা কোথায়?

তবে, ভাবলে খাবাপ লাগে এই জন্যে যে, তুমি চিরদিনই বড় কনফিউজড। নইলে, তোমার মতো মানুষের কুর্চির মতো সাধারণ মেয়েকে ভাল লাগত না। তবু, কুর্চির কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ

নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার পথে বাধা যেটুকু ছিল তা কুর্চিই এসে দূর করেছিল।

তোমরা পুরুষরা কেনোদিনই এক নারী নিয়ে খুশি নও। ইতিহাস তাইই বলে। লুকিয়ে চুরিয়ে পরকীয়া করে অথবা খারাপ মেয়েদের কাছে গিয়ে নতুনত্ব খোঁজো তোমরা আর চাও তোমাদের স্ত্রীরা সতী-সাধ্বী হয়ে বাড়িতে সংসার পালন করুক। সেই স্ত্রী যদি তোমাদের সমানও আয় করে, শিক্ষিত হয়, তবুও। কারণ, তোমরা পুরুষ। কিন্তু মেল শভিনিজম্-এর দিন এদেশেও অতি দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। তোমরা নতুনত্ব চাইলে আমাদেরও বা চাইতে দোষ কি ? আমরা পারি, পেরেছি বলেই কি চিরদিনই একই ভাবে পেরে আসব ? তোমাদের পা-ধুইয়ে দেব ? সহমরণে যাব ? বোরখা না পরেও বোরখা পরে থাকব চিরদিন ?

না। তা আর হবে না। আমরা সমানে সমানে বাঁচব। এই "বাঁচার" কথা বুঝতে এদেশের সব মেয়েদের আরও কিছু সময় লাগবে। তাছাড়া, খুবই অল্পে সন্তুষ্ট বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পুরোপুরি নেই বলে, এবং আমবা জন্ম-ভীতু বলেই সুখ না থাকলেও আমরা সুখকে কল্পনা করে নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালবেসে এসেছি এত বছর, পাছে, অসুখের সত্যি মুখটি চোখের সামনে এসে আমাদের ঘোর ভাঙায় ! তবু, একজন মনোমত, বুঝদার, কন্‌সিডারেট স্বামী পেলে আজও কোনো বুদ্ধিমতী মেয়ে ঘর ভাঙতে চায় না। আবার এও সত্যি যে, এই মুহূর্তে আমার চেয়েও অনেকই বেশি অখুশি অনেক স্ত্রী এই ছোট্ট জায়গা হাটচান্দ্রাতেই আছে। তারা সন্তানের মা ডাক শুনে চমকে ওঠে। যে ছেলেমেয়েরা তাদের ভবিষ্যতেব সাথী নয়, কেউই নয়, তাদেরই জন্যে এবং তাদের ভণ্ড, মিথ্যাচারী, অত্যাচারী স্বামীদেরও জন্যে এই একটামাত্র জীবন মিছিমিছি নষ্ট করে চলে যায়।

যাক। যত লম্বা হচ্ছে চিঠি, ততই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হয়ত পুনরাবৃত্তিও হয়ে যাচ্ছে বক্তব্যর। তুমি খুশি হও। ভাল থাকো, আনন্দে থাকো তাইই আমি চাই। আমাব নতুনত্বে কাঁটা বিঁধবে, যদি না তুমিও নতুন হও।

মিলি ও টুস্‌কে চিঠি দিও। বাবাগিবি ফলিও না। জ্ঞান দিও না। কাবণ ওদের জ্ঞান আমাব তোমার চেয়ে একটুও কম নয়। ওদের দুঃখবোধ আনন্দবোধ সবই পুবোপুবি অন্য রকম। ওরা হয়ত ভবিষ্যতে কোনো কৃত্রিম উপগ্রহে বাস করবে। নয়ত সমুদ্রেব তলায় কোথায় বাস করবে তা ত অজানা। পৃথিবীতে আর থেমে নেই। আগের পৃথিবীই নেই, তাই তার পুরনো মানসিকতাই বা থাকবে কি কবে ? ওবা ওরা, আমরা আমবা। বন্ধুব মতো যদি দেখো ওদের, বন্ধুত্ব পাবে। তুমি নিছক "বাবা" বলেই যে ওদের ভালোবাসা পাবে তা আদৌ ভেবো না। সমস্ত সম্পর্কব উষ্ণতাই ভালোবাসাব প্রদীপ জ্বেলে পেতে হয়। দেবে না, বদলে শুধু পেয়েই যাবে তা আর হবাব নয়। তা সে স্ত্রীইই হোক, কী ছেলেমেয়েই হোক।

কুর্চির দেখা পেলে কী না জানিও। কে রাঁধছে ? কি খাচ্ছো ? কেমন আছো ? জানিও। চোখেব মলমটা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। আরেক শিশি কি পাঠিয়ে দেবো ? আসলে, তোমার কোনো স্ত্রীরই দরকার ছিল না। একজন মা থাকলেই চলত তোমার। ইডিপাস কমপ্লেক্স-এর এমন কেস, তোমার মতো, আমি আর দেখিনি !

তোমার জন্যে সত্যিই চিন্তা হয় !

তোমার ঠুঠা কি সঙ্গে আছে ? তাও একজন পুরোনো চেনা লোক আছে জেনে ভাল লাগে।

—ইতি

তোমাব এক সময়ের স্ত্রী রুষা।

ঠুঠা বারান্দার এক কোণে একটা থামে হেলান দিয়ে ওর নস্যিরঙা মোটা আলোয়ান জড়িয়ে অন্ধকারে অন্ধকারেরই মতো বসে ছিল। হঠাৎই অমানুষিক আওয়াজ কবল একটা মুখ দিয়ে। কিন্তু চাপা, নিচুস্বরের আওয়াজ।

পৃথু চমকে তাকাল সেদিকে। কৃষ্ণপক্ষর প্রথম এক ফালি ছোট্ট চাঁদ উঠবে, তাও অনেক পরে। অন্ধকারে ঠুঠাব চুটার লাল আগুনটা তীব্র হচ্ছে মাঝে মাঝে যখন টান মারছে তাতে।

পৃথু বলল, কী হল ? এলে কখন ? গেছিলেই বা কোথায় ?

ঠুঠা জবাব দিলো না কোনো। আবার ঐরকম আওয়াজ করলে একটা।

পৃথুর মনে হল পৃথু যেন সত্যিসত্যিই লা-মাঞ্চার ডন কীয়োটে, আর ঠুঠা বাইগা তার স্যাঙ্কো। বোবা স্যাঙ্কো। এতদিন অনেক উইণ্ডমিলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অনেক পথ পরিক্রমার শেষে যেন ফিরে এসেছে ওরা দুজনে রণক্লান্ত হয়ে। তফাৎ এইটুকুই যে, ডন কীয়োটে বলে এক আশ্চর্য চরিত্র তৈরী করেছিলেন মিগুয়েল দ্য সারভান্তে, আর পৃথুর মনোজগতের সব লড়াইই মিছিমিছিই ফেলা গেল। ডন কীয়োটে অমর হয়ে রয়েছেন সাহিত্যে, পৃথু ঘোষ মুছে যাবে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই।

পৃথু ভাবছিল, মিলি ও টুসুকে কি সত্যিই ওরা দুজনে মিলে তৈরী করেনি ? অপত্য সম্পর্ক বলে কি কোনো সম্পর্ক ভবিষ্যতে থাকবেই না ? রুষা যেমন বলছে, মানুষ কি সত্যিই তেমনই হয়ে যাবে ? আলাদা আলাদা, ছেঁড়া ছেঁড়া, সুখকে ছোট ছোট ললিপপ্-এর মতো ভাগ করে নিয়ে তাইই একা একা বড়জোর দোকা দোকা চুষে চুষে খাবে।

কে জানে ! হয়ত হবে। ভবিষ্যতে হবে। মিলি-টুসুরা পৃথুকে কি দেবে কী দেবে না তা ওদেরই ব্যাপার। তাছাড়া এ ত টিবড়েওয়াল-এর অ্যাকাউন্ট্যান্সী নয়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই কি একটি ডেবিটের বদলে একটি ক্রেডিট হয়ই ? দেখাই যাবে। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎই জানবে। তবে যতদিন মিলি টুসু "বাবা" বলে ডাকলে তার বুকের মধ্যের গাছ পাথর সব গলে গলে যাবে, যেমন যায়, ততদিন সে ওদের বাবাই থাকবে। খারাপ বাবা, বাজে বা অপদার্থ বাবা।

তবু, বাবা ত।

লণ্ঠনটা দপ্‌দপ্ করছিল। তেল ফুরিয়ে এসেছে। ঠুঠা খসখসে পায়ে হেঁটে এগিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বাংলোর ভিতরে চলে গেল। নৌকোডুবি হলে জল যেমন নৌকোকে গিলে ফেলে, জলের মধ্যে ভাঙা-কাঁচেরমতোঝকঝকে রূপোলি জল চারদিকে ছিটিয়ে দিয়ে, এখন নিকষ অন্ধকার তেমনই করে কয়লার গুঁড়োর মতো অন্ধকারের স্তূপের মধ্যে টেনে নিল পৃথুকে।

ঠুঠা বাইগা লণ্ঠন হাতে ফিরে এল। টেবলের উপর বসালো সেটাকে।

পৃথু বলল, বোসো না ঠুঠা।

ঠুঠা চেয়ারে না বসে পৃথুর সামনে মাটিতে বসল। জোড়াসন করে।

সংস্কার :

কথা বলো না কেন ? আজকাল ? কী হল তোমার ?

পৃথু বলল।

শব্দ না করে হাসল ঠুঠা। যেন, পৃথুর প্রশ্নর মধ্যে হাস্যকর কিছু ছিল।

কথা না বললে, তুমি যে পাগল হয়ে যাবে। কথা না বলে বাঁচতে পারে কোনো মানুষ ?

ঠুঠা আবারও হাসল। শব্দ না করে। এক দারুণ দীপ্তি ছড়িয়ে গেল ওর কুৎসিত মুখে।

কি অসুবিধে তোমার ? ঠুঠা ? সব সময় এত গম্ভীর হয়ে কি ভাবো তুমি ? কিসের চিন্তা করো ?

এবারে ডান হাত দিয়ে হঠাৎ একটি অতি দ্রুত ঢেউ-তোলা ভঙ্গী করে ও আবারও হাসল। বোঝাতে চাইল যে, বালকসুলভ প্রশ্নর জবাবদেওয়ার মতোসময় অথবা প্রয়োজনও তার একেবারেই নেই।

পৃথু বলল, আজ কুর্চির বাড়ি যাবে না ? কুন্তী কি আছে।

কুন্তীর নাম শুনেই ঠুঠা বাইগার মুখ হঠাৎই গম্ভীর, নিষ্ঠুর হয়ে গেল। সে উঠে পড়ে আবার গিয়ে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে নস্যি-রঙা আলোয়ানের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পশ্চিমাকাশে, পাহাড়ের মাথার ঠিক উপরে সন্ধ্যাতারাটা স্নিগ্ধ সবুজাভ দ্যুতিতে অন্ধকারের জ্বরগ্রস্ত কপালে ওডিকোলন-ভিজোনো রুমালের মতো স্নিগ্ধতা ঢেলে দিচ্ছিল। সেই চিতাটা করাত-চেরা আওয়াজে ভরে দিল অন্ধকার রাতের সব রোমকূপ। পাহাড়তলীর ঘনান্ধকার থেকে শম্বরের দলের দৌড়ে যাওয়ার আওয়াজ ধেয়ে এল। রাতের বাতাস, শুকনো পাতাদের পাথরের আর পাথুরে-মাটির উপর দিয়ে সড়সড় আওয়াজে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। করৌঞ্জ আর মহুয়ার গন্ধ ছুটছে আগে আগে। পাইলট সার্জেন্টদের মতো।

হাটচান্দ্রায় যখন ছিল তখন একা থাকতে খুবই ভাল লাগত পৃথুর। এখন একেবারেই একা হয়ে গিয়ে বুঝতে পারছে যে, একা একা বেঁচে থাকা বড় সোজা নয়।

পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি যেন জঙ্গল থেকেই উঠে এসে ওর মাথার মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে থাকল। প্রত্যেকটি শব্দ একটি একটি করে :

"একা হলেই নিজের কাছে নতজানু মানুষ
বরফের মতো, ঘাসের মতো
মোমের মতো গলতে গলতে বলে
—ক্ষমা করো!
আমি পারিনি
খুচরো পয়সার মতো এলোমেলো হয়ে গেছি
গাছ থেকে ঝরে পড়েছি
খাদে,
ফাঁদে,
জঙ্গলে।
দরজা খুঁজে পাইনি রাজবাড়ির
সিঁড়ি খুঁজে পাইনি মন্দিরের
ক্ষমা করো।
আমি পারিনি।



এ রবিবার সকাল থেকেই আছে পৃথুর বাংলোয়। কুন্তীকে ছুটি দিয়েছে একদিনের জন্যে। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর বারান্দায় বসে ছিল পৃথু আর কুর্চি। অনেকদিন পর পরোটা, মেটে-চচ্চড়ী আর পায়েস দিয়ে ব্রেকফাস্ট করল পৃথু। কুর্চি নিজে রান্নাঘরে গিয়ে বিশু নিজে হাতে বানিয়েছিল। শুধু পায়েসটা গত রাতে রেঁধে রেখেছিল বিশু। রান্না যে মেয়েদের কতবড় গুণ তা একালের অনেক মেয়েরাই জানেন না। শুধুমাত্র ভালবেসে রেঁধে ও খাইয়েই যে একজন পুরুষের হৃদয় জয় করা যায় সহজে, অন্য কোনো গুণ ব্যতিরেকেই, সে কথাও বোধহয় রুষার মতো অনেক আধুনিকা জানেন না। কুর্চি ঘুরে ঘুরে প্লান্টস্, ফার্ন, ব্রমেলিয়াডস্‌গুলো দেখছিল। রুষার মতো ইকেবানা বা প্লান্টস্ বা ক্যাকটাই সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নেই কুর্চির কিন্তু স্বাভাবিক ভালবাসা আছে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের এই সব শখে নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগ খুব একটা থাকে না। তাই বলে ভালবাসাও যে থাকে না এমন নয়। যেখানে নারী, সেখানেই গাছ, ফুল, পাখি, প্রজাপতি, কাঁচপোকা। ভ্রূণ এবং বীজও।

পৃথু, কুর্চির অনবরত প্রশ্নর উত্তরে হেসে বলল, এডওয়ার্ড লীয়রের-ননসেন্স বটানী পড়েছো?

কুর্চি চোখ তুলে বলল, না ত! ইংরিজী আমি কতটুকুই বা পড়েছি!

রুষার খুবই প্রিয়, লীয়র।

পৃথু বলল।

ননসেন্স্ কেন ?

কুর্চি বলল।

সেইই ত মজা!

কি রকম ?

ধরো, বটল্‌ফোরিকা স্থনিফোলিয়া। অথবা স্মলটুথকম্বিয়া ডমেস্টিকা।

কুর্চি হেসে ফেলল। বলল, আরও আছে ?

অনেক। পলীবার্ডিয়া সিঙ্গুলারিস্, কক্কাটুকা সুপার্বা অথবা পিগিয়াউইগিয়া পীবামিডালিস্।

কুর্চি হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর বারান্দার মোজাইক্-করা চওড়া ঘেরার উপর থামে হেলান দিয়ে বসে বলল, অন্যদের লেখা ত অনেকই পড়লেন। সারা জীবন ধরে। নিজে এবারে একটা বড় লেখায় হাত দিন পৃথুদা। আপনি কিছুই না করে নিজেকে নষ্ট করলেন।

নষ্ট হয়ে যাবার মধ্যেও একধরনের বোধ কাজ করে গভীরে। জেনেশুনে নষ্ট, সকলে হতে পারে না। "প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই" এমন কথা কি সকলে জানে ? না বলতে পারে ?

আপনার মতো করেই লিখুন। কেমন হয় দেখাই যাক না।

আমি লিখলে, বড় জোর মণি চাকলাদারের মতোই লেখা হবে হয়ত। পাতা ত কতলোকেই ভরিয়ে চলেন। সেই সব ভরা-পাতার কতটুকু সাহিত্য বলে বিবেচিত হবে ভবিষ্যতের পাঠকের কাছে আর কতটুকু পাঠকের পরম অবহেলায় মুদির দোকানের ঠোঙ্গাতে পর্যবসিত হবে, তা জানে একমাত্র মহাকাল। বেশি পড়লে, বেশি ভাবলে, বোধহয় কিছু লেখা যায় না। সবাই যদি কবি বা লেখক হয়ে পড়েন তবে পড়ুয়া হবেন কারা ?

আপনি ভীষণ কুঁড়ে। তাইই এসব বলে নিজেকে বুঝ্ দেন।

কুঁড়েমির মতো গুণও কি বেশি আছে ? বারট্রাণ্ড রাসেলের "ইন প্রেইজ অফ আয়ডলনেস" বইটা তোমাকে পড়তে দেবো। পড়ে দেখো।

ইংরিজি ত আমি জানি না তেমন ভাল।

যে একটি ভাষাকে ভালোবাসে তার কাছে সব ভাষাই সহজে আপন হয়। সব বোঝার দরকারই বা কি। মূলভাবটুকু বুঝলেই যথেষ্ট।

কী জানি! রুষা বৌদির যে চিঠিটা আপনি আমাকে আজ সকালে পড়ালেন তা অবশ্য বুঝেছি। উনিও কিন্তু সহজেই লেখিকা হতে পারতেন। কী চমৎকার ইংরিজি লেখেন। অথচ লিখলেন না।

আমার মনে হয় যাঁরা লেখেন, তাঁদের চেয়ে অনেক বড় লেখক-লেখিকা রয়ে গেলেন চিরদিনই সকলের চোখের আড়ালে পড়ুয়া হয়েই। সেই মুষ্টিমেয় পড়ুয়ারাই যুগে যুগে সাহিত্যের মান নির্দ্ধারণ করেন; সাহিত্যের প্রকৃতির প্রকৃত বিচার করেন। তাঁরা যে কারা, জনসাধারণের ভীড়ের মধ্যে কোথায় যে নিজেদের গোপন করে তাঁরা জীবন কাটিয়ে দেন, তা লেখকরা জানেনই না। অথচ তাঁদের দেয় পুরস্কারই আসল পুরস্কার। তাঁদের বিচারে যাঁরা বড় তাঁরাই থেকে যান শেষ পর্যন্ত।

কথাটা কিন্তু উঠিয়েছিলাম আমি আপনার লেখা নিয়েই।

আমার কথা ছাড়ো। সাহিত্য ভালবাসলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না। বললাম না, সরস্বতীর কৃপা থাকা চাই। আমি একটা ফাল্‌তু লোক। নির্গুণ। কিছু হওয়ার জন্যে এখানে আসিনি এ জন্মে, যাঁরা হয়েছেন তাঁদের গুণগ্রাহী হওয়ার জন্যেই এসেছি। তাছাড়া, সবাইকেই যে বিরাট কিছু হতে হবেই তারই বা মানে কি ? বেশ ত আছি। একখানা পা, সীওনীর এই নির্জন শান্ত নিরুপদ্রব নির্লোভ জীবন, একজন কুর্চি, একজন ঠুঠা বাইগা আর আদিগন্ত প্রকৃতি এই সব নিয়ে। এই ত কত! এর চেয়ে বেশির যোগ্যতা আমার নেই, প্রত্যাশাও নয়।

কুর্চি উঠে এসে পৃথুর পেছনে দাঁড়িয়ে ওর হাত দুটি নামিয়ে পৃথুর বুকের কাছে মালা গড়ল একটি। বলল, আপনি তাহলে আপনারই মতো থাকুন। বলছি বটে এত কথা, আপনি বিখ্যাত হয়ে গেলে, বড় হয়ে গেলে আপনার অনুরাগী আর অনুরাগিণীদের ভীড়ে আমিই হয়ত কাছে পাবো না

আপনাকে। আমরা দুজনেই যে অনেকই দাম দিয়ে দুজনকে পেয়েছি পৃথুদা। হারাবার কথা ভাবলেও বুক কাঁপে ভয়ে। পেয়ে হারানোর দুঃখ হয়ত সইবে না। যতদিন পাইনি, ততদিন অন্য কথা ছিল।

পেলে আর কোথায় ? আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হওয়া আমাদের সম্ভব নয়। রুষার আধুনিকতায় ও ত এসব ব্যাপাবকে আমলই দেয় না। যে কারণে ডিভোর্স-এর কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করেনি একবারও।

ভাঁটু ত দেয। দুজনের আইনেব সম্পর্ক না চুকালে নতুন সম্পর্ক আমরা গড়ব কি করে ?

কুর্চি এসে পৃথুর সামনের চেয়ারে বসল। বলল, কারণ যে কী, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। স্পষ্ট করে আমি নিজেও তা জানি না। তবে, মনই বলে এবকম কথা। কিছু কিছু পুরুষ বোধহয় থাকে যাদের কোনো মেয়েই পুরোপুরি পায় না। তাদের ষোলো-আনা কোনো একজন বিশেষ নারীর জন্যে নয়। টুকরো-টাকরা নিয়ে যারা খুশি হতে পারল, তারা হলো : যারা পারল না, তারা পেলোই না তাকে। অবশ্য, প্রকৃতই যারা পুরুষ তাদের পক্ষে এরকম বিধিবদ্ধ খাঁচার-পাখির জীবন হয়ত অভিপ্রেতও নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা'ব অবিচার কথা বলছিলাম সেদিন! তাব সবই ছিল। রূপ, গুণ, মেধা, তবু তার সর্বস্ব দিয়েও সে নবীনকে পুরোপুরি পেল না। অথচ কেন যে পেল না সে সম্বন্ধেও তার এক স্পষ্ট ধারণা ছিল। কে জানে, পেতে চাইলও না হয়ত শেষ পর্যন্ত।

'শেষ-কথা' আমাব ভাল মনে নেই। ল্যাবরেটরী আর রবিবার মনে আছে।

সেই যে, নবীন বলল না ; অচিরা কচ ও দেবযানীর কথা তোলাতে ? "দেখুন, আমি হয়ত ভুল করেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদি না চলে তা হলে মেয়েদেব সৃষ্টি কেন ?"

তখন অচিরা বলল · "বারো-আনাব চলে, মেয়েবা তাদের জন্যেই। কিন্তু বাকি মাইনরিটি যারা সব-কিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে তাদেব চলে না। সব-পেরোবার মানুষকে মেয়েরা যেন চোখের জল ফেলে বাস্তা ছেড়ে দেয। যে দুর্গম পথে মেয়ে-পুরুষের চিরকালের দ্বন্দ্ব সেখানে পুরুষবা হোক জয়ী।"

পৃথু বলল, রবীন্দ্রনাথের সময়ে হয়ত এইসব কথার দাম ছিল। আজকে মেয়েরা ত লিবারেটেড হয়েছে। মেল্-শভিনিজম্-এর দিন ত আর নেই। এখন মেয়েরা কোন্ অংশে পুরুষদের থেকে কম। এমন কথা অন্য আধুনিকাবা শুনতে পেলেও তোমাকে দুয়ো দেবেন।

তা দিন। মেয়েরা যতই স্বাধীন হোক, যতই লিবারেটেড় হোক, তারা ত মেয়েই থাকবে। বড় ছোটর কথা বলছি না, মেয়েরা পুরুষের মধ্যেই সার্থক, হয়ত পুরুষরাও মেয়েদেয় মধ্যে। দুজনের মধ্যে ত কোনো বিরোধ নেই। তেমন তেমন মেয়েরা চিরদিনই লিবারেটেড। পুরুষের দুয়ারে পতাকা আর পোস্টার নিয়ে স্বাধীনতা ভিক্ষে করতে বিদেশের মেয়েরা যায় যাক, আমি যাবো না। স্বাধীনতা ত সামান্য কথা, তার চেয়েও অনেক বড় আসনে এদেশের শিক্ষিত, যথার্থপুরুষরা চিরদিনই আমাদের বসিয়ে এসেছেন। আর তাইই যখন ঘটনা : তখন নিজেদের এমন করে ছোট করতে যাবই বা কেন ?

বল কী তুমি ? শরিযতী আইনের ওপর সুপ্রীম কোর্টের রায় নিয়ে দেশের অধিকাংশ মুসলমান পুরুষরা কেমন লম্ফ-ঝম্ফ করছে দেখছো না !

তা তাঁরা যা খুশি তাইই করুন। যে জাত, যে দেশ, যে ধর্ম, মেয়েদের মর্যাদা না দেয়, তারা কখনই শিক্ষিত বলে পরিচিত হবে না। বর্বরতা আর আধুনিকতা ত একই বোরখার নিচে সহাবস্থান করতে পারে না।

দোষ কি মুসলমানদেরই শুধু ? রোজই কাগজে তুমি হিন্দুদের মধ্যে পণের ব্যাপার নিয়ে অত্যাচার, হত্যা, আত্মহত্যার খবর কি পড়ো না ?

পড়ব না কেন ? যে সব সমাজে এবং বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এসব এখনও ঘটে, তারা বড়লোক হতে পারে, ব্যবসার নিয়ন্ত্রক হতে পারে, মানুষ হয়ে উঠতে তাদের এখনও অনেকই দেরী আছে।

রবীন্দ্রনাথের অচিরা আর নবীনবাও সেদিন ত ছিলই। আজ তাদের সংখ্যা অনেকই বেড়েছে। আপনি ত আমাকে পুরোটা বলতেই দিলেন না। সবই গোলমাল করে দিলেন তার আগেই।

সরী! বল বল, তোমার অচিরার কথাই শুনি।

অচিরা আরও বলেছিল : "যে মেয়েরা মেয়েলি, প্রকৃতিব বিধানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, তারা ছেলে মানুষ করে, সেবা কবে ঘরেব লোকেব। যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, তাদেব সংখ্যা খুব কম ; তাবা অভিব্যক্তির শেষ কোঠায়। মাথা তুলছে একটি দুটি কবে।" মানে, আপনাবই মতো আব কী!

তারপর ?

"মেয়েরা তাদের ভয পায, বুঝতে পাবে না, টেনে আনতে চায নিজেব অধিকারের গণ্ডীতে।"

যাইই বল, সেই আলখাল্লা পবা বুড়োর অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তর্কশাস্ত্রে যে বিশেষ দখল ছিল তাঁর তা কিন্তু আমার মনে হয় না। আমার দোষেই দোষী তিনি। যখনই কিছু বলতে চান, তখন তাঁব বক্তব্য ছাপিয়ে তাঁর ভাষাব কাব্যময়তা তাঁর পাত্র-পাত্রীকে একেবাবেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বলা শেষ হলে দেখা যায় নায়ক এবং নায়িকা যে তিমিবে ছিল, সেই তিমিবেই।

পৃথুদা। আপনি ভীষণ অধৈর্য এবং উদ্ধতও।

ঠিক আছে। বল শুনি।

"পুরুষ যেখানে অসাধাবণ সেখানে সে নিবতিশয় একলা। নিদারুণ তাব নিঃসঙ্গতা, কেননা, তাকে যেতে হয় যেখানে কেউ পৌঁছযনি।"

পৃথু, হাসল।

বলল, কথাগুলো ভারী সুন্দর। কিন্তু আমি ত অসাধারণ নই। ঠিক এই মাপেব অসাধারণ পুরুষ ত চাবপাশে দেখতেও পাই না কোথাও। বাঙালীদের মধ্যে বোধহয় অসাধারণত্বর মড়ক লেগেছে, গরু-মোষের রাইণ্ডাবপেস্ট মহামাবীবই মতো। অসাধারণ বাঙালীদের প্রজন্ম শেষ হযে গেছে। এখন শুধুই ইঁদুবদের দৌরাত্ম্য।

ইঁদুর মানে ?

কুর্চি বলল। চোখ তুলে। বিরক্ত হয়ে।

ইঁদুররা সবসময কাটা-কুটি কবে কেন, জানো ?

না ত। কেন ?

ওদের একটা দাঁত আছে। সবসময় কিছু না কিছু কেটে তাদের সেই দাঁত ক্ষইয়ে না ফেললে সেই বাড়ন্ত দাঁত তাদের মগজ ফুটো করে দিত। অক্কা পেত নিজেরাই। এখনকার বাঙালীবও ঐ ইঁদুরদেরই মতো। তাও ধেড়ে ইঁদুর নয়। ইঁদুরদের মধ্যেও, ধেড়েরা বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। চারপাশে এখন নেংটি ইঁদুর। কুটুর-কুটুর সর্বক্ষণ।

কাটে কি তারা ?

যা কিছুই পায় তাইই কাটে। শ্রম কাটে, আশা কাটে, সম্পর্ক কাটে, সাবল্য, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, ভালত্ব সবকিছু কেটে কেটে ঝাঁঝরা কুটিকুটি করে দেয়। এদের মধ্যে অচিবার নবীনবাবুর মতো কাউকেই ত দেখি না!

আপনি। আপনি ত ব্যতিক্রম!

হাঃ। হাসল পৃথু। বলল : হলে, খুশি-হতাম। কিন্তু নই কুর্চি।

শেষ হল কি তোমার অচিরার অশেষ শেষ-কথা ? না হয়ে থাকলে, বলো।

অচিরা পরে বলেছিল তার অধ্যাপক দাদুকে : "ও তোমার বাজে কথা। আসল হচ্ছে এটা স্ত্রী -জাতিদের দেশ। এখানে পুরুষেরা স্ত্রৈণ, মেয়েরাও স্ত্রৈণ। এখানে পুরুষরা কেবলই 'মা' 'মা' করছে, আর মেয়েরা চিরশিশুদের আশ্বাস দিচ্ছে যে তারা মায়ের জাত। আমার ত লজ্জা করে। পশু-পক্ষীদের মধ্যেও মায়ের জাত নেই কোথায় ?

এবারে থামো কুর্চি। 'শেষ কথা'র নায়ক-নায়িকাবা কেবলই বড় বড় পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা

বলছে। আসলে কে যে কি বলতে চায় তা বুঝে পর্যন্ত উঠতে পারছি না।

সব মানুষই পরস্পরবিরোধী। যারা নয়, তারা ত যন্ত্র, মেশিন, এমনকি জানোয়ারই, তারা মানুষ পদবাচ্যই নয়। আপনি কি জানেন না, রবীন্দ্রনাথকে একজন বিদেশি প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার মতে, আপনার সবচেয়ে বড় দোষ কি ?' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'ইন্‌কন্‌সিস্টেনসী'। উনি আবারও জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আপনার মতে আপনার সবচেয়ে বড় গুণ কি ?' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'ইন্‌কন্‌সিস্টেন্সী'।

তাইই ? বাঃ বেশ ত !

পৃথু বলল।

ইয়েস স্যার। তাইই।

এবারে একটু কন্‌সিস্‌টেন্ট হয়ে বলো, আসলে কী তুমি বলতে চাইছিলে ?

পৃথু বলল।

বলেছিত ! আপনাকে চিরদিনের মতো,আইনানুগভাবে পাবো না আমি। এরপরে বলার কি আর থাকতে পারে ?

মাত্র কদিন মাঝে মাঝে দেখা হওয়াতেই যেমন ঝগড়া এবং মতবিরোধ হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে চিরদিনের মতোকোনো ভালবাসার জনকেই কাছে না পাওয়াই বোধহয় ভাল। তোমার কাছে যখন যেতাম রাইনাতে, অপলকে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তোমার হাতে হাত রাখলেই আমার শরীরে কাঁটা দিত। চোখে চুমু খেলে মনে হত ভাললাগায় গলে যাব। চোর ছিলাম ত। পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করার নামই ত চুরি।

আর এখন ?

কুর্চি বলল।

সবই পেলাম। এতবার করে, এতরকম করে, কিন্তু সেই চুরি করে চোখে চুমু খাওয়ার সিরসিরানি যে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে ? চুরি করে ভাল না-বাসলে বোধহয় ভালবাসাটা আর ভালবাসা থাকে না। পরকীয়া প্রেম বা অনাঘ্রাত প্রেম হচ্ছে চাঁদের আলো, আর বিবাহিত প্রেম বা খোলামেলা বাধাহীন শরীরী-সম্পর্ক বোধহয় সূর্যালোক। প্রখর সূর্যতাপে, ধুলোয়, আওয়াজে ভালবাসার ফুল বোধহয় শুকিয়েই যায়।

কুর্চির গাল লাল হয়ে উঠল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল ও।

কি হল ?

কিছু না।

আরে। নিজের মনে নিজের সঙ্গে কথাও কি বলতে পারব না ? নিজেকে নিজে প্রশ্ন যে না করে সেও কি মানুষ ? এত জানো, আর এটুকু জানো না। স্বগতোক্তিও কি দোষের ?

আপনি যদি এইই জানেন তাহলে অমন কাঙালপনা করতেন কেন ? আমার বারো বছর বয়স থেকে আমাকে এমন করে ভালোবাসলেন কেন ? যা আমি আপনাকে দিয়েছি তাইই কি চাননি আপনি আমার কাছে ? অদ্ভুত মানুষ আপনি। সত্যিই ! যা পেয়ে ধন্য হওয়ার কথা ছিল তাইই পেয়ে মনে হচ্ছে বিরক্ত হয়েছেন আপনি। আমি.....আমাকে এমন অপমান করার কোনো...

আঃ। কুর্চি : তুমি ত ছোট নও। বোকা নও। তুমি হয়ত তোমার নিজের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। আমি নই। এখনও নই।

কুর্চির চোখের কোণে জল ছলছল করে উঠল।

পৃথু, ক্রাচদুটি তুলে নিয়ে, কুর্চির কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখল।

বলল, কুর্চি ! আমাকে ভুল বুঝো না। নিজের মধ্যে যে মানুষটা বাস করে তাকে এতদিনেও জানা হয়নি। যেদিন চিতায় ছাই হয়ে যাব সেদিনও হয়ত পুরোপুরি জানা হবে না। নিজের ভিতরের নিজেকে পুরোপুরি জানার এই খোঁজ যেদিন থামিয়ে দেব, সেদিন বেঁচে থেকেও যে মরে যাব কুর্চি ! আমাকে বাঁচতে দাও লক্ষ্মীটি। তোমাকে আমি আমার অনেক স্বপ্ন আর কল্পনার কুর্চি করেই রাখতে

চাই। তোমার সঙ্গে দিনরাত এক ঘরে থেকে, তোমার শরীরকে হাত বাড়ালেই বারবার পেয়ে তোমাকেও যদি আরেকজন রুষা করে তুলি, রুষা বলে ভাবতে থাকি আমি ? সেইই ভয় আমার। তুমি কি বোঝো না ?

হঠাৎই কুর্চি উঠে দাঁড়াল।

দু-ভুরু কুঁচকে বলল, অসম্ভব !

বিনুনী করে এসেছিল। চান করে। ছিপছিপে, ঋজু সরু কোমর বেয়ে বেণী নেমেছিল কালো প্রপাতের মতো। নিচের দিকে গোঁজা ছিল অমলতাস ফুলের স্তবক। তার পরনে হলুদ একটি টাঙ্গাইল শাড়ি, অফ্-হোয়াইট ব্লাউজ, দীঘল চোখে কাজল। সকালের বারান্দাতে হঠাৎ একটি উদ্ধত অথচ নরম হলুদ ফুলের মতো ফুটে উঠেই, সারা বারান্দা হলুদ আলোয় আভাসিত করে বেণী দুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল কুর্চি। তারপর প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেল বাংলোটা থেকে।

পৃথু ডাকল কুর্চি। ও কুর্চি।

আমি যে দৌড়তে পারি না। তুমি দৌড়ে চলে গেলে আমি তোমাকে ধরতে পারব না আর কোনোদিনও। একটু দাঁড়াও আস্তে এগোও। আমি আসছি। রাগ কোরো না। প্লীজ····। কুর্চি। মনে মনে বলল পৃথু। চলে যাওয়া কুর্চির দিকে তাকিয়ে।

কুর্চি ততক্ষণে বড় বড় পা ফেলে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হতাশ, হতভম্ব পৃথু ধবপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। তাড়াতাড়ি বসাতে একটি ক্রাচ হাত ছিট্‌কে পড়ে গেল বারান্দার মেঝেতে। শব্দ শুনে ভেতর থেকে ঠুঠা বাইগা পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়াল। একবার পৃথুর দিকে চাইল, আরেকবার কুর্চির শূন্য চেয়ারটার দিকে। বেণী থেকে খসে পড়া হলুদ অমলতাসের গুচ্ছ মেঝেতে পড়ে ছিল। ঠুঠা, বাংলোর গেট পেরিয়ে বাঁক অবধি গেল। তারপর ফিরে এসে পৃথুর সামনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা চাউনিতে দেখল পৃথুকে। পৃথুর মনে হল ঠুঠা বলছে : তুমি একটা অভিশপ্ত জীব। আমারই মতো। একটা শুধু পাইই নয়, একদিন আমারই মতো সবকিছুই হারাবে তুমি। যে ধরে রাখতে না জানে, তার কিছুমাত্রই পাওয়ার অধিকার নেই এ সংসারে। পৃথু মুখ নামিয়ে নিল। অজগরের চোখের মতো সেই চাউনি সহ্য করা কঠিন ছিল।

রান্নাঘর থেকে বিগ্‌ এল। এদিক ওদিক চেয়ে অবাক গলায় বলল, একী ! মেমসাহেব গেলেন কোথায় ?

ঠুঠা নিজের চোখ-জোড়া দিয়ে বিগুর চোখ-জোড়াকে টেনে এনে মেঝেয় পড়ে থাকা অমলতাসের স্তবকের উপর নামাল।

বিগু বলল, খাসীর রেজালা বানাচ্ছি, বাসমতী চালের পুলাউ, ছোলার ডাল, কারিপাতা দিয়ে, বাযগণ ভাজা, আর মেমসাব ··

পৃথু বলল, রান্না হলে টিফিন ক্যারিয়ার করে মেমসাহেবের বাড়ি খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবি। বলবি, আমি যাব। ওখানেই খাব।

বিগু ও ঠুঠা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ভিতরে চলে গেল। সবুজ আর সাদা ডোরাকাটা পর্দাটা দুলতে লাগল ডিফিওনবিচিয়ার অতিকায় একটি পাতার মতো।

পৃথু বৈশাখের সকালের রৌদ্রোজ্জ্বল পাহাড়ের দিকে চেয়ে ভাবছিল, কুর্চিরও তাহলে রাগ আছে। রুষার মতো।অতটা না হলেও বেশ বেশিই আছে। নইলে, রাগ করে এমনভাবে সীন্-ক্রিয়েট করে চলে যাবার মতো কোনো ব্যাপার ঘটেনি। ওর কিছু বলার থাকলে ও ঠাণ্ডাভাবে বলতে পারত। অথচ, আশ্চর্য ! এত বছরে কুর্চির সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে পৃথুর, মনে হয়েছে ও শুধু নম্রতা আর সহানুভূতি আর আদর আর ভালোবাসারই প্রতীক। মানুষমাত্রেরই যে রাগ থাকে, দোষেগুণে মেশা যে সব মানুষই, এ ভাবনা, যে-কুর্চিকে ও জানত সেই কুর্চি সম্বন্ধে মাথায় একবারও আসেনি। এখন বুঝছে যে আসা উচিত ছিল। কুর্চির মধ্যেও রুষা আছে।

কে জানে, হয়ত রুষার মধ্যেও কুর্চি ছিল।

তেমন করে খোঁজার চেষ্টা করেনি কখনও হয়ত পৃথু। নিজেকে নিয়ে, নিজের পুরুষবন্ধুদের

জগৎ নিয়ে, রুষার প্রতি অনুযোগময় বছরগুলি কুর্চির প্রতি নরম ভালবাসা বুকে করেই কাটিয়ে দিয়ে এল। অনেকগুলো বছর। রুষার মনের সব পাঁপড়ি খুলে মেলে দেখার অবকাশই হয়নি। হয়ত শরীরেরও নয়। এক অন্ধ জীবন যাপন করছিল ও। যদি বা সেই বন্ধ চোখ খুলেছিল সীওনীতে এসে তাও আবার বন্ধ হবার মুখে।

অথবা, কে জানে? প্রকৃত ভালবাসার সম্পর্কে এই মান-অভিমানই হয়ত আসল। মান এবং মান-ভঞ্জন। এই নাগরদোলাই হয়ত নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখে; সঞ্জীবিত করে।

বেচারী কুর্চি। বেচারী রুষা। বিজ্‌লী বেচারী!

পৃথু ভাবছিল ও বড নরম মনের পুরুষ মানুষ, রবীন্দ্রনাথের 'শেষকথার' অচিরার ভাষায় হয়ত স্ত্রৈণও। হাটচান্দ্রার অনেকেই তাকে এই অপবাদ দিত। যদিও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বলতে এক বাড়িতে থাকা, একসঙ্গে খাওয়া ছাডা আর কিছুই ছিল না। তবু, সে প্রচণ্ডরকম বিবাহিত ছিল। স্ত্রী ছেলেমেয়ের প্রতি কর্তব্য, তাদের প্রতি মমত্ব, তাদের জন্যে সব দরদ পুরোমাত্রায়ই ছিল তাব। কিন্তু সেই সব বোধ প্রকাশ করার সুযোগ তাকে খুব বেশি দেওয়া হয়নি। ছেলেমেয়েরাও রুষা-চালিত ছিল, শিশুকাল থেকেই। একবেলাও তাদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবার অধিকার ছিল না, ছিল না ওদের একটি চকোলেট বা কেক কিনে দেওয়াব স্বাধীনতা, রুষার অনুমতি ছাড়া। এই সবেরই জন্যে, ধীরে ধীরে নিজের সম্মানেরও কারণে ও নিজেকে সরিয়ে আনতে আনতে হয়ত বড় বেশি দূরেই সরিয়ে এনেছিল। দাম্পত্য সম্পর্কে "স্পেসেস্ বীটউইন টুগেদারনেস" ভাল। কিন্তু সেই স্পেসেস্ যদি দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে, তখন তা আর সাঁতরে পেরুনো যায় না, তা পেরোতে কুর্চি বা বিজ্‌লীব মতো নৌকোর প্রয়োজন হয়ে পডে।

বাইরে রোদ জোর হচ্ছিল। ইদানীং একটু গরম গরম লাগে। পথের উল্টোদিকের একটি বড় অশোক গাছে মস্ত একটি মৌচাক হয়েছে। বিশু একদিন বারান্দায় আগরবাতি জ্বালিয়েছিল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাবা হামলে এসে পড়েছিল চাক থেকে বিশুর উপব। মৌমাছির কামড জঙ্গলে পৃথু অনেকবারই খেয়েছে। সেটা মোটেই সুখাদ্যর মধ্যে গণ্য নয়। তাইই, কুর্চিকেও বলে দিয়েছিল কোনো সুগন্ধি মেখে যেন বারান্দায় না বসে। নিজেও ঈত্বর সম্বন্ধে সাবধান হয়ে থাকে। কি আর করা যাবে? যেখানে সুগন্ধ, সেখানেই কামড। সুগন্ধমাত্ররই মধ্যে হুলের হোমিং-ডিভাইস থাকে বোধহয। বীল্ট-ইন্।

সামনে পাহাডেব নবম রোমশ সবুজ গায়ে তার ত্রিকোণ চলন্ত ছায়া চক্রাকারে ঘুরিয়ে ঘুবিয়ে একটি ক্রেস্টেড হক ঈগল আকাশ পবিক্রমা কবছে। পশ্চিম দিকে, পাহাডেব পায়ের কাছে একটি দহ মতো আছে। সেদিক থেকে দ্রুত উড়ে আসছে একটি ছোট্ট নীল-মাথা বাদামী-গায়ের কিং ফিশাব মাছরাঙা। আর তার পেছন পেছন, যেন তাকে ধাওয়া করেই উড়ে আসছে সাদা-বুক মস্ত ঠোঁটের বড় একটি হোয়াইট-ব্রেস্টেড কিং-ফিশার। ক্রেস্টেড হক-ঈগলটা ক্রমশই উপবে উঠছে। দেখতে দেখতে পাহাড়ের চুডো ছাডিয়ে নীল মহাশূন্যের মধ্যে একটি বিন্দুর মতো ছোট হয়ে যাবে সে। তাব দূরবীক্ষণ চোখে পাহাড়ের প্রতিটি খোঁজ-খাঁজ, মালভূমি, বুকেব উপত্যকা, নদীর পেলব শুকনো খোল ফুটে উঠবে। কোথায় খাবাব নড়ছে-চরছে তা দেখতে পেলেই ফাইটার মিগ জেটের মতো দ্রুত সে নেমে আসবে। জিম করবেটের বনশীব মতো অলুক্ষুণে ডাক ডাকবে কখনও। বুকের মধ্যে, হাবতে-থাকা-ফুটবল টীমের কাছে রেফারীর পেনাল্টি কিক্-এর হঠাৎ-বাঁশিরই মতো তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত স্বরে বেজে উঠবে তার শুদ্ধ স্বর, তারাতে। ক্রেস্টেড হক ঈগলরা উদারা মুদাবার ধার ধারে না। তারাতেই তাবা স্বর-দীপ্ত।

পাহাড় চুড়োর দিকে চাইলেই বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে আজকাল। নিজের পঙ্গুতা এবং ওয়াল্ট হুইটম্যান-এব উদাব মুক্তিব কবিতাগুলি একে অন্যের সঙ্গে নিঃশব্দ যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

অ্যালোন, ফার ইন দ্যা ওয়াইল্ডস এণ্ড মাউনটেইনস আই হাণ্ট,

ওয়াণ্ডারিং অ্যামেজড় অ্যাট মাই ওওন্ লাইটনেস এণ্ড গ্লী,
ইন্ দ্যা লেট আফটারনুন চুজিং আ সেফ স্পট টু পাস দ্যা নাইট,
কিণ্ডলিং আ ফায়াব এণ্ড ব্রয়লিং দ্যা ফ্রেশকিলড গেম,
সাউণ্ডলী ফলিং অ্যাস্লীপ্ অন দ্যা গ্যাদারড লীভস, মাই ডগ
এণ্ড গান বাই মাই সাইড।

যখন নিজের ভাবনায় বুঁদ হয়ে যায় পৃথু তখন ঐ ঈগলের মতোই উড়তে উড়তে চলে যায় নিঃসীম শূন্যে। সময়ের হুঁশ থাকে না, পরিবেশেব হুঁশ থাকে না!

বিগুর গলা-খাঁকারীর আওয়াজে ওব ঘোর ভাঙল।

বিগু টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে তৈরী। জামা-কাপড়ও বদলে ফেলেছে। কাঁধে মুসলমান-বাওয়াৰ্চিদের মতো একটি তোয়ালে ফেলেছে। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি। ছেঁড়া হলেও, ধবধবে করে কাচা।

হেসে বলল, আমি এগোলাম। আপনি কখন যাবেন বলব?

আধঘণ্টা পরে রওয়ানা হব। আমাব যেতে ত সময় লাগবে! মনে হয় বারোটা নাগাদ পৌঁছব। তুই পৌঁছে দিয়েই চলে আসিস। বেলা হয়ে যাবে। ফিরেই, ঠুঠাকে দিয়ে তুইও খেয়ে নিস।

বিগু চলে গেলে একবাব বাথরুমে গিয়েই, পৃথু বেবিয়ে পড়ল কুর্চিব বাড়িব দিকে। আস্তে আস্তে বড় রাস্তায় এসে উঠল। কুর্চির বাড়ির দিকের রাস্তায়, বাঁদিকে মোড় নিতে যাবে যখন ঠিক তখনই মার্জিত মেয়েলি গলার আওয়াজে চমকে উঠল ও। পিপ্পুলগাছের নিচের চা আব পানেব দোকানের সামনে থেকে এল সেই কণ্ঠস্বর। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, স্কুলেব দুজন মেয়ে টিচাব। কী যেন নাম! তক্ষুনি মনে করতে পাবল না।

পৃথুকে হয়ত ওরা তখনও লক্ষ্য করেনি। কিন্তু ওবা লক্ষ্য করাব আগেই পৃথু হেসে বলল, কি হচ্ছে, এখানে?

ওঁবা দুজন সমস্বরে হেসে বললেন, গুটকা খাচ্ছি। ছুটি ত! এই দিকে এসেছিলাম কে রাযেব বাড়ি। আমাদের কলীগ।

পৃথু হেসে এগিয়ে গেল। কুর্চির বাড়ির দিকেব পথে মোড় নেবাব সময় আবেকবার পেছন ফিবে তাকাতেই দেখতে পেল মেয়েদুটি তাকে নিয়েই হাসাহাসি কবছে। কুর্চিব বাড়ি যাচ্ছে বলেই হযত।

যাক্‌গে। যে যা বলে, ভাবে ভাবুক। এবা সকলেই আসলে ঈগল। একটু সুখ দেখলেই ছোঁ মাবতে চায়। দিসাওয়াল সাহেব যেমন বলেছিলেন। মেয়ে দুটিই অবিবাহিত। অথচ বয়স যে হয়নি বিয়ের তাও নয়। নিজে অভুক্ত থাকলে অন্য কাউকে পবিতৃপ্তিব সঙ্গে খেতে দেখলে বাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সকলেই সুস্থ থাকলে, সকলেরই সবরকম খিদের পবিতৃপ্তি হলে বড় সুখের হত এই কাল, এই দেশ।

একটু যেতেই বিগুব সঙ্গে দেখা হল। সে বলল, মেমসাহেব বড়ী গোসেসমে হ্যায়। খনা ওয়াপস্ লে যানেকে লিয়ে কহথী থী। ম্যায় জববদস্তী ছোড়কে আয়া।

আমি যাব যে, সে কথা বলেছিস্ ত?

হাঁ।

বলার পরই ত রাগ আরও বেড়ে গেল মেমসাহেবের।

পৃথু একটু বিরক্ত বোধ করল। বিগুর উপরে, কুর্চির উপরে এবং নিজেব উপরেও। রাগটাগ নিয়েই ত এতবছর ঘর করে এল, যদি তাকে ঘর করা আদৌ বলে। আব এসব ভাল লাগে না। একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলছে কুর্চি। কী সামান্য কথা থেকে কী!

বেড়ার দরজা খুলে ঢুকতেই কুন্তীর কুকুবটা কামড়াতে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু কোনো সাড়া পেল না তার। মনে পড়ল। কুন্তীকে ছুটি দিয়েছে কুর্চি। কুন্তী বোধহয় তাব কুকুবকে সঙ্গেই নিয়ে গেছে।

অতখানি একসঙ্গে হেঁটে হাঁফ ধরে গেছিল পৃথুব। দাওয়ার ছাওয়ায় কিছুক্ষণ ক্রাচ্-এ ভব দিয়ে

দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিল ও। কুর্চির ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ডাকল, কুর্চি, একটু জল খাওয়াবে ?

কোনো উত্তর না দিয়ে কুর্চি সামান্য পর একগ্লাস জল হাতে করে এসে দাঁড়াল।

ঢক্‌ঢক্ করে জল খেয়ে, পৃথু চারদিকে তাকিয়ে বসার মতো কিছুই দেখতে পেল না। কুর্চিও খালি গেলাস নিয়ে ভিতরে চলে গেল। কোনো কথা বলল না।

পৃথু ওর পেছন পেছন ঘরে গেল। গিয়ে, বিনা-আমন্ত্রণেই, কাঠের যে হাতলওয়ালা চেয়ারটাতে বসে কুর্চি সেলাই করে, তার উপরে বসে ক্রাচ দুটোকে রাখল পাশে।

কুর্চি খাটের উপর বসে পা-ঝুলিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল। দেওয়ালে এমব্রয়ডারী করা একটি লেখা, পেরেক থেকে ঝুলছে। কাঠের ফ্রেমে কাঁচ দিয়ে বাঁধানো। লেখা আছে : "সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে।"

কী, হল কি তোমার ?

পৃথু নরম গলায় বলল।

কী আবার হবে ?

রুক্ষ গলায় বলল কুর্চি।

আহত হল পৃথু। এই কুর্চিকে ও কোনোদিনও চিনত না। চিনতে হবে বলে. ভাবেওনি কখনও।

তুমি কিন্তু ঠিক করছ না কুর্চি তুমি ত ছেলেমানুষ নও ! কী আমি করেছি, যার জন্যে তুমি এমন ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে ?

তা ত ঠিকই। উ্য আর ওলওয়েজ রাইট ! কী আর করেছেন !

চমকে উঠল পৃথু। কুর্চির শরীরের উপরে যেন রুষার রাগী মুখটি বসিয়ে দিয়েছে কেউ। তেমনই নিষ্ঠুর, বিবেচনাহীন, জেদী।

তুমি যদি এমন ব্যবহার করো, তাহলে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখব না। অবুঝপনা সইবার মতো সহ্যশক্তি আমার আর অবশিষ্ট নেই। অনেকই সয়েছি আমি।

আহা ! যেন, আমি কিছুই সইনি। তাচ্ছিল্যের গলায় বলল কুর্চি। তারপর বলল, বাজে মানুষ আপনি। আমার সবকিছু নিয়ে, এখন...

কথাটা বলতে বলতে কুর্চির গলা ধরে এল।

পৃথু হতভম্ব হয়ে গেল।

বলল, সবকিছু নিয়ে মানে ? আমি ত চাইনি। তুমিই ত জোর করে আমাকে কিবুরু বাংলোয় নিয়ে গেলে, তুমিই ত...

আমি ? আর এতদিন ভিখিরীর মতো কাঙালপনা কে করেছিল ?

পৃথু গলা তুলে চিৎকার করে কুর্চির গলাকে ডুবিয়ে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, সে এই আমি নই ; সে আমি অন্য আমি ছিলাম।

হুঁ। এখন কত কিছুই বলবেন। পুরুষ মানুষ মাত্রই ঠগ্। বাজে। জোচ্চোর।

কী বলছ কি তুমি ? ছিঃ ছিঃ ! তুমি এমন ভাষায় কথা বলছ ?

বলছি। আপনি আমাকে এখানে জ্বালাতে এলেন কেন ? আমি ত চলেই এসেছিলাম। আমার নিজের ঘরেও কি শান্তি পাবো না আমি ? কেন এলেন ?

তুমি না-খেয়ে চলে এলে তাই...

থাক। অনেকই ভালোবাসা দেখিয়েছেন। আর নাইই বা দেখালেন।

হঠাৎই পৃথুর ভালোবাসার নরম মনটা প্রচণ্ড ফুঁসে উঠে মনের মধ্যের পাশের দরজাটাকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে রাগের ঘরে ঢুকে এল। ক্রাচ ছাড়াই, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতোও একপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে একলাফে কুর্চির উপর গিয়ে পড়ল। তারপর চিৎকৃত প্রতিবাদের কুর্চিকে চুমুতে চুমুতে কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। তার অজানিতেই তার একটি হাত ওকে চেপে শুইয়ে রাখল শক্ত খাটের উপর আর অন্য হাত ওকে বিবস্ত্র করতে লাগল যন্ত্রদানবের মতো। কবিতা, রবীন্দ্রনাথ,

সংস্কৃতি সব গোল্লায় গেল। কুর্চির নাকের পাটা ফুলে উঠল। ফুঁসতে ফুঁসতে ও বলতে লাগল · অসভ্য ! ইতর ! জানোয়ার ! বাজে লোক একটা ! জোর করে··

দেখতে দেখতেই রাগের ফোঁসফোঁসানি স্তিমিত হয়ে এসে তা ভালোলাগার গোঙানিতে পর্যবসিত হয়ে গেল। কুর্চির মুখ কিন্তু ঐ কথাগুলিই বলে যেতে লাগল · অসভ্য ! ইতর ! জানোয়ার ! বাজে লোক ! কিন্তু এখন সেই ঘৃণাবাহী শব্দকটিই পৃথুর প্রতি এক গভীর ভালোবাসার, তার উপর নির্ভরতার প্রতিভূ হয়েই যেন ধ্বনিত হতে লাগল। কুর্চির দুটি হাত পৃথুর পিঠের নিচে মালার মতো নেমে এসে সাঁড়াশীর মতো দৃঢ় হয়ে চেপে বসল। ওর চুল এলোমেলো হয়ে গেল। হলুদ শাড়ি আর অফ-হোয়াইট ব্লাউজের খোলসের ভেতর থেকে হিসহিস করা এক বাদামী ·পিণী বেরিয়ে এল। পৃথুর চোখমুখ গলা কুর্চির সিক্ত ছোবলে দংশিত হতে লাগল।

কতক্ষণ সময় কেটে গেল খেয়াল নেই। এখন দুজনেই দুজনের আলিঙ্গনের মধ্যে যুগল মৃতদেহর মতো শান্ত হয়ে শুয়ে রয়েছে। নগ্ন দুটি হিমেল শরীর। দু চোখ বেয়ে আনন্দধারা বইছে কুর্চির। পৃথুর দু চোখ জ্বলজ্বল করছে নিজেকে আবিষ্কারের লজ্জা এবং আনন্দেও। বাইরে বৈশাখের ঘোর-লাগা ছায়াচ্ছন্ন দুপুরে ঘুঘু ডাকছে ঘুঘর-র-র-র ঘু, ঘুর-র-র-র-র, ঘু-উ-উ-উ করে। কাঁচপোকা উড়ছে খোলা জানালার সামনে বুঁ-বুঁ-বুঁ-ই-ই-ই-ই আওয়াজ করে। একটা ক্রো-ফেজেণ্ট গম্ভীর স্বরে ছায়াচ্ছন্ন নদীর খোল থেকে ডেকে চলেছে ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব। অনন্তকাল ধরে চলতে থাকা হাঁপিয়ে-ওঠা সময় যেন এই ঘরে এসে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেছে চার দেওয়ালের মধ্যে। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। ঘরের মধ্যে এখন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। গভীর ভাললাগা এবং এক ধরনের খারাপ লাগাও ঘিরে আছে দুজনকে।

হঠাৎ ওরা দুজনেই চমকে উঠে যে যার ফেলে-দেওয়া জামা-কাপড়ের দিকে হাত বাড়াল। দেখল, খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ঠুঠা বাইগা। হাতে একটি চিনেমাটির বাসন নিয়ে। তার চোখে লজ্জা নেই, রাগ নেই, অপরাধবোধও নেই। এক আশ্চর্য বিপন্ন বিস্ময়ে সে এই রুক্ষ পৃথিবীর একটি স্নিগ্ধতম দৃশ্যে বিমুগ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

যতক্ষণে ওদের দুজনের সম্বিত ফিরেছে, হয়ত ততক্ষণে ঠুঠারও।

যেমন চিতার মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে এসেছিল তেমনই নিঃশব্দে, ছায়ার মতো সরে চলে গেছে। তার বোবা পশুর মাথার মতো শ্লথ মস্তিষ্কে গ্রীষ্মের মধ্যদিনের পিয়াসী, মুখ হাঁ-করা তিতিরের বুকের ছটফটানিই ভরে নিয়ে ফিরে গেছে সে বেচারী। জল দাও। জল দাও। না বলেই, বলতে বলতে।

কুর্চি জামাকাপড় পরে বারান্দায় গেছিল আগে। ওখান থেকেই বলল, পৃথুদা ! পায়েস দিয়ে গেছে। বিশু বোধহয় ভুলে গেছিল।

পৃথু ক্রাচদুটোর জন্যে কুর্চির কাছে হাত বাড়িয়ে হেসে বলল, পরমান্ন ! যে যেমন ভাগ্য করে আসে। বেচারী ঠুঠা !

ছিঃ ছিঃ। কী লজ্জা ! আর কি কখনও ঠুঠাদাদার চোখে চেয়ে কথা বলতে পারব ? কী যে হল আমার ! দরজাটা পর্যন্ত বন্ধ করতে ভুলে গেলাম। অবশ্য আমার দোষ কি ! সময় পেলাম ? অদ্ভুত বাজে লোক আপনি একটা !

ঠিক এই বাক্যটিই বলত রুষা।

একটি বাক্যই অর্থের কত বিভিন্নতা পায় বলার ধরনে ! যে তা বলে, তার মুখের ভাবে ! অবাক হয়ে গেল পৃথু।

কুর্চি খাবারগুলো গরম করছিল রান্নাঘরের স্টোভে। পৃথু খাটের উপর আস্ত পা-টি তুলে দিয়ে সেই হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল।

ও শুনেছিল যে, দম্পতির যত ঝগড়া, যত মতপার্থক্য, যত বাদানুবাদ সবই নাকি নিঃশেষে গলে যায় শোবার ঘরের খাটে। আজকে জানল যে, কথাটা কত বড় সত্যি। কথাটার যাথার্থ্য জেনে যেমন আনন্দিত হল তেমনই দুঃখিত হল এইকথা ভেবে যে, রুষার প্রতি ও খুবই অবিচার করেছে।

এত বড় ঝগড়া যদি এত সহজেই মেটে তাহলে এমনি করেই তা ও মেটায়নি যে কেন ! অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, রুষার ঔদ্ধত্য, দম্ভ, শীতলতা তাকে কখনই কুর্চিব প্রতি বোধের মতো কোনো বোধে উদ্বুদ্ধ করেনি। যে সাবলীল ঋতিতে ঋত সহজে উদ্বেলিত হয়ে সব মত-পার্থক্যকে উদ্বায়ু তরল পদার্থের মতোই মুহূর্তে অদৃশ্য করে দেয়, সেই ঋতিই ছিলো না রুষাব। ঈশ্বরই জানেন, পৃথুর দোষ নেই। দোষ নেই।

রান্নাঘর থেকে কুর্চি বলল, কি ? খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে ত !

নাঃ। কত কী ত খেলাম একটু আগে।

আপনি সত্যিই ভীষণ অসভ্য !

পৃথু জবাব দিলো না।

মনে মনে বলল, হইই না একটু। সভ্যতাতে সতত বড়ই নিষ্পেষিত, ক্লিষ্ট আছি গো আমি। সভ্যতাব হাল্কা আবরণকে, এসো, আমরা জীবন-গন্ধী হাওয়ায়, দুজনে তার দু কোণ ধবে উড়িয়ে দিই। কোনো নবীন কিশোরেব অনভিজ্ঞ হাতের চাঁদিয়াল ঘুড়ির মতো ভো-কাট্টা হয়ে ভেসে যাক এই আবরণ সাতপুরা পর্বতমালার সবুজ সুগন্ধি বুকেব দিকে। এত হাজার বছরেও তথাকথিত সভ্যতার আস্তরণটি যদি যথেষ্ট পুরু না হয়ে থাকে, তার দোষ ত আমাব বা তোমার নয় !

মুখে কিছুই বলল না ও কুর্চিকে।

আজ সকাল থেকেই ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানে পেয়েছে পৃথুকে। কাউকে কাউকে যেমন ভূতে পায়, পৃথুকেও এক একদিন এক একজন কবিতে পেয়ে বসে। কবিব ভূত-ছাড়ানো ওঝা কোথায় যে থাকে, কে জানে ?

"কাম ক্লোজার টু মী,
পুশ্ ক্লোজ মাই লাভারস এণ্ড টেক দ্যা বেস্ট আই পজেস্
ঈল্ড ক্লোজার এণ্ড ক্লোজাব এণ্ড গিভ মী দ্যা বেস্ট উ্য পজেস্।"

কুর্চি সব খাবাব, দুটি প্লেট, চামচ এবং জল নিয়ে এল এঘবে। বলল, আপনি এই টেবলেব সামনে বসে খান, আমি টুলটা নিয়ে ওপাশে বসি।

বাঃ। দারুণ রেঁধেছে কিন্তু বিশু পোলাউটা। অনেকদিন এমন মিষ্টি বাঙালী পোলাউ খাইনি। আমার মা বড়ই ভাল রাঁধতেন এই পোলাউ। খাসীব রেজালাটাও খুব ভাল করেছে, তাই না ? ছেলেটার রান্নার হাত ভাল। যা করে, ভালবেসে করে।

পোলাউটা আমিই ওকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। ওর মুসলমান মালিকের কাছে থেকে এই পোলাউ রাঁধতে ও জানবে কি করে ? আমার ব্যবসাটা ধরে যাক। দেখবেন, আপনাকে এত ভাল ভাল পদ রেঁধে খাওয়াব যে মোটা করে দেব।

মোটা কাউকেই করতে হবে না। আমার বাবা মা দুজনেই মোটা ছিলেন। চল্লিশে পা দিলেই দেখবে জল খেলেই মোটা হয়ে যাচ্ছি।

কেউ কেউ যেমন হাতী খেয়েও রোগা থাকে। কনস্টিট্যুশান বলে কথা।

পৃথু যখন খেতে খুবই ব্যস্ত, কুর্চি বলল, এখন আমি ফিরে যাব কি করে আপনার সঙ্গে। ভারী লজ্জা করবে আমার। ঠুঠাদার কাছে ত বটেই, বিশুর কাছেও। রাগ দেখিয়ে চলে এলাম।

যাওয়ার দরকার কি ? তুমি গেলে ত ঠুঠারও এখানে এসে বাড়ি পাহারা দিতে হবে। তাব চেয়ে আমিই এখানে থাকব আজ তোমার সঙ্গে।

এত ঘন ঘন একসঙ্গে বোধ হয় না থাকাই ভাল।

কুর্চি বলল। মুখ নামিয়ে।

কেন ?

কেন, তা আপনি জানেন না ?

কথা ঘুরিয়ে পৃথু বলল, তুমি কিচ্ছু খাচ্ছো না, শুধু কথাই বলছ। ভাল কবে খাও।

আমি কমই খাই।

তাইই ত নিজেকে এমন সুন্দর রেখেছো।

লাভ কি হল ? আপনার চোখে ত আমি চিরদিনই সুন্দর। এসব ঢঙের কথা তখন কোথায় ছিল ? ভাঁটুকে ত শখ করে বিয়ে করিনি।

ওসব কথা থাক।

পৃথু ভাবছিল, কুর্চি ঘন ঘন থাকার কথা ঠিকই বলেছে। ও তার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাবছে। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে দূবে বাখাই ভাল। তার সঙ্গে অনেকদিন পর পর দেখা হওয়া ভাল। মনোমালিন্যটা আপাতত মিটে গেল বটে কিন্তু পৃথুর মন বলছে আব কিছুদিন কুর্চির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা চললে সত্যি সত্যিই তাব কুর্চি আর কুর্চি থাকবে না। অন্য একজন রুষা হয়ে যাবে। বড়বেশি কাছাকাছি এলে, থাকলে, কোনো মেয়েকেই ভালবাসা যায় না আব।

রুষাকে যে দেখত সেইই তার প্রেমে পড়ত, প্রেম ছিল না শুধু পৃথুরই, যে মানুষটি তার সঙ্গে ঘর করত। প্রেমও বোধহয় এক ধরনেব খেলা। এই খেলা লং-পাস-এ খেলতে হয়। কাছাকাছি এলেই ফাউল হবার সম্ভাবনা।

ইদুরকার আর রুষার সম্পর্ক এখন কেমন হয়েছে কে জানে ? লং-পাস-এ না খেললে ফ্রি-কিক-এ গোল খাবে ইদুব। আশ্চর্য ! পৃথুর যে একটা অতীত জীবন ছিল সে কথা আজকাল প্রায মনেই পড়ে না। কোনদিন যে সেই জীবনেরই মতো তাব ডান পাটাও নিটোল, আস্ত ছিল, সে কথাও যেন মনে পড়ে না। আসলে, সব বিচ্ছেদই বোধহয় সময়ে সয়ে যায়। মানুষের মতো অ্যাডাপ্টেবিলিটির ক্ষমতা সম্পন্ন অন্য কোনো প্রাণীই বোধহয় পৃথিবীতে নেই। একমাত্র তেলাপোকা ছাড়া।

কি ভাবছেন ? খেতে খেতেও এত কি ভাবেন ? বেশি যারা ভাবে, তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। আপনার এই অদ্ভুত স্বভাবই আপনার সব দুঃখের মূলে।

হয়ত !

হযত নয়, তাইই। মুহূর্তে মুহূর্তে নিজেকে এমন কনট্রাডিক্ট করতে আমি কোনো মানুষকেই দেখিনি।

পৃথু হেসে বলল, তুমিই ত বলছিলে না সকালে ইন্‌কনসিস্‌টেন্সী ভাইসও বটে ; ভার্চুও বটে।

ইন্‌কন্‌সিসটেন্সী অনেকই নরম কথা। আপনি সেল্ফ-কনট্রাডিক্টরী।

হয়ত ! আমারও তাইই মনে হয়।

আপনার মতো পাগলের সঙ্গে ওয়েভ-লেংথ-এর মিল খুব কম লোকেবই হওয়া সম্ভব।

অন্যদের আমার দরকার কি ? তোমার সঙ্গে মিললেই হল। তোমার ওয়েভ-লেংথ-এর হদিসটা যদি দাও তাহলে মনের নব্‌ ঘুরিয়ে মিলিয়ে নেব এখন তোমার স্টেশনের সঙ্গে।

হাসল কুর্চি।

বলল, কথায় পারব না আপনার সঙ্গে। এখন খান।

পৃথু মনে মনে আবৃত্তি করল। খাওয়া থামিয়ে হুইটম্যানেই :

> "ডু আই কন্‌ট্রাডিক্ট মাইসেল্ফ ?
> ভেরী ওয়েল দেন··· আই কনট্রাডিক্ট মাইসেল্ফ,
> আই অ্যাম লার্জ···আই কনটেইন মালটিচ্যুডস্‌।"

একটা হাড়ের মধ্যের সুরুয়া সুড়ুৎ করে চুষে হাড়টি সাইড প্লেটে রেখে পৃথু নিঃশব্দে বলল : আই রিয়্যালী ডু।



বেশ গরম পড়ে গেছে। তবে সীওনীতে গরম অসহ্য লাগে না। তবু, ক্রাচ্-এ ভর করে এতখানি হেঁটে এসে ক্লান্ত বোধ করে আজকাল।

অফিস থেকে ফিরে আসতেই বিগু চিঠি দিল একটা। ভুচুর চিঠি। হাত মুখ ধুয়ে এসে বারান্দায় বসে চিঠিটি খুলল পৃথু।

পৃথুদা,

বিকেলে হঠাৎই রুষা বৌদি এসেছিলেন আমার গারাজে। ওঁর বাঁ গালে পাঁচটি আঙুলের স্পষ্ট দাগ বসেছিল। ফর্সা গালে আগুনেরমতো ফুটেছিল কোনো পুরুষের আঙুলের ছাপ। কিসের দাগ, জিগগেস করতে, উনি এড়িয়ে গেলেন। বললেন, তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, কোনো জবাব পাননি। আমি তোমার কোনো খবর জানি কিনা জানতে এসেছিলেন। আমি যা জানি, তাই-ই বললাম।

কুর্চির কথাও কিন্তু লুকোইনি। বললাম, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। আমরা যেদিন গেছিলাম সীওনীতে সেদিন এসেছিলেন। গানও গেয়েছিলেন অনেক।

রুষা বৌদির মুখ দেখে মনে হল জানতে চাইছেন তুমি কুর্চির সঙ্গেই আছো কী না! আমি নিজেই বললাম যে, তোমরা আলাদাই থাকো তবে দেখা হয় প্রায়ই।

রুষা বৌদিকে এও বললাম যে, নুরজেহানের বিয়েতে সম্ভবত তুমি আসবে এখানে। শুনে, উনি বললেন, টুসু খুব বাবা বাবা করছে এবং উনি নাকি চান না যে, টুসু ইদুরকারের কাছে আর একদিনও থাকুক। কী হয়েছে তা খুলে কিছুই বললেন না। জোর করে ওঁর কাছ থেকে যে কিছু জানা যাবে, এমন চরিত্রের মানুষ তিনি নন বলেই মনে হল। বললেন, আমি যদি টুসুকে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি তাহলে খুবই ভাল হয়। ক'দিন স্কুল কামাই হলেও, হবে। তুমি যখন নুরজেহানের বিয়েতে আসবে পনেরোদিন পর তখন টুসুকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

একটু ইতস্তত করে, এও বললেন যে, ইদুরকারের বাড়িতে তোমার যেতে হবে না। এখানে যখন আসবে তখন টুসুকে পৌঁছে দিতে তুমি তোমার পুরোনো বাড়িতেই একবার যেও। রুষা বৌদির সঙ্গে দেখাও করে আসতে পারবে। তোমার সঙ্গে কথা আছে ওঁর। ওঁর কথা শুনে যা মনে হল, খুব সম্ভব তুমি এখানে আসার আগেই উনি ফিরে যাবেন ঐ বাড়িতে।

পৃথুদা, রুষা বৌদিকে খুবই বিষণ্ণ এবং আতঙ্কিত দেখালো। আমি আমার আর গিরিশদার ফোন নাম্বার দিয়ে ওঁকে বলেছি যে, কোনোরকম দরকার হলে যেন একটুও দ্বিধা না করে আমাদের ফোন করেন। গিরিশদাকেও সব বলে রেখেছি।

সত্যি কথা বলতে কী পৃথুদা তুমি রুষা বৌদিকে ভালবাসো বলো বটে. আমি কিন্তু ওঁর ব্যবহারের জন্যে ওঁকে ক্ষমা করতে পারিনি। একটা সময় অবশ্যই ছিল যখন তোমার প্রতি ওঁর ব্যবহার আমরা, যারা তোমাকে ভালবাসি তারা কেউই ক্ষমা করতে পারতাম না। অস্বীকার করব না সে কথা। কিন্তু সেদিন ওঁকে দেখে বড়ই খারাপ লাগল। একেবারেই অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। ঝড়ে ডানাভাঙ্গা পাখিরই মতো অবস্থা। কোথায় গেছে সেই ঔদ্ধত্য, কোথায় গেছে তাঁর সবজান্তা ভাব. সেই গুমোর!

আমি বললাম, সত্যি করে বলুন ত বৌদি, ইদুরকারই কি মেরেছে আপনাকে ? একবার মুখ ফুটে বলুন শুধু ! শালাকে শিখিয়ে দিয়ে আসছি। পৃথুদা এখানে না থাকতে পারেন, আমরা এখনও আছি। আপনি এখনও পৃথুদার বিবাহিত স্ত্রী। ডিভোর্স ত হয়নি আপনাদের ! আপনার মান-সম্মানের সঙ্গে এখনও পৃথুদার এবং আমাদের সকলের মান-সম্মানের প্রশ্নই জড়িত আছে। আপনার কোনোরকম অপমান আমরা বেঁচে থাকতে হতে দেবো না।

রুষা বৌদি যে গালে আঙ্গুলের দাগ ছিল সেই গালটা ফিরিয়ে মুখ নিচু করে বললেন, এ সবের কোনোই দরকার নেই ভাই। অন্যর হাতের মার ত' এ নয়, আমার নিজেরই হাতের মার এ। ভাগ্যেরই মার। যে ভাগ্যকে আমি কোনোদিন অস্বীকার করিনি। তবে, এর জন্যে পৃথুব বা তোমাদের কারো কাছেই আমি কোনোরকম সাহায্য চাই না। আমার কোনোরকম অপরাধবোধও নেই। নিজের ভার আমি নিজেই বইতে পারব। প্রত্যেককেই নিজের নিজেব কৃতকর্মর ফল ভোগ করতেই হয়। যে-সমস্যা আমার নিজেরই তৈরি করা তার সমাধান আমাকে একাই করতে হবে। ও নিয়ে তোমরা ভেবো না। তবে সেরকম প্রয়োজন যদি হয়ই তবে জানাতে দ্বিধা করব না। তোমার দাদাকে এসব কথা জানাবে না। শুধু টুসুকে ওঁব কাছে পৌঁছে দিলেই হবে।

বৌদির কথামত আমি আগামী সপ্তাহে টুসুকে নিয়ে যাব তোমার কাছে। আজ ত' বুধবাব৷ ইদুরকারের বাড়ি গিয়ে ভোরবেলা টুসুকে নিয়ে আসতে বলেছেন আমাকে। বলেছেন, ইদুবকাবের সঙ্গে আমি যেন কোনোরকম খাবাপ ব্যবহার না করি। তাঁর আসল ভয়, নাকি টুসু বা তাঁর নিজের জন্যেও নয়, মিলির জন্যে। মাঝে এক বাতে ইদুরকার নাকি মিলির সঙ্গে অশোভন ব্যবহাব করেছিল।

একথা শুনে অবধি আমার ত' মাথায় আগুন লেগে গেছে। গিবিশদা ছাড়া আর কাউকেই আমি এসব বলিনি। কিন্তু তুমি যদি একবার অনুমতি দাও তাহলে আমাদেরও কারোই কিছু করতে হবে না। তোমার কাছে শামীমেব যে ঋণ জমা আছে তা সে একাই শোধ করতে পারলে খুশি হবে।

যেদিনই যাই না কেন, সন্ধ্যের সময় পৌঁছব টুসুকে নিয়ে। রাতটা থেকে, পরদিনই ফিরে আসব।

তুমি যাই-ই বলো আব তাই-ই বলো, অমন করে আমাদের পর্যন্ত না জানিয়ে হাটচান্দ্রা থেকে তোমার পালিয়ে আসাটা একেবারেই ঠিক হয়নি। সব মানুষেব জীবনেই সমস্যা আছে, থাকে। তুমি অন্যদের কত বড় বড় সমস্যার মোকাবিলা নিজের জীবনেব ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়ে করেছো অথচ নিজের সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে গেলে যে কেন ?এই কথাটা আমার মোটা বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। পালাতে কে না চায় ? আমার নিজের ত' তেমন কোনো সমস্যাই নেই, তবু আমারই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মাঝে মাঝেই পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয। পালানোর মধ্যে কোনো লজ্জা নেই। ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়েও পালায় অনেকে, অনেকে পালায় অভিমানে, তাও জানি। হয়ত তুমিও সে কারণেই পালিয়েছিলে অমন করে। কিন্তু সমস্যার মোকাবিলা করতে ভয় পেয়ে পালোনোটা হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট ভীরুতা। তোমার অমনভাবে পালিয়ে যাওয়াটা আমাদের সকলের কাছেই আশ্চর্য ঠেকেছিল। এখন ত বুঝছ যে, তুমি এখানে থাকলে ব্যাপারটা এতদূর হয়ত গড়াত না। হাটচান্দ্রায় থাকতে চাইলে, সীওনীতে যে চাকরী করছ তার চেয়ে বেশি মাইনের চাকরীও সহজে তুমি পেতে। সীওনীতে যাবার আর কি কারণ কিছু ছিলো না ?

ভুল মানুষমাত্ররই হয়। তাছাড়া' ধোয়া-তুলসীপাতা ত তুমিও নও ! বিজ্‌লী বাঈজীর সঙ্গে তোমার কোন ব্যাপার থাকতে পারে, আর ইদুরকারের সঙ্গে রুষা বৌদিব থাকতে পারে না ? রুষা বৌদির ব্যাপারটা প্রথম প্রথম নিছক একটা অ্যাফেয়ারই ছিল। 'অ্যাফেয়া'রের মধ্যে আমি কোনো দোষ দেখি না। যদিও, তুমি বলতে পারো, আমি এসবের কি বুঝি ? আমি নিজে ত বিয়েই করিনি।

বিয়ে না করতে পারি, কিন্তু আমি তোমার মতো রূপোর চামচ মুখে করে জন্মাই নি যে ! আমার এই বয়সে জীবনের নানাদিক আমি যতখানি দেখেছি, অন্য বহু মানুষের জীবনে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছাতেও যত গভীরভাবে ঢুকেছি তাতে আমার অভিজ্ঞতাও নেহাৎ কম হয়নি। 'অ্যাফেয়ার'

হয়ত শতকরা ষাট ভাগ বিবাহিত মানুষের জীবনেই থাকে। জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে। তা নিয়ে এতকিছু ঘটে যায় না। আমার ত মনে হয় একটি দুটি অ্যাফেয়ারই হয়ত বিবাহিত জীবনের একঘেয়েমিকে ভরিয়ে তুলে সেই সম্পর্ককে পরিপূর্ণ করে তোলে। ওই 'অ্যাফেয়ার' যেন বারান্দার মতো। ঘর হচ্ছে দাম্পত্য। মাঝে মাঝে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে চাঁদ, রোদ, পাখিব ডাক, বসন্তর হাওয়া এসব একটু গায়ে লাগিয়ে গেলে ঘরটাকেই হয়ত সুন্দর করে তোলা হয়। নতুন চোখে দেখা যায় তাকে। ফিকে-হয়ে-আসা ভাল লাগাকে রিনিউ করা যায়।

পৃথুদা, আমরা তোমার বন্ধু, তাই তোমার পক্ষ সমর্থন করা আমাদের কর্তব্য। দোস্তীর জন্যে দোস্ত্ জান-কবুল করতেও রাজী থাকে। তুমি যেমন নুরজেহানের কারণে, শামীমের জন্যে করেছিলে। কিন্তু তা বলে তুমি ত' একথা অস্বীকার করতে পারো না যে, তুমি অনেকদিন থেকেই কুর্চিকে ভালবাসতে। রুষা বৌদির মত বুদ্ধিমতী মহিলার কি সেটুকু বুঝে নিতে অসুবিধা হত বলে মনে করেছিলে তুমি? তোমার উইশফুল থিংকিং এ? আমার মতো মোটা-মাথাব মানুষই যদি তা প্রথম দিন কুর্চিকে দেখেই বুঝে থাকতে পারে তখন শিক্ষিতা রুষা বৌদির বুঝতে দেরী হয়েছিল বলে ত আমার মনে হয় না। যে যত গভীর, যার আত্মসম্মান যত বেশি তাকে বাইরে থেকে বোঝা হয়ত ততই কঠিন। রুষা বৌদিকে তোমার আশ্চর্য ব্যবহারে যে তুমিই ধীরে ধীরে ইদুরকারের দিকে ঠেলে দাওনি তা কি তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো পৃথুদা?

একজন স্ত্রী আর একজন পুরুষ অনেকেই কল্পনায় ঘর বানায়। আর খাটাশের মতো শেয়ালের মতো ইদুরকারেরা সেই ঘর ভাঙ্গবার জন্যে ছুক ছুক করে ঘুরে বেড়ায়। সাপের মতো সেই ভালোবাসার বাসায় পৌঁছে অনেক সাধ দিয়ে তৈবী ডিম খেয়ে যায়। তাদেব থাবাব হাঁচোর-পাঁচোব আঁচড়ে বাসা ভেঙ্গে যায়।

আমি ত বলব, দোষ সব তোমারই। তুমি রাগই করো আর যাই-ই করো।

তুমি যখন সবসময় সঙ্গে থাকতে, আমি তখন তোমারই ছায়া হযে ছিলাম। তোমার মধ্যেও যে কোনো দোষ থাকতে পারে, তা বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, বোঝার ক্ষমতাও পর্যন্ত ছিলো না আমার। তুমি আমাকে এমনইভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলে।

অবশ্য এ কথাও ঠিক, তুমি হয়ত এমন হয়ে যেতে না যদি না সাবীর সাহেব, শামীম, আমি, গিরিশদা এবং দিগা গাঁড়ে এমনকি ঠুঠা বাইগাও না থাকত বা থাকতাম। সাবীর সাহেব তাঁর একাধিক বিবি নিয়ে ঘর করেছেন। শামীম এখনও করছে। তাদের জীবন উপচে-পড়া জীবন। স্বাধীনতাহীন বোরখা-পরা বিবিদের সঙ্গে আর তাঁদের বাড়ির আসবাবের সঙ্গে কোনো তফাৎই ছিলো না। তোমার দাম্পত্যর ব্যাপার আব ওদের ব্যাপার আলাদা আলাদা। কিন্তু রুষা বৌদি ত আব তেমন বিবি নন তোমার।

আমি, গিরিশদা, ঠুঠা এবং লাড্ডু সকলেই আজও ব্যাচেলার। তোমার জঙ্গলের শখ, তোমাব বাউন্ডুলেপনাকে আমরা হয়ত শুধু উস্কেই দিয়েছি। হযত, শুধু ক্ষতিই করেছি তোমার। না-বুঝে। তুমি যে একজন শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলার স্বামী, দুই ছেলেমেয়ের বাবা একথা সম্বন্ধে তুমি নিজে যতখানি না অচেতন ছিলে আমরা তোমাকে তার থেকেও বেশি অচেতন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন করে দিয়েছি। এটা আমাদেরই দোষ।

আর তোমার দোষ হচ্ছে, তুমি মিলি-টুসুর বাবা, রুষা বৌদির স্বামী হয়েও কোনোদিনও বুঝতেই চাওনি যে, বিবাহিত মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক বাধা-নিষেধ থাকে। বাবার সম্মান ও ভালবাসা পেতে হলে তাকে অনেক কিছু ছাড়তেও হয়। বিয়ে মানেই, নিজের নিজস্বতার খেয়ালখুশির অনেকখানিই সারেণ্ডার করে দেওয়া, তাই-ই না যে-কারণে বিয়ে করার কথা হয়ত ভাবতেও ভয় করে আমার। তুমি বিবাহিত হয়েও অবিবাহিতই ছিলে। মনে করতে, টাকা দিলেই সব কর্তব্য করা হয়। তুমি কুর্চিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে। সেই-ই তোমার সব ছিল। এতই যদি ভালবাসতে তাকে ত প্রথমেই বিয়ে করলে না কেন? রুষা বৌদির কি দোষ? তাকে ত তুমি সম্বন্ধ করেই বিয়ে করেছিলে। তুমি ত কুর্চির স্বপ্ন নিয়েই থাকতে পারতে কবি হিসেবে। কবিদের ব্যাপার-স্যাপার ত

আলাদা হয়। কিন্তু শুধু কুর্চিতেও ত তোমার কুলোল না। বিজলীর মতো রাণ্ডীর কাছেও ত তুমি যেতে। তোমাকে বোঝা আমার সাধ্য নয়। শুধু আমারই বা কেন, কারোই সাধ্য নয়!

তোমার মতো কমপ্লিকেটেড, কনফিউজড মানুষ আমি আরও দুএকজনকে দেখেছি আমার জীবনে। যাদের জীবনে শিশুকাল থেকে কোনো সত্যিকারের সমস্যা থাকে না, তারাই এমন সমস্যা তৈরি করে নিতে ভালবাসে। তোমাদের বিলাসটা, বেদনারই বিলাস। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। ভেবে দ্যাখো, কুর্চিকেই বা তুমি কোন সুখটা দিলে? সে তোমাকে ছোটবেলা থেকে ভালবাসত, তুমিও বাসতে তাকে, তবু যে মানুষটার দশ বছর বয়স থেকে বাঘ-মারার সাহস ছিল তার একটি মেয়েকে বিয়ে করার সাহস হলো না পরিবারের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে? কুর্চির যদিবা বিয়ে হল, খারাপ হোক, যাই-ই হোক, তার স্বামীকে নিয়ে ত' সাদা-মাঠা সুখে ঘর সে করছিল। তুমি তার সব সুখকেও নষ্ট করে দিলে। নষ্ট করে দিলে তার জীবনও। তোমাকে টেক্কা মারার জন্যে বেচারী ভাটু স্মাগ্‌লিং শুরু করল। এবং জেলে গেল। তাকে জেলে পাঠাবার জন্যেও তুমিই পরোক্ষভাবে দায়ী। ভাটুকে জেলে পাঠিয়ে, রুষাবৌদিকে ইদুরকারের কাছে ঠেলে দিয়ে, তুমি এখন কুর্চির সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক পাতালে। এবং সম্পর্কটা শুধুমাত্র মনেরও নয়। তোমাদের শারীরিক সম্পর্কও আছে বলে আমার দৃঢ় ধারণা। সীওনীতে কুর্চির চোখ দেখেই আমার সে কথা মনে হয়েছিল। শারীরিক সম্পর্ক তোমার সঙ্গে না হলে তার চোখে অমন নির্ভরতা আর খুশির ভাব থাকত না।

আমি যদি ভুল বলে থাকি, তাহলে আমাকে ক্ষমা করো।

তুমি হয়ত আমার উপর বিরক্ত হতে পারো। রাগও করতে পারো। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। তোমাকে আমি আমার আদর্শ পুরুষ বলে মেনে নিয়েছিলাম সব দিক দিয়েই। এখানে থাকতে, তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করার মতো সাহস বা প্রবৃত্তিও আমার হয়নি কখনও। কিন্তু আজ তোমার পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবন ত' আর তোমার একার নেই। নুরজেহানকে যেদিন মগনলালরা তুলে নিয়ে গেছিল শামীমের ব্যক্তিগত জীবন যেমন তার অজানিতে এবং তার বিনা অনুমতিতেই আমরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে আমাদের মনোমত ফয়সালা করেছিলাম আজ তেমনই তোমার জীবনও হাতে তুলে নেবার সময় এসেছে আমাদের। রুষাবৌদির গালে যদি ইদুরকারের হাতের আঙ্গুলের ছাপ দেখি, যদি শুনি যে, টুসুর পক্ষে এখানে থাকা বিপজ্জনক, যদি জানি যে, সেই শুয়োরের বাচ্চা মিলির প্রতিও লোভ দেখাচ্ছে তবুও আমরা বেঁচে থাকতে তোমার মতো একজন অপদার্থ মানুষের হাতেই কি তোমার ব্যক্তিগত জীবনের ভার ছেড়ে রাখা আমাদের উচিত? তুমি আমাদের অবস্থায় পড়লে কি করতে? মানুষ, সে যত ক্ষমতাবান ব্যক্তিই হোক না কেন, তার জীবনের সব সমস্যার মোকাবিলা একহাতে হয়ত কোনো মানুষই করতে পারে না। করা, অসম্ভব বলে। এবং সেই কারণই তার বন্ধু-বান্ধব, এবং সমাজকে প্রয়োজন হয়ে পড়ে কখনও কখনও। আমি ত এইই বুঝি!

যাই-ই হোক, চিঠি অনেকই লম্বা হয়ে গেল। এ চিঠি পড়ে তোমার খুশি হবারও কথা নয়। তবু, এটুকু জেনো যে, যেদিন তোমাকে নিন্দা করবার মতো একজন মানুষও থাকবে না তোমার জীবনে, সেদিনের মতো দুর্দিন আর নেই। বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তাকে আমি যেটুকু জেনেছি, তা হচ্ছে মুখোসেরই কারবার। যে সব বন্ধু বা আত্মীয় তোমার সামনে তোমার প্রশংসাই করে শুধু, অথবা তোমার সবকিছু সম্বন্ধেই উদাসীন থাকে তারা তোমার কেউই নয়। তাদের চেয়ে খোলাখুলি শত্রুরাও ঢের ভাল, মানে যাদের তুমি শত্রু বলে চিনতে পারো। সেই শত্রুদের জানা যায়। তারা সৎ। বন্ধুবেশী শত্রুদের কাছ থেকে বিপদটা অনেকই বেশি। তুমি ভাগ্যবান যে, আমাদের মতো বন্ধু তোমার এখনও কয়েকজন আছে।

শেষ করলাম। আগামী সপ্তাহে দেখা হবে।

ইতি, ভুচু।

পি.এস.-এ সপ্তাহেই টুসুকে নিয়ে যেতাম। হাতে কতগুলো জরুরী কাজ পড়ে গেছে। হুদাও জ্বরে পড়ে আসছে না। তাই-ই—।

বিগু চা রেখে গেছিল টী-পটে করে। ঢেলে দেখল পৃথু, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে একেবারে। দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজাল। বিগু এলে, তাকে আবার ও চা আনতে বলল।

বিগু বলল, পরোটাও ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করে আনব?

নাঃ। ওগুলো নিয়ে যা। ঠুঠা আর তুই খেয়েছিস?

আমরা ত অনেকই দেরী করে খাই দুপুরে। ক্ষিদেই পায় না বিকেলে।

তবু, আজ এগুলো তোরা খেয়ে নে। শুধু চা-ই নিয়ে আয় আমার জন্যে।

বিগু চলে গেলে, পৃথু বাইরের অন্ধকারে চেয়ে রইল। আগুন লেগেছে দূর পাহাড়ে। দাবানল মালার মতো জড়িয়ে আছে আগুন পাহাড়গুলোর গায়ে। কোথাও বা ছেঁড়া-মালার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে; গড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়চুড়ো থেকে উপত্যকার দিকে। হাওয়া ছুটে যাচ্ছে সেদিকে। শূন্য পূর্ণ করার জন্যে। তাতে আরো জোর হচ্ছে আগুন। বনের জানোয়াররা ছুটে পালাচ্ছে আগুনের বেষ্টনীর মধ্যে আটকা পড়ে যাবার ভয়ে। তাদের ভয়ার্ত সেই দৌড়-ঝাঁপ এতদূর থেকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু অনেকবারই খুব কাছ থেকে দেখেছে এই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য পালানো ওদের। তাই স্পষ্ট অনুমান করতে পারছে পৃথু।

পৃথুর নিজেরও চারপাশে যেন জীবনের আগুন মালাবই মতো ঘিরে ফেলছে ওকে ধীরে ধীরে। কিন্তু ও যেহেতু জানোয়ার নয় তাই দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হয়ে না ছুটে, ভাববার চেষ্টা করছে চুপ করে বসে। জঙ্গলের দাবানলের বলয় থেকে জানোয়ারেরা মুক্তি পায় সহজেই কিন্তু মানুষের জীবনের নানা ধরনের কষ্টর আগুনের লেলিহান শিখা থেকে পালানো অত সোজা নয়। জীবনের কোনো না কোনো সময়ে প্রত্যেক মানুষকেই সেই আগুনে ঝলসেই যেতে হয়। একবারও না পুড়ে জীবনে বেঁচেছে এমন ভাগ্যবান মানুষ খুব বেশি নেই। চিতায় যখন পোড়ে তখন ত' বোধ থাকে না কোনো। জীবন্ত অবস্থায় এই অদৃশ্য আগুনের হাতে দগ্ধ হওয়া বড়ই যন্ত্রণার। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ারই এই আগুনের কথা জানে না।

আশ্চর্য! ভুচুটাও এত কিছু ভাবে! এমন করে বলতে পারে তার ভাবনার কথা। অথচ স্কুল-কলেজে লেখাপড়া সে শেখেইনি। জীবন থেকে মানুষ যা শেখে, যার শেখার ইচ্ছা আছে, সুযোগের অভাব সেই সব মানুষের পথে বোধহয় কখনই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

লজ্জা হল পৃথুর।ভুচুর চিঠিটা পড়ে। একটু রাগও যে হলো না তাও নয়। তাহলেও ক্ষমা করে দিল ভুচুকে ও। ভুচু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে। এই চিঠি, ভুচু নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যে লেখেনি, পৃথুকে ভালবাসে বলেই লিখেছে। আজকের পৃথিবীতে অন্যর ব্যাপার নিয়ে এমন আলোড়িত হতেই বা কজন মানুষ চায় বা পারে? বন্ধুভাগ্যে পৃথু সত্যিই ভাগ্যবান। তবু, অনেক জানা থাকে, যা শুধুমাত্র বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা দিয়েই জানা যায় না। যে সব ব্যাপার ভুচুর বোঝাবুঝির বাইরে। শুধু ভুচুরই বা কেন? হয়ত অনেকেরই বোঝাবুঝির বাইরে।

দাম্পত্য একটা এমনই সম্পর্ক, যে, সেই সম্পর্কর পূর্ণতা বা শূন্যতা তারা দুজন ছাড়া এক বাড়িতে থেকেও অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ভুচু অনেকই বোঝে। কিন্তু সব বোঝে না।

দিগা পাঁড়ের তুলসীদাসী ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়: "কর্মঠ পীঠ জামহি বরু বারা?" কচ্ছপের পিঠে কি কখনও চুল গজায়? যেমন গজায় না; পৃথু ঘোষের মস্তিষ্কেও তেমন অন্য দশজন মানুষের মতো সহজ, সাধারণ, সুস্থ বুদ্ধি গজাবে না। ও যে সহজে সুখী হতে পারল না। মোটামুটি খেয়ে পরে, সন্ধ্যেবেলায় টি· ভি-র সামনে স্ত্রীর সঙ্গে বসে, চাকরীর উন্নতির চিন্তা, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের আলোচনা, নিজের রিটায়ারমেন্টের পরের সুখী জীবনের জল্পনা কল্পনা ওব দ্বারা এসবের কিছুই ত হলো না। ও মানুষপদবাচ্যই নয় হয়ত। ও নিজেকেই বোঝে না ভাল করে, ও যে কী তা অন্যকে বোঝাবে কি করে?

ইদুরকারকে যদি শিক্ষা দিতে হয় ত ভুচুরাই দিক; রুষা নিজেই দিক। রুষাকেও যদি শিক্ষা

দিতে হয়, তবে রুষা নিজেই তা দিক নিজেকে। পৃথুর ব্যক্তিগত ফায়দার জন্যে, ওর আমিত্বর অবমাননার জন্যে সে নিজে কারো বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করবে না। ঈশ্বর আছেন কি নেই তা ও জানে না। থাকলে, তাঁকে বলত, ঈশ্বর। তুমি সাক্ষী ; যা-কিছুই আমার জীবনে ঘটেছে, পাওয়া বা হাবানো, পেয়ে-হাবানো বা হাবিয়ে-পাওয়া সে সবই তোমাবই ইচ্ছায়। জীবন যেমন যেমন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তেমনইভাবে সে তাকে গ্রহণ করেছে। জীবনকেও হাতুড়ি-ছেনি দিয়ে গড়েপিটে নেয়নি, নিজেকে ত নয়ই ! জীবনের আবর্তে এই অবগাহন স্নানে আনন্দ যেমন , দুঃখও তেমনই। আর ত ফিরে আসবে না এখানে। একবাবই মাত্র। "ওন্‌লী ফর ওয়ান্স"। সায়ানাইড কেমন খেতে তা যেমন যাঁরা খেয়েছেন তাঁদেব কেউই নাকি বলে যেতে পারেন নি, জীবনেব স্বাদও যে ঠিক কেমন তাও বোধহয় সঠিক কেউই বলতে পাবেন নি আজ অবধি ; অন্যাব অবগতিব জন্যে। জীবনের সঙ্গে সব মানুষই অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। জীবনের সঙ্গে এক ধবনের পার্থক্য রেখে, দূরত্ব বেখে, জীবনেব স্বরূপ খোঁজাবই চেষ্টা কবে এসেছে পৃথু চিবদিন। দোষ সবই তাব। অস্বীকার কবে না। কাবণ, সে অন্য দশজনেব মতো নয়। তবে, তাব এই দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনকে তাব চোখ দিয়ে দেখার নতুন এক চেষ্টাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মব কিছু মানুষ হযত জীবন সম্বন্ধে নতুন করে ভাববেন। জীবনের ভারে চাপা পড়ে, জীবনেব স্রোতে অপারগ হয়ে হাবুডুবু খাওয়া আর নিজের ইচ্ছায়, নিজের শর্তে বেঁচে থাকাটা যে সমার্থক নয়, তা আগামী প্রজন্মেব মানুষবা নিশ্চয়ই বুঝবেন।

আপাতত সব অপরাধ, সব অনুযোগ, সব দোষই মাথা পেতে মেনে নিচ্ছে সে। সে সম্পূর্ণই নির্গুণ। জাগতিকার্থে কোনো কিছু পাওয়ারই যোগ্যতা হয়ত তাব নেই। হয়ত আকাঙ্ক্ষাও নেই। তার কথা, সে শুধু নিজেই জানে। অন্যর কাছে নিজেকে পূর্ণ আলোয় প্রতিভাত কবাব ইচ্ছেও বোধ করেনি কখনও। তা করাব ক্ষমতাও রাখে বলে মনে হয় না। যে যতটুকু জানল, জানল , যে চেহারায় তাকে দেখল বা যে আলোয় বুঝল তাই-ই যথেষ্ট। যার যতটুকু প্রয়োজন, তাব অন্তবঙ্গ একাকী সত্তার গা থেকে, ঝুলিয়ে বাখা ভেড়ার মৃতদেহর মতো এক একজনে তাকে টুকরো করে কেটে নিয়ে গেছে চেখে পবখ করে দেখার জন্যে। মৃত, অখণ্ড ভেড়াটারই মতো, সম্পূর্ণ মানুষটাকেও এই জীবনের খুচবো ক্রেতাদের কারোই প্রয়োজন হয়নি। রান্না করে যার যার নিজেব পাত্রে তা পরিবেশন কবে বলেছে . মাটন। কেউ ঝাল দিয়ে রেঁধেছে, কেউ মিষ্টি দিয়ে ; কেউ বা স্ট্যু বানিয়েছে রোগীর পথ্যরই মতো। সেইটুকু খেয়েই ভাল বা মন্দ ভেবেছে। অখণ্ড, সম্পূর্ণ মানুষটা সম্বন্ধে কোনো ধারণার কাছাকাছিও কেউ আসেনি। এই বাজারে পাইকাররা অনুপস্থিত। সবই খুচরো খদ্দের। অংশই পূর্ণ বলে চলে এখানে।

খসস্ খস্‌স্ শব্দ করে অন্ধকার বারান্দায় ভালুকেব মতো ছায়া ফেলে ঠুঠা এসে দাঁড়াল।

পৃথু বলল, বোসো, ঠুঠা বোসো। বলে, সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল ওকে।

অন্যদিন ঠুঠা বসে না। আজ কেন যেন বসল।

বিশু চা নিয়ে এল।

আরও একটা কাপ আনতে বলল, বিশুকে।

বিশু কাপ না এনে একটা কলাইকরা গ্লাস নিয়ে এল।

পৃথু বিশুকে বলল, কাপ আনতে বললাম যে !

ঠুঠা দুদিকে মাথা নাড়ল।

বিশু বলল, আমরা চা খাই খুব গরম। কষে, দুধ চিনি দিয়ে। গ্লাসে খেলে, চা অনেকক্ষণ গরম থাকে।

পৃথু আর তর্ক করল না। বিশু বলল, ঠুঠাদার চা আমি আলাদা করে বানিয়ে এনে দিচ্ছি। আপনার এই ট্যালটেলে চা খেয়ে কোন্ সুখ হবে তার !

ছেলেটা বড় বেশি সপ্রতিভ। কথার ফুলঝুরি ফুটোয় সে সব সময়। তবু, এই বাড়িতে, কথা বলার লোক ত এখন একমাত্র বিশুই। ঠুঠা ত' কথাই বলে না। পৃথুও নিজের সঙ্গেই বলে। সেকথা

শোনা যায় না।

চা খেতে খেতে পৃথু বলল, কেমন আছো ঠুঠা ? ঠিক করলে কিছু ? দেবী সিং-এর গ্রামে গিয়ে থাকলে কি তুমি বেশি খুশি হও ? যাবে সেখানে ? আমার জন্যে তোমার সমস্ত জীবনটাই ত খোয়া গেল।

অত বেশি কথা ঠুঠা বাইগা পছন্দ করে না। আঙুল দিয়ে চিঠিটাকে দেখাল। ওর চোখ দুটো লণ্ঠনের আলোয় ঝকঝক্ করে উঠল, মাংসাশী কোনো জানোয়ারের চোখের মতো।

বলল, কি আছে ওতে ?

স্তম্ভিত হয়ে গেল পৃথু। লণ্ঠনের আলোতে ও যখন চিঠিটা পড়ছিল তখন ওর মুখের ভাব নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে ঠুঠা। এই স্বল্প আলোয় তাব থেকে কম কবে চার মিটাব দূরে-বসা ঠুঠা কি দেখল ওর মুখে সে ঠুঠাই জানে। কিন্তু একমাত্র নিজেব মা বা ঠুঠার পক্ষেই পৃথুর জন্যে এই উদ্বেগ সম্ভব ছিল।

অভিভূত হয়ে গেল পৃথু।

প্রথমে ভাবল, বলবে না। কি হবে ঠুঠাকে এসব বলে ?

তারপরই ভাবল, ঠুঠাকে বলবে না ত' কাকে বলবে ?

সংক্ষেপে বলল পৃথু যা বলার। এও বলল যে, টুসুকে নিয়ে আগামী সপ্তাহে ভুচু আসছে এখানে।

ঠুঠা একটু কেশে নিল। তারপর পরিষ্কার গলায় বলল, ভুচু এলে, ভুচুব সঙ্গে সেও ফিরে যাবে হাটচান্দ্রায়।

কেন ? হাটচান্দ্রায় কেন ? সেখানে আবার কেন ?

প্রথম কারণ, ঠুঠা গম্ভীর গলায বলল, পাহাবা দেবো রুষাকে। রুষাতোমাবৌ। এখনও বৌ। তারপর মিলিও আছে। রুষাকে বলব যে, তার নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে। ঐ ইতরটার বাড়ি ছেড়ে।

চুপ করে রইল পৃথু কিছুক্ষণ। কী বলবে ভেবে পেলো না।

তারপর বলল, দ্বিতীয় কারণ ?

এখানে পেত্নী আছে।

পেত্নী ? কোথায় এই বাংলোয় ?

না। ঐ বাড়িতে।

কোন বাড়িতে ?

কুর্চি মেমসাহেবের বাড়িতে।

ঠুঠার কথা শেষ হতে না হতেই গেটের কাছে একটি সাইকেল এসে থামল। কিরকির করে উঠল সাইকেলের উল্টো ঘুরোনো চেন এবং ছররররবর্ শব্দ করে মোরামের ওপর গড়িয়ে গেল হঠাৎ-ব্রেক-কষা পেছনের চাকাটা।

সাব্।

বলল, আগন্তুকটি।

কওন্ ?

লোকটি কথা না বলে, গেট খুলে ভিতরে এল সাইকেল ঠেলে। তারপর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সেলাম করে একটি চিঠি দিল হাতে।

হাতের লেখা দেখেই পৃথু বুঝল যে, কুর্চির চিঠি।

বলল, তুম্ কওন হ্যায় ভাই ?

কুন্তীকি মরদ।

ওঃ। তুমহি হ্যায়।

জী সাব।

ঠুঠা যেমন চেয়ারে বসেছিল, বসেই রইল। কুন্তীর বর ঠুঠার দিকে খুব কটমট চোখ করে তাকাল সেলাম করে চলে যাওয়ার আগে। ঠুঠা কিন্তু লোকটাকে পাত্তাই দিল না। ঠাণ্ডা, উদাসীন চোখে ওর চলে-যাওয়া দেখতে লাগল।

চিঠিটা খুলল পৃথু।

কুর্চি লিখেছে :

পৃথুদা,

আজ থেকে ঠুঠাদাদাকে আর রাতে পাঠাবেন না। কুন্তীর খুবই আপত্তি। বলছে, রাতে ঠুঠা এখানে থাকলে ও কাজ ছেড়ে দেবে। আজকে বিকেলে ওর বরও এসেছিল। ওদের মধ্যে কী সব কথাবার্তা হল। তারপরই আমাকে বলল, আপনাকে এই চিঠি লিখতে।

ব্যাপারটা ভাল করে জানবার জন্যে আমি কুন্তীর বরকে বাজার থেকে ঘুরে-ঘারে আসতে বলেছিলাম। একটা মুরগীও আনতে পাঠালাম বস্তী থেকে খুঁজে-পেতে, আপনি ত কাল রাতে আসবেনও বলেছেন। তাইই।

ও চলে যেতে, কুন্তীকে জেরা করে জানলাম যে, কাল রাতে ঠুঠাদাদা নাকি কুন্তীকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে তাকে এমনই জোরে কামড় দিয়েছে যে, বেচারীর ঠোঁটই কেটে গেছে। ঠুঠার গায়ে অসম্ভব জোর। কুন্তী নিজের চেষ্টায় ছাড়াতে পারেনি নিজেকে, ঠুঠাদাদা যখন নিজে ছেড়ে দিয়েছে তখনই ছাড়া পেয়েছে। ভয়ে রাতে আমাকে জাগায়ওনি।

ঠুঠাদাদা সম্বন্ধে ও আমাকে আগেও বলেছিল। রাতে লণ্ঠন নিয়ে বাইরে যেত ও। উঠোনের এক কোণাতেই আড়াল নিয়ে বসে পড়ত। ঠুঠাদাদা নাকি সেই সময় উঠে বসে বারান্দায় থেকে তাকে বিচ্ছিরি চোখে লক্ষ্য করত। জঙ্গলের মেয়ে ও। ছোটবেলা থেকে অনেক রকম পুরুষ-জাত বিপদ ওর জানা। অনেক বিপদ গায়ে-সওযাও। কিন্তু ঠুঠার চোখে নাকি দানোর দৃষ্টি ছিল। গা-হিম হয়ে যেত ওর।

সে কথা শোনার পর আমি বলে দিয়েছিলাম, পাশের ঘরে যদিও ও শোবে, রাতে যেন দরজা খুলে বাইরে না যায়। প্রয়োজন হলে আমার ঘরের লাগোয়া বাথরুমেই যেন যায়।

কাল এতই ক্লান্ত ছিলাম যে খেয়ালই ছিলো না। শোবার সময় আমার আর ওর ঘরের মধ্যের দরজাটাতে ভুল করে খিল তুলে দিয়েছিলাম। তাইই ওকে বাইরেই যেতে হয়েছিল।

পৃথুদা, কাল সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেতে পারত। এবং ঘটে গেলে, কুন্তীর বর ঠুঠাদাদাকে কেটে ফেলত।

কুন্তী তার বরকে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে। বলেছে যে, ও সেলাই-এর টেবলের নিচে বসে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, হঠাৎ ওঠার সময় অতর্কিতে ওর ঠোঁটে টেবলের কোণা লেগে গিয়ে ঐ কাণ্ড ঘটে যায়। বলেছে বটে, তবে ওর বর বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না তার চোখ দেখে। লোকটাও গুণ্ডা প্রকৃতির।

কাল আপনি রাতে আমার এখানে থাকবেন তাইই কুন্তীকেও ছুটি দিয়ে দেব কাল বিকেলেই সেই রাতের মতো। ঠুঠা দাদাকে কাল ত নয়ই অন্য কোনোদিনই আর পাঠাবেন না। কাল অবশ্যই আসবেন। না এলে, আমার একদম একা থাকতে হবে। ঠুঠাদাদার সঙ্গে আমিও একা থাকব না।

কাল যখন দেখা হবে, তখন বিস্তারিত বলব।

—ইতি কুর্চি।

কুন্তীর বর সাইকেল ঠেলে গেটের বাইরে পৌঁছে গেটটা বন্ধ করে সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল এমন সময় পৃথু ডাকল তাকে। তারপর দড়িতে টান দিয়ে গরুর গলার ঘণ্টা বাজাল। বিগু আসতেই চিঠির প্যাড আর কলমটা নিয়ে আসতে বলল।

দু লাইনের চিঠি লিখল কুর্চিকে : অনিবার্যকারণবশত কাল যেতে পারছি না। কুন্তীকে কালকে ছুটি দিও না। শনিবার রাতে থাকব তোমার কাছে। পৃথুদা।

পুঃ দেখা হলে সব বলব। মানে, কেন যাচ্ছি না কাল।

চিঠিটা কুন্তীর বরকে দিয়ে বলল, কুর্চিকে যেন এখনই দিয়ে যায়।

ও বলল, রাতে আমি ঐখানেই থাকব আজ। চিঠি ঠিকই পৌঁছে যাবে। আপনি বে-ফিক্কর থাকুন।

ও চলে গেলে, ঠুঠা আবারও তার ঘড়ঘড়ে কর্কশ গলায় কুর্চির চিঠিটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল : কি ? কি লিখেছে ?

পৃথু বলল, ও আমার চিঠি। তোমার বিষয়ে কিছু নেই এতে।

ঠুঠা অপরাধী শিশুর মতো মুখ করে অনেকক্ষণ পৃথুর দিকে চেয়ে থেকেই দু হাতের পাতা দিয়ে নিজের কুৎসিত মুখটাকে ঢেকে ফেলল।

ভারী কষ্ট হল পৃথুর। এই প্রাপ্তবয়স্ক, অসহায়, প্রায় বোবা-হওয়া ঠুঠার জন্যে। কুন্তীর জন্যেও। প্রায় একই ধরনের কষ্ট হল রুষারও জন্যে। কুর্চির জন্যে। ভুচুর জন্যে। গিরিশদার জন্যে। এবং এমন কি ওর নিজের জন্যেও।

ভুচু বোধহয় সেদিন ঠিকই লিখেছিল তার চিঠিতে : পৃথুদা, ঠুঠার যা দরকার, তা একটি শক্ত-সমর্থ মেয়েছেলে।

সত্যিই কি তাইই ?

হয়ত সত্যিই তাই।

কুর্চির সঙ্গে এখানে মিলিত হওয়ার পর জীবনের একটা নতুন দিক খুলে গেছে পৃথুর কাছে। হয়ত কুর্চিরও কাছে। কিন্তু ঠুঠা বাইগাও কি পৃথুরই মতো একজন ভঙ্গুর মানুষ ?

সারাটা জীবনই, যা শুধু না পেয়েই নয়, যার সম্বন্ধে এক গভীর অসূয়াই সে চিরদিন পুষে এসেছে সেই নারী শরীরের কাছে এত পথ একা একা হেঁটে এসে শেষে কালা-বাঘ ঠুঠা বাইগাও হাঁটু ভেঙে পড়ল ? গায়ের জোরে পেতে চাইল কুন্তীকে ? পুরোপুরি পেলেও ব্যাপারটা স্বাভাবিক হত। জানোয়ারের মতো রক্তাক্ত কামড়ে কুন্তীর মতো প্রকৃত সুন্দরী মেয়ের ঠোঁট কামড়ে নেওয়া ত সুস্থতার লক্ষণ নয়। এ এক ধরনের বিকৃত-কামের প্রকাশ। ঠুঠা বাইগা জানত পুরোপুরিভাবেই, কুন্তীকে পেতে তার বাধা ছিল অনেক। নিজেব ভিতরেব বাধা. পৃথুর দিকের বাধা, কুর্চির দিকের বাধা এবং, কুন্তীর দিকের বাধা ত বটেই। এই সব বাধা সম্বন্ধে সচেতন, নিশ্চিত ছিল বলেই তার স্বাভাবিকতা বিকৃত হয়ে উঠেছিল।

নারী ছাড়া যদি বাঁচা নাইই যায় তবে জীবনভর এত বড় বড় বুলি কপচে গেলে কেন. ঠুঠা বাইগা ? অবশ্য ঠুঠা ত একাই নয়। পৃথু নিজেও ত কম বলেনি ; কম ভাবেনি।

দিগা পাঁড়ের কাছে তুলসীদাসের মানসমুক্তাবলী শুনেছিল সে. সেই বাণীই তাহলে সত্যি হল ? "জয় বিনু দেহ নদী বিনুবারী তৈসি অ নাথ পুরুষ বিনু নারী।" প্রাণ বিনা দেহ, জল বিনা নদী যেমন, নারী ছাড়া পুরুষও তেমনই। "কো জগ কাম নাচার ন জেহী" ? জগতে কাম কাকে কামড়ায়নি ? মানুষ আর মানুষেব মাথার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা এই প্রথম রিপুর চেয়ে বেশি বিষধর সাপ পৃথিবীব কোনো পাহাড় জঙ্গল সমুদ্র বা মরুভূমিতেও নেই। সাপেরই মতো, যত বেশিদিন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, বিষ ততই বাড়ে। এর কামড়ে বড়ই জ্বালা। রুষার আজকের সমস্যা, ইদুরকারের সমস্যা, কুর্চির সমস্যা, তার নিজের সমস্যা সবই কি শুধুমাত্র এই রুখু উপোসী শরীরের জন্যেই ? জানোয়ার হলে ত দুঃখ পেতো না। শূকর হলে, যে-কোনো শূকরীতে উপগত হতে পারত। মানুষ যে যে-কোনো মানুষীতে যেতে পারে না। মানুষ অনেক কিছুই পারে না, যা জানোয়ারেরা সহজেই পারে। জীবনের মাঝামাঝি এসে পড়ে অনেক দম্ভ, গর্ব, অনেক জানাকে এমন করে ডুবন্ত জাহাজের মত মন থেকে জেটিসন করে দিতে যে হবে এ কথা ছ'মাস আগেও জানত না। নিজের প্রেমিকার কাছে, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাগের বশে নেশাগ্রস্থ হয়ে বিজলী বাঈজীব কাছে গিয়ে ও যা জেনেছিল, বিদ্যুৎচমকের মতো, সেই শিক্ষাই ঠুঠা বাইগা বোধহয় আজ শিখল জীবনের সাঁঝ-বেলাতে এসে কুন্তী নামক একটি সুন্দরী গোঁদ যুবতীর কাছে।

শহুরে না হতে পারে, ইংরিজি না জানতে পারে, ঘোরতব জংলী হলেও ঠুঠা কিন্তু শূকর মোটেই

নয়। প্রত্যেক পুরুষই শুধুমাত্র তার নিজের সমাজের, নিজের রুচির, নিজের পছন্দর কোনো নারীর কাছে এসেই নিজের শরীরের বিদ্যুৎবাহী তারে হঠাৎ চৌম্বকত্বর সাড়া পায়। যে কোনো নারী, যে-কোনো পুরুষকে জ্বালাতে পারে না, যে-কোনো পুরুষও পারে না যে-কোনো নারীকে। এইখানেই মানুষের এত দুঃখ। তাইই সারা জীবন নারীকে ঘৃণা করে এসে ঠুঠাকে ভেঙে পড়তে হয় কুন্তীর শরীরের চৌকাঠে। পৃথুর মধ্যে তার নিজের তরঙ্গবাহী তার খুঁজে না পেয়ে ইদুরকারের কাছে যেতে হয় রুষাকে। কিন্তু বেচারী বড় দেরীতে বুঝতে পারে যে, শুধু শরীরের তরঙ্গ মিললেই একজন নারী আর একজন পুরুষ চিবদিন একসঙ্গে থাকতে পারে না খুশিতে। শরীরের তরঙ্গর চেয়েও মনের তরঙ্গর মিলের প্রয়োজন বেশি। তাই এত দাম দিয়ে স্বাধীনতা কিনেও রুষাকে শবীরের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে আবার ফিরে আসবার আয়োজন করতে হয় পুরোনো বাসে। সেই একই কারণে কুর্চিকে পেয়ে, এতদিন পরে পৃথু বুঝতে পারে যে, তাব জীবনের মন এবং শরীরের সমান অংশীদার শুধুমাত্র কুর্চিই। রুষা নয়, বিজলী নয় ; আর কেউই নয়। দুই-তৃতীয়াংশ জীবন খোঁজাখুঁজি করতেই কেটে গেল পৃথুর, ঠুঠার কেটে গেল পুরো জীবন তার বেয়ারিং কারেক্ট কবতে। এব পবেও বাঁচাব সময় কি আর বেশি থাকে বাকি ?

ঠুঠা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল পৃথুর মুখে। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেছিল। আলোর গতি এক লক্ষ ছিয়াশী হাজাব মাইল। মানুষের ভাবনার গতি কত তা মানুষের এখনও জানাব বাইরে। ভাবতে বসে উধাও হয়ে যায় পৃথু মনে মনে।

পৃথু বলল, বিয়ে করবে ঠুঠা ? তোমার জন্যে পাত্রী দেখি ? বাইগা মেয়ে। একটু বেশি বয়সী ? বিধবা ? কারো ছেড়ে-দেওয়া ? অনেকই ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে একটু খোঁজ করলেই। দিসাওয়াল সাহেবের কোম্পানীতেই এ বকম অনেক মেয়ে থাকবে। বলো ত' চেষ্টা করি। বাকি জীবন তোমরা দু'জনে আমার সঙ্গেই থাকবে। আমার ত' তুমিই সব। তোমার বউও কি আমার পর হবে ? কত ভাল হবে তোমরা দু-জনে যদি আমাব চোখের সামনে থাকো।

ঠুঠা আবার দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

পৃথু বুঝতে পারল চিঠিটাতে কি আছে তা অনুমান কবেছে ঠুঠা।

ঠুঠা বলল, কালকে সকালের বাসে আমি হাটচান্দ্রাতে চলে যাব। কাল শেষ রাতে তোমার বাবাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। তোমার বাবা যেতে বলেছেন সেখানে।

বাবাকে ?

নরম হয়ে গেল পৃথুব গলার স্বব।

হ্যাঁ।

তা হাটচান্দ্রায় গিয়ে থাকবেটা কোথায় ?

যেখানে ওরা থাকে। মিলি-টুসুরা।

সেখানে তোমার থাকা হবে না। তুমি ভুচুর কাছে বা গিরিশদার কাছে থাকতে পারো।

না। তা হবে না। আমি গেলে ওদের কাছেই থাকব। কাল ভোরেই আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব।

একেবারেই না।

ধমকের সুরে বলল পৃথু।

তারপর কথা ঘুরোবার জন্যে বলল, একটা চুট্টা দাও ত দেখি। বড় কিপ্টে হয়েছো আজকাল তুমি।

ঠুঠা উঠে দাঁড়িয়ে ওর ফতুয়ার পকেট থেকে চুট্টা বের করে শজারু-মার্কা দেশলাই জ্বেলে তা ধরিয়ে দিল। ওর দু হাতেব তেলোব মধ্যে ধরে থাকা জ্বলন্ত কাঠির আগুনে চকিতে ঠুঠার মনের ভাব পড়ে নেবার চেষ্টা করল পৃথু। জন্মাবধি ঠুঠা বাইগাকে দেখছে পৃথু। পৃথুর মতো ভাল ঠুঠা বাইগাকে কম মানুষই চেনে। কিন্তু অতি পরিচিত বাহ্যত কুৎসিত কিন্তু আত্মিক সৌন্দর্যে সুন্দর সেই মুখখানির চোখ-দুটিতে কিছুই পড়তে পারল না পৃথু এই মুহূর্তে। দূর পাহাড়ের অস্পষ্ট

দাবানলের আলোরই মতো এক অস্পষ্ট লালচে আভা দেখতে পেল শুধু। দু চোখের মণির মধ্যে দাবানলের মালা। মনে হল, আরও অনেকের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে, আগুনের শাড়ি ছিপছিপে কালো শরীরে আলতো করে জড়িয়ে কালো কুচকুচে কুন্তী যেন নাচছে ঘুরে ঘুরে ঠুঠার দু চোখের মণির ওপরে। নেচে-নেচে চলে যাচ্ছে কাছ থেকে দূরে। ফিরে আসছে দূর থেকে কাছে। একবার দলছুট হয়ে যাচ্ছে হাত-ছাড়িয়ে আবারও ফিরে আসছে দলে।

ঠুঠা আবার বলল, আমি কাল যাচ্ছি।

একদম না। যদি যেতেই হয় ত ভুচুর সঙ্গেই যেও। একা জীপ চালিয়ে ছেলেটা ফিরবে অতদূর, ভালই হবে। তাছাড়া টুসুই ত আসছে এখানে। তুমি যাবে কি করতে?

পৃথু বলল।

নাঃ। যাবই। যেতে হবে মিলির জন্যে আর রুষার জন্যে।

পৃথু বিপদে পড়ল। ঠুঠা যেন আবারও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। আগেব বার নাঙ্গা বাইগীন্‌কে স্বপ্ন দেখে ব্যাপারটা ঘটেছিল। এবার কুন্তীর সংস্পর্শে এসে। যে ক্ষিদের তার পূরণ হয়নি যা তীব্রভাবে জেগে উঠেছে যাই-যাই-বেলায়, সেই ক্ষিদেসুদ্ধু ঠুঠাকে কুর্চি বা রুষা বা মিলি কারো কাছেই ভরসা করে পাঠানো যায় না। এখন সুস্থ নেই ঠুঠা। মানুষ অসুস্থ হলে শূকর হযে যায়। হয়ত পৃথুও নেই। তফাৎটা শুধু এইটুকুই যে, পৃথু জানে যে, সে অসুস্থ; আব ঠুঠা জানে না সে কথা।

ঠুঠা তেমনই বসে রইল।

কি ঠিক করলে?

ঐ।

ঐ কি?

কাল যাব।

ঠাণ্ডা মাথায় ঠুঠার চোখের দিকে চেয়ে তাব অপ্রকৃতিস্থতাব মাত্রাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল পৃথু। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টেবল থেকে ক্রাচ্ দুটো তুলে নিয়ে বলল, বেশ তাইই হবে। এখন চা-টা তো খাও।

বিশুর এনে দেওয়া চায়ের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বান্নাঘরের দিকে চলে গেল ঠুঠা। শ্লথ পাযে। মোজাইকের টাইলস এর উপরে খসখস— খস্‌খস শব্দ তুলে, পা ঘষে ঘষে।

পৃথু ঘণ্টা বাজাল।

বিশু দৌড়ে এল।

ফিস্‌ফিস্ করে ও বলল, ঠুঠার উপরে একটু চোখ রাখিস। আর দুটো গুলি দেব, এক্ষুনি ওর চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দে কোনো কায়দা করে। ঘুমিয়ে পডবে তাহলে।

ওর পাগলামিটা বেড়েছে মনে হচ্ছে। খববদার! জোর করিস না।

ঘরে গিয়ে দুটো পাঁচমিলিগ্রামের ঘুমের ওষুধ দিল বিশুর হাতে।

এখানের ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে আগে থেকেই ঠুঠার জন্যে এই ঘুমের ওষুধ আনিয়ে রেখেছিল ও। সম্ভব হলে, এই হাটবারেই ওকে নিয়ে যাবে রায়পুর বা জবলপুরে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। কিন্তু সাইকিয়াট্রিসট কি নাঙ্গা বাইগীনের দর্শন পাওয়া মানুষের চিকিৎসা করতে পারবেন? কুন্তীর ব্যাপারটা সম্বন্ধে হয়ত পারবেন কিছু করতে। কে জানে, হয়ত বলবেন, সেক্সুয়াল স্টার্ভেশান থেকেই ওর সব-কিছু গোলমাল। নাঙ্গা বাইগীনের স্বপ্ন-টপ্নও তাইই।

হয়ত।

চান করে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে যখন আবাব পৃথু বারান্দায় এল দেখল ঠুঠা বারান্দার তাকে বসে, থামে হেলান দিয়ে, মাতালের মতো টলছে। বিশু খাওয়াতে পেরেছে তাহলে ওষুধ চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে। চালাক আছে ছেলেটা। কিন্তু ঠুঠা এইখানেই ঘুমিয়ে পড়লে পৃথু বা বিশুর পক্ষে তাকে আর ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো খুবই মুশকিলের হবে। পৃথু নিজেই ত এখন পরনির্ভর। আগের পৃথু

ত সে আর নেই ! থাকা-না-থাকা সমান। এই সময় ঠুঠার পেটে কিছু খাবার পড়লেই ঘুমটা আরও ভাল হত। বলা যায় না ঘুমিয়ে ওঠার পর এই কুন্তী-জনিত শক্-এর সেন্সটা হয়ত কেটেও যেত।

ঘণ্টা বাজিয়ে বিগুকে ডেকে, দুজনেই ঠুঠাকে দু দিকে ধরে বলল, চলো, খেয়েই শুয়ে পড়বে। আমরা সকলেই আজ তাড়াতাড়ি খাব। কালকে তুমি হাটচান্দ্রায় যাবে, বাসে তুলে দিতে যেতে হবে না আমাদের ? তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ত সকলের, না, কি ?

ঠুঠা মাথা নাড়ল। তারপর নিজেই টলতে টলতে রান্নাঘরের দিকে এগোল।

বিগু বলল, তুমি তোমার ঘরে যাও দাদা। আমি খাবার নিয়ে আসছি। আমারও ভীষণ ঘুম পেয়েছে। আমরা দুজনে একসঙ্গেই খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।

কোনো কথাই বলল না ঠুঠা উত্তরে। টলতে টলতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

পৃথু নিজের ঘরে গেল। রুষাকে আর ভুচুকে দুটি চিঠি লিখতে হবে। যে চিঠিদুটি সে লিখবে তা শুধু চিঠিমাত্রই নয়। জীবনের হিসাবনিকেশ। ট্রায়াল-বালানস। মিলবে না। জানে ও যে মিলবে না। তবে, ডিফারেন্সটা জমার দিকেই আসে না খরচের দিকে সেটাই দেখার এখন।

জানালা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে দাবানলের মালা এখন দেওয়ালীর রাতের প্রদীপের মালার মত দেখাচ্ছে। ঝড়ের মতো হাওয়ায় কাঁপছে মালাগুলো। গ্রীষ্মবনের রাতের বুক থেকে, মুচমুচে শুকনো পাতাদের দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ানোর শব্দের আড়ালে এক বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস ওঠে। পোড়া-পোড়া গন্ধ ওঠে। ছেলেবেলায় দেউড়িতে যেমন পেটা-ঘড়ির আওয়াজে প্রহর হেঁটে যেত এখানে প্রহরে প্রহরে শেয়ালের ডাকে তেমন হাঁটে। সেই চিতাটা করাত-চেরা আওয়াজ করে পাহাড়ের কাঁধের কাছে হেঁটে যাচ্ছে। পাহাড়তলীতে এক চিলতে চাঁদের আলো আর গ্রীষ্মবনের ধোঁয়াশা মিলে এক আশ্চর্য ধূসরাভ মেঘের সৃষ্টি করেছে। এই রাতের বনের রহস্যময়তাকে গভীরতর করে তুলেছে পরিচিত পাখিটির গম্ভীর ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব শব্দ। হনুমানের দল হুপ-হুপ-হুপ-হুপ করছে। বোধহয় কোনো বড় বাঘ দেখে থাকবে গ্রীষ্মে পাৎলা-হয়ে-যাওয়া উপত্যকার জঙ্গলে।

পৃথু, বাইরের নেশাগ্রস্ত প্রকৃতি থেকে চোখ ভিতরে করল। মহুয়া আর করৌঞ্জ ফোটার সময় অন্যত্র শেষ। এখানে এখনও ফুটছে।

ঝলক ঝলক গন্ধ এল হাওয়াটা দিক বদলাতেই।

লণ্ঠনের আলোয় লিখল, পৃথু।

রুষা, কল্যাণীয়াসু ,...



দিসাওয়াল সাহেবের বিড়িপাতার কাজ শুরু হয়েছে সবে।

অন্য অঞ্চলের জঙ্গল হলে কাজ এতদিনে এগিয়ে যেত অনেক কিন্তু এই অঞ্চলে গরম দেরী করে পড়ায় একটু দেরীতেই শুরু হয়েছে।

জঙ্গলের মধ্যে কুলীদের ক্যাম্প এবং পাতা কালেকশনের ডেরা সবে ঠিক-ঠাক করা হচ্ছে। গত বর্ষার বৃষ্টিতে ঝুপড়িগুলোর চাল পচে, খসে, ঝড়ে উড়ে গেছে। খুঁটিও নড়ে গেছে অনেক। কিছু ত

পড়েও গেছে। এই সব মেরামত করার কাজ সবে শেষ হয়েছে। পুরোনো কুলি সর্দার গাণ্ডেরী সিং মারা গেছিল শীতের গোড়ায় তিনদিনের জ্বরে। নতুন সর্দার হুকমত্ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে লেবারদের নিয়ে। বয়সে গাণ্ডেরী তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। সে কারণেই পৃথুকে দিসাওয়াল সাহেবের অনুরোধে পুরো ব্যাপারটা তত্ত্বাবধান করে মসৃণভাবে যাতে কাজ চালু হয় এবং থাকে তাই পৃথু এখানে এসেছে। দিন সাতেক থাকতে হবে। দিসাওয়াল সাহেবের ধারণা পৃথু নাকি ওঁর চেয়েও ভালভাবে এ বছরের পাতার ফলন, গুণগত মানের রকম এবং কবে নাগাদ সব পাতা জঙ্গল থেকে সীওনীতে নিয়ে এসে পাইকারদের দিয়ে দেওয়া যাবে সে সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে।

কেঁদ গাছের পাতাই বিড়িপাতা। কিন্তু সময় মত পেড়ে, সময়ে, মানে বৃষ্টিনামার আগে আগেই চালান না করতে পারলে সবই মাটি। নরকি-কিল্লার কাছে রাস্তাটার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে আছে। গত বছরে ফরেস্ট করপোরেশনের ঠিকাদার বোধহয় পুরো টাকাটাই খেয়ে নিয়েছে, নইলে এক বর্ষায় পথের হাল এমন হত না। এখন নিজেদের পয়সাতেই মেরামত করতে হবে,নইলে ট্রাক যাবে না। দুটো নদীও পেরুতে হয় আসতে হলে সান্দুর-এ। নদীতে নামার ও ওঠার জায়গাগুলোরও ভাল মেরামতী দরকার। কাজ যখন পুরোদমে শুরু হবে তখন একেবারে দক্ষযজ্ঞ।

বিড়ি পাতার দাম এক এক বছরে এক একরকম থাকে, অন্যান্য সমস্ত জাংগল-প্রড্যাস্-এরই মতো। আশে পাশের অন্যান্য জঙ্গলের ফলনও দামের উপর প্রভাব ফেলে।

সাত দিনের ট্রিপ-এ আসার আগে কুর্চি বলেছিল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন পৃথুদা? যদিও জংগল পাহাড়ের পরিবেশে কাটিয়েছি অনেকই দিন তবু একেবারে জঙ্গলের বুকের মধ্যে সাতদিন কুঁড়ে ঘরে থাকার অভিজ্ঞতা কখনই হয়নি আমার। তা ছাড়া, আপনার সঙ্গে জঙ্গলে থাকাও ত একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। ভাবব, এইই আমাদের না-বিয়ে-হওয়া কৃষ্ণপক্ষর হানিমুন। মনে মধু থাকলেই হল, চাঁদে নাইই বা থাকল।

হেসে বলেছিল পৃথু। বেশ ত। চলো। তবে, তোমার মনে আমার সম্বন্ধে যা আছে তা মনেই রেখো। অন্যে শুনলে ভাবতে পারে নিজের সম্বন্ধে আমি অরণ্যদেবের মতো কোনো ইমেজ গড়ে তুলেছি তোমার মনে। জঙ্গলের কতটুকুই বা জানি। ভালোবাসি, এই পর্যন্ত।

যতটুকু জানেন, তাইই আমার কাছে অনেকখানি। ভালই হল। আমাদের দুজনের মনের উপর দিয়েই যা বয়ে গেছে তাতে একটা ছুটির দরকার ছিল দুজনেরই।

পৃথু বলেছিল, আমার ত নিরন্তরই ছুটি। কাজ আর করলাম কোথায় জীবনে? যা করেছি সবই প্রায় অকাজ।

ঈসস ভাবতেই ভাল লাগছে। গভীর বনের মধ্যে পর্ণকুটিরে থাকব আপনার সঙ্গে। জায়গাটার কি নাম?

সান্দুর। জীপে যেতে এখান থেকে ঘণ্টাখানেক লাগবে। পথ বেশি নয় তবে খারাপ। তাইই সময় লাগে।

এখানে আসার পর থেকে কুর্চি বন-মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। প্রকৃতির ত সত্যিই কোনো বিকল্প নেই। চাঁদে পা-দেওয়া মানুষ, কমপ্যুটার-নির্ভর মানুষ, হাইড্রোজেন বোমা বানানো মানুষ সকলেরই প্রকৃত মুক্তি নিহিত আছে এই প্রকৃতিরই মধ্যে। প্রকৃতি থেকে,যতই আধুনিক মানুষ বিযুক্ত হয়ে পড়ছে, ততই সে অমানুষ হয়ে উঠছে।

আজকে পঞ্চম দিন। আজ সকালে ঘুম ভেঙেই পৃথুর কোমর জড়িয়ে শুয়ে কুর্চি বলেছিল, সারা জীবন এখানে থাকতে পারি না আমরা?

পৃথু হেসেছিল। বলেছিল, তোমার মতো অনেক বন-বিলাসীই এক বছর একটানা এই রকম জায়গায় থাকলে আর কখনও জঙ্গলের মুখই দেখতে চাইবে না। শহুরেদের পক্ষে, প্রকৃতি খুব সুন্দর, ফর আ চেঞ্জ। জঙ্গলের ভালটাতে মুগ্ধ হওয়া সোজা, খারাপ যেটুকু আছে তা সকলের সয় না।

একটি পাহাড়ী ঝোরা সোজা বয়ে গেছে ডেরার ঠিক পিছন দিয়ে। এখানে নদীটা খরস্রোতা।

নদীর নামও সান্দুর। নদীর নামেই জায়গার নাম। এক কোমর জল আছে এখানে এবং গ্রীষ্ম যখন তুঙ্গে তখনও এক হাঁটু জল নাকি থাকবে, হুকুমত সিং বলছিল। এই জলই ডেরার এবং কুলি ঝুপড়ির সকলের পানীয় জলের উৎস। চান-করা, কাপড়-চোপড় কাচা এবং অন্যান্য প্রয়োজনও মেটাতে হয় ঐ জলেই। সব সময় ঝরঝরানি শব্দ। রাত যত গভীর হতে থাকে এই শব্দও তত জোর হতে থাকে। ঝরনা এক আশ্চর্য ফুলেরই মতো ঝরে যাচ্ছে ফুটেথেকেই। নিশিদিন। দিনের বেলা মনে হয় তার স্বর যেন বি-ফ্ল্যাটে বাঁধা। আর গভীর রাতে সি-শার্প-এ। যে-কেউই গলা মিলিয়ে তার সঙ্গে গাইতে পারে গান, ইচ্ছে যদি হয়।

কুর্চি শালকাঠের তক্তার মাচার বিছানাতে উঠে বসে পাল্লাহীন জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বলেছিল, সত্যি পৃথুদা, ঠাট্টা নয়। পারি না থাকতে সারা জীবন? এই রকম জীবনের স্বপ্নই দেখেছিলাম ছোটবেলা থেকে।

পৃথু বলল, যাবে না কেন? এমন জঙ্গলে থাকলে জংলীদের মতোই থাকতে হবে। সারা জীবন ত লোকে থাকেই। কাছেই সান্দুর বস্তি। সেখানের মানুষরা ত এখানেই থাকে। তবে, তোমার পক্ষে বোধহয় এইই ভাল। একমাত্র মহিলা তুমি এই ক্যাম্পে। এতজন পুরুষের লুব্ধ চোখের সামনে তুমি একা। ভাল লাগে না?

পুরুষের চোখ মাত্রই ত লুব্ধ। সে এখানে আর ওখানে কি? এইটা ভেবেই খারাপ লাগে। সুন্দর করে যারা তাকাতে পর্যন্ত পারে না তাদেরই চাওয়ার শেষ নেই।

বেশি সুন্দর করে তাকালে বোধহয় তোমরা বুঝতে পর্যন্ত পারো না যে তোমাদের চাইছে তারা।

হেসে ফেলল, কুর্চি। বলল, কথায় পারব না।

সান্দুরের জঙ্গলে এসে কুর্চিও যেন সত্যিই জংলী হয়ে উঠেছে। এই কুর্চিকে ভয় পেতে শুরু করেছে পৃথু। সব মেয়েই কি কুর্চির মতো? কে জানে? হাতে হাত রাখলে,পাখির পালকের মতো মসৃণ একটি চুমু খেতে চাইলে লজ্জায়, ভয়ে মরে যেত যে মেয়ে, তারই এই রূপ দেখে অবাক ত হতেই হয়। 'সেক্স' ব্যাপারটাতে ওদের ভীষণই ভীতি এবং অপরাধবোধ। কিন্তু সেটা কেটে গেলে একেবারেই অন্যরকম হয়ে ওঠে বোধহয়। কে জানত যে, তার কুর্চির মধ্যেও এমন একজন মেয়ে বাস করত?

আসলে, পৃথু একটি ফার্স্ট রেট ইডিয়ট। না বুঝতে পারল রুষাকে, না কুর্চিকে। মেয়েরা কি আসলে একেবারেই রোম্যান্টিক নয়? পৃথুদের চেয়ে ইঁদুরকাবদের দামই তাই বেশি ওদের কাছে? অথচ পুরুষের সব রোম্যান্টিকতা ওদেরই ঘিরে। মেয়েরা যতখানি শরীর-সর্বস্ব, শরীর-নির্ভর, ততখানি পুরুষরাও নয়। অবশ্য দুজনকে দেখেই সব মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণা করা অনুচিত। এই বিষয়ে পৃথুর অভিজ্ঞতা অতি সীমিত।

কাজ যতটুকু,তা ভোর বেলা উঠে শুরু করে দিত পৃথু। একবার ফিরে এসে নাস্তা করত। আবার বেরিয়ে যেত। দুপুরে ফিরে খেতে খেতে দেড়টা দুটো হত। তারপরে আর কোনো কাজ থাকত না। কুর্চিকে নিয়ে, জঙ্গলে বেড়িয়ে বেড়াত। কখনও জীপ নিয়ে যেত, ড্রাইভারকে নিয়ে। কখনও হেঁটে। রাঁধার একজন লোক অবশ্য আছে এই ক্যাম্পের মেস এ। কিন্তু পৃথুর রান্না কুর্চিই করত। দুজনের মতো। কাল দুপুরে এঁচড়ের তরকারি রেঁধেছিল। পরশু বিকেলে জংগলে বেড়াতে গিয়ে জংলী কাঁঠালের গাছ থেকে পেড়ে এনেছিল দুজনে মিলে। তেঁতুল দিয়ে এঁচড়ের টকও রেঁধেছিল। মোটা চালের সোঁদাগন্ধ ভাত, অড়হরের ডাল, জম্পেস করে ঘি ঢেলে তাতে কাঁচালঙ্কা আর হিং দিয়ে রেঁধেছিল কুর্চি। রান্নার গুণে এঁচড়টা ত মাংস বলেই মনে হচ্ছিল। কেউ যত্ন করে নিজে হাতে রেঁধে সামনে বসে এমন আদর করে খাওয়ালে নিজের কাছে নিজের দামই বেড়ে যায় যেন। শব্দহীন অথচ তীব্রভাবে সোচ্চার হয়ে থাকা দীর্ঘদিনের সমস্ত ইনডিগনিটিজ এবং মিসডিমেন্যারের দুঃখ ভুলেই যেতে ইচ্ছে করে চিরদিনের মতো।

রুষা তাকে যা দিত, তা পেলে হয়ত অন্য কোনো পুরুষ বর্তে যেতেন, কিন্তু সেই আড়ম্বর ও বাহুল্য ও বিদিশিপনাতে পৃথুর প্রয়োজন ছিলো না কোনোই। কুর্চি যেন পৃথুরই জন্যে জন্মেছিল

এবং পৃথু কুর্চিরই জন্যে, শরীরে মনে। সিগারেট কোম্পানী খোঁজ পেলে, তাঁদের মেড ফর ইচ আদারের প্রাইজটা নির্ঘাৎ দিয়ে দিতেন ওদেব দুজনকে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। পার্টি-ড্রেসে সেজেগুজে যাওয়া দম্পতিদেবই এঁরা এই পুরস্কার দেন। বাহ্যিক মিল দেখে। আসলে হয়ত দেওয়া উচিত ছিল পৃথু ও কুর্চিরই মতো দম্পতিকে, যাঁরা আত্মিক মিলে একে অন্যেব পরিপূরক।

কুর্চি রাতের বেলাতেও বেবোতে চায় হেঁটে। পৃথু, আজকাল 'ক্রাচ-নির্ভব' হওয়ায় অন্ধকার রাতে আর আগের মতো অনায়াস নয়। তা ছাড়া কৃষ্ণপক্ষর বাত। তার উপব সান্দুব জায়গাটা সীওনী থেকে অনেকই নিচে। গরমের দিনে সাপ ও বিছে আছে নানারকম। তবে, একরাতে জীপ ও ড্রাইভার নিয়ে কুর্চিকে রাতেব বন দেখিয়ে এনেছিল দুর্গম প্রায় দুরতিগম্য সব বাস্তায় বাস্তায় ঘুরিয়ে। নাইটজার পাখিরা তাদের লাল লাল চোখ জ্বেলে কী কবে বনপথ আঁকড়ে বসে থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে সোজা উপরে ওঠে, ওড়ে, তা দেখিয়েছে পৃথু কুর্চিকে। মনে হয়, যেন জীপের বনেট ফুঁড়েই উঠল পাখিবা। জীপ যত জোরেই যাক না কেন, কখনও বন-পথে-বসে-থাকা নাইটজার পাখি নিচে চাপা পড়েছে বলে জানা নেই ওর তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায়।

চিতল হরিণেব চোখ বাতে কী ভাবে জ্বলে আলো পড়ে, দুই জ্বলন্ত চোখেব উচ্চতা ব্যবধান এবং চোখ ঘোরানোর ভঙ্গী দেখে এবং সেই চোখের আলোর বঙ দেখেই সেই জানোয়াব নিবামিষাশী না মাংসাশী তা বোঝা যায়। এই দুই শ্রেণীব মধ্যে সেই জ্বলজ্বলে চোখেব মালিক যে কোন্ বিশেষ জানোয়ার তাও কী করে বুঝতে হয পৃথুর কাছ থেকে কুর্চি এই সব খুঁটিনাটিও জেনে নিতে লাগল। জেনে নিতে পারে সহজেই কেউ। কিন্তু জঙ্গলের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হতে অনেকই বছর লেগে যায়। কখনও কখনও সারা জীবন। কনডেনসড কোর্স নেই এখানে। থিওবীর সঙ্গে প্র্যাকটিস অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে আছে।

কুর্চি সখেদে বলল, এতগুলো বছর চলে গেল, মিছিমিছি পৃথুদা এইবারে.....

কালো কালো পাথরছড়ানো একটি এলাকায় একদল বুনো শুয়োর দেখা গেল। আলোতে পাথরের মধ্যে তাদেব প্রথমে অনড় পাথব বলেই মনে হওয়ায কুর্চি বলল ওদেব চোখ জ্বলছে না যে?

পৃথু বলল, শুয়োরদের চোখ ক্ষুদে ক্ষুদে। প্রায় জ্বলেই না বলতে গেলে।

একটি চিতা চকিতে কিন্তু বিনা আয়াসে লাফ মেরে পথের ডানদিকে থেকে বাঁদিকে যাওয়ায় কুর্চি বলল, এত বড় লাফ মারল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই? অনেকখানি দৌড়ে এসেও ত অতখানি লং-জাম্প দিতে পারত না কোনো মানুষ।

লং-জাম্প বোলো না, বলো লং-কাম-হাই জাম্প। কত উঁচু দিয়ে গিয়ে কত দূরে পড়ল দেখলে? ওদের দৌড়তেও হয় না। বাঘও চিতার মতোই বড লাফ দিতে পাবে। ওদের শরীরের পেশীগুলো সব দড়িরই মতো পাকানো পাকানো থাকে। মেদ যা আছে, তা সামান্য, পেটের কাছে। কোনোদিনও যদি মৃত, চামড়াছাড়ানো বাঘকে দেখতে তাহলে অনুমান করতে পারতে কী শক্তি ধরে সুন্দর, ডোরাকাটা মসৃণ চকচকে চামড়া ঘেরা এই বড় বিড়ালেরা।

সেদিন বিকেলে, বেলা থাকতেই কুর্চি চা বানাল ওদের জন্যে। তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়ল। জীপের ড্রাইভার বসির ওদের এগিয়ে দিল যতখানি জীপ যেতে পারে ততখানি। তারপর পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। বসিরকে বলে দিল পৃথু যেন সন্ধের আগে এখানেই এসে অপেক্ষা করে। কুলীরা সকালবেলা গিয়ে একটি 'হাইড' বা 'আড়' বানিয়ে এসেছিল ডালপালা আর পাতা দিয়ে সান্দুর ঝোরার অনেক উজানে, যেখানে অনেকগুলো গেম-ট্র্যাক এসে মিশেছে। জানোয়াররা জল খেতে আসে। সেখানে পৌঁছে যখন ওরা দুজন লুকিয়ে বসল নদীর দিকে মুখ করে একটা মস্ত বহেড়া গাছকে পেছনে রেখে। তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সূর্য ডুববে অবশ্য ঘণ্টা দেড়েক বাদে।

বড় জানোয়ারেরা জল খায় মূল নদীতে। কিন্তু চকচক করে তাদের জল খাওয়ার চেয়েও বেশি ভাল লাগে ছোট ছোট নানা জানোয়ার ও পাখির জল খাওয়া দেখতে। মূল নদীর পাশে অনেকখানি গেরুয়া-রঙা বালি ভিজে রয়েছে। তারই একপাশ দিয়ে পায়ের পাতাও ভেজে না এমন জল চলেছে

শব্দ না করে, বালির ওপর বুকে হেঁটে।

বেলা পড়ে আসতেই পাখিরা এল একে একে। শীর্ণা গায়িকার গলার শিরা যেমন গান গাইবার সময় তিরতির করে কাঁপে তেমন তাদের গলার শিরাও কাঁপছিল তৃষ্ণায়। সরু সরু ঠোঁটে জল শুষে নিচ্ছিল ওরা। বনমুরগী, তিতির, বটের, আসকল, কালি-তিতির, ময়ূর, মুনিয়া, নানা রকম ফ্লাইক্যাচার পাখি, বাদামী কালো বড় ক্রো-ফেজেন্ট, পৃথুর ওড়িয়া বন্ধু চন্দ্রকান্তদের দেশে যে পাখিকে বলে "কুম্ভাটুয়া", মৌটুসী, ঘুঘু, নীলচে-রঙা বক্-পিজিয়ন। তাবৎ বিশ্বকে ছ্যা ছ্যা ছ্যা করা বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতাদের মতো বাচাল ছাতারে পাখিরা সদলবলে এল তাদের পাটকিলে-খয়েরী রঙে নদীর পাড়ের ধুলোবালির রঙের সঙ্গে মিশে গিয়ে।

সাপেরাও এল। সুন্দর দেখতে ঢোঁড়া, গা-ঘিনঘিন করা চিতি, গোখরো এবং একটি মস্ত শঙ্খচূড়। ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল কুর্চি। পৃথুও অনড় হয়ে রইল। ওদের উপর ভরসা কম। রুষারই মতো বদমেজাজী সাপ এ। বিনা কারণেই ভীত, পলায়মান মানুষের পেছন পেছন গিয়ে দৌড়ে গিয়েও লেজের উপর সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বুকে মুখে বা মাথায়ও ছোবল মারে এরা। আর শঙ্খচূড়ের ছোবল মানেই মৃত্যুর চুমু।

চলে গেল তারা এঁকেবেঁকে ভিজে বালিতে তাদের সর্পিল ছাপ এঁকে দিয়ে।

প্রজাপতিরাও এসেছিল, পাখিদেরও আগে। ভিজে বালিতে ওদের মুখ ছোঁওযায় আর উড়ে যায় আবার ছোঁওয়ায় আবারও ওড়ে।এমনি করেই জল খায় ওরা। শেষের দিকে দুটি খরগোস এবং একটি শজারু এল। একটি বনবেড়ালও। বেজী দেখতে পেলো না একটিও।বেজী কম বলেই হয়ত সাপেরা এমন নিশ্চিন্ত এখানে। তবে ময়ূর আছে। নানা ধরনের ঈগল আছে। ওদের ভয় পাওয়ার মত অনেক কিছুই আছে।

মূল নদীতে চিতল, শম্বর, বারাশিঙা, বাইসন, কোটরা এরা সবাই জল খেয়ে গেল। চৌশিঙ্গাও এসেছিল একজোড়া। একদল কৃষ্ণসার।

চারধার দেখে নিয়ে সাবধানে উঠল পৃথু কুর্চিকে নিয়ে। সন্ধের আগে বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। সঙ্গে টর্চও আনেনি।

গ্রীষ্ম সন্ধ্যার বনে বনে তীব্র মধ্যাহ্নর রিরংসার ঝাঁঝ মরে গিয়ে তার অদৃশ্য শাড়ির প্রান্ত দিয়ে শুকনো পাতা-কেঁটিয়ে-নেওয়া উদাস হাওয়াটা বনমর্মরের সঙ্গে আশ্চর্য মিশ্র বনজ গন্ধ উড়িয়ে এক বিষণ্ণ বিবাগী ভাব এনে দেয়। বিধুর করে তোলে মনকে, যাদের মন আছে। উষ্ণ পাথরের খাঁজ-খোঁজের শিলাজুত, ছায়া-খোঁজা পাখির বুকের আঁশটে-গন্ধ-উষ্ণতা সবই উবে গিয়ে পশ্চিমাকাশের স্নিগ্ধ নীল সন্ধ্যাতারারই মতোএক স্নিগ্ধতায় ভরে ওঠে বন পাহাড়। সেই মুহূর্তে, ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে সবাইকেই। ভালবাসতেও ইচ্ছে করে, যদি তেমন জন কেউ থাকে। পৃথুকে চিরদিনই অবাক করেছে প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর, দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ের এই ভাববদলের ভবন্ত ঋতি। কুর্চির মনেও এই সাংঘাতিক নেশা ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছে। এ নেশায় যাকে একবার পেয়েছে,তার আর রক্ষা নেই। তীব্র-আনন্দে চকচক করা কুর্চির চোখ দুটিও উত্তেজনায় ফুলে ওঠা নাকের পাটার দিকে চেয়ে ভারী ভাল লাগতে থাকে পৃথুর। কুর্চি হয়ত প্রকৃতিকে, প্রকৃতির এই ঋতিকে বোঝে বলেই পৃথুকেও বোঝে।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। ওরা একটু এসেছে নদীর কোল ছেড়ে অমনি ওদের দেখে চমকে গিয়ে একটা ভাল্লুকের গুবলু-গাবলু বাচ্চা স্প্রিং-দেওয়া মস্ত কালো কুমড়োর মতো লাফাতে লাফাতে গড়াতে গড়াতে শুকনো পাতা আর কুটো-কাঁটা ভেঙ্গে ওরা যেদিকে যাবে তার বাঁদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পৃথু বলল, তাড়াতাড়ি পা চালাও কুর্চি। ওর মাও ধারে কাছে থাকতে পারে। থাকলে, ঝামেলা বাধাবে। টর্চও আনিনি সঙ্গে।

পিস্তল ?

সেটা আছে। কিন্তু....

কিন্তু কি ?

পিস্তল দিয়ে মানুষ মারাই সহজ। মানুষই ত হচ্ছে সবচেয়ে কমজোরী, নাজুক প্রাণী। জঙ্গলের জানোয়ারের মোকাবিলা করতে রাইফেল বন্দুকই ভাল।

ভয় পেয়ে কুর্চি পৃথুর পেছনে গিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল। যদি সত্যিই ভাল্লুকী আক্রমণ করে তাহলে অসুবিধায় পড়বে, কুর্চি তার কোমর জড়িয়ে থাকলে। কিন্তু কিছু বলল না পৃথু। খুব ভাল লাগতে লাগল ওর। কেউই ওর উপর এমন করে নির্ভর করেনি আগে। ও যে আদৌ নির্ভরযোগ্য এ কথাও কেউ ওকে বুঝতেও দেয়নি। অন্যে নির্ভর করলে, বোধহয় মানুষ তার নিজের সব ক্ষমতা ছাপিয়ে গিয়ে অতিমানুষও হয়ে উঠতে চায়।

কুর্চির গরম নিঃশ্বাস পড়ছিল ওর পিঠে। দৃঢ় অথচ নরম বুকের ছোঁয়াও অনুভব করছিল। গা সিরসির করছিল, ভাল লাগায়। আওয়াজটা কাছে এসে গেছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবার। আস্তে করে পিস্তলটাকে হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল পৃথু। কিছুক্ষণ আগে থেকেই আওয়াজের রকমটা দেখেই ও বুঝেছিল যে কোনো মানুষ আসছে। ভাল্লুক নয়। মা-ভাল্লুকী এলে এমন গদাইলস্করী চালে আসত না। ঝড়েরই মতো উড়ে আসত। এবং সে যে ভালমানুষের ঝি-এরই মতো জানোয়ার-চলা পথটি ধরেই আক্রমণ করত এমনও নয়।

জেনেও, কুর্চিকে বলেনি কিছু। কুর্চির এই সমর্পণকে উপভোগ করছিল এতক্ষণ। যে নির্ভর করে, তাকে ভীত দেখে এক ধরনের আনন্দও পাওয়া যায় বোধহয়। এখন দেখা যাক, মানুষটি কে? কোনো আদিবাসী চোরা-শিকারী? ডেরার কোনো লোক কি?

বাবা!

কে যেন ডেকে উঠল পিটাস ঝোপের আড়াল থেকে।

টুসু আবার বলল, বাবা।

হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল পৃথুর। গরমের সন্ধের মুখে, এমন গভীর জঙ্গলের মধ্যে জলের পাশে টুসুকে একা কে এমন বে-আক্কেলের মতো পাঠাল? ভাল্লুকের বাচ্চা যখন আছে ভাল্লুক মায়েরও কাছাকাছি থাকা একটুও বিচিত্র নয়। এই জঙ্গলে প্রায় সবরকম জানোয়ারই আছে। এক গণ্ডার আর হাতী ছাড়া।

টুসু এবার বলল, বাবা! তুমি কোথায়? আমি এসেছি।

কুর্চির হাতের বাঁধন, বুকের চাপ আলগা হয়ে এল তার পিঠ থেকে। অনুভব করল পৃথু। টুসু এগিয়ে আসতে লাগল যত, কুর্চি ততই সরে যেতে লাগল।

পৃথু বলল, টুসু।

বলেই এগিয়ে গেল।

টুসু বলল, বাবা।

বাবা এবং ছেলের মিলনের মিলিত ডাক প্রায়ান্ধকার বনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে গেল। ঝোরার স্রোত সেই ডাককে কুড়িয়ে নিয়ে মুখে করে উৎসারে ছুটে গেল উপত্যকার প্রপাতের মাথায় তাকে টুকরো করে ভেঙ্গে নিচের ফেনিল দহে ছড়িয়ে দেবে বলে।

টুসু, পৃথুর একখানি পা, আর কোমর জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। টুসুর মুখটা পৃথুর কোমরের কাছে। পৃথুর মধ্যে পূর্বমুহূর্তে কুর্চির সান্নিধ্যজনিত যে উষ্ণ আনন্দটুকু কাঁপছিল তা মুছে গিয়ে টুসুর প্রতি ওর বুকের মধ্যে দীর্ঘ অদর্শনের দিনগুলিতে জমিয়ে-রাখা পাথরের মতো শক্ত জমাট এক বোধ গলিত উষ্ণ লাভার মতো ছিটকে বাইরে এল। পৃথু বোকার মতো অনুভব করল যে, তার দু চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

কুর্চি পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল।

কুর্চির মুখের ভাব স্পষ্ট দেখা গেল না। তার মুখের অন্ধকার বনের অন্ধকারে মিশে গেল। একটা টিটি পাখি ওদের মাথার উপর পা দুলোতে দুলোতে ঘুরে ঘুরে বার বার ডাকতে লাগল: ডিড ঊ্য ডু ইট? ডিড ঊ্য ডু ইট? ডিড ঊ্য?

এই পাখিগুলোর ইংরিজি নামই এই। ডিড ঊ্য ড্যু ইট।

কুর্চির ইচ্ছে হচ্ছিল পাখিটাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে চেঁচিয়ে বলে ঃ আমি না। আমি না। আমি কিছু করিনি।

কিন্তু পাখি ত মানুষের মনের ভাষা, এমন কি মুখের ভাষাও বোঝে না। তাইই সে ডাকতেই লাগল ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে ঃ

পৃথু, কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, এই যে। টুসুকে তুমি চেনো ? টুসু তুই কি কুর্চিকে চিনিস ?

কুর্চি পাশে দাঁড়িয়ে হাসল।

মনে হল যে হাসল। প্রায়ান্ধকাবে ভাল বোঝা গেল না।

টুসু বলল, হাই আন্টি!

হাই বলা অভ্যেস নেই কুর্চির। অপ্রস্তুত হয়ে গেল অমন সম্ভাষণে।

টুসুকে বলল, এসো। আমার হাত ধবো। তোমার বাবা পড়ে যাবেন তুমি ওঁকে অমন করে জড়িয়ে রাখলে।

রাখব না জড়িয়ে আমি, বাবাকে।

বলেই, টুসু যেন অনিচ্ছাতেই ওব বাবাকে ছেড়ে দিল।

কুর্চি আবার বলল, আমাব হাত ধরো।

লাগবে না কারো হাত। টুসু বলল। আমি বড হয়ে গেছি।

মনে মনে বলল কুর্চি, ছেলেটা বাপকো বেটা।

এবারে ওরা সকলে মিলে এগোল সামনে। পৃথু বলল, ভুচুটা কী রকম বে-আক্কেলে লোক যে তোকে এই সন্ধের সময় গরমের দিনে জলের কাছে পাঠাল ? কত বিপদ হতে পারত ? এক্ষুনি ত একটা ভাল্লুকের বাচ্চা দেখলাম। তাছাড়া সাপ.....

জানো বাবা। আমিও।

কি ?

একটা মস্ত ভাল্লুক দেখলাম। পেছন উপুড় করে মহুয়া গাছে উঠছিল। কেন বাবা ? মহুয়া ত আর নেই।

কোথায় দেখলি ?

আরে। ঐ দ্যাখো। ঐ ত। নেমে পড়ল গাছ থেকে।

আতঙ্কিত কুর্চি আব পৃথু দেখল সত্যিই একটা প্রকাণ্ড ভালুকী মহুয়াতলি থেকে তাদের দিকে তেড়ে আসছে। আর বাচ্চাটা তার কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়ে বিনা-টিকিটে মজা দেখছে।

টুসু আর কুর্চিকে পেছনে ঠেলে পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর আগেই গুলির আওয়াজ হল একটা। শর্ট-ব্যারেলড পিস্তলে আওয়াজ জোর হয়। ভাল্লুকীর কাছাকাছিই এসে পড়ল গুলিটা। ধুলো উড়ে গেল। পাথরের একটি চিলতে কটাং করে উড়ে গেল গুলি খেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে উঁক উঁক উঁক আওয়াজ করে ঘুরে গেল ভাল্লুকী। তারপর বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ল ঝোপ-ঝাড় দাবড়ে। প্রকাণ্ড বড় শ্লথ-বেয়ার।

পৃথু বুঝেছিল গুলিটা গায়ে লাগানোর জন্যে করেনি ভুচু, ভয় পাওয়ানোর জন্যেই করেছিল। গায়ে গুলি লাগলে বিপদ ছিল সকলেরই। গুলির শব্দ করাও বারণ এখানে। কিন্তু না-করেও উপায় ছিলো না। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়েই দেখল ওদের থেকে কিছুটা দূরে সুঁড়ি পথের বাঁকের মুখে একটা উঁচু কালো পাথরেব উপরে ঘোড়ায় চড়ার মতো করে দুদিকে দু পা ঝুলিয়ে বসে আছেন ভুচু বাবু।

এক লাফে নেমে পড়েই পৃথুর জন্যে শালপাতার দোনায় মোড়া পানের প্যাকেট বের করে দিল।

টুসু বলল, ভুচু আংকল ? তুমি কি হনুমান ? কী করে লাফিয়ে নামলে।

ভুচু বলল, হুপ! হুপ! হুপ! দেখলে ত ভালুক বাবাজীকে ?

কুর্চি বলল, ভাল আছেন ?

ভুচু বলল, এই আপনারা সকলে যেমন রেখেছেন।

কথাটাতে খোঁচা ছিল, বুঝল কুর্চি।

ভুচুও ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে লাগল। জিনের শার্টের নিচে বেল্টের সঙ্গে লাগানো হোলস্টারে পিস্তলটা গুঁজে রাখতে রাখতে। তোমার এই খামকা্ হরকৎ ভাল লাগে না ভুচু। যদি সত্যিই চার্জ করত ওটা ?

করলে করত ? আমরা দুজনে ছিলাম। পটাপট্ মেরে শুইয়ে দিতাম।

এরকম রসিকতার কোনো মানে হয় ? সঙ্গে বাচ্চা এবং মেয়েদের নিয়ে ?

লেহ্ লট্‌কা।

লাড্ডুর মতো করে বলল ভুচু। যেন ভাল্লুকটার সঙ্গে কনসাল্ট করে তোমাদের ইনসাল্ট করেছি। আমি কি জানতাম ? তোমাকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যেই টুসুকে পাঠিয়েছিলাম আগে আগে।

কাজটা ভাল করোনি।

আমি ওকে কভার করে ছিলাম ত। নইলে আর ঐ উঁচু পাথরের উপর চড়তে যাব কেন ? আমার নিজের বৌ-ছেলে নেই বলে কি আমি এতই দায়িত্বজ্ঞানহীন ? কী ভাব তুমি বলত আমাকে পৃথুদা ?

আহত গলায় বলল ভুচু।

তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে কুর্চি বলল, লাড্ডুবাবুর খবর কি ?

খুব খারাপ।

কেন ?

ওর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে।

ওমাঃ। সেটাকে খারাপ খবর বলছেন ?

খারাপ নয় ? বিয়ের তারিখ ঠিক হওয়ার মতো খারাপ খবর একজন অসাধারণ পুরুষের জীবনে আর কীইই বা থাকতে পারে ?

পুরুষরা ত সবাইই অসাধারণ ! মেয়েরাই শুধু সাধারণ।

তা কেন ? আপনি অসাধারণ। রুষা বৌদিও অসাধারণ।

পৃথু ওদের এই তর্কে যোগ না দিয়ে বলল, তোর খবর বল টুসু। তোর ইদুরকার আংকল্ তোর সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করেছিল রে ? তোকে মেরেছিল ? বকেছিল ?

নাঃ।

তবে ?

কিছুই করেনি।

তবে ?

কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি ত ?

না। কিন্তু আমার সঙ্গে কথাই বলত না।

কুর্চি চকিতে একবার তাকাল টুসুর দিকে। পৃথুরই ছেলে বটে। কুর্চিরও দরকার এমন একটি ছেলের। এমন কেন ? টুসুর চেয়েও ভাল।

আমার কাছে থাকবি তুই টুসু ?

থাকব বলেই ত এলাম।

তোর স্কুল ?

আমি আর পড়বো না বাবা। স্কুলের পড়া আমার ভাল লাগে না। হিন্দি, ইংরিজি, ম্যাথস্। তুমি আমাকে জঙ্গল, পাখি, ফুল, প্রজাপতি এসব চেনাবে ? বাবা ?

এসব চিনতেও ত পড়াশুনো করতে হয় টুসু।

সেত আমি জানি। ইংরিজিতে আমি পড়তে লিখতে জানিই। তুমি আমাকে ভাল ভাল বই এনে

দেবে। তুমিই আমাকে পড়াবে। আমি বাড়িতেই পড়ব বাবা।

তারপর ? বড় হলে, ডিগ্রি না থাকলে যে চাকরী পাবি না। আমি কি চিরদিন বাঁচব ? তাও ত ল্যাংড়াই হয়ে গেছি এখন।

চাকরী করব না আমি।

খাবি কি ?

কেন ভুচু-আংকলও ত চাকরী করে না। ভুচু আংকলও ত কলেজে যায়নি, স্কুলের ডিগ্রি নেই··

বোঝো এখন।

বলে, হেসে উঠল ভুচু।

বলল, রুষা বৌদি এই জন্যেই বলতেন যে, আমার মতোছোটলোক মোটর মেকানিকদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে। তুমি ত নষ্ট হলেই, আমার দ্বারা, নেক্সট জেনারেশানেরও দফা-রফা ! নাঃ। মিসেস রায়, আমার জন্যে এখানেই একটু জায়গা দেখে দিন ত। আমি চলেই আসব হাটচান্দ্রা থেকে।

তুমি কি ভুচু-আংকল-এর মতো গাড়ির গারাজ করবে ? গাড়ি-টাড়ি সারাবে ?

না। আমি ওয়াইল্ড-লাইফ ফোটোগ্রাফার হবো।

ও, এখনও মাথায় আছে সেটা।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক জার্নালেও আর্টিকেল লিখব। জঙ্গলের মধ্যে একা একা থেকে ডাইরী লিখব। কত কীই ত এখনও আমরা জানি না, না বাবা ?

হুঁ। পৃথু বলল, অন্যমনস্কর মতো।

তারপর বলল, মা কেমন আছে রে টুসু ? আর দিদি ?

ভাল নেই। জানো বাবা, আংকল ইদুরকার না, মাকে চড় মেরেছিল।

মা কিছু বলেননি, আমাকে বলবার জন্যে ?

না। শুধু তোমার চোখের মলমটা দিয়ে দিয়েছে। বললেন, লাগাতে ভুলে যেও না। তুমি খুব ভুলোমনের লোক। না-লাগালে চোখ আবার খারাপ হবে। এই কথাই বলতে বলেছেন শুধু।

অন্যমনস্কর মতো পৃথু বলল, হুঁ! তাইই বলেছে ?

হ্যাঁ।

ডেরাতে পৌঁছেই কুর্চি ভুচুর জন্যে চা এবং টুসুর জন্যে খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গেল।

ভুচু বলল, পাগল হয়েছেন মিসেস রায়। সান-ডাউনের পর চা খেয়ে লিভার নষ্ট করতে রাজী নই আমি। টুসুকেও অনেক খাইয়ে দিয়েছে ঠুঠা আর বিগু। এই জংগলে আর ফর্মালিটি করবেন না। আপনি বরং রাতের জন্যে কিছু বন্দোবস্ত করুন। কাউকে বলুন, আমাদের একটু জল আর দুটো গ্লাস দেবে। রাম্ আমি সঙ্গেই এনেছি। সামনের এই বহেরা গাছটার নিচে চৌপায়া পেতে আমি আর পৃথুদা একটু সুখ-দুঃখের গল্প করি। কাল ত ফিরেই যাব।

পৃথু বলল, টুসু, তুমি আন্টির সঙ্গে গল্প করো। কাল থেকে ত আমি আর তুমি। আমাদের সব কথা হবে তখন।

পৃথু আসলে, কুর্চির সামনে ইদুরকারের রুষাকে চড় মারার কথা টুসু বলে ফেলায় অস্বস্তি বোধ করছিল। কেন যে এমন হয় ? রুষার অপমানে ত পৃথুর খুশিই হবার কথা ছিল। কেন যে দুঃখ পায় কে জানে ? নিজেকে একেবারেই বোঝে না ও।

টুসু ভিতরে গেলে, পৃথু বলল, ভুচু, চিঠিতে তুমি যা করবে বলে লিখেছিলে তা পড়ে খুবই চিন্তা হয়েছিল আমার। কিছু করোনি ত ? আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

তুমি ইদুরকারের কথা বলছ পৃথুদা ?

হ্যাঁ। তুমি লিখেছিলে না, শিক্ষা দেবে ওকে।

না পৃথুদা। দেব ভেবেও কিছুই করিনি। এ কথা শুনে তুমি হয়ত অবাক হবে। কিন্তু কী জানি, বয়স হচ্ছে বলেই হয়ত, বদলে যাচ্ছি। আগে মনে করতাম, আমারই দু হাতে পৃথিবীর সব জোর।

যা-কিছু অন্যায়, অবিচার সবকিছুর প্রতিকার যেন আমাকেই করতে হবে। তোমার চেলাগিরি করেও এই ভুল ধারণাটা জোরদার হয়েছিল। সকলকেই 'শিখলিয়ে' "টাইট" করে দিতে গিয়ে নিজে যা শিখলাম তা অন্য কথা। কেউই বোধহয় কাউকে কিছু শেখাতে পারে না পৃথুদা।

কুচির নির্দেশে মেট মইউদ্দিনের ছেলে আসলাম্ একটি অ্যালুমিনিয়ামের জাগে করে জল আর দুটি গ্লাস নিয়ে এল।

ভুচু উঠে গিয়ে জীপের থেকে রাম-এর বোতলটা নিয়ে এল। তারপর বোতলটা খুলতে খুলতে বলল, তোমার রয়্যাল-কাস্ক পেলাম না। টুয়েল্‌ভ ইয়ার্স ওল্ড মংক।

হলেই হল। বলল, পৃথু। একা ত খাই না। হাটচান্দ্রা ছেড়ে এসে লাভ এইটুকুই হয়েছে যে মদ্যপান প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। তারপরই বলল, রুষা আর কিছু বলেছিল ? সেদিনের পর ?

হ্যাঁ। রুষা বৌদি মাঝেও এসেছিলেন একদিন। অনেকক্ষণ ছিলেন আমার গারাজে। ওমলেট্ আর চা বানিয়ে দিলাম। খুব প্রশংসা করলেন ওম্‌লেটের। মানুষটি কিন্তু ভারী ভাল। ভাল করে মিশে দেখলাম সেদিন। ভুল সকলেরই হয়, হতে পারে পৃথুদা। তোমারও যে ভুল তুমি কি…কি বলতে চাইছ তুমি ?

পৃথু রাম-এ চুমুক দিয়ে বলল।

পৃথুর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, ভুচু মাঝপথে থেমে গেল।

দূর থেকে চিঠিতে এই পৃথু ঘোষ মানুষটাকে যা লেখা যায়, সামনাসামনি তা বলতে ভয় করে। এমনিতে মনে হয় মানুষটা মাটির মানুষ, সকলের সঙ্গেই কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলে কিন্তু হঠাৎ যখন ভিতরের মানুষটা বাইরের খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসে তখন তাকে কিছু বলার মতো সাহস ভুচুরও হয় না।

প্রসঙ্গ বদলে ভুচু বলল, বেশ ভাল জানোয়ার আছে কিন্তু এই সান্দুরের জঙ্গলে।

থাকবেই ত'! ভ্যালী ত। চারদিকে পাহাড় ঘেরা। তাছাড়া, এই সব জঙ্গলের সঙ্গেই ত ন্যাশনাল পার্ক-এর যোগাযোগ আছে। বিড়িপাতার কাজের জন্যে বছরের এ সময়টাতে যা একটু গোলমাল হয়, বাকি সারা বছরই জঙ্গল আনডিস্টার্বড থাকে।

ভুচুর গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভুচু বলল, রুষা বৌদি তোমাকে চিঠি দিয়েছে একটা পৃথুদা।

কোথায় ?

হিপ্ পকেট থেকে একটা খাম বের করল ভুচু।

পৃথু, চৌপাইয়ে শুইয়ে রাখা ক্রাচ্ দুটি তুলে নিয়ে বলল, আমি একটু আসছি ভুচু।

তারপর আস্‌লামকে ডেকে বলল, একটি হ্যারিকেন দিতে। হ্যারিকেন নিয়ে এলে, পৃথু গিয়ে মেট মইউদ্দিনের ঘরের বারান্দার শাল কাঠের তক্তার উপরে বসে খুলল চিঠিটা। ইংরিজিতে লিখেছে।

পৃথু।

আমি ঠিক করেছি, ভুচু ফিরলেই আমাদের বাড়িতে ফিরে আসব। ভুচুর একটু সাহায্যর দরকার হবে আমার।

গিরিশদার এবং শামীমের সঙ্গেও একদিন পথে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। ভেবেছিলাম, চিনবেন না। কিন্তু দুজনেই ভাল ব্যবহার করলেন। একটু অবাকই হয়েছিলাম।

একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে, তুমি যাদের সঙ্গে উঠতে বসতে তাদের সকলের ফর্ম্যাল এডুকেশান বা সামাজিক পদমর্যাদা তেমন না থাকলেও মানুষ তারা কেউই খারাপ নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে তারা প্রত্যেকে সত্যিই খুবই ভালবাসে। আমার ক্লাবের বন্ধুবান্ধব, স্কুলের সহকর্মীরা, মহিলাসমিতির মহিলাদের মধ্যে আমার বন্ধু যে একজনও নেই তা আমি এখন বুঝি। তাছাড়া, তারা সবাইই খোপের পায়রা। তোমাকে ছেড়ে যেতেই তারা আমাকে ত্যাগ শুধু করেছে যে তাইই নয় ; অপমান ও অসম্মানও কম করেনি।

ভিনোদকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলাম। যদিও সেই ভালবাসার অনেকখানিই ছিল

শরীর-নির্ভর। এর জন্যে তুমি আমাকে পুরোপুরি দোষী করলে হয়ত অন্যায় করবে। তোমার কাছে আমার দাম ছিলো না কোনোই। তোমার কাছে তোমার কারখানা, ভুচু, দিগা পাঁড়ে, সাবীর সাহেব, শামীম, গিরিশদারাই সব কিছু ছিল ও ছিলেন।

মানুষের জীবনের প্রকৃতিও হয়ত হাওয়ারই মতো, জলেরই মতো, সীমানা মধ্যবর্তী কোনো এলাকায় শূন্যতার সৃষ্টি হলে স্বাভাবিক নিয়মে পারিপার্শ্ব থেকে সেই শূন্যতা পূরণ করতে ছুটে আসে। আশেপাশের চেনাজানা মানুষও তেমনই আসে ছুটে। আমার শূন্যতা পূর্ণ করতে যেমন এসেছিল ভিনোদ, তোমার শূন্যতা পূর্ণ করতে কুর্চি।

বড়লোক! কিন্তু অত্যন্ত খারাপ চরিত্রের মানুষ এই ভিনোদ। একবাতে মিলির দিকেও হাত বাড়িয়েছিল। মিলি ত খুবই সুন্দরী হয়ে উঠেছে। বড় ত হয়েইছে। যা আমাকে খুবই চিন্তিত করেছে তা হচ্ছে মিলির মধ্যে ভিনোদের প্রতি একধরনের দুর্বলতা। এখন ভাবি, কী জানি, ভিনোদ হয়ত মিলির জন্যেই আমার সঙ্গে অভিনয় করেছিল। মিলির চরিত্রের এই দিকটা হয়ত সে আমার কাছ থেকেই পেয়েছে। সে জন্যে আমি লজ্জিত।

ভিনোদ জোর করছে যে অন্তত বছর দুই যেন তাকে আমি সুযোগ দিই। বলছে, সে মানুষটা খারাপ নয়, একটু বদরাগী, ওইই নাকি ওর দোষ। আমাকে চড় মেরে তারপর আমার পায়ে পড়ে অনেক ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু আমার মন বলছে ওর মনে অন্য কোনো মতলব আছে। যে মানুষ তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে টাকার জন্যে তাকে বিশ্বাস করি কি করে? ভুচুকে আমি কিন্তু এই চড় মারার কথা জানাইনি। ও নিজেই বুঝতে পেরেছিল। ছেলেটির খুব সেনসিটিভ একটি মন আছে।

আমি যে চলে যাব এ কথা ঘুণাক্ষরেও জানাইনি ভিনোদকে। হঠাৎই ব্যাপারটা ঘটাতে হবে। তার জন্যে ভুচু এবং গিরিশদাদের সাহায্যর দরকার হতে পারে যে, এ কথা আগেই বলেছি।

তুমি ভাবতে পারো, তোমাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে গিয়ে এখন বিপদে পড়ে এত কথা তোমাকেই বা জানাচ্ছি কেন?

ভয় নেই তোমার কোনো। তোমার ও কুর্চির জীবনে আমি কোনোরকম বাধাই হবো না। আমরা দুজনেই জুয়া খেলেছিলাম জীবন নিয়ে। তুমি জিতেছো। আমি হেরে গেছি। তুমি হয়ত মানুষটাও আমার চেয়ে ভাল বলেই জিতেছো। সে যাইই হোক, আমিও এমন চরিত্রের মানুষ নই যে, জুয়াতে হেরে গিয়ে যা বাজী ধরেছিলাম তা ফিরে চাইব। তোমার জীবনে আমার আর কোনো দাবীই থাকবে না। তবে, একসময়ের সাথী হিসেবে, আমার ছেলেমেয়ের বাবা হিসেবে একধরনের সম্পর্ক থাকবেই বাকি জীবন। তাকে ঠিক "সম্পর্ক" বলা যায় কি না জানি না। কিন্তু সম্পর্ক ত বটেই! যত ঢিলেই হোক না কেন তার বাঁধন! প্রেমের সম্পর্ক তোমার সঙ্গে হয়ত আর হবে না এত কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। তবু, যেখানে প্রেমের সম্পর্ক থাকে না সেখানেও যে শুধুমাত্র বৈরিতার সম্পর্কই রাখতে হবে, এইই বা কেমন কথা? প্রেম আর বৈরিতার মাঝেওত সম্পর্কের আরো নানা স্তর আছে! আমার ও তোমার সম্পর্ক সেই রকমই কোনো স্তরে এসে থেমে থাকবে। অন্তঃসলিলা নদীরই মত, বাইরে থেকে হয়ত বোঝাও যাবে না যে কোনোরকম সম্পর্ক আছে কিন্তু নিভৃতে দুজনের চারহাতে বালি খুঁড়লে দেখা যাবে হয়ত আপাত উত্তপ্ততার গভীরে তখনও অনেকই আর্দ্রতা আছে।

যাকগে এসব কথা। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে।

পৃথু, আমার খুব ভয় করছে। যতদিন না ও বাড়িতে ফিরে যেতে পারছি ততদিন প্রতি মুহূর্ত ভয়ে ভয়ে থাকি আমি।

এসব কথা তোমার দয়া চাওয়ার জন্যে লিখছি না। দয়া, আমি কারো কাছেই চাই না। মিলি টুসুর বাবা তুমি, তাইই সব কথা তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য। আমার যা কিছুই হোক না কেন, তার জন্যে আমিই দায়ী। আমার অপরাধে ওদের শাস্তি কেন হবে? শাস্তি হলে, আমি তোমার কাছেই বা মুখ দেখাব কেমন করে?

আজ এখানেই শেষ করি। কুর্চির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, শুনেছি ভুচুর কাছে। জানি না,

তোমাদের সম্পর্কটা কেমন। যেমনই হোক, তা নিয়ে আজ আমার কোনো অনুযোগ বা অভিযোগের কারণ আর নেই। আমার আত্মসম্মানের কারণেও তোমাদের সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে আমি আদৌ উদগ্রীব নই। এইই প্রার্থনা করি যে, তুমি সুখী হও। আমাকে নিয়ে হতে পারলে না, তবু জীবনের বাকি এখনও তো অনেকই আছে! বাকি জীবন তোমার নিজের মতো করে সুখী হও। একটাই জীবন। সকলেরই নিজের নিজের মতো করে সুখী হওয়ার অধিকার আছে। যে না হতে পারল, সে অভাগা।

আমিও সুখী হবো। সব মেয়েরাই ভাবে, তাদের সুখের জন্যে একজন পুরুষের সঙ্গে ঘরবাঁধাটা ভীষণই জরুরী! এ সব গত প্রজন্মর কথা। আগামী প্রজন্মর মেয়েরা গিরিশদার মতো, ভুচুর মতো, একা এবং স্বালম্বী হয়েই তাদের একক জীবনে চমৎকার সুখী হবে। শরীরের এবং অর্থর প্রয়োজন মেটাতে সারাটা জীবন পছন্দ না হলেও, বনিবনা না হলেও একই পুরুষের পদবীর বোঝা কাঁধে নিয়ে ভারবাহী পশুর মতো জীবন তারা আর কাটাবে না। তাছাড়া, শারীরিক সুখকে ত দেখলামই! নানারকম ভাবেই। একজন মানুষের পক্ষে সুখী হতে হলে, হয়ত মনের সুখটা যতখানি দরকার শরীরের সুখ তার ছিটেফোঁটাও দরকার নয়। মনের সুখের সঙ্গে শরীরের সুখ মিললেই ভাল। নইলে, শরীরের সুখের দামই বা কি? বিদেশে ত এই ন্যূনতম সুখের জন্যে নানারকম যন্ত্রই পাওয়া যায়। হয়ত এদেশেও যাবে, ভবিষ্যতে। মন ছাড়া ত মানুষ হয় না। মন না মিললে মিলন ব্যাপারটাই একটা মিস্‌নমার। অথবা, জানি না, আমি এখনও সঠিক কিছু বুঝি বলে এসব ব্যাপারের। শবীর সর্বস্ব ভিনোদকে এবং মন-সর্বস্ব তোমাকে দেখে আমি টোটালি কনফিউজড্ হয়ে আছি এই মুহূর্তে।

চিঠিটা অনেকই বড় হয়ে গেল। কথাগুলোও বড় এলোমেলোভাবে আগে পরে মনে আসে আজকাল। চিঠিটা লেখা দরকাব ছিল আমার বিপদের কথা জানানোব প্রয়োজন ছাড়াও অন্য একটা কথা বলতে। কুর্চি যদি তোমাকে সুখী কবতে পারে কোনোদিন তাহলে আমি সুখীই হবো। সত্যিই বলছি। আমি ত হেরে গেছিই। যে হারে, সে হারেই। প্রতিপক্ষ কত ভাল অথবা কত খারাপ, হেরে যাবার পব তা নিয়ে আলোচনা করা আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষকে একেবারেই মানায় না। নাথিং ফেইলস লাইক ফেইলিওর!

ভাল থেকো। বেশি মদ খেও না। আমি একদমই ছেড়ে দিয়েছি। প্রায় অ্যালকহলিকই হয়ে গেছিলাম। যে সব মানুষ দুঃখ ভোলাব দোহাই দিয়ে মদ খায় তারা মানুষই নয়। মানুষ হিসেবে তুমি আমাব চেনাজানা অনেক মানুষের চেয়েই বড়। দেরী করে বুঝলেও, তা বুঝি। এবার লেখালেখি শুরু কবো। জীবনে যা হতে চেয়েছিলে তাইই হও। এখনও বাকি আছে অনেকই সময়। নতুনভাবে তোমার নতুন রুষা-হীন, বাধাবন্ধহীন জীবন আরম্ভ করার সময় এসেছে। আমার সমস্ত শুভেচ্ছা রইল তোমার প্রতি।

ইয়োরস রুষা



চিঠিটা খামে ভরে ভুচুর কাছে ফিরে এল পৃথু। ভুচু ততক্ষণে দুটো বড় খেয়ে ফেলেছে। একটু তাড়াতাড়িই খেয়েছে।

বলল, কত বড় চিঠি? এতক্ষণ লাগল পড়তে?

অনেক বড়।

বলেই পৃথু চিঠিটা এগিয়ে দিল ভুচুর দিকে।

এ কী?

পরে, পড়ে নিও।

তোমার চিঠি আমি পড়ব কেন? পার্সোনাল ব্যাপার।

আমার আর রুষার সম্পর্কতে কোনো গোপনীয়তা আর রাখার দরকার আমার কাছে অন্তত নেই।

ওখানেই বসে ভুচু চিঠিটা খুলে ফেলল খাম থেকে। পৃথু আসলামকে হ্যারিকেনটা নিয়ে আসতে বলল।

চিঠি পড়তে লাগল ভুচু। আর পৃথু অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে ঝোরাটার দিকে চেয়ে রইল।

ঝিঁঝির ডাক এখন ঝোরার আওয়াজকেও ডুবিয়ে দিয়েছে। এই ঝিঁঝিগুলো মস্ত বড় বড়। এদের নাম ঠিক জানে না। তবে, গরমের সময়ই এদের দেখা যায়। দিনের বেলাতেও কোনো কোনো জায়গাতে এদের ডাকে সমস্ত জঙ্গল পাহাড় একেবারে ঝম্‌ঝম্ করতে থাকে।

টুসু আর কুর্চি কী এত গল্প করছে রান্নাঘরে কে জানে? রান্নাঘর থেকে ওদের দুজনের গলার আওয়াজ ঝোরার এবং ঝিঁঝির আওয়াজকেও ছাপিয়ে আসছে।

বেচারী টুসু! যখন মায়ের সঙ্গে অন্য বাড়িতে থাকতে গেছিল তখন মাকে একা পায়নি। ভিনোদ ইদুরকার সঙ্গে ছিল। বাবাকে একা পাবে বলে এসে এখন কুর্চির সঙ্গেই বসে রয়েছে। কালকে থেকে অবশ্য একাই পাবে তাকে। কুর্চির কাছে পৃথু যাবে অথবা কুর্চি আসবে কখনও সখনও বেড়াতে। টুসুর দাবী তার উপরে কুর্চির দাবীর চেয়েও অনেক বেশি।

চিঠি পড়া শেষ করে ভুচু বলল। যাঃ বাবা! এ ত চিন্তার কথা। এমন জানলে ত আমি আসতামই না এখানে। টুসুকে পাঠিয়ে দিতাম অন্য কাউকে দিয়ে।

পৃথু কিছু বলার আগেই ও বলল, কটা বাজে এখন?

আটটা।

ভুচু মনে মনে হিসেব করল কী যেন, খুব দ্রুত।

পৃথু ভাবল, সীওনী থেকে ফোন করবার কথা ভাবছে বোধ হয় কাউকে। হয়ত গিরিশদা অথবা শামীমকেই।

পরমুহূর্তেই জোরে জোরে ভাবতে লাগল ভুচু। সান্দুর থেকে সীওনী এক ঘন্টা। এবং তারপর ঘন্টা ছয়েক। সাত থেকে আট ঘন্টা। ভোরের আগেই পৌঁছে যাব।

বলেই, বলল, পৃথুদা, বৌদি যেমন ভাবে লিখেছেন তাতে আমার এখানে থাকাটা ঠিক হবে না। তোমাদের ত জীপ আছে। কাল ত তোমরা ফিরেই যাচ্ছো। আমি এগোচ্ছি।

আমার করণীয় নেই কিছুই। ওরা ত আমাকে জিগেস করে ইদুরকারের বাড়ি থাকতে যায়নি। তোমাদের ব্যাপার।

ইদুবকারের বড্ডই বাড় বেড়েছে। একটু শিখলানো দবকাব ওকে।

একটু আগেই না বলছিলে অন্য কথা, কেউই কাউকে "শিখলাতে" পারে না কিছু।

বলেছিলাম। কিন্তু নিজের জন্যে ত করছি না। এত পরেরই জন্যে। তুমি আমার কে ?

পৃথু বলল, ভুচু, শামীম আমার যা, আমিও তোমাব ঠিক তাইই ! আসলে, জড়িয়ে যে পড়াব ; সে পড়েই। আর এড়িয়ে যাবার যাবা, তারা এড়িয়েই যায়। তবে, এই রাতে এই রকম দুর্গম পথে একেবারে একা এতখানি যাবে ? আমার ভাল লাগছে না ভুচু।

হাঃ। পৃথুদা ! তুমিও কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছো নাকি ? রাতের পর রাত আমরা ডিসেম্বর জানুয়াবীতেও কি জীপ চালিয়ে যাইনি ? মনে হয়েছে, নাকগুলো সব ঠাণ্ডায় খসেই যাবে আমাদের। আব এখন ত গরম ! দিব্যি হাওয়া খেতে খেতে চলে যাব। রাতে এ পথে ট্রাফিকও কম।

এতই বেশি কম যে, সেটাই ভয়ের কথা।

ভুচু চৌপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কাল ভোরেই গেলে পাবতে। এক রাতে কীই বা এমন হবে ?

বল কী ! এক বাতে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পাবে।

পৃথু ভাবছিল, তা অবশ্য ঠিক। যেমন ঘটেছিল কিবুরু বাংলোতে।

মুখে বলল, রুষা নিশ্চয়ই গিরিশদাকে জানাবে, তেমন দরকার পড়লে।

ভুচু অবাক-হওয়া গলায় বলল, তোমার কথায় মনে হচ্ছে— রুষা বৌদি তোমার কেউই নয় !

নয়ই ত। একদিন ছিল। আজ আর কেউই নয় ভুচু।

আর মিলি ?

হ্যাঁ। মিলি আমার মেয়ে।

ভুচুকে এ কথা বলতে গিয়েও বলল না যে, মিলি চিঠি লিখেছিল পৃথুকে : "তুমি আমাদেব সঙ্গে থাকলে আমাদের অশান্তি হয়।" মিলিকে অথবা রুষাকে ভাল সে কিছু কম বাসতো না। কিন্তু এই মুহূর্তে রুষা বা মিলির বিপদকে ও ব্যক্তিগত বিপদ বলে মনে করতে পারছে না চেষ্টা করেও। খুবই খারাপ হয়ে গেছে হয়ত পৃথু। এত উদাসীনতা এবং কাঠিন্য যে কী করে এল ওর ভেতরে ? সে যে চিরদিনের নরম মানুষ ! কী করে এল তা, ও নিজেই জানে না। জীবনই বোধ হয় মানুষকে বদলে দেয়। জবলপুরের হাসপাতাল থেকে অসহায় হয়ে ফিরে দূর থেকে বাড়িতে আলো না-জ্বলতে দেখে, বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ দেখে তার বুকের মধ্যে যে নীরব কিন্তু হৃদয়-ভাঙা হাহাকার উঠেছিল সেই তীব্র অপমানের বোধ এ জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না। সেই শূন্যতাকে ধীরে ধীরে পূর্ণ করে নিয়েছে ও। জংলী জানোয়ারের ক্ষতেরই মতো নিজের বুকের ক্ষত আপনা আপনিই শুকিয়ে গেছে। আজকে রুষা বা মিলির প্রতি কোনো বিশেষ বোধ আর নেই পৃথুর। শক্ত হবার, নিষ্ঠুর হবার, স্বার্থপর হবার সময়, নিজের দিকে চাইবার সময় সব মানুষের জীবনেই আসে। স্বেচ্ছায় ত বদলায়নি। ওকে বদলে দেওয়া হয়েছে।

এই পৃথুকে, পৃথু ঘোষ নিজেও চিনতো না আগে।

চলি, পৃথুদা।

ভুচু বলল, হঠাৎ।

চমক ভেঙে পৃথু বলল, সে কি ? খেয়ে যাও। এখন ত পথে কোথাও খাবার পাবেও না। পেলেও সেই দেরীই ত হবে। দেরীটা, এখানেই না হয় হোক।

না। জীপকেও ত একটু রেস্ট দিতে হবে। গরমের দিন। একটানা আট-ন-ঘণ্টা চালানো যাবে না। পথে ধাবা ত পাবোই দু তিন জায়গাতে। কোথাও খেয়ে নেবো এখন।

বলেই ও জীপের স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসল।

এ কী ! কুর্চিকে আর টুসুকে বলেও যাবে না ?
নাঃ পৃথুদা। রুষা বৌদির চিঠিটা পড়ে আমার মন খাবাপ হয়ে গেছে। আমি চললাম।
রাম-এব বোতলটা ?
তুমি খাও। তোমার জন্যেই এনেছি।
আমি আজকাল খাই না বেশি। আরও একটা ঢেলে নিচ্ছি। এই বোতলটা তুমি নিয়ে যাও ভুচু।
বলেই, নিজেব গ্লাসে একটা ঢেলে বোতলটা ভুচুকে দিল। বলল, ড্রাইভ কবতে কবতে না-খাওয়াই ভাল। সাবধানে যেও। একা যাচ্ছ এতটা পথ !
পৃথুর কথার উত্তব না দিয়ে পৃথুব মুখে এক ঝলক তাকিয়ে এক ঝটকায স্টার্ট কবল ও জীপটাকে। তারপব বোধ হয পৃথুকে দেখানোব জন্যেই বোতলটা ঠোঁটেব সামনে ধবে ঢকঢক কবে নীট্ বাম খেলো অনেকখানি। জিনস-এব শার্টেব হাতায ঠোঁট মুছে হঠাৎ বলল, তুমি, অনেকই বদলে গেছো পৃথুদা !
উত্তবে পৃথু কিছু বলার আগেই আবও কী যেন বলল ভুচু। শুনতে পেলো না পৃথু। কথাগুলো রেভড-আপ ইঞ্জিনের শব্দে ডুবে গেল। এক ঝাঁকুনিতে জীপটা যুদ্ধেব ঘোড়াব মতোই ছুটে গেল অন্ধকার জঙ্গলের অসমান পথে। পরক্ষণেই টেইল-লাইটেব লাল আলো দুটো কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রকাণ্ড জানোযাবেব দু চোখেরমতো জ্বলতে জ্বলতে পাহাড় চড়তে লাগল। ফাবস্ট গীযাবেব গোঁ গোঁ শব্দে। পেট্রোলেব গন্ধে বাত ভবে গেল।
অত জোরে হঠাৎ-যাওয়া জীপের শব্দে টুসু ও কুর্চি ভেতব থেকে দৌড়ে এল। কুর্চি বলল, ও কি ? কোথায় গেলেন ভুচুবাবু ? না খেয়ে ?
ওর তাড়া ছিল।
পৃথু বলল।
অবাক হয়ে কুর্চি বলল, তাড়া ?
হ্যাঁ।
এখুনি হাটচান্দ্রাতে ফিরে যাবেন ? এই বাতে ? ঐ সাংঘাতিক বাস্তা দিয়ে একদম একা একা ? কিছুক্ষণ আগেই ত এসে পৌছলেন!
হ্যাঁ।
পৃথু বলল, অন্যমনস্কব মতো।
আপনি মানা কবলেন না ?
মানা, শুনলো না। সত্যিই ওর তাড়া ছিল।
পৃথু ভাবছিল, সাংঘাতিক রাস্তা দিয়ে একদম একা একাই যেতে হয় সকলকে। কেউ ভুচুর মতো জেনেশুনে যায়, আব কেউ রুষার মতো, কুর্চির মতো, অথবা হযত পৃথুরই মতো, না জেনে যায়। পথ না পেরুলে ত গন্তব্যে পৌঁছনো যায় না। জীবনেব কোনো গন্তব্যেই।
মুসুর ডালের খিচুড়ি রেঁধেছিল কুর্চি। মধ্যে পেঁয়াজ, আলু, কাঁচা লঙ্কা সব আস্ত ফেলে দিয়েছিল। সঙ্গে সান্দুর বস্তীর খাঁটি ঘি। আলু দিয়ে, সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ ও লঙ্কা কুচিয়ে ভাত্তাও বানিয়ে ছিল। গরম গরম খেল ওরা তিন জনে একসঙ্গে বসে। উপাদেয় লাগল পৃথুর। সাহেবী খাওয়া খেয়ে অভ্যস্ত টুসু দু বার চেয়ে নিয়ে চেটেপুটে খেল।
পৃথু মনে মনে বলল, খা। খা। বাঙালীর ছেলে, বাঙালীরমতো হাপুস হুপুস করে বাঙালী খাওয়া খারে বেটা !
ভাল খেলে টুসু ? বাড়িতে তোমরা কত ভাল ভাল জিনিস খাও। তুমি যে এই খিচুড়ি খেতে পারবে তা ভাবিনি। ঝাল লাগেনি ত ? রুষা বৌদিও কি এমন করেই রাঁধেন ?
মা ?
অবাক চোখে ও একবার ওর বাবার দিকে আর একবার অ্যালুমিনিয়মের থালার খিচুড়ির দিকে তাকাল।

তারপর বলল, মা কখনও রান্না করেন না। রান্না ত লছমার সিং... । বলেই থেমে গেল।

ওর গলায় কোনো অভিযোগ ছিল না। মা নিজে হাতে রান্না করবে এ কথা কেউ ভাবতে পারে যে, এটা ওর কাছে অসীম বিস্ময়ের ব্যাপার!

পৃথু মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

রুষার নিন্দা মনে মনে নিশ্চয়ই করা যায়। হয়ত ছেলেমেয়ের সঙ্গেও করা যায় তাদের মায়ের সম্বন্ধে আলোচনা। কিন্তু কুর্চিকে বলতে বাধল যে,দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে রুষা কোনো দিনও একটি পদও রান্না করে খাওয়ায়নি পৃথুকে বা ছেলেমেয়েদেরও। আদৌ করলে, কী করতে পারে বা কেমন করতে পারে সেই প্রসঙ্গ উঠতে পারত। সংসার ও চালিয়েছে উঁচুদরের ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট-এর মতো, কিন্তু মজদুর হতে আপত্তি ছিল গোড়া থেকেই।

খাওয়া দাওয়ার পর বহেড়া গাছের নিচের চৌপাইতে বসে ওরা একটু গল্পসল্প করল। কুর্চির সঙ্গে টুসুর বেশ ভাব হয়ে গেছে। কুর্চির অনুরোধে টুসু বয়-স্কাউটের একটি গানও গেয়ে শোনাল কুর্চিকে। বেশ সুরে বলে গলা। টুসু যে গান গাইতে পারে তা জানতই না পৃথু।

কুর্চি বলল, মিলি গায়? গান?

টুসু বলল, চোখ বড় বড় করে, গায় না? বনি এম, রোলিং স্টোনস্, দ্যা পোলিস, অ্যাব্বা! অ্যাব্বা এখন ব্যাক ডেটেড হয়ে গেছে। এই সবই গায়। দারুণ গলা দিদির।

এসব কি গান?

কুর্চি বোকার মতো শুধোলো। পৃথু কৌতুকের চোখে চেয়ে রইল ছেলের মুখের দিকে।

ও গড! এগুলো সব ডিফারেন্ট গ্রুপস-এর নাম। শোনোনি তোমরা কখনও! আমি ক্যাসেট নিয়ে এসেছি। শোনাব তোমাদের কাল।

মিলি রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় না? অতুলপ্রসাদ?

ওগুলো কি গান? শুনিনি ত কখনও? ফানি!

কুর্চি আর টুসু দুজনে এক ঘরে শুয়েছিল। পৃথু, পাশের ঘরে। দু ঘরের মধ্যে অবশ্য দরজা ছিলো না কোনো।

বেচারী কুর্চি। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যের পর্ণকুটিরের এই শেষ রাত। বেচারী টুসু! একা বাবার সঙ্গে প্রথম রাত। এই ক'রাত কুর্চিকে দেখে মনে হয়েছিল যে, ওর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। অফ্ ওল পার্সনস্ কুর্চির মতো মেয়ের মধ্যে যে এমন একজন শরীরবিলাসী ছিল এত বছর ওকে জেনেও একটুও বুঝতে পারেনি।

বাইরে একটা হ্যারিকেন ঝোলানো থাকে রাতে। এই ডেরাতে অন্য কোনো লোক শোয়না যদিও, কাছাকাছিই আরো ডেরা আছে। পিস্তলটা খুলে মাথার বালিসের নিচে রেখে শুয়েছে এ কদিন রোজই শোওয়ার সময়। সারা রাত যত জানোয়ার আর পাখি ডেকেছে সবই চিনিয়ে দিতে হয়েছে কুর্চিকে। কৌতূহলের সীমা নেই ওর। একদিন ওরা দুজনেই হয়ত অ্যাডামসনস্‌দের মতো বা ডগলাস-হ্যামিলটনদের মতো বনের মধ্যেই বাস করে বনের পশুদের সম্বন্ধে জানবে শুনবে। লাইফ ইজ ভেরী ইয়াং। এখনও অনেক কিছু করা যেতে পারে এই ক্ষত বিক্ষত অঙ্গহৃত জীবনখানি নিয়েও।

মাঝরাতে একবার বাইরে গেছিল পৃথু। টর্চ নিয়ে। পত্রহীন জঙ্গলে মোড়া পাহাড়ের মাথার উপর কালপুরুষ তরোয়াল কাঁধে নিশি জাগছেন। ঝোরার আওয়াজটা রাত যত গভীর হয় ততই জোর হয়। সান্দুর বস্তীতে কোনো সাড়া শব্দ ছিলো না তখন। একটি ডেরা থেকে একজন বুড়ো কুলী খক্‌খক্ করে কেসে উঠল দু বার। হায়না ডাকল পাহাড়ের উপর থেকে হাঃ হাঃ হাঃ করে। কে জানে ঐ বুক-কাঁপানো ডাকে টুসু ভয় পেয়ে জেগে গেল কি না।

তারাদের অবস্থান দেখে অনুমান করল রাত তখন দুটো হবে। ভুচু নিশ্চয়ই এখন টিকিয়া উড়ান জীপ চালিয়ে যাচ্ছে গভীর রাতে গা-ছম্-ছম্ পাহাড়-বনের মধ্যে নির্জন পথকে হেডলাইটের আলোর বন্যায় ভাসিয়ে আর টায়ারে হুস্ হুস্ শব্দ তুলে। ওর ক্যাসেট প্লেয়ারে কি এখন ওর প্রিয়

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে ? "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, সেই যে আমাব নানারঙেব দিনগুলি।" এখনও কি স্টীয়ারিং-এ বসে রাম্ এব বোতল থেকে রাম খাচ্ছে ও ? সঙ্গে আরও কি ছিল বোতল ? কাজটা ভাল কবছে না। যখন তখন অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

ভুচু বলছিল যে, পৃথু অনেক বদলে গেছে। কে জানে, হয়ত গেছে। বদলানোই ত স্বাভাবিক। না-বদলানো মানেই থেমে-থাকা। ভুচু জানে না এখনও যে ভুচু নিজেও বদলাবে। অথবা, বদলে কি গেছেই ?

বড় তাড়া করল ভুচু যাবাব সময। অত তাড়ার কিছু কি ছিল ? মনে হচ্ছিল ভুচুব ভিনোদ ইদুরকারের সঙ্গে মোকাবিলা কবাব ঐ তাডাকে অন্য কোনো গভীর তাড়াতেই তাড়া করে নিয়ে গেল। কোন তাডা সে ? তাবাভবা বোবা রাত চুপ করে চেয়ে রইল পৃথুর মুখে।

ঝোরার জলের শব্দেব সঙ্গে বহুদূবেব বাতেব পথ দিযে উড়ে-যাওযা ভুচুর জীপের শব্দ মিলে গেল।

ছেলেটা বড় ভাল।

পৃথু বলল, ক্রাচ দুটো পাশে নামিয়ে বেখে শুতে শুতে। ভাল হোক। ওর ভাল হোক।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল কুর্চি আর টুসুর গলাব স্বরে। কুর্চি বলছে, ওমাঃ ওটা কি পাখি জানো টুসু ? কী সুন্দব লালটুকটুকে, না ?

কোথায় দেখছ তুমি পাখি ? কুর্চি মাসী ? টুসুর মেয়েলি গলা শোনা গেল। বয়স, এখনও ওর গলার স্বরে পুরুষালিভাব আসেনি।

ঐ যে ! ঝোরোটাব পাশেব বুনো আমগাছটাব মগডালে। দেখতে পাচ্ছো না ?

কই ?

ঐ ত !

হ্যাঁ। হ্যাঁ। এবাবে দেখেছি। ওমা ! ওটা ত স্কার্লেট-মিনিভেট। তাও জানো না ?

আমি কিছু জানি না রে টুসু। আমাকে তুমি সব পাখি চেনাবে ত ?

সব ত চিনি না আমি। সব চিনতে হলে বাবাকে বলতে হবে ! আমি অল্প অল্প চিনি। তোমার কাছে সালিম আলির বই নেই ?

সালিম আলি কে ?

ওঃ গশ ! হতাশ গলায় বলল টুসু। সালিম আলি যে কে, তাও তুমি জানো না ? তোমাকে নিয়ে আমার ট্রেমেনডাস্ ডিফিকাল্টী হবে। হাওযেভার, চেষ্টা থাকলে আস্তে আস্তে শিখে যাবে। ভয় পেও না।

ওদের ম্যাথস্-এর আন্টি টুসুকে ঠিক যে ভাবে বলেন, সেই ডায়ালগ, সেই ইন্‌টোনেশানেই টুসু তার এক এবং একমাত্র ছাত্রীর উপর ঝেড়ে দিল।

মজা লাগছিল পৃথুর। প্রত্যেক শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে এমন ভেবে খুশি হয়। আর বয়সের একঘেয়ে ভারে ন্যুব্জ হলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই শিশু হতে চায় মাঝে মাঝে।

ওটা কি পাখি...টুসু ? ঐ যে। ঝোপের ধারে নড়ছে চড়ছে ? হলুদ হলুদ চোখ। অনেকগুলো একসঙ্গে। কী রকম থপ্‌থপিয়ে চলছে দ্যাখো।

ওগুলো ? আগে দেখোনি ?

তা দেখেছি। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। পথের উপরেও দেখেছি কখনও কখনও।

ওগুলো ত ব্যাব্‌লার। ঐ হলুদ চোখের জন্যেই ওদের নাম ইয়ালো-আইড ব্যাব্‌লার। দল বেঁধে থাকে। সব সময় কথা বলে। ভীষণ টকেটিভ ওরা।

ঐ দ্যাখো। ঐ লম্বা ল্যাজ ঝোলা রূপোলি গায়ের কালো মাথা একটা পাখি। বাঁশের বনে বসে আছে। মাথাটা ঠিক কালোও নয়, কেমন বন্দুকের নলের মতো কালো রঙ। ওটার নাম কি জানো টুসু ?

দেখি, দেখি। বলে, টুসু একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বলল, ওঃ। ওটা বিখ্যাত পাখি।

ওদের বলে প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার। পোকা খায় কপাৎ কপাৎ করে উড়ে উড়ে। ফড়িং-টড়িং যা পায় তাইই খায়।

প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের নাম শুনে তাড়াতাড়ি বাইরে এল পৃথুও। বলল, কোথায় রে টুসু? কোথায় দেখলি?

ঐ ত! দেখেছো বাবা?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। আশ্চর্য ত! আগে তুই কোথায় দেখেছিস এ পাখি? হাটচান্দ্রাতে? না রাত মোহানার কাছে?

না বাবা। আগে দেখিনি। তবে বইয়ে ছবি দেখেছি।

এই পাখি এদিকে আমিও দেখিনি। অথচ দেখা উচিত ছিল। কানহার জঙ্গলে অবশ্য দেখেছি।

টুসু ঝোরার দিকে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল প্যারাডাইস ফ্লাই-ক্যাচার ভাল করে দেখবে বলে।

কুর্চি বলল, টুসু ত দেখছি রীতিমত পাখি-বিশারদ।

হ্যাঁ। ওদের জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা আমাদের মতো ভাসাভাসা জ্ঞানে বিশ্বাস করে না। টুসু একাই নয়। ওরা সকলেই অন্যরকম। আমরা পাখিকে পাখি বলেই খুশি ছিলাম। ওরা সব জিনিসেরই গভীরে গিয়ে সবকিছু জানতে চায়। ওদের আই-কিউও আমাদের চেয়ে অনেকই বেশি। আমার খুব ভাল লাগে ওদের এই জন্যে। ওরা অনেককিছুই জানে তা নয়। তবে, যেটুকু জানে, সেটুকু ভাল করে জানতে চায়। ফাঁকি ব্যাপারটা কম ওদের মধ্যেও। ওদের মনও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞান ও তথ্য-বিশ্বাসী।

টুসু ফিরে এলেই কুর্চি বলল, আমি তাহলে নাস্তার বন্দোবস্ত কবি গিয়ে।

তুমি নিজেই রান্না করো? কুর্চি মাসী? রোজ রোজ?

হ্যাঁ। আমি গরীব লোক। বেয়ারা বাবুর্চি কোথায় পাব বলো?

ডিম কিন্তু আমি স্ক্র্যাম্বলড্ খাবো। বেকন থাকলে বেকন, নইলে হ্যাম্।

ডিম ত নেই বাবা এখানে।

তবে? কি হবে ব্রেকফাস্টে? ডিম ছাড়া, পরিজ বা কর্নফ্লেকস্ ছাড়া কি ব্রেকফাস্ট হয়?

দ্যাখোই না আমি তোমার জন্যে কেমন মুচমুচে পরোটা আব ঝালঝাল আলুর তরকারি বানিয়ে দিচ্ছি। দ্যাখো খেয়ে। সান্দুর বস্তীর আহীর এখুনি আসবে দুধ নিয়ে। দুধ জ্বাল দিয়ে দেব তোমাকে। আমি আর তোমার বাবা চা খাব।

বেশি ঝাল দিও না কুর্চি মাসী। ঝাল খেলে লিভার খারাপ হয়। পেটে আল্‌সার হয়।

সে শুকনো লংকা খেলে হয়। কাঁচা লংকা কালো জিরে দিয়ে রাঁধব আমি। ইচ্ছে না করলে লংকা খেও না। লঙ্কার গন্ধ দিয়ে খেও। তোমার বাবা ঝাল খেতে ভালবাসেন। কাঁচা লঙ্কায় ভিটামিন আছে।

আমরা সকালে কডলিভার অয়েলের ক্যাপ্‌সুলস্ আর গার্লিক পার্ল খাই একটা করে। মা রোজ মাল্‌টিভিটামিন ট্যাবলেটস্ খায়।

ওষুধ, অসুখ-বিসুখ না হলে খাওয়া বোধ হয় ঠিক নয়। খাবে, এক্সারসাইজ করে হজম করবে আর বেশি করে জল খাবে। দেখবে, গায়ে কত জোর হবে।

বাঁচা গেছে! ওষুধ-ফষুধ খেতে আমার একদমই ভালো লাগে না।



ইদুরকার ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে টাই বাঁধছিল। আজ জবলপুরে যাবে ও। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে মীটিং আছে নাকি ক্লাবে।

বেড-রুমের মধ্যের সোফায় বসে রুষা চেয়েছিল ওর দিকে।

টাইটা পরে, ওয়াড্রোব খুলে কোটটা বের করে পরল ইদুরকাব।

বলল, তোমার জন্যে কিছু কি আনব জবলপুর থেকে ? হানি ?

না।

আমি কিন্তু মিলিকে নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে। আজ ত স্কুল ছুটি। রবিবাব।

মিলি ? কোথায় যাবে ? কাজে যাচ্ছো ত তুমি।

গেলে কি ? ও দুপুরে জ্যাকসন হোটেলে থাকবে। বিকেলে আবাব চলে আসবে আমার সঙ্গে। এনজয় করবে খুব। লং ড্রাইভ। ওকে বলে রেখেছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তৈবি হয়ে গেছে।

না। ও যাবে না।

রুষা বলল, দাঁড়িয়ে উঠে। কঠিন গলায়। আমি জানলাম না, আব মেয়ে তৈরি হয়ে গেল কী রকম ? আমি কি মরে গেছি ? হাউ ডেয়ার উ্য ?

এমন সময় মিলি একটি সিল্কের লাল ম্যাক্সি পরে দরজায় এসে দাঁড়াল।

মিলিকে দেখে আতঙ্কিত হল রুষা। কত লম্বা দেখাচ্ছে ওকে হাই হীল জুতো পবে। মনে হচ্ছে কোনো পঁচিশ বছরের মেয়ে।

মিলি বলল, আই অ্যাম রেডী আংকল।

শ্যানেল নাম্বার ফাইভের গন্ধ বেরুচ্ছিল ওর গা থেকে। পনি টেইল করেছে চান করে উঠে। শ্যাম্পু করেছে। ওর দু-চোখে স্বচ্ছল জীবন-জনিত এবং জীবন-তৃষ্ণার গভীর এক ঘোর। এই বয়সটাই নষ্ট হবার বয়স। ভিনোদ ওকে পুরোপুরিই নষ্ট করে দিতে চাইছে।

একটা প্রি-মনিশান্ হয়েছিল রুষার। আজ যে এরকম ঘটতে পারে তা ভুচুকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল কালকেই. সন্ধ্যায় বাজারের প্রভিশন-এর দোকান থেকে। ভুচু বলেছিল, ও কালই ভোর পাঁচটায় ফিরে এসেছে টুসুকে পৌঁছে দিয়ে। ওর মনও ভাল বলছিল না। বলেছিল, ইদুরকার যদি কথা না-শোনে, তবে একটা ফোন করে দেবেন। আমরা ফিরিয়ে আনব মিলিকে। এবং তাহলে কালই আপনাদের শিফট্ কবাব পুরোনো বাড়িতে।

মিলি, আমি বলছি তুমি যাবে না।

দাঁড়িয়ে উঠে শাসনের গলায় বলল রুষা।

আমি কি ছোট মেয়ে না ? আমি যাব। তুমি না করার কে ? আই অ্যাম গ্রোন-আপ ন্যাও। উ্য কাণ্ট কীপ-অন বসিং এনি মোর।

বলছি, না, মিলি।

উ্য কীপ কোয়ায়েট।

রুষার গালে যেন থাপ্পড় মেরে বলল মিলি।

মিলি আবার বলল, উ্য আর জেলাস্।

হো-য়া-ট ? বলে, সোফায় বসে পড়ল রুষা। মাথা ঘুরছিল ভীষণ।

ভিনোদ হাসছিল। রুষার দিকে চেয়ে দু কাঁধ শ্রাগ করল। বলল, ওয়েল ! পরে আবার বোলো না তোমার মাইনর মেয়ের উপর আমি জোর খাটিয়েছিলাম।

মিলি ! তুমি যাবে না !

আমি যাবই।

রুষা দরজার কাছে গিয়ে ঠাস্ করে এক চড় লাগালো মিলির গালে।

হতবাক হয়ে গেল মিলি। তার মা তাকে কখনও গলা তুলে বকেনি কোনোদিনও। ওয়েস্টার্ন কায়দায় মানুষ করেছিল ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত রুষা তার ছেলে-মেয়েকে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে মিলি বলল, দেখি তুমি কি করে আটকাও আমাকে। আই সেইড ইট ওলরেডী ! আই অ্যাম আ গ্রোণ-আপ গার্ল। উ্য উইল হ্যাভ টু রিপেন্ট দিস মাম্মী। উ্য উইল সী। আই লাভ আঙ্কল ইদুরকার। ইয়েস্। আই লাভ হিম !

রুষার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। ভিনোদের বাহুতে তার হাত জড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল মিলি। মিলির দিকে চেয়ে বিশ্বাস হচ্ছিল না রুষার যে, মিলি তারই মেয়ে। তার চেয়েও সুন্দরী, লম্বা, ভরন্ত গড়নের যে মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হবার কথা ছিল মায়ের, তাকে ঘৃণা করতে লাগল ও ওর সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাকে অভিশাপ দিতে লাগল। ভাবতে লাগল, প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই কি মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে একজন ? সে যে কখন বাইরে আসবে তা কেউ জানে না।

ওরা নেমে গেলে মিলির প্রতি তার সমস্ত ঘৃণাটুকু তার নিজের বুকেই ফিরে এল। নিজেকেই অভিশাপ দিতে লাগল রুষা। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সোফাটার উপর। মিলির প্রতি ঘৃণা বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে।

মার্সিডিস গাড়ির হর্ন শোনা গেল গেটের কাছে। দারোয়ানেরা গেট খুলে দিল। রুষা দৌড়ে গিয়ে নাইটি-পরা আলুথালু বেশে ফোনের ডিজিটাল রিসিভারটা তুলে নিয়ে বাঁ হাতের তেলোতে রেখে তাড়াতাড়ি ডায়াল করল। উত্তেজনায় রং-নাম্বার হল একবার। ওপাশ থেকে একজন বলল, কত নাম্বার চান তা না জিজ্ঞেস করেই ভুচুকে চাইছেন ? অদ্ভুত লোক ত ? এখানে ভুচু বলে কেউ থাকে না। পরের বার পেল ভুচুকে।

ভুচু ?

বলুন বৌদি। ফোনের কাছেই ছিল ভুচু সকাল থেকে।

এইমাত্র ওরা চলে গেল ভুচু ! বাঁচাও তুমি আমার মেয়েকে। আমাকে বাঁচাও। প্লীজ !

ঠিক আছে। কোনো চিন্তা নেই আপনার। আপনি গোছগাছ করে নিয়ে তৈরি থাকুন। ইদুরকারের বন্দোবস্ত করেই আমি আপনার কাছে আসছি। কোনো ভয় নেই বৌদি। গাড়িটা কি ? কি রঙের ?

সাদা রঙের। মার্সিডিস্। ওইই চালাচ্ছে।

ফোনটা নামিয়েই ভুচু গিরিশদাকে ফোন করল। শামীম ওখানেই বসে ছিল সকাল থেকে। ওদের খবরটা দিয়েই ফোনটা রেখে ডাকল, হুদা !

হুদা দৌড়ে এল। বলাই ছিল ওকে।

বলল, বলো।

হুদা দৌড়ে গিয়ে জীপে বসে জীপটা গারাজ থেকে বের করে আনল। কাল রাতেই সার্ভিস করিয়ে ফুল ট্যাঙ্ক তেল নিয়ে রেডি করে রেখেছিল।

ঘাড় ঘুরিয়ে কম্বল আর বেতের লাঠিদুটো পেছনে আছে কী না একবার শিওর হয়ে নিল সে সম্বন্ধে। হুদাই জীপ চালাচ্ছিল। ভুচু বসেছিল পাশে। খুব জোরে চালিয়ে, হাটচান্দ্রা থেকে যে পথটি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মান্দ্‌লা হয়ে জব্বলপুরের দিকে গেছে সে পথে মাইল পাঁচেক গিয়ে একটা বাঁকের মুখে জীপটাকে পথের বাঁ দিকে একটি ফরেস্ট রোড-এ ঢুকিয়ে ব্যাক করে রাস্তার দিকে মুখ করে রাখল। কয়েকমিনিট পরই দেখল গিরিশদার অ্যাম্বাসাডার খুব জোরে ছুটে বেরিয়ে

গেল। তারও মিনিট পাঁচেক বাদে ইদুরকারের সাদা মার্সিডিস গেল। গাড়িটা এগোতেই হুদা জীপের এঞ্জিন স্টার্ট করে পথে এসে উঠে ফলো করতে লাগল গাড়িটাকে একটু দূরত্ব রেখে।

ড্রাইভার নেয়নি ইদুরকার আজকে। নেয়নি ইচ্ছে করেই। সামনের ডানদিকের সীটে মিলি বসেছিল লেফট হ্যাণ্ড ড্রাইভ মার্সিডিসে রাজকুমারীর মতো। মিলিকে যে ভাবে তার মা মানুষ করেছিল তাতে এই রকম ঐশ্বর্যর জীবনই তার একমাত্র কাম্য ছিল। ভাল-থাকা, ভাল-খাওয়া ছাড়াও মানুষের জীবনে যে আরও অনেক কিছু চাইবার থাকে সে সম্বন্ধে মিলি একেবারেই অনবহিত। সুখ আর ঐশ্বর্য ওর কাছে সমার্থক। শুধু ওর কাছেই নয়, এই বয়সী, এইরকম ভাবে ট্যাঁশ-সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা বেশির ভাগ মেয়েরই কাছে হয়ত।

প্ল্যান আগে থেকেই ছকে নিয়েছিল ভুচু গিরিশদা আর শামীম। হুদাও জানত। পথটাতে, একটা হেয়ার-পিন বেণ্ড আছে। তাতে যে-কোনো গাড়ির গতিই ড্রাইভার কম করতে বাধ্য। এমনকি পৃথু এবং ভুচুর মতো ড্রাইভারকেও স্পীড কমাতে হয়ই এখানে এসে। তাছাড়া, ইদুরকার জয়-রাইডেই বেরিয়েছিল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে মীটিংটা মিথ্যা কথা। জঙ্গলের মধ্যেই কোনো বন-বাংলোয় উঠত গিয়ে ও মিলিকে নিয়ে। যেতই না জব্বলপুর অবধি।

পৃথুদার মেয়ে মিলিকে! তারপর···

হেয়ার পিন বেণ্ডটা আর সাত-আট মাইল আছে। এ পথে প্রাইভেট গাড়ি বা জীপ খুব কমই যাওয়া-আসা করে। দিনে রাতে গোটা ছয়েক বাস আপ-ডাউনে যায়। আর গোটা বারো ট্রাক। প্রতিদিন গড়ে। নইলে, রাস্তা নির্জনই থাকে। বেণ্ডটার কাছাকাছি আসতেই জীপের গতি বাড়িয়ে দিল হুদা। বেণ্ডটার ঠিক আগেই একটি কাঁচা, লালমাটির ফরেস্ট-রোড বেরিয়ে গেছে ডানদিকে। অন্ধ-পথ। শেষ হয়েছে গিয়ে হাঁলো নদীর সামনে। পথটা কেটে গেছে নদী। সেখানে নদীর উপর একটি কজওয়ে তৈরি করছিলো ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট। গত বছরই শুরু হয়েছিল, কিন্তু ফাণ্ডস-এর অভাবে কাজ অ্যাবাণ্ডণ্ড হয়ে গেছে। এখনও নদীতে যথেষ্ট জল আছে। ট্রাক পেরোতে পারে না এখন নদী। নদী যদি বা কেউ পেরোতে পারতও তাহলেও ওদিকে যেতে পারবে না আর। পথই তৈরি হয়নি। বড় বড় পাথরে ভরা অগম্য সেই কাঁচা রাস্তা। একমাত্র জীপ যেতে পারে। অতি কষ্টে। তাও, মে মাসের গোড়া থেকে জুনের শেষ অবধি। যতদিন বৃষ্টি না নামে।

ইদুরকারের মার্সিডিস খুব আস্তে হেয়ার-পিন বেণ্ডটাকে নেগোশিয়েট করল। করেই, থেমে গেল।

সরু পথের উপর আড়াআড়ি করে দাঁড় করানো আছে গিরিশদার অ্যাম্বাসাডর। বনেট খুলে শামীম যেন গাড়ি মেরামত করছে। গিরিশদা ড্রাইভিং সীটে। ড্রাইভারকে ইচ্ছে করেই আনেননি।

হুদা, জীপটা আর না-এগিয়ে, ডানদিকের সেই অন্ধ-গলির এপাশে পিচ রাস্তার মধ্যে জীপটা আড়াআড়ি করে রেখে জীপের বনেট খুলে দিল। দু পাশ থেকেই কোনো গাড়ি এলেও ঢুকতে পারবে না। মার্সিডিজও যেতে পারবে না। এই দুই ব্যূহ ভেদ করে।

ইদুরকার গাড়ি দাঁড় করিয়ে খুব জোরে হর্ন বাজাল কয়েকবার। তারপর দরজা খুলে গালাগালি করতে করতে গিরিশদার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গিরিশদা গাড়িকে স্টার্ট-এ রেখে, তাঁর দোনলা শট্গানটি নিয়ে নেমে এসে ইদুরকারের দিকে তুলে ধরলেন। শামীমও বনেট বন্ধ করে পিস্তল নিয়ে দৌড়ে গেল ওর দিকে।

প্রথমে ও বুঝতে পারেনি। পরক্ষণেই শামীম এবং গিরিশদাকে চিনে ফেলল ও। চিনতে পেরেই প্রাণপণ দৌড়ে নিজের গাড়িতে উঠে গাড়ি ব্যাক করল তিন চারবার এগিয়ে পেছিয়ে অনেক কষ্টে। তারপর জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে হাটচান্দ্রার দিকে ফিরে যেতে গিয়েই দেখল একটা জীপ আড় করে লাগানো আছে পথে। উইশফুল থিংকিং-এ ও ভেবেছিল এটা একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু ঠিক সেই সময় ভুচু জীপের মধ্যে থেকে নেমে এল হাতে পিস্তল নিয়ে।

কথা বেশি বলে না ভুচু। এবং ওর মুখের ভাব এবং চোয়ালের দৃঢ়তা দেখে ইদুরকার কি করবে প্রথমটা বুঝে উঠতে পারল না। পাঁচ-দশ সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে দৌড়ে গাড়িতে ফিরে গিয়েই

ডানদিকের দরজা খুলে এক হ্যাঁচকা টানে মিলিকে পথের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওর সিল্কের ম্যাক্সি উঠে গেল উরু অবধি। নুড়ি ছড়ানো ধুলোর মধ্যে সে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে ভয়ে কেঁদে উঠল। এবং চিৎকার করে উঠল, বাবা! বাবা! বাঁচাও।

ঐ অবস্থাতেও হাসি পেল ভুচুর। এত লোক থাকতে, বাবা!

ততক্ষণে গিরিশদার অ্যাম্বাসাডর ফিরে এসেছে। ঐ গাড়িকেও ফিরে আসতে দেখে ওর বিরুদ্ধে যে একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত হয়েছে তা আর বুঝতে বাকি রইল না ইঁদুরকারের। যেমন ঘটবে ওরা ভেবেছিল, তাইই ঘটল। সামনে ও পিছনের পথ আগলানো দেখে সে প্রায় মিলির গায়েরই উপর দিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে নেমে গেল ডানদিকের সেই কাঁচা অন্ধ বন পথে। ঐ পথ যে হাঁলো নদীর সামনে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে তা ঐ ইদুরকারের জানার কথা নয়। জঙ্গলের পোকা ভুচু এবং শামীম যা জানে শহরের সুখী "ভদ্রলোক" ইঁদুরকারের তা জানার কথা ছিল না। ওকে এ পথেই যেতে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ওদের।

গিরিশদা মিলির হাত ধরে বললেন, এসো মা। উঠে এসো, এই গাড়িতে। আমি তোমার বাবার বন্ধু।

মিলি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে কী যেন বলতে গেল। শোনা গেল না ভাল।

ভুচু বলল, ওঠো, গিরিশজেঠু তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমি তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে আসছি তোমার কাছে। একটু পরে।

কোথায়? মিলি শুধোল।

তোমাদের পুরোনো বাড়িতে। তোমাকে আজ মেরেই ফেলত ইঁদুরকার। মায়ের কথা না শুনলে, এমনই বিপদে পড়তে হয়।

মেরে ফেলত? কেন?

ঘোরের মধ্যে বলল মিলি।

ভুচু মনে মনে বলল মেয়েদের মৃত্যুর নানা রকম হয়। নুরজেহান যেমন মরেছিল!

মুখে কিছু বলল না।

হুদা জীপটা একপাশ করল। এমন সময় দূর থেকে একটা বাসের এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বাসাডর এবং জীপ দুইই ডানদিকের বনপথে ঢুকিয়ে দিল ওরা অনেকখানি যাতে বাসের নজরে না পড়ে। বাসটা চলে যেতে, গিরিশদার গাড়ির স্টীয়ারিং-এ এসে হুদা বসল। গিরিশদা মিলিকে নিয়ে পেছনের সীটে। শামীম এসে জীপে উঠল। ভুচু স্টিয়ারিং-এ।

অ্যাম্বাসাডর ব্যাক করে বড় রাস্তায় উঠে চলে গেল। হাটচান্দ্রার দিকে। ভুচু, হাত নাড়ল মিলিকে। মিলি হাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। এই গিরিশবাবু আর ভুচুই হয়ত মেরে ফেলবে ওকে। কে জানে?

গিরিশদা বললেন, তোমার বাবাকে চিঠি লিখো একটা ভাল করে। টুসুকে নিয়ে ফিরে আসতে বলো এখানে।

মিলি দু চোখ দু হাতে ঢেকে বসে রইল।

অ্যাম্বাসাডরটা চলে যেতেই ভুচু আগে বাড়াল জীপ। অনেকদিন পর রক্ত দাপাদাপি করতে লাগল। কপালের দু পাশে ঝুনুক্ ঝুনুক্ করে। ভাল লাগতে লাগল ওর।

শামীম তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে পানের শালপাতামোড়া প্যাকেট বের করে পান দিল ভুচুকে, উত্তেজনাহীন, ঠাণ্ডা হাতে। তারপর মীর্জা গালিবের একটা গজল বেসুরে গাইতে লাগল গুনগুন করে। বেসুরো গান শুনে মাথা ধরে যায় ভুচুর। ধমক লাগিয়ে গান বন্ধ করতে বলল ওকে।

মোড়ে গীয়ার বদল করতে করতে, ভুচু বলল, পেছনে আছে বেতের লাঠিদুটো, আর কম্বল। কম্বলে মুড়ে ভাল করে পেটাতে হবে। যাতে জীবনের মতো শিক্ষা পায়। গায়ে দাগও না হয়।

হুঁ।

শামীম বলল।

তারপর বলল, দেখি।

আতঙ্কিত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ভুচু ওর মুখে। বলল অ্যাই শামীম ভাই ! জানে মেরোনা কিন্তু। আর কদিন পরেই নুরজেহানের বিয়ে। মগনলালকে নিয়ে অনেকই ঝামেলা হল। আর ঝামেলা বাড়িও না।

দেখি, কী করি। তুমি যে মাদ্রাসায় লেখাপড়া শিখেছো ভুচু, আমি ত' সেই মাদ্রাসাতে লেখাপড়া করিনি। আমাদের দিমাগ কুছ্ অলগ্ অলগ্।

ভুচুর ভীষণই ভয় করতে লাগল এই কথাতে। শামীমের মধ্যে এক দারুণ নিষ্ঠুরতা আছে। দিগা পাঁড়ের কুঁড়ের কাছে সেই জংলী- কুকুরে চোখ খুব্‌লে-নেওয়া বারাশিঙাটাকে যেমন করে গুলি করেছিল তেমন করেই ও হঠাৎ হঠাৎ নানা কাণ্ড করে বসে। সেইসব মুহূর্তে ও ওর নিজের মালিক থাকে না। ওর মধ্যে সাক্ষাৎ শয়তান এসে বাসা বাঁধে। নুরজেহানের ঘটনাটা ঘটার পর থেকে শামীম আরও নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসে থাকে। মনে হয়, যেটুকু মায়াদয়া ছিল ওর মধ্যে, তাও মুছে গেছে নির্মূল হয়ে।

মাইল দুয়েক যেতেই দেখা গেল মার্সিডিস গাড়ি ফিরে আসছে। কিন্তু জীপটাকে আসতে দেখেই গাড়ি থামিয়ে দিল ইদুরকার। তারপর ওদের চিনতে পেরে, গাড়ির দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল, টাই ঠিক করতে করতে। গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে অন্য দশজন বড়লোকেরমতো আত্মবিশ্বাস এবং ছোটলোকদের সাহসের প্রতি বিরক্তি ফুটিয়ে থুতনী উঁচু করে চেয়ে রইল আগন্তুক জীপের দিকে। ভাবটা, যেন, "আই উইল গিভ দেম আ বিট্ অফ্ মাই মাইণ্ড।" অত দামী গাড়িটার সঙ্গে গা লাগিয়ে বৈভব ও সাহসকে ওর শরীরেব সঙ্গে "আর্থ" করিয়ে রাখল। বেশির ভাগ বড়লোকদের সাহসের বেশিটাই হয়ত তাদের সম্পত্তিসম্ভূত।

ভাবল, ভুচু।

শামীম নামল। ভুচুও নামল।

ইদুরকার বলল, তোমাদের সাহস ত কম নয় !

সাহসের এখনই কি দেখলে ? শালে চুহাকি বাচ্চে !

শামীম বলল।

বলেই, ওর টাই ধরে এক হ্যাঁচকা টান লাগাল।

কি, কী হচ্ছেটা কি ?

ধমক লাগাল ইদুরকার। হতভম্ব হয়ে।

শামীম এক চড় মারল ওর গালে।

নার্ভাস হয়ে গেল ইদুরকার। ওর মতো মার্সিডিস-গাড়ি চড়া মানুষকে বাজাবের একটা সামান্য গাড়ি-সারাইওয়ালা যে চড় মারতে পারে, ভাবতে পর্যন্ত পারেনি ও।

ভুচু পিস্তলটা বার করে বলল, জামা-কাপড় সব খোলো।

কেন ? কেন ? টাকা চাও ? ডা স্টিংকিং মেকানিক ! এই নাও আমার পার্স। দু হাজারের উপর টাকা আছে এতে।

একটু চুপ করে থেকে ও বলল, কার সঙ্গে লাগতে এসেছো জানো না।তোমাদের কপালে অশেষ দুঃখ।

শামীম বলল, নিজের কপালের লিখন ঠেকাও আগে, তারপর আমাদের কপাল নিয়ে ভেবো।

ভুচু আবারও বলল, জামা-কাপড় সব খোলো।

ভুচুর চোখে কী দেখল কি জানে, ইদুরকার। লক্ষ্মীছেলের মতো জামা কাপড় সব খুলে ফেলল। পায়ে জুতো-মোজা, আর আণ্ডারওয়্যার পরে দাঁড়িয়ে রইল হাস্যকরভঙ্গিতে।

ভুচু বলল, গাড়ি ঘোরাও। পালাবার মতলব ছাড়ো। গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে নদীর দিকে চলো।

ইদুরকার গাড়িতে গিয়ে বসেই এঞ্জিন স্টার্ট করল। অত পাওয়্যারফুল এঞ্জিন ! গমগম করে উঠল দুপাশের জঙ্গল। হঠাৎই ভুচু লক্ষ্য করল যে, ব্যাক না করে, এঞ্জিন রেস করছে ইদুরকার।

পরক্ষণেই বুঝল যে, ক্লাচ টিপে এঞ্জিন রেভ্-আপ্ করে হঠাৎই ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে ও এক ঝটকায় ওদের জীপটাকে ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই যা ভাবল, তাইই ঘটল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুচু ওর গাড়ির টায়ার লক্ষ্য করে দুটি গুলি করল। কিন্তু তারই মধ্যে মার্সিডিস গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে গিয়ে জীপটাকে ধাক্কা মারল। জীপটা এক দমকে পেছিয়ে গেল অনেকটা। কিন্তু পেছিয়ে গিয়ে গিয়ে ঢালুতে গড়িয়ে এমনই আড়াআড়িভাবে পথের উপর অনড় হয়ে দাঁড়াল যে, মার্সিডিজ গাড়ির পথও একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। জীপের হেডলাইট দুটো আর গাড়ির হেডলাইট সাইড লাইট সব চুরমার হয়ে গেল। অত জোরে ধাক্কা লাগল অথচ গাড়িটার রেডিয়েটরের কিছুই হলো না। অ্যাম্বাসাডর হলে এতক্ষণে সব জল পড়ে যেত পথে।

পালাবার পথ বন্ধ হওয়াতে এবার ঘাবড়ে গেল ভীষণ ইদুরকার।

ভুচু পিস্তল হাতে, ইশারাতে আবারও গাড়ি ব্যাক করতে বলল। রাগ হয়ে যাচ্ছিল ভুচুরও। ইদুরকার জানে না, শামীমের হাতে ওকে ছেড়ে দিলে কি করবে শামীম!

এবারে বাক্যব্যয় না করে গাড়ি ব্যাক করল ইদুরকার। দু তিনবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ একটি খসখস আওয়াজ শুনে চমকে তাকাল ভুচু শামীমের দিকে। দেখল, শামীম পিস্তল বের করছে।

ভুচু দৌড়ে গেল শামীমের দিকে। চিৎকার করে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে ফেলল শামীমের।

শামীমের মুখচোখ অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিল।

ভুচু জোর করেই পিস্তলটা কেড়ে নিল শামীমের কাছ থেকে।

ইদুরকার হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে শামীমকে বলল, সব নিয়ে নাও শুধু জীবনটা নিও না। আমি কথা দিচ্ছি, হাটচান্দ্রা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।

হেসে ফেলল, শামীম।

বলল, শালে কুত্তা,. মওত্সে ইত্না হি ডরতা তু? কামিনে? তু মরদ, ইয়া আওরৎ?

ভুচুর মনে পড়ল, পৃথু একদিন বলেছিল ওকে যে, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে নামের একজন আমেরিকান লেখক বলেছিলেন যে, মানুষের পয়সা যে অনুপাতে বাড়তে থাকে ঠিক সেই অনুপাতেই তার জীবনের মায়াও বাড়তে থাকে। যাদের পয়সা কম তাদের জীবনের মায়াও কম। কথাটা হয়ত ঠিকই!

ভুচু ইদুরকারকে গাড়ি চালিয়ে আগে আগে যেতে বলল নদীর দিকে।

মারধোর যা করার নির্জনের গভীরে গিয়েই করা ভাল। দেখতে দেখতে পৌঁছেও গেল নদীর সামনে। এখানে পথটা খাড়া নেমে গেছে নদীতে। হ্যাণ্ডব্রেক লাগিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইদুরকার তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে ফেলল আবার। বলল, খালি গায়ে থাকলে সুড়সুড়ি লাগে আমার।

ভুচু একটা অর্জুন গাছের নিচের ছায়ায় পাথরের উপরে বসে দুদিকে দু পা ছড়িয়ে শামীমের পিস্তলটা হাতে নিয়ে হাসল।

শামীম বলল, ঠিক আছে। খালি হাতেই যা পারি করব।

আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। চলো এই মস্ত শেঠকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়ে যাই। এদিকে কেউই আসে না। কোনো বস্তীও নেই ধারে কাছে। লেবার জোগাড় হলো না বলেই ত কজওয়েের কাজ অ্যাবানডানড্ হয়ে গেল! গাছে-বাঁধা অবস্থাতেই শুকিয়ে মরুক ও।

ইদুরকার এদিক ওদিক দেখছিল দৌড়ে পালাবার মতলবে। ভুচু পিস্তলটা তুলে বলল, একদম না। প্রাণ তবে কিন্তু সত্যিই যাবে।

কত সময় আছে তোমার?

শামীম বললো।

পাঁচ মিনিট থেকে দশ মিনিট। যা করবার করো। বেতের লাঠি দুটো বের করো। শুধু কথাতেই

ত সময় যাচ্ছে।

তুমি কিন্তু কাছেও আসবে না আমার। যা করার আমি একাই করব।

শামীম বলল ভুচুকে।

ভুচু বলল, ইদুরকারকে, যা বলবে শমীম ভাই তাইই করবে। ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে আমার গুলিতেই প্রাণ যাবে।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। বলল, ইদুরকার। দু হাত দুপাশে তুলে।

শামীম ইদুরকারকে নিয়ে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসল। পেছনের সীটে।

কি করবে ? সিগারেট লাইটার দিয়ে ছ্যাঁকা দেবে কি ? যা খুশি করুক। প্রাণে না মারলেই হল। যা করতে চায় করে, পৃথুদার কাছে মৌলবীর কাছে ওর ঋণ শোধ কবার বৃথা চেষ্টা করুক। যদি আনন্দ পায় তাতেই ত পাক।

ভাবল ভুচু।

রুষার মুখটি কেবলই মনে পড়ছিল ভুচুর। কাল বাতে রুষার চিঠিটি ওকে পড়তে দেওয়া উচিত হয়নি পৃথুর। যেদিন রুষা বৌদি কারখানাতে এসেছিলেন, ওর ঘরে বসেছিলেন সেদিন থেকেই একটা ঘোরে আছে ভুচু। মনের এই রকম অবস্থা আগে কখনই হয়নি। তাই ইদুরকারের হেনস্থা করতে পেরে ও এক ধরনের ব্যক্তিগত আনন্দও পাচ্ছে, অথচ যে-আনন্দর স্বরূপ সম্বন্ধে ওর স্পষ্ট কোনো ধাবণাও নেই।

রুষা বৌদিকে কাছ থেকে এব আগে মাত্র একদিনই দেখেছিল। পৃথুদার বাড়িতে। সেই মানুষটি আর এই মানুষটির মধ্যে অনেকই তফাত। সে ছিল একজন গর্বিত, দাম্ভিক, সুন্দরী, চোখ-ঝলসানো নারী। আব তার কারখানায় দেখা রুষা বৌদিকে বড় করুণ, অসহায় বলে মনে হয়েছিল। পামেলাব মুখের মধ্যে যেরকম একটি ভাব ছিল, সেই রকম এক ভাব দেখেছিল সেদিন। কখন যে কোন নারীর মুখের ভাব কোন্ পুরুষের বুকে কী ভাব জাগায় তা বিধাতাই জানেন বোধ হয় ! বেচারী ভুচু ! মানুষের মনের কারবাবী ও কখনই ছিল না। নারীর মনের ত নয়ই। কী যে হল তার ! কিছুই ভাল লাগছে না আর সেদিন থেকে। খেতে নয়, কাজ করতে নয়। শুধুই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। নয় ত একা একা বনে বনে ঘুবতে। কেবলই রুষা-বৌদির মুখটা ভাসে চোখের সামনে। মনে মনে কত কথা বলে ওঁর সঙ্গে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তিন চারদিন আগের এক রাতে কল্পনায় রুষা বৌদিকে খুব আদরও করে দিয়েছিল।

ছিঃ। ছিঃ। পৃথুদা জানলে কি ভাববে !

কল্পনায় কাউকে আদর করাও কি দণ্ডনীয় অপরাধ ? ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে কোনো ধারা কি আছে ? কে জানে ?

অবাক হয়ে দেখল ভুচু যে, শামীম ইদুরকারকে নিখুঁতভাবে জামা-কাপড় পরাচ্ছে। টাই বাঁধতে সাহায্য করছে। বড় আদরে। ছেলে, যেন নিকাহ্ করতে যাবে, এমনই ভাব।

জামাকাপড় ঠিকঠাক হলে, গাড়ির দরজা খুলে ইদুরকারকে বসতে বলল শামীম, স্যুটেড-ব্যুটেড হয়ে। তারপর নিজেই বসল স্টিয়ারিং-এ। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে ভুচুকে বলল, জীপে গিয়ে জীপ স্টার্ট করতে এবং মুখটা ঘুরিয়ে রাখতে। ও আসছে এখুনি।

ইদুরকার শামীমেবই নির্দেশে চাবি ঘুরিয়ে শামীমকে দিয়েই গাড়ি স্টার্ট করাল। তারপর চাকার সামনে রাখা পাথরগুলো নেমে সরাতে লাগল। ভুচু গিয়ে জীপে বসে, জীপ ব্যাক করে ঘুরিয়ে রাখছিল। জীপের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। রেডিয়েটরেরও ক্ষতি হয়নি। শুধু হেডলাইট দুটোই গেছে। গ্রিলটাও মেরামত করতে হবে। হঠাৎই ভুচুর মনে পড়ল শামীম ত গাড়িই চালাতে জানে না। সে মার্সিডিজের স্টিয়ারিং-এ বসে কি করছে ?

কথাটা মনে হতেই ভুচু স্টার্ট বন্ধ করে জীপ থেকে নামতেই দেখল, মার্সিডিজটা একেবারে নদীর ধারে গড়িয়ে গেছে। একটু হলেই জলে পড়বে। ইদুরকার গাড়ির সামনের সীটেই বসে আছে। শামীমকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ইদুরকার মাথা নিচু করে ফেলল।

ভুচু, সন্দিগ্ধ চোখে ওদিকে এগিয়ে যেতেই মার্সিডিজের এঞ্জিনটা প্রচণ্ডভাবে গর্জন করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অতবড় গাড়িটা জল ছিটিয়ে হাঁলো নদীর মধ্যে গিয়ে পড়ল। গাড়িটা জলে নেমে যেতেই দেখতে পেল, শামীম পথের বাঁ দিকে চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে।

ব্যাপারটা কী যে ঘটল তা বুঝতে না পেরে ঢালু বেয়ে দৌড়ে গেল ভুচু। জলের মধ্যে তখনও জল ও বালি তোলপাড় করে গাড়িটা ক্রমশ গভীর জলে এগিয়ে যাচ্ছিল। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি। জলের নিচ থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ আর শোনা গেল না। আলোড়নও নয়। অনেকক্ষণ বুড়বুড়ি উঠল। তেল-মবিল ভেসে উঠল জলের উপর। কিন্তু নদীর স্রোত সঙ্গে সঙ্গে তা ধুয়ে নিয়ে গেল। এখন হাঁলোর দিকে চাইলে বোঝাই যাবে না যে, তার গর্ভে একটি পাঁচ লাখ টাকা দামের সাদা রঙা সুন্দর মার্সিডিজ শুয়ে আছে। জলে টইটম্বুর হয়ে।

ইদুরকার কোথায় ?

উত্তেজিত, অবাক-হওয়া ভুচু শামীমকে শুধোল, দু পাশের গাছগুলোব দিকে চেয়ে। কোনো গাছ থেকে নাইলনের দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিল কি শামীম তাকে ? জলজ্যান্ত লোকটা হাপিস্ হয়ে গেল ?

শামীম নিজের কুর্তা পাজামা থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল মনোযোগের সঙ্গে ভূপতিত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে। ওর কনুই ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। বলল, দেখেছো ! কোনো মানে হয় ? ঝুঠঠো !

অধৈর্য গলায় ভুচু বলল, আরে ইদুরকারকে কি করলে ? কোথায় সে ?

শামীম একবার হাসল। পৈশাচিক হাসি। তারপর জলের দিকে আঙুল দেখাল।

বলল, গাড়ির মধ্যেই আছে। গুলি কিন্তু করিনি আমি।

রাগে, চিৎকার করে উঠে দৌড়ে গেল ভুচু জলের দিকে। তারপব নদীতে ঝাঁপিযে পডল। যতখানি হেঁটে যাওয়া যায়, গেল। তারপর সাঁতরে গেল। একটু পরেই পায়ের নিচে শক্ত মত কি যেন ঠেকল। বুঝল, মার্সিডিসের ছাদ। ছাদে দাঁড়িয়েও ওর কোমর জল সেখানে। ডুব সাঁতাব দিয়ে, গাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দরজা কোন্ দিকে তার হদিস করতে লাগল। একটা হ্যাণ্ডেলে হাত লাগল। হ্যাণ্ডেলের গোড়ার বোতামও টিপল। কিন্তু দরজা কিছুতেই খুলল না। মনে হল, হাজার মন ওজন হয়ে গেছে সবকটি দরজার। ঘোলা জলে কিছু দেখাও গেল না। দম নেবার জন্যে উঠে এল একবার উপরে। বুক-ভরে দম নিয়ে আবারও ডুব দিল। তারপর আরও একবার। নাঃ। কিছুই করার নেই।

ক্লান্ত, ক্রুদ্ধ ভুচু চুপচুপে ভিজে যখন নদীর পাড়ে উঠল, দেখল শামীম জীপের ড্যাশবোর্ড খুলে পান খাচ্ছে।

ভুচু কাছে আসতেই পান জর্দা এগিয়ে দিল ওর দিকে।

হাতের এক ঝটকায় ফেলে দিল সেগুলো ভুচু।

হিঃ হিঃ করে হাসল শামীম।

বলল, তুনে বোলাথা, পিস্তল বেগর্ যো-কুছ কর না ম্যায় করনে শক্‌তা। আভ্‌ভি গোস্‌সা কিস্ লিয়ে হো রহা হ্যায় ?

ভুচু পুরো ব্যাপারটার অভাবনীয়তায় স্তম্ভিত হয়ে ছিল তখনও।

বলল, কি করে করলে ? করলেটা কি ?

সামনের চাকার বড় পাথরগুলো এক এক করে সরিয়ে দিতে বললাম ওকে। একটু হলে গাড়ির নিচে নিজেই চাপা পড়ে মরতাম। ওর কাছ থেকে গাড়ি স্টার্ট করা দেখে নিলাম। গীয়ারে দিলাম। তারপর দরজা খোলা রেখে অ্যাকসিলরেটরের উপরে একটা পাথর চাপিয়ে দিলাম।

ইদুরকার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেনি ?

করেছিল ত !

তবে ?

শামীম তার কুর্তার নিচ থেকে একটা ছুরি বের করল। নিজের গলা আব জিভ দিয়ে শব্দ

করল "খিশ্-শ্-শ্" করে। বলল, অ্যাকসিলরেটরে পাথর চাপাবার আগেই...

গা ঘিন্‌ঘিন করে উঠল ভুচুর।

এই সব খুনী বদমাসদের সঙ্গে আর নয়। যারা খুন করার আনন্দর জন্যেই খুন করে তাদের সঙ্গে আর সম্পর্কই রাখবে না কোনো। জীবনে কত সুন্দর সব অনুভূতিব শরিক হওয়ার কথা ছিল এতদিনে! ভালবাসা, ছেলেমেয়ে, সুখ, শান্তির ঘর-সংসার। এই পৃথুদাটাই যত নষ্টের গোড়া! আব চামচেগিরি করেই নিজের জীবনটা বরবাদ্ হয়ে গেল। এই দলের মধ্যে মাত্র একটা লোকই ছিল মানুষের মতো।মানুষ। সে হচ্ছে দিগা পাঁড়ে। বড়ই অশান্তি ভুচুর মনে। কয়েকদিন থেকেই ছিল। ইদুরকারকে এই ভাবে মারতে দেখে সেটা আরও বেড়ে গেল। ভাবল, কাল সে দিগা পাঁড়ের কাছে যাবেই একবার।

জীপ চালিয়ে যাচ্ছিল খুব আস্তে আস্তে ভুচু। হয়ত মনের অশান্তিকে স্তিমিত করার মিথ্যে চেষ্টাতেই আস্তে চালাচ্ছিল। জঙ্গলের মধ্যে পথের দুপাশে পাতা ঝরে যাচ্ছে; উড়ছে, মধ্যদিনেব হাওয়ায়। পত্রহীন আমলকি গাছে আমলকি ফলে আছে থোকা—থোকা। গাছটা দেখে ভাল লাগল খুব। পাতা নেই একটিও, সবুজের চিহ্ন নেই; তবু ফলে নুয়ে আছে। ভাবল, কত রকম মানুষ, কত রকম গাছ আছে এই যেশাস ক্রাইস্টেব পৃথিবীতে!

শামীম আবারও দুটো পান এগিয়ে দিতে গেল ভুচুর দিকে।

ভুচু সঙ্গে সঙ্গে এক থাবায় ওব হাতটি ধরে জীপ চালাতে চালাতেই ভীষণই জোরে মুচড়ে দিল। নিষ্ঠুর হয়ে উঠল ওর মুখ। বলল, শোনো শামীম ভাই! তোমার জান্ একদিন আমার হাতেই যাবে! জেনে নিও। হুদার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করে বোধ হয় আমি ভুলই কবেছি। নুরজেহানের গায়ে ত তোমারই বক্ত থাকবে কিছু। নিজেকে বদলাও শামীম। নইলে, তোমার মওত্ আমিই বয়ে আনব।

কাফিরের কাছে জ্ঞান নিই না আমরা।

শামীম ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল।

নিও না। তবে কথায় কথায় ছুরি বের করে লোকের গলা না-কেটে, সেই ছুরি দিয়ে তোমার নিজের অন্দরমহলের বোরখাব কালো কাপড়গুলো কাটো ত' দেখি! ত' বুঝি কিছু করলে!

কাফির, ক্রীশ্চান, ভুচু। তোমাব সঙ্গে আমি এইসব আলোচনা করতে চাই না। কোনো আলোচনাই নয়। তুমি দোস্ত্। তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি।

তুমি জাহান্নমে যাও। কবরের অন্ধকারেই বেঁচে থাকো তুমি। তোমার দোস্তীতে দরকার নেই আমার। পুলিসে জিজ্ঞেস করলে, আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব। দেখো তুমি!

পুলিস ত' জিজ্ঞেস করবে একমাস পরে। যদি আদৌ করে। জল যখন কমবে নদীর, যখন গাড়িটা মাথা-উঁচু করবে। কিন্তু প্রমাণ করবে কি করে? সাক্ষী কে ছিল?

আমি ছিলাম!

ভুচু বলল, বিরক্ত গলায়।

পারবে না ভুচুবাবু। তুমি ত পিরথুদাদারই চেলা! চাইলেও, ক্ষতি করতে পারবে না কাবোই।

একটু চুপ করে থেকে বলল. পীরথুদাদার কাছে যে আমার অনেকই ঋণ ছিল! শোধ করার এমন মওকা আর পেতাম না।

ভুচু কিছু বলল না। কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়।

শামীম বলল, হিন্দুস্তাতে আইন এখনও বড়লোকদেরই জন্যে। গরীবের কথা, আদালতে ট্যাঁকে না। যার পয়সা আছে আইনের তামাশা শুধুমাত্র তারই জন্যে। উকিল, ব্যারিস্টার, জজসাহেব সবাই তার দিকে। তেমন দরকার পড়লে, আইন নিজে হাতে না তুলে যে উপায় নেই!

তবু, এমনভাবে, জ্যান্ত মানুষটাকে জলে ডুবিয়ে মারা? ভাবতে পাচ্ছি না আমি।

শামীম বলল, অজীব বাঁতে কর্ রহ্যা হ্যায় তু! উত' আধামুর্দা বন্ গ্যায়ে থে ঈয়ে 'ধাক্কাসে'

বলে, আবারও পান এগিয়ে দিল ভুচুর দিকে।

এবার ভুচু পান নিল। মুখটা শুকনো লাগছিল। ভয়ও লাগছিল। মিলিকে জেরা করলে ত' মিলির কাছ থেকে পুলিস সবই জানতে পারবে। অবশ্য মিলি কিছুই জানে না। মিলিকে ওরা উদ্ধারই করেছে শুধু। উদ্ধার করেই ফিরে এসেছে। মিলি তাই-ই জানে। তারপর ইদুরকারের কি হয়েছে তা কে জানে?

পিচ রাস্তার কাছে এসে জীপটা দাঁড় করাতে বলল শামীম। জঙ্গলের ভিতরে রাখতে বলল।

ভুচু জীপটা রাখতেই শামীম নেমে গিয়ে কতগুলো পুটুসের ঝাড় কাটল ছুরি দিয়ে। তারপর পিচ রাস্তা থেকে মার্সিডিসের টায়ারের দাগ এই অন্ধ-বনপথের মধ্যে দুশো গজ মতো নির্মূল করে মুছে দিল ঐ ডালপালা দিয়ে। যাতে, ঐ মোড়ে দাঁড়িয়ে মার্সিডিস গাড়ি যে এই পথে আদৌ ঢুকেছে তা বোঝাও না যায়। পিচ রাস্তাতে পড়ে হাটচান্দ্রার দিকে মাইলখানেক যাওয়ার পর শামীম ভুচুকে আবার জীপ দাঁড় করাতে বলল। নেমে, বনেট খুলল। ভুচুকেও বলল, নেমে দাঁড়াতে পথের মাঝখানে।

কেন?

অবাক হয়ে ভুচু জিজ্ঞেস করল।

এক্ষুনি সার্ভিস পাস করবে। আপ-ডাউন দুই-ই। তোমাকে সকলেই চেনে। আমাকে না চিনলেও। ডাউনের ড্রাইভারকে বলে দেবে তুমি যে, আমরা দেড়ঘণ্টার উপর এখানে পড়ে আছি। ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গেছে। কারখানায় একটা ফোন করে দিয়ে যেন বলে, মোটর সাইকেল বা অন্য গাড়ি করে জীপের ফ্যানবেল্ট কেউ নিয়ে আসে।

লাভ?

ভুচু বলল, অবাক হয়ে।

লাভ? দু-বাসশুদ্ধু লোক সাক্ষী থাকবে যে আমরা দেড় ঘণ্টার উপর এই সময়ে, পথের এই জায়গাতেই অনড় পড়ে আছি। ওদের বলব, দুজন ট্রাকওয়ালাকেও বলেছি, তারা বোধ হয় খবর দেয়নি। মানে দুজন ট্রাকওযালাও দেখেছে।

কামিনা কাঁহাকা!

বলে, ভুচু জীপটা থেকে নেমে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে।

শামীমের মাথাটা সত্যিই ক্রিমিনালের। অবশ্য ক্রিমিনাল ত ও নিশ্চয়ই!

শামীম হাসছিল। তখনও ওর ছুরিতে ইদুরকারের গলার গরম রক্ত লেগেছিল বোধ হয়। তবুও হাসছিল; পান খাচ্ছিল। এবং সেই বেসুরো গজলও গাইতে শুরু করল আবার।

থামো! থামো!

বলল, ভুচু।

নাঃ। খারাপ। বড়ই খারাপ হয়ে গেছে ভুচু। একটার পর একটা খারাবীতে ফেঁসে যাচ্ছি ক্রমশ। সবচেয়ে বড় খারাবী; এই রুষা-বৌদির প্রতি মনোভাবটা।

ওকি বাঁচবে? এই ব্ল্যাক-মেইলরদের দুনিয়াতে কোনো অন্যায়কারীই কি শেষে বাঁচতে পারে? সে অন্যায়, যতবড় ন্যায়ের জন্যেই করা হয়ে থাক না কেন!

যেমন বলেছিল শামীম, বিপরীতমুখী বাস দুটো একটু পরই এসে গেল পরপর। ড্রাইভাররা মুখ বার করে কথা বলল। ভুচুই বলল, যা বলার। শামীম বনেটের মধ্যে ঘাড় গুঁজে মনোযোগের সঙ্গে এঞ্জিন পরীক্ষা করছিল।

বাসগুলো পাস করে গেলে বলল, চলো।

ভুচু জীপটা স্টার্ট করতেই শামীম বলল, পুলিস কোনোদিন জিজ্ঞেস করলেও তুমি আমাকে ফাঁসাতে পারবে না। কারণ এইখানে আমাকে কেউই দেখেনি। সবাই তোমাকেই দেখেছে। এবং জীপটাও তোমারই। তোমার সাহায্য ছাড়া আমি ত আর একা একা অত দূরে গিয়ে একা হাতে ইদুরকারকে মেরে তারপর এতকাণ্ড করতে পারি কেউই একথা বিশ্বাস করবে না। আমায় ফাঁসালে তুমিও ফাঁসবে। প্রেমে-পড়া পুরুষদের কিছু বিশ্বাস নেই। তাদের ঘুমন্ত বিবেক হঠাৎ হঠাৎ জেগে

উঠে তড়পাতে থাকে ময়ূরের পেখমের মতো।

প্রেমে-পড়া পুরুষদের মানে ?

ভুচু অবাক হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল।

শামীমও মুখ ঘুরিয়ে তার দুচোখ ভুচুর দু চোখে স্থির রেখে বলল, ঠিকই বলেছি ! প্রেমে-পড়া পুরুষদের !

ভুচু একটুক্ষণ শামীমের চোখে চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল।

মানুষ যারা ভাল, সৎ, তারা অন্যর চোখে চোখ রেখে মিথ্যা বলতে পারে না।

ও নিজে ভাল মানুষ বলে, নিজেকে অভিসম্পাত দিল ভুচু। ভালমানুষদের বড়ই কষ্ট, এই খারাপ মানুষে ভরা পৃথিবীতে।



ভুচু একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়িব নিচে ত্রিপল পেতে শুয়ে, ডিফারেন্সিয়ালেব ক্র্যাক্ দেখছিল। দু ফোঁটা ডিফারেন্সিয়াল অয়েল পড়ল কপালে। বিরক্তিসূচক শব্দ করল ও একটা।

আজকাল নিজে এসব কাজ বিশেষ করে না। তবে গাড়িটা উধাম্ সিং সাহেবের। হাটচান্দ্রা শেল্যাক কোম্পানীই তাব প্রথম খদ্দেব ছিল। ধীরে ধীরে হাটচান্দ্রা জায়গাটা যত বড় হয়ে উঠেছে এই কোম্পানীর যত বাড়বাড়ন্ত হয়েছে ভুচুর কারখানাও তত বড় হয়েছে।

ত্রিপলটার উপরে আরও একটু নেমে শুল ও। বাঁ হাতের তেলো দিয়ে ডিফারেন্সিয়ালের তেলটা মুছল কপাল থেকে। ওব বাঁ দিকে একটা কমলা-রঙা ছায়া পড়ল হঠাৎ। অথবা, কে জানে কেন, রোদের রঙ হঠাৎই হালকা কমলা হয়ে গেল।

ভুচু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, একজোড়া কোলাপুরী চটির উপর সুন্দর গড়নের ফর্সা একজোড়া মেয়েলি পা। পায়ের পাতাদুটি ঘিরে হাল্কা সবুজ জরির পাড়ে মোড়া কমলা রঙা ইড়িকালি শাড়ি। মধ্যে অতি-হাল্কা সবুজরঙা চেক। প্রিয়া তেণ্ডুলকাব ঠিক এই রকম একটি শাড়ি পরে এসেছিলেন এখানে। গিরিশদার বম্বেবাসী এক বন্ধুপত্নী ছিলেন এখানে তখন। উনিই নামটি বলেছিলেন শাড়ির। মারাঠী শাড়ি।

পা দেখেই পায়ের মালিককে চিনল ভুচু। এমন পা রোজ পড়ে না এই কারখানায়। হুদা কী যেন বলল একটা। ওর কথা শেষ হবাব আগেই হড়বড়িয়ে উঠতে গেল ভুচু। মাথাটা ঢুকে গেল ডিফারেন্সিয়ালের সঙ্গে। ততক্ষণে হুদাও উবু হয়ে বসে গাড়ির নিচে মুখ বাড়িয়েছে। ভুচুকে খবরটা দেওয়ার জন্যে। ভুচুর মাথাও ঠুকে গেল বলে একটু অবাক হল হুদা। উস্তাদকে অনেকদিন ধরেই দেখছে গাড়ির নিচে কাজ করতে। মাথা ঠুকে যেতে পারে কখনও যে ওস্তাদের তা ওর জানা ছিল না।

বাইরে বেরিয়েই কপালে হাত দিল ভুচু।

কী হল ?

রুষা বলল।

নাঃ। ও কিছু না।

কিছু না কি ওস্তাদ ? কেটে গেছে যে ! ডেটল লাগাও। এই, রামু, দৌড়ে যা।

ভুচু বলল, কপালেবই দোষ।

রুষা হাসল। সে কথা শুনে।

রুষাকে নিয়ে ওব ঘবে এল। চেয়ারটা ঝেড়ে দিল ঝাড়ন দিয়ে। লজ্জিত গলায় বলল, যা ধুলো ! ভদ্রলোকদেব এখানে বসানো যায না। পাখাটাকে 'অন্' কবে খুলে দিল। ততক্ষণে রামু ডেটলে তুলো-ভিজিযে নিয়ে এসেছে। ডেটল লাগানোর পর ব্যাণ্ড-এইডও লাগালো। ঘরের ড্রয়ারেই ছিল।

ভুচু বোকাবোকা ভাবে কিছু বলতে হয তাইই বলল, পৃথুদা অন্যরকম ছিল ত। মানে, আমি তাঁকে 'ভদ্রলোক'দেব মধ্যে ধবতাম না। উনিও আমাকে 'ছোটলোক' ভাবতেন না।

হ্যাঁ। উনি মহৎ লোক ছিলেন।

রুষা বলল, মুখ নামিয়ে।

ভুচু বুঝল না, 'মহৎ' কথাটা ঠাট্টাব, না সত্যিই প্রশস্তির।

রুষাব মুখের দিকে তাকাল, চোখ দুটি খুঁজল, কিন্তু চোখ নামিয়ে বসেছিল রুষা। চোখ-ছাড়া মুখেব মানে বোঝা যায় না, মানে হযও না হয়ত কোনো।

চুপ করে বইল ভুচু।

কালও সারা রাত ঘুমোতে পারেনি ভুচু। ছটফট করেছে বিছানায়। একবার বারান্দার চৌপাইতে এসে শুয়েছে আবার ঘরে গেছে। সারা শরীরে জ্বালা। দু বার চান করেছে রাতে। সন্ধেবেলা চান করা সত্ত্বেও। তবুও ঘুম হয়নি। শেষ রাতেই যা ঘুমিয়েছিল একটু। ভোর ছটার পর কারখানায় ঘুমোনো যায না। দু শিফটে কাজ হয়। ছটা থেকে বারোটা, বারোটা থেকে ছটা। সকাল নটা আব বিকেল তিনটেয় চায়ের জন্যে পনেরো মিনিট কাজ বন্ধ থাকে শুধু।

সাবা রাত গা-জ্বালা কবেছে। ছটফট কবেছে শুধু রুষাবই মুখ ভেবে। চোখে ভেসেছে তাবই হাসি। গলার স্বর কানে বেজেছে। রুষাময় যে রাত, তা পোযানব পব রুষা নিজে এসে সামনে বসাতে কিন্তু আর জ্বালা নেই কোনোরকম। প্রলেপ লেগেছে ভাললাগার সব জ্বালারই উপরে।

রুষা বলল, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। হয়ইনি বলতে গেলে।

চমকে উঠল ভুচু। বলল, কার ?

আমার।

রুষা বলল।

ওঃ। বলেই, কথা ঘুরিয়ে বলল, কি খাবেন বৌদি ? নাস্তা করে এসেছেন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। কিচ্ছু খাবো না। ব্রেকফাস্ট করেই ত এলাম।

তা কি হয় ? কিছু খান। চা অথবা কফি অন্তত। আমি করে দিচ্ছি এক মিনিটে। অতিথি কিছুই না খেলে গৃহস্থর অকল্যাণ হয়।

রুষা হেসে বলল, গৃহস্থই বটে ! তারপর একদৃষ্টে ভুচুর চোখের দিকে চেয়ে বলল, তোমার কি ধারণা, আমি তোমার এখানে খেতেই আসি ?

অপ্রস্তুত হয়ে গেল ভুচু। বলল, কী যে বলেন ! না, না, সে কি, আমি··· আপনি ত কাজেই আসেন। বলুন, আর কি করতে পারি আপনার জন্যে।

তাইই ভাবছি। কী আর করতে পারো ! পুরোনো বাড়িতে এনে আবার নতুন করে তোমরাই বসালে। ভাগ্যিস ফার্নিচারটার কিছুই নিয়ে যাইনি। মনে মনে আমার একটা প্রিমনিশান ছিলই, জানো···।

তাহলে, গেছিলেন কেন ?

তাইই ত ভাবি। তোমরা ত শিকার করতে। এখনও হয়ত কর লুকিয়ে-চুরিয়ে। ভাল জানবে তোমরা আমার চেয়ে। কোনো কোনো হরিণী কি দ্যাখোনি ? যারা জঙ্গলের গভীরের নিশ্চিন্ত-নিরাপদ অন্ধকার ছেড়ে শীতের সকালের রোদ-পড়া খোলা মাঠে ঘাস খেতে আসেই,

শিকারির গুলি খেতে পারে যে তা জেনেও ?

দেখেছি।

মুখ নামিয়ে ভুচু বলল।

আমিও সেরকমই। গুলি লাগতে পারে তা জানতাম। তবে, লাগবেই যে, তা জানতাম না। অনেক হরিণীই ত বেরিয়ে আসে খোলা-মাঠে। সকলেই কি মরে ? বলো ভুচু ? অনেকে ত নিরাপদে ফিরেও যায়।

ভুচু একটা সিগারেট ধরালো লাইটাব জ্বেলে। বলল, কফি খান বৌদি।

বলেই, উঠল।

রুষা বলল, আমাকে তুমি বৌদি বোলো না।

বলব না ? কেন ? তবে কি বলব ? বৌদিই ত বলতাম !

আমার একটা নাম ত আছে। তোমার এক-সময়ের দাদার সঙ্গেই যখন আমার আর সম্পর্ক নেই কোনো, তখন এই মিথ্যে সম্পর্ক বোঝা তুমি অথবা আমি বইবই বা কেন ? তুমি আমাকে রুষা বলেই ডেকো। যা আমার নাম।

বেশ ! ভুচু বলল।

কিচেনে গিয়ে গ্যাসটা জ্বালতে গিয়েই ভুচুর আঙুল পুড়ে গেল। এও জীবনে প্রথম। জীবনে "প্রথম" অনেক কিছুই ঘটছে আজ। সকাল থেকে। গ্যাসের নীলচে-কমলা আগুনের শিখার দিকে চেয়ে কেটলিতে জল ভবে বসাতে বসাতে ও ভাবছিল বৌদি, থুড়ি রুষা জানে না যে, রোদ-পড়া, বিপজ্জনক কিন্তু বড় লোভনীয় খোলা মাঠে শুধু হরিণীরাই নয়, কিছু শিঙা হরিণও আসে জীবনের স্বাদু ঘাস খুঁটে খেতে। এবং কাছাকাছি শিকারি থাকলে তার বুকেই গুলি লাগে সবচেয়ে আগে। ভাল শিকারি "হরিণীকে" গুলি করেন না। মাবা বারণ। আইনের বাবণ ; বিবেকেরও।

দু-কাপ কফি ও কুচো-নিমকি নিয়ে ও ঘরে এল। দেখল, রুষা ঘুরে ঘুরে তার ঘর দেখছে। দেওয়ালের ছবি, বেড-কভাব, চেয়াব-কুশান ফায়াব-প্লেসের ম্যান্টেলের উপর রাখা টুকিটাকি। ওর শিশুকালের একটি দাঁত-ফোকলা ফোটো। মা বাবার বিয়েব ছবি। কালো হয়ে গেছে। স্মৃতির প্রায় সবই কালো হয়ে হাবিয়েই গেছে ভুচুর, বিশেষ করে শৈশবের সুখস্মৃতি। এ ফোটো কটি যে কী করে এত ঝড়ের মধ্যে বেঁচে গেল, তা ভাবলেও অবাক লাগে।

বাঃ। এই ভদ্রলোক কে ? কী সৌম্যশান্ত চেহারা। মনে হয় কোনো মিশনারী !

উনি আমার বাবা।

বাঃ ! মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলল, রুষা। তারপর চেয়ারে বসে, পাশের টেবল-ক্লথ মোড়া তেপায়া থেকে উজ্জ্বল হলুদ-রঙা পোর্সিলিনের কফির মাগ্ তুলে নিয়ে বলল, তোমার রুচি কিন্তু ভারী সুন্দর। সত্যি বলতে কি তোমার মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, টাইডী হ্যাবিটস্-এর এমন গোছানো স্বভাবের পুরুষ-মানুষ আমি দেখিনি আগে। অথচ তুমি ধুলো ময়লার মধ্যেই থাকো।

লজ্জা পেল ভুচু। বলল, গোছানো ঐ বাইরেটাই। ভিতরে নয়।

ভিতরে মানে ?

চোখ তুলে বলল, রুষা।

মানে, মনের কথা বলছি। সব এলোমেলো হয়ে আছে।

ও !

বলেই, চোখ নামিয়ে নিল রুষা।

কেমন হয়েছে ? কুচো নিম্‌কিগুলো ?

ভুচু জিজ্ঞেস করল।

ও। বলতে যাচ্ছিলাম। দারুণ হয়েছে। রেসিপি কি ?

হাসল ভুচু। হাঃ ! কুচো নিমকির আবার রেসিপি ! তবে, একটু বেশি ময়ান্ দিয়ে মাখতে হয় ময়দাটা। মধ্যে কালো জিরে, সামান্য শুকনো লংকার গুঁড়ো, কারিপাতা আর ধনেপাতাও কুচিয়ে

দিই যখন মাখি। খাই ত একাই। অল্পই বানাই, শনিবার রাতে। সারা সপ্তাহ চলে যায়।

তাইই ? বলে হাসল রুষা। বলল, তোমার মতো স্বনির্ভর পুরুষ বড় একটা দেখা যায় না। কোনো মেয়েই কখনও কষ্ট দিতে পারবে না তোমাকে। অন্য ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, তোমার যে স্ত্রী হবে, সে খুব সুখী হবে।

ভুচু বলল, মোটর মেকানিকের আবার বিয়ে !

কেন ? নয় কেন ?

বোকার মত ভুচু বলল, নয়। এইই…

আচ্ছা। খাওয়া-দাওযা ত হল। এখন বলি যে জন্যে আসা। দুটি কথাই বলতে এসেছি আমি। ইন্ ফ্যাক্ট, একটি জিজ্ঞেস করতে ; অন্যটি বলতে।

বলুন।

ভুচু বলল দু হাতে কফির মাগটি বুকের কাছে তুলে ধরে।

ভিনোদ ইদুরকার কোথায় ? কি করেছো তোমরা ওকে নিয়ে ?

ভুচুর ভিতরটা ছটফট করে উঠল। মিথ্যা কথা বলতে গেলেই ভীষণ কষ্ট হয ওর। ঘাড়ের কাছে ব্যথা করতে থাকে। মনে হয়, দম বন্ধ হয়ে যাবে। তবু, মাথা যতখানি নাড়া প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকই বেশি এবং অনেক জোবে নেড়ে বলল, জানি না।

জানো না ?

রুষা স্থির চোখে চেয়েছিল ভুচুর দিকে।

ভুচু আবারও মাথা নাড়ল। এবার আরো জোরে।

কফি-মাগটা তেপায়াতে নামিয়ে রেখে রুষা বলল, ঠিক আছে। এ নিয়ে এখন আব কোনো প্রশ্ন করব না। শুধু এইটুকু বলো যে, ইদুরকারের কাছ থেকে আমার বা মিলির কোনো বিপদের আশংকা কি কখনও আছে ?

প্রয়োজনের চেয়ে আবারও অনেক বেশি জোবে মাথা নেড়ে ভুচু বলল, না, না।

আর তোমার ? কোনো বিপদের আশংকা কি আছে তোমার ওর কাছ থেকে ? ওর লোকজনের কথা আমি বলছি না ভুচু, ওর নিজের কাছ থেকে বিপদ আছে কি না তাইই জানতে চাইছি।

না, না। কিছুই নেই। এবারে আরো জোবে মাথা নাড়ল ভুচু।

রুষা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খুব দুঃখিত দেখালো ওকে এক মুহূর্ত। পরক্ষণেই মুখে স্বাভাবিক প্রশান্তি ফিরে এল। ভুচুর চোখে চোখ রেখে রুষা বলল, আমার প্রশ্নর উত্তর আমি পেয়ে গেছি। এতটার দরকার ছিল কি ? পৃথুরইমতো সবকিছুই বাড়াবাড়ি কর তোমরা। এখন তোমার জন্যেও সব সময় দুশ্চিন্তা থাকবে ভুচু। খারাপ মানুষদের অনেকগুলো জীবন। তারা মরলেও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। সুযোগ খোঁজে তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা।

আমার জন্যে ভাববেন না। ঠিক আছি আমি। আপনি কি দুঃখিত বৌদি ?

নই। আবার হ্যাঁও। অনেকদিনেরই পরিচয়। এতটা না করলেও পারতে তোমরা। আমি বুঝিনি যে তোমরা…

উপায় ছিল না। আপনাদের বিপদ আরো বাড়ত।

আমার বিপদ বেড়েইছে। কমেনি।

কি বিপদ ?

মিলিকে নিয়ে।

কি করেছে মিলি ?

হয় যা এই বয়সে, সিনেমা স্টার, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়দের সঙ্গে মনে মনে প্রেমে পড়ে মেয়েরা। মেন্টালী ডিসঅ্যারেড্ হয়ে যায়। হিস্টিরীক্। সেই রকমই। হাইট অফ ইনফ্যাচুয়েশান্। জানি না, শারীরিক কোনো ইনভল্ভমেন্ট ছিল কি না। এখনও জানি না। মেয়ে ত মুখ বুজে আছে। তুমি ত জানো ভুচু যে, পৃথুর ফ্যামিলিতে পাগলামি ছিল। আমি খুবই ভয় পেয়ে গেছি।

আমাকে হেল্প করো। তোমার পৃথুদাকে লেখো। শুনলে আমাকে মেরে ফেলবে সে।

অন্য কাউকেই মারবার লোক পৃথুদা নয়। ডাকু মগনলালের বেলায় একসেপশান হয়েছিল। তাও ত নিজের জন্যে মারেনি। মারলে, একদিন নিজেকেই মারবে। তাকে আমি চিনি। আপনার কোনোই ভয় নেই। তবে, মিলির জন্যে সত্যিই চিন্তার কারণ আছে। দেখি, গিরিশদার সঙ্গে পরামর্শ করে যা করার করছি। তাছাড়া, পৃথুদা ত আগামী সপ্তাহে আসছেই। বলেছে, জানাবে কবে আসবে। নেক্সট রবিবারের মধ্যে আসছে। টুসুকে নিয়ে। টুসুর স্কুল কামাই হবে তা উনি চান না। এখন ত অসুবিধেও নেই।

কার অসুবিধে ?

অন্যমনস্কর মতো বলল রুষা।

না, মানে পুরনো বাড়িতে ত এসেই গেছেন আপনারা !

হ্যাঁ।

অন্য কি বলবেন ? কথাটা বললেন না ?

ও হ্যাঁ। আমি তোমার এই কাবখানায় আসি, সেটা ভাল দেখায় না। অবশ্য লোকভয়ের আমার আর কীইই বা আছে। কিন্তু আমি চাই তুমিই দিনে কম করে একবার আমার কাছে আসো। বেশিবাব আসলেও আমার আপত্তি নেই। জানো ভূচু, ইদুরকারেব বাড়ি ছেড়ে পরশু সকালে যখন চলে এলাম, ভেবেছিলাম একা একা পুরুষহীন হয়ে দিব্যি বেঁচে থাকা যাবে। উইমেন্‌স্ লিব্-এর চূড়ান্ত করব। কী জানি, হয়ত বম্বে ব্যাঙ্গালোর দিল্লি কলকাতায় হলেও হতে পারে, তবুও এই দেশে এই বকম জায়গায় এখনও মেয়েদেব জীবনে অনেকই সমস্যা, কোনো পুরুষের সাহচর্য ছাড়া বাঁচা ভারী মুশকিল। হয়ত মিলিদেব জেনারেশান পারবে। তখন অবস্থা অন্য রকম হবে।

একটু চুপ করে থেকেই রুষা বলল, তা বলে ভেবে বোসো না আবার যে তোমাকে অন্য কিছু বলছি। জাস্ট সাহচর্য।

বলেই উঠল। বলল, চলি।

এসেছেন কিসে ?

রিকশায় ?

যাবেন ?

রিকশায়।

এখানে ত রিকশা পাবেন না। ছেড়ে দিয়েছেন ?

হ্যাঁ। মোড়ে গেলেই পাবো।

কেন ? আপনাকে হুদা ছেড়ে দিয়ে আসবে।

হুদা ফুদা জানি না, তুমি নিজে দেবে ত চল, নইলে রিকশাতেই যাব।

বোঝে না, এই মেয়েদেব কিছুমাত্রও বোঝে না ভুচু। পামেলাকেও বোঝেনি।

জীপটা বাড়ির সামনে আসতেই রুষা বলল, বিকেলে এসো। গিরিশদাকে বলার আগে তোমার দাদাকে বোলো। শ্রীরামচন্দ্রর লক্ষ্মণ ভাই তুমি। ব্যাপারটা তাকে জানানো দরকার।

ঠিক আছে। ভুচু বলল।

রুষা পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে সুন্দর সোনালি হাত তুলে হাত নাড়ল। ডান হাতে রিস্টওয়াচ। বাঁ হাতে একটি মুক্তোর বালা। সৌন্দর্যর প্রতিমূর্তি যেন ! হিন্দুদের সরস্বতী প্রতিমার মতো, নিরাভরণ কিন্তু মর্যাদায় মোড়া। এই মেয়ের সঙ্গেও ঘর করতে পারল না পৃথুদা ! মানুষটা সত্যিই একটা অজীব আদমী। অনেকে বলে না ! ঠিকই বলে।

জোরে গরম হাওয়া লাগছিল গায়ে। চোখে মুখে। জীপ চালাতে চালাতে ভুচু ভাবছিল, সৌন্দর্যর কোনো বিকল্প নেই। সৌন্দর্য শুধু তার নিজের জোরেই পৃথিবীর সব পাওয়া পাবার দাবী রাখে।

পানের দোকানে জীপটা রাখল। ছোঁড়াটা এনে দেবে পান, জর্দা, সব। জানে দোকানী।

স্টীয়ারিং-এর উপর হাত, হাতের উপর থুতনী রেখে ভুচু ভাবছিল, কেন লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেল না ও জীবনে ? জুতো পালিশ করেই কেন শৈশব কাটাতে হল ? ও-ও যদি অন্য দশজন ভদ্রলোকের মতো রেসপেক্টেবেল হত তবে ত আজ তার বুকে এত কষ্ট হতো না। রুষার মতো কোনো মেয়ে, বাস্তবে ভুচুর মত মোটর মেকানিকের স্বপ্নেই থাকে শুধু। সে যদি বহুভোগ্যা এবং পরিত্যক্তাও হয়। একটা ক্লাস-এর ব্যাপার তবুও থাকেই। এই "ক্লাসলেস সোসাইটির" দেশেও। রোজগারভিত্তিক ক্লাস এ নয়, মানসিক স্তরের, বেড়ে ওঠার, শিক্ষার ক্লাস। ভেতরে ভেতরে কেউ অন্য ক্লাসের হয়ে উঠলেও বাইরের ছাপ আর তকমা না থাকলে তার দাম দেয় না কেউই। ভুচু শত চেষ্টাতেও পৃথু বা ভিনোদ হয়ে উঠতে পারবে না। সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং মহিলারাই এই কমপ্লেক্সে ভোগেন। পৃথু ঘোষই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। মানুষটার কাছে সব মানুষের সমান দাম ছিল। উধাম সিং আব ভুচু আর দিগা বা হুদাব মধ্যে কখনও কোনো ভেদ করেনি সে। রুষা ইচ্ছে করলেও কি পৃথুর মতো হতে পারবে কখনও ? মনে হয় না।

পানটা মুখে পুরে প্রথম পিকটা ফেলে দিয়েই রুষাব প্রতি ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠল ওর। ভুচু কি রুষার চাকর, না পৃথুদার চাকর ? কেন সে সেবা করতে যাবে তাদের এমন করে ? পৃথুদার চামচেগিরিতে জীবনের অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ইনি এলেন হুবী-পরী। এটা করো সেটা করো। মারো গোলি ! যাবে না ও আজ বিকেলে। ভারী বয়েই গেছে ভুচুব ! অনেকই দেরী হয়ে গেছে। নিজের কথা ভাবার সময় হয়েছে এবারে।

দিসাওয়াল সাহেবের সঙ্গে পেঞ্চ পার্কে গেছে টুসু। দিসাওয়াল সাহেবের কাজ আছে। পারিহার সাহেবের সঙ্গে। গতকাল সকাল থেকেই জ্বর হয়েছে পৃথুব। মনটাও একেবারেই ভাল নেই। মাঝে মাঝেই এমন হয়। দু তিন মাস পব পর। এক একটা স্পেল দিনসাতেক থাকে যখন বড্ডই মন-মরা লাগে। কেবলই মনে হয় আত্মহত্যা করে। সেই সময় হাতের কাছে পিস্তলটাকে বাখতে চায় না! ভাবে, কারো কাছে জিম্মা দিয়ে আসে। কালই ভেবেছিল, দিসাওয়াল সাহেবকে দেবে। হযনি দেওয়া। পিস্তলের খাঁজকাটা বাঁটটা আব নীলচে-কালো মসৃণ ছোট্ট নলটা এই বকম সময ওব মুখে যেন চেয়ে থাকে। বড় ভালবাসতে ইচ্ছে করে সেটাকে। টুসুদের ফিবতে ফিরতে রাত হযে যাবে। দিসাওযাল সাহেব তাঁর একার সংসারের বাক্স-প্যাটিরা ঘেঁটে একটি ফিল্ড গ্লাস বেব কবে দিযেছেন। ডিসপোজাল থেকে কিনেছিলেন জব্বলপুর থেকে। লেন্সে বোধহয ফাঙ্গাস পড়ে গেছে। মুছেটুছে আহ্লাদে ডগমগ হয়েছে টুসু। পাখি দেখবে জঙ্গলে।

পৃথু শুয়েছিল। ঠুঠা বাইগা পাশে, মাটিতে বসে মাথাব চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল। একটু আগে ওডিকোলোন ভিজিয়ে মাথায় পটিও দিয়েছিল। অসুখ-বিসুখ হয় না পৃথুব। কিন্তু হলে আটানব্বুই জ্বরেও বড় কাবু করে। রুষা হাসত ওকে নিয়ে। বলত, আতুকী ! বড়লোকের লালু ছেলে !

বাইরে দাঁড়কাক ডাকছিল। ক্যাকটাইগুলো অর্কিডস আব প্লান্টসগুলোকে বাঁচানোই এখন মুশকিল। মে এবং জুন মাসের তিন সপ্তাহ ওদের যত্ন লাগবে খুবই। কখনও কখনও জুনের শেষ অবধিও লাগে। বৃষ্টি না আসা অবধি। যদিও সীওনী অনেকই উঁচুতে, তবু এই দুটো মাস ওদের না দেখলে চলে না। রোদ পড়ে ঝকঝক করছে বাবান্দাটা ফুলে আব পাতায় আর অর্কিডে আব ক্যাকটাইতে। দাঁড়কাক ডাকছে। কয়েকবাব ডেকে উড়ে গেল। মৌটুশকি পাখি এসেছে। কিসকিস করে ডাকছে।

গেটটা খোলার শব্দ হল। আবাব বন্ধ করাব।

কে এল ? পৃথু বলল।

কৌন জানতা ? উদাসীন গলায় বলল ঠুঠা। পৃথিবীর সব কিছু সম্বন্ধেই ঔৎসুক্য চলে গেছে মানুষটার। এই রকমভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ও জঙ্গলে মবে গেলেই ছিল ভাল। সকলকেই যে বেশিদিন বেঁচে থাকতেই হবে তার মানেই বা কি আছে ? দেওয়ার কিছু না থাকলে চলে যাওয়াই ভাল। পৃথুও সেই কথাটাই ভাবছে সকাল থেকে। এই রকম মন খারাপ যখন হয় তখন একা একা ভাবতে ভাবতে ওর দু চোখ জলে ভরে আসে। কত কীই যে মনে পড়ে তখন।। বাবাব কথা,

মায়ের কথা, ছেলেবেলাব কথা, কষার সঙ্গে বিযেব দিনেব কথা, বিযেব পব হাটচান্দ্রা চলে আসাব আগে কুর্চির সঙ্গে শেষ দেখা হওযাব দিনেব কথা। কে জানে, কেন এমন হয ? ভাবে আব চোখ ভেসে যায় জলে। অথচ কাউকে কিছু বলতে বা বোঝাতেও পাবে না।

কুন্তী এসেছে। ঠুঠা বলল।

কুন্তীকে দেখেই সে কেমন ছটফট কবে উঠল। পৃথুব মাথায বাখা তাব হাতেও সেই চঞ্চলতাব ছোঁযা লাগল। কুন্তী কিন্তু ধীব স্থিব, ঠুঠাব দিকে তাকাল বটে একবাব, কিন্তু সে যে ঘবে আছে তা যেন সে দেখেও দেখল না। পৃথুকে বলল, দিদিনে খাত ভেজিন।

তাবপব চিঠিটা দিযে ঠুঠাকেই বলল, জ্বব কত ?

আছে।

তুমি ভাল আছ ?

ঠুঠা কুন্তীব এই প্রশ্নে একেবাবে হকচকিযে [illegible]।

থতমত হযে বলল ভাল [illegible]।

তুমি ?

আমি ভালই থাকি। সব সময।

পৃথু চিঠিটা পডল। "পৃথুদা আমি সাবুব খিচুডি বেঁধে নিযে যাচ্ছি। সাবা দুপুব থাকব। অত্যাচাব কববেন না শবীবেব উপবে। আমি খেযেই যাব। বিশুকে ঝামেলা কবতে মানা কববেন।"
—কুর্চি

কুন্তীকে বলল, ঠিক আছে।

পৃথু ঠুঠাকে বলল, ঠুঠা খাওযাও কুন্তীকে। বিশুব কাছে নিযে যাও। কী হলে তুমি ?

না সাহাব। অনেক কাজ আছে আমাব।

কাজ ত চিবদিনই থাকবে। কাজেব মধ্যে মধ্যেই একটু আনন্দ কবে নিতে হয নইলে কি আব কবা যায ?

কুন্তী হাসল। বাঁ হাত দিযে সুন্দব অথচ ত্রস্ত ভঙ্গিতে বুকেব ও মাথাব আঁচল টানল। তাবপব চলে গেল ঠুঠাব সঙ্গে।

ঘোবেব মধ্যে ঘুমিযেই পডেছিল পৃথু। হঠাৎ গেট খোলাব শব্দে ঘুম ভাঙল। কুর্চি এল কি ? না, কুন্তী গেল। এতক্ষণ কুন্তী কী গল্প কবছিল ঠুঠাব সঙ্গে কে জানে ?

বোদ বেশ চডা হযেছে। বাথরুমে গিযে মাথা ধুল এবং গা স্পঞ্জ কবল। দাডি কামাযনি কাল। ইচ্ছে কবল না আজও। গা স্পঞ্জ কবতেই খুব দুর্বল লাগল। ফিবে এসেই শুল পৃথু। আবাব ও ঘুমিযে পডল।

অনেকক্ষণ ঘুমোবাব পব চোখ খুলেই দেখল কুর্চি পাযেব কাছে মোডা পেতে বসে তাব মুখেব দিকে চেযে আছে। জানালাব দিকে পৃথুব মাথা ছিল তাই জানালা দিযে এক আকাশ আলো এসে কুর্চিব পবিত্র ঢলঢলে মুখটিতে পডেছে।

কী ? খুব ঘুমিযে ওঠা হল ! কখন থেকে বসে আছি পাযেব কাছে। কখন বাবুব ঘুম ভাঙবে।

জাগাওনি কেন ?

মাথা খাবাপ। বেগে যেতে যদি। মুখেব ভাব দেখে মনে হচ্ছিল "আমি স্বপনে বযেছি ভোব, সখী আমাবে জাগাযো না।

পাযে হাত বাখল চাদবেব উপব দিযে কুর্চি। হাত বুলোল একটু।

ওব নবম হাতেব পাতাব ছোঁযাতে গা সিবসিব কবে উঠল। কুর্চি ওব শবীবেব যে কোনো অংশে হাত ছোঁওযালেই বিদ্যুৎতবঙ্গ খেলে যায সঙ্গে সঙ্গে। সে কি শবীবেবই গুণ ? না মনেব ? কে জানে ?

খাবেন ত এবাবে ? দেখেছেন সাডে বাবোটা বেজে গেল !

জ্ববটা দেখবে না একবাব ?

সকালে দেখেছিলেন ?

নাঃ। বেশি ত নয়। তবু মনে হচ্ছে সকালের দিকে বাড়ে, বিকেলের দিকে কমে আসে। আবারও রাতে বাড়ে।

নিজের ডাক্তারী নিজে না করে ডাক্তার ডাকলেই ত হয়।

একগাদা কড়া কড়া ওষুধ দেবে। অসুখে যত না কাবু হয়েছে শরীর, ওষুধে তার চেয়েও বেশি হবে। তাইই যতক্ষণ পারি, না ডাকার চেষ্টা করি।

ভাল। থার্মোমিটার কোথায় আছে ?

ওহো ! থার্মোমিটারই ত নেই। একা মানুষের সংসার। দেখেছো ! ভুলেই গেছিলাম। তোমার বাড়ি থেকে আনতে পাঠাও না ঠুঠাকে।

হাসল কুর্চি। আমারও আছে না কি ? রায়নাতে ছিল। এখন আমারও ত একার সংসার।

চোখ নামিয়ে স্বগতোক্তির মতো,বলল ও,কোনোদিন দোকার সংসার হলে, তখনই দেখা যাবে।

পৃথু উঠে বসতে বসতে বলল, ততদিন জ্বরটা না হওয়াই ভাল বলছ ?

হ্যাঁ।

বলেই, হাসল কুর্চি।

লাগবে না থার্মোমিটার। ডাক্তারও লাগবে না। তুমি এসেছো,, সাবুর খিচুড়ি করে এনেছো নিজে হাতে, জ্বরের সাধ্য কি যে, সে আর থাকে ! ভালবাসার চেয়ে বড় ওষুধ কি আব আছে ? বলো ?

বলে, কুর্চির হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল।

আদবিণী বেড়ালনীর মত লজ্জায়, ভাললাগায় কুর্চি মুখ বাখল পৃথুর আস্ত পাটিব উরুর উপর। পৃথু আদবে ওব পিঠে ডান হাতটি বাখল। কালো ব্লাউজ, হলুদ তাঁতের শাড়ি, চোখে কাজল, কপালে কালো টিপ। হালকা কোনো প্রসাধনের গন্ধ উড়ছে। চান করে এসেছে। পিঠময় চুল ছড়ানো ভিজে চুলের তেলের গন্ধও মিশে গেছে প্রসাধনের গন্ধর সঙ্গে। ওব গলায় একটি সরু সোনার হার। লকেটটা এক পাশে ঝুলে নেমে এসেছে পৃথুর হাঁটুর পাশে। বারান্দা থেকে চড়াই ডাকছে। টালির ছাদেব ছায়া থেকে কামাতুর কবুতর।

পৃথু মুখ নামিয়ে কুর্চির সিঁথিতে একটি আলতো চুমু খেল। গা সিবসির করে উঠল ওব। কুর্চিও ছটফট করে উঠল ভালোলাগায়।

মনটা ভীষণই খারাপ হয়ে গেল পৃথুর। কুর্চির সঙ্গে যদি একসঙ্গে ঘর করে, রোজ রাতে একই খাটে শোয় পাশাপাশি ; তবে কি একদিন রুষার সঙ্গে সম্পর্কটা যেমন করে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গিয়ে মরে গেছিল তেমনি করেই এ সম্পর্কও মরে যাবে ? মরেই যদি যাবে ; তবে নতুন করে তার জন্ম দেওয়া কেন ? কে জানে ? কি হবে ? কোনো সম্পর্ক দারুণ ভাবে বেঁচে থাকে, কোনো সম্পর্ক মরে যায়। কোন্‌টা বাঁচবে আর কোন্‌টা মরবে, সাদা জার্মান স্পিৎজ কুকুরের বাচ্চাদের মতো আগে থেকে তা বলা যায় না। যেটির যত্ন করা হল, সেটিই হয়ত মরে যায়, যাকে দেখাই হলো না মোটেই, গাব্দা-গোব্দা হয়ে ওঠে।

আপনাকে না, আর আপনি বলতে পারছি না। পৃথুদা !

কুর্চি বলল, মুখটিকে পৃথুর উরুর উপরেই রেখে। তুমি বলব ? এবার থেকে ?

আপনিই ভাল।

উরু থেকে মুখ তুলে কুর্চি বলল, কেন ? তুমি নয় কেন ?

মনে হয় এই 'তুমি' সম্পর্কর উষ্ণতার মধ্যেই দুজন মানুষের সব শীত লুকোনো থাকে। দুজনেই ভাবে আমি ত ওরই, ওও আমার। এবং এটা ভাবলেই যতখানি না উচিত তার চেয়েও বেশি ইনফর্ম্যাল হয়ে যায় দুজনে। মানে, মেনি থিংগস আর টেকন ফর গ্রান্টেড। আর তখন থেকেই বোধ হয় সম্পর্কটার নিজেরই নষ্ট হয়ে যাবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। আপনিই রাখো আমাকে, তাতেই বেশি আপনার হয়ে থাকব তোমার, বেশিদিন। একটু দূরে থাকাই ভাল।

যা আপনার ইচ্ছা !

কুর্চির মুখে অভিমানের ছায়া ঘনিয়ে এল।

একটা কথা বলব?

কুর্চি বিছানা থেকে উঠে মোড়াতে বসে বলল।

কি? বল।

ঠুঠাদার কাছে শুনলাম যে, আপনি আগামী সপ্তাহে টুসুকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন হাটচান্দ্রাতে। রুষা বৌদি নাকি ফিরে এসেছেন?

ঠিকই শুনেছো।

ও। ঠিকই তাহলে?

হ্যাঁ।

এখানের চাকরি কি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন?

না ত! তেমন ত ভাবিনি।

টুসুকে কি ওখানেই রেখে আসবেন, যদি ফিরে আসেন?

ভাবছি। ওয়াইল্ড-লাইফ ফোটোগ্রাফারই হোক আর যাইই হোক স্কুলের পড়াশুনো অন্তত শেষ না করতে পারলে জীবনে ত কোনো ওপেনিংই পারে না। ও যে সময়ে বড় হয়ে উঠবে, সেই সময় অনেকই ভাল ভাল ছেলে এই দেশে ওয়াইল্ড লাইফ আর ওয়াইল্ড লাইফ রিসার্চ নিয়ে মেতে উঠবে। একটা নতুন জেনারেশান এসে গেছে কুর্চি। ওদের উপর আমার অনেকই ভরসা। ওরা

তাহলে রেখেই আসবেন? ওকে?

বললাম ত! ভাবছি।

আপনি? নিজে কি ফিরে আসবেন?

পৃথু তার দু চোখের দৃষ্টি দিয়ে কর্চির দু'টি চোখের একটুও বাকি না রেখে ভরে দিয়ে বলল, তাও ভাবছি।

কুর্চি বলল, ও।

আর কিছুই না বলে মুখ নামিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, খাবেন ত এখন? যাই। বিগুকে ওগুলো গরম-টরম করতে বলি। খাওয়ার ঘরে যাবেন? না এখানেই নিয়ে আসব, ট্রলি করে

এখানে আনলেই ভাল হয়। গায়ে হাতে পায়ে অসম্ভব ব্যথা। তুমি কেন কষ্ট করবে এত! বিগুকে বলো না!

কুর্চি উত্তর না দিয়েই চলে যেতে গিয়েও দরজার কাছে থেমে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে একটু হাসল। বলল, সম্পর্ক "তুমি"তে নামিয়ে আনতে এত আপত্তি কেন এখন বুঝছি তা।

দারুণ দেখাচ্ছিল কুর্চিকে। ওর মরালী গ্রীবায় ঋজু হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গীতে ঠোঁটের কোণের দুর্জ্ঞেয় হাসিতে। একটা ক্যামেরা থাকলে কুর্চির এই প্রোফাইল ধরে রাখত ও। যে নারীর হাসির মানে বোঝা যায়, সে হাসি ত' সস্তা তার মধ্যে কোনো রহস্য নেই। সস্তা কোনো কিছুর প্রতিই কোনো আকর্ষণ ছিলো না পৃথুর

পৃথু অনুমান করেছিল আগেই যে, কুর্চি এইসব প্রশ্ন করবে তাকে। কিন্তু কুর্চিকে যথাযথ উত্তর কেমনি দেবে কি করে? প্রথমত শেষ প্রশ্নটির যথার্থ তাৎপর্যই এখনও প্রাঞ্জল নয় ওর নিজেরই কাছে, হাটচান্দ্রা গিয়ে পৌঁছলে তারপরই তা প্রাঞ্জল হবে। এবং অর্থ প্রাঞ্জল হওয়ার পরও সেই প্রশ্নের উত্তর যে কি হবে, তাও এই মুহূর্তে পৃথুর একেবারেই অজানা। তাইই, কি করে জবাব দেবে পৃথু কুর্চিকে?

দেখা যাক। তার আধখানা জীবন আর একখানা পা পেছনে ফেলে রেখে এসেছিল একদিন হাটচান্দ্রা থেকে এখানে। এখানে এখন ফিরে আসবে আবার, যদি আসে, তবে আরও কি হারিয়ে আসবে কে জানে?

কর্চি, বিগুকে সঙ্গে করে খাবারদাবার সুন্দর করে ট্রলিতে সাজিয়ে নিয়ে এল। একটি ছোট

তোয়ালেকে ন্যাপকিন করে দিল। নিজে মোড়ায় বসে, প্লেটে খিচুড়ি বেড়ে দিতে দিতে বলল, খান। সাবুর খিচুড়ির মধ্যে পটল ফালি করে দিয়েছে। আলু, আঙুলের মতো কেটে। দারুণ স্বাদ হয়েছে। জ্বরের মুখেও উপাদেয় লাগছে।

পৃথু দেখল, কুর্চি মুখে-চোখে জল দিয়ে এসেছে। চোখের কাজল একটু লেগে গেছে গালে। কুর্চির গালে যে জায়গাটায় কাজল লেগেছিল ঠিক সেইখানেই একটা চুমু খেতে ভীষণই ইচ্ছা করল পৃথুর। কিন্তু চুমু না খেয়ে, চামচ করে সাবুর খিচুড়ি খেল : ইচ্ছা পূরণের আনন্দর তীব্রতার চেয়েও অনেকই সময়ে অপূর্ণ-ইচ্ছার নিবিড় আনন্দ তীব্রতর হয় যে, এ কথাটা ও জানে বলেই।



যেদিন রুষারা ফিরে এল এ বাড়িতে সেদিনই বিকেলে খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের ধবধবে সাদা অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা, কুচকুচে কালো আয়াটির সঙ্গে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ফিরে আসবার সময় পথের উপরেই ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেল।

মেটে-লাল কুকুরীটার এবং আয়ার কিছুই হয়নি।

খাণ্ডেলওয়াল সাহেব কুকুরটাকে একটি বড় ইউক্যালিপটাস গাছের নিচে কবর দিয়ে সাত দিনের মধ্যেই একটি কালো মদ্দা কুকুর নিয়ে এসেছেন, কুকুরীটার জোড়া হিসেবে। নতুন কুকুরটা দেখতে জংলী ; হিংস্র। ঘাড়ের কাছে কেশরের মতো আছে। প্রথম দুদিন কুকরীটা একটু ভয়ে একটু অপরিচয়ে, নবাগন্তুককে ঘাউ-ঘাউ করেছিল। দেখিয়েছিল, একটু ঢং-ঢাংও। এখন দিব্যি প্রেম হয়ে গেছে। এ ওর গা শুঁকছে, জিভ দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চাটছে একে অন্যের। এক জাতের কুকুররা সবাইই একই রকম, মানুষদের মতো আলাদা আলাদা নয়। ঐ কুকুরীটা কত সহজেই পুরোনো সঙ্গীকে ভুলতে পেরেছে। এবং নতুন করে নতুন সাথীকে নিয়ে অবলীলায় সুখীও হতে পেরেছে

রুষা ভাবছিল, রুষাও কি ঐ মেটে লাল কুকুরীটিরই মতো হয়ে উঠছে? অথবা উঠেছিল? কিংবা কোনোদিন হয়ে উঠবে?

মানুষ হওয়া কুকুর হওয়ার চেয়ে অনেকই কঠিন। এবং কষ্টেরও। কোনো মানুষীই কুকুরী হতে পারে না, মনুষ্যত্ব থেকেই যায় ছাই-ছাপা আগুনের মতো।

ভুচুর চোখের চাউনি, পৃথু এখান থেকে চলে যাবার পর, যেদিন থেকে ভুচুর সঙ্গে বাধ্য হয়েই যোগাযোগ করেছিল ও, সেদিন থেকেই রুষাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। পুরুষের মুগ্ধ চোখ তার দিকে কৈশোরের প্রথম দিন থেকেই ছিল। তাতে কোনো নতুনত্ব নেই। কোনো পুরুষের চোখে স্তুতি ছিল, কারো চোখে নির্ভেজাল কাম। কারো চোখে শুধুই মুগ্ধতা, নিছকই সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত গা-সিরসির ভাললাগা। সামান্য দু' একজনের চোখেই এমন ঝড়ের আভাস থাকে। সেই দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাওয়া, কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেই চোখে চোখ রাখলেও বুকের মধ্যে সেই ঝড়কেই আঁধি করে তোলা হয়। ঝড়কে আবাহন সব পাখিই করতে পারে, কিন্তু ঝড়ের পরে ডানা ভেঙে, বিচিত্রবর্ণ, নেতানো ঝরাপাতার সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হয়ে থাকবার মত মানসিক প্রস্তুতি থাকে খুব কম পাখিরই! ভারী ভয় করছে রুষার তাই কদিন ধরেই। ও যে ঘর-পোড়া। এ কথাও ও এতদিনে জেনেছে যে, ওর মধ্যে ডাইনীসুলভ কোনো ব্যাপারও আছে। পুরুষমাত্রই এমন অসহায় হয়ে পড়ে

ওর সামনে এসেই যে তা বলার নয়। অবশ্য মজা লাগত খুবই, যখন বয়স কম ছিল। মজা এখনও লাগে। তবে এই মজা অবিমিশ্র সুখের নয় যে, তাও জেনেছে এতদিনে। এই মজাই তাকে মজিয়ে ইদুরকারের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। এই মজার দামও দিতে হল অনেকই।

প্রত্যেক পাপের মধ্যেই বোধ হয় ফুলের মধ্যের কাঁটার মতোই প্রাপ্য শাস্তি সুপ্ত থাকেই [illegible] তার হুল ফোটাবে বলে। কবে যে ফোটাবে, তা আগে থেকে জানা যায় না, এইই যা। [illegible] পাপ? পাপ কি? রুষা, পাপ ত করেনি কোনো। মিলির দিকে হাত বাড়িয়ে পাপ করেছিল ইদুরকারই। রুষার মনে কোনোই পাপবোধ নেই। সে যা করেছে, তার জন্যে পৃথুই দায়ী [illegible] ঔদাসীন্য, আশ্চর্য অমানুষিক শৈত্যই ধীরে ধীরে তাকে ঠেলে দিয়েছিল ইদুরকারের দিকে। [illegible] বিবেক জানে, রুষার কোনো দোষ ছিলো না। না ইদুরকারের দিকে দৌড়ে যেতে [illegible] আসতে।

হাটচান্দ্রার থানার দারোগা এসেছিলেন। তাকে এবং মিলিকে জিজ্ঞাসাবাদও করে গেছেন অনেকক্ষণ ধরে। সারপ্রাইজিংলি কাম অ্যান্ড [illegible] ছিল কিন্তু মিলি। [illegible]—এই ও বলেছে যে, কী করে ভুচুরা ওকে উদ্ধার করেছে। অথচ এ কথা চেপে গেছে যে ভিনোদ তাকে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল এবং প্রায় রান ওভারই করেছিল। মিলি বলেছে যে, গিরিশদার গাড়ি তাকে উদ্ধার করেই ফিরে এসেছিল। ভুচুদের জীপকে ও দেখেনি সঙ্গে আসতে।

ইদুরকারের নিরুদ্দেশ হওয়াটা যে স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, এই সন্দেহটা রুষার এবং হয়ত দারোগারও, তা থেকেই হয়েছে।

ভিনোদ কোনো উইল করে যায়নি? কোনো উইল কি রুষার কাছে আছে?

দারোগা জিগেস করেছিলেন।

সম্পত্তি সব কি আপনিই পাবেন?

রুষা হেসেছিল। দারোগাকে বলেছিল, আপনি কতটুক জানেন আমার সম্বন্ধে? আমি কি ওর সম্পত্তি সব হাতিয়ে নেওয়ার জন্যেই ইদুরকারের কাছে গিয়েছিলাম বলে ধারণা আপনার?

জী না। বলে, দারোগা অনেকক্ষণ মুখ হাঁ করে বসেছিলেন।

রুষার মনে হচ্ছিল কোনো মাছি ঢুকে যেতে পারে মুখে অতক্ষণ হাঁ করে থাকলে। এই মিডলক্লাস মেন্টালিটির লোকগুলোকে নিয়ে পারা যায় না।

দারোগা বললেন যে, ইদুরকারের বাবার ওখানে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে সে সেখানেও যায়নি। পুলিস থেকে মার্সিডিস গাড়ির নাম্বার দিয়ে সব জায়গায় [illegible] করা হয়েছে। গাড়িটা খুঁজে বের করার খুবই চেষ্টা করছেন ওরা। ঐ গাড়ি ত লুকিয়ে [illegible] লুকোলেও লুকোনো যেতে পারে।

দারোগা বলেছিলেন।

ওরা কী যে করেছে ভিনোদকে কে জানে। পৃথুই কি বলে দিয়েছিল ওকে শেষ করে দিতে? নাকি এ ভুচুরই কাজ? হতে পারে ভুচু নিজেও করে থাকতে পারে। অন হিজ ওওন ইনিসিয়েটিভ ওর চোখে যা দেখে রুষা ইদানীং তাতে কিছুই অসম্ভব নয়। যে আগুনের ঝড়ের সংকেত পায় ও ভুচুর চোখে, সেই আগুন নেবাবার জন্যে, পৃথুকেও খতম করে দিতে পারে ভুচু। এই রকম মানসিক অবস্থায় একজন পুরুষ সবই পারে। কে জানে, ভুচু কখন বদলে গেল এমন করে? এতদিন ত পৃথুরই ছায়া ছিল সে।

শুধু রুষারই নয়, প্রত্যেক সুন্দরী নারীর মধ্যেই কোনো ডাইনী বাস করে নিশ্চয়ই। সে যে কখন কোন পুরুষের মনোজগতে কী ঘটনা ঘটায় তা আগের মুহূর্তেও বোঝা যায় না। সেই নারী নিজেও বোঝে না।

ভুচু বলছিল, পৃথু আসবে এ সপ্তাহেরই কোনোদিন। ও যা নরম মনের মানুষ। রুষার বুকে মুখ রেখে হয়ত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। দূরে ছিল তাইই সহজে ভুলে ছিল, কাছে এলেই, পৃথু হয়ত ভেঙেই পড়বে হাঁটু গেড়ে। [illegible] জানে। রুষাকে চিরদিনই এক ধরনের ভয়ই পেয়ে এসেছে পৃথু।

ঠিক ভয় হয়ত নয়, ভালোবাসারই, অথবা শান্তিপ্রিয়তারই এক ধরনের প্রকাশ। রুষা যদি ওকে আবারও এক সঙ্গে থাকতে বলে, তবে পৃথু যে খুশি হয়েই থাকবে তাতে রুষার নিজের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কুর্চির কাছে পৃথু হয়ত যেতে পারে, গেছেও হয়ত ; যেমন প্রস্টিট্যুট বিজলীর কাছেও গেছিল এক সময়, কিন্তু সেই যাওয়া শুধুই শরীরের জন্যে। মদ্দা কুকুর যেমন করে অল্প-চেনা মাদী কুকুরীর কাছে যায়, অনেকটা তেমনই। কিন্তু রুষার ত কোনোই বিকল্প নেই, থাকতে পারেও না, কোনো পুরুষেরই কাছে। সে কথা রুষা ভাল করেই জানে। সে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী !

ভিনোদের সঙ্গে কী করে যে ব্যাপারটা ঘটে গেছিল। সিলী ! খুবই ভাল অভিনেতা ছিল ভিনোদটা ! নইলে, পুরুষের আবার মন ! শরীর ছাড়া কি কিছু আছে ওদের ? তাই-ই, শেল্যাক কোম্পানীর নন্-রেসিডেন্ট ডিরেকটর, হ্যাণ্ডসাম, পাইপ-স্মোকিং—ইংলিশম্যান, মাইকেল হাও, ক্লাবের টেম্পোরারী মেম্বার, নাগপুর থেকে আসা মিঃ ঘোড়পাড়ে, বিষেণ নারাং অথবা মিঃ এম [illegible] এই সব মানুষের সঙ্গে রুষার ফীজিক্যাল অ্যাফেয়ারের মধ্যে আর ভিনোদের সঙ্গে সম্পর্কর মধ্যে একটু তফাৎ ছিল। ওগুলো শুধুমাত্র একইবারের সম্পর্ক। এবং পিওরলি ফীজিক্যাল ছিল। আর ভিনোদেরটা পৌনঃপুনিক। একটু একটু মন মিশোনো। ভিনোদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সকলেই জেনে গেছিল। কিন্তু অন্য সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে সেই সব দূরে-যাওয়া পুরুষরা আর রুষা নিজে ছাড়া একজনও ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না আজ অবধি। বুদ্ধিমতী নারীমাত্রই যাযাবরের সঙ্গেই শারীরিক সম্পর্ক করতে ভালবাসে। শিকড়, স্থায়ী ঠিকানা মানেই বিপদ।

অনেক পুরুষই যে তাকে চায় একথা জেনে খুবই ভাল লাগত রুষার। এদেশের মেয়েদের এখনও ত এছাড়া অন্য অ্যাডভেঞ্চার কিছু নেইও। বৈচিত্র্যের এবং অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজেই তাই ও তেমন তেমন এক্সট্রা-অর্ডিনারী পুরুষদের অঙ্কশায়িণী হয়েছিল। ওয়েল্। ইট ওজ্ গ্রেট ফান্। রিয়্যালী। ভ্যারাইটি ইজ দ্যা স্পাইসেস্ অফ্ লাইফ্ ! একজন নারী যখন চিতার অথবা কবরের সামনে শায়িত থাকেন তখন তাঁর সুগন্ধি শীতল, সুসজ্জিত, ফুলে-ঢাকা নিথর শরীরের মধ্যে অনেকই রহস্য, অনেকই গোপন কথাও বুঝি স্তব্ধ হয়ে থাকে আগুনে জ্বলে যাবার বা ঠাণ্ডা নরম মাটির গভীরের শৈত্যে জমে থাকার অপেক্ষায়। নারীর জীবনের রহস্য সেইই একা জানে। সেই সব গোপন কথাগুলিই বোধ হয় নদীপারের নির্জন শ্মশানভূমির তীব্র গন্ধ ধুলিকণা হয়ে উধাও গ্রীষ্মবাতাসে উড়ে বেড়ায় অথবা ছোট ছোট লাল হলুদ গোল গোল ঘাসফুল হয়ে ফুটে ওঠে গোরস্থানে, পরের বসন্তর শুরুতে, কবরের সামনে। সেই উধাও হাওয়া আর ঘাসফুলের মানে কেইই বা খোঁজে ?

মেরী বলল, ব্রেকফাস্ট লাগিয়ে দিয়েছি মেমসাহেব।

মিলি কি করছে ?

মিলিও এসেছে টেবলে।

খাচ্ছে ?

হ্যাঁ।

কেমন বুঝছ্ মেরী ?

আগের থেকে ভাল। অনেকই ভাল। মেমসাহেব।

ওষুধগুলো দিচ্ছ ত' ? সময়মত ?

হ্যাঁ।

ডাক্তার এসে মিলিকে সেডেটিভস্ও দিয়ে গেছেন। শক্ড এবং ডেজড্ হয়ে আছে এখনও রুষা এ কথা জেনে যে, রুষার সঙ্গে একটা রাইভাল্‌রী গড়ে তুলেছিল মিলি। ওর নিজেরই মেয়ে। মানুষের মনের মধ্যে কখন যে কী হয়। মিলিকে ও জন্মই দিয়েছিল মাত্র। ও ত আলাদা একজন ব্যক্তি। তার চাওয়া পাওয়ার উপরে রুষার ইনফ্লুয়েন্স কতটুকু ? কোনো ইনফ্লুয়েন্স থাকা উচিতও নয় হয়ত আদৌ.।

ডাক্তার অবশ্য বলছেন, শী হ্যাজ টু স্লীপ ইট্ অফ্ফ্। ওটা চলে যাবে। চিন্তার কিছু নেই। তবে

বেশিদিন সেডেটিভস্ কন্টিন্যু করতে চান না উনি। রুষাও চায় না। কারণ এই বয়সের ছেলে-মেয়েরাই হঠাৎ ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। বড় সাংঘাতিক বয়স এটা। অবশ্য সব বয়সই সাংঘাতিক। মন একবার গড়ন পেয়ে গেলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সাংঘাতিক বিপজ্জনক। পরীক্ষার পর পরীক্ষা। প্রতিটি মুহূর্ত।

ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে রুষার তবে, কফি তখনও শেষ হয়নি, ঠিক এমন সময় বাইরে জীপের আওয়াজ শোনা গেল। এঞ্জিন বন্ধ করার আওয়াজও। তারপরই বেল বাজল দরজার। মিলি ব্রেকফাস্ট সেরে উঠে গিয়েছিল। এখনও সবসময় একটা ঘুম ঘুম ভাব রয়েছে ওর। যেন ঘোরের মধ্যেই চলে ফেরে। আগে থেকে অনেকখানিই বিকভার করেছে অবশ্য ! আশা করা যায় দু' একদিনের মধ্যেই নর্ম্যাল হয়ে যাবে। মাকে, "মা" বলেই জানবে ; আবারও নির্ভর করবে তারই ওপর সব ব্যাপারে।

মেরী, বেলের আওয়াজ শুনেই তাকাল রুষার মুখে। তারপর এগিয়ে গেল দরজা খুলতে।

রুষা বলল, মেরী। তুমি নিজের কাজ করো। অনেক কাজ পড়ে আছে। আমিই খুলছি।

মেরী তাকাল একবার রুষার চোখে। ভুচুর সঙ্গে মেমসাহেবের সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতাটা চোখ এড়ায়নি ওর। অদ্ভুত ম্যানিয়াক এই মহিলা ! একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল মেরী !

দরজা খুলেই রুষা দেখল, আজ খুবই সেজেছে ভুচু। লাল আর কালো স্ট্রাইপড্ সিল্কের ফুল-স্লিভস শার্ট পরেছে একটা। নিচে, সাদা কর্ডুরয়ের ওয়েল-প্রেসড ট্রাউজার। পায়ে চক্‌চকে ব্রাউন মোকাসিন্।

রুষাকে বলল ভুচু, গুড মর্নিং।

রুষা ওর মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, মর্নিং। ভেরী গুড মর্নিং ইনডিড্। আরে ! তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না ভুচু ! হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ !

কাকেরও ত কখনও ময়ূর হতে ইচ্ছা হয়।

ভুচু বলল, মুখ নিচু করে, হাসবার চেষ্টা করে।

তা যায়। তবে যে-কাক ময়ূরপুচ্ছ পরে ছিল তার অবস্থা কি হয়েছিল তা জানো ত ?

জানি।

বলে, ভুচুও হাসল।

সত্যিই চমৎকার সকালটা আজকের ! কিন্তু কোথায় চললে এখন এত সেজেগুজে ? জানতে ইচ্ছে করছে। পামেলার কাছে কি ?

লজ্জা পেল ভুচু। বলতে চাইল যে, এখানে আসবে বলেই ত' এত সাজুগুজু করেছিল। কিন্তু মুখে বলল, আজ যে রবিবার ! ভাবছি, চার্চএ যাব। অনেকই দিন যাইনি। যাবেন আপনি ? আমার সঙ্গে ?

রুষার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। ওর সৌন্দর্যর ছটায় অন্ধ হয়ে গিয়ে বাঘা-বাঘা পুরুষেরা যখন টোকা-খাওয়া টাকা-কেন্নোর মতো কুঁকড়ে যায় ও'র সামনে তখন খুবই মজা লাগে ওর। ভালও লাগে অবশ্য। এই সবই ত' বেঁচে থাকার পার্কুইজিটস্, প্রত্যেক সুন্দরীর। চোখ তুলে একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল রুষা ভুচুকে। শরীরটি কিন্তু বেশ ! ইস্পাতের মতো। টানটান মজবুত ; উজ্জ্বল। বয়সে, ভুচু রুষার চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই হবে। কালো হলেও, গায়ের চামড়াটি ভারী সুন্দর, কাল-কেউটের মতো জীবনীশক্তিতে একেবারে ফোঁস ফোঁস করছো বিপদের ভয় থাকলেও সব বেদেনীরই এমন সাপ নিয়ে খেলা করতে ইচ্ছে করেই।

সত্যিই মজা লাগে রুষার ! একটি তরুণ, অনভিজ্ঞ শিঙাল হরিণ জালে পড়েছে। অভিজ্ঞর সঙ্গে খেলায় এক ধরনের মজা, আর অনভিজ্ঞর সঙ্গে অন্য ধরনের। এখন তাকে মারবে, না বাঁচাবে : মারলে কী ভাবে, কোন্ প্রক্রিয়ায় মারবে তাই নিয়ে....।

কিন্তু মোটর মিস্ত্রী ? আন্‌থিংকেবল্। শী ওজ্ ওনলী টয়িং উইথ্ দ্যা আইডিয়া....। পুরুষগুলোর এই ছটফটানি দেখতেই বেশি ভাল লাগে ওর। সঙ্গমের চেয়ে যেমন শৃঙ্গারের সুখই বেশি মধুর, বধ

করার আগের এই উত্তেজিত ভয়ার্ত বধ্য পুরুষের কাণ্ডজ্ঞানহীন ছট্‌ফটানির মজাটাও মেয়েদের কাছে অনেকই বেশি উপভোগ্য।

রুষা অবাক হওয়ার ভান করে বলল, আমি কেন চার্চ্‌-এ যাব? আমি ত ক্রীশ্চান নই!

তারপর গলা নামিয়ে ভুচুর চোখে চোখ রেখে বলল, তাছাড়া, আমার ত কন্‌ফেশান্ করারও কিছুই নেই। আই অ্যাম ক্লীন।

ভুচু বুঝল, ইদুরকারের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথাই বলছে রুষা। পরোক্ষে বলছে, খুনীরাই ত চার্চ্‌এ যায় কন্‌ফেশান্ করতে; কন্‌ফেশানালের কাছে।

ভুচু জোর করে হাসল।

বলল, কন্‌ফেশান করার কিছু আমারও নেই। যদি থাকতও, তবে হয়ত আপনাকেই কন্‌ফেশানাল করতাম। তার জন্যে চার্চ্‌-এ যাবার দরকার ছিলো না। চার্চ্‌ ত আর মসজিদ নয়। আমাদের ধর্মও আপনাদেরই মতো। সকলেরই অবারিত দ্বার সেখানে।

জানি না। আমি কোনো ধর্মই মানি না। স্বধর্মই আমার ধর্ম। আমার শরীর আর মনের ধর্মই সব কিছু আমার কাছে।

রুষা বলল।

ভুচুর মনে হল, একটু বিদ্রূপেরই, সঙ্গে।

বলেই, বলল, কফি খাবে? ভুচু?

না।

পৃথুর কোনো খবর জানো? আসবে কবে?

না। যা আগে জানতাম, তাই-ই। তারিখ জানায়নি। লিখেছিল—যে-কোনোদিনই চলে আসবে সামনের সপ্তাহে।

ও। এ সপ্তাহে নয়? তাহলে?

না।

কিসে আসবে?

তাও লেখেনি। হয়ত দিসাওয়াল্ সাহেবের জীপেই আসবে। জানি না।

আগে থেকে না জানলে ডিনার বা লাঞ্চ বানিয়ে রাখব কি করে? আমার এখানে ত আর এখন লোকজন, বাবুর্চি বেয়ারা নেই।

ভুচু ভাবল, বলে, সে সবই ত একদিন ছিলো।

যা বলবে ভেবেছিল, তা না বলে বলল, পৃথুদার সব কিছুতেই অভ্যেস আছে। মানে, মানিয়ে নিতে পারে। খেতে ভালবাসে বটে, তবে এটা না হলে, চলবে না ওটা না হলে চলবে না এসব তার একেবারেই নেই।

তা ঠিক। বিদ্রূপের গলায় রুষা বলল, তোমার দাদার সঙ্গে ছাগলের অনেকই মিল আছে। কথায় বলে না, ছাগলে কী না খায়! পৃথু যেমন সহজেই যে-কোনো জায়গায় যেতে পারে, তেমনই সহজে সমস্ত অখাদ্য-কুখাদ্যও খেতে পারে।

ভুচু, এই "যেতে-পারার" মানেটা বুঝল। রুষা বৌদি, বিজ্‌লী আর কুর্চির কথাই মীন করছেন।

এক গ্লাস জল খাবো বৌদি।

বৌদি নই আমি। আমি রুষা।

হ্যাঁ। রুষা!

এই "রুষা" নামটি উচ্চারণ করতেও ভুচুর সমস্ত শরীরে যেন শিহর ওঠে।

রুষা ভিতরে চলে গেল। চলে-যাওয়া রুষার দিকে চেয়ে ভুচুর পা কাঁপতে লাগল, অবশ লাগতে লাগল সারা শরীর। কখনও হয়নি এমন আগে। বসে পড়ল ডানপিটে ভুচু রণক্লান্ত যোদ্ধার মতো। নিজেরই রক্ত যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে তখন বোধ হয় এমনই হয়! না-হেরে গিয়ে কোনো উপায়ই থাকে না আর।

একটু পরই মেরী ট্রের উপরে লেস্‌এর ঢাকনা বসিয়ে হীরেরমতোঝকঝকে কাঁচের গ্লাসে করে জল নিয়ে এল রুষার পেছন পেছন। জল খেতে খেতে রুষাকেই দেখছিল ভুচু গ্লাসের মধ্যে দিয়ে, দু'চোখ ভরে। জলের মধ্যে দিয়ে দেখায় তার মুখটিকে অনেকই বড় দেখাচ্ছিল। ছাই-রঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে রুষা। সঙ্গে ছাই-রঙা সিল্কেরই ব্লাউজ। এইই কি মধ্যপ্রদেশের সেই বিখ্যাত হোস্‌সা--সিল্ক ? কে জানে ? ভুচুর জীবনে সিল্কের কোনো ভূমিকাই ছিলো না। তার জীবনের পথ প্রথম দিন থেকেই বড়ই অমসৃণ, রুক্ষ, এবড়ো-খেবড়ো। অথচ সেইই ভুচুই এখন সিল্ক সম্বন্ধে হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল ও রুষার দিকে।

রুষাও তাকিয়েছিল ভুচুর দিকে এক দৃষ্টে।

আর কোনো দরকার ? আমাকে দিয়ে ? বলবেন।

বোকার মতো বলল ভুচু।

এই মুহূর্তে নয়। নট্ এনী, দ্যাট আই ক্যান থিংক অফ্।

আপনার কিন্তু একেবারেই মোবিলিটি নেই। একটা গাড়ি আর ড্রাইভাবের বন্দোবস্ত করে দেব কি ? আমার কোনোই অসুবিধে নেই কিন্তু। বৌদি ?

মানে···· ?

মানের কিছু নেই। আমি রুষা। আমি একজন ইনডিভিজয়াল। এটাই আমার পরিচয়।

ভুচুর মুখে এসে গেছিল, মিস্ত্রী মানুষ আমি ! গাড়ি নিয়েই ত কারবাব। গাড়িফাড়ি কোনো প্রবলেমই নয়। গাড়ি একটা পাঠিয়েই দেব। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল যে, ওর মুখ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। রুষার কাছে সে যে "মিস্ত্রী", এ-কথা স্বীকার করতে চাইছিল না ভুচু ; যদিও রুষা তা জানেই। প্রেম কি মানুষকে ভণ্ড করে ? মিথ্যাবাদী ? নিজে যা নয়, তাই ই করে তোলে কি নিজেকে ? নিজেকে বড় করে দেখাতে চায় ?

ভাবছিল ; লজ্জিত ভুচু।

রুষাব দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, গাড়ি ? হ্যাঁ, দরকার ত খুবই। কিন্তু পৃথু আসুক। দেখি, কি বলে সে ? আমার চেয়েও এখন ওরই দরকার বেশি একটা ট্রান্সপোর্টেব। ও কি চাকরি ছেড়ে দিয়েই আসছে ? জানো কিছু ?

ভুচু নিবে গিয়ে বলল, জানি না। কথা হয়নি এ বিষয়ে আমাব সঙ্গে। যা নিজে থেকে না বলে, তা জানা মুশকিল। আপনি ত আমার চেয়েও ভাল চেনেন তাকে।

বলেই বলল, আমি তাহলে যাই এখন ?

এসো। রোজই এসো তোমাব সময়মতো। মেরী খুব ভাল-ফিশ্-ফাশ্ করে। আজ রাতে খাবে নাকি আমাদের সঙ্গে, ডিনাব ? ফিশ-ফাশ খেতে চেয়েছে মিলি।

কী হল ভুচুর কে জানে। বলল, নাঃ থাক। পৃথুদা আসুক। তারপর।

মনে মনে ভাবল, রুষাকে রুষাব নিজের কথাই ফেবত দিল।

ও। আচ্ছা ! অ্যাজ উ্য লাইক ইট্। রুষা বলল।

জীপে গিয়ে বসে, এঞ্জিন স্টার্ট করে প্রয়োজনের অনেকই বেশি স্পীডে লাল ধুলো আর ঝরা পাতা উড়িয়ে চলে গেল ভুচু। রুষার কাছ থেকে সেই মুহূর্তে অনেকই দূরে চলে যেতে চাইছিল ও, যত জোরে পারে, এক তীব্র ভাললাগা মিশ্রিত খারাপ লাগায় ওর শরীর জ্বলছিল। লঙ্কা বেটে গায়ে লাগালেও শরীর এমন জ্বলে না।

ভুচুর চলে-যাওয়া-জীপের দিকে চেয়ে খোলা-দরজায় রুষা দাঁড়িয়ে মনে মনে বলল, বেশির ভাগ পুরুষই বোধ হয় তাদের জীবনীশক্তির অনেকখানিই অপ্রয়োজনে ও বেজায়গায় খরচ করে ফেলে। আশ্চর্য ইডিয়টিক্ স্পেসিস !

রুষার চোখ ঝাপসা হয়ে এল এক মুহূর্তের জন্যে। গত দু'বছরে যত প্রেজেন্ট তাব সবই ও পেয়েছিল ইঁদুরকারের কাছ থেকেই। ভুচুকে দেখে তাই-ই ভয় করছে তার। প্রথম প্রথম ইঁদুরকারও আজকেব ভুচুরমতোই নিষ্পাপ, সরল ছিল। সারল্য এবং পবিত্রতাকে বগড়ে দিলেই বোধ

হয় তা থেকে বক্রতা আর পাপের বীজ বেরোয়।

রুষার এই ভয়টা অবশ্য আনন্দমিশ্রিত ভয়। হয়ত ভবিষ্যতে ভুচুর কাছ থেকে পাবে ও শত উপহার। পৃথিবীর সব ধনই কোনো সুন্দরীর চাইবার অপেক্ষাতেই ত' থাকে শুধু। এই মনটাকে নিয়েই বড় মুশকিল। প্রায়-মরে-আসা শীতের শেষ বিকেলের রোদের মতো বিবেকটাও এখনও কষ্ট দেয়। যার কাছ থেকে তার প্রাপ্য ছিল সবচেয়ে বেশি, সেই স্বামীর কাছ থেকেই পাওয়া হলো না কিছুই। সম্বন্ধ করে ত লক্ষ লক্ষ মেয়েরই বিয়ে হয়, তারা অনেকেই ত' সুখীও হয়। পৃথুর মতো একজন উদ্ভট স্বভাবের অমানুষকেই যে সে পেয়েছিল স্বামী হিসেবে! দুর্ভাগ্য কার। রুষা কখনই সেই বিদেশিনী গাইয়ের মতো গাইতে পারবে না সেই বিখ্যাত গান ; "আই উইল ট্রেড ওল্ মাই টুমরোজ্ ফর আ সিংগল্ ইয়েস্টারডে"।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করল রুষা। তারপর ভিতরের দিকে এগলো। দিনের এই সময়টাতে বড়ই বিষণ্ণ বোধ করে ও। সমস্ত বিবাহিতা নারীদেরই কি এই মাঝসকালটাতে মন খারাপ হয় ? কে জানে ? স্কুল ও কলেজের বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায় ? বাপের বাড়ির জীবনের কথা ? আত্মীয়স্বজনের কথা ? প্রথম প্রেম, যে-কিশোরটি নিবেদন করেছিল ; তাকে ? যে প্রথমবার ফুল দিয়েছিল কাঁপাকাঁপা হাতে এনে সেই যুবককেও কি ? কালের গতিতে আলতো করে প্রথম চুমু খেয়েছিল যে বা যে খেয়েছিল চোখের পাতায় তাকেও, কাকে কাকে ঠকিয়ে বর্তমানের জীবনকে সে গড়ে নিয়েছে, সেই সব পুরুষদের প্রত্যেকের কথাই কেন যে শুধু দিনের এই সময়টিতেই মনে আসে ? কিন্তু আসেই।

পামেলাদের চার্চ-এর দিকেই যাবে ভেবেছিল, কিন্তু দু কিলোমিটার মতো গিয়েই জীপ ঘুরিয়ে দিগা পাঁড়ের কুঁড়ের পথ ধরল ভুচু। জঙ্গলের মধ্যের কাঁচা পথ দিয়ে লাল ধুলো উড়িয়ে থার্ড গীয়ারে জীপ চালিয়ে চলল ও নানা কথা ভাবতে ভাবতে।

রুষা, ঈভস-উইকলী হাতে করে বেডরুমে জানালার পাশের সোফাতে এসে বসেছিল। কী করে মেয়েদের বুক সুন্দর ও শক্ত রাখতে হয় তার উপরে খুব ভাল একটা আর্টিকেল্ ছিল বম্বের একজন নামকরা বিউটিসিয়ানের। তাতেই চোখ নিবদ্ধ করল, কিন্তু ওর চোখ ম্যাগাজিনের পাতা থেকে উঠে বাইরের বাগানে পিছলে গেল। গ্রীষ্ম সকালের রুখু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সকালের এই হাওয়াটা একবার জোর হয়, আরেকবার আস্তে। স্মৃতি ত বটেই, নিঃশব্দ স্মৃতির সঙ্গে কত এবং কতরকম ভুলে-যাওয়া শব্দই যে মুখে করে হাওয়াটা অবাধ্য কুকুরের মতো ছোটাছুটি করে এই সময়টাতে! যে গৃহবধূ, তাঁর স্বামী সংসার এবং পুত্র-কন্যা নিয়ে অত্যন্তই সুখী, তাঁরও দিনের এই সময়টাতে কেমন এক দুঃখ জাগে মনে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

একটু পরেই জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিতে হবে। "লু" বইতে শুরু করবে। চোখ জ্বালা করবে। উড়াল-চুলো পেঁপে গাছে বসে কর্কশ স্বরে দাঁড়কাক ডাকবে। লাটাখাম্বার ক্যাঁচোর-কোঁচোর শব্দ উঠছে বাগানের কুয়ো থেকে। দূরের কাছিম-পেঠা পাহাড়টার গায়ে যেন এগজিমা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। খাণ্ডেলওয়াল্ সাহেবের নতুন কালো অ্যাল্‌সেশিয়ানটা হাউ! ঘাউ! ঘাউ! করে ডাকছে। এই ঘাড়ে-কেশরওয়ালা তীব্র-যুবক কুকুরটার সঙ্গে ভুচুর মিল আছে খুবই। কুকুরটার এতই বেশি জীবনীশক্তি যে, তা নিয়ে সেই তারুণ্যে-দীপ্ত কুকুর কী যে করবে, তা যেন ভেবে পর্যন্ত পাচ্ছে না। ভিনোদ ছিল, মরে-যাওয়া সাদা অ্যালসেশিয়ানটার মতোই। সেও মরল দুর্ঘটনায়।

পুজো-টুজো সেরে দিগা তার একচড়া চাপাচ্ছিল সবে। এমন সময় ভুচুর জীপ গিয়ে পৌঁছল ধুলো উড়িয়ে।

ভুচু জীপ থেকে নেমে বলল, বেশি করে চাল দাও। আমিও খাবো।

ভুচুকে এমন দারুণ পোশাকে দেখেনি কখনও দিগা আগে। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর বলল, আপনি ? হঠাৎ ? বাঃ বাঃ। মনে পড়ল তাহলে আমাকে ? পৃথু বাবু, সাবীর মিঞা শামীম ভাই, ঠুঠা ওদের সব খবর কি ?

ভুচু বলল, সবই শুনবে। তাড়া কিসের ? আজ মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসব বলেই ত এসেছি।

বাইরের বড় পাথরটাতে এখন আর বসা যায় না। শীতেই ওখানে বসতে আরাম। ভুচু বলল, আমি নদীর পাশে গাছের ছায়ায় বসছি গিয়ে। ঠাণ্ডা হবে ওখানে। রান্না হলেই তুমি হাঁড়িসুদ্ধ ওখানেই নিয়ে এসো। নদীর পাশের পাথরের উপরে ঘি দিয়ে জম্পেস করে ভাত মেখে খাব। তারপর অনেক কথা আছে।

দিগা বলল, যেমন বলবেন। কিন্তু খাবেন কি আপনি ? কিছুই যে নেই ! আপনাকে কী দিয়ে খাবার দিই বলুন ত ? অতিথি যে নারায়ণ !

কি আছে ?

ভাত, মুগের ডাল, আর নুন।

আর ঘি ? ঘি আছে ত ?

তা আছে একটু।

ফারস্টক্লাস। আবার কি চাই ? আমার ত' এখানে আসার ঠিকই ছিলো না। হঠাৎই চলে এলাম। নইলে, তোমার জন্যে আনাজ নিয়ে আসতাম। চাল ডালও। কালই সব পাঠিয়ে দেব কাউকে দিয়ে জীপে করে।

না, না। পাঠাবেন কেন আবার ? চাল ডাল নুন যা আছে তাতে চলে যাবে আরও দিন সাতেক। তাছাড়া, জঙ্গলে কতরকম মূল আছে ; ফল আছে।

এইই দোষ তোমার ! তুমি যা বোঝো ; কেউই বোঝে না ! এগোলাম আমি। এসো রান্না শেষ হলে।

জীপটা নিয়ে হাঁলো নদীর একেবারে গায়েই সাঁটিয়ে দিয়ে জীপ থেকে ভড্কার বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস, লেবু আর ছুরি বের করল। তারপর জুতো-মোজা সব খুলে ফেলল। নদীর মধ্যে, পাথরের কোল ঘেঁষে মস্ত একটা চাঁর গাছের ছায়ায় বড় কালোরঙা ডিমের মতো দেখতে একটা পাথরের উপর বসে লেবু কাটতে লাগল। লেবু কেটে, ট্রাউজার গুটিয়ে নদীতে যখন গ্লাসে জল ভরার জন্যে গেল ও, জলের মধ্যে হঠাৎই লাল-রঙা কী চোখে পড়ল। বুকটা ধ্বক্ করে উঠল ভুচুর।

রক্ত ?

রক্ত কি ?

তারপরই বুঝল যে, ভুল।

নিজের সাদা-রঙা মার্সিডিজ গাড়ির মধ্যে কণ্ঠনালীকাটা স্যুটেড-বুটেড্ টাই-পরা ভিনোদ ইদুরকার এই হাঁলো নদীরই অনেক নিচে কি এখনও বসে আছে ? এতদিনে গভীর জলের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে গলেই গেছে কি মৃতদেহটা ? প্রাণটা বেরুবার আগে খুবই কি ছট্ফট্ করেছিল ও ? মুরগী জবাই করার পর একটা মুরগী যেভাবে রক্তের ফিন্কি তুলে লাফায়-ঝাঁপায় তা অনেকবারই দেখেছে ভুচু। দেখে, শিকারি ভুচুও আতঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ ? ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠল ওর। গাড়ির দরজাগুলো কি খুলে গেছে এতদিনে জলের তোড়ে ? ছোট ছোট পাহাড়ী মাছে কি ঠুকরে খেয়ে গেছে ইদুরকারের চোখ দুটো ? কে জানে ? আবারও গা গুলিয়ে উঠল ভুচুর।

বড় করে ভড্কা ঢালল গ্লাসে। আজকে মাতালই হয়ে যাবে ভুচু। নিজেকে ভোলা দরকার। নিজের কাছ থেকে নিজে অনেক দূরে পালিয়ে যাবার জন্যে কালেভদ্রে এক আধদিন মাতাল হওয়া মনের স্বাস্থ্যের পক্ষেও বোধ হয় ভাল।

হাঁলো নদী বয়ে যাচ্ছিল গ্রীষ্মবনের বিবাগী, জ্বরতপ্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে। গাছগুলোর বেশিরই পাতা নেই এখন। পাতা-ঝরা গাছেরা সমর্পণের ভঙ্গীতে তাদের অসংখ্য হাত উঁচু করে আগুন-ঝরানো আকাশে কোন্ অদৃশ্য দেবতার কাছে যে কি বর চায়, তা তারাই জানে। কিছু গাছে এখনও পাতা আছে, প্রখর গ্রীষ্মেও পাতা যাদের ঝরে না। অথবা যাদের পাতা ঝরে শীতে কিংবা শরতে। তারাই গ্রীষ্মবনের দাবদাহ থেকে বাঁচায় বনচারীকে। বনমোরগ ডাকছে নদীপারের বনের

ভিতরের একটা দোলামত জায়গা থেকে। দু পারের সব শব্দ মুখে করে ছুটে চলেছে জবির শাড়ির মতো জল। অগভীর জলের মধ্যে গাছগাছালির ফাঁক-ফোকরের মধ্যে থেকে সোনালি বেজীর মত অতর্কিতে লাফিয়ে-পড়া রোদ জলজ আলোর সাদা-কালো অসংখ্য সাপেদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে।

ভুচুর মাথার দু'পাশেই জুলপীর একটু উপরে ঝিরঝিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে। পরপর ভড়কা খেয়ে যাচ্ছে ও। একটু কাঁচা-লঙ্কা, লেবুর সঙ্গে, বিচিগুলো বের করে ফেলে দিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু নেই। কোনো বিশেষ বিষয়ে সে মনই বসাতে পারছে না। না কাঁচালংকা, না রুষা, না ইদুরকারের ফুলে-ওঠা মৃতদেহ। কোনো বিষয়েই না। জলের পাশের একটা মরা কসসি গাছের ডালে জলফড়িংটা যেমন তার ফিনফিনে বাদামী ডানায় রোদ চমকিয়ে উড়ছে আর বসছে ভুচুর সামনে, ওর মনও তেমনই উড়ছে আর বসছে। মনটা ফড়িং হয়ে গেছে। কখনই আজকের মতো এমন করে ভুচু নিছক মাতাল হওয়ারই জন্যে মদ খায়নি এর আগে। আনন্দ পেয়েছে বলেই খেয়েছে। কখনই অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ হয়নি। পৃথুদা যেমন মাঝে মাঝে হয়ে পড়ত। কিন্তু আজ পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ হতে চেয়েও হতে পারছে না। মাতাল হওয়াও যে এমন কঠিন কাজ, তা ওর মত মদ্যপায়ীরও জানা ছিলো না।

কখন যে দিগা এসে, মাটির হাঁড়িটা নদীপারের দুটি ছোট পাথরের হেলান দিয়ে রেখে চাঁর গাছের পাতা ছিঁড়তে শুরু করেছিল তা লক্ষ করেনি ভুচু। তাড়াতাড়ি উঠে, নদীর পাশে একটি চ্যাটালো পাথরে আঁজলা ভরে জল ছিটিয়ে ভাল করে ধুয়ে দিল ভুচু। দিগা এসে তারই উপরে পাতাগুলো দোনার মত করে বিছিয়ে দিল। তার পর হাঁড়িটা আনল। দোনায় মুড়ে নুন এনেছিল, আর ঘি দিয়ে দিয়েছিল হাঁড়ির মধ্যেই। চমৎকার সুগন্ধী আতপান্নর গন্ধর সঙ্গে জংলী-বস্তীর ঘরে-বানানো খাঁটি গাওয়া ঘি-এর গন্ধ, নদী আর বনের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল। পাথরের উপর ওর সাধের সাদা কর্ডুরয়ের ট্রাউজার পরেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল ভুচু দিগার মুখোমুখি। ট্রাইপড়-সিল্কের শার্টের হাতা গুটিয়ে নিয়ে হাপুস-হুপুস করে খেতে লাগল। একটা বড়কি ধনেশ পাখি 'হ্যাঁক্কা', হ্যাক্কো' হুঁক্ হুঁক্ করে নাক্স-ভোমিকা গাছের মগডালে বসে ডাকতে লাগল। এখন ত ফল নেই গাছে। কি করছে সে ঐ গাছে কে জানে? তারপরই পাখিটা একটা আওয়াজ করতে লাগল, যেমন নিচু স্বরের একটানা স্বগতোক্তি একমাত্র বড়কি ধনেশরাই করে। মন বড় বিষণ্ণ হয়ে যায় শুনলে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে যে-পাথরে বসে ভড়কা খাচ্ছিল তারই উপরে আবার এসে বসল ভুচু। তারপর আরও ভড়কা ঢালল।

ভুচুর পোশাক দেখেই বুঝেছিল দিগা পাঁড়ে যে, যেতে চেয়েছিল ভুচু অন্যত্র কিন্তু এসে পড়েছে ওর কাছে। বেশির ভাগ সংসারী মানুষই ত জীবনের পথে বেরিয়ে পড়ে এমনি করেই। যেখানে যেতে চেয়েছিল সেখানে না গিয়ে অন্যত্র পৌঁছে থেবড়ে বসে পড়ে। যাওয়া যে হলো না, তা না বুঝেই! গন্তব্যে পৌঁছতে পারে কজন মানুষ? দিগা বলল, আপনার মনে খুব অশান্তি ভুচুবাবু তাই না?

হুঁ। বলে, মাথা নাড়াল ভুচু।

তাই-ই আজ তোমার কাছে এসেছি দিগা। আমার বড়ই অশান্তি। তুমি ত অনেক জানো, অনেক পড়েছো, তুমি কিছু করতে পারো কি আমার জন্যে?

একটু চুপ করে থাকল দিগা, জীপের পাশে, মাটিতে উবু হয়ে বসে। তারপর বলল, কারো জন্যেই অন্য কেউই কিছুই করতে পারে না ভুচুবাবু। পথের হদিশই শুধু দিতে পারে কেউ কেউ। সে-পথের হদিশ পেয়েও যে সবাই-ই সে পথে যেতে পারে, এমনও নয়। যা করার, তা নিজেকেই করতে হয়। তবু, আপনি মন খুলে কথা বলুন। মন হালকা লাগবে, সেটাও ত মস্ত লাভ।

ভুচু যন্ত্রণাকাতর মুখে বলল, সেসব এমনই কথা দিগা যে, মন খুলতে চাইলেও খোলা যায় না।

আপনি বোধ হয় প্রেমে পড়েছেন ভুচুবাবু। আপনি যখন এলেন তক্ষুনি আপনার মুখচোখ দেখেই আমি বুঝেছি। "বৈর প্রেম নাহি দুরই দুবঐ"—শত্রুতা আর প্রেম লুকোতে চাইলেও কখনই

লুকোনো যায় না।

লজ্জিত, ধরা-পড়া গলায় অপরাধীর মতো ভুচু বলল মুখ নামিয়ে, তাই-ই ?

দিগা হাসল। বলল, প্রেমে পড়ার মধ্যে ত কোনো দোষ নেই ভুচুবাবু। আমিও ত সবসময় প্রেমেই পড়ে রয়েছি। তবে আপনার প্রেম একজন নারীর সঙ্গে আর আমার ঈশ্বরের সঙ্গে। সেই নারীর মধ্যেও ত ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর সব জায়গায়ই আছেন। প্রেম এমনই এক সুখ যে তার সেই সুখসুপ্ততার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে। তুলসীদাস তাইই বলেছিলেন।

"জীব সীব সম সুখ সয়ন সপনেঁ কছু করতূতি।

জাগত দীন মলীন সোই বিকল বিভূতি ॥"

মানে কি হল ?

উৎসুক গলায় শুধোল ভুচু। বানে ভেসে-যাওয়া জল যেন হাতে গাছ পেয়েছে।

দিগা মধুর পবিত্রতার হাসি হেসে, দুটি হাত বুকের কাছে তুলে নাড়িয়ে বলল, জীব যখন সুখসুপ্ত, তখন সে শিবেরই মতো। তখন স্বপ্নে সে কত কীই না সৃষ্টি করে চলে। কিন্তু যেই জেগে ওঠে ওমনি সেই-ই আবার দীন ; মলিন। বিষাদেরই প্রতিমূর্তি। প্রেম মানুষকে শিব করে দেয়, এই-ই বা কম কি ? বলুন ?

পাঁড়েজী, তুমি আমার কথা সব জানো না। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক এবং অনেকরকম কষ্ট করে আজ এখানে এসে পৌঁছেচি জীবনে। আমার কি সুখী হবার কোনোই অধিকার নেই ? সারাজীবনই কি একইভাবে কাটবে আমার ?

গলা ধরে এল ভুচুর। কিছুটা মানসিক অবস্থার কারণে৷ বাকিটা ভডকার।

দিগা হেসে বলল,

"সুখ জীবন সব কোউ চাহত সুখ জীবন হরিনাম।

তুলসী দাতা মাগনেউ দেখি গ্রত অবুধ অনাথ ॥"

আঃ। মানে কি বল !

দিগা বলল, ভুচু বাবু, সুখী জীবন ত সবাই-ই চায়। কে তা না চায় বলুন ? কিন্তু সুখী জীবন ত শুধুমাত্র শ্রীহরিরই হাতে। তুলসীদাসের চোখে, যে দাতা আর যে প্রার্থী : দুজনেই সমান অবোধ। দাতা অবোধ, কারণ সে দানের গর্বেই আবদ্ধ থাকে সব সময়। আর যে প্রার্থী, সেও অবোধ; কারণ সর্বসুখের আকর ঈশ্বরকে না চেয়ে সে অন্য ভোগের প্রার্থনা করে।

তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না দিগা। আমার বড়ই কষ্ট। আমি এমন এক নারীর প্রেমে পড়েছি, যে আমার সবচেয়ে প্রিয়জনেরই আপনতম জন। কি যে করব আমি ! বড় পাপবোধ হয় মনে, অথচ ভাল যে বেসে ফেলেছি !

দিগা আবারও হাসল। কৃষ্ণপক্ষর শেষ রাতের চাঁদের মতো গভীর আশ্বাসমাখা সে হাসি। দিগা বলল,

"বড়ি প্রতীতি গঠিবন্ধ তেঁ বড়ো জোগ তেঁ ছেম।

বড়ো সুসেরক সাই তেঁ বড়ো নেম তেঁ প্রেম॥

ভুচুবাবু, তুলসীদাসের কথা হচ্ছে গিয়ে এই যে, বাইরের সমস্ত গ্রন্থিবন্ধনের চেয়েও বিশ্বাস অনেকই বড়। যোগের চেয়ে ক্ষেম বড়। প্রভুর চেয়েও তার শ্রেষ্ঠ সেবক বড়। আর সমস্ত নিয়মের চেয়েও বড় প্রেম। প্রেমেই যদি পড়ে থাকেন, তবে এসব নিয়ে ভাববেন না। কোনো কিছুই প্রেমের সমান হতে পারে না।

ভুচু, দিগার কাছে নেমে এল ওর উঁচু শিলাসন ছেড়ে। নদীপারের লাল মাটির মধ্যে ধবধবে সাদা ট্রাউজার পরেই আসনপিঁড়ি হয়ে দিগার মুখোমুখি বসে বলল, কিন্তু সেই নারী যে আমার প্রিয়জনের স্ত্রী ! তুমি বুঝছ না দিগা। সে যে তাকে বুকে করেই রেখেছিল।

এবার খুব জোরে হেসে উঠল দিগা। নদীর জল সেই হাসিকে আলোর মতো প্রতিসরিত করে দিল দু-পাশের গাছগাছালিতে। দিগা হাসতে হাসতেই বলল,

"রাখিঅ নারি যদপি উর মাহী * যুবতী, শাস্ত্র, নৃপতি বস নাহী
দেখহু তাত বসুন্ধবা গুহারা * প্রিয়াহীন মোহী ভয় উপজারা"

এর মানে কি হল ?

ভুচু উদগ্রীব হয়ে শুধোল।

এর মানে হল, স্ত্রীকে যদি বুকে করেও কেউ রাখে, তবুও যুবতী স্ত্রী, শাস্ত্র এবং নৃপতিরই মতোবশে কখনই থাকে না। কেউ বুকে করে রাখলেই যে বশে থাকবে তা ভাবা ভুল। ভালই যদি কাউকে বাসেন ত', তাকে পেতে দোষ কোথায় ? "মন মোদকহি কি ভুখ বাতাঈ ?" মনগড়া মিঠাই দিয়ে কি আর ক্ষিদের নিবৃত্তি হয় কখনও ?

তুমি জানো না দিগা, আরও একটা ব্যাপারেও আমি মনে মনে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি। সাংঘাতিক এক অপরাধ করেছে আমারই এক দোস্ত। অথচ তার মনে বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই। জ্বলে মরছি শুধু আমি সেই অপরাধের গ্লানিতে। অথচ আমার কোনোই হাত ছিলো না তাতে।

দিগা বলল, এরকম ত ঘটতেই পাবে।

"ঔরু করৈ অপবাধু কোউ ঔর পাব ফল ভগু।
অতিবিচত্র ভগবন্তী গতি কো জগ জানৈ জোগু॥"

অপরাধ করে একজন আর তার ফল ভোগ করে আর একজন। ভগবানের লীলা অতি বিচিত্র। তা জানার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কার আছে বল ?

ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে পরিষ্কার মাথায় ও ভাবছিল, দিগা পাঁড়ে অনেকই জ্ঞানের কথা শোনাল। কিন্তু এত জ্ঞানে ত ওর দরকার ছিলো না। ও যে স্বল্পশিক্ষিত লোক।

আকাশে চেয়ে দেখল, বেলা পড়ে গেছে। দীর্ঘ হয়েছে গাছের ছায়ারা। দিগার কুঁড়ের সামনে জীপটা নিয়ে গেল ভুচু। দিগা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আপনার জন্যে চা বানাই ? পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।

তুমি খাবে ত ?

আমি ত খাই না।

তাহলে ছেড়ে দাও। পথেই খেয়ে নেবো কোথাও।

বলেই, মুখ বাড়িয়ে বলল, কাল তোমার জন্যে সিধা পাঠিয়ে দেব দিগা। ভাল থেকো। তারপর চাপ দিল অ্যাকসিলারেটরে।

ভাল থাকবেন ভুচুবাবু। আবারও আসবেন। সঙ্কলকে নিয়ে।

এক ঝাঁক বন-মুরগী কঁক্-কঁক্-কঁক করতে করতে প্রায় জীপের চাকার তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে দৌড়ে গিয়ে পথের ডান দিকের জঙ্গল থেকে বাঁদিকের পড়ন্ত বেলার মাঠে নেমে গেল।

থার্ড গীয়ারে ফেলে দিয়ে আঁকাবাঁকা বনপথে জীপ চালাতে চালাতে ভুচু ভাবছিল আগেকার দিনের মত "সঙ্কলকে" নিয়ে আর আসা হবে না দিগার কাছে।



আজ ভোরের বাসে হাটচান্দ্রা যাবে বলে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে রওয়ানা হয়েছিল ওরা তিনজন। পৃথু, ঠুঠা আর টুসু। বাসস্ট্যাণ্ডটি বেশ দূরেই। ইচ্ছে করলেই দিসাওয়াল সাহেবকে গাড়ি বা জীপের জন্যে বলা যেত, কিন্তু বলেনি। যার যতটুকু পাওনা তার বেশি না চাওয়াই ভাল। উপরি পাওনাতে অভ্যস্ত হলেই কিছুদিন পরই সেটাকে ন্যায্য প্রাপ্য মনে করে তার জন্যেও দাবী জানাতে চায় মন। সে মনিব কর্মচারীর সম্পর্কর বেলাতেই হোক কী অন্য সম্পর্কর বেলাতেই হোক।

বাংলো ছেড়ে বেরোবার একটু আগেই কুন্তী হাফাঁতে হাঁফাতে এসেছিল একটা চিঠি নিয়ে, কুর্চির কাছ থেকে। বলেছিল, দিদিনে ভেজিন্।

পৃথু বলেছিল, যে, হাটচান্দ্রাতে পৌঁছেই জবাব দেবে। এখন ত সময় নেই।

দিদি যে জবাব চেয়েছিলেন।

সময় কোথায়? পৃথু বলল।

তিনজন চলেছে সিংগল ফর্মেশানে। আধো অন্ধকারে। আগে ঠুঠা বাইগা, তার পর টুসু; একেবারে পেছনে প্রতিবন্ধী পৃথু।

ওরা বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে চায়েব দোকানের সামনেব শালকাঠের তক্তার বেঞ্চে বসল।

আর এক কাপ চা খাবে নাকি ঠুঠা?

পৃথু শুধোল।

একটা শব্দ করল ঠুঠা। বেরোবার আগে কুন্তী আসাতে ও উত্তেজিত হয়ে ছিল। ওরা রওয়ানা হবার আগে কুন্তী ঠুঠাকে বলেছিল, ফিরে এসো কিন্তু জংলী।

জংলী কে?

চা খাবে নাকি? টুসু?

চা? মা বকবে। কোনোদিনও খাইনি।

কোনোদিনও যখন খাসনি তখন ত' খেয়েই দেখতে হয়। কখনও এই কথাটা বলবি না। "কোনোদিনও করিনি" কথার কোনো মানে নেই।

আর মায়ের বকুনি?

সেটা ত' মাঝে মধ্যেই খাস, না? পেটে খেলে তবে না পিঠে সয়!

কোথাকার জল দিয়ে কীভাবে চা করছে তা কে জানে? মা ত' বলে, এই সব দোকানে পুরোনো মোজা দিয়ে চা-ছাঁকে।

নাক কুঁচকে বলল টুসু।

হো হো করে হেসে উঠল পৃথু। বলল, সত্যি! তোর মার ইমাজিনেশন্ আছে বটে! আরে! ও *ঠুঠা! গরম গরম সিঙ্গাড়াও যে ভাজছে, আর জিলিপির সাইজ দেখেছো? এমন খাওয়া ছেড়ে কি* বাসে ওঠা যায়?

বাবা! ওগুলো কিন্তু খেও না। পোড়া-মবিলে ভাজে ওগুলো। আর পা দিয়ে ডলে ডলে সিঙ্গাড়ার পুর তৈরি করে ওরা। মা অনেকদিনই বলেছে। খেলেই কলেরা নো ডাউট!

তাহলে ত' খেতেই হয়, কি বল? আমি ত খাবই। তুই যদি খেতে চাস ত বল্। ঠুঠাও খাবে। আমাদের এই সব না খেলে ত' মজাই হয় না। পথে বেরিয়ে পথের খাবার খাবি তবে ত'। নাকি শেঠদের মতো যেখানেই যাবি সেখানেই একটা পেটমোটা টিফিন ক্যারীয়ার সঙ্গে নিয়ে ঘুরবি?

টুসু হাফ প্যান্টের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে বলল, দেখিই তাহলে খেয়ে। তুমি ত' আছ। মা বকলে, তুমি আমাকে বাঁচাবে।

একশবার।

জিলিপি সিঙ্গাড়া এবং চা খেতে খেতে বাস প্রায় ভর্তি হয়ে এল। ওরাও উঠল।

বাস ছেড়ে দিল। টুসু একেবারে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছে। ঠুঠা আর পৃথু বসেছে একটু পেছনে, পাশাপাশি সীটে। এখানে বাসের মধ্যে বিড়ি খেলে কেউ আপত্তি করে না।

ঠুঠা একটা চুট্টা ধরালো বাস ছাড়তেই। পৃথু বলল, বেশ স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছো ত' আজকাল। একটা ছাড়ো!

সেই অমানুষিক শব্দ করে এগিয়ে একটা চুট্টা দিয়ে, শজারু মার্কা দেশলাইয়ের আগুন ধরিয়ে দিল ঠুঠা।

ঠুঠা সেই শব্দ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল, এই চুট্টার বাণ্ডিলটা কুন্তীর দেওয়া।

পৃথু কিছুই বঝতে পারলো না। ঠুঠার এখনকাব ভাষা বুনো-শুয়োর আব কুন্তী ছাড়া কেউই বোঝে না। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথা বললেই ভয়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করে আর কাঁদে। শিশু ত' আর নয় যে, পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবে!

চুট্টার টান মেরে ধুয়ো ছেড়ে পৃথু ভাবল, কথা অবশ্য যত কম বলা যায় এবং কম বোঝা যায় ততই মঙ্গল। বেশ আছে ঠুঠা একদিক দিয়ে।

বাস চলেছে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে হলুদ-লাল-নীল নদী আর সবুজ-কালো পাটকিলে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। বাইরের প্রথম সকালের সুন্দর ছবিগুলো ওর চোখের উপর ছায়া ফেলেই অতি দ্রুত সরে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে সেই ছায়া পৌঁছে দিতে পারছে না চোখ,কারণ মস্তিষ্কে তখন অনেকই কথা। জায়গা নেই। হাটচান্দ্রায় ফিরে যাচ্ছে যে ও! পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। সারাজীবন আর কত এবং কত রকম পরীক্ষাই যে দিতে হবে। যেদিন ইংল্যাণ্ড থেকে এঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী এবং চাকরীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি সঙ্গে করে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে উঠেছিল হীথ্রো এয়ারপোর্টে, সেদিন বাইশ বছরের পৃথু ভেবেছিল জীবনের সব পরীক্ষা শেষ করেই উড়ল বুঝি জীবনের আকাশে। বাকি জীবন সিল্কের মতোই মসৃণ পথে হেঁটে যাবে। এখন জানে, সে সব ত' সামান্য ডিগ্রী পাবারই পরীক্ষা। নেহাৎই ছেলেখেলা! জীবনের যুদ্ধ প্রতিদিনের। প্রতি প্রহরের অগণ্য পরীক্ষা প্রত্যেক পুরুষ আর নারীর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটে হাতে হাত রেখে, মৃত্যুর মুহূর্ত অবধি। এটাই ঘটনা।

রুষার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক আর পাতাতে পারবে না পৃথু। ভাবছিল। তবে এও ভাবছিল যে, যেখানে প্রেমের সম্পর্ক রাখা যায় না সেখানে যে শুধুমাত্র বৈরিতার সম্পর্কই বাখতে হবে এইই বা কেমন কথা। প্রেম ও বৈরিতার মাঝামাঝিও ত অনেকগুলিই স্তর আছে সম্পর্কর! রুষার মনের তেমনই কোনো একটি স্তরের মসৃণ গেরুয়া চরে বেঁধে বাখবে পৃথু তার নৌকোখানি বাকি জীবন। জলোচ্ছ্বাসে দোল পাবে; জল কমলে গেরুয়া-রঙা নরম আলোয় বিধুর দেখাবে। মাঝনদীতে ভরদুপুরে নানারকম অপ্‌টিক্যাল ইল্যুশানের মতো নানারঙা সরু-মোটা সুতো বুনবে ভবিষ্যৎ। সে সব রুষারই ব্যাপার। নোঙর-করা নৌকোতে মাঝে মাঝে এসে শুধু বসবেই হয়ত পৃথু। যদি আদৌ আসে।

কিন্তু....এ জীবনে সময় আর কি হবে? ফিরে আসার? মনের অয়ন পথ যে বড়ই বিচিত্র। মন একবার সরে এলে পুরোনো পথে আর ফেরে না। পুরোনো নৌকোতেও ফেরে কম জনই!

কুর্চিটাও এক আশ্চর্য মেয়ে! হাটাচান্দ্রায় যাচ্ছে শুনেই ও কি করে ভেবে বসল যে, পৃথু আর ফিরে আসবে না। এতদিনে এতটুকুই কি বুঝল ওকে? তবে, যে দাম দেয়, তার কাছেই নিজের দাম বাড়াতে গভীর এক সুখবোধ হয়। হয়ত, হারাবার ভয়টা এখনও এদেশের মেয়েদের সহজাত। জীবনের অনেক সুখ ও দুঃখের পথেই ওরা আজও পরনির্ভর বলে। তবু, কুর্চি কি জানে না? এখনও জানে না যে, ভালোবাসা কোনো লিপ্ততা নয়, কোনো বিলাসও নয়; ভালবাসা একটা

প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজনই বা বলবে কেন ? ভালবাসা এমনই এক আঙ্গিক, যা নইলে; ব্রহ্মাও জগন্নাথ হতেন !

সীওনীতে এসেই পৃথু জগন্নাথ যেন ব্রহ্মা হয়েছে। মানুষটা যেন পূর্ণতা পেয়েছে। কুঁচির শরীর এবং মনের ভরা-কলসের দানই হয়ত এই পূর্ণতাব দিকে ঠেলে দিয়েছে তাকে। এতদিন না-পেয়ে পেয়ে, বুঝতেই পারেনি যে, তার মধ্যে ঠিক এতখানি শূন্যতা ছিল, মরুভূমির মত উষর; রুখু কাঁটাগাছের জীবন বুকে করে বেঁচেছিল সে। শূন্যতা পূরণ হলেই শুধু জানা যায় যে, তার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা কতখানি। কে জানে? কত মানুষ মানুষী পৃথু আগে যেমন করে বেঁচেছিল রুখাব ঘরে তেমন করেই বেঁচেও-মরে-থেকেই নিজেদের "চমৎকাব আছি" বলে চোখ ঠেরে ঠেরে এই এক মাত্র জীবনও পুরোপুবি মাটি করেই প্রতিনিয়ত নিঃশব্দে পৌঁছে যাচ্ছে শ্মশানে বা কবরে। বাঁচা মানে যে এমন এক ভরন্ত উচ্ছল অভিজ্ঞতা তা কিন্তু কুঁচি তাকে না শেখালে পৃথুবও জানার বাইরেই থাকত।

তার পরে বিয়ে হল। জীবনেব প্রথমে নারী বলাকে জানল। কিছুদিন ভেসে থাকল হলুদ ব্যাঙের মতোনতুন বিয়ের পবেব সহজ সুখের বানেব জলে। সেই ঘোব কাটলে ধীরে ধীরে জানলো যে, কাব্যে আর জীবনে ফাঁক আছে। এত বছর বাদে কুচি তার কাছে সম্পূর্ণ আনন্দর প্রকৃত ধ্রুব স্বরূপ হয়ে এল। আনন্দব তীব্রতম বিন্দুতে পৌঁছনোব পবই বোধ হয় মন বড়ই ছটফট করতে থাকে। এই মন নিয়ে বড়ই জ্বালা। দুখও সয় না, সুখও নয় !

কিন্তু এই পূর্ণতা কেমন যেন এক নির্লিপ্তিও দান করেছে পৃথুকে। জীবিকা নয়, সংসার নয়, নারী নয়, অপত্যস্নেহ নয়, জীবনেব সব শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে যেন আরো অন্য কিছুর খোঁজে এসে যেতে চাইছে। রুষাব চিঠিতে উল্লিখিত রিচার্ড বাখ্-এর ইল্যুশানস্-এর সেই সামুদ্রিক কীটটির মতো। সব বাঁধন আলগা করে দিয়ে। এই ভেসে যাওয়া যে কি, তা পৃথু নিজেও জানে না। তা হয়ত নিজেকেই খোঁজা, আপনাকে জানার এক তীব্র তাগিদ। ধর্ম জিজ্ঞাসা নয়, সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হয়ে যাওয়া নয়। দিগা পাঁড়েব মতো, ববং আধুনিক,শিক্ষিত, বিজ্ঞান বিশ্বাসী মানুষ হিসেবেই সে অনুক্ষণ অনুভব করছে যে, যে মানুষটিকে সে জানত, যাব নাম ধবে ডাকলে সে সাড়া দিত, সেই পদবী, ডিগ্রী জীবিকা এবং ঠিকানা-সর্বস্ব মানুষটিই তাব মূল শিকড়ে ফিরতে চাইছে। ঠুঠা বাইগা হয়ে যেতে চাইছে সে।

টুসু ডাকল জোরে জোরে, বাবা !

চমকে উঠল পৃথু। বলল, কি রে ?

একটা কথা শোনো।

সব নির্লিপ্তি কেটে গেল। পৃথুব মনে হল এমন করে"একটা"কথা শুনতে তাকে কেউই ডাকেনি ওকে এই জীবনে আগে। বুকেব মধ্যে পাথব গলল। প্রাচীন জটাজুটসম্বলিত গাছ ভেসে চলল, মুক্তি প্রত্যাশী মানুষেব মনকে ভাসিয়ে নিয়ে প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য-অপত্যর জটিল আধার জীবনে।

টুসুকেই কাছে ডাকা উচিত ছিল। ক্রাচ্ নিয়ে চলন্ত বাসে চলাফেরা কবা সোজা নয়। কিন্তু না ডেকে, নিজেই গেল, ঠুঠাকে পেরিয়ে। ছেলে ডেকেছে। এই"বাবা"ডাকটার মধ্যে কী যেন আছে। যতদিন বাবা হয়নি ততদিন এই ডাকেব গভীব স্বননের, ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোনোই জ্ঞান ছিলো না।

টুসু বলল, পৃথুর কানে কানে, গোপনতম কথার মতো, ফিস্‌ফিস্ করে, বাবা ! আমার হিসি পেয়েছে।

হো হো করে হেসে উঠল পৃথু। ওর এই দীর্ঘ বাবাগিরির জীবনে এমন নির্দোষ খবরের এবং নির্মল হাসির শরিক এর আগে কখনই হয়নি। কতদিন যে এমন মনখুলে হাসে নাও।

বাসসুদ্ধু লোক চমকে ওর দিকে চাইল।

ফিস্ ফিস্ করে, ছেলের কানে কান ঠেকিয়ে বলল, কিছুক্ষণ পরই বাস দাঁড়াবে। তখন। ঠিক আছে ?

কতক্ষণ ?

পনেরো মিনিট।

ঠিক আছে।

পৃথু ফিরে এসে ঠুঠা জানালার দিকে সরে গেলে ঠুঠার সীটেই বসল। পৃথুর কষ্ট লাঘব করতেই তাড়াতাড়ি সরে গেল ঠুঠা। সরে যাবার পর ঠুঠা একটা অমানুষিক শব্দ করল। পৃথু কানে কান ঠেকিয়ে বলল, হিসি পেয়েছে ছেলের। খুব গোপন কথা।

বলতেই, খক্ খক্ করে ঠুঠাও হেসে উঠল। চমকে উঠল পৃথু। ঠুঠা কি স্বাভাবিক হয়ে গেল? নাঃ। হাসিটা নিবে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। এবং সেই গভীর বিষাদ নেমে এল আবার ওর মুখে। শিশু আর দেবতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বোধ হয় স্বর এসে ক্ষণিকের জন্যে বসে ওর গলায়।

দুপুরে বালাঘাটে খাওয়া সেরে নিয়েছিল ওরা। রুটি, তড়কা, আওলার আচার আর কড়হি দিয়ে। টুসু কখনও কাড়হি খায়নি। খুব ভালবেসে খেয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, এর মধ্যে 'ইয়োগোহার্ট' আছে না?

মাথা নাড়িয়েছিল হতাশ হয়ে। বাঙালীর ছেলে দইকে বলে "ইয়োগোহার্ট"। ভাবছিল ওকে ডি-ফ্রস্ট করতে সময় লাগবে। ফালতু সাহেবীয়ানা জমে গেছে শক্ত বরফের ইঁটের মতো।

ঠিক সন্ধ্যের মুখে মুখে হাটাচান্দ্রায় এসে পৌঁছল বাসটা। হাটাচান্দ্রার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেই চলে গেছিল, তবু দূর থেকে জায়গাটি দেখতে পেয়েই ভাল লাগছিল।

বাস থেকে নেমে, পৃথু বলল, টুসুবাবা তুমি ঠুঠা চাচার সঙ্গে তোমার মায়ের কাছে যাও। আমি কাল গিয়ে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করব।

আমি—ইদুরকার আংকল-এর বাড়ি যাবো না?

না না সেখানে নয়। আমাদের পুরোনো বাড়িতে যাবে। মা আর দিদি ত সেখানে চলে এসেছে।

তাই-ই?

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল টুসুর।

হ্যাঁ! তাই-ই ত!

তুমি কোথায় যাচ্ছো বাবা?

দেখি, হয় গিরিশদাব বাড়ি নয়ত ভুচুর কাছে। বলে একটা রিক্শাতে উঠল। ঠুঠা ব্যইগাকে বলল যে টুসুকে পৌঁছে দিয়ে যেন ভুচুর গারাজে ঐ রিক্শা নিয়েই চলে আসে।

নিচু গ্রামে একটি অমানুষিক শব্দ করে ঠুঠা জানাল, যে, সে কথা বুঝেছে।

টুসুরা আগে আগে গেল। কিছুটা গিয়েই, চামারটোলির দিকেব রাস্তাটা ঘুরে গেল। ওদেব রিকশা ঘুরতেই টুসু হাত তুলে বলল, টাটা বাবা।

টাটা! পৃথু বলল। আসন্ন সন্ধ্যার গোলাপি পথে দীঘল বৃক্ষসারির ছায়ারা গোলাপি মুখে লেপ্টে-যাওয়া চোখের কাজলেব মতো লেপ্টে গেছে। তাদের আব আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। রাত নেমে আসছে। পৃথুব নাকে উক্যালিপটাস-এর গন্ধ ছাপিয়ে টুসুর গায়ের গন্ধ লাগছে। নিজের সন্তানের গায়ের গন্ধর মতো মিষ্টি গন্ধ পৃথিবীব কোনো মহার্ঘতম পারফ্যুমেও নেই। শুধুমাত্র বাবা-মায়েরাই সে গন্ধর কথা জানেন।

ভুচুব গারাজে পৌঁছল যখন তখন প্রায় আটটা বাজে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে অনেকটাই দূর। ভুচু ছিলো না। হুদাও ছিলো না। আগামীকাল ওর বিয়ে, নিশ্চয়ই ছুটি নিয়েছে। গিদাইয়া ঘর খুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, চা আনবে কী না। পৃথু বলল, থাক। বাবু ফিরবে কখন?

জানি না।

কোথায় গেছে?

আপনার বাড়িতেই ত! মেমসাহেব এসেছিলেন। বাবু আর মেমসাহেব দুজনে ত জীপে করেই বেরোলেন এখান থেকে। তাও ঘণ্টা দুয়েক হয়ে গেল।

ও। পৃথু বলল।

ইদুরকার সাহেবের কোনো খবর জানো? সাহেবকে পাওয়া যাবে এখন বাড়ি গেলে? তুমি ত

ওঁর বাড়ির কাছেই থাকো। কি, গিদাইয়া ?

ইদুরকার সাহেব ত বে-পাত্তা হয়ে গেছেন, তাও প্রায় আট-দশদিন হল। পুলিস খোঁজ করছে চারদিকে। সাহেব বে-পাত্তা ত বে-পাত্তা, সাদা পেট্রোল মার্সিডিজভি বে-পাত্তা। অথচ গাড়ি নাকি মান্দ্‌লা কি বাইহার কী মালঞ্জখণ্ড কোথাওই যায়নি। আজিব বাত !

তাই ?

হ্যাঁ।

আমি তাহলে ভুচুর ঘরে যাচ্ছি। বাথরুমে কি তোয়ালে আছে ?

আছে। আমি নতুন তোয়ালে বের করে দিতে বলছি রামচন্দরকে।

বলেই হাঁক ছাড়ল, আর রে এ রামচন্দব....

পৃথু, ভুচুর ঘরের ইজীচেয়ারে গিয়ে পিঠটা এলিয়ে দিল। একসঙ্গে এতঘণ্টা বাসের চিপু শক্ত সীটে বসে পিঠ, কোমর এবং কাটা-যাওয়া পাটাও টনটন করছিল। রক্ত এসে মুখের কাছে এখনও ছলাৎ ছলাৎ করে। কোথায় ঝাঁপাতে চায়, কে জানে ?

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, নিজের স্যুটকেস থেকে পায়জামা পাঞ্জাবি বেব করে রামচন্দরের দেওয়া তোয়ালেটা তুলে নিয়ে বাথরুমে গেল পৃথু। জামা কাপড় ছাডতে ছাড়তে পৃথু ভাবছিল ইদুরকার বেপাত্তা হয়ে যাওয়াব মানে দুটো হতে পারে। হয় তাকে সাবধান করে দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে বলেছে ভুচুরা। নয় ত... কিন্তু এতটা করার কি দরকার ছিল ? তারপরই ভাবল, ইদুরকার অথবা রুষা কেউই তাব কেউ নয়। অতএব তাদের ভাল হল কী মন্দ তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করতে রাজী নয় ও। কাল সকালে একবাব সাবীর সাহেবের কববে যাবে ফুল নিয়ে। নুরজেহানের শাদীব খানা খাওয়ার চেয়েও অনেক বড় কর্তব্য সেটা।

শাওয়ার খুলে সাবান মাখতে গিয়ে ও দেখল একটি মস্ত বড় বিলিতি ক্যামে সাবানের সবুজ রঙা কেক সোপ-কেসে ! বাবা ! কবে থেকে এমন শৌখিন হয়ে উঠল ভুচু ? ক্যামে ওর ভাল লাগে না। ভুচু ত চিরদিন নিম সাবানই মাখত। পৃথু তাই-ই মাখে। শাওযাব বন্ধ করে বেসিনের উপরের ক্লোজেটটা খুলল পৃথু, যদি তাব মধ্যে নিম সাবান থাকে ! ওটা খুলতেই চমকে উঠল। রুষার ফোটো একটি। রাতমোহানাব পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। ছবিটি অতি-সাম্প্রতিক সময়ের। হয়ত ভুচুই তুলেছে, ইদুবকারের বাড়ি থেকে চলে আসার পর রুষা নিশ্চয়ই গেছিল ভুচুর সঙ্গে বাতমোহানায়। যে-কোনো মানুযেব ফোটোই ভালবেসে অন্য মানুষ রাখতেই পারে। কিন্তু সে ফোটো বাথরুমের ক্লোজেটের মধ্যে কেন ?

একটি নিম সাবানে হাত দিয়েও সাবানটি রেখে দিল পৃথু। এখান থেকে সাবান নিলে ভুচু বুঝতে পারবে যে, পৃথু ফোটোটা দেখেছে। লজ্জা পাবে বেচারী। ক্যামের-এর কেকটিই তুলে নিয়ে আবার শাওয়ার খুলল। অন্যর সাবান মাখতে কেমন লাগে। ভাল করে ধুয়ে নিল। ঠাণ্ডা জলের ধারা সারা শরীরে স্নিগ্ধতা এনে দিল। তাব সঙ্গে বিলিতি ক্যামের বিদ্‌ঘুটে গন্ধ। ফেনা, সারা শরীরকে সমুদ্র করে বুদ্বুদ ফাটিয়ে এবং ফুটিয়ে তুলে স্বগতোক্তির মতো কত কী বলে যেতে লাগল। ওদের বিড়বিড় স্বগতোক্তির মধ্যেই পৃথু বলল, কে যে কখন কার কাছে হেরে যায় !

চান করে জামাকাপড পবে বেরোতেই জীপের শব্দ শুনল একটা। ভুচু এল বোধ হয়। পৃথু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজেকে বলল, "পৃথু ঘোষ ! রাইজ টু দ্যা অকেশান্। ভুচু তোমাকে সত্যিই ভালবাসে। ভুচুকে ত তুমিও ভালবাসো। ক্ষমা করো। ক্ষমা কি সকলে করতে পারে ?"

ভুচু আর শামীম্ দুজনেই ঘরে এল। ভুচুর গা দিয়ে ভুরভুর করে ফিরদৌস্ ঈত্বরের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোস্ত সাদা পাযজামার সঙ্গে ফিন্‌ফিনে সাদা কুর্তা পরেছে ও। এমন শুভ্র বেশে কখনও দেখেনি পৃথু, ভুচুকে। পায়ে চকচকে কালো কোলাপুরী চটি। ভুচুর চেহারাই পাল্টে গেছে।

প্রেম বোধ হয় মানুষকে বড় চেক্‌নাই দেয়। চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে। দিগা পাঁড়ে কি একটা দোঁহা বলত তুলসীদাসের, প্রেম কখনো লুকোনো যায় না, না কি যেন !

ভাবল পৃথু।

ভুচু বলল, পৃথুদা একবার বাইরে যেতে হবে।

চিরুনিটা নামিয়ে রেখে অবাক হয়ে পৃথু বলল, কোথায় ?

কারো বাড়িতে নয়। জঙ্গলেই চলো। জীপে বসেই না-হয় কথা হবে। এখানে বলা যাবে না। দেওয়ালেরও কান আছে।

আমি এসেছি তুমি জানলে কী করে ?

আমি ত তোমার বাড়িতেই ছিলাম। তুমি আসবে বলে অপেক্ষা করছিলাম। সেখানে। ঠুঠা আর টুসু এল রিকশা করে। ওরা বলল, তুমি এখানে এসেছো।

পৃথু লক্ষ্য করল, ভুচুর সঙ্গে ওর দীর্ঘদিনের পরিচয়ের মধ্যে আজই প্রথম মিথ্যা কথা বলল ভুচু ওকে। ওরা আজই আসবে এমন কথা কাউকেই জানায়নি পৃথু। তার জন্যে রুষার বাড়িতে অপেক্ষা করাব প্রশ্নই ওঠে না তাই।

মজা লাগল ওর। প্রেম যখন দুজনের মধ্যে নতুন থাকে এবং গোপনও, নতুন বই বা কোরা শাড়িব গন্ধব মতো তখনই বোধ হয তা সবচেয়ে স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য হয়ে কাছের লোকেদের কাছে ধবা পড়ে।

পৃথু বলল, চলো। আমার স্যুটকেসটাও নিয়ে চলো। ফেরার সময় আমাকে গিরিশদার বাড়ি নামিয়ে দিও।

বাঃ। তা কেন ? তুমি আজকের বাতটা আমার সঙ্গেই থাকো পৃথুদা। আবার কবে দেখা হবে। তাছাড়া, তোমার সঙ্গে কিছু পার্সোনাল কথাও আছে আমার।

পার্সোনাল ?

বলে, চোখ তুলে চাইল পৃথু।

হ্যাঁ, পার্সোনাল অ্যাণ্ড স্ট্রিক্টলি কনফিডেন্শিয়াল।

গম্ভীর মুখে বলল ভুচু।

এমন ভারিক্কী কখনও দেখায়নি ওকে আগে।

ভুচু বলল, চলো পৃথুদা। ঘর থেকে বেরোবার সময় একটি বোতল নিয়ে নিল ভুচু রাম্-এর। রামচন্দ্রকে বলল, একটা বেতের বাস্কেটে তিনটে জলের বোতল, বরফের বাকেট, আর তিনটে গ্লাস দিয়ে দিতে।

পৃথু বলল, ঠুঠা বাইগা ?

তাকে পৌঁছে দিতে বলেছি গিদাইয়াকে, গিবিশদার বাড়ি। গাড়ি নিয়ে চলে গেছে গিদাইয়া।

ভুচু স্টীয়ারীংয়ে, শামীম্ মধ্যে এবং পৃথু বাইরের দিকে বসল। জীপ স্টার্ট করার আগেই পান বের করে দিল ভুচু পৃথুকে। বলল, তোমার পান।

পানটা নিতে নিতে পৃথু ভাবছিল ছেলেটা বদলায়নি বিশেষ। নদীর একদিকে পাড় ভাঙ্গে, অন্যদিকে চর পড়ে। তাতে বলা যায় না যে নদী বদলে গেছে। বড়জোর বলা চলে তার ঋতিটাই বদলিয়েছে শুধু।

কোনদিকে যাবো ?

ভুচু শুধোলো।

রাতমোহানায়। কাছাকাছিও হবে। নির্জনও হবে।

চমকে, পৃথুর চোখে চোখ রাখল ভুচু।

তারপর চোখ নামিয়ে বলল, তাই-ই চলো।

রাতমোহানায় পৌঁছেই শামীম হট-কেস থেকে বটি-কাবাব বের করল। বলল, কালকের খনার মহডা। সাবীব মিঞার সব কর্তব্য এখন শামীমই যেন তার কাঁধে তুলে নিয়েছে। কিন্তু সাবীর মিঞা একজনই হন। দুজন হবেন না আর। পৃথু বলল, কাল তোমার মেয়ের বিয়ে আর তুমি আজ এমন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছো কী রকম ! শামীম বলল, বিয়ে ত হুদা আর নুরজেহানেরই। আমার থোরীই বিয়ে হচ্ছে !

ভুচু নেমে বলল, দাঁড়াও তোমাকে রাম্ তৈরী করে দিই।

পৃথু জবাব দিলো না। জীপ থেকে নেমে যে-পাথরে আরাম করে পাটাকে বিশ্রামে রেখে বসা যায়, তেমন একটি পাথর দেখে নিয়ে বসল। আজকে সপ্তমী কি অষ্টমী হবে। শুক্লপক্ষর। চাঁদ উঠেছে। হুই হুই করে নরম হাওয়া বইছে। বনের বুকে বুকে পাতারা জলপ্রপাতের মতো আওয়াজ করে বয়ে যাচ্ছে। দুপুরের বনের ঝাঁঝ আর পাথরের শিলাজতুর গন্ধ এখনও যেন রয়ে গেছে। শাওন্ আর ভাঁদো নদীতে জল খুবই কম। হাঁটুখানেক হবে বড়জোর। একটা বেওয়ারিশ ডান-পা খোঁড়া কালোরঙা রোগা ষাঁড় ওপার থেকে এপারে এল জলে ছপ্-ছপ্ আওয়াজ তুলে। ওর হাঁটার ভঙ্গীটি ভারী করুণার উদ্রেক করে। কী করে ভাঙ্গল পা-টি কে জানে ? এমনই কঙ্কালসার চেহারা যে, ওকে কোনো স্বাভাবিক বাঘে চিতায় ছোঁবেও না। এখানে অবশ্য বাঘ বা চিতা নেই। মানুষেরও দরকার নেই তাকে কসাইখানায় অথবা ক্ষেতে। তাকে কারোই প্রয়োজন নেই। এমনকি কোনো গরুরও নয়। তারও বোধ হয় কাউকেই প্রয়োজন নেই। ফিকে জ্যোৎস্নায় রহস্যময় হয়ে-ওঠা বনের মধ্যে দিয়ে লটরপটর করে একটু গিয়েই ষাঁড়টা থেমে পড়ল, কী ভেবে যেন। আবার একটু পরেই চলতে শুরু করল। একা একা চলেছে সে। কী অত ভাবছে কে জানে ! বলদেরও এত বুদ্ধি থাকে না কি ? খোঁড়া বলদটার আর পৃথুর মধ্যে বোধ হয় অনেকই মিল।

রাম্-এর গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে নিজে ঠোঁটের কাছে তুলে ভুচু বলল, চীয়ার্স : পৃথু বলল, চীয়ার্স !

ভুচু বলল, একটা কেচাইন হয়ে গেছে পৃথুদা !

কি ?

শামীম ইদুরকারকে একেবারেই শেষ করে দিয়েছে। অনেক মানা করেছিলাম। ওকে গুলি মাবার ভয়ও দেখিয়েছিলাম।

অনুমান করেছিলাম। কিন্তু তোমবা যদি ভেবে থাকো এর জন্যে তোমাদের বাহবা দেব আমি তাহলে ভুল করছো। অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে কাজটা। একে কি বিচার বলে ? কাজীর বিচারও যে এর চেয়ে ভাল।

দ্যাখো না ! কিন্তু একথা বোঝাবে কে এই বর্ণ- ক্রিমিন্যালকে ? বাহাদুর এসেছেন মস্ত। বাহবা চাই।

গভীর বিরক্তিব গলায় ভুচু বলল।

বাহবা আমি কারোও কাছ থেকেই চাই না। শামীম বলল। বাহাদুরীর বয়স পেরিয়ে এসেছি অনেকদিনই আগে। আমি ত' তোমার মতো ছেলেমানুষ নই।

তবে করলে কেন ?

পৃথু বলল।

সে আলোচনা ছাড়ো। তা করে লাভ কি ? এখন কি করণীয় তাই-ই ঠিক করা দরকার। শামীম বলল।

ঘটনাটা ঠিক কি ঘটলো শামীম ? পৃথু শুধোলো।

ভুচু বিস্তারিতভাবে বলল পৃথুকে, কি করে কী হল।

সব শোনার পর শামীম বলল, এবারে কি করব ?

পৃথু, শামীমের চোখে চোখ রেখে বলল, তা আমি কি করে বলব ? তুমি করেছো, তুমি যা ভাল মনে করো করবে। বুদ্ধি এবং বিশেষ করে দুর্বুদ্ধি তুমি ত কম রাখো না ! আমার বুদ্ধির ভরসায় কি তুমি বসে আছো ?

হ্যাঁ। আমি যে খারাপ সে বিষয়ে আমার নিজেরও কোনো সন্দেহ নেই। আমি বিশ্বাস করি, সুবিচার বা অন্যায়ের প্রতিকার এইভাবেই করা উচিত। অবিচারকে অবিচার দিয়েই মুছতে হয়। ন্যায় বিচারের চেয়ে অন্যায় বিচার অনেকই ভাল।

পৃথুর মনে হল এ যেন শামীম নয়, যেন গ্রীক দার্শনিক প্লাটোর "দা রিপাবলিক্"-এর কথোপকথনে যে থ্যাসীম্যাকাসের কথা আছে, তার আত্মাই যেন কথা বলছে শামীমের মধ্যে থেকে।

হুবহু সেই কথা।
পৃথু বলল, তুমি কি বলতে চাও যে, অবিচার এক দারুণ গুণ আর সুবিচার একটা দোষ ?
নিশ্চয়ই।
অবিচারেরই দাম আছে, সুবিচারের নেই ?
তা কেন ?
তবে তুমি কি বলতে চাও যে সুবিচার একটা ভুল কথা। একটা দোষেরই ব্যাপার ?
দোষ বলব না, বলব যে কিছু মাথা-মোটা ভালমানুষই, ভুচুর মতো ; সুবিচারে বিশ্বাস করে। অবিচার, পন্থা হিসেবে দারুণ ! তার কোনোই বিকল্প নেই।
তুমি কি তাহলে বলতে চাও যে অন্যায় আর অবিচারে তোমারই মতোযে সব মানুষ বিশ্বাস করে তারা চরিত্রে আর বুদ্ধিতেও অন্যদের চেয়ে অনেক বড় ? অন্যরা সব ফালতু ?
হ্যা, তাই ই ত : অবিচারকে যারা তুঙ্গে চড়াতে পারে, খুঁতহীনভাবে তারাই একটা পুরো জাতের, শহরের, এমনকি দেশেরও মালিক হয়।
কি রকম ?
যেমন কোন কোন রাষ্ট্রের নায়কের ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন, পাকিস্তানের জিয়া।
হেসে ফেলল পৃথু। বলল, সাব্বাস ! তুমি ওকালতি পড়লে না কেন ?
মুখ বেচে খেতে যাব কোন দুঃখে এত রকম অন্য জীবিকা থাকতে !
ভুচু বলল, জানো পৃথুদা, ও যে শুধু ঠাণ্ডা মাথায় ইদুরকারকে জবাই করে তাকে জলের মধ্যে চালান করেছে তাই-ই নয়, তার পরেও ঠাণ্ডা মাথায় এমনই সব কাণ্ড করেছে যাতে খুনের দায়টা আমার ঘাড়েই চাপে। ডি-আই-জি এসে আমাকে যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তাতে মনে হল ওঁরা আমাকেই সন্দেহ করছেন, বিশেষ করে আমিই তোমার সবচেয়ে কাছের লোক বলে।
শামীম বলল, কোনো কিছুই আনাড়ির মতো করি না আমি। আমি চাই যে, ওরা তোমাকেই সন্দেহ করুক। তাহলেই ওরা ফাঁসবে। কেন ফাঁসবে, তা এখন বলব না। শামীম মিঞা অমন কাঁচা কাজ করে না।
ঠাণ্ডা-রক্তের বিষধর সাপের মতো শামীম জীপে ফিরে গিয়ে রাম্-এর বোতল বের করে ওর গ্লাসে রাম্ ঢালল, তারপর জল।
আমরা কি করব এখন ? পৃথুদা ?
ভুচু বলল।
আমি কি বলব ? তোমরা যা ভাল মনে করো করবে। যা করেছ তা ত' আমাকে জিগগেস করে করোনি।
যদি ওরা আমাকে সত্যিই ধরে তাহলে তুমি ইন্দারজিৎলাল সাহেবকে বলবে ত ? আমি দোষী না হয়েও শাস্তি পাব ?
তাই-ই ত' হয়ে এসেছে চিরদিন। দোষীরা শাস্তি কমই পায়।
মজা লাগল পৃথুর নিজের প্রাণের উপর ভুচুর হঠাৎ এমন মায়া জাগতে দেখে। বড়লোক ত' মানুষ শুধু টাকাতেই হয় না, রুষাকে যদি সত্যিই পেয়ে থাকে ভুচু তবে ত তা কুবেরেরই ভাণ্ডার। হেমিংওয়ে ঠিকই বলেছিলেন কথাটা। মানুষের বড়লোকি বাড়ার সমান অনুপাতেই তার প্রাণের ভয় বাড়ে।
পৃথু বলল, চলো তাহলে। কথা ত হলো।
এইটুকু ? ব্যাসস্ ? তুমি ত কিছুই বললে না পৃথুদা ?
তোমরা চুরি করে বারাশিঙা মারার পর এখানেই মীটিং করেছিলে মনে আছে ? বারাশিঙা মারা আর ভিনোদ ইদুরকারের মতো এত ইনফ্লুয়েনসিয়াল পয়সাওয়ালা একজন মানুষকে মারা এক জিনিস নয়। এতে আমি কি বলতে পারি ?
ভুচুর মুখ গোমড়া হয়ে গেল। স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসল। গ্লাসগুলো শেষ হলে বাস্কেটে রেখে

স্টার্ট করল এঞ্জিন। জঙ্গলের মধ্যে হেডলাইটের আলোর বন্যা বইয়ে এগিয়ে চলল জীপ টপ-গীয়ারে।

শামীমকে ওর বাড়ির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে জীপ ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ পর ওরা যখন গিরিশদার বাড়ির সামনে এল, দেখল বাইরে একটি ফিয়াট ও একটি অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

কারা আবার এল ? স্বগতোক্তি করল পৃথু। লোকজন ভাল লাগে না ওর। নতুন লোক ত' নয় !

ভিতরে যেতেই বুঝল, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। হাটচান্দ্রার যত ফোটা, আধফোটা এবং ডিম-কবিরা গিরিশদার বসার ঘরের গালচেতে, সোফাতে বসে আছেন নানা ভঙ্গিমায়। তুমুল সাহিত্যালোচনা চলছে। মণি চাকলাদারই মধ্যমণি। একটি অদ্ভুতদর্শন শার্ট পরেছেন জিনস্-এর শর্টস-এর উপর। গিরিশদার হাতে কবিতার খাতা। বোধ হয় কবিতা শোনাচ্ছিলেন।

পৃথুকে দেখেই মণি চাকলাদার বললেন, ওয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ !

গিরিশদা উদ্ভ্রান্ত হয়ে বললেন, আরে ! এসো এসো।

পৃথু মনের ভাব মুখে না এনে চাকলাদারকে বলল, কি ব্যাপার আজ ?

আমরা সবাই আজ এখানে জমায়েৎ হয়ে কবিতা, গল্প এবং নাটক পাঠ করছি, গানও।

নাচ-টাচ হয় না ? পৃথু শুধোল।

হ্যাঁ ! তাও হয় বইকি ! গোটা সাত-আট পেটে পড়ে গেলে অনেকেই নাচানাচি করেন।

সুমিতাকে ডাকেননি ? না কি আপনাদের এই সভায় নারীরা বিবর্জিতা ?

তাই-ই। এ পুরুষ সমাবেশ। কোনো মহিলা কবিকেই ডাকিনি। আপনি সীওনীতেও এমন একটি কবি সমাবেশের বন্দোবস্ত করুন না।

আমি ? কোন অধিকারে ?

কেন ? আপনি কি কবি নন ? ভাল কবি হওয়ার প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে আপনার !

কেন ?

যত যন্ত্রণা, ততই ত সৃষ্টি ! বলেই, মুখ ঘুরিয়ে অন্যান্যদের সাপোর্ট চাইলেন।

হাততালি দিলেন অনেকেই।

নাঃ। আমি কবি নই। আমাকে বাদ দিন।

কবি না হলেও আপনার মধ্যে কবি-ভাব প্রচণ্ড।

মণি চাকলাদার বললেন।

সে ত' গিরিশদার বাঁদর সুখময়ের মধ্যেও প্রচণ্ড ছিল, তা বলে কি সেও কবি ?

আপনি অভিমানের বশে একথা বলছেন।

মানুষ মাত্রই অভিমান থাকে। অন্তত থাকা উচিত। বাঁদরদের যা থাকে না।

আপনি কি মনে করেন না যে, হাটচান্দ্রার কবিরা যাঁরা, তাঁদের মধ্যে খুব ঘনঘন দেখা হওয়ার, আড্ডা হওয়ার একটা পার্মানেন্ট ফোরাম থাকা দরকার বলে মনে করেন তাঁদেরও একটা পয়েন্ট আছে ? সাধারণভাবে বাংলা কাব্য এবং কবিদের উন্নতির জন্যেও কি এর প্রয়োজন নেই ?

হয়ত আছে ; নইলে আপনারা মিলিত হয়েছেন কেন।

পৃথু ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। উত্তেজিত হবার অনেকই কারণ আজকে আগেই ঘটেছিল, গিরিশদার সঙ্গে দেখা করতে এসে যে মণি চাকলাদারের খপ্পরে পড়বে, ভাবতেও পারেনি।

ও বলল, আমি ত জানতাম না এই সমাবেশের কথা। আজ আমার একটু তাড়া আছে। আজ আসি। পরে একদিন আসব। চলি, নমস্কার।

গিরিশদা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হাঁ হাঁ ! করে উঠলেন। বললেন, সে কি ? তুমি ত রাতে থাকবে এখানে। ঠুঠা বলল যে !

ভুচু বলল, না গিরিশদা। আজ আমার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি পৃথুদাকে। কাল রাতে বরং আপনার কাছে থাকবেন, বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে চলে আসবেন একেবারে। আমরা চললাম। ঠুঠাকে ভাল

করে খাওয়াবেন কিন্তু।

আরে সে চিন্তা তোমার নেই। ঠুঠার জন্যে মুনেশ্বর ইতিমধ্যেই লিট্রির বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। এই কবি-সমাবেশ ভেঙ্গে গেলেই ওর দেখাশোনা করছি আমি। একটা নতুন কবিতা লিখেছিলাম। শুনবে না ?

কি নাম দিলেন ?

অধঃপতন।

চলি গিরিশদা আজ।

বলে, ভুচু এসে জীপে বসল। পৃথুও।

জীপ ঘুরিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট করে ও বলল, তুমি ওদের এমন এড়িয়ে এড়িয়ে যাও কেন বল ত ? মনে ত হয় ওরা তোমাকে ভালইবাসে, তোমাকে ওরা সত্যিই চায়।

আমিও একটা সময় তাই-ই ভাবতাম ভুচু। তবে একথাও ঠিক যে, ভাল হয়ত এই দলের বেশির ভাগ মানুষই বাসে।

তবে, মণি চাকলাদারদের এ জন্যেই সাহিত্য হবে না কোনোদিন। রাজনীতি যারা করে, সাহিত্য তাদের জন্যে নয়। সাহিত্যের রাজনীতিও ঐ রাজনীতিরই মধ্যে পড়ে। আমি বোকা লোক। বুঝতে সময় লেগেছিল বহুদিন। কবির জীবন বড একাকিত্বব জীবন ; বড কষ্টর। কবিতা গদ্য নয় যে, হাতে দু পায়ে কালি মেখে হামাগুড়ি দিলেই পাতা ভবে।

কী জানি ! কবিরাই যদি একে অন্যের সঙ্গে না মিশবে তবে কি তারা আমার মতো কি ঠুঠা বাইগার মতো লোকের সঙ্গে মিশবে ?

না কেন ? কেন না ? তোমবাই যে সাহিত্যব উপজীব্য বিষয় ! তাই-ই মিশবে !

ভাবছিল,পৃথু ।বার্নার্ড শ' জন গলসওয়ার্দিকে একবার বলেছিলেন : "লিটারারী মেন শুড নেভার অ্যাসোসিয়েট উইথ্ ওয়ান অ্যানাদার নট ওনলী বিকজ অফ দেয়ার ক্লিক্স্ অ্যান্ড হেট্রেডস্ অ্যান্ড এনভীজ, বাট বিকজ দেয়ার মাইন্ডস ইনব্রীড্ অ্যান্ড প্রড্যুস্ অ্যাবরশনস্।"

ভুচু চুপ করে রইল। জীপটা এবার বড় রাস্তার কাছে এসে গেছে।

বড় রাস্তায় উঠেই পানের দোকানের কাছে স্পীড কম করে বলল, তোমার কি মনে হয় না যে, ওঁদের মধ্যে অনেকেই সত্যিই তোমার বন্ধু ?

পৃথুর মনে হল এই প্রশ্নটির গভীরে ভুচুরও একটি অন্য প্রশ্ন লুকোনো আছে। ও বলল, ভুচু তুমি কখনও কোনো সীস্মেহাল্-এ ঢুকেছো ? যার উপরে এবং চার দেওয়ালেই কাঁচ ?

না। কখনও ঢুকিনি কোনো সীস্মেহালে।

আমি ঢুকেছি। ঢুকলে, তুমিও বুঝতে পারতে। আয়নার জগতে একবার ঢুকে পড়লে তখন কোন্টা যে অবয়ব আর কোন্টা প্রতিফলন তা বোঝা বড়ই মুশকিল। বন্ধুবেশী শত্রুদের চেনা সেখানে আরও বেশি মুশকিল।

কবিতার জগতকে আয়নার জগত বলছ তুমি ? সে জগতও এক সীস্মেহাল ?

শুধু কবিতার জগতই কেন, আজকের দুনিয়ায় বোধ হয় সব জগতই তাই। আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত জগতও।

আমাদের মানে ?

সন্দিগ্ধ গলায় ভুচু বলল।

মানে সকলেরই ! আমার, রুষার, ইদুরকারের, তোমার, কার জগত নয় ?

পৃথু বলল।

ভুচু একবার তাকাল পৃথুর দিকে। তারপর নেমে গেল পান আনতে।

পান নিয়ে ফিরে এসে পৃথুকে পান এগিয়ে দিয়ে জীপটা স্টার্ট করে কতগুলো শালগাছের ভিড়ের পাশে পথ থেকে সরিয়ে লালধুলোর মধ্যে দিল নামিয়ে বাঁদিকের চাকা দুটো। এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বলল, কারখানায় গিয়ে রাতের খাবার খাব। শামীম ওর ছেলেকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে সাইকেলে।

রাম্ খাও পৃথুদা এখানেই বসে। বেশ লাগছে চাঁদের আলোটা, শালের পাতায়, না ?

পৃথু বলল, হুঁ।

ভাবল, প্রেম মানুষকে সৌন্দর্য অনুভব করতেও শেখায়। এসব সূক্ষ্ম বোধ ভুচুর আগে ছিলো না। এতদিন সুখে ছিল। সূক্ষ্ম হলেই দুঃখ। খুশী থাকতে হলে সাধারণ হয়েই থাকতে হয়।

রাম্-এর গ্লাস এগিয়ে দিয়ে নিজেও নিয়ে ও আবার ড্রাইভিং সীটে এসে বসল। বনেটের উপর চাঁদের আলো চক্চক্ করছিল। জোর হাওয়া বইছে এখনও লু'-এর মতো। গরম হাওয়া। শালবনের পাতারা হাতছানি দিচ্ছে আর তাদের লক্ষ হাতে চাঁদের আলো ছিট্কে ছিট্কে চম্কাচ্ছে। দূর থেকে সাইকেল চালাতে চালাতে আর গান গাইতে গাইতে কেউ আসছিল। অল্প বয়সী কোনো ছেলে হবে। গলার স্বরটি এখনও মেয়েলি আছে। তার গানের মধুর সুরে শালবনের পাতারা উৎকর্ণ হয়ে উঠল যেন।

দুজনে চুপচাপ বসে আছে পাশাপাশি। ঝড় ছুটছে শালের বনে চাঁদের আলো মাথায় করে। বছরের এই সময় রাতের বন থেকে এক উগ্র গন্ধ বেরোয়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাশভারী পুরুষের ব্যক্তিত্বর গন্ধর মতো। ভুচু যেন কি বলব বলব করছে। উসখুস করছে বলবার জন্যে, কিন্তু বলছে না।

এবার একটা বিয়ে কর ভুচু।

পৃথুই বলল।

চমকে উঠল ভুচু।

আমি ? কেন ? হঠাৎ ?

হঠাৎ আবার কি ? বিয়ের সময় ত বয়ে যাচ্ছে। আর কতদিন ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবে ? পরোপকার ত অনেকেই হল। অবশ্য এই পরদের মধ্যে আমিই অন্যতম। এবার নিজের দিকে তাকাও ভুচু। বিয়ে কর সংসার কর, দশজন পুরুষ যা করে, যা করে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে একজন মানুষ আর মানুষী সুখী হয়েছে, সুখে থেকেছে চিরদিন তাই-ই কর। আমি ত আর নিয়ম নই ; ব্যতিক্রম। সব ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রমাণিত করে।

দেখি।

বলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভুচু। সিগারেট ধরালো। পৃথুকেও ধরিয়ে দিল একটা। তারপর ভাবনায় ডুবে গেল। পৃথুও সিগারেট টানতে টানতে ভাবছিল। জীপের মধ্যের অন্ধকারে দুজনের সিগারেটের আগুন এক এক লাফে নিচে নামছিল।

ভুচু কি সুখী হবে রুষাকে নিয়ে ? রুষা কম করে ওর চেয়ে পাঁচ'ছ বছরের বড় হবে। মিলি ও টুসুও আছে। কিন্তু যারা সুখী হতে জানে তাদের সুখী হওয়া আটকায় না। এ সব বাহ্য। রুষাকে সুখী করারমতোসব কিছুই ভুচুর আছে।আর ভুচুও জাতে উঠবে সমাজের চোখে রুষাকে পেলে। যে জীবনে রুষার হাত ধরে গিয়ে ও পৌঁছবে সেই জীবনই নিরানব্বুই ভাগ মানুষের কাম্য। যদি ওরা দুজনে সুখী হয়, ত হোক না। খুশিই হবে পৃথু। অন্তর থেকে বলছে এ কথা।

রাম্ দাও ;

বলে, গ্লাস এগিয়ে দিল ভুচুর দিকে।

আজকে পৃথু অপ্রকৃতিস্থ হতে চায়। হাটচান্দ্রাতে এসেও সে বিপদগ্রস্ত রুষা ও মিলির সঙ্গে দেখা যে করল না এটা খুব সহজে ঘটেনি। অনেকই জোর লেগেছে ভিতরের। এখন, এই রাতের অনুষঙ্গতে ভিতরের জোরটা যেন ক্রমশই কমে আসছে। পৃথু কি হেরে যাবে ? রুষাকে আঘাত দিতে কি তার বুক কাঁদবে ? উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। যখন বড় নরম ছিল তখন সকলেই পায়ে মাড়িয়ে গেছে তাকে কাদারই মতো অবহেলায়। আজ তীক্ষ্ণ কাঁকর হয়ে তাদের পদতল ক্ষতবিক্ষত করে দেবে সে।

রাম্-এর ভর্তি গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিল পৃথু।

শেষ পর্যন্ত রুষার কথা ভুচু কিছুই বলল না। পৃথু জানত যে, বলতে পারবে না। ছেলেটার মধ্যে

এখনও বিবেক বেঁচে আছে। আঘাতে আঘাতে তা অবশ হয়ে যায়নি।

এক সময় ভুচু বলল, চলো যাই।

চলো।

পৃথু বলল।

সকালে ভুচু ওঠার আগেই উঠে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল পৃথু। তখন পূবের আকাশ সবে লাল হচ্ছে। ভোরের আজান দিকে-দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রত্যেক মসজিদের মিনারে মিনারে মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে দেখছে। কেন ? কে জানে ? মিষ্টি হাওয়া ছেড়েছে। রাতশেষের এই সময়টায় প্রচণ্ড গরমের দিনেও একটা ঠাণ্ডা ভাব থাকেই।

গোরস্থানটা ভুচুর কারখানা থেকে শর্টকার্ট-এ মাইলখানেক পড়ে। অনেকখানিই রাস্তা। তবু, ভুচু ওঠা অবধি আর অপেক্ষা করেনি ও। প্রেম ও শ্রদ্ধা নিবেদন বোধ হয় একা করাটাই বাঞ্ছনীয়। ভুচু উঠলে, জীপ নিয়ে সঙ্গে আসত অথবা জোর করে অন্য কাউকে পাঠাত। এখন নিজে ড্রাইভ করতে পারে না বলেই বার বার অন্যাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে না আর। ভুচুর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করার দিনও বোধ হয় শেষ হয়ে এল। আস্তে আস্তে সম্পর্কের সুতো এবারে ঢিলে দেওয়াই ভাল। অনেকই করেছে ও পৃথুর জন্যে। ঋণ আর না বাড়ানোই ভাল। এই পথটার দুপাশে ইউক্যালিপ্টাস গাছ। পথটির নামও তাই ইউক্যালিপ্টা অ্যাভিন্যু।

ভুচু রাতে বলে দিয়েছিল কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে সাবির মিঞাকে, দু সারি সোনাঝুরি আর জ্যাকারাণ্ডা গাছের মাঝে। উনি, মৃত্যুর পরও যদি নিজের মত ফলাতে পারতেন তাহলে হয়ত বলতেন তাঁর বনক্ষেতিতেই যেন তাঁকে কবর দেওয়া হয়। তিন দিক খোলা মাটির ঘরের ডেরার ঠিক সামনের মহানিমগাছটার গোড়ায়। অনেকই আনন্দের দিন-রাত কেটেছে পৃথুদের সকলেরই সেই গাছতলিতে।

গোরস্থানে ঢোকবার আগে মনে পড়ল ফুল আনা হয়নি। পথের পাশে বুনো লালপাতিয়ার ঝাড় ছিল অনেক। সেখানে গিয়ে অনেকগুলো লালপাতিয়া ছিঁড়ে নিল পৃথু, তারপর গোরস্থানের মধ্যে ঢুকে ভুচুর নির্দেশিত জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছল আস্তে আস্তে। লালপাতিয়ার পাতাগুলো কবরের উপর রেখে, পাশে ক্রাচ্ নামিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল মাটির উপর।

সব ঘাসই মরে লাল হয়ে গেছে এখন। সূর্যটা সবে উঠেছে। সোনাঝুরি আর জ্যাকারাণ্ডাদের ফাঁক-ফোকর দিয়ে নরম লাল রোদ এসে পড়েছে কবরের উপরে। উর্দুতে লেখা আছে কোরাণের কোনো বাণী। নিচে ইংরিজিতেও লেখা আছে হিয়ার স্লীপস্ মহম্মদ সাবির। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ। সাবির সাহেব পৃথুর চেয়ে বয়সে প্রায় তেইশ চব্বিশ বছরের বড় ছিলেন জেনে অবাক লাগল। অথচ এমন ইয়ার জীবনে বেশি পায়নি।

পাঁচটি জ্যাকারাণ্ডা, তাদের শেষ ফুলের নরম বেগুনী রাশ আজই শেষভোরে ঝরিয়ে দিয়েছে কবরের উপরে, যেন পৃথুরই হয়ে। ঝরিয়ে দিয়েই রিক্ত হয়ে গেছে।

পৃথু ভাবছিল, সাবীর সাহেবের ছেলেরা সবাই আছে বটে, কিন্তু কেউই ও-বাড়িতে উদ্বাহু হয়ে, আতরদান সাজিয়ে, "আইয়ে আইয়ে" করে বুকে টেনে নেবেন না আর পৃথুকে। বক্‌রী ঈদের ও মুহারম্-এর বাঁধা নেমন্তন্ন ত' ছিলই এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নানা অছিলায় নেমন্তন্ন করতেন উনি। অমন উম্‌দা বিরিয়ানী আর কেউই পেশ করবেন না। হারুনুর রশিদই যেন এসেছিলেন সাবীর সাহেবের শরীর ধরে এই জঙ্গলে হাটচান্দ্রায়। এই মানুষটিকেও একদিনের জন্যে খাওয়াতে পারেনি পৃথু তার বাড়িতে ডেকে। তার ত কোনো বাড়ি ছিলো না ! মনে পড়তেই, চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল ওর।

মৃত্যুর আগের দিনক'টিতে নাকি হোঁশ-বেহোঁশ সাবির সাহেব হরদম পৃথুরই নাম করে পুকার দিয়ে উঠতেন। পৃথুর অশেষই সৌভাগ্য বলতে হবে। কোনো কিছুই "সদ্‌কা" করে ছেড়ে দিলে ; মানে, উৎসর্গ করে দিলে গায়কের মুখ-নিঃসৃত সুরেরই মতো, তা ত' আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না এ জন্মে। সাবীর সাহেবের প্রতি হৃদয়ের যে উষ্ণতা, পৃথু একদিন সদ্‌কা করে দিয়েছিল তা এখনও

ছড়িয়ে আছে হাটচান্দ্রার আকাশে বাতাসে। এমন হমদর্দি মানুষ আর ত' দেখল না ও!

সাবীর মিঞা পাকা গাইয়েও ছিলেন নিজে। অথচ কখনই নিজেকে জাহির করতেন না। বরং একজন ভাল শ্রোতা হিসেবেই পরিচিত হতে চাইতেন। একবার পরজ-বাহার শুনিয়েছিলেন তাদের সকলকে। বনক্ষেতিতে। উদ্বেল বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে। সবশুদ্ধ দেড় ঘণ্টা মতো গেয়েছিলেন। কিন্তু সে কী গান। কী মেঘগর্জনের মতো গলা। তারই মধ্যে বিদ্যুতের চমক, ফুলের গন্ধ। কী ভাব! যে গানটি গেয়েছিলেন সেটি অবশ্য পৃথুর বহুবারই শোনা ছিল বহু গায়কের মুখে— "ডাল ফুল ফল।" কিন্তু উনি আরম্ভই করেছিলেন রেখব-ষড়জ-নিখাদের একটি "কন্" দিয়ে। আহা! সে কী কন্! হৃদয়-ভাঙা অভিমানের মতোই তীক্ষ্ণ অথচ মোলায়েম। পরজ ও বাহার ছাড়াও অন্য অনেক রাগই এসে মিশছিল তাতে। কত আলোছায়া নেচে যাচ্ছিল ঘুঙুর পরে সেই সুরের লুকোচুরির মধ্যে যে,আজও ভাবলে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পৃথু, বাবার মুখে শুনেছিল, এই গানটিই নাকি মৌজুদ্দিনের গলায় তিনি শুনেছিলেন এক সময়। মৌজুদ্দিনের গলায় শোনা সেই গানের ঘোর পৃথুর বাবার হঠাৎ-মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অবধিও তাঁর মধ্যে ছিল।

গান ত' কত লোকেই গায়! কিন্তু সুর এমন ঈজ্জৎ, গানের বাণী এমন নাজুক চেক্‌নাই পায় ক'জন গায়কের গলায়? অথচ গান ত' পেশা ছিলো না সাবীর সাহেবের! পেশায় ত ছিলেন জুতো আর বন্দুকের দোকানী। হয়ত পেশা ছিলো না বলেই অমন করে হৃদয় নিংড়ে গাইতে পারতেন মানুষটি। কত বছর আগের সেই রাতে উনি গান গেয়েছিলেন ত' মোটে দেড়টি ঘণ্টা। কিন্তু কী যে মস্তী ছিল সে গানে! মস্তীর বিচারকে ত' কোনোদিনও আর সময়ের হিসাবে বাঁধা যায় না! পঞ্চাশ বছরের কারবারি লুৎফ্ বে-মুশকিলে একটি মুহূর্তের মস্তীরও বরাবর হতে পারে। এই সকালে সাবীর সাহেবের কবরের সামনে বসে অমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের লেখা অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'স্মৃতির অতলে'তে উল্লিখিত দুটি ছত্র যেন কে আবৃত্তি করল ওর কানের কাছে, গোরস্থানের নির্জনে:

"অব্‌তো সোনে দেও চয়নসে,
পড়ো না তঙ্কি লহ্‌দসে যাও।"

আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে, উঠে পড়ল পৃথু। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে চলল ভুচুর গারাজের দিকে।

পৃথুর বুকের খুবই কাছের, জিন্দা-দিল্, লাজোয়াব্; লম্বা-চওড়া মানুষটি ঠাণ্ডা শ্বেতপাথরের একটি ফলক হয়ে পড়ে রইলেন পিছনে। পৃথুর আগে অথবা পিছনে দিল-খোলা হাসি হাসতে হাসতে তাকে উষ্ণতায় ভরে দিয়ে আর কোনোদিনও সাবীর সাহেব হেঁটে যাবেন না।



ভুচু চান-টান করে অপেক্ষা করছিল উদ্বিগ্ন হয়ে। গেল কোথায় খোঁড়া মানুষটা?

ফিরতে দেখেই বলল, কোথায় গেছিলে তুমি? সাতসকালে? না বলে কয়ে? রীতিমত চিন্তায়ই ফেলে দিয়েছিলে।

গেছিলাম, সাবীর সাহেবের কবরে।

আমাকে বললে না কেন? এতখানি পথ হেঁটে গেলে?

কিছু কিছু জায়গাতে ত' শুধুমাত্র হেঁটেই যেতে হয় ভুচু ! কী একটা হিন্দি ছবির সেই গান ছিল না ? 'সজনরে ঝুঠ্ মত্ বোলো, খুদাহ্কি পাস্ যানা হ্যায়, না হাতী হ্যায় না ঘোড়া হ্যায়, হঁয়া ত' পায়দল্হি যানা"

"ঝুঠ্ মত বোলো" কথাটা ভুচুকে একটু বিচলিত করল। ত্রস্ত চোখে চাইল পৃথুর মুখে। পৃথুর কথাটা যে দ্ব্যর্থক সেটুকু বুঝল। কিন্তু দুটি অর্থর কোনোটাই প্রাঞ্জল হলো না ওর কাছে।

কি খাবে বলো নাস্তায় ?

অনেকদিন তোমার হাতের চিঁড়ের পোলাও খাইনি। খাওয়াবে ? আর লাড্ডুর দোকানের রাবড়ি। আছে কেমন সে ?

কেমন আর থাকবে ? বলির পাঁঠার মতো। বিয়ের তারিখ ত' এগিয়ে আসছে। আজ রাতে ত' দেখা হবেই নুরজেহান আর হুদার বিয়েতে। খুব বড় ম্যায়ফিল বসাবে ও। ভোপাল থেকে নামী উস্তাদ, উজ্জয়িন্ থেকে হুরী-পরী বাইজী আনাবে। তুমি ওর বিয়েতে না থাকলে ও কিন্তু খুব দুঃখ পাবে।

তোমার বিয়েতে যদি আমি না থাকি তাহলে তুমিও কি দুঃখ পাবে ? না কি, আনন্দিত হবে ?

হঠাৎই বলল পৃথু দুম্ করে। বোমার মতো আওয়াজ হল কথাটাতে ভুচুর কানে। ও বলল তোমার কথার আজকাল কোনোই মাথামুণ্ডু নেই। এবারে চান করে এসো। চিঁড়ের পোলাও বানিয়ে ফেলছি। লাড্ডুর দোকানেও পাঠাচ্ছি কাউকে রাবড়ির জন্যে। দুপুরে কোথায় খাবে ? তোমার বাড়িতেই নিশ্চয়ই ?

আমার বাড়ি ? আমাব ত' কোনো বাড়ি নেই ভুচু !

তোমাব এই হেঁয়ালি সব সময় ভাল লাগে না পৃথুদা। তুমি ত' এ রকম ছিলে না !

তুমিও কি এরকম ছিলে ? হেসে বলল, পৃথু। তাছাড়া, এর মধ্যে হেঁয়ালিটা কি দেখলে ? হাটচান্দ্রার চামারটোলির রুষা সেনের বাড়ি নিশ্চয়ই আমার বাড়ি নয়।

তবে, তোমার বাড়ি কোথায় ? সীওনীতে ?

নাঃ। সেখানেও নয়।

তবে ?

আমার বাড়ি স্বপ্নে আছে। এ জীবনে স্বপ্নেই থাকবে। 'বাড়ি' বলতে যা বোঝায় তা থাকার মতো যোগ্যতা নিয়ে যে এই জন্মে এখানে আসিনি।

তোমার স্বপ্নের বাড়িটার রকমটা কেমন ?

বিদ্রূপের গলায় বলল, ভুচু। বলেই বলল, তুমি অনেকই বদলে গেছ পৃথুদা, কিছুদিন হল।

হাসি-হাসি মুখেই পৃথু বলল, ভাগ্যিস বদলে যাই আমরা।

আমরা মানে ?

মানে, আমি, তুমি, আমরা সকলেই। বদলের আরেক নামই ত' বেঁচে থাকা। তাই না ? নিজেকে যে নবীকৃত করতে না পারে প্রতি মুহূর্ত, সে ত' থেমেই আছে। চলা থামলে, না বদলালে ; থাকা-না-থাকা সমান।

ভুচুর মুখে বিদ্রূপের হাসিটা তখনও কৃষ্ণপক্ষর শেষ রাতের চাঁদের মতো পুরু ঠোঁট দুটি থেকে ঝুলে ছিল। বলল, তোমার জীবনটা, তোমার কথা আর তোমার কাজ বড়ই বেশি গোলমেলে। একটা জীবনে তুমি আঁটলে না। অথচ জীবন ত' সব মানুষেরই একটাই !

ঠিক ! ঠিকই বলেছো তুমি। এই একটিমাত্র রঙচঙে ঝল্মলে যাত্রারপোশাকেরই মতো জীবনকে যারা অনুক্ষণ গায়ে চড়িয়ে না রাখতে পারে, হয় তারা জীবনে আঁটে না,নয় জীবন তাদের গায়ে আঁটে না।

তুমি ? তুমি কি সুপারম্যান ?

ভুচু বলল, একই সুরে।

না। আমি লেসারম্যান। অনেকগুলো জামা আমার। যখন যেটা খুশি পরি। কিন্তু তুমি যেহেতু

বয়সে ছোট, খুব দেখেশুনে পা ফেলো। আমারই মতো নষ্ট হয়ে যাবে তা না হলে। অনেকগুলো জামা পরতে গিয়ে শেষে জীবনের বাদলা-দিনে পৌঁছে উদ্‌লা গায়ে থেকো না। তোমার মধ্যে আইডিয়াল হাজব্যাণ্ডের সব এলিমেন্টসই আছে। যাকে ভালো লাগে তাকে বিয়ে করো, ঘরসংসার করো, সুখী হও। তোমার সুখের পথে কোনোই বাধা আসবে না। তবে বিয়ের পর আমার মতো ডিস্টার্বিং ডিসরাপটিভ্ মানুষের সঙ্গে আর কোনো সংস্রব রেখো না। আমার মধ্যে শুধু নিজেকে নষ্ট করার প্রবণতাই নেই, আমার কাছাকাছি যারা থাকে তাদেরও নষ্ট করে দিই আমি অজানিতে। আবার বলছি ভুচু, এবারে বিয়ে করো, যাকে পছন্দ তোমার তাকেই···নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেব আমি।

কাকে পছন্দ আমার ?

প্রায় ধরা-পড়া, কম্পমান গলায় ভুচু বলল।

তা আমি কি করে জানব ? কখন যে কার কাকে ভাল লেগে যায় তা কে বলতে পারে ? মানুষের মন বলে কথা ! যাই। চানটা করেই আসি।

চান করতে করতে বাথরুমের ক্লোজেটটা খুলে লুকিয়ে যেন পরস্ত্রীকেই দেখছে, এমন করে রুষার ফোটোটি দেখল আরও একবার। সত্যি ! রুষার মতো সুন্দরী লক্ষে মেলে। কী ব্যক্তিত্ব ! শারীরিক সৌন্দর্য অনেক বোকা-বোকা মেয়েদেরও থাকে। রুষা, রুষাই ; ক্লিওপেট্রার মতো।

ঠুঠা বাইগা এল ভুচুর রান্নাঘরে, গিরিশদার বাড়ি থেকে তার চিঠি হাতে করে। ভুচু চিঠিটি খুলে দেখল গিরিশদা লিখেছেন পৃথুকে, ব্রাদার ! যদি তুমি দুপুরে অন্যত্র না খাও, তবে আমার সঙ্গেই খাবে। ঠুঠাকেও নিয়ে আসবে। রাতে সকলে এখান থেকেই নুরজেহানের শাদীতে যাওয়া যাবেখন।

কাল রাতে খুবই জমেছিল। তুমি থেকে গেলেই পারতে ! আমার কবিতা পড়ে সকলে অভিভূত ! —ওলওয়েজ ইওরস্। গিরিশদা।

ইডিয়ট।

মনে মনে বলল ভুচু। পৃথুদা এতদিন পরে এসেছে, কি করে ভাবলেন গিরিশদা যে, রুষা বৌদির ওখানে খাবে না সে ? তাছাড়া রুষা বৌদি আর পৃথুদার সম্পর্ক কি মোড় নেয় না নেয় তার উপর নির্ভর করছে ভুচুর সমস্ত জীবন। পৃথুদা কি থেকেই যাবে এখানে ? ইস্‌স, কী যে কষ্ট ভুচুর ! কেন যে এমন হল ! কী যে হল ! ছিঃ ছিঃ ! কোনো সুস্থ মানুষ ইচ্ছে করে এমন অসুস্থ হয় ! ভুচুর মতো !

চান করে উঠে বাইরে এসে যখন জামাকাপড় পরছে তখন পৃথুর পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে হঠাৎ কুর্চির চিঠিটা মেঝেতে পড়ে গেল।

ভুচু বলল, কী যেন পড়ে গেল।

কুর্চির চিঠি।

এখানে লিখেছেন মিসেস রায় ?

নাঃ সীওনীতে বাসে ওঠার আগেই পাঠিয়েছিল।

পড়লে না ?

তাড়া কিসের ? পড়া যাবে ধীরেসুস্থে। সবাই ত' রুষা নয়। অন্য মেয়েরা কি লিখবে তার আন্দাজ পাওয়া যায়ই।

ভুচুর খুব ইচ্ছে করল চিঠিটি চুরি করে পড়ে। তাহলে জানা যেত কুর্চি আর পৃথুদার সম্পর্কটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ! এবং তা থেকে রুষার সঙ্গের সম্পর্কটা অনুমান করাও সহজ হত।

নাস্তায় বসল ওরা। ঠুঠাকেও ডাকল পৃথু।

ঠুঠা একটা সংক্ষিপ্ত আওয়াজের ও তার কুৎসিত মুখের প্রসন্ন ভঙ্গিমার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিল যে, সে ডাট্‌কে নাস্তা করেই এসেছে। ভুখ্ নেই।

খেতে বসে আর বিশেষ কথা হলো না দুজনের। দুজনেই নিজের নিজের ভাবনাতে বুঁদ ছিল।

পৃথু মাঝে মাঝে চাইছিল ভুচুর মুখে। প্রেম, ভুচুকে এক দৃপ্ত ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। কখনও কখনও অন্ধকারও দেয় প্রেম, যখন গভীরে গড়িয়ে যায় ; চোখের নিচে কালি পড়ে তখন ; গোলাপি আভা মরে গিয়ে। খুব মজা লাগছিল পৃথুর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই ভুচুই পৃথুর জন্যে নিজেকে মেরেও ফেলতে পারত। এমন সখা, এমন বন্ধু, এমন মহৎ ছেলে আর দেখল কই ! কিন্তু যেই স্বার্থ এল, এল স্বার্থর সংঘাত অমনি এতদিনের সম্পর্ক কী রকম উল্টেপাল্টে গেল। স্বার্থর রোদ লাগলেই জবরদস্ত দোস্তীও আইসক্রীমেরই মতো গলে যায়। দোস্ত-এর সঙ্গে এই যুদ্ধ পরিহার করে যে হেরে গেছে বলে সরে আসতে পারে সেই-ই বোধহয় প্রকৃত দোস্ত ' পারবে কি পৃথু ? সাধারণ পৃথু ঘোষ কি পারবে অসাধারণ হতে ? পৃথু অনেকই সয়েছে। হয়ত আরও সইতে পারবে। কিন্তু বেচারী ভুচু বড় ছেলেমানুষ। বড়ই বঞ্চিত শিশুকাল থেকেই। ও ভেঙেই যাবে হয়ত। সুখী হোক ভুচু। সুখী হোক।

হঠাৎই প্লেট থেকে মুখ তুলে ভুচু বলল, আচ্ছা পৃথুদা ! বিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা কি ?

হঠাৎ এই প্রশ্ন ? বিয়ে মানে ? তোমার বিয়ে ?

আঃ। আই মীন, বিয়ে ইন্ জেনারাল।

সে সব পণ্ডিতেরাই বলতে পারবেন। তোমাদের খ্রীস্টান ধর্মের কথা আমি জানি না। তবে জানি যে, আমাদের শ্বেতকেতুই প্রথম নাকি বিবাহ-প্রথা চালু করেছিলেন।

তিনি আবার কে ?

উদ্দালক বলে এক ঋষি ছিলেন, তাঁরই ছেলে।

হঠাৎই শ্বেতকেতু ? কি কারণে ?

কারণ একটা ছিল। শ্বেতকেতু যখন শিশু তখন একদিন তিনি দেখলেন যে, তাঁর মাকে আরেকজন ব্রাহ্মণ এসে নিয়ে চলে গেলেন। অবাক হয়ে তিনি বাবা উদ্দালককে জিজ্ঞেস করাতে, উদ্দালক বললেন, বৎস ! নারী আর গাভীতে ত' সকলেরই সমান অধিকার। যে-কেউই যে-কোনো নারীকে নিয়ে গিয়ে সহবাস করতে পারেন।শ্বেতকেতু গাভীরই মতো তাঁর মায়ের এক অপরিচিত মানুষের সঙ্গে অমনভাবে স্থানান্তরে চলে যাওয়াতে খুবই মর্মাহত হলেন। বড় হয়ে তাই উনিই বিবাহ প্রথা চালু করলেন। সেদিন থেকে নারীর কৌমার্য দলিত করার অধিকার শুধুমাত্র পতিতেই বর্তাল। বিবাহ অনুষ্ঠানেরও চল হল।

মানে, সেদিন থেকেই এক নারী এবং এক পুরুষের কনসেপ্ট চালু হল বলছ ?

তা হল, কিন্তু পুরোটা শোনোই। এই শ্বেতকেতুই পরবর্তী জীবনে নন্দীর হাজার অধ্যায়ের কামশাস্ত্রকে ছোট করে পাঁচশ অধ্যায়ের একটি কামশাস্ত্র রচনা করলেন।

তোমাদের এই শ্বেতকেতু কি কোনো কাল্পনিক মানুষ ? মীথিকাল কেউ ?

ইন্টারাপ্ট্ করল ভুচু।

না, না। কাল্পনিক চরিত্র নন। আমাদের তৈত্তিরীয়সংহিতা, উপনিষদের ছান্দোগ্যোপনিষৎ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎও এই শ্বেতকেতুর উল্লেখ করেছেন। মজাটা হল এই-ই যে, নারীর চরিত্র যাতে নির্মল এবং অকলুষিত থাকে সে জন্যে এক নারীকে এক পুরুষের সঙ্গেই আজীবন বাঁধা থাকতে বলা হল কিন্তু যে কটি কামশাস্ত্র রচিত হল তার সবকটিতেই একটি করে অধ্যায় যুক্ত হল, তাতে পুরুষ কোন্ প্রক্রিয়ায় অন্যর স্ত্রীকে বশে এনে তার সঙ্গে সহবাস করতে পারে তারই বিস্তারিত প্রেসক্রিপশন থাকল। কোনো কামশাস্ত্র সেই বিশেষ অধ্যায়ের নাম দিল 'পারদারিক'। আমাদের বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র তার নাম দিল "পরদারিকাধিরণস্য"। মানে, পরের স্ত্রীকে অধিকার করার কায়দাকানুনের ফিরিস্তি আর কী !

ভুচুকে একটু চঞ্চল দেখাল। হঠাৎ বলল, পৃথুদা, তুমি চা না কফি ?

মজা পেল পৃথু। গীল্‌টি-কনসাস ভুচুর দিকে চেয়ে।

বলল, কফি। কিন্তু তুমিও পড়েছো না কি বাৎস্যায়ন ?

রেগে গেল ভুচু। বলল, যা বলছিলে বলো না। শেষ করো।

ব্যাপারটা কী দাঁড়াল দ্যাখো। প্রত্যেক পুরুষ তার নিজের স্ত্রীকে সতী-সাধ্বী থাকতে বলল। সমাজও তাই বলল। টিকিওয়ালা পেটমোটা পণ্ডিতেরা, সামান্য এদিক ওদিক হলেই নারীদের 'অসতী', 'কুলটা' এসব বলে তাদেব জন্যে সবরকম সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য শাস্তির বিধান দিল এবং সেই সমাজপতিরাই পুরুষদেব 'পারদাবিকাধিকরণস্য' সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহে কখনও বাধা দিল না। হিন্দু পুরুষদের ভণ্ডামির এতবড় প্রমাণ আব কিছুই হতে পারে না বোধ হয়।

প্রত্যেক পুরুষই হয়ত পলিগ্যামাস্। বেশিবভাগ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান পুরুষমাত্রই হয়ত তার রক্তের মধ্যে বহুচারণাব প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মায়। এক নারীতে কোনোদিনই সে সন্তুষ্ট নয়।

ভুচু বলল।

অথচ মেয়েদের কথাটা কেউ ভাবল না পর্যন্ত ?

পৃথু বলল, এখন সময় এসেছে কোনো মহিলার কামশাস্ত্র লেখার। তাতে পরপুরুষ শিকারের প্রেসক্রিপশন থাকবে।

ভুচু হেসে বলল, তুমি হিন্দুদেরই দোষ দিচ্ছ আর মুসলমানেবা ? তাদেব ধর্মই ত' বিধান দিচ্ছে পুরুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়েই। আমাদেব সাবীব সাহেব, শামীম, মৌলভী গিয়াসুদ্দিন এদের সকলেবই ত' একাধিক স্ত্রী আছে।

পৃথু বলল, তা আছে। কিন্তু তারা ত' হিন্দুদের মত ভণ্ড নয়। কোবানেব ফরমান মেনেই হয়ত ভোগ করেন তাঁবা। তাঁবা সম্মানের। তবে চুবি করে, ঘোমটার তলায় খেমটা নাচ দেখাব দবকার হয় না মুসলমানদের। পবস্ত্রীব দিকে হাত না বাড়িয়ে নিজে একাধিক বিয়ে করাটাই ত' অনেক শান্তির। এবং শাস্ত্রসম্মত। যে ব্যক্তিগত আইন বা সামাজিক প্রথাকে যথেষ্ট সম্মান দেখানো না যায়, বা যা পুরোপুরি মানা না যায় ; তা বেখে লাভ কি ? আমাদের বিয়ের কনসেপ্টটাকে আগাগোডা খতিয়ে দেখে এর খোল-নলচে পাল্টাবার দিন এসে গেছে বলে মনে হয়। যত শাস্তি, যত কুৎসা আজকেও ওই পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদেরই মাথা পেতে নিতে হয়। মহান, পবিত্র পুরুষদের গায়ে কোনো কলঙ্কই লাগে না। এই সমাজে রুষা সেনরাই চিরদিন কলঙ্কিনী হয় আব পৃথু ঘোষরা নির্দোষ। সমাজের সব সমবেদনা থাকে তারই দিকে। তাই-ই না ?

এমন সময় বামচন্দর বাবড়ি না পেয়ে ফিরে এল। এসেই ঘরে ঢুকে বলল, দশটার পবে গেলে পাওয়া যাবে।

ভুচু বলল, পাঠিও কাউকে দশটার পরেই। ভুলে যেও না আবার। খেতে চেয়েছেন পৃথুদা, খাওয়াতে হবেই।

রামচন্দর চলে গেলে ভুচু বলল, তুমি এত কথা বললে বটে পৃথুদা, কিন্তু "অ্যাফেয়ার" ত' কখনও একজনে হয় না। তাতে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর দরকার হয়ই। পরস্ত্রী রাজী হলে তবেই না পরপুরুষ অ্যাফেয়ার কবতে পারে ? কথায়ই বলে "যব মিঞা বিবি রাজী তব্ ক্যেয়া করে কাজী ?"

তা ঠিক। কিন্তু আমি বলছিলাম অন্য কথা। মেয়েদেরও যে কিছু চাওয়ার আছে, তারাও যে মানুষ, তারাও যে, যে-কোনো একজন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলেই সারাজীবন তাকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করে জীবন কাটিয়ে দেবে, চোখ বন্ধ করে রাখবে তাব স্বামীর চেয়ে সুন্দর শরীর অথবা সুন্দর স্বভাবের অথবা বেশি গুণের কোনো পুরুষকে দেখবে না বলে ; নাক বন্ধ করে রাখবে ফুলের আর ধূপের সুবাস যেন নাকে না আসে ? কান বন্ধ করে রাখবে যাতে পরপুরুষের গলার স্বর কানে মিষ্টি না লাগে ? এটাই বা কোন্ নিয়ম ?

কফি খাও পৃথুদা। ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ভুচু বলল। জানতে চাইলাম বিয়ের কথা। আর তুমি কত জ্ঞানই না দিয়ে দিলে!

এই জ্ঞান দেওয়াটাই হচ্ছে সেনিলিটির লক্ষণ। কেউ কেউ অল্প বয়সেই সেনাইল হয়ে যায়

আমার মতো।

এতদিন পরে হাটচান্দ্রায় ফিরে কোথায় এতক্ষণে নিজের বাড়িতে গিয়ে…তা না, কালকে কবি সম্মেলন থেকে পালিয়ে এসে আজ ভোরে ধর্ম-সম্মেলন বসালে তুমি। অজীব আদমী বটে।

কফিতে চুমুক দিয়ে পৃথু বলল, জানো ভুচু, ধর্মের কথাই যখন বললে তখন বলব যে এই পুরোনো পৃথিবীতে এক নতুন ধর্মব্ব সূচনা করার দিন এসে গেছে অনেকদিনই। যে ধর্মে বিত্ত দিয়ে ভেদ সৃষ্টি করা যাবে না মানুষের মধ্যে মানুষের, গায়ের রং দিয়েও যাবে না, প্রত্যেক নারী ও পুরুষ যে ধর্মে সমান মান মর্যাদা সুখ এবং স্বাধীনতা পাবে।

তুমিই কি তাহলে এই নতুন ধর্মব স্রষ্টা হবে?

ঠাট্টার গলায় বলল ভুচু।

আমি কে? স্রষ্টারা আসছে। ওই টুসুদের প্রজন্ম। ওরা আমাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না এই ভান-ভণ্ডামির জন্য। সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে। এখনও যাদের বয়স পনেরোর চেয়ে কম, তুমি দেখো, তাবাই আমাদেব সব মুখোশ ছিঁড়ে দেবে। মানুষকে, মানুষেব মতো সুস্থ, স্বাভাবিক, সুখী হয়ে বাঁচতে বলবে ওরা এই একটামাত্র জীবনে। আমাদের বারুদ আর অ্যাটমের গোবস্থানে ওরাই সাদা ফুল ফুটোবে।

একসময় বলল, নাও সিগারেট খাও একটা।

চলো এবার উঠি। তোমার বাড়িতে যাবে ত' এবাবে? দশটা বাজতে চলল।

ভুচু বলল।

বাড়ি নেই। তবে যাবো। রুষার কাছে। চলো যাই। মিলিটাকেও দেখিনি অনেকদিন।

আমি? আমি কি করতে যাব? তোমাদেব কত কন্‌ফিডেন্সিয়াল কথা থাকবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। কাবাবমে হাড্ডি হবাব কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।

পৃথু একবার তাকাল ভুচুর দিকে। তারপর কী ভেবে বলল, আচ্ছা।

বলেই, এগোল।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। গাড়ি নিয়ে যাও। কাউকে দিয়ে দিচ্ছি, চালিয়ে নিয়ে যাবে। দুপুরের প্রোগ্রাম তাকে দিয়েই আমাকে জানিয়ে দিও। নইলে, ওদিকে সে বুড়ো হাঁচোব-পাঁচোড় করে মরবে। গাড়িটা সারাদিনই সঙ্গে রেখো। ছেড়ে দিও না। গাড়ি ছাড়া চলে?

সব ছাড়াই চলে যায় ভুচু। জীপ ছাড়া চলে, রুষা ছাডা চলে, এমনকি ভুচু ছাডাও চলে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়, হবে হয়ত একটু। এই-ই যা! তারপর আব মনেই হবে না যে জীবন কিছু অন্যরকম ছিল। মানুষের মতো মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন জানোয়ার বিধাতা আর ত' বানাননি। বোধহয একমাত্র আরসোলা ছাডা।

সবাই-ই ত' আর তুমি নয়। ভুচু বলল। একটা ট্রান্সপোর্টের খুবই দরকার কিন্তু রুষা বৌদির। বড়ই অসুবিধে হয় ওঁর। এত বছবের অভ্যেস। তুমি কি বল? একটা গাড়ির বন্দোবস্ত কবে দিই? গারাজেই ত' পড়ে আছে একটা অ্যাম্বাসাডর। সিক্সটি-ফাইভ মডেলের। অ্যাক্সিডেন্টের গাড়ি কিনে বানিয়ে নিয়েছিলাম। সাজিয়েও নিয়েছি। সাদা রঙ-এ। ঘড়ি আছে। ক্যাসেট-প্লেয়ার।

পৃথু, দাঁড়িয়ে পড়ে ভুচুর চোখে সোজা তাকিয়ে বলল, রুষাকে তুমি খুবই ভালবাসো, না ভুচু? ব্যাপারটা অতি-সম্প্রতিই ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। তাই-ই না? ভালবাসা, অবশ্য এমন হঠাৎই হয়ে যায়। করোনারী অ্যাটাকের মতো।

পৃথুর সোজা অথচ দরদী দৃষ্টি থেকে ভুচু চোখ নামিয়ে নিল।

বলল, তুমি বড় মীন্ পৃথুদা। রুষা বৌদি তোমার স্ত্রী। তোমাকে এত ভালবাসি আর তাকে ভালবাসব না?

পৃথু ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করে হেসে ফেলল।

বলল, তাহলে দিওই গাড়িটা। পৃথুদার বৌ বলে কথা! রুষার কষ্ট ত' নিশ্চয়ই হয় গাড়ি ছাড়া! কিন্তু ওর গাড়ি নেই বলে তোমার যে কষ্ট, তা আরও বেশি। ইডিয়ট্! একেই ভালবাসা বলে।

একমাত্র ভালোবাসাই মানুষের নিজের কষ্টর চেয়েও পরের কষ্টর জন্যে বেশি দুঃখিত করতে পারে তাকে।

ভুচু ধরা-পড়া মুখটি অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, তোমার মতো অত বুঝি না আমি।

ভুচুর নির্দেশে একজন লোক একটি সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এল। পৃথু ঠুঠাকে ডাকল। ঠুঠা মাথা নাড়ল। অমানুষিক শব্দ করল আবার।

ভুচু বলল, ও আর আমি শামীমের বাড়ি যাব। কাজ আছে অনেক। ডেকরেটর কাল রাত থেকেই কাজ করছে। মধ্যপ্রদেশ বিড়ি ফ্যাক্টরীর মাঠটা পেয়েছে শামীম। প্রায় দুশো লোক হবে ত'। মস্ত শামিয়ানা হচ্ছে।

এত লোককে খাওযাচ্ছে কি করে শামীম?

ও কোত্থেকে খাওয়াবে? গরীব মানুষ! খাওয়াচ্ছি আমিই। বরকর্তা না কি বলো না তোমরা? আমি ত তাই-ই!

আমাকে একবার সোনা-চাঁদির দোকানেও যেতে হবে ভুচু। ভুলেই গেছিলাম। বলে, গাড়িতে উঠল পৃথু। ভুচু বলল, লছমন শাহুর দোকানেই যেও। ওর কাছে নূরজেহানের হাতের ও গোড়ালির মাপ আছে।

কথাটা শুনে হাসি পেল পৃথুর। নূরজেহানকে হুদার খাটে হামাগুড়ি দিয়ে পাঠাবার কোনো ইচ্ছা ওর নেই।

শালবনটার পাশ দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছে এখন। পেরিয়ে গেল বনের মধ্যের সেই কুয়োটা, যার সামনে টুসু একদিন আত্মহত্যা করতে গেছিল। তারপর দূর থেকে বাড়িটাও দেখা গেল। এই বাড়িতেই কাটিয়েছিল এতগুলো বছর? রোজই এই বাড়ির দরজা দিয়েই বেরিয়ে আবার এতেই এসে ঢুকত? চেনা দৃশ্য, চেনা গন্ধ, সকাল থেকে রাত? অথচ আজ মনে হচ্ছে এ যেন অসংখ্য পরিচিত জনেরই একজনের বাড়ি। বিশেষ কোনো টান অনুভব করল না। কোনো বিশেষ দাবীও নয়।

গাড়ির শব্দ শুনেই খাণ্ডেলওয়াল সাহেবের বাংলো থেকে অ্যালসেশিয়ান্ কুকুরের গম্ভীর ঘাউ-ঘাউ ডাক শোনা গেল। দুটি কেন? তারপরই মনে পড়ে গেল জবলপুরের হাসপাতালে টুসু বলেছিল যে, সাদা কুকুরটার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ঝাঁপাঝাঁপি করা বড় কুকুরটা ত' সাদা নয়! সাদা কুকুরটা কোথায় গেল? এই জন্যেই গলার স্বরটা অচেনা মনে হচ্ছিল। কালো কুরকুচে, ঘাড়ে কেশর-ওয়ালা রাগী-রাগী টগবগে যৌবনের অন্য একটা কুকুর এটা। বদলে গেছে বাড়ি, বদলে গেছে বাড়ির চারপাশ, পরিবেশ, অনুষঙ্গ। যে, একদিন এই বাড়িতে বাস করত বদলে গেছে সেই পৃথুও। বদলে গেছে রুষা। ভাল। ভাল!

গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই টুসু দরজা খুলে, মা! বাবা এসেছে! বাবা এসেছে! বলতে বলতে দৌড়ে এসে পৃথুর এক পায়ের উরুতে মুখ গুঁজল। যেন, বাবার গন্ধ নেবে বলে। পৃথুর মনে হল যেন টুসু নয়, তার যৌবনের শিকারের সঙ্গী সেই প্রিয় ল্যাব্রাডর গান্-ডগটিই! গলে যেতে লাগল পৃথুর ভিতরটা। এই ছেলেটাই তার মুক্তির পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক। নইলে, তার আর দিগা পাঁড়ের মধ্যে তফাৎ আজ আর বেশি নেই। রুষার উপর থেকে যেমন করে একদিন হঠাৎই সব দাবী তুলে নিয়েছিল, কুর্চির উপর থেকেও নিতে পারে। যে-কোনো সময়েই। কখনও নেবেও হয়ত। জীবনকে নেড়েচেড়ে ঝাড়াই-বাছাই করে ঝাড়া-হাত-পা হয়েছে এখন। কোনো কিছুই আর তার কাছে আবশ্যিক নয়। সব কিছুই ঐচ্ছিক। মনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ বোধ করে সে। পাখিরই মতো হালকা হযে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে জীবনের আকাশে। এই আশ্চর্য পরিবর্তনটা ঠিক কবে কখন যে ঘটে গেল, তা নিজেও ঠিক জানে না। চরম পূর্ণতা অথবা অপূর্ণতা থেকেই বোধ হয় জীবন সম্বন্ধে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মায়।

রুষারই মতো কুর্চিও পৃথুকে নিজস্ব মালিকানার ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে রাখতে চায়। পৃথুর মতো মানুষদের ছেড়ে রাখাই যে ধরে রাখার সহজ উপায় এ কথাটা ওরা কেউই বুঝল না। কোনো নারীর

সান্নিধ্যে অথবা আলিঙ্গনেই বেশিক্ষণ থাকলেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে ওর।

পৃথু ঘোষের স্ত্রী রুষা রুষা সেন খোলা দরজার সামনে পরস্ত্রীর মতোই মধুর আমন্ত্রণী হাসি মুখে মেখে খোলা দরজায় দাঁড়িয়েছিল।

কেমন আছো? রুষা হেসে বলল। রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ-দেখা-হয়ে-যাওয়া পুরোনো প্রেমিকার মতো।

ভাল। বলল, পৃথু। আর তুমি?

রুষা অপলকে পৃথুর দিকে চেয়ে ছিল। কী রোগা হয়ে গেছে পৃথু! চেনা যায় না। পা-হারা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা পৃথুকে ত আগে দেখেনি! হঠাৎই রুষার বুকের মধ্যের শক্ত করে কুলুপ-আঁটা দরজা-জানলাগুলি ভেঙ্গে কী এক গভীর যন্ত্রণার আর অনুশোচনার বোধ সাইক্লোনের মতো ধেয়ে এসে ওকে ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দিল। মনের পায়ে জোর পাচ্ছিল না। পৃথু যেমন পায় না শরীরের পায়ে। পরমুহূর্তেই, শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না, ভাবাবেগবর্জিতা আধুনিকা এক নারী তার মধ্যে ফিরে এসে মনের হাল ধরল আবার শক্ত হাতে।

উত্তর না পেয়ে পৃথু আবারও শুধোল, তুমি কেমন আছো?

সম্বিৎ-ফেরা রুষা বলল, ওঃ আমি? আমি ফাইন্। অ্যাবসল্যুট্‌লি ফাইন্। নাথিং টু কমপ্লেন্ অ্যাবাউট! এসো, এসো। ভিতরে এসো। ধরব না কি তোমাকে? পারবে? একা একা সিঁড়ি চড়তে?

পৃথু বলল, না না, ঠিক আছে! পারব।

না বলে, বলল, উঠতে উঠতে; জীবনেব সব সিঁড়িতেই ত' একা একাই উঠতে হয়।

মনে পড়ে গেল পৃথুর যে, জবলপুরের হাসপাতাল থেকে যেদিন ও ফিরল তার আগেই রুষা চলে গেছিল ইদুরকারের বাড়িতে। মনে পড়ল, দূর থেকে সেই আলো-নিবোনো দরজা-জানালা-বন্ধ ঘরগুলির দিকে চোখ পড়ায় তার বুকের মধ্যে কেমন ভূমিকম্প ঘটেছিল! কিন্তু সে সব বলার কথা নয়। অনুযোগ, অভিযোগের একটা সময় থাকে; বয়স থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তমনস্ক মানুষদের ও সব ছেলেমানুষী মানায় না।

মেরী এসে ড্রয়িংরুমে ঢুকেই বলল, গুড মর্নিং স্যাব। ওয়েলকাম্ হোম স্যার!

পৃথু বলল, ভেরী গুড মর্নিং মেরী। কেমন আছো তুমি?

ভাল ভাল। আপনি কেমন স্যার? বলেই, পৃথুর দিকে অনুকম্পার চোখে চাইল।

যা ভয় করেছিল, পৃথু এবারে তাইই হল। মেরী একনিশ্বাসে বলল, ব্রেকফাস্টে কি খাবেন স্যার? কর্নফ্লেকস্ না পরিজ? কটা ডিম স্যার? ডিমের কি স্যার? পোচ্ না স্ক্রাম্বল্, ফ্রাই না ওমলেট? ওয়াটার-পোচ্ কি স্যার? চা না কফি? স্যার?

হেসে ফেলল পৃথু।

বলল, কিছুই খাবো না ম্যাডাম। আমি খেয়ে এসেছি। তুমি ঠিক একই রকম আছ মেরী। একটুও বদলাওনি।

তাইই? আপনিও একটুও বদলাননি স্যার। মানে পা'টা ছাড়া।

তাইই? বলল, পৃথু।

মনে মনে বলল, বাইরেটা দেখে মানুষের ভিতরের বদলটা বোঝা যায় না।

চা কিংবা কফি কিছু ত খাবে? লাঞ্চ-এ কি খাবে?

রুষা জিগগেস করল।

কিছুই খাবো না।

মুখ কালো হয়ে গেল ওর। চোখ নামিয়ে নিচুস্বরে বলল, খাবে না? কেন? এতদিন পরে দেখা হল। খেয়েই যাও আমাদের সকলের সঙ্গে।

বলতে কষ্ট হল যদিও কিন্তু তবুও পৃথু বলল, নাঃ। দুপুরে গিরিশদা নেমন্তন্ন করেছেন

রুষা বলতে না-চেয়েও বলে ফেলল, গিরিশদাই তোমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের চেয়ে বড় হল?

পৃথুর মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। জবাব দিলো না।

ঘরে চলো।

রুষা বলল, টুসু ও মেরীর দিকে চেয়ে, মুখ নামিয়ে।

কোন্ ঘরে ?

আমার শোবার ঘরে।

ড্রইংরুমেই বসি। মিলি কোথায় ?

দিদিকে ডেকে নিয়ে এসো টুসু। যাও। আর তুমি খেলো গিয়ে বাগানে। বাবার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মিলি এল। হাতে একটি পড়ার বই। অপরাধী অপবাধী মুখ করে বলল, হাই। বাবা! তুমি কেমন আছ ? আই মিসড্ ট্যু ভেরী মাচ্।

মিলিকে দেখে অবাক হয়ে গেল পৃথু। কী সুন্দর আব কত লম্বা হয়ে গেছে মিলি। একটা বয়সে মাত্র কয়েক মাসেই মেয়েদের কী অসম্ভব পরিবর্তনই না ঘটে যায় শরীরে! এই সুন্দরী, যে কৈশোর আর যৌবনের ঘর দুটিব মাঝের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে, সে যে তারই মেয়ে এ কথা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। মুগ্ধ গলায় পৃথু বলল, হাই! ইয়াং লেডি! কেমন আছিস তুই ?

আমি খারাপ বাবা। আমি খুব খারাপ। ট্যু গুড ডিসওন্ মী।

বলেই অনুতাপমিশ্রিত ঔদ্ধত্যব সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল ও। চোখে জল ছিলো না। জ্বালা ছিল। রুষারই মেয়ে।

আসার আগে ঠিক করেই এসেছিল যে, মিলির সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবে। যে মেয়ে বাবাকে অমন চিঠি লিখতে পারে, যে মেয়ে মায়ের প্রেমিকের সঙ্গে প্রেম করতে চায় তাকে সত্যি সত্যিই ও ডিসওওন্ই করবে। মেয়ে বলে স্বীকারই করবে না। কিন্তু সেই পৃথুই ক্রাচ্-এ ভর দিয়ে দুটি লাফে এগিয়ে গিয়ে মিলিকে বুকে জড়িয়ে ধবল। ওব ইচ্ছে করল, সদ্য যুবতী মেয়েব সমস্ত দুঃখটুকু নিজের বুকে শুষে নেয়। নিঃশেষে।

মিলি, পৃথুর বুকেব মধ্যে কুঁকড়ে গিয়ে রাতভর ঝুলিয়ে-রাখা গুল্লি-করে-মারা জংলী হাঁসের মতো শক্ত হয়ে গেল।

টুসু বলল, ডোন্ট বী সিলী! দিদি।

রুষা বলল, টুসু, তোমাকে বাগানে গিয়ে খেলতে বলেছি না আমি। আই ডোন্ট ওযান্ট ট্যু হিয়ার।

টুসুর হাতে একটা সাদা-কালো চৌখুপী ফুটবল ছিলোই। সেটা নিয়ে ও চলে গেল।

পৃথুর বুকের মধ্যে মুখ রেখে মিলি বলল, আমি খারাপ।

পৃথু মিলির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবল, ভুল সকলেই করে। ভুল করলেই যদি খারাপ হয়ে যেত কেউ তাহলে... আর ভুল করে যদি ভুল করেছিস বলে বুঝতেই পেরে থাকিস তবে আর দুঃখ কিসের ? সব ত মিটেই গেল! ভুল করে ভুল স্বীকার করতে পারে কজন মানুষ রে মিলি ? মুখে বলল না কিছু।

মিলি বলল, বাবা! তুমি চলে যেও না। আমাদের সঙ্গে থাকো বাবা।

মাথা ঘুরতে লাগল পৃথুব। স্ত্রী ও মেয়ের কাছ থেকে এত আঘাত পেয়ে যে সচেতন নিষ্ঠুরতা সে মনের মধ্যে তিলতিল করে পাহাড়ের মতো জমিয়ে তুলেছিল সেই পাহাড়েরই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে গেল হঠাৎই। বুঝতে পারল, ওর এই উদাসী নির্মোকও আজও ওর মধ্যে অনেকই দযা, ক্ষমা, মায়া-মমতা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। বুঝতে পারল, অপত্য স্নেহের চেয়ে গভীরতর বোধ আর কিছুই নেই একজন মানুষের জীবনে। সন্তানের মুখ চেয়েই মানুষ মানুষী আবহমানকাল ধরে নিজেদের ঠকিয়ে এসেছে ; নষ্ট করেছে একটামাত্র জীবন।

মিলি আবারও বলল, বাবা। বল ? তুমি থাকবে ত ?

পৃথু বলল, আয় আয় কাছে আয়। আয় আমরা এখানে বসি, সোফাটাতে। ক্যাড্‌বারী খাবি ?

মিলি ?

বলেই মনে পড়ল যে, সে ত সঙ্গে করে কিছুই আনেনি মেয়ের জন্যে। শুধু আজই নয়। গত পনেরো বছরে কিছুমাত্রই আনেনি হাতে করে। কোনো ছেলেমেয়ের জন্যেই। আজ যা-কিছুই পাচ্ছে তার কিছুই প্রাপ্য নয় ওর।

বলল, রাবড়ি খাবি ? দাঁড়া, রাবড়ি আনাচ্ছি আমি।

তারপর, যে লোকটি গাড়ি চালিয়ে এনেছিল তাকে ডাকতে বলল রুষাকে। সে এলে, তাকে বলল, ভুচুবাবুকে বলে দিও গিরিশবাবুকে খবর দিতে যে, দুপুরে আমি এখানেই খাবো। আর রাবড়ি নিয়ে এসো ত' লাড্ডুর দোকান থেকে। এই নাও টাকা।

টাকা ভুচুবাবু দিয়ে দিয়েছেন।

নাও। ভুচুবাবুর টাকা রেখে দাও। ফেরত দিও বাবুকে। রাবড়ি আর ভাল কালাকাঁদও এনো। খাবি মিলি ? কালাকাঁদ ?

মিলি জবাব দিলো-না কোনো। পৃথুর পাশে ঘন হয়ে বসেছিল ও।

রুষা বলল, তোমার গাড়িটা নিয়ে আমি কি একটু বাজারে যেতে পারি ? তুমি খাবে, এতদিন পরে। বাড়িতে কিছুই নেই অতিথিকে খাওয়ানোর মতো। ভুচুকে তাইই বলেছিলাম, ভাল হত, আগে জানলে...

গাড়িটা ত ভুচুরই। নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে পারো তুমি। আব এই নাও টাকা। বাজারের।

আমার কাছে আছে। তাছাড়া, আমিও ত রোজগার করি। একবেলার অতিথির কাছ থেকেও কি কেউ টাকা নেয় ?

রুষা চলে গেল।

টুসু বাগান থেকে ফিরে এসে বলল, বাবা, খেলবে ?

মিলি বলল, বোকা বোকা কথা বোলো না। কি করে খেলবে বাবা ? বাবা কি আর আগেব মত আছে ?

পৃথু ভাবল, ঠিকই বলেছে মিলি ! বাবা আগের মতো আর নেই।

আজ আমি সারাদিন এখানে থাকব তোমাদেরই সঙ্গে। মজা করব। তবে সন্ধেবেলায় শামীমেব বাড়ি যেতে হবে। ওব মেয়ের বিয়ে ত।

টুসু বলল, জানি। নুরজেহান ! যার নামে টাজমেহাল, আগ্রার, তাই না ?

হেসে ফেলল পৃথু। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই টুসু বলল, ঐ নুরজেহানের জন্যেই ত' ডাকু মগনলালেব সঙ্গে তুমি ফাইট করলে, তাই না ?

পৃথু হেসে বলল, হ্যাঁ। তাইই ত !

মিলি বলল, বাবা আমি যাই আমার ঘরে ? তুমি থাকবে ত এখানে ? চলে যাবে না ত' সীওনীতে ?

কি কবে থাকব রে ? এখানেব চাকরী ত ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন খোঁড়া মানুষ। ইচ্ছে করলেই কি আর যেখানে সেখানে চাকবী পাবো ? একটা চাকরী পেয়েছি ত সীওনীতে। মাইনে দিচ্ছে, আমার এখনকার যোগ্যতার তুলনায় বেশিই। সুন্দর থাকার বাংলো। অনেক ফুল, প্লান্টস, ক্যাকটাই, অর্কিড, সাকুলেন্টস্। ছবির মতো একেবারে। আমি ওখানেই থাকব। মাঝে মাঝে না হয় আসব তোদের এখানে। তোরাও ছুটিতে ওখানে যাবি বেড়াতে। মাকেও নিয়ে আসিস। আমি ত' তোদের জন্যে কিছুই করিনি কোনোদিন। টাকা রোজগার করা ছাড়া আর কিছুই করিনি। তোদেব মা-ই-ই তোদের সব। মাকে কখনও দুঃখ দিস না তোরা। এমন ভাল মা, সকলের হয় না।

এখানে কোনো চাকরী তোমাকে দেবে না কেউ বাবা ?

মিলির "বাবা" ডাকটা পৃথুকে, টুসুর "বাবা" ডাকেরই মতো বড়ই এলোমেলো করে দিচ্ছিল বাব বার। যতদিন একসঙ্গে ছিল একবারও বুঝতে পারেনি যে, সে যে-থাকাকে না-থাকা-বলেই জানত তাইই ছিল এত-বড-থাকা। গ্রীষ্মর দাবদাহের পত্রহীন গাছের ন্যাংটো ডালপালার মধ্যেও যে প্রাণ

সুপ্ত থাকে, প্রথম রাতের বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই যে সেই সব রিক্ত ডালই কচি-কলাপাতা-সবুজ কিশলয়ের সহস্র গুঁড়ি গুঁড়ি কুঁড়িতে ভরে উঠে প্রমাণ করে যে, তারা প্রচণ্ডভাবেই ছিল। কিন্তু লুকিয়ে ছিল। একথা ও জানত।

কিন্তু কথাটা যে তার নিজের জীবনের বেলাতেও প্রযোজ্য তা জানত না। নিজের জন্যে, রুষার জন্যে, মিলি ও টুসুর জন্যে এক গভীর বেদনা অনুভব করতে লাগল ও। ওর আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব, অহং সবই যেন তার ছেলেমেয়ের কচি-গলাব "বাবা" ডাক একেবারে তছনছ করে দিল। ওদেরও উপর গভীর অভিমানে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। বড় বেশি দূরে। এখন যে মধ্যের সাঁকোটি পর্যন্ত ভেসে গেছে। ফিরবে কি করে?

কিন্তু এত কথা ওদেব বুঝিয়ে বলে, সে ক্ষমতা ওর নেই। বলতে গেলেও ওরা হয়ত বুঝবেও না।

পৃথু বলল মিলিকে, তুমি পড়ছিলে?

আচ্ছা বাবা। কোনো দবকার থাকলে ডেকো।

টুসু, যাও তুমিও খেলো গিয়ে।

তুমি ত খেলছ না! একা একা কি খেলা যায়?

পৃথু বোবা চোখে তাকাল ছেলের চোখে। বলতে চাইল, টুসুবাবা, যখন বড় হবি, জীবনের সব নিষ্ঠুর ঝড় আর আঁধি আর চোখ-জ্বালা-কবা "লু"-এর মধ্যে গিয়ে পৌঁছবি তখন জানবি যে, সারাটা জীবন একা একাই খেলতে হয় রে, প্রত্যেক মানুষকেই। চারধার অনেকে ঘিরে থাকে বটে, সুন্দর সব নারী আর পুরুষ কিন্তু তাবা বড-দোকানের কাঁচের শো-কেসের মধ্যের মডেলেরই মতো সবাই। পুতুল-মানুষ সব। তোকে পাস দেয় না, তোর পাস নেয় না। চারিদিকে মাথা-উঁচু প্রাচীরের মতো, সারি সারি তক্তা-পাতা বিশাল গ্যালারীতে থাকে মৃত্যুর গা-ছমছম্ নিস্তব্ধতা। নির্জন, বড় নির্জন সেই মাঠ। সে মাঠে গোল দিয়েও একটুও আনন্দ হয় না কারণ গোলপোস্ট আগলে ঝাঁপা-ঝাঁপি করে না কোনো লম্বা-মোজা আর জার্সি-পরা গোলকীপার। তোকে আটকাবার জন্যে থাকে না একজনও। কিন্তু কবে, কখন, কোন্ মুহূর্তে যে সত্যি-খেলার অদৃশ্য রেফারির বাঁশি বেজে ওঠে সেই মিথ্যে-খেলারই গা-ছমছম্- ভুতুড়ে মাঠে, তা আগের মুহূর্তেও বোঝা যায় না। পুতুল-মানুষরা সব জ্যান্ত হয়ে ওঠে। গ্যালারীতে লক্ষ দর্শক কানে-তালা-লাগানো চিৎকারে চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎই মাথা খারাপ করে দেয়। বল পায়ে তোর দৌড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোর ধমনীর রক্তর দপদপানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা চিৎকাব করে ওঠে গো-ও-ও-ও-ও-ও-ল্। মনে হবে করাব মতো কিছু করলি জীবনে। গোল খেতেও হয় একা একাই। তখন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু সেসব মুহূর্ত দু একবারই আসে। সারাটা জীবন একা একাই খেলে যেতে হয় মিথ্যে-মাঠে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দেব ছায়াকে ধাওয়া করে, হাঁফিয়ে যেতে হয়, ভিজে যেতে হয় ঘামে! যা বাবা! এখন থেকেই একা একা খেলা খেলতে শেখ।

টুসু মনমরা হয়ে চলে গেল।

পৃথু নিজের ঘরের দিকে গেল। তারপর লেখার টেবলে বসল গিয়ে।

অবাক হল দেখে যে, কাজেব লোকজন নেই, অথচ ধুলো পড়েনি টেবলে। যেসব বই রেখে গেছিলো সেসব পরিষ্কার আছে, অগোছালোও নেই কিছু।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই পৃথুর দু চোখ অজানিতে ভিজে উঠলো। সেই প্রাগৈতিহাসিক ন্যক্কারজনক ভাবাবেগ!

যাবে কি ফিরে সীওনীতে? মিলি ও টুসুকে ছেড়ে? ওরা যে আত্মজ-আত্মজাই। পারবে যেতে শেষ পর্যন্ত? অন্য কোথাওই চলে যাবে কি?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতা মনে এলো ওর।

"এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়

এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই চলে যেতে পারি
কিন্তু কেন যাবো ?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো"
স্তব্ধ হয়ে রইল পৃথু অনেকক্ষণ।

গাড়িটা ফেরার শব্দ হল বাইরে। রুষা এসে প্রথমে বাবুর্চিখানায় গেল। তারপর পৃথুর কাছে এসে বলল, একটু বোসো, প্লীজ। মেরীকে বুঝিয়েই আসছি। ও তেমন ভাল রান্না করতে পারে না। আজকের রান্না আমিই করব। মাঝেমাঝেই করতে হয় এখন। আসছি এক্ষুনি।

তুমি রান্না করো ? রান্না করতে জানো তুমি ?

হাসল রুষা। বলল, রান্না করা কী আর এমন কঠিন কাজ ? তোমারই বেয়ারা-বাবুর্চি যতদিন ছিল ততদিন বড়লোকি করে নিয়েছি। আজ যখন নেই, তখন রাঁধছি। সেদিন পৃথু ঘোষ সাহেবের বউ নিজে হাতে রাধলে লোকে কি বলত ? তাছাড়া তুমিই ত চিরদিন তুলোর মধ্যে করে রেখেছিলে আমাকে। এবং ছেলেমেয়েদেরও। পরীক্ষার দরকার না থাকলে, কেই বা পরীক্ষাতে বসতে চায় বলো ? পরীক্ষা না দিয়েই ত' অনেকই ডিগ্রী পেয়েছিলাম সেদিন। রুষা ঘোষকে সেদিন বাইরের জগতের দরকার ছিল, হাটচান্দ্রার সমাজ আমাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকত ; তাইই বাইরেরই হয়ে ছিলাম। আজ যখন ভিতরে ডাক পড়েছে তখন অন্য দশজন সাধারণ মেয়ে যা করে,তাইই করছি। অসাধারণ যারা, তারা সাধারণের চেয়ে বড় বলেই অসাধারণ। অসাধারণরা ইচ্ছে করলেই সাধারণ হতে পারে কিন্তু যারা সাধারণ, তারা শত চেষ্টাতেও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে না। তোমাকে একদিনও খিচুড়িও রেঁধে খাওয়াইনি বলেই চিরদিন অনুযোগ করে এসেছো তুমি পৃথিবীর সকলেরই কাছে। আমার জীবনের সব কিছু যে তোমাকেই ঘিরে ছিল, তোমার জন্যে গর্বিত হয়ে, এবং তোমাকে নিয়েই ; সেটুকু বোঝার মতো সময় বা বুদ্ধি ত তোমার কোনোদিনও হলো না ! আজ তোমাকে সত্যিই চাইনিজ রান্না করে খাওয়াবো। খেয়েই দ্যাখো, রাঁধতে পারি কি না।

পৃথু বিস্ময়ে চেয়ে রইল চলে-যাওয়া রুষার দিকে।

নিজেকে বড় বোকা, অসহায় ; উদভ্রান্ত বলে মনে হল।

একটু পরই রুষা ফিরে এসে বলল, চলো, শোবার ঘরে।

কেন ?

কফি রেখে এসেছি আমাদের। ওখানে চলো। কথা আছে।

ক্রাচ তুলে নিয়ে পৃথু ওর পেছনে-পেছনে শোবার ঘরে গেল। এই ঘর থেকেই একদিন রুষার শরীর চাওয়াতে রুষা তাকে ঘেন্নায় বের করে দিয়ে বলেছিল, "কুর্চির কাছে যাও। যেখানে খুশি যাও।" বিজলীর কাছে তার পরই প্রথম যাওয়া ওর। কুর্চির প্রতি আকর্ষণটাও তীব্রতার দীপ্তি পেয়েছিল সেই ঘটনাতেই।

রুষা বলল, কফিটা খাও। তারপর মনে করো, আমি যেন পরস্ত্রী। তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই। মনে করো, তোমার বিজলীরই মতো আমিও একজন নষ্ট মেয়ে। নষ্টই অবশ্য। তারপর সাধ মিটিয়ে আদর করো আমাকে। পরখ করেই দ্যাখো, আমি বিজলীর চেয়েও ভাল আদর করতে পারি কি না ?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল পৃথু ঘোষ।

বলল, কী বলব জানি না।

এখন কিছুই বলার সময় নয়। করার সময়। হাজব্যান্ডিং-টাইম এখন। শরীরের সঙ্গে শরীরের

কথার সময়। মুখকে নিবিয়ে দাও আপাতত। মনকেও। কী করে মন নিবোতে হয় তা তো তুমি জানোই। এমন কী গলা টিপে মারতেও জানো।

কফিটা শেষ করেই রুষা বেডরুমেব দরজা লক্ করে জানালার পর্দা টেনে রট্-আয়রনের ড্রেসিং-টেবলটার সামনেব কমলাবঙা গোল গালচেটার উপরে এসে দাঁড়িয়ে একে একে সব পোশাক খুলে ফেলল। কমলারঙা পর্দার মধ্যে দিয়ে রোদের আভা ঘরটিকে কমলা-রঙা কবে তুলল। আর রুষার শরীরের বঙ ত' কমলাই।

দুই কোমবে দু হাত রেখে প্যাবিসেব ফ্যাশান শোর মডেলদের মতো উদ্ধত গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে বলল, ভাল করে চেয়ে দেখে বলো, আমি তোমার বিজলী অথবা কুর্চির চেয়ে অনেকই বেশি সুন্দরী কি না ? শরীর ছাড়াও যে একজন মেয়ের অনেক কিছু থাকতে পারে তা ত কোনো পুরুষই স্বীকার করে না !

পৃথু, খাটের কোণায় বসেই রইল। কথা বলল না কোনো। ও ভাবছিল, কত্ত বদলে গেছে রুষা।

পেঁপে গাছে বসে দাঁড়কাকগুলো হঠাৎই ডাকাডাকি শুরু করল। দিনের বেলায় ও নগ্ন হলেই কী করে যেন বুঝতে পারে কাকগুলো। ভারী অসভ্য।

ভাবল, রুষা।

একটুক্ষণ সময় কেটে গেল। পৃথু নড়ল না। রুষাও তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল। অদৃশ্য একসারি বিচারকের সামনে ও যেন নিজেকে অনাবৃত করে বিজলী আর কুর্চিকে প্রতিযোগী ভেবে বিচারের রায়-এর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল। দাঁতে-দাঁত চেপে রুষা পৃথুকে বলল, আমাকে হারাতে পারে এমন কেউই নেই। শুধুমাত্র শরীরের প্রতিযোগিতাতেও নয়।

এমন সময় মেরীর গলা শোনা গেল দরজার কাছে। মেরী বলল, ম্যাডাম্ নুডলস্ সেদ্ধ হয়ে গেছে।

আসছি আমি। বলেই, জামাকাপড় তুলে নিয়ে পরতে লাগল।

পৃথু বলল, যাও। নুডলস সেদ্ধ হয়ে গেছে।

রুষা ওর দিকে অবাক চোখে চেয়ে বলল, সত্যিই তুমি চাও না ?

পৃথু হাসল, বলল, তোমার শরীরের চেয়ে এখন নুডলস্ই আমার বেশি প্রিয়।

সশব্দে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে রুষা ভাবছিল, অনেকই বদলে গেছে এই ক'মাসে মানুষটা। যার যেমন যোগ্যতা, তাব প্রাপ্তিও সেই রকমই হয়। ও কুর্চিরই যোগ্য, তাব কাছেই ফিরে যাবে হয়ত !

খাওয়া দাওয়ার পর পৃথু বলল, মিলি-টুসুকে ; এবারে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছো এখন বাবা ?

ভুচুব কাছে যাব।

রাতে ফিরে আসবে না ? আমি কিন্তু তোমার কাছে শোব বাবা। টুসু বলল।

তুমি নয়। আমি শোব আজ। সেই কবে বাবার কাছে শেষ শুয়েছিলাম, ভাল করে মনেই পড়ে না।

ওকে। এখন যাও তোমরা। এনাফ্ ইজ এনাফ্। রুষা বলল। বাবা যাবার সময়ে আবার এসো।

ওরা চলে গেলে রুষা বলল, ওদের কিছু বলে যাবে না ?

কি ?

উপদেশ, শাসন, ভালমন্দ দুটো কথা, সব বাবারা তাদের ছেলেমেয়েদের যেমন বলে, যেমন বলে এসেছেন চিরদিন !

নাঃ।

না কেন ?

কোনো কারণ নেই। আমি ওদের আদরই করতে পারি, ভালবাসতে পারি কাছে পেয়েছি বলে। ওরা ত কোনোদিনও আমার ছিলো না। তুমি ত স্বয়ংসম্পূর্ণা। ওদের বাবাকে কোনো দরকার নেই।

টাকা ত পাঠাবই। এ ছাড়া আর কিছু করতে পারিওনি, করতে তুমি দাওওনি। এখন আর হয় না। বড়ই দেরী হয়ে গেছে। তবে. চিঠি লিখব ওদের। তোমাকেও। ইচ্ছে হলে তুমিও লিখো।

একটু চুপ করে থেকে পৃথু বলল, ভুচু ছেলেটা ভারী ভাল। তোমার জন্যে আমার কোনো ভাবনা রইল না যে. এটাই মস্ত বড় কথা।

তাব মানে ?

বাঘিনীর মতো ঘুবে দাঁড়াল রুষা। পুরোনো দিনের মতো। যে-রূপে, পৃথিবীর কোনো মেয়েকেই মেয়ে বলে মনে হয় না।

মানে নেই কোনো। ও আছে. লোকাল গার্জেন ; ওইটেই বড় ভরসা। তুমি ওকে পুরোপুরি চেনো না। ওব মতো ছেলে হয় না। ছেলেবেলা থেকে অনেকই কষ্ট পেয়েছে। ওকে কখনও কষ্ট দিও না। পারলে. খুশি কোরো। ও খুশি হলে আমিও খুশি হব। এই আমার মনের কথা।

রুষা চুপ করে বইল।

পৃথু জানালা দিয়ে বাইবে চেয়ে বলল, এবার ডাকো ছেলেমেয়েদের। যেতে হবে। সময় হল।

মিলি ও টুসু দুজনেই দরজা অবধি এগিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে থাকল, দরজায় দুজনে। ওদের পেছনে. মা. রুষা। তার মুখের ভাবে কোনো বিষণ্ণতা ছিলো না। অথচ উদাসীনতাও নয়। কোন্ উপাদানে বিধাতা যে তাকে গড়েছিলেন, তা তিনিই জানেন।

সিঁড়ি থেকে নামবার সময় মিলি ও টুসুর মাথায় হাত দিয়ে মনে মনে বলল পৃথু, ডিগ্রীধারী মার্কামাবা শিক্ষিত হবার দরকার নেই তোদের। তোরা মানুষ হোস। ভালমানুষ। যে মানুষ, দুঃখ তাকে পেতেই হবে। নানারকম দুঃখ। কিন্তু দুঃখকে এড়াতে গিয়ে অমানুষ হোস না।

গাড়িব দবজা খুলে দিল ভুচুর লোক। লোকটার নাম জানে না। জিগ্যেস করল, নাম কি তোমার ? ও বলল, অর্জুন।

আজ অর্জুনকে দরকার ছিলো না পৃথুর। শ্রীকৃষ্ণর মতো সারথী হলে ভাল হত।

মিলি ও টুসু হাত তুলে বলল, টা ' টা ! বাবা !

রুষা একা গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বলল, এসো মাঝে মাঝে। ভাল থেকো। চোখেব অযত্ন কোরো না। এনজয় ইওরসেল্ফ।

পৃথু বলল, সো ডু ঊ্য।

ছেলেমেয়েদের বোলো চিঠি লিখতে।

বলব। গলা নামিয়ে বলল, তবে ওদের নিয়ে চিন্তা নেই। ওরা আমাদের কেউই নয়। ওরা সব স্বার্থপরের ঝাড়। পা শক্ত হলেই নিজের নিজের পথে হেঁটে যাবে। যতদিন আছে. যতখানি ভাল করে পারি ট্রিট করব। এইই ....

গাড়িটা ছেড়ে দিল।

পৃথু ভাবছিল ওই 'টা টা' কথাটার মানে কি?। ও জানে না। ওই টা ! টা ! বলারই মত অনেক কিছুই করে এল জ্ঞান হবার পর থেকে আজ অবধি অন্যর দেখাদেখি। মানে না বুঝে। না ভেবে। কাটিয়ে দিল এতগুলো বছর।

চাইনীজটা কিন্তু রীতিমত ভালই রেঁধেছিল রুষা। চিকেন অ্যাস্‌পারাগাস্‌ স্যুপ, চিকেন উইথ ব্যাম্বুশুটস্‌ এবং ভেজিটেবল্‌ ফ্রায়েড রাইস্‌। আমেরিকান চপ-স্যুইও, লালচে, খুব ক্রিসপ্‌ করে। মিলি টুসু এতদিনে রুষার রান্না খেয়ে বোধ হয় অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। ওদের বিস্মিত হতে দেখল না বোধ হয় তাইই !

পৃথুর বাহন সাদা অ্যাম্বাসাডরটা যখন লছমন শাহুর সোনা-চাঁদির দোকানের দিকে যাচ্ছিল সোনা-চাঁদি মহল্লাতে, ভুচু ঠিক তখনই থানা থেকে বেরিয়ে জীপ নিয়ে অন্য পথ দিয়ে শামীমের মেয়ের শাদীর জায়গাতে ফিরে যাচ্ছিল। সন্ধে হয়ে যাবে একটু পরই। অনেকই কাজ।

থানার দারোগার দরজা-বন্ধ ঘরে বসে ভুচু প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে নিজের জবানবন্দী নথীভুক্ত করিয়ে এল। রাজসাক্ষী হবে ও। শামীম কি করে ইদুরকারকে খুন করেছিল একা হাতে, ভুচুর প্রবল

আপত্তি সত্ত্বেও এবং পৃথু ঘোষের অজানিতেই তারই পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছিল। আজই ছিল সবচেয়ে সুবিধেজনক দিন। কারণ শামীম আজকের মতো ব্যস্ত অনেক বছরের মধ্যেই আর থাকবে না। ভুচু দারোগাজীকে বলেছিল যে, এই কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডারের জন্যে শামীমের ফাঁসী হওয়া উচিত। দারোগাজী বাঁহাতের দু-আঙুলে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলেছিলেন যে, "হবে"। মান্দ্‌লার বড় সাহেবের সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁর। জবলপুর থেকে ডি· আই· জি সাহেব রাতারাতি এসে সার্কিট-হাউসে ক্যাম্প করবেন। ভুচুরই অনুরোধে। বিয়েটা চুকে যাবার পরই শামীমকে অ্যারেস্ট করা হবে। জবলপুর থেকে ক্রেনও আসছে। হাঁলোর বুক থেকে মার্সিডি়স্ গাড়িটা কাল তোলা হবে। পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠানো হবে ইদুরকারেব মৃতদেহ জবলপুরে।

জোরে জীপ চালিয়ে ফিরে আসছিল ভুচু। ওর চুল উড়ছিল হাওয়ায়। উড়ছিল ঘাড়ের কেশর। ভাবছিল, চিরদিনই ও একটি সুস্থ সুন্দর পুরুষালি জীবন চেয়েছিল। পৃথুদার চামচেগিরি করতে করতে ভুলেই গেছিল যে, একজন নারী ছাড়া কোনো পুরুষই সম্পূর্ণতা পায় না। শরীরের মধ্যে বড় ছটফটানি বোধ করে আজকাল। পামেলাকে একদিন চুমু খেয়েছিল শুধু। এ ছাড়া, তার উনত্রিশ বছরের জীবনে নারীর সান্নিধ্য বলতে আব কিছুকেই ও জানেনি। শামীমকে ধরিয়ে না-দেওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না কোনোই। নইলে তার নিজেব মাথার ওপরও খাঁড়া ঝুলত। মাথার ওপর খাঁড়া নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না। পৃথুদা এখান থেকে কবে যাবে, তা জানে না ও। তবে, গেলেই এবার রুষার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত কববে ভুচু। রুষাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। অথচ এতদিন তাকে চিনেও কী করে যে বেঁচেছিল তা ভেবেই পায না। কখন যে কী ঘটে যায় মনে মনে: আচানক্!

ভুচু চলে যেতেই দাবোগাজীর ফোন বাজল আবার। মান্দ্‌লা থেকে।

এস, পি বললেন, ঐ বাঙ্গালী মেকানিককেও শামীম মিঞার সঙ্গেই আরেস্ট করবে। ডি-আই-জি সাহেব বলে দিয়েছেন। অ্যাবেটমেন্টের চার্জ-এ।

ইয়েস্ স্যার। বলে, ফোন নামিয়ে রাখলেন দারোগাজী।

থানার উল্টোদিকে যে ছোট্ট পানের দোকানটা আছে বড় সেগুণগাছটার নিচে তার মালিকের নাম রহমতুল্লা। মেহেন্দী লাগানো চাপ-দাড়ি লোকটার। বনবেড়ালেব মতো ছাই-রঙা চোখ। বয়স চল্লিশটল্লিশ হবে। ভুচুর জীপটা, থানায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর যেই চলে গেল তক্ষুনি রহমতুল্লা তার ছেলে সিদ্দিকিকে দোকানটা সামলাতে বলেই, গাছের গুঁড়িতে হেলান-দেওয়ানো সাইকেলটা তুলে নিয়ে জোবে প্যাড্‌ল করে চলল বিড়ি ফ্যাকটরীর দিকে, যেখানে শামীমের মেয়ের শাদীর শামিয়ানা পড়েছে। শামীম আগেই বলে রেখেছিল ওকে। শামীমের কাছে ভুচু নেহাৎই শিশু। ভালমানুষরা খলদেব সঙ্গে কখনই পেরে ওঠে না, এক সম্মুখযুদ্ধ ছাড়া। কিন্তু খল চরিত্রের মানুষরা কখনই কারো সঙ্গে সামনাসামনি শত্রুতা করে না। পেছন থেকেই ছুরি মারে।

ঈত্বরদানে সবরকম ঈত্বব ইস্তেমাল করা হয়েছে। ফিরদৌস্, শামামা, রুহ্ খসস্, গুলাব এবং আরও অনেক রকমের আতর। সেই সবেরই তদারকী করছিল তখন শামীম। এমন সময় রহমতুল্লা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পৌঁছল। শামীম তাকে দেখে এবং তার মুখের ভাব বুঝেই বিড়ি ফ্যাকটরির মাঠের এক কোণাতে নিয়ে গিয়ে সব শুনল। শামীম বলল, ওকে বিভ্রান্ত করার জন্যে; ভুচু যা করেছে তা করেছে। এর জন্যে কোনো চিন্তা নেই। কারণ কাল ভোরের আগেই পীরথু ঘোষই ওকে সাবড়ে দেবে!

কেন? ঘোষ সাহাব কেন?

রহমতুল্লা অবাক হয়ে শুধোল।

আরে তার বিবির সঙ্গে ভুচু লটর্‌পটর্ করছে না। বিবির সঙ্গে লটর-পটর করলে পীরথুদাদা আর কি করবে?

রহমতুল্লা টাগ্‌রাতে জিভ ঠেকিয়ে একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করে বলল, ঐ আওবতে আর রাণ্ডীতে তফাৎ কি আছে?

তবু। যার আওরাত তার ত লাগেই! যদিও পীরথু ঘোষ এক অজীব আদমী আছে। নিজের

বৌকে অন্যের ভোগে লাগিয়ে নিজে আরেকজনের বৌকে ভোগ করছে। শালা রহিস্ আদমীদের কারবারই আলাদা!

রহমতুল্লা চলে যেতেই, একটি গাড়ি ও একটি জীপ দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও, ছেলেদের ও শালাদের "একটু আসছি ঘুরে" বলেই, মোটর সাইকেলটা তুলে নিয়ে বড়া মস্‌জিদের পেছনের গলিতে ইমরান্ খাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল শামীম। ইমরান্-এর ভাই ইমরাত্‌ও ছিল। চৌপাইতে লুঙি তুলে বসে খট্‌মল্ মারছিল খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে টিপে টিপে। মিনিট পনেরো গুজগুজ ফুসফুস করল ওরা। ওরা দু'ভাই কথা দিল। শাদীর খানাপিনা সেরে আজ রাতেই যখন ফিরবে ভুচু তখন নিশ্চয়ই ও খুপরিয়ার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকার্ট করে আসবে। তখন একটা পুরোনো বেডফোর্ড ট্রাক দিয়ে পথ আটকে ভুচুকে সাবড়ে দেবে ওরা। পয়সা নিয়ে খুন করাই ওদের পেশা। হাত্ কাঁপে না, চোখের পাতা পড়ে না। দু'হাজার টাকা কবুলও করে এল শামীম। বিয়ের আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ যে দশ হাজার দিয়েছিল ভুচু তা থেকে পাঁচ আগেই সরিয়ে রেখেছিল ও। অন্য সব খরচ ত ভুচু এমনিতেই দিচ্ছে। ভুচুকে শামীম এমনিও সরাতো। ভুচু না থাকলে তার দামাদ হুদাই হবে ভুচুর গারাজের মালিক। বাকি জীবনটা শামীম আর গর্তের মধ্যে বসে ভাঙা ঘড়ি সারাবে না, গাড়ি সারাবে এবার। তবে, ঐ হুদাটাকেই বিশ্বাস নেই। ও শেষে শামীমকে পাত্তা নাও দিতে পারে। তবে সে সব পরের কথা। ইদুরকারের খুনের একমাত্র সাক্ষী ভুচু। সে না থাকলে, পুলিসের বাবার সাধ্য নেই যে, এই কেস ট্যাঁকায়। সে কারণেই এবং ভুচুর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই তাকে যেতে হবে। হুদা ছোকরাটা এক নম্বরের বুদ্ধু। শরিফ আদমী মাত্রই বোধ হয় বুদ্ধু হয়।

শাদীর শামিয়ানা দেখা যাচ্ছিল। কাছাকাছি এসে গেছে। ভুচু ভাবছিল, মাথার উপর ইদুরকারের মার্ডারের ফাঁড়া নিয়ে সে রুষার দিকে এগোতে পারবে না। বাকি জীবনটা একেবারেই নিষ্কণ্টকভাবে কাটাতে চায়। এই শামীমটা এক নম্বরের ক্রিমিন্যাল। ও যেভাবে সব কিছু ঠাণ্ডামাথায় ঘটিয়েছে তাতে ভুচু নিজে রাজসাক্ষী না হলে শামীমই তাকে ফাঁসিয়েই দেবে একদিন। ভুচুর এখন সুস্থ দেহে ভাল করে কারখানা চালাতে হবে। রুষাকে খুশি রাখতে অনেক টাকার দরকার। পৃথুদার ছেলেমেয়েদেরও ও খারাপ রাখবে না। তবে নিজেরও একটি ছেলে অথবা মেয়ে চাইই। রুষারই মত সুন্দরী হবে কি সেই মেয়ে? যদি মেয়েই হয়? কে জানে?

তবু, থানায় যাওয়ার জন্যে বড় অপরাধীই লাগছিল ওর। ভালমানুষের বড়ই কষ্ট। কখনও যে কারো ক্ষতি করেনি জীবনে।